সচিত্র মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী

"সাগর মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার,
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

সম্পাদক—
শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়

১৭শ বর্ষ
(শ্রাবণ ১৩২৮—আষাঢ় ১৩২৯)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।/০

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট
৪৪ডি, পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালি কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য ...
সডাক—৩৲

সূচীপত্র

১৭শ বর্ষ

(শ্রাবণ ১৩২৮—আষাঢ় ১৩২৯)

উপাসনা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ?
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার।
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে!"

১৭শ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩২৮ | ১ম সংখ্যা

স্বাদেশিকতার সীমা

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত]

এখন কথা উঠেছে যে, আমাদের জাতীয়তাকে খুঁজে নিতে হবে এবং সেই জাতীয় আত্মার উপর আমাদের শিক্ষা দীক্ষা সব প্রতিষ্ঠিত করে আমাদের জীবনে একটা নূতন সুর ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে। কিন্তু সে সুর যে কি রকম হবে তা নিয়ে অনেকেরই মতভেদ। কেউ বলেন, সে সুর হবে একেবারে খাঁটি ভৈরবী ও গান্ধার; আবার কেউ কেউ বলেন, সে সুরকে সাধ্‌তে হবে পিয়ানো বা হারোনেটের সঙ্গে সঙ্গত রেখে। আসল কথা এই যে, কি ধরণে আমাদের জাতীয় জীবন গড়ে উঠবে এবং কোথা থেকে আমাদের মরণোন্মুখ প্রাণে নূতন রূপ ফুটে আমাদের গোটা জাতিকে একটা নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করে তুলবে সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা বড় বেশী লোকের মাথায় নেই। কারণ তা যদি থাকত তা হলে এমন আজগুবি কথা আমাদের শুনতে হ'ত না যে, ইংরাজী পড়েই নাকি বাঙ্গালীর ম্যালেরিয়া হয়েছে। এর পর ছেলেদের স্কুল কলেজ ছাড়িয়ে আবার পাঠশালা টোলে পাঠাবার প্রস্তাব যে তথাকথিত দেশহিতৈষীরা করবেন তাতে আশ্চর্য্য হবার কারণ নিশ্চয়ই নেই। এ প্রস্তাব খুব দেশহিতৈষণা-প্রসূত হ'তে পারে, কিন্তু মোটেই কাজের নয়; শিক্ষা দীক্ষা বিষয়ে অগ্রসর হতে গেলে যে পুরাপুরি অতীতের ছিন্ন কন্থা ধরে টানাটানি করতে হবে এ ধারণা দার্শনিকের শোভা পেতে পারে, কিন্তু কর্ম্মী স্বদেশ-প্রেমিকের মোটেই সাজে না।

আমাদের জাতীয় জীবনের পরিকল্পনা এখনও শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, তাকে গভীর চিন্তা ও জ্ঞানের আকর্ষণে এই মাটীর বুকে রূপ নিয়ে দাঁড় করাতে হলে অনেক জিনিষ অনেক দিক থেকে ভেবে দেখবার প্রয়োজন। কারণ, একবার কতকগুলি ধারণা জন্মে গেলে, কতক সংস্কার গড়ে উঠলে, কতকগুলি নূতন ভাব বদ্ধমূল হলে তা পরিবর্ত্তন বা বর্জ্জন করা যে শুধু সময়ের অপব্যয় তা নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা একেবারে অপরিত্যজ্য। সুতরাং জাতীয় ধারণা, জাতীয় সংস্কার ও জাতীয় ভাব বলে তাড়াতাড়ি কতকগুলি দাঁড় করালেই চলবে না, কারণ বুঝতে হবে যে, এর সঙ্গে আমাদের জাতির রক্তমাংসের টান থেকে যাবে।

তাই প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত আমাদের উদ্দেশ্যটা কি। আমরা কি বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন চিন্তা নূতন ভাব দিয়ে সভ্যজগতের একটা অঙ্গ হয়ে থাকতে

চাই, না আপনাদের একটা আলাদা জাতি করে গড়ে তুলে নির্জ্জন খাপছাড়া ভাবে থাকতে চাই? অবশ্য আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাজনীতিক স্বাধীনতা, আর্থিক সচ্ছলতা, সমাজের একত্রীকরণ ও ধর্ম্মে উদারতা; কিন্তু কিসের জন্য? এগুলিই কি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, না এ ছাড়া আরও কিছু উচ্চতর লক্ষ্য আছে? যদি থাকে, তবে সেটা কি? এখনকার দিনে নিশ্চয়ই কেউ বলতে পারবে না যে সে লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দুর নির্ব্বাণ, মুসলমানের বেহেস্ত বা খ্রীষ্টানের মুক্তি। সে উদ্দেশ্য হবে মানুষের জীবনে শান্তির সঙ্গে একটা আনন্দ ফুটিয়ে তোলা। সেইজন্যই জাতীয় জীবনকে একটা খাপছাড়া লজ্জাবতী লতার মত গড়ে তুললে চলবে না, অন্য দেশের জাতীয়তার সংস্পর্শ তাকে সহ্য করতে হবে, অন্যের সহিত সংঘাতে তাকে বল অর্জ্জন করতে হবে। কারণ সভ্যজগতের এ জ্ঞান এখন জন্মেছে যে, মানুষের মনোজগৎ কেউ আর এক হাতে গড়ে তোলে নি, এর ভিতর নানা দেশের, নানা যুগের রূপ ফুটে উঠেছে। তাই বিদেশী ভাষা ও বিদেশী সাহিত্যের চর্চ্চা ছেড়ে দিলে আমাদের মনোরাজ্য একঘরে ও কোনঠাসা হয়ে পড়ে থাকবে। একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের চর্চ্চায়, জাতীয় ভাবের ধারণায় মানুষের মন জাতীয় গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যায়, এবং এ বিষয়ে বোধ হয় কারও মতভেদ নেই যে মনোরাজ্য কূপমণ্ডুকের মত থাকা উচিত নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়—হ'ক না সে কূপ যতই প্রশস্ত, হ'ক না তার অগাধ গভীরতা। আর এ কথাও স্বীকার করিতেই হবে, যে জাতি মনে যতই বড় হ'ক না কেন, তার মনের একটা সঙ্কীর্ণতা আছেই যার প্রাচীর ভাঙবার জন্য বিদেশী মনের ধাক্কা চাই। তখন যদি না বুঝে শুনে খেয়ালের মাথায় বলি

"ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ তরী
আমার সোণার ধানে গিয়াছে ভরি।"

এ যে শুধু মূর্খামি তা নয়, বাতুলতার চিহ্নও বটে। বিদেশীর প্রতি অবজ্ঞা, বিদেশী মনের অজ্ঞতা থেকেই জন্মলাভ করে এবং এই সূত্রে জাতির প্রতি দ্বেষ হিংসা জেগে উঠে। সুতরাং বিদেশী সাহিত্য বিদেশী ভাবের সংস্পর্শে শুধু যে আমাদের মন পবিত্র ও উদার হয় তা নয়, আমাদের হৃদয়ও প্রশস্ত হয়; শুধু মানসিক নয়, নৈতিক উন্নতির দিক থেকেও আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পারি অতএব মনোজগতে মুক্তিলাভ করতে হলে এবং সে মুক্তি সব স্বাধীনতার সেরা, আমাদিগকে বিশ্ব-মানবের মনের সংস্পর্শে আসতেই হবে, কারণ মনোজগতে বৈচিত্র্য থাকলেও দেশভেদ নিশ্চয়ই নেই।

আমাদের আগের যুগে যা ছিল সবই ভাল—কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি সামাজিক মতে, কি জীবনের অন্য কাজে, এমন ধারণাই আমাদের জাতীয়তা গঠনের সব চেয়ে বড় অন্তরায়। অতীতের ক্ষুদ্র প্রাচীরের মধ্যে জীবনটা ধরে রাখতে চাওয়া শুধু মিথ্যা নয় মূর্খতাও বটে। অতীতকে আমরা শ্রদ্ধা করি কারণ সে ভবিষ্যতের পথ চিনিয়ে দেয়। যদি আমাদের জাতীয় জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে সবল স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য নিয়ে গড়ে তুলতে হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিশিষ্ট ভূমার আনন্দ তার মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয়, তা হলে সব দিক থেকেই আমাদের বাইরের পৃথিবীটার সঙ্গে মেশামিশি করতে হবে। আমাদের দেশকে যদি জেগে উঠে আবার পৃথিবীর অন্য জাতির সঙ্গে সমানে দাঁড়াবার শক্তি পেতে হয়, তা হলে সমগ্র মানবজাতির আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক, সকল শক্তির বিশেষ পরিচয় নিয়ে তার থেকে আমাদিগকে লাভবান্ হতে হবে।

স্বদেশপ্রীতি অবশ্য খুব বড় জিনিষ এবং সেটা সকলের থাকা আবশ্যকও, কিন্তু বিদেশ-বৈরিতা একটা পাশবিক হিংসাপ্রবৃত্তি এবং সেটা যতই বর্জ্জন করা যায় ততই মঙ্গল। আপনার দেশের সব কিছুকে ভালবাসা একটা মস্ত কথা, কিন্তু তাই বলে বিদেশের যা কিছু সবই নিন্দনীয় এমন ভাবাও বাতুলতা মাত্র। বিদেশের সভ্যতা, বিদেশের বিজ্ঞানের সহিত আমাদের ঘনিষ্ট পরিচয় রাখতে হবে, কারণ তাতে অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন আমাদের হৃদয়-বধূটী ঘোমটা খুলে যাবে এবং তার স্বাভাবিক রূপ ফুটে বেরুবে। একটা জাতকে দাঁড়াতে হলে তাকে জ্ঞানরাজ্য অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু জয় করতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্য জাতি [illegible] স্পর্শ [illegible]

ইচ্ছাধীন তা নয়—একেবারে অবশ্যকরণীয়। যদি তের ব্যবসা ভারতবাসীদের চালাতে হয় এবং তা' দিয়ে দেশের শুধু ধনক্ষয় বন্ধ করা নয় ধন অর্জ্জনও করতে হয়, তা হ'লে বিদেশীর বিজ্ঞান-কৌশল ত্যাগ করলে চলবে না। এসব ক্ষেত্রে বিদেশ-বৈরিতা সর্ব্বনাশের কথা। কেউ কেউ নাকি বলেন, আমাদের যা ছিল তাই ভাল, আমাদের যেমনটি ছিল তাতেই ফিরে যাই—সেই মঠ, স্তূপ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, পুরাণ, সংহিতা, স্মৃতি—ওসব বিদেশী জ্ঞানে আমাদের প্রয়োজন নেই। কথাটা দেশাত্মবোধের ভ্রান্ত গোঁড়ামি হ'তে পারে, কিন্তু আদৌ কাজের নয়। কারণ পিছু হাঁটাই যে উন্নতির লক্ষণ এ ধারণা নিশ্চয় কারও নেই। মানুষের জীবনটা উন্নতির পথেই ধাবিত হতে চায়—জ্ঞানে কর্ম্মে ও অধ্যাত্মবিদ্যায়। তাকে সহজ সচল গতি দিতে হবে—সকল দেশের জ্ঞানের মার্গে, কর্ম্মের পথে ও নীতির শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে। ভারতের পক্ষে এ কথাটা বড় বেশী করেই খাটে। ভারতের মন যুগ যুগান্তর ধরে কুরূপ নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে, তাকে জাগাতে হলে বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যের সোনার কাটি ছোঁয়াতে হবে। জাতি ও আচারের বদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বাঁধা নিয়মে, অশিক্ষায় কুশিক্ষায় দেশের বহুদিনের অশান্ত অবস্থায় এবং জীবনকে ছোট করে দেখাইয়া কেবল বৈরাগ্য সন্ন্যাসের আদর্শ প্রচারে ভারতের জীবন এতটা পঙ্গু হয়ে পড়েছে যে, তার নিশ্চলতাই চোখে পড়ে, কোন্‌খানে যে সচল গতি তা ত দেখা যায় না। এইজন্যই তাকে জাগবার শক্তি দিতে হলে বাইরের থেকে ধাক্কা দিতে হবে।

তবে দেশাত্মবোধেরও খুবই প্রয়োজন আছে আমার কি ছিল এবং আমার কি আছে, এটা বোঝাও ত চাই। লেখক ও সমালোচকেরা যখন বলবে ওরা জুলুর মত অসভ্য জাতি, ওদের সভ্যতা কোন সময়েই ছিল না এবং ওরা চিন্তারাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে লক্ষ্য করবার মত কোন জয়ই করেনি; মোট কথা, বিশ্ব-সভ্যতার ওরা পরগাছা মাত্র। তখনই আমাদের দেশাত্মবোধ জেগে উঠা [illegible]জন। জগৎকে তখন দেখাতে হবে আমরা [illegible] সভ্যতার উত্তরাধিকারী, প্রাচীন জগতের কেমন-ধারা অতুলনীয় মনীষীদের আমরা বংশধর। এই দেশপ্রেমিকতা আমাদের অন্তর্দৃষ্টি এনে দিয়ে আত্ম-সম্মান জাগিয়ে তুলবে এবং সেই অতীতের স্মৃতি আমাদের ভবিষ্যতের মহত্ত্বের পথ দেখিয়ে দেবে। কারণ আমরা এমন এক জাতির সন্তান,—

ভগবদ্গীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান্ যেই জাতির সঙ্গে।
ভগবৎপ্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে॥
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম।
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল সোহহং ধর্ম্ম॥

তখনই আমাদের বুঝতে হবে আমাদের দেশ কর্ম্ম-জ্ঞানের ক্ষেত্র, ধর্ম্মজ্ঞানের ধাত্রী এবং আরও জানব "এ দেবভূমির প্রতি তৃণ 'পরে আছে দেবতার করুণাদৃষ্টি।"

কোন একটা জাতিকে যদি বিদেশীরা কেবলই বলে, 'তোমরা জ্ঞানহীন কর্ম্মহীন সভ্যতার অতল তলে' এবং সেও যদি নিজেকে তাই ভাবে, তবে সত্যই সে ছোট হয়ে যায়। তার আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার ধ্বংসের পথটাও বেশ পাকাপাকি রকমে দেখা দেয়। পরমহংসদেব বলতেন, 'আমি ছোট, আমি ছোট, ভাবতে ভাবতে সত্যই ছোট হয়ে যাই'। আমাদের কোন রকমের উন্নতি যাহাদের চোখে শূল বেঁধে, তাঁরা দিন নেই রাত নেই কেবলই বলছেন—'তোমাদের বুদ্ধি নেই, জ্ঞান নেই, শিক্ষা নেই, সভ্যতার চিহ্ন নেই, তোমাদের আবার উন্নতি কি?' তবে যদি হয়,সে ধীরে ধীরে। সে গতির ধীরতাটা তাঁরা এমন ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন যে তা নিয়ে চললে যুগ যুগ ধরে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগালেও স্বরাজের পথ চোখেই আসবে না, পথ দিয়ে চলা ত দূরের কথা। এই মহাত্মারাই আবার জনসাধারণকে বিদ্যাদানের বিরোধী এবং আমাদের যুবকেরা যাতে অর্থকরী ব্যবসা-বাণিজ্যের কৌশল শেখে তারও ঘোর শত্রু। তাদের স্বার্থে বাধা পড়বার ভয় যেখানে বেশী সেখানে তাদের গলার জোরও গর্দ্দভবিনিন্দিত। কারণ এঁরাই ত শিক্ষা না দিয়ে, জনসাধারণকে কুসংস্কারের জাল ছিঁড়তে না দিয়ে, জাতিভেদ ও সমাজের বন্ধন আরও দৃঢ় করে বাঁধছেন। তাদের বোঝাতে হবে কপাল দোষে আমাদের অবস্থা এমন হলেও আমাদের অতীত খুবই উজ্জ্বল ছিল। এমন একদিন ছিল—

"যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ বাজাইত বাণা
ব্যাস বাল্মীকি বিপুল বাসনা
ভারত হৃদয়ে আছিল ভরা।
যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
যাইত সমরে জাতি বীর রসে
হিমালয় চূড়া গগন পরশে
গাম্বিত যখন ভারত নাম।"

কিন্তু এখানেই শেষ ; এ সীমা ছাড়িয়ে গেলেই সর্ব্বনাশ! কারণ তখন চোখ দুটো পিছনে করে রেখে পথ চলতে আরম্ভ করবে, আর—পদে পদে হোঁচট ও পিছিয়ে যাওয়া সার হবে। আসল কথা যাহা সত্য তাকে মানতেই হবে সে প্রাচান হ'ক আর আধুনিক হ'ক, দেশী হ'ক বা বিদেশী হ'ক। বিজ্ঞানের নূতন তথ্য বের হলেই যে পুঁথি টেনে এনে দেখতে হবে আমাদের ঋষিরা এই কথা বলে গেছেন কি না! বলে যদি না গিয়ে থাকেন তবেই তা গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই। এমনি করেই এত দিন আমরা উন্নতির সহজ পথ বন্ধ করে রেখেছি। এটা মনে রাখতে হবে যা সত্য তা দেশ জাতিভেদে গড়ে উঠে নি, তা সার্ব্বজনীন। সুতরাং উন্নতি করতে হ'লে মনের দরজা খুবই মুক্ত রাখা প্রয়োজন, চারিদিক থেকে সত্যের পুণ্য বাতাস এসে তাতে লাগবে এবং মনটাও সতেজ সজাগ হ'য়ে উঠবে। যত বড় স্বদেশ-প্রেমিকই হই না কেন আমাদের এটা মস্ত ভ্রম হবে যদি আমরা ভাবি, যা কিছু সত্য তা সৃষ্টির আরম্ভে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছেই প্রচারিত হয়েছে এবং সব বিষয়ে যা কিছু জানবার তা তাঁরাই জানতেন, তা সে সাহিত্যই হ'ক, ধর্ম্মই হ'ক, রাজনীতিই হ'ক, কলাবিদ্যাই হ'ক আর এমন কি বিজ্ঞানই হ'ক। আমাদের বুঝতে হবে পৃথিবীটা অগ্রসরই হয়েছে, পিছিয়ে যায় নি, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের জগৎটার থেকে এখনকার জগতের অনেকটা প্রভেদ, হয়ত পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে না এগুতে পারে। আসল কথা যখন আমরা বুঝেছি যে আমাদের শত্রুরা আর বলতে পারবে না যে আমরা একটা বড় সভ্যতার উত্তরাধিকারী নয়, তখন এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিদেশী সভ্যতা থেকেও আমাদে অনেক শিখবার আছে এবং সে শেখাটা এমন হওয়া চা যে অতীত সভ্যতার ধারাবাহিক ভাবটা ঠিক রে বর্ত্তমান জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে। এক দিকে আম যেমন জানব যে ভারত জ্ঞানের মুকুটমণি ছিল

"প্রথম প্রভাত উদয় তার গগনে,
প্রথম সামরব তার তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তার বনভবনে
জ্ঞান-ধর্ম্ম কত কাব্য-কাহিনী।"

তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বলতে হবে, সে দুঃ করেই হউক অথবা উদ্দীপনা আনবার জন্যই হউক

"সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

এই ভেবেই চারিদিক থেকে, দেশ বিদেশ থেকে জ্ঞা আহরণ করতে হবে, জাতীয় আত্মা, জাতীয় প্রাণ সু সবল করে গড়ে তুলতে হবে। এই জন্যই আমাদের আদর্শ নূতন ভাবে সংস্কৃত করতে হবে। ইহাতে আমাদের স সাহস ও মনুষ্যত্বের শক্তির প্রয়োজন খুবই বেশী হবে, আ আবশ্যক হবে আমাদের আত্মনির্ভরতা ও আত্মদৃষ্টি আমরা বিদেশীর কাছ থেকে অনেক জিনিষ নিতে চা বলে, আমরা নকল ইংরেজ, নকল আমেরিকাবাসী নকল জাপানী হতে ইচ্ছা করি না, আমরা চাই উন্নতিশী ভারতবাসী হ'তে বাইরের সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য র করে অতীতের গৌরবময় স্মৃতি বুকে ধরে আর ভবিষ্যতে উজ্জ্বল মূর্ত্তি চোখের সামনে রেখে।

এখন এই জাতীয় আত্মা গড়ে তুলতে হলে প্রথমে আবশ্যক হবে জাতীয় শিক্ষার। সে শিক্ষা কেমনতর হ এই হচ্ছে সমস্যা। আমাদের সংস্কৃতে যা কিছু আ তাই শিখেই কি আমরা ইস্তফা দেব ? না বিদেশ থেকে জ্ঞান সংগ্রহ করে আমাদের জাতীয় ভাষাকে পুষ্ট করব বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্য তথ্যগুলি ত দেশ কি জাত মা না ; সুতরাং বিদেশের এ সব সত্য জা[illegible]ীর মা থেকে বেরোয় নি বলে পরিত্যাগ করা শুধু [illegible] তা

য়, জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাতও বটে। যে জ্ঞানভাণ্ডার মাদের কাছে উন্মুক্ত আছে তাহা যদি হেলায় আমরা রাই তার চেয়ে লজ্জা ও অনুশোচনার কথা আর কি ত পারে! সত্যই কি আমরা এমন বুদ্ধিহীন হয়ে পড়ব সেক্‌সপীয়র, বেকন, গেটে, সিলার, হুইটম্যান, ইমারসন ভৃতির অমূল্য রচনা পায়ে ঠেলব? তারপর বর্ত্তমান জনীতিক্ষেত্রে শুনতে পাই, বিদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থ বজ্ঞান নাকি আমাদের মাথা নষ্ট করে ফেলেছে এবং তা াকি আমাদের ত্যাগ করতে হবে? সেই কৌটিল্যের র্থশাস্ত্রই যদি আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের গতি নিয়ন্ত্রিত রে, তবে অনেক যুগ পেছন হটে গিয়ে সেই তপঃসিদ্ধ নভবনে ফিরে যেতে হয়। তা যখন হয় না তখন এই চেষ্টাই বাতুলতা। আরও আমরা শুনতে পাই যে বিলাতী চকিৎসাশাস্ত্র ত্যাগ করে ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা াস্ত্র পুনর্জীবিত করে তুলতে হবে। দেশী ও বিদেশী দু কমই পাশাপাশি ভাবে শিক্ষা করা ভাল, কিন্তু তাই বলে দি বর্ত্তমান সময়ের অস্ত্রচিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যাকে ত্যাগ রতে হয় এবং তাতে যদি হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ ও শুসন্তানকে এক ভ্রান্ত জাতীয়তার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে য়, তবে আমরা বলতে বাধ্য এমন জাতীয়তা থেকে ঈশ্বর ারতবর্ষকে রক্ষা করুন। তারপর যদি কখনও জাতীয় সৈন্য ড়ে' তুলতে হয় তখন কি বর্ত্তমান যুদ্ধের রীতিনীতি ও বিজ্ঞান না শিখিয়ে শুধু তীর ধনুক বন্দুক ও বর্শার প্রচলন করলেই হবে! এমন যদি ভাবতে হয় তবে "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে"।

আমাদের পতন যে হয়েছে এবং সেটা যে খুব বেশীই হয়েছে তার অস্বীকার করলে চলবে কেন? এখন প্রথম সাধনা এই

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।"

সেই সাধনাকে সফল করতে হ'লে যেখানে যা দেখব তাই এনে দেশের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করতে হবে। ভ্রান্ত জাতীয়তার ধারণায়, অন্ধ হ'য়ে সব ত্যাগ করে এক কোণে পড়ে থাকলে আমাদের জাতির প্রাণ উপবাস হ'য়ে যাবে এবং আমরাও পড়ে থাকব বর্ত্তমান সভ্য জাতদের অনেক পশ্চাতে। এই অন্ধ স্বাদেশিকতার পরিণাম হবে ভাবের জড়ত্ব ও কল্পনার শূন্যত্ব। এটা ত একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এ যে সব বিষয়েই আগে চলার যুগ, এখনকার দিনের সাধন মন্ত্রই যে—

"আগে চল আগে চল ভাই
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।"

প্রতিচ্ছবি

[শ্রীগিরিবালা দেবী]

(১)

ও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর তু আশার ধন, আকাঙ্ক্ষার দ্রব্য সদ্য-পক্ক আউস ধান াটিবার দিন প্রভাত হইতেই বিপুল বেগে বর্ষার ধারা ল দেখিয়া [illegible] ামছার প্রান্তে মুড়ি মুড়খিগুলি বাঁধিতে িতে [illegible] স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'দেবতা যে দেখছি গা ছেড়ে দিয়ে নামল। এমনধারা বৃষ্টি আর দুদিন থাকলেই নদীতে 'ঢল' নেমে যাবে। তা'হলে আমার সোনার পাকা ধান যে ঘরে তোলা হবে না বউ,—নিজেরা পেটেই বা খাব কি, আর মহাজনের দেনাই বা কি দিয়ে শোধ হবে? ঐ ক্ষেতটির মধ্যেই আমার পরাণ যে পড়ে রয়েছে।' পাবনা তামাক সাজিয়া হুকাটী

স্বামীর হাতে দিয়া, মাচার উপর হইতে তালপাতার 'টোকা' ও 'কাস্তে'খানা নামাইয়া আশ্বাসের স্বরে কহিল, 'একটু বেলা হলেই দেবতা পাটে বসবেন। আমি ইন্দির ঠাকুরকে দই, খই মানত করেছি। সুভাল হালে ধান কাটা হ'য়ে গেলেই গয়লাবাড়ী থেকে দই এনে,—খই ভেজে আগে ঠাকুরের ধার শুধব, তোমার ভয় নেই।' স্ত্রীর মুখের সরল বিশ্বাসভরা কথা কয়েকটী শুনিয়া এবং এক ছিলিম তামাকের সুনিবিড় রস গলাধঃকরণ করিয়া নিমাই-য়ের বিষণ্ণ মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে 'টোকা'টি মাথায় দিয়া কাস্তেখানা হাতে লইয়া বলিল, 'উঠানে গড় হয়ে ভাল করে ঠাকুরকে মানত কর বউ। ঠাকুরের দয়া হ'লে এবার তোমার হাতে দু'গাছা পৈঁছে গড়ে দেব। ছেলে মেয়ে হ'লে তারাও ত খেত পরত। সে পয়সাটা দিয়াও তোমার অঙ্গে কিছু দিতে পারি না,—একি আমার কম দুঃখ বউ!' পাবনীর মুখের উপর একটী বেদনার কাল ছায়া পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে মলিন মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটাইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, 'গয়না দিয়ে কি হ'বে? এ গাঁয়ে চাষার বাড়ীর কোন্ বউ আমার চেয়ে সুখে আছে বল ত? কিসের জন্যে তুমি এত দুঃখ কর গা?' নিমাই স্ত্রীর কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া—শুধু স্নেহ, প্রীতিভরা নয়নে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য-পথে প্রস্থান করিল।

অঙ্গনের এক পার্শ্বে একখানি ছোট একচালা কুটীরের মধ্যে তুলসী গাছ। তুলসীতলা নিকাইবার জন্য পাবনী গোবর-মাটী লইয়া গামছাখানা মাথায় দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল। গলবস্ত্রে যোড়করে তুলসী বেদাতে প্রণাম করিয়া পাবনী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'হে ঠাকুর, হে ভগবান, দয়া কর গো, আমায় দয়া ক'রে আমার কোলে একটু 'গুঁড়ো' দিয়া আমার বাঁঝা নাম ঘুচিয়ে কলঙ্ক ভঞ্জন কর। এমন করে থাকতে যে আমার ভাল লাগে না হরি।' দেবতার উদ্দেশে অন্তরের এ নীরব বেদনা নিবেদনের পর পাবনীর ক্ষুদ্র হৃদয়-নদীতে একটি বেদনার ও অবিচ্ছিন্ন অভাবের স্রোত সবেগে বহিতে লাগিল। বন্ধ্যা নারীর চক্ষু দুইটী সহসা কি এক অজানিত অভাবিত অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। এ নালিশ—এ মর্ম্মোচ্ছ্বাস, এ ত মানুষের উদ্দেশে নহে। এ যে বিশ্বপিতার দরবারে দীনার দীন আবেদন।

পাবনীর বয়স পঁচিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স—তেমনই অটুট অক্ষুণ্ণ তাহার স্বাস্থ্য। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। আষাঢ়ের নব ঘন মেঘের মত স্নিগ্ধ লাবণ্যে মণ্ডিত। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটা সজীবতা সৌষ্ঠব বিরাজিত—যে একবার দেখিয়া পুনরায় দেখিতে সাধ হয়। প্রকৃতি মায়ের আনন্দ দুলালী হাস্যমুখী তরুণীটীকে দীন কৃষকের গৃহে কিছুতেই যেন মানাইতে চাহিত না।

তাহার পরণে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চওড়া লাল পেড়ে শাড়ী—সুললিত বাহুযুগলে দুই গাছি রাঙ্গা শাঁখা ও ললাটের মধ্যদেশে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় সিন্দুরের বড় সুগোল টিপ্‌টিতে দরিদ্রতার এতটুকু ক্ষীণ রেখাও প্রকাশ পাইত না। একটি অপার্থিব অন্তর্নিগূঢ় মাতৃত্ব প্রভায় পাবনীর সুন্দর প্রফুল্ল মুখখানি সত্যই উদ্ভাসিত হইয়া রহিত। নিমাই পাবনী অপেক্ষা মাত্র দুই বৎসরের বড়। পাথরের মতন কাল কুচকুচে তাহার গায়ের বর্ণ। 'মহাভারতে' বর্ণিত ভীমসেনের মতনই সুদৃঢ় বলিষ্ঠ তাহার দেহের গঠন। এই নিরক্ষর—চিন্তাশূন্য সরল কৃষক যুবক যখন তাহার তৈল-সিক্ত বাবরী চুলে চেরাসিঁতি কাটিয়া, হরিদ্রা রঞ্জিত 'ডুরে' গামছাখানি কাঁধের উপর ফেলিয়া, আপদে বিপদে একমাত্র সহচর পাকা বাঁশের লাঠি গাছটি হাতে লইয়া পল্লীর বন-পথ দিয়া গমনাগমন করিত, তখন একালের ক্ষীণজীবী, ক্ষীণদৃষ্টি বাবুর দল অনিমেষ নয়নে সে দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে বলিত, 'বাবা রে দেহের পত্তন, এটা অসুর বিশেষ।'

সাধারণ কৃষককুল হইতে স্বজনহীন অজ্ঞাত সন্তান নিমাইয়ের অবস্থা মন্দ ছিল না। যে কয়েকখানা জোত জমী ছিল 'অজন্মা' না হইলে তাহা দ্বারাই তাহাদের মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান হইয়া যাইত। বাড়ীতে হাল লাঙ্গলের জন্য দুইটী বলদ ও একটী দুগ্ধবতী গাভী ছিল। পাবনী গরুগুলির পরিচর্য্যা করিয়া, সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া—ধান, কলাই 'মলাই ডলাই' [illegible], স্বামীকে যথেষ্ট সাহায্য করিত। স্ত্রীর সাহায্যে ক্ষেতে [illegible] পৃথক

কৃষাণ না রাখিয়াও নিমাইয়ের আরাম-সুখের ব্যাঘাত ঘটিত না। কিন্তু পাবনীর মনে তেমন শান্তি ছিল না। সমস্ত কাজ কর্ম্ম ও আরাম বিশ্রামের মধ্যে একটি বেদনার ক্ষীণ ব্যথা নিহিত হইয়াই রহিত। সে ব্যথাটি তাহার বন্ধ্যাত্ব। নারীজন্ম লইয়া—একটি কালো কোল নধর কান্তি নব গোপালের মত স্নেহের পুত্তলি সন্তান যদি স্বামীকে নাই দেওয়া যায়—তবে আবার নারীজন্মের সার্থকতা কি? হৃদয় মনের স্নিগ্ধতাকারক শিশু কণ্ঠের অমিয়বর্ষী 'মা' কথা যদি কর্ণ বিবরে সুধা বর্ষণ না করিতে পারে তবে আবার নারীজন্মের পূর্ণতা কোথায়? নিমাই কিন্তু ইহাতে তেমন বিচলিত হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিত না। সে বরং স্ত্রীকে আদর করিয়া, কাছে বসাইয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিত, 'নাই বা হ'ল ছেলে মেয়ে,—ও দিয়ে কি হ'বে বউ; এটা খেতে পেল না,—ওটা পরতে পেল না—তা দেখে আরও দুঃখ হবে। তার চেয়ে এই বেশ আছি।' স্বামীর এ সান্ত্বনা বাক্যে পাবনীর অশান্ত হৃদয় শান্ত হইত না। সে ক্ষুণ্ণ মনে উত্তর করিত, 'হ্যাঁ, বেশ আছি বৈ কি! ঘরে ছেলে নেই, মেয়ে নেই— এ ষেঁড়ে জীবন নিয়ে মানুষ আবার বেঁশ থাকে! ভগবান যদি পেটে সন্তানের স্থান দিতেন — তাহলে হাঁড়ীতেও অন্নের অস্থান হ'ত না।' স্ত্রীর একথার প্রত্যুত্তর নিমাই খুঁজিয়া না পাইয়া নিবিষ্ট মনে শুধু তামাকই টানিত। ভ্রমেও ছেলে মেয়ের প্রসঙ্গে কোন কথা স্ত্রীর নিকটে প্রকাশ করিয়া তাহার মুখ মলিন করিত না। কিন্তু আজ নিমাইয়ের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হঠাৎ তাহার মুখ হইতে ঐ কথাই বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। নিদারুণ বেদনার স্থানে যেমন সামান্য আঘাতটুকুও অসহ্য হইয়া উঠে—তেমনি নিমাইয়ের অতর্কিত ভাবে উচ্চারিত তুচ্ছ কথা শুনিয়া পাবনীর হৃদয়-গগনে একটু কাল মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল; এখন সেই ক্ষুদ্র মেঘবিন্দু হইতে অনা-রিত উচ্ছ্বসিত অশ্রুকণা দেবতার শ্রীচরণোদ্দেশে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

(২)

বেলা প্রহরাধিকের সময় সজল জলদকান্ত নীলাকাশ অনেকটা পরি[illegible] হইয়া উঠিল। ইন্দ্র দেবতা বোধ হয় কৃষক পত্নীর প্রদত্ত 'দই খই' লাভের আশায় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই দেবতার করুণা-ধারার ন্যায় ম্লান রৌদ্র বর্ষাস্নাত শ্যাম চিক্কণ বৃক্ষ পত্রের উপর ঝলমল করিতে লাগিল। পাবনী গোহাল হইতে গরুগুলি বাহির করিয়া তাহাদের 'জাব' খাইতে দিয়া ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া জল আনিতে চলিল। তাহাদের বাড়ী হইতে নদী অধিক দূর নহে। গ্রামের জমিদারের বৃহৎ একটি ফল, ফুলের বাগানের শেষ ভাগেই গ্রামের মেয়েদের সুনির্জ্জন স্নানের ঘাটটি। শাখাবহুল বকুল বৃক্ষের ছায়া-শীতল তল-দেশ দিয়া নদীতে যাইবার রাস্তাটি আঁকিয়া বাঁকিয়া বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ঈষদবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডলের কিয়দংশ আবৃত করিয়া শূন্য কলসীটি কক্ষে লইয়া পাবনী চঞ্চল চরণে পথের মাঝখানে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। বকুল তলায় বর্ষা-সিক্ত নবীন তৃণদলের উপর হইতে কৃষক বালক বালিকাগণ বৃষ্টিধৌত বকুল ফুলগুলি কুড়াইয়া কুড়াইয়া মলিন ছিন্নবস্ত্রের প্রান্তে তুলিতেছিল। কেহ বা পত্রবিহীন সূক্ষ্ম লতা লইয়া মালা গাঁথিতেছিল। অদূরে ঘন পল্লবিত জামগাছের নিকটে দাঁড়াইয়া একটী বাইশ তেইশ বৎসরের অতিশয় সুশ্রী যুবক উৎসুক নয়নে পাবনীর মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। পাবনীর চক্ষুর সহিত যুবকের চক্ষু সম্মিলিত হইবামাত্র সে চক্ষুর্দ্বয় নামাইয়া অপ্রতিভ সলজ্জ মুখে সেখান হইতে সরিয়া গেল। পাবনীর হৃদয় মন লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। আজ দুই দিবস যাবৎ সকাল সন্ধ্যায় এই বাগানে ঐ যুবককে তাহার দিকে দীন উৎসুক নয়নে চাহিয়া থাকিতে সে দেখিতেছে। কি উদ্দেশে অমন করিয়া সে পাবনীর মুখের উপর সজল দীপ্তিপূর্ণ নয়ন দুইটি প্রসারিত করিয়া চাহিয়া দেখে! উহার স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত অবয়ব দেখিয়া ত মনে হয় না যে এই মুখ এবং সুবিশাল বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সংসারের পাপ, তাপ এতটুকু মলিন রেখা অঙ্কিত করিতে সফলকাম হই-য়াছে। পাবনী মনে মনে কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ঘাটের কাজ সারিয়া ফিরিবার সময় সে দেখিল যে লতাকুঞ্জ হইতে যুবক এখনও অপসৃত হয় নাই। যুবকের সন্নিধানে জমি-দারের কর্ম্মচারী বদন সরকারকে দেখিয়া তাহার কৌতূহল

আরও শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে বকুলতলা হইতে একটী বালককে পেয়ারার প্রলোভনে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁরে হাবু, বাগানের মধ্যে ও বাবু লোকটি কে তুই চিনিস কি?' বালক বিজ্ঞের মত মাথা দুলাইয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, 'আমাদের রাজা মিহির বাবুকে তুমি চেন না খুড়ি? বুড়ো কর্ত্তার পর উনাইত সমস্ত গাঁয়ের রাজা হয়েছেন।' বালকের কথায় পাবনী স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল —ইনিই তাহাদের নবীন জমিদার। বুড়ো কর্ত্তার মৃত্যুর পর ছয় মাসের মধ্যে ইঁহারই এত প্রশংসা, এত সুখ্যাতি! ইঁহারই বুদ্ধির কথা, বিদ্যার কথা, দয়া, করুণার কথা চারিদিকে রটিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একটী দরিদ্র প্রজার কুলবধূর দিকে অমন করিয়া দৃষ্টিপাত করাটা কোন মহত্বের নিদর্শন—ইহা পাবনী বুঝিতে পারিল না। মনের মধ্যে অনুমান করিয়া লইল পুরুষ জাতিটাই বুঝি যুবক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে উক্ত ব্যারামে আক্রান্ত। ওটা দোষের মধ্যে না লইয়া ব্যাধির মধ্যেই ধর্ত্তব্য।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রাতঃকালের চঞ্চল মেঘ শান্ত ভাব ধারণ করিল। অপরাহ্নের অবসন্নপ্রায় আলোক জলে, স্থলে, বৃক্ষপত্রে ঝলমল করিতে লাগিল। কৃষকেরা সমস্ত দিনের পর কেহ বা গরুর গাড়ীতে, কেহ বা নিজেদের মাথায় ধানের বোঝা চাপাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহে ফিরিতে লাগিল। গোধনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাখালগণ গোচারণ শেষে

"দাঁড়ারে, দাঁড়ারে বলাই তোরে সঁপে দিই আমি।
দেখে শুনে রাখিস বাপ, ছোট ভাই তোর নয়নমণি॥"

সঙ্গীতে কানন পথ মুখরিত করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। শ্রান্ত ক্লান্ত নিমাই এক গাড়ী ধান লইয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে বাড়ী ফিরিল। স্বামী স্ত্রী দুই জনে মিলিত হইয়া ধানের 'আটি'গুলি প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে স্তূপাকারে সাজাইতে লাগিল। 'পালা' দেওয়া শেষ হইলে হাত পা ধুইয়া শাকভাজা ও পুঁটী মাছের চর্চ্চড়ী দিয়া এক পাথর ক্ষেতের রাঙ্গা রাঙ্গা চালের ভাত পরিতৃপ্তির সহিত আহারান্তে নিমাই বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিতে লাগিল, 'কাল আর পরশু দিনটা খুব ভোর থেকে সন্ধ্যা নাগাদ ধান কাটলেই কাটা শেষ হয়ে যাবে এক প্রকার। এবার মা লক্ষ্মী মুখ তুলে চেয়েছেন, চিন্তা নেই বউ। পূজার আগেই তোমার হাতের পৈঁছে গড়ে দিতে পারব। আর একখানা গুলবাহার শাড়ীও পরতে পাবে।' স্বামীর মুখে শুভ্র চাঁদি রূপার দুই গাছা পৈঁছে ও সাদা কাপড়ের জমীর উপর লাল সূতার বুটিদার 'গুলবাহার' শাড়ীর কথা শুনিয়া পাবনীর মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সরার আগুনে এক বাটী তৈল গরম করিয়া নিমাইয়ের ক্ষত বিক্ষত পা দুইখানিতে মালিশ করিয়া দিতে দিতে কহিল, 'শুধু আমার হাতে পৈঁছে আর গুলবাহার শাড়ী দিলেই হবে না, তোমারও একটী আংটি গড়ে নিতে হবে।' 'তোমার হাতে পৈঁছে দিতে পারলেই আমারও আংটি হাতে পরা হবে বউ। তোমার হাতে দেওয়াও যা, আমার হাতে দেওয়াও তাই।' বলিয়া নিমাই শয়ন করিতে গৃহের মধ্যে উঠিয়া গেল।

(৩)

তখনও ভাল করিয়া দিনের আলো ফুটিয়া উঠে নাই। নির্ম্মলাকাশে তরুণ তপনের লোহিত আভা পরিস্ফুট হইবার তখনও একটু বিলম্ব আছে। পাখীরা কুলায় বসিয়াই প্রভাতের প্রথম রাগিণীর মূর্চ্ছনায় বিশ্ববাসীর কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিতেছিল। নিমাই শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ক্ষেতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এমন সময় পৌরুষ কণ্ঠে কে যেন বাহির হইতে ডাকিল, 'নিমাই বাড়ী আছ?' এত ভোরে এ আহ্বানে নিমাই বিস্মিত হইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল জমিদারের কর্ম্মচারী বদন সরকার দুইটী পেয়াদা সঙ্গে লইয়া নিমাইকে ডাকিতেছে। অতর্কিত ভাবে বদন সরকার ও পেয়াদাদ্বয়কে দেখিয়া নিমাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বেতের মোড়া আনিয়া বদনকে বসিতে দিয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, 'সরকার মশাই, কি মনে করে পায়ের ধুলো দিতে এসেছেন; আমায় ব'লে পাঠালেই আমি গিয়ে হাজির হতাম।' সরকার মহাশয় একটু কাশিয়া, বার দুই ঢোক গিলিয়া উত্তর দিলেন, 'তোমাকে এক্ষণি আমাদের সঙ্গে যেতে

হবে। কাছারীবাড়ীর ঘর দিয়ে জল পড়ছে, ছেয়ে দিতে হবে।' নিমাইয়ের মাথার উপর বজ্রাঘাত হইল। তাহার যে ক্ষেতভরা পাকা ধান, এখনও সিকি অংশ কাটা হয় নাই, দুই তিন দিনের মধ্যে নদীর জলে ডুবিয়া যাইবে। সে ম্লান মুখে ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিল, 'আর দুটো দিন ক্ষমা দিতে হবে সরকার মশাই। নদীর ঢলে ধান আমার ডুবে যাবে। আমার এক বছরের খোরাক নষ্ট হবে সরকার মশাই, আমি পরশু দিন আপনাদের কাছারীবাড়ী 'ছেয়ে' দিয়ে আসব।' 'সে হবে না, আজ এক্ষুণি আমার সাথেই তোমার যাবার জন্যে রাজাবাবু হুকুম দিয়েছেন। মনিবের কথা অমান্য ক'রে ফিরে যাবার ক্ষমতা আমার নেই।' নিমাই সেইখানে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এ কি কথা—ক্ষুধার্ত্ত হতভাগ্যের মুখের গ্রাস কে এমন করিয়া কাড়িয়া লইতে আসিল রে! তাহার এত আশার, এত আকাঙ্ক্ষার এই দিনটি কে ব্যর্থ করিয়া দিতে চাহে রে! আর ত সময় নাই—এক দিন বিলম্বে তাহার আশা ভরসার মূলদেশ যে নদীর প্লাবনে ডুবিয়া যাইবে। নিমাই হাত দুইটী যোড় করিয়া সকরুণ কণ্ঠে কহিল, 'আজ আমায় ক্ষমা দিতেই হবে সরকার মশাই, আমি অন্য লোক ঠিক করে—' বাধা দিয়া বদন সরকার কহিল, 'কি—বার বার জমিদারের কথা অমান্য? এর প্রতিফল পাবি ব্যাটা, ভাল মুখের পাত্র নস।' বদনের ইসারায় ডাল-রুটী-ভোজী পরিপুষ্ট দেহ দুই ভোজপুরী পেয়াদা দুই দিক হইতে নিমাইয়ের দুইখানি বাহু সবলে চাপিয়া ধরিল। নিমেষের মধ্যে নিমাইয়ের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বেড়ার গায়ে হেলান তাহার তৈলপক্ক বাঁশের লাঠিটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। অন্তরাল হইতে স্বামীর মনোভাবটি পাবনী জলের মত বুঝিতে পারিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিল, 'ওগো, যাও না কেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপমান হবার দরকার কি? এ যেন আমাদের রাম রাজত্বে বাস হয়েছে। ভগবান এর বিচার কোরবেন।' নিমাই চাহিয়া দেখিল দরজার সম্মুখে দণ্ডায়মানা স্থিরা সৌদামিনীর [illegible] নয়ন প্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা বিচ্ছুরিত হই[illegible] সে দৃশ্য অবলোকন করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিমাইয়ের রোষ বহ্নি ম্লান হইয়া আসিল। সে বিনা বাক্য ব্যয়ে পেয়াদাদ্বয়ের সহিত যাইতে এতটুকুও আপত্তি করিল না।

পাবনী হৃদয়ের অসহ্য জ্বালায় অপমানে জর্জ্জরিতা হইতে লাগিল। ভগবানের রাজ্যে এই কি ন্যায়-বিচার? তাহাদেরই মত দীন দরিদ্রের হৃদয়-শোণিতে যে সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে—সেই সুখের প্রাসাদে, ঐশ্বর্য্যের শিখরে আরোহণ করিয়া—ধনবান কি এমনই করিয়া দুঃখী উপবাসে ক্লিষ্ট হতভাগ্যদের পিপাসার জল, মুখের অন্নের গ্রাস কাড়িয়া লইবে! তাহাদেরই বক্ষঃ পদদলিত করিয়া ধূলি-লুণ্ঠিত করিয়া চলিয়া যাইবে! অপরাধ—তাহারা দরিদ্র। তাহাদেরই হৃদয়ের রক্তে বিলাসীর বিলাসের উপকরণ সংগৃহীত হইতেছে। নারায়ণ, ধনী দরিদ্রের এ পার্থক্য তুমিই কি বিধান করিয়াছিলে?

পাবনীর হৃদয় মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহার সাধ হইতে লাগিল সে ছুটিয়া গিয়া জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসে, 'এ তোমার কেমন মহত্ত্ব গো, এ তোমার কেমন প্রজাপালন?' মনের চঞ্চলতা মনের মধ্যে দমন করিয়া পাবনী পাড়া হইতে দুইটী কৃষাণ নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে ধান কাটিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। ঘরের কাজ কর্ম্ম সারিয়া অস্নাত অভুক্ত পাবনী মেঝেয় অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিল। স্বামী এখনও অনাহারে আছে বিবেচনায় এ সাধ্বী রমণীর ক্ষুধা তৃষ্ণা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যা বেলা উৎকণ্ঠিতা পাবনী তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দিতে গিয়া অঙ্গনের মধ্যে বদন সরকারকে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, 'সরকার মশাই, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় নি কেন?' এ প্রশ্নে বদন মনে মনে একটু হাসিয়া উত্তর করিল, 'সে আমি কেমন করে জানব বল, জমিদারের মরজি, এ গরীবদের ত জানবার ক্ষমতা নেই মা। আমিও গরীব, কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে ঘর-সংসার করি। কত ক'রে বল্লেম, 'হুজুর, ছেড়ে দিতে হুকুম দেন। গরীবের ভাত মারবেন না।' তা জমিদার উত্তর দিলে, 'ওর পরিবার একবার কাছারীবাড়ী এসে বল্লেই ছেড়ে দেব। নইলে আরও সাত দিন আটকে

রাখব; এক কথায় কাজে আসেনি কেন?' অপরাধের প্রমাণ জানিয়া এবং নবীন জমিদারের অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনিয়া পাবনী নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইল। ঘৃণা ধিক্কারে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বিষাইয়া উঠিল। হঠাৎ বহু দিনের বিলুপ্ত অস্পষ্ট স্মৃতির ন্যায় জমিদারের সেই উৎসুক নয়নের দীন দৃষ্টি মনে পড়িল। কে জানে কি উদ্দেশে জমিদার তাহাদের সহিত এ ব্যবহার করিতেছেন। ক্ষণকালের জন্য পাবনীর মনের বল নিস্তেজ হইয়া আসিল। কিন্তু স্বামীর অনাহারে ক্লিষ্ট —ব্যথিত—উৎপীড়িত মুখচ্ছবি মনশ্চক্ষে দর্শন করিয়া তাহার ভয়, ভাবনা, আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া গেল। সে মনে মনে স্থির করিল 'সে কাছারীবাড়ী যাইবে'। তাহার ভয় কি? ঘাটে, মাঠে, গ্রাম গ্রামান্তরে সে যে বাল্যকাল হইতেই অবাধে পরিভ্রমণ করিয়া এত বড় হইয়াছে। আর আজ কাছারীবাড়ীতে এক খাম-খেয়ালী নবীন যুবকের নিকটে যাইতেই কি তাহার পদদ্বয় অবসন্ন হইয়া পড়িবে—হৃদয় আতঙ্কে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিবে, ছিঃ সে কি চাষার মেয়ে নহে। সেখানে যে তাহার স্বামী আছে, সে যাইবেই।

পাবনী আরব্ধ কার্য্য শেষ করিয়া, ঘরের মধ্য হইতে একখানি ছোট ধারালো ছুরি বুকের কাপড়ের মধ্যে লুকাইয়া প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে একটী ছোট ছেলেকে সাথে লইয়া বদন সরকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাছারীবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তররূপে ধরণীদেহে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার মেঘপূর্ণ আকাশে একটী নক্ষত্র বা চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে নাই। শুধু মেঘের পশ্চাতে খণ্ড খণ্ড কাল মেঘগুলি একটির পর একটী ছুটিয়া চলিতেছে। গৃহে গৃহে সন্ধ্যার শাঁক বাজিয়া উঠিতেছিল। গ্রাম্য যুবকগণ মাঠের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া

"আমার সোনার বাংলা—
আমি তোমায় বড় ভালবাসি,
চিরদিন, তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

গাহিতে গাহিতে গৃহে ফিরিতেছিল। কাছারীবাড়ীর আলোকোজ্জ্বল নিভৃত গৃহে প্রবেশ করিয়াই পাবনী ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিল। স্বামীর চিন্তায় তন্ময় হইয়া দিশাহারা গৃহস্থ ঘরের বধূ এ কোথায় আসিল;—এখান হইতে যদি মুক্তি না মেলে। স্বামী তাহার জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম হইলেও—তাহার মান, তাহার ইজ্জৎ এগুলিও ত অবহেলার বস্তু নহে।

(৪)

স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পাবনীর কিয়ৎক্ষণ কাটিয়া গেল। প্রতিবেশী-গৃহের বালক ঘুম-চোখে কয়েকবার ঢুলিয়া ঢুলিয়া তাহার পায়ের কাছে শুইয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। বাহিরে কাহাদের পদধ্বনি শুনিয়া পাবনী বক্ষে হাত দিয়া যথাস্থানে ছুরিখানা আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

দরজার সম্মুখ হইতে কে যেন কাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, 'এ ঘরে যেতে বলছ কেন বদন?' উত্তর হইল, 'যেয়েই দেখুন হুজুর।' পরক্ষণেই নবোদিত মিহিরের মতনই জমিদার মিহিরকুমার গৃহে প্রবেশ করিয়া পাবনীর দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অপ্রত্যাশিত অভিভূত অবস্থায় কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া আর্দ্র সকরুণ কণ্ঠে কহিল, 'বদন এ কি? নিমাই কোথায়?' বদন অগ্রসর হইয়া হাস্য-বিকশিত মুখে বলিতে লাগিল, 'তাকে সকাল বেলা থেকেই নানা কৌশলে আটুকে রেখেছি। পনেরটা জমিদারের বাড়ীতে সরকারী করে এ নফরের হুজুরের মনের কথা বুঝবার ক্ষমতা যথেষ্টই হ'য়েছে। একে আনতে বেগ পেতে হয় নি; একটা যা' তা' বলে দিলাম আর অমনি চলে এল।' হায়, জমিদারের নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী, ভগবান তোমাদের নির্ম্মম হৃদয় না জানি কি উপাদানে গঠিত করিয়াছেন। মনুষ্য-কুল-কলঙ্ক, শতধিক তোমাদের মনুষ্যত্বে!

গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান মিহিরকুমারের নয়ন হইতে ক্রোধ ঘৃণা যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। সে কষ্টে হৃদয়ের নিদারুণ ক্রোধ-বহ্নি প্রশমিত করিয়া কহিল, 'নিমাইকে কোথায় রেখেছ?' পরে পাবনীর দিকে [illegible] স্নিগ্ধ স্বরে

কহিল, 'তুমি আমার সঙ্গে এস মা, তোমার স্বামীর কাছে নিয়ে যাই।'

সমস্ত দিন অনাহারে রুদ্ধ ঘরে বসিয়া বসিয়া নিমাই, তাহার কোন্ অপরাধে এ নিগূঢ় শাস্তি, তাহারই আলোচনা করিতেছিল। আজ কোথায় ধান কাটিয়া তাহার সারা বৎসরের আহারের সংস্থানে ব্যাপৃত থাকিবে; তাহার পরিবর্ত্তে রুদ্ধ গৃহে আবদ্ধ—এ আবার ভাগ্য-বিধাতার কি বিড়ম্বনা! অপরাধ নাই, অনুযোগ নাই, অভিযোগ নাই—এক নিরপরাধ দীন দরিদ্রকে তাহার শান্তির কুটীর হইতে ছিনাইয়া আনিয়া এ আবার ধনীর কি রকম খেলা! নিমাইয়ের একটানা চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। হঠাৎ গভীর রজনীর নীরবতার মধ্যে নবীন জমিদারের পশ্চাতে স্ত্রীকে এবং তৎ পশ্চাৎ বদন সরকারকে দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

নিমাইকে সম্বোধন করিয়া স্নিগ্ধ মধুর স্বরে মিহির কহিল, 'আমার অজ্ঞাতসারে আজ তোমাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে নিমাই, এ জন্যে তোমরা আমায় মাপ কোরো। ভবিষ্যতে তোমাদের কোন অভাব অনটনের কথা আমাকে জানাতে সঙ্কোচ কোরো না। মাকে নিয়ে এখন ঘরে ফিরে যাও।'

পাবনীর মুখে সব কথা শুনিয়া, এবং জমিদারের এই স্নেহ বিগলিত কথায় নিমাইয়ের চোখে জল আসিল। সে উত্তর দিতে গিয়া পারিল না। এই সাক্ষাৎ দেবতুল্য জমিদার দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ইঁহাকেই সে কত অভিসম্পাত দিয়াছে। মিহির বদনের দিকে চাহিয়া স্থির কণ্ঠে কহিল, 'বদন, তুমিও ঘরে যাও। আজ থেকে তোমার কাজও শেষ হয়ে গেছে। তুমি যে পনেরটা জমিদারের কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছ—তা আমার কাজে লাগবে না; কাজেই তোমাকে দিয়ে আমার দরকার নাই।' হিতে বিপরীত হইয়া গেল দেখিয়া এবং মানবের মুখের বজ্রনাদৃশ কথা শুনিয়া বদনের নয়ন সম্মুখে দরিদ্রতার নগ্ন ছবিটা জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিল। হায়, এমন লাভের চাকরী ছাড়িয়া, এমন জমিদার ছাড়িয়া তাহার মতন নিঃস্ব লোকের কি উপায় হইবে? অনাহারেই যে তাহাকে স্ত্রী-পুত্র সহ ধরাতল হইতে শেষ বিদায় লইতে হইবে। বদনের দুই চক্ষু ফাটিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল। এবার পাবনী আর স্থির থাকিতে পারিল না। হাত দুইখানি যোড় করিয়া গদ্ গদ্ কণ্ঠে কহিতে লাগিল, 'আমাদের জন্যে এঁর চাকুরিটী গেলে ছেলেপেলেরা যে না খেয়ে মরবে, এঁকে ক্ষমা করুন বাবা।' মিহির শ্রদ্ধাপূর্ণ নয়নে পাবনীর মহিমাময় মুখখানির দিকে চাহিয়া উত্তর করিল, 'তাই হবে মা, বদনকে আমি ক্ষমা করলাম।'

(৫)

অপরাহ্নে বদন সরকারের স্ত্রী ষোড়শী রূপসী জমিদারপত্নী অর্চ্চনার নিকটে চাউল খরিদ করিবার জন্য পাঁচটি টাকা চাহিতে আসিয়া নিমাই মণ্ডলের স্ত্রীর প্রতি বাবুর 'নেক্‌নজরে'র গল্পটি আকার ইঙ্গিতে ভাল রূপেই অর্চ্চনার হৃদয়ঙ্গম করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। তাই অর্চ্চনার মনটি আজ আদৌ ভাল ছিল না। কাগজ পত্র দেখিয়া, সমস্ত কাজের হিসাব নিকাশ লইয়া প্রতিদিন ইহার বহু পূর্ব্বেই মিহির কাছারীবাড়ী হইতে শয়নগৃহে প্রবেশ করিত। আজ এত বিলম্ব দেখিয়া, রজনীর গভীরতার সঙ্গে সঙ্গেই অর্চ্চনার উৎকণ্ঠাও বাড়িয়াই উঠিতেছিল। যদিও তাহার ধারণা ছিল ও-কথার মূলে সত্যের নিতান্ত অভাব, তথাপি বদনের স্ত্রীর কথাগুলি রহিয়া রহিয়া তাহার হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে কি-একটি অজানিত ব্যথার উৎস খুলিতেছিল। সে বিছানার উপর পড়িয়া কত কি চিন্তার আবেশে আকুল হইয়া উঠিতেছিল।

কিয়ৎকাল পর সেই চির পরিচিত, চির মধুর স্বামীর পদশব্দ পাইয়া অর্চ্চনা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু মিহিরের ব্যথিত মুখের দিকে চাহিতেই কি একটা ক্ষীণ সন্দেহের আভাসে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া উঠিল। স্বামীর চির প্রফুল্ল হাস্য বিকশিত মুখখানি আজ এত গম্ভীর হইল কেন? তবে কি—অর্চ্চনার চক্ষে জল আসিল; সে অশ্রু বিকৃত কণ্ঠে কহিল, 'আজ তুমি কোথায় ছিলে? এতক্ষণে ফিরে এলে?' 'হ্যাঁ, অর্চ্চনা, আজ এই ফিরে আসছি।' এ সন্দেহভরা

পাপভরা জগতে সন্তানের দৃষ্টি নিয়ে মাকে দেখা যে কত বিপদজনক, তা আগে বুঝ্‌তে পারি নাই। আজ ভাল করেই বুঝেছি।' স্বামীর সকরুণ কণ্ঠের এ আর্দ্র কথা কয়েকটিতে অর্চ্চনার সুকোমল হৃদয়টি দ্রবীভূত হইল। সে জানিত তাহার স্বামীর গভীর ব্যথা কোথায় লুক্কায়িত আছে। সে মমতা পূর্ণ কণ্ঠে কহিল, 'কি হ'য়েছে আমায় বল্‌বে না?' 'তোমায় বোলব বই কি অর্চ্চনা, আমার মা-হারার কথা তুমি বোধ হয় সব শুনেছ; মার যখন পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স, সেই সময় আমি তাঁকে জীবনের শেষ দেখা দেখে পাবনা পড়তে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে তাঁকে আর দেখ্‌তে পাইনি। মার সেই চেহারাটিই আমার মনের মধ্যে চির মুদ্রিত হ'য়ে রয়েছে। মাতৃবিয়োগ দশ বছরের বালকের বুকে যে কেমন হ'য়ে বেজেছিল, তা তোমায় বোঝাতে পারব না অর্চ্চনা।' মিহিরের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। অতীতের স্মৃতির আকর্ষণে হৃদয়টী বিচলিত হইয়া উঠিল। স্বামীর এ ভাবান্তর অর্চ্চনার নিকটে গোপন রহিল না। সে সান্ত্বনার স্বরে কহিল, 'আমি সে সব কথা পিসিমার কাছে শুনেছি। মা চলে যাবার পর তোমায় বাঁচানই কঠিন হয়েছিল। দু' বছর ভরে' মানুষে আর যমে যুদ্ধ ক'রে তোমায় বাঁচিয়েছিল। তুমি নাকি মেয়ে মানুষ দেখলেই মার মতন কি না না দেখে কিছুতেই ছাড়তে না।'

মিহির ম্লান মুখে বলিতে লাগিল, 'সে অভ্যাস এখনও আমার যায় নি অর্চ্চনা; স্ত্রীলোক দেখলেই তাঁর ভিতর আমার মায়ের সাদৃশ্য আছে কি না, এ আমি এখনও দেখে থাকি। ক'দিন আগে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে আমার মার প্রতিচ্ছবি দেখেছিলাম। ঠিক্ তেমনি বয়স, তেমনি মুখ চোখ, সব তেমনি, শুধু পার্থক্য সে আমারই এক দীন দরিদ্র প্রজার স্ত্রী।' অর্চ্চনা আশ্চর্য্যান্বিত কণ্ঠে কহিল, 'সে কাদের বাড়ীর বউ গো বল না আমায়।' মিহির বিষণ্ণ মুখে বলিল, 'সে নিমাই মণ্ডলের স্ত্রী। সন্তানের দৃষ্টিপাতে মায়ের আজ কত অপমান হ'য়েছে তুমি জান না অর্চ্চনা।' অর্চ্চনা নীরবে উৎসুক নয়নে মিহিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, মিহির ধীরে ধীরে বদন সরকারের কথা স্ত্রীর নিকটে বলিতে লাগিল। সমস্ত শুনিয়া ভক্তি শ্রদ্ধায় অর্চ্চনার হৃদয়টি স্বামীর চরণে লুটাইয়া পড়িল। সে পুলকিতান্তরে কহিল, 'মার মতন চেহারা—আমাদের সেই নকল মা'টিকে আমারও যে দেখতে ইচ্ছা হয়।' মিহির বলিল, 'কাল ঝিদের কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে তাকে ডেকে এনো। মার হাতের বাঁধান ঢাকার শাঁখা, আর বালা জোড়াটা—মার একখানা বেনারসী শাড়ী -আমাদের মাতৃত্বের চিহ্ন স্বরূপ তাকে দিয়ে দিয়ো।'

নীলাচলে গৌরাঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার]

৪র্থ স্তবক

প্রভু মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে (১৫১০ খৃঃ অব্দে) নীলাচল আগমন করেন এবং চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করেন। মহাপ্রভুর প্রসাদে সার্ব্বভৌমের যে পরিবর্ত্তন আমরা পূর্ব্ব স্তবকে উল্লেখ করিয়াছি তাহাকে "উদ্ধার" ব্যতীত অপর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। মহাপ্রভুর কৃপা-সম্পদ লাভ করিয়া নিজে তিনি দৈন্য প্রকাশে এক দিবস বলিয়াছিলেন,

'তর্ক শাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহ পিণ্ড,
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড।'

মহাপ্রভুর কৃপালাভে সার্ব্বভৌমের এই আমূল পরিবর্ত্তনের মঙ্গল-বার্ত্তা দেশময় প্রচার হইয়া পড়িল এবং লোকের মনে

শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে কিছু দ্বিধা ছিল তাহা বিদূরিত হইল। হইবারই তো কথা। চৈতন্য চরিতামৃত বলিতেছেন,—

'লোহাকে যাবৎ স্পর্শ হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে॥'

মহাপ্রভুর অবতারবাদ লইয়া আজ সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ পর যে সমস্ত সন্দেহশঙ্কুল তর্কের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই অজ্ঞতা-প্রসূত। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা আদ্যন্ত ধীর ভাবে আলোচনা করিলে তাঁহার ভগবত্তা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ উদিত হইতে পারে না। কোন কোন সুধী গৌরভক্ত মহাপ্রভুর বিস্তৃত জীবনী লিখিতে গিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে নানা প্রকার যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু গৌরলীলা সমাহিত চিত্তে ধারণা করিলে ইহা স্বতঃই বোধগম্য হইবে যে, মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, এ ধারণা তাহার লীলা আলোচনার অবশ্যম্ভাবী ফল।

তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাপ্রভুকে প্রথমতঃ সাধারণ মানব জ্ঞানে তাঁহার প্রতি যে ভাব পোষণ করিতেছিলেন তাহা স্বল্পকাল মধ্যে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সমূলে উন্মূলিত করিয়া তাঁহাকে অবনত মস্তকে 'পুরুষ পুরাণ' বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইলেন, তাঁহাকে একমাত্র উপাস্য জ্ঞানে তাঁহার দৈনন্দিন সেবা, পূজা জীবনের প্রধান সম্বল করিলেন। মহাপ্রভুর ভগবত্তা প্রমাণের ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ আর কি হইতে পারে ?

মহাপ্রভু চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া নববর্ষের প্রথমাবধি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের ইচ্ছা ভক্তবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা বিচ্ছেদাশঙ্কায় নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন,

'শিরে বজ্র পড়ে, যদি পুত্র মরি যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥'

মহাপ্রভুর কৃপায় সার্ব্বভৌমের কিরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে উপরি উক্ত দুইটি শ্লোক তাহার আভাষ প্রদান করিতেছে।

কিন্তু দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া নাম প্রেম বিতরণে বহির্ম্মুখ জীবকে উদ্ধার করিতে প্রভু কৃতসংকল্প হইয়াছেন, কাজেই ভক্তগণের কোন অনুরোধ রক্ষিত হইল না। একমাত্র সেবক সঙ্গে প্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

'মত্ত সিংহ প্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে॥'

সুধা বর্ষণ করিতে করিতে প্রভু অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও জীবকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার বিবরণ বর্ত্তমান আখ্যায়িকার অন্তর্ভুক্ত নহে। এই ভ্রমণ কালেই প্রসন্ন-সলিলা গোদাবরী তটে রায় রামানন্দের সহিত প্রভুর শুভ সাক্ষাৎ এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভজন রহস্য আলোচিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ লীলায় রামানন্দ-মিলন এক অপূর্ব্ব আখ্যান। তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি ও ভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের নাই।

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রভু নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে পথে গমন সেই পথেই প্রত্যাগমন।

'যাহাঁ যায় উঠে লোক হরিধ্বনি করি।
দেখিয়া আনন্দ বড় পাইলা গৌরহরি॥'

প্রভুর আগমনবার্ত্তা বিদ্যুৎ গতিতে রাষ্ট্র হইল এবং নীলাচলবাসী ভক্তবৃন্দ প্রেমানন্দে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে ধাবিত হইলেন।

'প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা আনন্দ দেহে নাহি যায়॥'
'জগদানন্দ, দামোদর, পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ॥'

আনন্দ-বিভোর ভক্তগণ প্রভু সম্মিলনে ছুটিলেন। সমুদ্রের তীরে প্রভু ভক্তে মিলন হইল।

মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিলে উৎকল রাজ প্রতাপ রুদ্রের গুরুদেব কাশীমিশ্রের বাসভবন তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্ধারিত হইল। ভাগ্যবান কাশীমিশ্র স্বীয় বাসভবন প্রভুর বাসের জন্য অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত জ্ঞান করিলেন। এই সময়েই নীলাচলবাসী

প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হয়। সার্ব্বভৌম অগ্রণী হইয়া সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং তাঁহারা মহাপ্রভুকে সভক্তি বন্দনা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। মহাপ্রভুও তাঁহাদিগকে প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন দ্বারা বড় কৃপা করিলেন।

'তবে সবে পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া।
সবে আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া॥'

দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর স্বরূপ দামোদর আসিয়া মহাপ্রভুর শরণাগত ও সঙ্গী হইলেন। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। ইনি মহাপ্রভুর অন্যতম প্রেমিক ভক্ত; নবদ্বীপে মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ছিলেন, প্রভুর সন্ন্যাসে মর্ম্মান্তিক ক্লিষ্ট হইয়া ৺কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ স্বরূপ দামোদর নামে অভিহিত হন। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসী। গুরু আজ্ঞা লইয়া তিনি নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। দিবারাত্র তিনি কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিহ্বল থাকিতেন এবং ভক্তগণ সমীপে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর রূপে পরিগণিত হইতেন। মহাপ্রভুর অন্তরে যখন যে ভাবের উদয় হইত এক স্বরূপ ভিন্ন অপর কেহ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। স্বরূপ অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। তিনি সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব ও শাস্ত্রে বৃহস্পতি। মহাপ্রভুকে নিত্য বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দ শুনাইয়া আনন্দ দিতেন। স্থূলকথা, স্বরূপের ন্যায় নিত্যসঙ্গী নিজ-জন মহাপ্রভুর শত শত ভক্তের মধ্যে অল্পই ছিলেন। এই কালেই মহাপ্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হন এবং ঈশ্বরপুরী নির্ব্বাণ কালে যে তাঁহাকে নীলাচল যাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে সেবা করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা মহাপ্রভুকে জানান। মহাপ্রভু গুরুর কিঙ্করকে নিজ সেবক রূপে গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ দ্বিধা বোধ করিলেও গুরুআজ্ঞা বলবান জ্ঞানে তাঁহাকে ভৃত্যরূপে গ্রহণ করেন। গোবিন্দ তৎকাল হইতে প্রভুর একনিষ্ঠ সেবক থাকিয়া নিত্য তাঁহার ধ্যবতীয় পরিচর্য্যাদি করিতে থাকেন।

৫ম স্তবক

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষে মহাপ্রভু নীলাচলে পুনরাগমন করিলে উৎকল রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত মিলিবার জন্য সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হয়েন। প্রতাপরুদ্র স্বাধীন হিন্দু নরপতি, তিনি স্বীয় শৌর্য্যে ও বীরত্বে সমগ্র উৎকল ভূমি প্রবল মুসলমান রাজা হোসেন সাহার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া একচ্ছত্রী বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন। হোসেন সাহা তৎকালে বাঙ্গালা দেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহার প্রতাপও দুর্দ্দান্ত ছিল। পরাক্রম-শালী হিন্দুরাজার সহিত তাঁহার অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ চলিত। কিন্তু হোসেন সাহার উৎকল রাজ্য প্রবেশের সমস্ত চেষ্টা প্রতাপরুদ্র ব্যর্থ করিয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের গৌরভক্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহা দ্বারাও মহা-প্রভুর স্বরূপত্ব উপলব্ধি হইতে পারে।

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত হইলে রাজা সার্ব্ব-ভৌম পণ্ডিতকে মহাপ্রভুর বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন।

'শুনিল যে তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হইতে আইলা তিঁহ মহাকৃপাময়॥'

সার্ব্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর যথাযথ বিবরণ জ্ঞাপন করিলে রাজা বলিলেন,—

'ভট্ট তুমি বিজ্ঞ শিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ তা তো সত্য মানি॥'
'পুনরপি ইহা তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন॥'

সার্ব্বভৌম রাজাকে স্পষ্টই বলিলেন, মহাপ্রভুর দর্শনলাভ রাজার পক্ষে অতীব দুরূহ। তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী। রাজদর্শন তাঁহার পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। রাজার আগ্রহাতিশয্যে সার্ব্বভৌম এক দিবস মহাপ্রভুকে রাজার আন্তরিক ভক্তি ও তাঁহাকে দর্শন জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জানাইলে মহাপ্রভু যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সার্ব্বভৌম ভীত ও শঙ্কিত হইয়া আর কখনও এ প্রস্তাবের পুনরুল্লেখ করেন নাই। মহাপ্রভু উত্তরে বলিয়াছিলেন—

'সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন।
স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা হেথা না পাইবে॥'

ইহার পর রাজার সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হয় নাই। রায় রামানন্দ প্রভু-আজ্ঞায় বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ বিদ্যানগর স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র হইতে নীলাচলে তাঁহার সহিত নিয়ত বাস করিতে আগমন করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্রের গৌরভক্তি এবং প্রভুকে দর্শন করিতে তাঁহার উৎকণ্ঠা জানিতে পারেন। রায় রামানন্দ প্রভুকে বলিলেন, 'প্রভু, রাজাকে তোমার আজ্ঞা বলায় রাজা আমাকে বিষয়কার্য্য হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তোমার নাম শ্রবণ মাত্র রাজা পুলকাবৃত হইয়া আসন হইতে উঠিয়া মহাপ্রেমাবেশে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'তুমি যে বেতন পাও, সেই বেতনই পাইবে, নিশ্চিন্ত হইয়া নীলাচলে বাস করিয়া প্রভুর চরণ ভজন কর।'

'আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশন।
তাঁরে যেই সেবে তার সফল জনম॥
পরম কৃপালু তেঁহো ব্রজেন্দ্র নন্দন।
কোন জন্মে অবশ্য মোরে দিবে দরশন॥'

রাজার আর্ত্তি বর্ণন করিতে গিয়া মহাপ্রভুর মন পরীক্ষা-চ্ছলে কুশাগ্রবুদ্ধি, ব্যবহারনিপুণ রায় বলিলেন,—

'যে তাঁর প্রেম আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥'

রায় রামানন্দের এই বাক্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তাহা যে কতকাংশে সুসিদ্ধ না হইল তাহা বলা যায় না। প্রভু উত্তরে আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন,—

'তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিব অঙ্গীকার॥'

ইহার কিয়ৎকাল পর অপর এক দিবস রাজা সার্ব্বভৌমকে ডাকিয়া তাহার সম্বন্ধে প্রভুকে কিছু বলা হইয়াছে কি না জানিতে চাহেন। সার্ব্বভৌম যে তাঁহার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই এবং পুনর্ব্বার [illegible] করিলে মহাপ্রভু ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইবেন তাহাও রাজাকে জানাইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের তখন প্রকৃতই মহাপ্রভুর প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। রাজা কেবল যে কৌতুহলপরবশ মহাপ্রভু দর্শন জন্য লালায়িত হইয়াছেন তাহা নহে। ভক্তির উচ্ছ্বাসজনিত ইষ্টদেব দর্শন জন্য মানব হৃদয়ের যে স্বাভাবিকী উৎকণ্ঠা, রাজার হৃদয়ে সেই পরম লোভনীয় উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইয়াছে। রাজা সার্ব্বভৌমকে ব্যথিত চিত্তে বিষাদ মলিন কণ্ঠে বলিলেন—

'পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার।
শুনি জগাই মাধাই করিল উদ্ধার॥
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ উদ্ধার।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥
তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজ দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥'

এই স্থলে যুগপৎ মনে রাখিতে হইবে, ইহা উৎকল রাজ্যের প্রতাপান্বিত স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্রের নিজের উক্তি। মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে সন্দিহান পাঠক মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বিবরণ একাধিকবার পাঠ ও চিন্তা করিবেন।

সার্ব্বভৌম রাজার জন্য চিন্তিত হইলেন। রাজার তীব্র অনুরাগ দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। তিনি রাজাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, 'তোমার উপর প্রভুর নিশ্চয়ই প্রসাদ হইবে। তিনি প্রেমাধীন আর তোমার যে প্রেম দেখিতেছি তাহাও অনন্যসাধারণ। কাজেই তোমার প্রতি তাঁহার কৃপা হওয়া অনিবার্য্য।' সার্ব্বভৌম রাজাকে এক অভিনব পন্থা নির্দ্দেশ করিলেন। তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, 'রথযাত্রা দিবসে প্রভু নিজ ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমাবিষ্ট চিত্তে রথাগ্রে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন করিবেন। তখন প্রেমানন্দে মহাপ্রভুর বাহ্যাপেক্ষা থাকিবে না। তুমি সেই পুণ্যক্ষণে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানে তাঁহার চরণ গ্রহণ করিবে এবং ভাগবতের রাস পঞ্চাধ্যায়ী শ্লোক কয়েকটী তাঁহাকে শুনাইবে। তোমাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে মহাপ্রভু নিশ্চয়ই আলিঙ্গন করিবেন। তোমার ভক্তির কথা রায় রামানন্দ

মহাপ্রভুকে বলিয়াছেন এবং তাহাতে তাঁহার মন কতক ফিরিয়াছে।'

ভক্তিমান উৎকল রাজের প্রতি প্রভুর এত কঠোরতা কেন জিজ্ঞাস্য হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি রাজার অনুরাগ উৎকণ্ঠার বিষয় তো সম্যক অবগত হইয়াছিলেন তবে তাঁহাকে দর্শন দিতে এত আপত্তি কেন?

গৌরলীলা লোক-শিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসীর প্রকৃতি ও রাজদর্শন একান্ত নিষিদ্ধ। যে যুগধর্ম্ম শিক্ষার জন্য মহাপ্রভু একদিন নিত্যসঙ্গী সুকণ্ঠ ছোট হরিদাসকে তপস্বিনী তুল্যা বৃদ্ধা বৈষ্ণবী মাধবী মাহিতী হইতে তুচ্ছ তণ্ডুলকণা ভিক্ষাপরাধে নির্ম্মম ভাবে বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মাণ ভক্ত হরিদাস প্রয়াগে জাহ্নবী নীরে দেহ ত্যাগ দ্বারা যাহার প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিল, ধর্ম্মের সেই মহান্ আদর্শ লোকচক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত রাখিবার জন্য মহাপ্রভুর এই কঠোরতা, এই নির্ম্মম অনুশাসন। কালচক্রে তাহার বিমল জ্যোতিঃ বর্ত্তমানে মলিন বলিয়া বোধ হইতে পারে—বিষয়াসক্ত মানব আজ সার্দ্ধ চারি শত বর্ষ পর সে মহান আদর্শ হইতে স্খলিতপদ হইতে পারেন, কিন্তু যতদিন হিন্দুধর্ম্ম থাকিবে, যতদিন বৈষ্ণব নাম ভারত হইতে একেবারে মুছিয়া না যাইবে ততদিন সে আদর্শের সম্মুখে সকলকে ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিতেই হইবে। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গলার পল্লী

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র]

আজি সে তটিনীতট নির্জ্জন নীরব।
সে বকুল আজো আছে, আজো ডাকে পাখী,
বোঁটা হ'তে ঝরে ফুল; আজো থাকি' থাকি'
বাতাসে কাঁপিয়া ওঠে শাখা পাতা সব।

যেথা ফুল ঝরি' পড়ে, পড়ে' থাকে সেথা;
অনাদরে ধূলিম্লান সেথায় শুকায়;
নাহি আর মালা গাঁথা; মরীচিকা প্রায়
আনন্দরূপিণী বালা আজ গেল কোথা?

কে আর গাঁথিবে মালা? কে পরিবে গলে?
কেহ নাই, কেহ নাই! আনন্দ, উৎসবে,
প্রীতিদান প্রতিদানে, হাসি, কলরবে
জীবন গড়িত যারা—সব গেছে চলে!

পথে পথে শিবাযূথ ফিরে ধীরে ধীরে,
পেচক পড়িছে মন্ত্র শিবের মন্দিরে।

রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের ভূমিকা

[শ্রীরাধাবল্লভ নাগ]

(১)

আমরা আজ যে মহাকবির কাব্যালোচনা করিতে সুরু করিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে দুই কথা বলিবার একমাত্র অধিকারী তিনিই, যিনি সেই অমৃতরাজ্যের কিছু খবর রাখেন, আমাদের কবি যে রাজ্যের অধিবাসী। যে অনন্তের মধ্যে জীবন ও মৃত্যু, খণ্ড ও অখণ্ড, সীমা ও অসীম, সত্য ও মিথ্যা, দুঃখ ও সুখ, বেদনা ও আনন্দ, সমস্ত দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের, সমস্ত বিরোধের বৈপরীত্য মিটিয়া যায়, সেই অনন্তরাজ্যের অধিবাসীই কেবল রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুরটীর ধারণা করিতে পারেন—যে সুর কবির অন্তর বীণার সুর।

ওগো কে বাজায়, দিবস নিশায়,
বসি অন্তর-আসনে;
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর,
কেহ শোনে, কেহ না শোনে!
অর্থ কি তার ভাবিয়া না পাই,
কত জ্ঞানী গুণী চিন্তিছে তাই,
মহান্ মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে!

সেই বিরাটের সুর কবির অন্তরে যে কোন্ পথ দিয়া আনাগোনা করিতেছে, কোন্ অনন্তের ভিতর দিয়া আসা যাওয়া করিতেছে, তাহার খবর একমাত্র তিনিই দিতে পারেন যিনি সেই অনন্তরাজ্যের অধিবাসী।

তবে আমরা যে আজ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছি তাহা এই সাহসেই যে, আমরা জানি যে, কবির কাব্য নানা জনের প্রাণে নানা বিচিত্র সুরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। কবির কাব্য হইতে কবির হৃদয়-লক্ষ্মীর পরিচয় পাওয়াই শ্রেষ্ঠ পাঠকের লক্ষণ, কিন্তু স্বয়ং কবির [illegible]ই যখন "অপূর্ব্ব তার আসা যাওয়া গোপনে" তখন আমাদের সাধারণের কাছে যে তাহা কি রকম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা শক্ত। সুতরাং সেই বিচিত্রা সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই—রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দের সুর-তরঙ্গ বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়া যাইতেছেন তাহা পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিবার শক্তি অল্প লোকেরই আছে। কবি আর যাহাই করিতে পারুন কাহাকেও জোর করিয়া আনন্দরস পান করাইয়া দিতে পারেন না। কবির কাব্য হইতে যাঁহার যেমন শক্তি তিনি সেইরকম ফল সংগ্রহ করিয়া থাকেন। একটী ফুল লইয়া কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দর্শন করেন, আবার কেহ বা তাহার রং বাহির করেন, কেহ বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করিয়া থাকেন—যাঁহারা শ্রেষ্ঠ পাঠক তাঁহারা কাব্য হইতে কেবল কাব্যই বাহির করেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে ইতিহাস বাহির করেন, কেহ বা দর্শন বাহির করেন, কেহ বা নীতি বাহির করেন।

সেই রূপ রবীন্দ্রনাথের কাব্য আমাদের কাছে যে-রূপ পাইয়াছে আমরা আজ সেই খবরই দিব। কারণ কবি নিজেই বলিয়াছেন যে, কাব্য হইতে যে যে-টুকু সংগ্রহ করিতে পারে তাহাই তাহার পক্ষে পরম লাভ। যে ভাগ্যবানেরা কবির মত বিরাট প্রাণ পাইয়াছেন তাঁহারাই প্রকৃত কাব্যরসিক—কারণ কবির হৃদয়যন্ত্রের সঙ্গে নিজের হৃদয়যন্ত্র একসুরে বাঁধিতে না পারিলে কবির হৃদয়ের গান নিজের হৃদয়ে অনুভব করা যায় না—কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়বীণার শক্তিহীন দুর্ব্বলতার সেই অনন্তের সুরে ঝঙ্কৃত হইবার দুরাশা করিতেও সাহস করে না।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই ভীত শঙ্কিত মনকে ক্ষণে ক্ষণে দোলাইয়া দিতেছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব স্বরলহরী ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চিত্তে অপূর্ব্ব আলোক-সম্পাত করিতেছে; রবীন্দ্রনাথ সেই অজানাদেশের অ-শোনা কথা কত ভাবে

কত স্পষ্ট করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন—তবুও আমাদের দুর্ব্বলচিত্ত তাহা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছেনা—কবির সহানুভূতিপ্রবণ প্রাণ বেদনায় কাতর হইয়া তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে,—

সে সঙ্গীত কি ছন্দে গাঁথিব, কি করিয়া
শুনাইব, কি সহজ ভাষায় ধরিয়া
দিব তারে উপহার ভালবাসি যারে ?

আমরা আশা ছাড়িলেও কবি আশা ছাড়েন নাই ; যে অনন্ত সৌন্দর্য্য কবির ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়া তাঁহার অন্তরতম প্রদেশে অনুভূতির নিত্যস্পন্দন জাগাইতেছে কবি সকলকেই সেই আনন্দসাগর যাত্রী হইবার জন্য ডাকিতেছেন

ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে
অতি দূর—অতি দূর যাব।

কবি পাখীর মত সংসার-কুঞ্জে আপন মনে গান করেন কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবি এই গানের সঙ্গে শিক্ষা দেন। কবি আত্ম-তৃপ্ত জগতের কণ্টকবনে আপনার পুষ্পাসন রচনা করিয়া আপনার মনে শান্তিস্তোত্র গান করেন। কিন্তু যে কবি সাধনার বলে এই পরা শান্তির অমৃতবারি তাপিত জগত-বাসীর প্রাণে ঢালেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ কবি, তিনিই ধন্য। আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাই শ্রেষ্ঠ। তিনি যে অমৃ-তের আস্বাদ পাইয়াছেন, যে ভূমানন্দরসধারা পান করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন, যে অকথিত আশ্বাসবাণী শ্রবণে আশ্বস্ত হইয়াছেন, যে অশ্রুত সঙ্গীতের নবসুরে মনকে ঘুম পাড়াইয়াছেন, সেই জ্ঞান, সেই শান্তি, সেই গীতসুরধারা, সেই পরমানন্দ সুধা জগতকে দুই হাতে দান করিয়া যাই-তেছেন। রবীন্দ্রনাথ আনন্দের কবি—সাধনা বলে তিনি আনন্দ সাগরের সন্ধান পাইয়াছেন, জীবনের বিজয় নিশান লইয়া তিনি আনন্দসাগরে যাত্রীকে ডাকিতেছেন

ছুটে আয় তবে, ছুটে আয় সবে
অতি দূর—অতি দূর যাব

কিন্তু এ যে অচেনা পথ, পদে পদে সন্দেহ-কাঁটা পায়ে বিদ্ধ করে, শত শত বাধা বিঘ্ন যে এই পথে রহিয়াছে—এ যে 'দুর্গম পথ এ ভব গহন'।

কিন্তু পথিক পাছে ভয় পায় সেই জন্য কবি আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন,

দেখ চেয়ে দেখ পথ ঢাকা আছে
কুসুমরাশিতে যে
কুসুম দলিয়া যাইব চলিয়া
হাসিতে হাসিতে রে।

কিন্তু ফুলে যে কাঁটা আছে—তাই কবি বলিতেছেন—

যদিও বা ফুলে কাঁটা থাকে ভুলে
তাহাতে কিসের ভয়!
ফুলেরই উপর ফেলিব চরণ
কাঁটার উপরে নয়।

ভীত, ত্রস্ত, সন্দেহান্দোলিত চিত্তকে ইহার অপেক্ষা আর কি আশ্বাস দেওয়া যাইতে পারে? এমনই করিয়া সমস্ত আশা ভরসা সেই অনন্তের চরণে সমর্পণ করিয়া আমরা যেদিন আনন্দসাগর যাত্রার প্রারম্ভে কবির মত বলিতে পারিব

কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
বাহির হনু তিমির রাতে
তরণীখানি বাহিয়া!
বাতাসে পাল ফুলিছে
পতাকা আজি দুলিছে
তরণী যদি না লাগে কূলে
শুধাব নাক' তোমাকে

সেই দিন আমরা ধন্য হইব।

(২)

ভাবপ্রবণ না হইলে ভাবের খেলা চক্ষে পড়ে না—ভাব-রাজ্যে বাস না করিলে বহুরূপী হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না। তরুলতাময় অভ্রভেদী মহাগিরির বিরাট সৌন্দর্য্য সকলেই মোহিত হয়, কিন্তু একটী ক্ষুদ্র ফুলের বা পাতার রচনাচাতুর্য্যে সকলের প্রাণে ভাবের স্পন্দন জাগে না। Wordsworth এর মত ক্ষুদ্র ভায়লেটের অন্তর্নিহিত মর্ম্ম-কথা কয় জনে শুনিতে পায়? কিন্তু ভাব-বিমুখ হৃদয়কে ভাবপ্রবণ করিতে এক প্রকৃতি ছাড়া আর কেহই পারে না। অনেক জীবনে এরূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে

হঠাৎ কোন এক সময়ে কোন একটা সুখের, কোন একটা বেদনার বা কোন একটা অবস্থার আঘাতে রুদ্ধ হৃদয়দ্বার খুলিয়া গিয়া মন ভাবরাজ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, হঠাৎ একটা সুরের আঘাতে তাহার চতুর্দ্দিকে সুরের আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সুরের হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে—তখন সে চতুর্দ্দিকের তাহার চির পুরাতন প্রকৃতিকে আর এক নব ভাবে, নব বেশে সজ্জিত দেখে, তখন সে যে বাণী শুনে নাই তাহা শুনিতে পায়; যে অর্থ বুঝিত না তাহা বুঝিতে পারে, কল্পনার চরণাঘাতে তাহার হৃদয় আলোক ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে।

এই যে ভাবের সাধনা, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আপনার মিলন-আত্মীয়তা ইহা বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই অনন্তপ্রাণময়ী বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আপনার একীকরণ এইটিই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের চিরজীবনের সাধনা। অতি শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথ এই সাধনায় রত হইয়াছিলেন—জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার, সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন এইটাই আমাদের বাউল কবির একতারার সুর।

রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে অঙ্গ
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে সাড়া
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

এই এক মূল সুরের হাওয়াই নানা ছন্দ, নানা ভাব, নানা বিচিত্রতার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথের অন্তর্জীবনের ক্রমাভিব্যক্তি ঘটাইয়াছে।

ছেলেবেলার কথা রবীন্দ্রনাথ যাহা নিজে লিখিয়াছেন তাহা এই :—

"আমার নিজের খুব ছেলেবেলার কথা একটু একটু মনে পড়ে, কিন্তু সে এত অস্পষ্ট যে ভাল করিয়া ধরিতে পারি না। কিন্তু বেশ মনে আছে এক একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জাগিয়া উঠিত। তখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল। গোলাবাড়িতে একটা বাখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটী খুঁড়িতাম, মনে করিতাম কি-একটা রহস্য আবিষ্কার হবে। .... পৃথিবীর সমস্ত রূপ রস গন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ,—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্দ্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্ত্তিতে আমাকে সঙ্গ দান করিত।" ছেলেবেলায় বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের একটা ছবি আমরা দেখিতে পাইলাম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচয় যে কি করিয়া ঘনিষ্টতর হইতে ক্রমে ঘনিষ্টতম হইল, মূক অর্দ্ধপরিচিত বিশ্বপ্রকৃতি যে কি করিয়া নানা পরিবর্ত্তনের, নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া কবিকে নব নব আনন্দ পথের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিল, বিশ্বপ্রকৃতি কখন যে মূক হইতে মুখর হইয়া উঠিল, অর্দ্ধপরিচিত হইতে অতি-পরিচিত হইয়া উঠিল, কবির অন্তর্জীবনের ক্রমাভিব্যক্তির সে বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই—সহজেই কবির কাব্য হইতে এ সম্বন্ধে যতটুকু পরিচয় আমরা পাইতে পারি তাহাই আমাদের পরম লাভ।

আমরা সমগ্র জগৎকে দুই ভাগ করিয়া দেখি—এক ভাগে আমি—আর এক ভাগে আমি ছাড়া আর যাহা কিছু আছে সেই সকলের সমষ্টি। আমার প্রাণ আছে, আমি প্রাণী কিন্তু আমি ছাড়া বাকী আর সমস্তও যে প্রাণী তাহা আমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালেই এই অনন্তপ্রাণ সমুদ্রের পরিচয় পাইয়াছিলেন—তা সে পরিচয় যতই অপরিস্ফুট হউক না কেন। এই অনন্তপ্রাণ সমুদ্রের কথা রবীন্দ্রনাথের অর্দ্ধেক কাব্য অধিকার করিয়া বসিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ কি করিয়া যে এই অসীম প্রাণ-সমুদ্রের পরিচয় পাইলেন সে সম্বন্ধে তাঁর যুক্তি বা তাঁর নিজের কথা তাঁরই একখানা চিঠি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিই—" ..... আমি নিজের ভিতরকার সহজ আনন্দ হইতে একটা অনুভব করি, আমার আর কোন যুক্তি নেই......কেবল তাহার সঙ্গে একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব করা...... যাহাকে আমরা অন্যায়পূর্ব্বক জড় বলিয়া থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনারই একটা যোগাযোগের পথ আছে নইলে কখনই নির্জীবের প্রতি জীবের, জড়ের প্রতি

মনের, বাহিরের প্রতি অন্তরের একটা এমন অনিবার্য্য ভালবাসার বন্ধন থাকিতেই পারে না; আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নাই, সেই জন্যেই এই জগতে আমরা একত্র স্থান পাইয়াছি,নইলে আমাদের উভয়ের জন্য ভিন্ন জগৎ সৃজিত হইয়া উঠিত।"

যুগযুগান্ত কাল ধরিয়া এই যে অনন্ত জীবনস্রোত বহিতেছে তাহার নানা বিচিত্র পরিচয় নানাভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। কত অসংখ্য প্রাণীরূপে কত গ্রহে উপগ্রহে কত জন্ম কাটিয়া গিয়াছে। তাই মনে হয়—

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা কেমনে?
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে!
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে!
যে ভাষায় তা'রা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি,
চির দিবসের ভুলে যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে!
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে।

অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এই যে পরিচয় তার পরিণাম বিশ্বপ্রেম—তাই কবি নিজের অন্তরের সঙ্গে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির একতা অনুভব করিয়া, সেই মহা-আকর্ষণ অনুভব করিয়া বলিতেছেন,

বিশাল বিশ্বে চারি দিক হ'তে
প্রতি কণা মোরে টানিছে।

শৈশবে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ট আত্মীয়তা না হইলেও তখন হইতেই যে তিনি তাহার সঙ্গ লইয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। সেই 'মূক অর্দ্ধপরিচিত' বিশ্বপ্রকৃতি শৈশবের কেবল প্রাণীত্ব পরিত্যাগ করিয়া যৌবনে অনাদি উষার বন্ধুরূপে পরিণত হইয়াছে।

এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন:—

আমি পৃথিবীর শিশু বসে আছি তব উপকূলে,
শুনিতেছি ধ্বনি তব; ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
কিছু কিছু মর্ম্ম তা'র—বোবার ইঙ্গিত-ভাষা হেন
আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে
নাড়ীতে যে রক্ত বহে, সেও যেন ওই ভাষা জানে,
আর কিছু শিখে নাই, মনে হয়, যেন মনে পড়ে—
যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন-ভ্রূণমাঝে,—লক্ষ কোটী বর্ষ ধরে'
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্মপূর্ব্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মত
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি' নত
বসি' জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে অনন্তপ্রাণ সমুদ্রের মধ্যে আমি এবং বিশ্ব আমরা দুজনে একসঙ্গেই ছিলাম। সেই সময়েই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল—আমরা দুজনে যে সেই একই প্রাণসমুদ্র হইতে উঠিয়াছি। জন্ম মৃত্যুর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে এই অনন্তপ্রাণ সমুদ্রের ভিতর দিয়া আমরা দিগন্তের পানে চলিয়াছি—কত অসীম যুগ ধরিয়া আমরা চলিয়াছি—অবিশ্রাম ভাসিয়া চলিয়াছি—এ চলার আদি নাই, অন্ত নাই—সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি এই অনন্ত তীর্থ-পথের যাত্রী সকলের সঙ্গে একসাথে আমরা চলিয়াছি—এই এক সঙ্গে সৃষ্টি এবং একসঙ্গে চলা হইতেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তার সূত্রপাত—আমরা

যতই চলিয়াছি আমাদের আত্মীয়তা ততই সুদৃঢ় হইতেছে—এর শেষ কি—এর পরিণাম কোথায়, তাহা ভাবিবার দরকার নাই—কেবল ভাসিয়া চল—

জগৎ-স্রোতে ভেসে চল, যে যথা আছ ভাই!
চলেছে যেথা রবি শশী চলরে সেথা যাই!
কোথায় চলে কে জানে তা', কোথায় যাবে শেষে!
জগৎস্রোত বহে গিয়ে কোন্ সাগরে মেশে!
অনাদি কাল চলে স্রোত অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পড়িছে ঢেউ, গণিবে কেবা কত,
ভাসিছে শত গ্রহ তারা, ডুবিছে শত শত।
ঢেউয়ের পরে খেলা করে আলোক আঁধারেতে,
জলের কোলে লুকোচুরি জীবনে মরণেতে।
শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণপ্রায়,
সে স্রোত মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়।

কিন্তু এই যে জগৎ-স্রোত এ ত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে—এর ত শেষ নাই, এ যে অশেষ—এ ত অনন্তকাল ধরিয়া চলিবে—তাহা হইলে এ চলাই কি সার—কেবলি চলা, চলা, চলা? এই চলাই যে জগতের ধর্ম্ম—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম—প্রত্যেক অণুপরমাণুর ধর্ম্ম। তুমি জগৎ ছাড়া নও—এবং জগৎও তোমাছাড়া নয়। তুমি যদি এই বিশ্বধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিবার চেষ্টা কর—তাহা তুমি হাজার চেষ্টা করিলেও পারিবে না—তুমি যে মুহূর্ত্তে চেষ্টা করিবে যে তুমি বিশ্বধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিতেছ—সেই মুহূর্ত্তেই তোমার অজ্ঞাতসারে তুমি বিশ্বধর্ম্মকে গ্রাহ্য করিয়া ফেলিবে, কাজেই তুমি যে জগৎ-স্রোতে ভেসে যাবে—সেটা জগতের জন্যও বটে এবং তোমার নিজের জন্যও বটে—

জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রইব না
মরিয়া যাব একা হলে একটী জলকণা।

এই জন্যই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলেই সকলের আত্মীয়—জগতে স্বার্থপরতার স্থান নাই—

আমার নাহি সুখ দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হ'য়ে যাই।
প্রভাত সাথে গাহি গান সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি তারার সাথে যাই।
ফুলের সাথে ফুটি আমি, লতার সাথে নাচি
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু ফুলের কাছাকাছি।
মায়ের প্রাণে স্নেহ হ'য়ে শিশুর পানে ধাই;
দুখীর সাথে কাঁদি আমি সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই,
জগৎ স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

যে দিক দিয়েই দেখা যাক্ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যে আমাদের আত্মীয়তা তা অস্বীকার করিবার জো নেই—তবে কেউ এই আত্মীয়তা সম্বন্ধে সচেতন, আবার কেউ একেবারেই অচেতন। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই তাঁর চেতনার মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির আত্মীয়তা স্পষ্ট করিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তারই পরিণাম হইতেছে এই বিশ্বপ্রেম।

(ক্রমশঃ)

মুক্তি

[শ্রীকালিদাস রায়]

এস সখি মুক্তিলোকে রুদ্ধ গৃহমাঝে,
বাহিরে খুলিয়া যত সংসার-শৃঙ্খল,
হেথা এস মুক্ত শ্লথ সুষমার সাজে
বিগলিয়া কর্ম্মক্লান্ত যৌবন তরল।
এলায়ে গুণ্ঠিত কুণ্ঠা, মুকুলিত লাজ,
ফুটে উঠ কণ্ঠবৃন্তে চম্পার মতন,
রাখি উপাধান তলে সর্ব্বভূষা সাজ—
পর' প্রেম কল্পতরু সঞ্চিত ভূষণ।
হেথা হেমসিকতায় মাণিক্য সন্ধানে,
মন্দাকিনী তটে খেলা রভসে হরষে—
কভু বা অঙ্গের ভূষা রাখিয়া সোপানে,
অবিশ্রান্ত জলকেলি অচ্ছোদ সরসে।
ইহস্মৃতি হারাইয়ে গৃহের নন্দনে
এস প্রিয়ে, লভ মুক্তি নিবিড় বন্ধনে।

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

চতুর্থ অধ্যায়

(ত্রিবেণীর কথা)

সরস্বতী

হাসির আমার এ কি হল! সে এই মাস-খানেকের মধ্যে এমন হয়ে গেল কেন? মা ভাবছেন, দিদিমা কাঁদছেন, এমন কি বোধ হচ্ছে যেন বাড়ীশুদ্ধ সবাই ভাবছে যে এই সারা গ্রামখানার হাসিখানি এমন হয়ে একটা ছোট্ট ঘরের কোণে মিলিয়ে যাচ্ছে কেন? এমন কি এই হতভাগিনী বাকশক্তিহীন মানুষটাও যেন মূক দৃষ্টিতে জানাচ্ছে যে তার করুণাময়ী হঠাৎ তার প্রতি এমন অকরুণ হয়ে উঠল কেন? কেবল ঘরের কোণে বসে একটা ছবি নিয়েই ভাবছে, না হয় তুলি বুলুচ্ছে, না হয় হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে।

ছবিখানাও দেখিছি—একটী ভিখারীর মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কত ফুল, কত শোভা, কত হীরে মাণিকের রাশি হেলা ফেলা করে সাজান। কিন্তু তার মাঝখানে গৈরিক বসনে ভিক্ষাপাত্র হাতে একজন ভিখিরী। এ যেন সেই তার পূর্ব্বের আঁকা বুদ্ধদেবের ছবিখানার নতুন সংস্করণ। সেই বুদ্ধের ছবিখানা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে, আর দেখতে পাই নে। কিন্তু তার স্থানে এ কার মূর্ত্তি সে আঁকছে। এ মুখখানার সঙ্গে যাঁর সাদৃশ্য রয়েছে তাঁকে এমন সন্ন্যাসীর বেশে সাজিয়ে দেবার কি কারণ যে আছে তাও ত' খুঁজে পাই নি। প্রিয় বাবুর চেহারার মধ্যে কোন স্থানেও ত' সন্ন্যাসীর লক্ষণ আমি দেখতে পাই নি। তবে আমি তাঁকে অধিকাংশ সময় দূর হ'তে না হয়, আড়াল থেকে দেখিছি, তাই জোর করে বলতে পারি নে বটে, কিন্তু কৈ আর কাউকেও ত' এ রকমের কোনো কথা বলতে শুনিনি। তবে শুনিছি বটে ইনি খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান লোক। তাই বলে এঁর মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাব কি করে হাসি দেখলে?

প্রিয়ব্রত বাবু যে খুব ভাল লোক তা'ত সবারই মুখে শুনছি। শুনছি তিনি আসাতে গ্রামের শ্রী ফিরে গেছে। সারা দেশের লোক এঁর প্রশংসা করছে—সমস্ত গ্রামের হেন কাজ নেই যাতে নাকি এঁর হাত নেই। গ্রামের দুঃখী দরিদ্ররাও নাকি বেশ দু'পয়সা রোজগার করে এঁর সাহায্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় করে নিচ্ছে। তবু কেউ ত' বলেনা যে ইনি সন্ন্যাসী। মা বলেন বটে, যে ম্যানেজার বাবু খুব ধার্ম্মিক, শুদ্ধাচারী, স্বল্পভাষী, স্বল্পব্যয়ী মানুষ। বিষয়বুদ্ধিও শুনেছি তাঁর যথেষ্ট আছে—বিষয়ের আয়ও বেড়েছে। কিন্তু কেউ ত তাঁকে কৈ সন্ন্যাসী বলে না, বা সন্ন্যাসী বলে ভুল করে না? তবে সেই বিষয়ী মানুষটীর মধ্যে এই অদ্ভুত মেয়ে মানুষটী সন্ন্যাসীকে কোথায় দেখতে পেলে?

সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী—কেবল দেখেছিলাম সেই এক দিন, আর দেখছি এই এতকাল পরে আমার ঘরের দ্বারেরই কাছে। জানি না আমার কি সৌভাগ্য যে আমারই কাছে সেই কত দিনের হারানো চাঁদ আবার আমারই আকাশে দয়া করে উদয় হয়েছেন, দয়া করে ধরা দিতে এসেছেন।

ধরা দিতে? হায় রে মেয়ে মানুষের প্রাণ! এ কথা কেমন করে, কোন্ সাহসে তুই বল্লি? কৈ তিনি ধরা দিলেন? সেই যেমন প্রথম ধরা দিতে এসে ধরা না দিয়ে সরে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি করেই ত' আজও কাছে এসে ধরা দিয়ে আত্মস্থ হয়ে বসে আছেন। এখন যে ইনি

আরও দূরে—বহু দূরে কোন সপ্তর্ষি লোকের ধ্রুবতারার মধ্যে লীন হয়ে আছেন। আমার যোগী যে ধ্রুবলোক হতে নামতেই পারেন না। না—না—নেমে কাজ নেই। তুমি অমনি ধ্রুবলোকেই থাক, আমিও এই অধ্রুবের জগৎ হতে তোমার ঐ দু'টী বিশাল কোমল নয়নের মধ্য দিয়ে আমার ধ্রুব ভক্তিকে সেই লোকে পাঠিয়ে দিই।

কিন্তু হাসিই বা এ কি করে বসল? হাসি এ কোন্ অপরিচিতকে এনে আমাদের দুই বোনের মাঝখানে দাঁড় করালে। এঁকে কে চায়? আমি? কৈ একদিনও ত' এঁর শুভাশুভ কোন কর্ম্মের দিকে ফিরে চাইবার কোনো অবসর পাই নি, তবে কেন আমার এত কাছে, আমার হাসির হাসিটুকুর অন্তরে এঁর স্থান হল? হাসি এ কি করে বসল?

তাকে মানা করবার জো নেই। মানা করলে বলে, 'আমার বাবা ক্রিশ্চান হয়ে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি ঘরে থেকেই ক্রিশ্চান। আমি তোমাদের এই সব বাজে লোকাচার মানি নে।' সে বাস্তবিকই কোনো দিন কোন মিথ্যে সংকোচ রাখে নি, যখন যেখানে যাবার দরকার বোধ করেছে সেখানে গিয়েছে, যে কাজ করবার দরকার বোধ করেছে তাই সে করেছে। কেউ তাকে বাধা দেয় নি, দিতে পারে নি। সে তার হাসির জোরে সমস্ত বাধাই উড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাকে কে ঠেকাবে? আমি? আমার সে সময় কৈ? ইচ্ছে কৈ? শক্তি কৈ? আমার সমস্ত শক্তিই যে এক জায়গায় আটকে গিয়ে শিবের জটায় গঙ্গার মত পাক খাচ্ছে। কোন্ ভগীরথ তাকে আরাধনা করে নামিয়ে আন্‌বে?

● ● ● ●

আজ প্রভাতে আমার সন্ন্যাসীর পাশে এ কাকে দেখে এলাম! এ কে—এ কে—এ কে গো! একে দেখলাম, যেন আমার হোমাগ্নির পাশে শান্তিজলের কলসের মত চুপ করে শেষের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে! কে ইনি, যাঁকে আমার সন্ন্যাসী এত আগ্রহে নিজের বুকের মধ্যেই টেনে নিচ্ছিলেন? কে তুমি এত দিন আপনাকে এমন ভাবে গোপন করে রেখেছ? তোমায় ত' চিনতে পারলাম না। তুমি আমাদের দাসত্ব করতে এসেছ, কিন্তু তোমার ঐ দাস ভাবের আবরণের মধ্যে যে মহাপ্রভুত্বের আভাস হঠাৎ বিদ্যুতের মত ঝলক মারলে তা কি সত্য, না তাও একটা মিথ্যা আলেয়ার আলো? ঐ যদি আলেয়া হয় তা হলে অভাগিনী হাসি মরেছে, আর যদি আলেয়া না হয়ে ধ্রুব জ্যোতিঃ হয় তা হলে? তা হলেও না জানি তার কি হবে?

যা ভয় করছি, যদি তাই হয় তা হলেও ত তুমি সহজ-লভ্য নও। হে অপরিচিত, হে আবৃত জ্যোতিঃ, তোমার সত্য মূর্ত্তি প্রকাশ ক'র, নইলে যে আমরা ভয়ে মরি। নইলে অভাগিনী হাসির হাসি যে আর দেখতে পাব না।

কথা কও—কথা কও! আজ আমার শুধু কথা শুনবার ইচ্ছে করছে—কথা কও! হে চিরমৌন, আর কত কাল এমনি ভাবে শুধু একটী কথার আশায় বসিয়ে রাখবে, কথা কও। এত কথার জগতে, এত কোলাহলের হাটে, শুধু সেই একটী কথাই কি কেবল শুনতে পাব না। আর সবই শুনতে পাব, কেবল সে একটী কথা হ'তে তুমি আমায় বঞ্চিত রাখবে? প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হ'তে প্রভাত—এমনি করে কত রাত্রি, কত দিন কেটে গেল, কত কথা তুমি কইলে, কেবল সেই একটী কথা হ'তেই বঞ্চিত রাখলে! বঞ্চিত রাখবে বলেই কি আগে হ'তে এই বাক্যহারা মেয়েটীকে আমাদের মাঝে রেখে দিয়েছ? তাই সেই প্রথম দর্শনের দিনই তোমার চিরমৌন ভাষার প্রতিনিধি করে এই যাকে পাঠিয়েছ তাঁকে বুঝি কথা কহাতে পারলাম না?

কিন্তু আমিও ছাড়ব না, আমি একেও কথা কহাব। একেও একদিন তোমার সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেখাব যে আমি কথা কহাতে জানি, মৌনতার মধ্যে মুখরতার জন্ম দিতে পারি। চির স্তব্ধ আকাশেও ধ্বনি জাগাতে পারি। ব্যথা আমার কথা কইবে এবং সেই সঙ্গে তুমিও কইবে—নিশ্চয়ই কইবে। যে কথার জন্য আমি আমার জন্ম হ'তে প্রতীক্ষা করে আছি, যে কথার জন্য আমার জনক ঋষি সারা জীবন অপেক্ষা করে গেছেন, সে কথা যে চির দিন অকথিত থাকবে এ হ'তেই পারে না। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হ'তে পারে না—তাঁরই আশা আমার মধ্যে

জলন্ত হয়ে জেগে আছে। সেই অমর আত্মার অমর আশা অমর সাফল্যকে টেনে আনবেই। আমি তার সূচনা দেখতে পেয়েছি।

* * * *

আমার 'ব্যথা' আমার হাসির ব্যথা, এই মুখর সংসারের মৌন মূক 'ব্যথা'ও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন তার মৌনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি জেগে উঠেছে। কেন উঠেছে তাও ধরতে পেরেছি, কারণ তার হাসি আর তাকে তেমন করে প্রাণভরা হাসি দিয়ে বাঁচিয়ে তুলছে না। কিন্তু তার চোখে এত দিন পরে জল দেখতে আরম্ভ করিছি—সে কেঁদেছে। আমি তাকে ভাষা শেখাবার বিফল চেষ্টায় যতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, সে ততই মৌন অশ্রুভরা চোখে তার হাসির হাসির জন্য মিনতি জানাতে আরম্ভ করেছে। যদি এই মৌন ভাষা স্ফুট হয়—এই এত দিনকার চেষ্টার ফল দেখা দেয়, যদি সে হঠাৎ তার স্ফুট ভাষা খুঁজে পায়, তা হলে কি সে যার মৌনতার প্রতিনিধি সে কথা কইবে না?

* * * *

কিন্তু তুমি ত' কথা কইতে পার, তোমার বন্ধুর কাছে ত' দূর হ'তে দেখলাম কত কথাই না কইছ! কেবল আমিই বঞ্চিত থাকব? আমার কাছে কি কেবল শুষ্ক উজ্জ্বল তত্ত্বকথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবার নেই তোমার? যে কথা বলবার জন্য তোমার সমস্ত দেহ মন আত্মা ছট ফট করছে—হ্যাঁ করছে, নিশ্চয় করছে—সেই কথাটাই কেবল বাদ থেকে যাবে? তুমি কি মনে করেছ আমার কেবল কান দুটোই আছে, চোখ নেই, মন নেই, আর কোনো ইন্দ্রিয় নেই? আমি যে তোমার কতখানি দেখে নিয়েছি, তাই যে তুমি ধরতে পারছ না। তোমার যোগযুক্ত মন যেখানেই যুক্ত থাক, তোমার মনের মন যে কোথায় ধীরে ধীরে যুক্ত হচ্চে তা যে তোমার চোখে পড়ছে না, এইটেই আশ্চর্য্য!

* * * *

কিন্তু আমার যোগীর এই ভোগী বন্ধুটিকে কেমন যেন একটু ভয় ভয় করছে। কি যে কথা হয় এঁদের মধ্যে তা যে কোন দিন সাহস করে আড়াল থেকে শুনতে পারলাম না! আড়াল থেকে শোনা! ছি ছি, তা কেমন করে পারব? তা যেদিন পারব সেদিন কি আর আমার সন্ন্যাসীর কাছে আমার চির-প্রার্থিত রঘুনাথজীর কাছে যেতে পারব না? না—না, তা পারব না। যদি চিরদিন এই দু'জনের পরিচয় গোপন থাকে, তবু তা পারব না।

কিন্তু এক একদিন ইচ্ছা হয় প্রিয়ব্রত বাবুর মার কাছ থেকে, আর যদি সম্ভব হয় অবিনাশ বাবু উকিলের কাছ থেকে এঁর পরিচয় আদায় করতে যাই। কিন্তু পারি না যে। কে যেন বাধা দেয়। তাই হাসির কাছেও এ কথা পাড়তে পারি না। লজ্জা করে—। লজ্জা! আমার আবার এ উৎপাত কোথা হতে জুটল! যে কোন দিন কোন লজ্জা ভয়ের ধার ধারেনি, তার আবার লজ্জা!

কিন্তু তবু সেই লজ্জাও ত' আমার মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল। এতদিনকার অব্যবহারেও ত' সে মরে নি।

বুঝি কিছুই মরে না; এই অমরতার জগতে কিছুই মরে না। কালে সবই ফুটে ওঠে, সময় হলে সবই আবার ফুলে পাতায় সজীব হয়ে ওঠে। ওরে মন! ভয় নেই, সময়ের অপেক্ষা কর্, তোর সাধনাও সফল হবে।

(ক্রমশঃ)

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]
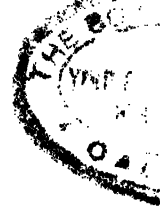
শাওন, মেঘে মেঘে
বেদনা ওঠে জেগে,
নয়নে নেমে আসে বরষা জল,
তরাসে কেঁপে ওঠে হৃদয় তল !
মিলন দিনে বুকে সে কি সে গুরু গুরু
ব্যথিয়া গেল সুখ কাঁপিয়া দুরু দুরু
কি কথা বলে গেলে টানিয়া জোড়া ভুরু
এখনও মনে পড়ে অবিকল।
নয়ন কোণে শুধু একটু মৃদু হেসে
মাথাটি নীচু করে দাঁড়ালে কাছে এসে,
আদরে বুকে নিনু কত না ভালবেসে
আধেক ফোটা যেন শতদল !
বৃন্ত হ'তে উঠি আপনি ফুটিতেছ
শোভার নাহি বুঝি সমতুল
পরাগ মাঝে তব গন্ধ অভিনব
আপনি হয়ে আছ সমাকুল !

কথা যে জুটিল না
মুখ যে ফুটিল না
দাঁড়ায়ে র'লে নতমুখে—
সে ব্যথা বেজেছিল বুকে !
আজ,—মেঘের পরে মেঘ মহলা করে যায়
অশ্রু-ভেজা মন করিছে হায় হায়,
তোমার মালাগাছি বুকে যে রাখা দায়
তুমি যে নাই মোর পাশে ;
বরষা নেমে এল সজল কালো মেঘে
উতলা হয়ে বয় বাদ্‌লা বায়ু বেগে,
বুকের মাঝে আজ যক্ষ ওঠে জেগে
বিরহী প্রিয়তম আশে !
কোন সে অলকায় অলক আলুথালু
ধূলায় লুটে সারা খালি,
চোখের জলে তা'র কাজল মুছে গেছে
আঁচলে মাখা শুধু কালি !

আমারি মত সে কি
আকাশে মেঘ দেখি
গুমরি উঠিতেছে দুখে
বিরহ ভরা—ভরা-বুকে ? .
জঘন হ'তে তার বসন পড়ে খুলে
শাওন-ঘন-ছায়া পড়িছে গ্রীবামূলে,
নদীর ভরা ঢেউ হৃদয় উপকূলে
আঘাত করি' যায় অনুখন ;
দীরঘশ্বাস বয়, কাঁকন বেজে উঠে
বেশর খসি পড়ে, নূপুর যায় টুটে
বরণ মালাখানি নিমেষে পড়ে লুটে,
শিহরি উঠে প্রাণ অকারণ !
শাওন মেঘময় তাহারি মায়াখানি
বিছায়ে রাখিয়াছে সে যে
আমার মন বলে বরষা ধারাজলে
তাহারি বীণা ওঠে বেজে !

গভীর বেদনায়
প্রাণ যে তারে চায়
দু'হাতে আগুলিয়া বুকে
পরশে কেঁপে ওঠা সুখে !

ওই যে মেঘে মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে
বরষা জলধারা আকুলি' এল ধেয়ে,
বিজন বনপথে বাতাস গেল বেয়ে
ছড়ায়ে ভেজা বনফুল ;
আজিকে থির হয়ে আছে যে আনমনা
শাঙন মেঘ সনে তাহারো আনাগনা,

বিরহী হৃদয়ের আজি এ আরাধনা
জীবনে হবেনাক' ভুল ;
উজল কেশভার মেঘেতে একাকার
মাঠের পরে পড়ে লুটি'
জীবন ভরি আজ মধুর হয়ে ওঠে
বিরহে ম্লান আঁখি দু'টি।

বাইজী

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার

(১)

সুচরিতার জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িল না। অগত্যা পাড়াগাঁ ছাড়িয়া কলিকাতায় গিয়া চিকিৎসা করানোই সাব্যস্ত হইল। হরিশপুরের জমিদার-বাড়ীতে চাবি বন্ধ হইল—কেবল কর্ম্মচারীরা বাহির-বাড়ীতে থাকিয়া কাজকর্ম্ম চালানোর আদেশ পাইল। মহিমের হুকুম হইল ম্যানেজার বাবু যেন মাস মাস হাজার টাকা কলিকাতা পাঠান।

(২)

কলেজ ষ্ট্রীটের উপর মেডিকেল কলেজের কাছে একটী সুন্দর দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করা হইয়াছে। মহিম তাহার স্ত্রী সুচরিতা এবং তিন বৎসরের কন্যা সুশীলা সেই বাড়ীতে আসিয়াছে। সঙ্গে ঝি, চাকর, ঠাকুরও আছে। সুশীলা মায়ের সৌন্দর্য্য পূর্ণমাত্রায় পাইয়াছিল—তাহার কলধ্বনিতে সমস্ত গৃহখানি মুখরিত হইয়া থাকিত, তাহার রুচিরূপের বিদ্যুৎ ঝলকে নিরানন্দ বাড়ীখানি আলো হইয়া থাকিত। কত ডাক্তার-বৈদ্য দেখানো হইল—টাকার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, সুচরিতার আরোগ্যের আশা সকলেই ত্যাগ করিলেন। মহিমের মনটা খারাপ হইয়া আসিল। দিন যত যাইতে লাগিল, সুচরিতা কন্যাকে ততই যেন বুকের উপর সারাদিন চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু প্রাণপাখী একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া গেল!

(৩)

শোকে কাতর মহিমের মাথার ঠিক নাই—সুচরিতা আজ তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে—তাহার দেহে এখনও প্রাণ রহিয়াছে—এই ভাবনাই তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। নানা প্রকারের লোক জন জড় হইয়াছে। মৃতদেহ বাহির করিবার আয়োজন হইতেছে—ইহার মধ্যে কোন্ ফাঁকে সুশীলা বাড়ীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

(৪)

সন্ধ্যার আঁধারে শিকার ধরিবার জন্য যে সমস্ত নারী কলিকাতার রাস্তায় বাহির হয়—তাহাদেরই একজনের চোখে পথভ্রষ্টা এই সুন্দর মেয়েটি পড়িল। সে তাহাকে বাড়ী রাখিয়া আসি বলিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া চলিল। সেখানে তাহার কান্না থামাইবার জন্য কত কি প্রলোভনের সামগ্রী দিতে লাগিল।

(৫)

কাশীতে এক সন্ন্যাসীর আড্ডায় একটা লোক বসিয়াছিল। মাথায় তেল নাই, চুল লম্বা লম্বা, উস্কো খুস্কো হইয়া জটা বাঁধিয়া গিয়াছে। চেহারা অত্যন্ত রোগা—হরিশপুরের গৌরবর্ণ নধরকান্তি জমিদার মহিমের দশা যে এরূপ হইতে পারে, ইহা কেহ দেখিলেও বিশ্বাস করিত না। একটি পাগল সেখানে বসিয়াছিল—সে বলিল, "আরে ভাই

কিসের সংসার, কে কার আপন, কার জন্ম কে দুঃখ করে? তুমি যুবাপুরুষ, বুদ্ধিমান জমিদার মানুষ হ'য়ে পরিবার ও কন্যার শোকে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছ—এতে কি তারা ফিরে আসবে—বম্ ভোলা ব'লে দুটান টেনে মজে যাও বাবা—নতুন নতুন রসের আস্বাদন কর—ও সব ভুলে যাবে—মনের সুখ শান্তি ফিরিয়ে পাবে।"

(৬)

জমিদারি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—কলেজ ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীটা কিনিয়া মহিম নাম দিয়াছে "সুচরিতা ভবন"—কিন্তু সেখানে এখন চলিতেছে পঞ্চ মকার সাধন। সেই পাগল তান্ত্রিক সাধুটা মহিমের গুরুদেব হইয়াছে। শোককাতর হতাশ মনে আট দশ বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে কোথাও শান্তি না পাইয়া অবশেষে তাহার এই নূতন গুরুর নূতন পথে যা-হয়-হবে ভাবিয়া অন্ধের মত ছুটিয়াছে।

(৭)

সুচরিতা-ভবনে আজ বাই নাচ। উপরের হল-ঘরটি আলোকমালায় ঝলসিয়া পড়িতেছে। রাণী বাইজীর নাম কলিকাতা হইতে লাহোর পর্য্যন্ত রসিক-মহলে সকলেই জানে। অল্প বয়সে তাহার মত খ্যাতি এ পর্য্যন্ত কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তা' ছাড়া রাণীর রূপের তুলনা ছিল না। আজ ভারতবিখ্যাত সেই সুন্দরী রমণীর নৃত্য ও গীত হইতেছে—তাহার কলকণ্ঠের অপ্সরার মত স্বর পথের পথিককে মুগ্ধ করিয়া পথ বন্ধ করিয়াছে। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে—তবুও বাহিরের রাস্তা লোকে লোকারণ্য—ট্রাম পর্য্যন্ত বন্ধ। সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই গীত-সুধা পান করিতেছে। জানালার ভিতর দিয়া মধ্যে মধ্যে স্বর্ণ-মুক্তা-জরি-খচিত বেশে সজ্জিত বাইজীর দোলায়মান দেহ-যষ্টিখানি নয়ন পথে পড়িতেছে।

(৮)

বীণানিন্দিত কণ্ঠে রাণী গাহিতেছে—

এ সখী, আমার দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর　　মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝঞ্চা ঘন গর-　　জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন　　কাম দারুণ
সঘনে খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত　　পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী　　ডাহুক ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি　　ঘোর যামিনী
থির বিজুরী পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ　　কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

ঘরে প্রবেশ করিয়া পর্য্যন্ত রাণী যেন কি একটা অস্পষ্ট স্মৃতির আবেগে—অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল। গান তেমন জমাইতে পারিল না—রাণীরও আজ তাল মান কাটিয়া গেল। এদিকে মনের জ্বালা নিবাইতে মহিমচন্দ্র প্রচুর পরিমাণে কারণবারি সেবন করিতে লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য শ্রোতাগণের সহিত চীৎকার করিতে লাগিলেন, "বাহবা বাইজান্ বহুৎ আচ্ছা।"

(৯)

মহিমের অবস্থা দেখিয়া বন্ধু বান্ধবগণ গান থামাইয়া রাণীর সঙ্গে তাহাকে একখানি মোটরে করিয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে পাঠাইল। বাহিরের উন্মুক্ত হাওয়ায় আসিয়া নেশার ঘোরে অচৈতন্য ভাব তাহার কতকটা কাটিয়া গেল। সে আস্তে আস্তে রাণীর কোলে ঘুমাইয়া পড়িল, তন্দ্রাবেশে বলিতে লাগিল—"সুচি, সুচি—মা সুশীলা, সুশীরে"। রাণীর বাল্যকালের কথা সব মনে পড়িয়া গেল—তাহার নামও তো সুশীলা ছিল, তাহার মাকে বাবা সুচি বলিয়াই ডাকিতেন—রাণীর সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তখন আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে—তারাগুলি ফুলের মত নৈশ গগনে ফুটিয়া উঠিয়াছে—দেহ মনের এত দিনের সঞ্চিত পবিত্রতা লইয়া আকাশের পানে চাহিয়া রাণী বলিয়া উঠিল—"অন্তর্য্যামী, অনেক কষ্ট পেয়েছি, আর আমায় বঞ্চিত করোনা, আজ আমার অন্তরের আশঙ্কাই যেন সত্যি হয়।"

অর্থ বিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অর্থ বিনিময় ও ঋণদান

ধার পত্র

ধারে পণ্য সামগ্রীর বিনিময় অতি প্রাচীন নিয়ম। সকল সভ্য দেশ ও সমাজে এই প্রথা প্রচলিত আছে। ভোক্তাগণও সময়ে সময়ে পরিচিত দোকান হইতে ব্যবহার্য্য সামগ্রী ধারে আনিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক অভাব পূরণ করেন এবং হাতে টাকা আসিলেই সেই দেনা পরিশোধ করিয়া থাকেন। ফেরিওয়ালা ও ছোট ছোট দোকানদারগণও ধারে মাল আনিয়া ব্যবসায় পরিচালন করেন, এবং বিক্রীত অর্থ হইতে সেই দায় আদায় করিয়া থাকেন। এইরূপে সমাজে একটা ধারের প্রবাহ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা যে ধারের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহার দায় সাক্ষাৎ ভাবে পরিশোধযোগ্য হইলেও তাহা আদায়ের কতগুলি আর্থিক অন্তরায় আছে। কোন নিকট প্রতিবাসীর দোকান হইতে ধারে মাল ক্রয় করিয়া আনিলে সেই দায় আদায় করিতে কোন ব্যয়-ভার-বহন করিতে হয় না। মফঃস্বলের কোন দোকানদার কলিকাতা হইতে ধারে মাল ক্রয় করিয়া আনিলে, তাহার পক্ষে সেরূপ সুবিধা থাকে না। কিছু ব্যয় স্বীকার না করিয়া তিনি তাহার দেনা পরিশোধ করিতে পারেন না। আর কলিকাতার মহাজনকে তাগেদা করিয়া টাকা আদায় করিতে হইলে, অসুবিধার সীমা থাকে না। মনিঅর্ডার বা রেজিষ্টরী যোগে টাকা প্রেরণ ব্যয়সাধ্য। লোক পাঠাইয়া টাকা আদায় করা আরও ব্যয়সাধ্য। এই সকল ব্যয়-বাহুল্য ও অসুবিধা নিবারণ জন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে হুণ্ডী কাটার প্রথা প্রচলিত আছে। মফঃস্বলের কাহাকেও কলিকাতায় টাকা প্রেরণ করিতে হইলে, মফঃস্বলের কোন নিকট কেন্দ্রে কলিকাতার কোন ব্যাঙ্কের কোন শাখা কিম্বা মূল আড়ত থাকিলে, তাহাতে একটা সামান্য বাট্টা দিয়া টাকা জমা দিলে, কলিকাতাস্থ আফিস হইতে টাকা দেওয়ার বরাত দেওয়া হয়। এই বরাত চিঠি আমানত-কারীর মহাজন নিকট প্রেরণ করিলে, তিনি কলিকাতার বরাতী আফিস হইতে অনায়াসে টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। এই ভাবে টাকা আদায় হওয়া মাত্র সকলের দায়িত্ব চলিয়া যায়। এই সকল বরাত চিঠিকে প্রচলিত ভাষায় হুণ্ডী কহে। টাকা আদায়ের সুবিধার জন্য নগদ আমানতী টাকার উপর এই সকল হুণ্ডীর প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যবসায়ী না হইয়া আমানতের উপরে এক ব্যাঙ্ক অপর ব্যাঙ্ককে টাকা দেওয়ার বরাত দিলে তাহাকে ড্রাফ্‌ট্ বলা হয়। টাকা প্রেরণের সুবিধার জন্য আদায়ের সময়ে এই সকল হুণ্ডীর সৃষ্টি হয়। ইহারা মণিঅর্ডারেরই অনুরূপ। প্রভেদ এই যে, হুণ্ডীর সহিত রাষ্ট্র-শক্তির কোন সাক্ষাৎ হাত নাই। মণিঅর্ডার অপেক্ষা হুণ্ডীর যোগে টাকা প্রেরণ কম ব্যয়সাধ্য। মফঃস্বলে নোট সর্ব্বত্র সুলভ নহে বলিয়া এই কৌশলই অবলম্বিত হয়। এই হুণ্ডীকেও ড্রাফ্‌ট্ কহে।

বাণিজ্যক্ষেত্রে ধারে বিনিময় সময়ে আর এক শ্রেণীর দলিলের সৃষ্টি হয়। তাহাদিগকেও প্রচলিত ভাষায় হুণ্ডী (Draft) বলা হইয়া থাকে। ধারের টাকা পরিশোধ সময়ে যে বরাত চিঠির অভ্যুদয় হয়, তাহা হইতে ইহাকে পৃথক করিয়া বুঝাইতে হইলে, ইহাদের পৃথক নাম থাকা আবশ্যক। ইহাদিগকে ইংরেজীতে বিল-অব-একশ্চেঞ্জ ও প্রমিসারী নোট কহে। আমরাও এই দুই নামেই অভি-হিত করিব; তবে সংক্ষিপ্ততার জন্য বিল মাত্র বলিব। বিল বলিলে ইহাদিগকে বুঝাইবে।

বিনিময় বিল বা বিল-অব-এক্‌শ্চেঞ্জ

কোন পণ্য সামগ্রী ধারে বিক্রয় হইলে, সেই বিক্রীত পণ্যের উপরে বিক্রেতার স্বত্বাধিকার বিলোপ হইলেও তাহার মূল্য দাবী করিয়া লওয়ার অধিকার থাকিয়া যায়। এই অধিকারও হস্তান্তরযোগ্য। বিক্রেতা ইচ্ছা করিলেই তাঁহার সেই অধিকার অন্যের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন। বিক্রেতা তাঁহার সেই অধিকারের বলে, ধারে বিক্রীত সামগ্রীর মূল্যের জন্য বিল-অব-এক্‌শ্চেঞ্জ বা বিনিময়-বিল * লিখিয়া তাহা অপর কাহাকেও দেওয়ার জন্য ক্রেতার প্রতি আদেশ করিতে পারেন। ক্রেতা ইহার

* A Bill of Exchange according to the Bills of Exchange Act, 1882 (45 and 46 vict., chap. 61) "is an unconditional order in writing, addressed by one person to another, signed by the person giving it, requiring the person to whom it is addressed to pay on demand or at a fixed or determinable future time a sum certain in money to or to the order of a specified person or bearer." এদেশের প্রচলিত Negotiable Instrument Actএ (Act XXVI of 1881) চেক, বিল-অব-এক্‌শ্চেঞ্জ এবং প্রমিসারি নোট সম্বন্ধে বিধি-নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। উহা ইংলণ্ডের প্রচলিত আইনেরই অনুরূপ, মাত্র এদেশে মোদ্দতি চেক লিখার কোন ব্যবস্থা নাই। ব্যাঙ্ক ভিন্ন অপর কাহারও উপরে চেক দ্বারা টাকা দেওয়ার আদেশ দেওয়া যায় না। হুণ্ডী বা Draft দ্বারা যে কোন ব্যক্তি অপর যে কোন ব্যক্তিকে টাকা দেওয়ার আদেশ করিতে পারেন। হুণ্ডী ও বিল-অব-এক্‌শ্চেঞ্জ একই ভাবে লিখিত ও সম্পাদিত হয়। তবে বিনিময়-বিল পণ্য সামগ্রীর মূল্যের উপরে লিখিত হয় বলিয়া আমরা আলোচনার সুবিধা ও তাহাদের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রমধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন জন্য পৃথক করিয়া দেখাইয়াছি। রাষ্ট্র বিধিতে উহাদিগকে পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হয় নাই। ব্যবসায় ক্ষেত্রে উভয়কেই ড্রাফ্‌ট বলা হয়। পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে ড্রাফ্‌ট বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহাকে এই বিল হইতে পৃথক করিবার জন্য Bank's Draft বা ব্যাঙ্কের ড্রাফ্‌ট বলা হয়। এ সকলই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার আদেশ পত্র।

দেশী ও বিদেশী ভেদে বিলসমূহ দুই শ্রেণীর। দেশী বিলসমূহ ইংরেজীতে নিম্নলিখিত আদর্শ মত লিখিত ও সম্পাদিত হয়। যথা:—

> No. 1. £200. Hare Street, Cal. 18th August 1920.
> Three months after date, pay to our order Two Hundred Pounds, value received.
> Merchant & Co.
>
> To Mr. Albert Pupil
> 30, New Street, Bombay.

আর আমাদের দেশীয় ব্যবসায়িগণ ইহাই নিম্নলিখিত আদর্শে লিখিয়া সম্পাদন করেন। যথা:—

> ভৈরব
>
> মং ২০০৲ টাকা। মল্লিক এণ্ড কোং সমীপেষু ১৩২৭ বাং ২০ শ্রাবণ
> অদ্য হইতে দুই মাস মধ্যে শ্রীযুক্ত পশীমোহন পালকে প্রাপ্ত দুই শত টাকা দিবেন। ইতি
> শ্রীযদুনাথ মল্লিক।

বিল-সম্পাদক তাঁহার নিজের ইচ্ছা ও সুবিধামত কাহাকে, কোথায় এবং কোন্ সময়ে টাকা দিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন। (১) সময়ের নির্দ্দেশ করিতে হইলে উহা উপস্থিত করা মাত্র, কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে, অথবা উপস্থিত করার পর কোন সময়ে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। (২) তাঁহার নিজকে, কিম্বা অপর কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে, কিম্বা তাঁহার আদিষ্ট ব্যক্তিকে, অথবা যিনি উহা লইয়া উপস্থিত হন, তাঁহাকে দেওয়ার আদেশ দিতে পারেন। (৩) কোথায় টাকা দিতে হইবে, যথা কলিকাতায় কিম্বা বুম্বাইয়ের কোন্ ব্যাঙ্কে দিতে হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া আদেশ করিতে পারেন। লেখকের ইচ্ছামত এই সকল আদেশ ও নির্দ্দেশ নির্ভর করে।

এই সকল বিলে পাঁচটী জিনিষ পরিষ্কার রূপে সন্নিবিষ্ট থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বিল সম্পাদনের তারিখ। দলিলের উপরিভাগের দক্ষিণাংশে তারিখ লিখিতে হয়। এই তারিখ হইতেই সাধারণতঃ দেয় সময় গণনা করিয়া লইতে হয়। উপস্থিত করার পর সময় গণনার নির্দ্দেশ থাকিলে, সেই তারিখ হইতেই হিসাব করিতে হয়। তারিখ না দিলে বিল পণ্ড হয় না। যখন যাহার হাতে বিল যায়, তিনিই এই অপূর্ণতা পূর্ণ করিতে পারেন। সম্পাদনের প্রকৃত কিম্বা যাহা প্রকৃত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় সেই তারিখ দিলেই হইল।

উপরে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করিয়া দায়িত্ব স্বীকার করিলেই তিনি সেই টাকার জন্ম দায়ী হইয়া পড়েন। বিলে স্বীকৃতি লিখার পর লেখকের দায়িত্ব একদা নষ্ট না হইলেও দায়িকের উপরেই তাহা সম্পূর্ণ ভাবে পর্য্যাপ্ত হয়। কিন্তু চেকে স্বীকৃতি লিখার কোন পদ্ধতি নাই। সুতরাং ব্যাঙ্ক চেকের (cheque) টাকা দিতে অস্বীকার করিলে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করা যায় না। তখন লেখকের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া কিম্বা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে দাবী আদায় করিয়া লইতে হয়। এই স্বীকৃত লিখার ইহাই বিশেষ তাৎপর্য্য। উপস্থিত মত টাকা দেওয়ার আদেশ থাকিলে তাহাকে Sight বা Demand Bill দর্শনী বিল কহে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পরে টাকা দেওয়ার আদেশ থাকিলে তাহাকে Time Bill বা মোদ্দতী বিল কহে।

প্রমিসারী নোট

কেহ অপর কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার আদিষ্ট অপর কোন ব্যক্তিকে অথবা যে কেহ উহা লইয়া উক্ত টাকা পাইবার দাবী করেন তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া দলিল লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলে তাহাকে প্রমিসারী নোট কহে *। কোন পণ্য বিক্রেতা স্বয়ং বিল না লিখিয়া ক্রেতা হইতে এইরূপ নোট লিখাইয়া লইতে পারেন। টাকা কর্জ্জ দিয়া মহাজন ও দায়িক হইতে এইরূপ নোট লিখাইয়া লইতে পারেন। ব্যাঙ্ক নোট ও ক্যারেন্সী নোট বিশেষ

দ্বিতীয়তঃ, The term বা মোদ্দত (যথা অদ্য হইতে তিন মাস পর) এই সময়কে The currency of the billও বলা হয়। এই সময় গতে উহা দেয় হয় এবং সময় মধ্যেই ইহা এক হাত হইতে অপর হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দেয় হইলেই পরিশোধিত হইয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, The amount বা পরিমাণ। ইহাকে বিলের contentsও বলা হয়। টাকার পরিমাণ পরিষ্কার ভাবে বিলের উপরিভাগের বাম পার্শ্বে অঙ্ক দ্বারা লিখিয়া গর্ভে অক্ষর দ্বারাও লিখিতে হয়। দেশী বিলে দেশের প্রচলিত মুদ্রা দ্বারাই পরিমাণ নির্দ্দেশ থাকে। বিলের দেনা টাকা ভিন্ন অন্য কোন ভাবে দেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

চতুর্থতঃ, The parties বা পক্ষ। প্রত্যেক বিলে তিনটী করিয়া পক্ষ থাকে। (১) যিনি বিল লিখিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহাকে Drawer বা লেখক কি স্বাক্ষরকারী বলা যায়। তিনিই মহাজন সংজ্ঞক। (২) যাঁহাকে টাকা দেওয়ার জন্ম লেখা হয় তাঁহাকে পেঈ (payee) বা প্রাপক বলা হয়। বিলে তাঁহার পরিচয় দেওয়া থাকা চাই। (৩) যাঁহার উপরে টাকা দেওয়ার আদেশ বা বরাত দেওয়া যায় তাঁহাকে ড্রূঈ (Drawee) বা দায়িক [প্রাদেশিক ভাষায় দায়িক শব্দ ব্যবহৃত আছে বলিয়া দায়ক না লিখিয়া দায়িক লেখা গেল।] বলা হইয়া থাকে। লেখক নিজকে টাকা দেওয়ার আদেশ করিলে লেখক ও প্রাপক এক হইয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, দেশের প্রচলিত নিয়ম বা রাষ্ট্রবিধি অনুসারে যে ষ্ট্যাম্প মাশুল ধার্য্য আছে, তাহা দিতে হয়।

দায়িকের সম্মতি ও স্বীকৃতি লিখার জন্ম বিল উপস্থিত করিলে, তিনি ইহার উপরে পাশাপাশি ভাবে আপনার নাম স্বাক্ষর করিয়া স্বীকৃতি লিখিয়া দেন। প্রচলিত ভাষায় উহাকে "সাকরা" করা বলে। দায়িত্ব স্বীকার জন্ম দায়িকের নিকট উপস্থিত করার সময়, স্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা বিধি ও প্রথা নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। দায়িক টাকা দেওয়ার স্থান ও সময় নির্দ্দেশ করিয়া স্বীকার লিখিতে পারেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সর্ত্তও লিপি করিয়া স্বাক্ষর করার নিয়ম আছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণের স্থল এ নহে। আমাদের এই দলিলের পরিচয় দেওয়াই বিশেষ উদ্দেশ্য। স্বীকার না করাকে অগ্রাহ্য বলে।

* A promissory note has been defined in Indian Negotiable Instruments Act (Act XXVI of 1881) as being "an instrument in writing (not being a bank-note or Currency note) containing an unconditional undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money only to or to the order of, a certain person or to the bearer of the instrument."

প্রমিসারী নোটসমূহ নিম্নলিখিত আদর্শে লিখিত হয়।

Rs. 100. Calcutta, 10th August 1910,

One month after date, I promise to pay Albert Pupil or order, the sum of one hundred rupees, value received.

বিধি অনুসারে প্রবর্ত্তনযোগ্য। সে কথা পরে হইবে। এই সকল প্রমিসারী নোটে ষ্ট্যাম্প মাশুল দিতে হয়। বিল কিম্বা প্রমিসারী নোটে কোন সর্ত্ত থাকিতে পারে না, তবে আদায়ী সময়ের নির্দ্দেশ ও সুদের দেওয়ার সর্ত্তকে নিষিদ্ধ সর্ত্তসংজ্ঞক বলিয়া গণ্য করা হয় না। মুদ্রা ভিন্ন অপর কোন বস্তু দ্বারা প্রাপ্য দাবী আদায়ের সর্ত্ত থাকিলে, উহাকে বিল বা নোট বলিয়া গণ্য করা হয় না। সুদ সহ বা বিনা সুদে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দেওয়ায় অঙ্গীকার থাকিলেই কেবল উহা বিল বা নোট বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহার সহিত আমাদের প্রচলিত হুণ্ডীর সাদৃশ্য অতি ঘনিষ্ঠ। তথাপি হুণ্ডীগুলি অতি সঙ্কীর্ণার্থে টাকা দেওয়ার বরাত চিঠিরূপে ব্যবহৃত হয়। পণ্য দ্রব্যের মূল্যের উপরে হুণ্ডী লেখা না যায়, তাহা নহে, কিন্তু এরূপ প্রথা অতি বিরল। মাত্র আমানতী টাকার বা প্রাপ্য টাকায় উপরে হুণ্ডীর প্রতিষ্ঠা সাধারণ নিয়ম। আর নগদ টাকা কর্জ্জ লইয়া নোট লিখিয়া দিলে, তাহাকে হ্যাণ্ডনোট (hand note) বলা হয়। প্রমিসারী নোট সাধারণ নাম।

বিদেশী বিল-অব-এক্‌শ্চেঞ্জ

এই আলোচনায় এক জাতীয় মুদ্রা প্রচলিত সীমার স্থানকে দেশ এবং তাহার বাহিরের স্থানকে বিদেশ বলা হইবে। রাষ্ট্রবিধি অনুসারে এক জাতীয় মুদ্রা একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতরে থাকে; তাহার বাহিরে উহাদের ব্যবহার হয় না। আর এক জাতীয় মুদ্রা প্রচলন সীমার ভিতরে যে সকল বিলের সৃষ্ট হইয়া, ঐ মুদ্রার যোগে পরিশোধিত হয় ও হওয়ার অভিপ্রায় থাকে, তাহাদিগকে দেশী বিল বলা হয়। এই সকল বিলের লেখক, প্রাপক ও দায়ক তিন জনই এই সীমার মধ্যগত লোক, সুতরাং তাহাদের দেনা পাওনা দেশের প্রচলিত মুদ্রায়ই পরিশোধিত হয়। কলিকাতার কোন মহাজন তাহার মান্দ্রাজ দায়ককে মান্দ্রাজের অপর কোন মহাজনকে টাকা দেওয়ার বরাত দিলে, তিনি এ দেশের প্রচলিত টাকাই দাবী আদায় করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের কোন দায়ককে তাহার দেশের অপর কোন ব্যক্তিকে হাজার টাকার বরাত দিলেও তিনি এই টাকা পরিমাণ মূল্যের গিণী মুদ্রায় দায় আদায় করিবেন ও করিতে বাধ্য হইবেন; কেন না, এ দেশের মুদ্রা তথায় প্রচলিত না থাকায় প্রাপক তাহা লইতে বাধ্য নহেন ও লইবেন না। যে দেশে যে বিলের টাকা দেয়, সেই দেশের নামে উহা পরিচিত ও মুদ্রার দেয়। সুতরাং বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় সমতা নির্দ্ধারণ করার প্রয়োজন নিত্য উপস্থিত হয়। তাই মুদ্রা প্রচলন সীমা ধরিয়া বিলসমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী আলোচনায় এ কথা আরও সুস্পষ্ট হইবে।

বিদেশী বিলের লিখন পদ্ধতিও কিছু স্বতন্ত্র। উহা দেশী বিলের ন্যায় একখানা করিয়া লিখিত না হইয়া দুই বা তিনখানা এক সময়ে লিখিত ও সম্পাদিত হইয়া এক প্রস্থ বা সেট (set) রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাহার কারণ এই যে, দূরদেশে একখানা পৌঁছিতে গৌণ বা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; একখানা প্রেরণের পরই আর একখানা প্রেরণ করিলে, সে সম্ভাবনা বিদূরিত হয়। তিন খানা লিখিত হইলে প্রত্যেক খানায় অপর দুইখানার উল্লেখ থাকে। * আদর্শে প্রথমখানায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়

* নিম্নলিখিত আদর্শে বিদেশী বিল লিখা হয়।

(Via of Foreign Bill)
[Via means any one of a set of Bills]

No. 6. Exchange for Rs. 1000—12 annas, London, 20th August, 1920.

Sixty days after sight, pay this first of exchange (second and third of the same tenor and date, not paid) to the order of Henry Clay, the sum of one thousand rupees and annas twelve, value received and charge the same in my account.

To John Smith, John Claton.
13, Dalhausi St. Calcutta.

খানার উল্লেখ আছে। তেমন দ্বিতীয়খানায় প্রথম ও তৃতীয় খানার, এবং তৃতীয়খানায় প্রথম ও দ্বিতীয় খানার উল্লেখ থাকে। এ সকলই কার্য্যের সুবিধা ও সাবধানতার জন্য ব্যবহৃত হয়। একখানার জন্যই টাকা দিতে হয়। প্রথমখানার উপরে টাকা দিলেই অপর দুইখানা বাতিল হইয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন আরও এক শ্রেণীর বিল-অব-এক্‌শ্চেঞ্জ আছে। তাহাদিগকে Documentary Bill বা দলিলী বিল কহে। এই সকল বিল সহ বিল-অব-ল্যাডিং, প্যালিসি অব্ ইনসিয়রেন্স বা বীমা প্যালিসি, জামানতী দলিল প্রভৃতি একত্র গ্রথিত থাকে। টাকা আদায়ের সাপক্ষে বিক্রেতা এই সকল দলিল আবদ্ধ রাখেন। * এই সকল বিলে পণ্য দ্রব্যের উল্লেখ থাকে। যে সকল বিলে ঐরূপ দলিল আবদ্ধ রাখা হয় না, উহাকে Clean Bill বলা হয়।

আর এক শ্রেণীর বিল আছে, তাহাদিগকে Accommodation Bill বলা হয়। ইহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া "kites" বা "windmills" ও বলা হয়। এই বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহারের কারণ এই যে, এই সকল দলিল প্রকৃত কোন পণ্য মূল্যের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। কাহারও সাময়িক টাকার অভাব হইলে, তিনি তাঁহার কোন আত্মীয় বা সম্ভ্রান্ত বন্ধুর যোগে একখানা বিল সৃষ্টি করিয়া তাহার বিনিময়ে টাকা সংগ্রহ করেন এবং উহার আদায়ী-মোদ্দতের পূর্ব্বে টাকা সংগ্রহ করিয়া দেনা আদায় করিয়া দেন। এইরূপ সাময়িক অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির সুবিধা করিবার জন্যই তাহার আত্মীয়ও এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই ব্যক্তি টাকা তুলিয়া যথা সময়ে উহা আদায় না করিলে আত্মীয় স্বয়ং টাকা আদায় করিয়া আপনার নিজ সম্ভ্রম রক্ষা করেন এবং পরে তাহা ঐ ব্যক্তি হইতে আদায় করিয়া লন।

এই সকল বিলের আদেশ মত আদিষ্ট ব্যক্তি টাকা দিতে অস্বীকার করিলে অথবা যে সময়ে টাকা দিতে হইবে সেই সময় মধ্যে টাকা দেওয়ার "স্বীকৃতি"-সূচক অঙ্গীকার করিয়াও টাকা না দিলে, বিল অগ্রাহ্য বা dishonour করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হয়।

এই সকল বিলের স্বত্বাস্বত্ব এবং দাবীদাওয়া সম্বন্ধে জটিল রাষ্ট্র বিধি আছে। তাহার বিস্তৃত আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সে সম্বন্ধে স্থানে স্থানে সামান্য কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি মাত্র। ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে এবং ব্যাঙ্কের মধ্যবর্ত্তিতায় এই সকল বিলের সাহায্যে কি করিয়া দেনা-পাওনা পরিশোধিত হয়, তাহাই আমাদের বিশেষ আলোচ্য। বঙ্গীয় পাঠকদিগের মধ্যে অনেকের এই সকল বিল সম্বন্ধে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকায়, আমরা তাঁহাদের একটা মোটামুটি পরিচয় মাত্র প্রদান করিলাম। বিশেষ আলোচ্য বিষয়ের আলোচনা পর অধ্যায়ে হইবে।

(ক্রমশঃ)

* নিম্নে তাহার আদর্শ দেওয়া গেল।

£500. London 22 July 1919.

Ninety days after sight, pay this first of exchange (second and third unpaid) to our order, the sum of Five Hundred Pounds sterling, value received against.

100/5 = 6 bales of Grey Dhooties, per S. S. "City of Athens." Shipping documents attached to be surrendered on payment.

Jones & Co.

To Messrs Bruce & Sykes
Calcutta.

Endrosement—Pay the National Bank of India, Ld. & order.

Jones & Co.

ভাববার কথা

(ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

ডাঃ শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র বসুর সম্পাদিত স্বাস্থ্য সমাচারে শ্রীযুত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধ্বংসোন্মুখ বাঙ্গালী হিন্দুর কথা লইয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে তিনি সরকারী তালিকা হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালার উচ্চ বর্ণীয় হিন্দুর সংখ্যা গত ৫০ বৎসর হইতে ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে। এবং নিম্ন জাতীয়দের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এ ব্যাপার লইয়া কিছু দিন পূর্ব্বে কর্ণেল ইউ, এন, মুখুজ্জ্যে আলোচনা করিয়া দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, কিন্তু অনেকে সরকারি তালিকা বিশ্বাসযোগ্য নহে বলিয়া তাঁহার অভিযোগ ভাবিবার যোগ্য নয় বলিয়া উড়াইয়া দেন। একটা অপ্রিয় সত্যকে ভয়বশতঃ আমলে না আনা মানুষের স্বভাব-দুর্ব্বলতা এই যে অপ্রিয় সংবাদটী ইহার বিশ্বাসের প্রধান অবলম্বন সরকারী তালিকা ছাড়া আর কিছু নাই। তালিকার অঙ্ক কড়া ক্রান্তি ধরিয়া নিখুঁৎ সত্য না হইতে পারে, কিন্তু মোটামুটি যে ঠিক তাহা অবিশ্বাস করার হেতু নাই। তা ছাড়া আজ ৫০ বৎসর ধরিয়া প্রতি জেলার লোকগণনার অঙ্ক যে ধারাবাহিক ভাবে ভুল হইয়া আসিবে তাহার সঙ্গত কারণ দেখি না। ১৮৭২ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত প্রতি দশ বৎসর অন্তর লোকগণনার অঙ্ক আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম বৃদ্ধির অনুপাত কমিয়া শেষ দিকে বৃদ্ধি অপেক্ষা হ্রাসের অঙ্ক বাড়িয়া চলিয়াছে। তালিকার এই অঙ্কপাত অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না, বস্তুতঃ ইহাতে ভাবিবার বিষয় আছে।

যাহা হউক, কামখ্যাবাবুর বক্তব্য কি শুনা যাউক। তিনি বলেন, জাতির মৃত্যু বলিতে তিনটী কথা স্বতঃই মনে হয়:—

প্রথম।—যদি জাতির মধ্যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেশী হইতে থাকে তবে বুঝিতে হইবে জাতি অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংসোন্মুখ—

দ্বিতীয়।—যদি জাতির মধ্যে জ্ঞানী, গুণী, ধীমান, প্রতিভাশালী লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হয়, তবে বুঝিতে হইবে জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর—

তৃতীয়।—যদি কোনো জাতির মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক অনুপাত অন্যান্য সভ্য জাতির অনুপাত অপেক্ষা কম হইতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে জাতি ধ্বংসের পথে ধাবমান—

কামাখ্যাবাবু বলেন যে, বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে উক্ত তিনটী কারণই ক্রিয়াশীল। সুতরাং উচ্চ বর্ণীয় বাঙ্গালী হিন্দুর তিরোভাব অদূর ভবিষ্যতে অবশ্যম্ভাবী। বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯১৮ সালের জন্মসংখ্যা ১,৬১৭,১৭৩, এবং মৃত্যুসংখ্যা ১,৭২৭,৩২১। প্রত্যেক দশ বাৎসরিক লোকগণনায় দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য সংখ্যা বিশেষ ভাবে কমিতেছে। ১৮৭১ হইতে ১৮৮১ সন পর্য্যন্ত বৃদ্ধির হার শতকরা ১১ জন, কিন্তু পরবর্ত্তী ২০ বছরে অর্থাৎ ১৮৮১ হইতে ১৯০১ সনের মধ্যে বৃদ্ধির হার শতকরা দুই জন! পরবর্ত্তী ১০ বছরে বৃদ্ধি বন্ধ হয়; এক্ষণে বৃদ্ধি অপেক্ষা হ্রাসই বেশী হইয়া চলিয়াছে।

১৮৭২ হইতে ১৮৮১ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি ছিল শতকরা ৩ জন; পরবর্ত্তী লোকগণনায় দাঁড়াইল শতকরা ১ জন। তার পর হইতে হ্রাসের সংখ্যা শতকরা ৮ জন!

আরও কথা, কামার, কুমার, তাঁতি, ছুতার প্রভৃতি শ্রমজীবীদের সংখ্যাও কমিতেছে। কেবল বাড়িতেছে বাগ্দী, চাঁড়াল প্রভৃতি নমঃশূদ্রের সংখ্যা। ১৮৭২ সাল হইতে এখন পর্য্যন্ত উহাদের বৃদ্ধিই চলিয়াছে।

পক্ষান্তরে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যায় যে,উচ্চবর্ণীয় বাঙ্গালী হিন্দুর সংখ্যা গত ৩০ বৎসর হইতে প্রতি জেলাতে কিরূপ মাত্রায় কমিতেছে।

কামাখ্যাবাবু সভয়ে নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, বাঙ্গালার উচ্চবর্ণীয় হিন্দু যদি এই অনুপাতে কমিতে থাকে, তবে আগামী ২০০ বৎসরের মধ্যেই উহাদের লয় একরূপ সুনিশ্চিত। ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু শতকরা ৩ জন! বিদেশের কথা দূরে যাক্, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের জন্ম মৃত্যুহার এরূপ হতাশজনক নয়! কয়েক বৎসর আগে মৃত্যুহার ছিল হাজার-করা ৪০ এবং জন্মহার হাজার-করা ৪৫, মাত্র হাজার-করা ৫ জন বৃদ্ধি! বর্ত্তমানে তাও অদৃশ্য; উপরন্তু মৃত্যুহার হাজার-করা জন্মহার অপেক্ষা দুই জন বেশী!

কামাখ্যাবাবুর ভয় যে অহেতুক নয়, তাহা ভাবিবার অনেক কারণ আছে। বাঙ্গালীর উচ্চবর্ণীয়েরা যে ক্রমশঃ কমিতেছে তাহার প্রমাণ জন্য সরকারী তালিকার সাহায্য দরকার কি? নিজেরা চোখে তো দেখিতেছি। আমাদের আয়ু ও জীবনীশক্তি যে ক্রমশঃ ভাটাইয়া চলিয়াছে তাহা চোখের উপর দেখিতেছি। নিজেদের, পিতাদের ও পিতামহদের সমসাময়িক লোকদের আয়ু ও জীবনীশক্তি তুলনা করিলে স্পষ্টই এ তত্ত্ব চোখে পড়ে।

বিদেশী সভ্যতার উৎপীড়নে ও বিদেশী শাসনের চাপে আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি দিন দিন প্রতিকূল হইয়া পড়িতেছে; জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার মত শক্তি ও চেষ্টা আমাদের হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। এবং আমাদের হইয়া এই শক্তি ও চেষ্টা আর কাহারও যে হইতেছে বা হইবে তাহা দেখি না।

এই অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের মূলে যে সব কারণ ক্রিয়াশীল তাহার মধ্যে প্রধান এই কয়টী :—

প্রথম :—চাকরীর দায়ে স্বাস্থ্যকর পল্লী ছাড়িয়া কদর্য্য সহরতলীতে অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস; এবং মাত্রাতিরিক্ত মানসিক ও কায়িক পরিশ্রম।

দ্বিতীয় :—উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, খাদ্যের ভেজাল এবং খাদ্য হজম করিবার মত শক্তির অভাব।

তৃতীয় :—শৈশবে প্রচুর পরিমাণ স্তন্যদুগ্ধের ও গো-দুগ্ধের অভাব।

চতুর্থ :—রোগের বিস্তার, ও রোগ প্রতিষেধের শক্তির ও উপায়ের অভাব।

পঞ্চম :—অক্ষম অপারগ অবস্থায় ও অকালে বিবাহ করিয়া বংশ বিস্তার করা ও পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণ করিতে না পারা।

ষষ্ঠ :—স্ত্রীলোকের বাল্য-মাতৃত্ব ও শারীর স্বাস্থ্যের অভাব।

দেশের জলবাতাস খারাপ হইয়াছে বলিয়া যদি কারণ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা খাটে না, কেন না যদি উহাই একমাত্র অনিবার্য্য কারণ হয় তবে ইতর শ্রেণীর নমঃশূদ্রেরাও উহার প্রকোপে পড়িয়া ধ্বংস হইত। তাহা হইতেছে না, শুধু উচ্চবর্ণীয়েরাই এই শাপে ধ্বংসপ্রায়। পুষ্টিকর প্রচুর খাদ্য খাইয়া হজম করিতে পারিলে ও সাধ্যমত প্রকৃতি শক্তির অনুকূলে থাকিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিলে দুষ্ট জল বাতাস বড় কিছু করিতে পারে না; নমঃশূদ্রেরা প্রকৃতি-পন্থী; খোলা হাওয়া বাতাসে থাকিয়া কায়িক পরিশ্রম করিয়া মাছ, ভাত, গেঁড়িশামুক খাইয়া হজম করিয়া টিকিয়া থাকিতেছে, ভেজাল খাদ্যের উৎপাত তাহাদের মধ্যে বড় নাই। কাজেই তাহারা জীবনযুদ্ধে জয়ী। উচ্চবর্ণীয়েরা বিলাসের লালসায় মুগ্ধ হইয়া বেশী রোজগারের আশায় অস্বাস্থ্যকর সহরতলীতে বাধ্য হইয়া দেহ মন রুদ্ধ করিয়া শক্তির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেছে আর অপ্রচুর রোজগারের পয়সায় দুর্ম্মূল্য খাদ্যদ্রব্য কিনিতে না পারিয়া আহার অভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। ঘন বসতিপূর্ণ রুদ্ধ নোংরা সহরতলীতে রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার খুবই দ্রুত, কাজেই অপুষ্ট দুর্ব্বল দেহ শীঘ্রই রোগাক্রান্ত হয়; হইলে অর্থাভাবে ও ব্যবস্থা দোষে সুচিকিৎসা হয় না। ইহাতে লোকক্ষয় হইবে না তো হইবে কিসে?

তার পর পুরুষেরা যদিও একটু ফাঁকা বাতাসের মুখ দেখে ও চলাফেরা করিতে পায়, নিষ্ঠুর দেশাচারের কোপে আমাদের নারীদের দুর্দ্দশা আরো শোচনীয়! ১২।১৩।১৪ বছর হইতে অপক্ক গর্ভে সন্তান উৎপাদন আরম্ভ করিয়া,

গুরুজনদের এঁটো পাতের ভগ্নাংশে উদর পূর্ণ করিয়া আর রুদ্ধ গবাক্ষ ও বদ্ধ দেওয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যে কারাবাস ভোগ করিয়া হিষ্টিরিয়া, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া প্রভৃতি রোগে জন্ম-অক্ষম হইয়া প্রাণপাত না করা পর্য্যন্ত গৃহধর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে! এরূপ দুর্ব্বলদেহা রুগ্নাজননী-গর্ভজাত সন্তানেরা অল্পায়ু হইবে তার আর বৈচিত্র্য কোথা?

অপেক্ষাকৃত বেশী রোযগারী শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও যে অল্পায়ু হইয়া যাইতেছেন তাহার কারণ শারীর ব্যায়ামের অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রম তাঁহাদের অতিমাত্রায় বেশী, অথচ মস্তিষ্কের ক্ষয় অপচয় নিবারণের উপযোগী Proteid খাদ্য তাঁহাদের মধ্যে প্রচলন নাই। যে পরিমাণ উক্ত খাদ্য দৈহিক অপচয় নিবারণ করিতে পারে তাহা হয় ধর্ম্মবোধে বা অরুচিবশতঃ বা যোগাড়ের অভাবে ঘটিয়া উঠে না।

তা ছাড়া উচ্চবর্ণীয়দের আয়ুক্ষয়ের কারণ আরম্ভ হয় যৌবনে পঠদ্দশায়; অল্প অপুষ্ট আহার দ্বারা দেহরক্ষণ করিয়া বিদ্যালাভের চেষ্টাতেই দেহের শক্তি সামর্থ্য ব্যয় হয়, কর্ম্মজীবনের জন্য শক্তি, উৎসাহ ও উদ্যম থাকে না, এবং যাহাতে থাকে তাহার কোন ব্যবস্থা বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষেরা করেন নাই। মোট কথা—বৈদেশিক সভ্যতা ও শিক্ষা ও বৈদেশিক জীবন যাপন পন্থা ও পদ্ধতি আমাদের বাঙ্গালীর ধাতে সহিতেছে না। কেহ যদি বলেন যে অন্যান্য প্রদেশের উচ্চবর্ণ হিন্দুর মধ্যে যখন এই অনিষ্টকর প্রভাব দেখা দেয় নাই, তখন বৈদেশিক শিক্ষা, সভ্যতা ও কর্ম্ম-জীবনের ফলেই বাঙ্গালীর এই ধ্বংসপ্রাপ্তি, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়?

উত্তরে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালীর মধ্যবিত্তের মত চাকরী-গত প্রাণ কোনো জাতি নয়, আর এত মানসিক পরিশ্রম ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা আর কোনো জাতিরই নাই; অথচ এরূপ অপুষ্টিকর আহারে জীবনধারণ ভারতের আর কোনো জাতিই করে না। ভিজে স্যাঁত্‌সেঁতে দেশের বাসিন্দা ভেতো-জাতির এত মানসিক পরিশ্রম যে কুফল-প্রসূ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। বলিষ্ঠদেহ, কর্ম্মঠ, শ্রমশীল, সদাব্যস্ত পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণে আমাদের জীবনযাপন ধারা বদলাইয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু কৌলিক দেশাচার লোকাচারের শাসনে পুরাতন প্রথাগুলি ধরিয়া রাখিয়াছি এবং আহার, বিহার, বিবাহ, সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি সমস্তই সে-কেলে পুরাতন নিয়মানুযায়ী হইতেছে। যান—পুরাণো সেই মন্থরগামী গরুর গাড়ী, তাহাতে যোতা হইয়াছে বেগবান ঘোড়া। কলাইএর ডাল, পুঁইশাক ও শালি ধান্যের ভাত খাইয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া হুঁকা হাতে দাবা খেলা চলে, দলাদলি করা চলে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়া চলে, পথে পথে নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়ানো চলে বা কর্ত্তাভজামী চলে, কিন্তু ওই ভাবে সবংশে ও সগোষ্ঠিতে তৃণভুক্ থাকিয়া পাশ্চাত্য জাতিসুলভ ব্যস্ত-কর্ম্মজীবন যাপন চলে না; বর্ত্তমান জগতের চলতি সভ্যতাকেই যদি নিজেদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেই হয়, তবে তদনুযায়ী আহার বিহার ও স্বাস্থ্যরক্ষণ করিতে হইবে। মোগলের সঙ্গে মিশিয়া মোগলাই চাল ধরিলে খানা খাইতেই হইবে। নূতন ধরণের জীবন প্রণালীর জন্য নূতন নূতন অভ্যাস করিতে হইবে।

বালিকার অপক্ক গর্ভে জন্মিয়া গয়লার জলো দুধে শৈশব কাটাইয়া পরীক্ষা পাশ করিতে দেহের রক্ত ঢালিয়া দিয়া হাড় পাকিবার আগে ছেলে-মেয়ের বাপ হইয়া প্রৌঢ়ে কেরাণীগিরি করিয়া অন্তিমে গঙ্গার জলে হাড়-কয়খানা ভাসাইয়া দেওয়াই যদি জাতীয় জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে আর এ জাতির লয়প্রাপ্তি রোধিবে কে?

সেকালে দৈনন্দিন কর্ম্ম ব্যপদেশে লোকের যে দৈহিক ব্যায়ামটুকু হইত আজকাল বিলাসিতার প্রভাবে সেটুকুও গিয়াছে। নানারূপ সস্তা যানবাহন হইয়া চলাফেরা একরূপ বন্ধ। শরীর জড়ধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর দারিদ্র্যবশতঃ উপযুক্ত আহার জোটে না, যা জোটে তার বারোআনা দ্রব্যে দূষিত ভেজাল দেওয়া! রোগ ধরিলে দুর্ব্বল দেহ রোগের সহিত লড়াই করিতে পারিতেছে না।

অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের ভয়ে উপকারী নূতন ব্যবস্থা চালাইতে লোকে সর্ব্বদা অনিচ্ছুক। মন একটা পুরাতন প্রথাকে 'কু' বলিয়া বুঝিলেও নৈতিক সাহসের ভয়ে উহা বর্জ্জন করিতে পারে না। জনসাধারণের মধ্যে এই

ভয়াবহ তথ্যটা জানা নাই যে জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর ; জানা থাকিলেও ব্যক্তির ইষ্টানিষ্টের উপর জাতির ইষ্টানিষ্ট নির্ভর করে, এ কথা ভাবিবার দূরদর্শিতাও নাই ; থাকিলেও জাতির কি হইবে এ মাথাব্যথা 'ব্যক্তি'র এখনও হয় নাই।

দেশের যাঁহারা মালিক, তাঁহাদেরই এই মাথা ব্যথা হওয়া উচিত। দেশের শাসক সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ত্তব্য ও আশু করণীয় হইতেছে, এই ধ্বংসশীল জাতিকে অকালমৃত্যু হইতে বাঁচান। তবে এক কথা এই যে, জাতের মরা বাঁচার জন্য দায়ী শুধু দেশের শাসকদল নহে, দেশের লোকেও বটে এবং মনে হয় দেশের লোকেরই বেশী দায়, আর বেশী গরজ। শাসক সম্প্রদায় যদি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উদাসীন হন, আমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের একটা কর্ত্তব্য আছে, যাহার অবহেলায় মহাপাপ। আপনার উদ্ধার আপনার হাতে, পরে মাত্র সাহায্য করিতে পারে। এই জাতীয় আত্ম-রক্ষা ব্যাপারে আমাদের যতটুকু হাত আছে, তাহা কর্ত্তব্য তো বটেই। যে সব রাক্ষুসে দেশাচার লোকাচার ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া আমাদের ভয় দেখাইয়া পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের আগে বর্জ্জন করিতে হইবে। তার পর যে সব মামুলি অলস অভ্যাস আমাদের ইচ্ছা সত্ত্বেও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে, তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে।

আমরা স্বরাজ লাভ করিবার জন্য হুলস্থুল বাধাইয়াছি, কিন্তু জাতীয় অস্তিত্ব এদিকে সঙ্কটাপন্ন। জাতিকে আগে বাঁচিতে হইবে তার পর স্বরাজ লাভ। অথচ আবার স্বরাজ লাভ না হইলেও অস্তিত্ব রক্ষণ অসম্ভব। মোট কথা, যাহাকে বলে vicious circle তাই ঘটিয়াছে। এ ফাঁদ হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি ?

সমস্যাটি এত গুরুতর যে, ইহার মীমাংসায় দেশের নেতৃবৃন্দের মনোযোগ আগে পড়া উচিত। প্রথমে উত্তমরূপে ইহার নানা কারণ নির্ণয় দরকার ; পরে কোন্ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে জাতি অকালমৃত্যু হ'তে উদ্ধার লাভ করিবে তাহার বিশদ আলোচনা দরকার। ইহা লইয়া বক্তৃতায় ও ছাপায় অনবরত আলোচনা দরকার। দেশের লোককে বুঝাইতে হইবে যে, তোমরা মরণোন্মুখ, অচিরে ধ্বংস পাইবে, সময় হইতে সাবধান হও। বিদেশী শাসকদলকে বুঝাইতে হইবে "তোমরা দুর্ব্বলের অভিভাবক, তোমাদের অধীনে থাকিয়া জাতটী মরিতে যাইতেছে, সভ্য জগতে এ কলঙ্ক কালি মুখে মাখিয়া বাহির হইবে কি করিয়া—অচিরে ইহার প্রতিবিধান কর। তোমরা অর্থে সামর্থ্যে অদ্বিতীয় একটা অসহায় জাতির ভরণপোষণ ও জীবনধারণের ভার এত যে দয়া ভাবিয়া সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হইয়া আসিয়া লইয়াছ—ইহাদের এই সর্ব্বনাশের প্রতিবিধান কর—"

দেশের লোককে বলি, যে সব কদাচার লোকাচার ধর্ম্মের নামে তোমাদের শুভ হইতে সরাইয়া রাখিয়াছে তাহাদের বর্জ্জন কর ; সত্য অপ্রিয় বলিয়া সরকারী তালিকাকে ভুল প্রতিপন্ন করতঃ ঘায়ে মলম দিয়া ঢাকিয়া রাখিও না। সুশিক্ষা দানে বালিকাদের দেহ মন পরিপক্ক করিয়া তবে তাহাদের মাতৃত্বে নিয়োজিত কর ; শিশুরা যাহাতে প্রচুর খাঁটী গোদুগ্ধ পায়, ছেলেরা যাহাতে প্রচুর পুষ্টিকর খাবার খাইয়া বলবান হয়, যুবারা যাহাতে আগে শরীর রক্ষা করিয়া পরে বিদ্যালাভে দেহ মন বলি দেয় তাহাই ব্যবস্থা কর। স্বাধীন ভাবে অর্থ রোজগার করিবার আগে যেন বিবাহ করিয়া কতকগুলা অসহায় অপোগণ্ডের ভারে ভারাক্রান্ত না হয়। প্রৌঢ়েরা যেন পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া খাটিবার শক্তি সঞ্চয় করে ; পল্লীগ্রামের সহজ সরল সিধা জীবন যাপন প্রণালী অবলম্বন করিলে যদি আবার পূর্ব্বেকার জাতীয় স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে তাহারও ব্যবস্থা দরকার।

নূতন তন্ত্রের স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর দৃষ্টি কি এই ভয়াবহ তথ্যের উপর পড়িয়াছে ? তিনি কি এ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিতেছেন ? দেশবাসী তো প্রত্যেকেই আশা করে বাৎসরিক ৬০০০০ মুদ্রা বেতনের বদলে তিনি অন্ততঃ একটুও মাথার ঘাম ব্যয় করিবেন, এই চিন্তায়—যে কি করিয়া স্বজাতটাকে এই অকালমৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইতে পারিব ?

একই দেশের নমঃশূদ্রের সংখ্যা বাড়িতেছে অথচ উচ্চবর্ণীয়েরা হ্রাস পাইতেছে। রোগের মূল কোথায় ? নমঃ-

শূদ্রেরা যে দুধ, ঘি, মাছ, মাংস বেশী খাইতে পাইতেছে আর আমরা পাইতেছি না, তা তো নয়। তবে কি? আসল কথা, তাহাদের সরল খাদ্যে ভেজাল বিধির মাত্রা কম; তাহারা রোদ জল বাতাসে খাটে খোটে, এবং যা খায় —মোটা ভাত,গেঁড়ী শামুক,মাছ—তা হজম করে; তাহাদের আয়ের বেশী অংশ খাদ্যে যায়; আর আমাদের অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস; খাটুনী বেশী, খাবার কম ও খারাপ, ব্যায়াম নাই, মন দুশ্চিন্তার আকর, কাজেই হজমশক্তি নাই; যা বা খাই সখ সাধ করিয়া তার ভেজালবিষ বারো আনা! কায়িক পরিশ্রমের সময়, শক্তি ও সাধ কিছুই নাই। অথচ বংশ বিস্তার চলিয়াছে সাবেকি অনুপাতে; সন্তান সন্ততি জন্মে ইঁদুর বেড়াল ছানার মত; অর্দ্ধেক দুগ্ধাভাবে রোগে ভুগিয়া মরিয়া যায়, অর্দ্ধেক, জলোদুধ বা টকো মাইদুধ খাইয়া কোনো মতে বাঁচিয়া পিলে লিভার লইয়া কৃপায় যদি বা ছটা বছর কাটাইল, অমনি আরম্ভ হইল বিলাতী সরস্বতীর গদা প্রহার ছাব্বিশ বছর পর্য্যন্ত! তার পর দেহের রক্ত দিয়া ডিগ্রি কিনিয়া অনেকে না কিনিয়া আরম্ভ করে কেরাণীগিরি, মাষ্টারী—তার আগেই আরম্ভ হয় সংসার। ট্যাঁকে পয়সা আসিবার আগেই সংসারে আসে খোকা-খুকী!

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল বুক-ফাটা হাসির গান গেয়ে বলে গেছেন—"সব গেছে ওরে সব গেছে আছে শুধু ড্রেনের গন্ধ, জলো দুধ আর ম্যালেরিয়া।" কবি তিনটী খাঁটী লাখ্ টাকার কথায় বাঙ্গালী জাতের অকালমৃত্যুর নিদান নির্ণয় যা করে গিয়েছেন তার একচুল ভুল নেই! গুরুতর ভাববার কথা!

সময় হলে

[দরবেশ]

তোমার সনে আমার মিলন
　　এবার খালি চোখের জলে,
পরাণ-পুরের পেছন দোরে,
　　গোপন হিয়ার তলে তলে
বাহিরের এই যাওয়া আসা,
মুখের মিঠি—বচন খাসা;
এত অল্পে মিট্‌বে আশা
　　অন্তরে যার পাহাড় টলে?
লক্ষ টাকার তোড়ার আশায়,
অকূলে যে তরী ভাসায়,
বল দেখি, কোন্ ভরসায়
　　ফিরবে সে জন কিসের ছলে?
আশীষ কিম্বা হোক্ অভিশাপ,
বাড়ুক আরো দুরন্ত দাপ,
প্রণয়-দেবের প্রবল প্রতাপ
　　নিঃশেষি যাক্ জীবন দলে';
তুমি-আমি রইব জোড়া,
বিশ্বনাথের ফুলের তোড়া,
এক মিলনে মিল্‌ব মোরা
　　সময় হলে'—সময় হলে'।

পঞ্চামৃত

কোন্ পথে ?

[শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়]

আমাদের দেশে একটি আকাঙ্ক্ষা ও একটি চিন্তা অনেক দিন হইতে ছায়ার মত প্রতিভাত হইতেছিল; তাহা এখন ধীরে ধীরে কায়া পরিগ্রহ করিয়াছে। সে আকাঙ্ক্ষা—স্বরাজ। সে চিন্তা—স্বরাজলাভের উপায়। তাহা কাল্পনিক নহে, স্বাভাবিক ;—যেমন স্বাভাবিক, সেইরূপ আন্তরিক। তজ্জন্য তাহা ক্রমেই অধিকসংখ্যক লোকের চিত্তক্ষেত্রে অধিকার বিস্তার করিতেছে।

স্বরাজ কি, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু প্রচলিত শাসনব্যবস্থা যে আকাঙ্ক্ষিত স্বরাজ নহে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ অল্প। স্বরাজলাভের উপায় কি, তৎসম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কিন্তু সংসারত্যাগী বিষয়বিরাগীর উদ্বেগহীন উদাসীনতা যে উপায় নহে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং রাজনীতিক আন্দোলন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আন্তরিকতা লাভ করিয়াছে; আলোচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুখরতা প্রাপ্ত হইয়াছে; মতভেদের মূলও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

দেশকালপাত্র মানবচিন্তার ও মানবকার্য্যের প্রকৃত নিয়ামক। তাহার প্রভাব অতিক্রম করা অসম্ভব। এক সময়ে তাহার প্রভাবে লোকে আত্মতৃপ্ত ছিল। এখন আবার তাহার প্রভাবেই এক অপরিতৃপ্ত স্বরাজ-লালসা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহা এক শ্রেণীর লোককে স্বপ্ন-লোকের দিকে, আর এক শ্রেণীর লোককে বাস্তব-লোকের দিকে আকর্ষণ করিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে দলাদলি অনিবার্য্য; গালাগালি অনিবার্য্য নহে। সুতরাং ধীরভাবে আলোচনার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে।

যাঁহারা স্বপ্ন-লোক অপেক্ষা বাস্তব-লোকের অধিক অনুরাগী, তাঁহারা যুক্তি-মার্গ, শান্তি-মার্গ, অহিংসা-মার্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারাও দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কাহারও মতে স্বরাজ "আত্ম-শাসন"; কাহারও মতে তাহা কেবল "আত্ম শোধন।" উভয় মতের লোকেই দেশ-শাসনে দেশের লোকের অধিক অধিকার লাভের পক্ষপাতী ;—কেহই দেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর নহেন। সে ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, কাহারা করিবে, এবং তাহার দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া, দেশের লোকে দেশের শাসন-কার্য্যে কতদূর অধিকার লাভের দাবী করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে উভয় দলই তুল্যভাবে নীরব। ইঁহাদের স্বরাজ একটি পারিভাষিক শব্দ; তাহার অর্থ—পররাজের শাসনাধীন স্বরাজ, অথবা স্বরাজপ্রভাব-পুষ্ট পররাজ। ইংরাজ শাসন বজায় রাখিয়া, ইংরাজ সহযোগে দেশের শাসন কার্য্যে অধিক অধিকার লাভই প্রকৃত লক্ষ্য। কেহ ক্রমে ক্রমে, কেহ এখনই তাহা লাভ করিবার জন্য লালায়িত।

তাহা লাভ করিবার উপায় কি, তৎসম্বন্ধে যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও প্রকৃতপক্ষে অবস্থাভেদে ব্যবস্থা-ভেদ। তাহা কাহারও মতে "সহযোগ"; কাহারও মতে "অ-সহযোগ।" এই দুইটি বিপরীত অর্থ-দ্যোতক কথা ফলিতার্থে বিপরীত আকাঙ্ক্ষা-দ্যোতক নহে। দেশকালপাত্র অনুসারে যাহা যুক্তিযুক্তরূপে আশা করা যাইতে পারে, তাহা অধিক অধিকার। তাহা লাভ করিতে হইলে, ইংরাজ-সহযোগ আবশ্যক। কেহ প্রজার সহযোগবলে ইংরাজ সহযোগ লাভ করিবার জন্য, কেহ প্রজার অসহযোগবলে ইংরাজ সহযোগ আদায় করিবার জন্য, আন্দোলনে বদ্ধ-পরিকর। অসহযোগবাদিগণের চরম লক্ষ্য অ-সহযোগ নহে; —সহযোগ লাভের জন্য অ-সহযোগ। সুতরাং সহযোগবাদিগণ অ-পরোক্ষ ভাবে, এবং অ-সহযোগবাদিগণ পরোক্ষ ভাবে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর।

অ-পরোক্ষ ভাব দ্বিধাশূন্য; পরোক্ষভাব সেরূপ নহে। অসহযোগ বলে শাসনশক্তিকে পঙ্গু করিয়া অধিক অধিকার দানে বাধ্য করিতে হইলে, দেশের যে সকল লোকের সহযোগবলে শাসন-যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে, তাহাদিগকে বিগড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। তাহা নানাকারণে অসম্ভব। সুতরাং পঙ্গু করিবার আশা ত্যাগ করিয়া, ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবার আশায়, বিবিধ উপদ্রব সৃষ্টি আবশ্যক। কিন্তু তাহাও সহজসাধ্য বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। এই কারণে, অসহযোগের সমস্ত কার্য্যপ্রণালী এখনও সুনির্দ্দিষ্ট হইতে পারে নাই। "ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে নৈতিক অধঃপতন, প্রতারণা, অত্যাচার এবং শ্বেতাঙ্গের প্রভাব ঘোষিত হইয়া থাকে, তাহা দূর করাই অসহযোগের উদ্দেশ্য।" ইহাই এখন পর্য্যন্ত শেষ সুসংশোধিত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রচারিত হইতেছে। দূর করিবে কে,—আমরা। দূর করিব কি, ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রের নৈতিক অধঃপতন, প্রতারণা, অত্যাচার এবং শ্বেতাঙ্গ-প্রভাব। যাহাদের সহযোগে শাসনযন্ত্র চলিতেছে, তাহারা অসহযোগ করিল না; বাহিরের লোকের অসহযোগে এই কার্য্যগুলি কিরূপে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কেহ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন না। ভাবে বোধ হয়, আমরা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিলেই, হইতে পারে। এই জন্য স্বরাজ আত্ম-শাসন নহে; আত্ম-শোধন। মানুষের মত মানুষ হইতে পারিলে, সহযোগবলেও কাম্যফল লাভ করা যাইতে পারে। অসহযোগবলে তাহা লাভ করা বরং অপেক্ষাকৃত কঠিন। কিঞ্চিৎ বিদ্বেষের প্রক্ষেপ ভিন্ন অসহযোগের পুটপাক সম্যক্ বীর্য্যলাভ করিতে পারে না। মুখের কথা যাহাই হউক, প্রয়োগকালে অসহযোগের অহিংসাত্মক প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন। অল্পদিনের মধ্যে তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। শাসন-ব্যবস্থার পাপ-ক্ষালন করিতে হইলে, ঘসা-মাজার সংঘর্ষ অনিবার্য্য। তাহাতে অগ্ন্যুৎপাত হওয়াই স্বাভাবিক। সহযোগবাদী এবং অসহযোগবাদী এখনও এই তর্কের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতেছেন না। শাসনকার্য্যের যে সকল পাপ দূর করা অসহযোগের উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে, তাহা এই উপায়ে দূর হইতেছে কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, সে কথারও আলোচনা হইতেছে না। এই পথই পথ,—মুখে মুখে কেবল এই কথাই অধিকতর দেশব্যাপ্ত হইতেছে। ইহাতে দেশের মধ্যে এক অবুঝ দল পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। তাহারা আপাততঃ অসহযোগবাদী হইলেও, কার্য্যক্ষেত্রে শান্তিপ্রিয়তার পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেছেনা। তাহারা যেখানে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, সেখানেই ধর্ম্মঘট, হরতাল, শান্তিভঙ্গ!

তাহারা দেশকালপাত্রের অনুসরণে অসম্মত,—স্বপ্নলোকের অনুগত,—নেতা নহে, নীত,—কিন্তু সকল বিষয়ে নেতৃপুরুষ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবে নীত হইতে অসম্মত। ইহাতে অল্পদিনের মধ্যে যে মতদ্বন্দ্ব অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে স্বরাজের মুখবন্ধ অনিন্দ্য না হইয়া, নিতান্ত অনুবন্ধহীন কলহ-কোলাহলে কলকলায়মান হইয়া উঠিয়াছে। অসহযোগের সহিত অবুঝদলের এইরূপ আংশিক আনুগত্য কত দীর্ঘস্থায়ী হইবে, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। কারণ, এই অবুঝদলই একদিন সুরেন্দ্রনাথের গাড়ী টানিয়াছিল, বেশান্ত বিবিকে মহাসভার সভাপতির আসনে বসাইয়া দিয়াছিল। ইহাদের মতে, ইহারা ছাড়া, দেশে আর যাহারা আছে, সকলেই সমান অপদার্থ। ইহারা মুক্তিবাদী। ইহাদের কথা,—"লজিক নহে, ম্যাজিক"—যুক্তি নহে, ভেল্‌কী। এই ভেল্‌কীতে ইংরাজ-শাসন ধূলা হইয়া এখনও উড়িয়া যায় নাই; কিন্তু নানা স্থানে দেশের লোক নানাভাবে দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছে। দেশে যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাহা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। সে হাহাকার আর কাহারও নহে,—আমাদের। সেই আমাদিগকে,—দরিদ্র, বিপন্ন, প্রতিকারসাধনে অসমর্থ আমাদিগকে,—এক হস্তে অশ্রু মার্জ্জন করিতে করিতে, অপর হস্তে এক কোটী টাকা চাঁদা দিতে, পঁচিশ লক্ষ টাকা বার্ষিক যোগাইয়া মহাসভার সভ্য হইতে, এবং কুড়ি লক্ষ চরকা ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

এই তিনটী দল অত্যধিক মাত্রায় গতিশীল। সংখ্যায় অল্প হইলেও, আর একটি সনাতনবাদী দল আছে, সে দল নিতান্ত স্থিতিশীল। সে দলের বিশ্বাস:— সহযোগবাদী এবং অসহযোগবাদী এই উভয় দলই বিলাতী দল, স্বদেশের লোকের দল হইলেও স্বদেশী নহে, বিদেশী দলপতিগণ বিলাতফেরত,—বিলাতী ভাবোন্মাদে আত্মহারা। তাঁহাদের পরিচালন-কৌশলে আমাদের দেশের সনাতন-ধারা মারা যাইবার পথে অগ্রসর হইতেছে কিনা, তাহা সর্ব্বাগ্রে সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, সনাতনধারা মারা পড়ে,—কি হিন্দু, কি মুসলমান,— কেহই এখনও তাহা ইচ্ছা করেন না। স্বরাজ যত বড় হউক না কেন, স্বজাতি-স্বধর্ম্ম তাহা অপেক্ষা অনেক বড়,—একথা অস্বীকার করিতে হিন্দু মুসলমান এখনও প্রস্তুত হয় নাই। যখন হইবে, তখন একাকার। এখন তাড়াতাড়ি তত বড় ত্যাগস্বীকার করিতে আহ্বান করিলে, হিন্দু মুসলমান উভয়েই দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে:—হিন্দু বলিবে "ছি"! মুসলমান বলিবে "তোবা"!

ইংরাজী শিক্ষা যাহা করিতে পারে নাই, বিলাত-ফেরত দলের আদর্শ তাহা করিয়াছে;—ভারতবর্ষে এক নবযুগ টানিয়া আনিয়াছে,—বিলাতফেরতদলকে তাহার যুগাবতারপদে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া দিয়াছে;— এবং বিলাতী স্বদেশ-প্রীতির ধারণায় স্বদেশী স্বজাতি-প্রীতি—স্বধর্ম্ম-প্রীতিকে খাটো করিয়া দিয়াছে। আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের শক্তি সঞ্চিত হয় নাই। এই অদৃষ্টবিড়ম্বনায় অসন্তোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। প্রচলিত শাসনব্যবস্থার ভ্রম ত্রুটি অত্যাচার অবিচার,জীবন-সমস্যার জটিলতাপূর্ণ অভাব অভিযোগের সহিত মিলিত হইয়া, জনসমাজকে এতদূর বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে যে, যিনিই নেতৃত্ব করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তিনি কে, তাহার অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া, লোকে তাঁহারই কণ্ঠলগ্ন হইতেছে। দলপতিগণ এইরূপে জনশক্তির সহ-যোগ লাভ করিয়া, যেরূপ রাজনীতিক আন্দোলনের আম-দানী করিতেছেন, তাহা স্বদেশী নহে, বিদেশী, দেশকাল-পাত্রের সহিত সামঞ্জস্যশূন্য উচ্ছৃঙ্খল স্বরাজসাধনা, ভারত-বর্ষের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব অভিনব ভাববিপ্লব।

স্থিতিশীল দল এইরূপ হেতুবাদে এই শ্রেণীর স্বরাজ-সাধনায় আস্থাস্থাপন করিতে অসম্মত। একজন স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—যে দিন ইহাদের "স্বরাজ" সত্য সত্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সে দিন তিনি উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিবেন! কথা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবার আশঙ্কা নাই, তথাপি ইহা উড়াইয়া দিবার কথা নহে। ইহা দেশের একশ্রেণীর লোকের মনের ভাবের অতিরঞ্জিত অভিব্যক্তি। তাহা দেশের লোকের বিরুদ্ধে অসন্দিগ্ধ অপবাদ,—দেশের লোকের কর্ত্তব্য-পরায়ণতার ও ন্যায়নিষ্ঠার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ। যাঁহারা গতিশীল, স্বরাজ-লোলুপ অবুঝদল, তাঁহারাও কিন্তু দেশের লোকের কর্ত্তব্যপরায়ণতায় ও ন্যায়নিষ্ঠায় এইরূপ আস্থাশূন্য; এবং পরস্পরের নিন্দাকুৎসা-রটনায় পঞ্চমুখ। ইহাদের মনসবদারীর উমেদারী সফল হইলে, দেশের মঙ্গল হইবে না বলিয়া, স্থিতিশীলদল আশঙ্কা প্রকাশ করিলে, তাঁহাদিগের তজ্জন্য অধিক তিরস্কার করা যায় না। কিন্তু স্থিতিশীল দলের প্রাধান্যের দিন চলিয়া গিয়াছে। যাঁহারা এখনও এই দলের জীর্ণ ধ্বজা ধরিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও জিগমিষা দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে,—মতের সহিত কার্য্যের সামঞ্জস্য শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ-প্রভুত্ব আবশ্যক,—আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই আবশ্যক,— আমাদের কল্যাণের জন্যও আবশ্যক,—এমন কথা স্থিতিশীল দলও সাহস করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। ইহার বক্তা শ্রোতা দুর্ল্লভ। যিনি অভিনব স্বরাজ-সাধনার প্রধান পথপ্রদর্শক, তিনিই কেবল একথা দৃঢ় স্বরে ব্যক্ত করিয়াছেন —কিন্তু তাঁহার নামের ঘন ঘন জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁহার এই কথা লোকে ডুবাইয়া দিয়া ইংরাজ নাম এবং ইংরাজশাসন ঘৃণাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে। অবুঝদল এ বিষয়ে অবিসং-বাদিত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে। কারণ, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক, তাহারা উত্তেজনাপূর্ণ বাচালতার পক্ষপাতী; সুতরাং অতি অল্প আয়াসেই তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে,—আমরা অসহযোগ প্রয়োগ করিবামাত্র

ইংরাজ-শাসনশৃঙ্খলা আপনা হইতেই খসিয়া পড়িবে;—তখন আর পর-রাজ নহে; একেবারে স্বরাজ—ইংরাজ-সম্পর্কশূন্য পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

আমাদের দেশ বহু পুরাতন সভ্যদেশ। সে সভ্যতার মূলশক্তি অ-সহযোগ;—আর্য্যে অনার্য্যে অ-সহযোগ,—হিন্দু-মুসলমানে অ-সহযোগ;—ব্রাহ্মণে অব্রাহ্মণে অ-সহযোগ। বর্ণে বর্ণে অ-সহযোগ। ইহাই সনাতন ব্যবস্থা। অনার্য্য-সহযোগে আর্য্য অনার্য্য হইয়া না যায়, তজ্জন্য আর্য্যে অনার্য্যে অ-সহযোগ, মুসলমান-সহযোগে হিন্দু, হিন্দু-সহযোগে মুসলমান, স্বধর্ম্ম-বিচ্যুত না হয়, তজ্জন্য হিন্দু-মুসলমানে অ-সহযোগ। এই একমাত্র কারণে, ব্রাহ্মণে অব্রাহ্মণে, বর্ণে বর্ণে, অ-সহযোগ। ইহা কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ নহে; ইহা কেবল স্বধর্ম্ম রক্ষক আত্ম-যোগ। ইহা স্বরাজলাভের পক্ষে অন্তরায় নহে। যখন স্বরাজ ছিল, তখনও ইহা বর্ত্তমান ছিল; বরং অনেক বিষয়ে দৃঢ়তর ছিল; কারণ, ইহা কেবল বৈবাহিক আদান-প্রদানে, সামাজিক পান-ভোজনে, স্বধর্ম্মসাধক ব্যবস্থা-পালনে, ক্বচিৎ, বর্ণানুগত বৃত্তি-নির্ব্বাচনে সীমাবদ্ধ। ইহার পরিবর্ত্তনসাধনে স্থিতিশীল দলের যতই আপত্তি থাকুক, গতিশীল দলের আপত্তি নাই। তাঁহাদের দৃষ্টান্তই বরং ধীরে ধীরে বহু বিষয়ে পরিবর্ত্তনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা খাঁটি স্বদেশী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু-মুসলমান, তাঁহারাও যে বিলাতী দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেছেন না, ইহাতেই যুগান্তরের সূত্রপাত হইয়াছে। স্বরাজ আসুক বা না আসুক, স্বধর্ম্ম ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। রাজ-নীতিক্ষেত্রে অ-সহযোগ চালাইতে হইলে, সমাজনীতিক্ষেত্রের সনাতন অ-সহযোগ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে নূতন। পুরাকালে আমাদের দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে কেহ কখন অ-সহযোগের বিনিয়োগ করিবার চেষ্টা করে নাই। কারণ, সে ক্ষেত্রে জন-সাধারণের অ-সহযোগ লোকস্থিতির পক্ষে অ-সহযোগ; রাজশক্তির বিরুদ্ধে অপরিতৃপ্ত অভিযোগ; রাজভক্তির পক্ষে মারাত্মক সংক্রামক রোগ। রাজা সুযোগমত মুষ্টি-যোগ প্রয়োগে মনোযোগ দিতে পারিলে, কর্ম্মভোগ;—না পারিলে, অরাজকতার অনিবার্য্য গোলযোগ। জয় হউক, বা পরাজয় হউক, ইহা একাকারের পক্ষে মাহেন্দ্র যোগ।

স্বধর্ম্ম-রক্ষক সনাতন অ-সহযোগ কাহারও সহযোগের উপর নির্ভর করে না। রাজনীতিক্ষেত্রের অ-সহযোগ সেরূপ নহে। তাহা সকল শ্রেণীর সকল লোকের সম্পূর্ণ সহযোগের উপর নির্ভর করে। এই সর্ব্ব-সহযোগ আগে, তাহার পরে, তাহারই সাহায্যে, রাজশক্তির বিরুদ্ধে অ-সহ-যোগ। সুতরাং সর্ব্ব-সহযোগ ঘটাইয়া তুলিতে না পারিলে, সম্পূর্ণ অ-সহযোগ অসম্ভব; তাহা ঘটাইতে হইলেই, অনেক সনাতন ব্যবস্থা শিথিল করিয়া লইতে হইবে।

যে পথে মানব-সভ্যতা উন্নতি লাভ করিয়াছে, সে পথ চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতার পুণ্য পথ। সে পথ সর্ব্বাগ্রে রুদ্ধ করিতে হইবে। তাহা সহজে সাধিত হইবার সম্ভাবনা না থাকিলে, ধর্ম্মঘট করিয়া সাধিত করিতে হইবে। কেহ যদি অ-সহযোগ মানিতে ইতস্ততঃ করে,—গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে অসম্মত হয়,—চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হয়,—তাহার বিরুদ্ধে অ-সহযোগ প্রয়োগ করিতে হইবে। রাজশক্তি আপাততঃ হাতে না থাকায়, সমাজশক্তির শরণাপন্ন হইতে হইবে, ছত্রিশ জাতির সমবেত শক্তিতে ব্যক্তিগত চিন্তার ও কার্য্যের গতিরোধ করিতে হইবে। ইংরাজরাজ যদি চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতাকে গণ্ডীবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে কোনরূপ বিধি-ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তনের আয়োজন করেন, তাহার সুতীব্র প্রতি-বাদের জন্য যথাসাধ্য কোলাহল করা যাঁহাদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য পবিত্র ব্রত, তাঁহাদিগকেই স্বরাজের দল বাঁধিয়া, তাঁহাদের সহিত যোগদানে অসম্মত ব্যক্তির চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতা লুপ্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, এবং তাহাকে একটি প্রশংসনীয় পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত করিতে হইবে। ইহার বিরুদ্ধে মহাত্মার সতর্কতা পূর্ণ শাসনবাণী নানা স্থানে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে;—কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। এই কারণে, বিচারবুদ্ধি সমাদর লাভ করিতেছে না, ভিন্ন মত আলোচিত হইতে পারিতেছে না;—কেহ সেরূপ সাহস প্রকাশ করিলে,

তাহার ভাগ্যে নিন্দা, কুৎসা, অপমান, নির্য্যাতন! এইরূপে যে স্বরাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা হইতেছে, তাহা মাথা তুলিতে পারিলে, দেশের লোকের পক্ষেও অ-সহযোগ অসহ-যোগ হইবে। অল্পদিনের মধ্যে যাঁহাদিগের পক্ষে ইহা অসহ-যোগ হইয়াছে, তাঁহারা একে একে দল ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন

যে ভাবেই হউক, সকল লোকের সম্পূর্ণ সহযোগ ঘটাইয়া, তাহার সাহায্যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে অ-সহযোগ খাটাইয়া, তাহাকে পঙ্গু করিয়া তাহার নিকট হইতে স্বরাজ আদায় করিয়া লইতে হইলেও, আমাদের মধ্যে যে সনাতন অ-সহযোগ প্রচলিত আছে, তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। মুখে বলা যাইতে পারে,—তাহা অনাবশ্যক। কাজের বেলা তাহা বলা চলিবে না। ইহার মধ্যেই মূল শিথিল করিতে হইয়াছে। অস্পৃশ্য জাতির গলা ধরিয়া উচ্চবর্ণের বালকগণের ভাই ভাই করিবার অভিনয়ই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ছাড়িতে হইবেই,—"ছুঁৎ-মার্গ" ছাড়িতে হইবে,—"হাঁড়ি-ধর্ম্ম" ছাড়িতে হইবে,—যাহার নাম "স্বধর্ম্ম" এবং যাহাতে থাকিয়া "নিধনলাভও শ্রেয়ঃ" বলিয়া চিরপরিচিত,—তাহাকেও অবশেষে ছাড়িতে হইবে। এ কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য ক্রমে সকলকেই মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে,—"যত দিন মুচি-মুদ্দাফরাসের সঙ্গে একত্র পান-ভোজন করিতে না পারিতেছ, ততদিন স্বরাজ পাইবে না।" সুতরাং আট মাসের মধ্যে স্বরাজ পাইতে হইলে, তৎপূর্ব্বে—এখনই—এ কাজটা সুসম্পন্ন করিতে হইবে! কারণ মহাত্মার মহাবাক্যানুসারে ইহাই আগে,—তাহার পরে স্বরাজ, এইরূপ একটি কথা প্রচারিত হইয়াছিল। এখন মহাত্মা বলিতেছেন—না ততদূর যাইতে হইবে না, তবে "ছুঁৎমার্গ" ছাড়িতেই হইবে।

ইহা এই নবযুগের মহাপুরুষের মহাবাক্য হইলেও, স্বদেশী নহে,—বিদেশী, আমাদের দেশকালপাত্রের সহিত সামঞ্জস্যহীন। মহাত্মা কিন্তু বৃথা চীৎকার করিতেছেন। লোকে এ কথাটা চাপা দিবার জন্যই চেষ্টা করিবে; কেহ ইহা মানিয়া লইতে সম্মত হইবে না। হিন্দু ইহা মানিতে পারে না; মুসলমানও ইহা মানিতে পারে না;—শূকর-মাংসলোলুপ মুচি-মুদ্দাফরাস উভয়ের পক্ষেই সমান অস্পৃশ্য। মহাত্মা ইহার পুনরুক্তি করিলে, নেতৃ-নীতের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া পড়িবে। তাঁহার নাম যাঁহাদিগের সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের জয়ধ্বনি, তাঁহাদের কণ্ঠে সেই জয়ধ্বনি—এই কারণে—বাধ বাধ ঠেকিবে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে অবসাদ জড়িত হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশ যে এখনও সম্পূর্ণ মাত্রায় বিলাতী মত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারে নাই, ইহা তাহারই পরিচয়স্থল। সুতরাং বিলাতী প্রণালীতে স্বরাজ লাভের চেষ্টা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইবে, প্রথম প্রবল উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইবামাত্র, বিচারবুদ্ধি ফিরিয়া আসিবে,—অসম্ভবের আশা ত্যাগ করিয়া, যাহা সম্ভব, লোকে আবার তাহারই জন্য ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবে।

এখানে বেশী দিন ভেল্‌কী খাটিবে না;—শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক,—পরিণামে যুক্তি আসিয়া ভেল্‌কীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইবে। এখনই অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—সত্য সত্যই কি এতদূর একাকার আবশ্যক? হয় মহাত্মাকে এরূপ উপদেশের প্রত্যাহার করিতে হইবে, না হয়, দেশের লোককে বিলাতীদল ছাড়িয়া, স্বতন্ত্র এক স্বদেশী দল গঠিত করিয়া, সময় থাকিতে বালকগণকে সতর্ক করিতে হইবে। নচেৎ চীনাম্যান যেমন একদিনে টিকি কাটিয়া, স্বাধীনতা-প্রিয়তার অভ্রান্ত পরিচয় প্রদান করিয়া, জগদ্বাসীকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিল, ভারতযুবকদলও সেইরূপ একদিনে জাতিধর্ম্মের বাধাবন্ধ টুটাইয়া, স্বরাজলাভের অশ্বমেধের অশ্বদর ছুটাইয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। যুবকদল স্বাধীনতা-প্রিয়তার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছে। যে দেশে "পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ!" মূলমন্ত্র;—যে দেশে পিতৃসত্য পালনার্থ স্বার্থত্যাগ মূল আদর্শ,—সে দেশের যুবকগণ যখন বিলাতীমন্ত্রে দীক্ষিত বিলাতফেরত নেতার মুখের কথামাত্রে পিতৃদ্রোহী হইয়া, বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, তখন জাতিধর্ম্মের মায়া-মোহ কতক্ষণ তাহাদিগকে পুরাতনের জীর্ণ খুঁটার সহিত বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে?

বিলাতফেরতদলের নেতৃত্বে আমাদের দেশে যে ইহ-সর্ব্বস্ব বিলাতী আকাঙ্ক্ষার আমদানী হইয়াছে, তাহার প্রতিযোগিতায় আমাদের পর সর্ব্বস্ব পুরাতন আকাঙ্ক্ষার রপ্তানী অনিবার্য্য। অ-সহযোগ নীতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইলে, আপোশ-বন্দোবস্ত চলিবে না। যে টিকি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতেছে, তাহাকে সমূলে কাটিয়া ফেলিতেই হইবে। এত করিয়া যদি সত্য সত্যই স্বরাজ পাওয়া যায়, আমরা থাকিয়া, তাহা লাভ করিতে পারিব না। আত্মত্যাগ সহজ, আত্ম-বিস্মৃতি বড় কঠিন, বুঝি বা অসম্ভব।

যেমন আছি, সেইরূপ থাকিয়া, স্বরাজ লাভের উপায়—সহযোগ। অসহযোগের পথ তাহা হইতে পৃথক্। তাহা নিশিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম, তাহার যাত্রা-নিশানের প্রকৃত লাঞ্ছন চরকা নহে,—সর্ব্বত্যাগ। ছাড়িতে হইবে,—অকাতরে ছাড়িতে হইবে। বিদ্যালয় ছাড়া, ব্যবসায়-বিশেষ ছাড়া, স্ব-বৃত্তি ছাড়া অন্য কথা,—পিতৃপুরুষের পুণ্যপরিচয়ের মান সম্ভ্রম ছাড়িয়া, জন-সমুদ্রে নামিয়া পড়িতে হইবে। তাহার পর? সে প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের গুপ্ত কক্ষে সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা যাহা কিছু ছাড়িয়াছেন, কাহারও মুখেই আত্মতৃপ্তির স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই;—কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় বেদনাক্লিষ্ট অসহকষ্ট তুষ্টনেত্রে রুষ্টদৃষ্টি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে; ফিরিবার পথে লজ্জা, চলিবার পথে অন্ধতা আনয়ন করিয়া, সংকীর্ণতার কূপের মধ্যে পাতিত করিবার আয়োজন করিতেছে। যাহাদের পিতৃপরিচয় নাই, অতীতের অবদান নাই, পশ্চাতে কেবল অকীর্ত্তিকর বর্ব্বরতা, তাহাদের আদর্শের অনুগামী হইয়া, আমাদের পিতৃপরিচয়-বিসর্জ্জন অভূতপূর্ব্ব আত্ম-বিসর্জ্জন। অ-সহযোগের পথে এই আত্ম-বিসর্জ্জন অনিবার্য্য। কিন্তু ভারতবর্ষ এখনও এত বড় আত্মবিসর্জ্জনের তীব্র তেজ সহ্য করিবার উপযুক্ত হৃদয়বল সঞ্চয় করিতে পারে নাই। তাহার জন্য আরও আত্ম-শোধন,—আরও সাধনবল আবশ্যক।

প্রচলিত শাসন-পদ্ধতিকে পঙ্গু করিয়া, তাহাকে স্বরাজ দানে বাধ্য করাই অ-সহযোগের উদ্দেশ্য। শাসন-যন্ত্র চালাইবার জন্য আমাদের সহযোগ আবশ্যক। নচেৎ, অল্পসংখ্যক ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশের শাসন যন্ত্র পরিচালন করা নিতান্তই অসম্ভব। সুতরাং আমরা অ-সহযোগ খাটাইতে পারিলেই, সে শাসন-যন্ত্র অচল হইয়া পড়িবে। পর-রাজ যে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা নহে, সরলতা;—চরিত্রদোষ নহে, চরিত্রগুণ। আমাদের অধ্যবসায়, আমাদের অকুতোভয়তা, আমাদের প্রভুভক্তি, পররাজ সংস্থাপনে এবং পরশাসনযন্ত্র-পরিচালনে সহায়তা-সাধন না করিলে, অসম্ভব সম্ভব হইত না। আমরা এখন সেই সহযোগ পরিত্যাগ করিলেই পররাজ-শাসনযন্ত্র বিকল হইয়া পড়িবে। ইহাই অ-সহযোগনীতির দার্শনিক সিদ্ধান্ত।

আমাদের দেশের অতি অল্পসংখ্যক লোকের সহযোগেই ইংরাজরাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, আধিপত্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। সকল লোকের সম্পূর্ণ অ-সহযোগ ভিন্ন তাহা অচল হইতে পারে না। অতি অল্পলোকের সহযোগ থাকিলেই যথেষ্ট। তাহার অভাব ঘটাইতে পারা কি সম্ভব? প্রোণপারাক্রান্ত সামন্তরাজগণ আছেন,—ইংরাজপৃষ্ঠপুষ্ট জমিদারদল আছেন,—ইংরাজবাণিজ্যালব্ধ সওদাগরগণ আছেন,—ইংরাজ-বিরংসাস্পৃষ্ট কিরিঙ্গিদল আছেন,—ইহাদের সহযোগেই শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইতে পারিবে। আমাদের অসহযোগ এই কারণে আংশিক অ-সহযোগ হইবে। তাহা যতই সুদৃঢ় হউক, ইংরাজ তাড়াইবার বা পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যসাধনে মূল্যহীন। কেবল অবস্থা-বিশেষেই আংশিক অ-সহযোগ প্রচলিত রাজশক্তিকে পঙ্গু করিবার আশা করিতে পারে। তাহাতে কিন্তু পর-সহযোগ আবশ্যক।

মীরজাফর আগে গুপ্ত সন্ধিবন্ধনে ইংরাজ-সহযোগ স্থির করিয়া লইয়া,—পরে—সেই পর-সহযোগের ভরসায়,—সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে অ-সহযোগ খাটাইয়াছিলেন। ফলে স্বরাজ আসিল না; পররাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল; ইতিহাসে মীরজাফরের নাম হইল—"ক্লাইবের গর্দ্দভ,"—স্নেহা-নুপালিত, ইঙ্গিতানুচালিত, তৃণোদকপুষ্ট, ভারবহনক্লিষ্ট, দুরদৃষ্ট গর্দ্দভ!

এবারও দুষ্টলোকে একটি পর-সহযোগের গুজব রটাইয়া

দিয়াছে। তাহা কাবুলী গুজব;—কাবুলী মেওয়ার মত ভারতবর্ষের হাটে বাজারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই গুজবের মূল কি, এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার রহস্যভেদ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাই যে অধিকাংশ নিরক্ষর মুসলমানকে নাচাইয়া তুলিয়া থাকিবে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যদি কাবুল আসে, আমরা কি করিব,—রাজা প্রজা অনেকেই গম্ভীরভাবে তাহার আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। ইচ্ছা থাকিলেও কাবুলের পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণ করা সম্ভব কি না, সাধারণ জনসমাজ তাহা চিন্তা করিতে অসম্মত। কাবুল আসিতেছে, এই সময়ে অ-সহযোগ চালাইতে পারিলেই বাস,—ইহাই জন সাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতেছে।

নিরক্ষর লোকের স্বাভাবিক সরল বিশ্বাস এইরূপে এক লুব্ধাশ্বাসের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। অ-সহযোগনীতির মূল প্রবর্ত্তকগণ দৃঢ়স্বরে মুক্তকণ্ঠে এই বিশ্বাস দূর করিবার জন্য চেষ্টা না করায়, জনসমাজ এই গুজবকে গুজব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছে না। যে সন্তান-সেনা মুক্তিমন্ত্র প্রচারের অগ্রদূত, তাহাদের মুখে মুখে ইহা লতাপল্লবে সঞ্জীভূত হইতেছে। ইহার গতিরোধের জন্য মুষ্টিযোগ প্রয়োগের ব্যবস্থা হইলে, গোলযোগ ঘটিত; -আবার শিশুপালবধের অভিনয় ফিরিয়া আসিত;—রাজা প্রজা কাহারও কল্যাণ হইত না। অবুঝ-দলের মতে এই সহিষ্ণুতা শক্তিশালীর সহিষ্ণুতা নহে;—ইহা শক্তিহীনের দুর্ব্বলতা;—ইংরাজ শাসনের নাভিশ্বাস! কেহ কেহ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির ন্যায়, ভবিষ্যদ্বক্তার আসন অধিকার করিয়া, একরূপ প্রকাশ্যভাবেই ইংরাজ শাসনের গঙ্গাযাত্রার দিন তারিখ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়া দিতেছেন,—বহুলোকে তাহাই আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে

অ-সহযোগ অবলম্বন করিতে হইলে, অনেক বিষয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে; প্রয়োজন মত বিচারবুদ্ধিও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। এত ত্যাগ স্বীকার করিয়া, যদি কিছু পাওয়া যায়, তাহা কি এবং কেমন, তাহা কিন্তু অধ্রুব!

ধ্রুব কি? আমরা আমরা, ইহাই একমাত্র ধ্রুব সত্য। আমরা আমরা থাকিয়া, যে পথে সভ্যসমাজে মাথা তুলিয়া চলিতে পারি, বিধিদত্ত জন্মগত অধিকার উপভোগ করিতে পারি, সেই পথই পথ। সেই পথে চলিবার জন্য আগে আমাদিগকে "আমরা" হইতে হইবে। তাহার পর, যাহা কিছু আমাদের পক্ষে ভাল, তাহার সহিত সহযোগ;—যাহা কিছু আমাদের পক্ষে মন্দ, তাহার সহিত অ-সহযোগ।

দেশ জাগিয়াছে। বহুযুগের বহু ঘটনায় দেশের লোকের মানসিক স্বাস্থ্য যেরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে জাগরণই যথেষ্ট নহে,—স্বাস্থ্য লাভও আবশ্যক। জ্ঞানের পথ ভিন্ন অজ্ঞানের পথে তাহা সাধিত হইতে পারে না। শিল্পবাণিজ্যের ক্রমোন্নতির পরিবর্ত্তে যে অধোগতি ঘটিয়াছে, তাহা নিতান্ত অনায়াসে দূর হইতে পারে না। তাহার জন্য যথাযোগ্য পথে প্রাণপণ চেষ্টা আবশ্যক। শাসন-ব্যবস্থার পূর্ব্বাবস্থা যেরূপ ছিল, তাহার কিছু কিছু সংস্কার সাধিত হইয়াছে; কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট নহে,—আরও সংস্কার আবশ্যক। এই সকল অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতে হইলে, দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন আবশ্যক। নিন্দাকুৎসায় অপমানে নির্য্যাতনে দেশমান্য ব্যক্তিগণকে দেশের লোকের নিকট ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিতে থাকিলে, প্রজা জমিদারে মনোমালিন্য জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে থাকিলে, এই জাগরণ কল্যাণদায়ক না হইয়া, অকল্যাণদায়ক হইবে। ভাঙ্গা ঘরের আর ভাঙ্গার সামগ্রী কি আছে? এখন ভাঙ্গা ঘরকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহাকে আমাদের দেশকালপাত্রোপযোগী করিয়াই গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতবর্ষ ভারতবর্ষ, আমরা আমরা,—ভারতবর্ষ ইউরোপ নহে। আমরাও সাহেব বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে পারি না। রাজনীতিক অধিকারই সর্ব্বস্ব নহে,—আমাদের আরও অনেক অধিকার আছে, যাহা সভ্যসমাজে আর কাহারও নাই। তাহাকে রক্ষা করিয়াই আমাদিগকে রাজনীতিক আন্দোলন চালাইতে হইবে। আত্মবোধ, আত্মশক্তির উন্মেষ, আত্মশক্তির সঞ্চয় ও রক্ষাকার্য্য আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য; তাহার

জন্যই রাজনীতিক অধিক অধিকার আবশ্যক। নচেৎ নিজস্ব হারাইয়া, পরস্ব কাড়িয়া লইয়া কেবল রাজনীতিক অধিকার লাভ আমাদের দেশকালপাত্রের পক্ষে লাভ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

অন্ধকার নহে, আলোক,—আরও অধিক আলোক। বিদেশী নহে, স্বদেশী,—আরও অধিক স্বদেশী। সংহার নহে, সংস্কার,—আরও অধিক সংস্কার। যিনি তাহা আনিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই যথার্থ দেশবন্ধু;—স্বপ্নে নহে, শৌর্য্যে,—বৈরাগ্যে নহে, বীর্য্যে,—কথায় নহে, কার্য্যে।

—সাহিত্য, বৈশাখ ১৩২৮।

অগ্নি-ঋষি

[কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম]

অগ্নি-ঋষি অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে
তাইতে তোমার বহ্নিরাগেও বেদন-বেহাগ বাজে।
দহন বনের গহনচারী
হায় ঋষি কোন্ বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আন্‌লে বারি
অগ্নি মরুর মাঝে
সর্ব্বনাশী কোন্ বাঁশী সে
বুঝতে পারি না যে।

দুর্ব্বাশা হে, রুদ্র তড়িৎ, হানছিলে বৈশাখে
হঠাৎ সে কার শুনলে বেণু কদম্বের ঐ শাখে
বজ্রে তোমার বাজলো বাঁশী
বহ্নি হলো কান্না হাসি
সুরের ব্যথায় প্রাণ্ উদাসী
মন সরে না কাজে
তোমার নয়ন-পোরা অগ্নিসুরে
রক্তশিখা রাজে
অগ্নি-ঋষি অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে। *

* তিলক-কামোদ—ঝাঁপতাল।

ইয়াংসি-বক্ষে

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

(১) প্রথম রাত্রি—চীনে জাপানী

ইংরেজ কন্‌সেশনের বাঁধপথের উপর জাপানী জাহাজ-কোম্পানীর কার্য্যালয় অবস্থিত। এইখানে ষ্টীমারের টিকেট কিনিলাম। মহামুস্কিল। পিকিঙ হইতে যে নোট আসিয়াছে তাহার উপর শতকরা দুই টাকা বাটা দিতে হইল। ইয়োকোহামা স্পেসি ব্যাঙ্কের নোট ছিল—তাড়াতাড়ি তাহাদেরই শাখা কার্য্যালয়ে গেলাম। কিন্তু তাহারাও বাটা না লইয়া টাকা দিবে না।

রাত্রি নয়টার সময়ে রুশ কন্‌সেশনের ঘাট হইতে জাপানী ষ্টীমার ছাড়িল। ষ্টীমারের কাপ্তেন এবং আর দু-একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ব্যতীত জাপানী আর কেহ নাই। খালাসী, বাবুর্চি, ম্যাথর ইত্যাদি সকলেই চীনা। জার্ম্মাণ কোম্পানীর জাহাজে, ষ্টীমারেও দু-একজন জার্ম্মাণ থাকেন মাত্র—সেবকেরা সকলেই চীনা। ইংরেজ এবং ফরাসী কোম্পানীর কারবারেও এই নিয়ম। সুতরাং

জাপানীরা অন্যান্য ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ারের চালেই চলিতেছেন।

জাপানীরা চীনে স্বদেশী লোকজন হইতে বেশ পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলেন। চীনের জাপানী ব্যাঙ্কে, লেগেশন কার্য্যালয়ে, দোকানে ও হোটেলে বিজেতা জাতির ধরণ ধারণ সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। ইয়োরামেরিকার লোকেরা চীনা লোকজনকে যেরূপ ভাবে নেটিভ বলিয়া থাকে, জাপানীরাও ঠিক সেই ভাবে চীনাদিগকে 'নেটিভ' বলে। চীনা চাকর, বাবুরচি ও দ্বারবানদিগকে বিদেশীয়েরা যে সুরে 'বয়' বলিয়া ডাকে, জাপানীরাও ঠিক সেই সুরে অভ্যস্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে ইংরেজের জীবন যেরূপ, চীনে ফরাসী, ইয়াঙ্কি, জার্ম্মাণ, রুশ, ইংরেজ ও জাপানীর জীবনও সেইরূপ। সুতরাং যাঁহারা ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের ব্যবহার দেখিয়াছেন তাঁহারা চীনে বিদেশীয়দিগের আচরণ বুঝিতে সমর্থ হইবেন না। আমরা ভারতবর্ষে কোন ইংরেজকে ছোট-খাট কাজ করিতে দেখি না। ইংরেজ জাতির মধ্যে যে মজুর, ম্যাথর, ঝাড়ুদার, মুচি ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর লোক আছে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি না। কোন ইংরেজকে রেলে, ষ্টীমারে দ্বিতীয় শ্রেণীর নিম্নে মোসাফির হইতে দেখিয়াছ কি? ইহারা যত নিম্নপদস্থ লোকই হউক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতবাসীর তুলনায়ও ইহারা উচ্চ—কারণ ইহারা বিজেতা জাতির লোক। বিজিত জাতিকে সর্ব্বদা ইহাদের ক্ষমতা দেখাইয়া চলিতে হয়। তাহা না হইলে ইহাদের 'প্রেষ্টিজ' থাকিবে কেন?

ভারতবর্ষে ইংরেজ যে বস্তু, ইংলণ্ডে সে বস্তু নহে। সেইরূপ জাপানে জাপানী যে বস্তু, কোরিয়ায় মাঞ্চুরিয়ায় এবং চীনে সেই বস্তু নহে। জাপানীরা স্বদেশে যত বেতনে কর্ম্ম করে, এই সকল ভোগ-ভূমিতে ইহারা তাহার চতুর্গুণ হারে বেতন পায়। জাপানী মুল্লুকে ভৃত্য জাতীয় লোক আছে কি না তাহা চীনের জাপানী সমাজ দেখিয়া বুঝিবার জো নাই। এখানে যে সকল জাপানী চোখে পড়ে তাহারা সকলেই রিক্‌শতে চলাফেরা করিয়া থাকে।

জাপানী ষ্টীমারে চীনা মোসাফিরদিগের জন্য এক ধরণের ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা আছে—বিদেশীয় ফার্ষ্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদিগের জন্য অন্য এক প্রকার কামরা আছে। বিদেশীয় কামরার জন্য মূল্য দিতে হইলে ৬০৲, অথচ চীনা প্রথম শ্রেণীর মূল্য মাত্র ১৫৲। এতটা প্রভেদ না থাকিলে চীনারা জাপানী ও অন্যান্য বিদেশীয়গণকে সম্মান ও ভয় করিবে কেন?

জাপান বিগত ৫০ বৎসর ধরিয়া ইয়োরামেরিকার নিকট নব্যজগতের সকল বিদ্যা শিখিয়াছে। মাত্র ৫।৭ বৎসর হইল দুনিয়ায় বৃহত্তর জাপানের সূত্রপাত হইয়াছে। বিদেশে সাম্রাজ্য চালাইবার জন্য কোন্ প্রণালীতে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য, জাপানীরা এক্ষণে তাহাও ইয়োরামেরিকা হইতে শিখিতেছে। সাম্রাজ্যশাসন নীতি বা 'ইম্পিরিয়ালিজম' সম্বন্ধে ইংরেজের সমান গুরু জগতে আর কোথায় পাওয়া যাইবে? কাজেই জাপান এইসকল বিষয়ে ইংরেজের পথ অনুসরণ করিতেছেন। এইজন্য বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ জাপানী রাষ্ট্রবীরগণের পক্ষে ল্যাবরেটরী স্বরূপ, ভারতে জাপানী পর্য্যটকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

চীনারা সকল বিদেশীয় রাষ্ট্রের উপরই নারাজ। সম্প্রতি জাপানীরা ইহাদের চক্ষুঃশূল। কয়েক মাস হইতে চীনারা জাপানী মাল বয়কট সুরু করিয়াছে, কাজেই চীনা দোভাষী মহাশয় জাপানী ষ্টীমারে বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছেন। প্রথম হইতেই ইনি বলিতেছিলেন 'মহাশয় জাপানী কোম্পানীর জিনিষপত্র ভাল নয়, ক্ষুদ্র ষ্টীমারে অসুবিধায় পড়িবেন।'

বিকাল হইতে মহাবৃষ্টি সুরু হইয়াছে। ইয়াংসি অজ উত্তাল তরঙ্গের খেলা দেখাইতেছে, যেন সমুদ্রে বাস করিতেছি। একঘুমে রাত্রি শেষ হইয়া গেল, ভোরে হুবো প্রদেশের পূর্ব্বসীমায় উপস্থিত। হানকাও হইতে ৬০ মাইল পূর্ব্বে এক স্থানে লৌহখনি আছে। এই খনির কথাই সেদিন 'উ' বলিতেছিলেন। এইখানে একটা কারখানা খুলিবার প্রস্তাব চলিতেছে। বিশেষ চুক্তির প্রভাবে জাপান-সরকার এই খনি হইতে সস্তায় লোহা পাইয়া থাকেন। আর ৪০ মাইল পূর্ব্বে একটা নুণের খনির নিকট দিয়া ইয়াংসি প্রবাহিত। শুনিলাম এই অঞ্চলে

প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয়। চারিদিকে পাহাড়—নিতান্ত সঙ্কীর্ণ জলপথ, তাহার ভিতরেও সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের শিরোদেশ।

হোয়াংহো নদীর খাত অসংখ্যবার স্থানান্তরিত হইয়াছে, ইহাতে বৎসরের মধ্যে কয়েকবার ভয়ঙ্কর বন্যা হয়। তখন সন্নিহিত জনপদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। কিন্তু ইয়াংসির মূর্ত্তি মোটের উপর শান্ত।

ইয়াংসি বক্ষে ৬০০ মাইলের সফরে বাহির হইয়াছি। যেন এলাহাবাদ হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ষ্টীমারে যাইতেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের লোকজন সমুদ্র হইতে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে পর্য্যন্ত জাহাজেই আসিত। এক্ষণে এলাহাবাদের সেই জাহাজ-ঘাটের একটা বাঁধের কিয়দংশ বর্ত্তমান আছে। আজকাল হ্যান-ইয়াংসি সঙ্গম পর্য্যন্ত বিদেশীয় বণিকগণের মানোয়ারি জাহাজও আসিয়া থাকে। একশত বৎসর পর চীনের অবস্থা কি হইবে কে বলিতে পারে?

(২) ইয়াংসি সমস্যা

সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর কামরা হইতে দেখি কিনারায় খড়ো চালার পল্লী কুটীর ও সবুজ ধানের ক্ষেত। অদূরে অনুচ্চ পাহাড় নদীর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। ইয়াংসির জল চীনের অন্যান্য নদনদীর জলের মতনই অত্যন্ত ঘোলা—প্রায় রক্তাক্ত পীত বর্ণ। বর্ষাকালে কখনও গঙ্গা পদ্মার এরূপ কর্দ্দমাক্ত গেরুয়া জল দেখি নাই।

চীনাদিগকে পীতাঙ্গ জাতি কেন বলা হয়, চীনে আসিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাদের বর্ণকে পীত বলিব কি করিয়া? শ্বেতাঙ্গও ইহারা নয়। মোটের উপর ভারতীয় ধূসর রঙের প্রাধান্যই দেখা যায়। তবে নদীর জল পীতাভ সন্দেহ নাই।

হ্যান্ কাও সমুদ্র হইতে মাত্র ৬০০ মাইল দূরে অবস্থিত। অথচ ইয়াংসির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৫০০ মাইল। চীনারা এই নদীর নামে দীর্ঘ ও প্রশস্ত নদী বুঝিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, ইয়াংসির উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত বহু দিনের পথ। খানিকটা ষ্টীমারে যাওয়া যায়। তাহার পর আর খানিকটা চীনা নৌকায় গমনাগমন হইয়া থাকে। শুনিতেছি মোটের উপর ১৫০০ মাইল নদীবক্ষে চলা ফেরা করিতে পারি। তাহার পর তিব্বতের সীমা। তিব্বতের পার্ব্বত্য ভূমিতে নদীর গতি অতিশয় বক্র এবং প্রস্থ অত্যন্ত অল্প। তিব্বত যেমন সিন্ধু ব্রহ্মপুত্রের জন্মদাতা, সেইরূপ ইয়াংসিরও জন্মদাতা।

সকাল ৯টার সময়ে কিউ-কিয়াঙ সহরে ষ্টীমার দাঁড়াইল। বার ঘণ্টায় ১৭০ মাইল আসিয়াছি। নদীর দক্ষিণ দিকে এই নগর। কতকগুলি নূতন নব্য-অট্টালিকা দেখা গেল। পয়াঙ হ্রদের জল ইয়াংসিতেও কিছু মিশিয়াছে। শীতকালে নাকি পয়াঙের জল শুকাইয়া যায়। কিন্তু অন্য ঋতুতে হ্রদে ষ্টীমার যাতায়াত করে।

ষ্টেসনের নিকটেই বিদেশীয় কন্‌সেশন মহল্লা দেখিতে পাইলাম। ইয়াংসি নদীর ধারে ধারে এইরূপ দশ বার বন্দরে বিদেশীয় রাষ্ট্রের ভোগ ভূমি স্বরূপ বাণিজ্য কেন্দ্র আছে। ইয়াংসিকে লইয়া বিদেশীয়েরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। চীনের উর্ব্বরতম ভূমিখণ্ড ইয়াংসির দুই কিনারায় দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ইয়াংসি প্রক্ষালিত প্রদেশ সমূহে সর্ব্ব সমেত বিশকোটী নরনারীর বাস। এই অঞ্চলে ব্যবসায় করিতে পারা এক প্রকার হাতে হাতে লক্ষ্মীলাভ নহে কি? এইজন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতা এবং মনোমালিন্য কম উপস্থিত হয় না। ইংরেজ ও ফরাসী বিশেষভাবে ইংরেজই ইয়াংসি-মাতৃক দেশে কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি জাপানের দৃষ্টি এই অঞ্চলে পড়িতে সুরু করিয়াছে। জাপানে ও ইংলণ্ডে ইয়াংসি লইয়া গণ্ডগোল বাধা বিশেষ আশ্চর্য্যজনক নয়।

কিউ কিয়াঙ্ অনেক দিনের সহর। তাঙ্ থাকলেও ইহা প্রসিদ্ধ ছিল। পশ্চাতে যে পাহাড়শ্রেণী দেখিতেছি উহা চীনা কাব্যে স্থান পাইয়াছে। তাঙ্ ও সুঙ্‌বংশীয় নরপতিগণ এই অঞ্চলের পোর্সলেন বাসন পছন্দ করিতেন। আজও এই শিল্প কিউ-কিয়াঙে বেশ চলিতেছে। বহুসংখ্যক মন্দির ও প্যাগোডা এই জনপদে দেখিতে পাওয়া যায়।

চীনের সর্ব্ব বৃহৎ হ্রদের নাম টং টিঙ্। উহা হ্যানকাও হইতে প্রায় ১৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইয়াংসিতে

এই হ্রদের জলও পড়িয়াছে। ইয়াংসি পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে প্রবাহিত, কিন্তু ইহার গতি সরল রেখার মতন নয়। পার্ব্বত্য ভূমির প্রভাবে ইহাকে আঁকাইয়া বাঁকাইয়া চলিতে হয়। কয়েক শত মাইল দক্ষিণে চলিবার পর কয়েক শত মাইল উত্তরে উহার গতি; পুনরায় হয় ত খানিকদূর দক্ষিণে গতি। এই কারণেই ইয়াংসির দৈর্ঘ্য এত বেশী। ইহার প্রস্থ কোথাও বেশী নয়। দেড় দুই মাইলের কমই সর্ব্বত্র—কোথাও কোথাও নাকি সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য গলিমাত্র নদীর খাত।

দুই কিনারার যেখানে যেখানে আবাদ দেখিতেছি সেই খানেই ধানের ক্ষেত চোখে পড়ে। কোরিয়া পরিত্যাগ করিবার পর ভুট্টার বজরার ভূমি শত শত মাইল ধরিয়া দেখিয়াছি। এক্ষণে ধান্য মণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ইয়াংসি চীনকে প্রায় দুই সমান ভূখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তর চীনের প্রধান খাদ্য রুটী—দক্ষিণ চীনে ভাতের মুল্লুক। উত্তরের লোকেরা ভাতও খাইয়া থাকে।

ইয়াংসির প্রায় সকল অংশেই পাহাড়ের দৃশ্য চোখে পড়ে। দ্বিপ্রহরে একটা প্রাচীর রক্ষিত পাহাড়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র নগর দেখিলাম। হুপে প্রদেশের পর কিয়াংসি প্রদেশে চলিতেছি। কিউ-কিয়াঙ্ এই প্রদেশেরই রাষ্ট্রকেন্দ্র। সন্ধ্যাকালে অনেকটা উত্তর পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই সময়ে আন্-হুই প্রদেশের রাষ্ট্রকেন্দ্র আনকিঙ্ নগরে ষ্টীমার থামিল।

দোভাষী মহাশয় চীনা খানসামাদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় মগ্ন থাকিতেছেন। ইংরেজীভাষী এক ব্যক্তিও ষ্টীমারে পাইতেছি না। সহযাত্রী মাত্র একজন। ইনি ইংরেজী জানেন না। পোষাকে বুঝিলাম চীনা। দোভাষীর সাহায্যে ইঁহার সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দেওয়া গেল। ইনি বলিলেন "মহাশয় নিতান্ত বাধ্য হইয়া জাপানী ষ্টীমারে যাইতেছি।"

পরিচয়ে জানিলাম চীনা সহযাত্রী উচাঙের অধিবাসী। হুপে প্রদেশের শাসনকর্ত্তার সাহায্য করা ইহাঁর কার্য্য। দশ বৎসর হইল জাপান হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। তোকিওর ওয়াসেদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাঁর শিক্ষা লাভ হইয়াছিল। ইনি জাপানীতে কথা বলিতে এবং পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারেন।

ম্যাণ্ডারিন মাছের ঝোল এবং ভাত আহার করা গেল। উত্তর চীনে আঙ্গুর প্রচুর পরিমাণে পাইতাম। দক্ষিণে খেজুর পাইতেছি।

অন্ধকার পক্ষ চলিতেছে—চাঁদের বাহার নাই। এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কাজেই "পরে কি যামিনী তারার মালা ?"

(৩) ৪০ কোটী নর-নারীর ভবিষ্যৎ

দক্ষিণ চীনের লোকসংখ্যা প্রায় বিশ কোটী, উত্তর চীনের লোকসংখ্যাও প্রায় বিশ কোটী। পৃথিবীতে একমাত্র ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের লোকসংখ্যা দশকোটী—অন্যান্য ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ারের লোকসংখ্যা হয় ৫ কোটী না হয় ৬ কোটী। সুতরাং লোকসংখ্যা অনুসারে যদি রাষ্ট্রের চতুঃসীমা নির্দ্ধারণ করা যায়, তাহা হইলে উত্তর চীনে দুইটা বৃহত্তম ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ার এবং দক্ষিণ চীনে দুইটা ফার্ষ্ট ক্লাস পাওয়ারের উপকরণ আছে। অর্থাৎ চীনা সমাজ হইতে ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের সমান চারিটী সুবৃহৎ রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারে। আর যদি জাপান, জার্ম্মাণি, ইংল্যাণ্ড বা ফ্রান্সের সঙ্গে তুলনা করি তাহা হইলে ৭।৮টা প্রবল চীনের মাল-মসলা এই জনপদের আছে। অবশ্য মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, তুর্কীস্থান এবং মাঞ্চুরিয়া খাঁটি চীনের বাহিরে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, খাঁটি চীন ভাঙ্গিয়া যদি ইংলণ্ড, জাপানের মতন ৭।৮টা স্বাধীন চীনা রাষ্ট্র প্রস্তুত করা যায়,অথবা বৃহত্তর চীন সাম্রাজ্য হইতে দশ বারটা এসিয়াটিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে মানব সভ্যতার ক্ষতি হইবে না ; বরং অনেক বিষয়ে উন্নতি হইবারই সম্ভাবনা। এক্ষণে যেখানে একটী মাত্র পিকিঙ্ দেখিতেছি সেখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুসংখ্যক পিকিঙ্ দেখিতে পাইব। পূর্ব্বে ইয়োরোপের একমাত্র চিন্তাকেন্দ্র ও কর্ম্মকেন্দ্র ছিল রোম। তাহার স্থানে আজকাল বহু সংখ্যক রোম দেখিতেছি। লণ্ডন, প্যারিস্, বার্লিন্, ভিয়েনা ইত্যাদির উৎপত্তিতে রোমের প্রতিপত্তি অনেকটা কমিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু

ইয়োরোপের মধ্যে সভ্যতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেইরূপ চীন সাম্রাজ্যের নানা কেন্দ্রে এশিয়ার বার্লিন, প্যারিস, ভিয়েনা, জেনেভা, হেগ ইত্যাদি গড়িয়া উঠিলে পুরাতন পিকিঙের পদ-মর্য্যাদা খানিকটা কমিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু এশিয়ার অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক শক্তিশালী নর নারীর উদ্ভব স্বতঃই হইতে থাকিবে

ইয়োরোপীয় সমাজে ধর্ম্ম,সভ্যতা ও বিদ্যা মোটের উপর এক। নানা প্রকার ঐক্য সত্ত্বেও এই ক্ষুদ্র অঞ্চলে ১২।১৪টা স্ব স্ব প্রধান পুরো স্বাধীন রাষ্ট্রের স্থান আছে। চীনাবাও ধর্ম্মে, সভ্যতায় এবং জাতিতে ঐক্যবিশিষ্ট হইয়াও বিভিন্ন বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকিলে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিবে কেন? রাষ্ট্রের সীমার সঙ্গে ধর্ম্ম, জাতি বা বিদ্যার সীমার সামঞ্জস্য কোন দিনই জগতে দেখা যায় নাই। অধিকন্তু চীনারা একলিপি ব্যবহার করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহাদের ভাষা প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন। কাজেই বহু বিষয়ে ঐক্যবিশিষ্ট থাকিয়াও ইয়োরোপে যদি একাধিক "জাতীয়তা", "স্বাদেশিকতা", "ন্যাশনালিটি" ইত্যাদির বিকাশ স্বাভাবিক বিবেচিত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধ-কন্‌ফিউ-শিয়ান মতাবলম্বী মাঙ্গোলিয় জাতির মধ্যে বহু সংখ্যক "নেশন" বা রাষ্ট্রের গঠন অস্বাভাবিক বিবেচিত হইবে কেন?

প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, যীশুখৃষ্ট, বেকন, দেকার্ডে, লাইব্‌নিজ, হার্ব্বার্ট-স্পেন্সার ইত্যাদির পশার পেট্রোগ্রাডেও আছে, ম্যাড্রিডেও আছে। নবীনতম এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রবর্ত্তকগণ পেট্রোগ্রাডেও সমাদৃত হন, ম্যাড্রিডেও সমাদৃত হন। খৃষ্টান মন্দির পেট্রোগ্রাডেও আছে ম্যাড্রিডেও আছে। অনুবাদের সাহায্যে প্রত্যেক দেশের কবিগণ ইয়োরোপের অন্যান্য সকল দেশেই পূজা পাইতেছেন। তথাপি পেট্রোগ্রাডের রুশেরা ম্যাড্রিডের স্পেনিসদিগকে বুঝে না। লিভারপুলের নরনারীগণ বুকারেষ্টের জন-সমাজকে বুঝিতে পারে না। সেইরূপ বেদ বেদান্ত, উপনিষদ পুরাণ, আসামেও প্রচলিত, সিন্ধু গুজরাতেও প্রচলিত, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুরেও প্রচলিত। বাঙ্গালার নব্য ন্যায় ভারতের সর্ব্বত্র আলোচিত হইয়া থাকে। পঞ্চনদের চরক সমগ্র ভারতে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণের গুরু। দাক্ষিণাত্যের শঙ্করাচার্য্য আর্য্যাবর্ত্তেও অবতাররূপে পূজাপ্রাপ্ত হন। একই কালিদাস সমগ্র হিন্দুস্থানে আদর্শ কবি। তথাপি কোচিন ত্রিবাঙ্কুরের কথা কয়জন আসামবাসী বুঝিতে পারে? মহারাষ্ট্রের হৃদয় কয়জন পূর্ব্ববঙ্গবাসী জানে? পঞ্চনদের কয়জন নেতা তামিল নরনারীর হৃদয় বুঝিতে সমর্থ? সেইরূপ দিল্লীর মুসলমান কাইরোর মুসলমানকে বুঝে না। তেহারাণের মুসলমান দিল্লীর মুসলমানকে বুঝে না। সেইরূপ বৃহত্তর চীনের সর্ব্বত্র একই কন্‌ফিউসিয়ান্, একই লাওট্জে, একই বুদ্ধ পূজা পাইতেছেন। তথাপি মুক্‌ডেনের কথা ক্যাণ্টনবাসী বুঝিতে পাবে না। সালার বৃত্তান্ত পিকিঙের কর্ত্তারা জানেন না। খোতানের সংবাদ শাংহাইয়ের লোক রাখে না। মঙ্গোলিয়ার লোকেরা ইয়াংসি-বৃত্তান্ত বুঝিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক আবেষ্টন এবং ভাষার প্রভেদ জনপদে জনপদে এত বেশী যে, অন্যান্য সকল প্রকার ঐক্য সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। অনেক সময়ে একভাষাভাষী সমাজও দুই বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত হইয়াছে। কাজেই রাষ্ট্রীয় চতুঃসীমা স্থির করিবার সময়ে একমাত্র সভ্যতা, ধর্ম্ম, জাতি, বংশ, বিদ্যা ইত্যাদির দোহাই বেশী না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। যতখানি স্থান একত্র হইলে রাষ্ট্রের শক্তি পুষ্ট হইতে পারে, ততটুকু স্থানকে ঐক্য গ্রথিত করিতে পারিলেই কার্য্য চলিয়া যায়। জগতের ভিতর অশেষ বৈচিত্র্য আছে, সেগুলিকে অস্বীকার করা মূর্খতা। চীনারা তাহাদের ৪০ কোটী নরনারীর ভবিষ্যৎ আলোচনা করিতে যাইয়া একটা তথাকথিত ঐক্যের মোহে অন্ধ থাকিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

বহুসংখ্যক চীন যদি স্বাধীনভাবে গড়িয়া না উঠে, বহুসংখ্যক চীন পরাধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ দেখিব ইহা সুনিশ্চিত। মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত ইতিপূর্ব্বেই অনেকটা চীনের হাতছাড়া হইয়াছে, খাঁটি চীনের অভ্যন্তরেই কনসেসন মহাল্লা বিদেশীয় sphere of influence বা প্রভাবমণ্ডল, এবং পরকীয় sphere of interest বা স্বার্থমণ্ডল, এবং হংকঙ্‌ চিংতাও, পোর্ট আর্থার ইত্যাদি

পুরা পরাধীন মুল্লুক এত বেশী যে, স্বাধীনতা কুত্রাপি নাই বলিলেই চলে। সঙ্গে সঙ্গে চীনের ঐক্যও অন্তর্হিত হইয়াছে। বোধ হয় বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের অবসানেই চীনের বুকের উপর বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের তাণ্ডব সুরু হইবে।

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতে সমাহার (সেন্সাস)

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা]

দ্বি-সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যে আদমসুমারীর একরূপ ব্যবস্থা ছিল, ইহা জানিলে সকলেই আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে নিম্নোদ্ধৃত অংশে ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

"তৃতীয় অধ্যক্ষ সমিতি কোথায় এবং কিরূপ ভাবে কাহার জন্ম বা মৃত্যু হইল, তাহার অনুসন্ধান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কর নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্যই যে কেবল ইহা করা হইত তাহা নয়, প্রজাদের উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু কত হইল, তাহা রাজ-সরকারের জ্ঞানগোচরে থাকে, ইহাও এই ব্যবস্থার একটা উদ্দেশ্য ছিল।" *

এই সব বিবরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম বৃত্তান্ত আমরা পাই, তাহাও মেগাস্থিনিসের এই উক্তির সমর্থন করিতেছে। অধীনস্থ স্থান সমূহেরও প্রজাবর্গের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান যে রাজ-সরকারের পক্ষে কতদূর প্রয়োজন, তাহা না বলিলেও চলে। চন্দ্রগুপ্তের সুশৃঙ্খল শাসন-পদ্ধতিতে এই সব বিবরণ সংগ্রহের বিশেষ একটা ব্যবস্থা থাকিবে ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আধুনিক এই যুগে যে সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যে ভাবে যে সব বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করা হয়, সেই প্রাচীন যুগে ঠিক সেই উদ্দেশ্যে সেই ভাবে সেই সব বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ করা হইত না, ইহা আমাদিগকে ধরিয়াই লইতে হইবে।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালীন আদমসুমারী ব্যাপারে এখনকার মত নির্দ্দিষ্ট কাল পরে পরে এই সব বিবরণ সংগ্রহ করা হইত না। স্থায়ী একটা নিয়ত প্রথা রূপেই ইহা প্রবর্ত্তিত ছিল। বিশেষ একটা রাজকীয় বিভাগে নিযুক্ত স্থায়ী রাজকর্ম্মচারিগণের হস্তেই এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকিত। এই বিভাগটা রাজসরকারের বড় একটা বিভাগ ছিল, এবং অনেক কর্ম্মচারীর দ্বারা এই বিভাগের কার্য্য পরিচালিত হইত। প্রধান কর্ম্মচারীর নাম ছিল সমাহর্ত্তা, অর্থাৎ সমাহার বা সংগ্রহের কর্ত্তা। এই বিবরণ সংগ্রহ সম্পর্কিত কার্য্য ব্যতীত, আরও কয়েকটা কার্য্যের ভার তাঁহার উপরে থাকিত, যথা—রাজস্ব সংগ্রহ, হিসাব পরিদর্শন, জরিপ ইত্যাদি। তাঁহার শাসনাধীন দেশকে প্রথমে চারিটী স্থান বা জিলায়, তার পর প্রত্যেক জিলাকে বহু গ্রামে ভাগ করা হইত। প্রত্যেক 'স্থান' বা জিলার উপরে 'স্থানিক' নামে একজন প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন। ইহার অধীনে গ্রামের কার্য্য পরিচালনার জন্য যে সব কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেন, তাহাদের নাম ছিল 'গোপ'। 'স্থানিক'-গণ এই গোপদের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। এই বিভাগের সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষ 'সমাহর্ত্তা'র নির্দ্দেশ অনুসারে পাঁচ বা দশটি করিয়া গ্রামের ভার এক একজন গোপের উপরে দেওয়া হইত। * গোপ ও স্থানিকগণের কার্য্যের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য 'প্রদেষ্টা' বা ইনস্পেক্টর নামে একদল রাজপুরুষ নিযুক্ত থাকিতেন। এই প্রদেষ্টাগণের নিয়োগই যথেষ্ট বলিয়া বিবে-

* মেগাস্থিনিস্—তৃতীয় ভাগ, ৩২ খণ্ড।

* অর্থশাস্ত্র, সমাহর্তৃ প্রচার, ২য় ভাগ, ১০১, ১৪২ পৃঃ।

চিত হইত না। সমাহর্ত্তা অনেক চরও নিযুক্ত করিতেন। এই চরগণ নানারূপে ছদ্মবেশে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করতঃ সমাহর্ত্তাকে জ্ঞাপন করিতেন। চর-দের কার্য্যক্ষেত্র যে কেবল গোপদের কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত তা নয়। এমন অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান তাহাদের করিতে হইত, যাহাতে 'গোপ'গণের সহায়তা তাহাদের প্রয়োজন হইত। ইহা ব্যতীত স্বতন্ত্র ভাবে আরও অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান ইহারা করিতেন। নিম্নে ইহা বিবৃত হইবে।

গ্রাম্য জমীর জরীপ ব্যতীত গোপগণকে নিম্নলিখিত কর্ম্মগুলি নির্ব্বাহ করিতে হইত। * যথা—(১) প্রত্যেক গ্রামে চারি বর্ণের অধিবাসীদের সংখ্যা গণনা, (২) কৃষক, গোপালক, বণিক, শিল্পী, দাস, প্রত্যেক গৃহের বালবৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ সকলের সংখ্যা গণনা এবং তাহাদের চরিত্র, কর্ম্ম, আয় (আজীব) এবং ব্যয় নির্দ্ধারণ, (৩) প্রত্যেক গৃহের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যা, করদাতা ও করমুক্ত পরিবারের সংখ্যা নির্দ্ধারণ এবং প্রত্যেক গৃহ হইতে কি পরিমাণ স্বর্ণ, অবৈতনিক শ্রম, কর ও অর্থদণ্ড আদায় হয় তাহার বৃত্তান্ত সংগ্রহ।

জমির জরিপ এবং রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত কার্য্য ব্যতীত চর-দিগকে নিম্ন লিখিত কর্ম্মগুলি নির্ব্বাহ করিতে হইত। (১) প্রত্যেক গ্রামের মোট অধিবাসীদের এবং গৃহ ও পরিবারবর্গের সংখ্যা গণনা; এবং প্রত্যেক পরিবারের জাতি ও কর্ম্মের হিসাব। (২) কর মুক্ত গৃহগুলির সংখ্যা নির্দ্দেশ। (৩) প্রত্যেক পরিবারের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্দ্ধারণ। (৪) প্রত্যেক গৃহের গৃহপালিত জন্তুদের সংখ্যা নির্দ্ধারণ।

এই পর্য্যন্ত গোপ-দের কার্য্য এবং চর-দের কার্য্য যে একরূপ সমান তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। ইহা ব্যতীত চর-দিগকে অতিরিক্ত আরও কতকগুলি বিষয়ের অনুসন্ধান নিতে হইত। † যথা—গ্রামবাসীদের দেশত্যাগ করিয়া যাওয়ার এবং নূতন লোকের গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপনার কারণ অনুসন্ধান, ইহাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ, এবং সন্দেহভাজন নরনারীদের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখা। এই সব কার্য্য 'গৃহপতিক ব্যঞ্জন' হইয়া, অর্থাৎ ছদ্মরূপে গৃহপতি হইয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাহ করিতে হইত। 'তাপস ব্যঞ্জন' হইয়া, অর্থাৎ ছদ্ম তাপস সাজিয়া ইহারা কৃষক, গো-পালক, বণিক, রাজকীয় বিভাগ সমূহের অধ্যক্ষগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিত। * কখনও চোর, শত্রু এবং দুষ্ট লোকদের ধরিবার জন্য 'চোরব্যঞ্জন' অর্থাৎ ছদ্মবেশী চোর হইয়া অনুচরগণের সঙ্গে ইহারা তীর্থস্নানের ঘাট, জনশূন্য স্থান, পাহাড়-পর্ব্বত, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ যেখানে আছে, এইরূপ স্থানে বিচরণ করিত।

রাজধানী এবং অন্যান্য নগরের আদমসুমারীর কার্য্য নাগরক নামক কর্ম্মচারীবর্গের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। † প্রত্যেক নগরে একজন করিয়া নাগরক থাকিতেন এবং প্রদেশের ন্যায় এক একটী নগর চারিটি বিভাগে বা 'স্থানে' বিভক্ত হইত, এবং এইরূপ এক একটি 'স্থানের' ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নামও ছিল 'স্থানিক'। স্থানিকদের অধীনস্থ নিম্নতর নাগরিক কর্ম্মচারীদের নামও ছিল, 'গোপ'। দশ, বিশ, বা চল্লিশটি করিয়া গৃহের সকল বিবরণ এক একজন গোপকে রাখিতে হইত। প্রত্যেক গৃহের অধিবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের জাতি, গোত্র, নাম এবং বৃত্তি এবং তাহাদের আয় ব্যয়ের সকল বৃত্তান্ত ইহাদের নির্দ্ধারণ করিতে হইত। বিদেশী পর্য্যটক এবং বাহিরের অন্য লোক যাহারা নগরে আসিত যাইত, তাহাদের হিসাব রাখা বড় কঠিন। ‡ এই কাজটি যাহাতে অপেক্ষাকৃত সহজ হয় তাহার জন্য মঠ, অতিথিশালা প্রভৃতি সদাব্রতের আশ্রম সমূহের পরিচালক-বর্গের উপরে এইরূপ আদেশ ছিল যে, কোন লোক তাঁহাদের আশ্রমে আসিলেই তাঁহারা আদমসুমারীর কার্য্যালয়ে সংবাদ পাঠাইবেন। § গৃহপতিগণের উপরেও এইরূপ আদেশ ছিল যে, বিদেশী কোনও অতিথি তাহাদের গৃহে

* অর্থশাস্ত্র, ২য় ভাগ, সমাহর্ত্তৃ প্রচার, ১৪২ পৃঃ।

† ঐ সমাহর্ত্তৃ প্রচার, ২য় ভাগ, ১৪২ পৃঃ।

* অর্থশাস্ত্র, সমাহর্ত্তৃ প্রচার, ১৪৩ পৃঃ।

† অর্থশাস্ত্র, নাগরকপ্রণিধি, ২য় ভাগ, ১৪৩, ১৪৪ পৃঃ

‡ ঐ „ ১৪৪ পৃঃ।

§ ঐ „ ১৪৪ পৃঃ।

আসিলে, রাজকর্ম্মচারীদিগকে তাঁহারা সংবাদ দিবেন। কেহ এই সংবাদ না পাঠাইলে তাহার অর্থদণ্ড হইত। নাগরিক শাসন কার্য্যাদি সুপরিচালনার জন্য, নাগরিক দণ্ডবিধিতে এরূপ ব্যবস্থাও ছিল যে, ব্যবসায় সম্বন্ধীয় অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিহিত কোনও ব্যবস্থা কেহ লঙ্ঘন করিলে, বণিকগণ, শিল্পজীবিগণ এবং বৈদ্যগণও সে কথা, রাজধানীর প্রধান নাগরককে জ্ঞাপন করিবেন। তবে ইহা আদমসুমারীর অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে এখানে কিছু আলোচনার আবশ্যক নাই

আদমসুমারী যাঁহারা করিতেন, সেই সব কর্ম্মচারীদের হস্তেই যে জরিপ কার্য্যের ভার ছিল, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই জরিপ কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ গ্রামের সীমানা নির্দ্দেশ করিতেন। এবং কৃষ্ট কি অকৃষ্ট (আবাদী কি পতিত) পাহাড়ী কি (বাদার) জলা, কি শুষ্ক এই সব হিসাবে কোন্ জমির প্রকৃতি কিরূপ, এবং বিভিন্ন প্রকৃতির জমি কোথায় কত খণ্ড আছে তাহা নির্দ্ধারণ করিতেন। উদ্যান, বন, মন্দির, তীর্থ, সত্র (আহারের স্থান), সেতুবন্ধ, পথ, শ্মশান, পথিকদের জন্য দোকান, এবং পশুচারণ ভূমি কোথায় কি আছে তাহারও বিবরণ ইঁহাদিগকে রাখিতে হইত। * পরিদর্শক নামে ইঁহাদের সহায়ক একদল কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহারা এই সব গ্রামের জমা, বাসগৃহ এবং পরিবার সমূহ সম্বন্ধীয় সকল বিবরণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

উপসংহারে প্রাচীন ভারতে এই আদমসুমারীর লক্ষ্য ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে হইবে। দেশের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক উভয়বিধ প্রয়োজনের দিকেই ইহার লক্ষ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য চারিদিকেই বহু শক্রর রাজ্যে পরিবেষ্টিত ছিল। সুতরাং এই রাজ্য যাহাতে নিরাপদে থাকে তাহার জন্য আভ্যন্তরিক যে সকল অবস্থার, যে সব তথ্যের সূক্ষ্ম বিবরণ রাজা ও রাজপুরুষগণের সুবিদিত থাকা আবশ্যক, এই আদমসুমারীর ব্যবস্থা হইতে সেই সব সংগৃহীত হইত, সুতরাং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ইহার বিশেষ সার্থকতা ছিল। এই সমাহার বা আদমসুমারী বিভাগের কর্ম্মচারীবর্গের বিশেষ একটী কর্ত্তব্য ছিল এই যে, তাঁহারা সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের এবং বিদেশী চর-দের গতি-বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন এবং অবিদিত চরিত্র নর-নারী যাহারা দেশ ছাড়িয়া যায় বা দেশে নূতন আসে, তাহাদের উপরেও দৃষ্টি রাখিবেন এবং এই যাতায়াতের কারণ অনুসন্ধান করিবেন।

এই সব বিষয় ঠিকভাবে জ্ঞান-গোচরে থাকা রাজ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক ব্যাপারে এই সমাহার অন্য রকমেও কাজে লাগিত। গ্রাম সমূহ যে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম, কনিষ্ঠ কেবল এই হিসাবেই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইত, তা নয়। অন্য রকম শ্রেণী-বিভাগও ছিল। * যথা, 'পরিতারক (কর-দায় হইতে মুক্ত) 'আয়ুধীয়'– যে সব গ্রাম সৈন্য যোগাইত, ও 'কুপ্য'—যে সব গ্রাম অর্থের পরিবর্ত্তে শস্য, পশু, স্বর্ণ ও বনজাত দ্রব্যাদি দ্বারা কর দিত; 'বিষ্টি'—সে সব গ্রাম বেগারী মজুর যোগাইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সব গ্রাম হইতে সহজে রাজকীয় সৈন্য সংগ্রহ হইতে পারে, এই সমাহার বৃত্তান্ত হইতেই রাজ-সরকার তাহা জানিতে পারিতেন।

গ্রাম সমূহের শ্রেণী বিভাগ, এবং প্রজাবর্গের বৃত্তি এবং আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় সকল বৃত্তান্তের সংগ্রহ করিয়া রাখা —দেশের অর্থ নৈতিক হিসাবেও যে কত প্রয়োজন তাহা না বলিলেও চলে। কর নির্দ্ধারণে ইহার সহায়তা অতুলনীয়। দেশের মোট আর্থিক অবস্থা নিরূপণের ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় আর হইতে পারে না। †

* অর্থশাস্ত্র, সমাহর্ত্তৃ প্রচার, ১৪২ পৃঃ।

* অর্থশাস্ত্র, সমাহর্ত্তৃ প্রচার।

† এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা—নব সংস্করণের পঞ্চম খণ্ডে ৬৬২ পৃষ্ঠায় প্রাচীনকালে অন্যান্য কয়েকটী দেশে আদমসুমারী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় :—

মিশর হইতে স্বদেশ যাত্রাকালে য়িহুদিদিগের যোদ্ধৃশক্তি কিরূপ ছিল, বিংশতি হইতে উদ্ধতন বয়স্ক সমস্ত পুরুষদের সংখ্যা হইতে নির্দ্ধারিত হইত। প্রত্যেক গোত্রের জন্য নিযুক্ত এক একজন লোক এই সংখ্যা গণনা করিতেন। লেভী গোত্রিয়েরা যাজকতা করিত, সুতরাং তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইত না। পৃথক ভাবে ইহাদের মধ্য হইতে ৩০ বৎসরের উর্দ্ধতন পুরুষদের সংখ্যা গণনা করা হইত। যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মমন্দিরের কার্য্য শাস্ত্র বিধান অনুসারে

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

পরলোকে জীবাত্মার অবস্থা

১। চিৎ-তত্ত্ব সভার প্রাপ্ত সংবাদ

মৃত্যুর পর জীবাত্মার কিরূপ গতি হয়, বা কিরূপে তাহার অবস্থিতি ঘটে, সে সম্বন্ধে চিৎ-তত্ত্ব সভার পরীক্ষা ও গবেষণা-লব্ধ ফল হইতে যতটুকু জানা যায়, তাহা সার অলিভার লজ্ তাঁহার Survival of Man গ্রন্থের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে ইংরাজীটা তুলিলাম না। অনুবাদ করিয়া মর্ম্ম দিলাম।

প্রথমতঃ—যে কথাটী আমরা শিখি তা হচ্চে আত্মার মরণান্ত অবস্থিতি; মরণের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মচৈতন্যের একদম শেষ হয় না; ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক সমস্ত লক্ষণ বিশেষত্বই বর্ত্তমান থাকে, আত্মার নিজ সম্বলগুলি যথাঃ—স্মৃতি, সংস্কার, শিক্ষা, অভ্যাস, চরিত্র, স্নেহ-মমতা, রুচি, পসন্দ অপসন্দ, আসক্তি অনাসক্তি (ভাল মন্দ দুই-ই) সব সঙ্গে যায়, যায় না কেবল পার্থিব সম্পত্তি রূপ যৌবন, টাকাকড়ি, যশ মান, শারীর বৈকল্য ও সুখ দুঃখ—এ সব স্থূল দেহের সঙ্গেই চলে যায়।

দ্বিতীয়তঃ লোকান্তর হলেই যে আত্মার জ্ঞান মাত্রা হঠাৎ অসম্ভব রূপে বাড়ে তা নয়, আমাদের আত্মত্ব কিছু

বিভাগ করিয়া দিবার সুবিধা হইবে, এইজন্য পরবর্ত্তী কালে বিখ্যাত য়িহুদীরাজ সলোমনও এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাজা দায়ুদের আদেশে জোয়াব অনিচ্ছায় যে আদমসুমারী করিয়াছিলেন, তাহাতে কেবল যোদ্ধগণের সংখ্যা গণনা করা হয়। ইহাতে যে কুফল ঘটিয়াছিল, তাহার কথা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত লোকে এইরূপ গণনায় অমঙ্গল সম্ভাবনা দেখাইবার জন্য উল্লেখ করিত। এরূপও মনে হয় যে, বেবীলনে য়িহুদিদের দাসত্বের যুগেও প্রত্যেক গোত্রের লোকসংখ্যার একটা তালিকা রাখা হইত এবং দাসত্ব মুক্তির পর জিরুযালেমে ফিরিয়া আসিলে তাহা প্রচার করা হয়।

কর নির্দ্ধারণের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের আর্থিক আয় কিরূপ তাহা নিরূপণ করিবার একটা পদ্ধতি প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যেও ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রদেশের রাজস্ব এবং প্রজাবর্গের সামরিক দায়িত্ব স্থির করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীন চীনেও এইরূপ একটা প্রথা ছিল। প্রাচীন মিশরে রাণা এমেসিস্ প্রতি বৎসর প্রজাদের বৃত্তির একটা তালিকা প্রস্তুত করাইতেন। কোনও রূপ অসাধুবৃত্তি অবলম্বনে বাধা দিয়া রাজপুরুষগণ প্রজাদের মধ্যে সুনীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যেই এই তালিকা প্রস্তুত হইত। হিরোডোটাস্ বলেন, এই বিধি সোলন এথেন্সের গণতন্ত্র শাসনে ভোটার (voter)দের তালিকায় পরিণত হয়।

রোমে এই লোক গণনা ব্যাপার প্রথমে একটা সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালীর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই লোক গণনায় ইংরেজি সেন্সাস্ (census) শব্দটীও রোমীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রথম সেন্সাস্, সার্ভিয়াস্ টুলাস্ করান বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার নামে যে রাষ্ট্র পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহাতে এরূপ ব্যবস্থা হয় যে, প্রত্যেক ৫ বৎসরের লোকসংখ্যা এবং প্রত্যেক পরিবারে ভূমি, পশু, দাস এবং দাসত্ব মুক্ত ভৃত্য প্রভৃতি লইয়া অধিকৃত সম্পদ কি আছে, তাহার একটা গণনা হইবে। সমগ্র প্রজাবর্গের মধ্যে প্রধান ছয়টি শ্রেণী ও তাহাদের শাখা সমূহ ধন ও জন সংখ্যায় ঠিক ভাবে ভাগ করা থাকে, ইহাই এই গণনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। নগরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেন্সাস্ কার্য্যেরও গুরুত্ব বাড়িয়া উঠিল। তখন সেন্সাসের পরে 'লাষ্ট্রম' নামে বৃহৎ একটা রাজকীয় শুদ্ধিযজ্ঞ হইত, সেন্সাস্ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেন্সর নামক কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গের মঙ্গল কামনায় এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। এইজন্য দুইটী সেন্সাসের মধ্যবর্ত্তী পঞ্চ বৎসর কালের নামও 'লাষ্ট্রাম' হইয়াছিল। সেন্সাস্ কথাটিও যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির অর্থাগমের তালিকা সংগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হইত, তেমনই এক এক সম্প্রদায়ের মোট আর্থিক শক্তির অর্থেও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। ক্রমে আর্থিক অবস্থার হিসাবে নির্দ্ধারিত 'কর' অর্থেও ইহারই প্রয়োগ হয়। ইহারই সংক্ষিপ্তরূপ বর্ত্তমান সেস্ (cess) শব্দে আমরা দেখিতে পাই।

মাত্র বদলায় না ; তবে মানসিক বৃত্তি বা শক্তিগুলো আর একটু তীব্র হয় ; বিশ্বজগত সম্বন্ধে ধারণাটা বাড়ে, তাও পার্থিব জীবনের কাজ-কর্ম্মের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি কোনো লোক জীবিত কালে মানসিক উচ্চ শক্তি বা বৃত্তিগুলির অনুশীলনে কাল কাটায় তা হলে পরলোকে তার এ বিষয়ে সুবিধা হবে, তার মানে স্থূলের বাধা নাশে এই সূক্ষ্ম শক্তিগুলির আরো বিকাশ হবে ; পক্ষান্তরে যাদের ইহজীবনটা পার্থিব বিষয় আশয়, সুখ দুঃখ ভোগাভোগের লালসায় কেটে গিয়েছে, তারা দেহান্তে পরলোকে গিয়ে অনেকটা অসুবিধা ভোগ করবে, অর্থাৎ এই সব ভোগের চরিতার্থতার উপায় না থাকাতে তার মানস শক্তিগুলি মুহ্যমান হয়ে থাকবে। (তার কারণ ইহজীবনে সে ওই শক্তিগুলিকে শুধু স্থূল বিষয় সম্ভোগে নিযুক্ত রেখেছিল, উচ্চ ভাবের আলোচনায় লাগায় নি)।

Dr. A. R. Wallace (যিনি Darwinএর সঙ্গে এক যোগে ক্রমাভিব্যক্তির নিগূঢ় রহস্য ভেদ করেন) আত্মার পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য—"পরলোকেও আত্মার মানসিক ও নৈতিক ক্রমোন্নতি ইহলোকের সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন ধারায় চলিতে থাকে, ইহজীবনের কর্ম্ম পরজীবনের উন্নতি অবনতির ভিত্তিস্বরূপ। পারলৌকিক সুখ দুঃখ ইহলৌকিক কর্ম্মের উপর পুরামাত্রায় নির্ভর করে।" "As we sow, so we reap"—নীতি মরণের ওপারের দেশেও বলবৎ। পূর্ব্বজন্ম, ইহজন্ম ও পরজন্ম এক মহাকারণ সূত্রে গ্রথিত। যেমন ইহজীবনে শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য ক্রমিক ভাবে কার্য্যকারণ ভাবে সম্বদ্ধ, তেমনি আত্মার অনন্ত জীবন-স্রোতে এই জন্ম-জন্মান্তরগুলি।

চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতি ৩০ বৎসর ব্যাপী পরীক্ষা ও প্রেক্ষণের ফলে মুক্তাত্মার পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে যা কিছু জানিয়াছেন তার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কথাকয়টাই সার। মুক্তাত্মার অবস্থা ও কাজকর্ম্ম ইত্যাদি সম্বন্ধেও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তবে চিৎতত্ত্ব-সমিতি সেগুলির প্রামাণিকতার অভাব বশতঃ তাহা বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করেন নাই। তথাপি এ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক আছে ; তন্মধ্যে ডাক্তার হেয়ারের পুস্তক, Alfred Stead সাহেবের After death * এবং Stainton Mosesএর Spirit Teachings নামক বই কয়খানিতে এ সম্বন্ধে যা পাওয়া গিয়াছে, পর প্রবন্ধে তাহার বিবরণ তুলিয়া দিতেছি। যাঁহারা এসব জানিতে কৌতূহলী, তাঁহারা অনেকটা মনে শান্তি পাইবেন।

মৃত্যু কি ? মৃত্যুর সময় জীবাত্মা কি করিয়া দেহ-মুক্ত হয় ; পরে কি অবস্থা হয়. মুক্তাত্মার পারলৌকিক অবস্থা, আশা আকাঙ্খা, জীবনের লক্ষ্য, শক্তি সামর্থ্য, সাধ-বাসনা ইত্যাদি কিরূপ, তাহার পরিচয় দেওয়া যাইবে।

সমস্ত বিবরণই আহুত ও আলাপশীল বিশ্বাসী প্রেত মুখ হইতে প্রাপ্ত। †

(সভার বাহিরে অন্য প্রেতবৈঠকে প্রাপ্ত বার্ত্তা)

পরলোক কিরূপ স্থান, মুক্তাত্মারা পরলোকে কি ভাবে থাকে, তাহাদের জীবনযাপন প্রণালী কি রকম, এই সব তত্ত্ব যা প্রেতমুখে পাওয়া গিয়াছে, তা প্রামাণিক নয় ; অর্থাৎ এসব কথা যে সত্য তা মিলাইয়া লইবার উপায় নাই ; যদি তাই হয়, কথা হইতে পারে, তাহা হইলে উহাদের আলোচনায় ফল কি ?

ফল আছে। চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির সভ্যগণ পরীক্ষা করিতে করিতে গৌণভাবে প্রেতমুখে পরলোক সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছেন ; প্রামাণিক নয় বলিয়া বেশী-ভাগই লিপিবদ্ধ করেন নাই ; এখন যাঁহারা নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন যে, দেহান্তে জীবাত্মা সজ্ঞান ভাবে বিদ্যমান থাকে, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের পরকাল-জীবন সম্বন্ধে জানিতে চাহিবেন, ও প্রেতকথিত বৃত্তান্তে বিশ্বাস করিবেন ; না করিবেনই কেন ? বিজ্ঞান যদি একরূপ নিশ্চিত ভাবে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে যে, মানুষ মৃত্যুর পরও থাকে, তাহা হইলে কি ভাবে থাকে, কোথায় থাকে, এসব কথা যদি তার মুক্তাত্মা বলে তা' অবিশ্বাস করিবার হেতু কি ? প্রমাণ নাই সত্য, কিন্তু মিথ্যাই বা কেন বলিবে, তারই বা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ কৈ ?

* সংকৃত এই গ্রন্থের অনুবাদ বাঙ্গলায় প্রকাশিত শীঘ্রই হইবে।

† সার লজ প্রাপ্ত রেমণ্ডবার্ত্তা দ্রষ্টব্য। গ্রন্থের নাম Raymond.

মরণান্তে মানুষের আত্মা দেহমুক্ত হইলেই যে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চনাপরায়ণ হইবে, ইহাই কি সম্ভব? অন্তত: যাঁহারা ইহজীবনে মহাধার্ম্মিক ও সত্যবাদী বলিয়া বিদিত ছিলেন, তাঁহারা কি উর্দ্ধগামী হইয়া হীনচরিত্র হইয়া যাইবেন?

কাজেই দেহান্তে আত্মার স্বতন্ত্র ও সজ্ঞান অবস্থিতি যদি ধারণাসম্ভব বৈজ্ঞানিক-সত্য হয়, তবে তার প্রমুখাৎ পরলোক-সংবাদ যে অসত্য হইবে তাহা ন্যায়বুদ্ধির অগম্য; সুতরাং এপর্য্যন্ত যে সব বিবরণ পরকাল ও পরলোক সম্বন্ধে পাওয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গকে জানাইতে কোনো ক্ষতি দেখি নাই।

(ক) পরলোক বর্ণনা

মুক্তাত্মাদের প্রেরিত বার্ত্তা হইতে বুঝা যায় যে:— ভূতল হইতে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ উপর হইতে পরলোক আরম্ভ। উপর্য্যুপরি ছয়টী লোকে (plane) পৃথিবীকে বৃত্তাকারে বেষ্টন করিয়া এই পরলোক বর্ত্তমান। ভূলোক লইয়া সর্ব্বসমেত সাতটী লোক; সকলেরই এক কেন্দ্র (in concentric circles)। প্রত্যেক পরলোক আবার ছয়টী অন্তর্লোকে বিভক্ত। সবগুলি বিস্তৃতিতে সমান। প্রত্যেক লোকের বা অন্তর্লোকের সীমানার কোনো প্রত্যক্ষ চিহ্ন নাই। মুক্তাত্মারা বিশেষ প্রকার অনুভূতি বলে লোক-ভেদ বুঝিতে পারে। এই পরলোক, ভূলোক ও চন্দ্র-লোকের মধ্যস্থ আকাশ-ভূমিতে নিবদ্ধ।

মানবীয় মুক্তাত্মারা দেহত্যাগের পর নিজ নিজ আধ্যাত্মিকতা অনুসারে এক এক পরলোকের অধিকারী হয়। ঐহিক জীবনে উপার্জ্জিত ধর্ম্ম, চরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা পরলোকের উচ্চ বা অধঃস্তরের অধিকারী হয়। এক এক লোকের অধিকারীদের মাথার চারিদিকে একটা জ্যোতির্ম্মণ্ডল থাকে; এই জ্যোতির্ম্মণ্ডল দেখিয়া মুক্তাত্মারা পরস্পরে বুঝিতে পারে, কে কোন্ লোকের অধিবাসী। এমন কি, মর্ত্ত্যবাসী দেহীদেরও মাথার চারিদিকে এই মণ্ডল দেখা যায়। মানুষে তাহা দেখিতে পায় না। মুক্তাত্মারা তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারে কোন্ মানুষ দেহান্তে কোন্ লোকের অধিকারী হইবে।

ভূলোকের উর্দ্ধেই যে প্রথম পরলোক তাহার বিস্তৃতি উর্দ্ধতন বাকী পাঁচ লোকের বিস্তৃতির যোগফল সমান। ইহাই প্রেতলোক বা গ্রীকদের Hades. অধম রিপুপরায়ণ লোকদের মরণান্তে এইখানে গতি হয়। ইহারই উর্দ্ধলোকে (৩ সংখ্যক পরলোক) অর্থাৎ পিতৃলোকে সাধারণ ধার্ম্মিকদের আত্মার বাসভূমি।

যে মানুষ যত ধার্ম্মিক, চরিত্রবান বা জ্ঞানী, তাহার গতি তত উর্দ্ধলোকে।

দুইটী বিশেষ গুণের অধিকারীরা উর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। যাহারা প্রেম-ধর্ম্মী ও যাহারা প্রেম ও জ্ঞানধর্ম্মী অর্থাৎ শুদ্ধ ভক্তিমার্গী ও ভক্তি ও জ্ঞানমার্গী। ইহজীবনে যে মানুষ নিঃস্বার্থ প্রেমিক হয় বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার হয়, তাহাদের আত্মার উর্দ্ধগতি তত শীঘ্র হয়। উর্দ্ধলোকবাসী মুক্তাত্মারা অধঃলোকে নামিতে পারে; কিন্তু অধঃলোক-বাসীরা উর্দ্ধলোকে যাইতে পারে না।

পার্থিব প্রেম, স্নেহ, মায়া, মমতা দেহান্তে প্রবলতর হইয়া আত্মাকে অসীম সুখের অধিকারী করে। হীন ভাব বা প্রবৃত্তি লোপ পায়। শাস্তি স্বরূপ আত্মার অধঃলোকে গতি হয়; তাও কেবল আত্মার সংস্কারের জন্য। স্বচেষ্টায় উন্নতি করিতে পারিলে আবার উহার উর্দ্ধগতি হয়।

উর্দ্ধলোকবাসী আত্মারা অধঃলোকবাসী আত্মা বা দেহধারী মানুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে, কিন্তু বিশ্ব বিধানের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে না। ঐহিক কোনো বাসনা কামনা পূর্ণ করিবার তাহাদের অধিকার থাকে না। উর্দ্ধলোকবাসী আত্মারা সর্ব্বকাম। উচ্চ জাতীয় সাধ বা বাসনা (যাহাতে উর্দ্ধগতি হয়) ইচ্ছামাত্রে পূর্ণ করিতে পারে। অস্তিত্বের অনুকূল যাহা কিছু কার্য্য তাহাই পূর্ণ মাত্রায় লাভ করিতে পারে। বেচাকেনা বলিয়া কিছু নাই; কাম্য দ্রব্যমাত্রই যথা ইচ্ছা ভোগ করিতে পারে; ভূলোকে আলো বাতাসের মত সে সব তাহাদের ইচ্ছালভ্য।

ঐহিক দাম্পত্য সম্বন্ধ বজায় রাখা না রাখা মুক্তাত্মার ইচ্ছাধীন। পৃথিবীর যৌন সম্বন্ধ অপ্রীতিকর হইলে তাহা স্বেচ্ছায় না-মঞ্জুর করিতে পারে। যাহার সহিত যাহার আত্মার মিলন স্বাভাবিক আকর্ষণে ঘটে, তাহার তাহাই

বজায় থাকে। পরলোকের এই দাম্পত্য মিলনের সুখ ঐহিক সুখ হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। উহার স্বাদ ও মাত্রা স্বর্গীয়।

এই সব পরলোক এক স্বতন্ত্র মধ্যবর্ত্তী spiritual সূর্য্য হইতে জ্যোতিঃ ও শক্তি লাভ করে। পার্থিব সূর্য্যের সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই।

পরলোকবাসী আত্মারা এক অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বায়বীয় পদার্থ শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা গ্রহণ করে। উহা পৃথিবীর পণ্ডিতদের অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত। অক্সিজেন বাষ্পের সহিত উহা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। দেহধারী আত্মারাও উহা হইতে প্রাণশক্তি লাভ করে।

[এই সপ্তস্তর সংবলিত পরলোকের ধারণা প্রায় সব ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায়: হিন্দুদের ভূ, ভুবঃ, স্বর্গ, জন, মহ, তপ, সত্য প্রভৃতি সপ্তলোক ধারণা এই জাতীয় মুসলমানরাও এইরূপ সপ্তস্বর্গের ধারণা করিয়াছে, প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও ইহার বিশ্বাস ছিল।]

(খ) মৃত্যুর অব্যবহিত পরাবস্থা

মানুষের মৃত্যুকালে তাহার আত্মাকে লইয়া যাইবার জন্য তার পরলোকবাসী আত্মীয় স্বজনের মুক্তাত্মারা আসে। ইহা অনুসন্ধানে সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আরথার হিল প্রণীত Psychical Investigations গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সহকারে বিশেষ আলোচনা আছে।

আসন্ন-মৃত্যু রোগীরা যে মৃত্যুকালে শয্যাপার্শ্বে এইরূপ মৃত আত্মীয় স্বজনের প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পান, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত অনেকেরই জানা আছে। সাধারণতঃ লোকে উহাকে বিকার-দৃষ্টি বলিয়া উড়াইয়া দেন; কিন্তু বাস্তবিক উহা বিকার প্রলাপ নহে। মৃত্যুকালে মানুষের জ্ঞানশক্তি অসম্ভব মাত্রায় সুস্পষ্ট হয়; সেই দিব্যজ্ঞানে তাহার তখন অদ্ভুত দৃষ্টি ও শ্রুতিশক্তির বিকাশ হয়, তখনকার তাহার অনুভূতিগুলিকে আমরা প্রলাপ ব্যাপার বলিয়া উড়াইয়া দি। যদি কেহ এ সম্বন্ধে প্রমাণ চান তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থের উক্ত অধ্যায় পাঠ করিলে স্বাধীন সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন।

মৃত্যু যদি আত্যন্তিক ধ্বংস না হয়, যদি ইহা অমরাত্মার এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তিই হয়, তবে ইহাই খুব সম্ভবপর হইবার কথা। জীবের জন্ম কালেও আত্মার গর্ভবাসরূপ অবস্থা হইতে ধরাবাসরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি। তখন আত্মীয়-স্বজন কিরূপ আনন্দোৎসবে নবাগতকে সম্বর্দ্ধনা করে; আর মৃত্যুকালে যখন সেই আত্মা পুনর্ব্বার উচ্চতর অবস্থায় নীত হয়, তখন তাহার পূর্ব্বগামী আত্মারা তাহাকে সাহায্য করিতে আসিবে, ইহার অসম্ভবতা কোথায়? এইরূপ সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা এই জন্যে যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তাত্মা উর্দ্ধলোকে চলিয়া যায় না; তাহার প্রিয় বাসভূমি ও আপন জনকে ছাড়িয়া যাইতে চাহে না, তা ছাড়া মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আত্মার একটা স্বপ্নাবস্থার মত আসে, এই অবস্থায় সে বুঝিতে পারে না যে তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে; তার মনে হয় যেন ইহলোকেই থাকিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছে; ইহলোকের সঙ্গে তার যে চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে তাহা বুঝিতে পারে না; তারপর যখন বুঝিতে পারে তখন তার একটা ভয়ানক চিত্তাবসাদ ঘটে; মায়াই তাহার কারণ। জীবনের প্রিয় সমস্ত সম্বন্ধ ছেদ করিয়া লোকান্তরে যাইতে হইবে, এই একটা যন্ত্রণাকর চিন্তায় তাহার অস্তিত্ব কষ্টকর হইয়া উঠে; কিন্তু সে যে এক অধিকতর সুখময় আর এক লোকে আসিয়াছে, এখানেও যে আত্মার কর্ম্মানুযায়ী উর্দ্ধগতি আছে, ইহা সে জানে না—কাজেই এই সব বুঝাইয়া তাহাকে পরলোকমুখী করিতে সাহায্য প্রয়োজনীয়।

পরলোকগত আত্মাদের প্রায় সকলেই বলে যে, মৃত্যুর পরমুহূর্ত্তেই বিদেহ আত্মা বুঝিতে পারে না যে, তাহার লোকান্তর ঘটিয়াছে। তার মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখিতেছে, সমস্ত গোলমাল বোধ হয়, কিছু ঠিক করিতে পারে না; পৃথিবীতে যে ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিত, তাহাই করিবার জন্য ব্যস্ত হয়; মৃত ব্যক্তিদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলেও মনে করে নিদ্রাবস্থায় যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। পরলোকবাসীরা বলিয়া দিলেও বিশ্বাস করিতে চায় না যে, তাহার দেহান্ত ঘটিয়াছে।—যাহারা অনেকদিন ধরিয়া রোগে ভুগিয়া মারা যায়, তাহারা মৃত্যুর পর পরলোকে কিছুদিন

ধরিয়া অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় মুগ্ধ বা তন্দ্রাহতের মত পড়িয়া থাকে; মাঝে মাঝে তন্দ্রা ভাঙ্গে, আবার ঘুমাইয়া পড়ে; পরে একটু একটু করিয়া সজ্ঞান ও সজাগ হয়। মৃত্যুর পরই spirit-body বা সূক্ষ্ম দেহটা পূর্ণভাবে সক্ষম ও পুষ্ট হইয়া উঠে না; হইতে কিছু সময় লাগে। সাংঘাতিক আঘাতে দেহটা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেলে বা পুড়িয়া নষ্ট হইয়া গেলে সূক্ষ্ম দেহটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; উহা আবার পূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিতে সময় লাগে। মৃত্যুর পরই দেহ পুড়াইয়া ফেলা ভুল; কেন না, আমরা যাকে মৃত্যু বলি অর্থাৎ নাড়ী ছাড়িলেই, সূক্ষ্ম দেহটা স্থূল হইতে মুক্ত হয় না; অন্ততঃ তিন দিন উহা স্থূলদেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে; আপনি ধীরে ধীরে বাহির হইতে থাকে, সম্পূর্ণ ছেদ হইলে তবে যথার্থ মৃত্যু হয়; তাহার আগে দেহ পুড়াইয়া দিলে সূক্ষ্ম দেহটার বিকার ঘটে। কাজেই উহাকে আবার জড় করিয়া গড়িয়া তুলিতে বেগ পাইতে হয়। যদি পুড়াইয়া ফেলাই দরকার হয়, তাহা হইলে স্থূলের সহিত সূক্ষ্ম দেহটা যে একটা সরু তন্তু দ্বারা যুক্ত থাকে তাহাকে ছিন্ন করিয়া দিতে হয়।

মরণান্তে আত্মার মানসিক অবস্থা

মৃত্যুর পর আত্মার মানসিক অবস্থাটা কিছু দুঃখ ও বিষাদময় থাকে; ইহার কারণ মায়া। প্রিয়-পরিজন ছাড়িয়া যাইবার পর এ অবস্থা সংসারাসক্ত জীবের পক্ষে স্বাভাবিক, পরে মুক্তদেহ আত্মীয়-স্বজন কর্ত্তৃক পরলোকের সুখাস্বাদ বিজ্ঞাপিত হইলে তখন প্রসন্নচিত্ত হয়, এবং পরকালের জীবন নির্ব্বাহে মন দেয়। সংসার-বিরাগী ধর্ম্মরত মানুষের আত্মা মরণান্তে একেবারে পরম সুখের অধিকারী হয়; ইহলোকের প্রতি মায়াসক্ত হইয়া পৃথিবীর কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় না।

মৃত্যুর পরই আত্মা যে লোকে যায় তাহা পৃথিবী হইতে বড় ভিন্ন নয়, সে জগতটা এ জগতের অনুরূপ; এমনি ঘর বাড়ী, জীব জন্তু, গাছপালা সমস্তই সেখানে আছে, কেবল উপাদানভূত পদার্থের স্থূলতার তারতম্য মাত্র। এই স্থূল জগতেরই একটা সূক্ষ্ম সংস্করণ মাত্র। ইহারই সহিত ওতঃ-প্রোত ভাবে জড়িত। যেমন আমাদের স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম-দেহ তেমনি। কোনো এক প্রেতাত্মা বলে যে, স্থূল জগত হইতে অনবরত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণা সকল উর্দ্ধে উঠিতেছে; এই সকল কণাকে প্রেতরা মানস-শক্তি বলে, যথা-ইচ্ছা আকার দিয়া নিজ মনমত দ্রব্যাদি গড়িয়া লয়।

খাওয়া, শোওয়া, বসা, পোষাক করা, কাজকর্ম্ম করা সমস্তই এ জগতের মত। নর নারী, শিশু যুবা, বৃদ্ধ ভেদ এখানকারই মত।

মানসিক শক্তি—বুদ্ধিবিচার, তর্ক সমস্তই ইহলোক অপেক্ষা তীব্রতর ভাবে ক্রিয়াশীল। সুখ-দুঃখ বোধও পার্থিব দেহ হইতে খুবই তীব্রতর ভাবে ও অধিক মাত্রায় ঘটে। একটা কথা স্পষ্ট বুঝা যায়, আমরা যেমন ইহজীবনে ইন্দ্রিয় সংযোগে বিষয় জ্ঞান লাভ করি, মুক্তাত্মারা সেরূপে জ্ঞানলাভ করে না; অনেক ক্ষেত্রে মনরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহারা বিষয় অনুভব করে; মাঝখানে জড় ইন্দ্রিয় সাহায্য দরকার হয় না।

ইহজীবনের কর্ম্মের উপর যেমন পরকালের ভাল মন্দ নির্ভর করে, পরকালের কর্ম্মের উপরও তেমনি উচ্চতর পরজীবনের সুখ-দুঃখ নির্ভর করে; কাজেই পরলোকেও আত্মাদের নিয়মিত জীবন যাপন আছে, কাজকর্ম্ম অবস্থা ও শক্তি অনুসারে সকলকেই করিতে হয়।

পরলোক জ্ঞানের উপকারিতা কি ?

একটা নূতন আবিষ্কার হইলেই এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা আগে হইতেই জিজ্ঞাসা করেন—'আচ্ছা স্বীকার করছি এটা হয় বা আছে বা হল—তাতে কি এসে গেল? মানুষের তাতে উপকারটা কি?' যাঁহারা সত্যের উপাসক, জ্ঞানলাভ মাত্রই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। লব্ধজ্ঞানে মানুষের কি কাজ হইবে তাহা তাঁহারা ভাবেন না; সে কাজ অপরের। তবে জ্ঞান মাত্রেরই যে একটা কার্য্যকরী মূল্য আছে, তার আর ভুল কি? মানবমনের ক্রিয়াশীলতা নানামুখী, কোন্ জ্ঞানে কি কাজ হইবে, তাহা যে যে-ভাবে উহাকে খাটাইবে সেই ভাবেই পাইবে।

এই যে আত্মার বিদেহ অস্তিত্ব রূপ সত্যটী আবিষ্কৃত হইতে বসিয়াছে, ইহারও যে একটা উপকারিতা না আছে তাহা নহে। প্রথমতঃ—শুদ্ধ জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে ইহা একটা মহালাভ। আমাদের জানা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ

ছাড়া আর একটা যে অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে, আর তাহার সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়বোধ্য জগৎটা যে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, ইহাই একটা পরম লাভ। দ্বিতীয়তঃ—ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিলে এই আবিষ্কারের মূল্য বড় কম নহে—জগতের সমস্ত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি আত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তরবাদ। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে জড়বিজ্ঞানের প্রবল প্রভাব বশতঃ আত্মার দেহাতিরিক্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও জন্মান্তরবাদ কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইতেছে; ইহা বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত সত্য রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে ধর্ম্মের প্রতি অবিশ্বাস কমিতে পারে; লোকে পুনর্ব্বার ধর্ম্মপরায়ণ হইতে চেষ্টা করিতে পারে, এবং সমস্ত ধর্ম্ম সংস্কৃত ও সমুন্নত হইয়া একটী পরম রমণীয় সভ্যতর বিশ্বমানবীয় মহাধর্ম্মে উন্নীত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ—নীতির দিক দিয়া দেখিলে মানুষের পক্ষে এ আবিষ্কার মহামঙ্গলকর।

উপস্থিত আমরা দেখি মানুষের মধ্যে পনেরো আনা তিন পাই লোক অন্যায় কাজ করিতে ইতস্ততঃ করে কেবল লোকাপবাদ ভয়ে—ধর্ম্মভয়ে নহে, পরকাল ভয়েও নহে। মুখে ধর্ম্মভয় জানাইলেও—মনে মনে লোক-নিন্দাকেই বেশী ভয় করে মানুষ। একবার যদি সাধারণ মানুষ সত্যভাবে বুঝিতে পারে যে, অন্যায় করিলে পরকালে আত্মা অশান্তি রূপ শাস্তি ভোগ করিবে—আর ন্যায় করিলে পরকালে আত্মার ক্রমোন্নতির পথ সরল হইবে তাহা হইলে পাপের মাত্রা ও সংখ্যা কি কমিবে না? যে শোকার্ত্ত হৃদয় মৃত্যুকবলিত প্রিয়জনকে হারাইয়া চির বিরহ ভয়ে কাতর হয় তাহা যদি একবার নিশ্চয় রূপে জানিতে পারে যে সেই প্রিয়জন মরণের সুবর্ণ তোরণ দিয়া অমৃতময় দিব্যধামে বিহার করিতেছে—তাহা হইলে তাহার পক্ষে এ জ্ঞান কি কম সান্ত্বনাকর? সংসারের আপাতঃ অন্যায় অসঙ্গত ভাগবৎ বিধিব্যবস্থা দেখিয়া যাঁহার বিমল বুদ্ধি নাস্তিক্যের প্রভাবে আন্দোলিত হইতেছে, জীবলীলা ভূমিকে যিনি নিষ্ঠুর অন্ধ জড়নিয়মের তাণ্ডব নৃত্যস্থল বলিয়া দেখিতেছেন—তিনি যদি পরকালের এই সুনিশ্চিত সংবাদ পাইয়া আশা ও আশ্বাসে পুলকিত হইয়া উঠেন, তাহা কি কম লাভ? ইহ-জীবনের খাওয়া-পরা, শোওয়া-বসা, যশ মান অর্থ রোজ-কার করাকেই যাঁহারা অস্তিত্বের আদি ও অন্ত বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহারা যদি বুঝিতে পারেন যে, সত্যই জীবনের লক্ষ্য তা নয়; ইহজীবনটা পর জীবনেরই শিক্ষাভূমি—আত্মার অনন্ত উন্নতিসোপানের একটা ধাপ্ মাত্র, তাহা কি মঙ্গলকর নহে?

এই সব কথা চিন্তা করিয়াই পণ্ডিতপ্রবর Sir Oliver Lodge বলিয়াছেন—"If there is any object worthy of patient and continued attention it is surely these great and pressing problems of *whence*, *what*, and *whither* that have occupied the attention of prophet and philosopher since human History began."

টেলিপ্যাথী, দিব্যদৃষ্টি, স্বতঃভাষণ, স্বতঃকথন ও সুষুপ্তিচৈতন্য প্রভৃতি এই যে সব অলৌকিক ব্যাপার যাহা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষা ও প্রেক্ষণের দ্বারা সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে একটা বিষয় প্রতিপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ একটা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মজগৎ বিদ্যমান আছে আর সে জগৎটা spiritual অর্থাৎ চিদ্‌জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগৎ নয়, এবং এ জগৎটা আমাদের জানিত জড়জগৎ হইতে বৃহত্তর; অপিচ এই উভয় জগৎ বোধতঃ ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাহা নয়। বাস্তবিকই একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায়, যাহাকে আমরা জড়-জগৎ বলি, সেই জড় কি? জড় বলিয়া স্বতন্ত্র নিরপেক্ষ কোনো বস্তু আছে কি না? ইহাতো চৈতন্যেরই একটা অনুভূতি ফল। এই চৈতন্য না থাকিলে জড় কোথায়? J. S. Mill জড়ের পরিচয় দিয়াছেন এই বলিয়া যে উহা Permanent possibility of Sensations কতকগুলা অনুভূতির নিত্যকারণ মাত্র। এই অনুভূতির কর্ত্তা কে?—জীব চৈতন্য। কাজেই চৈতন্য ব্যতিরিক্ত জড় এবং জড় ব্যতিরিক্ত চৈতন্য ধারণাই সম্ভবপর নয়। জড় ও চৈতন্য একই আত্মা পদার্থের দুই বিধা aspect গীতোক্ত পরা ও অপরা প্রকৃতি মাত্র। জীবচৈতন্য জড়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা, আর জড় জীবচৈতন্যের ঘনতম অবস্থা। আমাদের শাস্ত্রে বলে, ব্রহ্মের একপাদ ব্যক্ত manifested আর তিনপাদ অব্যক্ত। এই ব্যক্ত একপাদেরই আবার ঊর্দ্ধ-

তম সীমা জীবচৈতন্য আর অধঃতম সীমা জড়। বস্তু হিসাবে উভয়ই সমজাতীয়। উভয়ই সেই অসীম ও এক আত্মা বস্তুর আংশিক বিকাশ মাত্র। এই জড়ও যেমন চিৎ ধর্ম্মী, এই চিৎও তেমনি জড়ধর্ম্মী।

অলৌকিকের আলোচনায় শুধু যে অতীন্দ্রিয় চিদ্‌-জগতের অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া যায় তাহা নয়; মানুষের মধ্যে এই চিৎপদার্থ যে অদৃশ্যভাবে কতদূর বিস্তৃত তাহারও আভাষ পাওয়া যায়। মোহাবস্থায় মানুষের সুপ্তচৈতন্য যে সব অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিতেছে তাহাতেই ইহার বিস্তৃতি ও গভীরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। শুধু তাই নহে, এই অধ্যাত্ম জগৎ ও জড়জগতের উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি নিগূঢ় ও গভীর তাহাও বুঝা যাইতেছে, আর এক নূতন তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে আমরা যাহাকে চিৎপদার্থ বলি তাহা সর্ব্বদা বা সবক্ষেত্রেই যে আত্ম-বিকাশের জন্য জড়ের মুখাপেক্ষী তাহা নহে। প্রেত-তত্ত্বানুশীলনের এইটী মস্ত লাভ। আমাদের চিরকালের পণ্ডিতী ধারণা যে চৈতন্য আত্মবিকাশ করে জড়ের সাহায্যে এ বিষয়ে ইহা সম্পূর্ণ জড়াধীন; কিন্তু টেলিপ্যাথী ও সুপ্তচৈতন্য (Subliminal consciousness) আমাদের সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। চৈতন্য আপনা হইতেই অজানিত উপায়ে আত্মবিকাশ করিতে পারে; জড়ের কোনোমাত্র সাহায্য দরকার হয় না। অতার বার্ত্তাবহ (wireless Telegraphy) আবিষ্কারের পূর্ব্বে মানুষ ধারণাই করিতে পারিত না যে, তড়িৎ বিনা জড়ের সাহায্যে সঞ্চালিত হইতে পারে। যখন দেখা গেল তাহা সম্ভব, তখন আমাদের তড়িৎ সম্বন্ধে ধারণা বদলাইল। বুঝিলাম আমরা তড়িৎসমুদ্রে মজ্জমান। কোনোরকমে ঢেউ তুলিতে পারিলেই কাজ হইবে। ঠিক এইভাবে Telepathyও সুপ্তচৈতন্য আমাদের বিশ্ব-ধারণা উল্টাইয়া দিয়েছে। ভারতবর্ষে বসিয়া আমি একটা বিষয় ভাবিলাম, সেই চিন্তা নিউজিলণ্ডে একজনের চিত্তপটে ভাব তুলিল; বা ইংলণ্ডে বসিয়া একজন দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছে তার বন্ধু অষ্ট্রেলিয়ায় কি করিতেছে, ইহাতো পরীক্ষিত সত্য, আরব্যের গল্প নয়। মাঝে জড়ের ব্যবধান নাই, যদি কোনো ব্যবধানই না থাকে, একেবারে শূন্য থাকে তাহা হইলে মনের এই আদান-প্রদান কখনই সম্ভব হইত না। নিশ্চয়ই একটা কিছুর যোগাযোগ আছেই, তাহা কি? উহা এই অনন্ত দেশ ও কালব্যাপী চিৎবস্তু,আমরা এই অসীম চিৎসমুদ্রের বুদ্বুদ মাত্র; আপাতঃ ভিন্ন হইলেও এই চৈতন্যের প্রবাহে পরস্পর যুক্ত। প্রত্যেক জীবচৈতন্য এই সমুদ্রের ঘনীভূত কেন্দ্র স্বরূপ; এক চৈতন্যের ভাবতরঙ্গ এই প্রবাহ ধরিয়া অন্য চৈতন্যে সঞ্চালিত হইতেছে।

এই মহাসত্যের আবিষ্কারের ফলে আমাদের বিশ্ব সম্বন্ধীয় ধারণার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। আধুনিক বিজ্ঞান এতদিন সমস্ত বিশ্ব-রহস্যগুলিকে (কি জৈব কি অজৈব) জড়ের দিক্ দিয়া ব্যাখ্যার চেষ্টা করিতেছিল। চৈতন্যকে দধির অম্লত্বের সাদৃশ্যে জড়ের একটা ক্ষণিক ধর্ম্ম বলিয়া ধরা হইয়াছিল এবং সমস্ত জীবরহস্য এই ভাবেই ব্যাখ্যাত হইতেছিল। এখন আমরা একটা বিশালতর ও সত্যতর চিদ্‌জগতের সন্ধান পাইতেছি, চিৎবস্তু যে জড় হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিতে ও কাজ করিতে পারে তাহারও ইঙ্গিত পাইতেছি এবং এই চিৎবস্তু যে বেশী মাত্রায় অনশ্বর ও শাশ্বৎ, তাহাও দেখিতেছি—সুতরাং চৈতন্যের দিক দিয়া বিশ্ব-রহস্যের মীমাংসা চেষ্টা হইলে অনেক অবোধ্য ও দুর্ব্বোধ্য বিষয় বোধগম্য হইবে।

ক্রমশঃ।

গীতা ভাগবত

(সমালোচনা)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর

[শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী, বেদান্তভূষণ, ভক্তিরঞ্জন]

শ্রীকৃষ্ণ যে লীলা করিয়াছিলেন তাহা কোন্ শরীরে করিয়াছিলেন তাহা দেখা যাউক। তিনি কি আমাদের ন্যায় মাংসাসৃক্‌পূযবিন্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিময় অমেধ্য দেহে এ লীলা করিয়াছিলেন, অথবা অন্য দেহে? শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বসুদেব মহাশয় তাঁহাকে আপনার মনে ধারণ করিয়াছিলেন,—

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংস ভাগেন মন আনক দুন্দুভেঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২।১৬

ভক্তগণের অভয়দাতা বিশ্বের আত্মা ভগবান ও বসুদেবের মনে পরিপূর্ণ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ কহেন,—

"মন আবিবেশ মনস্যাবির্ব্বভূব জীবানামিব ন ধাতু সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ মনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জীবগণের ন্যায় তাঁহার ধাতু সম্বন্ধ থাকে নাই।

পুনরায় দেবকী দেবী কিরূপে ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই কহিয়াছেন,—

ততো জগন্মঙ্গল মচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূর সুতেন দেবী
দধার সর্ব্বাত্মক মাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথা নন্দকরং মনস্তঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।২।১৮।

যেরূপ পূর্ব্বদিক্ আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করেন, তদ্রূপ দীপ্তিশালিনী শুদ্ধ সত্বা দেবকী, বসুদেব কর্ত্তৃক বেদ দীক্ষা দ্বারা অর্পিত অচ্যুতাংশ অর্থাৎ অচ্যুতের অংশ সদৃশ যে অংশ তাহা আপনার মনো দ্বারাই ধারণ করিলেন।

যেরূপ পূর্ব্বদিকের সহিত চন্দ্রের কোন সম্বন্ধ নাই; কিন্তু আমরা দেখি যে পূর্ব্বদিক হইতে চন্দ্র উদয় হইতেছেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের শরীর ধাতুঘটিত নহে, উহা চিন্ময়।

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তি মন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি।
আনন্দ চিন্ময় সদুজ্জল বিগ্রহস্য
গোবিন্দ মাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং ৩২।

যাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি যুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য জগৎকে দর্শন, পালন ও দর্শন করেন, যাঁহার বিগ্রহ আনন্দ স্বরূপ চিন্ময়, নিত্য ও উজ্জ্বল সুতরাং সাধারণ শরীর হইতে বিভিন্ন; সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

লেখক মহোদয়! চিন্ময় শরীর কিরূপ তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলেন কি? যদি না পারেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের লীলার চর্চ্চার আবশ্যক কি? অধিকারী হইয়া চর্চ্চা করিলে বা দোষ দিলে ভাল হয় না? শুকদেবের মত উচ্চ স্থানে আরোহণ করুন, তখন দোষ দিতে পারেন দোষ দিবেন। এ বিষয়ে একটি উপাখ্যান কহিতেছি—জাবালি জনকঋষির নিকট গিয়া কহিয়াছিলেন "গীতার কতকগুলি প্রশ্ন আছে"। জনকঋষি কহিলেন, "আপনার গীতা পাঠ হয় নাই।" জাবালি পুনরায় গুরুর নিকট গিয়া আচমন করিয়া গীতা পাঠ করিয়া সন্দেহ নিরাশ জন্য পুনরায় জনকঋষির নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলে, জনকঋষি কহিলেন, "আপনার গীতা পাঠ হয় নাই।" পুনরায় জাবালি গুরুর নিকট গিয়া আচমন করিয়া গীতা সম্পূর্ণ করিয়া জনকঋষির নিকট আর

প্রশ্ন করিতে গেলেন না। বহুদিন অতীত হইলে জনকঋষি প্রশ্ন করিবার জন্য জাবালিকে আনিতে পাঠাইলেন, জাবালি আসিয়া কহিলেন, "ঋষে! আর আমার প্রশ্ন নাই।" তখন জনকঋষি কহিলেন, "এতদিনে আপনার গীতা পাঠ হইয়াছে।" লেখক মহোদয়ও তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করুন; অকিঞ্চনের ধন শ্রীমদ্ভাগবত, অকিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট পাঠ করুন তাহা হইলে প্রকৃত ভাব সমুদায় ফুটিয়া উঠিবে। শ্রীমদ্ভাগবত নিজের বিদ্যায় কিম্বা পণ্ডিতের নিকট পাঠ করিলে প্রকৃত ভাব পরিস্ফুট হইবেনা। এখানে কিছু কিছু নাই, অনুভবের বস্তু; লীলা স্মরণ কর, মানসচক্ষে দেখ ও দর দর করিয়া অশ্রু দ্বারা বক্ষ প্লাবিত কর; তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের ফল হইবে।

Knowledge এবং Wisdom দুইটি পৃথক পদার্থ; যথা—

"Knowledge dwells
In heads replete with thoughts of other men;
Wisdom in minds attentive to their own.
Knowledge a rude unprofitable mass,
The mere materials with which Wisdom builds,
Till smooth'd, and squar'd, and fitted to its place,
Does but encumber whom it seems t' enrich.
Knowledge is proud that he has learn'd so much;
Wisdom is humble that he knows no more."

Cowper—Winter walk at noon.

পাঠক মহোদয়! এ প্রতীচ্য ভাষার প্রমাণ দিলাম বলিয়া যদি দোষ ধরেন তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন। এরূপ সুন্দর প্রমাণ কোন সংস্কৃত পুস্তকে পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সাধারণের মনে ইহাই বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়া পরদার সঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এ কথা মহারাজ পরীক্ষিৎও শুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
সকথং ধর্ম্ম সেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্! পরদারাভি মর্ষনম্॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈজুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতং নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত!॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।২৬—২৮।

হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মসংস্থাপন এবং অধর্ম্ম প্রশমন জন্য ভগবান জগদীশ্বর অংশে অবতীর্ণ হন; তিনি স্বয়ং ধর্ম্ম, মর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা এবং রক্ষিতা হইয়া কি প্রকারে তদ্বিপরীত পরদারাভিমর্ষণ রূপ অধর্ম্ম আচরণ করিলেন? যদুপতি আপ্তকাম ছিলেন, তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে এই নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? হে সুব্রত! এ বিষয়ে আমার যে মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, উহা ছেদন করুন।

কিন্তু এ সন্দেহ মহারাজ পরীক্ষিতের মনে কখনও উদয় হয় নাই। কারণ ভক্তি নবধা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা॥

শ্রীভাগবতে ৭।৫।২৩

ইহার মধ্যে এক এক ভক্তির অঙ্গে এক এক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যথা—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভি বন্দনে কপিপতি র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

পদ্যাবল্যাম্।

শ্রীবিষ্ণুর গুণানুবাদ শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, তাঁহার চরণ সেবায় লক্ষ্মী, পূজায় পৃথু, প্রণামে অক্রূর, দাস্যে হনুমান্, সখ্যে অর্জ্জুন এবং সর্ব্বস্ব নিবেদনে বলি কৃষ্ণভক্ত হইয়াছিলেন; ইঁহাদের কেবল একাঙ্গ ভক্তি যাজনেই কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

সুতরাং এরূপ মহানুভব পরীক্ষিতের মনে এরূপ পাপ প্রশ্নের স্থান কখনও পাওয়া সম্ভব নহে; তবে গঙ্গাতীরের

সেই সভাতে অনেক কর্ম্মী ও জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, তাঁহাদিগের মুখের সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া পাছে এ সংশয় তাঁহাদের মনে উদয় হয় তজ্জন্য তিনি এ প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এ কথা শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কহিয়াছেন—

"অথ পরীক্ষিৎ সমীপবিষ্টানাং বিবিধ বাসনাবতাং কর্ম্মিজ্ঞানি প্রভৃতিনাং হৃদয়ে সন্দেহং সমুত্থিতমালক্ষ্য তচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি।" অনন্তর পরীক্ষিৎ সেই সভাতে নিকটবর্ত্তী বিবিধ বাসনাকারা কর্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতির হৃদয়ে সন্দেহ উত্থিত হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া, সেই সন্দেহ নিরাকরণ জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

যিনি গোপীভাবাপন্ন হইয়াছেন, ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল তিনিই এ লীলার আস্বাদন করিবেন।

যাহা হউক, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরের পূর্ব্বে দেখা যাউক যে, গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কি পরকীয়া।

আভ্যন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোপাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নহেন, কিন্তু তাঁহারা স্বকীয়া। কেবল লীলা বিকাশের জন্য পরকীয়া রূপে প্রতিভাত হইতেন। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের পুরুষ অপেক্ষা মায়া অধিক; ভক্তের ভগবানকে পাইতে হইলে সে মায়া ত্যাগ করিতে হইবে, এই জন্য গোপাঙ্গনাগণ সমুদায় মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন; পরপুরুষরতা স্ত্রীলোকের পরপুরুষের প্রতি মায়া অধিক, যথা—

"পরব্যাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহ কর্ম্মসু।
তদেবা স্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্॥"

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে উপশম প্রকরণে ৭৪।৮৩

এবং একথা মহাপ্রভুও শ্রীরূপ ও সনাতন প্রভুপাদদ্বয়কে কহিয়াছিলেন, যথা, শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায় প্রথম পরিচ্ছেদে।

উক্ত শ্লোকের অর্থ যে পরাধীনা রমণী গৃহকার্য্যে ব্যগ্রা থাকিয়াও সেই পর পুরুষের সঙ্গমের রসকে মনোমধ্যে আস্বাদন করিয়া থাকে। এই শ্লোকের দ্বারা মনের একাগ্রতা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। এরূপ মনের একাগ্রতা হইলেই ভক্ত মায়া ত্যাগ করিয়া ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ যে গোপাঙ্গনাগণের পতি, তাহা দুর্ব্বাসা মুনি গোপাঙ্গনাগণকে কহিয়াছিলেন, যথা—

"জন্মজরাভ্যাং ভিন্নঃ স্থাণুরয়মচ্ছেদ্যোঽয়ং যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতি যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ গাঃ পালয়তি যোঽসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্বেষু বেদেষু তিষ্ঠতি যোঽসৌ সর্ব্ববেদৈর্গীয়তে যোঽসৌ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাবিশ্য ভূতানি বিদধাতি সবোহি স্বামী যোঽসৌ ভবতি॥"

গোপালতাপন্যাং উত্তর বিভাগে।

যিনি জন্ম ও জরা রহিত স্থাণুর ন্যায় অচল ও অপক্ষয় শূন্য। যিনি সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান করেন, যিনি গো সকলে বিদ্যমান থাকেন, যিনি গো সকলকে পালন করেন, যিনি গোপ সকলে অবস্থান করেন, যিনি সকল বেদে অধিষ্ঠান করেন, বেদ সকল যাঁহার গান করেন এবং যিনি ভূত সকলের অন্তরে প্রবেশ করিয়া ভূত সকলকে বিধান করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের স্বামী। ব্রজ কুমারীগণ কহিয়াছিলেন—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপ সুতং দেবি! পতিং মে কুরুতে নমঃ॥"

শ্রীভাগবতে ১০।২২।৪।

হে কাত্যায়নি! মহামায়ে! মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরি! হে দেবি! নন্দগোপ পুত্রকে আমাদের পতি করিয়া দাও, আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি।

এ বিষয়ে পুনরায় অন্যস্থানে কথিত হইয়াছে—

গোপ্যঃ স্ফুরৎ পুরট-কুণ্ডল-কুন্তল ত্বিড়্
গণ্ডশ্রিয়া সুধিত হাস নিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎ কররুহ—স্পর্শ প্রমোদাঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।২২।

গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নখ স্পর্শে প্রমুদিতা হইয়া উজ্জ্বল সুবর্ণ কুন্তলের কান্তি ও কুণ্ডল সমূহের কান্তিতে শোভিত গণ্ডস্থল দ্বারা এবং সুধা সদৃশ হাস্য অবলোকন

করিয়া পতি শ্রীকৃষ্ণের সম্মান বিধান পূর্ব্বক তাঁহার পুণ্যকর কর্ম্ম সকল গান করিতে লাগিলেন।

এই শ্লোকে "ধবভস্য" শব্দের অর্থ স্বামিপাদ কহিয়াছেন,—

"পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য" অর্থাৎ পতি শ্রীকৃষ্ণের।

শ্রীজীব গোস্বামি পাদ অর্থ করেন—

"ধবভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেত্য ত্রায়মভিপ্রায় কৃষ্ণবধ্ব ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব শ্রীমুণীন্দ্রেণ ব্যক্তীকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ। তস্মাদস্মাভিরব্যাখ্যাতা অপি দয়িত রমণাদি শব্দা কেন বান্যথা মন্তব্যা।"

অর্থাৎ, "ধবভের" অর্থাৎ "পতি শ্রীকৃষ্ণের" এস্থলে ইহাই অভিপ্রায়। মুণীন্দ্র শ্রীশুকদেব যখন গোপাঙ্গনাগণকে "কৃষ্ণবধূ" বলিয়া স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমরা কেন তাহা গোপন করিব? তজ্জন্য আমরা ব্যাখ্যা না করিলেও "দয়িত", "রমণ" ইত্যাদি শব্দ সমূহকে কেই বা অন্যথা করিয়া মানিবে?

পূর্ব্বোক্ত "শ্রীকৃষ্ণবধূ" শব্দ প্রয়োগ, যথা—

পাদন্যাসৈর্ভুজ বিধুতিভিঃ সস্মিতৈ র্ভ্রূবিলাসৈ
র্ভজ্যন্ মধ্যৈশ্চল কুচ পটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ড লোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবর রসনা গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইবতা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।৭।

অর্থাৎ, চরণ বিক্ষেপ, কর সঞ্চালন, সহাস্য ভ্রূবিলাস, আভুগ্ন কটি দেশ, চঞ্চল স্তন বসন, গণ্ডস্থলে চঞ্চল কুণ্ডল দ্বারা উপলক্ষিত, স্বেদযুক্ত বদন বিশিষ্ট, কেশ ও রসনায় গ্রন্থি যুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের গানে উন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণের বধূ সকল মেঘমণ্ডলে চপলার ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত "দয়িত" শব্দের প্রয়োগ, যথা—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩১।১।

অর্থাৎ গোপাঙ্গনাগণ কহিয়াছিলেন যে, হে দয়িত! তোমার জন্ম দ্বারা এই ব্রজ মণ্ডল অত্যন্ত উৎকর্ষশালী হইয়াছে; তোমার এস্থানে জন্ম গ্রহণ করাতে লক্ষ্মী এ স্থানকে অলঙ্কৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। আমরা তোমারই, আমরা তোমার জন্য কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিয়া তোমাকে অনুসন্ধান করিতেছি, তুমি একবার দেখা দাও।

এ স্থানে "দয়িত" শব্দে "স্বামী"। দয়তেচিন্তমাদত্তে দয়িত ইতি ক্ষীর স্বামী।

অথবা দয়তেঽনুকম্পতে ইতি দয়িতঃ।

পূর্ব্বোক্ত, "রমণ" শব্দের প্রয়োগ যথা

প্রণত কামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণি মণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণ পঙ্কজং শন্তমঞ্চতে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩১।১৩।

অর্থাৎ, হে আধিহন্! অর্থাৎ, হে মনঃ পীড়োপশমন! হে রমণ! এই চরণ পদ্ম প্রণত জনের কামনা পূর্ণকারী, (গোবৎস হরণে) ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, ধরণীর ভূষণ, আপদ কালে ধ্যেয় এবং সেবা সময়েও সুখ স্বরূপ; সেই চরণ কমল আমাদের কাম-তাপ শান্তির নিমিত্ত আমাদের স্তনে অর্পণ কর।

এখানে "রমণ" শব্দের অর্থ "পতি"।

পুস্তক সমালোচনা

[পদ্মপাদ]

চিত্তরঞ্জন।—প্রতিকৃতি সম্বলিত জীবনী। শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ গুপ্ত, এম-এ, প্রণীত—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র রায়চৌধুরী এম-এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুন্দর এন্টিক কাগজে ছাপা, ১৩৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গেরুয়া রঙের মলাটটী সুন্দর—ত্যাগী মহাপ্রাণের জীবনীর উপযুক্তই হইয়াছে। মূল্য বার আনা। আজ বাঙলা মায়ের এই "কাঙলা" ছেলের জীবন-কথা জানিবার কৌতূহল বাঙলার আপামর সাধারণের হইয়াছে—সুকুমারবাবু সে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেশমাতৃকার পূজামণ্ডপে আজ হোতৃত্বের গুরুভার মাথায় লইয়া যাঁহারা আত্মভোলা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—চিত্তরঞ্জন তাঁহাদের অন্যতম।

সুকুমারবাবু বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নহেন—তিনি এই জীবনীখানির বিষয়-বিন্যাস ও প্রকাশ-ভঙ্গিমায় যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। গ্রন্থকার উৎসর্গপত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, "এই জীবনী 'আমার বংশের ত্যাগী—কর্ম্মবীরের"—কিন্তু তিনি যে নিরপেক্ষ ভাবে দোষ-গুণের সমাবেশ পূর্ব্বক পুস্তকখানিকে সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারিয়াছেন এজন্য তাঁহাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই গ্রন্থখানি শুধু যে কৌতূহল নিবৃত্তি করিবে তাহা নহে "যিনি সংসারী সাধারণের কাছে পাগল আখ্যা পাইয়া বাতিকগ্রস্ত বলিয়া পরিচিত হইয়া বিলাস ও সুখভোগ ছাড়িয়া দেশের জন্য, দশের জন্য ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়াছেন এবং যাঁহার নেতৃত্বে ত্যাগের পথে চলিয়া দেশ-জননীর সেবা করিবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার জীবনের পরিচয় এ যুগ সন্ধিক্ষণে আমাদিগের মনে ত্যাগের নিষ্ঠা জাগাইয়া দিবে।" এই বইখানির বিশেষত্ব এই যে, চিত্তরঞ্জনের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে 'মালা' 'মালঞ্চ' 'অন্তর্য্যামী প্রভৃতি কাব্যের মধ্য দিয়া তাঁহার সাধনাময় সাহিত্য-জীবন কিরূপে ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করিয়াছে তাহা এই পুস্তকে বেশ সুনিপুণ ভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এই পুস্তকের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের কতকগুলি উপাদেয় বক্তৃতা সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার দেখিলে সুখী হইব।

পথের সাথী।—শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ প্রণীত। স্বামিজী আপনার অন্তরে অন্তরে যে সব কথা উপলব্ধি করিয়াছেন, এই পুস্তিকায় তাহারই কিয়দংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কথাগুলি সবই প্রাণের কথা—স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে প্রাণ হইতে বাহির হইয়া একেবারে প্রাণকেই স্পর্শ করে। 'মা আমার! তোমাতে আমাতে সম্পর্ক শুধু মায়ের স্নেহের স্নিগ্ধ দৃষ্টির বন্ধনে। * * * সুখ-সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি যেমন আমার, দুঃখ দুর্দ্দশা দুর্গতিও যে তেমনি আমার, সে শুধু 'মা আমার' বলিয়া। মা আমার বলিয়াই আমি হিমাচলমিত বাধার সমক্ষে নির্ভয়ে দাঁড়াইব, 'মা আমার' বলিয়াই আমি অবনত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত, অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের অর্ঘ্য দিয়া মাথায় তুলিয়া লইব।' 'আমার আঁধারে সকল সুখস্মৃতি যখন ঢাকিয়া যাইবে, তখনও 'মা আমার'; বিজলী যখন চঞ্চলে চমকিবে, করকা যখন গম্ভীরে গরজিবে, তখনও মা আমার, ধরণী যখন আগুনে জ্বলিয়া যাইবে, তখনও মা আমার, সাগর যখন বরফ হইয়া যাইবে, তখনও মা আমার।'

চাণক্য-সূত্রাণি।—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী-সম্পাদিত।—চাণক্যের মূল সূত্রগুলিকে অতি সুন্দর প্রাঞ্জল বাঙ্গলাভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণের উপকার করা হইয়াছে। মূল্য আট আনা। নৈনীতাল অদ্বৈতাশ্রম হইতে প্রকাশিত।

উপাসনা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ?
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার।
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে !"

১৭শ বর্ষ } ভাদ্র—১৩২৮ { ২য় সংখ্যা

আলোচনা

সামাজিক ও বৈষয়িক অনুষ্ঠান

সকল সামাজিক প্রথা ও ইতিহাসের মূলে রহিয়াছে একটি খেয়াল ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রেরণা। এই আবহমান কালের ইতিহাস ও প্রথাগুলির প্রভাব অনেক শিক্ষিত সমাজে বড়ই প্রবল ও বদ্ধমূল। বহুদিনের পুঞ্জীভূত রীতি নীতি, বিধিবিধান ও প্রথার মধ্যে কতকগুলি সামাজিক জীবনের ধারাকে গড়িয়া তুলিতেছে। সেই জন্যই তুলনামূলক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এইরূপ বিভিন্ন জাতির সামাজিক ইতিহাস ও জাতীয় মনস্তত্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল ধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতির জন্য যে সকল প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেইগুলি কেমন করিয়া আমাদের আর্থিক ও সাংসারিক জীবনকে পরিচালিত করিতেছে, তাহা কয়েকটী স্থূল উদাহরণ গ্রহণ করিয়া দেখা যাউক। ভারতে জনসমাজে সমূহের প্রতিপত্তি ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিটা বড় বেশী। এই সমূহ-বোধ ও সহানুভূতি আছে বলিয়াই, আমাদের সাংসারিক জীবন ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি একটা নিজস্বরূপ ধারণ করিয়াছে। ভূ-সম্পত্তির অধিকারের কথাই ধরুন না কেন—সর্ব্বসাধারণের হিতসাধন যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে ব্যক্তিগত স্বত্বকে অল্প বিস্তর নিম্ন স্থান দেওয়া হইয়াছে। গ্রামে সাধারণ পুষ্করিণী, ক্ষেত্রে জলসেচন নালী ও পতিত জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণের স্বত্ব প্রতিষ্ঠাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, আরও আমরা দেখিতে পাই, নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী, শিল্পী ও অন্যান্য কর্ম্মচারীকে বিনামূল্যে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন কালেও দেখিতে পাই, ফসল পাকিলে পুরোহিত ও অন্যান্য কর্ম্মচারী যাঁহারা সমাজের পরমার্থিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিতেছেন, তাঁহারা ভরণপোষণের জন্য এক অংশের অধিকারী। আর এই সামাজিক প্রবৃত্তির প্রেরণাই ধর্ম্ম (ব্রহ্মত্তর) সংকল্প (দেবত্তর) ও বৃত্ত (মুষ্টি ভিক্ষা) প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মূলে নিহিত রহিয়াছে। আর্থিক অনুষ্ঠানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাই, নানা শ্রেণীর মজুরের মধ্যে কেহ বা বেশী, কেহ বা কম মজুরী পাইতেছে। এই মজুরী প্রতিযোগিতার দ্বারা ধার্য্য হয়

নাই। কোন্ শ্রেণীর মজুর কত কার্য্যকুশল এবং তাহার পারিবারিক অভাব অভিযোগই বা কি পরিমাণের, এই সকল বিচার করিয়া, একটা মজুরী ধার্য্য করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথায় (বা ইতিহাসে) জীবন ধারণের পরিমাপ (Standard of subsistence) অনুযায়ী একটা মজুরী ধার্য্য করা হইয়াছে। ভারতে পৈতৃক বাস্তভিটা আর কয়েক বিঘা জমির বন্দোবস্ত সকল কৃষকের আছে। নির্দ্দিষ্ট বাস্তভিটা আর খানিকটা জমিকে আঁকড়াইয়া ধরাই তাহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি, আর সে কারণে Economic Rent যেটা জমিদারের প্রাপ্য তাহা মোটেই বাড়িতে পারে নাই। কারণ হয় এটা কৃষকের আয়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, না হয় সমাজের কাজে ব্যয়িত হইতেছে। সেই জন্যই অন্যত্র যাহাকে Economic Rent বলে, ভারতে তাহাকে সরকার বা গ্রাম্য সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা কর বলা যাইতে পারে। এক্ষণে এদেশে অন্যান্য দেশের আদর্শে জমিদারী স্বত্ব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, আর তাহার ফলে প্রতিযোগিতায় জমির খাজনা ধার্য্য হইতেছে। আর তাহার অপেক্ষা ভীষণ ফল এই হইয়াছে যে, এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হইয়াছে যাহাদের নিজের জমি বিন্দুমাত্র নেই, পরের জমিতে কার্য্য করিতেছে, ইহাদের অবস্থা হইয়াছে ঠিক কলকারখানার মজুরদের মত। আজকাল কোন কোন প্রদেশে এদের সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে, যে তাহাদের লইয়া শাসক ও Economistরা একটা বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন, যে হেতু ইহারা অনেক সামাজিক অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাষ্ট্র বা বৈষয়িক জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সামাজিক ইতিহাসই একমাত্র কারণ নহে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কারণ আছে—যথা ভৌগলিক অবস্থান ও জলবায়ু এবং আহারের তারতম্য ভৌগলিক অবস্থানের অনুযায়ীই হইয়া থাকে। চিকিৎসকেরা গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন যে এদেশে একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক লোকের আহারে পুষ্টির জন্য যতটা সার পদার্থের প্রয়োজন তাহা ইউরোপীয় প্রাপ্তবয়স্ক লোকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক কম। এতেই বোঝা যায়, আমাদের দেশের মজুরেরা সাধারণতঃ কোন্ কাজের উপযুক্ত। যে কাজে একটানা দ্রুত কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, সে কাজ তারা পারে না। আর যে কাজ ধীরে ধীরে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিয়া করা যায়, সে কাজে তাহারা সকল দেশের মজুরকে হারাইয়াছে। ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য, কারণ তাহাদের দ্বারাই ইংরাজ উপনিবেশের (British Colonyর) বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। আজ যে আমরা দেখিতেছি কলকারখানায় মজুরদের কার্য্যশক্তি কমিয়া আসিতেছে আর তাহাদের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে, তার মূলীভূত কারণ হইতেছে কোন্ মজুর কোন্ কাজের উপযুক্ত বিচার না করিয়া তাহাকে তাহার অসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর এই কারণেই আমাদের কলকারখানার গণ্ডীর মধ্যে পৃথিবীর সব চেয়ে খারাপ দুয়ার সৃষ্টি হইয়াছে—ইহা সকল রোগের বীজ ও নৈতিক অবনতির মূল। একে ত এ দেশ গ্রীষ্মপ্রধান ও অত্যন্ত আর্দ্র, তাহার উপরে মজুরদের ঘন বিন্যস্ত আলয়—এতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিপদ বাড়িয়া উঠিয়াছে—যদিও প্রকৃতি এর প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছে—রৌদ্র ও বৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়া কেবল যদি আমরা ঐ ঘন বিন্যস্ত বস্তিগুলার মধ্যে জলবায়ু প্রবেশ করিতে দিই—ও উন্মুক্ত বায়ুর ব্যবস্থা করি।

এই যে আমাদের সামাজিক বিন্যাসের সহিত বৈষয়িক কার্য্যের সামঞ্জস্য সাধন করা হয় নাই, তাহার অনেক উদাহরণ দেখান যাইতে পারে। যখন কোন দেশে বৈষয়িক পরিবর্ত্তন ঘটে, তখনই দেখা যায়, হয় পুরাতনের স্থানে নূতনকে বাহির হইতে জোর করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইতেছে, না হয় একটা পরানুকরণের ধারা চলিয়াছে। যতই গ্রাম ও সহরের আদর্শের বিভিন্নতা বাড়িয়া উঠিতেছে, কুটীর শিল্পের অবনতি হইতেছে, রপ্তানির জন্য ফসল জন্মান হইতেছে আর ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমিক (Hereditary) আইন অনুসারে জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হইতেছে, দেশও পূর্ব্ব বর্ণিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদেরই দেশে, আইন বন্ধ করিয়া, জোর করিয়া, লোভ দেখাইয়া আরো ফেলিয়া মজুরদের অস্বাস্থ্য-

কর খনিতে ও বাগানে খাটান হইতেছে। রাজনৈতিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার চেয়ে আরও প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে এই—যে মজুরদের দেশ হইতে দেশান্তরে বসতি করিতে দেওয়া হইতেছে না। আমরা জানি Americaর ও পূর্ব্ব দক্ষিণ Africaর কটা ও দরিদ্র জাতিদিগকে অবাধে আসিতে দেওয়া হয় না। অনেক দেশের বিভিন্ন স্থানে Asiaর মজুরের প্রবেশ নিষেধ। পূর্ব্বে যাহাদের দ্বারা ঐ সমুদায় স্থানে ব্যবসা গড়িয়া উঠিয়াছিল, আজ Political expediencyর দোহাই দিয়া তাহাদের বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে, আর Economic যুক্তি তারা দেখান যে, Asiaর মজুরদের সঙ্গে মিশিলে ইউরোপীয়ানদের standard of life অনেক কমিয়া যাইবে। প্রাচ্য প্রদেশের যে যে স্থানের আজও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই, তাহাদিগকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিতে হইলে ভারতীয় কৃষিবিৎ, খনিকারের ও ব্যবসাদারের দাবী অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পশ্চাৎপদ ও উন্নত শ্রমজীবীর অবাধ মিশ্রণ সুনিয়ন্ত্র না হওয়ায় এই বিষময় ফল দাঁড়াইয়াছে যে শ্বেতাঙ্গজাতির কার্য্যশক্তি হানি হইয়াছে আর কৃষ্ণাঙ্গজাতির অশেষ দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে, নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছে আর স্থানে স্থানে তাহারা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। প্রকৃতির বিধান এই—যে বর্ণকে অগ্রাহ্য করিয়া কোন জাতির ক্রমোন্নতি সাধিত হয় না, বর্ণ বিচার করিয়া মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিতে হইবে। বর্ণই হচ্ছে মানুষ, কোন্ কোন্ অবস্থায় ও কোন্ দেশে বাস করিবার উপযুক্ত তাহার বাহ্যিক নিদর্শন। প্রকৃতির বিধানকে সার্থক করিবার জন্য আজ শ্রমজীবিদিগের হাতে শিল্প পরিচালনের ক্ষমতা আসা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বিধি ও পরিদর্শনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে কারণ Socialism প্রাণে যতই আশার সঞ্চার করুক না কেন, ইহা অনিবার্য্য যে, প্রবল দুর্ব্বলকে নির্য্যাতন করিবেই করিবে। 'কৃষ্ণকায়' শ্রমজীবীর স্বত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে ও মঙ্গল বিধানের জন্য আজি হউক বা কিছুদিন পরেই হউক, নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রকে আন্তর্জাতিক পরিদর্শন ও পরিচালনের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেই হইবে এবং যাহাতে জলবায়ু ও জাতির স্বাভাবিক বৃত্তি সামঞ্জস্য রাখিয়া সামাজিক বিন্যাসের ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে জমিজমার ও বাণিজ্যের সর্ত্ত ও প্রণালী বদলাইতে হইবে। Railway খনি ও বাণিজ্যের স্বত্ব Companies যাহাতে Concession পাইয়া রক্ষা করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত জাতির বৈষয়িক শিক্ষা যাহাতে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ঋণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই বৈষয়িক ঘাত ও প্রতিঘাতে যে কেবল আর্থিক লাভ হইবে তাহা নহে। ভারতের ও চীনরাজ্যের গোষ্ঠীচেতনা ও তাহার পরিচালন প্রণালী ও অভিজ্ঞতা নূতন Industrialism গঠনে বিশেষ উপকারে আসিবে। ইহা মানুষের ও সমাজের স্বাভাবিক বৃত্তি নিচয়ের তুষ্টি বিধান করিয়া সেই আদিম ও স্বাভাবিক সমূহতন্ত্রের বিকাশসাধন ও পুষ্টিবিধান করিবে। এই ধরণের আদর্শ আজকাল ইউরোপে প্রচার হইতেছে। এই প্রাচীন অভিজ্ঞতাই পাশ্চাত্য বৈষয়িক বিন্যাসের পুনঃ গঠনে এবং প্রাচ্যে Guild-socialismএর (পুগ-তন্ত্র) Syndicalismএর (সমূহ-তন্ত্র) আদর্শে শিল্প-কৃষি সমবায়ে ও বৈষয়িক স্বরাজ্যে পুরাতন সমূহ-রাষ্ট্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিবে।

এইরূপে উন্নত ও অনুন্নত জাতিসমূহ পৃথিবীর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনে পরস্পরকে সহায়তা করিবে। সকল বিবাদ বিসম্বাদের কোলাহল দমিত হইয়া এক শান্তির রাগিণী বাজিয়া উঠিবে। ইহাই তুলনামূলক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য হওয়া চাই। *

* সম্পাদকের ইংরাজীর ভাবাবলম্বনে শ্রীনীহাররঞ্জন দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক লিখিত।

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যমুনা

হ্যাঁ—ভারী চালাকী, না?—জগৎশুদ্ধ লোকের বুদ্ধি আছে কেবল আমারই নেই—না? আমি যোটে হাসি, আর সবাই দেব দেবী, ঋষি মহর্ষি ছাই ভস্ম কত কি! আমার সঙ্গে কথা কইবার সময় কারুরই সমিহ করার দরকার নেই, লজ্জা করার দরকার নেই, যা ইচ্ছে বল্লেই হ'ল, যেমন করে ইচ্ছে হুকুম করলেই হল। আর আমি হইছি খেঁকী কুকুর, কাজও নেই অবসরও নেই। কেবল তু করে ডাকলেই ছুটে যাব। 'এঁর খোজ নাও', 'ঐ কাজটা করবার জন্য হুকুম নিয়ে এস', 'এই ব্যাপারে যাতে এষ্টেট থেকে টাকা বেরোয় তার জন্য দয়া করে বল'—আমি বুঝি তোমার আর সংসারের মধ্যেকার টেলিগ্রাফের তার? না আমি তা নই।

কেন তা হব? আমি চিরদিন স্বাধীন, কেন আমি তোমার ছলভরা হুকুম মেনে চলব? দেখাও যেন কতই পরের হুকুমে চলছ, পরের দরকারে খাটছ, কিন্তু আমি তোমার মুখের কাপড় উঠিয়ে দেখে নিয়েছি—তা তুমি যতই তোমার ফটোই গোপন কর, আর যতই চাপকান চোগা লাগিয়ে আর্দ্দালি সেজে বেড়াও! আমি তোমায় চিনিছি মশায় চিনিছি। ও সব চালাকী আর যার কাছে হয় কর গিয়ে, আমার কাছে ওসব চলবে না।

আমি ত' আর কোনো রকম চশমা চোখে দিয়ে বসে নেই, যে কাছে কিছুই দেখতে পাব না, শুধু দূরের দিকে চেয়ে দূর দেখবার আশায় বসে থাকব—আর নিকটের যা কিছু হাত ফসকে পালিয়ে যাবে? ও গো মশায় তা হবে না—আমার কাছে তা হবে না। আমি ধর্ম্ম মানিনে, কর্ম্ম মানিনে, শাস্ত্র মানিনে, মন্ত্র মানিনে। আমি শুধু মানি এই আমার বাইরের চোখ দুটোকে আর আমার অন্তরের চোখকে। এই তিনটেতে যা ধরা পড়বে তাই আমার কাছে সত্য, বাদ-বাকি সমস্তই মিথ্যে মায়া ভোজবাজী।

ঐ যে দিদির সন্ন্যাসী ম'শায় আজ কতদিন হতে নাসাগ্র বদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে আছেন, মনে করছেন যে ওঁর ঐ চোখ দুটো যে মাঝে মাঝে ইদিক-উদিক নড়ছে, এ বুঝি কেউ দেখতে পায়নি! হায় রে বোকা মানুষগুলো! বিশেষতঃ ঐ সব একাগ্র মানুষগুলো! ওরা যতই একাগ্র ওরা ততই যে বোকা—ততই যে স্বচ্ছ, এটা ওরাই সবচেয়ে কম জানে। ঐ যে আমার দিদিটী যিনি মনে করেছিলেন যে পরীক্ষা না করে কাউকে তিনি তাঁর অন্তরের মধ্যে, বিশ্বাসের মধ্যে, স্থান দেবেন না, তিনি যে আজ একাগ্র বিশ্বাসে ঐ সন্ন্যাসীকেই আশ্রয় করেছেন, এটাই ওঁর চোখে পড়ছে না। এমনি অন্ধ এই সব যোগী মানুষগুলো!

কিন্তু সবারই যোগ ভাঙছে! আমি ধীরে ধীরে দেখতে পাচ্ছি সবাই বিয়োগের মধ্যে দিয়ে গুণে পৌঁছচ্ছেন এবং শেষে ভাগে পৌঁছে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে বিলিয়ে দিতে পথ পাবেন না, এও আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

আর তুমি—তুমি যে কেঁচে গণ্ডুষ্ করতে এসেছ, তুমি মনে করেছ যে বুঝি তোমার অন্তরের সন্ন্যাসীটা বুঝি তোমায় ছেড়েছে—তোমার বৈরাগ্যের ভূত বুঝি তোমার ঘাড় থেকে নেমেছে? নামেনি মশায় নামেনি—

কিন্তু সেইটেই ত' দুঃখ! কেন সে ভূত ছাড়ছে না তোমায়? কি চাও তুমি? কাকে চাও তুমি? কি মহা সত্য তোমার কাছে এখনো অপ্রকাশিত আছে? ওগো তোমার মনের ঝুলির মধ্যে এখনো কোন মহাভিক্ষা এ সংসার এ জগৎ দেয় নি? যে সত্যের লোভে তুমি তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ, কৃচ্ছ বৈরাগ্য সব ছেড়ে দাসত্বের মিথ্যাকে

অবলম্বন করেছ? সে কথা কি বলবে না—কখনো বলবে না, কাউকে বলবে না?

কিন্তু না বললেও ত' আমি ছাড়ব না। আমিও তোমারই চার পাশে ভ্রমরের মত ঘুরব, দেখি তোমার মুদিত মন-পদ্মের গোপন মধুটুকু চুরী করতে পারি কিনা। আমিও ছাড়ব না, এমনি করে আমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার মনের দ্বারে আঘাত ক'রব। দেখি সে দুয়ার কতদিন বন্ধ থাকে।

* * * * *

ব্যথাকে দেখিনে বলে, পিসীমা আমায় বকছিলেন, কিন্তু ব্যথাকে নিয়ে দিদিত' দেখছি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তা হলে আর আমার দরকার কি? সংসারের কাজ? সেও ত' বেশ চলছে, কৈ কারুর পাতে কিছু পড়ে নষ্টও হচ্চে নাত'—আর কেউ কিছু পেলেনা বলে কান্নাকাটীও ত' করছে না। যে সত্যসত্যই কান্নাকাটী করছে, সে যদি তার এই ছাব্বিশ বছরের একটানা দুর্ভিক্ষ দুদিনের জন্যে মেটাবার চেষ্টা করে, তা হলেই এত কথা উঠবে? সংসারের এ কেমন বিচার!

না আমি এতদিন ধরে পেরেছি—আর যদি না পারি? তাতে তোমাদের এত কলরব কেন উঠবে? পাঁচজন কাণাকানি করছে? করুক গে, কবে সে কাণাকানিতে তোমরা কাণ দিয়েছ? তোমরা যে এই সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত একটা সংসার গড়ে তুলেছ, এই যে তোমাদের ভারতছাড়া এই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ছাড়া বাড়ীটা, এই মনু-যাজ্ঞবল্কের দেশের বুকের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছ এর জন্য কার মুখের দিকে তোমরা চেয়েছ? কবে চেয়েছ? কখন না।—তবে এই বাড়ীরই একজন হয়ে আমিই বা কার মুখ চেয়ে নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখব?

না—তোমরা যখন কোনো নিয়ম মান নি, তখন আমিই বা মানব কেন? তোমরা যখন একটা ছায়ার পেছনে ছুটছ, তখন আমিই বা ছুটব না কেন?

ছায়া! মিথ্যে! মরীচিকা! হোক মরীচিকা তবু আমি যাব। সেই দিকেই যাব।

মিথ্যে নয় এ সংসারে কোন্‌টা? সারা সংসারই যে মায়ার পেছনে ছুটছে! আমিই কেবল চুপ করে থাকব? এ কেমন বিচার তোমাদের?

মিথ্যে নয় গো ম'শায়রা মিথ্যে নয়। এ যদি মিথ্যে হয় তা হলে গাছে ফুল ফোটাও মিথ্যে, আকাশে চাঁদ ওঠাও মিথ্যে, প্রভাতে সূর্য্য ওঠাও মিথ্যে, জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সবই মিথ্যে।

মনে মনে সবাই জানে—কিছুই মিথ্যে নয়, তবু জোর করে বলবে মিথ্যে—মায়া—ভেল্কি—ভোজবাজী। এই মিথ্যের ধুয়োটাকে কোন্ মিথ্যেবাদী জগতে এনেছিল? তাকে যদি হাতের গোড়ায় পেতাম তা হলে তার মাথাটা ধরে দেয়ালে ঠুকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, এই মিথ্যের আঘাতটা কেমন লাগছে?

* * *

কিন্তু তোমার আবার এ কি নূতন হুজুগ উঠল? তুমিও আবার কাজকর্ম্ম ফেলে মাঝে মাঝে ঐ মিথ্যের রাজা সন্ন্যাসীজীটীর কাছে ধন্না দিতে আরম্ভ করলে কেন? আমার যে ভয় করছে।

ভয়? হ্যাঁ ভয় বৈ কি। নিজের কাছে গোপন করে দরকার কি? হ্যাঁ আমার ভয় করছে। তুমি অমন করে আজ আমার ঐ বুদ্ধদেবের ছবিখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন? কি দেখছিলে ঐ অপটু হাতের অসম্পূর্ণ শিল্পটার মধ্যে? তোমার ঐ অমন সুন্দর উজ্জ্বল চোখদুটো আজ অমন মরার মত আমার দিকে চাইলে কেন? আজ কেন কোনো আদেশ আমি পেলাম না? কেন আজ তোমার কথার মধ্যে তোমাকে পেলাম না! কোন্ দূর বন বনান্তরে তুমি আজ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছ? তোমায় যে আজ কিছুতেই সেখান থেকে তুলে আনতে পারলাম না? কেন পারলাম না? কি আমাতে আজ ছিল না? কোন্ বস্তুর অভাবে আজ তোমায় আমার দিকে ফেরাতে পারলাম না? কি নেই আমাতে, তুমি যদি অমনি করে মুখ ফেরাও তা হলে সমস্ত জগৎ যে মুখ ফেরাবে—তা হলে কি নিয়ে থাকব? আমি যে এখন সব হারিয়ে বসে আছি। শুধু একটী

আশার আমি যে সব আশা ত্যাগ করেছি! এখন যদি মুখ ফেরাও—উঃ! না, তা যে ভাবতেও পারি নে!

* * *

আমি ত' আশা করাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। দিদি যেদিন সব ছেড়ে আশাকেই আশ্রয় করলে, সেইদিন হ'তে আমি সব ধরে আশাকেই ছেড়েছিলাম, কিন্তু তুমিই ত আশাকে জাগিয়ে দিয়েছ প্রভু! ওগো আমার না চেয়ে পাওয়া ধন, ওগো আমার অকালের মেঘ, আজ যদি তুমি আবার আকাশে মিলিয়ে যাও, তাহ'লে কি করে বাঁচব? না—না—তা পারব না, আমি তা পারব না। তোমায় ফিরতেই হবে। তুমি যখন এসেছ, যখন এ জীবনাকাশে আপনি এসে উদয় হয়েছ, তখন তুমি আমারই। তোমায় আর আমি গোপন হতে দেব না, কিছুতেই নয়। আমার যা কিছু আছে সব দিয়ে তোমায় আমার আকাশে বেঁধে রাখব। একবিন্দু জলও যদি ঐ মেঘ হ'তে না পড়ে, যদি ক্রমাগত বিদ্যুৎ আর গর্জ্জনই শুনতে হয়, যদি বজ্রাঘাতও নেমে আসে, তবু এ মেঘ আর মিলুতে পাবে না। এ মেঘকে আমি আমার সমস্ত কেকা দিয়ে সমস্ত কলাপের বিস্তার করে, সমস্ত কদম্ব ফুটিয়ে ধরে রাখবই রাখব।

কিন্তু এত যে জোর করে কাল ঐ কথাগুলো লিখিছি এ জোর আমার থাকছে কৈ? মনে হচ্ছে যেন কোন অজানা দিক্ হতে কেমনধারা যেন হাওয়া বইছে। আমার মেঘমালাও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার নয়নে যে গভীর ছায়া দেখে এলাম, এ ছায়া কিসের? কার এ ছায়া? এ ছায়া কোথায় ছিল এতদিন?

কি জানি কোথায় ছিল—কিন্তু ছায়া যে জেগে উঠেছে, বাতাস যে লেগেছে আমার মেঘে! কোন্ দিগন্ত হ'তে অজানা আলো এসে আমার মেঘকে রাঙিয়ে তুলছে, দুলিয়ে তুলছে, ফুলিয়ে তুলছে? কিন্তু বর্ষণ হবে কোন্ দিকে, কোন্ উষর দেশে, কোন্ মরুপ্রান্তরে? কদম বনের ঘনপাতার ওপরে না শুকনো নদীর বালুর চরে? কোথায় এ মেঘ সরে চল্ল!

মন যে আমার কেঁপে উঠ্‌ছে—দূরে কি আবার চাতক ডাকছে নাকি? কোথায় গেল আমার কেকা, কোথায় আমার কলাপ! আনো—আনো—সব আন—বাদ্য আন, নৃত্য আন, আন গান, আন ফুল, আন হাসি, আন বাঁশী যা কিছু আছে সব আন—মেঘকে আমার বাঁধতেই হবে।

ফাঁকি!

[শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

আশা-প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজে
একটা ফুঁয়ে কোন্ ছলে
হেলায় তারে নিবিয়ে দিয়ে
কোথায় সখি যাও চলে!
নিভ্‌লনা রে নিভ্‌লনা রে,
নিজের হাতে জ্বালুলে যারে,
ঘোম্‌টা টেনে অন্ধকারে,
এড়িয়ে চল মুখ্ ঢেকে,
কেমন এ গো, কেমন এ গো
শাস্ত্রে তোমার এই লেখে!

রঙ্গময়ি রঙ্গ এ কি
নিঠুর খেলা রঙ্গিনি!
নূতন দেশে নূতন বেশে
হ'লে ও-কার সঙ্গিনী!
প্রাণটা নিয়ে দারুণ খেলা
মন নিয়ে এ দারুণ হেলা
এই যে প্রেমের হেলাফেলা
হলাম শেষে আধ্‌মরা,
শূন্য মনে শূন্য নিয়ে
কেমন্ করে ঘর-করা!

মা-হারা

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

কেন এ জ্বালা, কেন এ পাগলকারী তৃষ্ণা, কেন এ হৃদয়ের অশান্ত ক্রন্দন! সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে মায়ের ক্রোড়-বিচ্যুত শিশুর মা'কে পাওয়ার জন্য এই আকুল ক্রন্দন কি থামিবে না? সাংখ্য দর্শন যাহাকে প্রকৃতি বলিয়াছেন, বেদান্ত যাহাকে মায়া বলিয়াছেন, ভাগবতের যাহা হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধা—সেই রহস্যময় উৎস হইতে বাহির হইয়া অনন্তের সাগর সঙ্গমে ছুটিয়া আবার কেন উজান বহিবার এ চেষ্টা? বিশ্বের জননী শক্তি তাহার ধারা বিস্তার করিয়া চলিয়াছে—কেন চলিয়াছে, কোথায় চলিয়াছে কে জানে? নারী-শক্তি সন্ততিক্রমে মানবের বংশ-ধারা বিস্তৃত রাখিয়াছে। মায়ের সঙ্গে যে মানব জাতির নাড়ীর টান! তাই সাধক ভগবানকে মা-ভাবে কল্পনা করিয়া সুখী হন—নারীর ভিতর ভগবতীর অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। যে কেবল কামিনী ভাবেই নারীকে দেখিয়া আসিয়াছে,ভোগ বিলাসের সামগ্রী মনে করিয়াছে—সে জীবনে একটা মস্ত বড় রসের আস্বাদন হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

সৃষ্টির সেই আদি জননীর ক্রোড় হইতে চ্যুত হইয়া অবধি মানব জাতি মা-হারার মত ছুটিয়া বেড়াইতেছে। নিজের উৎপত্তি কোথায়, কি রহস্যে সেই ঘটনা জড়ানো রহিয়াছে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দর্শন, বিজ্ঞান ক্লান্ত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। মায়ের সন্ধান সে পায় নাই, কচি শিশুর মুখের আধ-আধ কথার মত তাহার জ্ঞান বিজ্ঞানের বাণী অস্ফুটই রহিয়া গিয়াছে। রহস্যের সন্ধান না মিলিলেও মায়ের স্নেহময় হস্তের বেষ্টন এই সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টিকে ধরিয়া রাখিয়াছে—যে স্নেহের নিয়মে আকাশের কোটি কোটি তারা মনের সুখে নাচিয়া বেড়ায়, কেহ কাহারও গায়ে ঠেকে না, কত মহাতপনের সৃষ্টি আবার মায়ের কোলেই প্রলয়, কত উল্কার মায়ের বুকে আছড়ে পড়া, ছায়া পথে কত ভ্রূণ-ভানু শিশু-চন্দ্রের জন্ম সম্ভাবনা, গগনময় বিস্তারে গ্রহ-উপগ্রহের যুগ যুগান্তর ধরিয়া আবর্তন—বিশ্ব মায়ের কোলে ধূমকেতুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নর্তন, প্রলয়ের ভৈরব হুঙ্কার, সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ মহিমা, বিরাটের মহনীয়তা, অণুর চমৎকারিত্ব—এই সমস্ত ভীমকান্ত লীলার মাঝে মায়ের উদ্দাম ভালবাসা!

বুকভরা আগুন লইয়া এই বসুন্ধরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তালে তালে নাচিতেছে—চারিদিকে তাহার নীলের অসীম বিস্তার, তাহাতে হীরা মুক্তা মাণিকের মত গ্রহ-তপন-তারকা-চন্দ্র খচিত রহিয়াছে। ধনধান্য পুষ্পভরা এই বসুন্ধরার মাঝে সকল দেশের সেরা আমার স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমি ফেনিল জলধি মায়ের চরণ চুম্বন করিয়া অবিশ্রান্ত গর্জন করিতেছে, তুঙ্গ শৃঙ্গ শৈলমালা মাথায় কিরীট রূপে শোভা করিয়া রহিয়াছে, শ্যাম স্নিগ্ধ বনানি,নদী জলমালা-ধৃত প্রান্তর, শস্য-শ্যামলা মা আমার কি মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রাণ মন কাড়িয়া লইতেছেন! আমাদের এই জন্মভূমি, এই ক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবী, এই সৌর জগৎ, তদপেক্ষা বৃহত্তর জগৎ সমষ্টি কোন্ অজ্ঞাত স্নেহের টানে, কোন্ অলক্ষ্যের সন্ধানে মাতৃ-হারার মত পাগল হইয়া অবিশ্রান্ত ছুটিয়া চলিয়াছে! সমগ্র সৃষ্টি যেন মায়ের সন্ধানে দিশাহারা। কত যুগ যুগান্তর চলিয়া গেল, কত শতাব্দী ফিরিয়া ঘুরিয়া আসিতে আসিতে শ্রান্ত হইল, কত গ্রহ উপগ্রহ তপন মহা-তপনের খুঁজিতে খুঁজিতে আঁখির জ্যোতিঃ নিবিয়া গেল, কত প্রলয় মহা-প্রলয় কোথায় লয় পাইয়া গেল—কিন্তু আজও পর্য্যন্ত মাতৃ-হারার মায়ের খোঁজ আর মিলিল না। সাধক মনের খেদে গাহিলেন "মা, আমায় ঘুরাবি কত, কলুর চোখ-ঢাকা বলদেরই মত। খুলে দে মা চোখের ঠুলি হেরি মা তোর অভয় পদ।" সমস্ত বিশ্ব সৃষ্টি উন্মাদের মত ছুটিতে ছুটিতে যেন এই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি করিতেছে। মেঘের অন্ধকারে বিজলীর ঝলকে যেন মাঝে মাঝে সাধক প্রাণের

মধ্য দিয়া এ অনন্ত রহস্যের সন্ধান মিলিল বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্নেহাতুর মানব-শিশুর চির অশান্ত ক্রন্দন কই থামিল না তো। সৃষ্টির আদি কাল হইতে এ ক্রন্দন উঠিয়াছে, প্রলয়েও এ ক্রন্দনের বিরাম নাই, এ চিতার আগুন কখনও নিবিবে কি না কে জানে?

তৃষিত মানবাত্মা গুমরিয়া বলিতেছে—মাগো, আর কত দিন কাঁদিব, কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ না হইলে তুমি বুঝি তোমার স্নেহের হাতখানি বাড়াইয়া দিবে না। তোমার অফুরন্ত স্নেহের পরশ একবার নয়নে বুলাইয়া দাও, তোমার অনন্ত অঞ্চলের একটি প্রান্তে চোখের জল মুছাইয়া দাও। শিশুর হাসিতে, নারীর প্রেমে, চাঁদের জ্যোৎস্নায়, কুসুমের সুবাসে,—যে সুখ সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠিয়া জগৎকে শান্ত স্নিগ্ধ করে, সে সকলের মূল উৎস রূপে তুমি একবার নয়ন সম্মুখে দাঁড়াও—মৃণ্ময়ীর ভিতর দিয়া সাধক কি করিয়া চিণ্ময়ীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, আমি সেই তত্ত্ব বুঝিয়া ধন্য হই। আমার জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত অন্ধকার দূর হইয়া যাক—তোমার উজ্জ্বল জ্যোতিতে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। "পরশ মণির প্রদীপ তোমার অচপল তার জ্যোতিঃ, সোনা করে নিক পরশে আমার সব কলঙ্ক কালো।"

স্নেহের ভাণ্ডার মা তুমি, তোমার সন্ধানে এ পাগল হিয়া জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া ছুটিয়াছে, ইহজন্মে কত আশ্রয় ধরিয়াছে, মাতৃ-ভ্রমে কত জনকে অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু প্রাণের তৃষা মিটে নাই। এতদিন পরে মা, যদি তুমি আমায় ধরা দিলে, তবে আর ছলনার আবরণে সন্তানকে পথহারা করিও না। এতদিন পাইয়াও পাই নাই, ধরিয়াও ছাড়িয়াছি, সন্দেহের অন্ধকার এখনও কাটে নাই—কিন্তু মন বলিতেছে, এতদিন যাহার সন্ধানে উন্মাদের মত—ছুটিতেছিলে আজ তাহারই পদ প্রান্তে পৌছিয়াছ। মা-হারার অপার ব্যথা, হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণা বুঝি এতদিনে ঘুচে! তোমারও কি আমায় মনে পড়ে না?—না এ বুঝি লীলা চাতুরী। ধরা যদি পড়িয়াছ, তবে রহস্যের আবরণ দূরে ফেলিতেই হইবে—মায়াজাল ছিন্ন হইবেই—মা-হারার মাতৃলাভে আর কেন বাধা দাও মা! তৃষিত হিয়াকে জুড়াইতে দাও, এ মরুতে আর যে চলিতে পারি না—যদি তোমার এ লীলা মরীচিকাই হয়, তবে কবির ভাষায় বলি—

"মরীচিকা রচি জুড়াব জীবন আপনারে দিব ফাঁকি।"
আমার সেই ফাঁকির ফাঁকেই—জীবনটা কাটাইয়া দিতে দাও।

আমি বেশ বুঝিয়াছি, হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি যে দিন বিশ্বের উন্মত্ত নর্ত্তনের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল ঠিক রাখিয়া নিজের জীবনকে মিলাইতে পারিব, সেই দিন জীবনের এই বে-সুরা যন্ত্রটি ঠিক বাজিবে—তখন কাহার দোষে জীবন আমার এমন অর্থ-হারা একথা বলিয়া আর কাঁদিতে হইবে না। মা-হারা হইয়া এতদিন ছুটিয়া চলিয়াছি—কত যুগ যুগান্তর, কত জন্ম জন্মান্তর ঐ একই লক্ষ্য ধরিয়া হৃদয়ে বেদনার বোঝা বহিয়া চলিয়াছি—আজ বুঝি লক্ষ্যের সন্ধান মিলিয়াছে, উষার আলোক দেখা দিয়াছে, পাখীর প্রভাতী কলরব বসন্তের গগনতলে ধ্বনিত হইয়াছে। আজ রক্তমাংস গঠিত আমারই মত দেহবিশিষ্ট মানব শরীরের মধ্য দিয়া চিন্ময়ীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এক মাতৃ-হৃদয়ের ভিতর দিয়া বিশ্ব মায়ের আভাস মিলিয়াছে। মা, তোমার অপার সৌন্দর্য্যময়, রহস্যময়, প্রেমময় রূপ তোমার সন্তানের নিকট ধরিয়া দাও, সে তোমার চরণ তলে তাহার জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত সুখ দুঃখ নিবেদন করিয়া ধন্য হউক। তাহার ভাল মন্দ, সুন্দর অসুন্দর যাহা কিছু আছে—তুমি সে সমস্ত গ্রহণ করিয়া তাহার জীবন অর্ঘ্য বিশ্ব দেবতার চরণ তলে পৌছিয়া দাও। মায়ের বুকে—মায়ের কোলে আসিয়া তাহার শ্রান্ত প্রাণ শীতল হোক—তোমার পবিত্র স্নেহ প্রলেপে তাহার সব ব্যথা জুড়াইয়া যাক—বিশ্ব আত্মার ক্রোড়ে মানব আত্মা শান্তিময় সুষুপ্তি লাভ করুক, মা-হারা মায়ের কোলে ফিরিয়া এতদিনের বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ভুলিয়া যাক।

পারুলবালা

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

নাম ছিল তা'র পারুলবালা
এমনি জ্বালা—
:ক একে সাতটা ছেলের পরে মেয়ে
তাইতে, নেচে গেয়ে
াটিয়ে দিলে তার জীবনের চোদ্দ বছর একে একে,
লোকে বল্‌ত দেখে,—
বিয়ে দেবার নামটি যে নাই এত বড় হ'ল পারুল
আছে ত কুল,
ধড়ে মেয়ে' এমনি করে আদর দিয়ে পুষে রাখা ঘরে
ই বোশেখেই দাও না কেন বিদেয় করে যেমন
তেমন বরে!"

তর্কলঙ্কার-পত্নী সেদিন এসে
নেক প্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে, ফোক্‌লা দাঁতে
খাব্‌লা খানেক হেসে
বল্‌লে—"যাহোক বুকের পাটা
ত বড় 'ডবকা' মেয়ে পাড়াপড়শীর গায়ে যে দেয় কাঁটা,
তোমরা মা বাপ হয়ে
ল ঢেলে পায় বসে আছ, মেয়েটা যে যাচ্ছে ক্রমে বয়ে!"
অনেকখানি 'অর্থাৎ কিনা'
গাপন ছিল এই কথাটায়—ভাল করে বুঝলেনা কেও
পারুল বিনা!

ঠাকুর বাড়ীর পথে সেদিন
পাড়ার নবীন,
য়স তার এই হদ্দমুদ্দ ষোল কিম্বা কুড়ি
আরতির দিন বেজায় হুড়োহুড়ি
ঝ গিয়েছে হারিয়ে ভিড়ে—ডাক্‌লে পারুল—'নবীন দাদা!'
বাকী কেবল ছিল কাঁদা!—

অন্ধকারে হাত ধরে' তার আগিয়ে দিলে বাড়ী
আর কি ছাড়াছাড়ি—
পাড়ায় পাড়ায় গাওনা গেয়ে হেথায় অবশেষে
পারুর মায়ের কানে কানে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হ'ল ভালবেসে!

পারুলের মা হাসলে বটে মুখে
কিন্তু মায়ের বুকে
কত রকম শঙ্কা যে আজ উঠ্‌ল রুখে
কিলবিলিয়ে সাপের মত;
লজ্জানত
মুখখানি তার সরিয়ে নিয়ে পারুলবালা
খুঁজে নিলে এক নিরালা।
কাঁদন সে কি মরণ-কাঁদন
দৈত্য যেন দাঁত দিয়ে তার ছিঁড়ে ফেলেছে বুকের বাঁধন।
খেলাঘরের জীবনটী তার নারী হয়ে উঠ্‌ল যেন ফুটে
কাঁদলে লুটে লুটে,
ধুলা কাদায় নৃত্যপরা এই বালিকার পায়ের নূপুর
সে কি—মধুর!
চাউনিটী তার
নিজের কাছেই পড়ল ধরা, একলা পথে চলাও যে ভার।
নিজের পানে তাকিয়ে সেদিন দেখ্‌লে পারুল
পাড়ার লোকে যা বলে তার অনেক কথাই নয়ক'ত ভুল।

চোখের জলে
প্রথম পর্ব্ব শেষ করে আজ পারুল যখন দাঁড়াল 'মা' বলে'
সে যেন এক নূতন বেশে
এলোকেশে
মেঘ যেন তার এলিয়ে দেছে সকল ভরা প্রাণ,
ক্ষোভে কম্পমান

ঠোঁট দু'টী তা'র রক্তজবার পাঁপড়ি সম
মনোরম,
শঙ্কিতা মা বুকের পরে
পারুলকে আজ রাখলে ধরে ;
কিসের যেন ভয়
না না—তা কি হয় ?—
পারুকে মা বক্ষে চেপে
দীর্ঘশ্বাসের আকুলতায় উঠ্‌ছেছিল কেঁপে কেঁপে ;
চুমায় চুমায় দিলে ভরি'
আজ পারুলের ছোট্ট বুকে কি যেন ভয় কাঁপছে থরথরি !

আপিষে আজ পারুর বাবার
কিসের ছুটি—ঠোঙায় ভরা এনেছে তাই অনেক খাবার।
পারুর বাবা শুধায় ডেকে—
"মায়ের কেন মুখখানি ভার ? চক্ষু রাঙা, বক্‌ছ কি একে ?
সাতটা মরে' একটা মেয়ে,
নেচে গেয়ে
বেড়াক না ও—কেন এমন কর তুমি বকাবকি ?
ছিঃ, ও কি ?
মায়ের আমার বুদ্ধি কত—"
পারু কিন্তু নড়লনাক বাপের ডাকে, মুখটি নত
অনেকখানি ব্যথা বুকে,
তাহার মুখে
ফুট্‌লনাক কোনো বাণী—
অনেকখানি
চাপা কাঁদন নিথর হয়ে রইল তাহার প্রাণে
আজকে কেহ বুঝলে না তার মানে !

বোশেখ মাসের দশ তারিখে
ভাল বরের হাতেহাতেই বাবা সঁপে দিলেন মেয়েটিকে ;
অর্থাৎ কিনা—বিজনবাবুর সমান
রাস্তা ঘাটে যায় না দেখা, ছিল তাহার হাজার রকম প্রমাণ।
দশের মাঝে তার পরিচয় ?
—"এমনটী হয় !"—
অজানা এক আনন্দেতে পারুর বুকে উঠ্‌ল উত্তাল ঢেউ

শ্বশুরবাড়ী ছিল না তার কেউ,
সে অবলা
হ'লনা তার মুখের কথা বলা—
তবুও সে ভাবলে মনে
সুখ কিনা এ জানিনা ত -কি হবে তা জানিয়ে জনে জনে ?

বিজনবাবু বিজন জীবন লয়ে
এতদিন ত এসেছিলেন একটানা বেশ সুখের বোঝা বয়ে -
কিন্তু বিয়ের পরে
শোনা গেল পরস্পরে
বিজনবাবু 'ঘাল' খেয়েছেন শূন্য প্রাণের কোন যে ফাঁকে
বলেন নি তা কাকে—
তবে সেটা প্রকাশ পেল' দু'দিন পরেই কনের আগমনে,
বিজনবাবুর চালচলনে
কি যেন কি জাহির হ'ল যায়নাক ঠিক বলা ;
তবে পথে চলা
হোচট্ খেত বারে বারে ;
"পারুল তারে
হাতধরে কি চলবেনাক ?"—এইকথাটী ভেবেই হ'ল ভয়
ভবিষ্যতের ভাবনা এসে হৃদয়টীকে তার করলে পরাজয় !

"একা একা ছিলাম খাসা
কোন দেশের এই মায়ার পাখী প্রাণের মাঝে
বাঁধলে বাসা ?
ওরে পাগল—
তোর পাঁজরের হাড় দিয়ে যে বাঁধলি আগল,
পাখী সে যে সত্যিকারের পাখী
উড়ে যাওয়া স্বভাব যে তা'র সেই কথাটি ভুললি নাকি ?
আমার ছিল 'আমি' একা
বিজন জীবন মাঝপথেতে কে তুমি গো দিলে দেখা ?
অনেক কালের চেনা লাগে,
বক্ষে জাগে
তোমার হাতের মধুর পরশ, কানে যেন শুনেছি ও বাণী
ওগো হৃদয়-রাণী

এলে যদি মনে রেখো
সারাজীবন থেকে থেকো
এই পরাণের প্রাসাদপুরে,
অনেক দূরে
যেওনাক—ছাড়বেনাত' সত্যি বল ?
ওকি তোমার নয়ন কেন ছল ছল !"

চোদ্দবছর পরে'
প্রথমে এই পারুলবালা এল যখন পরের ঘরে,
ছোট্ট বুকে সুখ ছিল তার ঢের
তবু কেমন গ্রহের ফের—
বাপের বাড়ীর ভাবনা এলে চক্ষুদু'টী উঠত জলে ভরে,
কেমন করে'
মায়ের আদর বাপের সোহাগ সজাগ হ'ত বুকে
স্বামী-সোহাগ সুখে ?—
ভেবে সে তার পেত না কূল
মাঝে মাঝে হ'ত যে ভুল
অনেক কাজে—
ধরা প'লে মুখখানি তার রঙীন হ'ত গভীর লাজে।

একটী মাস আর সইল না'ক মায়—
"এই শনিবার
ছুটী নিও—পারু আমার সেই গিয়েছে শ্বশুরবাড়ী
এই ত প্রথম ছাড়াছাড়ি,
বুক থেকে তায় নামিয়েছি কি এই চোদ্দ বছর ?
সোহাগ আদর
যত্ন ছাড়া ছিল না মোর অন্য কিছু
দাওটা ছেলের স্নেহ নিয়ে এতটা কাল তারি পিছু পিছু
এলাম ছুটে,
বক্ষপুটে
এই যে সুধা জমিয়ে এলাম রাশি রাশি,
সর্ব্বনাশী
এমনি করে পরকে নিয়ে ভুলে গেল আপন জনে
সেই কথাটা হান্‌ছে ব্যথা আমার মনে

* * * *

পারুল যখন বাপের বাড়ী, বেড়িয়ে এল সকল পাড়া
বিজন বাবুর বিজন জীবন তখন যেন লাগ্‌ছিল খাপ্‌ছাড়া।
একটী মাস যে হয়নি ছাড়াছাড়ি,
তাই,—পারুল যখন গেল বাপের বাড়ী—
আঘাতটা যে বিজনবাবুর বুকের পরে
লাগ্‌বে জোরে
এ কথাটা তারি ছিল জানা
তবুও সে করেনি ত মানা,
পুরুষ বলে নাই কি তাহার লজ্জা অভিমান ?
ভালবাসার মান
রাখতে যদি জানে—
যে প্রেয়সী ঘর-উদাসী সেহই আবার আস্‌বে ফিরে
আপন টানে,
আমি কেন দগ্ধে মরি
এই বেদনার পাত্র ভরি'
দিচ্ছি শুধু আপন মুখে তুলে ?—
না, না আমি থাক্‌ব ভুলে
কিসের এ বিরহ
পুরুষ আমি—হোক্‌ না ব্যথা যতই সে দুঃসহ !
সান্ত্বনা সে যতই করে দান
মান্‌ত না তার প্রাণ—
সে হয়েছে উড়ো-পাখী—বিজন বনের গহন পথের ধারে,
চল্‌তে নারে,
পায়ের বাঁধন টান্‌ছে যে তার
তাই একাকার ;
সকল বাঁধন
মনের মধ্যে ফুঁপিয়ে ওঠে দুরন্ত এক কাঁদন !

বাহিরটারে সাম্‌লে নিয়ে ভাব্‌লে বিজন—"বেড়িয়ে আসি
পুরী কিম্বা কাশী,
বাঁধতে যেয়ে নিজেই যখন পড়নু বাঁধা—
কেন মিছে কাঁদা ?
বাঁধন এখন কাটতে যদি পারি
তবেই বলিহারি !"

সে ত জানে মনের মিলন নাহোক হুনিয়ার
কাঁটা হয়ে বিধ্‌বে বুকে বরণমালা তার ;—
তাইত হ'ল
এত সুখের ব্যথাটুকুই বেঁচে র'ল ?
আমিই কেবল দিয়ে ফতুর,
সেই ত চতুর !
সেবার যা'.তা' নিয়ে গেল কি দিল তা সেই ত জানে
এই যে ব্যথা তা'র বুকে কি হানে ?

মাসখানেক না যেতে যেতে
সেদিন রেতে
হঠাৎ যেন লাগ্‌ল কেমন পুরীর হাওয়া –
সকালবেলা হ'ল না আর নাওয়া খাওয়া
সাগর ডাকে কেমনতর লাগ্‌ল যেন
ঢেউগুলো সব এমন কেন ?
তারেই যেন করলে উপহাস
কিসের আভাস
লাগ্‌ল প্রাণে
মন যে তাহার কি কথা কয় বিজন তাহার বুঝলেনাক
কোনও মানে !
শুধু তখন ঘরের মায়া
শ্রান্ত হু'টী নয়ন ভরে বিছিয়ে দিল আপন মধুর কায়া —

বিজন ভাবে এইত গেহ
এইত আমার প্রাণজুড়ান মায়ের স্নেহ,
নাই শুধু একজনা
মনটিরে মোর হরণ করে আমারে যে করেছে উন্মনা !
কেন এমন হয় ?
হৃদয় দিয়ে কার হয়েছে এমন পরাজয় ?
একটী মাসের স্মৃতি
কেন আমায় এমন করে দিচ্ছে ব্যথা নিতিনিতি ?
সেই অবলা পারুলবালার স্বামী
সেই দোষে কি দোষী আমি ?
হৃদয় আমার উজাড় করে
দিইছি ভরে

এই কি তবে সেই অকারণ ক্ষতির ব্যথা ?
না না, সে যে মিথ্যে কথা
বুঝছি আমি প্রাণে প্রাণে,
এই দরদের দরদী যে অন্তর্যামী সেও ত জানে !

একে একে তিনটী মাসে
ঘরে এবং পরবাসে
কাটিয়ে বিজন, বাক্স খুলে দেখলে দিয়ে হানা
অন্ততঃ বিশ খানা
পারুর চিঠি অ-খোলা সব অনাদরে পড়ে আছে,
তারই কাছে
পারুর দেওয়া বকুল ফুলের মালা ;
বুকের জ্বালা
আরো গেল বেড়ে ;
এতদিনের ভোলা কথা ঘুম থেকে সব উঠল মাথা নেড়ে !
ঘরটা নির্জন
চিঠিগুলো পড়লে খুলে—দেখ্‌লে বিজন
এ যেন তার বুকের শোণিত মাখা
আখরগুলি, গভীর ব্যথার নয়ন জলে ঢাকা
চিঠিগুলো রাখল বেঁধে
উঠল কেঁদে
আকুলতায় বিজনের প্রাণ ;
তবুও হায় সেই অভিমান
বড় হলো !
পারুল লতা মনের ব্যথায় নেতিয়ে প'ল
—"স্বামীর হাতের হু'টী আখর লেখা
এই জীবনে যাবেনা দেখা !"

বিজন পারুর নিলে না আর খোঁজ
ভাবে সে রোজ রোজ
আজকে ঠিকই লিখব চিঠিখানা
মানবনা আর মনের মানা—
এমনি করে হারিয়ে যে যায় সকল দিশা
প্রাণের তৃষা

বাহির দিয়ে কেমন করে মেটে
দগ্‌দগে এই মনের ঘা'টা বাড়াব না নিঠুর হাতে ঘেঁটে!
কিন্তু—ব্যথা যত বাড়ল দিনে
একেবারে নিল যেন কিনে
সর্ব্বহারা মনটিকে তার তার সে প্রাণের বিপুল অভিমান
তারই কাছে বিকিয়ে দিল সকল কাণ্ড জ্ঞান

পনেরটা দিন একনাগাড়ে অসুখ
শুকিয়ে গেছে পারুলবালার ঢল্‌ঢলে মুখ,
টল্‌টলে গাল টোল্‌ খেত যে ফুঁয়ের ভরে
এমন করে
চুপসে গেছে—দেখ্‌লে তারে পাড়ার লোকেও কাঁদে,
নীরব আর্ত্তনাদে
কোটর হ'তে ভাসা ভাসা ডাগর আঁখি দু'টী
বিশ্বধাতার চরণতলে পড়ছে যেন লুটি—
"আহা এমন ঠোঁট দু'খানি
নড়েনাক' সরে না আর বাণী
মর্ম্মে যেন আছে মরে,
পরাণ ধরে
তার দিকে কে তাকায় বল
কেন এমন হ'ল?

সেদিন দুকুর বেলা
বিজনবাবু বন্ধুসহ করতেছিলেন পাশা খেলা!
ঝড়ের মতন
নিদেন খবর লাগিয়ে দিল দুকুর মাতন
বিজনবাবুর মনে,
সে কি অকারণে
দুকূল ছাওয়া বানের মত হু হু করে বন্যা এল ধেয়ে?
দু'টী নয়ন ভরে
পড়ল ঝরে
এতদিনের কঠিন শিলার রুদ্ধ স্রোতের ধারা
বাঁধন হারা
এত দিনের ঘনিয়ে তোলা বিপুল অভিমান
হ'ল অন্তর্ধান
বিদ্যুতের এই ঝিলিকহানা মেঘ-জমান বক্ষ চিরে
জীবন ঘিরে!

• • • •

"আমার প্রাণের পারুলবালা
সুখে দুখে সেই ত আমার দীর্ণ বুকের বরণ মালা;
জীবন-উষার সেই ত আলো
সব ফুরালো?
নিবিড় বিজন এই আকাশের ধ্রুবতারা
জ্যোতির ধারা;
অন্ধকারে
বারে বারে
পথ-ভুলান মোহের মাঝে সেই ত ছিল মধুর মায়া
বিছিয়েছিল এই সাহারায় তারই শ্যামল গহন গভীর ছায়া।
ঊষর মরু-বুকের পরে
আজও তারি সৃষ্টি করা পাহাড়তলীর ঝরণা ঝরে;
হায়, অভাগা পলে পলে
এলি দলে
তার জীবনের তরুণ কচি নধর শাখার সব কিশলয়
এমনি নিদয়!
শূন্য প্রাণের উষ্ণ বায়ে শুকিয়ে গেল বাসন্তীফুল
সে ছিল মোর তাজা পারুল!
বিজন জীবন রইল আবার নিজন হয়ে
মরুর নিশান হাঁ হাঁ করে বিষ ছড়িয়ে চল্‌ছে বয়ে।

ইয়াংসি

[অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

(৪) বিপ্লবকেন্দ্র নান্-কিঙ্

দ্বিতীয় দিবস দ্বিপ্রহরে নান্-কিঙ্ পৌঁছিলাম। ইয়াংসি এইখানে অনেকটা উত্তর ঘেঁসিয়া আসিয়াছে। বস্তুতঃ পয়াঙ্ ছাড়িবার পর হইতে নদীর গতি বরাবর উত্তর-পূর্ব্বে। নান্-কিঙ্ হইতে ইয়াংসি দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবতরণ করিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে। আরও ২৪ ঘণ্টা পরে কাল দ্বিপ্রহরে শাংহাই পৌঁছিব।

চীনা সহযাত্রী মহাশয় এইখানে নামিয়া গেলেন। নান্-কিঙ্ হইতে রেলে শাংহাই যাইবেন। মাত্র ৪।৫ ঘণ্টার পথ। শাংহাই হইতে নান্-কিঙ্ আসিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া সম্প্রতি ষ্টীমার হইতে নামিলাম না।

নান্-কিঙ্ চীনাদের দ্বিতীয় পিকিঙ্। এই শব্দের অর্থও "দক্ষিণ রাজধানী"। ১৯১১ সনে রিপাব্লিক স্থাপিত হইবার পর স্বরাজ প্রবর্ত্তকগণ নান্-কিঙ্‌কেই রাষ্ট্রকেন্দ্র করিতে চাহিয়াছিলেন। নান্-কিঙ্ই সর্ব্ব প্রথম বিপ্লব-কেন্দ্রও ছিল। শেষ পর্য্যন্ত পিকিঙেরই জয় হইয়াছে। পরে স্বরাজ-প্রেসিডেণ্ট য়ুয়ান-শি কাইয়ের আধিপত্য ভোগের বিরুদ্ধে চরমপন্থী বিপ্লববাদীরা যখন পতাকা উত্তোলন করেন তখন তাঁহারা নান্-কিঙ্‌কেই স্বরাজকেন্দ্র করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চীন দুই টুকরা হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। তাহা হইলে উত্তর চীন য়ুয়ানের অধীনে রাজ-তন্ত্রের অন্তর্গত থাকিত। দক্ষিণ চীন পুরাপুরি স্বরাজের অন্তর্গত হইত। এই গৃহ বিবাদকে অনেকটা ইয়াঙ্কিস্থানের 'সিবিল ওয়ার' এর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক চরমপন্থীরা কৃতকার্য্য হন নাই। তাহাদের নেতা ছিলেন স্থন্ ইয়াৎ-সেন এবং সেনাপতি হোয়াঙ-সিঙ। উভয়েই একণে চীন হইতে নির্ব্বাসিত। স্থন্ জাপানে আন্দোলন চালাইতেছেন—হোয়াঙ্ ইয়াঙ্কিস্থানে ঘুরিতেছেন।

য়ুয়ানের দল নানা কৌশলে বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যাঙ্কারগণ হইতে শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য ৩৭॥০ কোটী টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। স্থন্ এবং হোয়াঙ্ এই ঋণ গ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তাহাদের দল প্রচার করিল যে য়ুয়ান জন সাধারণের মত না লইয়া বে-আইনি ভাবে এই ঋণ গ্রহণ করিতেছেন। ইহার ফলে প্রথম হইতেই রিপাব্লিক বা প্রজাতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। যদি বিদেশ হইতে য়ুয়ান টাকা না পান তাহা হইলে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রজাতন্ত্রের নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। এই বুঝিয়া স্থনের অনুচরবর্গ নানাদেশে ঋণের বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। এখনও ইঁহারা য়ুয়ানের নূতন ঋণ গ্রহণের পথে কণ্টক বিকীরণ করিতেছেন।

বিলাতী সমাজেও এইরূপ দেখা গিয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজায় ও প্রজায় যে দ্বন্দ্ব চলিত তাহাতে রাজা বিদেশীয় টাকার সাহায্যে বহুকাল পর্য্যন্ত ক্ষমতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ফরাসী নরপতি চতুর্দ্দশ লুই বিলাতী দ্বিতীয় চার্লস্‌কে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন। ফ্রান্সের টাকা লইয়া চার্লস্ ইংরেজ জন সাধারণের প্রতিনিধিবর্গ বা পার্লামেণ্টকে অগ্রাহ্য করিতেন। এই জন্যই পার্লামেণ্ট সভার আহ্বান না করিয়াই তিনি যথেচ্ছ ভাবে শাসন চালাইতেন। তাঁহার টাকার অভাব ছিল না, এইজন্য প্রজাবর্গ শীঘ্র তাঁহাকে জব্দ করিতে পারে নাই। শেষ পর্য্যন্ত জনগণ যখন হইতে ফরাসীর শত্রু ওলন্দাজ উইলিয়মের সাহায্য পাইল তখন হইতে ইংল্যাণ্ডে রাজক্ষমতা হ্রাস

পাইতে থাকিল। বর্ত্তমান চীনের স্বরাজান্দোলনে সুনের দল য়ুয়ানকে ষ্টুয়ার্ট চার্লসের ন্যায় দেশদ্রোহী বিদেশ-ভক্ত বিবেচনা করিতেছেন। ফরাসীর সাহায্যে ষ্টুয়ার্টেরা যেরূপ অনেকদিন পর্য্যন্ত যথেচ্ছাচার করিতেছিলেন আজ বিদেশীয় বণিকগণের সাহায্যে য়ুয়ান সেইরূপ যথেচ্ছাচার করিতেছেন। সুতরাং বিদেশীয় বণিকগণকে ধ্বংস না করিলে চীনে প্রজাতন্ত্র শাসন স্থাপিত হইবে না।

কিন্তু বিদেশীয় বণিকগণকে ধ্বংস করা সুনের পক্ষে অসাধ্য, কাজেই তিনি বণিকগণের রাষ্ট্রপুঞ্জের নিকট কাঁদিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য, টেলিগ্রামের ফল হয় নাই। চীনা ষ্টুয়ার্ট বিদেশীয় অর্থ প্রভাবে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ভোগই করিতেছেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের The China Year Book গ্রন্থের Finance অধ্যায় হইতে চরমপন্থী স্বরাজবাদিগণের প্রয়াস বিবৃত হইতেছে।

Dr. Sun took the extreme step of telegraphing to the Governments and peoples of the foreign powers denouncing the Government * * * of concluding the loan in a high-handed and unconstitutional manner. He asserted that so long as the Peking Government was kept without funds there was a posibility of a compromise between it and the people being effected, where as a liberal supply of money would probably precipitate a terrible and disastrous conflict. "In the name and for the sake of humanity which civilization holds sacred, I therefore appeal to you to exert your influence with a view to preventing the bankers from providing the Peking Government with funds which at this juncture will assuredly be utilised, as the smens of war."

বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ দেখিলেন যে, চীনে প্রজাতন্ত্রই হউক বা রাষ্ট্রতন্ত্রই থাকুক, তাঁহাদের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। বরং ঋণদানের সর্ত্ত এরূপ যে তাহার প্রভাবে চীনের নানা শাসনবিভাগে বিদেশীয় কর্ম্মচারিবর্গের প্রভাব স্থাপিত হইবে। য়ুয়ান সাক্ষীগোপাল মাত্ররূপে বিদেশীয়দিগের কথায় উঠিবেন বসিবেন। চীন প্রকারান্তরে বিদেশীয় হস্তেই থাকিবে। তাঁহাদের একমাত্র ভাবনা ছিল যে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি বাড়িয়া যাইবে। তাহা নিবারণ করিবার জন্য যথাসাধ্য যুক্তি ও পরামর্শ হইয়া গেল। তাহার পর ইঁহারা দূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া য়ুয়ানের ঋণ-পত্র এবং খাজনা বন্ধকি গ্রহণ করিলেন।

ইয়াঙ্কি রাষ্ট্রের সভাপতি উড্রো উইলসন প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, য়ুয়ান যে সর্ত্তে বিদেশীয়গণের অর্থ গ্রহণ করিতেছেন তাহাতে চীনের স্বাধীনতা রক্ষা হইতে পারে না। অনেক সময়ে বিদেশীয় রাষ্ট্রপুঞ্জ চীনের আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইবেন। এই বুঝিয়া তিনি ইয়াঙ্কি ব্যাঙ্কারগণকে ঋণদান হইতে বিরত রাখিলেন। কিন্তু ইংলাণ্ড, জার্ম্মাণি, রুষিয়া, ফ্রান্স ও জাপান এই পাঁচ রাষ্ট্র য়ুয়ানের সর্ত্ত গ্রহণ করিয়াছেন। The China Year Book হইতে ইয়াঙ্কি রাষ্ট্রের মত উদ্ধৃত হইতেছে "The conditions of the loan touched the independence of China and * * * the American Government might in certain eventualities be led to the necessity of forcible interference, not only in the financial, but also in the political affairs of China."

সুনের মতে চীনে প্রজাতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথে বিদেশীয় ঋণ প্রধানতম অন্তরায়। উইলসনের চীনাদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পথে এই ঋণ বিশেষ কণ্টকস্বরূপ। কাজেই য়ুয়ান চীনাসমাজে এক সঙ্গে যথেচ্ছ রাজতন্ত্র এবং পরাধীনতা আমদানি করিয়াছেন বলিতে হইবে। ফরাসীদেশেও বিপ্লবের যুগে এইরূপ য়ুয়ানশি-কাইয়ের উদ্ভব একাধিকবার হইয়াছিল। অবশেষে ১৮৭০ সালের ঘটনায় চরমপন্থী স্বরাজতন্ত্রীরা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব পাইয়াছেন।

নান্‌কিঙ্‌-এর পরেও ইয়াংসির দুই ধারে পাহাড় অথবা ধানের ক্ষেত এবং পল্লী কুটির দেখিতেছি। পরদিন প্রত্যূষে কিয়ৎকালের জন্য ইয়াংশির সুপ্রশস্ত রূপ দেখিলাম। খানিকটা পদ্মার বিস্তৃতি যেন দেখা গেল। তাহার পরেই সঙ্কীর্ণ খাল সদৃশ নদীর ভিতর পড়িলাম। ক্রমশঃ শাংহাই

দৃষ্টিগোচর হইল। দুই কিনারায় জেটি, কারখানা, চিমনি, আফিস ইত্যাদি দেখিয়া নিউ ইয়র্ক বন্দরের কথা মনে আসিল। শাংহাই বন্দরের নিকট ইয়াকোহামা যেন নিষ্প্রভ। কোথায় চীন ছাড়াইয়া আসিয়াছি, যেন ইয়োরামেরিকার কোন পোতাশ্রয়ে উপস্থিত। প্রাসাদতুল্য ব্যাঙ্ক, কনসাল গৃহ, হোটেল ইত্যাদি বিদেশীয় কনসেশন মহল্লায় অবস্থিত। বাঁধ পথে ইলেক্‌ট্রিক ট্রাম, মটরকার অহরহ চলিতেছে। নদীতে জাহাজ, ষ্টীমার, নৌকা অগণিত। বিরাট বিদেশীয় নগরের ভিতর দিয়া এক চীনা হোটেলে আসিলাম। সন্ধ্যার সময়ে নদীর ধারে "ইডেন গার্ডেন" সদৃশ বাগানে বসা গেল। এখানে চীনাদের প্রবেশ নিষেধ। আগাগোড়া কলিকাতা বোম্বাই অপেক্ষাও শাংহাইকে জাঁকজমকপূর্ণ বোধ হইতেছে। *

অর্থ বিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত]

পঞ্চম অধ্যায়

অর্থ বিনিময় ও ঋণদান (অনুবৃত্তি)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যবসায় ক্ষেত্রে পণ্য দ্রব্যের মূল্য প্রেরণের প্রয়োজন নিয়তই উপস্থিত হয়। কেহ দেশী হউক বা বিদেশী হউক, দূরবর্ত্তী অপর কোন ব্যবসায়ী হইতে ধারে কোন সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিলে মেয়াদ মত তাহাকে টাকা আদায় করিতেই হয়, অন্যথায় তাহার সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যায়। নগদ টাকা প্রেরণ করিয়া দেনা পরিশোধ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। বিশেষ বিদেশী মহাজনের প্রাপ্য আদায় করিতে হইলে, সোণা প্রেরণ করিয়া তবে দেনা আদায় করিতে হয়। সোণাই বহির্বাণিজ্যের দেনা পরিশোধের মুদ্রা। তেমন মণিঅর্ডারে অর্থ প্রেরণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। দেশের সীমার ভিতরে ভিন্ন দেশের প্রচলিত নোট অপর দেশে চলে না। এই সকল ব্যয় লাঘব করিবার জন্য বিলের অভ্যুদয় হইয়াছে। উহাদের সাহায্যে অতি সহজে দেনা পরিশোধ করা যায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপে যদি মনে করা যায় যে, কলিকাতার কোন্ ব্যবসায়ী রাম, মাদ্রাজের নাদু হইতে হাজার টাকার পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতে চান। মাদ্রাজের রঙ্গস্বামী নামক অপর এক ব্যক্তি রামের নিকট হাজার কিম্বা তদূর্দ্ধ টাকার জন্য ঋণী আছেন। রাম নাদুকে টাকা দেওয়ার জন্য রঙ্গস্বামীর উপর বরাত দিয়া একখানা বিল সম্পাদন করিয়া নাদুর নিকট প্রেরণ করিলে, নাদু এই বিলের টাকা রঙ্গস্বামী হইতে আদায় করিলেই তাহাদের তিন জনেরই দেনা পাওনা পরিশোধিত হইয়া যাইবে। অথচ তাহাতে কাহাকেও কোন ব্যয় বিধান করিতে হইবে না, আর যাহা হয় তাহা নগণ্য।

তদ্রূপ রাম রঙ্গস্বামীর নিকট হাজার টাকার পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করিয়া একখানা বিল-অব-এক্সচেঞ্জ লিখিয়া তাহাতে রঙ্গস্বামীর সম্মতি লিখাইয়া লইয়াছেন। এই টাকা পরিশোধ করার মেয়াদ মধ্যে রাম নাদু হইতে দুই হাজার টাকার পণ্য দ্রব্য খরিদ করিলে সেই টাকার মধ্যে হাজার টাকা আদায় করার জন্য এই বিলখানা নাদুর নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। তখন নাদু রঙ্গস্বামী হইতে এই বিলের টাকা আদায় করিলেই এই হাজার টাকার দেনা পাওনা পরিশোধিত হইবে। কিম্বা নাদু অপর একখানা বিলের জন্য রঙ্গস্বামীর নিকট দায়ী থাকিলে এই দুই বিলে দেনা-পাওনা কাটাকাটি যাইয়া তাহাদের তিন জনেরই এই

---

* হৃষিকেশ সিরিজের অন্তর্গত "প্রাচ্য জগতে প্রথম স্বায়ত্ব শাসন" নামক গ্রন্থের এক অধ্যায়।

হাজার টাকার পাওনা-দেনা পরিশোধিত হইতে পারে। তখন নগদ একটী পয়সাও ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে না।

এমনও হইতে পারে যে, রাম রঙ্গস্বামীর নিকট ধারে মাল বিক্রয় করিয়া বিল লিখিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তিনি মান্দ্রাজ হইতে কোন সামগ্রী খরিদ করেন নাই। সুতরাং হয় রাম মান্দ্রাজ হইতে টাকা আনাইবেন, না হয় ত রঙ্গস্বামী তাহা প্রেরণ করিবেন। কিন্তু তাহা না করিয়া টাকা পরিশোধিত হইতে পারে। যদি কলিকাতার অপর কোন মহাজন মান্দ্রাজ হইতে ধারে মাল খরিদ করিয়া আনিয়া থাকেন, কিম্বা তাঁহাকে তথায় টাকা প্রেরণ করার আবশ্যক হয়, তবে তিনি রামের বিল ক্রয় করিয়া লইয়া তাঁহার মহাজনের নিকট উহা প্রেরণ করিতে পারেন। তখন ঐ মহাজন রঙ্গস্বামী হইতে টাকা আদায় করিলে এই চারি পক্ষেরই দেনা-পাওনা পরিশোধিত হইয়া যাইবে।

এমনও ত হইতে পারে যে, রামের এই বিনিময়-বিল সম্বন্ধে কলিকাতার অপর কোন ব্যবসায়ী, যাঁহাকে মান্দ্রাজে টাকা পাঠাইতে হইবে, তাহার কিছু জানা নাই। অথচ রামেরও সদ্য সদ্য টাকা পাওয়া আবশ্যক। মোদ্দত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিলে তাঁহাকে টাকার জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। এরূপ অবস্থা নিয়তই ঘটিতে পারে। ব্যাঙ্কের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, রাম কিম্বা তাঁহার অবস্থাপন্ন অপর কাহাকেও কোন বেগ পাইতে হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রাম তাঁহার এই বিল লইয়া ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক একটা নির্দ্দিষ্ট ব্যাজ বা বাট্টা (discount) কাটিয়া অবশিষ্ট টাকা তাহার আমানত হিসাবে জমা করিয়া লন। তখন ব্যাঙ্ক মান্দ্রাজে তাহার কোন শাখা থাকিলে তাহাতে কিম্বা অপর কোন ব্যাঙ্কে প্রেরণ করিয়া দায়িক হইতে টাকা আদায় করিতে পারেন, অথবা অপর কোন ব্যবসায়ী তাহা ক্রয় করিতে চাহিলে তাহার নিকট বিক্রয় করিতে পারেন। এই ভাবে বিক্রয় হইলে ক্রেতা তাহার মান্দ্রাজস্থ মহাজনের নিকট প্রেরণ করিলেই তিনি এই টাকা আদায় করিয়া লইতে পারেন। এইরূপে বিলের মাতব্বরীতে ব্যাঙ্কের টাকা কর্জ্জ লগ্নি হইয়া থাকে।

এইরূপে বাট্টা কাটিয়া বিলের টাকা জমা করা ও তাহা আদায় করিয়া লওয়াই ব্যাঙ্কের বিশেষ ব্যবসায়। ইহা দ্বারা দেশ বিদেশে অনায়াসে টাকা আদান প্রদান চলিয়া থাকে। ইহার বিশেষ সার্থকতা এই যে, তদ্দ্বারা অধিকাংশ দেনা-পাওনাই বাদ্‌-কাটাকাটিতে পরিশোধিত হয়। যাঁহারা ব্যাঙ্কে বিল জমা করিয়া দেন, তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ কোন নগদ টাকা দিতে হয় না। মাত্র বাট্টা কাটিয়া উহার প্রাপ্য দাবী তাঁহার নামীয় আমানতী হিসাবে জমা করিয়া লওয়া হয়। তখন চেকের সাহায্যেই টাকার প্রয়োজন চলিয়া যায় এবং সেই চেকের টাকা ও বাদ-কাটাকাটিতে উসল যায়। তেমন সেই বিলের টাকা ব্যাঙ্কের মারফতে আদায় হইলে, দেনাদারও চেক কাটিয়াই টাকা পরিশোধ করেন। সুতরাং কোন অবস্থায়ই বেশী নগদ টাকা ব্যবহার করার প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। এই বাট্টাকে 'ব্যাঙ্ক রেইট' কহে।

এই সকল বিক্রয়ের একদল ব্রোকার বা দালাল আছেন, তাঁহারা এই সকল বিল ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায় করেন। তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করিলেই কোন্ দেশের কয়খানা বিল বিক্রয় জন্য উপস্থিত আছে, তাহা জানা যায়। যে দেশে যে বিলের টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, তাহাকে সেই দেশের বিল বলা হয়। দেনাদার দেশেই বিলের টাকা পরিশোধিত হয়। সুতরাং দেনা-দার দেশের নামে বাজারে বিলের পরিচয় হয়। ফরাসী বিল বলিলে বুঝিতে হয়, যে ফরাসী দেশের লোক দেনা-দার এবং এই বিলের টাকা ফরাসী দেশ হইতে আদায় করিতে হইবে। যাহাদের বিদেশে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন আছে, তাহারাই বিলের ক্রেতা। ক্রেতাগণ বিল ক্রয় করিয়া লইয়া বিদেশস্থ মহাজনের নিকট দাবী আদায় জন্য প্রেরণ করেন। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ক্রেতাগণের প্রয়োজন ও বিলের যোগান অনুসারে তৎ সময়ের জন্য তাহার বাজার দর ধার্য্য হয়। দালালগণ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পক্ষে কার্য্য করেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতিযোগিতায় বিলের টান-যোগান দরের সমতা ঘটিয়া বাজার দরের দিন প্রতিষ্ঠা হয়। বড় বড় ক্ষেত্রে সপ্তাহে এক কি দুই দিন ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট

স্থানে সমবেত হইয়া তাঁহারা তৎ সময়ের জন্য বাজার দর ধার্য্য করেন।

এই বাজার দর,দায়িকগণের আর্থিক অবস্থা ও প্রচলিত সুদের হার ইত্যাদির উপরে ব্যক্তিবিশেষের জন্য বাট্টার হারের পরিমাণ নির্ভর করে। সাধারণ বাট্টার হারই তৎ সময়ের জন্য টাকার প্রচলিত সুদ। ফলতঃ, এই বাট্টা সুদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বিল ভাঙ্গাইবার নিমিত্ত যে তারিখে উহা লইয়া ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়, সেই তারিখ হইতে উহার নির্দ্ধারিত ও সম্ভাবিত আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত বাট্টার হারে সুদ কাটিয়া অবশিষ্ট টাকা উপস্থিত-কারীর আমানতী হিসাবে জমা দেওয়া হয়। এই বাট্টার উপরে rebate বা কমি দেওয়ার নিয়ম আছে। Discount বা বাট্টা অগ্রিম কাটা হয়; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বিল বিক্রয় হইয়া গেলে, যে কাল উহা ব্যাঙ্কের হাতে গচ্ছিত থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত সুদ কাটিয়া অবশিষ্ট অগ্রিম সুদ বাদ দেওয়া হয়। আর ব্যাঙ্কের মধ্যবর্ত্তিতায় মোদ্দত পরে টাকা আদায় হইলে সম্পূর্ণ বাট্টাই দেয় হয়। বিক্রীত বিলের টাকা বাজার দর অনুসারেই আমানতকারীর হিসাবে জমা হয়। যে হারে বাট্টা কাটা হয়, তাহাকে Bank rate (ব্যাঙ্ক রেইট) কহে। তৎ সময়ের জন্য ইহাই ব্যাঙ্কের সুদের হার বলিয়া গণ্য হয়। ব্যাঙ্ক রেইট বলিতে প্রচলিত সুদের হারই বুঝা যায়।

এইরূপে বিলের সাহায্যে দেনা-পাওনা পরিশোধ করার ফলে, অধিকাংশ দেনাই বাদ-কাটাকাটিতে পরি-শোধিত হইয়া যায়। ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই দেনা ও পাওনা দুই বর্ত্তমান থাকে। বহু লোকের প্রাপ্ত দেনা-পাওনার বিল একত্রিত হইয়া ব্যাঙ্কের হাতে যাইয়া উপস্থিত হইলে, তাহা প্রায় বাদ-কাটাকাটিতেই পরিশোধিত হইয়া যায়। সামান্য মাত্র নগদ টাকার পরিশোধ করার প্রয়োজন হয়।

মুদ্রা-বিনিময়

বা

(বিদেশী বিলের মূল্য সমতা)

বিদেশী বিল বিক্রয় সময়ে দেশী মুদ্রার ও বিদেশী মুদ্রার মধ্যে মূল্য সমতা নির্দ্ধারণ করিয়া তৎপর তাহাদের প্রকৃত বাজার দর নির্দ্ধারণ করিতে হয়। প্রত্যেক দেশের প্রাপ্য বিলে, সেই দেশের মুদ্রার পরিমাণ লিখা থাকে। এ দেশের পণ্যবিক্রেতা বিদেশী ক্রেতার উপরে যে বিল লিখিয়া লন, তাহাতে এই দেশের মুদ্রার দাবী পরিমাণ লিখা থাকে; কিন্তু ক্রেতা মূল্য আদায় করার সময়ে এ দেশের মুদ্রায় তাহা আদায় না করিয়া আপনার দেশের প্রচলিত মুদ্রা আদায় করেন। সুতরাং তাঁহার প্রকৃত দেনা স্বদেশীয় মুদ্রা দ্বারাই নির্দ্ধারিত ও নিরূপিত হয়। সুতরাং বিদেশী বিলের সহিত দেশীয় মুদ্রার সমতা ধার্য্য করার প্রয়োজন নিয়তই উপস্থিত হয়। সোণাই প্রায় অধিকাংশ সভ্য দেশের আদর্শ। তাহাদের আদর্শ মুদ্রা সোণা দ্বারা নির্ম্মিত। তথাপি বিশুদ্ধ সোণার সহিত কিছু খাদ মিশাইয়া মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। সুতরাং ঐ সকল দেশের ও প্রচলিত মুদ্রার পরস্পরের মধ্যে মূল্য সমতা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে এই খাদ বাদ দিয়া বিশুদ্ধ সোণার অনুপাতে তাহা ধার্য্য করিতে হয়। প্রত্যেক দেশের প্রচলিত রাষ্ট্র বিধি অনুসারে তত্তৎ দেশের প্রচলিত আদর্শ মুদ্রায় সোণা ও খাদের পরিমাণ নির্দ্ধারিত ও বিধিবদ্ধ আছে। তাহার ব্যতিক্রম করিয়া মুদ্রা নির্ম্মিত হয় না। এই নির্দ্দিষ্ট বিশুদ্ধ সোণার পরিমাণ ধরিয়া বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে সমতা ধার্য্য করা যায়। এই সমতাকে Mint par of Exchange বা নির্ম্মাণ সমতা, কি মিন্ট কি টাকশাল সমতা বলা হয়। এই সমতা ধরিয়াই দায়িক তাঁহার দেয় বিলের দেনা পরিশোধ করেন। যে সকল দেশে রূপা আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে, যথা চায়না, ম্যাকসিকো প্রভৃতি দেশ, তথায় যে রূপার মুদ্রা প্রচলিত আছে,তাহার মধ্যগত বিশুদ্ধ রূপা ধরিয়া তাহার আপেক্ষিক স্বর্ণ-বিনিময় মূল্যে মূল্য সমতা ধার্য্য করিতে হয়। যখন যে দরের রূপা ক্রয় বিক্রয় হয়, সেই দরের হারে মূল্য ধার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং এসকল বিলের নির্ম্মাণ মূল্য নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। আমাদের এদেশে পূর্ব্বে রূপাই আদর্শ ছিল। বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং মুদ্রাসহ তাহার কৃত্রিম অনুপাত ধার্য্য হওয়ায়, ষ্টার্লিং মুদ্রার মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদের

মুদ্রাসহ অন্য দেশের মুদ্রার মূল্য সমতা ধার্য্য করিতে হয়। যথা ইংলণ্ডের এক ষ্টার্লিং বা গিনিতে আমেরিকায় ৪.৮৬৭ সুবর্ণ ডলার হয়। সুতরাং ১০০০ গিনিতে আমেরিকায় ৪৮৬৭ সুবর্ণ ডলার এবং আমাদের বর্ত্তমান ১০,০০০ টাকা। (১ গিনি = ১০৲ টাকা। কিছুকাল পূর্ব্বে ১৫৲ টাকা ছিল।) দেনাদার এই সমতা ধরিয়াই বিলের দেনা আদায় করেন। যেমন ইংলণ্ডের কিম্বা আমেরিকার কোন বণিকের এদেশের পণ্য বিক্রেতার নিকট বিলের বাবদে দশ হাজার টাকা ধরিলে, ইংলণ্ডের দেনাদার তাঁহার দেশের প্রচলিত গিনিমুদ্রায় হাজার গিনি ও আমেরিকার দেনার ৪৮৬৭ সুবর্ণ ডলার দিলেই দায় মুক্ত হইবেন। দায়িকের পক্ষে দেনা আদায়ের ইহাই স্থির নিয়ম।

কিন্তু বিল বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ সমতা সর্ব্বত্র রক্ষিত হয় না। এই সমতাই তাহার স্বাভাবিক মূল্য। কোন সময়ে এই সমতানুসারে বিল বিক্রয় হইলে, তাহাকে at par বা 'দামেদাম' বিক্রয় হওয়া বলে। কিন্তু বাজারের টান যোগানর প্রভাবে এ সমতা ভঙ্গ হইয়া বাজার দরের প্রতিষ্ঠা হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যত বিল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয়, তাহাকে তাহার ষ্টক্ (stock) কহে। ইহাই তৎ সময়ের জন্য বিলের যোগান। আর যাহাদের বিদেশে টাকা প্রেরণের আবশ্যকতা আছে, তাহারা ক্রেতা। ক্রেতা ও বিক্রেতার প্রতিযোগীতা প্রভাবে ইহাদের বাজার দরের প্রতিষ্ঠা হয়।

বিলের মূল্য ধার্য্যের সীমা

পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বিলের ও টান যোগানের প্রভাবেই তাহার মূল্য ধার্য্য হয়। তথাপি ইহাদিগের মূল্যের একটা ঊর্দ্ধ ও নিম্ন সীমা আছে। এই দুই সীমার ভিতরেই প্রায়শঃ তাহাদের মূল্যের উত্থান পতন হয়, তাহার উপরে কিম্বা নিচে যাইয়া দীর্ঘ সময় স্থায়ী থাকিতে পারে না। বিদেশে সোণা প্রেরণ কিম্বা তথা হইতে আনয়ন করিতে যে ব্যয় পড়ে, তাহার উপরে এই দুই সীমা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এদেশের মহাজনদিগের হাতে যে সকল বিদেশী বিল থাকে তাহাদের প্রাপ্য দাবী বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। সোণা আনাইতে যত ব্যয় দিতে হয়, তদপেক্ষা বেশী ক্ষতি স্বীকার করিয়া কাহারও পক্ষে বিল বিক্রয় করা স্বাভাবিক নহে। সোণা আনয়ন ব্যয়ের নিচে মূল্য চলিয়া গেলে, যাহাদের সন্ত সন্ত বিল বিক্রয় করিয়া টাকা উঠানের প্রয়োজন তাঁহারা না হয় বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া বিদেশ হইতে সোণা আনাইতে পারেন তাঁহাদের পক্ষে এ ক্ষতি স্বীকার করা স্বাভাবিক নহে। সুতরাং কতক বিল বাজার হইতে সরিয়া পড়ে। এই ভাবে বিলের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়া বাজার দর ক্রমে ঐ সীমায় আসিতে থাকে। তদ্রূপ যাহাদের বিদেশে টাকা প্রেরণের প্রয়োজন আছে, তাঁহারাও সোণা প্রেরণ ব্যয়ের উপরে ক্ষতি দিয়া সহসা ক্রয় করিতে সম্মত হন না। কোন কারণে মূল্য উপরে চড়িয়া গেলে, কতক লোক বিদেশে সোণা চালান কিম্বা অন্য ভাবে বিলের টাকা পরিশোধ করার উপায় করেন। এই ভাবে কতক লোক সরিয়া পড়িলে টান হ্রাস হইয়া মূল্য নামিতে থাকে। এই সকল কারণে এই দুই সীমার ভিতরে থাকিয়াই তাহাদের বাজার দরের উত্থান পতন হয়। দীর্ঘ সময় উপরে কিম্বা নিচে যাইয়া থাকিতে পারে না।

বিলের স্বাভাবিক মূল্যের বা মিণ্ট সমতার উপরের ও নিচের হারকে এক্স্চেঞ্জ রেইট বা বিনিময় বাট্টা কহে। ইহা ব্যাঙ্ক রেইট হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। ব্যাঙ্ক রেইট টাকার সুদ। যে হারে বাট্টা কাটিয়া বিলের টাকা আমানতকারীর হিসাবে জমা করা হয়, তাহাকে ব্যাঙ্ক রেইট বলা হয়। উহা টাকার অগ্রিম সুদ। কিন্তু বিলের স্বাভাবিক মূল্য কেন্দ্রের উপরে কিম্বা নিচে যাইয়া যখন যে হারে তাহার বাজার দরের প্রতিষ্ঠা হয়, তৎসময়ের জন্য সেই হারকেই বিনিময় বাট্টা বলা হইয়া থাকে। উপরের হারকে Premium এবং নিচের হারকে discount rate বলা হয়। ব্যাঙ্কের পরিভাষায় এই Premium বা চড়া দরকে unfavourable বা প্রতিকূল এবং discount বা নামা দরকে Favourable বা অনুকূল সংজ্ঞক বলা হয়। এইরূপ অনুকূল ও প্রতিকূল বলিবার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা পরে আলোচিত হইতেছে।

বিনিময় বাট্টার প্রকৃত উর্দ্ধ ও নিম্ন সীমা কি ?

এ পর্য্যন্ত আমরা বিনিময় বাট্টার উর্দ্ধ ও নিম্ন সীমা মাত্র বলিয়া আলোচনা করিয়াছি ; কিন্তু তাহাদের প্রকৃত সীমা কি এবং কি করিয়াই বা তাহা অবধারিত ও নিরূপিত হয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কিছু বলা হয় নাই। তাহারও একটু বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বলিয়াছি, সোণা আনয়ন ও প্রেরণ ব্যয়ের উপরে এই দুই সীমা নির্ভর করে ; কিন্তু তাই বলিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে যে সকল দেশের সহিত কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের বহির্বাণিজ্যের সম্বন্ধ থাকে, তাহাদের সহিত উহার বিভিন্ন সীমার অভ্যুদয় হয়, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বহু দেশের সহিত সমকালীন এই সম্বন্ধ থাকার ফলে, তাহাদের পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া প্রভাবে তৎ সময়ের জন্য তাহার একটা উর্দ্ধ কিম্বা নিম্ন সীমার প্রতিষ্ঠা হয়। বর্ত্তমানে এ দেশের সহিত যে সকল দেশের বহির্বাণিজ্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্মধ্যে কোন কোন দেশের সহিত অনুকূল ও কোন কোন দেশের সহিত প্রতিকূল সম্বন্ধ নিয়তই থাকিয়া যায়। তাহাও নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। অদ্য যাহার সহিত অনুকূল সম্বন্ধ আছে, কল্য তাহার সহিত প্রতিকূল, এবং যাহার সহিত প্রতিকূল, তাহার সহিত অনুকূল সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে যদি কল্পনা করা যায় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এ দেশের সহিত যে ৮০।৮৫ দেশের বহির্বাণিজ্যের সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে ৫৫ দেশের সহিত প্রতিকূল ও অবশিষ্ট দেশের সহিত অনুকূল সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের কথাই বিশেষ ভাবে দেখা যাউক। এখন ইংলণ্ডের সহিত প্রতিকূল ও ফ্রান্সের সহিত অনুকূল সম্বন্ধ কল্পনা করা যাউক। ইহার অর্থ এই যে, এখন এ দেশে যে সকল লণ্ডন-বিল আছে তাহার সাহায্যে ইংলণ্ডের মহাজনদের প্রাপ্য দেনা সম্পূর্ণ আদায় করা যায় না বলিয়া বিল কিনিবার জন্য লোকের ফি বাড়িয়া যাওয়ায় তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। যদি ইহাই টাকা আদায়ের একমাত্র উপায় হয়, অন্য কোন উপায় না থাকে, তবে সোণা প্রেরণ করিয়া অন্ততঃ কতক দাবী আদায় করিতেই হইবে। তখন এদেশ হইতে ইংলণ্ডে সোণা প্রেরণ করিতে যে ব্যয় পড়ে, সেই ব্যয়ের সহিত সমতা ধার্য্য হইয়া কিম্বা তাহার উপরে যাইয়া বিনিময়-রেইট্ ধার্য্য হইতে পারে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। আমাদের কল্পিতাবস্থায়, ফরাসী দেশের সহিত এ দেশের অনুকূল সম্বন্ধ আছে। এদেশে প্যারী-বিলের সংখ্যা বেশী থাকায়, উহা তেমন বেশী দরে বিক্রয় হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়াই স্বাভাবিক। যদি তখন ইংলণ্ডের সহিত ফরাসী দেশের প্রতিকূল সম্বন্ধ অর্থাৎ প্যারী-বিল ইংলণ্ডে বেশী দামে বিক্রয় হয়, তবে এ দেশের দেনাদারগণ সাক্ষাৎ ভাবে লণ্ডন বিল দ্বারা দাবী আদায় না করিয়াও কতক দাবী প্যারী-বিলের সাহায্যে আদায় করিতে পারেন। ইংলণ্ডের মহাজনগণও এদেশ হইতে প্রেরিত প্যারী-বিল সমূহ সানন্দে গ্রহণ করিবেন। এইরূপে অনুকূল দেশ সমূহের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রতিকূল দেশের দেনা পরিশোধ করিলে, প্রতিকূল দেশের বিলের টান হ্রাস হইয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল দেশের বিলের টান বৃদ্ধি হইয়া যায়। এইরূপে চাহিদা হ্রাস বৃদ্ধির প্রভাবে এ দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার দর মধ্যে একটা সমতার প্রতিষ্ঠা হয়। এই সমতাই তৎ সময়ের জন্য বাজার দর। এই মধ্যবর্ত্তিতার ফলে বিলের টান-যোগান পরস্পর সমান সমান হইলে, বাজার দর মিণ্ট সমতার সহিত সমতা প্রাপ্ত হইয়া ধার্য্য হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই মধ্যবর্ত্তিতা সত্বেও বিলের টান অপেক্ষা যোগান বেশী হইলে, মিণ্ট সমতার নিচে যাইয়া মূল্য ধার্য্য হয়। এবং যোগান অপেক্ষা টান বেশী হইলে, তাহার উপরে যাইয়া মূল্য ধার্য্য হয়। এইরূপে বহু দেশের মধ্যবর্ত্তিতায় দেনা পাওনা পরিশোধ করার ফলে, বিলের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও তৎ সময়ে যে সকল দেশের সহিত এ দেশের প্রতিকূল সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে যে দেশ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী ও সোণা প্রেরণ করিতে কম ব্যয় পড়ে, সেই দেশে সোণা প্রেরণের ব্যয়ের পরিমাণ মূল্য বৃদ্ধি হইলেও এ দেশের পক্ষে বিদেশে সোণা প্রেরণ করিয়া মূল্য আদায় করায় প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। ইহাই বিনিময়-বাট্টার উর্দ্ধ সীমা। এই সীমার উপরে মূল্য

চলিয়া গেলে কতক সোণা বিদেশে চালান যাইবার কারণ উপস্থিত হয়। তদ্রূপ বিলের মূল্য হ্রাস হইতে থাকিলেও, তৎ সময়ে যে সকল দেশের সহিত এ দেশের অনুকূল সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সেই সকল দেশের মধ্যে যেটী নিকটতম ও যাহা হইতে সোণা আনয়ন করা কম ব্যয়-সাধ্য, তাহা হইতে সোণা আনয়ন করায় ব্যয়ের নিচে যাইয়া বিলের বাজার দরের প্রতিষ্ঠা হইলেই, কেবল বিদেশ হইতে সোণা আমদানী করিয়া দাবী উসল করার কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাই তৎ সময়ের জন্য বিনিময় বাট্টার নিম্ন সীমা। এইরূপে বহুদেশের যোগে ও মধ্যবর্ত্তিতায় কোন নির্দ্দিষ্ট দেশের বিলের বাজার দর ও তাহার উর্দ্ধ ও নিম্ন সীমা ধার্য্য হওয়াকে Arbitrage বা মধ্যবর্ত্তিতা সূত্রে ধার্য্য হওয়া বলে। আর এই দুই সীমাকে Gold point বা সোণার গতি সীমা বলা যায়। এই দুই সীমা পর্য্যন্ত দেশের সোণা নিশ্চল অর্থাৎ দেশ হইতে বাহিরে কিম্বা অন্য দেশ হইতে আমদানী হইয়া আসে না। এই সীমা অতিক্রান্ত হইলেই তাহার গতি হয়, মূল্য বেশী হইলে বহির্গমন গতি, এবং কম হইলে অন্তঃপ্রবেশ গতি লাভ করে।

ভূয়োদর্শন ও ব্যবসায়-অভিজ্ঞতা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে এই মধ্যবর্ত্তিতার ফলে কোন দেশেই এই এক্স্চেঞ্জ রেইট বা বিনিময় বাট্টার হার শতকরা ১/২৷ঃ হইতে ২৷ঃ উপরে কিম্বা নীচে যায় না। ইহাই বিভিন্ন দেশের সোণা আনয়ন ও প্রেরণ করার উর্দ্ধ ও নিম্ন সীমা। বিভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ও সোণা আমদানী-রপ্তানীর দায়িত্ব ভেদে এই ব্যয় বৈষম্য হয়। আমাদের দেশের সোণার রপ্তানী সীমা শতকরা ১৷০ এবং আমদানী সীমা ১৵৫ আনা। অন্ততঃ এই কল্পিত সীমা ধরিয়াই সেক্রেটরী-অব-ষ্টেট কাউন্সিল বিল বিক্রয় করেন। * প্রায় ২৫ বৎসর কাল ষ্টার্লিং মুদ্রাসহ এ দেশের টাকার যে কৃত্রিম সমতা ধার্য্য ছিল, তাহা রহিত করিয়া বর্ত্তমানে দশ টাকা এক ষ্টার্লিং বা গিনি বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উহা ১৫৲ টাকার সমান ছিল। ঐ ১৫৲ টাকার হিসাবেই ঐ উচ্চ নিচ হার লিখিত হইল।

এই বিনিময় বাট্টার সহিত ব্যাঙ্কের কার্য্যপ্রণালীর সম্বন্ধ কি তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা যাইবে।

নরকের দ্বার

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ গুপ্ত]

(১)

রুদ্রকুমার ছিল দর্শনশাস্ত্রে এম্-এ; হিন্দুদর্শনে বিশেষজ্ঞ। কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি য়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতদিগের অপেক্ষা শঙ্করাচার্য্যেরই সে ছিল অধিক গোঁড়া। ভগবান্ শঙ্করের কথা তার নিকট বেদবাক্য অপেক্ষাও ছিল অভ্রান্ত। বুঝিয়া হউক, অথবা না বুঝিয়াই হউক, তাঁর সবগুলি যুক্তি অবাধে মানিয়া লওয়াই ছিল রুদ্রকুমারের বিদ্যাবত্তার পরিচয়। মোটকথা কথায় কথায় বিবেক বুদ্ধি না খাটাইয়াই শঙ্করের দোহাই দিতে থাকিত। শঙ্করাচার্য্য নাকি বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক নরকের দ্বার,

---

* আমাদের টাকার ওজন এক তোলা বা এক ভরি। এক ভিরি=১৮০ গ্রেণ (grains)। ইহাতে ১৬৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রূপা আছে, অবশিষ্ট খাত। আমেরিকার রূপার ডলারের ওজন ৪১২.৫ গ্রেণ, তন্মধ্যে বিশুদ্ধ রূপা ৩৭১.২৫ গ্রেণ আছে। আর আমেরিকার স্বর্ণ ডলারের ওজন ২৫.৮ গ্রেণ, উহাতে ২৩.২২ গ্রেণ বিশুদ্ধ সোণা আছে। এইরূপে প্রত্যেক দেশের মুদ্রার ওজন ও বিশুদ্ধ ধাতব বস্তু নির্দ্দিষ্ট আছে। এই নির্দ্দিষ্ট বিশুদ্ধ ধাতু ধরিয়াই মিণ্ট-সমতা নির্দ্ধারণ করিতে হয়। আর বিনিময়-বাট্টা ধরিয়া তাহাদের তৎকালিক বিনিময় মূল্য ধার্য্য হইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটী প্রধান প্রধান দেশের সহিত ইংলণ্ডের ষ্টার্লিং মুদ্রার মিণ্ট-সমতা ও তাহাদের অনুপাতে সোণার গতি সীমা প্রদর্শন করা গেল। যথা :—

London on	Mint par	Gold exports	Gold imports
Paris Fes.	25.22½	25.1⅛	25.32½
Barlin Mkrs.	20.43	20.33	20.52
Amsterdam Fl.	12.10	12.04	12.15
Copenhagan Kr.	18.16	18.07	18.23
Newyork S	4.867	4.827	4.89

তাহার ছায়া মাড়াইলেও নাকি মস্ত পাপ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের প্রয়োজন হয়। তাই রুদ্রকুমার পারতপক্ষে স্ত্রীলোকের নাম করিত না, কোনও কথায় স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করিবার প্রয়োজন হইলে বলিত, অমুক নরকের দ্বার। এই নরকের দ্বারের হাত হইতে উদ্ধারও পাইয়াছিল সে যথেষ্ট! একমাত্র বৃদ্ধা মা ছাড়া তার সংসারে, ধারে কাছে কোনও স্ত্রীলোকই ছিল না, এবং ইহা বলাই বাহুল্য যে, তার মত শঙ্করের চেলা বিবাহ করিয়া নরকের দ্বার দিয়া নরকের পথে অগ্রসর হইবে এমন স্বপ্ন তার অতিবড় শত্রুও দেখিতে পারিত কি না সন্দেহ। আরও বিশেষত্ব এই, তার পিতৃ-মাতৃদত্ত নাম ছিল রমণীমোহন, অবশ্য চেহারা-খানি বেশ সুন্দরই ছিল, নামটা মোটেই বে-মানান হয় নাই। তবে নামটা যেন নরকের গন্ধে ভরপুর,—সেই নরকের দ্বার রমণী, তারই আবার মোহন। একথা মনে হইতেই রুদ্রকুমারের প্রাণটা শিহরিয়া উঠিত; এত বড় শঙ্করপন্থীর কি না এমন বিপরীত নাম। ভাবিয়া চিন্তিয়া ঐ নামটা বদলাইয়া নূতন নাম রাখিল রুদ্রকুমার। নিজের নাম আর কেহ নিজে রাখিয়াছে কি না তাহা জানা যায় নাই, তবে রমণীমোহন বদলাইয়া যে রুদ্রকুমারে পরিণত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে। ইউনিভার্সিটির calender এ নাম বদলাইবার জন্য রেজিষ্ট্রারের কাছে তার চিঠিপত্র খুবই লিখিতে হইয়াছিল; তবে শেষে তারই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। এখন সে রুদ্রকুমার নামেই পরিচিত, কলিকাতার একটি মাঝারি রকম কলেজের অধ্যাপক, মাহিনা একশত টাকা। এত নাম থাকিতে কেন যে রুদ্রকুমার নাম রাখা হইল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, 'ওহে জানই ত রুদ্রকুমার কার্ত্তিকের এক নাম, তা দেবতাদের মধ্যেও কার্ত্তিকের মত এমন শক্তিমান্ তেজস্বী পুরুষ কে ছিলেন। তিনিই ত দেবসেনাপতি, তাতে আবার আদর্শ ব্রহ্মচারী অবিবাহিত। ওসব নরকের দ্বার-ট্বারের ছায়া মাড়ান নি। অবশ্য বাঙ্গালা দেশের দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে কার্ত্তিকের ফুলবাবুটির মত চেহারা দেখলে, তোমরা ওসব বুঝবে না। বুঝলে না ওসব হল তোমাদের বাঙ্গালা দেশের বানানো কার্ত্তিকের রূপ। কুমারসম্ভব পড়ে দেখ, তখন বুঝবে আসলে কার্ত্তিক কেমন দেবতা। তোমাদের কি, যেমন নিজেরা, দেবতাকেও গড় তেমনি। আবার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছ কলাবউ, কারণ একটা 'নরকের দ্বার' সঙ্গে না থাকলে তোমাদের মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকে কি না।'

এহেন রুদ্রকুমার থাকতেন কলিকাতার একটি মেসে—একলা একটি ঘর নিয়ে। এমন অদ্ভুত চরিত্রের লোকের সঙ্গে যে মেসের অধিকাংশ লোকের বনিবনা হইত না এটা বলাই বাহুল্য। তবে রুদ্রকুমারের মনটা ছিল খুবই সরল এবং মেসের লোকদের অভাব কষ্টে তার সহানুভূতির বেশ পরিচয় পাওয়া যাইত। অর্থসাহায্য করিতেও সে কুণ্ঠিত হইত না। সুতরাং অনেকে তার অদ্ভুত চরিত্র লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিলেও তাহাকে আন্তরিক ভালবাসিত। বন্ধু মোহিনীমোহন ছিল সেই দলের, বেজায় রসিক পুরুষ, খুব খোসমেজাজী লোকটি, গানের ঝঙ্কার কণ্ঠে লাগিয়াই আছে, আর কথায় কথায় ঠাট্টা করিয়া রুদ্রকুমারকে অস্থির করিয়া তুলিত। কিন্তু সে রুদ্রকুমারকে ভাল-বাসিতও যথেষ্ট। রুদ্রকুমারও তাহাকেই বেশী পছন্দ করিত এবং সেইজন্যই তাহাকে বেশী ডাকিতে হইত বলিয়া মোহিনীমোহন নামটা বদলাইয়া সে তাহাকে করিয়া লইয়াছিল মুরারিচরণ; কারণ মোহিনী নামটায়ও যে বদ্-গন্ধ—সেই 'নরকের দ্বার' দেখা যাইতেছে। এই নাম বদলান প্রসঙ্গে একদিন রুদ্রকুমার মুরারিকে—এখন হইতে আমরা মোহিনীমোহনকে এই নামেই অভিহিত করিব—বলিয়াছিল—'দেখ মুরারি, বাঙ্গালা দেশে কি বিশ্রী নাম রাখবার ধরণ দেখ ত, এতে পুরুষগুলা মেয়েলি হবে না ত কি হবে। তারা যে ঐ 'নরকের দ্বার'গুলার মত সিঁথি কাটে, অঙ্গভঙ্গি করে, গান গায়, তার কারণ ঐ নাম রাখা। কেন বাপু, ভাল নাম কি মনে পড়ে না—এই ত ধর না বীরেন্দ্রবিনোদ, সংগ্রামচন্দ্র সমরলাল, আশুতোষ, অরবিন্দ, বারীন্দ্রকুমার, এসব নাম থাকতে কি যে ছাই নাম রাখা। বলিহারী যা হ'ক।'

মুরারি কিন্তু বিবাহিত, সেইজন্য রুদ্রকুমার তাহাকে 'নরকের দ্বারের' খোঁটা দিতে ছাড়িত না। একদিন

মুরারি দেশ হইতে স্ত্রীর একখানি বিশেষ প্রেমসম্ভাষণপূর্ণ পত্র পাইয়া খুব আনন্দের ঝোঁকে রুদ্রকুমারকে দুই একটা বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলায় রুদ্রকুমার তাহাকে গম্ভীর ভাবে অবিবাহিত জীবনের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে উপক্রম করিলে, সে নিজের হারমনিয়ামটি কোলের কাছে টানিয়া লইয়াই আরম্ভ করিল—

সে আসে ধেয়ে, এন্ ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে।

রুদ্রকুমার চেঁচাইয়া উঠিল—মুরারি কি ছাই যে আরম্ভ করলে, থাম হে থাম। কিন্তু মুরারিচরণের ভ্রূক্ষেপ নাই, সে ফূর্ত্তির জোরে গাহিয়া চলিল—

কুঞ্চিত ঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্ মট্ বুট শোভিত পদ শঙ্কিত ম্যাটিনে এ।

রুদ্রকুমার ধমকাইয়া উঠিল,—মুরারি আমার সামনেও ফাজলামি। কিন্তু শোনে কে, গান পুরাদমেই চলিল—

বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রয়িং-রুমটি ছেয়ে।

রুদ্রকুমার আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে রাগিয়া উঠিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মুরারি তাহার পলায়মান মূর্ত্তির দিকে চঞ্চল চাহনি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—'আচ্ছা, এর মজা দেখাব। এই 'নরকের দ্বারের' দ্বারস্থ করে তোমায় ছাড়ব। অলক্ষ্যে বিধাতা মুচকিয়া হাসিয়া বলিল 'হুঁ।'

(২)

মাসিক একশত টাকায় রুদ্রকুমারের তেমন সংকুলান হইত না। অবশ্য তাহার সাধারণ চালচলন, অতি অল্প ব্যয়েই কুলাইয়া যাইত। কিন্তু দেশে তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বে ভালই ছিল এবং এক্ষণে অবস্থা বিপর্য্যয়ের সঙ্গে ও সেইরূপ পূর্ব্বের চাল বজায় রাখিতে যাওয়ায় তাঁহার একটু বেশী ব্যয় হইয়া পড়িত। দেশে ছিল তাহার বৃদ্ধা মাতা ও এক কনিষ্ঠ সহোদর। সুতরাং রুদ্রকুমার তাহার বন্ধু-বান্ধবদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিল সন্ধানে প্রাইভেট টিউসিনি আসিলে তাহাকে খবর দিতে। একদিন মুরারিমোহন আসিয়া বলিল—'ওহে রুদ্রকুমার, একটা টিউসিনির সন্ধান পেয়েছি, করবে ত বল। শরৎবাড়ুয্যে পাটের আফিসের বড়বাবু, দুটি মাত্র ছেলে নিয়ে থাকেন। পত্নী সম্প্রতি মারা গেছেন, কোন রকম 'নরকের দ্বার'টারের গন্ধ টন্ধ নেই। ছেলে দুটির মধ্যে একটি ফোর্থ ক্লাসে আর একটি ফিপ্থ্ ক্লাসে পড়ে। একবেলা পড়াতে হবে, মাইনে দেবে ৩০্ টাকা, রাজি থাক ত বল।' রুদ্রকুমার দেখিল মন্দ নয়, তার এই ৩০্ টাকার সম্প্রতি বিশেষ প্রয়োজন। আর অসুবিধাও কিছু নাই, বিকালে স্কুলের পর না হয় ঘণ্টা দুয়েক পড়াইয়া আসিবে। যাক্, তার উপর আবার 'নরকের দ্বার'টারের বালাই নাই। রুদ্রকুমার রাজি হইল, পরদিন মুরারির সহিত শরৎবাবুর বাড়ী গিয়া পড়াইবার ভার লইল। রুদ্রকুমারের পড়ান ব্যাপার মন্দ কাটিতেছিল না; ছেলে দুটি মেধাবী ও মনোযোগী এবং মাষ্টার মহাশয়ের বেশ বাধ্যও হইল।

সেবার পূজার ছুটিতে মেসের সকলে বাড়ী চলিয়া গেল। রুদ্রকুমার কেবল তখনও বিশেষ কাজের ঠেকায় মেসের মায়া কাটাইতে পারিতেছিল না। একটা সরকারী কলেজের অধ্যাপকের পদ খালি হইয়াছে। রুদ্রকুমার সেখানে দরখাস্ত দিয়া সুপারিসের জন্য বড় বড় লোকের বাটী হাঁটাহাঁটি করিতেছে। ইচ্ছা যে, ছুটী ফুরাইলেই সেই সব সুপারিস পত্র লইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তার সহিত দেখা করিবে। হঠাৎ একদিন রুদ্রকুমারের নামে তারের খবর আসিল, তার মা অতিশয় পীড়িতা, অনতি-বিলম্বে ডাক্তার লইয়া যাইতে হইবে। রুদ্রকুমারের দেশ হুগলি জেলায়। তখন তাহার মোটেই টাকার সংস্থান নাই। শরৎবাবুর নিকট হইতে কিছু টাকা আপাততঃ লইয়া সে সন্ধ্যার ট্রেণে একেবারে ডাক্তারের সঙ্গে হুগলি যাইবে ঠিক করিল। সে জুতা জামা পরিয়া ছাত্রগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, তাহার ছাত্র দুইটী পিতার সহিত কোথায় বেড়াইতে গিয়াছে. বাড়ীতে এক নূতন ঝি আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, কর্ত্তা ছেলেদের লইয়া বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছেন। এই ঝিকে রুদ্রকুমার পূর্ব্বে

দেখে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কর্ত্তার এক শ্যালি-কন্যা আজ এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে, কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া পূজার পর পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইবে, নূতন ঝি তাহার সঙ্গেই আসিয়াছে। শুনিয়া রুদ্রকুমার হতাশভরে এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার যে টাকার বড়ই প্রয়োজন, তার মা যে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে যাইতে বসিয়াছেন। রুদ্রকুমারের অকস্মাৎ এই ভাবান্তর দেখিয়া ঝি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'বাপু, তোমার কি অসুখ করেছে, মুখ অমন শুখনো দেখাচ্ছে কেন?' ঝিএর এই করুণ জিজ্ঞাসাও রুদ্রকুমারের মনে একটু সান্ত্বনা আনিয়া দিল, তাহার মুখ দিয়া অলক্ষিতে বাহির হইল—'কি করি মায়ের চিকিৎসার জন্য টাকার যে এখনি বড় প্রয়োজন, এই সাতটার গাড়ীতেই যে আমাকে ডাক্তার লইয়া হুগলি যাইতে হইবে।' তাহার এই কথাকয়টী শুনিয়া ঝি অন্দরে গিয়া দিদিমণিকে সব কথা বলিল। শুনিয়া দিদিমণি কয়েকটী কথা চুপি চুপি বলিয়া ঝিকে রুদ্রকুমারের কাছে পাঠাইয়া দিল। ঝি আসিয়া বলিল, 'দেখ বাপু, আমাদের দিদিমণি বললে, তোমার মায়ের যখন এমন ব্যারাম, আর তোমার হাতে যখন ডাক্তারকে দেবার মত টাকা নেই, তখন আমাদের দিদিমণি বললে তার কাছে হাত খরচের জন্য ২৫৲ টাকা আছে, তোমায় দিচ্ছে, তুমি নিয়ে যাও বাপু, এই নাও টাকা। কতক্ষণ অপেক্ষা করবে, তোমার এখনই যাওয়া উচিত। ওটা নিতে লজ্জা করচ কেন? বাবু বাড়ী এলেই ত দিদিমণি টাকা নিতে পারবে।' রুদ্রকুমার একটু ইতস্ততঃ করিয়া দুই একটী অলক্ষ্যে ধন্যবাদ দিয়া একান্ত প্রয়োজনহেতু টাকা লইয়া বাহিরে আসিল।

রুদ্রকুমারের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। সে আজ একজন 'নরকের দ্বারে'র নিকটও মায়ের জীবনের জন্য বোধ হয় ঋণী হইল। তাহার মনের এক কোণে একবার ধ্বনিত হইল—না, স্ত্রীলোকেরা বড় করুণাময়ী। তখনি তাহার মধ্যে যেটুকু শঙ্করের চেলা সে বলিয়া উঠিল -কি আর এমন, মেসোর থেকে ত এখনি টাকাটা ফিরে পাবে। আবার তাহার ভিতর কে উচু হইয়া বলিল—তা হ'ক গে, তবুও কোন্ অপরিচিতার তার জন্য মাথাব্যথা পড়েছিল যে, ঝিকে দিয়ে সেধে টাকা পাঠিয়ে দেবে। এইরূপে সমস্ত রাস্তাটা মনে মনে এ বিষয় চিন্তা করতে করতে সে ডাক্তারকে নিয়ে শিয়ালদা ষ্টেশন থেকে ট্রেণে রওনা দিল। নৈহাটী আসিয়া নৌকা ঠিক করিয়া ডাক্তারের সঙ্গে চড়িয়া বসিল। ঢেউয়ের মাঝে হেলিতে দুলিতে জ্যোৎস্নার সঙ্গে খেলা করিতে করিতে নৌকাখানি বহিয়া চলিল। সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হিল্লোলের উঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে রুদ্রকুমারের মনে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এক করুণতা-মাখা হাস্যোজ্জ্বলা অপরিচিতার মুখ। অমনি তাহার মধ্যে শঙ্করের চেলাটি চোখ রাঙ্গাইয়া মনকে বলিতে থাকে—ছিঃ। ক্রমে সে বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল, ডাক্তারকে দিয়া মায়ের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া লইল। তারপর প্রাণান্ত সেবা-শুশ্রূষা করিয়া একপ্রকার যমের হাত হইতে মাকে ফিরাইয়া আনিল। এ কয়দিন আর সে চিন্তা করিবার বা অপরিচিতা উপকারিণী সম্বন্ধে ভাবিবার অবকাশ পায় নাই। মায়ের আরোগ্যলাভের সঙ্গে সে সেই পূর্ব্বের চিন্তা লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

(৩)

পূজার ছুটি ক্রমে ফুরাইয়া আসিল। মেসের লোকেরা ফিরিয়া আসিতে লাগিল, রুদ্রকুমারও ফিরিল। কিন্তু একটু যেন তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মাঝে মাঝে তাহাকে চিন্তাযুক্ত দেখা যায়। কথা বলিবার সময়ও যেন কখনও কখনও ঈষৎ অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে। সেই অপরিচিতা উপকারিণীর কথা মাঝে মাঝে তাহার মন অধিকার করিয়া বসে। যাহা হউক, রুদ্রকুমার মনটাকে অনেকটা স্থির করিয়া আবার পড়াইতে গেল। প্রথম দিন শরৎবাবুর সঙ্গে দেখা হইতেই তিনি রুদ্রকুমারের মাতার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—'সেদিন বায়স্কোপ থেকে এসে মাধুরীর কাছে আপনার মায়ের পীড়ার অবস্থা শুনে বড়ই দুঃখিত হ'য়েছিলাম। আপনার টাকার অভাব আমায় আগে জানান নি কেন? ভাগ্যে সেদিন বুদ্ধি করে মাধুরী আপনাকে টাকা কটা দিয়েছিল। মাধুরী আমাদের বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে; যেমন রূপ, তেমন গুণ।' রুদ্রকুমার

বুঝিল, শরৎবাবুর শ্যালিকা-কন্যার নাম মাধুরী। এতদিন কিন্তু সে এরূপ নাম কত শুনিয়াছে, 'নরকের দ্বার' হিসাবে উহা অগ্রাহ্যই ছিল। এখন এ নামটা কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা কল্পনার ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গেল। এর চেয়ে অধিক শঙ্করের চেলার তখনও কিছু করিতে পারে নাই।

মাধুরী কিন্তু এখনও বাপের বাড়ী ফিরিয়া যায় নাই। কয়দিন পরে নাকি তার বাবা মা সকলেই শরৎবাবুর বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গেই মাধুরী ফিরিয়া যাইবে। রুদ্রকুমার এত সংবাদ জানিত না। তাহার চাঞ্চল্য এতদিনে অনেকটা দূর হইয়া আসিয়াছে। শঙ্করের ভক্ত কি না, 'নরকের দ্বারে'র প্রভাব কতদিন থাকিবে? একদিন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে তাহার পড়াইতে যাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। বাড়ীতে কাহারা যেন অতিথি আসিয়াছে বোধ হইল। শরৎবাবুর গৃহে প্রবেশ করিতেই সে শুনিতে পাইল, উপরে দ্বিতলে মহিলাকণ্ঠে গীত হইতেছে—

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস!
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো,
পাগল ওগো ধরায় আস!

তখন সুরের ঢেউ খেলাইয়া গান চলিতেছে—

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!

সুরের পর সুর খেলাইয়া গান থামিয়া গেল। কিন্তু তাহার ঝঙ্কার যেন তখনও সারা বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অন্য কয়েকটা খেয়ালের সঙ্গে রুদ্রকুমার সঙ্গীতের উপর ছিল বিশেষ বিরক্ত। কিন্তু আজ তাহার হৃদয়ের তারে এ কি অননুভূত মৃদু আঘাত! সেই অপ্সরা কণ্ঠের মত বীণার ঝঙ্কারে রুদ্রকুমার কতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া রহিল। কখন যে তাহার ছাত্রেরা মুরারি বাবুর সঙ্গে সেইখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, তাহা তাহার লক্ষ্যই হয় নাই। সে ভাবিতেছিল, আহা, এ কি সেই মাধুরীর কণ্ঠস্বর, সে কি তবে এখনও যায় নাই? আহা, কি প্রাণ-মাতান গীতধ্বনি! এই চিন্তা তার মনে আসিতেই একটা ছোট রকম দীর্ঘ নিশ্বাস আপনা হইতেই বাহির হইল। অবশ্য ইহার অধিক তাহার সম্বন্ধে বলিলে তাহার শঙ্কর ভক্তির উপর দোষারোপ করা হয়। তখন স্থির হইয়া ফিরিতেই ছাত্র দুইটিকে এবং মুরারিকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইল। মুরারি মৃদু হাসিয়া তাহার দিকে একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হে রুদ্রকুমার, শরীরটা খারাপ বুঝি? তা থাক্ না আজকে পড়ান; শরীরের অসুখ বিসুখ হলে করা কি।' রুদ্রকুমার একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, 'না হে, তেমন কিছু না' বলিয়াই সে পড়াইতে আরম্ভ করিল, মুরারিও প্রস্থান করিল।

রুদ্রকুমারের অবস্থার কিন্তু আবার আর একটু পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সেই গান শুনার পর থেকে সে 'নরকের দ্বার' সম্বন্ধে কোনও স্থলে কিছু আলোচনা হইলে যোগ না দিলেও আর উঠিয়া যায় না। আজকাল তাহাকে অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা করিতেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। সে দিন কি এক ফুটবল খেলায় জেতা উপলক্ষে রুদ্রকুমারের কলেজ ছুটি ছিল। সারাদিনটা মেসে বসিয়া থাকায় সেই সব নানা চিন্তা তাহার মনের ভিতর দিয়া উঁকি মারিতেছিল। রুদ্রকুমার ভাবিল, যাই রাস্তায় একটু বেড়াইয়া একেবারে পড়াইতে চলিয়া যাই। অল্পক্ষণ বেড়াইবার পর কখন যে তাহার পদযুগল তাহার ছাত্রের গৃহের দিকে চলিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে সেখানে উপস্থিত করাইয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। পড়াইবার ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘড়ী খুলিয়া দেখে তখনও তাহার ছাত্রদের আসিতে প্রায় পনের মিনিট বিলম্ব আছে। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় মাধুরী কি একখানা বই লইতে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াই রুদ্রকুমারকে দেখিয়া লজ্জায় অঞ্চল টানিয়া বাহির হইয়া গেল। রুদ্রকুমার দেখিল এক অতি সুন্দরী তরুণী সেই ঘরে আসিয়াই চলিয়া গেল। সে ভাবিল, এই অপূর্ব্ব রূপসীই কি মাধুরী! কি সুন্দর দেহের গঠন, সুগোল, সুঠাম ও স্বাস্থ্যব্যঞ্জক। কি টানা টানা চোখ, কি যুগ্ম ভ্রূ, কি সুন্দর সুচিক্কণ কেশে পিঠ ঢাকিয়া গিয়াছে। আন্দাজে বয়স ষোল সতের বোধ হইল।

শরৎবাবুরা একটু আধুনিক দলের বলিয়াই এতদিন বুঝি মাধুরীর বিবাহ দেন নাই। যাহা হউক, আমাদিগের রুদ্রকুমারের মনে কিন্তু একটা তুমুল ঝড় উঠিল। ছিঃ রুদ্রকুমার, এ যে 'নরকের দ্বার'। দৈবাৎ সে সময়ে রুদ্রকুমারের ছাত্র দুইটির সহিত মুরারিও সেই ঘরে প্রবেশ করিল। মুরারি কিন্তু এই ঘটনাটা দেখিয়া ফেলিয়াছিল। সে রুদ্রকুমারকে কিছু না বলিয়াই তাহার কাছে গিয়া বসিল। ছাত্র দুইটি পড়িতে আরম্ভ করিল। রুদ্রকুমারের মন তখন এই লোক ছাড়িয়া কল্পনালোকে বিচরণ করিতেছে। সুতরাং ছাত্রেরা ভুল পড়িলেও তাহার কানে পৌঁছিতেছিল না। খানিকক্ষণ দেখিয়া শুনিয়া মুরারি বলিল, 'রুদ্রকুমার, তোমার কি হয়েছে ?' রুদ্রকুমার একটু চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তখনি উত্তর দিল, 'না কিছু নয়, এতটা দূর রোদে এসেছি কি না তাই এরকম বোধ হচ্চে।' মুরারি বলিল—'তা ত হবারই কথা, কম দূর ত নয়, কোথায় বহুবাজারে আমাদের মেস, আর কোথায় এই দর্জ্জিপাড়া। তুমি বলে এতদূর পড়াতে আস্‌তে স্বীকার করেছ।' এই বলিয়াই একটু মুচকি হাসিয়া রুদ্রকুমারকে বলিল, 'দেখ আজ ওদের ছুটি দিয়ে চল বেড়িয়ে আসি।' অগত্যা মুরারির কথায় ছল পাইয়া রুদ্রকুমার আপনার মান বাঁচাইবার জন্য সেদিন ছাত্রদের ছুটি দিয়া মেসে ফিরিল।

রুদ্রকুমারের আরও অধিক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে যে শুধু 'নরকের দ্বার' সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে বসিয়া থাকে, তা নয়, আবার মাঝে মাঝে নাকি যোগও দিয়া থাকে। কিন্তু কথা বার্ত্তায় সে এতদূর অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল যে, প্রায়ই অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া ফেলিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত। যাহা হউক, মনের উপর চোখ রাঙ্গাইয়া সে পড়ান কাজটা চালাইতে লাগিল। আর একদিন যখন সে পড়াইতে বাহির হইয়াছে, একমনে চিন্তামগ্ন হইয়া পথে চলিতেছে, সহসা শুনিল কে ডাকিতেছে, 'মাষ্টার মশায়, আজ আমরা পড়্‌ব না; আমি,দাদা ও দিদি মামার বাড়ী যাচ্ছি।' রুদ্রকুমার দেখিল একখানি খোলা গাড়ীতে বসিয়া তাহার ছোট ছাত্রটি ঐরূপ ভাবে সম্ভাষণ করিতেছে। তার পাশে বসিয়া সেই মেয়েটি। আর এক দিকে তাহার বড় ছাত্রটী ও মুরারিচরণ। রুদ্রকুমার বুঝিল তাহার ধ্যানের বস্তুটী সেই মাধুরী, তাহার মাতার আরোগ্যলাভের কারণ, আসন্ন বিপদে তাহার উপকারিণী। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই চারি চক্ষের মিলন হইল। মাধুরী লজ্জায় অমনি চক্ষু নামাইয়া লইল। মুরারি মুচকি হাসিয়া রুদ্রকুমারের দিকে একটা অর্থব্যঞ্জক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

(৫)

রুদ্রকুমারের মাথাটা একেবারেই ঘুরিয়া গিয়াছে। সে মেসে ফিরিয়া আসিয়াই দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া শুইয়া মাধুরীর কথাই ভাবিতেছে, তখন কিন্তু শঙ্করের এতবড় ভক্ত শিষ্যের খেয়াল নাই, সে আজ সেই 'নরকের দ্বারে'র কথাই ভাবিতেছে। পরদিন সে মাথাধরার অছিলায় কলেজ কামাই করিল, ঘরে বসিয়া বসিয়া কড়িকাটের দিকে লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ভাবিতেছে না কড়িকাট গুণিতেছে, না সেখানে একখানি সুন্দর মুখের ছবি দেখিতেছে, কে জানে। হঠাৎ কতকগুলি জিনিষপত্র লইয়া মুরারি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। রুদ্রকুমার নিজের চিন্তায় এমন বিভোর যে মুরারির প্রবেশ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করে নাই, দেখিয়া মুরারি গুন্ গুন্ সুরে গান ধরিল—

শুধু তার গান শুনেছি, আর নিমেষে দেখেছি
অমনি মাথাটী খেয়ে ফেলেছি।

রুদ্রকুমার চমকাইয়া উঠিয়া বলিল –'কি হে মুরারি, কতক্ষণ' ? সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া মুরারি বলিল—'কি হে, কি জটিল দার্শনিক তত্ত্বের সমাধান হচ্ছিল ? দেখ, অত দূর পড়াতে যেতে তোমার বড় কষ্ট হয়, তাই আমি নিকটেই একটা টিউসিনি সংগ্রহ করেছি। তুমি সেটা নাও। আমি শরৎবাবুকে বল্‌ব এখন, তিনি সব শুন্‌লে তোমাকে রেহাই দিতে রাজী হবেন বোধ হয়।' এই কথা শুনিয়াই রুদ্রকুমার লাফাইয়া উঠিয়া মুরারির দুই হস্ত ধরিয়া বলিল—'তোমার পায়ে পড়ি মুরারি, তুমি ভদ্রলোকের কাছে ওকথা উত্থাপন ক'র না,আমার পড়াতে যেতে কিছুই কষ্ট হয় না। ছিঃ এতদিন পড়িয়ে নাকি এমন করে ছাড়া

যায়।' কিন্তু মুরারি জানিত কেবল ইহাই একমাত্র কারণ নহে, ইহা অপেক্ষা প্রবলতর কারণ আছে।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া রুদ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—'মুরারি, তুমি আজ আফিস গেলেনা যে, হাতে ওটা কি হে?' মুরারি বলিল—'না, আজ বড় একটা দরকারী কাজ হাতে এসে পড়্‌ল তাই আফিস যেতে পার্‌লাম না। এই ছবি ক'খানা জনষ্টন হফ্‌ম্যানের ওখান থেকে তুলিয়ে আন্‌লাম, আর একখানা পাঠিয়ে দিয়ে এলুম।' এই কথায় রুদ্রকুমারের মনটা ছনাৎ করিয়া উঠিল, সে বলিয়া উঠিল—'কার ছবি? কোথায় পাঠালে? দেখি কেমন।' এক সঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন করিয়া সে যেন দম লইতে লাগিল। মুরারি উত্তর করিল—'এ আর তুমি দেখ্‌বে কি, এ এক 'নরকের দ্বার'। হাতে লাগ্‌লে ত তোমায় গঙ্গায় স্নান কর্‌তে হবে। এ মাধুরীর ছবি।' মাধুরীর নাম শুনিয়াই রুদ্রকুমার চঞ্চল হইয়া উঠিল—'আরে দেখিনা কেমন তুলেছে, আমি কি তোমার ওসব দেখ্‌তে যাচ্ছি, দেখ্‌ব শুধু ঠিক তুল্‌তে পেরেছে কিনা।' মুরারি মুচকি হাসিয়া তাহার হাতে একখানি মাধুরীর ছবি দিয়া বলিল—'এই এদের মামা হল আমার শ্বশুর, মাধুরীর বাবা আমার পিস্‌ শ্বশুর আমার উপর ওর সম্বন্ধের ভার দিয়েছেন। সেদিন ওরা আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছিল, পথে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল। মনে পড়ে?' রুদ্রকুমার বলিল—'হবে।' মুরারি বলিতে লাগিল—'দেখ তোমরা হ'লে মাধুরীদের পাল্টা ঘর, তুমি যদি এই 'নরকের দ্বার' বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌তে, তা হলে আমার ভাব্‌তে হ'ত না, মাধুরীর বাপও একটা মস্ত ভাবনার হাত থেকে রক্ষা পেত। তোমার মত যোগ্য ব্যক্তির হাতে, তার উপর আমার বন্ধুর হাতে মাধুরীকে দিতে পার্‌লে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তাম।' রুদ্রকুমারের হৃদয়ের শোণিত অতি দ্রুত বহিতে লাগিল, তাহার নাড়ীর চাঞ্চল্য অনুভব করিলে মনে হইতে পারিত তাহার বুঝি জ্বর হইয়াছে। মুরারি বলিতে লাগিল—'কিন্তু আমাদের কপাল, তা'ত হবার নয়, তুমি একেবারেই 'নরকের দ্বারে'র দ্বারস্থ হ'বে না, ভীষ্মের পণ। যাক্‌, ঈশ্বরের কৃপায় একটি পাত্রের সন্ধান করেছি, তার কাছেই ফটো পাঠালাম। সব ঠিক ঠাক, এখন ফটো দেখে মেয়ে পছন্দ হ'লেই এই সপ্তাহেই বিয়ে হ'য়ে যাবে। পাত্রের বাপ ইন্দোরে ইঞ্জিনিয়ারি করেন, পাত্র এম্‌-এ আর 'ল' পড়ে। মোটের উপর মন্দ নয়, তবে কিনা আমরা আশা করেছিলাম আরও বেশী। যাক্‌ সেখানেই বোধ হয় ঠিক হবে। শরৎ বাবুরা ত সব বন্দোবস্ত কর্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছেন।—ওহে তোমার কি হ'ল, তুমি অমন কচ্চ কেন? তোমার শরীর বুঝি বড় অসুস্থ? দেখ মাধুরীর এ সপ্তাহে যখন বিয়ে হ'বে, একরকম ঠিক, আর তোমার শরীরটাও যখন ভাল নয়, তখন না হয় তুমি এ সপ্তাহে পড়াতে নাই বা গেলে।' ইতিমধ্যে কিন্তু রুদ্রকুমারের মুখ এমন শুষ্ক, এবং চেহারা এমন রক্তশূন্য ফেকাসে হইয়া উঠিল যে, মুরারি তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিল, 'দেখ রুদ্রকুমার, তোমার মনটাও শরীরের সঙ্গে বড় খারাপ হয়েছে, একটু প্রফুল্ল রাখা ত উচিত। একটা ভাল গান গাই শুন। এই বলিয়া একটু ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে পাশের ঘর হইতে একটা হারমোনিয়াম টানিয়া আনিয়া আরম্ভ করিল—

আজি এসেছি—আজি এসেছি, এসেছি বঁধু হে,
নিয়ে এই হাসি রূপ গান।
আজি, আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে
তোমায় করিতে সব দান।

মুরারি গাহিয়াই চলিল, কেবল শেষ চরণে আসিয়া বার বার করিয়া গাহিতে লাগিল—

আজি সব ভাষা, সব বাক্‌, নীরব হইয়া থাক্‌
প্রাণে শুধু মিশে থাক্‌ প্রাণ।

আজ কিন্তু রুদ্রকুমার একটু আপত্তিও করিল না, তন্ময় ভাবে গান শুনিয়া গেল, কেবল শেষ হইলে তাহার হৃদয় মথিত করিয়া সজোরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। মুরারি ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল।

(৫)

পরদিন রুদ্রকুমার তাহার মাতার নিকট হইতে জরুরি টেলিগ্রাম পাইল, তাহাকে একখানি মাঝারি রকমের বাড়ী ভাড়া করিতে লিখিয়াছেন, দুই দিন পরেই তাহার মা

তার ছোট ভাইকে লইয়া বিশেষ প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিবেন : রুদ্রকুমার কারণ কি ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একখানি বাড়ী ভাড়া করিয়া সব বন্দোবস্ত করিয়া রাখিল। দুই দিন পরে তাহার মাতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে তাহার ভাই, তাহাদের এক দূর সম্পর্কের খুড়া, তাহাদের দেশের নাপিত, পুরোহিত মশায় এবং দুই চার জন আরও আত্মীয় স্বজন। রুদ্রকুমার বুঝিতে পারিল না ব্যাপারটা কি। মনটা ভাল না থাকায় কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসাও করিল না অথবা বুঝিতে চেষ্টাও করিল না। পরদিন রুদ্রকুমারের মা তাহাকে দিয়া দুই একটা কি ছাইভস্ম করাইলেন (রুদ্রকুমারের নিকট অবশ্য ছাইভস্মই মনে হইল) তাহা রুদ্রকুমার ভাল করিয়া লক্ষ্যই করিল না। তার পরের দিন সন্ধ্যার সময় এক মস্ত জুড়ীগাড়ী তাহাদের বাটীর দ্বারে আসিয়া হাজির। তখন খুড়ামহাশয় ও পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া বলিলেন, 'বাবা রুদ্রকুমার, লগ্ন পার হয়, উঠিয়া এস।' রুদ্রকুমার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে যন্ত্রচালিতের মত গাড়ীতে গিয়া বসিল, সঙ্গে উঠিল তাহার ভাই, দুই একজন আত্মীয় ও পুরোহিত মহাশয়। রুদ্রকুমার এতদূর অবাক্ হইয়াছিল যে জুড়ীগাড়ী যে তাহার ছাত্রদের বাড়ীতে থামিয়াছে তাহাও সে লক্ষ্য করিল না। ক্রমে তাহাকে আদর করিয়া লইয়া গিয়া এক জনাকীর্ণ ঘরের মধ্যে বরের আসনে বসান হইল। তখন তাহার যেন জ্ঞান ফিরিয়া আসিতে লাগিল, মনে হইল যেন এ ঘর তাহার পূর্ব্বের পরিচিত। তাহাদের পুরোহিত আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল, সে হতভম্বের মত তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তাহার হাতে দেওয়া চেলীর কাপড় পরিল। তখন তাহাকে এক আলোকপূর্ণ স্থানে লইয়া গিয়া বরাসনে বসান হইল এবং অল্প পরেই এক অবগুণ্ঠনবতী কিশোরীকে তাহার সম্মুখে স্থাপিত করা হইল। তারপর কি সব মন্ত্র পড়ান হইল। রুদ্রকুমার সকল কার্য্যই মোহাবিষ্টের মত করিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে শুভদৃষ্টির সময় যখন চারি চক্ষুর মিলন হইল, তখন রুদ্রকুমার চমকাইয়া উঠিল,—এ যে মাধুরী! সে ভাবিতে লাগিল ইহা কি সত্য না সে স্বপ্ন দেখিতেছে? এ যে তাহার কল্পনারও অতীত। সে যে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই মাধুরী তাহার হইবে। যখন রুদ্রকুমার এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, তখন কোথা হইতে মুরারি লাফাইয়া আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল,—'আহা, কর কি, এ যে 'নরকের দ্বার' রুদ্রকুমারের যে এখনই গঙ্গাস্নান করিতে হইবে। বোধ হয় এখনও ছোঁওয়া যায় নি, এখনও রুদ্রকুমার ভায়া সাবধান!' রুদ্রকুমার তাহার দিকে এক তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, তাহার অর্থ বোধ হয় বেশ শোধ নিয়েছ মুরারি। তখন বর-কন্যার আঁচলে আঁচলে গ্রন্থি দেওয়া হইতেছিল। দূর হইতে মাধুরীর দিদিমা, যিনি সব ব্যাপার মুরারির নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন, রুদ্রকুমারের কানটা মলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'যা শালা এখন 'নরকের দ্বার' আগলিয়ে থাক্ গে যা।' রুদ্রকুমার কিন্তু তখন এ তিরস্কারও গ্রাহ্য করিল না; সে তখন শুনিতেছিল দ্বিতলের একটি ঘরে তাহার শ্যালীরা গান করিতেছে,—

চিরজীবন সুখিনী বঙ্গরমণী, রমণীকুল প্রবরা রে,
সুস্মিতা, সুধাধরা মধুর কোকিল মৃদুস্বরা রে;
দিব্যগঠনা লজ্জাভরণা, বিনতভুবন বিজয়ি নয়না,
ধীরা, মলয় ধীর গমনা, স্নেহপ্রীতি ভরা রে।

পঞ্চামৃত

ডেয়ারি ফার্ম্মিং এবং পক্ষীচাষ

[শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার]

আমাদের দেশে নানা জাতীয় ও বর্ণের পাখী বা মুর্গী দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতী শোণিতের দ্বারা তাহাদের বিশেষ উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। চাটগেঁয়ে আসল, হাদ্রাবাদী, কটকী, পাটনাই, খাঁটুরে দেশী, বন্য প্রভৃতি মুর্গীর হাউদান, ফিলর্কা, অর্পিঙ্গটন লাঙ্গ্‌সচী, ক্রৌডকুর, রোড, ইণ্ডিয়ান রেড জাতীয় মোরগের সংযোগে আমাদের দেশী মুর্গী বংশের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে। মুর্গীদের ৫০।৬০টি করিয়া পৃথক পৃথক দূর দূর স্থানে রাখা কর্ত্তব্য, যাহাতে রোগ সংক্রামিত হইতে না পারে। খোঁপ প্রত্যহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সময়ে সময়ে ফেনাইল জলে ধৌত করা বিশেষ দরকার এবং আল্‌কাৎরা মাখানও দরকার। ডেয়ারি ফারমের কিছু দূরে পাখী চাষের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৈজ্ঞানিক নির্ব্বাচন ও পৃথকী করণ দ্বারা দেশী খেঁটুরে মুর্গীরও সবিশেষ উন্নতি করা যাইতে পারে। আমাদের দেশের অজ্ঞ কৃষক ও গো-উৎপাদকগণ এই বৈজ্ঞানিক বিধি প্রতিপালন করেন না বলিয়া আমাদের দেশের গো, মুর্গী, মেষ, ছাগলাদি গৃহপালিত পশুর এত অবনতি ঘটিয়াছে। বাদশাহ আকবরের সময় ১০৲ টাকা মূল্যে দিনে আধমণ দুগ্ধদাত্রী গাভী মিলিত; কিন্তু আজ এরূপ গাভী ভারতে দুষ্প্রাপ্য। ২০।৪০ হাজার টাকা মূলধনে যৌথ কারবার ফেলিয়া আমার মনে হয় দেশী ও বিলাতী মুর্গীর কারখানা ও ডেয়ারি ফারম কল কব্‌জা লইয়া কলিকাতার ৫০।৬০ মাইল দূরে প্রবাহমান নদীর সান্নিধ্যে ও রেলষ্টেশানের নিকট বেশ লাভে চালান যাইতে পারে। কলিকাতার মাড়োয়ারি সম্প্রদায় কিছু দিন পূর্ব্বে এইরূপ এক কোটী টাকা মূল ধনে ডেয়ারি ও গোরক্ষনি ফারম প্রারব্ধ করিতে সাধারণকে কংগ্রেস মঞ্চে অঙ্গীকার প্রদান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা অদ্যাবধি কার্য্যে পরিণত হইল না। আমার মনে হয় যে এইরূপ এক বৃহৎ কাজ হিন্দু, মুসলমান, ধনী দরিদ্র চাষী প্রভৃতির সমবেত সংযোগ ও চেষ্টা না হইলে কদাচ সাধিত হইতে পারে না। বোম্বাইর ধনকুবের শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাস যমুনাদাস, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, শ্রীশ্যামল দাস বি কেদায়া, লাল্লুভাই জাভেরী, স্বামী গোকুলনাথজী মহারাজ, রহিমভাই করীমভাই প্রভৃতি মহোদয়গণের অধিনায়কত্বে সেই নগরে এক ডেয়ারি খোলার ব্যবস্থাও হইয়াছে এবং কাজও অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু কলিকাতায় সব বাক্‌সর্ব্বস্ব! পাখী এবং গো-চাষ কৃষির অন্তর্গত। কৃষি-শিক্ষার জন্য বিলাত ৪০ হাজার পাউণ্ড প্রতি বৎসরে ব্যয় করিয়া থাকেন; মার্কিণ যুক্তরাজ্যে প্রতি বৎসর ২৫ হইতে ৩০ লক্ষ টাকা কৃষি-শিক্ষা বিস্তার, ভ্রমণশীল লেকচার, পাখী চাষ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যয়িত হইয়া থাকে; কিন্তু দীন ভারতে কৃষি শিক্ষার জন্য কি ব্যয় হয় তাহা কোন্ ভারতবাসীর অপরিজ্ঞাত? সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে কৃষকদের প্রতিনিধি সভা সমিতিতে, পার্লিয়ামেণ্টে ও সেনেটে স্থান অধিকার করিয়া কৃষক সম্প্রদায়দের প্রতিনিধি স্বরূপ তাহাদের স্বার্থ রক্ষায় সদাই ব্যস্ত আছেন, কিন্তু যে ভারতের শতকরা ৯০ জন কৃষক বা কৃষিজীবী, সে দেশের রাজসভায়, ছাপাখানাওয়ালাদের, শ্রমজীবিদের, ধর্ম্মঘটকারীদের তথা ডাকঘরের ও রেল কর্ম্মচারীদের প্রতিনিধিত্বের স্থান আছে, কিন্তু কৃষকদের স্থান নাই! ধন্য আমাদের দেশের মূক ও অন্ধ চাষা সম্প্রদায়!

ডিম ফোটা কল পরিচালন সম্বন্ধে অনেক পুস্তক আছে, তন্মধ্যে সাট্‌ক্লিফের পুস্তকখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছানা ফোটার পর তাহাদিগকে ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা কিছু খাইতে দিবে না, কারণ তাহা তাহাদের ঐ সময়ের মধ্যে

আবশ্যক হয় না। ডিমের হড্রিাত 'লালীম্থ' প্রোটীনের দ্বারাই তাহাদের শরীর পরিপুষ্ট হয়। যাহাদের কারবার ছোট এবং ১০।২০ বা ৫০টা মুর্গী লইয়া ব্যবসা, তাহাদের পক্ষে মুর্গীর নীচে ডিম দিয়া ছানা তোলা শ্রেয়। মুর্গীকে বসাইবার পূর্ব্বে তাহার গায়ে ভাল 'কীটনাশক পাউডার' দিয়া বসান কর্ত্তব্য। এইরূপ পাউডার ঘরে স্বল্প ব্যয়ে গন্ধক, দোক্তা, কার্বলিক বা ফেনাইল সাহায্যে প্রস্তুত করা যায়, তাহা ক্রমশঃ পরে বিবৃত হইবে। কি বসিয়ে মুর্গী বা ডিমদাত্রী মুর্গীকে আবশ্যকমত পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার পানীয় জল, হাড় চূর্ণ, লোটন ধুলা, উদ্ভিদ্ ও মাংস যুক্ত খাদ্য দিবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে ক্রমশঃ পর পর প্রকাশ করিতেছি।

ব্রুডারের (Brooder) দ্বারায় সদ্যজাত ছানাগুলিকে উত্তাপ দানে শুষ্ক ও শক্ত সামর্থ্য-যুক্ত করা হয়। ছানাগুলি ছেলেবেলায় বড় ঠাণ্ডায় সর্দ্দী ধরিয়া নষ্ট হয় বলিয়া পাশ্চাত্য ঠাণ্ডাদেশে ব্রুডারের ব্যবহার প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে শীতকালে এইরূপ ব্রুডারের ব্যবহার প্রচলন করা মন্দ হয় না। ব্রুডার পরিষ্কার, চাষ দেওয়া বিষহীন জমিতে বসান উচিত এবং উহা বসাইবার ২।১ দিন পূর্ব্বে তাহার বাতি ও পরিচালন বিধিটি ঠিক করিয়া লওয়া উচিত। কলে ছানা ফুটিলে যতদুর সম্ভব মুর্গীর নীচে ফোটা ছানার সহিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। কলে ফোটা ছানাগুলিকে যদি মুর্গীর সহিত এক করিয়া না দেওয়া হয় তবে তাহাদের স্বতন্ত্র পালন করা একটু যত্নসাধ্য ও তাহার বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে। ব্রুডার, তাহার আলো ও তদ্ অন্তর্গত সকল স্থান প্রত্যহ পরিষ্কার করিয়া পূতি বিমুক্ত (Disinfect) করিবে। ছানাগুলিকে গ্রীষ্মকালে ছাওয়াযুক্ত ঠাণ্ডা স্থানে রাখিবে এবং শীতকালে গরম রৌদ্রযুক্ত স্থানে রাখিবে, রৌদ্র তীব্র হইলে সরাইয়া ছায়াযুক্ত স্থানে রাখিবে বা গরম উত্তাপ পাইবার জন্য ব্রুডারের ভিতর রাখিবে। মুর্গীদের হাড়চুর্ণ, শামুক গুগ্‌লী, চুণ কাঁকর বালী, কীটনাশক গুঁড়া, পরিষ্কার পানীয় জলে সামান্য গন্ধক ও মোসব্বর দিবে। শিক্ষানবীষদের যেন উত্তমরূপ স্মরণ থাকে যে, পরিচ্ছন্নতা ও পরিশ্রমই মুর্গীচাষ ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য লাভ প্রাপ্তির একমাত্র গুহ্য ও মূলমন্ত্র।

মাদ্রাজ প্রদেশে "হিন্দু" পত্রিকায় আমার কতকগুলি এ সম্বন্ধে পত্র পাঠ করিয়া তদ্দেশীয় উৎসাহী যুবক ও অধিবাসীবৃন্দ শত শত পুল্ট্রীফারম খুলিয়া বেশ দু' পয়সা আয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। আমার ঐকান্তিক বাসনা যে, আমাদের দেশের মুসলমান ভ্রাতারা এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত "রিফর্মড্ হিন্দু" ভ্রাতাগণ মিথ্যা রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে লম্ফ ঝম্ফ না করিয়া এদিকে দৃষ্টিপাত ও মনোযোগ দান করিলে দেশমাতৃকার প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিবেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পক্ষীচাষের সহিত "ডেয়ারি ফারম" অবশ্য অবশ্য থাকা চাহি। দুগ্ধ সরবরাহ ও ডেয়ারি করা এবং গোরক্ষা সম্বন্ধে খুবই ভুয়া মিটিং, সভা সমিতি, জল্পনা ও কল্পনা সমগ্র দেশে দেখিলাম, রিজোলিউশান পাশ দেখিলাম, কিন্তু এ নাগাইত কাজে ত কিছুই দেখিতেছি না। ডেয়ারি কোম্পানি ১৭২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটে "বেঙ্গল ডেয়ারি" ৩নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে বাবু রামকুমার ভগত, কেশোরাম পোদ্দার, ঘনশ্যাম দাস বির্লা, রামকুমার ঝুণ ঝুণওয়ালা, রামদেও চৌখানি প্রমুখ মাড়োয়ারি ধনকুবেরগণ কলিকাতা নগরে এক কোটী মূলধনে দেশপূজ্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সম্পাদকত্বে যে গোরক্ষা মণ্ডলী নামক যৌথ কারবার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, অথবা অখিল ভারতীয় গোকন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারী শর্ম্মামিশ্র-কোম্পানী যে মডেল ডেয়ারি কোম্পানী ভাসাইয়াছে, তাঁহারাই বা কি করিতেছেন? মাদ্রাজে মিল্ক সাপ্লাই কোম্পানী, কাশ্মীর বিশ্বেশ্বরগঞ্জ ডেয়ারি কোম্পানী প্রভৃতি দেশের মধ্যে বহু দুগ্ধ সরবরাহ ও গোরক্ষাকল্পে কোম্পানী উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু কাজে কেহ এনাগাইত কিছু করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। ডেয়ারি বা পুল্ট্রী ব্যবসা আমাদের দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় সমাবেশ নবভাবে প্রবর্ত্তিত করা বড় সহজ নহে। গোরক্ষায় রাজা উদাসীন, গোখাদক প্রজাদের দেশে, পরিবর্ত্তিত অবস্থায়, শাস্ত্রানুমোদিত গো অধ্যক্ষের ও পরিচালকের অভাবে গোরক্ষা করা যে বড় সহজ ব্যাপার নহে তাহা ভারতবাসী

মাত্রেরই বুঝা উচিত। গোরক্ষা ও দুগ্ধ সরবরাহ সুলভ করিতে হইলে দুগ্ধের মূল উৎস অর্থাৎ গোপ্রচার রক্ষা, গোবংশের অবাধ বলি বিধিদ্বারা বয়স পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, নয়ন শৃঙ্গ সমীকরণ করিতে হইবে, গো পরিচালক অধ্যক্ষ কৃষ্ণ, নন্দ, উদীয়ানদের যুগের মত আমাদের তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। সেইজন্য বলি যে বঙ্গবাসী, ভাই মাড়োয়ারি সম্প্রদায় আপনারা এই গোরক্ষার যে সঙ্কল্প করিয়া "গোরক্ষা মণ্ডলী" স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে কাজ দেখান, দেশের লোককে সাথে করে লন, দেশের বিশেষজ্ঞের মত লইয়া ধীরে ধীরে প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন, যে বিশেষজ্ঞদের মতে কার্য্য পরিচালন করিবেন, তাঁহাদের একবার দুগ্ধ ব্যবসা জনন ফারম ইত্যাদি জ্ঞাতব্য-বিষয়গুলি ডেনমার্ক, সুইজরলণ্ড, ইংলণ্ড ও আমেরিকায় ২।৫ মাসের জন্য পাঠাইয়া পরিদর্শন করিয়া আনয়ন করুন, যাহাতে আপনাদের কাজ সুচারুরূপে অগ্রসর হয়, আমার বিশ্বাস যে আমাদের দেশের কাজ দেশীয় লোকের সাহায্যেই চালান কর্ত্তব্য এবং কার্য্যক্ষম সুদক্ষ বিশেষজ্ঞের (Expert) এর দেশে খুবই অভাব, একথা আমি বিগত ২৪।৭।২০ তারিখের দৈনিক 'বসুমতী' পত্রিকার স্তম্ভেও বঙ্গবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। কেবল মাত্র দুগ্ধ ব্যবসার উপর নির্ভর করিলে গোরক্ষা ও ডেয়ারি পরিচালন লাভবান হইবে না, দুঃখের বিষয় মাড়োয়ারি ভায়ারা কোন সৎ লোকের ও সদ যুক্তি না লইয়াই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাতে যে তাঁহারা কতদূর লাভবান ও সফলকাম হইবেন তাহা বলা যায় না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভারতের নিঃস্ব কৃষক পুত্র ও পত্নীদের পক্ষে মুর্গীচাষ, ডেয়ারি ফার্ম্মিং, ছাগল, হাঁস, খরগোশাদির চাষ বিশেষ লাভজনক বলিয়া আমার মনে হয়। সামান্য ১০।৫ হাজার মূলধনে পার্ব্বত্য উচ্চ ভূমিতে বা বিল ও ডোবা খানা নদী পুষ্করিণী বহুল স্থানে জলচর পাখীর চাষ যে খুব লাভের সহিত পরিচালিত হইতে পারে তাতে আর সন্দেহ কি? এক বৎসরের কম বয়স্কা মুর্গী অপেক্ষা দুই বৎসরের পুরাণ ধাড়ী মুর্গী ভাল ও পাকা পরিপক্ক হইয়া থাকে। যদি ঘেরা ছোট বাঁধা পরিসরের মধ্যে পাখী রাখা হয়, তাহা হইলে একটা নির্ব্বাচিত তেজস্কর মোরগের সহিত ১০।১২টি বেশী ডিমদাত্রী শোণিত বিশিষ্ট (profuse egg laying strain) মুর্গী সংযোজিত করা যাইতে পারে, নচেৎ যদি খোলা স্থান হয়, তবে একটা নরের সহিত অবাধে ২০।২৫টা মুর্গী ছাড়িয়া উর্ব্বর ডিম পাওয়া যাইতে পারে। আমি দ্বিতীয় পত্রে বলিয়াছি যে একটা তেজস্কর মোরগের সহিত ৫।৭টা মুর্গী ছাড়া যাইতে পারে এবং উর্ব্বরা ডিম্ব পাইতে হইলে নর ও মেদী ৮।১০ দিন পূর্ব্বে সংযোজিত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নর খুব উজ্জ্বল বর্ণ বিশিষ্ট, উচ্চ চীৎকারকারী, তেজস্কর, চঞ্চল ও তীক্ষ্ণ রক্তবর্ণ ফুল যুক্ত হইলে জানিবে যে তাহার সংযোগে প্রাপ্ত ডিম নিশ্চয় উর্ব্বর হইবে। সংযোগ ৮।১০ দিন হইতে ২ সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত বাড়ান যাইলেও লাভ বই কোন ক্ষতি নাই। ছানাগুলির প্রথম খাদ্য সমভাগ কঠিন সিদ্ধ ডিম, কুঁচা শুষ্করুটী বা খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম চূর্ণ বা চোকর দুধে মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। রুটী হইতে দুধ কচলাইয়া বাহির করিয়া লইবে, কারণ বেশী দুধ খাদ্যে থাকিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দী হইবার সম্ভাবনা থাকে। চতুর্থ দিন হ'তে অর্দ্ধ সিদ্ধ ভাত ও গম বা মকা চূর্ণের সহিত হলুদ মিশাইয়া খাইতে দিবে এবং ঐরূপ হলুদ মাখান খুদ জমিতে ছড়াইয়া দিবে যাহাতে বাছিয়া বাছিয়া ছানাগুলি খাইতে পারে। এইরূপে তাঁহাদের বেশ পরিশ্রম হইলে উত্তম স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে সহায়তা করিবে।

মুর্গী-খানা উচ্চ ঢালু স্থানে নির্ম্মাণ করিবে যাহাতে নর্দ্দামার ধোয়াট সম্পূর্ণ নিকাস হইয়া দূরে নীত হয় এবং পাখী ঘরের স্বাস্থ্যের সহিত কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে। বেলে বা কাঁকুরে জমাতে মুর্গীখানা নির্ম্মাণ করিবে এবং প্রত্যেক ২।৩ বৎসর অন্তর সব স্থান পরিবর্ত্তন করিবে এবং বাসা ও খোঁপগুলি পুতি বিমুক্ত করিবে। বাসাস্থানে যেন বেশ গাছ পালা থাকে যাহাতে পাখীগুলি ছাওয়াতে গ্রীষ্মের ও রৌদ্রের সময় আশ্রয় লইতে পারে। ঘর এমন স্থানে নির্ম্মাণ করিবে যেন বর্ষাতেও জল না বাধে। বাসাগুলি ও ঘর দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব্বমুখী নির্ম্মাণ করিবে যাহাতে শীতকালে চৌচাপটে খুব বেশী ও অবিচ্ছিন্ন রৌদ্র

পাইতে পারে। ট্র্যাপ-নেষ্ট ব্যবস্থিত থাকিলে বেশী ডিম-দাত্রীগণ নির্দেশ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বাসা ঘরে দাঁড় রাখিবে যাহাতে ধাড়ী পাখীগুলি রাত্রে বসিয়া যাপন করিতে পারে। ঐ ঘরের নিয়ে ১ ইঞ্চি বালী ছড়াইয়া রাখিলে পুরীষ বা লিদ জমিয়া পোকা হইতে পারিবেনা, এইগুলি সময়ে খেতে দিলে খুব ভাল সারের কাজ করিবে। আমাদের দেশের চাষীগণ তাহা জানে না বা জানিলেও আলস্য বশতঃ কাজ করে না। পাশ্চাত্য দেশে এই সারের খুব দাম এবং উচ্চ বাজারও আছে। ভারত শিক্ষা হীনতায় সব হারাইয়াছে ও হারাইতেছে। যে মুর্গী শীঘ্র ডিম দিবে বা ডিম দিতেছে তাহাদের উদ্ভিদ্ খাদ্য দিবে বা ঘাসযুক্ত স্থানে চরিতে দিবে এবং গৃহস্থ বাড়ীর কোপী-পাতা, আলুর খোসা ইত্যাদি গৃহস্থের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি মুর্গীদের বেশ দেওয়া যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং পুনশ্চ পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি যে ডিমদাত্রী ও বসিবার মুর্গীদের নির্ম্মল জল, প্রচুর খাদ্য, উদ্ভিদ্ ও জান্তব খাদ্য, শুষ্করক্ত কসাইখানা হইতে, মৎস্যের পরিত্যক্ত অংশ, কাঁটা পোঁটা কয়লারগুঁড়া, হাড়চূর্ণ সদা খোঁপ বা বাসার নিকট রাখিবে যাহাতে সহজেই খাইতে পারে। যে মুর্গী ডিম দিতেছে তাহাদের সমভাগে মক্কাচূর্ণ, জই এবং গমচূর্ণ দিবে অথবা তিনভাগ মক্কাচূর্ণ দুইভাগ জই এবং একভাগ গম অথবা একভাগ জই এবং দুইভাগ মক্কাচুর্ণ দিবে। মুর্গী প্রথম ডিম বৎসরই খুব বেশী ডিম দেয়, সেই জন্য তাহার পর তাহাকে হাটে পাঠাইবে এবং এই সময়ের মধ্যে ভাল সুনির্ব্বাচিত (well balanced) খাদ্য দিবে। বড় জাতির মধ্যে প্লিমাউথ রক্ গুলিকে ২ বৎসর পর্য্যন্ত রাখিয়া পরে বাজারে পাঠাবে। ডিম বাজারে পাঠাইবার সময় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় লইয়া যাইবে, যেন রৌদ্র না লাগে; বেশী তীক্ষ্ণ রৌদ্রে ডিম খারাপ হইয়া যায়।

কৃষক—আষাঢ়, ১৩২৮।

ফণী মনসার ডাল

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

জুঁই চাঁপা ও নয় ত চারু
কুসুম-ফুটানে,—
বিষ তরুটি পুঁত্‌লি এনে
ঘরের উঠানে।

কর্‌লি আমার হাড় যে কালী,
ফল নাহি ওর লেঠা খালি—
ফেল ভুলে রে নিরেট বোকা
শীঘ্র ছুঁটানে।

এমন তরু আন্‌লি ঘরে
কিসের আশেতে?
চাঁদমারিটি পাত্‌লি পাখীর
বাসার পাশেতে;

আগুন-শিখা তৃণের কাছে
কখনও কি রাখ্‌তে আছে?—
ফুটবে কাঁটা খোকার পায়ে
শোণিত ছুটানে।

ভগ্ন তৃপ্তি

[শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

পরেশচন্দ্র বাড়ী ঢুকিবা মাত্রই মহামায়া বলিয়া উঠিলেন—এরে এর মধ্যে যে ফিরলি—হাট বাজার সব হয়ে গেল?

—না পিসিমা কিছুই হয় নাই।

—তা হলে কি হবে পরেশ, ঘরে যে আর কিছুই নাই।

—কাল সকালে সব গোছ করে আনব 'খন।

—ও হরি, তাহলেই বুঝেছি। তোমার কাল ত—বলিয়া পিসিমা একটু হাসিলেন।

—না পিসিমা, নিশ্চয়ই দেখো কাল সকালে সব ঠিকঠাক পাবে।

পিসিমা এ বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিলেন—থাক্, আমি ভেবেছিলাম, তোর শরীরই বা বুঝি খারাপ হল, তা না হলে এত সকালেত কোনদিনই আসিস্ না। তা তোরই বা দোষ কি, কি করেই বা তোর ঘরের ওপর টান হবে বল্। বলিয়া তিনি একটা ছোট রকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

বেগতিক দেখিয়া পরেশও সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পিসিমার শেষের কথাগুলা সে এতবার শুনিয়াছে যে তাহা একরকম তার গা সহা হইলেও, সে কেমন তবু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত, কারণ যাহা সে বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছে, তাহার কোন জবাবই সে দেয় নাই। সুতরাং পিসিমার নিবিড় বেদনা ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছিল, অথচ কেন যে পরেশের দিক হইতে তার কোন কিনারা হইতে পারে নাই, মহামায়া যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এ কথাও বলা চলে না। মৃত্যুর অন্ধকারে যাহা মিশিয়া গিয়াছে, শুধু তাহারই স্মৃতি বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া এই তরুণ যুবক এমনি করিয়া উদাসীন ভাবে সংসারে এতকাল কি রকম করিয়া যে থাকিবে, এই দুর চিন্তা উঠিতে বসিতে তাঁহাকে পীড়ন করে।

পিসিমাই আবার প্রথমে কথা ক'হলেন—ওই যা, কথায় কথায় বল্‌তে ভুলে গেছিরে, তোর কাছে যে সত্য এসেছে। ওপরে যা, দেখা হবে'খন।

—আমার কাছে পিসিমা?

—হাঁ, বাবা; তোরই কাছে এই কথা ত অন্ততঃ সে বলেছে।

—আচ্ছা আমি তাহলে একবার তার সঙ্গে দেখা করে আসি।—বলিয়া পরেশ উপরে চলিয়া গেল।

উপরের ঘরে ঢুকিবামাত্রই—যাহোক পরেশদা, তুমিত বেশ—বলিয়া সত্য তাহাকে একটা বড় গোছেরই প্রণাম করিয়া আবার কহিতে লাগিল—এতদিন আমরা এসেছি, একবার আমাদের ওদিক কি ভুলেও মাড়াতে নেই? দিদি প্রায়ই দুঃখ করেন—

তার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া পরেশ একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "তাই এতদিন পরে তোমাকে দিয়ে সেইটে জানিয়ে পাঠিয়েছেন। যাক্, আর মিথ্যা কথা বাড়িয়ে লাভ কি? তোমরা কবে এলে বল?

—প্রায় এক মাস হ'ল।

—বটে, এ—ক—মা—স? এই এক মাসের মধ্যে তোমরাও এই প্রথম আমাদের খোঁজ করলে। তাহলেই দেখ দোষটা শুধু আমাদের দিকেই নয়!

সত্য কি উত্তর দিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না তাই বলিয়া ফেলিল—আমরা নতুন এসেছি কিনা, একটু গোলমালের মধ্যেই ছিলাম, তাই আর হয়ে ওঠে নাই।

পরেশ উত্তর শুনিয়া একটু হাসিল মাত্র, কোন কথা কহিল না।

সত্য ধীরে ধীরে কুণ্ঠাভরে প্রশ্ন করিল—তাহলে আমাদের ওখানে যাবেন না, পরেশ দা?

-যাব না এ কথা ত আমি তোমাকে বলি নাই, সত্য।

—তাহলে কাল বিকেলে আমাদের ওখানে যাবেন কিন্তু, দিদি আপনাকে নেমন্তন্ন করেছেন।

—তা বেশ তাই যাব। রাস্তাটা জানি বাড়ীর নম্বরটা বুঝি ১৩?

—না ১১ নম্বর।

তোমরা কি সবশুদ্ধ এখানে চলে এসেছ?—এই প্রশ্ন করিয়া পরেশ সত্যের দিকে একবার তাকাইল।

সত্য উত্তর দিল—হাঁ, তাই পরেশ দা। তবে দাদা রেঙ্গুনে আছেন, তা আপনি বোধহয় জানেন?

—হাঁ, রেঙ্গুনে তিনি কি করছেন?

—আজকাল যা অনেকের মুখের বুলি, তার মানে business করছেন।

—যাক্, তবুও ভাল, এতদিন পরে, যে যাহয় একটু করছেন, সেই ভাল।

এই সময়ে পিসিমা থালা সাজাইয়া জলখাবার লইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সত্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—সত্য একটু জল খেয়ে নে।

—জ্যেঠিমা এত! আমি ত একলা কোনমতেই পেরে উঠব না, যদি পরেশদা সাহায্য করেন, তা হলে না হয় হ'তে পারে; তা না হলে সত্যি এত খাবার যে নষ্ট হবে।

—কি যে বলিস সত্য এই ত তোদের খাবার বয়স। পরেশ, তাহলে তোরা দুজন খেতে বস্। আর সত্য, কি যে বল্‌ব এখন সব তাতেই বড় ভুল হয়ে যায়। তোরা যে সব হঠাৎ চলে এলি?

—হঠাৎ নয় জ্যেঠিমা, আমাদের আস্‌বার ত অনেক দিন ধরেই কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল। তবে মাঝে একটা কথা হয়েছিল যে আমি ঢাকা কলেজেই পড়ব, তাই হয়ত হত। এখানে দিদির বোর্ডিঙ্গে শরীর টিকছে না, কাজেই বাবা ঠিক করলেন যে কলকাতাতেই তবে এখন থেকে থাকতে হবে।

—তোদের বাপু ঐ এক রকম, মেয়েদের অত মেহনত সইবে কেন? আজকাল দেখ্‌ছি পাশ করাবার জন্য যে সবাই খেপে উঠেছেন। এত পড়ে কি হবে বল্?

—জ্যেঠিমা বাড়ীতে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে ভাল।

পরেশ এতক্ষণ চুপ করিয়া সব শুনিতেছিল। এইবা সে কহিল—পিসিমা, আগেকার দিনে আর এখনকা দিনে অনেক ব্যবধান ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে এখনকা দিনে অনেক কথা ভাব্‌তে হয়, যে সব কথা আগেকা লোকেরা ভাবেন নি। যে সমাজে সব মেয়ের বিয়ে ঘ ওঠা একটা খুব শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সমা এ রকম শিক্ষার পথ খোলা রাখ্‌তেই হবে, কেননা ঘ সংসার যাদের নিজেদের হবে না, তারা পরের গলগ্রহ ন হয়ে যাতে নিজেকে চালিয়ে নিতে পারে, এমন একট ব্যবস্থা ত চাই!

—কিন্তু শরীর না টিক্‌লে শেখাবে কাকে?—বলিয়া পরেশের দিকে তার পিসিমা তাকাইলেন।

—সেখানে অবশ্য অন্য কথা।

সত্য কহিল—দিদির শরীর গতিক দেখে বাবা ও মা তাঁকে আর পড়াতে চান না। কিন্তু দিদি যে নাছোড়বান্দা

পরেশ কহিল—তুমিত কলেজে এড্‌মিশন নিয়েছ। কি নিলে সায়ান্স না আর্ট?

—আর্টই নিলাম।

—সায়ান্স নিলে ভাল হত বোধ হয়।

উভয়ের জলখাবার খাওয়া শেষ হইল। ঘড়িতেও ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিল।

ব্যস্তভাবে সত্য কহিল—পরেশদা রাত হয়ে গেল যে!

পরেশ ধীর ভাবে উত্তর দিল—হাঁ, ছেলেমানুষের পক্ষে হ'ল বটে। তোমার একলা যেতে ভয় করবে বুঝি?

—না ঠিক ভয় না। তবে আপনার মুখেই শুনেছি আপনাদের পাড়াটা ভাল নয়।

—কোন ভয় নেই; আমি তোমাকে এগিয়ে দেব'খন।

—আর কাল বিকেলবেলা তাহলে যাবেন কিন্তু। জ্যেঠিমা আপনি পরেশদাকে কাল আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দেবেন কিন্তু। পরেশদা এখন আর আগে-

কার মতন আমাদের ভালবাসেন না, তা যদি বাস্‌তেন তাহলে একমাস কি এম্নি করে খোঁজ না নিয়ে থাক্‌তে পারতেন!

—তোমরাত পরেশদাকে ঠিক আগেকার মতন ভালবাস?

—নিশ্চয়ই বাসি, জ্যেঠীমা।

—তাহলে দেখ্‌বে পরেশ ও ঠিক তেম্নিই ভালবাসে। তুই ছেলেমানুষ সত্য তোকে আর কি বল্‌ব বল। যত গোল পাকিয়ে গেছে তোর দাদা। তোর মা-ইকি আগে আমায় কম ভালবাস্‌তরে, আহা দিদি বল্‌তে অজ্ঞান হ'ত। 'আজ তোরা মাসাধিক কাল এসেছিস, কেউ খোঁজ করে-নারে। বেঁচে থাক্‌লে কতই যে দেখ্‌তে হয়। যা স্বপ্নে ভাবিনি রে এখন তাই দাঁড়াল। পোড়া নাগানিভাঙ্গানীতে এখন দেখ্‌ছি যে সব হয়।

—আচ্ছা জ্যেঠিমা কি হয়েছে বলুনত?

—না বাছা সে তোমার শুনে কাজ নাই। আমাদের মধ্যে যাহোকগে যাক, তোমরা তার মধ্যে আর ঝুঁকে পড়না। যে যেখানে আছে সবাই সুখে থাক।

—জ্যেটিমা, আমি তবে এখন আসি।

—এস বাবা। ওরে মাঝে মাঝে মনে করে এক আধবার আসিস্।

—সে আমায় বল্‌তে হবেনা। হাঁ জ্যেঠিমা, জ্যাঠা-মশায়ের না আসবার কথা ছিল।

—ছিল বটে এখন আর হলনা। দিন কয়েক কি কাজে ঢাকায় থাক্‌তে হবে।

পরেশ আর সত্য যখন রাস্তায় আসিয়া পড়িল, পরেশ তখন বলিল—সত্য তুমিত আমার বাড়ী বেশ চিনে এলে।

—তা পারবনা কেন? ঠিকানা মুখস্থ ছিল, তাছাড়া সেজদির বিয়েতে যে এসেছিলাম।

—হাঁ সেও ত চার বছর হয়ে গেল।

—আর পথ ও যে সোজা। আচ্ছা সেজদিদের খবর কি? জামাইবাবু ত রংপুরেই ওকালতি করছেন?

—তা ছাড়া আর কি করবেন বল। যাক্, তাঁর এখন ও তেমন পসার হয় নাই, তবে কি জান এক রকম করে চলে যাচ্ছে। তবে কম্‌লির শরীর ভাল নয়, রংপুর তার সহ্য হয় না। আর পিসিমা পিসেমশায়ের ঐ হল শিবরাত্রির সল্‌তে। কমলির একটা ছেলে হয়েছিল, কপালগুণে সেটাও রইল না! এখন কম্‌লি বাঁচলে হয়।

কম্‌লি পরেশের পিসতুতো ভগিনী, তার নাম কমলিনী—সকলেই তাকে কম্‌লি বলে ডাকে।

সত্য কহিল—পরেশদা এই মোড়ের বাঁকের গলিটাতেই ত আমাদের বাড়ী। এত দূর যদি এগিয়ে দিলেন তবে একবার চলুন না?

—না, সত্য আজ নয়, কালই যাব। তবে যদি জোর কর তাহলে আজই যেতে পারি কিন্তু তাহলে কাল আর যাব না।

—আজ গেলে কাল আর যায় না বুঝি?

—তা জানিনে, আমি যাবনা এই বল্লাম।

—একি আপনার হিসাব?

—হাঁ সত্য' বেহিসাবী চলা বেশী দিন চলেনা। সংসার আমাকে হিসাব জোর করেই সেখাচ্ছে।

সত্য অবাক হইয়াই কথাগুলি শুনিল।

পরেশ ফিরিয়া আসিয়া সটান শুইয়া পড়িল। বহুদিন পরে আজ তার অতীত জীবনকাহিনীর বিস্মৃতিময় ঘটনাগুলি একে একে মনের মধ্যে উদয় হইয়া—তোলপাড় করিতে লাগিল; বহুচেষ্টা করিয়া চিন্তাধারাকে যখন সংযত করিতে পারিল না, তখন নিরুপায় হইয়া সে গা-ভাসান দিল।

বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন হইয়া পরেশ যখন পিসিমাতার স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, তখন হইতেই পিসেমহাশয়ের ভ্রাতা নবকান্তের পরিবারের সঙ্গেও তার বেশ ঘনিষ্ঠতা জমিয়াছিল। 'পিসেরভাই, কোন সম্পর্ক নাই' এই রকমের একটা কথা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু অবস্থা ও ঘটনার চক্রে এই নিঃসম্পর্কীয় পরিবারকে সে কোনদিনই পর মনে করিতে পারে নাই। বাল্য-কালটা তাঁহাদের সঙ্গেই মেশামেশা করিয়া কাটিয়া গিয়াছিল।

পরেশের পিসামহাশয় হরকান্ত বসু বেশ সাদাসিধা রকমের লোক। মুন্সেফী কার্য্যে লোকের নিকট তাঁর বেশ সুখ্যাতি ছিল। তিনি লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি যখন ঢাকায় মুন্সেফী করিতেন, তখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরকান্ত সেখানে স্কুলমাষ্টারী করিতেন। বহুদিন তিনি ঢাকায় ছিলেন—ঢাকাতে দুই ভাই একত্র ছিলেন। এইখানেই পরেশের সঙ্গে তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা হয়।

ঢাকার স্কুলেই সে পড়িত; কলিকাতায় তাহার একখানা ছোট বাড়ী ছিল, কাজেই তখন সেখানা—ভাড়া খাটিত। ঢাকায় বৎসর দুই থাকিবার পরে—পিসেমহাশয়ের বদলী হইবার কথা হয়, কাজেই পিসিমা তখন কন্যাসহ পরেশকে লইয়া আসিয়া কলিকাতায় বসবাস করিতে লাগিলেন। পরেশ কলিকাতার স্কুলেই লেখাপড়া করিতে লাগিল। কমলিনী ও বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি হইল। দীর্ঘাবকাশে মহামায়া উভয়কে লইয়া স্বামীর কর্ম্মস্থলে যাইতেন, তিনিও ছুটিছাটা পাইলে কলিকাতায় আসিতেন।

পিসিমা এই সময়ে ঘরে ঢুকিতে পরেশের চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। পিসিমা তাহাকে শায়িত অবস্থায় দেখিয়া কহিলেন—কিরে, এসেই যে শুয়ে পড়লি। খাবিনে দাবিনে?

—না পিসিমা আমার একটুও খিদে নেই, আজ আর কিছু খাবনা।

—দূর তাও কি হয়! একেবারে রাত-উপোসী থাক্‌বি! আমি খাবার এনে, ঢাকা দিয়ে—যাচ্ছি। খিদে পেলে খাস্।

পিসিমার সহিত বৃথা বাক্যব্যয়ে কোন ফল হইবেনা, তাই পরেশ কহিল—তবে রেখে দিয়ে যাও, খিদে পায়ত খাব'খন।

পিসিমা চলিয়া গেলেন। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া খাবার ঢাকা দিয়া রাখিয়া যাইবার সময়ে পুনরায় কহিয়া গেলেন—ওরে এই খাবার রইল তবে, দেখিস খাস্ যেন।

হাঁ, পিসিমা তাই হবে—বলিয়া পরেশ চুপ করিয়া রহিল। পিসিমা চলিয়া গেলেন।

পরেশের চিন্তার বিরাম নাই। সত্য তাহাকে যাইতে বলিয়াছে এবং এ আহ্বান কাহার তাহাও বলিয়া গিয়াছে। যাহাদের সহিত অবাধ মেলামেশা করিয়া আসিয়াছে, আজ সেখানে যাইবার কথায় দ্বিধার ভারে তার প্রাণ নুইয়া পড়িতেছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে সত্যের দাদা নির্ম্মল যখন কলিকাতায় আসিয়া পরেশদের বাড়ীতে উঠিয়াছিল, সেই সময় তাহারা সকলেই বুঝিয়াছিল যে নির্ম্মলের স্বভাব বিগড়াইয়াছে, কিন্তু তাহার অধঃপতন যে কতদূর হইয়াছিল প্রথমে তাহারা তেমন বুঝিতে পারে নাই। নির্ম্মল যে তাহাদের বাড়ীতে চুরী করিবে একথা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই, কিন্তু সত্যই যখন তার চুরী ধরা পড়িল তখন মহামায়া তাঁহার দেবরকে পুত্রের কীর্ত্তি-কাহিনীর কথা খুলিয়া লেখেন। ইহাতে উল্টা ফল হইল, কারণ যাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিলেন, পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া তাহা শুধু বুঝিলেন না নির্ম্মলের মাতা। ইহার পর হইতে এই দুই পরিবারের মধ্যে খিটিমিটি বেশ চলিয়া আসিতেছিল এবং তাহারই ফলে উভয় পরিবারের সম্প্রীতির মাঝখানে একখানা কালো পর্দা বিচ্ছেদের ব্যবধানকে নিবিড় করিয়া তুলিয়াছিল। এই অবস্থা যখন ঘনায়মান হইয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে পরেশ ঢাকাতে নবকান্তের ওখানে একবার দিন কয়েকের জন্য গিয়াছিল এবং সেখানে যাইবার পরই সে বুঝিতে পারিয়াছিল, না যাওয়াই তারপক্ষে ভাল ছিল। সেই ঘটনার পর হইতে সে তাঁহাদের এক রকম এড়াইয়া চলিতেছিল শুধু নবকান্ত বাবুর কন্যা মিনতিকে সে কোনমতেই আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। বোর্ডিঙ্গে থাকিতেই যখন নবকান্ত কলিকাতায় আসিতেন, মিনতিও সেই সময়ে একবার না একবার পরেশদের বাড়ীতে আসিত। সে পরেশকে কতবার প্রশ্ন করিয়াছে কিন্তু পরেশের উত্তরে তাহার দ্বিধা বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। তার ব্যবহারে পরেশ শুধু এইটুকুই বুঝিয়াছিল এখনও তার অম্লান বালিকা হৃদয়ে সংসার তার কদর্য্য ম্লান ছায়া ফেলিতে পারে নাই তাই স্বতঃউৎসারিত স্বচ্ছ অনাবিল যে শ্রদ্ধাঞ্জলি সে পরেশকে নিবেদন করিয়া আসিতেছে, পরেশ তাহা তুচ্ছ করিতে পারে নাই এবং তুচ্ছ করিতে পারে নাই বলিয়া

আজ এই বালিকার একান্ত আহ্বানের অন্তরালে যে আগ্রহ আছে, তাহাকে ব্যর্থ করিলে তার কোমল হৃদয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত শেলের ন্যায় বাজিবে, তাহাও সে বুঝিল! একই পরিবারের একদিকে আগ্রহ এবং অপরদিকে অনাদর এই দুইটি পরস্পর বিরোধি ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা যে কতদূর দুরূহ ব্যাপার, ইহা তাহার অবিদিত রহিল না।

একটা প্রচণ্ড ঘটনার মধ্যে অথবা অবস্থার বিপর্য্যয়ে যাহা ওলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছিল, আজ সুনিপুন হস্তের সেবার দ্বারা তাহারই মধ্যে নূতন শৃঙ্খলা এবং গভীর দরদ এমনিভাবে দৃঢ় হইয়া উঠিবে, একথা ভাবিলে পরম বিস্ময়ে পরেশের প্রাণ পুলকে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। নির্ম্মলের অসদ্ব্যবহার তাহার পরে মিনতির দিদির মৃত্যু এই দুইটা ঘটনাতেই পরেশের সঙ্গে নবকান্ত বাবুদের সম্পর্ক এক রকম উঠিয়া গিয়াছিল। সে যা'হক গে আজ সমস্ত অতীতের ব্যর্থ বেদনা অথবা ক্ষুব্ধ অভিমানকে জলাঞ্জলি দিয়া পরেশ স্থির করিল এই একান্ত আহ্বানকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে—সে তাহা পারিবে কি না, তাহা ভাবিল না, অদৃষ্টস্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল মাত্র—পরিণাম চিন্তা করিবার বুঝিবা তাহার শক্তি ও ছিল না।

(ক্রমশঃ)

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

[শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার]

৬ষ্ঠ স্তবক

প্রভুর নীলাচল প্রত্যাগমনের কিয়ৎকাল মধ্যেই গৌড় দেশ হইতে দুই শত গৌরগত প্রাণ বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনাভিলাষে নীলাচল আসিয়া উপস্থিত হন। অদ্বৈত আচার্য্য এই দলের অগ্রণী এবং শ্রীবাসাদি নবদ্বীপের সকল ভক্তবৃন্দই এই দলভুক্ত ছিলেন। প্রতি বৎসর গৌরভক্তগণ নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া গৌড় হইতে সেই সুদূর নীলাচল ধামে মহাপ্রভুকে দেখিতে যাইতেন এবং চারিমাস কাল প্রভুসঙ্গে বাস করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। গৌর ভক্তগণের এই বাৎসরিক অভিযান তাঁহাদের গৌর প্রীতির সম্যক পরিচায়ক।

প্রথম যাত্রায় রাজা প্রতাপরুদ্র যখন সংবাদ পাইলেন যে মহাপ্রভুর নিজজন বঙ্গদেশ হইতে আগমন করিতেছেন তিনি সার্ব্বভৌম ঠাকুরের সহিত এক অট্টালিকায় আরোহন করিয়া বৈষ্ণবগণের পরিচয় জানিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। গোপীনাথ সকলকেই চিনিতেন। তিনি একে একে পরিচয় দিতে লাগিলেন। ভক্তগণের তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি দর্শনে রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—

"বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর।"

মহাপ্রভু যে নাম কীর্ত্তনের প্রতিষ্ঠাতা এবং গৌরভক্তগণ গার্হস্থ্য লীলায় তাঁহার সহিত যে প্রাণোন্মাদকর কীর্ত্তনে গৃহ পরিজন বিস্মৃত হইয়া সারা নিশি শ্রীবাস অঙ্গনে যাপন করিতেন আজ মহাপ্রভু দর্শনপথে নীলাচল নিকটবর্ত্তী হইয়া ভক্তবৃন্দ মৃদঙ্গ করতালে সেই মধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সকলে আনন্দে বিভোর হইয়া নাচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতেছেন। সে আনন্দ তরঙ্গ সকলকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিয়াছে। বিস্মিত প্রতাপরুদ্র বিস্মিত সার্ব্বভৌম নির্নিমেষ

নয়নে এই অদ্ভুত কীর্ত্তন ও নৃত্য দর্শন করিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত হইতেছেন। রাজা প্রতাপরুদ্র কীর্ত্তনের ভাষা বুঝিতে পারিতেছেন না কিন্তু সে উদাত্ত স্বর লহরীর মধুর ঝঙ্কারে অট্টালিকায় থাকিয়া পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছেন। তিনি সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—

"ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥"

কিন্তু প্রতাপরুদ্রের বিস্ময়ের পর বিস্ময় আসিয়া তাঁহার আজন্মপোষিত সংস্কারগুলিকে মথিত করিয়া তুলিল। তিনি দেখিতেছেন ভক্তগণ পুরীধামে পদার্পণ করিয়া শ্রীমন্দিরাভিমুখী না হইয়া মহাপ্রভু প্রেরিত স্বরূপ ও গোবিন্দ সনে তাঁহার বাসভূমি প্রতি দ্রুত ধাবিত হইতেছেন। ভক্তগণ যখন নরেন্দ্র সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়াছেন স্বরূপ ও গোবিন্দ তৎকালে মহাপ্রভু প্রেরিত মালা প্রসাদ দ্বারা সকলকে অভিনন্দন করিলেন। রাজা পুনরায় সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া এই সকল ভক্তগণ সর্ব্বপ্রথম জগন্নাথ দেব দর্শন না করিয়া কোথায় যাইতেছেন এবং ইহার কারণই বা কি? সার্ব্বভৌম উত্তরে বলিলেন—

"………এই স্বাভাবিক প্রেম রীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিব আসিয়া॥"

রাজা আজ্ঞা দিলেন ভক্তগণের স্বচ্ছন্দ বাসা, প্রসাদ ও দর্শনে যেন কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। পরিজনকে আজ্ঞা দিলেন তাহারা যেন সতত নিকটে থাকিয়া সাবধানে প্রভুর ইঙ্গিতমাত্র সর্ব্বকার্য্য সমাধান করে। বৈষ্ণবগণ সিংহদ্বার দক্ষিণে রাখিয়া কাশীমিশ্রগৃহ পথে অগ্রসর হইলেন। এই সময় প্রভু স্বয়ং মহারঙ্গে সকলের সহিত মিলিত হইলেন। অদ্বৈতভবন হইতে বিদায় লইবার পর প্রভুভক্তে এই প্রথম সাক্ষাৎ। বিরহক্লিষ্ট ভক্তগণের এই মিলনে যে ভাবের উৎস প্রবাহিত হইল তাহা বর্ণনাতীত।

প্রথমেই বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন এবং প্রেমানন্দে উভয়ে অস্থির হইলেন। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ একে একে প্রভুর চরণরেণু গ্রহণে পবিত্র হইলেন। মুরারি গুপ্তকে আলিঙ্গন দান কালে মুরারি চকিতে পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া বলিলেন—

"মোরে না ছুঁইহ মুঞি অধম পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে পাপ কলেবর॥"

প্রভু উত্তরে বলিলেন "মুরারি দৈন্য সংবরণ কর, তোমার দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়।" এই অভিযানে নামযজ্ঞের মহাসাধক যবন হরিদাসও ছিলেন। হরিদাস দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করিয়া রাজপথ প্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। প্রভু তাঁহাকে আহ্বান করিলে হরিদাস বলিয়া পাঠাইলেন—

"…… মুঞি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা মধ্যে যদি স্থান খানিক পাও।
তাঁহা পড়ি রাঁহা এক কাল গোঞাও॥"

হরিদাসের দৈন্য মহাপ্রভুর মর্ম্মান্তিক হইল। বস্তুতঃ মহাপ্রভুর ভক্তগণ দীনতার প্রতিমূর্ত্তি। কৃষ্ণপ্রেমের প্রধান লক্ষণ এই দীনতা—যাহাতে "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে"—গৌর ভক্তবৃন্দের প্রতিঅঙ্গে প্রকাশ পাইত।

সকল ভক্তবৃন্দের বাসার সংস্থান হইল। হরিদাসের পৃথক্ বাসের জন্য প্রভু কাশী মিশ্রের নিকট নির্জ্জন স্থান চাহিয়া লইলেন। প্রভু হরিদাস সহ মিলিত হইতে আসিলেন। হরিদাস তখন প্রেমভরে নাম কীর্ত্তনে রত ছিলেন। প্রভুকে দেখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া পড়িতেই প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া সপ্রেম আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিতে লাগিলেন "প্রভু আমাকে স্পর্শ করিও না। আমি নীচ, অস্পৃশ্য, পামর--তোমার আলিঙ্গনের যোগ্য নহি।"

উত্তরে প্রভু বলিলেন "নিজে পবিত্র হইবার জন্য তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছি। তোমার পবিত্র ধর্ম্ম আমাতে নাই। এই বলিয়া প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে এক শ্লোক পাঠ করিলেন।

"অহো বত শ্বপচোঽত তো গরীয়ান
য জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥

(যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান। যাঁহারা তোমার নাম লয়েন তাঁহারাই তপশ্চারী, তাঁহারাই হোমকারী, তাঁহারাই তীর্থস্নায়ী, তাহারাই সদাচারী আর্য্য ও বেদাধ্যায়ী)

(শ্রীমদ্ভাগবত, তৃতীয়, ৩৩শ)

নাম কীর্ত্তনই যুগধর্ম্ম। অন্নগত প্রাণ ক্ষণভঙ্গুর দেহ কলির জীবের পক্ষে ভগবৎ নাম কীর্ত্তনই যে সাধন পথের একমাত্র অবলম্বন ইহাই প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মহাপ্রভু বিদ্বজ্জন মুখরিত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। নাম মহিমা তিনি বহুবার বহুপ্রকারে প্রচার করিয়াছেন। "অভিন্নাত্মানাম নামিনঃ" এই মহাবানী পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া জীবকে আশান্বিত করিয়া গিয়াছেন। সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তি নিরোধ একান্ত আবশ্যক। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় হইতে মনকে সংহরণ করিয়া একাগ্র করিতে না পারিলে ভগবদ্ভজন সুদূর পরাহত। বস্তুতঃ একাগ্রতাই সাধন জগতের মূল রহস্য। যোগের প্রক্রিয়া দ্বারা মনের এই একাগ্রতা সহজে লাভ হইয়া থাকে এবং তজ্জন্যই যোগ সাধন পথ এত প্রশস্ত। কিন্তু অপটু দেহের পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগ সম্ভবপর নহে, তাই মহাপ্রভু যুগোপযোগী নাম কীর্ত্তনরূপ সাধনার সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নামে বিবেক বাতাস পেলে, নামেই ভক্তি রতন মিলে"—ইহা ধ্রুব সত্য। চিত্তের স্থৈর্য্য আনিতে বহির্ম্মুখী মন অন্তর্ম্মুখী করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই।

হরিদাস কাশী মিশ্রের প্রদত্ত নির্জ্জন স্থানে বাসা পাইলেন। অতঃপর মহাপ্রভু গৌড়ীয় ভক্তগণ সহ আনন্দে সমুদ্র স্নান ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ভক্তগণ সকলেই কৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত। বিশেষতঃ পুণ্যতীর্থ পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর দেবদুর্ল্লভ সঙ্গলাভে তাঁহারা যে আনন্দের আস্বাদ পাইতেছিলেন তাহা সাধারণ বুদ্ধির অনধিগম্য। সন্ধ্যাসমাগমে মহাপ্রভু নিজ জন সনে জগন্নাথ মন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন।

"চারিদিগে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন॥"

কীর্ত্তনের মহামঙ্গল ধ্বনি যে উঠিল।
চতুর্দ্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল॥"

নীলাচলবাসী আবাল বৃদ্ধবনিতা অশ্রুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সে অদ্ভুত কীর্ত্তন দেখিতে ধাবিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীমন্দির বেড়িয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। জগন্নাথ মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া প্রভু নৃত্য করিতেছেন আর তাঁহার নয়নাশ্রুতে চতুর্দ্দিকস্থ দর্শকবৃন্দ স্নাত হইতেছে। প্রভুর প্রেম বিকার দর্শনে সমবেত লোক সমূহ প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র অট্টালিকায় আরোহন করিয়া কীর্ত্তন দর্শন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব নৃত্যদর্শনে তাঁহার উৎকণ্ঠা দ্বিগুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। রাজা সার্ব্বভৌমকে পুনরায় এক পত্রী পাঠাইয়া জানাইলেন

"প্রভুকৃপা বিনু মোর রাজ্য নাহি ভায়॥"
"যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব হইয়া ভিখারী॥"

পত্রী পাইয়া সার্ব্বভৌম বড় চিন্তিত হইলেন। তিনি পত্রের মর্ম্ম সকল ভক্তগণকে জানাইলেন এবং তাঁহারা নিত্যানন্দকে অগ্রণী করিয়া প্রভুর নিকট রাজার আন্তরিক অবস্থা নিবেদন করিলেন। রাজার অবস্থা বিদিত হইয়া প্রভুর মন কোমল হইলেও তাহার সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইলেন না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভুর এক খণ্ড বহির্ব্বাস প্রসাদ স্বরূপ রাজাকে পাঠাইয়া দিলেন।

"বস্ত্র পাইয়া আনন্দিত হইল রাজার মন।
প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥"

রায় রামানন্দ ও প্রভুকে রাজার সম্বন্ধে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে করেতে লাগিলেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহে প্রভু রাজপুত্রের সহ মিলিত হইতে সম্মত—হইলেন। "শ্যামলবরণ"—পীতাম্বরধারী প্রিয়দর্শন রাজপুত্রের সহ মিলনে

প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ স্মৃতি হইল এবং আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

"প্রভু স্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥"

ভাগ্যবান্ রাজপুত্র জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যফলে মহাপ্রভুর আলিঙ্গন লাভ করিয়া

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে, নাচে, করয়ে ক্রন্দন।"

রাজা প্রতাপরুদ্র প্রেমাবিষ্ট পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া নিজেও প্রেমাবিষ্ট হ'ন।

গৌরলীলায় এইরূপ আবিষ্টতার নিদর্শন প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভু যাহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া আলিঙ্গন দান করিতেন সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইত এবং তাহার আলিঙ্গনে অপরে পুনরায় তদ্রূপ সমভাবে প্রেমাবিষ্ট হইত।

মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যে এত দ্রুত প্রসরতা লাভ করিয়াছিল ইহার মুখ্য কারণ এই শক্তি সঞ্চার। দাক্ষিনাত্য ভ্রমনকালেও তিনি এইরূপে অত্যল্পকাল মধ্যে সমগ্রদেশ বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনুপ্রানিত করিয়াছিলেন।

এই শক্তি সঞ্চার অমানুষী। যুগধর্ম্ম প্রচার জন্য ইহার সৃষ্টি।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য, মৃত্যু ও চিকিৎসা

[শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়]

প্রকৃতির সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে জয় করিবার নিয়ত চেষ্টায় স্বাস্থ্য ভাল থাকে, না তাহার সহিত আপোষ করিয়া বাস করিলে স্বাস্থ্য বজায় থাকে এ তর্কের মীমাংসা এখনো হয় নাই। তবে মানুষ যখন জন্মগ্রহন করে তখন সে পূর্ব্ব-পুরুষের সঞ্চিত কিছু শক্তি বা ব্যাধি লইয়া আসে এবং এখানকার অনুকূল ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবের মধ্যে বাড়িতে থাকে।

প্রকৃতি ও স্বাস্থ্য

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে অধিবাসীর স্বাস্থ্যের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ট। ভারতের জলবায়ু ও তাপ এখানকার মানুষকে স্বভাবতই শ্রমবিমুখ করিয়া তোলে। বাংলা-দেশের গ্রীষ্মকালের পচানি, গরমে বা পশ্চিমের নিদারুণ তাপের মাঝে মানুষের বাস করা খুব কঠিন। প্রকৃতির সহিত লড়াই করিতে করিতে সে হয়রাণ হইয়া পড়ে। যত বড় জোয়ানই এদেশে বাস করুন না কেন কয়েক পুরুষের মধ্যে তাহাদের সন্তান সন্ততি নির্বীর্য্য হইয়া পড়ে, প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত তাহাদের কোনোই ভেদ আর চোখে পড়ে না। ইতিহাসে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতি বৃষ্টির ফল

ভারতবর্ষের বৃষ্টি বৎসরের মধ্যে একবার হয় এবং বৎসরের অধিকাংশ সময় দেশের কোথায়ও একবিন্দু বারিপাত হয় না বলিলে চলে। জল সরবরাহ তিন ভাবে হয়:—১। পুষ্করণী ২। কূপ ৩। নদী। ভারতবর্ষের বড় নগর ছাড়া কোথায়ও গ্রামের বা সহরের দূষিত জল দূরে ফেলিবার ব্যবস্থা নাই। অতি-বৃষ্টির সময়ে এই সব দূষিত জল অধিকাংশ সময়ে নিকটের পুষ্করিণীতে আশ্রয় লয় বা চোয়াইয়া কূপের মধ্যে যায়। এইরূপেই আমাদের

অধিকাংশ কূপগুলি নষ্ট হয়। এদিকে বৃষ্টির ফলে চারিদিকের খুব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, বড় বড় আগাছা উঠিয়া গ্রাম ছাইয়া ফেলে; বর্ষার আগে যেখানে খোলামাঠ ছিল বর্ষার পরে সেখানে মানুষের মাথা সমান গাছ। দুই বৎসর না কাটিতে পারিলে সেখানে বন। এই সময়ে তাপেরও অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে, কিন্তু বস্ত্রাভাবে অধিবাসীদের অনেকেই খুব কষ্ট পায়। বাংলাদেশের প্রধান শস্য ধান; বর্ষাকালে এসব ক্ষেত হইতে জল ভাল রূপে বাহির হইতে পারে না; রেলপথ মাটি দিয়া উঁচু করার জন্যও দেশের জল সহজে চলাচল করিতে পারে না ইহা রেলে চড়িলেই বুঝা যায়। এইরূপে জল দূষিত হইলে বর্ষাকালের প্রথমেই দেশময় কলেরা বা উদরের নানা রকমের ব্যাধি দেখা দেয়। ইতিমধ্যে বন-বাদাড় হইতে ম্যালেরিয়ার মশা আসিয়া গ্রামবাসীদিগকে শয্যাশায়ী করিতে আরম্ভ করে। মোটামুটী জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত লোকের স্বাস্থ্য মন্দ থাকে না; কিন্তু ইহার পরই দেখা যায় মৃত্যুহার ভীষণ রূপে বাড়িয়া চলিয়াছে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এইরূপ চলে।

অনাবৃষ্টির ফল

কিন্তু বৃষ্টি যদি কম হয় তবে যে বিপদ কিছু কম হয় তাহা নহে; গ্রামের ছোট ছোট পুকুর ডোবা শুকাইয়া যায়, কূপেও জল থাকে না। তখন একই পুকুরের জলে পানীয়, স্নান, কাপড়-কাচা, গরু ঘোড়া স্নান প্রভৃতি সকল রকম কাজ হইতে থাকে; ইহার ফলে দেশমধ্যে অচিরেই নানারূপ ব্যাধি দেখা যায়।

স্বাস্থ্যের উপর তাপ ও শৈত্যের প্রভাব

তাপের তারতম্য স্বাস্থ্য হানির অন্যতম কারণ। বাংলার স্যাঁৎসেঁতে স্থানে ছ্যাঁচার বেড়ার ঘরে লোক থাকে, পশ্চিমে মাটির ঘরে বাস করে। এই সব ঘরে বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা নাই। এমন কি দারিদ্র্যবশতঃ কোথায় একই ঘরে মানুষ ও পশু বাস করে। ইহার উপর আমাদের কতকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এই দুঃখকে আরও বাড়াইয়া তোলে। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকায় এই নিদারুণ গরমে ক্ষুদ্র ঘরে বহু লোকের শয়ন প্রথা এখনো বহু জায়গায় আছে। ইহার ফলে সান্নিপাতিক, ইনফ্লুয়েঞ্জা নিমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধির প্রসার হয়। সহরে এই ভিড় আরও বেশী। বম্বেতে ১৯০২ সালে ভাড়াটে বাড়ীর শতকরা ৮৭ টায় মাত্র একটি করিয়া ঘর ছিল এবং এখানেই সমগ্র সহরের শতকরা ৮০ জন লোক বাস করিত; প্রত্যেকটি ঘরে গড়ে ৪ জনের উপর লোক থাকিত।

বোম্বাই এর বাড়ী ও ব্যাধি

এমন সব ঘর ছিল যেখানে দিনে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করিত না। ইহার ফলে উক্ত নগরীতে যক্ষ্মাতে প্রতি দশ হাজারে প্রায় ১০ জন করিয়া লোক মরিয়াছিল। একটি বিভাগের যেখানে ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক বাস করিত যক্ষ্মাতে সেখানে দশ হাজারে ১৭ জনের উপর লোক মরিতেছিল; কিন্তু লণ্ডনে দশ হাজারে দুইএর কম সংখ্যা এই মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়িত।

বাল্য বিবাহ

বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই প্রায় প্রচলিত। অপরিনত বয়সেই ভারতবর্ষের অধিকাংশ বালিকা মাতা হয়; এবং অল্প কালের মধ্যেই তাহাদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভারতবর্ষের মেয়েদের সন্তানাদি হয় আগে এবং সন্তান-হওয়া বন্ধ হয় আগে। পুরুষেরা অনেক সময়ে ১৮।২০ বৎসরে পিতা হন এবং এক শতাব্দীর মধ্যেই ৬।৫ পুরুষ জন্মগ্রহণ করে ও মরে। আমাদের দেশে সন্তান-প্রসবের সময়ে জননীদের জীবন-সঙ্কট হয়; অশিক্ষিত ধাত্রীদের জন্য, অশিক্ষিত জননী ও গৃহকর্তৃদের জন্য অনেক শিশু ও বালিকা-জননী অসময়ে প্রাণত্যাগ করে।

পুষ্টখাদ্যের অভাব

অস্বাস্থ্যের আর একটি কারণ অপুষ্ট আহার। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই এবং বাংলাদেশে বিশেষ ভাবে আহার্য্য বিষয়ে লোকের জ্ঞান খুবই কম। দারিদ্র্য ইহার প্রধান কারণ হইলেও লোকের পুষ্টিকর আহার খাইবার দিকে রুচি কম। দেশে ভাল ঘি তেল কিছুই পাওয়া যায়

না, মৎস্যাদির দুর্মূল্যতার জন্ত লোকে তাহাও প্রচুর পায় না; ও খায় না; ফলে লোকের শরীরের তেজ হ্রাস পায় এবং সহজেই তাহারা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমরা প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য চাই নতুবা বাঁচিবার আশা কম।

নারীক্ষয়

পুরুষ ও নারীদের মধ্যে সংখ্যায় অসামঞ্জস্য সর্ব্বত্রই আছে। ভারতের পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কম। ১৮৮১ সালে ১০০০ জন পুরুষের স্থানে ৯৫৪ জন নারী ছিল। ১৯০১ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া হাজারে ৯৬৩ দাঁড়ায়; কিন্তু ১৯১১ সালের আদমসুমারীতে এই হার পুনরায় নামিয়া ৯৫৪ হইয়াছিল। বাংলাদেশে ১৮৮১ সালে ১০০০ পুরুষে যেখানে ১০১৩ নারী ছিল, গত আদমসুমারীতে সেইখানে ৯৭০ দেখা যায়। এই নারী ক্ষয়ের ফলে সমাজের জনসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। সমগ্র ভারতের নরনারীর মৃত্যুসংখ্যা হাজার-করা যথাক্রমে ৪০ ও ৩৮; অর্থাৎ মোটের উপর পুরুষদের মৃত্যুর হার অধিক। জন্মের প্রথম বৎসরে বালিকার চেয়ে বালকেরাই বেশী মরে। কিন্তু পরে উহা বদলাইয়া যায়। ১৫ হইতে ২০ বৎসরের সময়ে এই পার্থক্য সব চেয়ে বেশী; এবং ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েদের মৃত্যুসংখ্যা বেশী দেখা যায়। ইহার কারণ নারীদের সন্তান প্রসবের সময়ে তাহাদের মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাধিক। প্রত্যেক ৭৫ জন প্রসূতির মধ্যে একজন করিয়া জননী অযত্ন, বিনাচিকিৎসা ও অজ্ঞতা হেতু প্রাণত্যাগ করে। বিলাতে ২১২ জন প্রসূতির মধ্যে ১ জন মরে অর্থাৎ সেখানকার চেয়ে আমাদের নারীদের মৃত্যু হয় প্রায় তিনগুণ।

শিশু-মৃত্যু

লোক ক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ হইতেছে শিশু-মৃত্যু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুগণ জননীদের অপরিণত বয়সে জন্মগ্রহণ করে; ফলে তাহারা অল্প জীবনীশক্তি লইয়া ভূমিষ্ট হয়; এই জননীদের জীবন সঙ্কটময় করিয়া তোলে। ১৯০২—১৯১১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে গড়ে ১০০০ জন্মের মধ্যে ২৫০টি শিশু বৎসর ঘুরিবার পূর্ব্বেই যেথান হইতে আসিয়াছিল সেইখানে চলিয়া যায়। পৃথিবীর কোন সুসভ্য দেশের এমন শোচনীয় অবস্থা নয়। হাজার জন শিশুর মধ্যে ইংলণ্ডে ১২৭, অষ্ট্রেলিয়া ৮৭, সুইডেন ৮৪, নিউজিল্যাণ্ড ৬৪, ফ্রান্স ১৩২, জারমেনী ১৮৬ জন প্রতি বৎসর মরিয়া থাকে। এইসব স্থানেই জন্মহার খুব কম এবং সেইজন্য মৃত্যুহারও অধিক নহে; কিন্তু ভারতবর্ষ, রুশ, চীন প্রভৃতি স্থানে মৃত্যু-হার বিশেষতঃ শিশু-মৃত্যু-হার খুবই বেশী।

প্রতি-হাজার-জন্মে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে কত শিশু প্রতি বৎসর মরে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

বাংলা—২১০	পাঞ্জাব—৩০৬
মান্দ্রাজ—১৯৯	বম্বে—৩২০
বিহার-উড়িষ্যা—৩৬৪	ব্রহ্মদেশ—৩০২
যুক্তপ্রদেশ—৩৩২	

সহরের শিশু-মৃত্যু-সংখ্যা ভয়াবহভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। বদ্ধ-গৃহে বাস, দুধ বলিয়া বার্লি বা আরারুট পান, জননীদের শুষ্ক বক্ষ শোষন, ও তাঁহাদের ঘন ঘন সন্তান-সম্ভাবনা প্রভৃতি অনেকগুলি কারণ এই মৃত্যু-হার বৃদ্ধির কারণ। সহরের এই মৃত্যু-হার ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। কলিকাতায় ১৯০৯ সালে ২,৭০০ শিশু এক মাস ঘুরিবার পূর্ব্বে মারা যায়। বম্বেতে ১৯০০ সালের পাঁচ বৎসরের গড়ে হিসারে দেখা যায় যে ১০০০ এর মধ্যে ৭১১ জন শিশু মরে।

গ্রাম ও সহরের মৃত্যুহার

গ্রাম ও সহরের অধিবাসীদের মধ্যে মৃত্যুহারের তারতম্য লক্ষিত হয়। এখানকার শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে; অথচ সেখানকার স্বাস্থ্য যে কি ভীষণ খারাপ তাহা কোনো বাঙালীর অবিদিত নহে। ১৯০১ সালে হাজার করা লোকের মধ্যে সহরে ৩৯ জন ও ১৯১১ সালে ৩৩ জনের মৃত্যু হয়; কিন্তু গ্রামে উহা যথাক্রমে ২৮ হইতে ৩৩ দাঁড়াইয়াছিল। মাঝে ১৯০৮ সালে ৩৮ জন হয়। গত শতাব্দীর শেষ পাঁচবৎসরের মৃত্যুহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই গ্রামের যে অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়তর হইতেছে

তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সে সময়ের তালিকায় দেখা যায় যে গ্রামের মৃত্যু হার সর্ব্বত্রই কম; পরে দেখা যাইতেছে যে এ হার বাড়িয়াই চলিয়াছে। সহর ও নগরের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য স্থানীয় মুন্সিপালটি গুলি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করে। কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতা ও বম্বে প্রভৃতি স্থানে সহরের উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা চলিতেছে। দুষিত জল নানারূপ ব্যাধির কারণ; কতগুলি সহরে বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহের জন্য এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩½ কোটী টাকার উপর ব্যয়িত হইয়াছে; এবং এখানো আরও প্রায় ৩½ কোটী টাকা ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু সহরে ভারতের অধিবাসীর অতি সামান্য অংশই বাস করে, অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। তাহাদের পানীয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উদরের নানাপ্রকার পীড়ার কারণ এই দুষিত জল। আজকালকার গ্রামে যাহারা একবার প্রবেশ করিয়াছেন বা যাঁহারা বাস করিতেছেন তাহাদের কাছে একথা অবিদিত নয়। গ্রামের বদ্ধজল নিকাশের পথ নাই; ডোবা, পুকুর ও গাছের গোড়ার জল মেলেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধির জীবাণুর বৃদ্ধির প্রধান স্থান। গ্রামে ড্রেণের উন্নতি না করিলে যে সেখানকার স্বাস্থ্যোন্নতি হইতে পারে না, একথা নিশ্চিত। গ্রামের চারিদিকে পয়োপ্রণালী খনন করিয়া উদ্বৃত্ত জল নিকাশের পথ তৈয়ারী করার দিকে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি অল্পকাল হইল পড়িয়াছে; কিন্তু তেমন করিয়া দেশব্যাপী চেষ্টা এখনো হয় নাই। ড্রেণ ছাড়া গ্রামের জঙ্গলও ব্যাধি বৃদ্ধি ও বিস্তারের অন্যতম কারণ।

তীর্থস্থানের অস্বাস্থ্য

তীর্থস্থানে অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার ফলে সেখানে প্রতিবৎসর বহুসহস্র লোক ওলাউঠা ও বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করে। প্রথমে অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে ট্রেণে যাইতেই লোকের প্রাণ শক্তি অর্দ্ধেক কমিয়া যায়; ইহার পর তীর্থস্থানগুলিতে থাকিবার ব্যবস্থা আদৌ সুন্দর নহে একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন; সরকার এবিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতেছেন পথ ঘাটাদির উন্নতি জন্য কিছু অর্থও ব্যয় করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামের ও সহরের অধিকাং লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সামান্যও বোধ না-থাকাতে এই সকল ব্যাধির প্রকোপ বাড়িয়া যায়।

লোকের অজ্ঞতা

গৃহের পার্শ্বে আবর্জ্জনা স্তূপ করা, গৃহের সন্নিকটেই মলমূত্রাদি ত্যাগ, গোশালার পাশেই গো-ময় ও মূত্রাদি মিশ্রিত খড় বিচালি জমা করা, সহরের বাড়ীর ড্রেণ ও পায়খানা যথোচিতভাবে পরিচ্ছন্ন না রাখা, খাদ্যাদি খোলা রাখা ও ঠাণ্ডা খাওয়া, রাত্রে শুইবার ঘর সিন্দুকের মত বন্ধ করিয়া ছিদ্রাদিতে কাগজ কাপড় এবং তুলা দিয়া বন্ধ করা (পাছে হিম আসে), সহরে খেলিবার ও মেয়েদের বেড়াইবার স্থানের অভাব ইত্যাদি দেশের স্বাস্থ্য-অধঃপতনের অন্যতম কারণ। এছাড়া এমন কতকগুলি বদ্-অভ্যাস আমাদের মজ্জাগত হইয়াছে যে সেসব আর পাঁচজনের কোনো ক্ষতি করিতে পারে তাহা আমাদের মনে হয় না। ট্রেণে ও ট্রামের মধ্যে থুতু ও খাদ্যাদির উচ্ছিষ্টাংশ ত্যাগ, কলিকাতার ফুটপাতের উপর থুতু ফেলা এবং এক পা সরিয়া ড্রেণে ফেলিবার আলস্য, গৃহের জানালা হইতে আবর্জ্জনা রাস্তায় ফেলার ফলে রোগ প্রসার হয়।

প্রায় অধিকাংশ ব্যাধিই নিবারণ করা যায়। কিন্তু ভারতের অজ্ঞতা বশতঃ এখানে কয়েকটি ব্যাধি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে; এই সমস্ত ব্যাধির মধ্যে প্রধান হইতেছে মেলেরিয়া, ওলাউঠা, বসন্ত, প্লেগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা; এছাড়া শ্বাসযন্ত্রের নানাবিধ রোগ ক্রমেই দেশে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।

মেলেরিয়া

মেলেরিয়ার কথা বাঙালীকে বিশেষভাবে বলিতে হইবে না; এই ব্যাধিতে ভোগেন নাই এমন সৌভাগ্যশালী পুরুষ আজকাল নাই বলিলেই চলে। পূর্ব্বে কেবল বাংলাদেশেই এ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ছিল এক্ষণে তাহা উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাংলা দেশে গতশতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মেলেরিয়া আরম্ভ হয়।

সে সময়ের মহামারীর কথা আমাদের দেশের প্রবাদগত হইয়াছে। বহুজনাকীর্ণ গণ্ডগ্রাম সেই সময়ে উৎসন্ন যায়; এবং সেই হইতে ধ্বংসকার্য্য ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে। এখন বাংলাদেশে কেন—সমগ্র হিন্দুস্থানের কোথায়ও স্বাস্থ্যকর স্থান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এককালে কলিকাতার লোকে নানারূপ ব্যধিতে ভুগিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য হুগলি, বর্দ্ধমানে যাইত; কিন্তু আজকাল যাঁহারা সেখানে বাস করেন তাঁহারা আর কাহাকেও সেখানে আসিতে উপদেশ দেন না।

প্রাচীন বাংলা দেশ

মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৫৯ জন জররোগে মরে। বাংলাদেশে শতকরা ৭০ এর উপর মৃত্যুর কারণ জর। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে গ্রামের স্বাস্থ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল সে কথা আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে এক শতাব্দী পূর্ব্বেও বাঙালীর শারীরিক বল ও সুস্থতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ডমিণ্টো (১৮০৮) বলিয়া ছিলেন "আমি এরূপ সুন্দর জাতি দেখি নাই; ইহারা মান্দ্রাজের লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বাঙালীরা দীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও পালোয়ানের ন্যায় ইহাদের শরীরের গঠন।" কিন্তু বর্ত্তমানের অবস্থা যে কি তাহা বর্ণনা পাঠ করিয়া জানিতে হইবে না প্রত্যেক পাঠক নিজ নিজ শরীর ও চারিপার্শ্বের লোকের প্রতি দৃষ্টি দিলেই বুঝিবেন! প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বাঙালীদের যে চিত্র পাওয়া যায়, ভুঁইয়াদের যে বীরত্ব-কাহিনীর লুপ্ত ইতিহাস এখনো পাওয়া যায় তাহা হইতে বাঙালী ভীরু ও দুর্ব্বল একথা প্রমাণিত হয় না।

বাংলাদেশের গ্রামগুলি ক্রমশই জনশূন্য হইয়া আসিতেছে; গ্রামবৃদ্ধদের নিকট হইতে গ্রামের অতীত কাহিনী শুনিলে তাহা অলীক বলিয়া মনে হয়। তবে তাহাদের সমৃদ্ধঅবস্থার চিহ্ন স্বরূপ ভীষণ বনের মাঝে বোসেদের বাড়ী, মুখুয্যেদের বাড়ী, সিংহদের বাড়ীর ভগ্নভিটা সেই করুণ কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে। নদীয়া, যশোহর, বীরভূম, হুগলী প্রভৃতি কয়েকটি জেলার জনসংখ্যা মেলেরিয়ার উৎপাতে রীতিমত কমিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট সঙ্কিত হইয়াছেন।

১৯০৮ সালে উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাব প্রদেশে মেলেরিয়া দেখা দেয়। এই ব্যাধির আক্রমণে বলিষ্ঠ পঞ্জাবী, জা[ঠ] পাঠানগণ হাজারে হাজারে মরিয়া যায়।

প্রতিবৎসর ভারতে কেবল মেলেরিয়া জরেই ১০ লক্ষ করিয়া লোক মরে; ইহাদের অধিকাংশই পরিণত বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করে। যাহারা মরে না তাহারা ভুগিয়া ভুগিয়া এমন অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে যে সকল প্রকার শারীরিক পরিশ্রমের তাহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ধান-কাটার সময়ে বাংলাদেশে জর দেখা দেয়। বাঙালীরা একাজ করিতে পারেনা, প্রথমত দেশে অত লোক পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়তঃ ঐ সময়ে অধিকাংশ লোকই পীড়িত থাকে। সেইজন্য বিহার পশ্চিম ও সাঁওতাল ধান কাটিবার সময়ে বাংলাদেশে আসে।

মেলেরিয়ার প্রতিকার

মেলেরিয়ার হাত হইতে কেমন করিয়া দেশকে উদ্ধার করা যায় একথা গভর্ণমেণ্ট বহুকাল হইতে ভাবিতেছেন। বিখ্যাত রস্ সাহেব আবিষ্কার করেন যে একপ্রকার মশা এই রোগের বীজাণুর বাহক ও কুইনাইন উহার একমাত্র প্রতিষেধক। সেই হইতে সরকার বাহাদুর গ্রামে গ্রামে পোষ্টআফিসে কুইনাইন রাখিয়াছেন; বর্ত্তমানে ইহার দর অত্যন্ত বাড়িলেও কিছুকাল পূর্ব্বেও খুব সস্তায় লোকে কুইনাইন পাইত।

কুইনাইনের চাষ

১৯০৬ সালে এক বৈঠক বসে এবং তাঁহারা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নানারূপ প্রস্তাব করেন। ১৯০৮ সালে যুক্ত-প্রদেশে ভীষণভাবে মেলেরিয়া দেখা দেওয়ায় সরকার বাহাদুর সাড়ে তিন হাজার সের কুইনাইন বিনামূল্যে বিতরণ করেন। ১৯১৬ সালে ভারতে প্রায় ৯৩ হাজার সের কুইনাইন ব্যবহৃত হয়। গভর্ণমেণ্ট দার্জ্জিলিঙ ও নীলগিরি পাহাড়ে নিজের তত্ত্বাবধানে সিন্‌কোনা গাছের আবা[দ]

করিয়াছেন ; সরকারী ফ্যাক্টরী ও জেল খানায় কুইনাইন তৈয়ারী হয়। কিছুদিন হইতে ডাক্তার বেণ্টলী ও আমাদের লাট সাহেব লর্ড রোনাল্ডশে বাংলাদেশকে মেলেরিয়ার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন ; তাঁহাদের কার্য্য যে ভাল হইবে একথা বলাই বাহুল্য।

প্লেগ

মেলেরিয়া ছাড়া প্লেগ ভারতের লোকক্ষয়ের অন্যতম কারণ। ১৮৯৬ সালে বম্বেতে এই ব্যাধি প্রথম দেখা দেয় এবং সেখান হইতে ধীরে ধীরে ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় ১৯৯৮ সালে প্লেগ দেখা দেয়। সেই সময়কার প্লেগের চেয়ে প্লেগের চিকিৎসায় লোকের যে আতঙ্ক হইয়া ছিল তাহা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। সেই হইতে প্রতি বৎসরই ভারতের কোনো না কোনো অংশে ইহা দেখা দেয়—বিশেষতঃ বম্বে প্রদেশে প্লেগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। সেখানে কেবল সহরে নয় গ্রামেও প্লেগে হাজার হাজার লোক প্রতিবৎসর মরিতেছে। ১৯০৭ সালেই ভারতে ১৩ লক্ষের উপর লোক প্লেগে মরে। ১৯১৫ সালে এই রোগে পঞ্জাবের মৃত্যু সংখ্যা ভীষণ হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯০৪ সালে বিশেষজ্ঞদের লইয়া প্লেগের তত্ত্ব-নির্ণয়ের জন্য এক বৈঠক বসে। ১৯০৭ সালে এই ব্যাধির কারণ আবিষ্কৃত হইল। পণ্ডিতেরা বলিতেছেন প্লেগের বীজাণু-ইন্দুরের শরীরে পুষ্টিলাভ করে ; এক প্রকার মাছি এই বিষ এক শরীর হইতে অন্য শরীরে সঞ্চারিত করে। কোন বাড়ীতে ইন্দুর মরিতে আরম্ভ করিলে বুঝিতে হইবে যে প্লেগের বিষ সেখানে আছে এবং অবিলম্বে সেস্থান পরিত্যাগ করা বিধেয়। সেইজন্য সরকার বাহাদুর কোন স্থানে প্লেগ দেখা দিলেই সেখানকার ইন্দুর মারিবার জন্য আদেশ দিয়া থাকেন। ১৮৯৬ সাল হইতে এপর্য্যন্ত কেবল প্লেগেই ৯৭।৯৮ লক্ষ লোক মরিয়াছে।

কলেরা

মহামারীর মধ্যে প্লেগের পরেই ওলাওঠা। বৎসরে ৩.৪ লক্ষ করিয়া লোক এই রোগে মরে। দূষিত জল, দুধ ও খাদ্য হইতে কলেরার উৎপত্তি। দেশের জল-কষ্টের কথা সকলেই জানেন। প্রতিদিনই খবরের কাগজ কোনো না কোনো স্থানে জলাভাবে কলেরার প্রাদুর্ভাবের কথা ও প্রজাগণের আকুল কণ্ঠে জমিদার ও সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে কৃপা ভিক্ষার কথা প্রকাশিত হইতেছে।

বসন্ত

বসন্ত রোগে প্রতিবৎসর গড়ে প্রায় ৮০ হাজার করিয়া লোক মরে। পূর্ব্বে বাংলা-টীকা লইবার ব্যবস্থা ছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টীকা দেওয়ার উন্নতি হইয়াছে। সমগ্র ভারতে প্রায় ছয় হাজার লোক টীকা দিবার জন্য নিযুক্ত আছে। প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটী করিয়া লোককে টীকা হয় ; টীকার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

অন্যান্য ব্যাধি

এছাড়া ২ লক্ষ ৮০ হাজার লোক পেটের অসুখ আমাশয়, ও শ্বাসযন্ত্রের রোগে দুই লক্ষ ও অন্যান্য ব্যাধিতে ১৭ লক্ষ লোক প্রতিবৎসর মরিয়া থাকে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

গত তিন বৎসর হইতে পৃথিবীতে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষেরও এ রোগে কি পরিমাণে ক্ষতি করিয়াছে তাহা প্রত্যেকেই জানেন। এমন বোধ হয় একজনও নাই যাহার জানা শুনা দুই চারিজন লোক এই রোগে না মরিয়াছে। ১৯১৮ সালের জুন মাসে এই রোগ প্রথম দেখা দেয়। সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার শতকরা দুইজন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মারা পড়িয়াছে।

ইনফ্লুয়েঞ্জার মৃত্যু সংখ্যা ১৯১৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত

বঙ্গদেশ—	২,১৩,০৯৮	৪.৭ হাজার করা
বিহার উড়িষ্যা—	৩,৫৯,৪৮২	১০.৩ „
মাদ্রাজ—	৫,০৪,৬৬৭	১২.৭ „
যুক্ত প্রদেশ—	১০,৭২,৬৭১	২২.৯ „
পাঞ্জাব—	৮,১৬,৩১৭	৪২.২ „

বোম্বাই—	৯,০০,০০০	৪৫'৬	„
দিল্লী—	২৩,১৭৬	৫৫'৬	„

চিকিৎসা বিভাগ

ভারতের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য একটি সরকারী বিভাগ আছে। এই বিভাগে ৭৬৮ জন চিকিৎসক আছেন; বিলাতের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইঁহারা এদেশে আসেন। ভারতের ইংরাজ ও দেশীয় সৈনিকদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-রক্ষাই ইহাদের প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এ ছাড়া ক্রমে ক্রমে নানারূপ কর্ত্তব্য ইহাদের কাজের সঙ্গে জড়িত হইতে লাগিল যথা সাধারণ হাঁসপাতাল ও বেসরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের পর্য্যবেক্ষণ, জেল তত্ত্বাবধান ইত্যাদি।

১৭৬৬ সালে এই বিভাগ গঠিত হয়; তখন ইহার মধ্যে মিলিটারী ও ছিভিল এই দুইভাগ ছিল। ১৮৫৩ সালে ইহাতে দেশীয়দের প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। প্রথম দেশীয় ডাক্তার যিনি মিলিটারী বিভাগে কাজ পান তিনি একজন বাঙ্গালী; তাঁহার নাম গুডিভ চক্রবর্ত্তী। ১৮৫৫ হইতে ১৯১০ পর্য্যন্ত মাত্র ৮৯ জন ভারতবাসী এই বিভাগে কর্ম্ম পাইয়াছেন। ইঁহাদের সকলের উপাধি সেনাপতিদের ন্যায় লেফ্‌টনাণ্ট, কর্ণেল, মেজর ইত্যাদি। গত কয়েক বৎসর যুদ্ধের সময়ে অনেক ভারতবাসীকে অস্থায়ীভাবে এই বিভাগে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

সমগ্র চিকিৎসা বিভাগের পরিচালক ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী,—চিকিৎসা-বিভাগের পরামর্শদাতা তিনিই। কর্ম্মচারীদের প্রমোশন ও সাধারণ বিভাগের লোক নির্ব্বাচন প্রভৃতি আপিষী কাজই তাঁহাকে বেশী করিতে হয়। তাঁহারই অধীনে ভারতের স্যানিটারী বা স্বাস্থ্য বিভাগ।

প্রত্যেক প্রদেশের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য একজন করিয়া বড় ডাক্তার কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত; তিনি সমস্ত হাঁসপাতালের পরিদর্শক। স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য একজন পৃথক কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন; তাঁহার অধীনে প্রায় প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া স্যানিটারী কমিশনর আছেন। ইঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে তাঁহাদের অধীনস্থ ভূখণ্ডে কোথায় কোনো সংক্রামক ব্যাধি আছে কিনা তাহার সন্ধানকরা এবং কেমন করিয়া দেশকে উহার হাত হইতে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে স্থানীয় শাসন বিভাগকে পরামর্শ দান করা। জেলার সাধারণ হাঁসপাতাল প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার সিভিল সার্জ্জেনের উপর। তিনি সাধারণত জেলার মধ্যে চিকিৎসা সম্বন্ধে সুপণ্ডিত। জেলার প্রধান সহরের সরকারী হাঁসপাতালে তিনিই চিকিৎসাদি করেন। অনেক জেলায় তিনিই স্যানীটারী ইন্সপেক্টরের কার্য্য করেন।

বিলাত হইতে যাঁহারা ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগে কর্ম্মচারী হইয়া আসেন তাঁহাদের সম্মান ও বেতন দুইই অধিক। লেফ্‌টনাণ্টরা ৫০০৲, ক্যাপ্টেনরা ৫০০৲ হইতে ৬১০৲, মেজরেরা ৭০০৲ হইতে ৮০০৲ ও লেফ্‌টনাণ্ট-কর্ণেল ৯০০৲ হইতে ১৪০০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন।

মিলিটারী উপাধিভূষিত চিকিৎসক ছাড়া সাধারণ বিভাগে ৬৫০ জন কর্ম্মচারী আছেন; ইঁহারা ইন্সপেক্টর জেনারেল, স্যানিটারী কমিশনর, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক, জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির কাজ করেন। সকলের বেতন মাসিক হাজারের উপরই ১২০০৲ হইতে ২৫০০৲ এর মধ্যে।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল

১৯১৬ সালের শেষে ভারতে ৩,০৫১ টি হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র ও রোগ-বহুল দেশের পক্ষে ইহা নিতান্তই কম। গ্রামের মধ্যে চিকিৎসার দুর্দ্দশার কথা কাহারও অবিদিত নাই। হাসপাতাল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। ১৯১৬ সালে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষের উপর রোগী সরকারী ঔষধালয় হইতে ঔষধ লইয়াছিল।

ভারতে ৫টী সরকারী মেডিক্যাল কলেজ আছে—কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাস, লাহোর ও লক্ষ্ণৌ। সবগুলি কলেজে ২০৯৬ জন বিদ্যার্থী পাঠ করিতেছেন; ইহার মধ্যে ৭৯ জন মহিলা। এ ছাড়া ১৭ টি মেডিক্যাল স্কুল আছে। এগুলিতে তিন হাজার ছাত্র পাঠ করে।

আমাদের দেশে খ্যাপা কুকুর ও শেয়ালে কামড়াইলে যে দেশীয় চিকিৎসা ছিল তাহা এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; সে সব প্রণালী সত্য কি মিথ্যা তাহাও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে শিমলা শৈলের কসোলী নামক স্থানে, মান্দ্রাজের কুনুরে, আসামের শিলংএ এবং বর্ম্মায় রেঙ্গুনে হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৯১৬ সালে ভারতে ২১টি পাগ্‌লা গারদ্ ছিল। সব গুলিতে প্রায় ১০ হাজার রোগী আছে। বাংলাদেশের মধ্যে বহরমপুরের পাগ্‌লা গারদ বিখ্যাত। সমগ্র ভারতে প্রায় ২৫০০ করিয়া লোক প্রতি বৎসর পাগ্‌লা গারদে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকেদের জন্য খাঁটি সরকারী কাজ খুব কমই আছে। অধিকাংশই খৃষ্টান পাদরীদের দ্বারা পরিচালিত। মান্দ্রাজের সরকারী কুষ্ঠাশ্রম, বঙ্গের মাতৃঙ্গ কুষ্ঠালয়, ত্রিবঙ্কুরের সরকারী কুষ্ঠাশ্রম, ও কলিকাতায় কুষ্ঠগৃহ উল্লেখ যোগ্য। খৃষ্টানদের ৫০টি কুষ্ঠালয়ে সরকারী সহায্য প্রচুর পরিমাণে প্রদত্ত হয়।

নারীদের বিশেষ ব্যবস্থা

পুরুষদের ন্যায় মেয়েদের জন্য ভারতীয় মেডিক্যাল বিভাগ খোলা হইয়াছে। এ দেশের নারীদের চিকিৎসা ও সেবা যাহাতে ভালরূপ হইতে পারে তাহার জন্য এই বিভাগের সৃষ্টি।

লেডী হার্ডিংজের (ভূতপূর্ব্ব বড়লাট বাহাদুরের স্বর্গীয়-পত্নী) নাম অনুসারে দিল্লী সহরে ১৯১৬ সালে মেয়েদের একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলা হইয়াছে। পুরুষদের সঙ্গে একত্র কলেজে পড়িবার অনেক অসুবিধা। দেশীয় রাজাদের অর্থেই ইহা স্থাপিত হইয়াছে; ইহার সংলগ্ন হাসপাতালে ১৬৮ টি রোগী রাখিবার ব্যবস্থা আছে। সেবিকার কাজও ভালরূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এখানে আছে।

১৮৮৫ সালে তৎকালীন বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিনের পত্নীর উদ্যোগে ভারতের সর্ব্বত্র মেয়েদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। লেডী ডফ্‌রীন যখন ভারতে আসেন তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া এদেশের নারীদের শোচনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্য বিশেষ ভাবে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। লেডী ডাফ্‌রিন ভারতে আসিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন ও চারিদিক হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি সমিতি গঠন করেন। তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নাম "ডাফরিণ ফাণ্ড" হয়। ভারতবর্ষে বাসকালে তিনিই ইহার নেত্রী ছিলেন। ভারতবর্ষময় এই সভার শাখা-সভা স্থাপিত হইল এবং তহবিলের ব্যবস্থা স্থানীয় লোকের উপর ন্যস্ত হইল। ইহার উদ্দেশ্য ১—চিকিৎসা শিক্ষা; ভারতীয় নারীরা যাহাতে চিকিৎসক, ধাত্রী ও সেবিকার কর্ম্ম শিখিতে পারে তাহার ব্যবস্থা। ২—সেবা; স্থানে স্থানে হাসপাতাল ও ঔষধালয় খুলিয়া মেয়েদের চিকিৎসা বিশেষভাবে করিবার বন্দোবস্ত করা। কলিকাতার "ডাফরিণ হাসপাতাল" এই শ্রেণীর হাসপাতাল। ৩—শিক্ষিত ধাত্রী ও সেবিকা প্রয়োজনীয় স্থানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা।

চারি বৎসরের মধ্যে ভারতের নানাস্থানে ১২ টি হাসপাতাল ও ১৫ টি ঔষধালয় স্থাপিত হয়। দেশীয় লোকের উৎসাহের অভাব বা অর্থের অনটন হয় নাই। এই অর্থ হইতে চিকিৎসা শিখিবার জন্য সেবিকার কার্য্যের জন্য ১২ টি ও হাসপাতালের সহকারীর কার্য্য শিখিবার জন্য ২ টী স্কলারশিপ মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে ১৫৮ টি হাঁসপাতাল, ওয়ার্ড ও বহুশ্রেণীর ঔষধালয় আছে এবং বৎসরে দেড়লক্ষ স্ত্রীলোকের ঔষধাদি ও শুশ্রূষাদি করিবার মত ব্যবস্থা আছে। ইহা সরকারের নিজ তত্ত্বাবধানে চালিত হইতেছে।

অপমৃত্যু

রোগে মরা ছাড়া আরও নানা রকমেও লোক মরে, যথা আত্মহত্যা। "কেরোসিন তৈলে নারীদের আত্মহত্যা করার প্রথা কয়েক বৎসর হইল বাংলাদেশে অবলম্বিত হইয়াছে। এছাড়া আফিং সেঁকোবিষ প্রভৃতি খাইয়াও

অনেকে প্রাণত্যাগ করে। নিদারুণ, অসহ্য, অপ্রতিবিধেয় মানসিক ব্যাধিও অনেক সময়ে আত্মহত্যার কারণ, এবং এই মানসিক বিকৃতি কখন কখন দৈহিক ব্যাধি হইতে উৎপন্ন হয়। ১৯১৫ সালে বাংলাদেশে ১৪৫২ জন পুরুষ ও ২০১৮ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। পুরুষদের প্রায় দেড়গুণ অধিক স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার বিশেষ কারণ আছে। বাংলাদেশেই যে আত্মহত্যার প্রাদুর্ভাব বেশী, তাহা চারিটি প্রদেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট হইতে সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

	পুরুষ	নারী
মধ্য প্রদেশ—	৪৪১	৫২৩
বিহার উড়িষ্যা—	৬০৫	১১০৫
আগ্রা অযোধ্যা—	৬৬৪	১৭৯৯
বাংলা দেশ—	১৪৫২	২০১৮

আত্মঘাতী নারীর সংখ্যা

"তালিকায় দেখা যাইতেছে যে চারিটী প্রদেশেই পুরুষ অপেক্ষা নারী অধিক আত্মঘাতী; এই সামাজিক ব্যাধির কারণ কি? বাঙ্গালীর মেয়েরা নিজেই নিজের প্রাণ নাশ করিলে আদালতে গৃহীত সাক্ষ্যে প্রায়ই দেখা যায় যে ঐ সব স্ত্রীলোকের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। শাশুড়ী, শ্বশুর বা স্বামী, কিম্বা সকলেই যথেষ্ট যৌতুক না পাওয়ার জন্য, কিম্বা বধূ পরমা সুন্দরী নহে বলিয়া, কিম্বা তাহার কৃত গৃহকার্য্য সন্তোষজনক নহে বলিয়া, এইরূপ কোন না কোন অজুহাতে তাহার লাঞ্ছনা হয়। তাহাতে তাহার প্রাণের আশা থাকে না। কন্যা পিতামাতার দায় স্বরূপ হয়; সেই জন্য যে তাহাকে গ্রহণ করে সে পিতাকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করে। এই দুরবস্থার প্রতিকার, নারীর ব্যক্তিত্বের ও স্বাধীন-জীবন যাপনের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের উপর নির্ভর করিবে। সর্ব্বত্রই সুশিক্ষা দ্বারা নারীর মনকে দৃঢ়তর করিবার, নারীর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার, এবং নারীর পক্ষে দুঃখজনক সামাজিক প্রথা ও পারিবারিক ব্যবস্থার সংস্কার ও অন্যান্য উপায়ে নারীর জীবনকে অধিকতর আশা ও আনন্দ পূর্ণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

বন্যজন্তুর উৎপাত

বন্যজন্তুর হাতে প্রতিবৎসর কয়েক সহস্র করিয়া লোক মরে। সর্পাঘাতে প্রতিবৎসরেই ২১।২৩হাজার করিয়া লোক মরিয়া থাকে। ১৯১৭ সালের সর্পাঘাতের মৃত্যুসংখ্যা প্রায় ২৪ হাজার হইয়াছিল। বাঘ ভালুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর হাতে প্রতিবৎসর দেড় হইতে দুই হাজার করিয়া লোক মরিয়া থাকে। ১৯১৭ সালে দুই হাজারের উপর লোক মরিয়াছিল। হিংস্রজন্তুর উৎপাতে নিরস্ত্র মানুষ কখনো আত্মরক্ষা করিতে পারে না। ৩১ কোটী লোকের বাস যেখানে সেখানে মাত্র ১ লক্ষ ৩৭ হাজারের বেশী বন্দুক নাই। এই সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিতেছে।

১৯০৮ সালে	...	১,৯৭,১০০ বন্দুক—
১৯১৩ "	...	১,৮২,৪১২ "
১৯১৭ "	...	১, ৬,৭০৭ "

মৃত্যুসংখ্যা

বাংলা দেশে ১৯১০ সালে ২৯,৪০৬ টি বন্দুক ছিল. ১৯১৩সালে ২৫,৯৬১ টি ও ১৯১৭ সালে ৮,০৪২ টি মাত্র দাঁড়াইয়াছে। সংযুক্ত প্রদেশে প্রায় ২০ হাজারের স্থানে ৬৩৫৭ টি, পাঞ্জাবে ১৩৮৭৫ টির স্থানে ৬২১৯টি ১৯১৭ সালে দাঁড়াইয়াছিল। এ অবস্থায় বন্যজন্তুর কবল হইতে অসহায় গ্রামবাসীদের প্রাণরক্ষা অসম্ভব।

বন্দুকের পাশ

১৯১১-১২সালে সমগ্র ভারতে প্রায় ৬ লক্ষ গ্রাম ছিল; প্রত্যেক চারিটি গ্রামের মধ্যে তিনটি গ্রামের একজন লোকের কাছেও একটি বন্দুক ছিল না। এ কয় বৎসর লোক বাড়িয়াছে কিন্তু বন্দুকের সংখ্যা কমিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ ও অনাহার

ব্যাধি ব্যতীত অনাহার জনিত অপমৃত্যুর সংখ্যা ভারতে খুব বেশী। লোকক্ষয়ের ইহা একটা প্রধান অঙ্গ; সুতরাং হিসাবের মধ্যে এটিকেও ধরিতে হইবে। ভারতে ইংরাজ আসিবার পর হইতে দুর্ভিক্ষ হইতেছে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। পূর্ব্বেও অনাহারে লোক মরিত তবে তাহা কেহ গণিয়া গাঁথিয়া লিখিয়া যায় নাই ১৮৫৪ সাল হইতে ১৯০১ সাল

পর্য্যন্ত এই ৪৭ বৎসরে প্রায় ২ কোটি ৮২ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। কেহ কেহ অনুমান করেন গত বিংশ শতাব্দীর শেষ ১১ বৎসরে অনাহার ও অনাহার-জনিত ব্যাধিতে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ করিয়া লোক মরিয়াছে। ভারতের জনসংখ্যা ১৮৯১ সালের আদমসুমারী অনুসারে ২৮ কোটি ৭২ লক্ষ, ১৯০১ সালে ২৯ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল। যথার্থ অনুপাত অনুসারে এই বৃদ্ধি হইলে ১৯০১ সালেই ৩১ কোটি লোক হইত। ১৯১১ সালের ফল দেখিয়াও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

জন্ম মৃত্যুহার

ভারতবর্ষের মৃত্যুহার

		হাজার করা
১৯১৩	...	২৮·৭২
১৯১৪	...	৩০·০০
১৯১৫	...	২৯·৯৪
১৯১৬	...	২৯·১১
১৯১৭	...	৩২·৭২
১৯১৮	...	৬২·৪২
১৯১৯	এখনো তৈয়ারী হয় নাই	

অন্যান্য দেশ

	জন্মহার ১৯১৭	মৃত্যুহার ১৯১৭	মৃত্যুহার ১৯১৯
ইংলণ্ড		১৫·৭	১৪·২
অষ্ট্রিয়া	৩১·৪	২১·৯	২০·৫
বেলজিয়ম	২০·৭	১৫·২	১৪·৮
বুলগেরিয়া	৪০·৩	২৬·৪	২১·৫
ডেনমার্ক	২৬·৭	১৩·৪	১২·৮
ফ্রান্স	১৮·৭	১৯·৬	১৯·৬
জার্ম্মানী	২৯·৮	১৬·২	১৫·০
হাঙ্গারী	৩৭·৮	২৪·৯	২২·৩
ইটালী	৩১·৫	২১·৪	১৭·৯
জাপান	৩৪·১	২১·৯	১৯·৫
হল্যাণ্ড	·	·	১২·৪
নিউজিল্যাণ্ড	২৬·১	৯·৫	৯·১
নরওয়ে	২৪·৯	১৩·২	১৩·৭
রুমেনিয়া	৪৩·০	২৫·৭	২৩·৮
রুশিয়া	৪৬·৮	২৯·৮	২৮·৯
সার্বিয়া	৩৯·০	২২·৪	২১·১
স্পেন	৩০·৮	২৩·৭	২২·১
সুইডেন	২৩·৮	১৩·৮	১৪·৬
সুইজারল্যাণ্ড	২৫·০	১৪·১	১৩·৩

(Whitaker. Almn'sanack 1918. Hazell's Annual 1920.) *

কাব ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নঃ ইঃ-র উদ্দেশে

[শ্রীমোহিতলাল মজুমদার]

বক্ষ তোমার আকুল এযে,—কণ্ঠ কালো কিসের বিষে ?
প্রাণের দাপট ঝড়ের ঝাপট্ উড়িয়ে দিল উত্তরী' সে !
লাল যে দেখি নখের কিনার,
নয় ত রঙীন্ ছাপ সে হেনার !—
কল্‌জে খানা টান্‌তে ছিঁড়ে' লাগ্‌ল শোণিত-চিহ্ন কি সে!

* কুমার [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত "[illegible]"র অন্তর্গত 'ভারত-পরিচয়' নামক স্বতন্ত্র গ্রন্থের এক অধ্যায়।

ঊর্দ্ধমুখে রক্ত ছোটে,
ঠোঁটে কি তাই আল্‌তা ফোটে ?
তাই কি হাসির গর্‌রা এমন ছুট্‌ছে আবীর-পিচ্‌কিরিতে ?
মরণ-চুমা চুঁইয়ে ঝরে আফিম্‌-নেশার মিছ্‌রী-গীতে ?

চক্ষে তোমার ঘনায় আঁধার—সাঁঝের দীঘির অতল কালো,
মূর্চ্ছে সেথায় ডুবে-মরা কোন্ রূপসীর হাসির আলো !
এখনো তার নীলাম্বরী
দেয় গো দেখা সোপান 'পরি,
কলস-মুখের বুদ্‌বুদেরা কখন গেছে হাওয়ায় মিশে,
জলের তলে নিথর নিশা শিউরে' ওঠে শ্যামার শিসে !

তবুও কি আজ মেঘের ছায়া নাম্‌ল ললাট-অলক-বনে ?
ইন্দ্রধনুর পুচ্ছ-চূড়া দেখ্‌ছি যে তা'য় ক্ষণে ক্ষণে !
মা-যশোদার প্রাণের কূলে
আজ যে ভরা বাদর দুলে !
কৃষ্ণা তিথির কোন্ অতিথি তৃষ্ণাতে মুখ দিল স্তনে !
বৈশাখী সে বাজের জ্বালা
আজ যে ভাদর-আদর-ঢালা !
মাথায় যে তাই মেঘের কাজল উথ্‌লেছে কার স্নেহাশিসে—
কাঁদন-কারায় বাঁধন-হারার নূতন জনম-অষ্টমী সে !

রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের ভূমিকা

[শ্রীরাধাবল্লভ নাগ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর).

(৩)

বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালবাসিবার আর একটা কারণ হইতেছে তাহা সুন্দর। প্রেমের অ-ধরতা সুন্দরে ধরা পড়িয়াছে—সৌন্দর্য্যের উপাসনা করাও যা প্রেমের উপাসনা করাও তাই—প্রেম এবং সৌন্দর্য্য যেন ভাব আর রূপ—ভাবরাজ্যে ডুবিতে যাইলে রূপ ছাড়া তাহা সম্ভব হয় না—আবার রূপের রাজ্যেরও কেবল একটা পথ—তাহা হইতেছে ভাবের। তাই কবি বলিতেছেন—

রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ-রতন আশা করি

সৌন্দর্য্যের উপর আমাদের প্রেম স্বাভাবিক—আবার প্রেমের চক্ষে সকলই সুন্দর। বিশ্বপ্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে হইলে নিজের হৃদয়ে অসীম প্রেম থাকা দরকার। প্রেমের শিক্ষাদীক্ষা প্রেমের শিক্ষকত্ব ছাড়া আমরা এই বিশ্বপ্রকৃতির সুবৃহৎ গ্রন্থ পড়িতে পারি না। যাহার অক্ষর পরিচয় হয় নাই তাহার সম্মুখে বইয়ের একটি পাতা খুলিয়া ধরিলে যেমন সে কিছুই বুঝিতে পারে না তেমনই যার হৃদয়ে প্রেম নাই তার কাছে বিশ্বপ্রকৃতির অবারিত সৌন্দর্য্যরাশির কোনও অর্থ নাই। প্রেমের শিক্ষায় আমরা আমাদের সমস্ত দেখার মধ্যে অ-দেখাকে দেখিতে পাই—আমাদের সমস্ত জানার মধ্যে অ-জানার সাক্ষাৎ পাই। যেমন একখানা কাগজ যতক্ষণ সাদা থাকে ততক্ষণ আমরা তাহার আকার আয়তন দেখিতে পাই—কিন্তু তাহার উপর যখন অক্ষরের সমাবেশ ঘটিতে থাকে তখন আমরা কাগজের কথা ভুলিয়া যাইয়া অক্ষরের কথার শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াই—তাহার পরে যখন অক্ষরগুলি বড় বড় বাক্যে আসিয়া শেষ হয়—তখন আমরা কাগজও দেখিতে পাই না—অক্ষরও দেখিতে পাই না—যাহা দেখি তাহা হইতেছে ভাব বা অর্থ।

এই বিশ্ব প্রকৃতির অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিতে পারে—প্রেম—প্রেমই সত্য এবং প্রেমই অনন্ত। হৃদয়ের স্বাধীনতা বা বিস্তার একমাত্র প্রেমই করিতে পারে। প্রেম হইতেছে ধ্রুব—এই যে পরিবর্ত্তনশীল কোলাহলমুখর বিশ্বজীবন ইহার মধ্যে নিত্য সত্তা কেবল একমাত্র প্রেমের। তাই কবি বলিতেছেন—

হে প্রেম, হে ধ্রুব সুন্দর
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে পরস্তর
দ্বীপগুলি তব গীত মুখরিত
ঝরে নির্ঝর কলভাষে
অসীমের চির চরম শান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে।

প্রেমই আমাদের শিক্ষা দেয় যে এ জগতের সকলেই সমান—সকলই সুন্দর। এই প্রেমের বিকাশেই মনে হয়—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি!
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
*   *   *   *
জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান!

সকলেরই প্রাণ আছে—আমি যদি বিশ্বপ্রকৃতিকে ভালবাসি তাহা হইলে সেও ভালবাসিয়া আমাকে তাহার প্রাণের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়। বিশ্বপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার অন্তরের মধ্যে সাদরে লইয়া যাইয়া তাঁর চিরগোপন সঞ্চিত অনন্তসৌন্দর্য্য-রহস্যের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের গভীর ধ্যানদৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বের অপর কোনও সৌন্দর্য্য কোনও আনন্দ গোপন রহিল না। কবি আবেগ-ভরে গাহিয়া উঠিলেন—

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।

এই প্রেমের বিকাশ, তাহার নানামূর্ত্তি, নানা বৈচিত্র্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রকাশ পাইয়াছে।

আকাশ সিন্ধুমাঝে একঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে
জগত ঘূর্ণী জেগেছে
সেইখান হতে স্বর্ণ কমল
উঠেছে শূন্য পানে
সুন্দরী ওগো সুন্দরী
শতদল দলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি॥
...   .
নানা দিক হতে নানা দিন দেখি
পাই দেখিবারে ওই হাসি।

যাহা প্রেম তাহা প্রেম ছাড়া আর কিছুই নহে—এক প্রেমই নানা বিচিত্র সময়ে বিচিত্রভাবে প্রকাশ পায়।

আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জনতরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেম-গীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী মিলন-মেলায়
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

মানবীয় প্রেমে বা দেবতার প্রেমে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে তা নয়—মানুষই দেবতা এবং দেবতাই মানুষ। এ কথাটাই আর এক রকম ভাবে বলা হইয়াছে :—

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জ কাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি পরে
ধীরে পাত্র লয়েছে করে,
হেসে করিয়াছি পান চুম্বনভরা
সরস বিম্বাধরে।
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
মধুর আবেশ ভরে।

* * * * *

আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্র বসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয় তলে উষার রাগিনী
বাঁশিতে উঠেছে বাজি।
তব বামবাহু বেড়ি শঙ্খ বলয়
তরুণ ইন্দু-লেখা।
একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি'
প্রভাতে দিতেছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি'
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি—সমুখে উদিলে হেসে ;
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্মলবায় শান্ত-উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে।

যখন যে দিক হইতে এই স্বর্গসৌন্দর্য্যের আধারকে কবি দেখিয়াছেন তখনই সেই ভাবে তাঁহাকে নিজের কথা কবিতার ভাষায় জানাইয়াছেন। কিন্তু সকলের মূলেই সেই প্রেমে রহিয়াছে—যাহা ধ্রুব। যেটা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে—যাহা হইতেছে সৌন্দর্য্যের উপাসনা।

(৪)

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনার মধ্যে আমরা যে সুরের পরিচয় পাই তাহা হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যলীলার, বিশ্বকে নিজের জীবনের মধ্যে অনুভব করিবার একটি ব্যাকুলতা, যার মূল প্রধানতঃ শান্তির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে—এইটাই হইতেছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কাব্যজীবন।

পরজীবনে রবীন্দ্রনাথ যে একটা নূতন সুর অনুভব করিলেন, তাহা হইতেছে মহান্ মানব-মানসের সঙ্গে মিলন-ব্যাকুলতা। এই সময়ে তিনি যেন তাঁর আবাল্যের সঙ্গীকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন—বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার যে সংযোগ-বন্ধন ছিল তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে অথচ মানবপ্রকৃতির সঙ্গেও তাঁহার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে না। এই সময়ের কাব্যের মধ্যে সেই জন্য যে সুর বাজিয়া উঠিল তাহা হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সেই সুমধুর বন্ধনকে ফিরিয়া পাইবার জন্য একটা ক্রন্দন আর 'বিশ্ব-মানবের সঙ্গে একটি মিলন-ব্যাকুলতা। বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে যাইয়াই কবি বিশ্ব

প্রকৃতিকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। বাল্যের সেই "সুকুমার-আমি" কে ফিরিয়া পাইবার কথা সন্ধ্যা সঙ্গীতের "আমহারা" কবিতাতে ব্যক্ত হইয়াছে।

হায় হায়
জীবনের তরুণ বেলায়,
কে ছিলরে হৃদয় মাঝারে,
দুলিতরে অরুণ দোলায়!
* * *
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি,
সে আমার সুকুমার আমি!
* * *
প্রতিদিন বাড়িল আঁধার
পথ হল পঙ্কিল মলিন,
মুখে তার কথাটিও নাই,
দেহ তার হ'ল বলহীন।
অবশেষে একদিন, কেমনে, কোথায়, কবে
কিছুই যে জানি না গো হায়,
হারাইয়া গেল যে কোথায়!
* * *
হারায়েছি আমার আমারে,
আজ আমি ভ্রমি অন্ধকারে।
* * *
হৃদয়ে যে ছবি ছিল, ধূলায় মলিন হ'ল,
আর তাহা নাহি যায় চেনা!
ভুলে গেছি কি খেলা খেলিত,
ভুলে গেছি কি কথা বলিত!
যে গান গাহিত সদা, সুর তার মনে আছে,
কথা তার নাহি পড়ে মনে!
আশা হৃদয়ে লয়ে, উড়িত সে মেঘ চেয়ে
আর তাহা পড়ে না স্মরণে!
শুধু যবে হৃদিমাঝে চাই,
মনে পড়ে- কি ছিল—কি নাই!

রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের অবস্থা তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের একটী কবিতার সঙ্গে বেশ মিলিয়া যায়—

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে
জীবন বীণা ঠিক সুরে তাই বাজ্‌ছে নারে।

কিন্তু আবার এদিকে বিশ্বমানবের ক্ষেত্রে কবি নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতে যাইয়া যাহা পাইলেন তাহা কেবলই আঘাত আর দ্বন্দ্ব।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"যখন বয়স অল্প ছিল তখন নানা কারণে লোকালয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, তখন নিভৃতে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেই ছিল আমার একান্ত যোগ। এই যোগটী সহজেই শান্তিময়, কেন না ইহার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, বিরোধ নাই, মনের সঙ্গে মনের, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার সংঘাত নাই। এই অবস্থা ঠিক শিশু-কালেরই সত্য অবস্থা। তখন অন্তঃপুরের অন্তরালে শান্তি এবং মাধুর্য্যের দরকার। বাহিরের দরকার মাটির বুকের মধ্যে বীজটি পৃথিবীর আঁধার আড়ালে শান্তিতে রস শোষণ করা। ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র ছায়ার ঘাত প্রতিঘাত তখন তাহার জন্য নয়। তেমনি এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ধর্ম্ম-বোধের যে আভাস মিলে সে হইতেছে বৃহতের আস্বাদনে। এইখানে শিশু কেবল তাঁহাকেই দেখে যিনি কেবল শান্তং, তাঁহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠে যিনি কেবল সত্যং।

"বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজের প্রকৃতির মিলটা অনুভব করা সহজ কেন না সেদিক হইতে কোন চিত্ত আমাদের চিত্তকে কোথাও বাধা দেয় না। কিন্তু এই মিলটাতেই আমাদের তৃপ্তির সম্পূর্ণতা কখনই ঘটিতে পারে না। কেন না আমাদের চিত্ত আছে, সেও আপনার একটা বড় মিল চায়। এই মিলটা বিশ্বপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিশ্বমানবের ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেইখানেই আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া আপনার বড় আমির সঙ্গে আমরা মিলিতে চাই। সেই-খানে আমরা আমাদের বড় পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্ম্মের নেতাকে, পথের চালককে চাই। সেইখানে কেবল আমার ছোট আমিকে লইয়াই যখন চলি তখন মনুষ্যত্ব পীড়িত হয়; তখন মৃত্যু ভয় দেখায়, ক্ষতি বিমর্ষ করে, তখন বর্ত্তমান ভবিষ্যৎকে হনন করিতে থাকে, দুঃখ শোক এমন একান্ত হইয়া উঠে যে, তাহাকে অতিক্রম করে কোথাও সান্ত্বনা দেখিতে পাই না, তখন প্রাণপণে কেবলই

সঞ্চয় করি, ত্যাগ করিবার কোন অর্থ দেখি নে, ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষে মন জর্জ্জরিত হইয়া উঠে—তখন

শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি,
সরমের ডালি
নিশি দিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালী।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির বিশেষত্ব এই যে—

আমি যে সব নিতে চাইরে—
আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে।

"যো বৈভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখং অস্তি"—ভূমাও অল্পকে বাদ দিয়া নয়—যা ভূমা তাহা অল্প নয় কিন্তু অল্পকে লইয়াই ভূমা। রবীন্দ্রনাথ যে মুক্তি চাহিতেছেন সে মুক্তি বন্ধনকে অস্বীকার করে, এড়াইয়া যাইয়া নয়—তাঁহার শান্তি অশান্তির ভিতর দিয়া আসিবে, তাঁহার সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া আসিবে তাঁর জীবন মরণের দোসর।

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্র খানি ভাবি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিব আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

(ক্রমশঃ)

গীতা ও ভাগবত

সমালোচনা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী]

পুনরায় গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। যথা—

অপিবত মধুপুর্য্যা মার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি সপিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধুংশ্চ গোপান্।
কচিদপি সকথা নঃ কিঙ্করিণাং গৃণীতে
ভুজমগুরু সুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদানু॥

শ্রীভাগবতে ১০।৪৭।২১।

'গোপাঙ্গনাগণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন যে, হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র (গুরুকুল হইতে আগমন করিয়া) এক্ষণে মধুপুরীতে বাস করিতেছেন কি? তিনি এক্ষণে পিতা নন্দের গৃহ সকল, বন্ধুগণ ও গোপমণ্ডলকে স্মরণ করেন কি? কোন সময়েও কি কিঙ্করী আমাদিগের কথা স্মরণ করেন? কতদিনে তিনি সেই অগুরু সুগন্ধ বাহু আমাদিগের মস্তকে অর্পণ করিবেন?

এই শ্লোকে যে "আর্য্যপুত্র" শব্দ আছে তাহাতে শ্রীমজ্জীব গোস্বামীপাদ কহিয়াছেন—

"আর্য্যপুত্র ইতি রূঢ্যাবৃত্ত্যা আর্য্যস্য শ্রীগোপেন্দ্রস্য পুত্র ইতি তচ্ছব্দেন স এবস্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ অন্যস্তু লোক প্রতীতি মাত্রময়ঃ বাল্যমারভ্যাস্মত্রাস্মদীয় ভাবাভাবাদিতি, ব্যঞ্জিতং।

বৈষ্ণবতোষণী।

অস্যার্থ এইস্থলে 'আর্য্যপুত্র' এই রূঢ়িবৃত্তি দ্বারা আর্য্য শ্রীগোপেন্দ্রের পুত্র এই অর্থ হইল। এই শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই আমাদের বাস্তবিক স্বামী। অন্য যে পতি সকল তাহা লোকপ্রতীতি মাত্র; বাল্যকাল হইতে আমাদিগের অন্য কোথাও তাদৃশ ভাব হয় নাই ইহাও ব্যঞ্জিত হইল।

এই শ্লোকের টিকায় "আর্য্যপুত্র" শব্দে শ্রীবল্লভাচার্য্য মহাশয় ও কহিয়াছেন—

"আর্য্যস্য নন্দস্য বসুদেবস্য বা পুত্রঃ ভর্ত্তৃত্বে ন নাম গ্রহণং"

সুবোধিনী।

অর্থাৎ, আর্য্যনন্দ বা বসুদেবের পুত্র, স্বামী বলিয়া নাম গ্রহণ করেন নাই।

মুনীন্দ্র শুকদেব এইরূপে গোপাঙ্গনাগণের যে শ্রীকৃষ্ণ পতি তাহা অনেক স্থলে কহিয়াছেন। এই সকলের কার্য্য-কর্ত্রী যোগমায়া।

"যত্রচ সাক্ষাৎ যোগমায়া কৃষ্ণং বরিবস্যন্তী স্বাত্মনো গোপনীয় পূর্ণিমানাম্না তপস্যন্তী কৃচ্ছ্রবশ্যন্তী গত্যন্তর মপশ্যন্তী তাসামন্যত্র বিবাহং মৃষাভাববহমেব নির্ব্বাহয়ামাস সর্ব্বত্রানপে স্বপ্ন কল্পনায়ামপি প্রায়ত্তয়া প্রচারণাৎ। তথাতাসাং পত্যাভাসাঙ্গ সঙ্গমঞ্চ ভঙ্গমাসা দয়ামাস।"

গোপালচম্পূঃ উত্তর ভাগে ১ম পূরণে। অর্থাৎ যে স্থানে সাক্ষাৎ যোগমায়া কৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিয়া আপনাকে গোপন করিবার নিমিত্ত পূর্ণিমা নাম ধারণ পূর্ব্বক তপস্যা করিয়া কষ্টের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া গোপ কন্যাগণের অন্যত্র বিবাহ যে মিথ্যা ভাব ব্যঞ্জক তাহা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। মিথ্যা কার্য্যে যে তাদৃশ ব্যবহার হইতে পারেনা, তাহার দৃষ্টান্ত এই যেরূপ ঘোর নিদ্রাকালেও নিদ্রিত ব্যক্তি প্রায়ই অন্য গৃহে গমন করে এবং বৃষাদিতে আরোহণ করে; কিন্তু এই সমুদায় কিছুই সত্য নহে সেইরূপ মিথ্যা বিবাহেও পত্নীত্বের ব্যবহার হইতে পারে বটে, কিন্তু সঙ্গমাদি হইতে পারেনা। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের পতির আভাস মাত্র পতিগণের অঙ্গসংস্পর্শে ভঙ্গ দিয়াছেন। এ কথা শ্রীভাগবতেও শুকদেব কহিয়াছেন—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্দারান্ ব্রজৌকসঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।৩৭।

ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণ বিদ্বেষ করেন নাই, কারণ তাঁহার মায়াতে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন; তাঁহারা নিজপত্নীগণকে আপন আপন পার্শ্বস্থ বিবেচনা করিতেন।

যদিও গোপগণের ভূরি ভূরি পুণ্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্র বাসাদি সম্ভব হইয়াছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের উপভোগ্যা রমণীগণ তাঁহাদের ভোগ্যা হওয়া কদাচ সম্ভব-পর নহে। তজ্জন্যই কহিয়াছেন—

মায়া কল্পিত তাদৃক্ স্ত্রীশীলনেনানুসূয়িভিঃ।
নজাতুব্রজ দেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

উজ্জ্বল নীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

গোপগণ মনে করিতেন যে আমার পত্নী আমার নিকট শয়ন করিয়া আছে, অভিসারাদিকালে যোগমায়া কল্পিত তাদৃশী গোপমূর্ত্তি দেখিয়া গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিবিদ্বেষ করেন নাই। গোপীগণের পতিগণের সহিত সঙ্গম হয় নাই!

যেরূপ রাবণ মায়াসীতাকে হরণ করিয়াছিলেন কিন্তু রাম পত্নী জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে স্পর্শ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায় নবম পরিচ্ছেদে যথা—

ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য থাকুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া সীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

তথাহি কূর্ম্ম পুরাণ বচনং—

সীতয়া রাধিতো বহ্নিশ্ছায়া সীতামজীজনৎ।
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতাবহ্নিপুরং গতা॥
পরীক্ষা সময়ে বহ্নিংছায়া সীতাবিবেশ সা।
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ॥

অগ্নিদেব সীতা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মায়াসীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; রাবণ সেই মায়াসীতা হরণ করিয়াছিলেন এবং সীতা দেবী ও বহ্নিলোকে গমন করিয়াছিলেন। সীতার অগ্নি পরীক্ষাকালে মায়াসীতা বহ্নিতে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন, তখন অগ্নিদেব সীতাদেবীকে শ্রীরামের সমীপে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

পরকীয়া দুই প্রকার যথা কন্যকা ও পরোঢ়া।

কন্যকার লক্ষণ যথা—

অনূঢ়াঃ কন্যকাঃ প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ।
সখী কেলিষু বিস্রব্ধাঃ প্রায়োমুগ্ধা গুণান্বিতাঃ॥
তত্র দুর্গাব্রত পরাঃ কন্যা ধন্যাদয়ো মতাঃ।
হরিণা পূরিতাভীষ্টাস্তেন তাস্তস্য বল্লভাঃ॥
উজ্জ্বল নীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

যাঁহাদের বিবাহ হয় নাই লজ্জাশীলা ও পিতৃগৃহে অবস্থান করেন এবং যাঁহারা সখীর সহিত ক্রীড়া করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক তাঁহাদিগকে "কন্যা" কহে, কিন্তু তাঁহারা মুগ্ধার গুণে অন্বিতা। কন্যাগণের মধ্যে ধন্যা প্রভৃতি কতকগুলি ব্রজকুমারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিভাবে কাত্যায়নীর ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের ও অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া-ছিলেন, এইজন্য তাঁহাদিগকে ও "কৃষ্ণবল্লভা" কহা গিয়া থাকে। পরোঢ়া যথা—

গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদাসম্ভোগ লালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ॥

গোপগণ কর্ত্তৃক পাণিগ্রহণ হইলেও যাঁহাদিগের সর্ব্বদা হরির সহিত সম্ভোগ লালসা থাকে তাঁহাদিগকেই 'পরোঢ়া' কহা গিয়া থাকে। তাঁহারা হরির বল্লভা, তাঁহাদিগের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয় নাই।

এতাঃ সর্ব্বাতিশায়িন্যঃ শোভাসাদ্গুণ্যবৈভবৈঃ।
রমাদিভ্যোঽপ্যরুপ্রেম সৌন্দর্য্যভরভূষিতাঃ॥

এই পরোঢ়া সকল শোভা, সাদ্গুণ্য ও বৈভবদ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় শ্রেষ্ঠা এবং লক্ষ্মীদেবীর অপেক্ষাও তাঁহাদিগের প্রেম ও সৌন্দর্য্য পূর্ণতায় ভূষিতা ঐ পরোঢ়া তিন প্রকার যথা—

সাধন পরা, দেবী ও নিত্যপ্রিয়া।
সাধন পরা ও দ্বিবিধ যথা যৌথিকী ও অযৌথিকী।

যৌথিকীর লক্ষণ যথা—

যৌথিক্যস্তত্র সংভূয় গণশঃ সাধনে রতাঃ।
যাঁহারা আপনগণের সাহত সাধনপরা হন,
তাঁহারাই যৌথিকী।

যৌথিকীও দুই প্রকার যথা মুনি ও উপনিষদ্।

মুনির লক্ষণ যথা—

গোপালোপাসকা পূর্ব্বম প্রাপ্তাভীষ্ট সিদ্ধয়ঃ।
চিরাদ্রম দ্ধবরয়ো রাম সৌন্দর্য্য বীক্ষয়া॥
মনস্যুদ্রিক্তাভীষ্ট সিদ্ধি সম্পাদনে রতাং।
লব্ধভাবা ব্রজেগোপ্যা জাতাঃ পাদ্ম ইতীরিতম॥

পূর্ব্বে গোপালোপাসকগণ অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; চিরকালের পর শ্রীরামচন্দ্রের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের কৃষ্ণ বিষয়িনী এবং সীতাদেবীর সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া গোপী বিষয়িনী রতি উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল; তদনন্তর ঐ মুনিগণ অভীষ্টসিদ্ধির সম্পাদনে তৎপর হইয়া ভাব লাভ করিয়া ব্রজে গোপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন।

পুরা মহর্ষয় সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্টারামং হরিং তত্রভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তাভবার্ণবাৎ॥

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ২৭২ অধ্যায়ে (পুনামুদ্রিত)

পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসী মহর্ষি সকল শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া পরম রমণীয় হরিকে উপভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা গোপালদেবের উপাসনা করিতেন; তাঁহারা সকলে গোকুলে ব্রজরমণী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হরিকে কামভাবে প্রাপ্ত হইয়া ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইয়া-ছিলেন।

কথাপ্যন্যাখিল বৃহদ্বামনেরিতি বিশ্রুতিঃ।
সিদ্ধিং কাশ্চিদেবানাং রাসারম্ভে প্রপেদিরে।
ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তে প্রকটার্থানুসারিণঃ॥
উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

বৃহদ্বামন পুরাণে এইরূপ কথা লিখিত হইয়াছে যে কোন কোন গোপী রাসারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগের জন্য দেহ প্রাপ্ত হয়েন এবং কেহ কেহ বা পতিগণ কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভোগে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। কোন কোন ব্যক্তি প্রকটলীলানুসারে এইরূপ কহিয়া থাকেন।

উপনিষদ্গণের লক্ষণ যথা—

সমস্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোখিলাঃ।
গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্যমসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ॥
তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে।
বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদী প্রথা॥

যে সমস্ত উপনিষদ্ সর্ব্বতোভাবে সূক্ষ্মদর্শিণী তাঁহারা গোপীদিগের অসমোর্দ্ধ সৌভাগ্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যা করিয়া ব্রজে প্রেমবতী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুরাণে এবং উপনিষদে তাঁহারাই বল্লবী এইরূপ প্রথা বর্ণিত আছে।

উপনিষদ সকল যে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যা গোপী হইতে বাসনা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ যথা—

নিভৃত মরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ় যোগ যুজো হৃদি য —
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড বিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ॥

শ্রীভাগবতে ১০।৮৭।২৩

শ্রুতিগণ কহিয়াছিলেন হে প্রভো! প্রাণ মনঃ এবং ইন্দ্রিয়গণ সংযম করিয়া দৃঢ় যোগ যুক্ত হৃদয়ে মুনিগণ যে রূপ উপাসনা করেন, শত্রুগণ শত্রুভাবে স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে। সর্পদেহাকৃতি আপনার ভুজদণ্ডে গোপাঙ্গনাগণ অত্যন্ত আশক্তচিত্ত হইয়া আপনার স্পর্শ মাধুর্য্য হৃদয়ে ভজন করেন। আমরা শ্রুত্যভিমানী দেবতা তাহাতে অযোগ্য হইলেও নন্দ ব্রজে গোপীদের প্রাপ্ত হইয়া কায়ব্যূহদ্বারা তাঁহাদের সদৃশা হইয়া তাঁহাদের ভাবের অনুগত ভাব প্রাপ্ত করিয়া তোমার স্পর্শ-মাধুর্য্য অনুভব করিব।

অযৌপিকীর লক্ষণ যথা—

তদ্ভাব বদ্ধ রাগী যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ।
তদ্যোগ্য মনুরাগৌঘং প্রাপ্যোৎ কণ্ঠানুসারতঃ॥
তা একশোঽথবা দ্বিত্রাঃ কালে কালে ব্রজেঽভবন্।
প্রাচীনশ্চ নবাশ্চ স্যুরযৌপিকা স্ততোদ্বিধা॥
নিত্যপ্রিয়াভিঃ সালোক্যং প্রাচীনাশ্চিরমাগতাঃ।
ব্রজেজাতা নবাস্তেতা মর্ত্ত্যা মর্ত্ত্যাদি যোনিতঃ॥

উজ্জ্বলনীলমনৌ কৃষ্ণ বল্লভা প্রকরণে।

যাঁহারা গোপীভাবের প্রতি অনুরাগী হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং যাঁহাদিগের উৎকণ্ঠাবশতঃ তাহার উপযুক্ত রাগানুগীয় ভজনোৎকৃষ্ট হেতু গোপীভাব সিদ্ধ হয় তাঁহারাই অযৌপিকী এবং তাঁহারাই সময়ে সময়ে এক কিম্বা দুই কিম্বা তিন তিন করিয়া ব্রজমধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

অযৌপিকী দুই প্রকার প্রাচীনা ও নবীনা, তন্মধ্যে প্রাচীনা অযৌপিকী সুদীর্ঘকালে নিত্যপ্রিয়াদিগের সহিত সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং নবীনাগণ দেব, মনুষ্য এবং গন্ধর্ব্বাদি জন্মের পর ব্রজে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

দেবীগণের লক্ষণ যথা—

দেবেষ্বংশেন জাতস্য কৃষ্ণস্য দিবি তুষ্টয়ে।
নিত্য প্রিয়ানামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ॥
তত্র দেবাবতরণে জনিত্বা গোপকন্যকাঃ।
তা অংশীনীনামেবাসাং প্রাণসখ্যোঽভবনব্রজে॥

উজ্জ্বলনীলমনৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ অংশের বা বলদেবের সহিত দেবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সন্তোষের জন্য নিত্যপ্রিয়াগণের অংশ সকলও দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারাই নিত্যপ্রিয়াবর্গের প্রাণসখী।

দেবীগণ যে ব্রজে গোপাঙ্গনাগণ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ, যথা—

বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতেতৎ প্রিয়ার্থং সম্ভবন্তমর স্ত্রিয়ঃ

শ্রীভাগবতে ১০।১।২৩

পরম পুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান বসুদেবগৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সন্তোষবিধানার্থ অমর কামিনীগণ জন্মগ্রহণ করিবেন।

নিত্যপ্রিয়া যথা—

রাধা চন্দ্রাবলী মুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্য সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়াঃ॥

উজ্জ্বলনীলমণৌ কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

বৃন্দাবন মধ্যে শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ নিত্য-প্রিয়া, ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণ তুল্য নিত্য সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়া।

গোপাঙ্গনাগণ লক্ষ্মীস্বরূপা এবং শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষ ছিলেন। যাহা হউক এ ব্রজলীলারস অনুভবের বস্তু, যাঁহার কাম জয় না হইয়াছে তিনি যেন এ বিষয় আলোচনা না করেন। তজ্জন্য নিষেধ ও করিয়াছেন—

ইদং বৃন্দাবনে সৎ তু রহস্যং মম বৈশুভম্।
ন প্রকাশ্যং কদাকুত্র বক্তব্যং ন পশৌ কচিৎ॥

পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডে ৭৫ অধ্যায়ে।

(সমাপ্ত)

লক্ষ্মী—ছাড়া

[কাজি নজরুল ইস্‌লাম]

আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন।
শেষে সেই আমারে কাঁদায় যারে করি আপনারি জন!
দূর হতে মোর গানের সুরে
পথিক-বালার নয়ন ঝুরে,
ও তার ব্যথায়-ভরাট ভালবাসায় হৃদয়পুরে গো!
তারে যেমনি টানি পরাণ-পুটে
অমনি সে হায় বিষিয়ে উঠে!
তখন হারিয়ে তারে কেঁদে ফিরি সঙ্গীহারা পথটী আবার নিজন॥

মুগ্ধা ওদের নেই কোনো দোষ আমিই ওগো ধরা দিয়ে মরি,
প্রেম-পিয়াসী স্নেহের-ভুখা শাশ্বত যে আমিই তৃপ্তি হারা,
ঘর-বাসীদের প্রাণ যে কাঁদে পরবাসীদের পথের ব্যথা স্মরি',
তাইত তারা এই উপোসীর ওষ্ঠে ধরে' ক্ষীরের থালা, শান্তি বারি ধারা!
ঘরকে পথের বহ্নি-ঘাতে
দগ্ধ করি আমার সাথে,
লক্ষ্মী ঘরের পলায় উড়ে' এই সে শনি'র দৃষ্টি পাতে গো!
জানি আমি লক্ষ্মী-ছাড়া
বারণ আমার উঠান মাড়া,
আমি তবু কেন সজল-চোখে ঘরের পানে চাই?
হায় পরকে কেন আপন করে' বেদন পাওয়া, পথেই যাহার কাট্‌বে জীবন বিজন,
আর কেউ হবেনা আপন যখন, সব হারিয়ে চল্‌তে হবে পথটি আমার নিজন!
আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন!

স্বদেশ

(উপন্যাস)

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সে বৎসর ভাদ্রের আরম্ভেই বর্ষার অবসান হইয়াছিল। অসময়ে আকাশের সুনীল-কান্তি, বাতাসের উচ্ছল চলচাঞ্চল্য, এবং ধরণীর শিশির-স্নিগ্ধ অপরিমেয় সৌন্দর্য্য-সম্ভার কৃষকের সরল প্রাণে বিমল আনন্দ বহন করিয়া আনে নাই। মাঠে ধানের চারাগুলি শুকাইবার উপক্রম করিতেছিল, তাই ঘরে ঘরে নৈরাশ্য!

বৃদ্ধ হরদয়াল, সেদিন তাহার ক্ষেত্রের একপ্রান্তে আলের উপর বসিয়াছিল; পাকা গোঁফজোড়া শুক্‌নো গালের উপর দিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কোটরগত চক্ষু দুটির উপর শুভ্র ভ্রূগুচ্ছ পড়িয়া বৃদ্ধের দূর-দৃষ্টিকে অস্পষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সংসরের একমাত্র অবলম্বন ধানের লঘু পীতবর্ণ তাহার চক্ষের সমস্ত সরসতাকে যেন নিমেষে বাষ্প করিয়া দিতে ছিল।

তখনো সূর্য্যাস্ত হয় নাই। পশ্চিমের খণ্ড মেঘের উপর একটির পর একটি করিয়া রং ফুটিয়া উঠিতে ছিল। সন্ধ্যাকাশে আলো এবং রঙের অপূর্ব্ব বিন্যাস পৃথিবীকে উৎসবময়ী করিয়া তুলিয়াছিল।

এই সময়ে সেখানে ছবি আঁকিবার সাজ-সরঞ্জাম লইয়া জমিদার অবনীমোহন বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরদয়াল সভয়ে, ভক্তি এবং সম্ভ্রম সহকারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহাকে প্রণিপাত করিল।

জমিদার বাবু মৃদু এবং গম্ভীর হাস্য করিয়া বলিলেন, কি গো মোড়ল যে, কি হচ্ছে এখানে বসে বসে?

হরদয়ালও একটু হাসিল; কিন্তু তাহার কোন উত্তর যোগাইল না। সে নিজেই জানিত না—কেন সেখানে আসিয়া বসিয়াছিল, এবং বসিয়াই বা কি করিতেছিল।

ইতিমধ্যে অবনীমোহন পকেট হইতে সিগারেটের বাক্স বাহির করিয়া—আকাশকে ধূমাঙ্কিত এবং বাতাসকে গন্ধামোদিত করিয়া তুলিয়া—মনে মনে খুসী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

তাঁহার ভৃত্য রজতচন্দ্র তে-ঠেঙ্গার উপর অর্দ্ধ অঙ্কিত ছবিখানি খাড়া করিয়া, ছোট তে-পায়াটির উপর রঙের বাক্স এবং তুলিগুলি পরে পরে সাজাইয়া রাখিতেছিল।

জমিদার-প্রভু এবার ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নে-নে বেটা শীগ্‌গির ক'রে নে' দেখ্‌চিস্‌নে হতভাগা আলো যে যায় যায় করচে—শেষকালে তোর জন্যেই এতটা ছুটে আসা বুঝি পণ্ডশ্রম হবে।

রজত নেপথ্যে একটু বক্র হাস্য করিল। প্রভুর ক্রোধ গর্জ্জন তাহার ভালই লাগিত, কারণ যদিও তাহাতে চড় চাপড়ের কঠোর সম্ভাবনা ছিল—কিন্তু তাহার পরিণাম বক্‌সিসের কমনীয়তায় চিরদিনই রমণীয় হইয়া উঠিত!

হরদয়ালের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, কেমন বুঝছ হে, এবার ফসলের অবস্থা-টবস্থা?

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল,—মোটেই ভাল নয় বাবু।

কেন?

সমস্ত ভাদ্দর মাসে এক ফোঁটা বিষ্টি নেই। হরদয়াল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিল,—আগেই চাষারা কতক কতক জান্‌তে পেরেছিল। শাওনে পূবে বইলে—চাষের একদম সব্বনাশ।

অবনীমোহন এতক্ষণে তুলি লইয়া আকাশের রংএর সহিত বাক্সের রংএর মিল খুঁজিতে খুঁজিতে অন্যমনস্ক ভাবে

বলিলেন—বটে, তাই বুঝি? আরো অন্যমন হইয়া বলিলেন,—তারপর মোড়ল, তারপর?

হরদয়াল তারপরের অনুসন্ধানে মাঠের প্রান্তে চক্ষু ফিরাইয়া আনিয়া বলিল, আর ঐ দেখুন না কি কুলক্ষণ—

কৈ—কি?

ঐ সূয্যি ডুবতে না ডুবতে—কুয়াশা—

কিছুক্ষণ কুয়াশার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অবনীমোহন বলিলেন;

হুঁ।

তাহাতে তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতাই প্রকাশ পাইল।

হরদয়াল অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া চুপ করিল। কিন্তু জমিদার আবার বলিলেন,—তারপর—তারপর—মোড়ল, তারপর?

হরদয়ালের মন তারপরের সন্ধানে বাহির হইল। এই এক প্রহরের মধ্যেই ধান শিশিরে ভিজে যাবে।

যাবে নাকি? তাতে কি হয়?

হরদয়াল কিছু উত্তর দিল না দেখিয়া জমিদার বলিলেন —হাঁ মোড়ল,—তাতে কি হয়?

মোড়ল মনে মনে ক্রমেই তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল—চাষার এই জীবন মরণের কাহিনীর প্রতি লঘুতা—তাহার যে প্রাণান্তকর! কিন্তু, উত্তর দিতেই হইবে।

তাতে বোঝা যায় যে চাষার কপাল পুড়েছে। এবার আর জল হবার কোন আশা নেই।

তুলি ছাড়িয়া জমিদার আবার সিগারেট ধরিলেন এবং মুখবিবর হইতে বিপুল ধূমকুণ্ডলি বাহির করিয়া—উপহাস ভরে বলিলেন, এবার কেন, ফি-বার। এমন কোন বারই ত শুনলুম না যে ফসল ভাল হলো—হয় অতি-বৃষ্টি, নয় অনাবৃষ্টি—তোমাদের, একটা না একটা, নাকে কাঁদুনি লেগেই আছে।

বৃদ্ধের চীৎকার করিয়া, মাথার চুল ছিঁড়িয়া কাঁদিবার ইচ্ছা হইল। জমিদার কি বলিতে চায়! চাষারা চক্রান্ত করিয়া বৎসরের পর বৎসর দেশে অজন্মা আনে! তাহারা ইচ্ছা করিয়া এই অস্থিচর্ম্মসার করাল মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে? তাহার বড় ইচ্ছা করিল একবার আকাশ ফাটাইয়া এই কথা গুলি শুনাইয়া বলে; কিন্তু হরদয়ালের বয়স হইয়াছিল —তাহার অভিজ্ঞতা তাহার কর্ণকুহরে চুপি চুপি বলিল, সাবধান রে, ভাই সাবধান, উচিত কথার দাম ক'জন দিতে পারে!

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অবনীমোহন বলিল, কি মোড়ল, কোথায় চল্লে?—যা বল্‌চি, সত্যি নয় কি?

হরদয়াল একটু হাসিল; কিন্তু তাহার চক্ষের ভিতর হইতে একটা উগ্র দীপ্তি বাহির হইতেছিল যাহা জমিদারকে পরিষ্কার বলিয়া দিল, যে, দরিদ্র হওয়া মানুষের পক্ষে পাপ নয়। দরিদ্রের অন্তরে যে বহ্নি সঞ্চিত আছে তাহা তাহার মত শত শত ধনীকে নিমেষে দগ্ধ করিয়া দিতে পারে।

লাঠিটা মাটি হইতে তুলিয়া লইতে লইতে বৃদ্ধ বলিল, বাবু আমরা গরীব চাষা, সত্যি মিথ্যে কি জানি? শুধু এই টুকু জানি যে গরীবের প্রাণ বড় কড়া; যখন টাকায় ষোল সের করিয়া চাল ছিল তখনো আমরা কষ্টেই বেঁচে ছিলাম,—আর আজ আড়াই সের, তিন সেরেও বেঁচে আছি—যে কষ্ট সেই কষ্টই আছে। ধান না হলেও আমরা বাঁচব—নইলে আপনাদের জমি চষবে কে বাবু? আপনাদের চলবে কি করে?—আমরা যে আপনাদের জুতোর শুকতলা

বৃদ্ধ যাহা বলিল তাহা অবনীমোহনের অন্তরের মধ্যে সোজা প্রবেশ করিল; সে বুঝিল অত্যাচারক্লিষ্ট চাষার মধ্যে এখনো আসল মানুষটি মরিয়া যায় নাই এবং অত্যাচারীর নির্দ্দয় বিদ্রূপের আঘাতে এখনো সাড়া দিবার ক্ষমতা তাহার আছে।

অবনীমোহন এবার দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিলেন, তাইত মোড়ল, নদীর জলও ভয়ানক কমে গেছে—হঠাৎ এত কমে গেল কেন?

হরদয়াল একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, আকাশে জল নেই, নদীতে জল আস্‌বে কোথেকে বাবু।

জমিদার বলিলেন, তা' আমি জানি—তবুও এত কম হয়ে যাবে না ত!

বৃদ্ধ একটু কুণ্ঠার সহিত বলিল, সে কথা ঠিকই বলচেন কর্ত্তা—তাহার পর সে ম্লান হাসি হাসিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল।

ব্যাপার কি ?

আজ্ঞে কৈলেস্ পুরের জমিদার বাবু—নদীর জল উপরেই বেঁধে থুয়েছেন, এ বছরে।

কে ?—তিনকড়ে ?

হরদয়াল চুপ করিয়া রহিল। অবনীমোহন অস্ফুটে কতকগুলা কথা উচ্চারণ করিয়া বলিলেন,—এ কথা আমার কাছারিতে গিয়ে বলনি কেন ?

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিল না। অবনীমোহন রাগে ফুলিতে লাগিলেন। তিনকড়ির সঙ্গে অবনীমোহনের বন্ধুত্বই ছিল—কারণ স্কুলে অনেক দিন এক সঙ্গেই পড়িয়াছিলেন। তিনকড়ি স্কুলের গণ্ডি পার হইতে পারেন নাই—সেই সময় হইতেই ছাড়া-ছাড়ি।

বৃদ্ধ জানিত যে পুরুষানুক্রমে এই দুই জমিদার বংশের মধ্যে লড়াই ঝগড়া চলিয়া আসিয়াছে এবং ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কারণে তাহা আবার জ্বলিয়া উঠিতে পারে। অশান্তিকে কেমন একটা ভয় করা তাহার প্রকৃতির মধ্যে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবনীমোহন বলিলেন, মোড়ল এক কাজ করা যাক এস—কাল সকালে দুজনে মিলে কৈলাসপুর যাই। গিয়ে আমি তিনকড়িকে জিজ্ঞেস করব যে কি অধিকারে সে নদীর জল বেঁধে—আমাদের এমন ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। আমি ত' নিজে সব কথা জানিনে, তাই তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিতে চাই।

বৃদ্ধ কতকটা গম্ভীর হইয়া বলিল, আপনার হুকুম যখন তখন যাবো—কিন্তু বাবু বিশেষ কি কোন ফল হবে ? বিনা মামলায় কৈলেসপুরের জমিদার-বংশ—এক ছুঁচ ভূঁইও কাউকে দেবে না।

তা আমি জানিনে তা নয় ; তবুও আমি নিজের কাছে পরিষ্কার থাকতে চাই। শেষকালে এমন আপশোষ যেন একদিন না করতে হয় যে মিছিমিছি—একটা খুনখারাবি ক'রে বসলাম।

হরদয়াল আর কথা কহিল না। ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর রজত চীৎকার করিয়া বলিল,—মোড়ল কাল সকালেই এসো।

সে ইঙ্গিতে জানাইল যে নিশ্চয় আসিবে।

জমিদার বাবু মনোযোগ সহকারে—শিশ্ দিতে দিতে ছবি আঁকিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার মনটি সেই অবসরে তর্ক-বিতর্ক হইতে নিবৃত্ত ছিল না।

প্রথম তিনি তিনকড়িকে লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন, অনেক প্রিয়-সম্ভাষণ যথা—শূয়োর, র‍্যাস্কেল, ষ্টুপিড্, গাধা ইত্যাদি বলিয়া বলিলেন, চিরটাকালই কি এক রয়ে গেল !—স্বার্থপরের ধাড়ি ! তুই নিজের সুবিধে টুকুই দেখলি ? নদীর জল কি তোর মৌরসি, ডেভিল্ ?

মানুষের মন একটি অদ্ভুত জিনিষ—তাহা একদিক দেখিয়া নিরস্ত থাকে না। অপর দিকের কথাও কেমন আপনা আপনি দৃষ্টিপথে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে—বিশেষ করিয়া যদি অপর পক্ষে ওকালতি করিবার কেহ না থাকে। যে কোন উপায়ে মন একটা ন্যায় বিচারে আসিয়া উপস্থিত হইতে চাহে !

তাই অবনীমোহন ভাবিলেন, আচ্ছা ধরে নেও যে তিনকড়ে জলটা নাই ধরলে, তাতে চাষার কি সুবিধে হতো। ক্ষেত গুলো উঁচু—জলটা নীচে—অগত্যা তাকে ক্ষেতের লেভেলে তুলতে হলে বাঁধতে হয়ই। সব চাষা কিন্তু তা পারে না—তাই জমিদার—তিনকড়ি,—চাষার ভালোর জন্যে নদীটা বেঁধে দিয়েছে। সে জলটা কেবল বয়েই চলে যেত, যাতে আর কারুর কোন উপকার হতো না—সেটাকে সে কতকগুলো লোকের উপকারে লাগিয়েছে। এতে তার কি এতবড় দোষ হোল, শুনি ?

তাইত ! তিনকড়ি ত' বিশেষ কোন অন্যায় করেনি। উপরন্তু এই বলা যায় যে সে পরের উপকার করেছে।

অপর পক্ষের আবার সহ্য হইল না। সে তাড়া দিয়া বলিল,—তা বেশই জানা আছে যে তিনকড়ে নিছক পরের উপকার করতে—তার প্রজাবর্গকে একটা সাহায্য করেনি—অতটা বোকা আমরা নই হে! শেষ পর্য্যন্ত সে কি করবে জান ?

কি ?

ওটা নিজের খাজনা কায়েম রাখবার একটা উপায়। মনে কর ফসল হল না—প্রজারা এখন খাজনাটা দেয়

কোত্থেকে? আর এ? যা হবে, অমনি সটান্ চলে যাবে জমিদারের পেটে। জমিদারের পথে বাঁধটা বেঁধে দেবার খরচাটা কর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়—এদিকে তার বদলায় যা পাওয়া যাচ্ছে—তা' অন্য কোন জমিদার আর এ বচ্ছরে পাবে? তার ওপর হয়ত সেই সময়ে বাঁধ বাঁধার খরচটাও আদায় করে নেওয়া হবে।

এইরূপ আলোচনার পর অবনীমোহন আনন্দ না পাইয়া দুঃখই বোধ করিলেন। মানুষের অনুমানের মধ্যে আপনার ছবির প্রতিবিম্ব যে অনেকখানি পড়ে সে বোধ এই শিক্ষিত জমিদারটির ছিল। মানুষ মানুষকে বিচার করে। কিন্তু সেই বিচারের মধ্যে অবিচার যে কতখানি স্থান জুড়িয়া বসে—তাহা আমরা জানি না!

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছিল। ছুপি আঁকা ছাড়িয়া অবনীমোহন গৃহাভিমুখে চলিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখা গেল যে হরদয়াল চুপটি করিয়া পথের ধারে বসিয়া আছে। অবনীমোহন খানিকটা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মোড়ল, এখেনে যে বসে আছ আবার!

বৃদ্ধ বিনয় সূচক হাস্য করিয়া বলিল, এখেনটায় বড় ভয়; কর্ত্তা যাবেন, সে সময় থাকা ভালো।

কিসের ভয়হে?—অবনীমোহন হাসিতে হাসিতে বলিলেন।

এজ্ঞে, লতার। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে তাই সর্পের নাম চাষারা উচ্চারণ করে না। লতার অপভ্রংশ নতা।

কি নতা হে?

এজ্ঞে পরে বলচি—আপুনি আগে যান।

হরদয়াল বিশেষ ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাই অবনীমোহন প্রায় দ্রুত পদেই সেই স্থানটি অতিক্রম করিলেন।

আগে আসিয়া বাবু বলিলেন,—আচ্ছা মোড়ল, তুমিত ছিলে বেশ নিশ্চিন্তে চুপটি করে বসে—তোমার কি প্রাণের ভয় নেই?

আমার? এজ্ঞে আমি যে মন্তর জানি, আমার কাছে ঘেঁসে,—জো কি?

অবনীমোহন যে মন্ত্রে তন্ত্রে বিশ্বাস করিতেন না তাহা বলা বাহুল্য; তাই তিনি খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিলেন,—মন্তর কোত্থেকে শিখেছিলে মোড়ল?

আমার দাদামশাইয়ের কাছ থেকে।

বটে! এ মন্তরে কি করতে পার!

অবিশ্বাসীর কাছে কোন কথাই মন খুলিয়া বলা যায় না। তাই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে—আমাদের কৃষককুল এমন নির্ব্বাক। এই শিক্ষার অভিমান জন্তু-জানোয়ারের শৃঙ্গের মত এমনি উদ্যত হইয়া থাকে—যে নিরীহ লোক তাহার নিকটে পর্য্যন্ত যাইতে সাহস করে না।

বাবু যে পরিহাস করিতে ছিলেন হরদয়াল তাহা অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছিল। তাই কোন কথার উত্তর না দিয়া সে আগাইয়া চলিয়াছিল।

রজত কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল। সে ভীষণ চীৎকার করিয়া উঠিলে, পিছন ফিরিয়া অবনীমোহন দেখিলেন যে রজত উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিতেছে এবং তাহার পশ্চাৎ একটা কেউটে সাপ গর্জ্জন করিতে করিতে ছুটিয়াছে।

জমিদার বাবু নিমেষে চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন।

বৃদ্ধ কিন্তু একটুও ব্যস্ত হইল না। লাঠি দিয়া একটা চক্র আঁকিয়া বলিল, বাবু আপনি এর বাইরে যাবেন না। কিছু ভয় নেই।

বৃত্তের রেখার উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হরদয়াল সর্পের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, অবনীমোহন তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তালবৃন্তের মত কাঁপিতে লাগিলেন।

রজত সেই দিকেই ছুটিয়া আসিতেছিল। সেও আসিয়া হরদয়ালের পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

প্রকাণ্ড সাপটা বৃদ্ধের বীরমূর্ত্তি দেখিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। হরদয়াল ইত্যবসরে শিশ্ দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সাপটা ফণা আরো বিস্তৃত করিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণে ও বামে দুলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে—হরদয়াল মাটি হইতে ধুলা লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বলিল, যা, যা, ঘরে যা, লোক হিংসে ভাল নয়।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত অবনীমোহন দেখিলেন যে সেই

ভীষণ সাপটি ফণা কুঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে যে পথে আসিয়াছিল সেই দিকে চলিয়া গেল।

রজত জোড় জোড় মাঠেই ফেলিয়া আসিয়াছিল দুইজনে তাহা আনিতে গেল।

নিস্তব্ধতার মধ্যে অবনীমোহনের মনে একটি কথা বারম্বার আঘাত দিয়া বলিতে লাগিল, এ কি? মানুষের বুদ্ধির গোচরে সংসার যৎসামান্যই ধরা দেয়। সেইটুকুকে আমরা বৃহৎ বলিয়া অহঙ্কার করি। তাহার বাহিরে যে জগৎটি আছে তাহা বিরাট এবং অনন্ত; তাহা মানুষের বুদ্ধির যে বহু উর্দ্ধে!

(ক্রমশঃ)

মাসিক-কাব্য-সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

অর্চ্চনা জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের "প্রেম ও মায়া" নামক কবিতায় প্রেমের বড় অভাব মায়াটাই ঘোরালো হয়ে অঘটনঘটন ক'রে তুলেছে।

'প্রাণপ্রতিষ্ঠা'। কবি কুমুদরঞ্জনের কবিতা। কুমুদের স্বভাবসিদ্ধ মকরন্দ কবিতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছে। ভাষাটা একটু গদ্যাত্মক হয়ে পড়েছে আর শেষটায় চোখের জলে কবিতার মকরন্দ একটু ধুয়ে গেছে।

নবীন কবির কবিতাকুঞ্জে—হেমেন্দ্রনাথ চাকদার নববর্ষের আবাহনে বলেছেন—"এস মন্দবাতাসে ধান্যের শীষে নর্ত্তন তালে তালে।" ধান্যের শীষ দেখে বলতে ইচ্ছা হয় এ নববর্ষ কি "ইংরাজী নববর্ষ?" 'সন্ধ্যারাণীর আবাহনে' কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'আঁধার আলোর ঝালর কাটা ওড়না খানি গায়, কে তুমি গো মৌনমুখী আলতা পরা পায়?" এই সব ঝালর কাটা ওড়না ইত্যাদির উৎপাতের জন্য সত্যেনবাবুকে আমরা দায়ী করি। "বাতাস রথ" কি Aeroplane.

ভারতবর্ষ। জ্যৈষ্ঠ। জপ। শ্রীকালীদাস রায়। সঙ্গীত। শেষের গান। শ্রীকুমুদরঞ্জন। শেষের গান ভাল জমে নাই।

মুছবে এখন রাত্রিদিনে
আলপনার ওই সকল চিনে

এদুটী পঙক্তির ভাবটি বেশ কিন্তু রচনা সুন্দর হয় নাই। "সকল চিহ্ন" কে 'সকল চিনে' করতে হয়েছে। দীপালী, সেফালির, সহিত 'কেবলি' মিলটাও ভাল হয় নাই "রোয়ন্ত কনম"—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক—মৈথিলী কবির অনুকরণে মৈথিলীমিশ্র বাংলায় রচিত। ভাষা বেশ সুললিত হইয়াছে কিন্তু হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই।

শিক্ষক। শ্রীকুমুদরঞ্জন। দরিদ্র শিক্ষকগণের পক্ষ হইতে জননায়কগণের নিকট কাতর আবেদন। কবিতাটি কুমুদরঞ্জনের লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই। কুমুদরঞ্জনের অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাগুলি যেমন সুন্দর হয় ভারতবর্ষে প্রকাশিত কবিতাগুলি তেমন সুন্দর হয়না ইহার কারণ কি? "অভাবের পেষণেতে এই 'তে' পরিহর্ত্তব্য; "জীর্ণ সে তনুথান" 'তনুথান' সুষ্ঠু নহে। "ভক্ত সে শক্ত" শিক্ষক অপেক্ষাও দীনার্থ। "মাথা নত করেনা সে, দেয় তার রক্ত" দুইটি বাক্যে পৌর্ব্বাপর্য্য সামঞ্জস্য নাই। "রক্ষ হে লক্ষ এ ভিক্ষুক শিক্ষক" 'ক্ষ' এর অনুপ্রাস মাধুর্য্য বাড়াচ্ছেনা বরং কেশোরোগী শিক্ষকের গলার খক্ খকের মত শোনাচ্ছে।

"ভরে যাবে ঘরদ্বার তার বিষবাষ্পে"

তারপরই—

"জেনো তারি ক্ষীণ ডাকে ভগবান আস্বে"

ভাল শোনাচ্ছে না। এ ছাড়া কবিতাটিতে ছাপার ভুলও ২৷১টি আছে। "অভয়ের কথা কয় খাসরোধ কণ্ঠে" এ পংক্তিতে কি অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে,

অতিথি। শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। কবিতাটির অর্থ বোধগম্য হলোনা। "আকুল উদাস আনন্দ ব্যথা" কি ?

"তবক্ষণিকের মায়ায় রঙীন
দরশন আজ আনিল যে দিন
তাহারি পরশে সাজিল নবীন
ধরনীর সবখান।"

ক্ষণিকের মায়ায় রঙীন দরশন যে দিন আনিল তাহার পরশে ধরনীর সবখান নবীন সাজিল,—এইত বক্তব্য ? কিন্তু এর তাৎপর্য্য কি ?

'পবন পুলক ব্যথা চঞ্চল' হইলে কিরূপ দাঁড়ায় তাহার অনুভূতি আমাদের নাই। আগাগোড়াই এইরূপ কাজেই বোঝা সোজা নহে।

প্রবাসী। জ্যৈষ্ঠ। শ্রীমান্ রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর 'ব্যর্থ' কবিতাটি ব্যর্থই হইয়াছে। "পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজ যে বুকের 'রাঙা ব্যথা' বয়ে আনছে রবি যদি তাহা বুঝতে না পারে তা'হলে পঙ্কজের পঙ্কে থাকাই ভাল ছিল" এই কথাটা বল্‌তে গিয়ে রাধাচরণ বাবু কিরূপ গলদঘর্ম্ম হয়েছেন 'নিম্নের ক' লাইন পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন—

"পঙ্কপ্রাচীর পেরিয়ে কমল
আনছে 'বয়ে' তিথার দলে
অনুরাগের যে বাণী রূপ রাগের-ছলে
রবি যদি সে (?) তার ব্যথা
সে (?) তার বুকের রাঙাব্যথা
বুঝতেনারে—মেঘের আড়ে
লুকিয়ে শুধুই রয় বিরলে
ছিল যে তার থাকাই ভালো পঙ্কতলে।"

এইত গেল কবিতার অর্দ্ধেক—বাকী অর্দ্ধেক তা' হতেও খারাপ কারণ বাকীটাতে নূতন কথাও নাই নূতন ভঙ্গিও নাই—প্রথম অর্দ্ধেকের উপর দাগা বুলানো "গোলাপযদি রক্তমাখা রাঙাপ্রাণ নিয়ে 'দেউলদোরে' আসে আর দেবতা হেলায় 'ঠ্যালে' তা'হলে গোলাপের মরণই ভাল।"

জীবনলীলা। শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়। "অনন্তেরি ইচ্ছা ধারা" "বিপরীতের উৎসধারা 'উৎসবেরি মুখে" "মরণমুখর জীবন বেগা" "মিলনভারে ক্লান্তবায়ু" "অকস্মাতের আবির্ভাব" "অনিয়মনের ব্যগ্রবল" ইত্যাদি বাছা বাছা বাগ্‌বিন্যাসে কবিতাটিকে ঘোরালো করবার চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু এই "জীবনলীলা" কবিতাটিতে জীবনও নাই লীলাও নাই—ছন্দেরও আগাগোড়া সামঞ্জস্য নাই।

আমাদের মনে হয় বলবারো বিশেষ কিছু ছিল না। ছন্দ মিলাতে মিলাতে একটা কবিতাতে (!) দাঁড়াইয়াছে।

নিষ্ক্রমণ। শ্রীকুমুদরঞ্জন। মন্দ হয় নাই। ১ম শ্লোকটি সুন্দরই হইয়াছে।

বলেন কবি 'ওরে আমার গীত
ওরে আমার বিজন ঘরের ধুপ,
নিস্‌নে খবর, দেখছি যে তোর জিৎ
ছড়াস সুধা, নিংড়ে নিয়ে দুখ।'

এ ক'পংক্তি প্রকাশ দৈন্যের উদাহরণ।

দুঃখীবীর। শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত। প্যারীবাবুর এই ধানাই পানাই প্রবাসীতে ছাপবার যোগ্য নহে। কবিতার ৩।৪ লাইন নমুনা দেই—

অর্থ নিয়ে আরাম নিয়ে
যে সুখ পাওয়া—দুখ যে কি
রিক্ত হ'য়ে প্রবল জাগা—
আনন্দ সে দুখ কি ?
* * * *
ধাক্কা খেনু, ভাঙিনিত
ভেঙেছিযে লক্ষ দুখ
তাইত আজি দাঁড়িয়ে আছি
জয় আর সুখে পূর্ণ বুক।"

ধানাই পানাই আর কাকে বলে ?

প্রোষিত ভর্ত্তৃকা। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কবিতার নামটি সংস্কৃত হলেও বিষয়টি নেহাৎ গ্রাম্য—বিরহিণী কিষাণ বধূর কথা। ফাগুনসাঁজের পল্লীদীঘির চিত্রটি সুন্দর হয়েছে—নারীহৃদয়ের ব্যথার সহিত পল্লীসন্ধ্যার ম্লান মাধুরীর বেশ মিল হয়েছে—স্থলে স্থলে কবিত্বের বেশ নিপুন তুলিকা স্পর্শ আছে।

"পাতায় মেশা কাতার দেওয়া তীরের তালীবনে
সাঁঝের ছায়া গাছের ছায়া মিলায় আলিঙ্গনে
* * * *
বুকের মাঝে কাঁপন যেন বাজায় পাখোয়াজ
কলসীগায়ে মিলায় শত হালকা ঢেউয়ের ভাঁজ।"

সুরভি। শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী—সুরভি না সৌরভ ? কবিতার আরম্ভ ও শেষ দুই-ই সুন্দর মাঝখানটা একটু এলো মেলো হয়ে গেছে।

উপাসনা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ } আশ্বিন ১৩২৮ } ৩য় সংখ্যা

আগমনী

[কাজী নজরুল ইস্‌লাম]

একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন—
ঝন রনরণ রণ ঝনঝন !
সেকি দমকি' দমকি'
ধমকি' ধমকি'
দামা-দ্রিমি-দ্রিমি গমকি' গমকি'
ওঠে চোটে চোটে, ছোটে লোটে ফোটে
বহ্নি-ফিনকি চমকি' চমকি'
ঢাল-তলোয়ারে খনখন !
সদা গদা ঘোরে বোঁও বনবন
শোঁও শনশন !
একি রণ-বাজা বাজে ঘন ঘন
রণ ঝনঝন ঝন রণরণ !
ঐ হৈ রব
ঐ ভৈরব
হাঁকে, লাখে লাখে
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে
লাল- গৈরিক-গায় সৈনিক ধায় তালে তালে
ওরে পালে পালে

ধরা কাঁপে দাপে !
জাঁকে মহাকাল কাঁপে থরথর !
রণে কড়কড় কাড়া খাঁড়া-ঘাত,
শির পিষে হাঁকে রথ-ঘর্ঘর ধ্বনি ঘরঘর !
গুরু গরগর বোলে ভেরী তূরী ;
"হর হর হর"
করি' চীৎকার, ছোটে সুরাসুর-সেনা হনহন !
ওঠে ঝঞ্ঝা ঝাপটি' দাপটি' সাপটি'
হু-হু হু-হু হু-হু শনশন !
ছোটে সুরাসুর-সেনা হন হন !
বোঁও বনবন
শোঁও শন শন
হো-হো ঝননননন রণঝনঝন রণননরণ ঝনরণ !
তাতা থৈথৈ থল খলখল
নাচে রণ-রঙ্গিণী সঙ্গিণী সাথে,
ধকধক জ্বলে জ্বল জ্বল
বুকে মুখে চোখে রোষ-হুতাশন !

রোস্ কোথা শোন্
ডম্বরু-ঢোলে ডিমিডিমি বোলে,
ব্যোম-মরুৎ-স-অম্বর দোলে,
যম-বরুণ কী কল-কল্লোলে চলে উতরোলে
ধ্বংসে মাতিয়া, তাথিয়া তাথিয়া
নাচিয়া রঙ্গে,—চরণ-ভঙ্গে
সৃষ্টি সে টলে টলমল !
ওকি বিজয়-ধ্বনি সিন্ধু গরজে কলকল কল
কলকল !
ওঠে কোলাহল,
কূট হলাহল
ছোটে মন্থনে পুনঃ রক্ত-উদধি,
ফেনা-বিষ ক্ষরে গলগল !
টলে নির্বিকার সে বিধাতৃরো গো
সিংহ-আসন টলমল !
কা'র আকাশ-জোড়া ও' আনত-নয়ানে
করুণা-অশ্রু ছলছল !
বাজে মৃত সুরাসুর-পাঁজরে ঝাঁঝর ঝম্ ঝম্,
নাচে ধূর্জ্জটী সাথে প্রমথ ব-ব-ব বম্ বম্ !
লাল লালে-লাল ওড়ে ঈশানে নিশান যুদ্ধের,
ওঠে ওঙ্কার রণ-ডঙ্কার,
নাদে ওম্ ওম্ মহাশঙ্খ-বিষাণ রুদ্রের !
ছোটে রক্ত-ফোয়ারা, বহ্নির বান রে !
কোটি বীর-প্রাণ
ক্ষণে নির্ব্বাণ,
তবু শত সূর্য্যের জ্বালাময় রোষ
গমকে শিরায় গম্ গম্ !
ভয়ে রক্ত-পাগল প্রেত পিশাচেরও
শির-দাঁড়া করে চন্ চন্ !
যত ডাকিনী যোগিনী বিস্ময়াহতা,
নিশীথিনী ভয়ে থম্ থম্ !
বাজে মৃত সুরাসুর পাঁজরে ঝাঁঝর ঝন্ ঝন্ !

ঐ অট্ট হাসিছে রণ-চামুণ্ডা হাহা হাহা হাহা
হিহি হিহি !
মাঝে মাঝে হুঙ্কারে বৃংহিত-নাদ, হ্রেষা রব
চিঁহি চিঁহি হিঁহি !
বজ্রের মার, করকা-পাত !
"কর আঘাত,
কর আঘাত,
কর্ নিপাত
বহ্নি-পাত,
মারের ওপরে মা'র হানো, বাঃ সাব্বাস্
হাস্ ! কাঁপে দেখ ভয়ে ?
যেন শীতে, হিহি ইহি ইহি !
কট্ কট্ কট্
পট্ পট্ পট্
গিরা ছিঁড়ে হাহা নড়ে ছট্ফট্ !
হুর্র্ ! হুর্র্ !! হুর্র্ !!!
হোহো কাটা-পাঁটা যেন ধড়্ফড়্ করে,
দূর্র্ ! দূর্র্ !! দূর্র্ !!!"
ঐ ওঠে দানবেরা ঘন চীৎকারি'
ধিক্কারি' পুনঃ হানে টিট্কারি রে !
যেন কোটি নাগ-বিষ-ফুৎকার
ওঠে মৃত্যু-আহত নিশাসে নিশাসে ঘুৎকার !
নর- মুণ্ড-মালিনী চণ্ডী হাসিছে হাহা হাহা হাহা
হিহিহিহি
হোহো হাহা হাহা হাহা হিহি হিহি !!
অসুর-পশুর মিথ্যা দৈত্য-
সেনা যত হত আহত করে রে দেবতা সত্য !
স্বর্গ, মর্ত্ত্য,
পাতাল, মাতাল রক্ত-সুরায় !
ত্রস্ত বিধাতা, মস্ত পাগল
পিণাক-পাণি স-ত্রিশূল প্রলয়-হস্ত ঘুরায় !

কিন্তু সবাই রক্ত-সুরায় !!
চিতার উপরে চিতা সারি সারি,
চারিপাশে তারি
ডাকে কুক্কুর গৃধিনী শৃগাল !
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল !
প্রলয়-দোলায় দুলিছে ত্রিকাল !!

আজ রণ-রঙ্গিণী জগৎমাতার দেখ্ মহারণ,
দশদিকে তাঁর দশহাতে বাজে দশ প্রহরণ !
পদতলে লুটে মহিষাসুর,
মহামাতা ঐ সিংহ-বাহিনী জানায় আজিকে—
বিশ্বরাসীকে—
শাশ্বত নহে দানব-শক্তি, পায়ে পিশে যায়
শির পশুর !
'নাই দানব
নাই অসুর,—
চাইনে সুর,
চাই **মানব** !'
বরাভয়-বাণী ঐ রে কা'র
শুনি, নহে হৈ রৈ এবার !
ওঠ্‌রে ওঠ্‌,
ছোট্‌রে ছোট্‌ !
শান্ত মন,
ক্ষান্ত রণ !
খোল্ তোরণ,
চল্ বরণ
কর্‌বো মায় ;
ডর্‌বো কা'য় ?
ধর্‌বো পা'য় কার্ সে আর,
বিশ্ব-মা'ই পার্শ্বে যার ?

আকাশ-ডোবানো নেহারি তাঁহারি চাওয়া,
ঐ শেফালিকা-তলে
কে বালিকা চলে ?
কেশের গন্ধ আনিছে আশিন-হাওয়া !
এসেছে রে সাথে উৎপলাক্ষী চপলা কুমারী
কমলা ঐ,
সরসিজ-নিভ শুভ্র বালিকা এলো বীণা-বাণী
অমলা ঐ !
এসেছে গণেশ, এসেছে মহেশ,
বাস্‌রে বাস্ !
জোর্ উছাস্ !!
এলো সুন্দর সুর-সেনাপতি,
সব মুখ এযে চেনা-চেনা অতি !
বাস্‌রে বাস্
জোর্ উছাস !!
হিমালয় ! জাগো ! ওঠো আজি, তব
সীমা লয় হোক !
ভুলে যাও শোক—চোখে জল বক !
শান্তির আজি শান্তি-নিলয়
এ আলয় হোক !
ঘরে ঘরে আজি দীপ জ্বলুক !
মা'র আবাহন-গীত চলুক !
দীপ জ্বলুক !
গীত্ চলুক !!
আজ কাঁপুক মানব-কলকল্লোলে কিশলয় সম
নিখিল ব্যোম্ !
স্বা-গতম্ !
স্বা-গতম !!
মা-তরম্ !
মা-তরম্ !!
ঐ ঐ ঐ বিশ্ব-কণ্ঠে বন্দনা বাণী
লুণ্ঠে—"বন্দে মাতরম্ !!!"

আলোচনী

ব্যবসায়ে বিশ্বজনীনতা

জগতের বিভিন্ন জাতি সমুদয়ের সখ্য-বন্ধনের যে বিরাট আয়োজন হইতেছে তাহাতে আমরা রাষ্ট্রীয় বিধি নিষেধের কথাই বেশী শুনিতেছি। কিন্তু এটা ঠিক যে জগতের অশান্তি ও যুদ্ধের মূল কারণ বৈষয়িক। বস্তুতঃ পৃথিবীর যাবতীয় দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতা না আনিতে পারিলে যুদ্ধের কারণও বর্ত্তমান থাকিবে। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও উষ্ণ প্রধান দেশে ব্যবসাক্ষেত্রে এত অসাম্য, অবিচার রহিয়াছে যে তাহা হইয়াই পাশ্চাত্যজাতি সমুদয়ের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য এখনই ঘটিতেছে। বার্লিন ও ব্রুশেল্স্ কন্‌গ্রেস্ আফ্রিকার অসভ্য অথবা অর্ব্বাচীন জাতি সমুদয়ের সমাজ-বন্ধন যাহাতে ব্যবসায়ী ও মূলধনীর স্বার্থের আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন না হয় তাহার যে ব্যবস্থা করিয়াছিল সেই গুলি প্যারিসের সভায় অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়াছে। শুধু তাই নয়—উপরন্তু ঐ গুলির ভিত্তিতে নূতন Mandatory system অথবা দায়িত্ব-মূলক ভার-প্রাপ্ত সভ্যজাতি কর্ত্তৃক অসভ্যজাতির উন্নতিবিধানের ব্যবস্থাও সুরু হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবি সংঘ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সমুদয়ের মধ্যে পরিশ্রমের ঘণ্টা, মজুরী, কারখানায় শিশু ও স্ত্রীলোক নিয়োগ প্রভৃতি সম্বন্ধে সমীকরণের চেষ্টা করিতেছে। আরও নানা দিক হইতে বিভিন্ন জাতির বৈষয়িক শক্তির সমবায় না হইলে পৃথিবীর শান্তি সুদূর-পরাহত। নিম্নে আমরা কয়েকটী বিষয়ের সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন উল্লেখ করিলাম।

(ক) জগতের উপনিবেশ স্থাপনের ইতিহাসে কোন কোন জাতি খুব ভাল অংশ ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। কোন জাতির পক্ষে সূর্য্যের নীচে স্থান পাওয়াই কঠিন হইয়াছে। খাদ্য-শস্য ও কারখানার কাঁচা মালের ইউরোপের এখন যেরূপ অভাব তাহাতে জাতি বৈঠকে পরস্পরের অভাব বিচার করিয়া প্রয়োজন মত রপ্তানি-ব্যবস্থা আবশ্যক।

(খ) ব্যবসায়ের জন্য স্থল ও জলপথ একেবারে অবারিত থাকা উচিত। কোন এক জাতির পক্ষে যদি সমুদ্রের পথ খোলা না থাকে তাহাহইলে অপর জাতি তাহার অন্তর্বাণিজ্যের দ্রব্য সমুদয়ের উপর শুল্ক বসাইবে না, এমন কি আন্তর্জ্জাতীয় বিধি ব্যবস্থা অনুসারে কোন বিশিষ্ট দেশের খাল, টানেল অথবা রেলপথ যাহাতে অন্য দেশের ব্যবসা বা অন্য প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার হইতে পারে তাহাই করা আবশ্যক।

(গ) যেরূপ ভাবে জগতের সব-দেশেই দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া চলিতেছে এবং তাহাতে যেরূপ অশান্তি সকল জাতিদিগের মধ্যেই দেখা দিয়াছে তাহাতে পৃথিবীর সোণা ও রূপার পরিমাণ ও প্রচলন সম্বন্ধে একটা বিধিনিষেধ নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। দ্রব্যের মূল্য হঠাৎ বাড়িয়ে কমিলে ব্যবসা ক্ষেত্রে যে বিষম অনর্থপাত ঘটে এবং মূলধন সহজভাবে দেশ বিদেশে প্রচলন না হইলে যে ব্যবসায় হানি ঘটে তাহার প্রতিরোধ এখন আবশ্যক।

(ঘ) সমবেতভাবে ও যৌথ-প্রণালীতে জাতিবিশেষকে জাতি সমুদয় কর্ত্তৃক ঋণদান আবশ্যক। কোন বিশেষ জাতির নিকট কোন দেশ কর্জ্জ লইলে তাহাতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার হানি হয়। চীন ও পারস্য দেশ এইরূপে তাহাদের সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে। নূতন জগতে যাহাতে আবার কর্জ্জ লইয়া কোন দেশ তাহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণের দাসখত না লিখিয়া দেয় তাহার জন্য আন্তর্জ্জাতিক যৌথ-ঋণদানের ব্যবস্থা আবশ্যক।

(ঙ) উত্তরোত্তর পৃথিবীর লোকসংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে তাহার উপযোগী নূতন খাদ্য-শস্য ও ব্যবসার উপকরণ সামগ্রী যোগাইবার জন্য সাহারা মরুভূমি, মধ্য এসিয়া ও সাইবেরিয়ার বনপ্রদেশ কিম্বা মধ্য-আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অকর্ষিত-ভূমি সংস্কার করা অদূরভবিষ্যতে আবশ্যক। যেরূপ মূলধন ও কার্য্যদক্ষতা ইহাতে প্রয়োজন, জাতিসমুদয়ের সমবেত কার্য্য ভিন্ন তাহা অসম্ভব।

(চ) পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইউরোআমেরিকান্ জাতির অবাধ-গতি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদেরই অবাধ প্রভুত্ব। এদিকে প্রাচ্য এসিয়ার জন-বাহুল্য সঙ্কুলন না হইয়া চারিদিকে উপছাইয়া পড়িতেছে। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা প্রাচ্য এসিয়ায় জাতি সমুদয়ের বসবাসের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, কিন্তু এই দুই প্রদেশই প্রাচ্য দেশ-বাসীর আগমনে, বিশেষ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা করিয়া আইন কানুনের দ্বারা তাহা প্রতিরোধ করিয়াছে। অথচ চীনের অভ্যন্তরে বিদেশীয় স্বার্থ ও প্রভাবমণ্ডল চীনের ঐক্যসাধন ও স্বাধীনতার হানি করিতেছে। আর একদিকে উষ্ণ-প্রধানদেশে যেখানে মূলধনী-সম্প্রদায় আপনাদের কে শ্রম-জীবী শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর জীব মনে করিয়া বিদেশ হইতে শ্রমজীবীগণকে আমদানী করিতে থাকে সেখানে শ্রমীগণের অবস্থা অত্যন্ত হীনতা ও ঘৃণার হয়। কুলী-দেশ, কুলী-জাতি, কুলী-স্বর্গ যেন আলাদা হইয়া মূলধনীদিগের মনোজগতে বিরাজ করে। কুলীরা নিতান্ত অসম্বদ্ধ, দল ও নেতাহীন; সুতরাং তাহাদের আত্মরক্ষার উপায় নাই। এক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক আইন কানুনের দ্বারা শ্রমনিয়োগ, এবং শ্রমনিবাস সম্বন্ধে ব্যবস্থা না হইলে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। ইহা ছাড়া মূলধনীদিগের যথেচ্ছ ভূমি সংগ্রহ অথবা শ্রম-বাধ্যকরী টেক্স স্থাপন, কিংবা চুক্তিমূলক শ্রমনিয়োগ প্রভৃতি যে ভাবে সমাজবন্ধন শিথিল করিয়া আফ্রিকার নানা জাতির ধ্বংসের কারণ হইয়াছে, তাহার প্রতিরোধ প্রয়োজন হইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বিধান ও তত্ত্বাবধান ভিন্ন ইহা অসম্ভব। দেশবিদেশের শ্রমজীবী সমুদায়ের আমদানী রপ্তানি বিষয়ে পরস্পরের সমান অধিকার ও আদান প্রদান জগতে না আসিলে অসাম্য ও অবিচার জাতিতে জাতিতে শত্রুতার বীজ বপন করিতে থাকিবে।

আন্তর্জ্জাতিক সভা সমুদয়ের প্রধান দোষ হইয়াছে যে জগতের সমস্যাগুলি বিচারে ইউরোপেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকার রহিয়াছে। এমন কি শ্রম-সভারও এই দোষ এবং এই লইয়া গত বৎসর যখন ভারতের সভ্যগণ প্রতিবাদ করেন সে প্রতিবাদ গ্রাহ্য হয় নাই। জাতিতে জাতিতে ভিন্ন বিচার প্রতিকূলে জাপান যে প্রস্তাব আনিয়াছিল তাহার মীমাংসা কিছুই নয় নাই। এদিকে আফ্রিকায় বুনো ও অসভ্যজাতির ধ্বংস, নিউ হেব্রাইডিসে্ অসভ্যজাতির সমূল বিনাশ প্রভৃতিতে লোকে জাতি-বৈঠকের তৈয়ারী নূতন দায়িত্ব-বোধমূলক ব্যবস্থাকে খুব বিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে পারিতেছে না। চীনদেশে পাশ্চাত্যজাতি সমুদয়ের প্রভুত্ব রেখা এখন সরলভাবে না চলিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। বিশেষতঃ ইয়াংসি-অঞ্চলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার কোন মীমাংসা হয় নাই। জাপানী ও চীনাশ্রমীর পাশ্চাত্য দেশের অধিকার সম্বন্ধেও কিছুই নিষ্পত্তি হইলনা বরং আমেরিকায় সমস্যাটা ক্রমশঃ আরও জটিল ও আশঙ্কাপ্রদ হইতেছে। ভারত-বাসীর অধিকার সাম্রাজ্যের অন্য প্রদেশ যদিও স্বীকার করিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকা একেবারে বাঁকিয়া বসিয়াছে। নূতন জতি-সভা অনেক আশার সৃষ্টি করিয়াছে, অনেক আশারও বিনাশ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় যুদ্ধের আয়োজন সংক্ষিপ্ত করিবার কোন ব্যবস্থা না হওয়া; এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রীয় শক্তির লীলাক্ষেত্র প্রাচ্য ও উষ্ণপ্রধান দেশে ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও শোষণকে সজীব রাখা ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং দেশীয় শ্রমজীবীদিগের সম্বন্ধ আন্তর্জ্জাতিক বিবেক বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে শোষণ চলিতে থাকিবে – তাহাতে ইউরোপীয় জাতিদিগের প্রতিদ্বন্দ্বতা এবং আফ্রিকা ও প্রাচ্যদেশবাসীদিগের অবিশ্বাস বাড়িতেই থাকিবে। সাদা-জাতির অষ্ট্রেলিয়া ও নাইরোবি সেখানে সাদার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর অধিকার ও বর্ত্তমান কালোজাতির প্রবেশ নিষেধ এই ব্যবস্থা যে সকল সভ্যজাতি করিয়াছেন তাহারা পৃথিবীর সমস্যার ন্যায়ানুমোদিত

মীমাংসা করিতে অপারগ—তাহাদের সে উদারতর দৃষ্টি নাই। চীনের সে সমগ্র দৃষ্টি আছে—সে সমগ্র প্রেম ও জ্ঞান আছে। চীনের কনফুসিয়ান ও লাওট্জের নীতির ধর্ম্ম মানুষের মধ্যে কোন গণ্ডীই স্বীকার করে নাই, তাই চীনই সেই টায়-পীঙ্ জগৎব্যাপী শান্তির মোহন স্বপ্ন প্রথম দেখিয়া অধীর হইয়াছিল, কিন্তু চীন এখন ছিন্ন বিছিন্ন—ভারতের সে দৃষ্টি ছিল—বুদ্ধের ও অশোকের ভারতের সে ব্যাপক জ্ঞান ছিল—কিন্তু ভারতও এখন হীনবল, অন্ধ। চীনের সেই উদার মানব-ধর্ম্ম, ভারতের সেই ব্যাকুল মৈত্রীর ভাব না আসিলে জাতি-সভার কাজ নিতান্ত যন্ত্রচালিতের মত চলিবে। ভাবুকতার বন্যায় বর্ত্তমান অন্ধকারকে ডুবাইয়া নূতন স্বপ্নময় আশার দ্বীপকে সমুদ্র হইতে কে উদ্ধার করিবেন? সে সমুদ্রে কত বিশ্ববিজয়ী আলেকজাণ্ডার শার্লিমান নেপোলিয়নের আশা অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু অশোকের মধুর স্বপ্ন আজও সেই জলকে বর্ত্তমান সভ্যতার পরিশ্রান্ত সন্ধ্যায় রঙীন করিয়া তুলে, সেই জলকে বিশ্বধর্ম্মী আকবর আজান-পূত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করে নাই। বুদ্ধদেবের অহিংসার ধর্ম্মও অর্দ্ধ-জগৎকে আজও মুগ্ধ রাখিয়া ভারতের স্থান পাইল না। ভারতবর্ষের ইতিহাস ভারতের আত্মাকে লাঞ্ছনা করিয়াছে, কিন্তু ভারতের লাঞ্ছিত আত্মা জগতের এই সন্ধিক্ষণে কি একবার জাগিয়া উঠিবে না, তাহা হইলে বিশ্বের ইতিহাস যে নূতন হয়, শত শতাব্দীর ব্যর্থ আশা যে সার্থক হয়! বিশ্বমানবই নারায়ণ। হিংসা-বিষ জর্জ্জরিত বিশ্ববাসীর পরিকল্পনায় নারায়ণ বিশ্বপারাবারে জাগিবেন, নবতৃণাচ্ছাদিত দ্বীপে নবকলেবরে দেখা দিবেন।

'সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই
তটিনী পারাপার
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে
বাঁধগো পারাবার।
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে -বিশ্ব আজি
দাঁড়ায়ে ঐ তীরে!'

মেঘ্লা-ব্যথা

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

উঠেছে মেঘ উঠেছে
ওলো সই দ্যাখ্ না হোথা,
বাগানে ফুল ফুটেছে,
'হেনা' তোর 'হাস্না' কোথা?
শাখে ঐ বকুল কাঁদে,
একা কি রইতে পারে?
আজিকে বাদল-রাতে
বিরহ সইতে নারে।
ছোট সে, যুঁই-কুঁড়িটি
ব্যথা তার জাগ্‌ল বুকে

কার সে, চুমার পরশ
সহসা লাগ্‌ল মুখে।
লুকায়ে গোপন ব্যথা
কহিল মল্লিকারে,
'ওলো ও শোন্ না কথা,
জোড়া তোর কল্লি' কারে?'
এতখন ভাব্‌ছিল সে,
একেলা চুপ্‌টি করে'—
থাবে কে সোহাগ-চুমু
সাদরে মুখটি ধরে'।

দুধারে দেখ্‌ল চেয়ে
বাতাসে কাঁপন্ লাগে
সবারি রুদ্ধ বুকে
গুমরি' কাঁদন্ জাগে।
দূরে ঐ পাতায় ঢাকা
কোথাকার ছোট্ট কুঁড়ি
নামটি কেউ জানে না
ব্যথা তার বক্ষ জুড়ি।
চোখেতে অশ্রু জোয়ার,
তবু সে হাস্‌ছে কেন ?
স্মৃতিটি গোপন-চুমার
সুমুখে ভাস্‌ছে যেন !
সবুজের বোর্‌কা খুলে'
অবুঝে বল্‌ল ডেকে,—
ওলো ও মল্লী' বালা,
মরিবি কল্য থেকে' ;
মরণে বরণ করে'
চুপ্‌সে থাকনা বসে',
আজিকে ধূলার পরে
পাপড়ি যাক না খসে'।

হেথা এ ক্ষুদ্র বুকে
কত আর বাস্‌বি ভালো ?
যতখণ থকিস বেঁচে'
বিলা লো— বাস্ বিলা লো !
ফাগুনের আগুন-দিনে,
বঁধুয়া আসবে হেথা,
বাতাসের কান্না শুনে'
বুকে তার বাজ্‌বে ব্যথা।
তুই ত' মর্‌বি না লো,—
বেঁচে যে থাক্‌তে হবে।
তারি যে পথটি চেয়ে,
প্রিয় সে আসবে কবে !
যেখানে থাকনা কেন,
ফির্‌বি তারই সাথে,
বুকেতে বুকটি দিয়ে
বল্‌বি নীরব রাতে—
'জীবনে কওনি কথা
তৃপ্ত হওনি প্রভু !
ম'লে ত' আস্‌তে হ'লো,
ব্যর্থ হইনি তবু !'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

[শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ গুপ্ত]

যখন পাশ্চাত্যের এক দিগ্বিজয়ী কবি তারস্বরে বলে উঠেছিলেন—"প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকবে, পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্যই থাক্‌বে, তাদের পরস্পরের মিলনের কোনও আশাই নেই ;" তখন পাশ্চাত্যের একদল অমনি সায় দিয়ে বল্‌লেন—"তা বটেই ত, তা বটেই ত।" তারপর ঠিক এমনি সুরেই প্রাচ্যের কোন কোন দিগগজ পণ্ডিত পাশ্চাত্য সাধনার পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে বিলাপের অভিনয় আরম্ভ করে বল্‌তে থাক্‌লেন—"ওগো ও পথে যেয়ো না জল নেই, জল নেই, শুধু মরুভূমি।" প্রথম দলের আপত্তির কারণ তাঁহাদের দর্পিত আত্মাভিমান, যাহা পার্থিব বল-ঐশ্বর্য্য ছাড়া আর কিছুই গ্রাহ্য করে না এবং নিকটে আসতেও দেয় না। আর দ্বিতীয় কাঁদুনে দলের বুয়া হচ্ছে এই যে আমাদের

দেশের এমন একটি অমূল্য সেকেলে সম্পত্তি আছে যার নাম হচ্ছে বৈরাগ্য, সেটা নাকি একেলে পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতে পড়লে একেবারে অন্তিমদশা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু বিধাতার এক অখণ্ড বিধানে পাশ্চাত্য জগতের এই খণ্ড-প্রলয়ে সেই আত্মাভিমানে এক প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে; সেখানেও অনেকে ভাবতে শিখেছেন যে এই পার্থিব উন্নতি বা বৈশ্বর্য্য জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সব কথা নয় এবং বোধ হয় বড় উচু কথাও নয়। তাঁদের মনের কোণায় কে যেন নাড়া দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্চেন "ওগো প্রাচ্যের সঙ্গে তোমাদের মিলতে হবে এবং সেই মিলনেই হবে তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ উন্নতি, পরমার্থিক অভ্যুদয়!" তারপর দ্বিতীয় দলের বিলাপ শুনলে হাসিও পায় কান্নাও পায়। হাসি পায় তার কারণ এই যে, বৈরাগ্য যদি এতই আমাদের প্রিয় বস্তু, তবে তাহার পথই অবলম্বন কর না কেন—তাই বা কই পারো? আর কান্না পায় তার কারণ—একেলে সভ্যতা তোমাদের ত হাত পা বেঁধে রাখে নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে তোমাদের প্রাচ্যের বৈরাগ্য সাধনা ফুটাইয়া তোলো না কেন? আসল কথা—বৈরাগ্য জিনিসটা এখন একটা সুলভ বাজারে-জিনিস নয়, কারণ এটা অন্তঃকরণের সামগ্রী, সুতরাং সাধনের বস্তু। প্রকৃত বৈরাগ্য সংসারে কোনও কর্ত্তব্য সাধনেরই প্রতিবন্ধকতা বরণ করে না, বরং সেরূপ বৈরাগ্য কর্ত্তব্যসাধনের পথ আরও পরিষ্কার করে দেখিয়ে দেয় কারণ জীবনের পথে উহা একটা অন্তর্জ্ঞানের প্রদীপ। বৈরাগ্য অভ্যাস অর্থাৎ যাহাকে আমরা প্রাচ্যের নিজস্ব সাধনা বলি তাহা ত আর কিছুই নয় কেবল মনের সুর-বাঁধা। যেমন সেতারের সুর বাঁধা থাকলে, তাতে যে রাগিণী ইচ্ছা, সেই রাগিণীই বাজানো যেতে পারে, তেমনি অন্তঃ-করণে যদি সত্যিকারের বৈরাগ্যের সুর বাঁধা থাকে, তাতে সকল রকমের কর্ত্তব্যই বেশ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা সহজ হয়। কারণ এটা খুবই খাঁটি কথা যে মন রাগদ্বেষে অধীর থাকলে কোনও কাজই হয় না, সে আর্থিক উন্নতিই হ'ক বা পরমার্থিক সাধনাই হ'ক; মনের প্রশান্ত ভাব প্রত্যেক কর্ত্তব্যে অগ্রসর হবারই শ্রেষ্ঠ উপায়। সে প্রশান্ত ভাবে শিক্ষা দেয়—মানুষের কর্ম্মের মাত্র অধিকার আছে, ফলের দিকে তাকাবার তার প্রয়োজন নাই। এইরূপ যোগস্থ হয়ে কর্ম্মকরার নামই প্রাচ্যের বৈরাগ্য-সাধনা। আর যে-বৈরাগ্য কর্ত্তব্য সাধনের প্রতিবন্ধক, তা বৈরাগ্যের ভানমাত্র। তবে যদি আমরা চাই সেই-বৈরাগ্য যা সেকালে পথে ঘাটে হাটে মাঠে ছড়িয়ে ছিল—যেমন ব্রাহ্মণের মাথার টিকি, মুখে দুবেলা সন্ধ্যা আহ্নিকের বুলি, বৈষ্ণবের নাশায় তিলক, গলায় তুলসীর মালা, শাক্তের কপালে রক্তচন্দনের কোঁটা; তা হলে একথাও নিশ্চিত যে বাণপ্রস্থ ভিন্ন আর কোনও আশ্রমই আমাদের উপযোগী নয়। কিন্তু সংসারে আমরা দেখি কি মুখে বৈরাগ্যের বুলি আর হৃদয়ে ভোগের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। এ ভণ্ডামি কেন?

মানুষের জীবনের সাধনায় প্রথম স্থানে হচ্ছে ঈশ্বর-প্রীতি, তার নীচেই স্বদেশানুরাগ। সেক্‌স্‌পীয়রও অষ্টম হেনরি নামক নাটকে কার্ডিনেল উল্‌সীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—"Be just and fear not. Let all the ends thou aimest at be thy country's, thy God's and truth's." "ন্যায়পথে থাকিও, ভয় কিসের? তোমার সংকল্পিত সকল কার্য্যেরই যেন লক্ষ্য হয় তোমার দেশ, তোমার ঈশ্বর এবং পরম সত্য।" কিন্তু আসলে হয়েছে, প্রতীচ্য-দেশ আত্মস্বার্থ করে করে ঈশ্বরকে হারিয়েছে; আর প্রাচ্য ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে দেশ ও আত্মোন্নতি হারিয়েছে, এমন কি ভ্রান্ত কুলধর্ম্মের আশ্রয় নিয়ে ঈশ্বরকেও হারাতে বসেছে, কেবল জাতিগত ও কুলগত আচার নিয়েই সে ব্যস্ত। তাই পাশ্চাত্য তার দেশীয় মর্য্যাদার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে বর্ত্তমান থেকে ভবিষ্যতে দৃষ্টি প্রেরণ করছে, অতীতের ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-প্রীতি সে ভুলতে চাইছে; আর আমাদের দেশ তার জাতীয় মর্য্যাদার উপর নির্ভর করে বর্ত্তমান থেকে কেবলি অতীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে, ভবিষ্যৎকে এবং সেই সঙ্গে দেশকে ও আত্মোন্নতিকে সে মুছে ফেলিতে চাইছে। এই জন্যই কাজ-হিসেবে পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে আর ধর্ম্মসাধনায় প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছে। কারণ যদিও বর্ত্তমান থেকে অতীতও যতদূর ভবিষ্যৎ ও ততদূর, কিন্তু দু'য়ের মধ্যে কাজের বিস্তর প্রভেদ; কেন না পাশ্চাত্য দেশে

দেশের উন্নতি সাধনে সকলেরই সমান অধিকার আর এখানে কৃত্রিম বন্ধনে হাত পা বাঁধা কাহারও কোনও হাত নাই। পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করে এসেছেন তাই করতে হবে, যাহা বলে এসেছেন তাই বেদবাক্য বলে সব সময়ে গ্রহণ করতে হবে এই প্রাচ্যের ধারণা। আমাদের সাধনাকে আমরা অতীতের সহিত দৃঢ়বদ্ধ রেখেছি, তাই তার ভবিষ্যতের দ্বার একেবারে বন্ধ। পর্ব্বত থেকে যেমন নদনদী উপত্যকায় নেমে আসে, অতীত থেকেও তেমনি সেটুকু সাধনার জিনিস সেটুকুই বর্ত্তমানে নেমে আসে এবং ততটুকুই কাজের, বাকীটুকু স্বপ্নের কল্পনা। তারপর সেই বর্ত্তমানের সাধনাকে আশ্রয় করে পুরুষত্বের সাহায্যে ভবিষ্যৎ ফুটে উঠে।

আসল কথা আমাদের দেশের জাতীয় আত্মা যেন একটা প্রকাণ্ড রথ, তার সারথী হচ্ছে সেকেলে শাস্ত্র, আর অশ্ব হচ্ছে লোকাচার। সারথীটি বার্দ্ধক্যের বশে এমনি অথর্ব্ব হয়ে পড়েছেন যে তিনি অশ্বকে চালান কি অশ্ব সারথীকে চালায় এটা বলা কঠিন। তার উপর নানাদেশের নানা বিরোধী লোকাচার মিলে অসংখ্য অশ্ব গড়েছে, আর নানামুনির নানা মত অসংখ্য সারথী হয়েছে। রথটা কোন্‌দিকে যাবে স্থির করতে না পেরে "থমকি থেমে গেছে পথমাঝে" আর সঙ্গে সঙ্গে মনোরথেরও গতি বন্ধ হয়ে গেছে। একেবারে আশা ভরসা হারিয়ে আমরা জড়ভরত হয়ে বসে আছি।

ভারতের জাতীয় জীবন অনেকদিন থেকে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। তাকে এখন নূতন শক্তিদিয়ে চলবার উপযুক্ত করে নিতে হবে। তাই আমাদের সম্মুখে সাধনার একটা আদর্শ চাই। সে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবার সময় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভেদাভেদ দেখলে চলবে না কারণ এটা এখন সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে যে আদর্শ মনুষ্যসমাজ গড়তে গেলে প্রাচ্যের ও প্রতীচ্যের মিলন একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং প্রথম কথা হবে প্রাচ্যের সাধনা ও পাশ্চাত্যের আদর্শকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিশ্লেষণ করে যার যেটুকু আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে দেশের উন্নতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় সেটুকু গ্রহণ করতে হবে, আর বাকী যা প্রাচ্যের কি পাশ্চাত্যের আমাদের আদর্শের পরিপন্থী তা কুসংস্কার-শূন্য মনে বর্জ্জন করে দিতে হবে। তাই প্রথমেই আলোচ্য প্রাচ্য সাধনার বৈশিষ্ট্য কি আর পাশ্চাত্যের সাধনারই বা লক্ষ্য কি।

আমরা বহুকাল থেকে শুনে আসছি পাশ্চাত্য সাধনা বহির্মুখী আর প্রাচ্য সাধনা অন্তর্মুখী অর্থাৎ প্রাচ্য আধ্যাত্মিক বিষয়ে লিপ্ত আর পাশ্চাত্য আধিভৌতিক ব্যাপারের পশ্চাতে ধাবমান। পাশ্চাত্যের চোখ ইহলোকের দিকে আর প্রাচ্য চেয়ে আছে পরলোকের পানে। পাশ্চাত্য জীবন ইন্দ্রিয়কেই আঁকড়িয়ে রয়েছে, প্রাচ্য ব্যাকুল হইয়াছে অতীন্দ্রিয়কে ধরিতে। পাশ্চাত্য তাই বাইরের চাকচিক্য নিয়ে ব্যস্ত, যাহা স্থূল চোখে দেখা সত্য যাহার লীলা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া, অনিত্যতাই যাহার ধর্ম্ম,—আর প্রাচ্য অনুসন্ধান করছে আত্মার অখণ্ড সত্যকে যাহা নববধূর মত অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া মাঝে মাঝে তার রূপটিকে আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে দেখাইয়া দেয়, সম্পূর্ণভাবে আপনার সমগ্র রূপের পরিচয় দেয় না। সেই জন্যই পাশ্চাত্য হইয়াছে কর্ম্মী সচল নূতন উদ্যমে সদাজাগ্রৎ একটা চঞ্চল জীবনে পরিপূর্ণ; আর প্রাচ্য হইয়াছে ধ্যানপর শান্ত সমাধিতে নিমগ্ন বাস্তব জীবনের সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগসমস্যা সঙ্কেত করছে এই উভয় আদর্শের সমন্বয়েরদিকে, মানবজাতি চাইছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া এক নূতন ছাঁচে ঢালিয়া এক উদারমহান্ আদর্শের মধ্যে সমস্ত জগৎকে একই প্রাণধর্ম্মে বেঁধে ধরতে। কারণ মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন জীবন গঠনে দুটিরই সমান সার্থকতা। মনোজগতে সত্যের রাজ্য অখণ্ড, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যভেদে তাহাকে বিভাগ করা অসম্ভব। তাই জীবনকে গতিশীল করতে হ'লে, নূতন আদর্শের রূপ তাতে ফুটিয়ে তুলতে হলে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে এক সূত্রে গেঁথে নিয়ে এক মহাসত্যকে আশ্রয় করতে হবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনার মধ্যে যে বিভিন্নতা তাহা উভয়ের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের সকল দিকেই বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে...তাদের সাহিত্যে বিজ্ঞানে সঙ্গীতে চিত্রকলার রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ও দর্শনে। প্রথমেই যদি ধর্ম্মের

কথা ভাবি তাহা হ'লে আমরা দেখি পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম-জ্ঞানই এই প্রাচ্যে জন্মলাভ করে এখানেই বিকশিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য যে টুকু গ্রহণ করেছে, তাহাও সে বিকৃত করে ফেলেছে। পাশ্চাত্য ধর্ম্মকে ক্রমে ক্রমে নিম্নদিকে টেনে নিয়েছে এবং শেষে জগতের মধ্যে তাকে হারিয়ে ফেলবার উপক্রম করেছে। পাশ্চাত্যের ক্ষাত্রবল এখন ধর্ম্মকে ছাপিয়ে উঠেছে, ক্ষাত্রশক্তিকে বর্দ্ধিত কর্‌বার জন্যই এখন ধর্ম্মের সাহায্য লওয়া হয়েছে ; তাই সেখানে ধর্ম্ম যাজকেরাও রাজনীতিক ক্ষমতা পাবার জন্য ব্যস্ত, রাজনীতির হট্টগোলে আপনাদের সাধনা হারিয়ে ফেলেছেন। তাই তাঁদের church eccleissastical এখন church militant এ পরিণত হয়েছে। আর প্রাচ্য তার ধর্ম্মকে ক্রমেই ঊর্দ্ধে নিয়ে চলেছে, শেষে ব্রহ্মের মধ্যে জগৎকেই হারাতে বসে গিয়েছে। তার ধর্ম্মমত হয়েছে সাধু সন্ন্যাসির একচেটিয়া, তার প্রতিষ্ঠান মঠাদি অরণ্য ও বনের মাঝ খানে। তাই প্রাচ্যের জীবন সকল শক্তি হারিয়ে অথর্ব্ব ও পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

কর্ম্মজীবনে ও ঠিক সেইরূপ। পাশ্চাত্য তার কর্ম্মবীরের আদর্শ ধরে নিয়েছে আলেকজন্দর ও নেপোলিয়নকে, আর প্রাচ্যের আদর্শ হয়েছে অর্জ্জুন ও ভীষ্ম। পাশ্চাত্যের কর্ম্মবীর চঞ্চল প্রমত্ত আপনার আসুরিক বলে বলীয়ান্ আর প্রাচ্যের কর্ম্মবীর শান্ত সংযত দৈবভাবে গরীয়ান্। নেপোলিয়ান্ ভগবানের বিরাট বিভূতি সন্দেহ নাই, অর্জ্জুন একেবারে নরনারায়ণ। ফল হয়েছে কি পাশ্চাত্য ধর্ম্মকে জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারেনি, তাই সে খ্রীষ্টকে ভুলেছে। প্রাচ্যও তেমনি জীবনে কর্ম্মের বিভূতি ধরে রাখতে পারেনি, তাই সে কৃষ্ণকে ভুলেছে, গীতাকে ভুলেছে, ধর্ম্মের পথে কর্ম্মের সমন্বয়কে ভুলেছে। রাশি রাশি শাস্ত্র বচনের ও অসংখ্য খুঁটিনাটির ভারে প্রপীড়িত হয়ে আমরা কর্ম্ম যে এমন ভাল জিনিষ তাকেও যন্ত্রণার মধ্যে গণ্য করে নিয়েছি। আমাদের দেশের শাস্ত্রানুশাসিত কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড লোকের স্বাধীন স্ফূর্ত্তির এমনি ব্যাঘাত উৎপাদন করেছে যে কি দর্শন কি পুরাণ সব শাস্ত্রই একবাক্যে কর্ম্মের নাম দিয়েছে কর্ম্ম বন্ধন। পাশ্চাত্যে কিন্তু জড়তার নামই বন্ধন আর কর্ম্মই সে বন্ধন মুক্ত কর্‌তে পারে। প্রাচ্য চেয়েছে এই সংঘর্ষ সঙ্কুল দ্বন্দ্বময় জীবন থেকে কেবল ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য যেটুকু কর্ম্ম আবশ্যক সেটুকু মাত্র কর্ম্মকে ধরে রাখতে, আর পাশ্চাত্য চেয়েছে জীবনের তারে নূতন নূতন ঝঙ্কার দিয়ে কেবল বৈচিত্র্যময় নূতন নূতন সুর ফুটিয়ে তুল্‌তে এবং সেই সঙ্গে নূতন নূতন কর্ম্মের তালে তালে সেই সব সুর বেঁধে ধর্‌তে। প্রাচ্য চেয়েছে আত্মাকে চিন্‌তে, তাই সে পেয়েছে একটা চিদ্‌ঘন মহত্ব একটা রহস্যময়ী গভীরতা, কিন্তু আত্মার প্রকাশ যে শরীর তাকে সে ঠেলেছে বলে সে বিরাট ঋদ্ধিকে হারিয়ে বৈচিত্র্যহীন পাশ্চাত্য শরীরকে ভাল করে চিনেছে, তাই সে বিচিত্রতার মধ্যে জীবনের ঐশ্বর্য্য ফুটিয়ে তুল্‌তে পেরেছে, কিন্তু শরীরের পূর্ণতা যে আত্মার প্রতিষ্ঠানে তাহা সে বুঝতে চায়নি বলে সে ঐশ্বর্য্য ক্ষণভঙ্গুর—বাহ্য চাকচিক্যের ঝলক হেনেই সে শেষ হয়ে যায়। জীবনকে রসবহুল কর্‌তে সে পেরেছে কিন্তু সেই রসের মধ্যে অমৃতের আস্বাদ পরমানন্দকে সে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে নি। এক কথায় পাশ্চাত্য বহুকে নিয়ে, বৈচিত্র্যময় রূপকে নিয়ে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কিন্তু তুরীয়কে হারিয়ে তরল আর প্রাচ্য এককে নিয়ে সমাধি মগ্ন একটা সমুদ্রের আভাস নিয়ে গভীর কিন্তু রূপকে হারিয়ে নগ্ন।

তাই পাশ্চাত্য তার সাহিত্য এঁকেছে মানবীয় চরিতচিত্র, আর প্রাচ্য ফুটিয়ে তুলেছে লোকান্তর চরিতচিত্র। পাশ্চাত্য মানুষকে মানুষ ভাবেই শুধু দেখিয়েছে জগতের সহিত, পৃথিবী রূপ রসের সহিত জড়িত জীবনকেই স্পষ্ট এঁকে দিয়েছে। প্রাচ্য দেখাতে চেয়েছে মানুষ একটা কিছুর প্রতিনিধি, জড়জগতের ঊর্দ্ধে একটা নিবিড়তর স্তরে স্থাপিত যেখানে দাঁড়ায়ে মানুষ আপনাকে অমৃতের পুত্র বলে পরিচয় দিতে পারে। এমনি ভাবে অনন্তের চৈতন্য ফুটে উঠেছে প্রাচ্যসাহিত্যে ; আর সান্তের অনুভূতি জেগেছে পাশ্চাত্য সাহিত্যে। পরাবিদ্যার সাহায্যে সান্তকে ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ করে অপরা বিদ্যার দ্বারা অনন্তকে অতীন্দ্রিয়ের বোধগম্য করাই প্রাচ্যের দীক্ষা ও প্রেরণা। প্রাচ্য অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে আপনাকে এমন নিবিড় [illegible]

বিরাট ভাবে পেতে চেয়েছে সে তার সাহিত্যে তাই অতি সহজে ফুটে উঠেছে।

"অহং রুদ্রেভিশ্চরামি অহং আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।"

পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান চেয়েছে প্রকৃতিকে দাসীর মত খাটিয়ে নিতে, কর্ম্মজীবনকে সহজ সরল করে আনতে: তাতে বিজিগীষার আসুরিক প্রচণ্ডতা আছে, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা প্রকটিত হয়েছে। জীবনকে রূপে রসে ভরপুর করে ঐশ্বর্য্যের মধ্য দিয়ে আত্মতৃপ্তিলাভের বাসনা তাতে ফুটে উঠেছে। প্রাচ্যের বিজ্ঞান কিন্তু কর্ম্মজীবনের চরিতার্থতার দিক দিয়ে পঙ্গু, সে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি অপেক্ষা চেয়েছে একটা অস্খলিত আনন্দ। তাই প্রাচ্য গড়ে তুলেছে জ্যোতিষ বিজ্ঞান, সেখানে সে চেষ্টা পেয়েছে একটা রহস্যের জাল ছিন্ন করে তুরীয়ের জ্ঞান লাভ করতে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান জীবনের বহুভঙ্গিম রসধারাকে উৎসারিত করে তুলতে চেয়েছে। কিন্তু সেটা বড় আসুরিক ভাবে, এই কঠিন ধরণীর রূপই সে ঐশ্বর্য্যময় ভাস্বর মূর্ত্তিতে ফুটিয়ে তুলেছে কিন্তু সে ছাড়তে চেয়েছিল দিব্য কাব্য প্রেরণাকে। আর প্রাচ্য বিজ্ঞান কাব্যের তন্ময়তা নিয়ে তারাময়ী নিশীথিনীর কল্পনা নিয়ে—বিভোর ছিল কর্ম্মজীবনে প্রযুজ্য শক্তিকে একেবারে হারিয়ে ফেলে। তাই এখনও প্রাচ্য জীবনের উন্নতিবিধায়ক বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ; এই জন্য পৃথিবীতে যে সময়ে উন্নত বিজ্ঞান দর্শনের জ্ঞানানল শিখা দিন দিন ঊর্দ্ধ থেকে ঊর্দ্ধতর উঠে যোজন দূরে জ্যোতি বিকীর্ণ করছে, ঠিক সেই সময়ে এই প্রকট দিবালোকে প্রাচ্য স্বচ্ছন্দচিত্তে কতকগুলি জরাজীর্ণ কঙ্কালবিশিষ্ট কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে আফিংখোরের মত উদ্যমহীন পড়ে আছে এবং দূর থেকে চীৎকার ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করে বলতে আরম্ভ করেছে—"ওরে ফুঁ দিয়ে ঐ জ্ঞানের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তোর আঁধার কুটীরেই ফিরে আয়।"

পাশ্চাত্যের সঙ্গীতও সৃষ্টি করেছে এক বিরাট কর্ম্ম কোলাহলময় জগৎ—তাহা পঞ্চভূতমাত্রে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত প্রেরণাপুঞ্জ নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রকৃতির দ্বন্দ্বময়ী সহস্র গতিভঙ্গিমাকেই সে ধরতে চেয়েছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গীত তাই জগতের [illegible]হীন এই ভূলোককে মহীয়ান্ করে হৃদয়ের মাঝখানে এনে ফেলেছে, তাই সে বৈচিত্র্যময় বহু ভঙ্গিম রুচির। প্রাচ্যের সঙ্গীত আগাগোড়া এক একটি সমাধিমাখা কীর্ত্তন শান্ত, ধীর, অথচ গভীর ও উদাত্ত। সুরের বৈচিত্র্যে সে অঙ্গহীন, কিন্তু একটিমাত্র ভাবতরঙ্গকে অবলম্বন করে তারই উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া সে চলেছে এই মরলোক ছেড়ে কোন্ অনন্ত শান্তির রাজ্যে। মোটকথা পাশ্চাত্যের সঙ্গীত যেমন প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে নিয়ে ঐশ্বর্য্যময় কিন্তু সমাধিহারা, প্রাচ্যের সঙ্গীত তেমনি তুরীয় লোকের একটিমাত্র ভাব বুকে ধরে বৈচিত্র্যহীন কিন্তু সমাধির সুরে ভরপুর।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের এই বিভিন্নতা খুব ভাল করে দেখা দিয়েছে তাদের চিত্রকলায়। প্রাচ্য চিত্রকলার কবি বস্তুর মাঝে ভাবকে ধরে দেখায়, অনন্তকে রূপ দিয়ে তুলে, সকল মাধুরীর আবার সেই জগৎ-ব্যাপী অবগুণ্ঠন টেনে চকিতের মত তার স্বরূপ দেখিয়ে দেয়; সে ভাবের মূক গাম্ভীর্য্যকে মুখর করে তোলে, রূপের পিছনে যে সত্য ফুটি ফুটি করছে তাকে সকল শোভায় ভরপুর করে ফুটিয়ে তুলতে চায়। তাতে করে প্রাচ্যের চিত্র বাহ্য প্রকাশে সুন্দর নয়, তার বাহ্যপ্রকাশ সত্যভাবের মাঝে যেন লয় পেয়েছে। পাশ্চাত্যের চিত্রকলার যে মহত্ত্ব বাহ্যিক গরিমা তাতে যে সমাধিমগ্ন শান্তি ফুটেনি তাতে ফুটেছে প্রাণের ও জড়ের গরিমা; বাহ্যপ্রকাশে তাহা অনন্য, তার মহত্ত্ব বৈশিষ্ট্যের, বৈচিত্র্যের, পৃথকত্বের মধ্যে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য চিত্রকলা প্রাচ্য চিত্রকলাকে পশ্চাতে ফেলে রেখেছে।

এইত গেল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন তুলনা। দেখা গেল একের জীবনে যে বিশিষ্টতা অপরের জীবনে তাহা ফুটে নাই। দেখিলাম প্রাচ্য পাশ্চাত্যকে ত্যাগ করে পঙ্গু, পাশ্চাত্যও প্রাচ্যকে অবহেলা করে অঙ্গহীন। আসল কথা এই যুগসন্ধিক্ষণে ভাবের আদান প্রদান উভয়ের জীবন গড়ে উঠবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচ্য জীবনে কর্ম্মের বিভূতি নেই বলে সে অপূর্ণ, পাশ্চাত্য জীবনও কর্ম্মকে সর্ব্বস্ব করে নিয়ে এবং কর্ম্মের পশ্চাতে যে সত্যের অনুভূতি আছে তাকে না বুঝে উচ্ছৃঙ্খল। এ কথা এখন ভাল রকমেই লোকের মনে

জেগেছে। কারণ সকলে বুঝেছে মানব জীবনকে তার সমস্ত রূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে, তাতে করে এই সংঘর্ষময় উচ্ছৃঙ্খলতার ঝঙ্কার মানুষের হৃদয় বীণা থেকে লয় পাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠবে কর্ম্মজীবনের মাঝে এক মহামানবতার সুর। সেই সুর থেকেই সমগ্র মানবজাতির মনে জেগে উঠবে এক মহাসত্য যাহা চিরনবীন ও চিরমধুর ঝঙ্কারে প্রাণে হৃদয়ে ছন্দিত হতে থাকবে।

"আঁধারের কুহেলিকা ছিন্ন করে দিয়ে
চাহিব আমি সত্য-দর্শপানে,—
সেই হবে মোর সকল প্রাণের চাওয়া।
দুঃখশোক ব্যথা ভয় জয়ী প্রাণ নিয়ে,—
রহিব বিভোর আনন্দের গানে, -
সেই যে আমার মুক্তকণ্ঠে গাওয়া।"

সত্যাভিজ্ঞা।

[শ্রীবঙ্কিভূষণ ভদ্র]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গঙ্গা

তুরিয়ানন্দ! বন্ধু! এখন হার স্বীকার করছ কিনা? হারতে হল কিনা? সেই সর্ব্বশক্তিময়ীর কাছে জোর! জোর! তার কাছে চালাকী!

কিন্তু ভয় নেই ভাই, এতে তোমার জয়ই হবে, তুমি হেরেও হারবে না। ঐ মায়াবিনীর এমনি মায়া, যে যে হারে, তার কাছে সেও অমনি হার স্বীকার করে। যে হারতে চায় না, সেই মরে। তুমি এতে মরবে না ভাই, আনন্দময়ী তোমার সৎচিৎ একের মধ্যে একেশ্বরী হয়ে ধরা দেবেন; তোমার একত্ব বাঁচবে সর্ব্বত্ব বাঁচবে।

কিন্তু আমিও ধন্য হলাম, তোমার মধ্যে এই অপরূপা থাকে পাচ্ছেন সেই আমিও ধন্য হলাম, পূর্ণ হলাম মুক্ত হলাম। আমি বেঁচে গেলাম, ভাই, বেঁচে গেলাম তোমার মধ্য দিয়ে এই আমার সাধনার ধনকে বুকে পেয়ে ধন্য হলাম। তোমার মধ্য দিয়ে এর অন্তরে প্রবেশ করে এর সংস্পর্শ লাভ করে সেই পরম মায়াবিনীর চির অধরের ধরা ছোঁয়া পেলাম। তোমার পায়ে কোটী কোটী প্রণাম— আমার চির সাধনার সিদ্ধি এসেছে আর দেরী নেই সমস্ত দিগন্ত ঘিরে সেই মহাসম্ভাবনা জেগেছে। আর ভয় নেই। আমার ভয় নেই। আর দ্বিধা নেই, সত্যোপলব্ধির জোরে বলছি, নিজে আমি আমার কাছে যেমন সত্য তেমনি সত্য-ভাবে অনুভব করিছি যে তোমার মাঝেও আমি তেমনি সত্য আবার তোমার আমার সবারই মাঝে সে; সেই আমার একটা মন্ত্র যে সেও সত্য। সে আজ এই ছোটো ছুটো চোখে সাড়ে তিন হাতের বেশী নয় তবু তার ঐটুকুরই মধ্যে সব দেখিছি সব পেয়েছি; সব হয়েছি।

এখন স্বীকার কর বন্ধু আমার দেখা মিথ্যের দেখা নয় মায়ার দেখা নয় ভুলের দেখা নয়। এই দেখা যে পরম দেখা এ তোমায় মানতেই হবে —হবে কেন, হয়েছে। নইলে তোমার তাপীর চোখের যোগীর জল পড়ছে কেন? এ জল যে সেই "একো জালবানের" জল তা মানছ কিনা এবার?

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি -

আজ স[illegible] য় গিয়েছে। সর্ব্ব দ্বিধা সর্ব্ব দ্বন্দ্ব মিটে গেল—পরম বিজয়িনীর সর্ব্বপ্রকারেই জয় হয়েছে। অসাধনায় তারই জয় সাধনাতেও তারই জয়; অসহজেও

তারই জয় সহজেও তারই জয়, জ্ঞানেও তারই জয় অজ্ঞানেও তারই জয় হয়েছে। সেই কথা বলে আমার এই কথার জালের শেষ গ্রন্থি শেষ করে দি—

আজ সকাল থেকে কোনো কাজে মন দিতে পারি নি। কেন? যেদিন এমন একটা ঘটনা ঘটবে সেদিন কি আর চুপ করে অন্যকাজে থাকবার জো আছে? তাই আজ সকালেই উঠে চুপ করে বসেছিলাম। সমস্ত প্রভাতের আলোটা যেন কেমন জমাট হয়ে আমার চোখ দুটোর সামনে ঠিক যেন ভুরু দুটোর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছিল। ঠিক সেই সময় আমার কুড়িয়ে পাওয়া সহজে পাওয়ার ধন হাসি এসে উপস্থিত। অমনি আমার ভ্রূমধ্যগত আলো আবার সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ল। আমি তার দিকে ফিরে বসলাম।

হেসে উঠে সে বল্লে, "আর মিছি মিছি আমার মান্য রাখতে ফিরে বসবেন না। যা করছিলেন করুন।"

আমিও হেসে বল্লাম, "কি করছিলাম?" সে বল্লে "না-ভাবা ভাবছিলেন।"

আমি বল্লাম, "না-ভাবা? সে আবার কি? তাই নাকি আবার ভাবা যায়?"

সে বল্লে, "আপনাদেরত সব যত অনাসৃষ্টি যত অপরূপ যত অসম্ভব নিয়েই কারবার; তাই আমি আপনাদের চিন্তার নাম রেখেছি না-ভাবা ভাবা।"

আমি একটু নড়ে চড়ে উঠে বসলাম, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। না জানি এই সেই পরম মায়াবিনীর অখণ্ড কথাটী কিই বা বলে বসে!

কিন্তু সে আমাকে কথা শুনতে উৎসুক দেখে কি জানি কি ভেবে দূরে সরে গিয়ে, তারই আঁকা সেই যোগীচক্রবর্ত্তি বুদ্ধদেবের চেহারাটার সামনে দাঁড়াল। আমি চেয়ে চেয়ে বল্লাম "না-ভাবাটা কি রকম আমায় বোঝাও না হাসি?"

অসামান্য ঘটনা অনেক সময় অত্যন্ত সামান্য কারণ থেকেই ঘটে—আমার এই সামান্য একটু পরিহাসের কথা হতে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যার জন্য আমি—অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তে—প্রস্তুত ছিলাম না। হাসি আমার দিকে একবার ফিরে চেয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে কাঠের মত হয়ে সেই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আমিও তখন আমার আসন ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে সেই ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর ছবিটার দিকে চেয়ে বল্লাম,—

"তুমিও কি না-ভাবা ভাবছ নাকি? কিন্তু বুদ্ধদেবত—" আমার কথা শেষ হল না, কারণ হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার সেই চিরহাস্যময়ীর হাসি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। তার পরিবর্ত্তে বজ্র বিদ্যুৎময় একটা ভয়ঙ্কর মেঘ সমস্ত মুখখানায় ছেয়ে এসেছে। আমি ভয়ে পেছিয়ে গিয়ে বল্লাম, 'কি হয়েছে হাসি?' হাসি আমার দিকে পূর্ণভাবে ফিরে বল্লে, 'আমায় নিয়ে প্রতিদিন এমন ভাবে খেলা করবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে?'

আমি ভীতভাবে বল্লাম, 'আর কেউত দেয়নি, তুমি নিজেই দিয়েছ। তুমিই সহজ ভাবে সরলভাবে ব্যবহার করে আমার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ। তাই সময় অসময় তোমার সঙ্গে খেলা করে—"

"না না, আমায় নিয়ে খেলা করবার আপনার কোনো অধিকার নেই। কে আপনি যে আমায় নিয়ে রাতদিন পুতুল খেলা করবেন? আপনি সন্ন্যাসী আপনার দয়া নেই মায়া নেই; আপনার ভুল হয় না আপনি সত্যকে ধরে সহস্র মিথ্যার মধ্যে অচল হয়ে বসে আছেন। কিন্তু আপনার পক্ষে যা খেলা তা অন্যের পক্ষে খেলা নাও হতে পারে এ ধারণা এ দ্বিধা কি কখনো আপনার হয়েছে? হয়নি—যদি হ'ত, তা হ'লে প্রতিদিন—উঃ যদি সত্যিই অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসীই থাকবেন তবে কেন আমাদের কাছে এসেছেন? কে আপনাকে এই নিষ্ঠুর খেলা খেলতে ডেকেছিল? কে আপনাকে—"

আমি তাকে বাধা দিয়ে বল্লাম, "কে ডেকেছে তা বলতে পারি কিন্তু তা কি কেউ বিশ্বাস করবে? কেউ না। কিন্তু যেই ডাকুক তার ডাকের ঝড়ে আমার সন্ন্যাসীগিরির ছাই মাটী ঝুলি ঝাম্পা সব উড়ে গেছে। তোমায় কাছে সব বলতে পারতাম, কিন্তু দেখছি তুমিও বিশ্বাস করবে না—প্রথম হতেই বোধ হয় একটা অবিশ্বাসকে মনে স্থান দিয়েছ তাই মূর্ত্তিমতী-হাসির মুখ থেকে আজ এইরকম বেদনার কথা আনন্দহীন ব্যথা দেবার কথা বেরুচ্ছে।"

আমার কাতর স্বরে হঠাৎ দেখি হাসির মুখের সমস্ত জমাট মেঘ অশ্রুতে গলে গেল। সে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসেপড়ে বল্লে, "আমি বিশ্বাস করব, আমায় বল।"

'বিশ্বাস করবে তুমি! বুঝবে তুমি আমাকে! আঃ বাঁচলাম হাসি।" হাসি আবার বল্লে বিশ্বাস করবে। আমি তার স্বর শুনে চমকে উঠলাম এবং বুঝলাম সে বিশ্বাস করবে। অমনি আমার চিরদিনের সমস্ত সাধনা যেন সিদ্ধি লাভের পরমানন্দে আমার মধ্যে নেচে উঠল। আমার সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ একটী মাত্র বর্ত্তমানে সত্য হয়ে উঠল। এইত আমার সহজের ধন এইত আমার চিরকালের পাওয়ার ধন! একে চাইতে হয় না চাইলে একে পাওয়া যায় না। তাই একে পেয়ে আমার জন্ম জন্মান্তরের লোক লোকান্তরের অস্তিত্ব সেই এক মুহূর্ত্তের অস্তিত্বে এসে জমাট বেঁধে দাঁড়াল। সমস্ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—জগতের যা কিছু আছে বা ছিল সবই যেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সত্য করে পেলাম। ঐ একটী প্রাণের এক মুহূর্ত্তের বিশ্বাসে আমি বাঁচলাম—ওগো বাঁচলাম।

আমি ধীরে ধীরে বল্লাম "তা হলে বিশ্বাস কর তুমিই আমায় ডেকে এনেছ—না জেনে, না শুনে, না চিনে তুমিই আমায় ডেকে এনেছ। আমিও না জেনে, না শুনে, না চিনে তোমারই জন্যে এসেছি। কারণ তোমার মধ্যে যে ডেকেছে আমার মধ্যে সেই সে ডাক শুনেছে। যারে আমি ডেকেছি যে আমায় ডেকেছে সে আমার না পাওয়ার ধন, কিন্তু তুমিই আমার চিরকালের পাওয়ার ধন একথা কি বিশ্বাস করতে পারবে তুমি?"

আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করলাম বটে, কিন্তু হাসির মুখে সেই তার সহজ হাসি ফুটে উঠতেই বুঝতে পারলাম সে বুঝুক না বুঝুক বিশ্বাস করেছে। তাই তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমি তার পায়ের কাছে বসে আত্মনিবেদন করে বল্লাম "তবে আমায় নাও—নিয়ে, তার পর যত ইচ্ছা বেদনা দাও, আঘাত কর, কাঁদিয়ে দাও, গলিয়ে দাও কিন্তু সেই সঙ্গে আমি যে তোমারি এবং তোমারি হয়ে সবারি এইটেই আমায় সজোরে জানিয়ে দাও, আগুনের রেখায় প্রাণে লেগে দাও। দিতে পারবে হাসি?"

জানিনা সে আমার কথা সম্পূর্ণ বুঝলে কিনা, কিন্তু তার চক্ষে যে পরম নির্ভরতার পরম বিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল তাই দেখতে দেখতে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম যেমন ভাবে নতজানু হয়ে উর্দ্ধমুখে তার দিকে চেয়েছিলাম তেমনি ভাবেই রইলাম। উঠে দাঁড়ান আর হল না।

কতক্ষণ যে এভাবে ছিলাম তা জানিনা, কিন্তু যখন জ্ঞান হল, দেখলাম মা এসে দুজনার মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে "ছি ছি মা, তোমার এই সন্যাসী ছেলেটী বড় নির্লজ্জ!"

মা কিন্তু আদর করে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লেন, "আমার এই গিন্নী-মেয়েটীও ত নির্লজ্জতায় কম যায় না।"

হাসি এইবার মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগল—কিন্তু তার মুখ হতে যে মা মা ধ্বনি শুনতে পেয়ে ছিলাম, সেই ধ্বনি আমার মধ্যে কি ধ্বনি যে জাগাল সেই পরম জননীই শুনতে পেয়েছিলেন, আর কেউ নয়।

আমি তখনি সংসারের কাজে বেরিয়ে গেলাম—কিন্তু সমস্ত সকালটা মাতালের মত কি যে করলাম তা জানিনে। দেওয়ানজী ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "ম্যানেজার বাবু বাড়ী যান, আপনার আজ শরীর খারাপ হয়েছে। ছোট দিদিমণি বলে পাঠিয়েছেন যে আজ আপনাকে এখনি বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে।"

আমি তবু উঠলাম না, কাগজপত্র খুলে চুপকরে চেয়ারের ওপর বসেই রইলাম। শেষে হঠাৎ অন্দর হতে আমার আদেশ এল, 'এখনি আমায় বাড়ী ফিরে যেতে হবে।'

আমি মনে করছিলাম, বুঝি এই কাজের মধ্যে আমাকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে পেরেছি। বুঝি আজও আমার সবই সেই চিরন্তন গোপনতার মধ্যে এখানে বসে আছে! ওরে মূর্খ, তা হবে কেন? আজ যে প্রভাতের সঙ্গেই জগৎচক্ষু আমার জীবনের দিক চক্রের ওপর উঠে পড়েছেন। এখন আমার ভূ ভূর্বঃ স্ব হতে সত্য পর্য্যন্ত সমস্তই সেই পরম সবিতার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সত্য হয়ে উঠেছে। আর কি কিছু গোপন থাকে?

আমায় উঠতে হল কিন্তু কি জানি কেন আমার এই অবাধ্য পা দুটো আমাকে সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে সেই আষাঢ় দিনের ভয়ঙ্কর উত্তাপের মধ্যদিয়ে আমার বন্ধুর দিকে নিয়ে চল্ল। আমি মনে করেছিলাম, যে সেই ভয়ঙ্কর আলোর মধ্যে আমায় বুঝি কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু যে চোখ একবার আমার জগতের উপর ফুটে উঠেছে, সে দুটী চোখ যে তার গবাক্ষ হতে আমারই পথের দিকে চেয়ে ছিল তা কি জানতাম আগে! জানলে কি আর মায়ের দিকে না গিয়ে বন্ধুর দিকে ঐ অবস্থায় চলে যেতাম?

কিন্তু আজ যে আমার সব পাওয়ারদিন আজ যা পাবার তাকে পেলেই শুধু হবেনা, যা না পাবার যা সাধনার তাকেও যে না পাওয়া দিতে পেতে হবে। আজ কি আমি কেবল আমাতে আছি। আজ যে আমার জন্য সারা জগতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল—সড়যন্ত্র হচ্ছিল! আমি কি করে ঠিক যেখানে যাওয়া উচিত হত সেখানে না গিয়ে অন্য কোথাও যাই।

বন্ধুর কাছে গিয়ে দেখি বন্ধু চুপ করে বসে আছে। যেন সেও কার অপেক্ষায় সমস্ত চিত্তকে একাগ্রকরে ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। যেন কে আসবে, এখনি আসবে—এখনি তার পূজা নিতে হবে, পূজা দিতে হবে। বন্ধু আমায় দেখে ছুটে এসে আমার বুকে পড়ল। আমি তাকে নিয়ে তার আসনেই বসলাম। আজ আর কোনো দ্বিধাই রইল না।

সেও আমায় জড়িয়ে ধরে বল্লে, "তোমার মুখ দেখে বোধহচ্ছে, আজ তুমি কি যেন পরম বস্তু পেয়েছ সেই বস্তু আমায় দিতে এসেছ।"

আমি বল্লাম "হ্যাঁ ভাই, তাই আজ আর কোনো গোপনতা কোনো লুকোচুরী নয়; শুধু আপনাকে উন্মুক্ত করে দেখান। কিন্তু তোমার মুখ দেখেও বুঝছি আজ তুমিও কিছু গোপন করবে না।"

বন্ধু বল্লে, "হ্যাঁ ভাই আজ আর কোনো গোপনতা নয়—আর এ লুকোচুরী সইছে না আমার। আজ আমি নিজেকে সবারই সামনে ধরে দিয়ে বলব, আমার মধ্যে যাকে চাচ্ছ সে আমি নই তবু সেই আমি। তোমরা যাকে চাচ্ছ তাকে তোমরাই আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছ, আমি সেই হয়ে গিয়েছি। এই স্থূল দেহটা তার দেহ না বলতে পার। কিন্তু সেই পরম প্রার্থিত মানুষটী আমাতেই এসেছেন। জানি না যাঁকে এঁরা এতকাল ধরে চাচ্ছেন তিনি এখন কোথায়; তবু একথাও সত্য যে মহাপুরুষকে এই পরম তপস্বিনী চাচ্ছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী তাই তিনি এই অধম আধারকেও কৃতার্থ করেছেন।"

আমি পরমানন্দে তাঁকে জড়িয়ে বল্লাম "ঠিক বলছ ভাই সে তোমার মধ্যেও আছে? ঠিক বলছ যে সে একটা স্থূল দেহ ধারণ করে কোন একটা জায়গায় আবদ্ধ নেই? সে তোমাতেও আছে? বল আর একবার বল?"

বন্ধু হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল তারপর দুবার ঐ মস্ত ঘরখানার এপার ওপার ঘুরলে, তারপর সজোরে প্রায় চীৎকার করে বল্লে, "আছে আছে নিশ্চয়ই আমাতে প্রবেশ করেছে, আমার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। আমিই সেই—"

আমিও ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লাম "আমিই সেই আমিই সেই—আমিই সেই।" বন্ধু থমকে দাঁড়ালে আমার মুখখানা দুহাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে "কে—কে—কে তুমি?"

আমি আবার বল্লাম "আমিই সেই—আমিই তোমার মধ্যে আমি—আমিই আমার মধ্যে আমি—"

বন্ধু আমায় থামিয়ে বল্লে "কে তুমি? তুমি কি সত্যানন্দ নও—তুমি কি তবে? কে তবে তুমি?"

তার ভীত আর্ত্ত স্বর শুনে আমারও যেন চমক ভাঙ্গল, আমি হেসে বল্লাম, "আজ গোপনতার দিন নয় ভাই, আজ সব লুকোচুরীর জাল ছিঁড়ে ফেলতে এসেছি। এস তোমায় বলছি।"

(ক্রমশঃ)

স্মৃতি-স্যন্দন

[শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য]

'কুহু' ডাক শুনি আজ সারা দিন-ভর,
অতীতের বেদনায় কাঁদে অন্তর !
তারি মুখ ফাঁকা বুক করে তোলপাড়,
প্রেয়সীর খাঁটি প্রেম সে কি ভুলবার !
মুখে মুখ, বুকে বুক, কত ফিস্‌ফাস্‌ !
কত সুখ নিশিদিন, ঘন নিশ্বাস !
খেয়ে চুম্‌ লাগে ধুম, ঘুমে চোখ ছায়,
চোখে চোখ দুজনায়, আঁখি আব্‌জায় !
পরশের হরষের সুখে উন্মন,—
জাগে সেই স্মৃতি আজ, একি কম্পন !
দিঠিটুক মিঠে খুব, তবু তুল্‌-তুল্‌,
বঁধুয়ার সুষমায় আজো মশ্‌গুল্‌ !
সে যে, হায়, কোথা আজ আমি কোন্ দেশ !
বুঝি বিচ্ছেদে প্রাণ আজি হয় শেষ !
দেখাহোক্ দেহে কায় !—একি সঙ্কট !
কাছে নাই তবু ছাই করি ছট্‌ফট্‌ ।
দেখা আর পাব তার কিছু ঠিক নাই,
তবু রূপ্‌-পিপাসায় কেঁদে গান গাই ।
অতীতের জীবনের মধুময় সব,
স্মৃতিটুক আজি মোর মহা বৈভব !
রাতিদিন করি' ধ্যান কাটে যৌবন,
নাহি সেই খোলা প্রাণ, নাহি সেই মন ।
দুনিয়ার মাঝে, হায়, অতি দীনহীন,
আঁধিয়ার দেখি আজ, মহা দুর্দ্দিন !

কোথা অন্তরে আর প্রেম-গুঞ্জন !
বাজে আজ বেহাগের ঘুঘু নিক্কণ !
কেঁদে যৌবনে, হায়, ফিরি চৌদিক !
কাজে মন বসে কই ! লাগে দিক্‌-সিক্ !
ফিরে কেউ নাহি চায় রহি' আশ্‌-পাশ্‌,
সদা মন উচাটন, করি হাঁস-ফাঁস !
ব্যথা সেই বোঝে যার ফাটে পঞ্জর !
অপরের হাসি মুখ, সবি সুন্দর !
আজো আপ্‌সোষে তার বুঝি গৌরব,
ভাসে আল্‌গোছে বায় দেহ-সৌরভ !
দেখি নীল শাড়ীখান আকাশের গায়,
হাসি তার ফোটে ফুল মিঠে জ্যোস্‌নায় !
আষাঢ়ের মেঘে তার খোলা কুন্তল,
কিশোরীর রূপে আজ ধরা উজ্জ্বল !
তবু, হায়, নিরাশায় বড় হল্‌-দিল্‌ !
জীবনের মাঝে সব একি গড়মিল !
ছিল দিন গেছে দিন, বৃথা গায় পিক !
পাখী "চোখ গেল" গায়, আঁখি অনিমিখ !
স্মৃতি-মন্দিরে আজ শুধু ক্রন্দন,
আরতির ফুলদল কোথা চন্দন !
একি চাল চিরকাল ! আঁখি-নির্ঝর
বাদলের ধারা প্রায় ঝরে ঝর্‌-ঝর্‌ !
বৃথা "বৌ কথা কও" ডাকে বার বার ।
ওগো আজ দেখা দাও, কর গুলজার্‌ !

মৃত্যু-মিলন

[শ্রীখগেন্দ্রনাথ বসু]

(১)

কলিকাতার অনতিদূরে এক পল্লীতে তাদের বাড়ী ছিল, বড়ভাই ইন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল স্থানীয় এণ্ট্রান্স্ স্কুলে হেডমাষ্টারী করিতেন, কিন্তু ছোট চন্দ্রনাথ লেখাপড়া সামান্যই জানিত, সুতরাং তাহাকে বাড়ীর কাজকর্ম্মই দেখিতে হইত, সংসারে মাতা, ইন্দ্রনাথের স্ত্রী মানদাসুন্দরী ও একটী শিশুপুত্র; বিষয় সম্পত্তি কিছুই ছিল না, তবে ইন্দ্রনাথ যে ৮০৲ টাকা বেতন পাইতেন, তাহাতে বেশ চলিয়া যাইত, চন্দ্রনাথ কোন চাকরী না করিলেও যে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ চরাইত, তাহা নহে, লেখাপড়া তেমন না জানিলেও, গ্রামের কেহ কোনদিন তাহাকে কোন দলাদলিতে মিশিতে দেখে নাই। বাস্তবিক তাহার ন্যায় বিনয়ী ও চরিত্রবান যুবক সে পল্লীতে আর কেহ ছিল না। বাড়ীতে একটী বালক চাকর ছিল, চন্দ্রনাথ সকল বিষয়ে তাহার সাহায্য করিত, কখনও গরুর জাব্না মাখিয়া দিত, কখনও বাগিচা ঘিরিয়া তাহার তত্বাবধান করিত, খেজুরের গাছ কাটিয়া পুকুরের ঘাট বাঁধিয়া দিত, এইরূপ সংসারের আরও অনেক প্রকারের কাজ তাহাকে করিতে দেখা যাইত, বৌদিদির ছেলে রাখা এবং অসুখের সময়ে ডাক্তারের বাড়ী হইতে ঔষধ আনিয়া দেওয়া তাহার অন্যতম কাজ ছিল।

ইহা ভিন্ন অন্য বাড়ীতে কাহারও সাংঘাতিক অসুখের কথা শুনিবামাত্রই সে রোগীর শয্যাপার্শ্বে ছুটিয়া যাইত। কিছুদিন রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের স্থানীয় শাখা সমিতির সংস্পর্শে আসিয়া এমন নিপুণতার সহিত সে শুশ্রূষা করিতে পারিত যে পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারেরাও তাহার কার্য্যে বিস্মিত হইয়া যাইতেন, পরের বাড়ীর এই কাজটুকুর জন্য বৌদিদির নিকট অনেক সময়েই তাহাকে লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইত, কিন্তু কিছুতেই সে পরের বিপদে স্থির থাকিতে পারিত না। মানদাসুন্দরী প্রায়ই তাহাকে আকার ইঙ্গিতে এমন করিয়া বুঝাইয়া দিত যে—যে কোন ব্যক্তিই স্পষ্ট বুঝিতে পারে এমন করিয়া বসিয়া বসিয়া দাদার অন্নধ্বংস করিলে চলিবে না, একা মানুষ কি করিয়া এতগুলির পিণ্ডির যোগাড় করিবে।

নিজের জন্য তাহার কোন কষ্ট ছিল না, কিন্তু যখন বৃদ্ধা মাতাকে উদ্দেশ করিয়া মানদাসুন্দরী অজস্র গালি বর্ষণ করিত, তখন চন্দ্রনাথের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইত, বৃদ্ধা বিধবা মাতার দিনান্তে একমুষ্টি হবিষ্যান্নের জন্য স্বীয় গর্ভের সন্তানের রাক্ষসী বধূর অধীন হইয়াও নিস্তার নাই, ইহা কোন্ মাতৃভক্ত পুত্র নীরবে সহ্য করিতে পারে? ইন্দ্রনাথ ইস্কুলের কাজ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, এ সব ব্যাপার তাঁহার কাণে পৌছিবার অবসর পাইত না, অথবা তিনি কিছু কিছু জানিতে পারিলেও তাহা উপেক্ষাই করিয়া যাইতেন।

রাত্রে আহারের পরে ইন্দ্রনাথ কি একটা সাপ্তাহিক পরীক্ষার কাগজ দেখিতেছেন, ছেলেটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মানদাসুন্দরীও সেবা শেষ করিয়া পাশে আসিয়া বসিলেন, ইন্দ্রনাথ কাগজগুলি চাপা দিলেন, নাক হইতে চশ্মা খুলিলেন, একটা অপ্রিয়কর প্রস্তাব উথাপন করিবার এখনই উপযুক্ত অবসর অনুমান করিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ওগো একটা কথা শোন," পরে অধর কোণে একটু মধুর হাসি আনয়ন করিয়া বলিলেন—"তোমার পরামর্শ ছাড়া আমিত এক পদও অগ্রসর হ'তে পারি না, কাজেই তোমার মত না নিয়ে আমি ভদ্রলোককে কেমন করেই বা কথা দিই, হরিপুরের চাটুজ্যে, বনেদি ঘর তারা; মেয়েটীও বয়স্থা, সংসার নিয়ে তুমিওতো একা পেরে উঠ্ছনা গণেশবাবু

আজ আমাকে বড্ড ধরে বসেছে, আর আমিও ভেবে দেখলাম চন্দ্রনাথেরও বয়স হয়েছে এখন—"

ইন্দ্রনাথের আর কথা শেষ করিতে হইল না। রায় বাঘিনীর ন্যায় মানদাসুন্দরী হাঁ হাঁ করিয়া স্বামীর মুখের উপর গাইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রনাথের সেই অধর কোণের মধুর হাসিটুকুর অস্তিত্ব ত লোপ পাইলই অধিকন্তু তিনিও ত্রাসে এক হাত পিছাইয়া গেলেন,—"আর বিয়ে দিয়ে কাজ নেই, অমনি ভাল, কাজ নেই, কর্ম্ম নেই, কাঁড়ি কাঁড়ি গিলবেন, আরও বিয়ে?—দাও, বছরে বছরে ছেলেমেয়ে হো'ক কে খেতে দেবে বাপু? আর কি বলছ?—আমাকে সাহায্য? হা, হা, হা, আমি তেমনি কপাল নিয়েই তোমার হাতে পড়েছিলাম কি না! হা আমার পোড়াবিধাতা!"

মানদাসুন্দরীর স্বরটা শেষের দিকে একটু নরম হইয়া আসিল আবার আঁচলখানি দিয়া চক্ষুর কোনটাও মুছিয়া ফেলিলেন, স্ত্রীর স্বভাব ইন্দ্রনাথ বেশ জানিতেন, কেবল স্ত্রীলোককে শাসনে রাখিবার ক্ষমতাই তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে— এক কথা বলিলে দশ কথা শুনিতে হইত, একটা চড় চাপড় মারিলে তাহার পৃষ্ঠে অন্ততঃ পক্ষে সেইরূপ ৬টী পড়িত, তাহাকে বাধ্য হইয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হইত, ইহার আর আপিল ছিলনা?

কিন্তু ইন্দ্রনাথ আজ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাহার দুরদৃষ্টই বলিতে হইবে। মানদাসুন্দরীকে বলিলেন—"এত বাড়াবাড়ী তোমার ভাল নয় মানু! খাবার ভাবনা আমার আছে, তোমায় তাতে কি?"

মানদাসুন্দরীও একবার উপরে চড়িল—"তা বই কি? ভাবনা ওর আছে। ভাই বলতে পাগল! এদিকে গুণধর ভাই দাদার বুকের উপর বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছেন, তা দেখছেন না, তখন দুচোখ কাণা হয়ে যায়।"

এই সময়ে বাহিরে দীর্ঘনিশ্বাসের একটী মর্ম্মভেদী শব্দ শ্রুত হইল, কিন্তু স্ব স্ব যন্ত্রণাপীড়িত দম্পতীযুগলের কর্ণে তাহা প্রবেশ করিল কিনা জানি না।

ইন্দ্রনাথ পুনরায় পরীক্ষার কাগজে মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, শত বৃশ্চিকের অসহ্য বিষ এককালে তাঁহার মস্তিকে ঢুকিয়া যেন সমস্তই গোলমাল করিয়া দিতেছিল, তিনি শুইয়া পড়িলেন, মানদাসুন্দরী প্রথমে একটু অনুতপ্ত হইয়াছিলেন, পরে ভাবিলেন, 'দাম্পত্যে কলহেচৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' এ মেঘ বাতাসে টিকিবে না।

(২)

বৈশাখের সন্ধ্যার প্রাক্কালে চন্দ্রনাথ সমস্তদিন বাহিরে ভীষণ পরিশ্রম করিয়া ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসিয়াছে, সমস্ত শরীরে ঘর্ম্মের স্রোত, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক, ক্ষুধায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, সে ভীতিবিজড়িত কণ্ঠে বৌদিদির নিকট একগ্লাস জল চাহিল।

ইন্দ্রনাথের ছেলেটী অসুস্থ তার উপর অসহ্য গরম, বৈকালে হইতেই সে কান্দিতেছিল, কোন প্রকারেই তাহাকে শান্ত করা যাইতেছিলনা, সুতরাং আজ মানদাসুন্দরীর ক্রোধের মাত্রা বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় কোন দুটী অভিশপ্ত জীবের উপর ধাবিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, চন্দ্রনাথের গলার আওয়াজ পাইয়া মানদাসুন্দরী "তেলেবেগুণে" জলিয়া উঠিলেন সঙ্গিনীসুলভ তিরস্কারের খোঁচা আজ দেবরের হৃদয়ে বড় বাজিল, আজ আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই বলিয়া উঠিল—"মুখ সামলিয়ে কথা বলো বৌদি, আমি তোমার খাইনে।"

"ওরে ড্যাকরা গাঙ্গের কুলে, আমার নাখাস্ আমার স্বামীর খাস্, বলতে লজ্জাও করে না মুখপোড়া! যেখানে পারিস দূর হয়ে যা।"

চন্দ্রনাথ কান্দিয়া ফেলিল, ইন্দ্রনাথ ঘরেই বসিয়াছিলেন তখন তাঁহার এমন সাহস হইল না যে হতভাগ্য ভাইয়ের পক্ষ হইয়া রায়বাঘিনীর বিরুদ্ধে দুটী কথা বলেন, বৃদ্ধামাতা জ্বরে ঘোর অচেতন, তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই।

তখন কালবৈশাখীর তাণ্ডব লীলা আরম্ভ হইয়াছে, সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, টুপ্ টাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, মাঝে মাঝে সৌদামিনীর অপূর্ব্ব লীলা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ভীম অশনি গর্জ্জন মানবের মনে এক

গ্রাসের সঞ্চার করিতেছিল, সেই প্রচণ্ড ঝটিকাবৃষ্টি মাথায় করিয়া চন্দ্রনাথ অন্ধকারের সহিত মিশিয়া গেল, আজ বিদ্যুতের ক্ষণিক চমক তাহার শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, অন্তর্যামী ভগবান তাহার একমাত্র সহায়।

বরাবর লাইনের পথ ধরিয়া রাত্রি একটার সময় চন্দ্রনাথ শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিল, ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং দিনের পরিশ্রমে তাহার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, সে আর পথ চলিতে অক্ষম হইয়া ষ্টেসনে এক বেঞ্চির উপরে শীঘ্রই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

(৩)

পরদিন সকালে উঠিয়াই চন্দ্রনাথ হ্যারিসন রোডের রাস্তা ধরিল, কিন্তু কোথায় যাইবে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর এত কাতর যে বেশীদূর হাটিয়া যাইবারও ক্ষমতা হইতেছে না, অথচ সঙ্গে একটি পয়সাও নাই যে এক পয়সার ছোলাভাজা খাইয়া একটু জলপান করিবে। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সে যে এক খানি ময়লা কাপড় পরিয়াই বাড়ির বাহির হইয়াছে। সে পথিপার্শ্বস্থ কল হইতে হাত মুখ ধুইয়া উদর পরিপূর্ণ করিয়া জলপান করিল, পরে কোথায় যাইবে ভাবিতে লাগিল, তাহার আর যাইবার স্থান কোথায়? গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক এখানে চাকরী করেন বটে, কিন্তু সে কাহারও বাসা চেনেনা, কোন রাস্তায় বাসা তাহাও জানে না, কয়েকজন ভদ্রলোকের নিকট তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া গালি খাইল, কেহ বা পাগল বলিয়া তাহাকে পুলিশের ভয় দেখাইল। নিতান্ত নিরাশ হইয়া চন্দ্রনাথ একটা বড় বাড়ীর গাড়ীবারান্দার একপাশে বসিয়া পড়িল।

ক্রমে বেলার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর এবং লোকজনের যাতায়াত বাড়িতে লাগিল, সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত, সহায় সম্বলহীন চন্দ্রনাথের খোঁজ লইতে এ পৃথিবীতে কেহই নাই, চন্দ্রনাথের চক্ষু ফাটিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঐ যে দুটী ভদ্র লোক তাহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে আসিতেছে, তবে বুঝি চন্দ্রনাথের চক্ষের জল সার্থক হইল, তাহার দুঃখের নিশার অবসান হইল। কিন্তু কৈ, না, তাহারা একবার চাহিয়া দেখিয়াই চলিয়া গেল,—হা অদৃষ্ট!

অপর ফুটপাথে একখানি মোটর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার আরোহী হ্যাটকোটধারী একটী বাঙ্গালী বাবু। দুর্ভাগা চন্দ্রনাথ সাহসে ভর করিয়া একটা চাকরী চাহিতে তাঁহার নিকট গেল, কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সেই উষ্ণমস্তিষ্ক বাবুটী "নেহি নেহি মিলেগা, ভিয়া ভিক নেই মিলেগা, নিকাল যাও" বলিয়া তাড়াইয়া দিলেন, এবার চন্দ্রনাথ আর কাহাকেও কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া বরাবর হাওড়া পুলের উপর গিয়া উঠিল, একবার মনে করিল, এখান হইতে লাফাইয়া পড়িয়া জীবনের অবসান করি, যাহার উদরান্নের সংস্থান করিবার ক্ষমতা নাই তাহার মরণই মঙ্গল, আবার ভাবিল না মরিতে ত হইবেই না খাইয়া, নিজে কেন উপযাচক হইয়া পাপের ভাগী হইতে যাইব, সে পুল হইতে নামিল, গঙ্গায় স্নান করিয়া রোদে কাপড় শুকাইল, পরে সেই গঙ্গাতীরেই অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে একটা গাছের তলায় শুইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল,

কিন্তু মৃত্যু আসিল না, আসিল তাহার পরিবর্ত্তে মূর্ত্তিমতী করুণারূপে সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের স্নেহমধুর ডাকে চন্দ্রনাথের গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন সন্ধ্যা হইতে বড় বেশী দেরী নাই। ভদ্রলোককে দেখিয়াই চন্দ্রনাথ কাঁদিয়া ফেলিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাবা?"

চন্দ্র। আমার নাম চন্দ্রনাথ, আমি বামুনের ছেলে বাবা! কাল হতে আমার কিছুই খাওয়া হয়নি, আমাকে বাড়ী হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছে।

ভদ্রলোকটী তখন সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বলিলেন—"তোমার কোন চিন্তা নেই বাবা! আমার সঙ্গে চল্ ঐ যে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

ভদ্রলোকটীর নাম রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়। ভবানীপুরে তাঁহার একটী কাঠের আড়ৎ ও একটী মুদীখানার দোকান আছে, তাহাতে তাঁহার প্রচুর আয়। নিকটেই তাঁহার বাসাবাড়ী। চন্দ্রনাথ তাঁহার পরিবারে আশ্রয় পাইল। পরিবারে লোক অল্প, রজনীবাবুর স্ত্রী কুসুমকুমারী, দশম বর্ষীয়া কন্যা কমলা ও একটী ঝি ব্যতীত আর কেহ ছিল না।

চন্দ্রনাথ কুসুমকে মা বলিয়া ডাকে, কমলাকে সহোদরার ন্যায় স্নেহ করে, দুইবেলা নিরুপদ্রবে উদর পূর্ত্তি করিয়া আহার করে আর কাঠের আড়তের কাজকর্ম্ম দেখে।

চন্দ্রনাথ বেশী লেখাপড়া না জানিলেও রজনীবাবু শীঘ্রই তাহার বুদ্ধিবিবেচনা ও সচ্চরিত্রতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। আড়তের কার্য্যের পরিমাণ কমাইয়া ঘরে বসিয়া যাহাতে কিছু লেখাপড়া শিখিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিছুদিন পরে তাহার ১৫৲ টাকা বেতনও বরাদ্দ করিয়া দিলেন, কিন্তু সে কখনও মাহিয়ানা লইত না। খোরাক পোষাক রজনীবাবুর সংসার হইতেই চলিয়া যাইত, পকেট খরচের জন্য কুসুমকুমারী তাহাকে প্রায়ই কিছু কিছু দিতেন। চন্দ্রনাথের দিন স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতে লাগিল।

(৪)

দুই বৎসর অতীত হইল, এই দুই বৎসর চন্দ্রনাথ যেন বাহ্যজগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া গেল, সেই কালবৈশাখীর সন্ধ্যাবেলা! যে কালসন্ধ্যায় সে প্রিয়তম জন্মপল্লী হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়াছে, আজ সেই কথাই মনে পড়িল। মা তাহার তখন রোগশয্যায় যন্ত্রণাকাতর! আজ তাহার মনে হইল মা তাহার তেমনি রোগশয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, না হইতেছে সেবাশুশ্রূষা, না হইতেছে কিছু। হায়, তাঁহাকে দেখিবার আর কেহই নাই, চন্দ্রনাথ কুসুমকুমারীর নিকট হইতে টাকা লইয়া বাজারে গেল, পীড়িতা মাতার জন্য বেদানা, আঙ্গুর, ন্যাস্‌পাতি যত পারিল কিনিল, আর কিনিল ছোট ভাইপোটির কচিহাতে তুলিয়া দিবার জন্য খেলনা সম্মুখে যত রকমের দেখিল, আর তার মুখে দিবার জন্য সন্দেশ, ক্ষীরের নাড়ু, লজেঞ্জস আরও কত কি! তার পর সে একখানা গাড়ী করিয়া সিয়ালদহ ষ্টেসনের দিকে গেল।

সে যখন গ্রামের ষ্টেসনে নামিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, শুক্লাষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র মধ্যগগনে হাসিতেছে! ষ্টেসন হইতে বাড়ী বেশী দূরে নহে। খাবার ও খেলনার মোটটী স্কন্ধে লইয়া চন্দ্রনাথ চলিল, কিন্তু একি! তাহার সমস্ত শরীর থর থর কাঁপিতেছে, পা যে আর চলেনা, দুই বৎসরের মধ্যে না জানি বাড়ীর কত পরিবর্ত্তনই হইয়াছে; মা ছিল রোগশয্যায়, সে কি এখনও বেঁচে আছে? ভাবিতে ভাবিতে চন্দ্রনাথ বাড়ীর মধ্যে গিয়াই উপস্থিত হইল তাহার পদশব্দে ভীত হইয়া একটা শৃগাল উঠানের একপার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে দৌড়িয়া গেল, চন্দ্রনাথের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সে ডাকিল—মা মা, কিন্তু কেও উত্তর দিল না, আবার উচ্চৈস্বরে ডাকিল—দাদা—, কোন উত্তর নাই, আজ কোন ঘরে একটী প্রদীপও জ্বলে না।

চন্দ্রনাথের সাড়া পাইয়া পার্শ্বের বাড়ী হইতে জ্ঞাতিখুড়ো ভবানীশঙ্কর একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া আসিলেন। "কে বাবা চন্দ্রনাথ, বস," "একি কাকা!" "বস বাবা বল্‌ছি। কি কর্‌বে বাবা সবই বিধির লিখন, তুমিই বা বাড়ী ছেড়ে যাবে কেন? আর তাও বলি মা বাপ ত কারও চিরকাল—" "শীঘ্র বলুন কাকা, কি হয়েছে?"

"এই বলছি বাবা, বস, তুমি যাওয়ার পরে বড্ড তোমার জন্য ভেবে ভেবে পাগল। আর সেই যে জ্বর দেখে গিয়েছিলে,—সেই জ্বরই তার কাল হল, তাতেই তার দেহান্ত হয়েছে। ইন্দ্রনাথ একটা মোটা চাকরী পেয়ে সপরিবারে মুঙ্গেরে চলে গেছে, তোমার খোঁজ অনেক দিন পর্য্যন্ত করেছিল কিন্তু—"

চন্দ্রনাথ 'মাগো' বলিয়া একটা গগনভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল।

পরদিন বেলা ১২ টার সময় চন্দ্রনাথ যখন কুসুমকুমারীর পায়ের উপর লুটিয়া পড়িল, তখন তিনি তাহার চেহারা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কান্দিতে কান্দিতে চক্ষু জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। এক-রাত্রের মধ্যেই মাথার চুলগুলি এমন রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে যেন এক বছরের মধ্যে তাহাতে তেল পড়ে নাই। গাল-দুটী যেন কে চড় মারিয়া বসাইয়া দিয়াছে। চন্দ্রনাথকে আশ্বাস দিয়া কুসুমকুমারী বলিলেন—এক মা গিয়াছে, আর এক মা আমি আছি, তোমার কিসের দুঃখ বাবা!

সময়ে সব সহিয়া যায়, চন্দ্রনাথের শোকাবেগও প্রশমিত হইল, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কোন খোঁজ না পাইয়া খিন্নমনে

দিন কাটাইতে লাগিল। মুঙ্গেরে পর পর ৪।৫ খানি চিঠি লিখিল, কিন্তু একখানিরও উত্তর পাইল না। অবশেষে সে নিজের অভিশপ্ত জীবনকে ধিক্কার দিয়া নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িল।

(৫)

দিন জলের ন্যায় তর তর বেগে চলিয়া যায়, কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না, ইহা অত্যন্ত সাধারণ কথা, চন্দ্রনাথের জীবনের আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল, কমলা পনের বৎসরে পা দিল। এখন আর তাহাকে অমনি রাখা যায় না, পাত্রস্থা করিতে হইবে। স্বামী স্ত্রীর এত দিনের অভিলাষ ব্যক্ত করিবার সময় উপস্থিত। নানারূপ পরামর্শের পর এ বিষয়ে কুসুমকুমারীই অগ্রসর হইলেন, কারণ "প্রায়েণ গৃহিণীনেত্রাঃ কন্যার্থেষু কুটুম্বিনঃ।" কন্যা সংক্রান্ত কর্ম্ম গৃহিণীর অভিপ্রায়ানুসারেই হইয়া থাকে।

চন্দ্রনাথকে ডাকিয়া কুসুমকুমারী তাহাদের সংকল্পের কথা বলিলেন, চন্দ্রনাথ মূর্খ, চন্দ্রনাথ সহায় সম্পদহীন, চন্দ্রনাথ গৃহহীন নিরাশ্রয়, এ সংসারে চন্দ্রনাথের আপন বলিতে কেহ নাই, এইরূপ পাত্রের হাতে ধনী সওদাগরের কন্যা পড়িবে, এ যে স্বপ্নেরও অতীত, তাই, চন্দ্রনাথ অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "আপনি কি বলছেন মা, আমার মন পরীক্ষা কর্‌ছেন?"

কুসুম। তুমি কিসে তার অনুপযুক্ত?

চন্দ্র। আমি মূর্খ।

কুসুম। কেবল ইস্কুল কলেজে পড়লেই বুঝি বিদ্বান হওয়া যায় বাবা!

চন্দ্র। আমার কেউ নাই।

কুসুম—আমরা আছি।

চন্দ্র। আমার মাথা রাখবার স্থানটুকু নেই মা!

কুসুমকুমারী ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন—কেন কমলার ঘরবাড়ী কি তোমার কিছু নয়?

চন্দ্র। সারা বাঙ্গালা দেশ খুঁজে আপনরাও কি আর একটা ছেলেজুটাতে পার্‌লেন না?

কুসুম। তা'হ'লে যে তোমাকে হারাতে হয় বাবা! তা আমাদের অসহ্য। আর তাও বলি শুধু পাশ করা ছেলের হাতে মেয়ে দিলেই মেয়ে সুখী হয় না। আবার কুলশীলও দেখ্‌তে হয়।

এবার চন্দ্রনাথ প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—আমি নিতান্তই অকৃতী মা! অসময়ে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের কথা রাখ্‌তে পারছিনা, এত সুখ আমার ন্যায় হতভাগ্যের কপালে সইবে কেন? আমাকে ছেড়ে দিন আমি চ'লে যাই, কত দীনদুঃখীর দিন কেটে যাচ্ছে আমারও যাবে।

কুসুমকুমারীর চক্ষুও ছল ছল করিয়া আসিল, চন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—ছি বাবা নিজেকে অত হেয় মনে কর্‌তে নেই, পুরুষ ছেলে, তোমার কিসের দুঃখ? কথায় বলে পুরুষ না লক্ষ্মী!

চন্দ্র। আমায় আর কিছু বলবেন না মা! কমলার বিয়ের ভার আমি নিলাম, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমাপেক্ষা শতগুণে শ্রেয় ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিব।

কুসুম। ছি বাবা, তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ! রাম কৃষ্ণ মিশনের বই যারা পড়ে, তারা বুঝি বিয়েকরে না?

চন্দ্র। বড় দুঃখ মা আমি পাঁচবছর আপনাদের সঙ্গে আছি, এখনও আমাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না।

কুসুম। খুব চিনেছি বাবা, সংসার কর্‌তে গেলে ছোট বড় অশান্তি ত আছেই, কিন্তু তুমি সে আশঙ্কা কর্‌ছো কেন? কমলাকে তুমিও পাঁচ বছর ধরে দেখ্‌ছ, তার মতি গতি আচার ব্যবহার তোমার অবিদিত নেই।

চন্দ্রনাথ নীরবে বসিয়া রহিল, এ কথার কোন উত্তর দিল না, বুদ্ধিমতী কুসুমকুমারী অদ্যকার মত রণে ভঙ্গ দেওয়াই যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন।

কিন্তু চন্দ্রনাথের মতিগতিরও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, পরন্তু সে পরদিন সকাল বেলায় মুখুজ্যে মহাশয়ের নিকট যাইয়া বিদায় চাহিল—"আমি আজ যাব অনুমতি দিন।"

"কোথায় যাবে?"

"ঠিকানা নেই"

"তবে?"

চন্দ্রনাথ ঘাড় নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুখুজ্যে মহাশয় পুনরায় বলিলেন "বিবাহ নাই বা করলে কিন্তু এ বাড়ীতে থাকতেও কি দোষ?"

"যদি আপনারা থাকতে না দেন তবে—" "পাগল আর কি?" মুখুজ্যে দম্পতী তাহাদের পাগল ছেলেকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিল না, তাহার একগুয়েমী চির প্রসিদ্ধ, অবশেষে তাহার অভিপ্রায়ানুসারে মুখুজ্যে মহাশয় তাহাকে ভিন্ন বাসা করিয়া দিলেন, দুইহাজার টাকা দিয়া একটা দোকান করিয়া দিলেন। ক্রমে বাদানুবাদের পর চন্দ্রনাথ ৫ বৎসরের বেতনবাবদ এক হাজার টাকা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইল, বাকী এক হাজার মুখুজ্যে মহাশয়কে ফেরত লইতে হইবে।

চন্দ্রনাথ চাল, ডাল, নুন, তেল হইতে আরম্ভ করিয়া কাপড় জামা ইত্যাদি নিত্যাবশ্যকীয় সমস্ত জিনিষই দোকানে আমদানী করিল, দুটী লোক রাখিয়া নিজেও পূর্ণোদ্যমে কাজ কর্ম্ম দেখিতে লাগিল।

অবকাশ পাইলেই সে প্রতিদিন একবার করিয়া মুখুজ্যে মহাশয়ের বাড়ীতে যায়, কমলার বিবাহের জন্য পাত্রেরও খোঁজ করে, কিন্তু সে মুখুজ্যে দম্পতির মনে যে কষ্ট দিয়েছে, কিছুতেই তাহার অপনোদন করিতে পারিল না।

(৬)

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।' সকলের ভাগ্যে লক্ষ্মী লাভ হয় না, কিন্তু চন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর অযাচিত কৃপা প্রাপ্ত হইল। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে ফাঁপিয়া উঠিল, এখন সে কারবার বিশগুণ বড় হইয়াছে, আজ কতলোক তাহাতে খাটিতেছে। লোকজন রাস্তা দিয়া যায় চেয়ে চেয়ে দেখে আর বলে—একেই বলে পাতাচাপা কপাল! কিন্তু যে চন্দ্রনাথ সেই, এত বড় হইয়াও তাহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না, সেই সত্যনিষ্ঠা, সেই সাধুতা, সেই পরোপকারীতা, সেই দৃঢ়তা, আবার সেই সরলতা সেই জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা, তাহাকে কেহ সংসারী হইতে বলিলে অমনি তাহার মুখখানি গম্ভীর হইয়া যায়, হৃদয় আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠে, সে যেন কত বড় মহাপাপের কথা! কিন্তু তাহার মনে কি শান্তি আছে? হায়, এ সুখ সম্পদের দিনে যদি তাহার মা বাঁচিয়া থাকিতেন! যদি তাহার দাদার খোঁজ হইত!

বেলা তখন ১টা বাজিয়া গিয়াছে। আহারাদির পর একটু বিশ্রামের জন্য চন্দ্রনাথ দোকানের ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া শুইয়া আছে। এমন সময়ে দোকানের একটা বালক কর্ম্মচারী দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে জানাইল—"বাবু, বাবু একটা লোক ব্যারামে বড় কাতর ঐ রাস্তার পাশেই পড়ে আছে, আপনাকে খোঁজ করছিল" চন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইয়া দেখেন, সে স্থান লোকে লোকারণ্য, জনতা ঠেলিয়া ভিতরে গেলেন, লোকটার মুমূর্ষু অবস্থা। কিন্তু তখনও সে অতিকষ্টে আধাভাঙ্গা আধা উচ্চারিত বাক্যে মর্ম্মের বেদনা লোকসমাজে জানাইতেছে—"না, ভগবানের রাজ্যে পাপের শাস্তি আছেই। ওঃ আগে যদি জানিতাম! কুহকিনীর মায়ায় ভুলিয়া বুঝিয়াও বুঝি নাই। মাকে অযত্নে অবহেলায় মারিয়া ফেলিয়াছি, প্রাণের অধিক সেবাপরায়ণ ভাইকে তাড়াইয়া দিয়াছি। ওঃ ইহা কি তাহারি ফল! একমাত্র ছেলেটা কলেরায় মরে গেল! কুহকিনি, তুইও ত পচে গলে মরলি। তার পর আমিও ব্যারামে পড়্লাম। দেখ্বার লোক নাই, পয়সা নাই যে লোক রাখিব। অর্থের অভাবে অসুস্থ ক্ষীণ শরীর নিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ভগবান্ এখনও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে আবার বলিতে লাগিল—"যদি চন্দ্রনাথের দেখা পাইতাম, ক্ষমা চাহিয়া লইতাম। চন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, ভাইরে এলি ভাই!"

চন্দ্রনাথ পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া ইন্দ্রনাথের বুকের উপর যাইয়া লুটাইয়া পড়িল। সে অঝোরে কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"দাদা, দাদা, দেখ এইত আমি এসেছি।"

"চন্দ্রনাথ এতদিনে কি তোর অভিমান গেলরে ভাই, বড় ভায়ের উপর কি এমন অভিমান করতে হয়রে। আজ তোকে পেয়ে আবার—আমার বাঁচ্তে ইচ্ছা হচ্ছে—কিন্তু আর যে সময় নেই—আর বল্তে পারছি না।

"দাদা, দাদা, এই শোচনীয় পরিণাম তোমার!"

চন্দ্রনাথ দাদার দেহ কোলের উপর উঠাইতে যাইয়া দেখে, তাহা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, মুখ হইতে রক্তস্রাব হইয়া একটা ছোট গর্ত্তে গড়াইয়া পড়িয়া ঢেউ খেলিতেছে. কোন্ মুহূর্ত্তে যে হাত দুখানি যুক্তকরে বুকের উপর স্থাপিত হইয়াছে, তাহা কেহ লক্ষ্যও করে নাই। . . .

শিল্পকলা-বিজ্ঞান

[শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়]

তত্ত্ব

শিল্পকলা-বিজ্ঞানে মানবজাতির অন্তরেন্দ্রিয়ের বিকাশ হয়। চিত্রশিল্পী অন্তরের চক্ষুদিয়া যে সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে বাহিরের চক্ষুতে সেটি দেখিতে যখন একান্ত ব্যাকুল হয় তখন তাহার মুখ-ভাবে, আকারে ইঙ্গিতে, কথায়, গানে, তুলির টানে সকল কর্ম্মে, সকল বাক্যে লোক চক্ষুর গোচরে সেই সৌন্দর্য্য ফুল-ফোটার মত বাহির হইয়া পড়ে। গায়ক যখন ভিতরের কানে যাহা শুনিয়াছে তাহা নিজের সুরের সাহায্যে বাহিরের কানকে শুনাইতে চায় তখন সে কলা-বিজ্ঞানের দ্বারে আসিয়াছে বুঝিতে হইবে। সুধাময় অমৃতের স্বাদ পাইয়া বাহিরের রসনাকে তৃপ্তকরিবার জন্য যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন তদ্বারা যে অমৃতোপম দ্রব্য তৈয়ার করে সেও কলাবিজ্ঞানের ঘরে আসিয়াছে। ভিতরের সুন্দর গন্ধে আমোদিত হইয়া সেটি অনুভব করিবার চেষ্টায়, শিল্পী যখন নানা ফুল হইতে ভিতরের গন্ধটি মিলাইয়া মিলাইয়া, তাহার মত গন্ধ তৈয়ার করিয়া গন্ধে বিভোর হয় তখন সে শিল্পকলার তত্ত্ব বুঝিয়াছে। কবি যখন তার স্বপ্নদৃষ্ট নাটকের ভাবে বিভোর হইয়া, নিজ মানস-কল্পনার সাহায্যে সেটি বর্ণনা করিয়া নিজে মোহিত হইতে চাহেন তখন তিনি শিল্পীপদবাচ্য।

নিজে ভাবুক না হইলে শিল্পকলা বিজ্ঞানের রসিক হওয়া যায় না। ধৈর্য্য প্রেম, দয়া, দান, কৃতজ্ঞতায় মনকে ভরাইয়া ফেলিলে তবে লোকে শিল্প যজ্ঞের আহুতি দিবার যোগ্য হয়; তবেই তার মনের কপাট খুলিয়া যায়। লোক-লজ্জা, লোভ, ভয়, ক্রোধ, বাহিরের নয়নকেই অন্ধ করিয়া দেয়, এসব থাকিলে অন্তরের নয়ন খোলা বহুদূরের কথা! আত্মসম্মান আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞান এই তিনটির উপর ভিতরের শক্তি নির্ভর করে। এ কলাশক্তি শক্তিমানকে লাভ করিবার জন্য আপনিই আসিয়া পড়ে। ভিতরে আত্মসম্মান বোধ না থাকিলে বাহিরে আত্মারামকে তৃপ্ত করিবার ইচ্ছাইবা কেন হইবে? আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে সদানন্দময় হওয়া চাই। প্রেমে প্রাণ পোরা থাকিলে তবেই না সকলের রূপেই একটা নিত্যানন্দ সৌন্দর্য্যের ভাব আসিয়া মনকে মোহিত করিয়া রাখে।

ভারতবর্ষের শিল্পকলা-বিজ্ঞান-বিদ ঋষিরা চাহিয়া ছিলেন সেই পবিত্র ধী শক্তি, যার দ্বারা সেই অমৃতের পুত্রগণ মধুময় হইয়াছিলেন। যজ্ঞ দান তপস্যার দ্বারা পবিত্র হইয়া তবে সেই বুদ্ধিলাভ করা যায়। সেই বুদ্ধির সুর বিশ্বের ধী-শক্তির সহিত একসুরে বাঁধার নাম কলাবিজ্ঞান। এই সুর যে পর্দ্দার বাঁধা তাহার তারতম্যের উপর শিল্পীর শিল্পের ভালমন্দ নির্ভর করে। সুযোগের অন্বেষণে শিল্পী ঘুরিয়া বেড়ায় না। শিল্পী গ্রামোফোনের মত সুযোগের ভাবকে ধরিয়া রাখিয়া সেটির সুরে সুর গায়। সুযোগ ও সুবিধার ভাব "লক্ষ্মীর" মত তাহার ঘরে বাঁধা থাকে। শিল্পী সাহসের দ্বারা নিজের পথ নিজে গড়িয়া যে সিদ্ধির উচ্চাসনে উঠিয়া বসে সেখানে ধনী যশস্বী কেহই উঠিতে পারে না।

কলাবিদ্যার মূলতত্ত্ব এই অন্তরের জানাকে বাহিরের

জানাতে পরিণত করার চেষ্টা। এ চেষ্টার কথা যে নিজে অন্তর্মুর্খ সে ছাড়া কে বুঝিবে! এ হিসাবে শিল্পী "বিশ্বকর্ম্মা।"

জগৎ ভাবময়ী। ভিতরের ভাব বেশ বিধিবদ্ধ হইয়া ভিতরে থাকে, শিল্পী সেটাকে আপন তুলিকায় ফলাইয়া তোলে। শিল্প বিজ্ঞান হইয়া ফুটিয়া উঠে। শিল্পরূপ ভাব বিজ্ঞানরূপ ভাষা হইয়া প্রস্ফুট হয়। যে গুপ্ত চিত্র ভিতরে বেদের মত জানা ছিল, কালে তা শিক্ষা হইয়া বিজ্ঞান পদবাচ্য হইল। এই বিজ্ঞান যখন অন্যে বুঝিতে পারে এরূপভাবে বিজ্ঞাপিত হয় তখনি সেটি শিল্পপদবাচ্য। ইহাই শিল্পতত্ব। যা-মঙ্গলময়ের মহাভাবরূপে অন্তরে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছিল সেই ভিতরের জানা বেদরূপীমহাভাব মহাগায়ত্রী শিক্ষাদেবী "সরস্বতীর" আকারে পর্য্যবসিত হয়। তাহাই চঞ্চলা লক্ষ্মীর আকারে শিল্পীকে সার্থক করিয়া সিদ্ধিদাতার কলাবধূটির মত বহির্গত হইয়া দিকে দিকে জনে জনে "বিশ্বকর্ম্মার" ভাবে পূর্ণ করিয়া মঙ্গলের ও কল্যানের আশীর্ব্বাদ দিয়া ধন্য করে।

ভিতরে যে জানা সেই জানাকে যে মানে সে বেদকে মানে। সে জেনে শেখে, তাই সে মানুষ। যে ঠেকে শিখিতে চায় সে মরে, এইজন্য সে মানুষের সমাজে বসিবার অযোগ্য। রাজপুত্র বুদ্ধ এই বড় জানাকে যাচাইতে গিয়া অনেক কষ্টে পড়েন। সেই ভিতরের জানাটির, সেই আদি ভাবটির নাম ব্রহ্মবিদ্যা এই জন্যই "গানাৎপরতরং নহি" "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি" দুকথাই আছে। এটি পরাবিদ্যা। "অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদাঃ শিক্ষাকল্প ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষমিতি।" বেদের মধ্যেই আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গন্ধর্ব্ববেদ অর্থশাস্ত্র ইহারা চতুর্ব্বেদের উপবেদ। শিক্ষাচতুর্দ্দশবিদ্যা। শিল্প স্থাপত্যাদি বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্রং "তত্তু গৃহবাস্তু কুণ্ডাদি করন শাস্ত্রং। শিল্পশাস্ত্রমিতি যাবৎ।"

ইতিহাস

প্রথমে ছিল সত্যের চিন্তা তাই আমরা বলি সত্য যুগ। মানব-শিল্পীর জীবন পশু-জীবনের মত নির্ভুল ছিল। এটি সরল বিশ্বাসের সত্য যুগ তখন কোন খান দিয়া মিথ্যা আর প্রবেশ করিতে পারিত না। পাখিদের জীবনের মত দুঃখহীন পাপহীন অভাবহীন সকলের জীবন ছিল। তখন মাকড়সার মত মানুষ মুখের লালাদিয়া সুতা তৈয়ার করিয়া জাল বুনিতে জানিত। গুটির মত নিজের ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া তাহার ঘর কাটিয়া প্রজাপতির মত সুন্দর হইয়া বাহির হইত। কেহ তাহাকে সিদ্ধ করিবার ছিল না। তখন গাছেদের নিকট সে যা চাহিত তাহারা কল্পতরু হইয়া তাহাই দিত। তখনকার গাভীগুলি ছিল বশিষ্ঠের কপিলা কামধেনু। ধরা-স্বর্গের নন্দন-কাননে প্রকৃতির বরপুত্রেরা স্ব স্ব রাজ্যের রাজা ছিল। তারা যেন বিরাট সমুদ্রের লহরীর মত ক্রীড়া করিত। কি এক মহান শক্তির ধারা-তত্ব হইতে তারা আনন্দ গ্রহণ করিত। সেই হচ্ছে সত্যযুগ যখন মহানিয়মের সুরে তারা এক সুরে বাজিত। তাঁর হাতের ক্রীড়ার পুতুলের মত তাঁর ভাবে বিভোর হইয়া আপনি হাসিত আপনি কাঁদিত। জলের সঙ্গে তারা জল হইয়া সাঁতার দিত। বাহিরের হাওয়ার সঙ্গে অন্তরের নিঃশ্বাস এক করিয়া লইত। তাহাদের হাসি কান্না হীরা পান্নার মত দুইই সত্য ছিল। তারা তখন বুঝিত "যস্য ছায়া অমৃতো যস্য মৃত্যুঃ।" শিশুকে যেমন একখানি কাটের পীঁড়া দিয়া বলিলেই হইল এই তোমার নৌকা এইখানটা নদী, এখানে এস স্নান কর এই তোমার খাবার সে সেই ভাবে ভাবিত হইয়া যেমন সেই নৌকায় চড়ে' আনন্দ পায় সেইখানে টুপু টুপু শব্দ করে ডুব দিয়ে নায়— সেই মাটির ঢেলাগুলি 'কয়া কয়া' করে খায় সেইরূপ তখনকার শিল্পী নিজের মনের ভিতরের সকল রূপ (Form) বিশ্বের বিশ্বনাথের রূপ একটি মাটি দিয়া লিঙ্গমূর্ত্তি তৈয়ার করিয়া তাহাতেই বিভোর থাকিত সেই একটি গোলক একটি স্তম্ভ একটি কিউবের সমন্বয়ে সে বিশ্বের সকল রূপ প্রকাশ করিত। তাহার ধর্ম্মের ভাব (Religious Kindergarton) তাহার মতের ভাব তাহাকে অজন্তার গিরীগুহার চিত্র বিচিত্র কাটাইয়া বিভোর করিয়া রাখিত। তখনকার সকল কার্য্যই খেলার মত একটু আঁচড় দিয়া হইত। তখনকার পুতুলের মুখে চুম্বন করিলে সেই পুতুল খুসী হইত এ বিশ্বাস তাদের ছিল। তারা যেমন্ বিশ্বকে বিস্ময়ের

চক্ষে দেখিত তেমনি নিজেদেরও সম্মানের চক্ষে দেখিত। তখন তারা প্রার্থনার দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি করিত যা চাহিত তাহাই পাইত কেবল চাহিবার অপেক্ষা মাত্র ছিল। স্বপ্নের দেশের মত তখন জগতটা তাদের হস্ত স্থিতআমলকীবৎ ছিল। তাহাদের জগৎ ইতিহাসের জগতের মত ইচ্ছার জগৎ (Law of necessity) ছিল। তখন শক্তিমানের নাম লইলে তাহারা শিহরিয়া উঠিত কৃতজ্ঞতায় তাহাদের চক্ষু ভরিয়া জল আসিত তাহারা ভাবোল্লাসে নৃত্য করিত। তাহাদের প্রকৃতি শিশুর মত হইলেও মহাত্মার মত ভক্তের মত তাহাদের ভাব ছিল। তাহাদের সাহস, সরলতা, সত্য-পরায়ণতা অতি অদ্ভুত ছিল। তাহারা সকলেই ব্রহ্মবিৎ সিদ্ধযোগী ছিল। বাল্যের সরলভাব, মত্তের উন্মত্ত উৎসাহ বাউলের সবুজভাব এই তিন ভাবের সম্মিলনে তাহাদের প্রেমের মূরতি গঠিত ছিল। তাই তাদের বাসস্থান গিরী-গুহা বৃক্ষতল, খাদ্য ফল মূল, স্বচ্ছন্দজাত নীবার হৈয়ঙ্গবীন গোদুগ্ধাদি, পরিধেয় বল্কল কষায় পশুলোম গ্রথিত বৃক্ষপত্র। তাহাদের জীবনের সবটাই দান (Sacrifice), শিক্ষা তাদের তপস্যা, উপাসনা তাদের যজ্ঞ। এই তিনে তারা নিজেকে পবিত্র করিত। তাদের এখনকার শিল্প স্বপ্নদৃষ্ট নরনারী সর্প প্রেত দেবদেবী। এ সময়ের শিল্পের বিচারে কথায় কেবল বলা যায় "এই সেই।" যেন কবে কোন স্বপ্নদৃষ্ট অচিন্ পাখী যাকে হৃদয়ের খাঁচাতে দোলাইয়া ভূমার স্পর্শের মত আনন্দ লাভ করিয়াছি সে যেন হৃদয়ে নূতন বসন্ত জাগাইয়া দিয়া আবার থামিল; এটি দেখিয়া সেই ভাব মনে পড়ে এজন্য সর্ব্বস্ব দিয়া সেটি পাইতে ইচ্ছা হয়। ইহা অমূল্য। ইহা যেন জগতের উপাদান বিশ্বনাথের চিন্তা জমাইয়া জ্যোস্না ছানিয়া অমিয়ার মাধুরী লীলার মত কি একটা "অদৃষ্ট" পূর্ব্ব হারান জিনিষ।

দ্বিতীয় ত্রেতাযুগে বিশ্বমানবের গায়ে একটা স্বাধীনতার হাওয়া লাগলো তাদের চোখ খুলুলো। এতদিন প্রকৃতি তাদের যেদিকে চালাতো সেই দিকে তারা চল্‌তো। ক্রমে তাদের মধ্যে "কর্ত্তার ইচ্ছার" সন্ধান পেলে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা একটা কর্ত্তারইচ্ছা শক্তির লীলার সন্ধান পেয়ে সেই ইচ্ছারএকটা ধারা একটা সুর একটা নিয়ম তারা ধরে ফেল্‌লে। তাদের দৃষ্টি খোলেনি অথচ ইচ্ছা জেগেছে। একটা মধুর গন্ধে তারা পাগল হলো। তারা পদে পদে ভুল করে করে শিখতে লাগলো। ছোট ছেলের দুরন্তপনার মত সে সব ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে হেসে যাবার ভেসে যাবার ফোট্‌বার আনন্দ পেয়ে তার চিত্তঅনুগামী পথে চললো। তার জীবন সরলরূপী খেল্‌নাকে নিয়ে কখন সে গালে পুরে দিলে কখন সে দুহাত দিয়ে বালকের মত চাপড়াতে লাগলো কখনও বা টান্‌মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে চিদানন্দময়ী মনমোহিনী মায়ের জন্য কাঁদতে বস্‌লো। সে দেখলে এই হাসি কান্নার ভিতর জীবনের মরণ বাঁচনের কত রং, কত আলো, কত আনন্দ, কত ছবি! এই জীবনের রহস্য বুঝতে সে সাত তাল খেয়ে হাঁটতে শিখলে। সে আর মা বাপের হাত ধরে হাঁটতে পারলেনা। সে রাজপুত্র বুদ্ধের সঙ্গে স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে বৈরাগী হয়ে অরণ্য বাস করতে সুরু করে দিলে। তার পূর্ব্ব যুগের স্থির (Positive) আনন্দ ছেড়ে চঞ্চল (negative) চিদানন্দে ডুবে গেল। সে স্বর্গের নন্দনকাননে আদম হবার মত জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে আর অনুতাপ করা ভুলে গেল। তাদের তীব্র স্মৃতির বলে বহু দিনের সাধনাদ্বারা একটা মানবধর্ম্মনীতি-শাস্ত্রের নিয়ম বাহির করে ফেল্লে। সে যে মাটির ঠাকুর গড়া থেকে বিসর্জ্জনের শেষ পর্য্যন্ত মানব প্রকৃতিকে বুঝে নিয়েছে! অভিনয়ে ভীমের খড়ের গদা আর তার ভয় উৎপাদন করতে পার্‌লো না। সে পাহাড় পর্ব্বত দেখে যে ভয়ে ভক্তিরসে আপ্লুত হতো সে ভাব কাটিয়ে সটান বরফের রাস্তা দিয়ে বহুদূরে যেতে লাগলো। তারা নিজে-দের মধ্যে সেই নিয়ম সেই শাসন সেই ব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠা করে তার অধীনে শান্তিতে কাটাতে লাগলো। মোহ-ঘুম আর তাদের আচ্ছন্ন করতে পারলে না। তারা সেই ঘুমকে নিজের দরকার মত আহ্বান করতে লাগলো। তাদের স্বপ্ন তাদের চিন্তার সমাধির জন্য একটা বিধিপূর্ব্বক আহূত অবস্থা হয়ে, তাদের চিত্তশক্তির বেগ (vibration) বাড়িয়ে দিলে। ধর্ম্ম ও প্রাণের আকাঙ্খার সৌন্দর্য্য ও নৈতিক জ্ঞান তার এমন এক জায়গায় এসে পড়লো যে সে যা সুন্দর যা সুনীতি-সঙ্গত তাই সে করতে আরম্ভ করল এবং তাতে

মনের উৎকর্ষ (culture) বাড়তে লাগলো। যাতে বেশী লোকের ভালো হয় তাতেই নিজের ভাল হবে এই জ্ঞান বদ্ধ-মূল হতে লাগলো, প্রকৃতির সময়-তালিকা দেখে মানবরূপ এনজিন চলতে লাগলো—লোকেদের মনে হতে লাগলো—সে নিয়মে আসে নিয়মে যায় কিন্তু সে আপনার খেয়াল মত চলতে লাগলো। সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর প্রাচুর্য্য দেখে তারা বিহ্বল হতো। এই যুগের শিল্পীরা সেই চির সুন্দরের মনের মানুষ হয়ে যে শিল্প তৈয়ার করল তাতে সুন্দর আরো সুন্দর হয়ে উঠলো। তারা বুঝল বিশ্বজগতে চরিত্রবান মূল্যবানের নাশ নেই। বড় হতে পারলে অমর হওয়া যায়। দামী জিনিশের নাশ নাই (Law of conservation of value) আত্মার এই পূর্ণ বিকাশ (Souls manifest transcendence) যুক্ত এই অমৃতের পুত্রগণ পৃথিবীর মধ্যে দেবত্ব পেয়ে যে শিল্প রচনা করল তা অল্প ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট এ যুগের লোকের কল্পনার দুর্ল্লভ। পৃথিবীর এক প্রান্তে এই অমৃত সঞ্চিত হতে লাগল অন্য প্রান্তে তাদের চিদ্-অনু দিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিরামিড গঠিত হতে লাগল। টেলি-প্যাথিও অন্তর্দৃষ্টির যত উন্নতি হচ্ছে ততই বুঝা যাচ্ছে সেই যুগের মানুষের চিদ্-অনু তাদের শরীরের নাশের পরও একাধারে মহাকাশে নানা শিল্পের আকারে আবদ্ধ আছে। শিল্প প্রতিভা বিবর্ত্তবাদের মহানিয়মে হয় না। কে বলিবে হয়তো মানুষের পাগল-ভাব দ্বিমনা (double) ভাব তার ভিতর এমন মশলা তৈয়ার করে যাহাতে তার চিত্তবৃত্তি অতীন্দ্রিয় শক্তি বিশিষ্ট হয়। এখনকার শিল্প এযুগের লোকের বিস্ময় উৎপন্ন করে।

দ্বাপর যুগের শিল্পী দেখতে আরম্ভ করলে বুঝতে আরম্ভ করলে এ আবার কিসের মিথ্যার চীনা প্রাচীর গড়ে ফেলেছি এতে কি আছে! আছে শুধু নিয়ম, শাস্ত্র আছে, শুধু শ্লোক আত্মার লাঞ্ছনা মানুষের অপমান। আমরাইতো শক্তির কেন্দ্র-আমরাইতো ডিনামাইট্। আবার এ অনুশাসনের পাহাড় কোথা হতে এলো। একে আমরা মানবো না। একে আমরা প্রণত করবো আর প্রণাম করবো না। ত্রেতার বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়'সে এখন বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণ হবার জন্য তপস্যা সুরু করে দিল। ব্রাহ্মণ দ্রোন শাস্ত্র শিক্ষা করে ক্ষত্রিয়ের আরাম উপভোগ করবার জন্য প্রবৃত্তি মার্গে ধাবিত হইল। এখনকার ব্রাহ্মণ জয়দ্রথ দুর্ব্বাসা এখন সমাজের মধ্য সদাচার রক্ষার জন্য সে নিজের জাতীয় প্রতিহিংসার জন্য ক্ষত্রিয়দের সহিত যুদ্ধ করে শাপ দিয়ে বেড়াতে লাগলো। মানুষের স্বতন্ত্রতা তাকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ব্রতী করল। এখনকার যুগ শিক্ষার যুগ—সদাচারের যুগ। এই জন্য দ্রোন গুরুর সম্মান। এখনকার শিল্প ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংশাবশেষ শিষ্টাচার ভদ্রতা (position) রক্ষার জন্য। যেন দৈত্য ময়দানবের তৈয়ারী বলে বোধ হইবে। এখনকার অজগর বিজবনে খাণ্ডব দাহন করিয়া সুন্দর বাসযোগ্য স্থান করা হইয়াছে মনে হইবে।

কলিযুগে স্ব স্ব প্রধান। সদাচারের নামেও মানুষ ভাল মন্দ বিবেচনা করেনা। নিজের যাতে ভাল হয় তাই করে। অহঙ্কার দেখান, বাড়ী ঘর প্রেমের উৎকর্ষ দেখান তাজমহল, বিলাসের প্রমোদকানন, স্পর্দ্ধার দুর্গ ইহাই এ যুগের শিল্প।

কেবল অনুকরণ (base imitation) অহংকারের মধ্যে পরের প্রভুত্ব অসহ্য বোধ হইল। এখনকার রাজা 'দাস রাজা'। অন্তর্দৃষ্টি হারাইয়া চাঁদ সদাগরের মত মারের উপর মার খায় অথচ ভক্তিকে ঠিক জায়গায় বসতে দেবে না। দুঃখ দিয়ে আর চৈতন্যের ফাঁক বুজিয়ে দিতে চায় না। এখনকার শিল্প সর্পদষ্ট অঙ্গুলীর মত বাঁধা। অভিমন্যুরমত এ শিল্পী সপ্তরথী বেষ্টিত হয়ে অবিচারে মরে।

পর্য্যায়

প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা-বিদ্যা অষ্টাদশ প্রকার। এতন্মধ্যে পরাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাও আধ্যাত্মবিদ্যা। অপরা ঋকযজুসাম অথর্ব্ব এই চারিবেদ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ; পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্ম-শাস্ত্র এই চারি শাস্ত্র বিদ্যা। সামান্য বিদ্যার মধ্যে উপবেদ চারিটি—আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থ শাস্ত্র; সামান্য বেদাঙ্গের মধ্যে দণ্ডনীতি (অর্থ শাস্ত্র, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতি) এবং সামান্য শাস্ত্রের মধ্যে শিল্পশাস্ত্র—এই শিল্প শাস্ত্রের মধ্যে শিল্প ও কলাবিদ্যা দুই বিভাগ। শিল্পের মধ্যে —স্থাপত্য বা বিশ্বকর্ম্মা-শাস্ত্র তন্ত্র গৃহবাস্তু কুণ্ডাদিকরণ শাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রমিতি যাবৎ। সামান্য শিল্পের মধ্যে—তানি তু

কাম-স্বর-নট-মুদ্রাশিল্প হনস্বগজ-রত্ন-স্থেন-পরীক্ষা-অস্ত্র নির্ম্মাণ স্থাপত্য-কেরলি-স্বর-শকুন-রাজনীতি-কাব্য-অলঙ্কার প্রভৃতি-নি। কলাবিদ্যা নীতি শাস্ত্রের দণ্ডনীতির অন্তর্গত সূপকার প্রাণীবিদ্যা উদ্ভিদ-বিদ্যা ও চতুষষ্ঠিকলা। নিম্নে চতুষষ্টি কলার পরিচয় দেওয়া গেল। এতন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন বর্ণের মধ্যে যার যা অভিরুচি সেই সেইটি শিক্ষা করিত। কেহ শস্ত্র বিদ্যা কেহ শাস্ত্র বিদ্যা কেহ আধ্যাত্ম বিদ্যা কেহ বা ব্রহ্মবিদ্যা যে যেটি ইচ্ছা বা এতন্মধ্যে দুই বা ততোধিক বিদ্যা শিখিতে পারিত। কলাবিদ্যা স্ত্রীলোকদের বেশী প্রিয় ছিল। ৬৪ কলা বিদ্যার শিবতন্ত্রে বিশেষ উল্লেখ আছে।

সংকলন পর্য্যায়

(১) গীত (২) বাদ্য (৩) নৃত্য (৪) নাটকাভিনয় (৫) আলেখ্য (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য ॥ চন্দন ও কুঙ্কুমের অলকা তিলকা ফোটাকাটা প্রসাধন,—ছাব দেওয়া; এখন সখী মালিনী ও ঘাটওয়ালারা করিতেছে (৭) তুণ্ডুল কুশুম বলি বিকার ॥ নৈবেদ্য সাজান, গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা বেদী সাজান (৮) পুষ্পাস্তরণ ॥ ফুলের শয্যাও পাখা প্রভৃতি রচনা, ফুলের তোড়া তৈয়ার (৯) দশন-রসনান্দ রাগ ॥ দাঁতে দৃক কাটা, গায়ে উল্কি পরাণ, কাপড় চিত্র বিচিত্র ছাপ দেওয়া, কাপড় ছোবান প্রভৃতি (১০) মনি-ভূমিকা-কর্ম্ম, মনি বা পাথর উঠাইয়া পিণ্ডিকা প্রভৃতি মূর্ত্তি। (১১) শয়ন-রচন ॥ খাট পালঙ্ক প্রভৃতি শয্যা রচনা, বিছানা পাতা ও সাজান। (১২) উদক-বাদ্য ॥ জলে পাত্র বা পাত্রে জল রাখিয়া বাদ্য—বর্ত্তমানকালে জলতরঙ্গ (১৩) উদকঘাত ॥ জলস্তম্ভ-বিদ্যা, ডুবুরির কার্য্য, জলে লুকান—এ বিদ্যা দুর্য্যোধন জানিত। বর্ত্তমান কালে মুক্তা-উত্তোলন। (১৪) চিত্র-যোগ ॥ আশ্চর্য্য চিত্রাদি প্রদর্শন, বর্ত্তমান ষ্টিরিঅস্কোপ, ল্যাণ্টার্ণলেকচারে ছবিদেখান প্রভৃতি। (১৫) মাল্য-গ্রহণ বিকল্প ॥ ফুলের অলঙ্কার পেটরা ধনুর্ব্বান খেলনা তৈয়ার। (১৬) শেখরা যোজন ॥ শিরোভূষণ, টুপী, পাগড়ী অলঙ্কার তৈয়ার। (১৭) নেপথ্য-যোগ ॥ রঙ্গরচনা অভিনেতাদের সাজান চুল ও অন্যান্য সাজ প্রস্তুত। (১৮) কর্ণপত্র-ভঙ্গ ॥ পত্র পুষ্পাদি নির্ম্মিত পত্রাকার কর্ণভূষন তৈয়ার (১৯) গন্ধ-যুক্তি ॥ নানা সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত। (২০) ভূষণ-যোজনা ॥ অলঙ্কার গাঁথা ও নির্ম্মাণ। (২১) ইন্দ্রজাল ॥ ভোজবাজী। (২২) কোচুমার যোগ ॥ অবার ও চিত্রাদির হুবহু অনুকরণ বা নকল-জাল করা। (২৩) হস্ত-লাঘব ॥ ক্ষিপ্র হস্ত-সঞ্চালনদ্বারা দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তন-হাতের কসরৎ শিক্ষা। (২৪) চিত্রশাক পূপ ভক্ষ বিকার ক্রিয়া ॥ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পিষ্টকাদি প্রস্তুত। (২৫) পান করম রাগসেবা ॥ মদ্য, নানা প্রকার সরবৎ ও মোরব্বাদি প্রস্তুত। (২৬) সূত্র-ক্রীড়া ॥ সূত্র সংযোগে পুতুল নাচ ও ছায়াবাজি খেলা, দাঁড়র উপর চলা, বাঁশবাজি। (২৭) সূচী যাপকর্ম্ম ॥ সূচীকার্য্য, সূতাকাটা, বস্ত্রবয়ন বর্ত্তমান মোজা জুতা বয়ন। (২৮) প্রহেলিকা ॥ হেঁয়ালী তৈয়ার পুরস্কার রচনা (২৯) প্রতিমালা ॥ বস্তুর প্রতিরূপ তোলা বর্ত্তমানকালে কলে ফটো তোলা (Bust) মডেল তৈয়ার। (৩০) দুর্ব্বাচক যোগ ॥ দুরূহ পুরাতত্ত্ব সম্বলিত কাব্যের লিপির অর্থ বর্ত্তমান দোভাষির কার্য্য। (৩১) পুস্তক বাচন ॥ বিলুপ্ত অক্ষরের পুস্তক পাঠ, নানা প্রকার অক্ষরের পুস্তক পাঠ (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন ॥ নাটক অভিনয় দেখান। ভরত জানিতেন। (৩৩) কাব্য-সমস্যা পূরন ॥ কাব্য বা শ্লোকের একাংশ বলিলে অন্যাংশ পূরন। রস সাগর জানিতেন। (৩৪) পট্টিকা বেত্রবান বিকল্প ॥ হস্তী অশ্ব উষ্ট্রের পৃষ্ঠের সাজ তৈয়ার বেতের আসন ও যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ার। (৩৫) তক্র কর্ম্ম ॥ পাথরের মধ্যে লৌহশলাকা দিয়া টাকুরা প্রস্তুত করিয়া সূক্ষ্ম ও স্থুল সূতা কাটা, পৈতা তৈয়ার। (৩৬) তক্ষণ-ক্রিয়া ॥ কাষ্ঠের শিল্প-কার্য্য—ছুতারের বিশেষ কার্য্য বর্ত্তবান ফ্রেটওয়ার্ক। (৩৭) বাস্তবিদ্যা ॥ গৃহ নির্ম্মান, এন্‌জিনিয়ারীং। ঘরের রং চুনকাম গৃহ-শিল্প-কার্য্য। (৩৮) রূপ্য-রত্ন পরীক্ষা ॥ সোনা রূপা হীরকাদি পরীক্ষা কষ্টিপাতর সাহায্যে, বর্ত্তমান জহুরীদের কার্য্য (৩৯) ধাতুবাদ ॥ সুবর্ণাদি ধাতুর সাঙ্কর্য্য পরিহার করণ প্রস্তুত করণ রসাঞ্জন ও রসায়ণ। (৪০) মণি রাগজ্ঞান ॥ হীরকাদি রত্নের বর্ণ ও উজ্জ্বলতা পরীক্ষা। (৪১) আকরজ্ঞান ॥ কোথায় কোন বস্তুর খনি আছে এই জ্ঞান শিক্ষা। (৪২) বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ ॥ বৃক্ষলতা গুল্ম প্রভৃতির রোপন সংরক্ষণ বৃদ্ধি ও ঔষধ চিকিৎসা জ্ঞান। (৪৩) মেষ-কুক্কুট-লাবক-যুদ্ধ-বিধি ॥ মেড়া কুক্কুট প্রভৃতির লড়াই ও খেলা দেখান

শিক্ষা, বাঁদর ভালুক নাচান ও সাপ খেলান শিক্ষা। (৪৪) শুক সারিকা প্রলাপ ॥ পক্ষিদের বুলী শিখান খেলা শেখান। (৪৫) উৎসাদন কর্ম্ম ॥ কৌশলে শত্রুবধ উচ্ছেদ কৌশল যুদ্ধবিদ্যা। (৪৬) কেশমার্জ্জন-কৌশল ॥ চুলের সৌষ্ঠববৃদ্ধির উপায় শিক্ষা এখন কোঁকড়ান, ছাঁটা, বাঁধা, বিড়ান প্রভৃতি। (৪৭) অক্ষর মুষ্টিকা কথন ॥ সাঙ্কেতিক লিপি বিজ্ঞান। (৪৮) ম্লেচ্ছিতক বিকল্প ॥ ম্লেচ্ছভাষাও ম্লেচ্ছ শাস্ত্র-জ্ঞান। (৪৯) দেশভাষা জ্ঞান ॥ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা পরিজ্ঞাত হওন। (৫০) পুষ্প কটিকা নিমিত্তজ্ঞান ॥ ফুলের গাড়ী তৈয়ার বিদ্যা। (৫১) যন্ত্র-মাতৃকা ॥

অল্পায়াসে কার্য্যনির্ব্বাহ করিবার জন্য যন্ত্রাদি প্রস্তুত ঘটিকা যন্ত্রও বক যন্ত্রাদি। (৫২) ধারণ-মাতৃকা ॥ পূজার জন্য, রোগ-আরোগ্য শান্তিস্বস্ত্যয়ণ জন্য কবজ মাদুলী তৈয়ার। (৫৩) সম্পাট্য-কর্ম্ম ॥ মনিমুক্তাদির কৃত্রিমতা নির্ণয় ও কৃত্রিম বস্তু প্রস্তুত। (৫৪) মানসী-কাব্য-ক্রিয়া ॥ অন্যের মনোভাব ছন্দের দ্বারা প্রকাশ কৌতুক। (৫৫) অভিধান-কোষ-ছন্দো-জ্ঞান ॥ শব্দ শাস্ত্রে পারদর্শী হওয়া। (৫৬) ক্রিয়া বিকল্প ॥ একটি কার্য্য বহু উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করা। (৫৭) ললিতক-যোগ ॥ পর প্রতারণার কৌশল শিক্ষা উদ্দেশ্য পরে প্রতারনা না করিতে পারে। (৫৮) বস্ত্র-গোপন ॥ এক বস্ত্রকে অন্য বস্ত্র দর্শান, অর্থাৎ ঝুঁটা রেশমের কাপড় তৈয়ার। (৫৯) দ্যুত ॥ জুয়া, পাশা। দাবা—বাজী রাখিয়া খেলা। (৬০) আকর্ষ ক্রীড়া। বশীকরন স্তম্ভন উচাটন প্রভৃতি। (৬১) বালক্রীড়নক বালকদের নানাবিধ খেলনা প্রস্তুত। (৬২) বৈতালিকী বিদ্যা ॥ স্তুতি পাঠক বন্দনা গান। (৬৩) বৈজায়িকী বিদ্যা ॥ শত্রু বিজয় জ্ঞান। (৬৪) বৈনায়কী বিদ্যা ॥ ভূত প্রেতাদি দেবযোনী বিশেষকে নিবারন—বর্ত্তমান কালে ওঝার কাজ।

নূতন পথে

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

সারা পিছল পথটী এলাম, তোমার সাথে চলে
কেমন করে বিদায় নেব কিছুই নাহি বলে।
দাঁড়িয়ে ছিলাম ভোর বেলাতে
পান্থশালার পরচালাতে,
হাস্যমুখে তুমিই আমার সঙ্গী শুধু হলে।

তোমার বোঝা হাল্‌কা ছিল, আমার বোঝা ভারী
আপনি আমার ভারটী নিলে জোর করিয়া কাড়ি'।
নিত্য তুমি ভাঙন দেখে
হাত ধরেছ সুমুখ থেকে,
সরল পথে আজকে এসে দুজন ছাড়া ছাড়ি।

হে দরদী আপনি হলে আমায় ব্যথার ব্যথী
করলে পথে কতই দেরী করলে আপন ক্ষতি।
ডাক্‌লে আমায় রৌদ্রজলে
তোমার পাতার ছত্র তলে
এখন্ থেকে দুই জনারি দুই দিকেতে গতি।

যখন পথে মেঘের ডাকে উঠতো হিয়া কাঁপি'
তখন মোরে ব্যগ্র হয়ে বক্ষে নিতে ঝাঁপি'
পথের দীঘির পদ্ম তুলে
দুলিয়ে দিতে আমার গলে,
ক্লান্ত তোমার পায়ের ক্ষত নিত্য যেতে চাপি'

আজকে মনে পড়ছে যে সেই দুর্য্যোগেরই দিন
চলছি-দোঁহে কম্পিত বুক দুর্য্যোগে লীন।
অশ্রু চেপে হাস্য দিয়ে
চলছো আমার সঙ্গে নিয়ে
অন্ধকারে কুটীর আলো জ্বলছে দূরে ক্ষীণ।

পথ যে এবার পিছল হলো আমার চোখের জলে
কি ফল বল এই কমলের শিকল পরে গলে?
আজকে মোদের এই যে প্রয়াণ
কোথায় হবে হায় অবসান
মিলবো আবার কোন লগনে সুদূর তরুতলে।

মার্জ্জারাগমনে

[শ্রীপ্রিয়কুমার গোস্বামী]

মহারাজ চক্রবর্ত্তীর ব্যাটার বিয়ের নেমন্তন্ন। বামুন পণ্ডিতেরা খেতে বসেছেন। ভাটপাড়া নবদ্বীপ থেকে আরম্ভ করে নারাণপুর, কাঞ্চনপুর, কামরূপ—সারা রাজ্যি বেরাজ্যির য'ত পণ্ডিত কেউ বাদ যান নি। রুই কাৎলা থেকে চুনপুঁটি সব্বই আছেন।—কেউ পণ্ডিত বেদের, কেউ তর্কশাস্ত্রের, কেউ সাংখ্যের, কেউ বা ন্যায়ের, কেউ স্মৃতির, কেউ ব্যাকরণের কেউ কাব্য কলার।

প্রকাণ্ড উঠান। নীলরংএর চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। তারি নীচে বামুনদের পাত পিঁড়ি।

সার সার বামুন পণ্ডিতেরা বসেছেন। সবারি মুড়ানো মাথায় হাজার আট গাছি চুলের মোটা টিকি; বাঁ কাঁধথেকে ডান কোমরে নেতিয়ে পড়েছে ধব্‌ধবে ফর্সা পৈতে,—তা গঁদের আঠার কলপ দেওয়া—শক্ত টোন সুতার মতো। ....দিব্যি ব্যাস্‌!

রূপার গামলায় সোনার হাতার প্রথম প্রস্থ পরিবেশন হয়ে গেল।

বৈদিক মহামহোপাধ্যায় স্মিত দৃষ্টিতে সভাস্থবর্গের প্রানে তাকিয়ে বল্লেন "হেঁ—হেঁ—হেঁ—এবার আ'সে—"

সবাই বল্লেন "হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ বেশ।"

সকলে গণ্ডুষ নেবার জল হাতে নিলেন।

"নাগায় নমঃ, কূর্ম্মায় নমঃ, অনন্তায় নমঃ—"

—"বাবাগো, মলুম গো, ধর্‌লেরে—" চেঁচাতে চেঁচাতে মালীর ছোট ছেলেটা একেবারে ছুটে চাঁদোয়ার নীচে!

"হাঁ হাঁ হাঁ!! কে—কি—ব্যাপার কি?"

মালীর ছেলে দেউড়ীতে বসেছিল। একটা ক্ষ্যাপা কুকুর তাড়া করায় পালিয়ে এসেছে। বারো বছরের ছেলে সে। ভারী সুন্দর ফুটফুটে দেখতে।

সভায় হুঙ্কার উঠল "কি-অনাচার!"

"কি ব্যাভিচার!"

হাজার পণ্ডিতের দুহাজার চোখ তার পানে কটমট্‌ করে চাইলে। ছেলেটার মুখটুকু টোটকলা গাছটার মতো শুকিয়ে গেল!

ভাগ্যে সত্যিযুগ নেই,—নয়তো বা হাজার জোড়া চোখ থেকে ঠিক্‌রে-পড়া আগুনে ছোক্‌রা ছাই হয়ে যেতো!

"অর্বাচীন—"

"বেল্লিক—"

"বেহায়া—"

"বেয়াদব—"

"অকাল কুষ্মাণ্ড—"

কাব্যবিশারদ এরূপর অনুপ্রাসের জাঁক দেখিয়ে মিহিকণ্ঠে হাঁকলেন,—

"লণ্ডভণ্ড—"

বিষম ব্যাপার। স্মৃতিরত্ন তখন "মহাভারত, মহাভারত" আউড়ে সবটুকু অপবিত্রতা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। ঝুলে পড়া পৈতে অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জ্জনীর সাহায্যে ডান কাঁধের ওপর ছুঁড়ে ফেলে, শিখাবদ্ধ পুষ্পগুচ্ছে প্রকাণ্ড একটা দোলা দিয়ে সবাই আসনের ওপর উঠে দাঁড়ালেন।

সর্ব্বনাশ—ব্রাহ্মণ-ভোজন বুঝি পণ্ড হয়!

মহারাজ চক্রবর্ত্তী গললগ্নী কৃতবাসে মিনতি জানালেন সমস্ত ত্রুটি তাঁর। নিজগুনে যদি তাঁরা............

"কি অনাচার—"
"কি ব্যাভিচার—"
"কি অবিচার—"
"কি অত্যাচার—"
"কি বেবন্দোবস্ত—"

রাজা নিরুপায় হয়ে পায়ে পড়লেন। কোনোরকমে বামুনেরা কিছু ঠাণ্ডা হলেন।

তখন রসুইঘর থেকে দাদখানি চালের পোলাওর গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছিল।

ন্যায় চুঞ্চু শাসালেন "খবরদার,—এবার যেন সুবন্দোবস্ত হয়!"

সবাই হাঁকলেন "নিশ্চয় নিশ্চয়।"

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকা ছেলেটাকে টুঁটি ধরে আল্গা করে দেউড়ী পার করে দিয়ে আসা হোলো। এই গেল সুবন্দোবস্তের পয়লা জের। "অব্যাপারেষু ব্যাপারঃ" করবার পরিণাম দেখে পণ্ডিতেরা আশ্বস্ত হলেন।

আঙ্গিনায় গোবর জলের ভাগীরথী বয়ে গেল। ফের পাত পিঁড়ি পড়লো।

উঠানের চার কোণায় এবার দাঁড়াল চারজনা করে বরকন্দাজ, তাদের হাতে চারহাতি তেল-পাকানো বাঁশের লাঠি।

ঘন ঘন "দীয়তাং ভুজ্যতাং" আওয়াজের ভেতরে দক্ষিণ-হস্তের কাজ চল্ছে। তখন পাতে দই।

—"হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ—"

হঠাৎ কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড ধব্ধবে সাদা ল্যাজ মোটা বেরাল পুবকোণা থেকে এসে মাঝখান দিয়ে ছুট। পুবকোণার মোতায়েন সেপাই রামলক্ষ্মণ পাঁড়ের পাকা বাঁশের লাঠি "দড়াম্" করে মাটীতে পড়ে খানিকটা মাটী খুঁড়ে ফেল্লে। ততক্ষণে মার্জ্জার পুঙ্গব একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে বৈদান্তিকের মাথা টপ্কে, বৈয়াকরণিকের বাঁ পাটাতে একটু আঁচড়ে, বেদাধ্যায়ীর চাদরটা ছিঁড়ে, কাব্যবিশারদের গা-ঘেঁষে মাঝখানে গিয়ে পৌছেচে। বেরালটার মুখে আধ খেকো একটা পিঠে। শেষমেশ সেটার ধাক্কা লেগে ন্যায়চুঞ্চু মশাইর গেলাসটা কাত হয়ে পোড়লো।

রাজার মুখ শুকিয়ে গেল ব্রাহ্মণেরা বুঝি অভুক্ত ওঠেন।
সান্ত্রীদের বুক শুকিয়ে উঠ্ল এবার বুঝি গর্দ্দান যায়।

ন্যায়চুঞ্চু চেঁচিয়ে উঠ্লেন "দেখ্লে, দেখ্লে কোত্থেকে এলো এঁটো মুখো বেরালটা!—ওহে স্মৃতিরত্ন—বলতো—"

স্মৃতির পণ্ডিত সড়াৎকরে খানিকটা দৈ উদরস্থ করে মুরুব্বিয়ানা চালে বল্লেন "আরে খাও না হে—বেরাল গ্যাছে তার কী হয়েছে,—মার্জ্জার গমনে শুদ্ধিঃ—"

সবাই বল্লে "হাঁ হাঁ বটেইত বটেই তো।"
রাজার ঠোঁট চিরে হাসির রেখা ফুটল।
সেপাইদের ধড়ে প্রাণ এলো।

এবার একটু মুচ্কি হেসে ভুরু কুঁচ্কে স্মৃতিরত্ন কাৎহয়ে পড়া গেলাসটার পানে চেয়ে বল্লেন "কিন্তু ন্যায়চুঞ্চু আর বিদ্যাবাগীশ দুজনাই কিন্তু খুব বেঁচেছ হে, ঐ দ্যাখো তোমার এঁটো জলের ধারাটা এক আঙুলের জন্যে বিদ্যাবাগীশের আসনটা ছুঁয়ে যায় নি।"

"সত্যিই তো, সত্যিই তো"—বিদ্যাবাগীশ ছড়িয়ে পড়া কোঁচার শেষটা সন্তর্পনে গুটিয়ে নিলেন।

বেরালটা ততক্ষণে পশ্চিম কোণে সাংখ্যরত্নের ডানপাশে বসে পিঠেখানার সদ্ব্যবহার কচ্ছে। সেটার পানে চেয়ে তিনি বল্লেন "কিন্তু যাই বল, খাসা বেরালটী দেখ্তে!"

মহারাজ স্মিতহাস্যে হাতজোড় করে নিবেদন করলেন "আজ্ঞে হ্যাঁ ওটা আমার ছোট মেয়ে অপর্ণার বেরাল। দেখ্তে সুন্দর কিন্তু ভা—রী দুষ্টু। এই যে বাইরের উঠানে মেথরাণীর মেয়েটা খেতে বসেছে তার চক্ষের সাম্নে পাত থেকে পিঠেখানা নিয়েই ছুট।............ওরে হরে, ঠাকুরমশাইদের দৈ হয়ে গিয়েছে, সন্দেশ নিয়ে আয়, শীগ্গির সন্দেশ নিয়ে আয়।"

নারীর ব্যথা

[শ্রীবিরজাসুন্দরী দেবী]

বিধাতার অভিশাপ মস্তকে লইয়াই যেন নারীজাতির জন্ম হইয়াছে। তাই কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলেই পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলেই কিছু না কিছু বিমর্ষ হইয়া থাকেন। ছেলে মেয়ে এক গর্ভে জন্মে, এক মাতার স্নেহ মমতায়, এক মাতার ক্রোড়ে, এক সঙ্গে লালিত পালিত হয়; তবু ছেলে আদর, আর মেয়ে তাচ্ছিল্য পাইয়া থাকে।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "যে গৃহে নারী পূজিতা হয়েন সে গৃহে লক্ষ্মী অচলা হইয়া বাস করেন।" আবার শাস্ত্রকারগণও টিকি নাড়িয়া কাল-ভুজঙ্গিনীর সঙ্গে রমনীর রূপ গুণের তুলনা করিয়াছেন এবং রমনীকে বিশ্বাস করিওনা বলিয়াছেন! হরিদাস স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেব তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ছিলেন! তাই প্রাণ ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁর এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন! নারী সাধন ভজনের অন্তরায় সুতরাং নারীর মুখ দেখিতে নাই। পরম-হংস দেবের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, কামিনী" কাঞ্চণ পরিত্যাগ কর!" ধর্ম্ম উপার্জ্জনই যখন মনুষ্য-জীবনের প্রধান লক্ষ্য তখন ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য সকলকেই সাধ্যানুসারে নারীর সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু বিধাতা নর নারীকে এমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন যে, ইহার একটীকে বাদ দিলে অপরটী পূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। বিশেষতঃ নারী জাতিই জগতের পালন কর্ত্রী, নারীর স্নেহ, নারীর প্রেম ভিন্ন জগৎ এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব ইহাদিগকে বাদ না দিয়া ইহারা যাহাতে জ্ঞানে, কর্ম্মে,—ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে, সকল অবস্থায় সকল বিষয়ে পুরুষদের সঙ্গিনী হইতে পারে সেই উপাদানে গড়িয়া তুলিলে, পুরুষগণের নারীদ্বারা এবং নারীগণের পুরুষদ্বারা কোন ভীতির কারন থাকে না।

"নারী কি শুধুই নরের ভোগ্যা?
নহে কি জননী নহে কি ভগিনী
নহে কি বিশ্ব-হিতের যোগ্যা?"

মানুষের জীবন-প্রভাতে প্রথম আশ্রয়-স্থল প্রথম শান্তির স্থান্ মাতৃ-অঙ্ক। মাতৃ স্নেহে, মাতৃযত্নে লালিত পালিত বর্দ্ধিত শিশু জানে না যে, মা হইতে তার বেশী আপনার কেহ আছে। তখন মাতৃ ক্রোড় হইতে আর কোন সুখের বা আরামের স্থান আছে বলিয়া মনে হয় না।

শিশু যখন ক্রমে বড় হইতে থাকে নূতন নূতন আশা আকাঙ্খা প্রাণে জাগিয়া উঠে তখন সেই জীবন-মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ শান্ত আঁচল বিছাইয়া দেয় ছায়া করিয়া থাকে নারীর প্রেম। তখন কর্ম্মে শক্তি, বিশ্রামে শান্তি, দর্শনে তৃপ্তি, আলাপে আনন্দ, প্রবাসে চিন্তা—নারী। নারীর সঙ্গই তখন সকল শান্তি সুখের নিলয়।

জীবন-সায়াহ্নে কন্যারূপে বধূরূপে সেবা ব্রত দ্বারা মাতৃ স্নেহ দান করে নারী। এই ধরাধামে নারী ধরা দিতে আসে মাতৃরূপে। স্নেহে, প্রেমে, সেবায় জগতকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে নারী। ইহারা সহে শত শত অপমান অনাদর আর পায় অবিশ্বাসিনী বলিয়া ঘৃণা।

নারীর আসন কত উচ্চে ছিল, আর আজ কত নিম্নেই না নামিয়াছে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন তপস্যায় গমন করেন তখন তাঁহার দুই স্ত্রীকে বহু ঐশ্বর্য্য দিয়া যান্। মৈত্রেয়ী তাহা না লইয়া বলিয়া ছিলেন "যাহাতে আমি অমরত্ব লাভ করিতে না পারিব তাহা লইয়া কি করিব?" আজ কাল কয় জন রমনী ওই জ্ঞান লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন? প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আজ কাল নারী জীবনের কোনো মূল্যই নাই আর তাই তাহারা আজ এত হীন হইয়া পড়িয়াছে।

ব্যষ্টির সমষ্টি লইয়াই সমাজ এবং সেই সমাজ পুরুষ জাতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। নারীজাতি সর্ব্বাবস্থায় পুরুষজাতির অধীন, তাহারা যদি প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অধঃপাতে যায় সেজন্ত কি সমাজ দায়ী নহে? তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার ভার কি সমাজের হাতে নহে?

আমাদের দেশের সমাজ এমনি নিম্নস্তরে আসিয়া উপনীত হইয়াছে যে, নিতান্ত অল্প বয়স্কা বালিকা, যাহারা দেব-পূজার ফুলের ন্যায় অতি পবিত্র এবং অতি নির্ম্মল তাহাদের প্রতিও পুরুষদিগের শকুনি দৃষ্টি পতিত হয়। আর বালবিধবাগণ,—তাহাদের কথাত বলিবারই নয়। তাহাদের বিষাদ-মলিন নিরাভরনা শুভ্র শুভ দেবী মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তি সহানুভূতি এবং দয়া পূর্ণ সকরুণ দৃষ্টি পতিত না হইয়া, তাহাদের প্রতি অতি অপবিত্র ঘৃনিত লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয়। যাহারা সর্ব্বাবস্থায় বিপন্না দুর্ব্বলা অসহায়া রমনীদের রক্ষক তাহারা যদি ভক্ষক হয় তাহা হইলে ইহাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? এবং পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিবারই বা উপায় কি? বড় দায়ে পড়িয়াই নারী হইয়াও এ অপ্রিয় অপবিত্র আলোচনা করিতে হইল! না করিলে যে উপায় নাই!

স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা শ্বশুর গৃহে স্বামী এবং অন্যান্য পরিজন কর্তৃক লাঞ্ছিতা, এবং বালবিধবা এই তিন শ্রেণীর নারীদের মধ্যে নানারূপ প্রলোভনে পতিত হইয়া অজ্ঞানতা বশতঃ কেহ কেহ নিজেকে রক্ষা করিতে অসমর্থা হইয়া যদিই বিপথ-গামিনী হয় অমনি সমাজ হইতে তাহারা লাঞ্ছিতা পরিত্যক্তা হয়। কেহ ইচ্ছায় কেহ অনিচ্ছায় অনন্যোপায় হইয়া মাতৃ জাতির কলঙ্ক স্বরূপ স্বৈরিনী শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া থাকে এবং পরে নিজকৃত পাপও অন্যায় কার্য্যের জন্য অনেকেই আত্মগ্লানি ভোগ করে। কিন্তু আর তাহাদের উদ্ধারের উপায় থাকে না। পুরুষগণ অনেকে সারা জীবন কুকার্য্য করিয়াও সমাজে সমাজপতি হইয়া সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা "পুরুষ" এই গুণে তাঁহাদের সকল অপরাধ মার্জ্জনীয় হয় অথবা অপরাধ বলিয়া গণ্যই হয় না। আবার তাঁহারাই নানা প্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া যাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন, তাহাদের একবার পদস্খলন হইলে এত কঠোর দণ্ড কেন হয়? কেন তাহারা আর সমাজে স্থান পায়না, সমাজপতিগণ তাহাকি একবার চিন্তা করিয়া দেখেন?

পুরুষ অপেক্ষা রমনীগণ অনেক আত্মত্যাগ করিতে জানে, তাহারা অন্যের সুখের জন্য অকাতরে আপনার সুখ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে পারে। গৃহে স্বামী এবং স্বামীর পরিজন বর্গের নিকট তাহাদের যেটুকু প্রাপ্য তাহার সম্পূর্ণ না হউক কিয়দংশ পাইয়া অনেক রমনী প্রাণপনে খাটিয়া অকাতরে সেবা করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিয়া থাকে। বিলাসিনী রমনী অপেক্ষা এই শ্রেণীর রমনীই বেশী।

বর্ত্তমান সময়ে নারীগন কি ভাবে জীবন পথে অগ্রসর হইলে তাহাদের এই দুর্দ্দশা ঘুচিবে, প্রাণে আবার সেই লুপ্ত সাহস লুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইবে তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়। স্বাধীন চিন্তা দ্বারাই বোধহয় আত্মরক্ষার শক্তি পাওয়া যায়।

আমাদের দেশ এখন ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া শিক্ষা ও সভ্যতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু গোড়ায় তেমনি গলদ রহিয়াই যাইতেছে। যে শিক্ষায় আত্ম-শাসন নাই, পবিত্রতা নাই, যে শিক্ষার ভিতর প্রাণ নাই সে শিক্ষা সভ্যতার শিক্ষা নহে। উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর প্রত্যেক পুরুষগণের মাতৃত্ব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। প্রত্যেক রমনী-হৃদয়ে মাতৃশক্তি জাগ্রত করিতে হইবে। এইরূপ শিক্ষা এবং এই মাতৃ-মন্ত্রে দীক্ষা ভিন্ন দেশ জাগরণের অন্য উপায় বোধহয় নাই।

পুরুষ নারী হইতে বুদ্ধিতে, শারীরিক বলে, শৌর্য্যে বীর্য্যে নিশ্চয়ই উন্নত এবং এই জন্যই নারী তাঁহাদের হাতে আত্ম-সমর্পন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে; এই অধীনতা তাহাদের পক্ষে হীনতা নহে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের যখন তাঁহাদের বলবীর্য্য হারাইয়া নারী বনিয়া যাইতেছেন, তখন নারীদিগকে আত্মরক্ষার ভার কতকটা নিজের হাতে লইতেই হইবে। আমাদের দেখিতে হইবে পুরুষের পৌরুষ কোথায়।

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার]

৭ম স্তবক

গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বৎসর রথযাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে নীলাচল আগমন করিয়া চারিমাস কাল প্রভুসঙ্গে বাস করতঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা হিন্দুর মহাপর্ব্ব। শত শত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী এই পর্ব্বোপলক্ষে প্রতিবৎসর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া থাকেন। জগন্নাথ দেবের রথাগ্রে প্রেমাবিষ্টে নর্ত্তন ও কীর্ত্তন মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার এক প্রধান অঙ্গ। রথযাত্রা নিকটবর্ত্তি হইলে মহাপ্রভু গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন সেবা মাগিয়া লইলেন। শ্রীমন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণী গুণ্ডিচা দেবীর নামানুসারে এইমন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। কথিত আছে গুণ্ডিচা দেবী রথযাত্রায় জগন্নাথ দেবকে এই মন্দিরে আনয়ন করিতেন। অদ্যাবধি সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। জগন্নাথদেব শ্রীমন্দির হইতে রথে আরোহন পূর্ব্বক গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন। মন্দির মার্জ্জন প্রভুর যোগ্য সেবা নয়। মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ মহাপ্রভুকে এই সেবার ভার দিতে প্রথমতঃ কুণ্ঠাবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু নিজগন সহ সানন্দে এই নীচ সেবাই বরণ করিয়া লইলেন। গুণ্ডিচা মন্দির সুচারুরূপে পরিষ্কৃত ও জলদ্বারা ধৌত ও মার্জ্জিত হইল। গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন দ্বারা প্রভু জীবকে শিক্ষা দিলেন ভগবানের সেবায় উচ্চ নীচ নাই। সেবামাত্রই বরেন্য। যাহা সাধারণ লোক চক্ষুর নিকট তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ভক্তের নিকট তাহাও অতি আদরের। অতঃপর জগন্নাথদেবের "নেত্রোৎসব" আরম্ভ হইল। স্নানযাত্রাবসানে শ্রীবিগ্রহের অঙ্গরাগ এবং চক্ষুদান উপলক্ষে পঞ্চদশদিন দর্শন বন্ধ থাকে তজ্জনিত উৎসবই "নেত্রোৎসব" নামে অভিহিত। পঞ্চদশ দিন জগন্নাথদেব দর্শন না পাইয়া প্রভু মহাদুঃখে ছিলেন উৎসবাবসানে প্রভু উৎকণ্ঠায় শ্রীমুখ দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। প্রভু দেখিতেছেন

> "প্রফুল্ল কমল জিনি নয়ন যুগল।
> নীলমনি দর্পণ কান্তি করে ঝলমল॥
> বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ।
> ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত তরঙ্গ॥"

মহাপ্রভু তো বিগ্রহমূর্ত্তি দেখিতেছেন না তিনি যে সেই কোটী মনমথ মনমথ, প্রেমের অফুরন্ত প্রশ্রবন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই দেখিতেছেন। দর্শনে মহাপ্রভুর কি অবস্থা হইতেছে?

> "শ্রীমুখ সৌন্দর্য্যমধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
> কোটী কোটী ভক্ত-নেত্র-ভৃঙ্গ করে পানে॥
> যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর।
> মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥"

ধীরে ধীরে রথ যাত্রার পুণ্যতিথি সমাগত হইল।

যে পরম মোহন নৃত্য একবার মাত্র দর্শনে জীবের বাসনা মলিন মন নির্ম্মল হইয়া কৃষ্ণভক্তির উদয় হইত বহির্ম্মুখী মানবের সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া অপ্রাকৃত ভাব রাজ্যের অনাস্বাদিত আনন্দের অনুভূতি প্রদান করিত, ৺বারানসী ধামে বিন্দু মাধব অঙ্গনে এক দিবস যে নৃত্য-প্রকাশাদর্শনে মায়াবাদের প্রধান উপাসক বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ নন্দ সরস্বতী জন্ম জন্মান্তরের জ্ঞান কর্ম্মপাশ হইতে সহসা মুক্ত হইয়া ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন এবং স্বকৃত পূর্ব্বাপরাধ অশ্রুজলে ক্ষালন করিয়া প্রভুর চরণ তলে পড়িয়াছিলেন প্রভু নীলাচলে এই পুণ্য তিথিতে জগন্নাথ

দেবের রথাগ্রে সর্ব্বলোকলোচনের সম্মুখে জীবের কল্যান-প্রদ সেই মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য মানবহৃদয়ের অবরুদ্ধ আনন্দ সত্বার বাহ্যিক অভিব্যক্তি। অন্তর্নিহিত আনন্দ উৎস মনের বেলা ভূমি অতিক্রম করিয়া দেহের প্রতি অঙ্গে বিচ্ছুরিত হয়। এই আনন্দ ভগবানের অতন্ততম শক্তি "হ্লাদিনীর'ই ক্ষীণা বিকাশ মাত্র। ভগবৎ প্রেমা-নন্দাধিক্যে যে নৃত্য তাহা জীবের স্ববশে কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না। হৃদয় দ্রবকারী এই মোহন নৃত্য মহাপ্রভুই জীবকে সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভুর তুষ্টির জন্য রাজা প্রতাপরুদ্র এ বৎসর রথযাত্রার যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন তাহাতে সমগ্র উৎকল ভূমি এক অভিনব আনন্দস্পন্দনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। রথযাত্রার দিবস রাজা স্বয়ং সুবর্ণ মার্জ্জনীহস্তে পথ সংমার্জ্জন করিয়া চন্দন জলে তাহা অভিষিক্ত করিলেন এই পথে ঠাকুরের রথ অগ্রসর হইল।

> "রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার।
> নব হেমময় রথ সুমেরু আকার॥
> শত শত শুভ্র চামর দর্পন উজ্জ্বল।
> উপরে পতাকা শত চান্দোয়া নির্ম্মল॥
> ঘাগর কিঙ্কিনি বাজে ঘণ্টার ক্বণিত।
> নানাচিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত॥"

মহাপ্রভু 'মনিমা', 'মনিমা' বলিয়া উচ্চধ্বনি করিতে লাগিলেন। নানা বাদ্য কোলাহলের মধ্যে গৌড়দেশীয় মল্লগণ রথ টানিতে লাগিল।

"ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ।" মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণকে একত্র করিয়া সকলকে মাল্য চন্দনে বিভূষিত করিলেন। শ্রীহস্ত স্পর্শে ভক্তগণের আনন্দ বৃদ্ধি পাইল, প্রভু কীর্ত্তনের সাতটি সম্প্রদায় গঠন করিলেন। চারি সম্প্রদায় রথের অগ্রভাগে দুই সম্প্রদায় দুই পার্শ্বে এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সাত সম্প্রদায়ে একসঙ্গে চৌদ্দমাদল বাজিয়া উঠিল।

> "যার ধ্বনি সুনি বৈষ্ণব হইল পাগল।"

নাম কীর্ত্তনের মহামঙ্গলধ্বনি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিগ্ ব্যাপ্ত হইল।

> "সাত ধাই বলে প্রভু হরি হরি বুলি।
> জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥
> আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ।
> এককালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
> সব কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায়।
> অন্য ঠাঞি নাহি যায় আমার দয়ায়॥"

অতঃপর প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিতে মনন করিলেন। সাত সম্প্রদায় একত্রিত হইল। দশজন প্রভুর সঙ্গে গাহিতে ও নাচিতে লাগিলেন।

> "দণ্ডবৎ করি জুড়ি দুই হাত।
> উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ॥"

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

> জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ।
> জয়তি জয়তি কৃষ্ণঃ বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ॥
> জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গ।
> জয়তি জয়তি পৃথ্বীভার নাশো মুকুন্দঃ॥"

আবিষ্ট হইয়া শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভু প্রণাম করিতে লাগিলেন। এইবার প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

> নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
> সসাগর মহীশৈল করে করে টলমল॥
> আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে পড়ি যায়।
> সুবর্ণ পর্ব্বত যেন ভূমিতে লোটায়॥

নিত্যানন্দ দুইহস্ত প্রসারণে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আশে পাশে সর্ব্বত্র সন্ত্রস্ত। অদ্বৈতাচার্য্য হুঙ্কার করিয়া হরিবোল বলিয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছেন। লোক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কল্লোলিত জনস্রোত তন্ময় চিত্তে প্রভুর নৃত্য দেখিতে ছুটিয়াছে। স্বয়ং প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্রগণ সহ লোক নিবারণে বিফল চেষ্টায় রত হইয়াছেন। প্রভুর নৃত্যে সকলেই আবিষ্টচিত্ত। রাজা বিহ্বল হইয়া নৃত্য দেখিতেছেন আর তাঁহার শরীর প্রেমময় হইতেছে। রাজার অগ্রভাগে প্রভুর নিজজন শ্রীনিবাস আবিষ্ট হইয়া

নৃত্য দর্শন করিতেছেন। রাজার অগাধ দর্শনে বিঘ্ন হওয়ায় রাজমন্ত্রি হরিচন্দন শ্রীনিবাসকে একপাশে যাইতে হস্ত দ্বারা বার বার ঠেলিতেছেন ; শ্রীনিবাসের বাহ্যাপেক্ষা নাই তিনি বার বার উত্যক্ত হওয়ায় দেশ কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া হরিচন্দনকে এক চপেটাঘাত করিলেন। রাজমন্ত্রি এই অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া কিছু বলিতে উন্মুখ হওয়ায় রাজা তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন।

"ভাগ্যবান তুমি ইহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাই তুমি কৃতার্থ হইলা ॥"

এই সামান্য ঘটনাও রাজা প্রতাপরুদ্রের মানসিক ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার আরম্ভ হইল। এককালে অষ্ট সাত্বিক ভাব দেব দেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

"মাংস, ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিল।
শিমূলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোক জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥
সর্ব্বাঙ্গ প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম।
জ জ গ গ জজ গগ গদ গদ বচন ॥"

প্রভু-"জগন্নাথ" পূর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না জ জ গ গ বলিতেই "জগ যন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রু জলে।" চতুর্দ্দিকস্থ সমবেত লোক প্রভুর অশ্রুজলে স্নাত হইতে লাগিলেন। প্রভুর দেহকান্তি কখনও অরুণবর্ণ কখনও আবার পরমুহূর্ত্তেই মল্লিকা পুষ্পের বর্ণ ধারণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতে ছিল। কখনও বা প্রভু স্তব করিতেছেন কখনও ভূমিতে পতিত হইয়া শ্বাসহীন হইতেছেন।

"কভু নেত্র নাসা জল মুখে পড়ে ফেণ।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥"

কখনও বা প্রভু ভাবাবেশে ভূমিতে বসিয়া অধোমুখে তর্জনী দ্বারা কৃষ্ণ মূর্ত্তি আঁকিতেছেন আর স্বরূপ অঙ্গুলী ক্ষত হওয়ার আশঙ্কায় সভয়ে নিজকরে তাহা নিবারণ করিতেছেন। প্রভু ভাব বিশেষে প্রবেশ করিতেছেন আর তদনুযায়ী নৃত্যের প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ ভাব অনুযায়ী পদ ধরিতেছেন। স্বরূপ গাহিলেন।

"সেই তো পরান নাথ' পাইনু।" আর প্রভুও আনন্দে মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন পাইয়া আনন্দে উথলিয়া উঠিয়াছেন প্রভুর মনে এই ভাব আচ্ছন্ন হইয়াছে। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে মধুর কীর্ত্তন ও নৃত্য হইতেছে। প্রভুর হৃদয়ে আনন্দ সিন্ধু প্রবাহিত হইতেছে। নীলাচলবাসী সমবেত অগণিত যাত্রীর দল পাত্র মিত্র সনে রাজা প্রতাপরুদ্র এই অদ্ভুত নৃত্য দর্শন করিয়া প্রেমে অভিভূত হইতেছেন।

"প্রেমে নাচে গায় লোক করি কোলাহল।"
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দ বিহ্বল ॥"

কখনও প্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিতেছেন কখনও রথের পশ্চাৎ গিয়া মাথা দিয়া রথ ঠেলিতেছেন আর হড় হড় করিয়া রথ অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে প্রভু নিজগণ সনে মহানন্দে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন — রথ ক্রমে "বনগণ্ডীতে" উপনীত হইল।

"বনগণ্ডী"-জগন্নাথদেবের মাসীর আলয় বলিয়া পরিচিত। ইহা শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচার মধ্যপথে। ইহার দক্ষিণ ভাগে বৃন্দাবনতুল্য চারু পুষ্পোদ্যান। এই স্থানে রথ আসিলে জগন্নাথদেবের ভোগ হইয়া থাকে। ভক্তগণ এই স্থানে ঠাকুরকে স্বেচ্ছামত ঈপ্সিত ভোগ দিয়া থাকেন। দীর্ঘকাল উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভু শ্রান্ত হইয়া বনগণ্ডীর রমণীয় উপবনে প্রেমাবিষ্টে পড়িয়া আছেন ভক্তগণও স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিতেছেন এই সময় রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের পূর্ব্ব উপদেশমত রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন বৈষ্ণব বেশে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। রাজার ভাগ্যাকাশে আজ সৌভাগ্য সূর্য্য সমুদিত। যে যজ্ঞের সফলতার জন্য তিনি হৃদয়ের সমস্ত শক্তি ও একাগ্রতা নিয়োজিত করিয়া এতকাল ব্যর্থমনোরথ হইয়াছেন আজ তাহার পূর্ণাহুতির দিন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র ধীরে ভীত কম্পিত বক্ষে প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইতেছেন।

ধীরে সমীরণ বহিতেছে। মৃদু মন্দ পবন ফুল্ল কুসুম দামের সৌরভ-সুষমা বহন করিয়া পরিশ্রান্ত ভক্তগণকে ব্যাজন করিতেছে। চতুর্দ্দিক নিরব এক অখণ্ড শান্তি বিরাজিত। কেবল গৌর প্রেম বিহ্বল একটি মহাপ্রান

হৃদয়ের চির পোষিত আকাঙ্ক্ষা সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া মৃদু পদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। রাজা ভক্তগণকে যোড়হস্তে বন্দনা করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। হৃদয়ের সমগ্র শক্তি উদ্বুদ্ধ করিয়া সাহস ভরে মহাপ্রভুর চরণ ধারন করিলেন। রাজা নিপুনভাবে প্রভুর পাদ সংবাহন করিতেছেন আর রাসলীলার "জয়তি তেঽধিকং" শ্লোক পাঠ করিতেছেন।

"শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
বোল বোল বলি উচ্চে বলে বার বার ॥"

আশ্বাস পাইয়া নৃপতি পড়িলেন

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততম্
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম, ৩১ শ)

আবেগভরে গদ্গদ কণ্ঠে উচ্চারিত ভাগবতের শ্লোক শ্রবণে প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সত্বর উঠিয়া রাজাকে আলিঙ্গন দান করিলেন।

"তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন ॥
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুইজনের অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার ॥

প্রেম আজ সন্ন্যাসের কঠোর ধর্ম্ম ভেদ করিয়া চিরন্তন বিধি নিয়ম ভাসাইয়া দিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। প্রেমাবিষ্ট প্রভুর এযাবৎ বাহ্যস্ফুর্ত্তিই ছিল না। এই সপ্রেম আলিঙ্গনের পাত্র যে উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্র সে দিনও রথাগ্রে নৃত্যকালে ভূমিতে পড়িবার সময় যিনি সম্ভ্রমে অঙ্গ স্পর্শ করাতে বিষয়ী স্পর্শ হইল বলিয়া প্রভু কত না আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা যেন প্রভু জানিতেই পারেন নাই। প্রভুর চক্ষু নির্মীলিত। গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতেছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি ?" "কে তুমি হিতকারী বন্ধু আজ আচম্বিতে আসিয়া কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইতেছ ?"

রাজা বলিলেন "আমি তোমার দাসনুদাস।" রাজা আনন্দে চঞ্চল, কণ্ঠ গদ্গদ। হৃদয়ের সকল তন্ত্রী হইতে আজ এক সার্থকতার ললিত সুর বাজিয়া উঠিতেছে। রাজা সকল ভক্তের বন্দনা করিয়া উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে রথ পুনর্ব্বার গুণ্ডিচা অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূর গমনের পর রথের গতি সহসা স্তব্ধ হইল। বলিষ্ঠ মল্লগণ প্রানপন চেষ্টা করিয়াও রথ টানিতে পারিল না। রাজা প্রতাপরুদ্র ব্যগ্র হইয়া মত্ত হস্তিযুথদ্বারা রথ টানাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নিষ্ফল—রথ একপদও অগ্রসর হইল না স্থাণুর ন্যায় অচল হইয়া রহিল। বিশ্বগুরু জগন্নাথের রথ কে চালাইতে পারে ? "ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ না চলে কারও বলে।" যাত্রী মণ্ডলে হাহাকার ধ্বনি উঠিল।

অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তি করয়ে চীৎকার।
রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার ॥"

মহাপ্রভু নিজগণ সনে এই আকস্মিক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছেন এ নিদারুণ দৃশ্য আর অধিকক্ষণ দেখিতে দেখিতে পারিলেন না। রথরজ্জু হইতে হস্তিযুথ মুক্ত করিয়া নিজগণকে রথ টানিতে দিলেন।

"আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া।
হড় হড় করি রথ চলিলা ধাইয়া ॥

"জয় জগন্নাথ বলিয়া মহানন্দে সর্ব্বলোক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

"জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।
এই মত কোলাহল লোক ধন্য ধন্য ॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে ॥"

রথ গুণ্ডিচামন্দিরে পৌঁছিল। গুণ্ডিচা মন্দিরে আগমনাবধি প্রভুর বিরহস্ফূর্ত্তির অবসান হইল। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছেন প্রভু এইভাবে বিভাবিত থাকিয়া আনন্দে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানে ও জল-কেলিতে, দ্বি-সন্ধ্যা মন্দির প্রাঙ্গনে কীর্ত্তনে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

চক্ষু-দান

[শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

সে সময়ে গুলের সমান তেমন রূপবতী বোগদাদে কেহই ছিল না। গুলের রূপের তুলনা হয় না। ফুলের কুঁড়ি যেমন কুঁড়ি ছাড়িয়া যেমন-যেমন ফোটে তেমন-তেমন রূপে ফাটিয়া পড়ে, গুলেরও তাহাই হইতেছিল ;—সে ষোল বছরের দিকে যতই পা আগাইতেছিল ততই রূপের পরী হইয়া উঠিতেছিল। আর গুলের মত সুকণ্ঠী ও গায়িকা সে অঞ্চলে তখন বিরল ছিল। সুতরাং গুলের নাম বাদশাজাদার কানে পৌঁছাইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই।

নগর প্রান্তে দীঘির ধারে যেখানে জলের চঞ্চল খেলা, আর হংসের কলধ্বনি, যেখানে নীল গগনের বিশ্বজোড়া নেশা মনখানি লইয়া ক্রীড়া করিবার সুযোগ পায়, মধুঋতুর মধুর বাতাসটুকু যে পথ দিয়া প্রথম আসে—সেইখানে গুলের ছোট কুটীরখানি মৃদঙ্গ ও কণ্ঠ মূর্চ্ছনায় মুখর হইয়া থাকিত।

গুলের কথা শুনিয়া শুনিয়া বাদশাজাদা অস্থির হইয়া উঠিতেছিলেন। রূপসীর রূপের পাত্র পান না করিলে তাঁহার তৃষ্ণা মিটিতেছিল না। সে সুকণ্ঠ না শুনিলে তাঁহার জীবন অর্থহীন বোধ হইতেছিল। গুল তাঁহার সারা হৃদয়ে ভরিয়া উঠিতেছিল !

(২)

সে এক মধুর যামিনী ! দীঘির জল চাঁদের আলোয় টল টল করিতেছিল। গুল কুটীরের উন্মুক্ত অলিন্দে একমনে বসিয়া বক্ষের উপর মৃদঙ্গ লইয়া তখন সুর-সাধনায় নিরতা। জ্যোৎস্নার তরল রূপের নির্ঝর লজ্জায় গুলের আবদ্ধ চিকুরগুচ্ছের নীচে সরিয়া সরিয়া যাইতেছিল। গুলের অঙ্গুলি কেমন বাধ-বাধ হইতেছিল,—সুরের কুহক সৃষ্টি করিতে বড় সময় অপব্যয় করিতেছিল !

বাদশাজাদা ব্যস্ত হইতেছিলেন। গুল তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া যে হাসিটুকু হাসিল তাহা তাহার রক্তাধর আরও রক্তিম করিয়া তুলিল।

গুল বুঝিল, পতঙ্গ আগুনে পুড়িতে আসিয়াও পুড়িবার জন্য এমন করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে !

মৃদঙ্গে সুর বাজিল। বাদশাজাদা অবাক হইলেন। চাঁপার কলির মত গুলের আঙুলগুলির খেলা—সেই মৃদঙ্গের উপর কি সুন্দর ! বিজলী যেন বাদিত্রের গাত্রে গাত্রে চমকিয়া বেড়াইতেছে !—আর তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া মেঘমল্লার আবেগ বর্ষণ করিতেছে !

সেই সঙ্গে কণ্ঠের যে সহজ তরল উৎস ছুটিতে লাগিল তাহা যেন তটিনীর জলোচ্ছ্বাসের মতই আবেগময়—শ্রাবণ গগনের মতই প্রাণস্পর্শী !

বাদশাজাদার চিত্ত আজ ঝর ঝর গগনের মত আপন খেয়ালেই আপন-ভোলা—উন্মত্ত ! নিখিল জগৎ তাঁহার নিকট হইতে দূরে—অতি দূরে কোথায় যেন নির্ব্বাসিত !

গান থামিল, মৃদঙ্গ নীরব হইল। তাহাদের শেষ রেশটুকু তখনও বাদশাজাদার কানে রুণু রুণু করিয়া উঠিতেছিল ! গুল যে রূপের পাত্র তাঁহার মুখে ধরিয়াছে তাহাতে বাদশাজাদা বিভোর,—যে কণ্ঠের নির্ঝর খুলিয়াছে তাহাতে বাদশাজাদা তন্ময় !

বাদশাজাদা একটী গোলাপের তোড়া গুলের গায় ছুড়িয়া মারিলেন, বলিলেন,—'গুল, তুমি আমাকে মসগুল করিয়াছ !' গুলের লালায়িত ঠোঁটে চতুর হাসি খেলিয়া গেল ! সে বলিল,—'বাদশাজাদার অনুগ্রহ।'

(৩)

গুলের অন্তরে অনেক কথা জড় হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, সে বাদশাজাদার অনুগ্রহভাগিনী—কেন ?—কে

তাহার কারণ?—বাদশাজাদা, না গুল! ফুল ত ফুলই থাকে, তাহার নয়ন-ভুলান রূপ ত তাহারই থাকে—দেখিবার চক্ষু থাকে কয় জনের!—তাহাই বা কেন? ফুলের সৌন্দর্য্য, প্রাণোন্মাদিনী শক্তিই না মোহের কারণ!—গুলের মনে হইল, সে কত সুন্দরী!—অতুলনীয়া ষোড়শী! বাদশাজাদা তাহার পায়ে লুটাইবে, এ কি বেশী কথা!

গুল ঠিকই ভাবিয়াছে। তাহার সুর্ম্মাটানা নয়নের একটী লঘু কটাক্ষ যে বাদশাজাদার সারা হৃদয় ভাঙ্গিয়া গড়ে,—তাহার মুখের একটী ছোট বাণী বাদশাজাদার চরম সাধনার পূর্ণ ফল! নর্ত্তকীর উড়ন্ত ওড়নার বিলাস-লাস্য বাদশাজাদার মনকে স্বপ্ন বিমোহন করিয়া ফেলে! কঙ্কন নুপুরের মৃদু শিঞ্জন—তাঁহার হৃদয়ের পুলক-স্পন্দন! —তাই ত গুল ভাবিয়াছে, ফুলই নয়নের মোহ!—সে সুন্দরী! বাদশাজাদা যে তাহার পায়ে লুটাইবে, এ কি বেশী কথা!

গুল গর্ব্বে বিভোর হইল। বাদশাজাদা যখন তাহার রূপের জ্যোতিতে অন্ধ হইয়া প্রলাপ বকিয়া যাইতেন তখন সে হাসিয়া বাঁচিত না! রূপ!—রূপ! মরি কি রূপ লইয়াই সে জন্মিয়াছে—বাদশাজাদা যে রূপে পাগল—মত্ত—মুগ্ধ! কি রূপ লইয়াই সে জন্মিয়াছে যে রূপে বাদশাজাদাকে সে পতঙ্গের মত নাচাইতে পারে! ওগো, সে যে সুন্দরী! তাহার যে তুলনা নাই!

সে এই রূপের পূজা করিতে লাগিল। সারাদিন নানা ভাবে এই রূপের অর্চ্চনা করিতে লাগিল,—তাহা বিচিত্র কৌশলে দৃষ্টিরম্য করিতে লাগিল।

অনেক সময়ে গুল ভাবিয়া পাইত না কেমন করিয়া সে এই রূপের প্রসাধন করিবে! কিসে—কি ভাবে এই রূপ শত গুণে ফুটিয়া উঠিবে!

একখানি বৃহৎ মুকুরে গুল নিয়তই ঐ রূপ দেখিত,—কখনও বা নিজে নিজেই মোহিত হইত! কঙ্কন, কেয়ূর খুলিয়া খুলিয়া পরিত, ওড়না নূতন করিয়া উড়াইত, চুলের বেণী নূতন প্রণালীতে ফিরাইত, ঘুরাইত। নূতন একটা খেয়াল মনে আসিলেই তাহাকে চুম্বন করিয়া অঙ্গে অঙ্গে ফুলের মত ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা পাইত!

(৪)

সেদিন রূপের রচনা-বিন্যাসে গুল বড় ব্যস্ত। এক একবার মুকুরে মুখ দেখিতেছে আর ভাবিতেছে, খাস বেগম হইবার সে খাসা স্পর্দ্ধা রাখে!

আজ সে নানা পারিপাট্যে গা সাজাইয়াছে। আজ গুল বাদশাজাদার চোখের উপর একটা দিব্য রূপের ফোয়ারা খুলিবে! হয় তাহাতে বাদশাজাদাকে ভাসাইবে, নয় নিজে ডুবিবে!

আনারের লাল ফুলে সন্ধ্যার ছায়াপাত হইয়াছে। দীঘির জলে চঞ্চলতা নাই। মিলনের পথে ধরিত্রী স্থিরা। গুল বুঝিল, বাদশাজাদার আসিবার গৌণ নাই।

গুল চকিতে একবার আয়নায় সারা অঙ্গ দেখিয়া লইল। এ কি!—এ কি! সে কি দেখিল!—সে বিশ্বাস করিতে পারিল না! গুল চোখ মুছিল, আবার দেখিল! আবারও যে তাহাই দেখিল! তাহার সে রূপ কই! কোন্ যাদুকর তাহা হরণ করিয়া লইয়াছে!—সে দেখিল, কবরের মাটি-মাখা এ কি শীর্ণ কঙ্কাল!—এ কি বিকারের প্রলাপ! স্বপ্নের নির্ম্মম মায়াজাল! চোখের প্রতারণা! আয়নার কুহক! সে আবার চোখ মুছিল, আবার তাহাই দেখিল! সে ওড়নার স্বর্ণাঞ্চল দিয়া আয়না মুছিল, আবার তাহাই! —অবিকল—অনুরূপ! সে রূপ কই!—কবরের মাটি-মাখা এ কি শীর্ণ কঙ্কাল!

গুল ছুটিয়া গবাক্ষ-পথে গেল। দেখিল, সন্ধ্যার অন্ধকার! ফিরিয়া আসিল। আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিল। আয়না মুছিল, চোখ মুছিল,—আবার দেখিল!—তাহাই! —সেই—সেই—সেই!

গুল আলোক আরও উজ্জ্বল করিয়া দিল।—আরও উজ্জ্বল—আরও উজ্জ্বল! আলোক ফাটিয়া গেল!

গুল কাঁদিতে বসিল। অনেক চোখের জল ফেলিল। জগতে রূপের বিন্দুও নাই! সে সব-ই অন্ধকার দেখিতে লাগিল!

হায়! হায়! তাহার রূপের গুমর ভাঙ্গিয়াছে! তাহার বুক ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে! সে কাঁদিল,—আরও কাঁদিল,—আরও কাঁদিল! ক্রন্দনের আজ বিরাম নাই!

বাঁদী আসিয়া খবর দিল, বাদশাজাদা আসিয়াছেন। গুল দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—'বাঁদি, ফিরাইয়া দে! গুলের আর সে দিন নাই।'

বাঁদী বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। উন্মাদিনী গুল আয়নায় শত শয়তানীর বলে লাথি মারিল। খান-চুর হইয়া আয়না ভাঙিয়া পড়িল। গুলের পঞ্জর যেন খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল!

তহবিল তছরূপ

[শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু]

সাজা দিবে দাও, ত'বিল ভাঙিয়া করেছি অনেক পাপ,
৩টা কথা শুধু দয়া করে আজ শোনো গরীবের বাপ!
যাঁর নুন খেয়ে মোরা ছ'পুরুষ মানুষ হয়েছি সবে,
ধূলোমুঠো যাঁর ভেবেছি আমরা সোণামুঠি বলি ভবে,
আমি নিজে আজ পনের বছর গোলাম হয়েছি যাঁর,
তাঁরই আমি আজ বিশ্বাসঘাতী, ত'বিল ভেঙেছি তাঁর;
এতদিন যে বা বিশ্বাসী ছিল, দোষ করে নাই কোনো,
সে যে কেন আজ নিমকহারাম দয়া করে তাই শোনো।

প্রথম যখন মোহরের কাজে তোমার তরফে ঢুকি,
তরুণ তখন তিন বছরের, মাস কয়েকের খুঁকী;
আট টাকা মোটে মাহিনা মিলিত চলিত তাতেই প্রভু,
মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের অভাব হয়নি কভু;
তখনো পাতিনি কারো কাছে কর পাইনিক কোনো ক্লেশ,
চারিটী প্রাণীর দিনগুলো সব চলিয়া গিয়াছে বেশ।

তারপর যবে জমা-নবিশীতে দিলে প্রমোশন প্রভু,
এগার বছর আগেকার কথা মনে পড়ে বেশ তবু;
বেতন বাড়িল তিন টাকা, তবু এমনি ছিল যে রোগ,
সন্দেশ দিনু বান্ধবগণে গোবিন্দজীরে ভোগ;
টাকায় তখোনো ষোল সের চাল, কুড়ি সের দুধ খাঁটী,
তখনো অভাবে আপন মাথায় মারেনি কেহই লাঠি;
প্রজাদেরও তব ছিল না অভাব, ছিল না কোনই ক্লেশ,
'সেলামী' 'তহরী' যাহা কিছু বল উপায় করেছি বেশ;
দিয়ে থুয়ে তবু কেটেছে দিবস মাছে ভাতে দুধে ক্ষীরে,
ভিখারী অতিথও পেয়েছে দুমুঠো যায়নি কখনো ফিরে;
এগারো টাকায়ও সুখে গেছে কাল পড়েনি এমন দিন,
ভিক্ষা করিতে হয়নি তখনো, করিতে হয়নি ঋণ!

এ কয় বছরে আরো তারপরে বেতন বেড়েছে চার,
পনের টাকায় বড় এলাকায় হয়েছি ত'শীলদার;
মনে হয়েছিল জমিবে কিছু বা এখন বছর শেষে,
রণের ডঙ্কা বাজিল অমনি ইউরোপ মহাদেশে;
মূর্ত্তি ধরিয়া আসিল দুঃখ এমনি গ্রহের ফের,
ছ'টাকা হইল কাপড়ের জোড়া চার আনা চা'লের সের;
দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চার গুণ হলো সব জিনিষের দাম,
ধীরে ধীরে ধীরে ডুবিতে লাগিল মান সম্ভ্রম নাম;
পনের টাকায় কোনমতে হায় চলে নাক আর দিন,
পুঁজি-পাটা? সে'ত ফুরালো দু'দিনে, করিতে লাগিনু ঋণ;
চালানু দু'দিন বন্ধক দিয়ে গহনা যা ছিল ঘরে,
জীবন বাঁচাতে তাও শেষে হায় বেচিতে হইল পরে;
এমনি করিয়া গেল কিছুকাল, তারপর শেষে, আর
সকলের হাল হইল সমান, কেবা দিবে আর ধার?
কত আবেদন করেছি চরণে অশ্রু ঢেলেছি কত,
কত জানায়েছি তোমায় মোদের অভাব দুঃখ যত;
তবু একবার দেখনি ভুলেও ফিরিয়া মোদের পানে,
তবু প্রাণ তব গলেনি মোদের বুক-ফাটা দুঃখ-গানে!

অধিক কি কব তোমারে মোদের দুঃখের কথা আর,
ছেলেদের পড়া বন্ধ করেছি খরচ জোটেনা তার;
এমনি বরাত বড় ছেলেটার জোটেনা একটা কাজও,
পারুল পড়েছে পনের বছরে বিবাহ দেইনি আজও;

সে সব কথা তো পড়েনি মনেই কভু ক্ষণেকের তরে,
মেয়ের বিবাহ দিবে সে কেমনে ভাত নাহি যার ঘরে ;
দুবেলা দু'মুঠো কেমনে জোটাব ভাবিয়া হয়েছি সারা,
অন্য চিন্তা ছিল না আমার অন্নচিন্তা ছাড়া !
দিনরাত শুধু জ্বলে যেত বুক অভাব দহনে দহি,
চোখের উপরে ছেলে মেয়ে মরে কেমন করিয়া সহি ?
তাদের কাতর করুণ কণ্ঠ বাজিল যেমনি প্রাণে,
কেমন করিয়া স্থির থাকি আর চাহি তাহাদের পানে ?

মানিনি বিবেক, মানিনি ধর্ম্ম, শুনিনি কাহারো কথা,
রাখেনি ত কেউ এক মুঠো দিয়ে,বোঝেনি ত কেউ ব্যথা !
উপোসী-কণ্ঠে দিয়েছি দু'মুঠো ত'বিল ভাঙিয়া তব,
অভাব করেছে স্বভাব নষ্ট অধিক কি আর কব ?

দাও সাজা দাও—অপরাধী আমি—বলিবার কিছু নাহি,
তবু বলি প্রভু, এ পাপ কাজে ত আমি নহি একা দায়ী ;
তুমিই আমারে করিয়া তুলেছ বিশ্বাসঘাতী, চোর !
—ক্ষমা করো দেব, করো মার্জ্জনা কর্কশ ভাষা মোর !

বৈষ্ণব-কবিতা

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

আমদের মনের ভিতর একটা প্রকাণ্ড জগৎ আছে। সেখানে দৃশ্যজগতের সমস্ত ছবিগুলি কল্পনায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। আমরা মানসদ্রষ্টা হইয়া সেই অপূর্ব্ব কল্পনাগুলি উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবার চেষ্টা করি। মনের সহিত ভাবরাজ্যের এই যে আদান-প্রদান,—ইহার শেষ নাই। বাহেন্দ্রিয়ের বিলোপ ঘটিলে অন্তরিন্দ্রিয় ফুটিয়া উঠে। প্রকৃতি যেন স্নেহপরবশ হইয়া আপনার পদ্মহস্তে মুগ্ধ মানবদের চিন্তাজগতের দ্বার খুলিয়া দেন। সেকালের লোক এইরূপ মানসদ্রষ্টা হইয়া একালের লোকের অপেক্ষা অনেক জিনিস বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিত। এই প্রচণ্ড বিজ্ঞানের যুগে আমরা একটা যন্ত্রের সাহায্যে এক সেকেণ্ডকে হাজার অংশে বিভক্ত করিবার স্পর্দ্ধা রাখি। কিন্তু সেকালে লোকের জীবনে এইরূপ ছুটাছুটীর সাড়া আসিয়া পৌঁছায় নাই। দেশশাসন, ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, লোকাচার—সবই 'জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর' ছন্দে চলিয়াছে। 'দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষমাস'—পূজারী সাধন-মন্দিরে শুধু হবিস্পুত অগ্নি জ্বালাইয়া বসিয়া আছেন। এই বিরাট ছুটীর যুগে বিশাল বৈষ্ণব-সাহিত্যের উৎপত্তি। বৈষ্ণব সাহিত্যের অসংখ্য পদকর্ত্তৃগণ যে ভাবুক ছিলেন, সে বিষয়ে কেহই আপত্তি করিবেন না। তাঁহারা জগতের কার্য্য হইতে আপনার মনকে শম্বুকের মত গুটাইয়া লইয়া 'রূপসাগরে' ডুব দিতেন। বলিতে—

'লীলাজলধিতীরে চলু ধাই।
প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই ॥' (গোবিন্দ দাস।)

কখনও বা 'শুক্তি মুকুতার ধাম মনিময় খনি' হইতে দু' একটী সাধনলব্ধ রত্ন পারে ফেলিয়া দিতেন। আমরা সেই রত্নসম্ভারের অধিকারী—সুতরাং অমৃতের সন্তান সন্দেহ নাই।

এই বিষয়ে আর একটী কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। আজকালের মুদ্রিত সাহিত্য অপেক্ষা সেকালের অমুদ্রিত সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও সমাদর ঢের বেশী ছিল। যিনি কবি, তিনিই গায়ক। কবিতার অর্থ গাথা। যে জিনিষটী রসপূর্ণ, তাহা পাঠকের বা শ্রোতার মনের মাঝখানে গিয়া সমস্ত স্থানটী জুড়িয়া বসে। Oral literature বা কথাসাহিত্য পৌরাণিক যুগের বটে, কিন্তু সেগুলি দুর্জ্জয় কালসংগ্রামে টিঁকিয়া আছে, শুধু একটী কারণে। তাহা এই যে, Oral literature ঊর্দ্ধমূল অধঃশাখ অব্যয় অশ্বত্থের ন্যায় একটী বিশিষ্ট স্থানে আপনার মূল সঞ্চারিত করিয়া সেই স্থানের রস ও আলোকে পুষ্ট হইয়াছে। তাহা দেশজ ; দেশের প্রাণের কাহিনী কথাসাহিত্যে,পদ-ভণিতায়,

রূপকে ও বিবিধ ছন্দে পার্ব্বত্য প্রস্রবণের ন্যায় উৎসারিত হইয়া সেই স্থানেরই উর্ব্বরতা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদরচয়িতৃগণ দেশের সেই প্রাণের কাহিনীগুলি ভাষার plateএ ফটো তুলিয়া ছন্দের ফ্রেমে বাঁধিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মই যে সাহিত্যের মূল—তাহার বিনাশ নাই। আবার সেই ধর্ম্ম যখন দেশবাসীর সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত থাকে, তখন সেই সাহিত্যই দেশের মূলপ্রস্রবণ স্বরূপ হয়। এই অতুলনীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে বঙ্গদেশের নীল আকাশের ছায়া অনুরাগভরে আনত হইয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ ভারতের স্যমন্তকমণি। বৈষ্ণব কবিগণের শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্গালার পুরুষ—কুরুক্ষেত্রের পার্থসারথি নহেন। তিনি শিশু—লোকমনোহর, ননীচোরা; তিনি বালক—রসে গদগদ, মাতৃস্নেহে পুষ্ট, সখিপ্রেমে মাতোয়ারা; তিনি কিশোর-চঞ্চল, দুষ্ট, সারল্যে সুন্দর; তিনি তরুণ—তাঁহার বাঁশীর মোহন মন্ত্রে গোপী সব পাগলিনী। তিনি বাঙ্গালার সুন্দর ভাবময় পুরুষ। রাধামোহনের ভাষায়—

'কালিন্দী-সলিল কান্তি-কলেবর
কৃতকুসুমাবলি-বেশ।
কান্তি-করম্বিত করবীর কুট্মল
কলিত সুকুঞ্চিত কেশ॥'

তাঁহার অঙ্গে পীতাম্বর, করে সুন্দর বেণু, তাঁহার 'মুনিমনোমোহন নাট'; তিনি বরকৌস্তুভ ধারণ করেন। তাঁহার 'জনু নব মনমথ ঠাট'। শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ বৈষ্ণব কবিতায় ও বঙ্গদেশের আলোকে পবনে সর্ব্বাঙ্গীন হইয়াছেন।

এই বিশাল রসসাহিত্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীমতী রাধিকা। কিন্তু এই দুইটী চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট রোমান্স দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। গয়টে বলেন, যথার্থ কবিতা inevitable, অর্থাৎ অব্যর্থভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব কবিগণের কবিতা সরল প্রাণের গভীর, সহজ সুন্দর অভিব্যক্তি। জগতের সাহিত্যে এই হিসাবে ইহা অদ্বিতীয়। এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বাঙ্গালী জীবনের যে অংশটী সাহিত্যের বিষয়ীভূত করিয়া চিরবরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই আমাদের লক্ষ্যবস্তু, কেননা তাহা শাশ্বত ও সনাতন।

বৈষ্ণব কবিগণের এইরূপ সরল অভিব্যক্তিটুকু সাধারণ। বিদ্যাপতি শ্রীরাধিকার বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন অবস্থার কত রূপবর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তবুও যেন সেই 'নয়ুঞ্জ-বদনী'র রূপবৈভবটুকু ধরা পড়ে নাই। তাঁহার 'উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ' যেন 'মেঘমালা সঞে তড়িতলতা'; তাঁহার 'কবরীভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে'; তাঁহার 'নাগরশেখর নাগরীবেশ'—নানা ছন্দে নানা ভাবে ভাষায় আকারিত হইয়া কেবল একটী ভাব প্রকাশ করে; —শ্রীরাধার অলোকসামান্য পার্থিব রূপ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভ্রান্ত হইয়াছেন। রাধার সঙ্গলাভ কেবল একটা মানবীয় বাসনার পরিতৃপ্তি—বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলীর এই অন্ধকারময় অংশটী আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের চক্ষেও পড়িয়াছিল। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের কবিতায় এই অস্থিমাংসমেদবসার পূজা অন্তর-পূজায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই হিসাবে বিদ্যাপতি বৈষ্ণবীয় প্রেমকবিতার আদিগুরু শ্রীজয়দেব গোস্বামীর সহিত তুলনীয়। জয়দেবের সংস্কৃত গেয়কবিতাগুলির মধ্যে আমরা অনুপ্রাস, পদলালিত্য, মার্জ্জিতছন্দ ও একটা মোহময় আনন্দপূর্ণ গতি—ডিকুইন্সির অমর ভাষায় 'Glory of motion' দেখিতে পাই। এখানে কৃষ্ণরাধিকার প্রেম একটা মানবীয় জড়-পরিতৃপ্তি মাত্র। কবি স্বয়ং রূপকের যথেচ্ছ ব্যবহার ও তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহার কাব্যকে 'রূপক' নামে অভিহিত করিতে পারি না। রূপক জিনিষটা এক বস্তুর বর্ণনা করিয়া ইঙ্গিতে সূক্ষ্মতর আর একটী জিনিষকে লক্ষ্য করে। অল্প পরিসরে রূপকের খুব বাহাদুরী দেখাইতে পারা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ও জগতের প্রায় সমস্ত প্রাচীন ও নবীন সাহিত্যে ইহার অসংখ্য নিদর্শন আছে। রূপক অতি বিস্তৃত হইলে আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও বোধশক্তি সেখানে পরাভব মানে। ক্ষুদ্র পরিসরে জয়দেব রূপকচ্ছলে কেমন বর্ণনা শক্তি দেখাইয়াছেন, আমরা তাহার একটী নিদর্শন দিব। বিরহী শ্রীকৃষ্ণ কন্দর্পের উদ্দেশে বলিতেছেন—

'হৃদি-বিসলতাহারো নায়ম্ ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ?'

হে কন্দর্প, আমার বুকে এই যে মৃণালহার দেখিতেছ, উহা বাসুকী নহে; আমার গলায় ইহা পদ্মের মালা—গরলরাগ মনে করিও না; আর অঙ্গে যাহা দেখিতেছ, ইহা ভস্ম নহে—চন্দনকণা মাত্র। প্রিয়াবিরহিত আমি—আমাকে শিব মনে করিয়া আমাকে প্রহার করিও না। বিরহী কৃষ্ণের রূপে শিবত্ব আরোপ আর মদনভস্মের সেই পূর্ব্বাবস্থা—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যখন 'বকুলবনে পবন হত সুরার মত সুরভি'—কবি অপূর্ব্ব শক্তিবলে সেই চিত্রটী প্রাণময় করিয়া আঁকিয়াছেন। জয়দেবের কবিতায় নারী সৌন্দর্য্য, জড়প্রেমের বিচিত্র বিলাস, ইংরাজী সাহিত্যের Pre-Raphaelite কবি-চিত্রকরগণের ন্যায় সূক্ষ্মতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ভাষার বৈভবে ভাব দরিদ্র ও পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যাপতি প্রেমের দুইটী দিকই দেখাইয়াছেন। একটী পার্থিব—নশ্বর আপাত সুন্দর রূপ; আর একটী প্রেমের ইন্দ্রিয়াতীত অনশ্বর রূপ। শ্রীকৃষ্ণ রাধার অতীন্দ্রিয়রূপে মুগ্ধ—তিনি বলেন—

'রসের সায়রে ডুবায়ে আমারে
অমর করহ তুমি।'

রবীন্দ্রনাথের গানের 'সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে অমর হয়ে রব মরি'—ইহার সহিত তুলনীয়।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ, দূতীসংবাদ ও সখীশিক্ষা, প্রথমমিলন, বসন্তলীলা, মান, মানান্তে মিলন, প্রেমবৈচিত্র্য, ভাবীবিরহ, বর্ত্তমানবিরহ বা মাথুর, ভাব-সম্মিলন ও পুনর্ম্মিলন প্রভৃতি নানা Conventional বা চিরাচরিত মামুলী নিয়মে বিদ্যাপতি প্রমুখ সমস্ত বৈষ্ণব কবিগণের কাব্য নিয়ন্ত্রিত হইলেও কোথাও ভাব ও ভাষার দৈন্য নাই। ভাব ভাষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া চিরসুন্দরের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। এক বর্ষাচিত্রই কত ভাবে কত ছন্দে অঙ্কিত হইয়াছে—তাহা বৈষ্ণব-সাহিত্যের সামান্য আলোচনা করিলেই চোখে পড়িবে। ভারতের মেঘ—জয়দেবের 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্'—বিরহিগণের মনে যুগে যুগে যাতনার মুর্ম্মুরদাহ উপস্থিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'এমন দিনে তারে বলা যায়,' 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,' 'এস হে এস সজল ঘন বাদলবরিষণে,' 'শ্রাবণ ঘনগহনমোহে গোপন তব চরণ ফেলে' ইত্যাদি শতাধিক সঙ্গীত স্মরণ করাইয়া দেয়। 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ'—মেঘের উদয়ে সুখী লোকেরাও কেমন আনমনা হয়ে পড়ে—প্রবাসী যক্ষের এই উক্তি কেবল ভারতবাসীর প্রতিই প্রযুজ্য। সেই বর্ষায় কৃষ্ণবিরহ দারুণ হইয়া উঠিয়াছে। এই বর্ষা-চিত্রগুলি যেন এক একখানি বৃহৎ চিত্রের সীমান্ত-লীন পরিপ্রেক্ষিতের উপর দু'একটি সূক্ষ্মরেখা। মানবিকতাপূর্ণ, সকরুণ, অশ্রুর নীরবগাথা। "এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর," "জলদ নেহারি চাতক মরি গেল," "মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া," "অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব, কি করব বারিদ-মেহে"—প্রভৃতি বিদ্যাপতি ঠাকুরের সঙ্গীতময় পংক্তিগুলি বর্ণে উজ্জ্বল, ভাবে মোহন, মানবিকতায় অনবদ্য।

প্রকৃতির সহিত মানবজীবনের গভীর সম্বন্ধ, কিন্তু তাহা ভাবের বস্তু, দৃশ্য নহে। কবি তাঁহার কবিতায় প্রকৃতির সহিত মানবজীবনের নিগূঢ় সম্মিলন সাধিত করেন। "পথ নিরখিতে চিত উচাটন। ফুটল মাধবীলতা," "সময় বসন্ত। কান্ত রহু দূরদেশ। জানলু বিহি প্রতিকুল,"

"এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া তিতিছে,
দেখিয়া পরাণ ফাটে॥"

কিংবা—

"ধেনু সঙ্গে আওত নন্দদুলাল।
গোধুলী ধূসর, শ্যাম কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমাল॥" (জ্ঞানদাস)

প্রভৃতি উদাহরণে বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানবজীবনকে সমসূত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে। প্রকৃতি দেবী ধরণীর শিশুর প্রতি যেন সহানুভূতিপূর্ণা হইয়াছেন।

রাধিকার বিরহযন্ত্রণার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে নাই। এই ব্যাকুলবাসনা শ্রীকৃষ্ণে আত্মলয়-জন্ত। এই আত্মেতর প্রীতি —ইহাই বৈষ্ণব সাহিত্যের গূঢ়নীতি। চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ই বৈষ্ণব ভক্তিসাহিত্যের ও ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। ইহা বাঙ্গালার নূতন যুগের নূতন ধর্ম্ম। ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ—ইহাই ত যুগে যুগে জগতের জাতি শিখিয়া আসিতেছে। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে বঙ্গে ভগীরথের ন্যায় সাধনবলে এক নূতন ভাব গঙ্গা আনিলেন। বৈষ্ণবসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের সে ভাবমুগ্ধ ছবির অভাব নাই।

"বিমল হেম জিনি, তনু অনুপাম রে,
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্বকেশর জিনি, একটী পুলক রে,
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
চলিতে না পারে গোরা- চান্দ গোসাঞিরে,
বলিতে না পারে আধ বোল।
ভাবে অবশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া,
আচণ্ডালে ধরি দেই কোল॥
গমন মন্থর-গতি, জিনি ময়মত্ত হাতী,
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ বসন ছবি, জিনি প্রভাতের রবি,
গোরা অঙ্গে লহরী খেলায়॥"

"আচণ্ডালে ধরি দিবে কোল"—ইহাই এই ধর্ম্মের বেদান্তসূত্র। সখ্য, প্রীতি, রতি, দাস্য—ইহাই চৈতন্যধর্ম্ম। চণ্ডীদাস সেই ভালবাসার সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া অমর হইয়াছেন—

"পীরিতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া,
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন, করিতে পারিলে,
পীরিতি মিলয়ে তারে॥"

রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতমূর্ত্তির ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ অনন্তের উপলব্ধি করিতেছে। শেখর রায়ের ভাষায়—"দুহুঁক রূপের নাহিক উপমা, প্রেমের নাহিক ওর।"

এই প্রীতির সাহিত্যে symbolism বা রূপকের দ্যোতনা অবশ্যম্ভাবী। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ভাবুক কার্লাইল বলেন—'allegories are the after-creations of faith'—ধর্ম্মবিশ্বাস ক্রমাভিব্যক্তির ফলে রূপকে পরিণত হয়। বর্ত্তমান যুগের একজন ইংরাজ লেখক বৈষ্ণবসাহিত্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—ঈশ্বর-প্রেম প্রগাঢ় হইলে তাহা পতির প্রতি পত্নীপ্রেমে পর্য্যবসিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Henry Vaughan নামে একজন ইংরাজ কবি তাঁহার একটী ক্ষুদ্র কবিতায় নিজে বধূবেশে সেই রসিকশেখরের উদ্দেশে 'বিপ্রলব্ধা' হইয়া বসিয়া আছেন—

"Ah ! what time it will come ? When shall that cry
The Bridegroom is coming ! fill the sky ?
Shall it in the evening run,
When all our words and works are done ?
Or will thy all-surprising light
Break at midnight ?"

চণ্ডীদাসে আবার এই কৃষ্ণ বা ভগবৎ-প্রেম introspective বা আত্মমুখানুগামী হইয়া পড়িয়াছে—

"মনের সহিত যে করে পীরিতি
তারে প্রেম কৃপা হয়।
সেই সে রসিক অটল রূপের
ভাগ্যে দরশন পায়॥"

এই কৃষ্ণপ্রীতির দুইটী দিক।—বিরহ ও মিলন, সাধন-কৃচ্ছ্রতা ও সিদ্ধি। নরজীবনের পর অনন্ত জীবন। বিদ্যাপতি ঠাকুর বিরহ-খিন্না শ্রীরাধিকার মুখে সেই কঠোর অপেক্ষার কথা বলাইয়াছেন—

"এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
ছোড়নু জীবনক আশা॥"

বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু
খোয়নু এ তনু আশে।
হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জাবব
কি করবি মাধবীমাসে॥"

বিরহিণী রাধিকা বলিতেছেন—'এই নবযৌবন কি চির-বিরহেই কাটিবে? অঙ্কুর যদি তপনতাপে শুকাইয়া যায়, তখন আর মেঘে কি করিবে! সিন্ধু নিকটে থাকিতে যার কণ্ঠ শুকাইল, তার পিপাসা আর কে দূর করিবে!' বিরহের এই 'ঘন আঁধিয়ার' উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবে 'শ্যামসুন্দর পীরিতিশেখরের' সহিত মিলন হইবে।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে। মনস্তত্ত্বেও নাকি এই অবিরাম উচ্চারণের ফল স্বীকৃত হয়। ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে হরিনাম কীর্ত্তনে সাধকের একটা mesmeric trance বা ভাব-সমাধি আসে। সে নাম কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে—

"নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়।"—
"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো
কি করিব কি হবে উপায়॥"

ইংরাজ কবি টেনিসনও এই নামশক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিজের নাম বার বার উচ্চারণ করিয়া একটী অদ্ভুত অবস্থায় উপনীত হইতেন—"till all at once, as it were, out of the intensity of consciousness of individuality, the individuality itself seemed to resolve and fade away into boundless being, and this not a confused state, but the clearest of the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words, where death was almost a laughable impossibility, the loss of personality (if so it were) seeming no extinction but the only true life.' *

তিনি তাঁহার একটী কবিতায় এই তন্ময়তার কথা লিখিয়াছেন—

"As when we dwell upon a word we know
Repeating, till the word we know so well
Becomes a wonder and we know
not why"—†

গোলাপফুলকে যে নামেই ডাকি, সে সৌরভ দিবে বটে, তবে আমাদের অনুভূতির বিকার ঘটিবেই। তাই বলিব, নামের একটা ধর্ম্ম আছে; ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্ম্ম তাহাতে আরোপিত হয়। তাই

"জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥"

নাম কীর্ত্তন কলির প্রধান ধর্ম্ম। শাস্ত্রকার বলেন, 'কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'।

বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের মিলনকাহিনী নানা রূপকের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক শিক্ষিত সমাজ হয়ত তথাকথিত শ্লীলতা ও শালীনতার দোহাই দিয়া ইহাতে অশেষ ব্যভিচার দেখিতে পাইবেন, কিন্তু একটু ভিতরে ঢুকিলে আমরা বুঝিব—'কামগন্ধ নাহি তায়।' বৈষ্ণবকবিতা অপূর্ব্ব রূপকের সাহায্যে আমাদের হৃদয়ের অনালোকিত ভাবরাজ্যে প্রীতির কিরণধারা নিক্ষেপ করে। চৈতন্যের ধর্ম্ম এই বিরাট চৈতন্যসাহিত্য পরিপুষ্ট করিয়াছে। এখানে সবটাই স্থূল ইন্দ্রিয়ের আবরণে প্রচ্ছন্ন, স্থূল সম্ভোগের চিত্রে 'সাহিত্য' হয় না; কালের প্রভাব ব্যর্থ করিয়া আজিও যাহা আমাদের হৃদয় জয় করিতেছে, তাহা একেবারেই 'কমলবিলাসী'র সাহিত্য নহে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যেও 'সাইকি' অর্থে আত্মা এবং রতি। রূপকের চূড়ান্ত সুযোগ; প্রীতিপ্রণত আত্মার অনন্তবেদনা সেই অনন্তদেবের উদ্দেশ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভক্ত চণ্ডীদাস তাই বলেন—

"এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দু'টী কমল পায়॥"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভাবের রাজ্যের জড়জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না; সমস্তটাই একটা প্রকাণ্ড idea—

* Life of Tennyson, a Memoir by his son, 1905.

† Lancelot and Elaine.

তাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন-কামনা এমন ভাবপূর্ণ অশ্রুময় সাহিত্য রচনা করিয়াছে।—বঙ্গভাষার শ্লাঘ্য পিতৃ-পরিচয়। ভগবানই জীবনে শ্রেয়ঃ, তিনিই পরমপুরুষার্থ,—কিন্তু তাঁহার ভজনা করিলে 'বৈড়ালব্রতিক ননদিনী সবে বলে কলঙ্কিনী।' জগতের ধূলিমলিন জীবন সেই মায়াময়ের স্বর্ণদণ্ডস্পর্শে আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। তাই রাধিকা সেই পরমাত্মার সহিত মিলনকালে বলেন—'আজ আমার গেহ, গেহ করিয়া মানিলাম। আজ আমার দেহের সার্থকতা সম্পন্ন হইল। বিধি আজ আমার প্রতি অনুকূল হইলেন, আজ আমার সকল সন্দেহ টুটিল। সেই কোকিল আজ লক্ষবার ডাকিতেছে, চন্দ্র যেন লক্ষচন্দ্র হইয়া উদিত হইয়াছে। পাঁচ বাণ আজ লক্ষবাণ হইয়াছে আর মলয়-পবন মন্দ মন্দ বহিতেছে।' * সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য বিরহান্তে এই মিলনের রসে ভরপূর। সেই যে দাস গোবিন্দের প্রথম মিলন চিত্র—

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।
ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মূরছা পায়॥"

ইহাতে সেই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের মানব ও অতি-মানব মূর্ত্তি শুধু যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নয়—ইহা ভাবের সোহাগে, রসের আদরে, কল্পনার মিশ্রণে বাঙ্গালী জাতির ধর্ম্মের প্রাণ সাহিত্যে চিরবরণীয়, চিররমণীয় ও চিরমহনীয় করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালী জাতি সব ভুলিতে পারে, কিন্তু এই রূপ ভুলিবে না—

"মালতী ফুলের মালাটী গলায়
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল
না কহি লোকের লাজে॥"

আজ সেই না-জানি কি ব্যাধির শান্তি হইয়াছে। আজ "দুঁহু মুখ হেরইতে দুঁহু সে আকুল।"—ইসলাম ধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম যখন সঙ্কুচিত, জাতীয়তার পুনরুদ্বোধনের সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে ধর্ম্মে এমন মানবিকতা আসিয়াছিল। তাই এত দ্যোতনা, এত রূপক, এত রূপ-বর্ণনা।

গোবিন্দদাসের রাধিকার একটী কামনা—তিনি বিধির পায়ে ধরিয়া একটী বর মাগিয়া লইবেন, যেন মিলনকালে তাহার চেতনা থাকে; তা' না হলে যে প্রিয়তমের সকল সৌন্দর্য্য দেখা হইবে না—

"বিহি পায়ে লাগি মাগি নিব এক বর
চেতন রহু মঝু দেহ।"

বিদ্যাপতি ঠাকুরের রাধিকা বলেন—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরী সমানা॥"

আর চণ্ডীদাসের রাধিকা বলেন—

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে॥
দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে ত' ভাল॥
এসব দুখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
এ সব দুখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পাইলাম কোরে॥

---

* আজ মঝু গেহ গেহ করি মানলু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অবলাখ ডাকউ
লাখ উদয়া করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥

এখন কোকিল আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥"

"মথুরা নগরে ছিলে ত' ভাল"—শ্রীকৃষ্ণ ইহার তীব্র শ্লেষটুকু বুঝিয়াছিলেন। শ্রীরাধিকা বাঙ্গালী বধূ। দুঃখে তাহার বেদনা অন্তরে লুকান থাকে, মিলনে সে বড় মুখরা। বাঙ্গালী বধূ দুঃখের প্রতিমা পূজা করে, সে চিরকাল বলে—'অবলা বলিয়াই ত' এত সহিলাম, পাষাণ হইলে ত' এতদিন কোনকালে ফাটিয়া যাইতাম!' তাই চণ্ডীদাস আমাদের প্রাণের কবি,—অন্তরের কথাগুলি তাঁহার কাব্যের মোহন-মন্ত্রে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই দাম্পত্য প্রেম মরজগতের কঠোর সীমা ছাড়াইয়া অমরলোকের কাহিনী শুনায়—চণ্ডীদাস ও রজকিনী রামীর ঘটনায়। যে প্রেম জগতের বাধা মানে না, সমাজশৃঙ্খলে যে প্রেমকে বাঁধা যায় না, যে প্রেম শ্রেয়বস্তুর সহিত এক হইতে চায়, প্রাচীন সাহিত্যে যে প্রেম কাহিনীর উদ্ভব তাহা চণ্ডীদাসের সহজ সুন্দর ভাষায় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

"তুমি রজকিনী আমার রমণী
তুমি হও পিতৃমাতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥"

প্রতীচীর 'Platonic love' বা অহেতুকী-প্রীতি ইহার অনেক নিম্নে। বসন্তোৎসবের সময় নবমবর্ষীয়া কিশোরী বিয়েট্রিচে পর্টীনারিকে দেখিয়া মহাকবি দান্তে এইরূপ মুগ্ধ হইয়া চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী গেম্মা দোনাতির (Gemma Donati) মুখে সেই বিয়াট্রিচের সাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন। আবার তাঁহার চিরাকাঙ্ক্ষিত স্বর্গরাজ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

দেশাচারের প্রতিকৃতি হিসাবে এই বিশাল কাব্য-সাহিত্যের মূল্য বড় সামান্য নহে। নারীর অলঙ্কার প্রসাধন, লোটন ও কানাড়া ছাঁদে কবরী-রচনা, ভ্রাতৃজায়ার সহিত ননদিনীর বঙ্গবিখ্যাত প্রীতি, যশোদা ও দৈবকীর কাহিনী-চ্ছলে মাতৃস্নেহ, গোপকুমারগণের সখ্য, যুগাচার ও দেশাচারের প্রতিচ্ছবি বলিয়া এগুলি বঙ্গসাহিত্যে চিরকাল অমর হইয়া থাকিবে।

বৈষ্ণব কবিগণ অনুরাগের তুলিকায় হৃদয়ের ভাষার বর্ণে এই অপূর্ব্ব চিত্র আঁকিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচরিতের কথকতা ও গান করিয়া বক্তা বা গায়ক সভাস্থ জনমণ্ডলীর দুনয়নে অশ্রুর প্রস্রবণ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। আমরা সৌভাগ্যবশত সেই অমর অশ্রুময় দৃশ্য দেখিয়াছি। ভাব, ভক্তি ও জ্ঞানের অবতার শ্রীকৃষ্ণ, ভালবাসার পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবনের চিরারাধ্য শ্রীকৃষ্ণ, আর নিষ্ঠুর-হৃদয় মথুরাপ্রবাসী শ্রীকৃষ্ণ—এসব যে আমাদের পল্লীজীবনের গার্হস্থ্যজীবনের দৈনন্দিন চিত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার কথা বঙ্গসাহিত্যে একটা Romantic cycle বা নবরসের কাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকাহিনী আমাদের জীবনের কথা নূতন করিয়া রসে মজাইয়া অপূর্ব্বচ্ছন্দে শুনাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরই মত এই সুখদুঃখের জগতে আমাদের একজন হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার—

"তরুণ মুরলী করিল পাগলী
রহিতে না দিল ঘরে॥"

তাঁহার অতি নির্ম্মল নয়নকমলে স্নিগ্ধ কাজল-রেখা, যেন যমুনার কিনারে মেঘের ধারাটী প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি 'পীরিতি বলিয়া এ তিন আখর' ভুবনে আনিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের এক একটী কার্য্য আমাদের জীবনে ও আমাদের সাহিত্যে সুবর্ণপ্রভ বর্ণে ভাস্বর হইয়া আছে। মথুরাযাত্রার সময় চণ্ডীদাস সাহিত্যে শোকের প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন কবিগণের উমা বা কালিদাসের শকুন্তলা পতিগৃহগমনকালেও এমন গভীর শোক জাগাইতে পারে নাই।

"এ সব যা কর বেদন উঠয়ে
সে জনে ছাড়িতে চায়!"—

যার জন্য এত সহিলাম, সে আজ আমাদের ছাড়িতে চায়! হে নবঘন, আজ সবার মরণ দেখিয়া তবে তুমি মথুরায় যাও! তখন—

'দুবাহু পসারি নবীন কিশোরী
পড়ল রথের তলে।
যাহ যাহ চলি রাধারে মারিয়া
সকল গোপিনী বলে॥"

এই অশ্রুর সাহিত্য বঙ্গের চির আদরের ধন। আজ যুগপ্রবর্ত্তনের ফলে আমাদের সাহিত্যে নিরীশ্বরবাদ আসিয়া পড়িয়াছে। সে জীবনব্যাপী সাধনা, সে হৃদয়-ভরা প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধা, আচার্য্য বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের সে মনীষা আজ সাহিত্যের পবিত্র অঙ্গন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। আমাদের ভাবময় সাহিত্য ভক্তের বৃন্দাবন বলিলে বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আজ 'নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'।

জগতের চিরন্তন বেদনা সঙ্গীতে, ছন্দে, নৃত্যে আকারিত হইয়াছে। অনার্য্যের পীড়নে আর্য্যগণের সেই ভক্তিময় দেবতাস্তুতি 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' ইহা বীণার তানে গেয়। আহ্রামন্ ও অরমজ্দ্ বা পাপপুণ্যের সংগ্রাম ছন্দে মুকুলিত হইয়াছে। ডেভিড্ ও সলোমনের গান, নারী-প্রেমে উদ্ভ্রান্ত ট্রয়ের গাথা, প্রবাসী ও জীবনযুদ্ধে মুমূর্ষু ওডিসিউসের গাথা, সৌরদেবতা বলডারের অকালমৃত্যুতে দেবেন্দ্র ওডিনের শোকগাথা, ইয়োরোপের মধ্যযুগে শার্লমানের কাহিনী, স্বর্ণময় চষকে জীবনের সঞ্জীবনী সুধার সন্ধানে স্যর গ্যালাহাডের প্রস্থান—সমস্তই গানের ভিতর দিয়া সাহিত্যে অমরত্বলাভ করিয়াছে। ভারতের মধ্য-যুগে শ্রীচৈতন্যের কাহিনী ও কৃষ্ণরাধিকার প্রণয় কাহিনীও সেই একই নিয়মে, ছন্দে, সুরে ও বিনোদ বাঁশীর বিনোদ আলাপে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। মানব হৃদয়ের সনাতন বৃত্তিসমূহ সাহিত্যেও অমর হইয়া থাকিতে চায়। ছন্দঃ অমর, ভাবও অমর। ভাব ও ছন্দ অমর-মিথুন। ইহার জৈব ইতিহাস বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঁধা যায় না। জগতের অনেক জিনিষই বিশ্লেষণে ধরা দেয় না। তাহারা মেঘের মত চঞ্চল, মৃত্যুর মত অজ্ঞেয়,—সে সব আকাশকাহিনী তারকার ছন্দে আকাশের নীল মণ্ডমণ্ডলে চিরকাল লিখিত আছে। জগতের লোক সেই জগৎকারণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহা বুঝিতে পারে।

তাই গৌরী, কেদারা, কানাড়া, বেহাগলি, সুরট, মল্লার, বেহাগ, ইমন, ভৈরবী প্রভৃতি বিবিধসুরে বিবিধ-ভাব গানের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক বঙ্গীয় গীতিকবিতা বৈষ্ণবকবিগণের ভাবে, ভাষায়, ছন্দে অনু-প্রাণিত।

অহেতুকী প্রীতি—ইহাই বৈষ্ণবীয় কাব্যের মূলতত্ত্ব। "পুষ্প যেমন আলোর লাগি, না জেনে রাত কাটায় জাগি," কিংবা "ঝর্ণা যেমন বাহিয়ে যায়, জানে না সে কাহারে চায়"—এই অজ্ঞেয় ভাবের জ্ঞানলাভ জন্য বৈষ্ণব কবিগণের সারাজীবনের সাধনা নিয়োজিত হইত। গৌড়জনকে তাঁহারা দেশের কথা, নবজীবনের কথা, অমৃত মধুরকণ্ঠে শুনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের কণ্ঠ আজ নীরব; তাঁহারা চিরাভীপ্সিত মহারাস-রসিকের সঙ্গলাভে আজ জগতের দুঃখশোকের অতীত হইয়াছেন। কিন্তু আজিও তাঁহাদের অমৃতচ্ছন্দ আমাদের মনে বৃন্দাবন সৃষ্টি করে; আজিও সেই প্রেমের অরুণরাগে আমাদের হৃদয়ের তমিস্রা ঘুচিয়া যায়; আজিও আমরা তাঁহাদের পরিত্যক্ত রত্নরাশির উত্তরাধি-কারী। তাই আশা আছে, বঙ্গের সাহিত্যে,বঙ্গের জীবনে, বঙ্গের গৃহপ্রাঙ্গণে ভাব-ভাগীরথী আবার প্রবাহিত হইবে।

বৈষ্ণব সাধকগণের যিনি চিরপূজ্য দেবতা, 'কালিন্দী-সলিল-কান্তি-কলেবর' সেই স্বপ্নময়, ভাবময়, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমি প্রণাম করি। হরি ওঁ।

ফ্রান্স-গৌরব

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

১

ফ্রান্সের অনেক এঞ্জিনিয়ারই নামজাদা। আমাদের দেশে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সবে মাত্র সুরু হইতেছে। কাজেই দুনিয়ার বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ারদের নাম আমাদের কানে এখনো পশে নাই। প্যারিসের একজন বড় এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মেটালার্জ্জি সম্বন্ধে আলাপ হইল। সাকৃচিতে তাতার ষ্টীল কারখানা স্থাপিত হইবার পর মেটালার্জ্জির প্রক্রিয়া-গুলা ভারতের শিক্ষিত সমাজে কথঞ্চিৎ প্রচারিত হইয়াছে।

ফরাসী মেটালার্জ্জিষ্ট মহাশয়ের নাম গিয়ে (Guillet)। ইনি এক টেক্‌নিক্যাল কলেজে মাষ্টারিও করিয়া থাকেন। এই কলেজে পড়িতে পয়সা লাগে না, বিদেশী ছাত্রেরাও বিনা পয়সায় উচ্চতম রসায়ন, তড়িদ্‌বিজ্ঞান, কার্য্যকরী পদার্থবিদ্যা, ধাতুসংক্রান্ত এঞ্জিনিয়ারিং, চীনার বাসনের কাজ, ব্যবসায়িক অর্থশাস্ত্র এবং ফ্যাক্টরী সম্বন্ধীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিখিতে পারে। এই ধরণের কলেজের কথা ভারতবর্ষের নেতৃস্থানীয় লোকেরা বোধ হয় এখনও জানেন
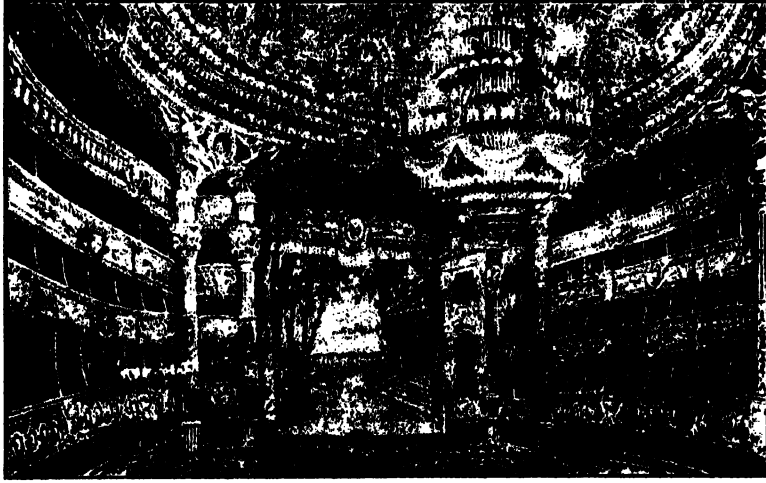
ওপেরার ভিতর

না।. গীয়ে বলিতেছেন—'মেটালার্জ্জি সম্বন্ধে ভারতবাসী-দের কি অভাব তাহা আমাকে পরিষ্কারভাবে কেহ যদি জানাইয়া দেয় তাহা হইলে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।' ইঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইল তাঁহার বাড়ীতে। গীয়ের কলেজের নাম কোঁজার্ভেতোয়ার ন্যাসন্যাল দেজ আর্‌জ্‌এ মেতিয়ে (Conservatoire National des arts et metiers)

আধুনিক প্রণালীতে লোহা গালাইয়া ষ্টীল তৈয়ারি করার বিদ্যাটা আমাদের দেশে নিতান্ত নূতন বটে। কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞান অনেকদিন হইতেই চলিতেছে। বহু ভারতীয় রাসায়নিকের মৌলিক গবেষণা আজকাল ইংলণ্ডে ও আমেরিকার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিতও হইতেছে। কাজেই দুইচার জন ফরাসী রসায়নবিদের নাম আমরা দেশে বসিয়াই শুনিয়া থাকি। প্যারিসে দেখা হইল মুরোর (Moureu) সঙ্গে। ইনি রেভ্যি সিয়েঁতিফিক্ (Revue Scientifique) এর সম্পাদক।

কাগজটা পাক্ষিক। বৈজ্ঞানিক মণ্ডলের যেখানে যাহা ঘটিতেছে তাহার সংবাদ বাহির করা এই পত্রিকার এক উদ্দেশ্য। প্রবন্ধ এবং পুস্তক সমালোচনাও প্রকাশিত হয়। মুরোর খ্যাতি অর্গ্যানিক রসায়নে। ইঁহার প্রসিদ্ধ কেতাবের নাম Nations fondamentales de chirnie organique. বায়ুমণ্ডলের দুষ্প্রাপ্য গ্যাস সম্বন্ধেও ইনি গবেষণা করিয়া থাকেন।

মুরো একজন পাঁড় 'স্বদেশী'। ফরাসী শিল্প ও বিজ্ঞান এবং ফরাসী রাষ্ট্রের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ইনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সবেমাত্র ইঁহার এক কেতাব বাহির হইয়াছে। কেতাবের মর্ম্ম :—'বিজ্ঞানের উপর ফরাসী জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। অতএব, হে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, হে বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক ফরাসী নর-নারী, বিজ্ঞানসেবী পণ্ডিতগণের গবেষণায় সাহায্য কর।' কেতাবটা লেখা বিল্‌কুল ফরাসী ষ্টাইলে, অর্থাৎ সাদা-সিধা প্রাঞ্জল ভাষায়। রচনা অতি মধুর,—এদিকে খাঁটি বৈজ্ঞানিক তথ্যেও ভরা। যাঁহারা ফরাসী জানেন তাঁহারা La chimie et la guerre পাঠ করিয়া একসঙ্গে ফরাসী ভাবুকতা, ফরাসী বিজ্ঞান চর্চ্চা এবং ফরাসী স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাইবেন। প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রকাশক Masson et Cie, প্যারিস।'

প্রকাশককে ফরাসী ভাষায় বলে এডিটার (editeur)। এই শব্দের ইংরেজী আত্মীয়ের অর্থ অবশ্য 'পত্রিকা সম্পাদক।' পত্রিকাসম্পাদককে ফরাসীতে বলে ডিরেক্‌টার (directeur)।

ফরাসীদের দস্তর ইহারা সোজা ভাষায় কঠিন কথা প্রকাশ করে। মুরোর রচনা হইতে আর একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত বৎসর ষ্ট্রাস্‌বুর্‌ সহরে ফরাসী বিজ্ঞান-বিবর্দ্ধনী পরিষদের (Association francaise pour l'avancement des sciences) বার্ষিক সম্মিলন হয়। এই সম্মিলনে মুরো এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের নাম Lavoisier et Ses Continuateurs (ল্যাভোআজিয়ে এবং তাঁহার পশ্চাদনুগামিগণ)। ফরাসী বৈজ্ঞানিক ল্যাভোআজিয়ে (১৭৪৩-১৭৯৪) নব্য রসায়নী বিদ্যার জন্মদাতা। তাঁহার প্রদর্শিত পথে যে সকল ইয়োরা-মেরিকান পণ্ডিত বিগত ১৫০ বৎসর কাল চলিয়াছেন তাঁহাদের বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধে পাওয়া যায়। বৃত্তান্তটা ব্যক্তিগত আলোচনা স্বরূপ প্রদর্শিত হয় নাই। রসায়নের সূত্রগুলা ধাপে ধাপে কেমন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে সেই ধাপগুলা অতিশয় নিপুণভাবে দেখানো হইয়াছে। রয়্যাল অক্টেভো (৮ পেজী) আকারের ৩০ পৃষ্ঠায় রচনা সম্পূর্ণ। আমাদের যে সকল যুবা রাসায়নিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফটক পার হইবার পর বিদ্যার রাজ্যে বিচরণ করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে এই ধরণের এক পুস্তিকা খোদ ফরাসী হইতে বাংলায় তর্জ্জমা করা অগৌরবের কার্য্য হইবে না।

বাঙ্গালীরা আজও অনুবাদ-কার্য্যটাকে নেহাৎ খেলো দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রয়াস বিবেচনা করিয়া থাকে। ইহা বড়ই আপ্‌শোসের কথা। অনুবাদ করাটা যদি নিন্দনীয় হইত তাহা হইলে পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, এবং কবিরাও বিভিন্ন বিদেশী গ্রন্থকারের রচনা নিজ মাতৃভাষায় প্রচার করিতে অগ্রসর হইতেন না।

'ফরাসী বিজ্ঞান-বিবর্দ্ধনী পরিষৎ' স্থাপিত হইয়াছে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে। ৪৭ বৎসরে ইঁহারা খরচ করিয়াছেন দশ লক্ষ ফ্রাঁ—একমাত্র বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্য্যের সাহায্যে জন্য। গড়ে প্রায় বৎসরে বিশ হাজার ফ্রাঁ। ইহা এমন কিছু অত্যধিক ব্যয় নয়, মনে রাখিতে হইবে, কোন ব্যক্তি-কেই পূরাপূরি সকল খরচ দেওয়া হয় নাই। যত লোককে সাহায্য করা হইয়াছে সকলকেই নিজ প্রয়োজনের কিয়দংশ মাত্র এই পরিষৎ প্রদান করিয়াছেন। ফ্রান্সে এই ধরণের আরও অনেক ফাণ্ড আছে।

আমেরিকার 'মুভিং পিক্‌চার' থিয়েটারগুলাতে যে সকল ছবি দেখা যায়, প্যারিসেও অনেক 'সিনেমা'তে সেই সবই দেখিতেছি। প্রভেদ মাত্র ভাষায়। ইয়াঙ্কিস্থানে বিবরণগুলা লেখা থাকে ইংরেজিতে, এখানে সেইস্থানে দেখিতেছি দেওয়ালে ফরাসী। তবে ভাষাজ্ঞানের কথঞ্চিৎ পরীক্ষা হইয়া যাইতেছে। কেন না, কোনো লেখাটাই

আগাগোড়া পড়িয়া উঠিতে পারিতেছি না। যতটুকু পড়িতেছি ততটুকু বুঝিতেছি, কিন্তু প্রত্যেক বিবরণেরই শেষ চতুর্থাংশ পড়িতে পারার পূর্ব্বেই নূতন ছবি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়ায়।

এক থিয়েটারে নাট্যাভিনয় দেখিলাম ওম দ'লেতর বা সাহিত্যসেবীর টিকিটে অর্থাৎ কম মাশুলে উঁচু শ্রেণীতে। বুঝিলাম না একটা শব্দও। ঘটনার স্থান মেসোপোটেমিয়া ও স্কটল্যাণ্ড।

প্যারিসের 'ওপেরা'তে (ইংরেজী উচ্চারণ অপ্‌রা Opera) যে সমস্ত পালা গীত হয় নিউইয়র্কেও সেইগুলা শুনা যায়। গীতের ভাষা কোন কোন সময়ে নিউইয়র্কে ফরাসীও নির্ব্বাচিত হয়—যুদ্ধের পূর্ব্বে জর্ম্মাণও হইত। সুকুমার শিল্পের তরফ হইতে পাশ্চাত্য জগতের নরনারী যতটা ঐক্য সূত্রে গ্রথিত, আমাদের ভারতীয় জনসাধারণের সমাজে ততটা ঐক্য আছে কি? অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের ট্রিচিনপলিতে যে নাটক অভিনীত হয় সেই নাটকের মারাঠী অনুবাদ পুণাতে এবং আসামী অনুবাদ শিলঙে অভিনীত হয় কি?

বর্ত্তমান যুগের কথা বলিতেছি, কেন না ইতিহাসের নজির দেখাইয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখনই জবাব দিবেন যে, মধ্য যুগের ভারতে এইরূপ ঐক্য ছিল। তখন একই সংস্কৃত গ্রন্থের বিভিন্ন অনুবাদ এক সঙ্গে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রচারিত হইত, এবং তাহার সাহায্যে আসমুদ্র হিমাচলের নরনারী একই যাত্রা, কথকতা, ভাঁড়ামি, হাসি ঠাট্টার আনন্দে ডুবিতে পারিত। কথাটা এই যে, আজ বর্ত্তমান জগতের আনন্দ বা সমস্যা গোটা ভারতকে কতখানি এক করিয়া তুলিতেছে?

কলেজ দ' ফ্রান্স (College de France) এর কর্ত্তা মরিস ক্রোআজে (Croiset) অতি প্রবীণ লোক। কলেজেই বসতি করেন। বিলাতী অক্সফোর্ডের কলেজের কর্ত্তারা আর আমাদের দেশী "টুলো" পণ্ডিতেরা এই ধরণেরই এক জাতীয় অধ্যাপক। ক্রোআজে গ্রীক সাহিত্যে পণ্ডিত। কলেজটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার বাহিরে—যদিও স্থান হিসাবে লাগা বটে। বার্গসঁ (Bergson) এই কলেজেরই মাষ্টার। এখানকার ছাত্রেরা ডিগ্রি পায় না। ক্রোআজে বলিলেন;—'বিদ্যার রাজ্য বাড়াইতে যাঁহাদের প্রয়াস তাঁহাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করাই এই কলেজের উদ্দেশ্য।'

২

পাগলা কুকুরে কামড়াইলে যে ব্যারাম হয় তাহার দাওয়াই আবিষ্কার করিয়াছেন ফরাসী ডাক্তার প্যাষ্টয়র, ভারতে এই পর্য্যন্তই আমরা জানি। শিমলা পাহাড়ের নিকট কসৌলিতে প্যাষ্টয়রের নামে একটা ইংরেজ-পরিচালিত হাঁসপাতালও আছে। কিন্তু ডাক্তার প্যাষ্টয়র একমাত্র এই দাওয়াই-ই আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার প্রতিভা ছিল সহস্রমুখিনী। প্রাণ-বিজ্ঞান বিদ্যার এমন কোন শাখা নাই যাহাতে তাঁহার কৃতিত্ব না পাই। নব্য চিকিৎসা ও শল্য (সার্জারি) যে প্রণালীতে চলিয়া থাকে তাহার প্রবর্ত্তক ছিলেন প্যাষ্টয়র। তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ সুরু হয় রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা বিভাগে। ১৯০৭ সালে ফরাসী নরনারীরা এক বিচিত্র বিচারের জন্য বৈঠক বসাইয়াছিল। তর্ক উঠিয়াছিল—'গোটা ফরাসী জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?' ভোটে নাম উঠিয়াছিল প্যাষ্টয়রের। প্যাষ্টয়র তখন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর বার বৎসর পর এই কীর্ত্তিলাভ ঘটিয়াছে। প্যাষ্টয়র (১৮২২—৯৫) লোকটা কত বড় ইহা হইতে খানিকটা আন্দাজ করা চলে বোধ হয়!

এই প্যাষ্টয়রের স্থাপিত প্যারিসে একটা অনুসন্ধানালয় আছে। নাম অ্যাঁস্তিতিউ প্যাষ্টয়র (Institut Pasteur)। রসায়ন আর বায়োলজির এমন কোন বিভাগ নাই যে বিষয়ে এখানে গবেষণা না হইতেছে। প্যাষ্টয়রের আবিষ্কারগুলা যত দিকে নূতন পথ খুলিয়াছিল সব দিকেই নিয়মিত অনুসন্ধান চলিতেছে। বায়োলজিক্যাল কেমিষ্ট্রী বা জৈবিক রসায়ন বিভাগের কর্ত্তা ব্যার্ত্রাঁ (Bertrand) বলিলেন;—'কৃষি, রেশম-কীট, উদ্ভিদ, চামড়া, বিষ, খুসবুই, ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য,—যা কিছু প্রাণীর জীবনে লাগে সকল বিষয়েই রাসায়নিক পরীক্ষা আমার অধীনে চলিতেছে।' অনুসন্ধানকারীদের ভিতর সকলেই ডাক্তার,

রাসায়নিক বা ঐ ধরণের কোনো না কোনো বিদ্যায় ওস্তাদ করিৎকর্ম্মা লোক। ব্যাক্‌টিরিওলজি বিভাগের কর্ত্তার নাম ভাইনব্যার্গ (Weinberg)। ইহার সঙ্গে এক বাঙ্গালী ডাক্তার চাঁদপুরের হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ কাজ করিতেছেন।

ব্যাত্রাঁর এক মহিলা সহকারীর সঙ্গে আঁ্যাস্তিতিউ পরিদর্শনে বাহির হইলাম। মহিলা পোলিস জাতীয়া। ইনি চৌদ্দ বৎসর আঁ্যাস্তিতিউয়ে রিসার্চ করিতেছেন। আঁ্যাস্তিতিউ স্থাপিত হইয়াছে ১৮৮৫ সালে। আজ এখানে মোটের উপর পঞ্চাশটা ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা চলিতেছে। একটা হাসপাতাল ল্যাবরেটরীগুলার সংলগ্ন। প্রত্যেক রোগীর জন্য আলাদা কামরা। রাস্তার দুই ধারে আঁ্যাস্তিতিউয়ের দুই অংশ। ব্যাক্‌টিরিওলজির অংশে চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থশালায় আয়োজন বিপুল। খরগোশ, চিড়িয়া ইত্যাদি জানোয়ারের উপর ব্যাক্‌টিরিয়ার পরীক্ষা করা হইতেছে।

আঁ্যাস্তিতিউ প্যাষ্টয়র
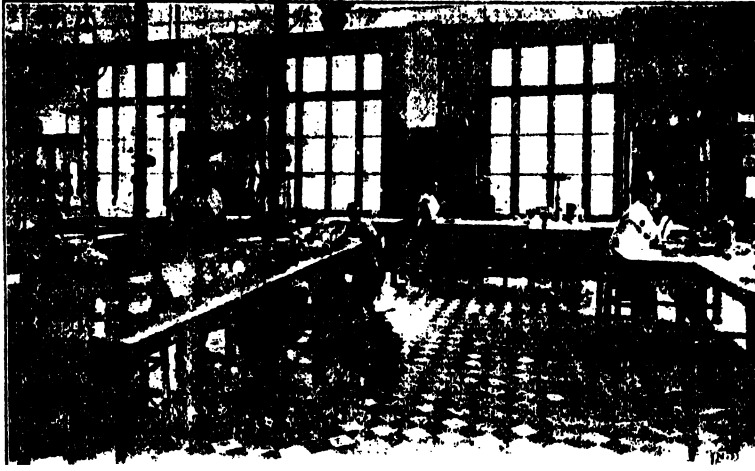
বলা বাহুল্য, এই অনুসন্ধানালয় বুঝিতে যে ধরণের যতটা বিদ্যার দরকার তাহা আমার পেটে নাই। দুনিয়ায় যত কিছু চোখে পড়িয়াছে বা কাণে শুনিয়াছি সবই কি বুঝিয়াছি? কেবল এই ভাবিতেছি যে, লুভর দেখা বা পিরামিড দেখা, বা সাব্‌মেরিন দেখা যদি মানুষের সাধ হয় তাহা হইলে বষ্টনের টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট দেখা অথবা প্যারিসের এই আঁ্যাস্তিতিউ দেখাও সাধ হওয়া উচিত। কাজেই প্যাষ্টয়রের অনুসন্ধানালয়ে আসিয়া বর্ত্তমান জগতের একটা নং ১ দর্শনযোগ্য বস্তু দেখিলাম। আমাদের দেশে অনেক প্রাণীতত্ত্ববিৎ, রাসায়নিক, চিকিৎসক ইত্যাদি শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছেন তাঁহারা আসিয়া স্বচক্ষে এখানকার ল্যাবরেটরীগুলি দেখুন সম্প্রতি মাত্র এই ইচ্ছা মনে জাগিতেছে। পরীক্ষা গৃহগুলা দেখিলে আর অনুসন্ধেয় তথ্য সমূহের তালিকা পড়িলে তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবেন। এক প্যাষ্টয়র ইন্‌ষ্টিটিউট হইতেই ভারত ভরিয়া চিন্তার বিপ্লব উঠিতে পারে। বোধ হয় আমাদের উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রবীণ মুরুব্বিদের মধ্যে খুব কম লোকই প্যারিসের এই প্রতিষ্ঠানের সঠিক বৃত্তান্ত অবগত আছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কোনো এক কেতাবে আছে যে ইংরেজীতে স্বপ্নদেখা ভারতবাসীর পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য বা ঐ জাতীয় কিছু। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও অনেক ভারত সন্তানই বিদেশী ভাষায় স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের নাড়ী পর্য্যন্ত বিদেশী হইয়া যাইবারই কথা! যাহা

হউক, মাত্র ছয় সপ্তাহ ফ্রান্সে থাকিতে থাকিতেই খাঁটি ফরাসী ভাষায় একটা দুই লাইন স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিয়াছি। ব্যাকরণ মিলাইয়া দেখিতেছি ষোল আনা নির্ভুল। অথচ দুর্ভাগ্যের বিষয়, চিত্তটা ফরাসীভাবাপন্ন হওয়া ত দূরের কথা, আজও বাজারে দাঁড়াইয়া ফরাসী আওয়াজ বুঝিতে অসমর্থ। ওপেরাতে যাইয়া কেবল গুণিলাম ৬৫টা যন্ত্র,—দেখিলাম তাহাদের অধিকাংশ তারের। কানে ঠেকিল মাত্র সুর। পালা ছিল "ফাউষ্ট"। এই যা রক্ষা। তবে ফরাসী ভাষায়। কেতাবটা ঘরে পড়িয়া যাইবার সময়াভাব।

নিউ ইয়র্কের অপেরা প্যারিসের এই প্রতিষ্ঠান হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়, বরং সেথায় ঘরটা বড়। লোক বসিতে পারে বেশী। আর গানবাজনা ত গোটা ইয়োরামেরিকায় একাকার। অধিকন্তু আমেরিকাতে ইতালীয়, ফরাসী, জার্ম্মাণ, স্পেনিষ সকল জাতীয় গায়ক গায়িকাকে "দেড়া মাশুলে" ভাড়া করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। কাজেই প্যারিসওয়ালারা অন্ততঃ এই বিষয়ে নিউ ইয়র্ককে হঠাইতে পারিবে না।

জগতের সর্ব্বত্র নয়া নয়া দল উঠিতেছে—সমাজ ও রাষ্ট্রের উদ্দেশে নানা সংস্কার মাথায় লইয়া। সকল দলেরই কাগজ আবশ্যক। প্যারিসে এই ধরণের এক নবীন দলের কাগজ পড়িতেছি। নাম "প্রোগ্রে সিভিক্" (Progres Civique)। ইহাকে বাঙলায় বলা যাউক "সামাজিক" বা "দেশের উন্নতি" বা সোজাসুজি "রাষ্ট্র সংস্কার"। এই কাগজের সম্পাদক আঁরি দুমে (Henri Dumay) জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"আমেরিকার 'নিউ রিপাব্লিক' কাগজটা ভারতবাসীর স্বপক্ষে না বিপক্ষে।" আমি বলিলাম :—"লড়াই থামিয়াছে আজ দুই বৎসর। এখন গোটা আমেরিকাই যুবক ভারতের স্বপক্ষে।"

ভারততত্ত্ববিৎ সেনারের বৈঠকখানা দেখিয়া বুঝা যায় লোকটা লেখাপড়া করে বটে। বুড়া মানুষ, আজকাল কাজকর্ম্মে ঝোঁক অল্প। নিতান্ত দরকার বা জরুরি কাজ না থাকিলে সভাসমিতিতে যাওয়া আসা নাই। লোক ভাল। কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি বুড়ারাও এশিয়ার সঙ্গে হৃদ্যতা পাতাইতে অগ্রসর।
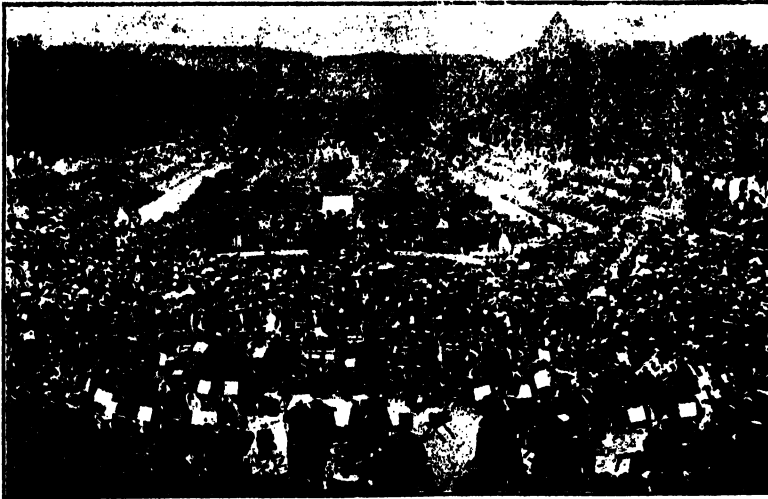
বসন্ত গ্রীষ্মের খোলা মাঠে সঙ্গীতমঞ্চ
(জার্দাঁ-দে প্লাঁ বাগিচায়)

(৩)

আঁদ্রে দেরাঁ (Andre Derain) মধ্য বয়স্ক লোক। ইঁহার কর্ম্মশালায় যে ছবিগুলা দেখিলাম তাহার প্রশংসা করিবার জন্য পাজি পুথি ঘাঁটিতে হয় না। মূর্ত্তি আঁকিতে দেরাঁর হাত যেমন পাকা, প্রাকৃতিক দৃশ্যেও তেমনি সবই তৈলচিত্র। জমিন প্রধানতঃ ধাতুজ ‍নীলে।

রাসায়নিক শেভ্রাল
(জার্দাঁ দে প্লাঁৎ বাগানে এই মূর্ত্তি স্থাপিত)

কেবল একটা কথা মনে হইতেছে—প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতেছি চিত্রশিল্পীরা একাধিক মুখ বা শরীর গড়িতে অসমর্থ। এক চেহারার এ পিঠ আর ও পিঠ সাজাইয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্বিস রঙানোই সকল কারিগরের কাজ। বোধ হয় সাহিত্যেও তাই। একটার বেশী চরিত্র খাড়া করিতে, জগতে খুব কম লেখকই পারিয়াছেন। সৃষ্টিশক্তির সীমানা বা প্রতিভার দৌড় সম্বন্ধে অত্যধিক দাবী করা বোধ হয় অনুচিত।

চেহারা যদি একই হইল, চরিত্র যদি একই হইল, বক্তব্য যদি একই হইল, মান্ধাতার আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত মানবশিল্পের বাণী বা মানব-সাহিত্যের "রস" যদি মোটের উপর একই থাকিল,—তাহা হইলে দুনিয়া বাড়িতেছে কোন্ তরফে? আসল কথা, এই বাড়তির দিকটা ঢুঁরিতে হইবে প্রধানতঃ ওস্তাদি, ও কৌশলে, কায়দায়, ঢঙে, রীতিতে, এক কথায়—আর্টে।

বিশ্বামিত্র যে বস্তু প্রমিথিউস্‌ও সেই বস্তু, লুসিফারও সেই বস্তু, সয়তানও সেই বস্তু, আর প্যারাসেলসাসও সেই বস্তু। তথাপি ইহারা সবাই বিশেষত্বওয়ালা ওস্তাদের মার্কামারা পেটেণ্ট করা মাল। যখনি কোনো চিত্রকরের বা ভাস্করের গড়া একই মূর্ত্তি দশবিশটা স্বতন্ত্র কাজে নজরে আসে তখন আর মুখশ্রী বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকটা মনে রাখি না।

তখন দেখি কেবল কারিগর কোন্ কোন্ রং কোথায় কতখানি ব্যবহার করিয়াছেন, তখন বুঝি কেবল ঘাড়টা বাঁকাইয়া না গড়িলে চেহারাতে চিন্তার রেখা পড়িত না, তখন রঙের সমাবেশেও ঢুঁরিয়া পাই যেন ইমারত তৈয়ারী করার কৌশল, আর বাটালির আঘাতেও চোখে ভাসে আলোক ও ছায়ার লুকোচুরি। এই ধরণের দেখিতে পারাটাই আসল শিল্প দেখা। একটা সাঁওতালের মূর্ত্তি দেখিলাম বা সরস্বতীর মূর্ত্তি দেখিলাম,—এ কথা কোন শিল্পী বা শিল্পরসিক সমজদার বলিবে না।

মিউজিয়াম দিস্তোআর ন্যাতিরেল (Museum d' histoire naturelle) প্যারিসের একটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রাণিবিদ্যা, জীবজন্তু ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা হইয়া থাকে। আজ পর্য্যন্ত ভারতে এই বিদ্যাটা শিক্ষিত মহলে যথোচিত সমাদর লাভ করে নাই।—এই দিকে অনুসন্ধান চালানো ত দূরের কথা।

রুল (Roule) এখানকার এক বিভাগের কর্ত্তা। ইঁহার অধীনে মাছের জীবন, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদির জীবন আলোচিত হয়। রুল বলিলেন :—"আমার পরীক্ষাগৃহের লাইব্রেরীতে ব্রেজিলের Vital Brazil (ভিটাল ব্রেজিল) পরিচালিত "সাপের ইস্কুলে"র (Snake Institute এর) বিবরণী

প্রাণতত্ত্ববিৎ লামার্ক
(জার্দাঁ দে প্লাঁৎ বাগিচার প্রবেশ পথে)

হইতে আরম্ভ করিয়া যুক্তরাজ্যের স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউশনের গ্রন্থাদি আর ভারত গবর্ণমেন্টের পরিচালিত জুলজিক্যাল পত্রিকাসমূহ সবই মজুত। কিন্তু কোনো ভারতবাসীর নাম কখনো কোনো গবেষণায় দেখি নাই। অথচ জীব জন্তুর বাথান ভারতবর্ষে এই বিদ্যার চর্চ্চা বেশী আশা করাই উচিত।"

আট দশজন জীবতত্ত্ববিৎ স্কুলের ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতেছেন। এক মহিলা কেউটে সাপের বিষ বিশ্লেষণে সকল ঝোঁক দিয়াছেন। জীবতত্ত্ব বিদ্যাটার জন্মদাতা ছিলেন ফরাসী পণ্ডিত কুভিয়ে (Cuvier)। তাঁহার নামে একটা রাস্তা আছে। সেই রাস্তায় জার্দাঁ দেঁ প্লাঁৎ (Jardin desplantes) বা উদ্ভিদ বিদ্যা বিষয়ক বাগান এবং এই মিউজিয়ামের ল্যাবরেটরীগুলা অবস্থিত। বস্তুতঃ পাড়াতে যতগুলা রাস্তা দেখিতেছি তাহার অধিকাংশই ফরাসী প্রাণতত্ত্ববিদ্‌গণের নামে অভিহিত।

একটা শিশু-হাঁসপাতালের ছোকরা-ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হইল। হাঁসপাতালের নাম "ওপিতাল দেজ্‌ আঁফাঁ ম্যালাদ্‌" (Hospital des enfant malades)। ডাক্তার মহাশয়ের বিশেষত্ব যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায়। হাঁসপাতালে একদিন সকালে ঘণ্টা দেড়েক কাটাইলাম। বার চোদ্দ জন অল্প বয়স্ক বালিকার শরীর পরীক্ষা করা হইতেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতি ইহাদের জন্মগত দুর্ভাগ্য। কাহারও পিঠ উঁচু, কাহারও হাত বাঁকা, কাহারও বা এক পাশ নেহাৎ ছোট, অপর পাশ নেহাৎ বড় ইত্যাদি। ইহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আবশ্যক। মাপা জোকা লেখা দাগ দেওয়া যথাবিধি চলিতেছে। মেয়েদের মা সঙ্গে আছে। ঘরের ভিতর ছয় জন পুরুষ ডাক্তার এবং তিন চারজন স্ত্রী সহকারী। কর্ত্তা দেখিতেছি একজন মহিলা ডাক্তার। ইনি বুঝাইতেছেন :—"দেখছ এই বালিকার শিরদাঁড়াটা সোজা করাইতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না। ইহাকে নিয়মিতরূপে সাধারণ ব্যায়াম করিতে পরামর্শ দাও।" ইত্যাদি।

আমাদের দেশে চিকিৎসাব্যবসায়ে অনেক কবিরাজ ডাক্তারই নামজাদা হইয়াছেন। অস্ত্র চিকিৎসায় প্রসিদ্ধ লোকও কয়েক জনের নাম করা সহজ, কিন্তু কবিরাজী বা ডাক্তারী বিদ্যাটা বাড়াইবার চেষ্টা কেহ করিয়াছেন বা করিতেছেন একথা কোনদিন দেশে থাকিতে শুনি নাই। কাগজে পত্রেও কখনো নাম চোখে পড়ে নাই। হয়ত বা দু'একজন ফিজিওলজিতে কিম্বা ওষুধ তৈয়ারি করার বিদ্যায় নূতন কিছু চর্চ্চা করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের কৃতিত্ব উচ্চতম শিক্ষাপ্রাপ্ত মহলেও কেহ জানে

কিনা সন্দেহ। গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর নাম বোধ হয় ক্রমশঃ সমাজে ছড়াইয়া পড়িতেছে। মোটের উপর দেখিতেছি যে, বিজ্ঞানালোচনা বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলিলে বাঙালীরা (বস্তুতঃ সমগ্র ভারতের লোকই) চিকিৎসার বিশ্বকোষটাকে পুরাপুরি বাদ দিয়াই বসে।

ডাক্তার রোজে (Roger) প্যারিস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চিকিৎসা ফ্যাকাল্টির দোআইয়াঁ (doyen) বা ডীন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক পরিচালক। ইঁহার নিকট শুনিলাম 'ফ্রান্সের কি হাঁসপাতাল, কি মেডিক্যাল স্কুল, সর্ব্বত্রই বিজ্ঞানের সীমানা বাড়াইতে সাহায্য করিবার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। যে-কোনো দেশের যে-কোনো উপযুক্ত লোককে সাহায্য করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।' বস্তুতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেডিক্যাল বিভাগে ১৪টা ল্যাবরেটরী এইজন্য রক্ষিত হইতেছে। আর সহরের ভিতর

জীবতত্ত্ববিৎ বুফোঁ
(জার্দাঁ-দে প্লাঁৎ বাগিচায় এই মূর্ত্তি স্থাপিত)

অবস্থিত ২০টা হাঁসপাতালে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক্তিয়ার আছে। এই হাঁসপাতালগুলিতে যে-সমুদয় মৌলিক অনুসন্ধান চলিয়া থাকে সেই সমুদয়ও বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই সামিল বিবেচিত হয়।

সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র দিগ্বিজয়ের পর দেশে ফিরিতেছেন। কয়েকদিন কাটাইলেন প্যারিসে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'বিলাতে ত শুনিতে পাই আমাদের দেশী ছাত্রেরা ডাক্তারী শিখিবার সুযোগই পায় মহাকষ্টে, সেখানে এই দিকে বিজ্ঞানের সীমানা বাড়াইবার সুযোগ পাইবে কোথা হইতে? প্যারিসের সুযোগগুলার আমরা সদ্ব্যবহার করিতে পারি কি উপায়ে?' জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন:—'ফ্রান্সে ডাক্তারী শিখানো হয় বিলাতের চেয়েও

ভাল উচ্চতর শ্রেণীর। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? আমাদের লোকেরা যে চাকরি চায়। ডাক্তারী লাইনে বড় চাকুরি পাইতে হইলে বিলাতী ডিগ্রি চাই-ই চাই। গবর্মেণ্ট ত ফরাসী ডিগ্রি স্বীকার করিবে না।'

কিন্তু আমাদের সকল ডাক্তারই কি চাকুরি চুঁরিতেছেন? ডাক্তারী ত স্বাধীন ব্যবসায়। এম, বি পাশ করার পর কোনো ব্যক্তি যদি প্যারিসে আসিয়া চিকিৎসার কোন এক বিভাগে একটা নূতন পথ খুলিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরেন তাহা হইলে তাঁহার পশার আটকায় কে? এই বিদ্যাটা যখন অর্থকরী, তখন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারাদির সার্টিফিকেট থাকিলে টাকা রোজগারের পথ ত স্বভাবতই আরও প্রশস্ত হইবে। আর যদি ডাক্তারী ব্যবসায়ে না ঝুঁকিয়া বিজ্ঞানসেবায় অর্থাৎ অনুসন্ধানের দিকেই মতিগতি যায় তাহাতেই বা শেষ পর্য্যন্ত ডাক্তার মহাশয়ের লোকসান কোথায়? যথার্থ বিজ্ঞানসেবী কোনো পণ্ডিত ভারতে একদম অনাহারে মরিতেছে বা মরিয়াছে এরূপ ত শুনি নাই।

যেদিন ভারতে হাজার হাজার যথার্থ বিজ্ঞানসেবীর অভ্যুদয় হইবে সেদিন দুচার দশজন হয়ত অনাহারে অথবা অর্দ্ধাহারে মরিলেও মরিতে পারেন বুঝিতে পারি। কিন্তু সেদিন আমাদের গৌরবের দিন সন্দেহ নাই। কেন সেদিন আমাদের বড়লোকদের সংখ্যা এত বেশী যে সকলের হাঁড়ির খবর রাখা হয় ত একপ্রকার অসম্ভবই বিবেচিত হইবে। ফ্রান্সে সেই ধরণের গৌরব যুগই চলিতেছে। এখানকার অলিতে গলিতে জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারের কুঁড়ে দেখিতে পাই।

৪

চিত্রপ্রদর্শনী প্যারিসে লাগিয়াই আছে। নিউইয়র্কে দেখিয়াছি মাত্র দু'একখানা সেজান্ (Cezanni) অর্থাৎ

মাতৃ-মূর্ত্তি
(নোতর দাম মন্দিরে)

ভূতুড়ে জানোয়ার
(নোতর-দাম মন্দিরের ছাদে)

সেজানের আঁকা ছবি। এখানে দেখিতেছি বার্ণহাইম জ্যান্ কোম্পানীর দোকানে তিনঘর ভরা সেজান্। সেজান্‌কে নব্য শিল্পীরা তাঁহাদের জন্মদাতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। সেজান্ সেদিনকার লোক, বেশী পুরাণা নন। ইঁহার অঙ্কনে লোকেরা কিম্ভূতকিমাকার উদ্ভট কিছু পাইবে না। তবে অনুপাতগুলা প্রাকৃতিক জীবজন্তুর হুবহু নকল নয়, সেজান্ মনমাফিক অনুপাত সমাবেশের এক আধুনিক স্রষ্টা সন্দেহ নাই। অথচ এই কৃত্রিম অনুপাত বা অবাস্তব গড়নগুলা দেখিয়া কোনো প্রকৃতিনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের নাক শিট্‌কাইবার জো নাই। রঙের জ্ঞান শিল্পীর এত বেশী, আর গড়নগুলা ক্যাম্বিশের উপর সাজাইবার ভঙ্গিমা সেজানের এতই অপূর্ব্ব। ইহারই নাম প্রতিভা,—মাপিয়া জুকিয়া
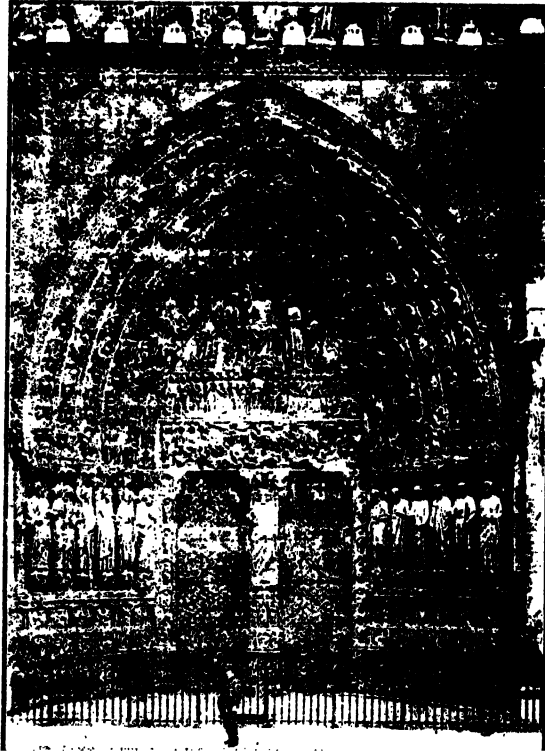
নোতর্-দাম মন্দির
(সম্মুখের মধ্যবর্ত্তী ফটক)

কথায় বক্তৃতায় ব্যাখ্যা করিয়া সমঝানো অসম্ভব। চিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা এক অবান্তর কাণ্ড। চিত্র 'দেখিবার' জিনিষ।

রেণোআ (Renoir) মারা গিয়াছেন মাত্র একবৎসর হইল। দুরাঁ রুএল্ কোম্পানীর দোকানে কয়েক কামরা রেণোআময় দেখিলাম। নিউইয়র্কের কোনো কোনো প্রদর্শনীতে গোটাকুয়েক রেণোআ দেখিয়াছি। প্যারিসে এইগুলা দেখিয়া নূতন কিছু ধারণা জন্মিল না রেণোআ বিসদৃশ মাল বাজারে বিখ্যাত করিতে চেষ্টিত ছিলেন না। এইজন্য তাঁহার পশার সংসারে বেশী হবারই কথা। তবে আমাদের দেশে, এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী সমাজে রেণোআ চলিবে না। কারণ তাঁহার নারীমূর্ত্তিগুলার অধিকাংশই নানা ধরণের নগ্ন অবস্থার চিত্র। কিন্তু যদি কোন মতে অঙ্কিত বিষয়টার কথা ভুলিয়া যাওয়া যায় তাহা

হইলে দর্শকমাত্রই বুঝিবে যে রঙের সাহায্যে রূপ, আকৃতি বা গড়নের চাপ প্রকাশ করা রেণোআর এক অদ্ভুত কৃতিত্ব। কল্পনার তরফ হইতে চিত্রের বিভিন্ন অংশগুলাকে কোনো ঐক্যসূত্রে গাঁথিবার তরফ হইতে দেখিলে রেণো-আকে সেজানের অনেক পশ্চাতে স্থান দিতে হইবে। কিন্তু লাল রঙকে মধুর করিয়া লেপিতে রেণোআ ওস্তাদ।

প্যারিসেও থিয়জফির সর্ত্ত। ভাল মহাল্লায় বেশ বাড়ী, লাইব্রেরিও আছে। কোনো অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। শুনিতেছি নাকি প্রায় দুই হাজার মেম্বার ম্যাজমোজেল (‘মিস্’ বা কুমারী) রেনোদ্ কর্ম্মকর্ত্তাদের একজন। থিয়-জফিষ্টরা এতই ভারতভক্ত যে ইঁহারা ভারতবর্ষে শিল্প-বাণিজ্যের আন্দোলন চলিতেছে শুনিবা মাত্র আঁতকাইয়া
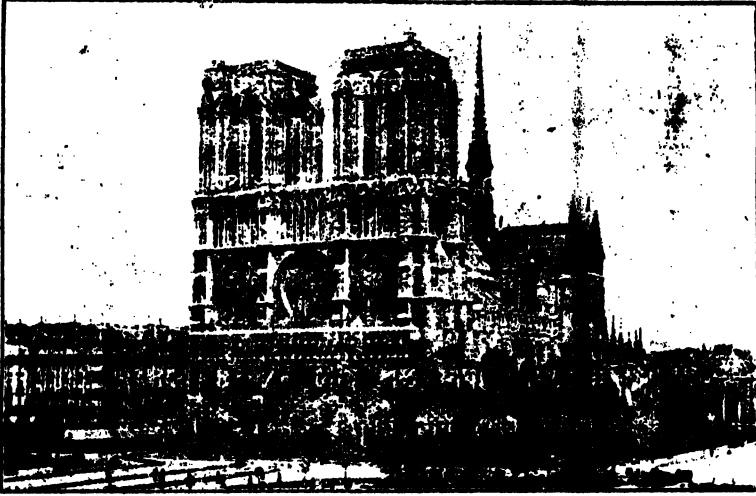
নোতর্-দাম

নোতর্-দাম মন্দির
(সম্মুখের মধ্যবর্ত্তী ফটকের মাথার দক্ষিণ কিনারার দৃশ্য)

উঠেন।' 'আরে বল্‌ছ কি? পৃথিবীর একমাত্র ভরসা-স্থল হিন্দুজাতি। তোমরাও আমাদের পশ্চিমাজাতের বৈষয়িকতায় মজিতে চলিয়াছ? হায় হায় কি সর্ব্বনাশ, দুনিয়া এইবার তবে রসাতলে চলিল।' ইত্যাদি শ্রেণীর বচন রেণোদের মুখে শুনিলাম। ইয়োরামেরিকার বেদান্ত পন্থী পুরুষ নারীরাও এই ধরণেরই ভারতভক্ত।

ভারতবাসীর সাংসারিক কাণ্ডজ্ঞান আছে এই কথা জগতের কোনো লোক মানিতে চায় না। মজার কথা, নাই বিবেচনা করিয়াই এই সব লোক খুসী। ম্যাক্‌স্‌-মুলার তাঁহার India what can it teach us? অর্থাৎ 'ভারতবর্ষের নিকট আমরা কি শিখিতে পারি?' গ্রন্থে এই তত্ত্বই শিখাইয়া গিয়াছেন। ভারতসন্তানও বেকুপের মতন

নোতর্‌-দাম মন্দির
(ভিতরকার দৃশ্য)

ম্যাক্‌স্‌মুলারকে গুরু করিয়া তাঁহার বচন যেখানে, সেখানে আওড়াইয়া থাকেন।

দুনিয়ার লোক ভাবিতেছে :—'বেশ কথা, এই বেকুপ-গুলা কোনোদিনই মানুষ হইবে না। তাহা হইলে ভারতে পাশ্চাত্যের প্রভাব আরও বহুকাল চলিবে।' ধর্ম্মের নামে, আধ্যাত্মিকতার নামে, 'উচ্চতর' 'গভীরতর' দার্শনিকতার নামে যে-সকল ইয়োরামেরিকান নর-নারী ভারতের সেবক বা ভক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ভারতবাসীকে যে ম্যাড়াকান্ত বিবেচনা করেন, এই কথাটা আমাদের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর নেতারা আজও বুঝিয়াছেন কি না জানি না। কেন না

আজও আমাদের ভারত-বীরেরা ভারতখানাকে এক 'বিচিত্র আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি' রূপে বর্ণনা করিয়া জগতে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছেন। এইরূপ বক্তৃতা করিতে পারিলে পয়সাও রোজগার করা যায়। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য-মহলে ভারতবাসীর পক্ষে পয়সা রোজগারের পথ আর নাই

স্পেনিষ চিত্রকর ফার্ণান্দেজের সঙ্গে আন্তর্ভৌম গাড়ীতে একদিন দেখা হইল। ভারতবাসী কোনো লোক ব্যবসায়ী আছে, এই সংবাদ তাঁহার নিকট অপূর্ব্ব বোধ হইল। ভ্যালেন্টিনো নামক একব্যক্তি ফরাসী পররাষ্ট্রসচিবের আফিসে কাজ করেন। ইনি বলিতেছেন :—'ভারতবর্ষের লোকেরা সূক্ষ্মতর জীবনের গূঢ় রহস্য বিশ্লেষণে ব্যস্ত।

ভূতুড়ে জানোয়ার
(নোতর-দাম মন্দিরের ছাদে)

ইহারা রাষ্ট্রশাসন বা শিল্পসংগঠনের মতন স্থূল চোআড় লোকের কাজে মন লাগাইতে পারিবে কি?' এক ইয়াঙ্কি নারীর মুখে শুনিলাম :—'মোটরগাড়ী চালাইতে পারে এমন লোকও ভারতবর্ষে জন্মে! ইহারা না সবাই আধ্যাত্মিক দর্শনে মস্‌গুল?'

আঁদ্রে ভারাঞ্যাক্ (Varagnac) নামক এক যুবা নানা সাপ্তাহিক ও মাসিক কাগজের আফিসে যাতায়াত করে। যুবক ফ্রান্সের চরম পন্থীদের সঙ্গে ইঁহার দহরম মহরম। ইনি নিষ্কর্ম্মা লোক, কোন রাষ্ট্রীয় দলে লিপ্ত নন। এই ছোকরা বলিতেছেন— 'মহাশয়, জগদীশ বসু নাকি কলিকাতায় একটা ইন্‌ষ্টিটিউট খাড়া করিয়াছেন? সেইখানে নাকি তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক মাপা-জোকা চলিতেছে?' আমি বলিলাম, 'কেবল তাহাই নয়। সেই মাপা-জোকার ফলগুলা বসু-

ইন্‌ষ্টিটিউটের বার্ষিক বিবরণীতে ছাপাও হয় চিত্রসহ। আর সেই কেতাব মায় প্যারিসের অ্যাকাদেমি দে সিয়ঁাসও (Academie des science) মহা সমারোহের সহিত গ্রহণ করেন। আর উপহার পাইবার জন্য সভা ডাকেন আর সভায় হাজির থাকেন স্বয়ং সভাপতি দেলাঁদে (Deslanders)" ভারাঞাক্ জিজ্ঞাসা করিলেনঃ— 'তাহা হইলে ভারতে আর ইয়োরোপে প্রভেদ কোথায়?'

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্যারিসে বাড়ীঘর রাস্তাঘাট ইত্যাদি কেমন ছিল এই বিষয়ে বক্তৃতা শুনা গেল। বক্তার নাম

নোতরদাম মন্দির
(সম্মুখের বাঁ ফটকের মাথার দৃশ্য)
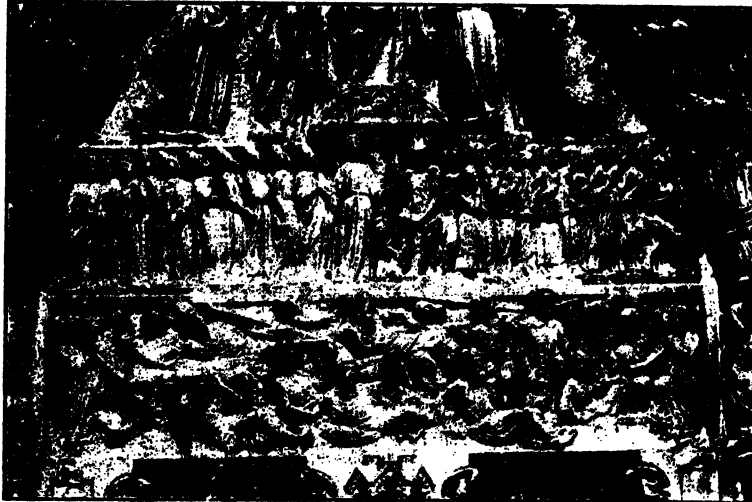
নোতর্‌-দাম মন্দির (সম্মুখের মধ্যবর্ত্তী ফটকের মাথার এক দৃশ্য)

পোয়েট (Poete)। ইনি এক নগর-বিদ্যালয়ের কর্ত্তা। নগরের ক্রমবিকাশ, নগরের বর্ত্তমান শাসন, নাগরিকগণের জাতিভেদ ও আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি এই বিদ্যালয়ে শিখানো হইয়া থাকে

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ফরাসী সমাজ বুঝিতে হইলে 'নোতর দাম'টা তলাইয়া মজাইয়া বুঝা আবশ্যক। ভিতরকার 'মামেরী' হইতে ছাদের উপরকার ভূতুড়ে জানোয়ারদের আওতা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই হিন্দু বৌদ্ধ বাস্তু ও স্থাপত্য

ভূতুড়েকাণ্ড
(নোতরদাম মন্দিরের ছাদে)

দেখিতেছি। যাঁহারা ভাবপূর্ণ অজান্তায় মজিয়াছেন তাঁহারা এইখানে আসিয়া অন্ততঃ তিন বৎসর কাটাইয়া যাউন। পূর্ব্বে পশ্চিমে আর তাঁহারা তফাৎ করিতে পারিবেন না।

রাখালীর দাবী

[শ্রীসত্যরঞ্জন বসু]

শ্রাবণের শেষ! টিপ্ টিপ্ করিয়া সারাদিন জল হইতেছে। অসময়ে বিশ্রি রকম ঠাণ্ডা হাওয়া ছাড়িয়াছে! বাহিরের দিকে চাহিলে মনে হয় যেন শীতকালে শিশির পড়িতেছে।

রাখালী মনেও করিতে পারে নাই, এরকম সময় কেহ ঘর হইতে বিশেষ জরুরী কাজ ছাড়া বাহির হইতে পারে। সে বেচারা তাহার দৈনন্দিন জীবনের বোঝাপড়া করিতেছিল। ঘরের চারিদিককার সাসি বন্ধ করিয়া একখানা কাঁচের উপর মুখ লাগাইয়া বাহিরে দূরে বহুদূরে দৃষ্টিরেখা যেখানে আকাশে মিশিয়াছে, তাহারই দিকে চাহিয়াছিল; আর ভাবিতেছিল ঠিক তার নিজেরই কথা।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে একবার ঘরের ভিতরেই ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু আবার যেন কি ভাবিয়া আগেকার মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কখন যে সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। ইতিমধ্যে রাধারাণী একটি তেলের প্রদীপ হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই এক ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল—'কি গো বড়লোকের ঝি, একটু গরীবদের কথাও ভাব্‌তে হয়! সন্ধ্যা বয়ে গেল, ঘরে কি আলোটাও জাল্‌তে নেই? বাইরের কাজ আর অন্ত কাজের জন্যতো এ বাঁদীই আছে!'

রাখালী যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। হঠাৎ চিন্তায় বাধা পাইয়া এবং শাশুড়ীর কথা শুনিয়া কেমন যেন হতভম্ব হইয়া পড়িল। সেই জায়গায়ই সে টিপ করিয়া বসিয়া পড়িল। রাধারাণী বক্ বক্ করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মানুষ হিসাবে দেখিতে গেলে রাখালীর দাবী ছিল অনেক; কিন্তু তাহার দৈনন্দিন জীবনের কথাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে পাওয়া যায় কেবল একটা অবজ্ঞা ও অসন্তোষ! সে এমন ভাবেই তাহার স্বামীর ঘর করিয়া আসিতেছে আজ ৭।৮ বছর ধরিয়া। কি করিয়া যে সে তাহার সারাজীবন কাটাইবে তাহাই সে আজ এই সন্ধ্যার অন্ধকারে বসিয়া ভাবিতেছিল। বুকের ভার লাঘব করিবার জন্য সে কিছুক্ষণ কাঁদিল; তাহার পর যখন সে আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহার স্বামী অনুপম ঘরে ঢুকিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

রাখালী নিজকে তখনও সম্পূর্ণরূপে সামলাইয়া লইতে পারে নাই, তখনও দুই চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। তাই সে স্বামীর হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য চেষ্টা করিল। অনুপমচন্দ্র ইহাতে নিজকে অপমানিত মনে করিল, এবং অযথা কতগুলি গালাগালি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাখালী আর চলিতে পারিল না। কোন মতে পাশের দরজা ভর করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার প্রাণে এতটুকু বল ছিল না যে স্বামীকে বুঝাইয়া দু'কথা বলে! চিরজীবন সে দুঃখকেই বরণ করিয়া লইবার জন্য মন বাঁধিল!

২

সকলেই ভাবিয়াছিল রাখালীর কপাল ভাল। তাহার রূপ ও গুণের কথা সকলের মুখেই শুনা যাইত! গরীব পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা! সোহাগ করিবার মধ্যে ছিল তাহার দাদামহাশয়। দাদামহাশয় তাহার বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিজের হাতে তাহাকে শিক্ষা দিয়া নিজের মনের মত করিয়াই গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। দাদামহাশয় মাঝে মাঝে বড় আদর করিয়াই বলিতেন, 'দিদি আমার লক্ষ্মী সরস্বতীর প্রতিমূর্ত্তি!' তিনিই দেখিয়া শুনিয়া

লক্ষ্মীপুরের জমিদারের একমাত্র পুত্র অনুপমচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন! বড় আশা করিয়াছিলেন যে, তাহার রূপে গুণে অতুলনীয়া নাত্‌নিটির জীবন বড় সুখেই কাটিবে। বিবাহের পর হইতেই রাখালী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার মানসিক জীবনের সহিত সাংসারিক জীবনকে বেশ একটু দ্বন্দ্ব করিয়াই চলিতে হইবে! সেই হিসাবেই সে চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু যে দিন সে তাহার দাদামহাশয় মৃত্যুশয্যায় শায়িত সংবাদ পাইয়াও শেষ দেখা একবার দেখিয়া আসিতে পাইল না—তখন তাহার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল! একটা তীব্র বিতৃষ্ণা ও নিজের উপর একটা অসম্ভব রকম অভিমান আসিয়া উপস্থিত হইল!

* * * *

স্বামী বাঁচিয়া থাকার সময় হইতেই রাধারাণী তাহার পুত্রটির কীর্ত্তি কলাপ স্বামীর নজরে এবং গোচরে যাহাতে না আসে তাহার যথেষ্ট রকম উপায় অবলম্বন করিতেন। ইহার একটু কারণও যে না ছিল এমন নহে।

একে একে অনেকগুলি সন্তান মরিয়া যাইবার পর, বহু সাধ্য সাধনা ও মানত করিয়া পাইয়াছিলেন এই অনুপমচন্দ্রকে। মাতৃ-হৃদয়ে তাই পুত্রস্নেহ অতি প্রবলরূপে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত। রাধারাণী ভাবিয়াছিলেন এই সমস্ত বালকসুলভ চপলতা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া যাইবে। কিন্তু বালকসুলভ চপলতা যখন আস্তে আস্তে যুবকের চরিত্রগত হইয়া পড়িল, তখন অন্ধ মাতৃস্নেহ তাহা দেখিতে পাইল না। অনুপমচন্দ্রও ভাবিল পিতা অবর্ত্তমানে যখন আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী তখন আমাকে বলিবার আর কেহ থাকিতে পারে না! এই 'স্বাধিকার প্রমত্ততা'য় উত্তেজিত হইয়া সে দিন দিন ধ্বংসের পথে চলিতে লাগিল! উশৃঙ্খলতা এমনই তাহাকে পাইয়া বসিল যে, মাতা কিম্বা স্ত্রীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিয়া তাহাদিগকে মানুষের মধ্যেই গণনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত!

রাধারাণী যে কতদিন কাঁদিয়াছেন, পুত্রকে কত বুঝাইয়াছেন, কিছুতেই তাহাকে পথে আনিতে পারিতেছিলেন না! রাধারাণী ভাবিলেন রাখালী তাহার পুত্রের ঠিক উপযুক্ত হয় নাই। তাই তাহাকে সময়ে অসময়ে তিরস্কার করিতেন! কিন্তু অনুপমচন্দ্র যে কি মেকদারের ছেলে তাহা তিনি বুঝিতেন না। রাখালী দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রমে সংসারের কাজ করিয়াও কাহারও মন পাইল না। উচ্ছৃঙ্খল স্বামীর সময়ে অসময়ে জবরদস্তী নীরবে কতইনা সে সহ্য করিয়া আসিতেছে! কোনদিন কেহ দেখে নাই তাহার কোনও প্রকার বিরক্তি ভাব! কিন্তু যখনই কোনও প্রকার অশান্তি তাহার প্রাণকে আঘাত করিয়াছে তখনই সে সেগুলাকে এমন ভাবে মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছে যে, বাহিরে তাহা বুঝিবার কেহ একটুও অবসর পায় নাই! ইহাতে এই হইল যে রাখালীর শরীর দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতে লাগিল। এই অবজ্ঞাভরা সংসারের মধ্যে একটু আশ্রয় পাইয়াছিল কেবল তাহার এক সমবয়সী দূর-সম্পর্কীয় দেবরের কাছে! ইহার নাম রাজেন! সময় অসময়ে মনের দুঃখ জানাইবার এইমাত্র একটি হৃদয় পাইয়া রাখালী ভাবিল যে সে অনেক পাইয়াছে। জীবনে যে কখনও সহৃদয়তা পায় নাই, তাহার কাছে হঠাৎ কেহ আপনাকরা ভাব দেখাইলে সে যেমন বিহ্বল হইয়া পড়ে-রাখালীরও ঠিক তেমনটি হইয়াছিল। সে রাজেনের সঙ্গ পাইবার আকাঙ্ক্ষায় অনেক সময়ই প্রত্যাশা করিত। কিন্তু রাজেন যে কি ভাবে তাহার কাছে সমবেদনা প্রকাশ করিবে তাহা সে ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিত না। রাখালীর এমন অনেক সময় হইয়াছে যে রাধারাণীর কাছ হইতে অপ্রত্যাশিত রকমের কটুক্তি পাইয়া নিজের বেদনা জানাইবার জন্য রাজেনের কাছে আসিয়াছে, কিন্তু রাজেন যেন কেমন অসম্বদ্ধ ভাবে তখনই ঘর হইতে দৌড়াইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। মোটকথা, রাজেনের প্রাণটা ছিল কোমল! সহজেই সেই প্রাণে আঘাত লাগিত; এবং যখন সেই আঘাত তাহার প্রাণের ভিতর গিয়া সূঁচের মত বিঁধিত তখন সে তাহা সহ্য করিতে পারিত না—কান্না হইয়া তাহা বাহিরে অভিব্যক্ত হইত। কাজেই পাছে রাখালী ইহাতে কষ্ট পায় এইজন্য সে তাহার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইত!

৩

কিন্তু অনুপমচন্দ্র, রাখালী এবং রাজেনের এই সম্পর্ক একটুও ভাল চোখে দেখিতে পারিতেছিল না। সর্ব্বদাই কেমন একটু বক্র নয়নে উহাদের উভয়ের চলা ফেরার উপর নজর রাখিত।

সেদিন হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়াই অনুপম রাখালীকে কাঁদিতে আর তাহারই পায়ের কাছে রাজেনকে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া খুব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল -- 'তোকে' তো আমি বার বার বারণ করে দিইচি, ফের—?' কথাটা সম্পূর্ণ না হইতেই রাজেন আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাখালী তখনও ভাল রকম বুঝিতে পারে নাই যে, রাজেন কেন চলিয়া গেল, কিন্তু তার পর-মুহূর্ত্তেই যখন তাহার উপর অশ্লীল গালি গালাজ চলিতে লাগিল, তখন সে একটু দৃঢ় হইয়া প্রতিবাদ করিবার জন্তই দাঁড়াইল। রাখালী কেবল এইটুকু বলিয়াছিল—'রাজেনের দোষ কি ?' ইহার পরই অনুপমচন্দ্র অকথ্য ভাষায় চীৎকার করিয়া উঠিয়া রাখালীকে মারিতে যাইয়া এক ধাক্কা দিয়া বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বুকের ভার যখন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে, বাহিরে টিপ্ টিপ্ করিয়া জল পড়িতেছে! রাখালী কখনও আশা করে নাই যে তাহারই স্বামী তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারে। তাই সে যখন দেখিল তাহার ধারণা একেবারে ভুল, তখন সে প্রতিশোধ লইবার জন্য মন বাঁধিল। সে ঠিক করিল সে আর তাহার স্বামীর কাছে আপনার নারীজনোচিত কোমলতা দেখাইবেনা বরং কর্কশতা প্রকাশ করিয়া স্বামীর ভুল ভাঙ্গাইয়া দিবে।

কিন্তু বাংলা দেশের মাতৃজাতি। সহজ ও সজল যাদের প্রাণের বেদন , আশা ও বৈচিত্র্যহীনতা যাদের জীবনের মূল,তারা কি কখনও বিমুখ হইতে পারে—বিশেষতঃ স্বামীর উপর! রাখালীরও হইল তাহাই!

সে রাত্রিতে অনুপমচন্দ্র বাড়ী ফিরিলেন অনেক রাত্রিতে! রাখালী ইচ্ছা করিয়াই ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল—ভাবিয়াছিল অপরিণামদর্শী স্বামীকে একটু শিক্ষা দিবে। নানা প্রকার চিন্তাতে তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল। তাহার সেই ছেলেবেলাকার সঙ্গীদের কথা হইতে আরম্ভ করিয়া আস্তে আস্তে তাহার বিবাহিত জীবনের দিকে চিন্তাধারা আসিতেছিল, ঠিক এম্‌নি সময়েই দরজায় ঘা' পড়িল। রাখালীর সমস্ত চিন্তা যে কোথায় চলিয়া গেল—সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল! তখনই তাহার আগেকার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়িল। কিন্তু সে বসিয়া থাকিতে পারিল না—দ্বিতীয়বার ঘা পড়িবার আগেই সে দরজা খুলিয়া দিল!

আকাঙ্ক্ষিতের আশা যে কত বড় তাহা যে-চায় সে-ই জানে, আর কারোও বোঝবার ক্ষমতা নাই! লোকের কাছে কথা শুনিয়াও ভিক্ষুক তাহারই কাছে ভিক্ষা চায়—পেটের দায়ে! অনাদর পাইয়া পাইয়া আদরের আশাই মনে জাগে বেশী—এবং আদর পাইবার আগ্রহেই সে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া থাকে বাহিরের অন্য সকলের দিকে। যদিও মাঝে মাঝে বিদ্রোহের আগুন মনের মধ্যে জ্বলিয়া উঠে—তখনই আবার উহা নিবিয়া যায়। রাখালীরও তাহাই হইয়াছিল। এতক্ষণ সে তাহার বিদ্রোহী মন লইয়া নানা প্রকার দ্বন্দ্বে সময় কাটাইতেছিল; কিন্তু হঠাৎ তাহার নৈরাশ্যের মধ্যে কে যেন একটু কোমল মধুর ভাবে প্রাণে আঘাত করিল। স্বামীর 'খা-আ-লী-ই' ডাকে সে সাড়া না দিয়া আর থাকিতে পারিল না। 'খালী' ডাকে যে তাহার কত কথাই মনে পড়ে! সেই তাহাদের শুভ-রাত্রিতে স্বামী বলিয়াছিলেন—'তুমি-ছাড়া যে আমার সব খালি; আমার সব শূন্য!'

শরতের প্রভাত। শিউলিভরা আঙ্গিনায় সদ্য-স্নাতা রাখালীকে পূজার রচনার থালা হাতে করিয়া আসিতে দেখিয়াই অনুপম একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। সে সবেমাত্র বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছে। চোখে মুখে তখনও জল দেয় নাই। রাখালীর দিকে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া

রহিয়াছে। যেন কোন অনির্দ্দিষ্ট আকর্ষণী শক্তি তাহার চোখ দু'টাকে সেদিকে বরাবর টানিয়া নিতেছিল।

পাড়ার হরিশ মোড়লের স্ত্রী পূজার কাজ করিবার জন্য আসিয়াছিল। সে যখন 'অনু-বাবু', বলিয়া কাছে যাইয়া ডাক দিল তখন তাহার চেতনা ফিরিল। অনুপম একটু অপ্রস্তুত হইল! কিন্তু রাখালীর সে রূপ নয়ন সার্থক করিবারই বটে! মূর্ত্তিমতী শরৎলক্ষ্মী! তাহার খোলা-ভিজা-চুল পিঠের উপর ছাড়িয়া দেওয়া। তার উপর প্রভাতী সূর্য্যের সোণালি আভা চুলগুলিকে মসৃণতম করিয়াছে। আঙ্গিনা-ভরা শিউলি ফুল,—এই ফুলরাশির মধ্যে পূজার থালা হাতে দাঁড়াইয়া যেন সে পূজার বাটিতে আশীর্ব্বাদ করিতেছিল!

পূজার ধুমধামে দিনগুলি কাটিতেছিল মন্দ না। কারণ রাখালী তাহার দৈনন্দিন জীবনের হিসাব নিকাশ করিবার বড় একটা অবসর খুঁজিয়া পাইতেছিল না! এদিকে তাহার স্বামী যে রাখালীর মধ্যে কি মূর্ত্তিই সে-দিন দেখিয়াছিল তাহা সে নিজেই জানে! তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা পূজার সময় যে রকম আমোদ-প্রমোদের আশা করিয়াছিল তাহা তাহাদের মনের মধ্যেই রহিয়া গেল। দেখা গেল, অনুপম-চন্দ্র যেন হঠাৎ বদলাইয়া গিয়াছে। কেমন মন-মরা!

রাধারাণী ।পুত্রের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সেদিন তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি রে অনু! তো'র কি হয়েছে রে?'

'কৈ? কিচ্ছু না'—বলিয়া সে পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল। রাধারাণী ভাবিলেন,পুত্রবধূ নিশ্চয়ই এর মুখ্য-কারণ! এবং তখনই ভাঁড়ার ঘরের সামনে রাখালীকে পাইয়া এক আঙ্গিনা-ভরা মেয়ে পুরুষের সাম্‌নে যাচ্ছাতাই রকম গালি গালাজ করিলেন।—

'ওলো রাক্ষসী—আমার মনে—আমার ছেলের মনে যা কষ্ট দিলি—তার বিচার মা-ই করবেন। তোর মুখ যেন আর—'

'আ—ছি, ছি, মা ঠাকরুণ ও কথা কি মুখে আনে?' বলিয়া রাজুর মা রাধারাণীকে বাধা দিল।

রাধারাণী গস্ গস্ করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রাখালী কিছুই বুঝিতে পারে নাই; কাজেই সে চুপ করিয়া বসিয়া তাহার জীবনের অভিনবত্বের কথাটা ভাবিতেছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন অনুপমচন্দ্র অসময়ে অতর্কিত ভাবে ভাঁড়ার ঘরে ছোট খোপে আসিয়া রাখালীর হাত ধরিয়া তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া গেল—তখন সে আর নিজকে সে ধরিয়া রাখিতে পারিল না! কাঁদিয়া কাঁদিয়া কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহা সে জানে না। হঠাৎ রাজেনের 'বৌদি' ডাকে চক্ষু মেলিয়া সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে সে কোথায় কি অবস্থায় পড়িয়া আছে। যখন তাহার সম্যক উপলব্ধি হইল, তখন আর সে কথাও কহিতে পারিল না—মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। রাজেনও আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

নারী-জীবনের যাহা সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্ক্ষিত—যাহার আশায় নারী তাহার অস্তিত্বের দাবী করে—রাখালীর ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; ঘটিবার সম্ভাবনাও যে আছে তাহা তাহার ধারণার অতীত। কিন্তু স্বামীর চরিত্রের মধ্যে যে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন আসিয়াছে, তাহাতে রাখালী কেন যেন আরও ভীতা হইয়া পড়িল। রাধারাণীর মত সেও নিজে ভাবিল—'আমারই তো দোষ!'

* * * *

বিজয়ার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য রাজেন প্রথমেই রাখালীর ঘরে ঢুকিল। কারণ সেই তো তার পরম আদরের। কোথাও রাখালীকে সে পাইল না; কিন্তু সাহস করিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও পারিল না!

অনুপমচন্দ্রও আজ একটু ব্যস্ত হইয়াই মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমাদের বৌ কৈ?'—কিন্তু তাহার কোনও উত্তর পাইল না।

* * * *

রাখালী ততক্ষণ তার দাবীর দাওয়া করিয়া বিশ্ব মায়ের কোলে আশ্রয় লইয়াছে।

বাহিরে বানাইয়ে তখনও বিসর্জনের করুণ রাগিণী বাজিতেছিল।

মাসিক-কাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

পরিচারিকা ; ভাদ্র—যাত্রী। শ্রীকুমুদরঞ্জন।

কবিতায় কবির বলিবার কিছুই ছিল না—'আয়োজন', 'প্রিয়জন', নিয়োজন', 'প্রয়োজন' ইত্যাদি কয়েকটা সুবিধা মত মিল হাতের কাছে জুটিয়া যাওয়ায় কবি কবিতাটা লিখতে প্রলুব্ধ হয়েছেন বলে মনে হয়। কবি কুমুদের হাত মিঠে, তাই ছন্দিত হয়ে মন্দ শোনাচ্ছে না। যে ছন্দে কবি মিলগুলিকে গুম্ফিত করেছেন তাতে 'সুদূর যাবার' 'বিদায় দেহ' ইত্যাদি তেমন খাপ খায় নাই।

তারপর শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের 'ভাবরাজ্যে' প্রবেশ করতে হবে।

'ভাবরাজ্যে' কবিতায় দীর্ঘতা ছাড়া অন্য দোষ বড় নাই। বরং কবিতাটি কল্পসুষমায় অতিরঞ্জিত—

"কোলাহল পড়েছে ঘুমায়ে
ধীর স্থির পরাণের গায়
ছোট খাটো সুখ দুঃখ যত
তাহারাও অঘোরে ঘুমায়
মৌন মুগ্ধ নীরব গভীর
শূন্য পথ ভরি খেলে হাসি
সে হাসিতে নাহি মাদকতা
আছে শুধু রাশি রাশি রাশি
মল্লিকা শেফালি বেলা ফুটে
আঁখিযুগ বিস্ফারিয়া শুধু
প্রাণভরি বিমুগ্ধ পথিক
পান করে সে ফুলের মধু"—

ইত্যাদি সুরচিত।

'প্রতীক্ষায়' গানটী এমন কিছুই হয় নাই যে জন্য স্বরলিপির মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে। স্বরলিপিকারিকা স্বরলিপির জন্য সঙ্গীত নির্ব্বাচনে একটু সুবিচারিকা হলে ভাল হয়।

'অতৃপ্ত'—সঙ্গীত। শ্রীকালিদাস রায় বিরচিত।

বর্ষণে অতৃপ্ত তৃষা দূর হচ্ছে না বলিয়া কবি বলেছেন—

"যাবেনা যাবে না শ্রাবণ ধারায়
প্লাবনের মাঝে সে নাহি হারায়
অশনি হানিয়া দহ দহ তায়
ব্যথা বরষার বাসব মোর।"

"যাবে না তৃষার নেশার ঘোর"—

'তৃষার নেশার ঘোর'—না 'নেশার তৃষার ঘোর ?'

শ্রীদ্বিজচরণ মিত্রের 'অসন্তুষ্ট' পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। রচনা বিশেষত্ব বর্জ্জিত—গদ্যাত্মক ও নীরস। মিলগুলি অধমাধম।

'দ্বিজচরণ' বাবুর পরেই 'দ্বিজপদ' বাবুর 'মাতৃত্ব'। দ্বিজপদ বাবু নিজেও দ্বিজ,—কারণ তিনি মুখোপাধ্যায়। সদ্যোমাতৃত্ব লাভ করেছেন এমন একটী বালিকাকে লক্ষ্য করিয়া 'কনকবরণী (?) চম্পক ফুল' 'চন্দনমাখা তুলসী' 'পূর্ণ কলসী' ইত্যাদি উপমা প্রয়োগে কবি কবিতাটী লিখেছেন। কবি বলেছেন, আজ 'বালিকা নহে সে রমণী'। বিশেষ করিয়া এ কথাটী উল্লেখ করায় মনে হয় প্রসূতি প্রকৃতপক্ষে বালিকা কিন্তু মাতৃত্বই তাহাকে রমণীত্বের পদবীতে উন্নীত করেছে। বাল্য মাতৃত্বে উল্লসিত হয়ে কবিতা লেখা সমাজহিতৈষী কবির কর্ত্তব্য নয়। 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব মহাশয় পাল্টা গেয়েছেন 'প্রসূতি' নামে একটা দশগজী কবিতায়। নরেনবাবুর কবিতাটা 'ম্যালেরিয়া বধ' কাব্যের কাছাকাছি গিয়েও বেঁচে গেছে।

দ্বিজপদবাবুর কবিতার বিষয়টা মন্দ ছিল না—কিন্তু অক্ষম হাতে পড়ে বাল্য মাতৃত্বের মতনই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছে।

যমুনা। শ্রাবণ।—'শ্রাবণ'—শ্রীমতী লীলাদেবী।

গত বৎসর যমুনায় শ্রীমতী লীলাদেবীই শ্রাবণে আগমনী

গেয়েছিলেন এবারো গেয়েছেন—এসব কবিতা নেহাৎ মামুলীই হয়—সুখের বিষয় এ কবিতাটী সে শ্রেণীর হয় নাই। কবিতায় লীলা আছে এবং শ্রীমতীও হয়েছে।

"কেতকীর রেণু মাখি মন্থর পবন,"
"মেঘে মেঘে কেঁদে ফেরে যক্ষের ক্রন্দন"
"সেই কুরুবক তলে বসন্ত আসিবে বলে
"মাধবী লতার চারা যতনে রোপণ"

ইত্যাদি পংক্তিগুলি বড়ই মধুর।

'পাগল'—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী—কবিতাটির রচনা-ভঙ্গি এতই মধুর যে মুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। বলিবার বিশেষ কিছু না থাকিলেও রচনা-ভঙ্গির গুণে যতীনবাবু তাঁহার রচনাকে সফল করে তুলতে পারেন। কবিতাটীর সরল মাধুর্য্য হৃদয় স্পর্শ করে—কবির এই রচনা-ভঙ্গির সারল্য কল্পনার প্রয়াসের বহু জটিলতার ফল, এই তারল্য, গূঢ় চিন্তার কঠিন চেষ্টার প্রসব—এই—আপাত স্বাভাবিকতা কলাকৌশলগত বহু কৃত্রিমতার পরিণতি।

ইহাই প্রকৃত চারুকলার রীতি। নেপথ্যের অন্তরালের কোনো কৃত্রিম চেষ্টার লক্ষণ রঙ্গমঞ্চবিলাসিনীর বেশভূষা হাবভাবে থাকিবে না। শিল্পের উদ্দেশ্য ভাষার উদ্দেশ্যের মতনই—আত্মপ্রকাশও বটে—আত্মগোপনও বটে—। শিল্পে শুধু ততটুকু আত্মপ্রকাশই বাঞ্ছনীয় যতটুকু সরস করিয়া প্রকাশ করা যায় এবং যতক্ষণ উপাদান ও উপকরণের রূঢ়তা, গ্রন্থিলতা ও কার্কশ্য আচ্ছন্ন না হয় ততক্ষণ আত্মগোপন করিতেই হবে। কবি যতীন্দ্রমোহন শিল্পসৃষ্টির মূল মন্ত্রটী বেশ বুঝেন।

যে নূতন সৃষ্টি করিতে পারে সে শক্তিমান শিল্পী ও স্রষ্টা - যে পুরাতনকে নূতন ভঙ্গিতে প্রকাশ করিতে পারে তাহাকেও আমরা গুণিশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করি। সাধারণ পাঠক শেষোক্ত শ্রেণীর সাধকদিগের গুণ উপলব্ধি করিতে চায় না—তাহারা খোঁজে 'নূতন তথ্য কি পাইলাম?' ভঙ্গির নবীনতা বা রচনার কারু-সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তাহারা উদাসীন বলিয়া অনেক গুণীর রচনায় তাহারা রস পায় না। সূক্ষ্ম শিল্পের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার চোখ যাঁদের নাই—তাঁহাদের নিকট যতীন্দ্রমোহন ও তাঁহার সতীর্থ কবিগণের বিশেষ সমাদর হইবে না।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়ের 'এক অনুরোধ' ধূপের ধোঁয়ার মত সুগন্ধি, কিন্তু শূন্যে বিলীয়মান।

শ্রীমান নজরুল ইসলামের 'অ-বেলায়' গানটি "ছোট্ট বুকের একটু সুরভি" লইয়া 'শিথিল কামিনী'র মত ফুটেছে —হয় ত 'অবেলাতে'ই ঝরবে। তা' ঝরুক—কিন্তু "বাজের বুকে কত ব্যথা কত দামিনী" চিরদিন জ্বলতে থাকবে।

'অমলচন্দ্র'—কারুণাপূর্ণ রচনা।

Printed and Published by Pulinbehari Das from Sree Gouranga Press, Calcutta.
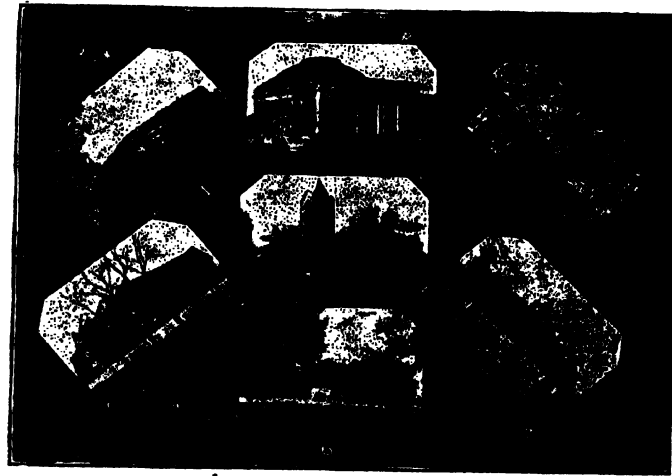
কর, মজুমদার কোম্পানীর প্রকাশিত "আমেরিকায় পনের
বৎসর (Fifteen years in America) নমক
গ্রন্থ হইতে।

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাবার
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩২৮ { ৪র্থ সংখ্যা

বোঝা-পড়া

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

বাইরে এই যে একটা সোর-গোল হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে এ হ'তে বোঝা যাচ্ছে দেশের অবস্থা-সমস্যা নিয়ে পন্থা উদ্ধারের চেষ্টা ছেড়ে মত আর আদর্শের লড়াই লেগে গিয়েছে।

এই সব ভিন্ন ভিন্ন আদর্শবাদীদের মধ্যে সুর উঠেছে নানা রকম—উপস্থিত একজন আত্মত্যাগী [illegible]বীর মাতৃভূমিকে আসন্ন মৃত্যু হতে টেনে তো[illegible] জন্যে একটা কার্য্যপন্থা আরম্ভ করেছেন [illegible] এই কা[illegible] নানা কারণে আর কয়েকজন পাণ্ডা যোগ দিতে [illegible]রছে[illegible] না; অথচ দেশেরও দশের কাছে নিজেদের যশকে [illegible]শবৈরী-অপবাদ হতে বাঁচাবার জন্যে ভিন্নপন্থার আ[illegible]র দোহাই দিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছেন; শুধু ঝগড়া নয় [illegible]পারত ভাবে বাধা দিচ্ছেন।

এই দুর্দ্দিনে এইটেই সব[illegible]চেয়ে কষ্টকর, যে দেশ মায়ের যোগ্য ছেলেদের মধ্যে মায়ের মরণাপন্ন অবস্থায় সময় মত নিয়ে ঝগড়া বাধতে পারে! বড় ছেলে একটা চিকিৎসা পন্থা আরম্ভ করেছেন মাত্র; এতে এসময় অন্য ছেলেদের উচিত নয়, অন্য ধরণের চিকিৎসা পন্থার আবদার ধরে বড় ভাই এর চেষ্টাকে বাধা দেওয়া। দিলে যা হয় এক্ষেত্রে তাই হবেই।

এই ব্যাপার নিয়ে গত আশ্বিনের 'বিজলী' পত্রে 'নায়ে সুখম্' নাম দিয়ে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়েছে; পড়লাম; পড়ে যা বুঝলাম তাতে মন অবসন্ন হল। প্রথমেই বিজলী লেখক মহাত্মার আদর্শ আলোচনা করে দেখালেন যে আদর্শটা খাটো; ওতে পেট ভরে না; কাজেই পূজনীয় কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভূমার আদর্শ ব্যাখ্যা করলেন; তার পর দেখালেন তাও খাটো' তাতেও পুরো পেট ভরে না; তার পর তিনি তাঁদের "তুরীয় ভাগবতের" আদর্শ খাড়া কল্লেন। করে সিদ্ধান্ত কল্লেন যে দেশের জনসাধারণের প্রত্যেকে "তুরীয় ভাগবতের সমস্যা" পূর্ণ করতঃ বিশ্বের সমস্যা পূর্ণ করে তুল্লে তবে ভারতের অন্তরাত্মা সিদ্ধ হয়ে বিশ্বাতিরিক্ত সত্ত্বার উদ্বোধন করবে.তখন এই বাঙ্গলা দেশের লোক দুবেলা খেতে পাবে, রোগে ওষুধ পাবে, গায়ে কাপড় জুটবে! এক কথায় মুক্তি পাবে।

হা ভগবান! হা মাতঃ দেশভূমি! তোমার অবস্থা এখন সঙ্কটাপন্ন! এজন্যে তোমার পঞ্চত্ব লাভই হোক্। তার পর যদি বিশ্বপ্রেমের ও তুরীয় ভাগবতের খিচুঁড়ী কেহ বানাতে পারেন তবে তখন তোমার আত্মার সপিণ্ডকরণ হবে!

এখন আসল কথা জিজ্ঞাস্য এই—মহাত্মার স্বরাজ লাভকে

একটা কাল্পনিক আদর্শ বলে খাড়া করা হচ্ছে কেন? এই আসন্ন বিপদের হাত হতে নিজেকে immediate মুক্ত করবার যে (হাতের কাছেই উপস্থিত) কার্য্যকরী পন্থা একটা আছে, মহাত্মা তাহাই দেখিয়েছেন এবং বলছেন, "দেশ ভাইরা তোমরা এই কাজটা করে দেখ, করলে তোমাদের অন্ন বস্ত্রের দুঃখ মিটতে পারে—দেশ অন্নাভাবে, চিকিৎসাভাবে, অর্থাভাবে, বস্ত্রাভাবে ধ্বংসের পথে চলেছে এ ধ্বংস হতে নিজেরা নিজেকে টেনে না তুললে পরে চলবে না—আর উদ্ধারের এই পন্থাই দেখছি—বাহিরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখাপেক্ষিতা ছাড়তেই হবে 'বিশ্ব থেকে কেটে ছেঁটে' দেশকে থাকতে বলছিনি; বিশ্বের মধ্যে যে ধ্বংসকারী প্রতিদ্বন্দ্বী বলবত্তর শক্তি দেশ সত্তাকে গিলতে বসেছে সেই দানবী শক্তি হতে নিজেকে বাঁচাতে হলে নিজের সত্তার সমবেত শক্তিকে তার বিরুদ্ধে লাগাতেই হবে; বিশ্বে যে শুধুই প্রেম শুধুই দেবশক্তি রয়েছে তা আমি বিশ্বাস করিনা, কোনো সহজ জ্ঞানীও তা করেন না—বিশ্বে বন্ধুশক্তিও আছে, শত্রুশক্তিও আছে; যখন শত্রু শক্তি আমাকে লোপ করতে আসছে তখন সেই মুহূর্ত্তে বন্ধুশক্তির সঙ্গে গলাগলি করবার সময় ফুরসুৎ আমার নাই। তা করতে গেলে আমি মারা যাই—কাজেই আমার এখন প্রধান চিন্তা হচ্ছে ধ্বংস হতে আত্মরক্ষা করা।"

এই যে কথা এ আদর্শের ধুম্ররচনা নয়; এ জলন্ত জীবন্ত সত্য; বিশ্বপ্রেমপ্রচারক বা তুরীয়-ভাগবত-সাধক বুকে হাত দিয়ে বলুন এ কথা সত্য কি না? অর্থাৎ একটা করাল ভয়াল, বিশালকায় ধ্বংস-রাক্ষসী আমাদের জাতকে গিলতে বসেছে কি না? এঁরা কি সরকারী গণনা তালিকায় বিশ্বাস করেন? করেন তো অস্বীকার করতে পারেন না যে বাঙ্গালী জাতটা ধ্বংসমুখে চলেছে। কর্ণেল মুখুয্যে অনেক দিন আগে, কামাখ্যা বাবু কয়েক মাস পূর্ব্বে স্বাস্থ্য-সমাচারে এবং প্রভাতবাবু উপাসনায় ঐ কথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন আজ ২০ বছরে প্রত্যেক বছর বাঙ্গালীর জন্ম সংখ্যা কমে আসছে, মৃত্যু সংখ্যা বাড়ছে! আর অনাহার, ব্যাধি, অস্বাস্থ্য এই ধ্বংস সাধন করছে; যিনি দেশের সুসন্তান বলে গর্ব্ব করতে চান তিনিই বলবেন বাঁচা দরকার; সব আগে দরকার স্বাস্থ্য, ও আহার ঔষধ সংগ্রহ করে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করা দরকার নচেৎ একশত দুইশত বৎসরের মধ্যেই এ জাতটা অদৃশ্য হবে!

এখন এই ঘোর সমস্যার সময় দেশের কর্ত্তব্য যদি কেউ দেখিয়ে দেন; আর কার্য্যকরী পন্থা ইঙ্গিৎ করেন তা হলে তাঁর সেই দর্শিত পন্থা কি আদর্শ বলে বর্ণনা করবো? হতে পারে এই উদ্ধার-পন্থায় ফিরে যাওয়াটা আদর্শ! তা হলেও তা practical তো বটে? আমাদের মত নির্জীব অসহায়, পর-তন্ত্র জাতির পক্ষে হাতের মুঠোর চেয়ে বড় আমে লোভ করতে যাওয়াটা হাস্যকর বা বাতুলবৎ চেষ্টা নয় কি? নিজের পেটের জোগাড় নাই অথচ দেশশুদ্ধ লোককে ভোজ খাওয়ানোর খেয়াল যেমন হাস্যকর, ছোট্ট দেশটিকে ভাল করবার যাদের শক্তি নাই তাদের বিশ্বপ্রেমের খেয়াল দেখা বা তুরীয় ভাগবতের স্বপন দেখা সমান হাস্যকর নয় কি?

বিজলী বলেন মহাত্মার আদর্শে পেট ভরে না তাই গরিবদের ভূমার স্বপ্ন দর্শন! এইখানেই দেশবাসী তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে চান; শরৎবাবু আসলে এই ঝগড়াই তুলেছেন। আমার এখন অন্ন বস্ত্র সংস্থান করে অনাথা ভাই বোন গুলোকে মৃত্যু হতে বাঁচাতে হবে তারই যোগাড় হ[illegible] না অথচ আমি বারোয়ারী ভোজ দিতে চাই! যিনি ভাল খেয়ে পরে ভাবের রাজ্যে থাকেন তাঁর পক্ষে অনাহারী বেনিয়াকাত প্রাতিবেশীর একমুঠো অন্নের চেষ্টায় প্রাণান্ত সং[illegible] tragedy বোঝা খুব কঠিন! "দেশ আছে বিশ্বের মধ্যে বিশ্ব হতে কেটে ছেঁটে দেশকে নিয়ে পড়ে থাকা বাস্তবিক সম্ভব নয়" এ সব বাক্‌-চাতুরি, কথার যাদুগিরি! 'দেশ বিশ্বের মধ্যে আছে' সবাই জানেন; "বিশ্ব হতে কেটে ছেঁটে থাকলে—থাকা সম্ভব নয়" তাও সবাই জানেন। তবে বুদ্ধিমানেরা জানেন এ গুলো Half truths আধা-সত্য! বিশ্বটার যে ভাল-মন্দ, সু কু, অনুকূল-প্রতিকূল দুটো দিক্ আছে তা কবিবর কি জানেন না? যে সব সভ্য দেশে তিনি বাক্যবলে দিগ্বিজয় করে এলেন তারা এই কথা খুবই জানে বলে মন্দ, কু,

প্রতিকূলকে নষ্ট করে, দূরে ঠেলে জগতে এখনো টীকে আছে; আর নিজেদের সুখ সুবিধের জন্যে আর পাঁচজনের ঘাড় মটুকে রস সঞ্চয় করে সুখে আছে! তারা তো কই বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়ে আয়রলণ্ড, ইজিপ্ট, কোরিয়া, কঙ্গো, ফিলিপাইন, গোয়া, পণ্ডিচারী ছেড়ে দেননি? বিশ্বপ্রেমের দোহাই দিয়ে গোয়ালা গরু ছেড়ে দেয়? না—গাড়োয়ান ঘোঁড়া ছেড়ে দেয়? কবিবর এটা জানেন না কি যে আত্মপ্রেম, আত্মরক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা সমস্ত প্রতিষ্ঠা চেষ্টারই মূল মন্ত্র? সকলেই আগে ঘর গুছিয়ে নিয়ে পরের সঙ্গে পীরিতি করবার অবসর পায়? কেননা সকলেই কাজের লোক, বাজে খেয়ালের খেয়ালী নয়; সকলেই জানে প্রকৃতির এই রক্তরাঙ্গা রঙ্গমঞ্চে জীবন সংগ্রামের নির্ম্মম অভিনয়ে প্রতিকূল শক্তি হতে আত্মরক্ষা করে; আর সেই জয়লাভ করতে গেলেই নিজের বোলো আনা পরের হাত হতে বাঁচাতে হবেই! যখনি যে জাতির অস্তিত্ব বাহির হতে বিপন্ন হয়েছে তখনি আত্মরক্ষার জন্য তাকে 'বিশ্বপ্রেম' ও 'তুরীয় ভাগবৎ সাধনা' ছেড়ে পাশবিক লীলায় মাত্‌তে হয়েছে।

আজ ভারতের জাতীয় অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন; অস্বাস্থ্য, অনাহার, রোগ, ব্যাধি, অশিক্ষা চারিদিক হতে তাকে চেপে ধরেছে প্রতিদ্বন্দ্বী নানা বাহির-শক্তি তাকে [illegible] দাঁড়াতে দিচ্ছে না; পর মুখ-প্রত্যাশায় দীক্ষিত হয়ে পরমুখের দিকে তাকিয়ে আছে অথচ কোনো কিনারা হচ্ছে না—কবিবর যদি ভারতের "মূঢ় মূক" মৃত Mass এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সত্যই সত্যভাবে রাখতেন কল্পসাহিত্যের ছলে নয়—এই রক্তমাংসের অন্তকরণ দিয়ে রাখতেন—তা হলে বুঝতেন ধ্বংস হতে আত্মরক্ষার কথা আগে না বিশ্বপ্রেম দিয়ে জগতের সাম্য রচনার কাজ আগে কর্তব্য! দেশের ক্ষুধাতুর রোগাতুর অর্দ্ধমৃত জাতির সঙ্গে তাঁর অসংযোগ সন্দেহ করছি বলে তিনি হয়তো এটাকে অপবাদ দেওয়া ভাববেন; কিন্তু এ সন্দেহ অনেকেই করছে। আমিও করি কেননা এ পর্য্যন্ত তিনি দেশের "মূঢ় মূক" mass এর সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশে তাদের সুখ দুঃখে সুখী দুখী, যে হয়েছেন তা আমরা কিছুতে বিশ্বাস করিনি; কেননা তার দৃষ্টান্ত আমরা পাইনি; আর শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত লোক ছাড়া, অশিক্ষিত মূক মূঢ় জনসংঘ তাঁহার নামই জানে না। সে কথা যাক্।

তার পর বিশ্বের মধ্যে কু বা প্রতিকূল শক্তি হতে কেটে ছেঁটে দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে হবেই; এ ভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা দেশ মাত্রেই করে; আর বিশ্বের মধ্যে 'সু' বা অনুকূল শক্তির সঙ্গে দেশকে মিলিয়ে নিতে হবে; একথা কবিবর নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন; মহাত্মা গান্ধী কি এমন কথা কোথাও বলেছেন যে বিশ্বের অনুকূল শক্তি হতে নিজের দেশকে ছেঁটে ফেলতে হবে? পাশ্চাত্য জ্ঞান বিদ্যাকে তিনি কোথাও বাদ দিতে বলেন না; তবে হতে পারে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান দান প্রথাটা তিনি নামঞ্জুর করতে চান্। বা রেল টেলিগ্রাফ, হাস্পাতাল তিনি শয়তানী যন্ত্র মনে করেন; এ নিয়ে মতভেদ হতে পারে। সে দূরের কথা; আধুনিক সভ্যতার জড়-যন্ত্র গুলা আমাদের মুক্তিপক্ষে দরকারী কি অদরকারী সে তর্কের উপর উপস্থিত অস্তিত্ব সমস্যা নির্ভর করছে না; উপস্থিত সমস্যা এই বুরোক্রাসীর নির্ম্মম শাসন কবল হতে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার হাত হতে কি করে নিরন্ন, নির্ব্বস্ত্র, স্বাস্থ্যহীন, ব্যাধিপীড়িত, জাতটাকে বাঁচানো যায়! ভারতীয় বুরোক্রাসী হতে ব্রিটিশপার্লামেণ্ট অনেক দূরে—ব্রিটীশ পার্লামেণ্ট হতে বিশ্বের দরবার আরো দূরে—তার চেয়েও দূরে বিশ্বের আধ্যাত্মিক সভ্যতা! আমাদের জীবনমরণ সম্পর্ক এই ব্যুরোক্রাসীর ঔদাসীন্যের সঙ্গে!

বিজলী বলেন "দেশের যেটা বেশী অন্তরের কথা সেটার উপর তাঁদের (Gandhiates) তত মায়া নেই!"—এত বড় অপবাদ, অত্যের অপলাপ, কখনো শুনিনি!

দেশের যেটা বেশী অন্তরের কথা সেটা এঁরা কি বুঝেছেন জানিনা তবে সেটা যে ভারতের 'ভাত কাপড় ঔষধের' কথা, তার ভুল নেই; শিক্ষা? তাও কি গান্ধীর দল অস্বীকার করেন? তিনি কি বিদেশী শিক্ষাতন্ত্র ছেড়ে স্বদেশী শিক্ষাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে বলেন নি? তবে হতে পারে তাঁর কল্পিত প্রতিষ্ঠানে তুরীয় ভাগবৎ সাধনার বা বিশ্বপ্রেমের লোকাচারের ব্যবস্থা হয়নি। দেশের এই যে

"বেশী অন্তরের কথা" অর্থাৎ আসন্ন মৃত্যু হতে জীবনে ফিরে আসার ব্যাকুলতা তার পন্থা হচ্ছে নিজের হাতে; চাই আমার স্বাস্থ্য, চাই অন্ন, চাই অর্থ, চাই বস্ত্র এই কটী দ্রব্য আমাকে সংগ্রহ করতে হবে নিজের চেষ্টায়—এবং সেই সংগ্রহে পাশ্চাত্য সভ্যতারূপী যে নিষ্ঠুর বহির্শক্তি বাধা দিচ্ছে তা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা। দুর্ব্বলের পক্ষে সে শক্তিরোধ অন্য উপায়ে সম্ভব না হলে দুর্ব্বলের একমাত্র পন্থা তার কাছ হতে সরে দাঁড়ানো। অর্থাৎ Self exclusion আত্মস্বাতন্ত্র্য। আগে আত্ম-স্বতন্ত্র্য তারপর আত্মবিস্তার (harmony with other selves) আমাদের এখন আত্মস্বাতন্ত্র্যে আত্মরক্ষা সবচেয়ে অন্তরের কথা।

এ কথা যিনি অস্বীকার করেন তিনি হয় ইচ্ছে করে অস্বীকার করেন নয় সত্য বলতে দ্বিধা বোধ করেন।

কিন্তু বিজলী তর্কের খাতিরে স্বীকার করেছেন "পরাধীন যদি আপন সত্তাকে বাঁচিয়ে বর্ত্তিয়ে রাখতে চায় তবে আগে নিজের চারদিকে ঘের দিয়ে আত্মবোধটা তীব্রমাত্রায় জাগিয়ে তুলতে হবে।" এবং এটা পুরা সত্য না মেনে তিনি উপদেশও দিয়েছেন যে "দেশকে বাঁচাতে বাড়াতে পারে দেশভক্তে নয় কিন্তু মানুষে—" তাও সত্য কথা কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এই যে লোকদের অসহযোগ ব্রত নিতে সারাদেশে ছুটে ছুটে বলে বেড়াচ্ছেন তাঁর উদ্দেশ্য কি এই-ই নয় যে সব মানুষ মানুষ হও; নিজের মধ্যে নিজের স্বাধীনতা প্রত্যক্ষ কর, বড় হও, মুক্ত হও—"। তা যদি তিনি না মানবেন তবে লোক জাগাবার এ চেষ্টা কেন? এক দেশভক্তের ভক্তির জোরেই যে দেশ জাগেনা, বাঁচেনা, তা তিনিও জানেন, বিশ্বাস করেন, না করলে এতদিন হিমালয়ের গুহায় অজ্ঞাতবাস করে যোগ বলেই কুণ্ডলিনী জাগিয়ে ভারত উদ্ধার করতেন! অথবা প্রবন্ধ লিখে, আর বিশ্বদরবারে বক্তৃতা দিয়েই কাজ সারতেন। —আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান দিয়ে যে জাতিকে স্বাধীন করতে হবে বা মানুষ করে তুলতে হবে তা তো পরের কথা—যদি বাড়ী পরের দখলেই রইলো, আর টাকা কড়ির বাক্সের চাবি পরের হাতে থাকলো, তবে বাড়ীর মেরামতিতে বৈজ্ঞানিক বিধি ব্যবস্থার আলোচনা অবান্তর কথা! একটা বাজে অছিলা নিয়ে কর্ম্মীর সঙ্গে স্বপ্নদর্শীর ঝগড়াই হচ্চে!

তারপর তৃতীয় আদর্শ খাড়া করছেন বিজলী নিজে। ইনি রবীবাবুর বিশ্বপ্রেমেও সন্তুষ্ট নন! ইনি আবার বিশ্বাতিরিক্ত কিছু একটার আদর্শ খাড়া করেছেন। অর্থাৎ বিশ্বকে পেতে হলে বিশ্বাতিরিক্ত কিছুকে চাই! অর্থাৎ ভাগবৎ তৃতীয় বা তুরীয় ভাগবৎ প্রেমের একটা কিছু অর্থাৎ মানুষকে কিনা এই তেত্রিশ কোটী রোগা, চীঁ হাংলা ক্যাংলা ভারত সন্তানদের প্রত্যেকটাকে এক একটা ভগবানের edition হতে হবে। তা হলে বিশ্বটা হাতের মুঠোয় আসবে সঙ্গে সঙ্গে দেশটার স্বাধীনতা মুক্তি, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি করতলে আমলকীর মত এসে পড়বে!

অতি সোজা! শাস্ত্রে নাকি বলে জীবের ভগবানত্ব লাভ লক্ষ জন্মেও হয় না! কিন্তু পুন্যবল থাকলেও পূর্ব্ব জন্মের কৃপা থাকলে এ জন্মেই হয়ে যায়! এখন এই প্রত্যেক ভারতবাসীর পূর্ব্বজন্মের পাপ পুন্যের খাতা খুলে দেখতে হবে জমার ঘরে পুণ্য কত; তা হলে ঠিকানা হবে কতদিনে স্বারাজ্য লাভটা সহজ ও সুগম হবে! নচেৎ ভারতবাসী যে ভারতবর্ষের প্রশ্ন সমাধা করতে পারবে না তা নয়, বিশ্বের প্রশ্নটা সমাধান করতে পারবে না!"

এই সব ... মানে কি? কেউ বলতে পারেন?

এই বিশ্বপ্রীতি বা বিশ্বাতিরিক্ত সত্তা প্রভৃতি কথায় যে বক্তব্যটা কি বোঝা কঠিন? "বিশ্বপ্রীতি অর্থে স্বদেশের প্রতি ঔদাসীন্য বা বি... নয়। বিশ্বপ্রীতির আলোক যদি না ফুটে ওঠে তবে সে দেশপ্রীতির অর্থ বিদেশী বিদ্বেষ।"

আমি যদি আমার সর্ব্বনাশকারী প্রবল প্রতিবেশীকে বলি "ভায়া আমার ঘর কন্নায় তোমার কথার দরকার নাই আমার বিষয়-ব্যবস্থা আমিই করবো আমার ভাঁড়ারের চাবিটা তুমি গাপ্ করনা তোমার অযথা ব্যবহারের ব্যবস্থায় আমার ছেলে পুলে কষ্ট পাচ্ছে—" আর সে যদি বলে—"ভায়া তোমার ভালর জন্যেই তোমার ঘর কন্নার ভার নিয়েছি বেশী খেয়ে অসুখ করবে বলে ভাঁড়ার বন্ধ

রেখেছি—তোমার দরজা জানলা মজবুৎ নয় বলে তোমার টাকা আমার বাড়ীতে রাখছি—" আর আমি যদি তবু বলি—"না, অত দরদে কাজ নেই, তুমি আমার কাজে হাত দিতে এস না আমার কথায় থেকনা—" এবং এই বলে যদি তার আসা বন্ধ করতে বাড়ীর দরজা বন্ধ করি বা অন্যত্র গিয়ে বাসকরি, বা ভিন্নভাবে থাকি তা হলে কি প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষ হয়?

হয় হউক! আমি ক্ষুদ্রজীব, স্বার্থ ভেবে আত্মরক্ষাটাই দরকার বুঝি; তুরীয় ভাগবৎ ভাব বা বিশ্বপ্রেম যদি তাতে ক্ষুণ্ণ হয় হউক! আর জিজ্ঞাসা করি "তুরীয় ভাগবৎ" ভাব চর্চ্চার গরজটা কি আমারি একা? যে শক্তি বা সভ্যতা আমার বুকে বসে রক্ত চুষে আমাকে নির্জীব করেছে তার নয়? এ কথাটা কোনো ইতিহাসেই দেখিনা যে যে-দুর্ভাগ্য দেশ যখন আত্মতন্ত্রতা লাভ করে আপনার ভার আপন হাতে নিয়েছে তখন তার প্রত্যেক অধিবাসীকে বিশ্বপ্রেম বা "তুরীয় ভাগবতভাব" চর্চ্চা করতে হয়েছিল! একজন রোগী, আর্ত্ত অভুক্ত লোক আধিভৌতিক উৎপাতে উৎপীড়িত; তাকে যদি বলা যায় "বাপু হে,—খাই খাই করনা, প্যান্ প্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান করনা; এসবে ভাত কাপড়ে দুঃখ যায় না গলা ধরাধরি করে ভালবাসাবাসি করগে; ভাগবৎপ্রেমে ধেই ধেই করে নৃত্য [illegible]রগে; সব ভাল হয়ে যাবে সব অভাব ঘুচবে—" [illegible]পদেশ পেয়ে সে যা বলবে, এঁদের এই [illegible] বড় বড় [illegible]বের বাণী শুনে এই নিরন্ন নিপীড়িত দেশও [illegible]ই-ই বলবে!

দেশ চায় এমন একটা [illegible]করী পন্থা যা ধরে চল্লে দেশের উপস্থিত দুঃখ কষ্ট অ[illegible] হতে সে নিজশক্তিতে মুক্তিলাভ করবে। দেশের প্রত্যেক লোকের সমস্যা হচ্ছে জড় দেহটার সুগতি আগে কিসে হয় তার পন্থা আবিষ্কার। আত্মার ভাবনা এখন তার মাথায় ঢুকছে না;—যখন খেয়ে পরে সুখে স্বাস্থ্যে বেঁচে প্রচুর সময় থাকবে তখন আধ্যাত্মিক আদর্শের নেশায় খেয়াল দেখবার যথেষ্ট সময় থাকবে—

আমরা দেখছি, বুঝছি আমাদের জাতীয়-সমস্যা ঘোরতর কঠিন হয়ে পড়েছে—আমি বীণা বাজিয়ে গোঁপে পাক দিয়ে বাহবা কুড়িয়ে বেড়াতে পারি কিন্তু আমার শতকরা ৯৯ জন ভাই রোগে অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ মরণাপন্ন! যদি আমি দেশভক্ত হই তা হলে তাদের ভাবনাই আমার ধ্যানব্রত করে তুলতে হবে, যখন তা করে তুলবো তখন আমার প্রথম বিবেচ্য হবে কি পন্থায়, কি উপায়ে এই হতভাগা গুলোকে বাঁচাতে পারা যায়! যাদের ভরসা করে যাদের আশার আশ্বাসে এতদিন দিন গণলাম তারা আমার দুঃখের কান্না কানেও তোলে না, গায়েও মাখে না! এখন এ যে আমারই গরজ? রোগের নিদান বুঝে দেখলাম, প্রতীকার নিজের হাতে—আমার ঘর-দ্বারের ভারও আমার খরচ পত্র নিজের হাতে না নিলে, ইচ্ছামত ব্যবস্থা এবং খাওয়া পরা করতেই পারবো না; আমার অর্থ যদি আমার অভিযোগেই যায় না হয় তবে কি করে নিজের দুঃখ দূর করবো, নিজের রোগ ভাল করবো?—যাদের সঙ্গে আমার ভাগ্য এমন করে সংযুক্ত, যে সংযোগে আমাকে পদে পদে তাদের মুখাপেক্ষী করে রেখেছে সেই সংযোগ ছেদ করতে হবে সেই মুখাপেক্ষিতা দূর করতে হবে—এক কথায় আমাকে সমস্ত অসুখ অসুবিধা স্বীকার করেও আত্মস্বাতন্ত্র্য লাভ করতে হবে; একজনকে নয়, প্রত্যেক কে স্ব স্ব ভাবে আত্মতন্ত্র হয়ে আপনার অভাব অভিযোগ পূর্ণ করতে হবে—তবেই মুক্তি; তবেই সব দুঃখের অবসান—'আত্মনা আত্মানাং উদ্ধারয়েৎ'—'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'—যেমন ব্যষ্টি দেহের ভিতর দিয়েই আত্মার বিকাশ তেমনি জাতীয় দেহের ভিতর দিয়ে জাতীয় আত্মার বিকাশ; জাতীয় দেহরক্ষা করতে হলে প্রতিকূল জড়শক্তির সঙ্গে বিরোধাচরণ অবশ্যম্ভাবী—এই দেহরক্ষা করতে গেলে যদি প্রতিকূল জাতি বা সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষ বোঝায় বোঝাক! এই বিদ্বেষ জীবন সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী factor!

আগে এই জাতীয় দেহ রক্ষা হউক, গঠিত হোক—তারপর প্রয়োজন হলে অবকাশ মত বিশ্বপ্রেম, ভাগবৎভাব নিয়ে আলাপ করা যাবে।

এই দেহরক্ষা মন্ত্র যিনি এখন প্রচার করছেন—রক্ষাপন্থা যিনি দেখাচ্ছেন, তাঁকেই দেশ বরণ করে নিয়েছে নেতার পদে—তাঁর কথাই শিরোধার্য্য! যাঁরা বিশ্বপ্রেমের ও ভাগবৎ

[illegible]দের আখড়াই দিচ্ছেন—দিন! দেশের যখন সে মন্ত্র নেবার [illegible] হবে সে দীক্ষায় দীক্ষিত হবার সুযোগ ঘটবে তখন তাঁদেরও বরণ করে নেবে! এখন তাঁদের যুগ নয়—এখন প্রাণরক্ষার চিন্তাই আগে! তারপর প্রাণরক্ষা পেলে [illegible]ম আদর্শ ধরে তার বিকাশ হবে সে চিন্তা পরে হবে। [illegible]খন বৈদ্যের প্রয়োজন, আধ্যাত্মিক গুরু উপদেষ্টার নয়—আদর্শ প্রচারকের যুগ এখন নয়।

তাই—তাঁদের প্রতি সানুনয় নিবেদন, এই যেন তাঁরা [illegible]র্ত্তমান নেতার কৃতকার্য্যে বাধা না দেন—

এ কথাটা তাঁরা মনে রাখবেন দেশের জনসাধারণ ভীত চকিত সংশয়আন্দোলিত হলেও, তারা বুঝতে পারে কার উপদেশের কতটুকু মূল্য ও কার বুকে দরদের ব্যথা বেশী তীব্র, বেশী আন্তরিক—তারা সত্য গুরুর বাণী শুনতে পেয়েছে ঠিক মন্ত্র পেয়েছে—কেবল পেটের জ্বালায় প্রাণের ভয়ে মন্ত্র সাধন করতে পারছে না, আদেশ মানতে পারছে না!!

ভারতের মূঢ় মূক জনসংঘ অন্ততঃ এতটুকু বুদ্ধি রাখে যে-যে ছেলে তৃষিতা মায়ের মুখে জলের বদলে আধখানা বেল এনে দেয় সে সু-সন্তান নয়॥

বিদায়

[শ্রীকালিদাস রায়]

বৎসে,

বিগত যামিনীর হাস্য সুষমার
মিলনমেলা অই মলিনম্লান,
নিদয় হয়ে তোরে হৃদয় হতে তুলি
বিদায় দিতে তার বিদরে প্রাণ।
সানায়ে বিনাইয়া করুণ তান বাজে
দারুণ নিপীড়নে অরুণ আঁখি রাজে,
এমনি একদিন মালিনী আশ্রমে
ঋষিরো চোখে এল অশ্রুবান,
আমরা গৃহী হায় তনয়া বৎসল
মায়ায় দুর্ব্বল মুহ্যমান।
বৎসে প্রাণোপমা ভবনরমাসমা
কেমনে রবো গো মা তোমারে ছাড়ি?
হোলীর পরদিনে শূন্য দোলতলা
আবির রাঙা যেন এ ঘর বাড়ী।

এ গৃহে প্রতি রেণুকলিকা তুমি মাখা
চরণ রেখা তব আঙিনা ভরা আঁকা,
রোপি[illegible] লতিকারা লুটাবে স্নেহহারা
য[illegible]রি হবে সারা সাধের সারী,
তোমারি [illegible] সাঁজে [illegible]াতিটি জ্বলিবেনা
প্রভাতে ঝরিবে না [illegible]ারির বারি।

বিদায় দিতে হ[illegible] এখানে কেন রবে?
দেউলে বর[illegible] সেখানে তুমি
এখানে নাই সাথী, [illegible] এ তব খেলাপাতি
এ তব নহে ব্রত [illegible]াধনা ভূমি।
মোদের গৃহ হেথা আঁধা[illegible] হবে হোক
তোমার প্রেমে সেথা জ্বলুক হেমালোক;
হৃদয় টুটে তবু বিদায় দিতে হবে
নয়ন জলে চাঁদ ললাট চুমি'
এখানে নন্দিনী আদরনন্দিতা
বন্ধ্যা মন্দিরে সেখানে তুমি।

—

স্বদেশ

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২

রজত আসিয়া মা-ঠাকুরাণীর কাছে বাবুর বিপদের কথা এবং মোড়লের দৈবশক্তির বলে এই বিপদের অপূর্ব্ব উদ্ধারের কাহিনী বর্ণনা করিতে তিলমাত্র ত্রুটি করিল না। ফলে মা-মনসার ষোড়শোপচারে পূজার মানত হইল এবং সর্পকুলকে একদিন দুধ কলা নিবেদন করিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সরকার মহাশয়ের উপর হুকুম হইয়া গেল।

কিন্তু তাহাতেও তিনি শান্ত হইতে পারিলেন না। বারম্বার বৈঠকখানায় লোক আসিয়া জানাইয়া গেল—একবার বাড়ীতে ডাকচেন।

সেদিনের মত পণ্ডিত মহাশয়কে বিদায় দিয়া অবনী-মোহন যখন অন্দরে প্রবেশ করিলেন, তখন বেশ রাত হইয়াছে। এক দিকে অত্যধিক তাড়া কিম্বা তাগিদ থাকিলে নিজের দিকে অসম্ভব রকম ঢিল দেওয়াই যেন তাঁহার স্বভাব। ভিতরে যাইবার ঘন ঘন তাগিদ না আসিলে হয়ত তিনি নিজেই বহু পূর্ব্বে ভিতরে আসিয়া গৃহিণীর নিকট সন্ধ্যার সমস্ত ব্যাপার গল্প করিয়া যাইতেন; কিন্তু এখন তাঁহার কাছ হইতে একটা কথাও বাহির করা অতি কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে আনন্দময়ীর হৃদয়টা ভয়ে সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল; ধীরে ধীরে তাহা অপসৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানটায় দুর্জ্জয় অভিমান আসিয়া জমাট বাঁধিয়া বসিল। অবনী-মোহনকে দেখিয়া তাঁহার বুকের সমস্ত শিরা উপশিরা ছিঁড়িয়া যেন অশ্রুর উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম

অচিরে বিছানার উপরকার পাখ'টা তুলিয়া উঠিয়া গৃহের ভারি হাওয়াটাকে লঘু করিয়া দিতে লাগিল।

আনন্দময়ী আর দূরে থাকিতে পারিলেন না, স্বামার পদতলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখানে বসিতেই তাঁহার হৃদয় এক অপূর্ব্ব শান্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অভিমানের গাঢ় মেঘ দুই এক ফোঁটা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই নিমিষে দূর হইয়া গেল। চিরকালের সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের মণিমাণিক্যগুলি তখন আনন্দময়ীর মনের উপর আলো ফেলিয়া বলিল, স্বামী পরম দেবতা, তাঁহার উপর রাগ করিতে নাই।

আনন্দময়ী বলিলেন,—খাবে চল।

অবনীমোহন একটা স্বস্তির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—নাঃ ক্ষিদে নেই। সেটা যে একটা মিথ্যা কথা তাহা উভয়েই জানিতেন, তাই আনন্দময়ী তাহার উত্তরে বলিলেন,—চল বসবে চল, দু-এক গাস্ খেতেখেতেই ক্ষিদে ফিরে আসবে। অনেকক্ষণ কিছু না খেলে নাড়ি অমন শুকিয়ে যায়।

অবনীমোহন পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলেন,—হুঁ।

তাঁহার উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া আনন্দময়ী বলিলেন, ওঠ, আর মিছে রাত করে কি হবে? লাভের মধ্যে কাল সকালে হয়ত শরীর খারাপ হবে।

সকালে তিনকড়ির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে

শাস্ত্রের সব ঠিক, তাতে কোন তফাৎ নেই।

অবনীমোহন কহিলেন,—তাই নাকি, সেত বেশ কথা; দেখ, এটা কিন্তু কোন দিন যেন ভুলে যেয়ো না। কি বললে মনে আছে?

আনন্দময়ী একটু রাগের ভাণ করিয়া বলিলেন,—বাবা, আমি যেন অতই বোকা, যা বলি তা বুঝি আমার মনে থাকে না?

অবনীমোহন। থাকে বই কি; কিন্তু তোমাদের স্মরণশক্তিটাও চমৎকার কিনা! প্রয়োজন অনুসারে কখন মনেও পড়ে আবার দরকার হলে বেমালুম ভুলেও যাও।

আ। সব কিছু দোষ যেন আমাদের—আর জন্মে মরে' যেন পুরুষ হই।

অ। আর আমি তোমার বৌ হব?

আ। সে তোমার খুসী।

অ। তাহলে ত' বেঁচে যাই।

আ। পুরুষ হয়ে তোমাদের দুঃখুটা কি শুনি?

অ। প্রথম নম্বর, তোমাদের নথনাড়া খেতে হয়। দ্বিতীয় নম্বর, হুকুম তামিল করতে এক সেকেণ্ড দেরী হলে—শ্রীমুখ খানি হাঁড়ির আকার ধারণ করে।

আ। বাবা! এত কথাও বানিয়ে বলতে পার। কবে নথ নাড়া খেয়েচ, কবে মুখ হাঁড়ি করেছি?

অ। ঐ কথাই ত' বলছিলুম গো—ঐ তোমাদের

আ। তা হবে না? রজার মুখে সব কথা শুনে আমার সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল।

আনন্দময়ী জোড় করে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—মা মনসা, খুব মুখ রক্ষে করেছ মা!

অবনী গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—যদি রক্ষে কেউ করে থাকেত ঐ বুড়ো মোড়লের অসম্ভব সাহস!

আনন্দময়ীর একথা ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন,—কেবল কি সাহসে হয়? বুড়ো যে সাপের মন্তর জানে।

অবনী একটা অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন; তাহা আনন্দময়ীর অন্তরে রূঢ় বেদনা দিল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—কি জানি কেন যে তোমরা মন্তর তন্তর মানতে চাও না! সাহস ত' অনেকের আছে; কিন্তু কে ঐ অমন করে আপনাকে সঁপে দিতে পারে?—আর যদি মন্তরের কোন গুণ নাই থাকবে ত' বুড়োর কথা ঐ খল পোকাটা শুনবে কেন?

আনন্দময়ীর কথা কহিবার সময় অপরিসীম সাবধানতা—অবনীমোহনকে আবার হাস্য-চটুল করিয়া তুলিল। হাসি টিপিয়া তিনি বলিলেন,—পোকা মাকড় আবার নাকি মন্তরের মানে বুঝতে পারে! মোড়লের হাতে কেঁদো লাঠিটি দেখে বাছাধন মনে করলেন আর কাজ নেই—এবার এখানেই প্রাণ যাবে—তাই সুড়সুড় করে [illegible] ফিরে গেল।

আনন্দময়ী একটু অধীর হইয়া বলিলেন—তা বেশ, তুমি মন্তর মান না, লাঠি মান ত'! আমি বুড়োর লাঠিটি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব এখন, আর মন্তর তন্তরের ব্যবস্থা আমি নিজে করব। ও সব তোমার ভাবতে হবে না।

অবনীমোহন আবার হাসিলেন—তোমার কোন কাজে কি আমি বাধা দিয়েছি? যা তোমার মন চায়, করনা কেন। আর হরদয়ালকে কাল সকালে আমি একশ' টাকা বকসিস্ দেব।

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি বলিলেন,—আমি ওর বৌকে হাত ভরা চুড়ি গড়িয়ে দেব।

অবনীমোহন কপট গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন,—তাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।

স্বামীর রসিকতা না বুঝিতে পারিয়া আনন্দময়ী কতকটা অবাক হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন,—কেন?

অ। আছে, আছে, যুক্তি আছে, রীতিমত কারণ আছে, নইলে কি আমি একটা কথা বলে বসি?

আ। শুনিইনা, কি কারণ?

অ। সেটা একটা বড় ন্যায়ের তর্ক; তোমার বুদ্ধি ততখানি দৌড়বে না।

আ। ন্যায়ের তর্ক মানে ত, চুলোচুলি, হাতাহাতি—যা রোজ হচ্ছে তোমার ঐ পণ্ডিত মশায়টির সঙ্গে। তর্কের খুরে নমস্কার—দোহাই তোমার, এই রাত্তিরে আর আমার সঙ্গে তর্ক ক'রো না।

অ। বটে! তুমি দেখছি ন্যায় থেকে দর্শনে গেছ। বেশ, তবে কিনা ন্যায় বলে—

আ। ন্যায় অন্যায় আমার মাথায় থাকুক—তুমি খেয়ে নেও।

অ। নাঃ আর প'ব না—উঃ সাড়ে দশটা হয়ে গেছে যে!—হুঁ কি বলছিলুম—ঠিক; তোমার মতটা যেমন ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্চে—তাতে কাল সকালে হরদয়ালের ভাগ্যে তোমার তরফ থেকে শূন্যো হবে।

আ। কেন?

অ। যদি বুঝিয়ে বলতে হয়ত' আমাকে সময় দিতে হবে—ওটাও ন্যায়ের একটা বিধিগত নিয়ম—বিশ্বাস না হয়, ডাকাও পণ্ডিত মশাইকে।

আ। কাজ নেই আর এই রাত্তিরে পাড়া তোলপাড় করে—আমি তোমার সব কথা মেনে নিচ্চি।

অ। ওটা হলো অ-বিজ্ঞান, নারীর মজ্জাগত ধর্ম্ম।

আনন্দময়ী বলিলেন,—তা হোকগে, ওই আমাদের ভাল; ভগবান করুণ ধর্ম্মই যেন মেয়ে মানুষের মজ্জাগত হয়।

এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে আনন্দময়ীর দুইটি চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অবনীমোহন স্থিরনেত্রে তাহা দেখিয়া সইতে সইতে অকস্মাৎ যে কথাগুলি ভাবিলেন—

তাহা তাঁহার সাধারণ চিন্তার ধারা হইতে বহুতর ভাবে বিভিন্ন; তবুও তাহা এমন জোরের সহিত মনের উপর আঘাত করিল যে তাহাকে কিছুতেই আর অবহেলা করা চলে না। বিশেষ এক অপূর্ব্ব চিত্র তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। বিশ্বাসের অটল সিংহাসনের উপর সাধ্বী রমণী সাগরাম্বরা সমগ্র ধরণীর সাম্রাজ্ঞীর মত বসিয়া; এবং বিজ্ঞান তাহার ব্যর্থ জ্ঞানভাণ্ডারে বিহ্বল ভাবে, তাঁহারই পদতলে অবনত!

দুইজনে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বহুক্ষণ নীরবে কাটিল। মিলনের নিবিড়তায় দুই জনে যেন বাক্যহারা! তাহার গম্ভীর স্তব্ধতাকে ক্ষুন্ন করিতে সেখানে যেন শব্দ-ব্রহ্মেরও সাহসে কুলায় না!

অনেকক্ষণ পরে অবনীমোহন কথা কহিলেন—একটা কথা যখনই মনে হচ্চে তখন আর আশ্চর্য্যের সীমা থাকচে না।

আগ্রহভরে আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি?

অ। ঐ মোড়লের কথা।

দুইজনেই কিছুক্ষণের জন্য কথা কহিলেন না। তাহার পর অবনীমোহন বলিতে লাগিলেন,—আমরা মৃত্যুর সামান্য সম্ভাবনা মাত্রে কত ভয়ে উঠি! তা' থেকে নিজেকে রক্ষা করিবার কতনা চেষ্টা, কতনা আয়াস! আর বুড়া, চোখের সামনে কি করলে! সেত' অনায়াসে বাড়ী চলে এলেই পারত'; কিন্তু সেটাত' দূরের কথা, যমের দোসরটির সঙ্গে সামনাসামনি হ'তে সে কিছুমাত্র ইতস্তত করলে না! নিশ্চয় সে অর্থের লোভে এটা করতে যায় নি, সে কি যা' তাকে এতবড় ত্যাগেতে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে!

আবার অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—ধারণা সব ক্রমেই বদলে যাচ্চে; জানবার দেখবার পদ্ধতি আছে; কোন কিছুই ছোট নয়, হেয় নয়। যাকে অজ্ঞ অসভ্য বলে ঘৃণা করতাম—তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জেগে উঠেছে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করি—তাকে লাভ কার?

আনন্দময়ী বলিলেন,—কার?

-আমার গো, আমার। বলিয়া পাশ

(৩)

বিহঙ্গের কাকলির সহিত হরদয়াল গাত্রোত্থান করিল। বৃদ্ধের শেষ রাত্রে আর ভাল ঘুম হয় না। বিছানার উপর বসিয়া ধীরে ধীরে ভাঙা গলায় কৃষ্ণনাম করা তাহার কেন, তাহার পূর্ব্ব-পুরুষের অভ্যাস। অদূরে একটা চৌকির উপর একখণ্ড ছেঁড়া কাঁথায় হরদয়ালের নাৎনী তাহার দিদিমার গলা জড়াইয়া ঘুমাইতেছিল। দিদিমা অর্দ্ধ জাগ্রত হইয়া বৃদ্ধের শ্রীনাম কীর্ত্তন শুনিতেছিল।

পার্ব্বতী হরদয়ালের দ্বিতীয় পক্ষের। প্রথম পক্ষের চিহ্নের মধ্যে একটি পুত্র রামশঙ্কর, সে অন্য ঘরে ঘুমাইতেছিল। বৃদ্ধের বয়স হওয়াতে এখন রামশঙ্করই ক্ষেত খামার দেখে।

সেদিন হাটবার তাই পার্ব্বতী উঠিয়াই যেন একটু তর্জ্জন গর্জ্জনের সুর ধরিল। বৃদ্ধ এই দ্বিতীয় পক্ষের কেউটে টিকে একটু ভয়ই করিত কারণ দেখিয়াছিল যে সকল মন্ত্রতন্ত্রই তাহার কাছে ব্যর্থ।

চাল বাড়ন্ত, তেল কমন্ত ইত্যাদি বহুবিধ কাহিনী শুনিয়া অবশেষে হরদয়াল যখন বলিল, বুঝিবা সে সেদিন হাটে যাইতে পারিবে না তখন পার্ব্বতী তেলে বেগুনে জ্বলিয়া গেল। নাসিকা উচ্চ করিয়া বলিল,—মুয়ে আগুন, রামা [illegible] নাকি আবার হাট করতে জানে। ছোঁড়া কেবল [illegible]র ঘুমুতে জানে। যেমন অলপেয়ে বুড়ো, তেমনি ছোঁড়া ছুকরা।

হরদয়াল যখন [illegible] ও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না তখন পার্ব্বতী তাহাকে স[illegible]সময়ে আহ্বান করিল—কি হয়েচে তোর বাপ্যাত্তুরে ঘাটের মড়া? তুই নিজে যাবিনে কেন?

হরদয়াল কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল,—রামকে আমি সব বলে বুঝিয়ে দেব—সে বেশ করে হাট বাজার করে আনবে—অত উতলা হও কেন? আমি আর ক'দিন আছি?—তোমাদের সংসার তোমরাই ত' করবে। আমি থাকতে থাকতেই দেখে শিখে নিক্।

পার্ব্বতী, ঝাঁঝাইয়া উঠিয়া বলিল,—আমার মাথা দেখবে আর মুণ্ডু শিখবে। কেন তোমার

গম্ভীর হইয়া হরদয়াল বলিল, কেন কি-হাটে আমিইত যাই; এবারে যেতে পারবো না, আমাকে এখুনি বাবুর সঙ্গে কৈলেসপুর যেতে হবে—ক'খন ফিরব—তাত' জানিনে।

পার্ব্বতী চোখ দুটা গোল এবং বড় বড় করিয়া বলিল,—তাই নাকি? আমার ঘাট হয়েচে—আজকাল আর কেও কেটা নও। সন্ধ্যে বেলায় বাবুর সঙ্গে হাওয়া খেতে বার হওয়া হয়—সকালে জমিদারি তদারকে বার হওয়া হচ্চে—তাহার পর, ঘরের খুঁটি লক্ষ্য করিয়া বলিল,—এদিকে মিনসে তোর ঘরে যে ভাত নেই; তা' আমি কি দোকান খুলবো, সাতগুষ্টিকে পিণ্ডি দেবার জন্যে?

হরদয়ালের নিশ্চিত রাগ হইয়াছিল—তাই সে আর কথার কোন উত্তর না দিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার আগেকার স্ত্রীর কথা বারম্বার মনে আসিতে লাগিল। মানদা কোন দিন এমন উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি দেখায় নাই। বড় দুঃখ কষ্ট গিয়াছে, মুখটি বন্ধ করিয়া সে সব সহ্য করিয়াছে। একদিন একটা কড়া কথাও বলিতে জানিত না। যে ভাল সে থাকে না; ভগবান তাহ'কে ডাকিয়া লয়েন! একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—হরিহে সবই তোমার ইচ্ছে।

অতএব হরির ইচ্ছানুক্রমে পার্ব্বতী একটি লম্বা ফর্দ্দ দিল যাহার টাকার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও বৃদ্ধের হাতে ছিল না। কোথা হইতেই বা টাকার জোগাড় হয়—কেই বা তাহা করে। কিন্তু একথা প্রকাশ করিয়া বলিবার সাহস তাহার ছিল না। আমি কি মানদা, যে তখনি হাতের চুড়ি কয়গাছা রাখিয়া পাঁচটা টাকা আনিয়া দেয়।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া রামশঙ্কর যে ঘরে ছিল সেই ঘরে গিয়া ঢুকিল। রামের ঘুম ভাঙ্গিয়া ছিল; সে লম্বা হইয়া শুইয়া গৃহান্তরে বিমাতা ও পিতার কলহ শুনিতেছিল। সে শুইয়া শুইয়া রামায়ণের কথা ভাবিতেছিল—বিমাতার কলহ অতি নিদারুণ ব্যাপার—রামের মত সৌভাগ্যবান্ যুবরাজের কপালে বনবাস পর্য্যন্ত ঘটিয়া যায়—না জানি তাহার কপালে কি আছে! মোট কথা, হাট করিয়া আসিতে তাহার একেবারেই ভাল লাগিত না। কারণ সমস্ত সপ্তাহ তাহাকে কথা শুনিতে হইত। চোরের অপবাদ ত' ছিলই—আরো কত কি!

হরদয়াল ঘরে ঢুকিতেই রাম উঠিয়া বসিল। তার চোখ দুটি দেখিতে হরদয়ালের বড় ভাল লাগিত—মানদার স্নিগ্ধতা তাহাতে যেন জড়াইয়াছিল।

বৃদ্ধ বলিল, বাবা, তোমাকেই যে আজকের হাটটা ক'রে দিতে হবে। আমাকে বাবুর সঙ্গে কৈলেসপুর যেতে হবে, কতক্ষণে ফিরতে পারবো জানিনে ত'।

রাম মুখের ভাবটা এমন করিল যাহা দেখিয়া শত্রুরও দয়া হয়। কিন্তু উপায় ছিল না।

বৃদ্ধ জানিত যে পারতপক্ষে রাম তাহার অবাধ্য হয় না এবং বিমাতার তীব্র রসনার কথাও অবিদিত ছিল না। যখন একেবারে অসহ্য হইত তখন সে একটা কাণ্ড করিয়া বসিত। পার্ব্বতীকে সে কোন দিন অপমান পর্য্যন্ত করে নাই; কিন্তু অভিমানে সে নিজেকে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়া বসিত—যেন মনে হইত তাহার আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান পর্য্যন্ত নাই।

হরদয়াল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রামশঙ্করের জন্যই পার্ব্বতীকে ঘরে আনা। লোকে এই উপদেশই বিশিষ্টতে দিয়াছিল; কিন্তু তাহার নিজের মনে যে ভয়টা কাঁটার মত ছিল তাহাই মূর্ত্তি ধরিয়া তুমুল হইয়া উঠিল। পার্ব্বতী রামশঙ্করকে মানুষ করিতে বিশেষ সাহায্য ত' করিলই না; উপরন্তু এমন সকল গোলমালের সৃজন করিল যে সংসার অশান্তিময় হইয়া উঠিল। হরদয়াল এই সময়ে তাহার গুরুর শান্তমধুর মুখখানি মনের মধ্যে স্থাপিত করিয়া দুই হাত তুলিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—তুমিইত বলেছ শান্তি এ জীবনের নয়। কাজ করে যেতে হবে—আমরা চাষা ভূষো—তাই বুঝি। সব সয়ে নিতে হবে—উতলা হলে চলে কৈ?

তাহার পর পিতা পুত্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে পিতা পুত্রকে বলিল, আজ হাতে কিছু নেই, টাকা পাঁচেক ধার করতেই হবে। তার পর ওই খড়গুলো বিক্রী করে শোধ করতে হবে।

পুত্র সহজভাবেই বলিল, খড় বেচ্‌লে গাই-গরু খা

কি ? এত ভাদ্র মাসে তারা ত' একেই শুকিয়ে রয়েচে। নীল আকাশের দিকে চাহিয়া হরদয়াল বলিল—তার বড় দুঃখু থাক্‌বে না বাপু—বৃষ্টি না পড়লে ধান ফুটবে না,—এখন সবই গাং-গারর পেটে যাবে।

ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর কথা চিন্তা করিতে করিতে তাহারা ক্রমে গিয়া গ্রামের মহাজন বিঠ্‌ঠল দাস সাহুর দরজায় উপস্থিত হইল।

বিঠ্‌ঠলের পূর্ব্ব-পুরুষ সুদূর পশ্চিম দেশ হইতে আগত। গ্রামে তেজারতি ও মদের কারবার করা তাহার ব্যবসা। কোনদিনই অর্থের অসদ্ভাব ছিল না; কিন্তু কোন কাজেই তাহার ব্যয়ের স্বচ্ছলতা দেখা যাইত না। বিঠ্‌ঠলের একটা বংশগত সংস্কার ছিল; মা লক্ষ্মী ব্যয়ের আতিশয্য সহ্য করিতে পারেন না; তিনি ভক্তের পরীক্ষার জন্য তাহার মুষ্টি ভরিয়া দেন—যে সেটিকে দৃঢ়বদ্ধ রাখে সেই তাঁহাকে রাখিতে পারে—আলগা পাইলে তিনি যে কোন্ ফাঁকে অন্তর্হিত হন—তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না।

বিঠ্‌ঠল উঠিয়া রোয়াকের উপর বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। সপুত্র মোড়লকে দেখিয়া মনে মনে সে যথেষ্ট খুশী হইয়াছিল কিন্তু তাহার সাধনার সিদ্ধি ছিল তাই তাহা কোনক্রমেই মুখে প্রকাশ হইল না।

মোড়লের সময় বেশী ছিল না, তাই সে বিনা ভূমিকায় কঠোর বিষয়টির আলোচনা আরম্ভ করিল।

মোড়লের আবেদন শ্রবণ করিয়া সুদীর্ঘ টান সম্ভূত বিপুল ধূম অনায়াসে গিলিয়া ফেলিয়া বিঠ্‌ঠল বলিল,—টাকার এত টান যে কম সুদে কারবার একেবারে উঠিয়ে দেব মনে করচি। তা ছাড়া ঠিক কতদিনে শোধ করতে পারবে না বল্‌লে—টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না।

এই দুইটি কথাই হরদয়াল মনে মনে তোলা-পাড়া করিয়া তাহার জন্য বিশেষ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল; তবুও তাহার স্পষ্টাক্ষরে আবৃত্তি শুনিয়া তাহার মনটা কঠিন ধাক্কা খাইল। মানুষের দুর্ভাগ্য যে, নীচতাকে অন্তর হইতে ঘৃণা করিয়াও—সেই নীচতার দ্বারে তাহাকে বারম্বার পড়িতে হয়!

হরদয়াল গম্ভীর হইয়া বলিল, হাঁড়ি-কাঠে গলা ইচ্ছে ক'রে দিয়ে আর মরতে ভয় করলে চলে কৈ সাহুজী! সুদ তুমি যা বল্‌বে তাই দেব; কিন্তু টাকাটা পনর দিন না হয় এক মাসের মধ্যে শোধ করে দেব।

বিঠ্‌ঠল বলিল,—পনর দিন আর একমাস ত' এক নয়। ঠিক যে দুনো হলো। আচ্ছা যদি পনর দিনে দিতে পার ত সুদে আসলে ছ' টাকা দিলেই হবে আর যদি এক মাসে দাও ত' সাত টাকা—আর যদি তার চেয়ে দেরী হয়ত—ঐ রেট।

টাকাটা রামশঙ্করের হাতে দিয়া হরদয়াল রাজবাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। জমিদার-ভবনকে তাহারা রাজবাড়ী বলিত; প্রয়োজনে রাধুঁনি ব্রাহ্মণকে আমরা মহারাজ বলিয়া থাকি!

অবনীমোহন চা পান করিয়া নির্ম্মল হইবার চেষ্টার উপক্রম করিতেছিলেন। ঘড়িতে সবে মাত্র সাতটা বাজিয়াছিল। ড্রয়ার হইতে একটা মোটা বর্ম্মা সিগার বাহির করিয়া সেটা ধরাইয়া লইতে লইতে অন্য দেরাজ হইতে একখানা একশত টাকার নোট টানিয়া বাহির করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

মোড়ল সভয়ে প্রণতি করিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অবনীমোহন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন,—এই নাও গো—কাল তোমার বাহাদুরির বকসিস্—আরো কিছু ভেতর থেকেও [illegible]।

হরদয়াল বুকের মধ্যে একটা উৎকট ব্যথা অনুভব করিতে করিতে—সেইখানেই বসিয়া পড়িল। নিমেষের জন্য তাহার বুদ্ধির মধ্যে কেমন একটা জড়তা আসিয়া পড়িল। তাহাকে তখন বজ্রাহত বিটপীর ন্যায় লক্ষ্মী-ছাড়ার মত দেখাইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

গ্রহণ ও বর্জ্জন

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশগুপ্ত]

সম্প্রতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুইটি ভিন্ন আদর্শের সমন্বয় নিয়ে এক প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কেহ কেহ বলছেন—পাশ্চাত্য সাধনা যে মহাশক্তির বলে প্রকৃতির উপরও প্রভুত্ব স্থাপন করেছে প্রাচ্যকে সেই প্রবল শক্তির উপাসক হতে হবে; আর কাহারও কাহারও মত হচ্ছে প্রত্যেকে নিজ সাধনাতেই মগ্ন থেকে—নিজের নির্ম্মোকের মধ্যেই তৃপ্তহয়ে থাকতে হবে। দুটিই আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ দেশ প্রেমিকের কথা। সেই মহাত্মাদের একজন বলছেন—বিশ্বমানবের ঐক্য সাধনের পথে সর্ব্বজাতি সমন্বয়ের প্রয়োজন, সদ্ভাব ও মিলনের মধ্যে দিয়ে তা হবে, কাজেই তীব্র ভেদ নীতি এ সময়ে মূলে কুঠারাঘাত করবে; সেই জন্যই তিনি গ্রহণের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। আর একজন দেশপ্রাণ মহাপুরুষ যাঁর কথা সমস্ত ভারত আজ বিনা আপত্তিতে মেনে চলেছে, তিনি বলছেন—জগতে পাশ্চাত্য সভ্য[illegible] এখনও প্রাচ্য দুর্ব্বল জাতিকে উৎপীড়িত ক[illegible]প্রবল শক্তি প্রতিষ্ঠার নেশায় ভরপুর, ভারতবর্ষও [illegible] দুর্ব্বল জা[illegible]র একটি বলে জগতের যজ্ঞ[illegible]লায় [illegible] অপাংক্তেয়; তার প্রাচীন সভ্যতা ও প্রতিভার [illegible] এখন শুধু প্রত্নতত্বের গর্ভে। অন্যান্য জাতির চোখে [illegible] ঘৃণ্য ও কৃপার পাত্র; তাই ভারতকে প্রথমে আত্ম[illegible]ষ্ঠ হতে হবে, সেই জন্য তার প্রয়োজন হচ্ছে পা[illegible]চাত্য বর্জ্জন। প্রথমোক্ত মহাপ্রাণের কথায় আছে [illegible]ক উদার বিশ্বপ্রেমিকতা আর শেষোক্ত মহাত্মার প্রাণে জেগেছে একটা সংযত দেশাত্ম বোধ। তিনি বলছেন—পাশ্চাত্যের প্রবল জাতিরা আমাদের এমন ঘৃণা করছে, এমন পদদলিত করে রাখতে চায় এবং আমাদের মনুষ্যত্বের অবমাননা করে কুকুর শৃগালের মত বর্শার খোঁচার ভয় দেখিয়ে শাসিত করতে চায়; [illegible] আমরা চাই না। আমরা ওসব বর্জ্জন করব। কারণ আত্মসাহায্যেই পূর্ণ সাতন্ত্র্যের লাভ হবে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা এই শূদ্রত্ব মোচন হলে ব্রাহ্মণের অধিকার লাভ করে ভারত আপনিই বিশ্ব যজ্ঞ সভার সম্মানের আসন—হোতার অধিকার লাভ করতে পারবে। কিন্তু এই দুই মহাপ্রাণ ভিন্ন আর যাঁরা জীবনের অভিজ্ঞতা ও সহজবুদ্ধির সাহায্যে এ সমস্যার একটা সমাধান করতে চাচ্ছেন, তাঁরা বলেন—গ্রহণ ও বর্জ্জন উভয়েরই প্রয়োজন, শুধু গ্রহণের দিক দিয়ে গেলেও ভারত কিছু নিজের প্রাণধর্ম্মকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না, আবার শুধু বর্জ্জনের দ্বারাও তার প্রাণের সকল রূপ ভাস্বর মূর্ত্তিতে ধরা পড়বে না। সুতরাং আসল কথা দাঁড়াচ্ছে কেমন ভাবে বর্জ্জন করতে হবে এবং কতটাই যে গ্রহণ করতে হবে।

এই সমস্যা এতটা জটিল হয়ে পড়েছে তার কারণ পূর্ব্বোক্তদল ধরে নিয়েছেন এই বর্জ্জন পন্থীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা-দীক্ষার বিরোধী। কিন্তু আসলে তাহা সত্য নয়, পাশ্চাত্যের যে জ্ঞান গরিমা যে কর্ম্মশক্তির শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে গড়ে তুলবার সহায়তা করে, তার বিরোধী কেউ হতেই পারে না বা হবেও না। মহাত্মা ত স্পষ্টই বলেছেন "আমি পাশ্চাত্য সভ্যতা বা জ্ঞান বিস্তার বিরোধী নই, তবে তার অনিষ্টকর প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা পেতে হবে।" এ কথা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে। তবে যদি পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার বিরোধী কেউ থেকে থাকেন তিনি তাহলে মস্ত ভুল করে বসেছেন। তাই বোধ হয় কবিবর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'ভারতকে' পৃথিবীর সকল জাতির সহিত শিক্ষা-দীক্ষা বিষয়ে সহযোগিতা করতে হবে। এ খুব বড় আশা। কিন্তু সহযোগিতা কি কেবল একদিক দিয়েই হবে? আদান প্রদান না হলে তাকে সহযোগিতা

বলে না। সেই জন্যই পাশ্চাত্যের চোখে প্রাচ্যকে সমান দরের মানুষ হতে হবে, এতে চাই স্বাবলম্বন এবং পাশ্চাত্যের অনুচিকীর্ষাজাত, আত্মঘাতী শিক্ষার বর্জ্জন। সুতরাং গ্রহণ ও যেমন প্রয়োজন, বর্জ্জন তদপেক্ষা অল্প নয় এবং বর্জ্জন আগে পরে গ্রহণ। ঠিক এই পদ্ধতির অনুসারে চলে যখন আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পারব, তখনই সাম্যমৈত্রীর ধ্বজা নিয়ে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রেমের রাসলীলায় যোগদান করতে সমর্থ হবে।

পুরাণে আছে একবার স্বর্গে কথা উঠেছিল—শ্রোত্রীয়ের অশ্রদ্ধার দান বড় না চণ্ডালের শ্রদ্ধার দান বড়। কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্য লুকান আছে। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর ইন্দ্রের সভায় এই স্থির হল চণ্ডালের শ্রদ্ধার দানই বড়। পাশ্চাত্যের উন্নত জাতিরা প্রাচ্যের তুলনায় শ্রোত্রীয়ের আসন পেতে পারেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে যতদিন তাঁরা প্রাচ্যকে ঘৃণার চোখে দেখছেন ততদিন তাঁদের শিক্ষা দীক্ষা প্রাচ্যের গ্রহণ করা অপমান জনক। স্বীকার করি যে দুর্জ্জয় শক্তির বলে উাহারা দৈনন্দিন জীবনকে সহজ সরল করে তুলেছেন, যে মণীষা-সঞ্জাত বিজ্ঞান কৌশলে তাঁহারা গগনবিজয়েরও স্পর্দ্ধা করেছেন এবং যে অদ্ভুত কলকারখানার সাহায্যে দূরকে নিকট—জটিলকে সরল করে নিয়ে ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেছেন, তার সাধনা প্রাচ্যের করতেই হবে, তবে সেটা সংযমের সঙ্গে সঙ্গে। কারণ গ্রহণ জিনিষটা জীবন-ব্রতের একটা পরাণ স্বরূপ, বর্জ্জন তার সংযম।

তাই কবিবর রবীন্দ্রনাথ যখন বল্লেন—প্রাচ্যের সাহায্য ছাড়া পাশ্চাত্য অসম্পূর্ণ, প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের সাহায্য না নিলে পঙ্গু; তখন কথাটা কাউকেই বড় বেশী সাড়া দিলে না। কারণ কথাটা যদিও কবিবরের অনুপম ভাষা সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে লোকচক্ষুর সম্মুখে নববধূর মত তার ঘোমটা খুলেছিল, তবু লোকের তাতে চমক লাগেনি, যেহেতু সে রূপ অনেকদিন দেখা হয়ে গিয়েছে সুতরাং নূতনত্ব-হীন একেবারে পুরাণো। তবে একথাটা প্রচার করবার কি প্রয়োজন? প্রয়োজন একটা আছে। সেটা এই, এতদিন ধরে শিক্ষিত ভারতবাসীর ধারণা ছিল শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে পাশ্চাত্যের সভ্যতা, জ্ঞান, বুদ্ধি সব খানি আত্মসাৎ করা এবং সে বিষয়ে যিনি যতটা অগ্রসর হতে পারতেন তিনি আপনাকে ততটা শিক্ষিত বলে গণ্য করতে চাইতেন। কিন্তু মহাত্মার বর্জ্জননীতিতে এই আত্মাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে, কারণ মহাত্মাজী যে শুধু পাশ্চাত্যের এই আমলাতন্ত্রী শাসন বিধির বিরোধী তাই নয়, বরং তিনি [illegible] চাইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার এবং কাজে কাজেই পাশ্চাত্যের বাহিরের চাকচিক্যের বর্জ্জনেরই অধিকতর পক্ষপাতী। পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও শিক্ষা মানুষের মনে জড় দেহটার উপরই সমস্ত আসক্তি এনে ফেলে, দেহের পশ্চাতে যে আত্মার প্রতিষ্ঠান তার সংবাদ সে চায় না; জড়বাদ মনুষ্যসমাজে প্রচণ্ড উন্মাদনা জাগ্রত [illegible] ও নৈরাশ্যজনিত অবসাদ আনতে বাধ্য। এইজন্যই মহাত্মা গান্ধী বল্‌ছেন—জড়ের পিছনে আর কত ছুটবে, যে সভ্যতা জড়বাদকে নিয়েই তৃপ্ত তাকে বর্জ্জন করে আত্মাকে চেনো এবং আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে চিদানন্দের মাঝে জীবনটাকে সুন্দর ও সরল করে নিয়ো।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইহাই এখন আমাদের সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে পাশ্চাত্যের বিলাস-মোহ প্রাচ্যকে [illegible] আত্মহারা করে ফেলেছে, এতে করে আমাদের [illegible] জীবন কতটা পঙ্গু হয়ে পড়েছে। কারণ আর কিছুই নয় কেবল পাশ্চাত্যের সৎশিক্ষা লাভ করতে গিয়ে আমরা [illegible] তার বিলাস-লালসা-পরতন্ত্রী সভ্যতাকেও সমূলে [illegible]সাৎ করতে চেয়েছি। ফল হয়েছে আমরা পাশ্চাত্যের চাল চলন আদব কায়দা সব হজম করে নিতে গিয়ে ইংরাজ নামধারী এক অদ্ভুত জীবে পরিণত হয়েছি। তাই মনে হয় যে বর্জ্জনের দিক দিয়ে গ্রহণের ব্যবস্থাই যুক্তিসঙ্গত, কারণ তখন নীরভাগ টুকু বর্জ্জন করতে করতে ক্ষীরটুকুই থেকে যাবে, আর যদি গ্রহণের পথ ধরে অগ্রসর হই, তা হলে ক্ষীরের সঙ্গে নীরও এসে পড়বে। এটা খুবই ঠিক কথা নিয়মের গণ্ডী কাজের সময় ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। আসলে মানুষ জড়দেহটারই উপাসক, জড়দেহটার পিছনে যে

চিদানন্দের ধাম আত্মা রয়েছে তাহা তার লক্ষ্য থাকে না। তাই পাশ্চাত্য যখন তার কর্ম্মমুখী শিক্ষা ও বিলাসতন্ত্রী সভ্যতা নিয়ে ভারতে এসেছিল, ভারত সাদরে গ্রহণ করলে তার বিলাস, তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তির লালসা, কিন্তু যে শিক্ষা পাশ্চাত্যকে কর্ম্মী সচল উদ্দাম প্রাণ সঙ্গীতে ভরপুর জীবন পূর্ণ করে তুলেছে তাহা গ্রহণ করতে ভারতের লোকে তত অগ্রসর হয়নি। তখন ভারতকে গ্রহণের পথই কেবল দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, বর্জ্জনের মধ্য দিয়ে যে প্রাণধর্ম্ম বিকশিত পুষ্পিত করে তোলা যায় তাহা তখন আমরা কোথাও শুনিনি। ইহার ফল হয়েছে ভীষণ আত্মঘাত সাধক, কারণ বাহিরের পরাধীনতা যাহা করতে পারত না, মনের পরাধীনতা তাই করেছে। আমরা স্বাধীন চিন্তা করবার শক্তিও হারিয়ে একরকম নকল ইংরাজ হবার চেষ্টা করে এসেছি। আমরা পাশ্চাত্যের সবটুকুই এতকাল প্রসংসার চক্ষে দেখে এসেছি, এবং তাই সেই সভ্যতাকে ভারতে প্রবর্ত্তিত করবার প্রাণপণ প্রয়াস পেয়েছি। এইখানেই বর্জ্জন নীতির সার্থকতা। এই নূতন শিক্ষার ফলে ভারত বুঝতে পারছে পাশ্চাত্য স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া সে এখন কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে। তার জীবনতরী এখন যে তীরে লাগিয়াছে সেখানে শুধু কাঁটাবন, এবং যে সময়ে সে [illegible]য়াছে তখন অন্ধকার-গভীর রাত্রি। সেই অন্ধতম[illegible] নিশীথে সেই কাঁটাবনের মাঝে ভারতের প্রাণ হুতাশে কাঁদিতেছিল; সহসা দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করে এক প্রচণ্ড দীপশিখা দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র[illegible] নির্গত মহাবাণী কাণের মধ্য দিয়া মরমে পশিল—"ফিরে এসো, ফিরে এসো, আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।" সেই সত্যবাণীই মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠনিঃসৃত বর্জ্জনের আদেশ। তিনি বলছেন—বুঝতে পেরেছ ভারতবাসী, তুমি কোথায় এসে পড়েছ; যে লৌহশৃঙ্খলে তোমায় বেঁধে রেখেছে সে বন্ধন ছিন্ন কর, যে মোহ যবনিকা তোমার চোখ আড়াল করে রেখেছে, তাকে দূরে সরিয়ে দাও, নিজের জাতীয়তাকে চেনো, তোমার জাতীয় শিক্ষা দীক্ষাকে জীবনে ফুটিয়ে তোলো, তারপর আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়ে সংযত মনে জীবনবীণায় পাশ্চাত্যের কর্ম্মসঙ্গীত ঝঙ্কৃত করো। সমগ্র পাশ্চাত্যের বুকের উপর দিয়ে যে ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা প্রকটিত হলো, তাতে কি বোঝোনি পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল্য কতটুকু।

কবিবর রবীন্দ্রনাথও বলেছেন প্রাচ্য শিক্ষার সার্থকতা আছে, কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর বড় বেশী জোর দিয়েছেন। পূর্ব্বের কোনও বক্তৃতাতেই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি এতটা পক্ষপাতিত্ব দেখান নি। সম্প্রতি তিনি পাশ্চাত্যে দেখে এসেছেন তাদের অলৌকিক বিজ্ঞান প্রতিভা যার সোনার কাঁঠির স্পর্শে রূপকথার মত প্রকৃতির রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হয়ে গেছে, তাতে তিনি নির্ব্বাক বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন—"পাশ্চাত্য প্রকৃতির উপরও আপন অধিকার বিস্তৃত করেছে, তাই জীবনের স্রোতে সে সবার চেয়ে অগ্রসর।" কিন্তু এ কথা কি আমাদের মনে জাগে না, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান কৌশল ধ্বংসের পথ প্রস্তুত করবার জন্যই তার অনেকটা শক্তি নিঃশেষ করেছে, তাই জীবনের যে স্রোতে পাশ্চাত্য অগ্রসর হচেছে তাতে আছে কেবল শবদেহের সন্ধানে শকুনির লোলুপ দৃষ্টি।

যে নোবেল পুরস্কার প্রদানে কবিবরকে বিশ্বের সাহিত্যিকরা তাঁদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করেছেন, সেই নোবেল সাহেব ছিলেন বিস্ফোরক দ্রব্যের আবিষ্কর্ত্তা। তিনি এই দ্রব্য আবিষ্কার করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই ভুল ভাঙ্গতে বেশী দিন অতীত হয় নি। যে অদ্ভুত আবিষ্কারে জগতের কত উপকার সাধিত হতে পারত; রেলপথ নির্ম্মাণ করে, প্রণালী খনন করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে কত সরল সুন্দর সহজ করে তোলা যাহার দ্বারা সম্ভব হয়েছে, তাকেই আবার নিযুক্ত করা হয়েছে ধ্বংসের সহায়তা করতে। বস্তুত ইহার দ্বারা মানুষের এত অনিষ্ট করা হয়েছে, তার জ্ঞান পিপাসা পরিতৃপ্তির পথে এত বাধা এনে দিয়েছে যে এখন এটা হৃদয়ঙ্গমকরা মোটেই কঠিন নয় বিস্ফোরক পদার্থের উদ্ভাবনে জগতে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী সাধিত হচ্ছে। একথা নোবেলের মনেও জেগেছিল। তাই তিনি তাঁর আজন্ম সঞ্চিত অর্থ বে[illegible]

কয়টি পুরস্কার প্রদানের জন্য ব্যয় করতে বলে গিয়েছেন, তার সব কয়টিই জগতে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য, মানুষের মনকে উচ্চ চিন্তার সুরে বেঁধে রাখতে, প্রাণে বিশ্বের মঙ্গল সাধনে তার ইচ্ছা ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পেয়েছে। ঠিক এই কথাই বোধ হয় শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও জেগেছিল; তাই তিনি কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বলিয়ে ছিলেন—"তোমার বিজ্ঞান আমার জীবনে কতটুকু সুখ উৎপাদন করিল।" উত্তরে বলিব সৌখীনতা আনিলেও সুখ আনে নাই। কারণ এই রজঃপ্রকৃতি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান আমাদের দিয়াছে একটা প্রচণ্ড চঞ্চলতা, একটা অতৃপ্ত দ্বন্দ্ব, একটা অশান্ত কোলাহল।

স্বীকার করি মানুষের মনোজগতে প্রাচ্যের জ্ঞান, পাশ্চাত্যের জ্ঞান বলে কোনও পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ নেই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে ঐ জ্ঞানের ব্যবহার নিয়ে। জ্ঞান জিনিষটা সার্ব্বজনীন কিন্তু ব্যবহার ভেদে এটা ভাল কি মন্দ, প্রাচ্যের কি পাশ্চাত্যের হয়ে পড়েছে। আসল কথা আমরা মানুষের বিচার বুদ্ধিকে খুব উপরে স্থান দিয়ে চরিত্রকে অনেক নীচে নামিয়ে এনেছি, কেবল মানুষের ক্ষমতার দিকটা বড় করে দেখিয়ে তার হৃদয়ের রূপটি অবগুণ্ঠনে ঢেকে রাখতে চেয়েছি। এ কথাটা না বুঝতে পেরেই আমরা আমাদের যত অমঙ্গলকে বরণ করে নিয়েছি।

তাই মহাত্মা গান্ধী তাঁর দিব্যদৃষ্টি নিয়ে আমাদের সম্মুখে এসে বললেন—হৃদয় আগে তার পর মস্তিষ্ক। কেউ কি জানেনা বা বুঝেনা কল কারখানার কাছে চরকা প্রতিযোগিতায় বেশী দূর যেতে পারবে না, তবে তিনি চরকার মাহাত্ম্য এত জোরের সঙ্গে প্রচার করছেন। তার কারণ তিনি বোঝাতে চাইছেন মানুষ যে বিজ্ঞান কৌশলের গর্ব্ব করে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করেছে, সে বিজ্ঞানকৌশল ভ্রান্তপথে চলে মানুষের শান্তি আনতে পারেনি। পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী প্রভাবে এই সব কলকারখানা মানুষের হৃদয়কে ছাপিয়ে উঠেছে। তাই তিনি প্রতিবাদ স্বরূপ প্রাচীন চরকার পদ্ধতিতে ফিরে গিয়ে বোঝাতে চাইচেন মানুষের হৃদয় প্রতিভার চেয়ে বড় জিনিষ, সেই হৃদয়ের প্রীতি মানুষের প্রতিভাসঞ্জাত বিজ্ঞান কৌশলের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা একথাটা মানেনি বলেই তার এত অশান্তি। তাই মহাত্মা চেয়েছেন হৃদয়কে প্রথম স্থান দিতে, তারপর শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই। কারণ যতদিন মানুষ হৃদয়কে বাদ দিয়ে কেবল প্রতিভার সৃষ্টির পিছনে অশ্রান্তভাবে ছুটবে এবং প্রকৃতির উপর কে কতখানি জয় বিস্তার করেছে তাই নিয়ে মনুষ্যত্বের বিচার করবে, ততদিন সংসারে শান্তি আসতে পারেই না, সে প্রাচ্যেই হ'ক কি—পাশ্চাত্যেই হ'ক।

বিশ্বে সে শান্তির যুগ ফিরিয়ে আনতে হলে এখন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় হচ্ছে হৃদয়বধূর অবগুণ্ঠন খুলে তার সমগ্র রূপের পরিচয় নেওয়া। কারণ হৃদয়কে বড় বলে না জানলে বিজ্ঞানকৌশল মানুষের উপকারে না এসে অপকারই সাধন করবে। মহাত্মা গান্ধীর দিব্য দৃষ্টি এইখানেই, যেহেতু তিনি এই কথাই মানুষের মনে জাগিয়ে দিতে চাইছেন। তাই মহাত্মা বর্জ্জনের অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেশকে হবিঃপূত করে নিতে অগ্রসর হয়েছেন। এই বর্জ্জননীতিই পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যের নিকট [illegible]ভাবে নিয়ে আসবে, কারণ একথা ঠিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সত্য মিলন যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তবে পাশ্চাত্যকে অনেকখানি স্বার্থত্যাগ করে পবিত্র সখ্যে প্রাচ্যের কাছে দাঁড়াতে হবে—ভৃত্যে প্রভুতে ত আর মিলন হয় না—পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করতে হলে এই বর্জ্জনই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। বিরহ যেমন মিলনের পূর্ব্ব রাগিণী, তেমনি আজিকার এ বর্জ্জন ভবিষ্যতের গ্রহণকে পবিত্র ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিবে, কারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে কোন প্রকারের মিলনের চেয়ে মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠ ও পূতস্বভাব হওয়া আরও বড় কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

পরলোকতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মহৎলাভ যাহা এই চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির কার্য্যাবলী হইতে দাঁড়াইবে তাহা হইতেছে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন।

অতীন্দ্রিয় জগতের তত্ত্ব লইয়া ধর্ম্মের কারবার Intuition বা অধ্যাত্মবোধ ইহার যন্ত্র; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ-তত্ত্ব লইয়া বিজ্ঞানের কারবার, Reason বা বিচারবোধ উহার যন্ত্র। বিশ্বাস ধর্ম্মের মূলমন্ত্র; প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র। ধর্ম্মের কাছে অধ্যাত্মজগৎই সার ও নিত্য সত্য; বিজ্ঞানের কাছে জড়জগৎই সার ও নিত্যসত্য। ধর্ম্মের কাছে জড়তত্ত্বালোচনা বৃথা-বিজ্ঞানের কাছে অধ্যাত্ম আলোচনা শক্তি ও সময়ের অপব্যয় ও জ্ঞানের অপব্যবহার।

অথচ সকলেই কম বেশী এটা অনুভবে বুঝিতে পারেন যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান দুইটী অতি সত্য জগতের রহস্য মীমাংসার চেষ্টা। পুরামাত্রায় মিথ্যা বা ভ্রান্ত কেহ নয়। তথাপি আবহমান কাল হইতে এই দুই শাস্ত্রে বিরোধ ও দলাদলি। বিজ্ঞান যখন শিশুমাত্র তখন ধর্ম্মরূপী কংস তাহাকে টীপিয়া মারিবার কি চেষ্টাই না করিয়াছে। কত শত সত্যানুরাগী মহাপুরুষকে বিজ্ঞানের তরে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল! আবার বিজ্ঞান যখন বলদৃপ্ত যুবাপুরুষে পরিণত হইল তখন বৃদ্ধ গলিত নখদন্ত ধর্ম্মকে তাহার কিরূপ মন যোগাইয়া চলিতে হইতেছে তাহাও দেখা যাইতেছে। প্রথম অসহায় অবস্থায় বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের ছাপ লইয়া বাহির হইতে হইত; এখন বৃদ্ধ অসহায় ধর্ম্ম তার জীর্ণ পুরাতন তত্ত্বগুলিকে বিজ্ঞানের ছাপ দিয়া বাজারে বজায় রাখিতে সচেষ্ট। বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও প্রেক্ষণের দাপটে ও প্রত্যক্ষপ্রমাণের জবরদস্ত তাগাদার চোটে প্রাচীনকালের শাস্ত্রীয় স্বেচ্ছাতন্ত্র সাকার ঈশ্বর পর্য্যন্ত সিংহাসন ছাড়িয়া অদ্বৈতবাদের absolute বা ব্রহ্মের পশ্চাতে অদৃশ্য!

চিৎতত্ত্বানুসন্ধানের আবিস্কৃত নূতন তথ্যের আলোকে মানুষের এই সনাতন বিশ্বাসগুলি কিরূপ দাঁড়ায় বিবেচনার বিষয়। ঈশ্বর, পরকাল, জীবাত্মার অমরত্ব ও জন্মান্তর এই চারটী হইল ধর্ম্মের চারটী স্তম্ভ। প্রথম তিনটী প্রধান ধর্ম্মগুলির আসল অবলম্বন। জড়বিজ্ঞানবাদ এই সবগুলিকেই ঘোর কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিলেও, চিরকাল সর্ব্বত্রই ধর্ম্মবেত্তারা, শাস্ত্র বক্তারা ও মুণিঋষিরা এই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন—এই সব তত্ত্ব তাঁহাদের দিব্যজ্ঞানলব্ধ ছিল; এই সকল তত্ত্বের সত্যতা তাঁহারা অলৌকিক উপায়ে জনসাধারণের কাছে পতিপন্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক যাহার সম্বল ও আশ্রয় ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষজ্ঞান তাহার কাছে দিব্যজ্ঞান বা অলৌকিক শক্তি মিথ্যা বা মায়া ঘটিত।

কিন্তু সেই বৈজ্ঞানিক এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে অলৌকিক বলিয়া কিছু নাই; প্রকৃতির রাজ্যে যা অব্যক্ত ইন্দ্রিয়শক্তির বাহিরে তাহাই অলৌকিক বা অব্যক্ত-লৌকিক। অতীন্দ্রিয় উপায়ে চিত্ত হইতে চিত্তান্তরে ভাব প্রেরণ, দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ, ভবিষ্যদর্শন, মায়াবীরূপদর্শন, অশরীরীর সজ্ঞান সম্ভাষণ; অমূর্ত্তের মূর্ত্তিধারণ, অলৌকিক উপায়ে দ্রব্যাদির চলাচল, আবির্ভাব তিরোভাব আর magic (যাদু) witchery

(ডাইনিবিদ্যা) নহে; স্বার্থপর পাদরিপুরুষের জুয়াচুরী নহে—এসব প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষিত সত্য।

সুতরাং যখন লৌকিক অলৌকিক ভেদ রহিল না; প্রাকৃত অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত বলিয়া ঘটনার জাতিবিচার করা যায় না তখন শাস্ত্র কথিত ঈশ্বর, পরকাল আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিচার বুদ্ধিতে কতটা সম্ভব ও গ্রাহ্য বিবেচনা করা উচিৎ।

সমস্ত সৎ শাস্ত্রেই ঈশ্বর সম্বন্ধে সর্ব্বোচ্চ ধারণা কি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদি অজ ও অনন্ত কারণ স্বরূপ চিন্ময় পরমাত্মাই ঈশ্বর। আমরা বিচার বা যুক্তিবলে এইরূপ এক অখণ্ড অব্যয় চিন্ময় পরমাত্মার সাক্ষাৎ পাই কি না দেখা কর্ত্তব্য।

যুক্তি তর্কের পথদিয়া সত্যানুসন্ধানে যাইতে হইলে জানা হইতে অজানায় অগ্রসর হওয়াই সমীচীন। দেহ ও আত্মা লইয়া জীব। জীবের দেহ জড় পরমাণুর সংঘ মাত্র। এই সব পরমাণু পৃথিবী, জল, বাতাস হইতেই পাওয়া যায় এই হিসাবে জড় দেহটা পৃথিবীর জড়পিণ্ড হইতে উৎপন্ন, এবং বিশ্বস্থ বাকি সমস্ত জড় রাশির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ও এক; আমাদের আপাতঃ প্রতীয়মান ভেদটা মায়িক; সত্য নহে। সমুদ্রবক্ষের উপর ঢেউগুলা যেমন আপাতঃ দৃষ্টিতে ভিন্ন, কিন্তু আর এক দিয়া একসঙ্গে যুক্ত; পৃথিবীর উপর অসংখ্য জীবও তেমনি একভাবে পরস্পর ভিন্ন হইলেও মূলতঃ অবিচ্ছিন্ন। আত্মাও তেমনি কতকগুলি শক্তির organised সমষ্টি মাত্র, আর এই শক্তিগুলি পৃথিবীর শক্তিভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত। জড় ও শক্তি পরস্পরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যমান, এক অপর হইতে স্বতন্ত্রভাবে থাকিয়া ক্রিয়াশীল, এমন দেখা যায় না; কাজেই বিশ্বের সমস্ত জড়রাশি সমস্ত শক্তির সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্ত্তমান, আমাদের, দেহগুলা যদি বিশ্বের জড়ভাণ্ডার হইতে উৎপন্ন হয়, আমাদের প্রাণ ও চৈতন্য ও তেমনি বিশ্বের প্রাণ ও চৈতন্য ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত ইহা অনুমান অসঙ্গত নহে। পৃথিবীর ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ জীবের যদি একটা চিন্ময় আত্মা থাকে তাহা হইলে মাতৃস্থানীয়া পৃথিবীর ও যে একটা আত্মা নাই ইহা কি সম্ভব ও সঙ্গত? আপত্তি হইতে পারে—'জীবচৈতন্য মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া প্রকট ও ক্রিয়াশীল, পৃথিবীচৈতন্যও তেমনি একটা মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া প্রকট হইবে কিন্তু এরূপ পৃথিবী মস্তিষ্কের অস্তিত্বের প্রমাণ কই? উত্তরে বক্তব্য এই যে চৈতন্যের বিকাশের জন্য যে মস্তিষ্কই প্রয়োজনীয় সর্ব্বক্ষেত্রে তাহার প্রমান কি? আমাদের দেহটা অসংখ্য জীবাণুর (cell) সংঘ মাত্র। প্রত্যেক জীবাণুটা প্রাণময় এবং কিছু পরিমাণে চৈতন্যময়। ক্ষুদ্রতম জীবকোষাণুর সহিত জীবদেহের যে সম্বন্ধ, জীবের সহিত পৃথিবীরও সেই সম্বন্ধ। একটা জীবকোষাণুর পক্ষে সমগ্র দেহ চৈতন্যের ধারণা যেমন অসম্ভব, আমাদের কাছে পৃথিবীচৈতন্যের ধারণাও অসম্ভব। এই রূপে ইহাও অনুমান করা সঙ্গত যে অসংখ্য সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ দের সমষ্টিতে বিরাট পুরুষের দেহ। উহারা যেন বিরাটের বিশালদেহের কোষাণুস্থানীয়। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে পরমাণু হইতে বিরাট পর্য্যন্ত কি দেহ কি চৈতন্য উভয় দিক দিয়াই একটা অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ধারা চলিয়া গিয়াছে। এই অন্তহীন অনাদি বিশাল বিশ্বটা যেন ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যময় দেহ আর ভগবান নিজে যেন তাহার অন্তঃস্থ পরমাত্মা।

All are but parts of one Stupendous whole
Whose body nature is and God the soul.

অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড জীবের মধ্যে যে ভেদ বা অমিল বা বিরোধ তাহার মীমাংসা হয় যখন আমরা উহাদিগকে এক বৃহত্তর সত্তার অংশ বলিয়া জানি। খণ্ডকে খণ্ডের দিক দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে দেখিলে তাহার অস্তিত্ব অর্থহীন, উহাদের মধ্যে ভেদ মা[illegible] দিয়া দেখিলে তাহার [illegible]কে অর্থযুক্ত দেখি, তাহাদের মধ্যে সমস্ত বিরোধের সামঞ্জস্য দেখি।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই যে ধারণা অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরস্থ চিন্ময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা[illegible]য়। তাহা হইলে একটা আপত্তি উঠিতে পারে এই বলিয়া যে জীবের এই যে Evil বা দুঃখ যন্ত্রনা ইহার মীমাংসা কি করিয়া হয়? যিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ বিশ্ববিধাতা তাঁহার শাসনে জীব দুঃখ যন্ত্রনা সহ্য করে কেন? তার এ অসম্পূর্ণতা এ সসীমতা, অক্ষমতা কেন বা কোথা হইতে? জীবের দুঃখ কষ্টে কোন সহমর্মী

ভাগবৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় ? এই সমস্যা মীমাংসায় আমাদের analogy বা সাদৃশ্য তুলনার আশ্রয় লইতে হইবে। খণ্ড জীবকে স্বতন্ত্র ও Self-contained ভাবিলে ইহার উত্তর পাওয়া কঠিন ; কিন্তু খণ্ড জীবের সহিত অখণ্ড বিরাটের সত্য সম্বন্ধ বুঝিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে। খণ্ডের অস্তিত্ব বিরাটের অস্তিত্বের সহিত অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আমাদের দেহ কোটী কোটী জীবকোষাণুর সমষ্টিতে গঠিত দেহের মঙ্গলের জন্য এই অসংখ্য জীবকোষাণু জন্ম বৃদ্ধি লয়ের বশীভূত। সমগ্র দেহের মঙ্গলের জন্য উহাদের আংশিক ধ্বংস প্রয়োজন। কোষাণুর দিক দিয়া দেখিলে তাহাদের অমঙ্গল, কিন্তু দেহের দিক দিয়া দেখিলে তাহাদের ধ্বংসের সার্থকতা আছে। কোটী কোটী খণ্ড জীবের জন্ম বৃদ্ধি ও লয়ের ভিতর দিয়া অখণ্ডের পূর্ণবিকাশ ; কালের ভিতর দিয়া দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি, অথচ কাজ মানে লক্ষ লক্ষ লাল রক্তকণার ধ্বংস ও ক্ষয় ; এক উচ্চতর মহান উদ্দেশ্যের অভিমুখে বিশ্বের এই অভিব্যক্তির ধারা ছুটিয়াছে, আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই অসংখ্য কোটী খণ্ডের আত্মবলিদান। জগতের ধারাই এই।

তারপর আর একটা কথা বিবেচ্য। ধ্বংস বলিতে আমরা আত্যন্তিক বিষয় ভাবিলেই এই সমস্যা কঠিন হইয়া উঠে। যাহাকে আমরা ধ্বংস বলি তা আত্যন্তিক ভাবে পরিণতি নহে ; পরিবর্ত্তন মাত্র। খণ্ডের ঐ ভাবে ধ্বংস নাই ; যাহা নাই তাহার অস্তিত্ব, যাহা আছে তাহার আত্যন্তিক বিলয় বলিয়া কিছুই নাই। কেবল এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি। দুঃখ বা যন্ত্রণা এই পরিবর্ত্তনেরই একটা পদ্ধতি মাত্র। সুতরাং জীবের এই আপাতঃ প্রতীয়মান অমঙ্গল সত্যই অমঙ্গল নয় ; মঙ্গলেরই রূপান্তর মাত্র। বিরাটের জন্যই খণ্ডের অস্তিত্ব, তথা উহার অস্তিত্বের কোনো হেতু নাই ; কাজেই এ সসীম অস্তিত্বের যা condition তা খণ্ডকে মানিতেই হইবে।

এই যে বিশ্বাত্মারূপী ভগবান ইনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের ভিতর দিয়া ব্যক্ত হইলেও জগতের সহিত coexistent ও coextensive নহেন ; ইঁহার একপাদ বিশ্বানুগ immanental এবং ত্রিপাদ Transcendental বা বিশ্বাতিগ। আমাদের জীবচৈতন্যের যেমন অংশমাত্র প্রকট, Supraliminal এবং অধিকাংশ, সুপ্ত Subliminal অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের বাহিরেও বিদ্যমান; তেমনি পরমাত্মাচৈতন্যও একাংশ বিশ্বের ভিতর প্রকট Supralimnial বাকী তিনঅংশ সুপ্ত বা Subliminal। পরমাত্মার বিশ্বানুগ অংশটী মানুষের reason দ্বারা ধ্যেয় ও জ্ঞেয় ; এবং তাঁহার বিশ্বাতিগ অংশটী মানুষের দিব্য দৃষ্টিতে intuition এ গ্রাহ্য। বিশ্বানুগ রূপে তিনি সগুন, বিশ্বাতিগভাবে তিনি নির্গুন। বিশ্বানুগ অংশটী দেশ ও কালে বদ্ধ হইয়া নামরূপ ধরিয়া লীলা হয়। বিশ্বাতীগ অংশটী লালীর বাহিরে স্ব স্বরূপে বিদ্যমান।

মানুষের বেলায় আমরা প্রমাণ পাইতেছি যে তাহার আত্মা দেহনাশে স্বতন্ত্র ভাবে সজ্ঞান অবস্থায় থাকিতে পারে ; ইহারই সদৃশ তুলনায় আমরা ধারণা করিতে পারি যে ভগবানের লীলাময় বিশ্বানুগ (immanental) অংশটী বিশ্বপ্রলয়ান্তে লীলা সংহার করতঃ স্বরূপে অর্থাৎ বিশ্বাতিগ অংশের সহিত এক ও সবিচ্ছেদ ভাবে বিদ্যমান থাকিবে।

> Though earth and man were gone
> And suns and universes ceased to be
> And thou were left alone
> Every existence would exist in thee !
>
> (E. Bronte)

অভিসার

শ্রীরবীন্দ্র নাথ মৈত্র

সেদিনও আসিয়াছিলে এমনি সন্ধ্যায়
মধুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে, লাবণ্যলীলায়
সারাতনু তরঙ্গিয়া। স্বপ্নময় আঁখি
মূক আমন্ত্রণে মোরে নিয়েছিল ডাকি'
তব পাশে ওগো প্রিয়া, দুটি পাণিতল
সঁপেছিলে মোর করে আবেশ বিহ্বল
চম্পকগুচ্ছের মত। বাঁধি নিলে মোরে
পেলব প্রসূন ডোরে জীবনের তরে।
সে বন্ধনে প্রাণ বাঁধা, তবু কেন আজ
এই জ্যোৎস্না বিলসিত নিদাঘের সাঁঝ
চিত্তের দুয়ারে কর হানে বারবার।
আজি কি বিরহ ব্যর্থ বরষের শেষে,
মলয় ফুলিত মুগ্ধ উদাস প্রদোষে,
আবার চম্পক গন্ধে নব অভিসার?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ

(৩)

যেদিন সত্যই পরেশ সত্যদের বাড়ী গিয়াছিল, সত্যের মাতা অন্নপূর্ণার ব্যবহারে তাহার সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল এবং চিরপরিচিত এই পরিবারের মধ্যে তাহার স্নেহের আসন এখনও যে অটল আছে তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। নিজের অকারণ সন্দেহকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়া ইঁহাদের প্রতি যে সে অন্যায় করিতেছিল, তার জন্য সে লজ্জা বোধও করিল। নির্ম্মলের ব্যাপারে মাঝখানে একটা অনর্থক বিপ্লব মাথা তুলিয়া সমস্তটাকে যে খাপছাড়া করিয়া দিয়াছিল, আজ সহসা তাহার অন্তর্ধানে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল।

সত্যের মা কথায় কথায় সেদিন বলিয়াছিলেন—হাঁ রে পরেশ, সত্যই কি তুই শেষে আমাদের ভুলে গেলি? আমার প্রভা যদি বেঁচে থাকত, [illegible]লে কি তুই তা পারতিস্? সবই আমার কপালের দোষ রে, [illegible]তোকে আর কি বলব বল্।

পরেশ নির্ব্বাক হইয়াই কথাগুলা শুনিয়াছিল, ঠিক কি জন্য এবং কেন যে সে আসে নাই, এমিতর স্নেহের দাবী যেখানে এখনও সুদৃঢ় সেখানে আসল কথাটা সে কোন মতেই আর তুলিতে পারে না। এই শেষে ধীরে ধীরে সে বলিতে বাধ্য হইয়াছিল—অন্যায় হয়েছে কাকিমা!

প্রভার কথা তুলিয়া খোঁচা দেওয়াতে, পরেশের বেশ মিষ্ট লাগিয়াছিল, কারণ ঐ সামান্য খোঁচার মধ্যেই পরেশ ও প্রভার জীবন কাহিনীর বিপুল ইতিহাস ব্যক্ত হইয়া পড়িয়া-

ছিল। প্রভা পরেশকে ভালবাসিত এবং পরেশও প্রভাকে খুবই ভালবাসিত—বাল্যকালের ধুলাখেলার মধ্যে দুইটী বালকবালিকার ভালবাসা জমাট বাঁধিয়া আসিতেছিল এবং তাহাই একদিন পাকিয়া উঠিয়া এই দুটী প্রাণীকে 'দুইয়ে মিলিয়া এক' করিয়া দিবে, বন্ধু পরিবারের সকলেই এমনিতর একটা আঁচ করিতেন। সে যাহা হউক, যাহা হইলে হইতে পারিত, তাহা শুধু এই জন্যই হইতে পারে নাই যে মৃত্যু একদিন হঠাৎ আক্রমণ করিয়া সংসার হইতে প্রভাকে ছিনাইয়া লইয়া সরিয়া পড়িল। ফুটিবার মুখেই ফুল ঝরিয়া পড়িল।

প্রথমদিনের স্নেহ অথবা আদরের আতিশয্যে পরেশের মনের সব খট্‌কা কাটিয়া গিয়াছিল, তাই সে আবার নবকান্ত বাবুর ওখানে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে লাগিল। কিন্তু মাসখানেক যাইতে না যাইতেই তাহার মনে নূতন করিয়া মস্ত বড় একটা খট্‌কা দেখা দিল। পরেশ দেখিল অন্নপূর্ণা তাহাকে একা নিরিবিলি পাইলে কি রকম একটা অপ্রসন্ন ভাব দেখান, কিন্তু সকলের সামনে আবার এমনি ব্যবহার করেন, যাহাতে স্নেহের আতিশয্যই প্রস্ফুট হইয়া উঠে—ঠিক এরূপ করিবার কারণ যখন পরেশের নিকট দুর্ব্বোধ ঠেকিল, তখন সে কেমন হাঁফাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা প্রথমে নিজেকে কতকটা সামলাইয়াই [illegible] ব্যবহার করিতেন, কিন্তু দিন কতক পরে পরেশ বুঝিল যে একটা কথা তিনি পরেশকে নানাভাবে ও নানাছাঁদে বলিতেন সেটা আর কিছুই নহে—পরেশের [illegible]হের কথা। পরেশ মূঢ়ের ন্যায় শুনিত কোন উত্তর দিত না। হঠাৎ পরেশের জন্য অন্নপূর্ণার এরূপ উতলা হইবার কারণ কি, সে তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারিল না এবং কেন যে অন্নপূর্ণার এ বিষয়ে আগ্রহ অপেক্ষা উ[illegible]তা প্রকাশ পাইত সে রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া পরেশ অন্নপূর্ণার আচরণে কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল।

পরেশ যাহা এত করিয়া বুঝিতে চাহিয়াও বুঝিতে পারিতেছিল না, একদিনের একটা সামান্য ঘটনায় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

আসে নাই। এমন সময়ে পরেশ সত্যদের বড়ীতে ঢুকিয়া সাড়া দিতেই অন্নপূর্ণা দেখা দিলেন এবং সত্যকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—এই যে পরেশ এসেছিস। তা বেশ, বেশ, এইখানেই তবে একটু বোস্, আমি কুটনোগুলো কেটে নিই। সব ভাল ত?

— হাঁ, সব ভাল, বলিয়া পরেশ চুপ করিয়া রহিল।

—আজই বেশ দিন বুঝে এলি; বাড়ীতে যে কেউ নেই রে। উনি ভবানীপুরে কা'দের বাড়ীতে গেছেন। সেখানে উপাসনা করতে হবে। লোকগুলোর বাপু একটু আক্কেল নেই, ওঁকে ওঁর শরীর ভাল নয়, তার ওপরে এই টানা-পাড়েন। সত্যও কোথায় গেছে রে। তা হোক্‌গে যাক, এইখানে বসেই তুই আমার সঙ্গে তবু একটু আধটু গল্প কর্।

—বেশ ত কাকীমা।

—যাক্, তবু ভাল। এখনকার ছেলেমেয়েরা ত বুড়োদের মোটেই আমল দিতে চায় না।

পরেশ চুপ করিয়া রহিল। অন্নপূর্ণা একবার তাহার দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন—ওরে অনেক দিন থেকে ভাবছি তোকে একটা কথা বলব, তা কি ছাই বলবার সুবিধে হয়। আমি একটি খাসা মেয়ে তোর জন্যে পছন্দ করেছি, তারাও রাজি, এখন তুই রাজি হলেই সব ঠিক করতে পারি।

—কিন্তু কাকিমা, আমার যে বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই।

—ওরে অমন অনেকেই বলে। এখন রক্তের তেজে বুঝতে পারছিস না, তারপর যখন বুঝতে পারবি তখন দেখবি সংসার যত সোজা ভাবছ, ঠিক তত সোজা নয় কিন্তু।

—আজ ঠিক অতদূর ভাবনার কোন দরকার আছে তাত মনে হচ্ছে না। আপনি ত সব জানেন—তার কথায় বাধা দিয়া অন্নপূর্ণা একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিয়া উঠিলেন —সব জানি এবং সব দেখছি বলেই না তোকে একথা বলছি।

—তার মানে?

ওর দরজায় ঘুরে বেড়াবার জন্যে কেউ সংসারে আসেনি রে পরেশ। থিতু হয়ে এখন ঘর সংসার করবার তোর সময় হয়েছে রে, এটা বুঝতে পারি বলেই তোকে একথা বলছি।

—কিন্তু আপনার কথা যে আমি কোনমতেই বুঝতে পারছিনে, কাকিমা।

—নিজের চাল মানুষ সব সময় বুঝতে পারে না, তাই তাকে চালাবার লোকের দরকার হয় —।

অন্নপূর্ণার কথার খোঁচায় সত্যই পরেশ বেদনা অনুভব করিতেছিল। কথার স্রোত ফিরাইবার জন্য সে সহসা প্রশ্ন করিল—সত্য কখন ফিরবে কাকিমা?

অন্নপূর্ণা উত্তর দিলেন—বায়োস্কোপ দেখতে গেছে, এই এল বলে।

—তাহলে আমি ওপরে যাই, তার জন্য একটু অপেক্ষা করি গে।

—তা যাও—বলিয়া অন্নপূর্ণা একটু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিলেন—মিনি মা একবার শোন ত।

—মিনতি আছে—আমি ভেবেছিলাম সে বাড়ীতে নেই।

এই সময়ে মিনতি আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং পরেশকে দেখিয়া বিস্ময়পূর্ণ ভাবেই কহিয়া উঠিল—এই যে আপনি? কতক্ষণ এসেছেন?

—তা ঘণ্টা খানেক—বলিয়া পরেশ স্তব্ধ হইল।

—এতক্ষণ, কই আমি ত কিছুই জানতে পারি নাই।

অন্নপূর্ণা কহিলেন—তুমি পড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, তাই তোমাকে খবর দিই নাই।

পরেশ ধীর ভাবে কহিল—আমি ভেবেছিলাম তুমি বাড়ীতে নেই।

—তা আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আমার পড়াটা একটু বলে দিয়ে যান না?

অন্নপূর্ণা চট্ করিয়া কহিলেন—পড়া উনি এলে হবে' খন। আজ আমার শরীরটে ভাল নেই মা এদিককার কাজ কর্ম একটু দেখ শোন—সহসা মাতার এরূপ আদেশে মিনতি বেচারা একটু থতমত খাইল। জোর করিয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া—ধীর ভাবে কহিল—তাহলে আমি ওঁকে একটু চা করে দিই। আসুন পরেশ দা, ওপরে আসুন আপনাকে একটু চা-পান করাই গে।

অন্নপূর্ণা কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু তাঁহার বলার পূর্ব্বেই পরেশ বলিয়া ফেলিল—আজ থাক মিনতি, আমার অন্যত্র একটু কাজ আছে। রাস্তায় দোকানে খাব' খন।

—কত আর দেরী হবে পরেশ দা! ভারি ত, আসুন।

—না, আজ নয় মিনতি—বলিয়া পরেশ উঠিল।

—তাহলে আবার কবে আস্‌বেন?

—ঠিক তা বলতে পারছি না, মিনতি।

—হঠাৎ আপনার কি হ'ল পরেশ দা?

পরেশ কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল—মিনতি দেখিল পরেশের মুখে বেদনার ছায়া পড়িয়াছে, হঠাৎ কি কারণে যে এইরূপ হইল, তাহা সে বুঝিতে না পারায় স্তব্ধ ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাড়াতাড়ি সেও উপরে চলিয়া গেল। মাতাকে সে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিল না—পরেও জিজ্ঞাসা করে নাই।

পরেশ চলিয়া যাইবার মুখে মিনতির মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিখানি একবার দেখিয়াছিল মাত্র, কিন্তু অন্নপূর্ণার আচরণ তাহাকে ঠেলিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছিল, কাজেই সে দ্রুত[illegible] বাড়ী ফিরিয়া গেল।

অন্নপূর্ণার সেদি[illegible] ব্যবহারে সত্যই পরেশ মস্ত বড় ধাক্কা খাইয়াছিল। [illegible]ঠিক এ জিনিষটার জন্য সে প্রস্তুত ছিল না কিন্তু অন্নপূর্ণার [illegible]নে যে আশঙ্কার উদয় হইয়াছে, তার জন্য সত্যই কি সে দা[illegible]? সেত মিনতি সম্পর্কে বরাবরই বেশ সাবধানেই চলিতেছি[illegible] এবং মিনতিও একটু দূরত্ব রাখিয়াইত চলিয়া আসিতেছি[illegible]।

তাহা হইলে এখন উপায় কি? অন্নপূর্ণা সেদিন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ওখানে আর যাওয়া চলে না। কিন্তু সে ত আপনা হইতে যায় নাই এবং তাঁহারা যদি আগ্রহের সহিত না ডাকিতেন তাহা হইলে সেও যাইত না। তবে সে কি জন্য এ অপমান সহ্য করিবে? নানা প্রশ্নে তার তরুণ

হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল, এবং ব্যর্থ বেদনার বিলোড়নে সে কেমন ম্লান হইয়া পড়িল।

পরেশ ভাবিতে লাগিল—কই এতদিন হইয়া গেল আমি ত আর যাই না, কিন্তু কেউ খবর করিল না ত। সেদিনকার অশিষ্ট ব্যবহারে সত্যাই যদি কেউ ক্ষুণ্ণ হইতেন, সে সংবাদ তাহার কাণে নিশ্চয়ই পৌঁছিত।

এইরূপ চিন্তার স্রোতে যখন পরেশ ভাসিতেছিল, পিসিমার আবির্ভাবে তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল।

পিসিমা কহিলেন—হাঁরে পরেশ, ঘরে একলা একলা চুপটি করে বসে কি ভাবছিস্ ?

—ভাবনার কি কিছু নেই পিসিমা ?

—তা থাক্‌বে না কেন ? কিন্তু ছুটোপাটি করেই যে দিন কাটায় তাকে ভাবতে দেখলে সত্যাই ভাবনা হয় ? কেননা সে কিছু গায়ে মাখে না, সত্যাই যখন তার গায়ে লাগে তখন সেটা যে সামান্য নয় এটা কি বুঝতে বাকি থাকে ?

—পিসিমা, আমাকে লক্ষ্য করেই যদি এগুলো বলে থাক, তাহলে ঠিক হয় নি। আমার ত কিছু হয় নি।

—হয় নি ত তবে অমন হয়ে যাচ্ছিস কেন ? থেকে থেকে হঠাৎ অন্য মনস্ক হ'স কেন ?

—অনেকগুলি কাজের ভার নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি তাই বোধ হয় ওই ভাব।

—নারে না, আজ ঠাকুরপো এসেছিলেন, তিনিও বলে গেলেন, তুই ওঁদের ওখানে বেশ যাচ্ছিলি আস্‌ছিলি, হঠাৎ যে একেবারে কেন যাওয়া আসা বন্ধ করলি, তা'ত তাঁরা ধরতে পারছেন না।

—আর কিছু বল্লেন ?

—হাঁ বল্লেন বৈকি ! এতদিন এসেছেন বড়ই বিপাকে ছিলেন, আসব আসব করে তাই আস্‌তে পারেন নি। একদিন আমায় নিয়ে যাবেন বল্লেন। আর তোকেও যেতে বলেছেন।

—তা বেশ বলে থাকেন ত যাওয়া যাবে।

—তাহলে আমাকেও নিয়ে চল্‌না একদিন।

—কিন্তু এখন ত আমি যেতে পারছিনে পিসিমা। এই যে বন্যায় দেশ ভেসে গেল, তাতে যে Nursing Brother hood থেকে আমাকে কাজের ভার দিয়েছে—এখন যে আমি তার জন্য খুব ব্যস্ত আছি।

—তা সে তুই কবে যাবি ?

—কাল না হয় পরশু পিসিমা!

—সেখানে আর কতদিন থাক্‌বি, ফিরে ত আস্‌বি। তখন তোর সঙ্গে একদিন যাব না হয়। যাওয়া মানে আমার দিকের দোষটা কাটান, নৈলে যেতে কি আর ইচ্ছে হয়। ওরে মনের ওপর রাংঝাল চলে না, তার যে দাগ মিলায় না রে। তবে ছেলেমেয়ে ছুটোর জন্য মন পড়ে থাকে। এখন ও ছেলেমানুষ কিনা তাই ওদের মনের এখনও যথার্থ টান আছে। জ্যোঠিমা বল্‌তে ছুটোতেই অজ্ঞান। সত্য তবু আসে যায় রে, আহা মিনিমাকে যে কতদিন দেখিনি।

—তা বেশ ত পিসিমা। আমি ফিরে আসি তারপর একদিন যাওয়া যাবে, কেমন ?

—আমি ও ত তাই বল্‌ছি রে।

(ক্রমশঃ)
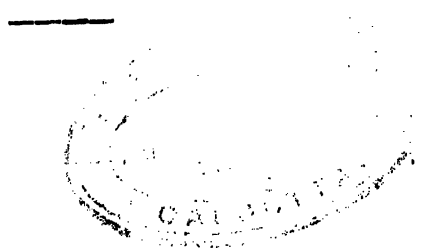
নবীন ভারত

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার]

নবীন ভারতের মন্ত্রগুরু, বর্ত্তমান শতাব্দীর চিন্তারাজ্যের অপ্রতিহত নায়ক স্বামী বিবেকানন্দ 'নবীন ভারতের' উদ্বোধন করিতে গিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন :—

"ভূত-ভারত-শরীরের রক্তমাংস হীন কঙ্কালকুল তোমরা কেন শীঘ্র শীঘ্র ধূলিতে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যাচ্ছ না? হুঁ, তোমাদের অস্থিময় অঙ্গুলিতে পূর্ব্ব পুরুষদের সঞ্চিত কতকগুলি অমূল্য রত্নের অঙ্গুরীয়ক আছে, তোমাদের পূতিগন্ধ শরীরের আলিঙ্গনে পূর্ব্বকালের অনেকগুলি রত্ন-পেটিকা রক্ষিত রয়েছে। এতদিন দেবার সুবিধা হয় নাই। এখন ইংরাজরাজ্যে, অবাধ বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যত শীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নবীন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালী, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনা-ওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা। সনাতন দুঃখভোগ করেছে, তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা এক মুটো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে; আধখানা রুটী পেলে ত্রৈলক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচার বল, যা ত্রৈলক্যে নেই। এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটী চুপ করে দিনরাত খাটা, এবং কার্য্যকালে সিংহের বিক্রম!! অতীতের কঙ্কাল-চয়! —এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। ঐ তোমার রত্ন পেটিকা তোমার মাণিকের আংটী —ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে যাও, কেবল কাণ খাড়া রেখো; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে কোটীজীমূতস্যন্দী কণ্ঠে ত্রৈলক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন ধ্বনি "ওয়াহ্ গুরুকি ফতে।"

আজ বিংশ শতাব্দীর বিগত প্রায় প্রথম প্রহরে আমরা দেখিতেছি 'অতীতের কঙ্কালচয়' ধীরে ধীরে নেপথ্যে সরিয়া পড়িতেছেন, আর শুনিতেছি হিন্দু মুসলমান—সমবেত ভারতবাসীর সম্মিলিত জয়ধ্বনি! আজ ভারত জাগিয়াছে, —এ জাগরণের দুর্নিবার গতিবেগের সম্মুখে কে অহঙ্কারী ঐরাবৎ আত্মঘাতী দম্ভ লইয়া দণ্ডায়মান হইবার আকাঙ্খা করিতেছ? আজ ভারতবাসী তথাকথিত নেতাগণের অপরিমিত স্পর্দ্ধাবাক্যের মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছে—আর নেতার প্রয়োজন নাই। এবার ভারতবাসী চায় গুরু—চায় ধর্ম্মবীর, চায় কর্ম্ম-সন্ন্যাসী—চায় সর্ব্বত্যাগী সাধক। তবুও হে বাক্যবীর অতীতের কঙ্কালচয় হে পক্ককেশ বুদ্ধিমান বৃদ্ধগণ, আজ তো তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে! তোমাদের সাধ মিটিয়াছে! আমাদের সাধ তো মেটে নাই। আমরা বহু বর্ষ তোমাদিগকে উচ্চাসন দিয়াছি, ধৈর্য্যসহকারে তোমাদের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়াছি, তোমরা চাঁদার খাতার সাদা পাতা আড়াল দিয়া সাধারণের অর্থ শোষণ করিয়াছ, কিছু বলি নাই, সেই কৃতজ্ঞতাটুকু স্মরণ করিয়া, দোহাই তোমাদের, মরিবার প্রাক্কালে একবার জাতীকে খুলিয়া বল, কি মহা-পাপ তোমরা করিয়াছিলে যাহার ফলে তোমাদের এই মানসিক মৃত্যু আমাদিগকে দেখিতে হইল! কি যে কৌশল, কি যে শাঠ্য, কি যে গুপ্ত ষড়যন্ত্র যাহা সম্বল করিয়া তোমরা একটা জাতিকে মরণের মুখে সঁপিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলে? ইহাতে তোমরা কি স্বার্থ সিদ্ধি করিতে! একবার কি মন মুখ এক করিয়া খুলিয়া বলিতে পার না?

শুনিয়াছি, তোমাদের মাথা নাকি খুব ঠাণ্ডা, শুনিয়াছি তোমরা নাকি রাজনৈতিক, শুনিয়াছি স্বজাতির হিতের জন্য নাকি তোমাদের রাত্রে নিদ্রা হয় না—এবং আরও যা যা বলিয়া আসিতেছ, যা বলিতেছ তাহা সবই শুনিয়াছি কিন্তু বোধ হয় তদপেক্ষাও কিছু জানি, বলি না কেন বলা উচিত নয়। কেননা আমরা তোমাদের মুখেই উহা শুনিতে চাই। কিন্তু তোমরা বল আর নাই বল, তোমাদের নীচ স্বার্থ, জঘন্য ধাপ্পাবাজী ও নির্লজ্জ কাপট্য আজ অতি কদর্য্য ভাবেই প্রকট হইয়া পড়িয়াছে, তাই তো তোমাদিগকে সরাইয়া ফেলিয়া গণ-বিগ্রহের জাগরণ নিজের পায়ের উপর দণ্ডায়মান হইবার জন্য জাতির ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা!

আজ যাঁহারা আমাদিগকে ধৈর্য্য ও সংযম অভ্যাস করিবার সৎপরামর্শ অযাচিত ভাবে বহুল পরিমাণে বিতরণ করিতেছেন, এবং আমাদিগকে আশা দিতেছেন যে এই অভিনব শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্ম্মচারীগণ রাতারাতি ভালমানুষ হইয়া উঠিবেন, আমাদের মনে হয়, তাঁহারা আমাদের অভাব অভিযোগের মর্ম্ম বুঝিতেই পারেন নাই। রাজ সরকার আমাদের অবেদন নিবেদনের প্রতি বরাবর হৃদয়হীন উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা দেশের কল্যাণ কামনায়, অপমান ও অসম্মান স্বীকার করিয়াও, ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষকে সৎ উপদেশ দিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মতামত কিরূপ অবজ্ঞাভরে অগ্রাহ্য হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাপি মন্ত্রীরূপে বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে বা অন্য কোন প্রকারে যাঁহারা রাজসরকারকে সাহায্য প্রদান করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন, এবং তাহা [illegible]য়া সুফলের আশা করেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই [illegible]জন যে খাঁটী স্বদেশ-প্রেমিক নহেন, তাহা বলা [illegible] না, এ যুগের দায়িত্ব অতি গভীর ও ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। এ যুগের কর্ম্মীগণের চাই বাধা-মুক্ত কর্ম্মশক্তি অথচ অটুট্ আত্মসংযম, চাই সাহস। সর্ব্বোপরি চাই গভীর সত্যনিষ্ঠা! সেই জন্যই মহাত্মা গান্ধি গোপনতাকে পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের সমস্ত কার্য্যই প্রকাশ্য দিবালোকে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কেননা, আমরা এবার সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াছি। সত্য, অনায়াসে দিবালোক সহ্য করিতে পারে। যাঁহারা অসহযোগনীতির সাধন সংরক্ষণ ও প্রচারে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, অথবা করিবার সংকল্প করিতেছেন তাঁহারা বিবেকানন্দের এই অমূল্য উপদেশটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন :—'চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না।'

অন্য দল বলিতেছেন যে এই অসহযোগীতা বর্জ্জনের মূলে ইংরাজ বিদ্বেষ ও রাজদ্রোহ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, অতএব এইরূপ আন্দোলনে কোন বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির যোগদান করা উচিত নহে। আমরা সর্ব্বান্তকরণে এইরূপ মতের প্রতিবাদ করি! অতি উচ্চতম নৈতিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া মহাত্মা গান্ধি এই অসহযোগ নীতি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, এই দুর্নীতিপরায়ণ, ক্ষমতা মদগর্ব্বিত, অবিচারক, দায়িত্ব জ্ঞানহীন রাজকর্ম্মচারিগণকে সৎ সাধু ও ন্যায়বিচারক করিয়া তোলা। কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে অন্যায় কার্য্য সমর্থণ করা বা অন্যায়কারীকে সাহায্য করা অসম্ভব! এমতাবস্থায় যতদিন পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট প্রজার দুঃখ বেদনার প্রতি নির্ম্মম ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের সহিত সহযোগীতা করা অন্যায় ও অধর্ম্ম। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট সুবিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ হইবেন, তখন আমরা উহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য। অতএব ইহার মূলে কোন ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজের প্রতি বা ইংরাজজাতির প্রতি কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নাই। আছে অন্যায়, পাপ, অত্যাচারের প্রতিবাদ—তীব্র প্রতিবাদ! সহযোগীতাবর্জ্জনকারীগণ রাজবিদ্রোহী নহেন। তাঁহারা জানেন যে বর্ত্তমানে তাঁহারা পরাধীন জাতি। যে কোন পরাধীন জাতি যদি যুক্তি বিচার দ্বারা দুর্নীতিপরায়ণ শাসকসম্প্রদায়কে উচ্চনীতি তত্ত্ব বা ধর্ম্মোপদেশ দিতে যায় তখন তাহাদের মহত্ত্ব অপেক্ষা দৌর্ব্বল্যই রাজপুরুষগণ অধিক উপলব্ধি করেন বিশেষ পদদলিত ব্যক্তির সাত্ত্বিক উপদেশ কোন দিনই সবল গ্রাহ্য করে নাই। সেই জন্যই আজ প্রমাণ করিবার দিন

আসিয়াছে,—আমরা দুর্ব্বল নহি, অক্ষম নহি। আমাদের উদ্দেশ্য, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগীতাবর্জ্জন করিয়া, আমরা ইংরাজজাতির শ্রদ্ধা অকর্ষণ করিব। আমাদের জাতীয় মর্য্যাদাবুদ্ধিকে আর কোন প্রকারেই উদ্ধত রাজকর্ম্মচারীর পাদপীঠরূপে ব্যবহৃত হইতে দিব না। ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমাদের যাহা প্রাপ্য তাহা আমরা চাই; এবং আমাদের যাহা দেয় তাহাও দিতে প্রস্তুত আছি এক কথায় আমরা মানুষের নিকট মনুষ্যত্ব প্রার্থণা করি, পশুত্ব আশা করি না। পাশবিক বলকে প্রাধান্য দিয়া নতশিরে হীনতা ও দৈন্য বহন করিতে অস্বীকার করার নাম যদি রাজবিদ্রোহ হয় তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কত গুরুতর অন্যায় অপমান সহ্য করিতে করিতে আজ অনন্যোপায় হইয়া হিন্দুমুসলমান এই দুই মহাজাতি মানবধর্ম্মের উদারময় ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া পরস্পরকে ভাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, এবং পরস্পরের ধর্ম্ম, মান ইজ্জত পরস্পর রক্ষা করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, তাহার নির্ম্মম ইতিহাস সকলেই জানেন ভারতের কল্যাণ কামনায় এ পর্য্যন্ত যাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা মিলনকে গড়িয়া তুলিবার সুমহান প্রয়াস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চেষ্টা আজ মহাত্মা গান্ধি স্বীয় অসাধারণ চরিত্রবলে সফল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। গণবিগ্রহের পুরোহিত-গণ, উন্মত্ত নহেন, অসহিষ্ণু হইয়া আমাদের অপমানিত অভিমানকে, স্পর্দ্ধাবাক্যে উত্তেজিত করিয়া কোন বিশেষ কার্য্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন না। তাঁহারা সংযত-ধৈর্য্যে আমাদের বিলুপ্তপ্রায় বিবেক বুদ্ধিকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। ক্ষুব্ধ জাতি যাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া অশান্তিময় বিপ্লবের সৃষ্টি না করে, সেদিকে তাঁহাদের সদা সতর্কদৃষ্টি রহিয়াছে। তাঁহারা চাহেন ত্যাগের শক্তি, অপরাজেয় সহিষ্ণুতা—বিকারগ্রস্থ রোগীর মত অস্বাভাবিক শক্তির খেলা দেখিতে চাহেন না। অন্যায়কে অন্যায়দ্বারা পশুবলকে পশুবলদ্বারা, অত্যাচার ও অবিচারকে বিশৃঙ্খল বিপ্লবদ্বারা পরাজিত করিবার হীনতাকে তাঁহারা ঘৃণা করেন। মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ তাঁহার সহযোগীনেতাগণ আত্মস্থ; কোন অবস্থাতেই তাঁহারা ধর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ম্মবুদ্ধিকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যায় উপায়ে কার্য্যসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবেন না।

* * * * * *

যে দিন রক্তাক্ত ধূসর সান্ধ্যাকাশতলে স্বদেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার ঐতিহাসিক দিগ্বিজয় সমাপ্ত করিয়া ভারতের মৃত্তিকায় প্রথম পদার্পন করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, "সুদীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়া বোধ হইতেছে। মহানিদ্রায় নিদ্রিত শব যেন জাগ্রত হইতেছে। * * * অন্ধ যে সে দেখিতেছে না, বিকৃতমস্তিষ্ক যে সে বুঝিতেছে না যে, আমাদের এই মাতৃভূমি তাঁহার গভীর নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। আর কেহই এক্ষণে ইহার গতিরোধ করিতে সক্ষম নহে, আর ইনি নিদ্রিত হইবেন না—কোন বহিঃস্থ শক্তিই এক্ষণে আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিবে না; কুম্ভকর্ণের দীর্ঘনিদ্রা ভাঙ্গিতেছে।"

বিবেকানন্দের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রতিভাত 'নবীন ভারতের' এই জাগরণের পুণ্যবার্ত্তা ঘোষিত হইয়াছিল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। এবং সেই সময় হইতেই ভারতে নবযুগের আরম্ভ। কিন্তু তখন বিবেকানন্দ ত্যাগ ও সেবা সহায়ে আমাদিগকে যে পথে অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, আমরা তখন উহা সম্যক উপলব্ধি করি নাই। ভারতের প্রাণবস্তু ভারতের জাতীয়জীবনের মেরুদণ্ড ধর্ম্মকে অবলম্বন করা আমরা মনে করিয়াছিলাম, ভীরুর অক্ষম দৌর্ব্বল্য। তাহার উপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভেই যখন আমরা দেখিলাম, রাজনৈতিক আন্দোলনকারিগণের অধিকাংশই ভণ্ড ও আত্মসুখান্বেষী, তখন 'স্বরাজ' লাভের জন্য ঐ সমস্ত বাকসর্ব্বস্ব নেতাগণের প্রতি নির্ভর করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। স্বদেশীয় ও বিদেশীয়ের নিকট অন্যায়রূপে উৎপীড়িত ও প্রবঞ্চিত হইয়া বাঙ্গালার যুবক-শক্তি অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। জ্বালাময়ী উত্তেজনা ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া একটা গুপ্ত বিপ্লবের আয়োজনকে সম্ভব করিয়া তুলিল। শক্তির এই বিভীষিকা

ময় ক্ষিপ্ততার বিরুদ্ধে যিনি যাহাই বলুন না কেন, ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে ইহার প্রয়োজন ও সম্ভাবনাকে অস্বাভাবিক ও অকারণ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যাহা হউক এই বিপ্লববাদ সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর কাল বাঙ্গালায় যে অভিনয় করিয়াছে, তাহার ফলে একদিকে আমরা যেমন কঠোর আত্মত্যাগ, অসমসাহসিক ঘটনা, নির্ভিক মৃত্যু দেখিয়া স্তম্ভিত ও আনন্দিত হইয়াছি, বাঙ্গালীর মধ্যে এমন শূরত্ব আছে বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি, অপরদিকে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা, কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড, জঘন্য দস্যুবৃত্তি ইত্যাদির প্রাচুর্য্যে লজ্জায় অধোবদনও হইয়াছি। এই বিপ্লববাদের পরিণাম এখনও বাঙ্গালীকে সহ্য করিতে হইতেছে। ইহার নিষ্ফল প্রয়াস ও অযথা উদ্যম শক্তির শোচনীয় অপব্যয় হইতে আমরা কি অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। কেননা, রাজসরকার কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও নির্য্যাচিত হইয়া ক্ষুব্ধ উত্তেজনায় যদি পুনরায় আমরা ঐরূপ গুপ্ত পন্থা অবলম্বন করি, তাহা হইলে, সুদীর্ঘ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জাতীয় উন্নতিকে রুদ্ধ করা হইবে।

থাক্ অতীতের আলোচনা। আজ যখন আমরা বর্ত্তমানকে ভুলিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি, তখন বৃথা সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া বিলম্ব করা অবিধেয়। আমাদের আন্দোলনের দ্রুত প্রচারের উপরই সমস্ত সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য আমরা আহুত হইয়াছি। আমাদের লক্ষ্য ভবিষ্যৎ—অতীত নহে। আজ অতিবাহিত পথের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া ফিরিয়া যাইবার দিন নহে। যে সমস্ত পন্থায় গিয়া আমরা পুনঃ পুনঃ দিশাহারা হইয়াছি। কেবলমাত্র পুরাতনের দোহাই দিয়া সেই পথে পুনরায় চলিবার প্রহসন অভিনয় করিবার জন্য জাতি আর প্রস্তুত নহে। আবেদন, নিবেদন, ক্রন্দন, মিনতি বিপ্লব পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হওয়াতেই, আজ বৈধ উপায় সমূহের মধ্যে অসহযোগনীতি শেষ সম্বল। এক্ষণে আমাদেরও লক্ষ্য স্বরাজ, এবং তল্লাভের উপায় অহিংসা অসহযোগ। ইহাই মহাত্মা গান্ধীর মত।

স্বরাজ লাভের অর্থ (অন্ততঃ আমি যতটুকু বুঝিয়াছি) কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ নহে; তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা উহার এক অতি আবশ্যক অপরিহার্য্য অঙ্গ মাত্র। স্বরাজ অর্থ—মানুষের ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্খা, আদর্শকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বর্জ্জন না করিয়া, বিভিন্নপ্রকার মতবৈচিত্র্য ও ধর্ম্মবৈচিত্র্যকে অস্বীকার না করিয়া, এক অতি উদারতম মহামিলনের ভিত্তির উপর হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টিয়ানের সমন্বয় সাধন। অতএব মানবজাতিকে উন্নততর মহত্তম আদর্শে জীবন-যাপন করিবার সুযোগ ও সুবিধা দেওয়ার জন্য স্বরাজ লাভের চেষ্টা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর ধর্ম্মানুমোদিত অবশ্য কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আমাদের স্বরাজ লাভের জন্য দুইটী জিনিষের একান্ত প্রয়োজন! —একটা সার্ব্বজনীন উপায় নির্দ্দিষ্ট করা এবং তাহা সত্বর কার্য্যে পরিণত করা। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত সমস্ত প্রকার সহযোগীতা বর্জ্জন করা। এই উপায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বহুবর্ষব্যাপী নির্ব্বিবেক বর্ব্বরতার পদতলে পড়িয়া অসহায় দাসত্বই জনসাধারণকে আজ স্বাধীনতা লাভের প্রেরণা দিতেছে। সহস্র বৎসর ইহারা কেমন করিয়া নীরবে এত অত্যাচার সহিল তাহাও যেমন ধারণাতীত, ঠিক তেমনি ইহাদের 'অটল জীবনীশক্তির' অকস্মাৎ জাগরণও ধারণাতীত। আজ তাহাদের 'সনাতন দুঃখভোগ' সার্থক। প্রত্যেকটী বৎসর 'নীরবে অত্যাচার সহ্য' করিবার শক্তি ইহাদের মুক্তির দিনকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। দুর্দ্দশার চরম সোপানে পদার্পণ করিয়া আজ ভারতবাসী তাহার বহু কষ্টার্জ্জিত 'অটল জীবনী শক্তি' সম্বল করিয়া মরিবে না বলিয়া মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? মহাত্মা গান্ধির মতে—অসহযোগীতা বর্জ্জন করা এবং তদনুসারে কার্য্য করা। সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মনৈতিক আন্দোলন—রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। এই সত্যটুকু আমাদের ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা উচিত। রাজনৈতিক সম্প্রদায় সমূহের উত্থান পতন ও বিলয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু একটী ধর্ম্ম

সম্প্রদায় যে পর্য্যন্ত না তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য মানুষের সভ্যতা শিক্ষা ও সুরুচি এবং তাহার জীবন যাত্রাকে নিরুপদ্রব শান্তিময় না করিতে পারে, ততদিন উহার বিনাশ নাই। তাই আজ স্বরাজলাভেচ্ছু হিন্দু ও মুসলমানকে মহাত্মা গান্ধি আহ্বান করিতেছেন, তাই এবারকার জাতীয় মহা-সমিতিতে সমবেত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমুসলমান একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন শান্তিময় বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভ করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হিন্দুর ধর্ম্মযুদ্ধ বা মুসলমানের জেহাদ ঘোষিত হইয়াছে। অন্যায় ও দুর্নীতিকে পরাভূত করিয়া নিরুপদ্রব ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এ যুদ্ধে কামান, বন্দুক, গুলি বারুদ অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন নাই; কেননা ইহা জিঘাংসা-লিপ্ত স্বার্থান্বেষী বর্ব্বরের নর-হত্যার আয়োজন নহে। ইহার অস্ত্র, ধর্ম্ম, ন্যায় নীতি, সদাচার ও আত্মোৎসর্গ। এই সমস্ত সনাতন অস্ত্রের অব্যর্থ প্রয়োগ শাসক সম্প্রদায়ের অপবিত্র চিন্তা ও কার্য্যের উচ্ছেদ সাধন করিবে—তাঁহাদিগকে পবিত্র করিয়া তুলিবে। আমাদের উদ্দেশ্য মহান, লক্ষ্য উচ্চ, অতএব সফলতা ও বিফলতায় কি আসে যায়! আমরা যখন সত্য ও ন্যায়কে অবলম্বন করিয়াছি, তখন কোন আশঙ্কা বা ভয়ের কারণ নাই। যদি কোন স্থলে আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্যের পরাজয় হয়, তাহা হইলে সৈন্যদলের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই; ব্যক্তি-বিশেষের লজ্জাকর অধঃপতন দেখিয়া আমাদের নিরাশ হইবার বা আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। ইহাই মহাত্মা গান্ধির মত। * * * * * * *

কেহ কেহ বলিতেছেন, দেশের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া আমরা আত্মপ্রতারণা করিতেছি। দেশের জনসাধারণ বিশ্বাসহীন, আশাহীন, উদ্যমহীন, ম্রিয়মান, জড়বৎ নিস্ফল। বহুবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক লৌহনিগড়ে আবদ্ধ থাকিবার ফলে তাহারা চলিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। এই যুদ্ধক্ষেত্রে তোমরা তাহাদিগকে কেমন করিয়া আনয়ন করিবে এবং যদিও বা আসিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে টিকিয়া থাকিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কতবার না আমরা তাহাদিগকে ধর্ম্মের নামে, দেশের নামে, স্বাধীনতার নামে, আহ্বান করিয়াছি, সে আহ্বান শুনিয়া জরাগ্রস্থ জাতি তাহার শিথিল মস্তক ক্ষণকালের জন্য উন্নত করিয়া পুনরায় গভীর অবসাদে লুটাইয়া পড়িয়াছে। দেশহিতব্রতে আত্মোৎসর্গকারী ধর্ম্মবীরের জলন্ত ত্যাগ ও তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত তাহারা বিস্ময় মুগ্ধ-দৃষ্টি তুলিয়া দেখিয়াছে। তাহার নির্ভীক মৃত্যু দেখিয়া স্তম্ভিত ও সচকিত হইয়াছে, কিন্তু বুঝিতে পারে নাই যে ঐ ধর্ম্মবীরগণের সহিত তাহাদের স্বাধীকার, স্বাধীনতা, সুখ, সম্পদও সমাহিত হইল। কোনমতে প্রাণধারণের জন্য দু'বেলা দুমুঠা অন্নের সংস্থান করা, তাহাও সভয়ে ও পথকুক্কুরের মত শঙ্কাজড়িত উৎকণ্ঠায়। উৎসাহ ও উদ্দীপনা নাই,—জাতির জরাগ্রস্থ অভ্যস্থ চিন্তার উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়াও তাহা পুনরায় জাগাইয়া তোলান দুঃসাধ্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অথচ জনসাধারণের সাহায্য ব্যতীত আমরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিব না। আমরা ইহাদের সাহায্য ব্যতীত, কেমন করিয়া মরিতে হয় তাহা দেখাইতে পারি, কিন্তু কেমন করিয়া জয়লাভ করিতে হয় তাহা দেখাইতে পারি না। যদি তুমি বিবেকানন্দের মত নির্ভীক দৃঢ়তায় বিশ্বাস করিয়া বলিতে পার "আমি দেশের হিতের জন্য তিলে তিলে হৃদয়ের রক্তদান করিয়াছি, তোমরাও সেইরূপ কর, নিরাশ হইও না, আমাদের প্রত্যেক শোণিতবিন্দু হইতে ভবিষ্যতে মহা মহা সুরবীরগণ আবির্ভূত হইয়া জগতের চিন্তা-স্রোতে এক আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিবে"—তাহা হইলে তুমি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর, কিন্তু যাহাদিগের হৃদয়ে তোমার মত বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও ত্যাগের বল নাই, তাহাদিগকে অনর্থক তোমার দলে টানিও না। নির্ব্বিকারে মহৎকর্ম্মের পদতলে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ, সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। আবার যে শক্তি একদিন স্বরাজ্য-সিদ্ধিকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন হইবে, তাহার অযথা অপব্যয় কোনদিক দিয়াই বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আত্মপ্রতারণা করিও না, ক্ষুদ্র উত্তেজনায় যুগ-প্রয়োজনকে বিফল করিয়া দিও না। নিজেকে দেশের কাজে

উৎসর্গ করিয়া দিয়া ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিয়া থাক।

উপরোক্ত সময়োচিত কথাগুলি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। কেননা, ইহার সহিত আমাদের ভবিষ্যত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রহিয়াছে।

* * * * * * *

সত্যকথা—দুর্ভেদ্য তমসাবরণ সকলকে সমভাবে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ভারতবর্ষের জনসাধারণ আত্মবিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে। যে বিশ্বাস ব্যক্তিবিশেষকে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইতে প্রেরণা দেয়, যে বিশ্বাসে মানুষ অন্যায় ও পাপের বশ্যতাস্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে যে বিশ্বাস সকলকে এক সাধারণ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সম্মিলিত হইবার প্রেরণা দেয়, যাহা নিজের ভাগ্যের উপর, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করিতে শিখায়—তাহা পর্য্যন্ত নাই। এক্ষণে চাই বিশ্বাস, যাহা ভক্তি বিনম্রচিত্তে শক্তি ও সাহায্যের জন্য শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা করিবে, যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া অক্লান্ত চেষ্টায় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। এক্ষণে চাই সেই বিশ্বাস যাহা মানুষকে নির্ভীক দৃঢ়তায় ভগবন্নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দিবে। বর্ত্তমান যুগের গণবিগ্রহের মহনীয় পুরোহিত মহাত্মা গান্ধি এই বিশ্বাসের ধর্ম্মই প্রচার করিতেছেন এবং আশা করিতেছেন, আমরা উহা কর্ম্মজীবনে পরিণত করিব। আমাদের কিসের অভাব? শক্তি অথবা শক্তির অনুভূতি? আমরা নিজেকে সুদীর্ঘ দুইটী শতাব্দী ধরিয়া দুর্ব্বল, পরমুখাপেক্ষী, অক্ষম বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্থ হইয়াছি। এই লজ্জাকর কুসংস্কার দূর করিবার উপায় কি? কেবল রোগই সংক্রামক নয়; মানুষের গুণ ও দোষও সংক্রামক। অর্থহীন ভীরুতা যদি সংক্রামক ব্যাধির মত ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন করিয়া অত্যাচারীকে তাহার ব্যভিচারের অপ্রতিহত সুযোগ দান করিয়া থাকে, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সাহস বীর্য্য, সত্যনিষ্ঠাও কি সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যুৎবলে সঞ্চারিত হইয়া উৎপীড়িত ও অত্যাচারীর মধ্যে সখ্য সংস্থাপনে সমর্থ হইবে না?

হে অসহযোগনীতি পন্থী সৈনিক যুবক, একবার চক্ষু মেলিয়া তোমার স্বদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! দুর্ভাগ্য, দুঃখ, অন্নবস্ত্রাভাব, নির্ভীক আত্মোৎসর্গ, অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান কামনা এদেশে চরমে উঠিয়াছে। সর্ব্বত্র অত্যাচার ও অবিচার—'ইম্পিরিয়ালিজম ও কমার্শিয়ালিজম' কালভুজঙ্গীর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ভারতবর্ষের বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত সেই বিষ গ্রহণ করিয়া জর্জ্জরিত হইতেছি! ভারতবাসী বিশৃঙ্খল বিদ্রোহ করিবে না, জিজ্ঞাসা পরায়ণ হইয়া সে ইংরেজের অঙ্গে বা অত্যাচার পরায়ণ রাজ কর্ম্মচারীর অঙ্গে আঘাত করিয়া, নিজেদের উন্নতর আদর্শকে ক্ষুণ্ণ বা মলিন করিবে না। সে তাহার মহিম পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকাহিনী বিস্মৃত হয় নাই—তাহার উদার ধর্ম্মমত, উৎকৃষ্ট নৈতিক জীবনের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে না। এবার সে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে, ফরাসীজাতির মত শোণিতাপ্লুত পন্থায় নহে—শান্তি, ধৈর্য্য, ত্যাগ, তিতিক্ষার ক্ষুরধারদুর্গম পন্থায়! এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তোমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। হে সত্যগ্রাহী সৈনিক, তুমি প্রস্তুত আছত তো?

নন্দন-পাহাড়

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

তোমার রূপের কথা
ভুলি নাই তিলটী,—
পাহাড়তলীর নীচে
আলোময় ঝিলটী।
বুলানো রঙের তুলি
আঁজি-কাটা ফুলগুলি,
ছায়া ঘন বন পথ,—
শিরে উড়ে চিলটী!

নূতন নূতন শোভা
শোভার সে বিষ্টি,
লতা পাতা-ফুল-পাখী
সুর কত মিষ্টি;
স্বপ্ন বিছানো প্রাণে
লেখা আছে গানে গানে,—
ফ্রেমেতে সুচারু ছবি
চারিধারে গিল্টি।

অর্থ-বিজ্ঞান

[শ্রীদ্বারকানাথ দত্ত]

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিনিময়-বাট্টা সহ সুবর্ণ রিজার্ভের সম্বন্ধ তত্ত্ব

বিলের বিনিময় বাট্টার প্রতি লক্ষ্য করিলে, দেশের আমদানী রপ্তানীর অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বিলের যোগান দেশের রপ্তানীর উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। দেশ হইতে যতই পণ্য সামগ্রী রপ্তানী হইয়া বিদেশে চালান যায়, ততই দেশের বিদেশী-বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই সকল বিল বিক্রয় করার মত উপযুক্ত সংখ্যক লোক না থাকিলে, বুঝিতে হয় যে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ বেশী হইয়াছে। তখন এক্‌শ্চেঞ্জ রেইট discountএ পরিণত হয়; অর্থাৎ স্বাভাবিক মূল্যের নীচে যায়। তদ্রূপ বিলের পরিমাণ অপেক্ষা ক্রেতার সংখ্যা বেশী হইলে রপ্তানী অপেক্ষা আমদানী বেশী হওয়ার সূচনা করে। তখন বিলের টান বৃদ্ধি হেতু বাজার দর স্বাভাবিক মূল্যের উপরে যায় এবং বিনিময় বাট্টা premiumএ পরিণত হয়। এই বাট্টা তাহার ঊর্দ্ধ সীমার উপরে গেলে দেশের সোণা বিদেশে চালান হওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়।

এই সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রমিয়ম বাট্টাকে প্রতিকূল বলা হয়। দেশের বিল বেশী দামে বিক্রয় হইলে, বিদেশ হইতে যাঁহারা মাল ক্রয় করিয়া আনবেন তাঁহাদের ক্ষতি হয়, কিন্তু দেশের উৎপাদকগণ লাভবান হইয়া থাকেন। কেননা, তাঁহারা যে মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা বেশী মুল্যে বিল বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে পারেন। কিন্তু দেশের উৎপাদক কিম্বা বিদেশী মাল আমদানীকারী মহাজনদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এই প্রতিকূল কিম্বা অনুকূল সংজ্ঞা প্রদান করা হয় না। উহা ব্যাঙ্কের পারিভাবিক শব্দ; তদ্বারা ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য মাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়।

বিলের বিনিময় বাট্টার হার বৃদ্ধি হইতে হইতে যখন দেশ হইতে সোণা প্রেরণের অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন উহাকে প্রতিকূল বলা হয়। কেননা, মহাজনদিগের টাকা ব্যাঙ্কের তহবিলে আমানত থাকে। তাঁহাদিগকে বিদেশে সোণা প্রেরণ করিতে হইলে, ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বা সোণা উঠাইয়া লইয়া বিদেশী দেনা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। ব্যবসায়ের স্বাভাবিক গতিতেও কখন কখন বিদেশে সোণা প্রেরণের প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন নির্ব্বাহ জন্য ব্যাঙ্কের তহবিলে কতক সোণা নিয়তই মযুত থাকে। উহাকে Gold reserve বা স্বুবর্ণ মযুত বা রিজার্ভ কহে। ব্যবসায় বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতিতে এই মজুতের উপরে কোন চাপ পড়ে না। কেননা সাময়িক প্রয়োজনে যেমন একদিকে সোণা প্রেরিত হয়, অন্যদিকে আমদানী হইয়া তাহার স্থান সহসা পূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু বিনিময় রেইট উর্দ্ধ সীমার উপরে গেলে, দেশের সোণা স্থায়ীভাবে বিদেশে চলিয়া যাওয়ার কারণ উপস্থিত হয় এবং সহসা তাহার স্থান পূর্ণ হয় না। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ [illegible]রিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যখন বাট্টার হার স্বুবর্ণ সীমায় নি[illegible] যায়, তখনই কেবল বিদেশ হইতে স্থায়ীভাবে সোণা আ[illegible]য়া তাহার স্থানপূর্ণ করিতে পারে। স্বুতরাং ব্যাঙ্কের স্বুবর্ণ-মযুতের উপরে এইরূপ একটা স্থায়ী চাপ উপস্থিত হওয়া বিপদ সঙ্কুল সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্কের এই মযুত সীমাবদ্ধ এবং আকাস্মিক অভাব পূরণ জন্যই সংরক্ষিত হয়। স্থায়ী কারণে ইহার উপরে চাপ পড়িলে, তদ্বারা সম্পূর্ণ অভাব পূর্ণ করা সম্ভবপর নহে। আমানতী টাকার বিনিময়ে সোণা পাইবার জন্য লোকের অভ্যধিক ভিড় হইলে ব্যাঙ্কের দ্বার বন্ধ করার প্রয়োজন উপস্থিত হইতে পারে। তাহা করিলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। দেশের ব্যয়মুখী টাকা আসিয়াই ব্যাঙ্কে জমা হয়। স্বুতরাং ব্যাঙ্কে টাকার অভাব আছে, এ কথা একবার প্রচার হইলে, আর রক্ষা নাই। যাহাদের সত্ত সত্ত কোন টাকার প্রয়োজন নাই তাঁহারাও টাকা উঠাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিবেন। লোকের মনে কোন প্রকারে একবার সংশয় বা সন্দেহের উদয় হইলে, উহা তড়িৎবার্ত্তার ন্যায় দেখিতে না দেখিতে সমাজ মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। দেখিতে দেখিতে দেশের সকল ব্যাঙ্কের কার্য্য বন্ধ হইয়া পড়িতে পারে। ব্যাঙ্কের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে। এই সকল কারণে বিনিময় বাট্টার উর্দ্ধ ও নিম্নসীমা নির্দ্ধারণ এবং সোণার গতি ক্রমলক্ষ্য করিয়া ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালন করা আবশ্যক হইয়া উঠে।

ফরাসী পণ্ডিত জুগলার (Juglar) মহোদয় মনে করেন যে এই রেইটের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াও টাকার বাজারে আকস্মিক কোন বিপদপাত হওয়ার কারণ আছে কিনা, তাহা সর্ব্বধারণ করা যায়। তাহার মতে ব্যাঙ্কে আসিয়া যত বিল জমা হয়, তাহার পরিমাণ ও স্বুবর্ণ মযুতের উত্থান-পতনের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই টাকার বাজারের ও দেশের আর্থিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। বিল জমার সঙ্গে সঙ্গে স্বুবর্ণ-মযুতের হ্রাস হইতে থাকিলে, বুঝিতে পারা যায় যে অর্থের আকস্মিক টান বৃদ্ধি হইয়া বিপদপাত (Criaes) উপস্থিত হইতে পারে।

যে ভাবেই হউক, যাহাতে টাকার বাজারে আকস্মিক কোন ভীতি বা বিপদপাত হইতে না পারে তজ্জন্য ব্যাঙ্ককে নিয়তই বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। কোন প্রকার বিপদের লক্ষণ দেখিলেই প্রতীকারে প্রচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। পণ্ডিতগণ এই প্রতীকারের নানা পন্থার উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ ব্যাঙ্ক হইতে সোণা বাহির করিয়া নেওয়ার পথ সঙ্কুচিত করিয়া দেওয়া। বিশেষ প্রয়োজন প্রদর্শন করিতে না পারিলে, কাহাকেও সোণা দেওয়া যাইবে না বলিয়া প্রচার করিয়া দিলে, সহসা কেহ সোণা উঠাইয়া লইতে পারিবেন না সত্য; কিন্তু তখন নগদ টাকা উঠাইবার নিমিত্ত ত ভীড় করিয়া বসিতে পারেন। ব্যাঙ্কের নগদ মযুত ও ত সীমাবদ্ধ। লোকে নগদ টাকা উঠাইয়া বাজার হইতে সোণা ক্রয় করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিবে। ফলতঃ যাহাতে জনসাধারণের মনে কোন প্রকার ভীতির সঞ্চার হইতে পারে সেরূপ কোন পন্থানুসরণ করা নিরাপদ নহে।

কেহ কেহ মনে করেন সোণা উঠাইবার পথ অবরোধ করিবার পূর্ব্বে বড় বড় চালানী মহাজনদিগের সম্মতি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাদের সম্মতি ক্রমে কার্য্য করিলে, জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার নাও হইতে পারে। সাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার না হইলেও, এই সকল মহাজনগণও তাহাদের দৈনন্দিন আমদানীর টাকা আনিয়া ব্যাঙ্কের তহবিলে জমা দেওয়ার সম্ভাবনা অতি বিরল। পাছে টাকা উঠাইয়া লইতে না পারেন সেই জন্য হাতের টাকা হাতেই রাখিয়া দিবেন। সুতরাং ব্যাঙ্কে আমানত বন্ধ হইলে, টাকায় টান পড়িয়া বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং এ পন্থাও নিরাপদ বলিয়া অনুমিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ কৃত্রিম উপায়ে সোণার মূল্য বৃদ্ধি করা। ব্যাঙ্ক স্বয়ং বেশী দরে সোণা ক্রয় করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে, সোণার বাজার চড়িয়া যাইবে। তখন সোণার অনুপাতে পণ্য সামগ্রীর দর হ্রাস হইয়া আসিবে। যাঁহাদের বিদেশে সোণা চালানের প্রয়োজন আছে, তাহারা তখন সোণার পরিবর্ত্তে কমদরে পণ্য মাল ক্রয় করিয়া বিদেশে চালান দিতে আরম্ভ করিবেন। তাহার ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি হইয়া আমদানী সহ সমতা হইতে আরম্ভ করিবে। এই ভাবে সোণার বহির্গমন নিবারিত হইয়া আসিবে। এ উপায়ে রপ্তানী বৃদ্ধি করা যায় সত্য, কিন্তু বেশী দামে সোণা ক্রয় করিতে যে ক্ষতি, তাহা কোন ব্যাঙ্ক সহসা বহন করিতে স্বীকৃত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। এ উপায় অবলম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অতি বিরল।

তৃতীয়তঃ ব্যাঙ্ক রেইট বা সুদের হার বৃদ্ধি করা। এপথ সহজে এবং সহসা অবলম্বিত হইতে পারে। তাহাতে অস্বাভাবিকতা কিম্বা আকস্মিক ভীতি সঞ্চার হইবার কোন কারণ নাই। ব্যাঙ্কের সুদের হার নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। ব্যাঙ্ক রেইট বৃদ্ধি হইলে, তাহার ফল দেশী ও বিদেশী মহাজনদিগের উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিস্তার লাভ করে। সুদের হার বৃদ্ধি হইলে, ব্যাঙ্ক হইতে সহসা কেহ বেশী টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করেন না। একান্ত যে টাকা নহিলে নয় তাহাই মাত্র পরিগৃহীত হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের টাকা যত আদায় হয়, তত কর্জ্জ লগ্নিতে বাহির হয় না। তাহার ফলে, ব্যাঙ্কের তহবিল পূর্ণ হইতে থাকে। পক্ষান্তরে বিদেশী মহাজনদিগের মধ্যেও যাঁহাদের সদ্য সদ্য টাকা পাইবার প্রয়োজন নাই তাঁহাদের অনেকেই উক্ত হারে সুদ পাইবার প্রলোভনে এদেশে টাকা আমানত করিয়া দেন। এই ভাবেও অনেক টাকা আটক পড়িয়া যায়। আর যাঁহাদের হাতে মোদ্দতি বিল থাকে, তাঁহাদেরও অনেকেই চড়া হারে বাট্টা দিয়া বিল জমা করিয়া দেওয়া অপেক্ষা মোদ্দত-কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সদ্য সদ্য যাহাদের টাকার একান্ত প্রয়োজন, তাঁহারাই মাত্র বিল ভাঙ্গাইবার জন্য ব্যাঙ্কে উপস্থিত হন। এই ভাবে ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে ঋণের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইয়া আমদানী টাকার অধিকাংশ আটক পড়িয়া তহবিল পূর্ণ হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন বিদেশী মহাজনদিগের মধ্যেও কেহ কেহ অতিরিক্ত সুদ পাইবার প্রলোভনে তাহাদের প্রাপ্য টাকা এ দেশেই ব্যাঙ্কে আমানত করিয়া রাখিয়া দেন। যাঁহাদের সদ্য সদ্য টাকার প্রয়োজন নাই; তাঁহাদের পক্ষে এই অতিরিক্ত সুদের প্রলোভন কম নহে। আর এই প্রলোভনেই বিদেশ হইতেও অনেক টাকা আকর্ষিত হইয়া আমদানী হইতে থাকে। অতিরিক্ত সুদ পাইবার প্রলোভনে অনেক বড় বড় ধনী, তাহাদের আপাততঃ অকর্ম্মণ্য টাকা এ দেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন। এ টাকা সোণার যোগেই প্রেরিত হয়। তাহার ফলে, সোণার

আমদানী বৃদ্ধি হইয়া, তাহার টান ও মন্দীভূত হইতে থাকে এই সকলই, তৎকালিক সমাদ্বিক ফল। এইরূপ ব্যাঙ্ক রেইট বৃদ্ধি করিয়া ব্যাঙ্ক-মজুতের পুষ্টি সাধন করিলে, পণ্য দ্রব্যের দরের হারের উপরে গভীরভাবে কার্য্য করিতে থাকে। ব্যাঙ্ক রিজার্ভের সহিত পণ্য-দ্রব্যের দরের হারের সম্বন্ধ কি তাহা যথা স্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে। বর্তমানে এই মাত্র বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্যাঙ্ক রেইট বৃদ্ধি করিলে, পণ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইয়া আসিতে থাকে; এবং তাহার ফলে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি হইয়া আমদানী হ্রাস হইতে থাকে। ব্যাঙ্কের তহবিল হইতে ঋণদান ঋণ-গ্রহণ করা সঙ্কুচিত হইয়া আসিলে, নগদ ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্র হইতে টাকা উঠিয়া আসিয়া ব্যাঙ্কের তহবিলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন প্রচলিত দরে বিনিময় করিতে, নগদ ক্ষেত্রে টাকার অভাব উপস্থিত হয়। তাহার ফলে টাকার টান বৃদ্ধি হইয়া নগদ ক্ষেত্রে পণ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। টাকার এই টান পূর্ণ করিবার জন্য ধারের ক্ষেত্র হইতে টাকা উঠাইবার টান বৃদ্ধি হইয়া তথায় মূল্য হ্রাস হইতে থাকে। বিশেষ নগদ ক্ষেত্রে মূল্য হ্রাস হইলে, ধারের ক্ষেত্রেও তাহা বিস্তৃত হওয়া স্বাভাবিক, দুই দরের বিক্রয় হওয়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ মূল্য হ্রাস হইলে, বিদেশ হইতে মালামালের আমদানী হ্রাস হইয়া থাকে, কেননা নিম্নগামী বাজারে আমদানী করিলে, ক্ষতি দেওয়ার কারণ উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে যাহারা এদেশ হইতে মাল চালান দেন, তাহারা এই কমী মূল্যে ক্রয় করিয়া বেশী মূল্যে বিক্রয় করার প্রত্যাশায় রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই ভাবে রপ্তানী বৃদ্ধি ও আমদানী হ্রাস হইয়া, একটা অভিনব সমতার প্রতিষ্ঠা হয়। সমতা ধার্য্য হইলে ব্যাঙ্ক রেইটও পুনরায় নামিয়া আসিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয়।

এই আলোচনা দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা দীর্ঘ সময়ের জন্য ঋণদানে বাহির করিয়া দেওয়া নিরাপদ নহে। আকস্মিক অর্ডার হইতে ব্যাঙ্ককে রক্ষা করিতে হইলে, যাহাতে সহসা টাকা তুলিয়া আনা যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থায়ও যাহাতে দৈনন্দিন বহুতর টাকা উঠিয়া আসে, এইরূপে ও এমন পাত্র দেখিয়া অতি সঙ্কীর্ণ ম্যাদে টাকা লগ্নি করা উচিত।

(সমাপ্ত)

রবীন্দ্র-কাব্য-সাহিত্যের ভূমিকা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীরাধাবল্লব নাগ]

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির এই বিশেষত্বের জন্যই তিনি বিচ্ছেদের মধ্যে আবার মিলনের সাক্ষাৎ পেলেন। বাল্যের পরে যৌবনে রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেমন এক নূতন সুর অনুভব করিয়া তাঁর কাব্যেও সেই সুর বেজে উঠেছিল। বাল্য কাটিয়ে নব যৌবনের প্রথম আলোক পাতের সূচনায় তাঁর হৃদয় পুলকে ভরে উঠেছিল—আবার যৌবনের প্রথম আবেশটা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি যেন নিজেকে ফিরে পেলেন—তখন তাঁর সমস্ত বেদনায় ক্রন্দন স্বরে পড়ে গেল। তখন জাগরণের গান—

বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক-রেখা।

প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি
থর থর করি কাঁপছে বারি
টলমল জল করে থল থল
কলকল করি ধরিছে তান।

এই জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির আর বিশ্ব-মানবের নানা লীলাখেলার সুরু হল—বিশ্বপ্রকৃতির আর বিশ্বমানবের মধ্যে যে বন্ধন তা প্রথমে শান্তির ভেতর দিয়েই এল। তাই নব বর্ষায় কবি দেখলেন—

ওগো নদীকূলে তীর তৃণদলে
কে বসে অমন বসনে
শ্যামল বসনে ?
সুদূর গগনে কাহারে সে চায় ?
ঘাট ছেড়ে ঘট কোথা ভেসে যায় ?

* * *

বিকচ কেতকী তট ভূমি পরে
কে বেঁধেছে তার তরণী
তরুণ তরুণী ?
ঝরে ঘনধারে নব পল্লবে
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে,
তীর ছাপি নদী কল-কল্লোলে
এল পল্লীর কাছে রে
হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মত নাচেরে।

যাত্রীর খেয়ানৌকা দেখে কবি গেয়ে উঠলেন—

আছে আছে স্থান
একা তুমি, তোমার শুধু
একটি আঁটি ধান।

* * *

এস এস নায়ে
ধূলা যদি থাকে কিছু
থাক্ না ধূলা পায়ে।

* * *

যাত্রী আছে নানা
নানা ঘাটে যাবে তারা
কেউ কারো নয় জানা।

তুমিও গো ক্ষণের তরে
বস্‌বে আমার তরীর পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মানবে না মোর মানা।
এলে যদি তুমিও এস
যাত্রী আছে নানা!
কোথা তোমার স্থান ?
কোন্ গোলাতে রাখ্‌তে যাবে
একটি আঁটি ধান ?
বল্‌তে যদি না চাও তবে
শুনে আমার কি ফল হবে ;
ভাব্‌ব বসে খেয়া যখন
করব্ অবসান—
কোন্ পাড়াতে যাবে তুমি
কোথা তোমার স্থান ?

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন শান্তির এই ক্ষণিকের হাওয়া মানব ও প্রকৃতি এই উভয়ের মিলনের ক্ষেত্রে শীঘ্রই শেষের দিকে ছুটে চল্ল—এর পরে নানা বিরোধের বৈপরিত্যের দ্বন্দ্বের এলোমেলো হাওয়া চারদিক থেকে বইতে আরম্ভ করল—কবি নিজে এই সময়কার কথায় বলেছেন—যে তাঁর কবিতা ক্রমে প্রকৃতির ধাপ থেকে মানুষের ধাপে উঠ্‌বে। "এই বড় আমিকে চাওয়ার আবেগ ক্রমে আমার কবিতার মধ্যে যখন ফুটতে লাগ্‌ল অর্থাৎ অঙ্কুররূপে বীজ যখন মাটি ফুঁড়ে বাইরের আকাশে দেখা দিলে, তারই উপক্রম দেখি, "সোণার তরীর" বিশ্বনৃত্যে।"

বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে
কে বাজাবে আজ বাজনা,
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সঙ্গীতে নূতন ছন্দ,
হৃদয় সাগরে পূর্ণ চন্দ্র
জাগাবে নূতন বাসনা।

(৫)

এ পর্য্যন্ত আমরা দেখে এলাম যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে নিজের জীবনের মধ্যে উপলব্ধি করবার জন্যে নিজেই নিজেকে অতিক্রম করে যে তীর্থ যাত্রা করেছেন সেই বিশ্বযাত্রার পথ কেবল একটা সরল রেখাতেই চল্‌ছিল—সেটা হচ্ছে শান্তং শিবং অদ্বৈতং। রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বযাত্রা বরাবর চলে এসেছে এবং আমাদের বিশ্বাস এ বিশ্বযাত্রার কখনও শেষ হবে না—শেষ হতে পারে না—কারণ এর শেষ নেই। তবে চলার সঙ্গে সঙ্গে পথের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বযাত্রা বাল্যকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পথ বেয়ে এসেছে—পরজীবনে তাঁর এই পথ এক থেকে বহু হয়ে নানাদিকে চল্‌তে আরম্ভ করেছে—তারপরে সেই সমস্তই আবার এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। "এই যে যাত্রা,—এর প্রথমে জীবন, তার পরে মৃত্যু, তার পরে অমৃত—"

সেই পথের মোহানায় যেখানে এসে কবির বিশ্বযাত্রার পথ বিভক্ত হয়ে গিয়েছে তার সম্বন্ধে কবি নিজেই বল্‌ছেন—"বিরোধ বিপ্লবের ভিতর দিয়ে মানুষ যে ঐক্যটি খুঁজে বেড়াচ্চে সেই ঐক্যটি কি? সেই হচ্ছে শিবং। এই যে মঙ্গল, এর মধ্যে একটা মস্ত দ্বন্দ্ব। অঙ্কুর এখানে দুই ভাগ হয়ে বাড়্‌তে চলেচে, সুখ দুঃখ, ভালোমন্দ। মাটির মধ্যে যেটি ছিল, সেটি এক, সেটি শান্তং, যেখানে আলো আঁধারের লড়াই ছিল না। লড়াই যেখানে বাধ্‌ল সেখানে শিবকে যদি না জানি তবে সেখানকার সত্যকে জানা হবে না। এই শিবকে জানার বেদনা বড় তীব্র। এইখানে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" কিন্তু এই বড় বেদনার মধ্যেই আমাদের ধর্ম্মবোধের যথার্থ জন্ম। বিশ্বপ্রকৃতির বৃহৎ শান্তির মধ্যে তার গর্ভবাস। আমার নিজের সম্বন্ধে নৈবেদ্যের দুটি কবিতায় এ কথা বলা আছে।"

১

মাতৃ-স্নেহ-বিগলিত স্তন্যক্ষীর রস
পান করি হাসে শিশু আনন্দে অলস,
তেমনি বিহ্বল হর্ষে ভাব-রসরাশি
কৈশোরে করেছি পান; বাজায়েছি বাঁশি
প্রমত্ত পঞ্চম সুরে, প্রকৃতির বুকে
লালন-ললিত চিত্তে শিশুসম সুখে
ছিনু শুয়ে; প্রভাত শর্ব্বরী সন্ধ্যাবধূ
নানা পাত্রে আনি দিত নানাবর্ণ মধু
পুষ্পগন্ধে মাখা। আজি সেই ভাবাবেশ
সেই বিহ্বলতা যদি হয়ে থাকে শেষ,
প্রকৃতির স্পর্শমোহ গিয়া থাকে দূরে
কোন দুঃখ নাই। পল্লী হতে রাজপুরে
এবার এনেছ মোরে,—দাও চিত্তে বল,
দেখাও সত্যের মূর্ত্তি কঠিন নির্ম্মল।

২

আঘাত সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল কণ্ঠ অলঙ্কার রাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি'
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহ
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
কর মোরে সম্মানিত নব বীরবেশে,
দুরূহ কর্ত্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষত-চিহ্ন অলঙ্কার। ধন্য কর দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন
কর্ম্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

এই বিরোধ বৈপরিত্যের মধ্যে যে নানা বিচিত্র সুর বেজে উঠেছিল তার মধ্যে কবি নিজের অন্তরে যাঁর অনুভবের পরিচয় পেয়েছিলেন সেই অনুভবটাও যে কত বিচিত্র তার কথা আমরা এবার বল্‌বার চেষ্টা করব। সমগ্র বিচিত্রতার পরিচয় দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত—আর সেটা সম্ভবও নয়—তবে যে গুলো আমাদের মত ক্ষুদ্রের প্রাণেও আঘাত করেছে সেই গুলোর কথাই আমরা বল্‌তে চেষ্টা করব।

(৬)

কবি যে অভিসার যাত্রা করেছেন সে অভিসার কার ?

ওগো পথিক দিনের শেষে
চলেছ যে এমন বেশে ;
কে আছে বা সেইখানে
কে জানে ভাই কে জানে
বুকের কাছে আমার সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তার
শুনেছি নাম জ্যোৎস্নারাতের স্বপনে।
অপূর্ব্ব তার চোখের চাওয়া
অপূর্ব্ব তার গায়ের হাওয়া।
অপূর্ব্ব তার আসা যাওয়া গোপনে।

কিন্তু কবি কি সত্যই তাঁর পরিচয় পান নি—তাও নয়—বিচিত্র মানবের পরিহাস আঘাতে কবি সে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন—

আমি যে তোমায় জানি, সে ত কেউ
জানে না।
তুমি মোর পানে চাও, সে ত কেউ
মানে না।
মোর মুখে পেলে তোমার আভাস
কত জনে কত করে পরিহাস,
পাছে সে না পারি সহিতে
নানা ছলে তাই ডাকি যে তোমায়
কেহ কিছু নারে কহিতে।
তোমার পথ যে তুমি চিনায়েছ
সে কথা বলিনে কাহারে।
সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।
স্তব্ধ তোমার উদার আলয়,
বীণাটি বাজাতে মনে করি ভয়,
চেয়ে থাকি শুধু নীরবে।
চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে।

কিন্তু এই যে পরিচয় অস্পষ্ট হাসিটুকু, কথাটুকু, গানটুকু চকিতের ছায়া, ক্ষণিকের আলোক এ মিলনে ত প্রাণ তৃপ্ত হয় না—যত পাওয়া যায় ততই আরও বেশী পেতে ইচ্ছে করে—অবশেষে তার সমস্তটা তার আত্মা পর্য্যন্ত না পেলে তৃপ্তি হয় না—কিন্তু তাতেও বোধ হয় তৃপ্তি নেই—

অসীম অতৃপ্তি লয়ে মাঝে মাঝে ফেলিছ নিশ্বাস
আকাশ-প্রান্তরে তাই কেঁদে উঠে প্রলয় বাতাস—

কিন্তু প্রত্যেক নিমেষে কবি যতই পাচ্ছেন—আশা আর মিটে না—কবি সমগ্রভাবে পেতে চান অসীম তারে পেতে চান—

আমরণ চিরদিন, কেবলি খুঁজিব তোরে
কখন কি পাবনা সন্ধান!
কেবলি কি রবি দূরে অতি দূর হতে
শুনিব রে ওই আধ গান!
এই বিশ্ব জগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্য্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবন পথে খুঁজিয়া চলিব তোরে
প্রাণ মন হইবে উদাসী।
তপনেরে ঘিরি ঘিরি যেমন ঘুরিছে ধরা,
ঘুরিব কি তোর চারিদিকে!
অনন্ত প্রাণের পথে বরিষিবি গীতধারা
চেয়ে আমি রব অনিমিখে!
তোরি মোহময় গান শুনিতেছি অবিরত
তোরি রূপ কল্পনায় লিখা,
করিস্‌নে প্রবঞ্চনা সত্য ক'রে বল দেখি
তুইত নহিস্ মরীচিকা ?
কতবার আর্ত্তস্বরে শুধায়েছি প্রাণপণে
অয়ি তুমি কে [illegible]—কোথায়—
অমনি সুদূর হতে, [illegible]কন তুমি বলিয়াছ
"কে জানে কোথায় ?"
আশাময়ী ওকি কথা! তুমি কি আপনাহারা
আপনি জাননা আপনায় ?

কিন্তু তুমি যে অশেষ—অসীম—তোমাকে পেলেই যে সব শেষ হয়ে যাবে তাই ত তোমাকে পেয়েও পাই না—সমগ্র মানবকে মানবের আত্মাকে ত পাওয়া যায় না। অনন্ত কাল ধরে যুগযুগান্ত ধরে কেবলি খুঁজে চলা।

খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকান তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য-শিখা।

*　　*　　*

যাহা পাস্ তাই ভালো,
হাসিটুকু কথাটুকু
নয়নের দৃষ্টিটুকু
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস্
একি দুঃসাহস!

*　　*　　*

আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

তা হলে আত্মা কি? আত্মাকে যখন পাওয়া যায় না তখন কি আত্মা নেই?

তাই কি? সকলি মায়া? আসে, থাকে, আর মিলে যায়? কিন্তু তাত নয়—

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।

যে আত্ম-বিসর্জ্জন করতে পারে তারই আত্মার পরে অধিকার জন্মেছে বলতে হবে—দান করবার অধিকারই সব চাইতে বড় অধিকার। রবীন্দ্রনাথ কুসুম কোমল পথ দিয়ে দরিদ্রের মত অভিসার যাত্রা করেন নি—

ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

তিনি যে "ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে সাবধানে অন্তর প্রদীপ খানি জালিয়ে নিয়ে অন্ধকার রাত্রে" অভিসার যাত্রা করেছেন। তাঁর যাত্রা ত সুখের নয়—সে যে আনন্দের যাত্রা। তাই যে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলছেন—

নাই বুঝি, নাই চিনি, তাই তা'রে জানি,
ধর তার পাণি;—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তা'র দীপ্তবাণী!
ওরে যাত্রী—

তাকে চিনবার দরকার নেই, জানবার দরকার নেই, বুঝবার দরকার নেই। আমি যদি আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে পারি, তাহলেই আত্মার পরে আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার লাভ হবে। যার অভিসারে কবি চলেছেন, তাঁর আহ্বান গীত যে শুনেছে সে আত্মবিসর্জ্জন ত দূরের কথা—

ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জ্জন—

সে নির্ভীক পরাণে বিশ্ববিসর্জ্জন দিয়েছে। ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি এই রকম নানা বিপরীত দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে নিজের অভিসার যাত্রায় কবি কেবল শিবংকেই জানবার চেষ্টা করে এসেছেন—যদি ঝড়ের মধ্যে, দুঃখের মধ্যে, অশান্তির মধ্যে সেই শিবং থাকেন তবে তাকেই চাই—তাকেই আমি নেব। দুঃখকে আমি আনন্দে বরণ করে নেব, সমস্ত ত্যাগ, শোক, বিরহ, দহনের মধ্যে আমি সেই শ্রেয়কে আশ্রয় করে শিবংকে স্পষ্ট করে জানব—যদিও এর বেদনা বড় তীব্র কিন্তু—

আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষে পরাণ নাচে
আমি যে তাই চাই—
আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ
দুঃখেরি সাথে দুঃখেরি ত্রাণ
তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহিনা মুকতি।

শুধু যে এই জানারই বেদনা আছে তা নয়—যেখানে জানার সূত্রপাত হয়েছে সেই পথ ও সুখের নয়।

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ
শ্রাবণ-রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

কিন্তু কবি যে শ্রেয়কে চেয়েছেন এই ত সেই শ্রেয়। যে ধাত্রী কবির অন্তর-ধাত্রী সে কে ?

ও রে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

দেখা যাচ্ছে এ যাত্রার আরাম নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই।

ভেবেছিলাম বোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
ল'ব তোমার অঙ্ক
হেন কালে ডাক্‌লে বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।
* * *
তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল র'ব
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
বাজ্‌বে জয়ডঙ্ক।
দেবো সকল শক্তি, ল'ব
অভয় তব শঙ্খ।

বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত মাধুর্য্য এবং শান্তির মধ্যে বিরাট মানবের আগমন পরিপূর্ণভাবে ঘোষণা করল ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত। কিন্তু কবি তাকেও মহানন্দে বরণ করে নিলেন। এর ফলেই যে অসীমের আবির্ভাব হল নানা দ্বন্দ্ব, বিরোধ, দুঃখের ভিতর দিয়ে, কবি সেই অসীমকে এমন সহজে এমন পরিচিত ভাবে আহ্বান করে নিলেন। অশান্তির ভিতরে যে শান্তি রয়েছে সেই ত প্রকৃত শান্তি। অশান্তিকে বাদ দিয়ে যে শান্তি—সে ত শান্তি নয়। এ শান্তির মধ্যে ত আরামের স্থান নেই, বিলাসের স্থান নেই, আলস্যের স্থান নেই। যে বিরাটের একদিকে শান্তি আর একদিকে অশান্তি, একদিকে দুঃখ আর একদিকে সুখ, একদিকে জীবন আর একদিকে মৃত্যু, সেই বিরাটের খালি সুখ, শান্তি আর জীবনকে দেখতে পেলে তার সঙ্গে পরিপূর্ণ পরিচয় কখনই হতে পারে না আবার খালি অশান্তি, দুঃখ আর মৃত্যুর পরিচয় নিয়েই তার সঙ্গে বোঝাপড়ার শেষ হয় না। "কিন্তু সেই সঙ্গে একথা মান্‌তেই হবে সেটা কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়। চরম কথাটা হচ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতং। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হত তা হলে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা কোনো আশ্রয় পেত না—তা হলে জগৎ রক্ষা পেত কোথায়? তাইত মানুষ তাঁকে ডাকছে রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং—রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তার দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। চরম সত্য এবং পরম সত্য হচ্ছে ঐ প্রসন্ন মুখ। সেই সত্যই হচ্ছে সকল রুদ্রতার উপরে। কিন্তু এই সত্যে পৌঁছিতে গেলে রুদ্রের স্পর্শ নিয়ে যেতে হবে। রুদ্রকে বাদ দিয়ে যে প্রসন্নতা, অশান্তিকে অস্বীকার ক'রে যে শান্তি, সে ত স্বপ্ন, সে সত্য নয়।" সুতরাং সোজা কথা হচ্ছে—

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও সে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান॥

(ক্রমশঃ)

সহজিয়া

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট]

সে এতদিন যে কথা জানতে পারেনি, কেউ যে কথা দুণাক্ষরেও টের পায় নি সেই গোপন কথা আমি তিন কথায় জানিয়ে দিয়ে বল্লাম, "ভাই আর গোপনতা নয়, তুমিও আপনাকে প্রকাশ করেছ, আমিও আমাকে প্রকাশ করলাম। এখন এই সত্যকে স্বীকার কর। প্রাণপণ বলে একে বুকের মধ্যে টেনে নাও—তুমি আমি হয়ে যাও; হয়ে গিয়ে, যিনি আমায় এতদিন ধরে তোমার মধ্যে পেতে চেষ্টা করছেন, সাধনা করছেন তাঁর পানে সেই আমাকে নিবেদন কর—তোমার বুকের মধ্যে বসে সেই সাধনার ধনকে চির অপ্রাপ্যকে পেয়ে ধন্য হই। বন্ধু, গুরু, শিষ্য, তুমি আমার কাছে হার স্বীকার করে, আমাকে তোমার অন্তরস্থ কর। আর নয় ভাই—আর মিথ্যা ভয়ের মধ্যে থেকো না। অভয়কে আশ্রয় কর।"

আমার কথা শেষ হতে না হতে বন্ধুর সর্ব্বশরীরে ভয়ানক কম্পন দেখা দিল, দেখতে দেখতে তার সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠল। মদন ভষ্মের পূর্ব্বে বুঝি সেই মহাযোগীর দেহ এমনি ভাবে জ্বলে উঠেছিল—বুঝি সেই ভবনেত্রজন্মা অগ্নিও এই দুই চোখের আলোর মতই জ্বলে উঠেছিল। সন্ন্যাসী হঠাৎ একেবারে তাঁর তুরীয় দেশে চলে গিয়ে দহরাকাশ হতে বজ্রবিদ্যুৎ বর্ষণ করে বল্লেন, "নেহি—নেহি—নেহি ম্যায় নেই চাহতো হুঁ কুচ নেই চাহতা হুঁ;

> অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপঃ
> বিভুর্ব্বাচ্চ সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং।
> মমৈকান্তিকত্বাৎ মুমুক্ষেক সিদ্ধ
> স্তদেকো বশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহং।"

আমি তাঁর হাত ধরতে গেলাম—তিনি আমার হাত ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন "চুপ কর তুমি, সরে যাও তুমি, আমি হারিনি। তুমি সত্য হতে পার কিন্তু আমিও অসত্য নই। তুমি কেবল জয়লাভ করবে—আমারও কি জয় হবে না? সহজই জিতবে আর সাধনাই হারবে? না তা কিছুতেই হবে না। এই জয়লাভ করলাম, আমি কেবল তোমার যন্ত্র নই, আধার নই, আমি তোমার প্রভু! তোমার স্বামী, তোমার তুরিয়ানন্দ!"

আমি কিন্তু ভয় পেলাম না—ভয়? তখন আমিও যে তুরিয়ানন্দে—তাই হেসে বল্লাম, "তুমিই ত আমার প্রভু।" কিন্তু তুরিয়ানন্দ বল্লেন, "নেহি—নেহি—আমি আর কোনো কথা শুনব না তুমি যাও, আমিও এই চল্লাম। তোমার জয় হয়েছে কিন্তু আমিও হারিনি হারতে পারি না।"

"শিবোহং শিবোহং" ধ্বনি করতে করতে সেই মহা ত্যাগী সন্ন্যাসী বেরিয়ে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর সেই গতিশীল মূর্ত্তির দিকে চেয়ে সেই আসনের উপরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে দিনের উজ্জ্বল জ্যোতির মধ্যে তাঁর দেহ মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ একটা অস্ফুট কাতর ধ্বনিতে আমি ফিরে চেয়ে দেখি, আমার পশ্চাতের দরজার চৌকাঠের উপর কে ঐ লুটুচ্ছে। ও কে? ও যে আমার হাসি! আমি ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে তুলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে উঠলে না, শুধু উপুড় হয়ে পড়ে চীৎকার করে বল্লে "নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর—মিথ্যাবাদী।—"

আমি বসে পড়ে বল্লাম "না হাসি না, আমি মিথ্যাবাদী

নই। আমি সত্যই বলিছি কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না, বুঝতে পারলে না, এইটাই দুঃখ। কিন্তু তুমি যদি বিশ্বাস না কর তাহলে আমার সবই বিফল।"

হাসি একবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে, তারপর আবার মুখ লুকিয়ে বল্লে "কি করে বিশ্বাস করব তোমায়? যে এতবড় একটা ব্যাপার এতদিন গোপন করে রাখতে পেরেছিল, তাকে কি করে বিশ্বাস করব।"

আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল—হায়রে সহজিয়া! তোকে ত' কেউ চায় না, কেউ চাইতে পারে না। যা অসহজ যাকে বিশ্বাস করতে মাথামুড় খুঁড়তে হয়, যে বিশ্বাস করাটা চেষ্টা করে শিখতে হয়, সেই বিশ্বাসের উপর মানুষ নির্ভর করতে পারে। আর যে বিশ্বাস অন্তরাত্মা থেকে সহজে উঠছে সেটার উপরে কেউ নির্ভরই করতে পারে না। আমার হাসি যখন সহজ অবস্থায় ছিল, সেই আমাদের প্রথম দেখাদেখির সময় সে কত না সহজে আমাকে বিশ্বাস করে অন্তরে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু যেই তার মধ্যে ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের ভাব জেগে উঠল সেই হতেই সে অসহজ হয়ে গেল। না গো না কেউ এই সহজ ধর্ম্ম বুঝবে না।

এই যে সন্ন্যাসী এতদিন এখানে আমারই আসনে, আমাকেই বুকে নিয়ে বসেছিল সেই সন্ন্যাসীর মধ্যে এরা আমায় বিশ্বাস করেছিল, আমায় পেয়েছে বলে ধরে নিয়েছিল; কিন্তু এই বিশ্বাস কি সহজের না চেষ্টা করে আনা? এই বিশ্বাসের জন্য এদের কত না চেষ্টা করতে হয়েছে, কারণ ঐ মহাত্যাগীর মধ্যে আমাকে পেতে হলে যে না পাওয়া দিয়ে পেতে হবে তুরিয়ে গিয়ে পেতে হবে। সে পাওয়া ত সহজ নয়, তাই সে পাওয়া আজ না পাওয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল। আর এই যে আমি সহজে ধরা দিয়েছি এ যে একেবারে পাওয়ার বস্তু তাই এই অসহজের মানুষরা আমায় গ্রহণ করতে পারছে না। বুঝি এখন সহজ হতে হলে আবার উল্টো সাধনা করতে হবে—অস্তিত্বকে উল্টো পাকে ঘোরাতে হবে। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে হাসি উঠে বসল, তারপর প্রশ্ন ভরা অশ্রুআর্দ্র চক্ষে ভীতভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, "বল তোমায় কি করে বিশ্বাস করব।"

আমি উদাস চক্ষে চেয়ে বল্লাম, "সহজে যদি বিশ্বাস করতে না পার, তোমার মধ্যে যে আছে যদি তার কথায় বিশ্বাস না হয়, ত' আমি হাজার বল্লেও বিশ্বাস করবে না। তুমি যখন সহজেই আমায় বিশ্বাস করে ছিলে তখনি আমায় পেয়েছিলে। সে বিশ্বাস তোমায় শিখতে হয় নি তার জন্য সাধনা করতে হয় নি তার জন্য তপস্যা করতে হয় নি। তাই আমাদের সে মিলন—পূর্ণ হয়েছিল আনন্দের হয়েছিল। কিন্তু এখন তুমি সে মিলনকে অসহজের অবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে ছেঁকে নিতে চাও—তা হবে না। আমি কিন্তু সহজেই তোমায় পেয়েছি, সহজেই তোমার হয়েছি। যিনি আমায় সাধনা করে তপস্যা করে পেতে চাচ্ছিলেন তাঁকে আমি তপস্যার মধ্যে দিয়ে পেয়েছি—না পাওয়ার মধ্যে দিয়ে পেয়েছি। তাই আমার মধ্যে দুইটাই সত্য হয়ে উঠেছে। এ যে কি রকম সত্য তা যে বোঝাতে পারলাম না—বুঝি বোঝান যায় না। না যায় না যাক তবু এইটেই সত্য, যে, পাওয়ার ধন পাওয়া দিয়েই পেতে হবে এবং না পাওয়ার ধন না পাওয়া দিয়েই পেতে হবে, চির সাধনা, চির তপস্যা, চির বিরহ দিয়েই পেতে হবে। এই মহাসত্য এই মহামুহূর্ত্তে আমার জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু তুমি তা বুঝবে কি? বুঝবে কি, যে ঐ যে সন্ন্যাসী এই আসনের উপর এতদিন বসে ছিলেন ওরই মধ্যে আমিই ছিলাম, ওরই মধ্যে আমি আমার চির বিরহের পাওয়াকে চির ত্যাগের পাওয়াকে সত্য করেছি। আর এই যে আমি স্থূলদেহ হয়ে, নিতান্তই ধরা ছোঁয়ার জিনিষ হয়ে চির পাওয়ার ধন তোমাকে পেয়েছি নিতান্তই ধরে ছুঁয়ে পেয়েছি এর মধ্যেও আমি সত্যকেই পেয়েছি। আমার এই সব কথা এখন হয় তো বুঝতে পারবে না, কিন্তু যদি কোনোদিন তোমার মধ্যকার সহজ মানুষটার সঙ্গে পরিচয় হয় তা হলে ধরতে পারবে। বুঝতে পারবে যে এই যে সহজে তোমার মুখানি হাতের মধ্যে নিজেকে ধরা দিয়েছে, তাকেই তোমরা ঐ সন্ন্যাসীর মধ্যে খুঁজেছ—

হয়ত পেয়েও ছিলে—কিন্তু কোনোখানেই তোমরা আমায় বিশ্বাস করে নিতে পারলে না।

আমার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে শুনতে হাসি যেন অভিভূতের মতই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমার শেষ কথাকটা শেষ হবার পূর্ব্বেই সে নিশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে তারপরে বল্লে, "না—না আমি ত' সন্ন্যাসীকে চাই নি, ঐ আসনে যিনি ছিলেন তিনি আমার কেউ নন। সন্ন্যাসীকে যিনি আজন্ম চেয়ে আসছেন, তিনি ঐ দেখ কাঠের মত দাঁড়িয়ে তোমার এই সব হেঁয়ালীর কথা শুনছেন। জানি নে উনি বুঝতে পেরেছেন কি না। কিন্তু আমায় যে না বুঝেও বুঝতে হচ্ছে, তুমি যে আমার সব বোঝার ওপরে উঠে গেছ। দিদি "

আমি চেয়ে দেখলাম—কি দেখলাম! দেখলাম আমার সেই চির মৌনতার চির সাধনার চিরকালের না পাওয়ার ধন চিরবিরহের ব্যবধানের পারে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পার্শ্বেও বোধ হ'ল সেই মূক মেয়েটী যারে আমি সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে এদের কাছে দিয়ে গিয়েছিলাম সেই বাক্যহারা মানুষটীও কি যেন বলবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

হাসির ডাকে সেই মৌন প্রতিমার যেন চমক্ ভাঙ্গল। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বল্লেন, "হাঁ ভাই আমি সন্ন্যাসীকেই চেয়েছিলাম, তাই তাকে পেয়েছি।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "আমি যাকে পাবার জন্য এই আসন পেতে সেই আসনের তলে আমাকে সমাহিত করে রেখেছিলাম সে আপনি নন—"

আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম, কি যে বলতে যাচ্ছিলাম তা স্মরণ নেই তবে এইটুকু মনে আছে যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা চীৎকার করে বলতে যাচ্ছিল, সেই আমি—সেই আমি—ওগো আমি সেই। কিন্তু আমার অন্তরের কথা [illegible] এক চিরমৌন আবরণ ভেদ করে উঠল, মহাদুঃখে মর্ম্মবেদনায় যে মূক হয়ে গিয়েছিল বাক্য হারিয়েছিল, সেই অকাল মূক মানুষটা চীৎকার করে বলে উঠল—আপন সহজ ভাষায় বলে উঠল—"নেহি—নেহি—সোহি হ্যায়, ইয়ে সোহি হ্যায়।"

হাসি উর্ম্মিলা দুজনেই ভয়ানক চমকে উঠল। উর্ম্মিলা ক্ষণকাল সেই উন্মত্তপ্রায় মানুষটার দিকে চেয়ে তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "কথা কইলি বোন, এতদিন পরে কি তুই কথা খুঁজে পেলি? আঃ বাঁচলাম। হ্যাঁ ইনি তিনিই, ভয় নেই আমি একবারও অবিশ্বাস করি নি।" তারপর আমার দিকে ফিরে বল্লেন, "তবু আপনি তিনি নন, আমি এই আপনাকে কখনো চাই নি, আমি যারে চেয়েছিলাম সে হয়ত নেই। নেই? না না তা কেন? সে হয়ত কেবল আমার অন্তরেই আছে আর কোথাও নেই। কোথাও কখনো ছিল না। কিন্তু আমি তা আগে জানতে পারি নি। জানলে হয়ত তাকে পাবার জন্য এমন করে বাইরে আসন পাততাম না। সে যে বাইরে পাবার নয়—সে যে—"

বলতে বলতে উর্ম্মিলা দেবী এমন ভয়ঙ্কর কাঁপতে লাগলেন যে দেখে আমার ভয়ানক ইচ্ছা হল যে বলি 'ওগো আমি সেই, তুমি আমায় বিশ্বাস কর।' কিন্তু সে কথাও আমায় বলতে হল না। হাসি চকিতে উর্ম্মিলার পাশে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বল্লে—"না দিদি না এ যে সেই—এ যে তোমারই সেই চির সাধনার ধন। একে এর বেশ দেখে অবিশ্বাস ক'র না।"

উর্ম্মিলা দেবীর পা থেকে মাথা অবধি হঠাৎ ভয়ঙ্কর উজ্জল হয়ে উঠল। তিনি সতেজে বলে উঠলেন "অবিশ্বাস! তবে এতদিন ধরে এই মহামানুষটীর কাছে তুই ছিলি কি করে? একে অবিশ্বাস করব এতখানি শক্তি আমার নেই হাসি। আমি যখন এসে দেখলাম এই মহাপুরুষের বুকের ভেতর সেই মহাত্যাগী মহাজ্ঞানী মানুষটীও ছোট্ট হয়ে শিশুর মত পরম নির্ভয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তখন হতেই যে আমার সব অবিশ্বাস চলে গিয়েছে। তারপর যখন সবই শুনলাম তখন আর অবিশ্বাস কোথায় থাকবে কোথায় থাকতে পারে? অবিশ্বাসের স্থান অবিশ্বাসের অস্তিত্ব সে যদি থাকত তাহলে কি এতদিন পরে এই মূক মানুষটী কথা ফিরে পেত? অবিশ্বাসকে আমরা গড়ে তুলি। অবিশ্বাস গড়ে ওঠে, বিশ্বাস সহজেই জন্মায় জন্মের সঙ্গে জন্মায়। না, আর আমার মধ্যে অবিশ্বাস

নেই। কিন্তু আমি বলছি আমি এঁকে চাই না কখনো চাই নি। জন্ম হতে চাইতে শিখিও নি জন্ম হতে একে সহজে চাইও নি। আমি যারে চাই তাকে সহজে পাওয়া যায় না। তাকে পাওয়া চিরদিনই না পাওয়া।

হাসি এইবার হেসে উঠল—কিন্তু সে হাসি প্রায় কান্নারই মত সেই চির ক্রন্দনের কক্ষে চির বিরহ সাধনার কক্ষে ধ্বনিত হল। হাসি হেসে বল্লে "মিথ্যে কথা, আমি তোমাদের ও হেঁয়ালির কথা বুঝি নে—বুঝতে চাই নে।"

উর্মিলা তার হাত দুটো চেপে ধরে আমার হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "তুমি বুঝোনা বোন, তোমার না বোঝাই সার্থক হোক, তুমি এমনি করে চিরদিন যেন এঁকেই পাও।"

কিন্তু হাসি হঠাৎ তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উর্মিলাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "না—দিদি না এই যে তোমার চির সাধনার ধন, একে এমন করে পায়ে ঠেল না। তুমি যদি না একে বেঁধে রাখ তা হ'লে কে এই মহাসন্ন্যাসীকে বেঁধে রাখবে? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে ইনি বাইরে যাই সাজুন অন্তরে সেই তোমার চির সাধনার সন্ন্যাসী—আর কিছুই নন।"

উর্মিলা আবার আমার দিকে ফিরলেন, তারপর তাঁর বিশাল নয়ন দুটো আমার মুখের ওপর একাগ্র করে বল্লেন "আমি সেই সন্ন্যাসীকেই পেয়েছি—বল তুমি আমার সে সাধনা কি অসিদ্ধ হয়েছে? তোমায় কি আমি পাই নি? বল তুমি, তুমিও কি আমায় পাও নি?"

হায় দেবি! তোমায় যদি না পেয়েছি তা হ'লে কি করে এই জগতে এতদিন জেগে আছি? কে আমায় চিরদিন বেদনা দিয়ে আঘাত দিয়ে জাগিয়ে রেখেছে। সে যে তুমি, চিরদুঃখরূপিণী, চির আশারূপিণী চির বিরহরূপিণী চির প্রতীক্ষারূপিণী তুমিই যে আমার সেই চির সঙ্গিনী। যাকে পাবার জন্য বেরিয়েছিলাম, যাকে পাবার জন্য সাগর ভূধর প্রান্তর নগর সর্ব্বত্র খুঁজেছি সেই পরম দুঃখই যে তুমি তাকে বাইরে পাই নি কারণ বাইরে যে আছে সে যে এই হাসি। সে ত দুঃখ নয় বেদনা নয় যে বেদনায় ফুল ফুটছে, বাতাস বইছে, তারা নক্ষত্র সূর্য্য চন্দ্র সবই ছুটছে সেই পরম শক্তিরূপিণী তুমিই যে আমার! তোমায় ত কেউ চায় না। চাইতে পারেই না যে। চায় যাকে সে হচ্ছে এই আমার চির সুখময়ী চির মিলনময়ী হাসি। কিন্তু তুমি আমার জগতের না চাওয়ার ধন তুমিই আমার জগতের চিরন্তন দুঃখ! তাই তুমি অসহজ—তাই তোমায় সহজের মধ্যে পেতে যাওয়া ভুল—আমি সহজের মানুষ হয়ে তোমায় সে ভাবে চাইব কেন? পাবই বা কেন? আমি সহজিয়া তাই তোমায় চিরন্তন অফুরন্ত চাওয়ার মধ্যেই পেলাম, পাওয়ার মধ্যে চাইতে পারব না গো পারব না।

আমি এত কথা এমন করে তাকে বলতে পারি নি তবু যা বলেছিলাম তাতেই সে বুঝেছিল, বিশ্বাস করেছিল। তাই সে আমার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ হাসির হাত দুটো আমার হাতের মধ্যে চেপে ধরে বল্লে "তুমি তুমি—ওগো আমার চিরন্তন দুঃখ তোমায় এই সুখময়ী হাসির মধ্যে ত্যাগ করে পেলাম—পেলাম—পেলাম। আমি তোমারি—তোমারি—।"

তারপর সেই মহাযোগিনীর দুটী বিশাল চক্ষু আমার মুখের ওপর তার সমস্ত বেদনা নিয়ে বিরহ নিয়ে সাধনা নিয়ে চিরদিনের জন্য লয় হয়ে গেল। হাসি ভীত ভাবে ডাকলে "দিদি।" কিন্তু কে উত্তর দেবে? সেই মূক বালিকা তার নবলব্ধ বাকশক্তিকে যথাসাধ্য সজোরে ব্যবহার করলে, কিন্তু যে সব উত্তর প্রত্যুত্তরের বাইরে সব বিশ্বাস অবিশ্বাসের ঊর্দ্ধে সত্যলোকে চলে গিয়েছে তাকে কে ডেকে আনবে?

আমি সেই সমাধিস্থ দেহকে ধীরে ধীরে তারই পাতা আসনের ওপর শুইয়ে দিলাম। তারপর সেই অপরূপ অপলক নয়ন দুটীর মধ্যে চেয়ে চেয়ে ডুবে গেলাম। হাসি ও অপলক দৃষ্টিতে সেই মুখের দিকে চেয়ে রইল—ত্রিবেণীসঙ্গম পূর্ণ হয়ে গেল। ঐ যোগমগ্ন নয়নের মধ্যে ঐ সরস্বতীর গুপ্তস্রোতে আমার অস্তিত্বের গঙ্গা হাসির প্রেম যমুনা যুক্তও হল, মুক্তও হল।

হয়ত আমাদের এই ত্রিবেণী সঙ্গম কেউ অন্তরঙ্গম

করতে পারবে না। হয়ত বলবে, যে, 'এত কথার কি দরকার ছিল? সোজা বল্লেই হ'ত যে উর্ম্মিলা দেবী যখন জানতে পারলেন যে তুরিয়ানন্দ তাঁর স্বামী নয় তখন সেই সতী লক্ষ্মী এমন আঘাত পেলেন যে সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হল।' কিন্তু আমি বলব—না তা নয়, আমার জানকী তাঁর রঘুনাথকে পেয়েছেন চিরদিনই পেয়েছেন। ঐ ত্যাগীর মধ্যেও পেয়েছেন এবং আজ এই ভোগীর মধ্যে আমার মধ্যেও পেলেন। আমার অস্তিত্ব যেমন সত্য তাঁর অস্তিত্বও আমার কাছে তেমনি সত্য। স্থূলরূপিণী মিলনরূপিণী সহজরূপিণী হাসি আমার যেমন সুখের দিক সেই বিরহরূপিণী দুঃখরূপিণী চিরসাধনারূপিণী উর্ম্মিলাও আমার অস্তিত্বের আর এক দিক—দুঃখের দিক। আমার অস্তিত্বের দুই পিঠ বা পীঠ রূপ যারা আমাতেই আছে, আমাকেই পেয়েছে। আমিই তাদের দুজনকে ধরে চিরন্তন অস্তিত্বরূপে অখণ্ড হয়ে আছি। এক সঙ্গে এই অস্তিনাস্তিকে সুখদুঃখকে স্বীকার করাই সহজ দর্শন। একই কেন্দ্রে এই দুইকে স্বীকার না করাই ভুল—মায়া মিথ্যা। কেবল সুখকে চাইলে সুখ থাকে না, ছুটে পালায়. আর কেবল দুঃখকে ত' কেউ চায় না—কিন্তু আমি জানি মানুষ অন্তরে অন্তরে এই দুটোকেই চায় এবং এক সঙ্গেই চায়। দোষের মধ্যে এইটুকু যে সে জানে না যে সে এক সঙ্গে এবং সহজেই যে এই দুটোকে চাচ্ছে। এই অজ্ঞানই তাকে এই পরম অদ্বৈতের আনন্দ হতে বঞ্চিত করেছে। এই দ্বৈতকে ধরেই যে তার অখণ্ডানন্দের অদ্বৈত অস্তিত্ব এইটিই জানে না বলে সে গতির মধ্যে চঞ্চলের মধ্যে স্থির হতে পারে না, তাই আনন্দের হাটে এসে কেবল নিরানন্দকেই কিনে বেড়ায়।

ত্রিবেণী সঙ্গমে লুপ্ত না হয়ে, কেবল গুপ্ত হয়ে সেই সরস্বতী ধারা চিরতরে রয়ে গিয়েছে। সেই আসনে আর কাউকে কেউ দেখতে পায় না বটে কিন্তু আমি জানি আর আমার সহজের ধন হাসিও জানে, যে, সে আছে তাই আমি আছি, হাসি আছে জগৎ আছে। সেই আছে তাই আলো আছে অন্ধকার আছে, সুখ আছে দুঃখ আছে, জ্ঞান আছে, অজ্ঞান আছে, ধর্ম্ম আছে অধর্ম্ম আছে, সে আছে তাই এই সারা বিশ্ব তার সমস্ত-স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ তুরিয় নিয়ে নিয়তই আছে। তোমরা তাকে না দেখতে পাও নাই বা পেলে, কিন্তু ঠিক জেনো যে সেই মহা বিরহ মিলনের দিনে সে আমারি মাঝে মহাত্যাগ যোগের দ্বারা আপনাকে লয় করেছে কিন্তু বিলয় করেনি। সে দিন মহাত্যাগের দ্বারা মহাভোগের মধ্যে অচল হয়ে সচল হয়ে জীবনের জীবন মনের মন আত্মার আনন্দরূপে হাসিও আমার মাঝে আছে, সে আছে—আছে—আছে।

আনন্দের দুই পিঠ সুখ এবং দুঃখ মিলন এবং বিরহ। আমারও দুই পিঠ হাসি ও উর্ম্মিলা। একজন ব্যক্ত আর একজন অব্যক্ত। এই দুইজনকে ধরেই আমার অখণ্ডানন্দের অস্তিত্ব। আমি সেই আনন্দে ডুবে আছি ভাই! তোমরা আশীর্ব্বাদ কর ভাই যেন সেই অখণ্ডানন্দেই ডুবে থাকি।

ওঁ অখণ্ডানন্দার্পনমস্তু।

(সমাপ্ত) *

রামপ্রসাদের মুহুরিগিরি

[শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

কথিত আছে সাধক শ্রীরামপ্রসাদ সেন যৌবনের প্রারম্ভে পিতৃবিয়োগবশতঃ কলিকাতার কোন ধনীর গৃহে চাকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধনী যে কে তাহা আজ পর্য্যন্ত যথার্থভাবে নিরূপিত হয় নাই। ১৭৭৭ শকে (৬৬ বৎসর পূর্ব্বে) 'বিবিধার্থ-সংগ্রহের' ফাল্গুন সংখ্যায় ৺হরিমোহন সেন মহাশয় লিখিয়াছিলেন 'ঐ প্রকার জন-

শ্রুতি আছে যে রামপ্রসাদ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নিকট কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া হিসাববহিতে কতিপয় পদাবলী গীত রচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন। গুণজ্ঞ রাজা তাহা জ্ঞাত হইয়া ও ঐ গীতপাঠে পরিতৃপ্ত হওত তাঁহাকে 'মহাশয়' উপাধি প্রদান পূর্ব্বক স্বালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।' 'কবিচরিত' লেখক ১৮৬১ খৃঃ (৪৮ বৎসর পূর্ব্বে) লিখিয়াছিলেন 'কেহ কেহ কহেন দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট প্রসাদ দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন আর কেহ কেহ কহেন নবরঙ্গকুলাধিপতি ৺দুর্গাচরণ মিত্র তাঁহার প্রভু ছিলেন। সুতরাং এতাদৃশ সংশয়স্থানের নাম নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ১৯৭০ সম্বতে (৪৪ বৎসর পূর্ব্বে) ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন 'প্রসাদ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে কলিকাতার কোন ধনিকের সংসারে মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন'। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গ্রন্থের পাদ-টীকায় 'ধনিকের' সম্বন্ধে লিখিত আছে 'কাহারও মতে দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের কাহারও মতে দুর্গাচরণ মিত্রের।' ১২৮২ সালে (৪২ বৎসর পূর্ব্বে) ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ 'প্রসাদ-প্রসাদ' গ্রন্থে (৯০ পৃঃ) লিখিয়াছিলেন 'কলিকাতার কোন এক ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির ভবনে প্রসাদ এক মোহরের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। এই ব্যক্তি কে তাহা ঠিক করা যাইতে পারে নাই। জনশ্রুতি এইরূপ যে, দেওয়ান গোলোকচন্দ্র (গোকুলচন্দ্র ?) ঘোষালের ভবনে তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কেহ বলেন যে 'নবরঙ্গকুলাধিপ' দুর্গাচরণ মিত্রই তাঁহার প্রভু।' রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে 'কথিত আছে, রামপ্রসাদ অনেক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরিগিরি করিতেন' এই কয়টি কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাব্যবিশারদ, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রভৃতি অন্যান্য সমালোচকগণ 'কবিচরিতের' পন্থানুসরণ করিয়া খিদিরপুরের দেওয়ানজী অথবা দর্মাণহাটার দুর্গাচরণ মিত্রের গৃহে প্রসাদ চাকরী করিতেন এই কথাই স্বীকার করিয়াছেন।

এই হইল এক পক্ষের অভিমত। অপর পক্ষের মত নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :—

(১) রামপ্রসাদ সেনের বৈমাত্রেয় ভাই নিধিরাম সেনের বংশধর শ্রীযুক্ত রামনাথ সেনের সহিত আমি কলিকাতা হরিঘোষের ষ্ট্রীটে দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে অবগত হই যে নিধিরামের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কণ্ট্রাক্টর কৃষ্ণ মল্লিকের সবিশেষ পরিচয় ছিল। মল্লিকমহাশয়কে বলিয়া নিধিরাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসাদকে তাঁহার অধীনে মাসিক ১২৲ টাকা মাহিনায় চাকরী করাইয়া দেন। প্রসাদ মল্লিকগৃহে ১ মাস ১৮ দিন চাকরী করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি নিধিরামের গৃহেই থাকিতেন।

(২) ১৩০২ সালের 'সুজন-তোষিণী' পত্রিকার কার্ত্তিক সংখ্যায় 'কবি রামপ্রসাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে মহাত্মা ৺কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—'প্রসাদ চুঁচুড়া গ্রামে শীল বাবুদের বাড়ীতে চাকরী করিতেন।

(৩) 'বিশ্বকোষ' সম্পাদক রায়সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আমাকে সম্প্রতি লিখিয়াছেন 'আমাদের যতদূর জানা আছে তাহাতে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ দীর্ঘকাল ৺দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতেই মুহুরী ছিলেন, মধ্যে কিছুদিন বাগবাজারের মদনমোহন-প্রতিষ্ঠাতা গোকুল মিত্রের বাড়ীতেও ছিলেন শুনা যায়। ইহা ছাড়া আমি তাঁহার চাকরী সম্বন্ধে আর কিছু জানি না বা শুনি নাই।

(৪) ফরিদপুরের অন্তর্গত খানখানাপুরের ভুলুয়া বাবা (কালিদাস সন্ন্যাসী) আমাকে লিখিয়াছেন 'হুগলীতে গোকুল সরকার নামে একজন ধনশালী ছিলেন। প্রসাদ তাঁহার সেরেস্তায় ৮৲ টাকায় মুহুরি নিযুক্ত হন।'

উপরোক্ত মন্তব্য হইতে বুঝা যায় যে রামপ্রসাদ কলিকাতা অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন ধনীর গৃহে মুহুরিগিরি কর্ম্মে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহের' অভিমত গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ প্রসাদ কখনও যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সেরেস্তায় চাকরী করিয়াছিলেন এ কথার কোনই প্রমাণ নাই। জনশ্রুতিও এ মতের সমর্থন করে না। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র

প্রসাদকে সাধক ও গায়ক বলিয়া অনুগ্রহ করিতেন। সম্ভবতঃ ইহাই ৺হরিমোহন সেনের বলিবার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু ভুলক্রমে তিনি 'প্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধীনে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন' ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়টী সন্দেহজনক বলিয়াই মনে হয় যে ৺দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ 'ধনীর' নামোল্লেখ করেন নাই। 'কবিচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে যে দুর্গাচরণ মিত্র অথবা গোকুল ঘোষালের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও প্রমাণ-সিদ্ধ নয়। কারণ ইহা জনশ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত, চাক্ষুষ অথবা দলিলাদির প্রমাণ এ পর্য্যন্ত কেহই উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই। আমি একবার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের বংশধর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র (Accountant General) মহাশয়ের সহিত তাঁহার গরাণহাটার বাড়ীতে দেখা করি এবং এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে রামপ্রসাদ দুর্গাচরণ মিত্রের গৃহেই চাকরী করিতেন, অধিকন্তু তিনি আমাকে প্রসাদ যে গৃহে বসিয়া কাজ করিতেন সেই গৃহখানা দেখাইয়াছিলেন। তবে তিনি দলিলাদির কোন সংবাদ আমাকে দিতে পারেন নাই। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে আমার সাহিত্যিক বন্ধু সিউড়িনিবাসী শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র আমাকে লিখিয়াছিলেন 'ভূকৈলাসের রাজবাটীতে প্রসাদের স্বহস্তলিখিত পদাবলীর খাতা এখনও মজুত আছে। *

এই সংবাদ পাইয়া তখন আমার একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছুই ফল হইল না। কারণ পরে বহু অনুসন্ধানে জানিয়াছি এরূপ কোন দলিল ভূকৈলাসের রাজবাটীতে নাই। ভূকৈলাস রাজবাটিতে সত্য সত্যই রামপ্রসাদের স্বহস্ত লিখিত খাতা আছে কিনা এবং দেওয়ানজীর অধীনে মুহুরিগিরি করিয়াছিলেন কিনা ইহা অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি বিগত ২৯শে ডিসেম্বর (১৯১৭ খৃঃ) শনিবার প্রাতে খিদিরপুর ট্রামে চাপিয়া ভূকৈলাসে গিয়াছিলাম। বেলা ১০টার সময় কুমারবাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যধ্যান ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে ইতিপূর্ব্বেই রাঁচির ঠিকানায় নিজ মন্তব্য জানাইয়াছিলেন। † দেখা করিয়াও বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না। তাঁহাদিগের ষ্টেট বহুকাল পর্য্যন্ত হাই-কোর্টের রিসিভারের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকায় দেওয়ানজীর সময়ে প্রাচীন খাতা পত্র তাঁহারা কিছুই পান নাই, এ কথাই তিনি পুনরায় আমাকে বলিলেন। সত্যধ্যান ঘোষাল মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি কুমারবাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যনিধি ঘোষাল মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাঁহারা দুই ভাই উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারাও বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না। রাজবাটীর কুমারবাহাদুরেরা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কোন সংবাদ রাখেন বলিয়া মনে হইল না। সত্যনিধি ঘোষাল মহাশয় আমাকে বলিলেন :—'এ বাড়ী রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের। আপনি পদ্মপুকুরে দেওয়ানজীর দৌহিত্রবংশীয়দের নিকট প্রসাদের সংবাদ পাইতে পারেন। এ কথা বলিয়া তিনি আমাকে দেওয়ানজীর দৌহিত্রবংশীয়দের বাড়ী যাইবার ঠিকানা

* ১ম পত্র (২২-৮-১৭)।

'রামপ্রসাদ কার্য্যকালে যে খাতায় 'দে মা আমায় তহবিলদারী' গান লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই স্বহস্ত-লিখিত খাতা ও গান এখনও মজুত আছে। তাহার ফটো দিতে পারিলে মন্দ হয় না। কোথায় পাওয়া যাইবে, আবশ্যক হইলে তাহার সন্ধান করিয়া দিব।'

২য় পত্র (১৬-৯-১৭)।

'ভূকৈলাসের রাজবাটীতে [illegible]দারী সেরেস্তার খাতায় রামপ্রসাদের স্বহস্ত-লিখিত ঐ গান আ[illegible] তাহার ফটো সংগৃহীত করিবার ব্যবস্থা করুন।'

৩য় পত্র (১৯-১২-১৭)।

'এই ঠিকানায় (বাবু প্রফুল্ল কুমার সেন গুপ্ত, ২৬ নং, ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রিট, খিদিরপুর) আমার নাম করিয়া ভূকৈলাসের রাজবাটীতে রামপ্রসাদের হস্তলিখিত খাতা অনুসন্ধান করিবেন।'

† কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত সত্যধ্যান ঘোষাল (ব্যারিষ্টার) আমাকে ১৩ই ডিসেম্বর (১৯১৭) লিখিয়াছেন 'আমাদিগের ষ্টেট বহুকাল পর্য্যন্ত হাইকোর্টের রিসিভারের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকায় দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের সময়ের খাতাপত্র আমরা পাই নাই। এই সকল খাতার সম্বন্ধে আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। রামপ্রসাদের হস্তাক্ষর ঐ সকল খাতায় থাকিলেও তাহা এক্ষণে পাওয়ার সম্ভব নাই, ঐ সকল খাতার এক্ষণে অস্তিত্ব আছে কিনা তাহাও সন্দেহ।'

বলিয়া দিলেন। আমি ১২টার সময় কুমারবাহাদুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রথমে ২৬নং ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীটে কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিমোহন সেন গুপ্ত মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়ে যাই। সেখানে তালাবদ্ধ দেখিয়া ৬নং পানবাজার (পদ্মপুকুর স্কোয়ারের নিকট) দেওয়ানজীর দৌহিত্রবংশীয়দের বাড়ী যাই। এখানে শিবমন্দিরের নিকট কয়েকটী ছেলেকে দেখিয়া তাহাদিগকে দেওয়ানজীর বাড়ীর কোন ব্যক্তিকে ডাকিয়া দিবার জন্য বলি। একটী বালক সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার কথা বলিলে একজন যুবক বাহিরে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন। ইঁহার নাম শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতার মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয়বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন। ইঁহাকে প্রসাদের স্বহস্তলিখিত খাতার কথা বলিলে ইনি বলিলেন, আমাদের গৃহে প্রসাদের খাতা নাই, তবে আমার পিতামহ ৺প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে নিজ হাতে একখানা খাতায় প্রসাদের পদাবলী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন বলিয়াই তিনি গৃহ হইতে নীল রংয়ের ফুলস্কেপ সাইজের একখানা কীটদষ্ট খাতা আনিয়া আমার হাতে দিলেন।* তাঁহার অনুমতি লইয়া আমি খাতাখানা সঙ্গে লইয়া আসি। অতঃপর ক্ষিতীশ বাবুর ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করি। তিনি দেওয়ানজী গোকুল চন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের দৌহিত্র ৺গোবিন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী ৺রামাসুন্দরী দেবী † ও তাঁহার কর্ম্মচারী ৺শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছিলেন যে রামপ্রসাদ সেন গোকুল ঘোষালের গৃহেই মুহুরিগিরি করিতেন। তখন দেওয়ানজীর বাড়ী বর্ত্তমান ডকের ভিতরে ছিল। এই সংবাদ ভিন্ন কবিরাজমহাশয়ের নিকট হইতে রামপ্রসাদের স্বহস্তলিখিত খাতার বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই। ৺প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত প্রসাদ-পদাবলীর খাতাখানাও তাঁহাকে দেখাইয়াছিলাম। ঐ লেখা বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত বলিয়া তিনি চিনিতে পারিলেন। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র ভায়ার চিঠিখানা কবিরাজমহাশয়কে দেখাইলে তিনি বলিলেন তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ প্রফুল্ল কুমার সেন গুপ্ত সিউড়িতে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই সূত্রে শ্রীমান্ প্রফুল্লের সহিত মিত্রজার পরিচয় হয়। রামপ্রসাদের স্বহস্তলিখিত খাতা তিনি দেখেন নাই এবং তাহা কোথায় আছে তাহাও তিনি জানেন না। এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা আলাপের পর আমি খিদিরপুর হইতে ২টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসি। ৩০শে ডিসেম্বর প্রাতে আমি হালিসহরনিবাসী হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত চাঁপাতলা ৫নং রামকান্ত মিস্ত্রির লেনে দেখা করি। ইনি ভূকৈলাস-রাজবাটীর দেবোত্তরবিভাগের রিসিভার ছিলেন। রামপ্রসাদের খাতার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি বলিলেন 'আমি রিসিভারী করিবার সময় প্রসাদের খাতা দেখি নাই, অথবা এ বিষয়ে কোন সংবাদও পাই নাই, তবে শুনিয়াছিলাম প্রসাদ গোকুল চন্দ্র ঘোষালের গৃহেই চাকরী করিতেন।' 'রামপ্রসাদ মেমোরিয়াল কমিটির' সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত * মহাশয়ও এবিষয়ে নূতন কোন সংবাদ আমাকে দিতে পারেন নাই। গরাণহাটার ৺দুর্গাচরণ মিত্রের বংশধরেরা বলেন প্রসাদ মিত্রমহাশয়ের গৃহেই চাকরী করিতেন, অপর পক্ষে কাহারও মতে তিনি খিদিরপুরের দেওয়ানজীর অধীনে মুহুরিগিরি করিতেন। ইহাও সম্ভবপর হইতে পারে যে প্রসাদ গরাণহাটা ও খিদিরপুর উভয় স্থানেই বিভিন্ন সময়ে চাকরী করিয়াছিলেন এবং এ জন্যই দেওয়ানজী ও মিত্র মহাশয়দ্বয়ের বংশধরদের মুখে উপরোক্ত জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্যা নিরাকরণের জন্য আমি 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থও মনোযোগের সহিত পাঠ করি। 'তীর্থমঙ্গলে' সেনবিশারদ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের নামোল্লেখ করিয়া সেই সেই স্থানের স্বনামধন্য ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত

---

* এই খাতায় মোট ১১১টী রামপ্রসাদের পদাবলী আছে। ইহার মধ্যে অপ্রকাশিত নূতন গান ৫৮টী পাইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে এই গানগুলি কোন পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই।

† ইনি তিন বৎসর হইল ৯২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন।

* ইনি ২১৭নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে থাকেন।

পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু হালিসহরে কুমারহট্টের নামোল্লেখ ভিন্ন প্রসাদের কথা তিনি কিছুই লেখেন নাই। এই বিষয়টি আমি নানা দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কেন যে সেনবিশারদ তীর্থকাহিনী লিখিবার সময় প্রসাদ প্রসঙ্গ ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই। যাহা হউক দলিলাদির প্রমাণ ভিন্ন প্রসাদ যে কোথায় চাকরী করিতেন তাহার একটা স্থির মীমাংসা করা বর্ত্তমানে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'সাধকসঙ্গীতের দ্বিতীয় সংস্করণের ৫০ পৃষ্ঠার ফুটনোটে ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন 'কোন কোন ব্যক্তি এস্থলে দুর্গাচরণ মিত্রের পরিবর্ত্তে ভূকৈলাসরাজবংশীয় দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নাম উল্লেখ করেন, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাহা ভ্রমাত্মক প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ গোকুল ঘোষাল রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী।' সিংহমহাশয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে গোকুল ঘোষালকে রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে গোকুলচন্দ্র ঘোষাল ভেরেলাষ্ট সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। ক্লাইভ যখন দ্বিতীয় বার কোম্পানীর চাকরী একেবারে ত্যাগ করেন সেই বৎসর ভেরেলাষ্ট সাহেব বঙ্গের গবর্ণর নিযুক্ত হন। ইনি ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী হইতে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন। ভেরেলাষ্ট সাহেব তিন বৎসরের জন্য গবর্ণর নিযুক্ত হন, এই তিন বৎসর গোকুল চন্দ্র ঘোষাল বাঙ্গালার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ভেরেলাষ্ট সাহেবের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ান বদল হইয়াছিল। তৎপরে গোকুল ঘোষাল সমাজে ধনী বলিয়া গণ্য হন এবং তিনি অনেক বিষয়সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল পিতৃব্যের বিষয়সম্পত্তির অধিকারী হইয়া ক্রমে রাজা[illegible] খেতাব পাইয়াছিলেন। সেই অবধি ভূকৈলাসের রাজবাটি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করে।

রামপ্রসাদ যে গোকুল ঘোষালের সমসাময়িক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিরাজ-উদ্দৌলার ১০ বৎসর পর গোকুল দেওয়ান হইয়াছিলেন; এই সময়ে রামপ্রসাদ জীবিত ছিলেন, কাজেই গোকুল ঘোষাল প্রসাদের সম-সাময়িক ছিলেন না এই মতের পোষকতা করা যায় না। অধিকন্তু রামপ্রসাদ তাঁহার যৌবনে কোন ধনীর গৃহে চাকরী করিতেন, ইহাই সর্ব্ববাদীসম্মত এবং এই জনশ্রুতি ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলে তিনি যে গোকুল ঘোষালের গৃহে ১৭৬৭ ৬৯ খৃঃ অব্দের মধ্যে চাকরী করিয়াছিলেন ইহা সম্ভবপর নহে। গোকুল ঘোষালের দেওয়ানী আমলে যে প্রসাদ চাকরী করিতেন, ইহাও কেহ বলেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র গোকুলচন্দ্রের পিতা কন্দর্প ঘোষাল মৃত্যুকালে বহু সম্পত্তি রাখিয়া যান। গোকুল ঘোষাল দেওয়ান হইবার বহু পূর্ব্বেই উত্তরাধিকারী-সূত্রে যথেষ্ট অর্থ ও বহু সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সম্পত্তি সংরক্ষণের জন্য কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইত। হইতে পারে দেওয়ানজী হইবার বহু পূর্ব্বেই রামপ্রসাদ গোকুল ঘোষালের গৃহে চাকরী করিতেন। গোকুল ঘোষালের দেওয়ানী আমলে প্রসাদ জীবনের শেষ অবস্থায় যে চাকরী করিতেন ইহার কোনই প্রমাণ নাই, বরং তিনি তখন মাতৃভাবসাগরেই তন্ময় থাকিতেন বলিয়া জানা যায়। তবে প্রসাদ গোকুল ঘোষালের গৃহে চাকরী করিতেন কিনা, ইহার কোন প্রমাণসিদ্ধ বিবরণ আজও পাওয়া যায় নাই। 'তীর্থমঙ্গল' লেখক এ বিষয়ে কোন কথাই লেখেন নাই বলিয়া একটা সন্দেহ আসিয়াছে এবং আমারও ব্যক্তিগত অভিমত এই যে রামপ্রসাদ ৺দুর্গাচরণ মিত্রও গোকুল ঘোষাল উভয়ের গৃহেই বিভিন্ন সময়ে চাকরী করিতেন। যাহা হউক একথা আমি দলিলাদির প্রমাণ ভিন্ন জোরের সহিত কিছুই বলিতে পারি না। ভুলুয়া বাবা অথবা নিধিরামের বংশধরের বাক্যও ফেলিয়া দেওয়া চলে না। মোট কথা প্রসাদের মুহুরিগিরি বিষয়টী যে ভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছে আমি কেবল তাহাই আলোচনা করিলাম, অনুসন্ধান করিয়াও আমি প্রামাণিক বিশেষ কিছুই জানিতে পারি নাই। এজন্য আমি দুঃখিত। যাহা হউক ভবিষ্যতে যদি কেহ এ বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে প্রসাদ-জীবনীর একটা দিক বাঙ্গালী পাঠক জানিতে পারিয়া কৃতার্থ হইবেন

মাসিক-কাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

মানসী। আষাঢ়। শ্রীমতী অমিয়া দেবীর 'ভারতী বন্দনায়' নিন্দা করিবারও কিছু নাই সুখ্যাতিরও কিছু নাই।

ছাড়াছাড়ি। শ্রীকুমুদরঞ্জন। গানটির মিলগুলি বেশ সুন্দর হইয়াছে

দুর্দ্দিনে। শ্রীকালিদাস রায়। কবি বলিয়াছেন—

"কণ্ঠের কল উল্লাস আসে
গদ্‌গদ্‌ নাদে ভরি—
কেলীকানিন্দী কল্লোল মালা
হয়ে আসে গোদাবরী।"

কালিন্দী গোদাবরী হইয়া আসিতেছে একথা বলার তাৎপর্য্য কি?

সার্থক প্রেম। শ্রীমতী অমিয়া দেবীর—ভারতী বন্দনা সম্বন্ধে যে বক্তব্য তার 'সার্থকপ্রেক' সম্বন্ধেও তাই।

অকালে। শ্রীকালিদাস রায়। কবি কালিদাস—ভৈরবী গা'বার বেলায় পূরবী গাইতে সুরু করেছেন—

আজি—শারদ প্রভাতে কোরক সভাতে
করুণ পূরবী ধরিলে কে?
কিশোর আশায় তরুণোল্লাস
একটি নিমেষে হরিলে কে?
না ভরিতে শুভ বোধন গাগরী
কে বাজালে আজ বিজয়া বাঁশরী
ঝলসি পড়িল নব পত্রিকা,
হেন অঘটন করিলে কে?
নব অনুরাগ বাসর সভায়
গীতগোবিন্দ থামাইয়া হায়
বজ্রকণ্ঠে পণ্ডটিকায়
মোহমুদগর পড়িলে কে?
ভাসায়ে গোকুল অকূল সাগরে
কেবা দিলে ডাক মথুরা নগরে
প্রমোদকুঞ্জ রতি বিলাপের
শোক সঙ্গীতে ভরিলে কে?

প্রবাসী। আষাঢ়। শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষের 'যৌবনে অভিশাপ' সুন্দর কবিতা।

কোন্ জনা ঘরে রাখিবে বহ্নি
ইন্ধন যার বিপুল ধরা
নয়ন অন্ধ করে দাও ওগো
চুকেযাক্ সব দ্বন্দ্ব ত্বরা।
কোথা পুরুরাজ যযাতি আজিকে
যৌবন হত ঋষির শাপে
ভোগবিলাসের বাসর সাজানো
সেকি শুধু শুধু ব্যর্থ যাবে।
একে পরিহাস তোমার কি সাজে
স্খলিত দন্ত পলিত কেশ
আমি অভাগিনী আমারে বিধাতা
পরাল ভুবন লোভন বেশ।
নয়নে চটুলচাহনী, নিটোল
তনুটি শ্রাবণ জোয়ারে ভরা
রিক্ত করিয়া সবনিয়ে শুধু
ভিখ্ দাও তব ভীষণ জরা।

দিবাস্বপ্ন। শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী। কবিতার প্রথমাংশটুকু সুন্দর। সুধীর বাবুর রচনার আরম্ভটি বেশ সুন্দর হয়। সংযমের অভাবে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় না। কবির কল্পনার লীলা আছে—কিন্তু লীলার শৃঙ্খলা নাই। রচনা ভঙ্গি সুন্দর—কিন্তু ইঙ্গিতবাহুল্যে সঙ্গীতটি বেশ জমিতে

পারে নাই। কলাপী। শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশ গুপ্তের কবিতা—রূপসীর কঙ্কন ঝনৎকারে নর্ত্তিত ময়ূরের মত।

শিল্পী। শিল্পীকে সম্বোধন করিয়া 'দীনভক্ত' বলিয়াছেন—

ললাটে তোমার জ্বলে ধ্যানের সে তৃতীয় নয়ন
যায় দীপ্তি মূর্ত্তমাঝে অমূর্ত্তের লভেদরশন
ব্যক্তযাতা কণাটুক্, বিরাট সে রয়েছ গোপন
'জাগরে নয়নমেলি' শিল্পী তাই রচিছে স্বপন

খোকার মুখের চুমো। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। কবিতাটী মন্দ হয় নাই ১ম ২টি লাইন বেশ।

আলগোছে কেচোঁয়ায় গালে গন্ধরাজের দল
পদ্মপাতার পাথার বাতাস কে বুলালে বল?

ভাঙাচুড়ি। বনফুলের এই কবিতাটিতে একটু বেশ করুণ মাধুরী আছে—হেমন্তের ক্ষুদ্র শিশির ভেজা কুন্দফুলের বুকে মধুকণাটির মত।

বৃদ্ধ। কবিকুমুদরঞ্জন—কবিতাটির ২।৪ পংক্তি বেশ সুন্দর হইয়াছে—

"কমলের ঝিল জলে ঝিলমিল ঝিলামে
শ্যামলের গৃহলোপ রক্তের নীলামে"

* * * *

জাফ্রান ক্ষেতে আজ তুহিনের ছাউনি
আঙ্গুরের চুমা নাই গোলাপের ছাউনি।

কুমুদবাবুর এ শ্রেণীর কবিতায় সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যের অভাব—যাহা কিছু সৌন্দর্য্য বিশ্লিষ্টভাবে পংক্তিতে পংক্তিতে। সে জন্য কয়টি পংক্তি সুরচিত হয়ে কয়টি হয়নি তাহাই চোখে পড়ে। কুমুদবাবুর বুড়ায় দেশ কবিতাটীর ২।৪ পক্তি বেশ সুরভি—কিন্তু "শক্তিহারা সিংহ ঘুমায়
দন্তভাঙা ব্যাঘ্রহে"

এখানে "হে" এর উপায় কি হবে? এ 'হে' কি সংস্কৃতের পাদ পূরণে ব্যবহৃত 'হি' এর বাংলারূপ? কবিতাটিতে জোড়া জোড়া মিল দিতে গিয়ে চাতুর্য্যের দ্বারা মাধুর্য্যকে ক্ষুন্ন করিয়াছেন। মিলের বিন্দুমাত্র ক্রটী কবিরা সইতে পারেন না কিন্তু ভাষার ক্রটী কি, ক্রটী নয়? 'দন্তভাঙা' 'শীর্ণপাখা' ইত্যাদি সমাসও বর্জ্জনীয়।

মুক্ত জ্যোৎস্নায়। শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত। মুক্তজ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া কবি বলিয়াছেন—

"সাধ হয় গলে গলে যাই ভেসে ভেসে
অসীমের দিশাহারা ভুলহীন দেশে
মিশে মিশে আপনারে কেবল বিলাই
কেবল অনন্ত বিশ্বে সবারে জড়াই"

কবির সাধ যাহা যায় তা তিনি করুন কিন্তু সবাইকে যেন না জড়ান। চন্দ্রাবিষ্টের দলে সবাই যেতে রাজী হবেন না। ঐ গলে যাওয়া আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অনেকেই বলেছেন। প্যারীবাবু বলবার মত করে বললে আমাদের শুনতে আপত্তি ছিল না।

আনমনে। শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

কয়েকটী চলনসই পংক্তি।

কবিতায় প্রিয়ম্বদা দেবীর বিশেষত্বটুক্ ফোটে নাই।

অর্চ্চনা। শ্রাবণ—ভাদ্র। কবিসাক্ষী। শ্রীকুমুদরঞ্জন। কুমুদবাবুর উৎপ্রেক্ষা ও উপমার তুবড়ীখেলা এবার ব্যর্থ হয়েছে—

"এযেন হায় ভারতীকে ধান ভানিতে ডাকা
সুদর্শনে যত্নে এনে গড়া গড়ীর চাকা"

From the Sublime to the ridiculos. অর্চ্চনার কবিতা কুঞ্জে প্রবেশ করে' ভারতীর অর্চ্চনার যোগ্য কুসুম একটিও পেলাম না। শ্রীযুক্ত অবনীকুমার দে মহাশয়ের "মুক্তির" হুঙ্কার শুধুই ফাঁকা আওয়াজ—

"মানবের বুকের পাষাণ
—শক্তিশেল দেবতার বুকে, নির্ম্মমবিষাণ
মহাবিশ্বের ক্রন্দন
অষ্টবসু নিমগন
অচঞ্চল শালগ্রাম শিলা, টলটলমান
বিধাতার অশ্রুমাঝ কোথা পরিত্রাণ।"

রীতিমত দুরধিগম্য—ও বন্ধুর।

শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য্যের—'অক্ষরদেবতা' বিশেষত্ব শূন্য। কবিগুণাকরের—"গানের কেন্দ্র"—পূর্ব্ব কবির চর্ব্বিত চর্ব্বন। শ্রীমতী বীণাপানি দেবীর "সন্ধ্যায়" ছন্দ নাই। শ্রীবুদ্ধদেব বসু—দেশের গানে ২।১ পংক্তি বেশ লিখেছেন—শেষে বলেছেন—

"দেশের মুখে আলো দিতে উঠরে জেগে তোরা" 'আলো অর্থে কেউ আগুন' মনে না করেন। শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়ের 'আশা' নেহাৎ নিষ্ফল হয় নাই। কবিতায় ভাষার বেশ বাঁধুনী আছে। শ্রীমতীস্বর্ণময়ী দেবীর "অর্চনায়" ভক্তি আছে—মন্ত্রমাধুর্য্য নাই।

কবিগুণাকরের "রবীন্দ্র আবাহন" কবিতায় কবি সংস্কৃত ও ইউরোপীয় সাহিত্যরথিগণের লম্বা একটা ফর্দ্দ দিয়েছেন—তাহাতে—'ভাস' হতে আরম্ভ করিয়া জয়দেব পর্য্যন্ত, এবং হোমার হতে আরম্ভ করিয়া 'মরলে' পর্য্যন্ত এ ছাড়া পারস্য কবি দেরও পাস আছে। কবির আবাহনে বিন্দুমাত্র কবিত্ব নাই—শুধু তালিকা কি কবিতা হইতে পারে? শ্রীবিষ্ণুপদ দেবশর্ম্মা মহাশয় 'কবিতা' নামক ছড়ায় যথেষ্ট চ্যাবলামী করেছেন। শ্রীযুক্ত যতীন বাবু মোহিত বাবু ইত্যাদি দুএকজন কবিকে অযথা ব্যঙ্গও করেছেন এবং দুঃখ করে বলেছেন

"চালচু লেনজনের উপর অনুগ্রহের বৃষ্টিধার"

কবিতা লক্ষ্মী যদি তাঁহাদের উপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করেই থাকেন তাহাতে হিংসা করে লাভ কি?

'ফুলের মেলায়'—শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী ফুলের একটি তালিকা দিয়েছেন। তালিকাটা ফুল কবিগণের কাজে লাগ্‌তে পারে।

শ্রীযুক্ত ত্রিগুণানন্দ রায়—"মুগ্ধদৃষ্টি" কবিতায় "মুগ্ধ স্নেহখানি" "দয়াময়ী মাধুরী" "সরল সৌম্যস্নিগ্ধ আভা" "সুখোজ্জ্বল নবীনতা" "সাহসদীপ্ত দৃষ্টিখানি" ইত্যাদি বাগ্‌বিন্যাসে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা আদৌ মনোজ্ঞ হয় নাই।

শ্রীমান সরোজকুমার সেনের "অসময়ে" কবিতাটী পড়িয়া মনে হয় তিনি নেহাৎ 'অসময়ে' কবিতা রচনা আরম্ভ করেছেন, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করলে ভাল হতো।

শ্রীমতী শশাঙ্কশোভা দেবীর "বিজয়ী" ভাবটি মন্দ নয়—রচনায় সৌষ্ঠব নাই।

নারায়ণ। শ্রাবণ। শ্রাবণে। শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

কবিতাটিতে একটি পংক্তি ছাড়া অন্য কোনো পংক্তিতে ছন্দের দোষ নাই—

"হিন্দোল দোলায় দোলাতে তায়
আকুল কেশ পাশে"

এই পংক্তির "হিন্দোল দোলায়" চারিমাত্রা থাকিলেও ব্যঞ্জন বাহুল্যে শ্রুতিকটু—"আকুল কেশ" ইহাতে তিনমাত্রা হইয়াছে। এই সামান্য দোষের কথা বাদ দিলে কবিতাটিকে সুরচিত বলা যাইতে পারে—

বর্ষা নয়রে বাদল নয়রে
ওই যে মহোৎসব
নূপুর রুণু ঝুনানে মোর
দেয়ার গুরুরব।
আকাশ ভরা ঐ যে কাহার
নীলাম্বরার জরীর বাহার
শাড়ীর সাথে মিশবেরে মোর
নিশির অন্ধকার
অলঙ্কারের শিঞ্জিনী কেউ
শুনবে না আজ আর।

ভাবটি অতি প্রাচীন হইলেও মন্দ লাগিল না।

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর "অকুলের আহ্বানে" আকুলতাটুকু বেশ ফুটিয়াছে—কবিতা হিসাবে অন্যথা ব্যর্থ।

"বিশ্ববিদ্যালয় বিদায়গীতি"—শ্রীসুবোধ চন্দ্র রায়। কবিতার নামটি যেমন দীর্ঘ কবিতাও তাই। দীর্ঘ হলেও মাঝে মাঝে বেশ রস জমেছে—

"তোমার কোলে যে সব ছেলে
নন্দদুলাল শরীর মেলে
জীবনটাও অবহেলে
কাটিয়ে দিল খাসা।
ভুঁড়ি দাড়ী চেন ঝুলিয়ে
প্রথম ছুটোয় হাত বুলিয়ে
জ্ঞান সাগরের জল ঘুলিয়ে
তুলছে বালির আসা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চারিদিক হতেই আক্রমণ হইতেছে—কবিতাই বা নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন? সুবোধ সুশীল গোপাল যাঁরা, তাঁরা অবশ্য ঢাল শরকী নিয়ে আক্রমণ না করে কবির লেখনী নিয়েই আক্রমণ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। ওদিকে চূণ ও কালীতে তুলি ভিজিয়ে চিত্রশিল্পীরাও লেগে গেছেন।

শ্রীকালীপদ ঘোষের "মিছে" কবিতায় ৬৬ বার 'মিছে' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন—কাজেই 'মিছে' শব্দটি বিছের মত কবিতার সর্ব্বাঙ্গে কিল বিল করিতেছে।

বিনা প্রয়োজনে কবিতাটী অযথা দীর্ঘ—শুধু একঘেয়ে ঘ্যান ঘ্যানানি আর একই ভাবের পুনরুক্তি। প্রত্যেক শ্লোকের ১ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি অভিন্ন হওয়াতে লেখকের ক্লান্তি কিছু কমিয়াছে কিন্তু পাঠকের ক্লান্তি বাড়িয়াছে।

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩২৮ { ৫ম সংখ্যা

অমর

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

সাত বছরের ছোট্ট কচি ছেলেটি, কাঁচা সোনার রঙ, নখের আগা দিয়ে ঢল্‌ঢলে রক্ত যেন ফিন্‌কি দিয়ে বেরোতে চাইছে।

কাজলপরা চোখ দু'টি বুজে আছে, সারা দেহের একটা দিনের যন্ত্রণা ঠোঁট্ দু'খানির উপর কালী হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে! মরা-হাসিটুকুর মধ্যে বিশ্বের সব করুণা কেঁদে কেঁদে খুন হয়ে যাচ্ছে। কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া থোলো থোলো চুলগুলো কপালের উপর পড়েছে—যেন মেঘে ঢাকা দ্বিতীয়ার চাঁদ!

* * * * *

তেপান্তরের মাঠের স্বপ্নে খোকা একবার হঠাৎ শিউরে উঠ্‌লো—তার এতটুকু বুকের অনিয়ম স্পন্দনে ধরিত্রীও যেন একবার গা নাড়া দিয়ে উঠ্‌ল—সেকি ভয়ে?—না বিস্ময়ে? * * * পরক্ষণেই কোন ঘুমপাহাড়ের রাণী এসে কেমন করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে, চোখ ঢুলিয়ে অঘোর ঘুমে অচেতন করে দিয়ে গেল!

—হঠাৎ সবাই কেঁদে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌ল "খোকা!—ওরে খোকা!—খোকা কেন এমন হয়ে গেল?"

মা খোকার পাশেই চুপটি করে বসেছিলেন, সবাইকে কাঁদতে দেখে, মৃদু হেসে, অসীম নির্ভরে খোকাকে বুকে টেনে নিয়ে বল্‌লেন—"তোমরা কাঁদচ কেন,—আমার খোকা মরে না! ক্লান্তির পর মানিক আমার ঘুমিয়ে পড়েছে—ঘুম কি আবার মরণ? বালাই ষাট্!

সমস্ত রাত্রির সজাগ পাহারার পর মারও ঘুমের আবল্য আস্‌ছিল—খোকাকে বুকে জড়িয়ে কখন মা ঘুমিয়ে পড়েছে কেও তা জানে না !

* * * * *

চিরজীবনের পথে দাঁড়িয়ে মা দেখ্‌লেন খোকা বুকের উপর একরাশ সদ্যফোটা ফুলের মত হাস্‌ছে !—মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আধ আধ স্বরে খোকা বল্‌ছে "মা কি কখনও মরে ?"

খোকার কপালে চুমু দিতে গিয়ে মা দেখ্‌লেন—টিপখানি তা'র তেমনি জ্বল জ্বল করে' জ্বলচে—মা নীরবে নির্ভয়ে, পরম পরিতৃপ্তির আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে খোকার এলিয়ে পড়া চুলগুলি সরিয়ে গুছিয়ে দিলেন—সমস্ত বুক দিয়ে খোকাকে আগ্‌লে ধরে ললাটে আশীষচুম্বন দিয়ে বল্‌লেন "আমরা ত মরিনে খোকা—আমরা যে চিরন্তনের যাত্রী"।

অতীত স্মৃতি

[শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়]

সেদিন ভোরের আলোকের রেখা ছায়ার আঁধার তলে
একটির পর নেয়ে যেতেছিল একটি সে কালোজলে,
স্নান অবসানে সিক্ত বসন তুমিও দাঁড়ালে আসি,
উষার আভাস থমকিয়া যেন দেখিল সে রূপরাশি।

সারা প্রান্তর স্তব্ধ নিঝুম, স্তব্ধ গগন তল,
ঢেউগুলি সেও তোমারে হেরিয়া ভুলে ছিল কোলাহল।
দু' একটি পাখী ক্বচিৎ-কখনো ঘুমঘোরে দিশাহারা,
ঝাপটিয়া পাখা আলোড়িয়া শাখা দিতেছিল শুধু সাড়া।

বিস্তৃত দিকচক্রের মাঝে হেথা আমি তুমি হোথা,
তুমি আমি দুটি—শুধু দুটি প্রাণী, আর কেহ নাহি কোথা।
একটিও কেহ কোথা নাহি আর চাহে তব মুখ পানে,
আমি একা শুধু কি যে দেখিলাম মোর মন তাহা জানে !

জল ভারে ঋজু চিকুর চোয়ায়ে ঝরিতেছিল সে বারি,
শিহরিতেছিল চরণের তলে মুগ্ধা ধরার নাড়ি।
ছোট একখানি আকাশ গলায়ে সজল মেঘের ভার,
ফোটে ফোটে যেন ঢেলে দিতেছিল বরিষার বারিধার ॥

দূর হ'তে আমি দেখেছিনু তব অপরূপ রূপ রাশি,
দেখেছিনু তব দেবদুর্লভ অধরের মৃদু হাসি।
সাদা মেঘখানি যেমন করিয়া আকাশে মিশাতে চায়,
তেমনি করিয়া মিশে যেতেছিল রূপ সে তোমারি গায় !

আজি বাতাসের দুরু দুরু বুকে বিরহ উঠেছে জেগে,
ধারায় ধারায় মন জানাজানি কানাকানি মেঘে মেঘে।
ধবল পাখার পালক উড়ায়ে বলাকা দিয়েছে সাড়া,
চঞ্চুর সাথে চঞ্চু জড়ায়ে পাখীরা আত্মহারা।

দূরে থেকে সে যে কত কাছে আজ, কাছে থেকে কত দূর
ধরিতে পারিনা—স্মৃতির গন্ধে তনু-মন ভরপূর।
স্বপ্নের ছায়া কোথা মিশে গেছে—কোথা গেছে তার মায়া,
অতীতের কথা মনে পড়ে' তবু শিহরিয়া উঠে কায়া।

মাসিক কাব্যসমালোচনা

[পঞ্চভূত]

নারায়ণ ভাদ্র। এই ক্লান্ত গোধূলিতে। শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী। তিনটী সনেট। সনেট তিনটি বিশেষ ভাবঘন না হইলেও সুরচিত বটে। 'স্বপন সঞ্চয়' কতকটা বুঝি, 'রিক্ততা সঞ্চয়' দুর্ব্বোধ নয় কি ?

নীরবে। শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী। গানটি আরো সংহত হলে ভাল হতো—মাঝে মাঝে পংক্তিগুলো কেমন যেন এলিয়ে পড়েছে।

বর্ষার গান। শ্রীননীগোপাল ঘোষ। কবির এথনো ছন্দোজ্ঞান হয় নাই—কিন্তু 'অচিন্ আলো' 'এস আমার নিবিড় কালো' 'তোমার হাতের বজ্রখানি' ইত্যাদি ভাবা সংগ্রহ হয়েছে। রচনায় চাতুর্য্যও নাই—মাধুর্য্যও নাই উদাহরণ—

ওগো নবীন দেয়া
নেমে এস মোর বুকের পরে গুরু গরজিয়া
জেগে উঠুক হৃদয়খানি
শুনি তোমার ব্যাকুল বাণী
দূর করে দাও সকল গ্লানি ঘন বরষিয়া।

'রুধির রঙে ফোটা'—শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরী—"প্রভাত আলোর হরিৎচুমা" "জমাট বাঁধা শিশির আঁখি কোণে" ইত্যাদি দিয়ে কি যেন কি একটা লিখেছেন ভাল করে বুঝতেই পারা গেলনা। কবিতাটা যাতে বুঝতে না পারা যায় সেজন্ত লেখকের চেষ্টার ক্রটী দেখা যায় না। দুচার পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেই পাঠকগণ বুঝতে পারবেন আমাদের এ ধারণা অমূলক কিনা—

"সাঁজ নীলিমায় গোপন ব্যথাটুকু
শুষ্ক করে নিঙড়ে ধুয়ে নিও।"
"এদের হাসির সকল মধু আলায়
ঢেকে দিও তোমার মোহন মালায়"

"পৌছে দিও কান্না হাসির মাঝে
তোমার গোপন সুরের তালে তালে।"

অনাদৃতা। কাজী নজরুল। সুমধুর সঙ্গীত—করুণ মাধুরীভরা।

তুমি যদি রও কাছে। শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল "তুমি যদি রও কাছে" আটবার প্রত্যেক পংক্তিতে পুনরুক্তি,—না আছে মিল না আছে ছন্দ। গানের দোহাই দিয়ে অনেক অক্ষমতা চালান যায়—মাসিক পত্রে না ছাপিয়ে এ সব গান গাইলেই ভাল হয়। গায়কের কণ্ঠের মাধুরী যোগ হলে এক রকম চলে যেতে পারে।

মাঝখানে। শ্রীমান শৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক। শ্রীমানের হাত বেশ মিঠে অনুশীলন রাখিলে সুকবি হইতে পারিবেন। শ্রীমানের আশে পাশে আত্মীয়বর্গের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি—অনুশীলন করিলে উৎসাহ ও নেতৃত্ব লাভের অভাব ঘটিবে না। তবে শ্রীমান লিখেছেন—

"সন্ন্যাস মোরে কত আশা দিয়ে
সুমুখ ধরিয়া টানে
কত বিবাগীর আঁখিঝরা গান
গেয়ে ফিরে দুটী কাণে।"

এই কিশোর বয়সে জীবনের প্রারম্ভে এ প্রকার ভাব আন্তরিক বা স্বাভাবিক হইতে পারে না। কচি মাথায় পাকাচুলের পরচুলো পরিলে চলিবে না। জীবনে অনেক সমস্যাই উপস্থিত হইবে—সমস্যার ভান করিবার প্রয়োজন নাই।

বিপরীত। শ্রীমতী লীলাদেবী বলেছেন—
"অশ্রুর চেয়ে মধুর কি আছে বিপদের চেয়ে হিত
ত্যাগের চাইতে ভোগ কই আর হারার চাইতে জিৎ॥

আশ্বিন— আগমনী। শ্রীকালিদাস রায়। শ্রীমতী মোহিনীসেনগুপ্তার স্বরলিপি সহ। কবিতাটির উপরে কালিদাস বাবুর নাম না থাকিলেও—"মঞ্জুষা" "তরুণিমা" "নমেরু" "আপীন" "গোরস" "কোকনদ" "ইন্দীবর" "মকরন্দ" "শালিসম্পদ" "লাস্য" ইত্যাদি শব্দের একত্র সমাবেশ দেখিলেই বঙ্গীয় পাঠকের লেখক নির্দ্ধারণ করিতে বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হইত না। দিন দিন শব্দলালিত্যের মোহ কবিকে বড়ই আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে।

গোপনকথা। শ্রীগিরিজা কুমার বসু। মধুর রচনা—
"জানিস তোরা যতই রাগি যতই করি ভারি গলার স্বর
সবি আমার লোক দেখানো ছল
নয়তো তারে তোরা যখন ডাকিস্ বলে 'ওগো দিদির বর'
হৃদয় বলে 'আবার ফিরে বল।'"

অশ্রু। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কবিতাটি বোধহয় সুরেশবাবুর হাত পাকিবার আগেকার রচনা।

বাঁধনহারা। শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়। সুবোধ বাবুর এ কবিতাটি সুবোধ্য হইয়াছে—এটা কম লাভ নয়—কারণ আজকালকার অধিকাংশ কবিতাই—বিশেষতঃ সুবোধ বাবুর কবিতাগুলি দুর্ব্বোধই হয়। ছন্দোবন্ধও মন্দ নহে।

'পূর্ণতায়'—শ্রীমতী লীলাদেবীর "তুমি যদি আমি কেমনে কাহাতে যোগ' বুঝিলাম না।

রাজা সন্ন্যাসী। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। 'রাজা সন্ন্যাসী'—না—রাজ সন্ন্যাসী? ভাষার আড়ম্বরে ভাবটুকু কতকটা আচ্ছন্ন অন্যথা কবিতাটিকে সুরচিত বলা যাইতে পারে।

ভারতী শ্রাবণ। "কবে সে ডাক্‌লো কোকিল" শ্রীযুক্ত কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। লাস্যচপলছন্দে সুমধুর রচনা।

সহরে। শ্রীপ্যারিমোহন সেনগুপ্ত। দুর্ব্বল রচনা।

দুপুর অভিসার। কাজী নজরুল ইসলাম। ললিত চটুল ছন্দে, মধুর তরল শব্দ বিন্যাসে সরস সুন্দর রচনা। প্রথমার্দ্ধ অতি সুন্দর।

"যাস্ কোথা সই একলা ও'তুই অলস বৈশাখে
জল নিতে যে যাবি ওলো কলস কৈ কাঁখে?
সাঁঝ ভেবে তুই ভর দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুরপানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে
যাস্‌নে একা হাবা ছুঁড়ি
অফুট জবা চাঁপা কুঁড়ি তুই
ছাথ—রঙ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগবধূ ফাগ থাবা থাবা ছুড়ি,
পিকবধূ সব টিটকিরি দেয় বুলবুলি চুমকুড়ি
ওগো বউল-ব্যাকুল রসাল তরুর সরস ঐ শাখে॥

স্বরবর্ণের অনুপ্রাস কত মধুর হতে পারে তা এই নবীন কবি এই কবিতায় দেখিয়েছেন—বিশেষতঃ

সাঁঝ ভেবে তুই ভর দুপুরেই দুকূল নাচায়ে
পুকুর পানে ঝুমুর ঝুমুর নূপুর বাজায়ে

এই দুই পংক্তির 'উ' কারের অনুপ্রাস বড়ই উপভোগ্য। "থাবা ছুঁড়ি" "চাপা কুঁড়ি" "পাগ্‌লি মেয়ে!" রাগ্‌লি নাকি ?" "শিমুল ডালে"—"হিঙুলগালে" দিগ্‌বধূ "পিকবধূ ইত্যাদি পাশাপাশি বসে যে ঝঙ্কার তুলছে তাও বড় মিষ্ট। অনেক কবির পংক্তির শেষে এক অক্ষরের মিল দিতে যে কি প্রাণান্ত পরিশ্রম হয় তাহা দেখিয়া দয়া হয় কিন্তু এই কবির মিল ও অনুপ্রাস বিন্যাসের ক্ষমতা দেখে অবাক হতে হয় হিংসাও হয়। ইঁহার কবিতায় উপরি উপরি চার অক্ষরের মিলত সর্ব্বত্রই—পাচ অক্ষরের আগাগোড়া মিলও যথেষ্ঠ। এ কবিতায় আবার পংক্তির শেষে সাত সাতটা অক্ষর থাক্‌তেই মিল আরম্ভ হয়েছে—

* * অলস বৈশাখে * * কলস কই কাঁখে,
* * সরস ঐ শাখে * * পরশ সই তাকে ?

কবিতার অলঙ্করণ ঝঙ্কৃতি ও বিলাস প্রসাধনে অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়ার জন্য যে, দোষ স্বাভাবিক তাহা কবির রচনায় ঘট্‌ছে—কবিতার আত্মা ও অন্তরের দিকে দৃষ্টি কম পড়ে যাচ্ছে। মিল অনুপ্রাস শব্দ ঝঙ্কারের চমৎকারিত্ব সম্পাদনের জন্য ভাষার দিকেও নজর কম পড়ছে—কোনো কোনো স্থলে ভাষার নাককান আঙুল ছেঁটেও নিতে হচ্ছে।

"পিয়াল বনের দিয়াল ডিঙে"
"দুপুর বেলায় পুকুর গিয়ে"
"কেম্‌নে দিবি" ইত্যাদি বিকলাঙ্গতার উদাহরণ।

বৈশাখে রসাল তরু কবির মানসকুঞ্জ ছাড়া অন্য কোথাও "বউল ব্যাকুল" থাকে না।

"রঙ দেখে তোর লাল গালে যায়
দিগ্‌বধূ ফাগ থাবা থাবা ছুড়ি।"
"পলাশ অশোক শিমুল-ডালে
বুলাস্ কি লো হিঙুল গালে তোর"

একেবারে লালে লাল। এত রক্তের ছড়াছড়ি লালের বাড়াবাড়ি সৌন্দর্য্যকে দৃষ্টিসুখকর করে না।

"শ্যাম চুমু খায় সব সে কুসুম লালে।"

এ পংক্তিটি রীতিমত দুর্ব্বল দুর্ব্বোধ হয়ে পড়েছে। রচনার মধ্যে যে সকল অনুপ্রাস সহজে আসে তাহাই প্রকৃত পক্ষে অনুপ্রাস, চেষ্টা করিয়া আহরণ করতে গেলে তাহা অনুপ্রয়াস হয়ে ওঠে। যে ঝঙ্কারে প্রয়াস প্রকটিত হয়ে ওঠে তাহা ঝঙ্কার না হয়ে ক্রেঙ্কার হয়। মিল ও অনুপ্রাসের আতিশয্যে আর একটা অসুবিধা আছে। অনেকগুলির মধ্যে ২।১টা যা জোরালো ও স্বয়মাগত তারাই প্রবল হয়ে ঝঙ্কার দেয় বাকীগুলো ঐ ২।১ টার প্রভাবে অভিভূত হয়ে বিফল হয়ে যায়—কবির আহরণের ক্লেশ ব্যর্থ হয়।

অনুপ্রাসবহুল ঝঙ্কারসঙ্কুল রচনায় আর একটা দায়িত্বও আছে।—মুহুর্ম্মুহু অনুপ্রাস ধ্বনিত উচ্চারণে পাঠকের কর্ণ এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে কবিতার যে সকল পংক্তিতে অনুপ্রাসের অভাব থাকে সে সকল পংক্তিকে বড়ই নীরস ও কর্কশ লাগে এবং তুলনায় বড়ই ম্রিয়মান বলে মনে হয়। সেজন্য কবিকে বাধ্য হইয়া সমগ্র কবিতার সর্ব্বাঙ্গে কিঙ্কিণীকঙ্কণ পরাতে হয়—তাহাতে কবিতার গতির স্বচ্ছন্দতা থাকেনা—বাধ্য হইয়া ভাবকে কতকটা বিসর্জ্জন দিতে হয় ভাষাকেও পঙ্গু করতে হয়। মনে রাখতে হবে ভাব আত্মার সম্পত্তি ঝঙ্কার কাণের প্রিয় জিনিস ভাব ও ভাষা একত্রে সাহিত্যের সম্পৎ। কাণকে সবার উপরে ঠাঁই দিলে চলিবে না।

সত্যেন্দ্রবাবু কবিতাকে অনুপ্রাসঝঙ্কৃত করবার জন্য অনেক অপ্রচলিত সংস্কৃত, বিদেশী ও গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করছেন—কাজী নজরুলও অপ্রচলিত পারশী ও গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁরা হয়ত বলবেন নূতন নূতন শব্দের প্রয়োগ প্রবর্ত্তনে বঙ্গ ভাষার পুষ্টিসাধন হচ্ছে। নূতন নূতন শব্দের সমাগমে ভাষার পুষ্টি হয় স্বীকার করি, কিন্তু সেগুলি সহজ সরল ও স্বাভাবিক ভাবে আসা চাই নতুবা সর্ব্বজনগৃহীত হবে না।

তাঁহাদের কবিতার রত্নাসনে সেগুলি বসিয়া থাকিলে সাধারণের কাজে লাগিবেনা ; সেজন্য সরল পদ্যে ও তরল গদ্যে তাহারা প্রযুক্ত না হইলে সাধারণের সম্পত্তি হইবে না। কাজী নজরুল অনেক অপ্রচলিত পার্শী শব্দ, আরবী

শব্দ তাঁহার কবিতায় প্রয়োগ করেছেন কিন্তু তিনি শুধু শব্দগুলিকেই আরব সাগর পার করিয়ে নিয়ে আসেন নাই সেই সঙ্গে পারস্য ও আরব দেশের আবহাওয়া ভাব ভঙ্গি, কল্পজীবন, রসহৃদয় পারস্য সাহিত্যের তেজ, তীব্রতা উগ্রতা সবই বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে নিয়ে এসেছেন। সেজন্য কবি নজরুল অনুপ্রাসের প্রলোভনে যে সকল পার্শী শব্দ আমদানী করছেন কবিতার বিষয় গৌরবের ও শব্দগুলির নিজস্ব ওজস্বিতা ও তেজস্বিতার গুণে সেগুলি বঙ্গকাব্য-সাহিত্যে একটী অভিনব ভঙ্গিই দান করেছে। ঐ অভিনব ভঙ্গি ও তাঁহার ঝঙ্কৃত দীপক রাগটির জন্য ঐ সকল শব্দ পরদেশী হইলেও বঙ্গবাসীকে চেষ্টা করিয়া আয়ত্ত করতে হবে।

কবি নজরুল এখনো উদীয়মান কবি—অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যে ক্ষমতা দেখায়েছেন তাহাতে মনে হয় একদিন তিনি বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি হবেন।

তাঁর কাব্যলক্ষ্মী একদিন সকল অলঙ্কার সকল বিলাস-বিভ্রম ত্যাগ করে' প্রৌঢ় মহিমায় ও পরিণত গাম্ভীর্য্যে সকলের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে! এখন তাঁর কলালক্ষ্মী কিশোরী—তাঁর পায়ে নূপুর রণিত হচ্ছে।—আমরা বাংলার পাঠক, মঞ্জীর শিঞ্জন বড় ভাল বাসি—বাংলার আদি কবি জয়দেব আমাদিগকে নূপুর শিঞ্জন ভাল বাস্‌তে শিখিয়েছেন। নূপুর কিঙ্কিনী আর কঙ্কণ মুখর-হারকেয়ূর ও মুকুট নীরব। নবযৌবনের মুখরতা কিঙ্কিনী কঙ্কনে রণিত হবে। তা না হলে যৌবনই ব্যর্থ। প্রৌঢ়তার স্তব্ধ মহিমা কেয়ূর মুকুটের গরিমায় প্রকটিত-সেদিন যখন আসবে তখন আপনি কিঙ্কিনী কঙ্কন থেমে যাবে।

নবীনের দেশ। শ্রীকুমুদরঞ্জন। কুমুদবাবুর কবিতার প্রধান গুণ আন্তরিকতা ও সহানুভূতি। সরল সহজ ভঙ্গিতে ললিতমধুর ভাষায় অজস্র উপমার সাহায্যে বাংলার প্রকৃতি ও সংসারের ছোট ছোট সুখ দুঃখ, হাসি অশ্রুকে তিনি ছন্দিত করিতে সিদ্ধহস্ত।

আমরা তাঁর ঐ সকল কবিতার বড়ই অনুরাগী। কিছুদিন হতে—প্রবাসী ভারতীর সহিত তাঁর সম্পর্ক স্থাপনের পর হতে,—দেখছি তিনি যেন প্রাণহীন আন্তরিকতাশূন্য কলানৈপুণ্যের বড় পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন। সেদিন বন্ধু-সমাজে একজন বল্‌ছিলেন—"কুমুদবাবু ছন্দোঝঙ্কারে সত্যেন বাবুর প্রতিযোগিতা করতে আরম্ভ করেছেন।" এটা চির-সরল মাধুরীর কবি—তাঁর পক্ষে খুব প্রশংসার বিষয় নহে। আলোচ্য কবিতাটি পড়িলে উক্ত বন্ধুর কথাটা কতকটা সমীচীন বলে মনে হয়। কবিতাটি নিছক ছন্দোঝঙ্কারের কারুকর্ম-কবিতার লাস্যচপল চরণের মঞ্জীরধ্বনি শ্রোত্ররম—কিন্তু ইহাতে কুমুদবাবুর নিজস্বতা নাই। কাজী নজরুলকে যে জন্য বাহবা দেওয়া যায়—ঠিক সেইজন্য তাঁহার প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপনীত স্বাধীনচেতা শিক্ষক কবিকে আমরা বাহবা দিতে পারলাম না। কবি শিল্প-চাতুর্য্যের অধিক পক্ষপাতী হয়েছেন বলিয়া তাঁহাকে দোষ দিই না বরং পূর্ব্বের কবিতা-গুলিতে শিল্প চাতুর্য্যের কতকটা অভাব ছিল বলিয়া আমরা দোষ ধরেছি। এ কবিতাটি শুধু শিল্প চাতুর্য্যের কেরামতী দেখানর জন্য লিখেছেন এবং শিল্পচাতুর্য্যের জন্য ভাষার সহজ সরল সুবোধ ভঙ্গিটিকে বিসর্জ্জন দিয়েছেন বলে এত কথা বলা।

"অবুঝের সবুজের নব অভিনয়"

এখানে অবুঝের সহিত সবুজের আনুপ্রাসিক মিল ছাড়া ইহাদের একত্র সন্নিবেশের অন্য কি কারণ আছে?

"সেথা—গুল বুল বুল
করে—পয় পয় ভুল
"দোলে—তুল তুলে ঢুল ঢুলে বন্‌ফুলচয়"

এখানে 'ল' এর অনুপ্রাস ছাড়া অন্য কি রসমাধুর্য্য আছে? 'বনফুল' কে 'বন্‌ফুল' করলে আর তার পর "চয়" চলে না।

"সেথা লালিমায় টুকটুকে অধরের লাল"

অধরের লাল লালিমায় টুকটুকে, ইহাতে লালই বাড়ল-রসত কমে গেল। 'লালিমা' শব্দ সম্বন্ধেও আপত্তি আছে।

"সেথা আলোকের চুমা চায় গোলাপের গাল"

ছন্দের পংক্তিতে স্থলাভাব—সেজন্য "গোলাপ বালা" গোলাপসুন্দরী বা গোলাপরাণী এমনি একটা কিছু বলে 'গালে'র মর্য্যাদা রাখা সম্ভব হলো না।

"সেথা—ফেলে চুপ্ অপরূপ রূপ্ শরজাল"

শুধু 'প' এর অনুপ্রাসে তুষ্ট হইতে পারি না একটা সঙ্গত অর্থ চাই।

"সেথা—কমলের সুরে বাজে প্রণয়ের বীণ"
"কমলের সুর"টা কি প্রকার?
"সেথা, হাসে বধূ-বর, নাচে কিন্নরী-নর"

ক্ষুদ্র প্রাণ স্বল্পস্থান পংক্তিতে স্থলাভাবে কিন্নরীর সঙ্গে কিন্নরের মিলন হলো না নরের ভাগ্যই প্রসন্ন হলো।

"সেথা বাসেরি আভাস আসে মঞ্জরীতে"
"বাস" নিশ্চয়ই গন্ধ বা সৌরভ।

মঞ্জরীতে অর্থাৎ মঞ্জরী হতে "সৌরভ" নয় 'সৌরভের আভাষ' আসে—নতুবা অনুপ্রাস হয় না।

সেথা—অঞ্চলালোক
করে—চঞ্চল চোখ
ছোটে—রামধনু-আঁকা পথে সঞ্চরিতে।

অঞ্চলালোক বোধ হয় অঞ্চলে খচিত রত্নে প্রতিফলিত আলোক। নবীনের দেশে চোখ তাতে চঞ্চল হইলে রামধনু-আঁকা পথে সঞ্চরণ করতে ছোটে। "নবীনের দেশ" নাম না দিয়ে "অনুপ্রাসের শেষ" নাম দিলেই ভাল হতো। এতে কাণ ভোলে কিন্তু প্রাণ ভোলে না।

বর্ষায়। শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী। সুধীরবাবুর রচনায় কবিত্ব আছে কিন্তু abstraction এর দিকে ঝোঁক বেশী এবং রচনায় একটা স্থিরাবলম্ব মেরুদণ্ড নাই।

"বরষা নেমেছে এসে
সন্ধ্যার অঞ্চল ধরি ধরণীর স্তব্ধ গৃহতলে
মৃদুপদে মেঘাবগুণ্ঠিতা।

* * * *

সুপ্তা ধরণীর তন্দ্রা গেল টুটে
বাঁধা পড়ে, একেবারে আকাশের কোটি বাহুপুটে,
আঁখি না মেলিতে আঁখি ছেয়ে গেল চুম্বনে চুম্বনে।"

এ সকল অংশ বেশ সুন্দর ও সুরঞ্জিত। বরষায় তৃণপুঞ্জ কিরূপে মর্ম্মরিয়া উঠিবে!

একটী বিরাট বোবা স্নেহ (?) ললাট বহ্নিতে
জেলে বাতি গগনেরে চিরি চিরি খুঁজিয়া করে
সে পাতি পাতি
বজ্র হয়ে টলে পড়ে ধরাতলে ব্যর্থ মূর্চ্ছাহত?

"সেই বোবা স্নেহই কি উন্মাদের মত "উতলা বাতাসে যায় সথা তথা ছুটি?"

"সেই বোবা স্নেহই কি মুঠি মুঠি বনের বিক্ষোভে ছেঁড়ে আপনার চুল?"

বোবা স্নেহের কাণ্ডটা ভাল বুঝলাম না। "খালি" কথাটার প্রয়োগও যেন কেমন কেমন; "দুখানি দোদুল অশ্রুধারা আঁখিকোণে" "বাহিরের এ বরষা খানি ইত্যাদি—" সুধীর বাবুর কবিত্বটা বাগাড়ম্বরের পাথরচাপা পড়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ছে।

ভাদ্র—জটাবুড়ি। শ্রীসুধীর কুমার। সুধীরবাবু কবিতায় মস্ত মস্ত ফাঁক দিয়ে যান আর বলে যান "fill up the gaps" এ দুরন্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। রচনা ব্যঞ্জনালঙ্কারে মণ্ডিত হইলে সকল কথা খুলিয়া বলে না—সকল কথা খুলিয়া বলেনা বলেই রচনা সুন্দর হয়। 'আধনগ্ন আধমগ্ন' না হলে কোন সৌন্দর্য্যই চিত্তহরণ করে না—সুধীর বাবুর এ-ত ব্যঞ্জনা নয় এ যে রীতিমত হেঁয়ালী। তাঁর প্রকাশের দোষেই হোক্ নয় আমাদের ধী-শক্তির অভাবেই হোক্ বিশেষ লোভ সত্ত্বেও তাঁহার কবিতা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারছিনা। তবে বুঝবার জন্য লোভ ও আছে তার কারণ মাঝে মাঝে এতই চমৎকার যে অস্পষ্টতার কুহেলিকা ভেদ করে বিদ্যুতের মত চোখে পড়ে। তাছাড়া ভঙ্গির বেশ শুচিতা ও মন্থরতা আছে। নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি সুন্দর।

"জলপিপাসায় ফল্গুনদীর চড়ার বালি
দাঁত দেখায়ে হাসে খালি।"
"মায়েরা যায় ছেলে কোলে, গাগর কাঁখে,
বুড়ি কেবল চেয়েই থাকে।
ছেলের মুখে খেয়ে চুমো
কয় তারা, বাপ, ঘুমো ঘুমো,
পথের বাঁকে!"

"প্রণয়ীরা পরস্পরে ভালোবেসে
বুকে টানে প্রেমাশ্লেষে।
পরস্পরের দেহের ভারে
বুকের শুধু ভারই বাড়ে,
রয় না প্রণয় রাত্রিশেষে।"
"বিনি-সূতার মালা হতে
একটি ফুল ঝরল পথে
শিথিলতা সবগুলিতে।"

ঘরের বাঁধন। শ্রীমোহিত লাল মজুমদার। সুন্দর কবিতা—

পায়জোরে তোর ঝম্‌ঝমাঝম
ছিট্‌কে পড়ে শঙ্কা-সরম,
কাল্‌-ফণী সে লুটায় ফণা, পায়ের তলায় যখন দলিস্
আল্‌তা পরায় পথ যে তোরে, গহন বনে যখন চলিস্
—কাঁটা দলিস্।

সুন্দর।

"আল্‌তা......দলিস্,"—অতুলনীয়। মহাকবি চণ্ডীদাস সহজিয়া পীরিত সম্বন্ধে বলেছেন—সাপের মুখে যে ভেকেরে নাচাতে পারে তাহাকেই এ পীরিত সাজে। আমাদের নবীন কবি সে ভাবটি অন্য ভাষায় বলেছেন—

ফাগুনফুলের মালা গাঁথে যেজন আগুন খেলার মাঝে।

দ্বিতীয় শ্লোকটি রচনায় কবি, হয় অতি মনোযোগ দিয়েছেন নয়ত অমনোযোগী হয়েছেন।

শেরী। শ্রীকুমুদ রঞ্জন। এ কবিতা কবি কুমুদ রঞ্জনের লেখনীর উপযুক্তই হয়েছে। গোড়া হতেই সুন্দর।

সুন্দরী সে নামটি 'শেরী', বেদুইনের মেয়ে
রূপের কমল উঠলো যেন আগুন থেকে নেয়ে।
চাঁদ-কপালে থাক্ দিয়ে ওই উড়ছে কাল চুল,
গোলাপবাগে চরতে এলো, কোকিল করে ভুল।
* * * *
চক্ষু সেকি? একটা গোটা স্নিগ্ধ মরুদ্যান,
গোলাপ ফোটে, হরিণ চরে, কপোত করে স্নান!

ছন্দে বাধে একটু—নইলে কপোতের জায়গায় 'খঞ্জন' লিখতে পারলে আরো ভাল হতো।

দীপক যে যায় বেহাগ হয়ে নয়ন-জলে গলে'।

মল্লার হলে বোধ হয় আরো ভালো হতো—কিন্তু ঐ বিপদ্।

"নিদ্রা তাহার আর আসে না ডাগর আঁখিপাতে" সত্যেনবাবু হলে হয়ত লিখতেন—

নিদসাগরের ঢেউ লাগে না ডাগর আঁখিরকূলে—

কবি Wordsworth এর ধরণে কবিতার শেষ করে বলেছেন—

"আজও মরুর ঝড়ের মত ফিরছে অহর্নিশ।"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

ইহার চেয়ে হতাম্ যদি আরব বেদুইন
চরণতলে ভীষণ মরু দিগন্তে বিলীন।

বাংলার কবিতায় সেই প্রথম বেদুইনের নাম পেয়েছিলাম—আজকে নবীন কবিরা বেদুইনদের মরুভূমি হতেই রস আহরণ করছেন।

কাজী নজরুল বেদুইনদের দেশ দেখে এসেছেন—তিনিত রীতিমত সে রসধারার ভগীরথ। মোহিত বাবু একটা আরব মরুর মত বিরাট বেদুইন কবিতা লিখে ফেলেছেন। কুমুদবাবু "নরজা এবং কর্জ্জনা আর গর্দ্দান মারীর দেশের" কবি, কাজেই কতকটা আরবী ভাব তাঁর মাথায় আস্তে পারে। ইতিমধ্যে অর্চ্চনায় এক কবি (?) কবিতা সরস্বতীকে দুঃখ করে বলেছেন "মা তোমার এমন দুর্গতি হয়েছে যে তুমি বেদুইনের তাঁবুতেও প্রবেশ করেছ" তাই—ত, বড় চিন্তার কথা,—কাব্য সরস্বতী শেষটা মুসলমানী প্রভাবে পীরালী হইয়া পড়বেন।

ভালো—শ্রীঅরুণ কান্তি বাগচী। বিশেষত্বশূন্য, মাঝে মাঝে মিল নাই—"পাখীর কণ্ঠে ঝরছে জগৎ"—অতিরিক্ত কবিত্ব।

সুরধুনী কাব্য ও তাহার ঐতিহাসিকতা

[শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ গুপ্ত]

প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কাব্যের এক একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, কাহারও আখ্যানভাগ পৌরাণিক তথ্য হইতে সংগৃহীত, ভক্তির বা ধর্ম্মের শিক্ষাপ্রদ তত্ত্বকথাই তাহার বিশিষ্টতা; কাহারও বা স্নিগ্ধ মাধুর্য্য প্রেমের ও কারুণ্যের মোহকর উদন্তস্রোত লইয়াই পূর্ণ প্রস্ফুট; অথবা কাহারও মনোহারিত্ব তৃপ্তিপ্রদ দৃশ্যনিচয়ের বর্ণন পারিপাট্যে নিবিষ্ট। আমাদিগের আলোচ্য সুরধুনী কাব্য শেষোক্ত বিভাগভুক্ত। পুণ্যসলিলা হিমাদ্রিসম্ভবা সুরধুনীর কল্লোলবিধৌত তীর্থ সমূহের বা বিশিষ্ট স্থান সকলের এবং ভাগীরথীবেলাস্থ সুশোভন দৃশ্যাবলী বর্ণনই ইহার উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ ঐতিহাসিকতাই ইহার বিশেষত্ব। অধিকন্তু কবিবর দীনবন্ধুর সমসাময়িক বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ মহানুভবগণের পুণ্যোজ্জ্বল চরিতকথা ধারণ করিয়া সুরধুনী কাব্য অধিকতর গৌরবান্বিত ও আদরযোগ্য হইয়াছে। কল্পনার বিশিষ্ট ভাবৈশ্বর্য্যে, লীলায়িত পদভঙ্গীতে অথবা মঞ্জুল শব্দ লালিত্যেও ইহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

তুষার মৌলী হিমাদ্রিতনয়া সুরধুনী যৌবনে পদার্পণ করিলেন; প্রাপ্তযৌবনা জাহ্নবী মাতাপিতার চরণ বন্দনা করিয়া সখীসহ সাগরসঙ্গমে চলিয়াছেন, পথে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আগত সহচরীবৃন্দের নিকট তাহাদিগের উপকূল সংলগ্ন ভূমিভাগের মাহাত্ম্য বর্ণনা অথবা তত্রত্য পূতচেতা মহানুভবগণের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছেন; ইহাই সুরধুনী কাব্যের আখ্যানভাগের মূলকথা। সুরধুনীর এইরূপ পতিসঙ্গমে গমন কোনও পৌরাণিক কথা সঙ্গত না হইলেও কবির কল্পনা প্রসূত এই বিবৃতির মধ্যে বেশ একটা মাধুর্য্য রক্ষিত হইয়াছে।

জীমূতনিনাদী প্রপাতপতন উল্লঙ্ঘন করিয়া গোমুখী তোরণপথে আবেগচপলা সুরধুনী হিমাচল হইতে বহির্গত হইলেন। সেই স্থানে—

> তুষার মণ্ডিত এক প্রকাণ্ড দেয়াল,
> শৈলকুলেশ্বর সৌধ প্রাচীর বিশাল,
> করিতেছে ধপ ধপ ভীম দরশন
> অনুমান শশাঙ্ক-শেখর বিভীষণ
> শির হ'তে শত শত, শুভ্র অতিশয়,
> নামিয়াছে তুষার শলাকা আভাময়,
> তুষার-শলাকাপুঞ্জ, তুষার প্রাচীরে
> শোভে যেন শুভ্র জটা ধূর্জ্জটীর শিরে।
> সেই শলাকার মাঝে গোমুখী বিরাজে
> শিবের জটায় গঙ্গা বলি কাজে কাজে।

ইহাই শিবের জটায় জাহ্নবী বিরাজ করেন এই প্রবাদ বাক্যের প্রাকৃতিক কারণ। করিরূপ শিলাপুঞ্জ স্রোতে ভাসাইয়া পতিতপাবনী বিষ্ণুপ্রয়াগে সহচরী অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া শ্রীনগরে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বে বাণিজ্যের প্রসার হেতু শ্রীনগরের যে একটা প্রতিপত্তি ছিল তাহা আমরা কবির বর্ণনা হইতে অবগত হই—

> এই স্থানে বড় ধূম মেলার সময়,
> কত লোক আসে যায় সংখ্যা নাহি হয়,
> রাশি রাশি দ্রব্য দেখ বিক্রয়ের তরে,
> বসন বাসন বাজী ধরে না নগরে।

পুণ্যসলিলা ভাগীরথী হরিদ্বারের পাদবিধৌত করিয়া কানপুরাভিমুখে কাট্‌লী কর্ত্তিত খাল পথে প্রয়াণ করিয়াছেন। পাণ্ডবাবাস হস্তিনাপুরী পশ্চাতে রাখিয়া গঙ্গা প্রাচীন প্রসিদ্ধ অনূপসহরে উপস্থিত হইলেন। কবি প্রসঙ্গক্রমে এই স্থলে অনূপসহরের সহিত সংশ্লিষ্ট একটি করুণ কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। পুরাকালে গম্ভীর স্বভাব 'হোমানল' নামে এক তপোধন বাস করিতেন, আহুতি

তাঁহার বেদবিশারদা পরম বিদুষী কন্যা ছিল, মেধাবী অনুপচন্দ্র তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিল। একদিন বাসন্তী যামিনীশেষে পরিমলকণাবাহী প্রভাতপবনহিল্লোলে বাতায়ন পথ দিয়া অনুপের মধুর বেদগান আহুতির কর্ণে প্রবেশ করিল। সমস্তদিবস ভাববিহ্বলা আহুতি ক্ষুণ্ণমনে একাকিনী নাগকেশরের মালা গাঁথিয়া গোপনে পূজানিরত অনুপচন্দ্রের কণ্ঠে পরাইয়া দিল। তারপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে সাশ্রুনেত্রা আহুতি আলবালে জলদান করিতে গমন করিল, তখন—

দিবা অবসান, রবি ডুবিল ডুবিল
সোনার আতপে ধরা হাসিতে লাগিল,
শীতল পবন বয় পরিমলময়,
দোলে লতা কচিপাতা কুসুম নিচয়,
নবীন তমালে কাল কোকিল কুহরে
নাচিছে ময়ূর মুখ ময়ূরী অধরে,
সুরধুনী নীরে নাচে কনক লহরী
নীরবে তুলিয়া পাল চলে যায় তরী।

গোপনে নাগকেশরের মালা বদল হইয়া গান্ধর্ব্ববিবাহ সম্পাদিত হইল। কিন্তু গুপ্তপ্রণয় অধিকদিন অপ্রকাশিত রহিল না। জ্ঞাত সমাচার ক্রোধান্ধ তপোধন অনুপচন্দ্রকে জাহ্নবীর আবর্ত্তে তনুত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। গুরুর আদেশে অনুপচন্দ্র ভাগীরথী সলিলে প্রাণত্যাগ করিল, বিরহব্যথিতা বিষাদক্লিষ্টা আহুতি একাকিনী কাতর নয়নে কাননে কাননে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু সতীর ব্যাকুলতা বুঝি দেবতার নিকটও অবহেলার যোগ্য নহে, বুঝি বা সতীত্বের প্রবল আকর্ষণ মৃতকেও আবার মূর্ত্তিমান করিয়া নয়ন সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারে। একদিন যখন শোকমুহ্যমানা আহুতি জাহ্নবীকূলে পতির চিন্তায় নিরতা ছিলেন, তখন নাগকেশরমাল্যপরিহিত সামসঙ্গীতপরায়ণ অনুপের অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি সলিলতল হইতে উত্থিত হইয়া বিরহব্যাকুলা আহুতিকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। সেইজন্য অনুপসহরের এত প্রসিদ্ধি।

এইবার গঙ্গা এলাহাবাদে আসিয়া যমুনার সহিত সম্মিলিত হইলেন। সেখানে গঙ্গা ও যমুনার সম্মেলনে কালো ও ধবলের যে অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে, যাহার উল্লেখে কালিদাস বলিয়াছেন—

"ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ র্মুক্তাময়ী যষ্টি রিবানুবিদ্ধা
অন্যত্র মালা শিতপঙ্কজানামিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব ॥
ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্ক্তিঃ
অন্যত্রকালা গুরুদত্তপত্রা ভক্তিভুর্বশ্চন্দন কল্পিতেব ॥
ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিশ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্রশুভ্রা শরদভ্রলেখা রন্ধ্রে ষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশাঃ ॥
ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।"

দীনবন্ধু ভাবের আলোকসম্পাতে যমুনার সেই কালোরূপের অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—

যমুনা গঙ্গার বোন ছিল হিমাচলে,
হেরি ভগিনীর ভাব ভাসে আঁখিজলে,
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাকিনী
ভেবে ভেবে কালরূপ তপন নন্দিনী ;
সত্বরে তরঙ্গ যানে যমুনা চলিল,
প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া মিশিল।

কথা প্রসঙ্গে যমুনা আপন আগমন বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ; কেমনে শত রম্যহর্ম্যপরিশোভিত দিল্লী নগরীর পাদবিধৌত করিয়া, প্রসিদ্ধ জুম্মা মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া নৃত্য করিতে করিতে হুমায়ুনের কবর সমীপে কল্লোলগান-রতা কুতবমিনারের প্রাচীন যশোগাথা বক্ষে ধারণ করিয়া যমুনা বহিয়া আসিয়াছেন। কুতবমিনার পৃথ্বীরাজার এক প্রসিদ্ধ কীর্ত্তি, কন্যার তীর্থানুরাগ সফল করিবার নিমিত্ত এই বিশাল স্তম্ভের সৃষ্টি, পরে মুসলমান নৃপতি ইহার সংস্কার বিধান করিয়া ইহাকে এই আখ্যা দান করিয়াছে। তারপর যমুনা কৃষ্ণের শেষলীলা মুখরিত মথুরাপুরীর পাদচুম্বন করিয়া বৃন্দাবনে সংসারত্যাগী বদান্যহৃদয় লালাবাবুর মন্দির মঠ ও অতিথিশালা বেষ্টন করিয়া পরমরমণীয় আকবর রাজধানী আগ্‌রানগরীতে উপনীত হইলেন। তৎপরে প্রেমের প্রোজ্জ্বল নিদর্শন তাজমহলের পার্শ্ব দিয়া আপনার প্রীতিমুখর সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে অপূর্ব্ব নয়ন মোহকর মতিমঞ্জিলের সম্মুখপথে আগমন করিয়াছেন।

এই স্থলে লালাবাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান স্থানোপ-

রোগী বলিয়া মনে করি। কারণ তিনি একদিকে বাঙ্গালীর গৌরবস্থল ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। ইনি দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদির জমীদার এবং পাইকপাড়ার রাজাদিগের অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ। প্রথম যৌবনে পিতার সহিত মতান্তর হওয়ায় ইনি স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন উদ্দেশে বর্দ্ধমান জেলার সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। কার্য্য কুশলতার পরিচয় দিয়া ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি উড়িষ্যায় সরকারী বন্দোবস্তী মহালসকলের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর ইনি সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। কথিত আছে একসময়ে ইনি জমিদারী পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাগমন কালে সন্ধ্যার সময় একগ্রামে উপস্থিত হন। সেইখানে শুনিলেন, এক রজককন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে—"বাবা বেলা যে গেল বাসনায় আগুন দাও।" কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা শুনিয়া একটু তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আমারও ত বেলা ফুরাইয়া আসিল, বাসনায় আগুন দিতে পারিলাম কৈ? তখনই স্থির করিলেন আর সংসারে থাকিবেন না। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি মথুরাবাসী হইলেন, তথায় ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রমাবিগ্রহ ও তৎসংলগ্ন আশ্রম স্থাপন করিলেন। লালাবাবুর মন্দির নিরাশ্রয় বাঙ্গালীর আশ্রয় স্থল। ইহাতে বার্ষিক ২২০০০৲ টাকা ব্যয়িত হয়। তিনি ৪০ বৎসর বয়সে মাধুকরী ব্রত গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজী ইঁহার গুরু স্থানীয় ছিলেন। মৌনব্রত গ্রহণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার দ্বারা তিনি দৈনিক আহার সংগ্রহ করিতেন। তিনি ৪২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে তিনি এখনও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া আছেন।

এই প্রসিদ্ধ দৃশ্যাবলীর বর্ণন মধ্যেও দীনবন্ধুর আর একটি কৃতিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়। আপনার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার দ্বারা এই একটানা বর্ণনার মধ্যে তিনি বেশ সরসতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

ছাড়িয়া প্রয়াগ গঙ্গা অবিরাম চলে
উপনীত ক্রমে আসি বারাণসী তলে।
কাশীতে হেরিল বালা বিশ্বেশ্বর বর
সলাজ ফিরাল মুখ কাঁপে কলেবর,
সেই হেতু কাশীতলে ভীষ্ম প্রসবিনী,
হয়েছেন মনোলোভা উত্তর বাহিনী।

কাশীর প্রধান কীর্ত্তি জ্যোতিষাগার মানমন্দির। ভারতে জ্যোতিষের বহুল প্রচারের নিমিত্ত অম্বরাধিপতি জয়সিংহ ইহার সংস্কার সাধন করেন। আর আছে শিক্রোল সন্নিকটস্থ প্রাচ্য দর্শনবেদ ও কাব্যের অধ্যয়ন মন্দির, যাহার প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

চন্দ্রনারায়ণ গুণে এই বিদ্যালয়
করেছে পণ্ডিতমাঝে সুখ্যাতি সঞ্চয়।

পুণ্যধাম বারাণসী ত্যাগ করিয়া সুরধুনী সহচরী গোমতীর সহিত সম্মিলিত হইলেন। সুরধুনী কাব্যে এই লক্ষ্ণৌবর্ণনের সহিত বঙ্গদেশের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে; — রাজা দক্ষিণারঞ্জনের দ্বারা লক্ষ্ণৌনগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধন উপলক্ষে দীনবন্ধু লিখিয়াছেন—

নয়নরঞ্জন রূপ দক্ষিণারঞ্জন,
করিতেছে সযতনে উন্নতি সাধন।

এই স্থলে রাজা দক্ষিণারঞ্জনের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মজীবনীতে দক্ষিণারঞ্জনের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—"দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিখ্যাত টাইমস্ পত্রে ইংরাজের পক্ষে দুই একটি প্রবন্ধ লেখাতে এবং বিখ্যাত খ্রীষ্টিয়ান মিশনারী ডাক্তার ডফ্ লর্ডক্যানিং এর নিকট তাঁহার গুণানুবাদ করাতে লর্ড বাহাদুরের অনুগ্রহ দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অযোধ্যা প্রদেশে লর্ড বাহাদুর এক জমিদারী প্রদান করেন। দক্ষিণারঞ্জনকে অযোধ্যা প্রদেশের পুনর্জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি লক্ষ্ণৌতে ক্যানিং কলেজ ও Oudh British Indian Association স্থাপন করেন। যখন Sir Charles Trevelyan লক্ষ্ণৌনগর দেখিতে যান, তখন Oudh British Indian Associa-

tion দেখিয়া বলিয়াছিলেন— This is your Parliament, Dhakshinaranjan"

অতঃপর ভাগীরথী বহুপবিত্র তীর্থভূমির পাদবিধৌত করিয়া ছাপরায় উপনীত হইয়া 'সতীগঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেন। কারণালী তীরস্থ এক নগরে কঠোর হৃদয় ধর্ম্ম-জ্ঞান বিবর্জ্জিত এক নরপতি রাজত্ব করিতেন; তাঁহার পূর্ব্বতন সেনাপতিপুত্র পুণ্ডরীকের 'শম্পা' নামে পরম ধর্ম্মিষ্ঠা ও অপূর্ব্ব রূপবতী ভার্য্যা ছিল। শম্পার রূপমুগ্ধ কামান্ধ পাপমতি নৃপতি পুণ্ডরীককে বিবিধ নির্য্যাতনগ্রস্ত করিয়া বলপূর্ব্বক 'শম্পাকে' অপহরণ করিলেন, কারুনালী তীরবর্ত্তী কেলিগৃহে মূর্চ্ছিতকল্পা বিলাপপরায়ণা সতী রমণীর ধর্ম্মলোপ সাধনে উদ্যত পাপাত্মা দৈবনির্দ্দেশে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত লাভ করিল, অকস্মাৎ কারুনালীর উত্তাল তরঙ্গমালা প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া দুরাত্মা ভূপকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। এই প্রকারে—

কারনালী শম্পাসতী করিল উদ্ধার,
সেই হেতু সতীগঙ্গা এক নাম তার।

এক্ষণে সোনের নিকট হইতে পৌরাণিক কথা প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বর্ণন শ্রবণ করিয়া সুরধুনী পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাটনার চমৎকারপ্রদ দৃশ্য গোলঘর, ইহার শৈলাকার সুগঠিত উন্নতশীর্ষ গর্ব্বভরে অম্বর চুম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাটনা ছাড়িয়া ভাগীরথী মুঙ্গেরে উপনীত হইলেন। ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে সুরধুনী কাব্যে বিবৃত এই স্থানের বিবরণ বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। এই মুঙ্গেরের দুর্গে নবাব রাজা রাজবল্লভকে কারারুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, অবশেষে তাঁহারই প্রার্থিত বিধানে গঙ্গাসলিলে তাঁহার প্রাণনাশ করিয়াছিলেন; আবার এই দুর্গেই ক্রুদ্ধ নবাব রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায় ও তৎপুত্র শিবচন্দ্রকে বন্দিভাবে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজের জয়ে পিতাপুত্র নবাবপ্রদত্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইতে উদ্ধার পাইলেন।

তারপর বেহুলার করুণ গাথা সমন্বিত চম্পানগরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সুরধুনী রাজমহলে দর্শন দিলেন। এই রাজমহলে নবাবী আমলের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া কাব্যশাস্ত্র বিশারদ হিন্দুকলেজের অধ্যাপক কাপ্তেন রিচার্ডসন একটি মনোরম কবিতা রচনা করেন; এই স্থানে উহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম—

এসহে পথিক হেথা এস এইখানে,
কালের নাশিনী গতি হের এই স্থানে।
যখন নিশীথকালে পেচকের রব,
শ্রবণ বিবরে আসি পশিবেক তব,
সুতীক্ষ্ণ চীৎকার ধ্বনি উঠিবে সঘনে
কৃশতনু শিবা হতে নির্জ্জন গগনে;
যদি হে তোমার চিত্ত হয় হে তেমন
পবিত্র উৎসাহে পূর্ণ, কবিত্বে মগন,
কিংবা জ্ঞানচিন্তারত হয় তব মন
এ ভগ্ন প্রাচীর তোমা বলিবে তখন,—
কি অনিত্য হয়, হায়! পার্থিব গৌরব,
মানবের কীর্ত্তি সহ গত হয় সব,
আশা ভরসা যত যৌবনের সাথে
হৃদয় ভগ্নাবশেষ রাখিয়া পশ্চাতে।

এই ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া আপনার সহানুভূতি পূর্ণ গীতি লহরী তুলিয়া ভাগীরথী মুর্শিদাবাদের পথে প্রবাহিত হইলেন। নবাবের শত কীর্ত্তিমণ্ডিত প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া নগপতিবালা বহরমপুরে উপনীত হইলেন। বিদ্যাধ্যাপনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে বহরমপুর বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে; এই স্থানে সুপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন চতুষ্পাঠী রচনা করিয়া বিদ্যা বিতরণ করিতেন, সুদূর দেশসমূহ হইতে আগত কতশত ছাত্র তাঁহার কৃপায় জ্ঞানলাভ করিত, তাই সেই জ্ঞানবীর তনুত্যাগ করিয়াও অমর। আর আছে পুণ্যময়ী দেশবিশ্রুতা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী স্বর্ণময়ীর বিবিধ সদনুষ্ঠানের পুণ্যস্মৃতি—

শ্বেতাম্বরা পরীধানা যেন তপস্বিনী,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগযজ্ঞ ব্রত আচরণ,
করিয়াছে স্বর্ণময়ী অঙ্গের ভূষণ;

তারপর নারায়ণী অজয়নদের "লোহিতবরণ হেতু" শ্রবণ করিয়া প্রাচ্য জ্ঞান চর্চ্চা ও প্রাচ্য সভ্যতার মহাকেন্দ্রভূমি নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সুরধুনী কাব্যে এই স্থলের বর্ণনে একটা বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালার গৌরব স্মৃতিশাস্ত্রের

অমূল্য খনি স্বরূপ বাসুদেব সার্ব্বভৌম রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি যে সমুদায় মনীষিগণের জীবন কথা বক্ষে ধারণ করিয়া বঙ্গভূমি মহিমান্বিত, সেই বঙ্গের পূর্ব্ব কীর্ত্তিমান্ তনয়গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইস্থানে বিবৃত হইয়াছে। কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে অপূর্ব্ব মেধাবী বাসুদেব সার্ব্বভৌম মিথিলায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় দেশবিশ্রুত প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রী পক্ষধর মিশ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র ও প্রধান শিষ্য গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইলেন, প্রত্যাগমন কালে মিথিলার পণ্ডিতগণ গ্রন্থসমূহ ফিরাইয়া লয়েন তখন বঙ্গের নবীন পণ্ডিত গৌরবের সহিত বলিয়া ছিলেন—

"স্মরণ তুলটে মম গ্রন্থ সমুদয়,
সুন্দর হয়েছে লেখা শুন পরিচয়
বঙ্গে গিয়া মন খুলে করিব প্রচার
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসিবেনা আর।"

বাসুদেবশিষ্য কাণভট্ট রঘুনাথ শিরোমণি ও তাঁহার সহাধ্যায়ী রঘুনন্দন স্মার্ত্তবাগীশ আপন আপন প্রতিভাবলে স্মৃতির সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই স্থলে রঘুনাথ শিরোমণির স্মৃতিশাস্ত্রে ভারতবিজয় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা স্থানোপযোগী বলিয়া মনে হয়। নবদ্বীপের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিতে করিতে রঘুনাথ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন, তথায় তর্কদ্বারা গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রমুখ স্মার্ত্তগণের পরাজয় সাধন করিয়া বৃদ্ধ পক্ষধর মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলেন, রাজ-সভায় তর্কালোচনা আরব্ধ হইল ; পাছে তরুণ যুবার নিকট সপ্ততিপর প্রসিদ্ধ বৃদ্ধের পরাজয় হয় এই আশঙ্কায় মিশ্র মহাশয়ের অন্তেবাসিগণ করতালিদ্বারা অবৈধ উপায়ে রঘুনাথের পরাজয় সাধন করেন। যুবক রঘুনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ পক্ষধরের শাস্তিবিধানের জন্য তাঁহার নিধন সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন, কিন্তু ইত্যবসরে অনুতাপবিদ্ধ বৃদ্ধ রঘুনাথের নিকট আসিয়া পরাজয় স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উভয়ের মনোমালিন্য দূর হইল, রঘুনাথ পক্ষধর মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন ; তাঁহারই অনুরোধে বঙ্গদেশে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের নাম সমধিক পরিচিত করিবার নিমিত্ত তদ্রচিত স্মৃতির প্রথম বাক্যটি গঙ্গেশকৃত গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে বিবিধ টীকাকার সুপণ্ডিত জগদীশ, পণ্ডিতরতন গদাধর ভট্টাচার্য্য, ও বিজ্ঞবর রামনাথ ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে ন্যায়ের স্রোত বহাইয়াছিলেন। গদাধর সম্বন্ধে দীনবন্ধু বলিয়াছেন—

"শিরোমণি বিরচিত গ্রন্থ সমুদয়
গদাধর টীকালোকে লোকে আলোময়।"

গদাধর সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত আছে। প্রথমে লোকের বিশ্বাস ছিল যে গদাধরের গ্রন্থপাঠ তত অধিক নয়, এইজন্য তাঁহার চতুষ্পাঠীতে প্রথমে আদৌ ছাত্র আসিল না। ইহা দেখিয়া দুঃখিত গদাধর গঙ্গাস্নানের পথে একটি কদলীবৃক্ষ প্রোথিত করিয়া তাহাকে শিষ্যত্বে বরণ করিলেন এবং যেন শিষ্য প্রশ্ন করিতেছে আপনি প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন এইরূপভাবে আপনই প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিলেন। একদিন নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত জগদীশ সেই পথ দিয়া যাইতে যাইতে গদাধরের অদ্ভুত মীমাংসাশক্তি শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন, আপন চতুষ্পাঠীতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহার ছাত্রগণকে গদাধরের নিকট পাঠ লইতে বলিলেন ; যাহারা তাঁহার নিকট পাঠ লইতে গেল, ক্রমে তাহারা তাঁহার চিত্তগ্রাহী ব্যাখ্যান প্রণালীতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণ করিল, এইরূপে গদাধরের প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইল।

বিদ্যাজ্ঞান-মুখরিত অপূর্ব্ব-স্মৃতিবিজড়িত নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথী জলাঙ্গির সহিত মিলিত হইলেন ; তাহার নিকট প্রখ্যাতনামা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিবরণ শ্রবণ করিলেন—

যথায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
গাহিত মধুর বিদ্যাসুন্দর সুন্দর,
সেই নগরেতে তাঁর শুভ রাজধানী
অদ্যাপি বিরাজে যথা সুখে বীণাপাণি।
* * * *
এখন সতীশচন্দ্র রাজা গুণাকার
সভ্য ভব্য মিষ্টভাষী নাহি অহঙ্কার,
কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর সুশীল শান্ত বদান্য বিদ্বান,

সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী।

পরম ধার্ম্মিক কোমলহৃদয় সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি রামতনু লাহিড়ী মহাশয় তথায় হৃষ্টমনে ধর্ম্মোপদেশ ও বিদ্যাদানে নিযুক্ত ছিলেন। সুবিজ্ঞ স্বদেশ সেবক ব্রজনাথ বিদ্যালয় ও সমাজ স্থাপনের দ্বারা মানস তিমির দূর করিতেছিলেন। তথায় সদানন্দ রামতনু কনিষ্ঠ ভিষক্‌রতন কালীনাথ লাহিড়ী দীন দুঃখিগণকে বিনামূল্যে ঔষধ পথ্যদান ও তাহাদের চিকিৎসা বিধান করিয়া দেশের সেবাব্রতে দীক্ষিত ছিলেন—

কেমন স্বভাব তাঁর মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,
ছেলেদের কালীবাবু ছেলেরা কালীর
উভয়েতে মিশে যায় যেন নীর ক্ষীর।

অতঃপর কালনায় আসিয়া তথাকার বর্দ্ধমান রাজ কর্ত্তৃক বহুভোগদ্বারা সেবিত লালজীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সুরধুনী চৈতন্যের দীক্ষাগুরু অদ্বৈতমহাপ্রভুর ভবন সম্মুখে চৈতন্যপ্রেম-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শান্তিপুরে দর্শন দিলেন। একতীরে শান্তিপুর অপর পারে গুপ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম। তথায় গুপ্তি-পাড়ার যশঃকেতু কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার বাস করিতেন, তাঁহার বিদ্যায় মুগ্ধ হইয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে সভা-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। সেই পবিত্র গঙ্গোর্ম্মিবিক্ষুব্ধ বেলাভূমিতে বসিয়া তিনি যে শিবস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন তাহা এখনও প্রসিদ্ধ। তাঁহার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। বাল্যকাল হইতেই বাণেশ্বর অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। এক সময়ে ইহাঁদের বাটীতে শ্যামাপূজা উপলক্ষে একজন সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় স্তুতিচ্ছলে শ্যামাস্তবাত্মক একশত আটটী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকগুলি সুমধুর ও বিশেষ কবিত্বপূর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং উপস্থিত সকলে উহাদের পুনরাবৃত্তি করিতে বলিলেন। কিন্তু শ্লোকগুলি সেই সময়েই মৌখিক রচনা ছিল বলিয়া পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হইল। তথায় অল্পবয়স্ক বাণেশ্বর উপস্থিত ছিলেন, তিনি সেই শ্লোকগুলির অবিকল আবৃত্তি করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতা আনন্দ গদগদস্বরে বলিয়াছিলেন—"কালে বাণও পণ্ডিত হইবে।" পিতার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

ক্রমে গুপ্তিপাড়া পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথী চূর্ণীনদীর সহিত মিলিত হইলেন। মামজোয়াতীরে "ব্যবস্থাদর্পণকর্ত্তা" মহাপ্রাজ্ঞ শ্যামাচরণ দে মহাশয়ের আবাসভূমি নিরীক্ষণ করিয়া রাণাঘাটস্থ বিখ্যাত পালচৌধুরীদিগের কীর্ত্তিকলাপ বিশেষতঃ দয়াশীল শ্রীগোপাললাল পালচৌধুরী মহাশয়ের সদনুষ্ঠান দর্শন করিয়া চূর্ণীনদী গঙ্গার সহিত মিলিয়াছেন। ত্রিবেণীতে উপস্থিত হইয়া যমুনা ও সরস্বতী ভিন্নপথে চলিয়া গেলেন। ত্রিবেণীতে অপূর্ব্ব ধীমান্ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শাস্ত্রের বিচার ও জ্ঞানদান করিতেন। সম্মিলিত তিনবেণী এইস্থানে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া ত্রিবেণী মুক্তবেণী নামে বিখ্যাত। অতঃপর সুরধুনী পণ্ডিতবসতি চির-শাস্ত্রালাপমুখর ভদ্রপল্লী বৈদ্যবাটী মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভক্ত রামপ্রসাদ সেনের জন্মভূমি হালিসহর দর্শনপূর্ব্বক বিবিধ চতুষ্পাঠীবেষ্টিত ভাটপাড়ায় উপনীত হইলেন।

এই স্থানে রামধন কথকরতন
কলকণ্ঠকলে কল করিত কলন,
সুললিত পদাবলী, বিরচিত তাঁর
সকল কথক সুরে করিছে বিহার।

এই হালিসহর ও ত্রিবেণীর বর্ণন মুকুন্দরাম বিরচিত কবি-কঙ্কন চণ্ডীতে ভাগীরথী তীরস্থ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের বিবৃতির মধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—

"উত্তরিয়া মাগরায় রাত্রিদিন ডিঙ্গা বায়
দূরপথ ক্ষণেকে নিরড়ে।
বাজায় ঠমকশিঙ্গা রাত্রিদিন যায় ডিঙ্গা
উত্তরিলা সাধু হাত্যাগড়ে॥
বহে ডিঙ্গা নিরন্তর ডাহিনে হালিসহর
ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।

* * * *

কোঙর নগর নাম বায়্যা যায় অবিশ্রাম
বামে কোদালিয়া গুপ্তিপাড়া॥"

কবিকঙ্কনের বর্ণনায় কেবল প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের নামমাত্র আছে, কিন্তু সুরধুনী কাব্যে একই স্থানের বর্ণনার মধ্যে

জ্ঞানের উদ্দীপক শ্রবণানন্দদায়ী তত্রত্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী কথা বিবৃত হওয়ায় উহা পূর্ব্বস্মৃতির উদ্রেক হেতু সমধিক আদর যোগ্য হইয়াছে।

এক্ষণে সুরধুনী কলিকাতার নিকটবর্ত্তিনী হইলে সাগরদূত বাণ আসিয়া তাঁহাকে কলিকাতার অনুপম শোভাসম্পন্ন দৃশ্য নিচয়ের ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের পরিচয় দিতে লাগিল—

"দেখ মাতা দক্ষিণেতে হেয়ারের গোর,
দীনদুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়,
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয়
বাঙ্গালীর উন্নতির নির্ম্মল নিদান
যার জন্য করেছেন সর্ব্বস্ব প্রদান।
* * * *
হেয়ারের শুভ্রমূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত,
কালেজের প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে স্থিত।"

তারপর সুরধুনী প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদ্ রসিককৃষ্ণ; গম্ভীর প্রসিদ্ধ বক্তা, স্বদেশ রক্ষায় একনিষ্ঠ "অসমসাহসভরা অন্যায়ের অরি, সভ্যতার সেনাপতি কল্যাণকেশরী" রামগোপাল ঘোষ; বিজ্ঞ প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী, দীনজনলালন তৎপর বিদ্যাসাগর; স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ ভরতচন্দ্র, প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, দর্শনবিৎ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, বিদ্যাসাগর বন্ধু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দশকুমারের অনুবাদক গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, কাদম্বরীর অনুবাদক তারাশঙ্কর, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অধ্যাপক কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও টেলিমেকস প্রণেতা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সুযোগ্য বঙ্গসন্তানগণের বিবরণ শ্রবণ করিলেন।

এইস্থলে আমরা আমাদিগের অব্যবহিত পূর্ব্বযুগের সমাজ ও সাহিত্য সংস্কারক বঙ্গের সুসন্তানগণের পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই তথ্য প্রদানই সুরধুনীকাব্যের বৈশিষ্ট্য। একদিকে মাইকেল টেকচাঁদ প্রমুখ সাহিত্য সেবিগণের পরিচয়, অপরদিকে ভিষককুলতিলক মহেন্দ্র সরকার রাজেন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহাত্মগণের জীবনী কথায় সুরধুনী কাব্য বাঙ্গালীর বিশেষ আদরযোগ্য হইয়াছে। একস্থলে দেশনায়কগণের পরিচয়—

"হরিশের লেখনীর জোর বিজাতীয়
পেট্রিয়ট দেশে দেশে হল বরণীয়;
বিজ্ঞবর কৃষ্ণদাস এবে সম্পাদক
সাহসিক প্রজাবন্ধু পারগ লেখক।"

অপরস্থানে সাহিত্যিকগণের প্রয়াস কথা—

অক্ষয়কুমার বিজ্ঞবর মহামতি,
পরিষ্কার মিষ্টভাষা করেছে সংহতি
* * * *
কবিবর রঙ্গলাল রসিক রতন
নানাছন্দে কবিতারে করেছে বরণ।

আর একস্থানে দেশোন্নতির প্রোৎসাহদাতা মহারাজ রাধাকান্ত, পাইকপাড়ার রাজ-ভ্রাতৃবর, দানশীল কালীসিংহ, মান্যবর রমানাথ ঠাকুর, হাইকোর্টের বিচারপতি শম্ভুনাথ, দেশহিতব্রত রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতির জীবনী কথায় সুরধুনী কাব্য শুধু আদরের নহে, অবশ্যপ্রণিধানের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে।

প্রসিদ্ধ দেশ সেবক ও সাহিত্যিকগণের পরিচয় লাভ ও তাঁহাদিগের পুণ্যচরিতের আলোচনা কেবল অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপযোগী এমত নহে, পরন্তু প্রথ্যাতনামা কর্ম্মবীরগণের স্মৃতি জীবনপথে অগ্রসর পক্ষেও অল্প প্রয়োজনীয় নহে। বাঙ্গালার দুর্দ্দিনে যখন বাঙ্গালী জাতি নির্জীবতা ও নিশ্চেষ্টতার পথে চলিয়াছিল, যখন তাহারা আপনাদিগের সাহিত্য, ধর্ম্মভাব, সমাজবন্ধন ও ব্যক্তিত্ব হারাইয়া উন্মার্গগামী হইয়া পড়িয়াছিল, তখন যে ক্ষণজন্মা মনস্বিগণ সাহিত্যের, সমাজের ও দেশের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে যত্নপর হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের প্রাণপাত পরিশ্রমে বাঙ্গালী জাতি পুনরায় জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, জাতীয় সাহিত্যের ও জাতীয় ধর্ম্মভাবের গগনস্পর্শী মহিমায় প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সমক্ষে সগৌরবে উন্নতশীর্ষ হইয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে সেই সাধকগণের পূত চরিতকথা বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালী জাতির কত আদরের ও শ্রদ্ধার বস্তু তাহা বর্ণনাতীত। ভাগীরথী যেমন হিমগিরির সংকীর্ণ কন্দর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে স্বীয় সংকীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়াছে, এবং

বহু জনপদ অতিক্রম পূর্ব্বক শেষে শতমুখী হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে ; বাঙ্গালার জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য সেইরূপ সংকীর্ণ ভাবস্রোত হইতে সমদ্ভূত হইয়া শেষে ক্রম-বিকাশ লাভ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা জাতিকে মহাপ্রাণতা ও মহনীয়তার সাগরসঙ্গমে উপস্থাপিত করিতে যত্নপর হইয়াছে। জাতীয়ভাবের স্বর্ণবেদীর নির্ম্মাতৃগণের ও জাতীয় সাহিত্যমন্দিরের স্থপতিবৃন্দের প্রত্যেকের কার্য্য-প্রণালা ও সাধনা বিশেষভাবে আলোচনা করা আমাদিগের জীবনপথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সাতিশয় অনুকূল ; দেখিতে হইবে কেমন করিয়া তাঁহারা নিত্যনৈমিত্তিক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া প্রকৃত পুরুষকারের উপর নির্ভরশীল হইয়া দেশের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন ; বুঝিতে হইবে কেমন করিয়া তাঁহারা মানবের চিরবরেণ্য পদে উন্নীত হইয়াছেন ; সুরধুনী কাব্যে এইরূপভাবে দেখাইবার ও বুঝাইবার একটা চেষ্টা হইয়াছে, এইজন্যই ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পদলালিত্যে ও অর্থগৌরবে অথবা ভাষার সরলতাপূর্ণ মাধুর্য্যে ও ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যে সুরধুনীকাব্য অতি উচ্চস্থান লাভ করিতে পারেনা সত্য, কিন্তু তথাপি জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশ ও জাতীয় সাহিত্যের ক্রম-পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যসমূহের যে মূলসূত্র ইহাতে নিহিত রহিয়াছে, তজ্জন্য ইহা বাঙ্গালীর আদরের বস্তু। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ একনিষ্ঠ স্বদেশসেবক "অনমসাহসভরা অন্যায়ের অরি, সভ্যতার সেনাপতি কল্যাণ কেশরী" রামগোপাল জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে যে নবভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়া যান, তাহাই হরিশ্চন্দ্র ও কৃষ্ণদাসপালের বিজাতীয় লেখনীর সাহায্যে সমগ্র বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ; তাহাই ক্রমে দেশোন্নতির প্রোৎসাহদাতা মহারাজ রাধাকান্ত, পাইকপাড়ার রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়, দানশীল কালীসিংহ, মান্যবর রমানাথ ঠাকুর, হাইকোর্টের বিচারপতি শম্ভুনাথ ও স্বদেশ-হিতব্রত রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতির কার্য্যে সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়া বাঙ্গালীর অভ্যুদয়ের কারণ স্বরূপে পরিণত হয়। অপরদিকে দীনজন-লালন তৎপর বিদ্যাসাগর, প্রসিদ্ধ শাস্ত্রবিদ্ রসিককৃষ্ণ, প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, হিন্দুদর্শনবিৎ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও বিদ্যাসাগর বন্ধু প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মদনমোহন প্রমুখ মনস্বিগণ দেশীয় সাহিত্যের গতি অপ্রতি-হত রাখিয়া ধীরে ধীরে জাতীয় ধর্ম্মভাবের ধারা পুনরাণয়ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন ; তাঁহারা আপন আপন আদর্শে বুঝাইয়াছিলেন, হিন্দু যখন পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে পুণ্য-সলিলা সরস্বতীর পুলিনদেশে লোকসমাজের হিতার্থে পরমা-শক্তির ধ্যান করিতেন ; তখন তিনি জাতীয় প্রকৃতি বিরুদ্ধ বা জাতীয় সমাজ বিরুদ্ধ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। হিন্দু যখন জ্ঞান গরিমায় সভ্যজগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তখনও তিনি বিজাতীয় ভাবের বন্যায় প্লবমান হন নাই ; এইরূপভাবে তাঁহারা হিন্দুত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন। আর সুরধুনীকাব্যে আছে বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষার অনিন্দ্য সৌধের অমর স্থপতিবৃন্দের চিরানন্দদায়িনী ও চিরোৎসাহ-দায়িনী মোহন স্মৃতি। বিদ্যাসাগর প্রমুখ সাহিত্য ধুরন্ধরের অপূর্ব্ব প্রয়াস কথা, অক্ষয়কুমারের ওজস্বিনী ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারবার্ত্তা, এবং মধুসূদন, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি কবিগণের মনোজাতপুষ্পের সৌরভ পরিচয়। তাই এখন কুসুমাভরণা লতা যেমন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের বিকাশে মানবের চিত্তহরণ করে, দিব্যকান্তি ইন্দু যেমন কমনীয় কর-জালে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, আমাদিগের মনস্বি-গণের প্রাণপাত আয়াসদ্বারা গঠিত বঙ্গভাষা ও আপন ওজস্বিতা ও প্রাঞ্জলতায় পাঠকের হৃদয় প্রীতির হিল্লোলে উৎফুল্ল করিয়া তুলে। এইরূপে বিভিন্ন দিক দিয়া বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে, তাহাই সুরধুনীকাব্যে প্রসঙ্গক্রমে কলিকাতা বর্ণনের মধ্যে সন্নিবিষ্ট।

হিমাদ্রিতনয়া ভাগীরথীর তরঙ্গবিধৌত তীর্থসমূহ যাহা হিন্দুর মনে ধর্ম্মের আলোক প্রতিফলিত করিয়াছে, অথবা সেই পূতবারিধির বেলাস্থ প্রসিদ্ধ মহাত্মগণ, যাঁহারা আপন আয়াসফলে হিন্দুর জাতীয়ভাব ও জাতীয় সাহিত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন—এই সমুদায়ই সুরধুনীকাব্যের আলোচ্য বিষয় এবং ইহাতেই উহার বিশিষ্টতা !

"প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন ॥"

সত্যরাজ বলিলেন "বৈষ্ণব চিনিব কেমনে"—বৈষ্ণবের লক্ষণ কি? উত্তরে প্রভু বলিলেন—

—"যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ ক্ষয়
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সবার উদ্ধারে ॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান ॥"

অতঃপর মহাপ্রভু ভক্তগণের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন "মুকুন্দের প্রেম নিগূঢ় নির্ম্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম" ময়ুর-পুচ্ছের আড়াণি দৃষ্টে মুকুন্দের যে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপনা হইয়াছিল এবং তিনি ভাবাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণন করিয়া ভক্তগণকে মুগ্ধ করিলেন। মুরারীগুপ্তের ভজন-নিষ্ঠা ও চিত্তের দৃঢ়তা উল্লেখ করিয়া প্রভু প্রশংসমান বদনে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিলেন। বাসুদেবের গুণ বর্ণন করিতে গিয়া প্রভু সহস্রবদন হইলেন। লজ্জিত বাসুদেব প্রভুর চরণ বন্দনা করিয়া নিবেদন করিলেন—"প্রভু জীবের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সকল জীবের পাপ, প্রভু, আমাকে বহন করিতে দাও—আমি সকলের পাপের বোঝা সাদরে মস্তকে লইয়া চিরকাল নরক ভোগ করি—জীবকে তুমি ভবরোগ হইতে মুক্ত কর।" জীবের প্রতি বাসুদেবের এই মহান্ উদারতা ও প্রীতি মহাপ্রভুকে বিচলিত করিল। তিনি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন—"বাসু, ভক্ত যে প্রার্থনা করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা অপূর্ণ রাখেন না। তুমি ব্রহ্মাণ্ড জীবের নিস্তার বাঞ্ছা করিতেছ কাজেই বিনা পাপ ভোগেই সকলের নিস্তার হইবে।"

"অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল।
তোমাকে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপফল ॥"
তোমার ইচ্ছামাত্র হবে ব্রহ্মাণ্ড মোচন।
সর্ব্বমুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি কিছু শ্রম ॥"

একই ডুম্বুর বৃক্ষে যেমন বহুফল থাকে, তদ্রূপ সীমাশূন্য বিরজার জলে কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে—এক ফল নষ্ট হইলে যেমন বৃক্ষের কোন অপচয় হয় না—

"তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয়।
তবু অল্প হানি বৃক্ষের মনে নাহি লয় ॥"

গৌরলীলায় বিশ্বাসপরায়ণ ভক্ত পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন বাসুদেবের এই আন্তরিক প্রার্থনা কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিল। "আচণ্ডালে প্রেমভক্তি বিতরণ" যে লীলার মুখ্য উদ্দেশ্য "পাপী নীচ উদ্ধার" তাহার আনুসঙ্গিক গৌন কর্ম্ম মাত্র।

ভক্তগণের গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রত্যেককে আলিঙ্গন দানে পুলকিত করতঃ প্রভু সকলকে বিদায় দিলেন।

"প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ ছিল মন ॥"

গৌড়ীয় ভক্তগন নীলাচল ত্যাগ করিলে এক দিবস সার্ব্বভৌম ঠাকুর প্রভুকে মাস ধরিয়া তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুনয় করেন। প্রভু "নহে যতি ধর্ম্ম ইহ" বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সার্ব্বভৌম ক্রমে বিশ, পঞ্চদশ, দশ দিবস প্রার্থনা করিলেন কিন্তু প্রভু তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর মাসে পঞ্চদিন সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভুর ভিক্ষার নিয়ম হইল। সার্ব্বভৌমের বড় বাসনা তিনি প্রভুকে প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইবেন। গৌড়ীয় ভক্তগণের সংখ্যাধিক্য বশতঃ অমর্য্যাদা আশঙ্কা করিয়া সার্ব্বভৌম এত দিবস স্ব-গৃহে প্রভুর ভিক্ষার আয়োজন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সার্ব্বভৌম প্রভুর ভিক্ষার জন্য নিভৃতে এক নব-গৃহই নির্ম্মান করিয়াছেন। ভিক্ষার দিন নির্দ্ধারিত হইল। সার্ব্বভৌম পত্নি—"প্রভুর মহা ভক্তো তেঁহো—স্নেহেতে জননী"—আনন্দে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিবিধ প্রকার, সুস্বাদু বস্তু প্রস্তুত হইল। প্রভুর শাকে বিশেষ প্রীতি সার্ব্বভৌম-পত্নি তাই দশ প্রকার শাকই রন্ধন করিয়াছেন। মোচা ঘণ্ট মোচা ভাজা "নব নিম্বপত্রসহ ভাজা বার্ত্তকী"—প্রভুর যাহা যাহা রুচিকর—সমূদয়ই হইয়াছে। নানাপ্রকার সন্দেশ পিঠাপানা পর্য্যাপ্ত পরিমানে সংগৃহীত হইয়াছে।

ভক্ত আজ প্রাণের আকাঙ্খা মিটাইয়া ইষ্টদেবকে ভোজন করাইতেছে কাজেই পূর্ণমাত্রায় আয়োজন। প্রভু মধ্যাহ্ন-কালে সার্ব্বভৌমের প্রার্থনানুযায়ী একাকী সার্ব্বভৌম গৃহে উপনীত হইলেন এবং পদপ্রক্ষালন করিয়া ভোজনে বসিলেন।

সার্ব্বভৌম গৃহে তাঁহার জামাতা অমোঘ বাস করিত। অমোঘ মূর্খ-নির্ব্বোধ পরান্নভোজী। মহাপ্রভু সম্বন্ধে তাহার যে কোন ধারণা ছিল তাহা বোধ হয় না। যে লীলার প্রেমতরঙ্গ সমগ্র উৎকল ও দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করিয়া নীলাচলকে ভাসাইয়া লইতেছিল স্বীয়. আশ্রয়দাতা শ্বশুরালয়ে যাহার নিত্যকুট উঠিয়া সকলকে অপার্থিব ভাবাবেশে অভিভূত করিয়া রাখিত অনভিজ্ঞ অমোঘকে তাহা এ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইতস্ততঃ ভ্রমনশীল এই অস্থির চিত্ত যুবক অকস্মাৎ মহাপ্রভুর ভোজন মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইল অন্নের পরিমাণ দেখিয়া দুর্ম্মুখ হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—

"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন॥"

এই বাক্য মুখ নিঃসৃত হওয়া মাত্রই সার্ব্বভৌমের রুদ্র নেত্রের চাহনীতে অমোঘ শিহরিয়া উঠিয়া দ্রুত স্থান ত্যাগ করিল। ভট্টাচার্য্য লাঠি লইয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অমোঘের বাক্যে প্রভু কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন মাত্র।

কিন্তু সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নির হৃদয়ে এই দুর্ব্বাক্য তীক্ষ্ণ শেলসম বিদ্ধ হইল।

"শুনি ষাঠীমাতা বুকে শিরে হাত মারে
* ষাঠী আজ রাঁড়ী হউক বলে বারে বারে॥"

স্নেহময়ী মাতা গৌর নিন্দায় বিচলিত হইয়া স্বীয় প্রাণপ্রতিম একমাত্র দুহিতার বৈধব্য কামনা করিতেছেন। কি চিত্র! সার্ব্বভৌম পত্নিকে বলিলেন আজ হইতে আর সে নিন্দকের মুখ দেখিব না—নাম লইব না; চৈতন্য গোসাঞিকে যে নিন্দা করে তাহাকে বধ করিলে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়। ষাঠীকে বল তাহার পতি পতিত তাহাকে ত্যাগ করাই শাস্ত্রানুমোদিত।

এদিকে অমোঘ পলাতক। রাত্রিতে তাহাকে পাওয়া গেল না প্রভাতে মহাপ্রভু শুনিলেন নির্ব্বোধ অমোঘ বিসূচিকা রোগে মহাযাত্রার পথে অগ্রসর। পরমকারুণিক প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দ্রুত আসিয়া অমোঘের রোগক্লিষ্ট দেহের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন পদ্মহস্তে আসন্ন মৃত্যুর ঘনীভূত করাল ছায়া অমোঘের বিবর্ণ মুখমণ্ডল হইতে অপসারিত করিয়া তাহার বুকে হস্ত দিয়া বলিলেন—

"সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসিবার এই যোগ্য স্থল হয়॥
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেন ইহাঁ বসাইলে।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে॥
* * *
উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণ নাম
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান॥"

এই মহাবাণী অমোঘের প্রতি ধমনীতে করুণার পবিত্র ধারা ঢালিয়া দিল। উচ্ছৃঙ্খল অমোঘ মহাপ্রভু হস্তস্পর্শে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হইল আর তৎসঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবসম্পদ লাভ করিয়া আনন্দে নাচিতে লাগিল। অমোঘের পুনর্জন্মই হইল। প্রভুর চরণ ধরিয়া অনুতাপবিদ্ধ যুবক কাতরে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং যে অপবিত্র মুখে প্রভু নিন্দা বহির্গত হইয়া ভক্ত-হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াছে তাহা নিদারুণ আঘাতে ফুলাইয়া ফেলিল। এই অমোঘ পরে মহাপ্রভুর একজন একান্ত ভক্ত দেশপূজ্য আচার্য্যের আসন প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম অমোঘের প্রতি এই কৃপার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস অবগত হইয়া খিন্ন কণ্ঠে প্রভুকে বলিয়াছিলেন-

"মরিত অমোঘ তারে কেন জিয়াইলা।"

প্রণ্ডিত প্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুকে কি চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন তাহা বিশদরূপে অনুশীলন জন্য এই প্রস্তাব বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইল।

(ক্রমশঃ)

* সার্ব্বভৌম-দুহিতা ষাঠী স্বামী সহ পিতৃ গৃহে বাস করিতেন।

হুভুড়ে বাড়ী ও ভৌতিক উৎপাত

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

চলিত বা সাধরণ কথায় যাহাকে ভূতের উৎপাত বলে তাহার সত্য বা মিথ্যা কিম্বদন্তী অতি পুরাকাল হইতে সব দেশেই প্রচলিত আছে। এসব কিংবদন্তীর মূলকথা এই যে, কোনো কোনো বাড়ীতে ভূত বাস করে; এইসব ভূত প্রায়ই কোনো না কোনো মৃত বা হত ব্যক্তির প্রেতমূর্ত্তি; ইহারা দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর ভূত নিরীহ তারা বাড়ীর বাসিন্দাদের উপর কোনো উৎপাত করেনা; যাহারা সূক্ষ্ম-অনুভূতি-প্রবণ (sensitive) তাহারাই এইসব ভূতকে দেখিতে পায় মাত্র; তাহাদের হাতে কেহ কোনো নির্য্যাতন ভোগ করেনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূতেরা কিছু অনিষ্টকর প্রকৃতির; বাসিন্দাদের উপর নানারকম উৎপাত করে ও অশান্তি ঘটায় এবং সুযোগ পাইলে কাহারো না কাহারো দেহের উপর 'ভর' করে। ইংরাজীতে ইহাদের poltergeist বলে।

অধিকাংশ ভূতই দ্রষ্টার মস্তিষ্ক বিকার জনিত বা কোনো দুষ্টলোকের অনিষ্ট জনক ভয় দেখানোর ফল; বা স্বাভাবিক ভয় বশতঃ কোনো জন্তু জানোয়ার বা মানুষের মূর্ত্তিকে ভুল করিয়া 'ভূত'ভাবে দেখা।

এ জাতীয় ভুলভ্রান্তির ঘটনাবলী বাদ দিলেও কিংবদন্তীর মূলে যে একেবারে সত্য নাই তাহা নহে। চিৎতত্ত্বানুসন্ধান সমিতি এইরূপ ভুতুড়ে বাড়ীর জনরব বিশ্বাসী দ্রষ্টার মুখে শুনিয়া তাহার সত্যতা তদন্তের জন্য একটী শাখা-সমিতি স্থাপন করতঃ তাহার উপর অনুসন্ধানের ভার দেন। সভা অনুসন্ধান ফলে যতটুকু সত্য নির্ণয় করিয়াছেন তাহার বিবরণ এই প্রবন্ধে দিতেছি।

নিম্নলিখিত ভৌতিক ঘটনাটী চিৎতত্ত্বসভার দ্বারা বিশেষ ভাবে তদন্ত হইয়া সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সভার বার্ষিক বিবরণীতে উহা "মর্টনকেস" নামে জানিত। ম্যানচেষ্টার নগরস্থ Dalton Hall কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জে গ্রেহাম ১৮৮৪ সালে এই ঘটনাটী সভার জ্ঞান-গোচর করেন; সভার পক্ষ হইতে স্বয়ং মায়ার্স ইহার তদন্ত আরম্ভ করেন:—

যে বাটীতে এই উপদ্রব ঘটে তাহার ঠিকানা ও তদধিকারীর সত্য নাম চাপা রাখিয়া ছদ্ম নামে পরিচয় দেওয়া হইবে! এই ভৌতিক ব্যাপারের প্রত্যক্ষকারিণী মিস মর্টন রীতিমত শিক্ষিতা এবং তাহার মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি বিজ্ঞান শিক্ষাফলে উত্তমরূপে মার্জ্জিত ও কুসংস্কার বর্জ্জিত সাক্ষী হিসাবে তিনি অতি দক্ষ।

১ম দৃষ্টান্ত

"১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে ক্যাপ্‌তেন মর্টন এবং তাঁহার পরিবারবর্গ একটা চৌমাথার কোণের বাড়ীতে উঠিয়া যান। বাড়ীর সুমুখে একটা ঘাসের জমি, তার চারিদিকে গাড়ীর রাস্তা। বাড়ীর পিছনে একটা ফুলের ও ফলের বাগান। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাড়ীটা তৈরী হয়, এবং তদবধি ১৬ বৎসর ধরিয়া উহাতে মিঃ স—ও তাঁহার পরিবারবর্গ বাস করেন। তথায় থাকিতে থাকিতে এক আগষ্টমাসে (সন অজানা) মিঃ স—এর পত্নীবিয়োগ হয়। মিঃ স—তারপর মদ খাওয়া আরম্ভ করেন। প্রায় দুই বছর পর আবার তিনি বিবাহ করিলেন। এবং নবপত্নী শীঘ্রই স্বামীর মত মদ ধরিলেন। ফলে উভয়ে দিনরাত ঝগড়া ও মারামারি হইত। অবশেষে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে মিঃ স—দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নী শ্রীমতি স— স্বামীকে ফেলিয়া ক্লিফটন নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন! ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত স্থানে বাস করিয়া শ্রীমতি Dipsomania রোগে মারা যান, এবং উক্ত বাড়ীরই পোয়া খানেক রাস্তা দূরে একস্থানে সমাহিত হন। শ্রীমতি স—র মৃত্যুর পর ঐ বাড়ীতে মিঃ ল—নামক একব্যক্তি মাস ছয়

যাবৎ বাস করেন। মিঃ স— মারা যাওয়ার পর ও বাড়ীতে প্রায় বৎসর চার ধরিয়া আর কেহ বাস করিলনা। লোকে বলিত ভূতের উপদ্রবে কেহ থাকিতনা। ক্যাপ্টেন মর্টন যখন সে বাড়ী দখল করেন, তখন তিনি এ মর্ম্মে কোনো গুজোব শোনেন নাই। ১৮৮২ খৃঃ জুন হইতে ১৮৮৯ খৃঃ পর্য্যন্ত এই বাড়ীর ভিতরে বাহিরে দিনে ও রাতে একটা দীর্ঘকায় বিধবা-বেশ-ধারিণী প্রেতমূর্ত্তি দেখা যাইত। তাহার মুখে একটা রুমাল চাপা থাকিত, আর ভাব দেখিয়া মনে হইত যেন কাঁদিতেছে। লোকে বলিত মিঃ স—এর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; আন্দাজ কতটা যে সত্য তাহা ঠিক করা যাইতনা, মুখ ঢাকা থাকার জন্য। প্রেতমূর্ত্তি প্রায়ই ড্রয়িংরুমে ঢুকিয়া যেখানে সে জীবিতকালে যেখানে বসিত সেইখানে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইত।

মর্টনের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী মর্টন বেশীর ভাগই এই প্রেতকে দেখিতেন। কুমারী অনেক দিন তাহার পিছু পিছু গিয়াছেন; ডাকিয়া কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—প্রেত যেন আসিয়া উত্তর দিতে যাইবে এমন ভাব দেখাইত কিন্তু কিছু বলিত না; কুমারী মর্টন উহাকে হাত দিয়া ছুঁইতে পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া ছিলেন, ফলে প্রেত সরিয়া সরিয়া যাইত, অবশেষে কোনঠাসা হইলে কেমন করিয়া অদৃশ্য হইত। মিস্ মর্টন শেষে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রেতের দৈহিক অজড়ত্ব নির্ণয় করিয়ার জন্য এক পন্থা ঠিক করিলেন। যে পথ দিয়া প্রেত যাতায়াত করিত, তিনি সেই পথের এপার ওপার আড়াআড়িভাবে সরু সুতার বেড়া বাঁধিয়া দিলেন। তথাপি প্রেত কোনো বাধা বোধ না করিয়া সুতার ভিতর দিয়া চলিয়া গেল; সুতার কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা গেলনা। প্রেতের চলাচল করার দরুন পায়ের ক্ষীণ শব্দ কানে লাগিত।

এর পর মিস মর্টনের অপর ভগ্নী ও ভাইএরা প্রেতকে দেখিতে পায়; অথচ মিস্ মর্টন উহাদের কাহাকেও সে কথা শোনান নাই। পরে বাড়ীর চাকর বাকর ও আগন্তুক লোক জনেও উহাকে দেখিতে পায়। সময় সময় লোকজন ও মিস্ মর্টন একত্র থাকার অবস্থায়, মিস্ মর্টনই কেবল দেখিতেন, উপস্থিত অপর সকলে কিছুই দেখিতনা। বাগানে ঢুকিবার দরজার কাছে গিয়া প্রেত অদৃশ্য হইত। একদিন মিস্ মর্টন ও তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী প্রেতকে ড্রয়িংরুম হইয়া বাগানের দরজার দিকে যাইতে দেখে; সেই সময় তাহাদের আর এক ভগ্নী কুমারী ই— বাগান হইতে বাড়ী ঢুকিবার সময় দেখিল প্রেত সেই দরজার সিঁড়ি পার হইয়া বাহির হইল। তিন জনেই বাগানের দিকে চলিতেছেন, এমন সময় উপর ঘর হইতে তাঁদের চতুর্থ ভগ্নী বলিয়া উঠিলেন "আমি এখান হতে দেখ্‌লাম প্রেতটা বাড়ীর সম্মুখের খোলা জমি পার হইয়া গাড়ীর রাস্তা ধরিয়া খিড়কির বাগানে গেল। [এই ঘটনাটীর একটু বিশেষত্ব আছে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রেতকে বাস্তব জড়দেহীর মত স্থান অধিকার করিয়া এবং কাল অনুসরণ করিয়া কাজ করিতে দেখিল—behaved in relation to Time and Space like a material body. প্রেতের এই যে "কালানুবর্ত্তিতা" উক্ত ঘটনার দ্বারা বুঝাইতেছে তাহা সত্য না দ্রষ্টাদের ভ্রম তাহা নিরাকরণের এখন আর উপায় নাই—কেননা দ্রষ্টারা কেহ নিজ নিজ record রাখেন নাই।]

প্রায় বেশী ভাবে জুলাই, অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রেতটীকে দেখা যাইত। মিঃ স— ও তাহার দুই পত্নীর মৃত্যু মাস ঐ গুলি। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মের সময় খুব ঘন ঘন দেখা যাইত; তারপর হইতে বারে কমিতে কমিতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একেবারে থামিয়া যায়। শেষ দিকটা প্রেতমূর্ত্তি একটু একটু করিয়া অস্পষ্ট ও ঝাপসা ঝাপসা হইতে থাকে। প্রথম প্রথম খুব স্পষ্ট, জীবন্ত ও বাস্তবের মত দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে সব অন্যান্য শব্দগত উপদ্রব হইত তাহাও কমিতে থাকে। সে নানা রকমের। চলাফেরার ধীর বা দ্রুত শব্দ; দরজার গায়ে সজোর ধাক্কা; দরজার হাতল নাড়া; ভারী জিনিষ টানা ফ্যালা করা, অদ্ভুত রকমের আলোর জ্যোতি ইত্যাদি।

মিস্ মর্টন যেরূপ সাহসের সহিত এই প্রেত ব্যাপারের তদন্ত করেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তিনি বলেন তাঁহার মনে তখন অলৌকিকের দর্শনে একটা ভয়ের ভাব

এবং উহার তত্ত্ব জানিবার জন্য একটা ব্যাকুলতা যুগপৎ প্রভাব সঞ্চার করে। পরে একটু একটু করিয়া যেন আত্মশক্তির হানিবোধ ঘটিতে থাকে। অন্যান্য দ্রষ্টারা খুব ভয় পায়। তাহাদের মনে হইত যেন একটা তীব্র শীতল বাতাসে তাহাদের দেহ হিম হইয়া যাইত। বাড়ীর দুইটা কুকুর সময় সময় অজানা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিত।

পণ্ডিত প্রবর মায়ার্স নিজ তদন্ত-রিপোর্ট সভার অষ্টম সংখ্যক বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে ভৌতিক উপদ্রবের ও ভুতুড়ে বাড়ীর এমন সুপরীক্ষীত উত্তম দৃষ্টান্ত খুবই বিরল।

২য় দৃষ্টান্ত

এটী বিজ্ঞানাচার্য্য ব্যারেট সাহেবের বর্ণিত নিজ প্রত্যক্ষ ঘটনা। ইংলণ্ডের মধ্যপ্রদেশস্থ একটী ম্যানর হাউসে ভৌতিক উপদ্রব ঘটে। ইহার তদন্তের জন্য আচার্য্য ব্যারেট আহূত হন। আচার্য্য বলেন—"প্রেতটীকে স্বচক্ষে দেখি নাই বটে তবে উহার উপদ্রবের অন্য রকম প্রমাণ পাই। অদ্ভুৎ রকমের নানা ধরণের শব্দ শুনিয়াছি। এসবের তদন্ত করিয়া কোনো সন্তোষ জনক কারণ ঠিক করিতে পারি নাই। তবে প্রায় বারো জন ভিন্ন ভিন্ন লোক স্বচক্ষে প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছে। তাহাদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে আমার বলিবার কিছু নাই। দ্রষ্টারা প্রেতমূর্ত্তি কোনো দুষ্ট লোকের কারসাজি ভাবিয়া তাহারা উহাকে ধরিতে যাইতে গিয়াছে, কিন্তু পারে নাই। একজন সৈনিক পুরুষও উহাদের মধ্যে ছিলেন। তিনি রাত্রিতে নিজ শয়ন ঘরে মূর্ত্তিটা দেখেন, উঠিয়া তাহার পিছনে পিছনে গিয়া শেষে তাহার গায়ের ভিতর দিয়া গুলি চালাইলেন। প্রেত অদ্ভুত ভাবে অদৃশ্য হইল। বাড়ীর ছেলেদের কাছে প্রেতের কথার উল্লেখ হয় নাই; তথাপি তাহারা প্রেতমূর্ত্তি দেখে। তাহারা কোনো ভয় বোধ করে নাই, বরং মজা পাইত; একটী ছেলে বলে "ভূতের গায়ের ভিতর দিয়া পড়বার ঘর দেখিয়াছি।"

৩য় দৃষ্টান্ত

এটীও আচার্য্য ব্যারেট ও দর্শনাচার্য্য শ্রীযুৎ সিজ্‌উইক তদন্ত করেন। কিংস্‌টাউন নগরে ব্যারেটের বাড়ীর নিকটে এক বাড়ীতে এই ঘটনা ঘটে। ঐ বাড়ীর একটা ঘরে একটী মহিলা ও তাঁহার ভাই বাস করিত। তাঁহারা ঐ ঘরে এবং সিঁড়ির কাছে একটী শাল-গায়ে নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। বাড়ীর আর পাঁচজন ও একটী পাঁচ বছর বয়স্ক ছেলেও প্রেতটীকে দেখিয়াছিল। ঘর বন্ধ থাকিলেও মূর্ত্তি কেমন করিয়া ঘরের ভিতর হাজির হইত। কোনো রকমে কারণ নির্ণয় হইত না; অবশেষে উহারা বাড়ী ছাড়িয়া পালায়।

তদন্তে পরে জানা যায় যে এদের পূর্ব্বেও আরো কয়েকজন বাসিন্দা এইরকম উৎপাত ভোগ করিয়াছিল।

৪র্থ দৃষ্টান্ত

শ্রীযুৎ মায়ার্স তাঁহার Human Personality গ্রন্থে নিম্ন লিখিত ভৌতিক ঘটনাটীর বর্ণনা দিয়াছেন। ঘটনার সাক্ষ্য অনেক নামজাদা শিক্ষিত লোক।

জনৈক মহিলা, নাম কুমারী স্কট্; রক্সবর্গ শায়ারে সেণ্ট বস্‌ওয়েলস্ নগরে বাস করিতেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এক সন্ধ্যাবেলা কুমারী বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় তার সমুখে কয়হাত দূরে এক কালপোষাকপরা দীর্ঘকায় পুরুষের মূর্ত্তি দেখিলেন। পথের একমোড় বরাবর গিয়া মূর্ত্তি মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল; অথচ পালাইবার কোন পথ সুমুখে ছিলনা। কুমারী লোকটা কোথায় গেল বা কি হইল তাহা জানিবার জন্য দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া দেখেন তাঁহার (কুমারীর) ছোট ভগ্নী বিস্মিত ভাবে এদিক ওদিক তাকাইতেছে। ইনিও মূর্ত্তিটীকে দেখিয়াছিলেন, এবং একজন পাদরী বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। এরূপভাবে হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ায় উভয়ে মিলিয়া অনেক খোঁজ করিয়াও কোনো তল্লাস পাইলেন না।

পরবর্ত্তী জুলাইয়ে ঠিক সেই স্থানে কুমারী সেই মূর্ত্তি আবার দেখেন; সঙ্গে তাঁহার অন্য এক ভগ্নী ছিল। তিনিও মূর্ত্তিটার উপরভাগ মাত্র দেখেন। মূর্ত্তিটী একটী বুড়া পাদরীর মত knee breech (হাপ্ পেণ্ট) রেশমী মোজা Buckled জুতা, সাদা cravat এবং চাপা টুপী এইরূপ পোষাকে সজ্জিত। কুমারী স্কট এবার যাতে মূর্ত্তি না অদৃশ্য

হইতে পারে এই ভাবিয়া উহার উপর চোখ রাখিলেন। কিন্তু দুই জনেরই চোখের সামনে মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। পর বৎসরও সেই জুন মাসে সেই স্থানে সেই মূর্ত্তি আবার তিনি দেখিলেন। ব্যাপার যে, কি তাহার মীমাংসার জন্য কুমারী ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন, কিন্তু মূর্ত্তিটা যেন পিছলাইয়া সরিয়া যাইতে লাগিল; অবশেষে উহা থামিয়া, কুমারীর দিকে ফিরিল। তখন সেই অবসরে কুমারী ভাল করিয়া তার চেহারাখানা দেখিয়া লইলেন। মূর্ত্তিটা এক শতাব্দী আগেকার স্কটল্যাণ্ড দেশীয় এক পাদরীর চেহারা। একটু পরেই উহা আবার রাস্তার উপরেই অদৃশ্য হইল।

আরো কয়জন লোক ঠিক সেইস্থানে সেই মূর্ত্তি দেখিতে পায়। কুমারী আরভিন্ নাম্নী আর এক মহিলা উক্ত মূর্ত্তিকে ঐ স্থানে বেড়ার ধারে ঘুরিতে ফিরিতে দেখেন। তার সে-কেলে পোষাকটায় কুমারী একটু আকৃষ্ট হন। মূর্ত্তি খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইল। সকল দ্রষ্টাই লিখিত বিবরণ দিয়াছেন। এবং সমস্ত বিবরণই মূর্ত্তিকে একই ভাবে বর্ণনা করিয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের পর আর কেহ সে মূর্ত্তি দেখেন নাই। কেবল আর একবার কুমারী স্কট্ ও তাহার এক ভগ্নী উহাকে দেখেন; তখন মূর্ত্তিটা যে আরো পাতলা সাদা ধোঁয়াটে মত হইয়া গিয়াছে। তখন উহাঁরা প্রেতের কথাই ভাবেন নাই, কাজেই মানস-বিকার বা মতিভ্রম যে নয় তাহা ঠিক। অপিচ কোনো রঙ্গপ্রিয় লোকেরও যে রহস্য খেলা তাহাও নহে।

ঠিক কোন কোন খানে প্রেত মূর্ত্তি দেখা দেয় তাহার চিহ্ন করিয়া উক্ত ঘটনা স্থলের একটা নক্সা করা হয়। ১৯০০খৃষ্টাব্দে জুলাইএ কুমারী সেই স্থানে সেই মূর্ত্তি আবার দুইবার দেখেন। পরে তিনি এক দীর্ঘ বিবরণ লিখিয়া চিৎতত্ত্ব সভায় পাঠাইয়া দেন। সে পথ দিয়া যাহারা যাতায়াত করিয়াছিল বা নিত্য করিত তাহাদের জিজ্ঞাসা বাদ করা হয়, কিন্তু কেউ কিছু দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দেয় না। অথচ কুমারী স্কট্ যে ভুল দেখিয়াছেন বা বলিয়াছেন তাহা বিশ্বাস হয় না।

সাইকিক্যাল সভার বিবরণী হইতে আরো প্রামানিক ঘটনা তোলা যাইতে পারে কিন্তু স্থানবাহুল্য ভয়ে পারিলাম না।

এই ধরণের যাবতীয় ঘটনার অপক্ষপাত বিচার বিবেচনা করিয়া বিদুষী সেজউইক্ পত্নী যাহা বলেন তাহা অনুধাবন যোগ্য; কেননা শ্রীমতী সেজউইকের মত এরূপ ঘোর সন্দেহবাদী অথচ নির্ভীক বুদ্ধিমতী অপক্ষপাত সমালোচক বড়ই বিরল। তিনি বলেন—"তর্কশাস্ত্রানুমোদিত সন্দেহ করা সত্ত্বেও এ সিদ্ধান্ত এড়ানো অসম্ভব যে সত্যই কোনো কোনো বাড়ীতে এরূপ ভৌতিক মূর্ত্তি ও উপদ্রব দেখা দিয়াছে ও ঘটিয়াছে। এবং দ্রষ্টার নিজকৃত Suggestion (মানস ইঙ্গিত) বা Expectation (দেখিবার ঝোঁক) মত দিয়া ইহার ব্যাখ্যা হয় না—" অর্থাৎ অনেকে বলিবেন যে দ্রষ্টা মনে মনে ভুত দেখিব এই ইচ্ছা ও চেষ্টা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে বলিয়াই এইসব ছায়া দর্শন ঘটে কিন্তু সবদিক বিচার করিয়া এরকম অনুমানের কোনই হেতু পাওয়া যায়না। ব্যাপার গুলার মধ্যে একটা অজ্ঞানিত অজ্ঞেয় সত্য রহস্য আছে— শ্রীমতী সেজউইকের এই মত।

উক্ত দৃষ্টান্তগুলি হইতে একটা ধারণা হয় যে খুব সম্ভবতঃ যাহাদর প্রেতমূর্ত্তি দেখা দেয় তাহাদের অতীত ইহজীবনের ঘটনাবলী কোনো অজ্ঞেয় রকমে ঘটনাস্থলে এবং সেখানকার জড়-জিনিসপত্রে তৎ তৎ ঘটনার (astral) সূক্ষ্ম ছাপ রাখিয়া যায়; (যেমন উচ্চারিত শব্দ গ্রামোফোনের রেকর্ডে ছাপ রাখে); এবং অতীন্দ্রিয় শক্তিশালী কোনো লোক সেখানে আসিলেই <u>একটা সমযোগ</u> বশতঃ তাহার চিৎ-যন্ত্রে ঘটিত ঘটনার আভাস ফুটিয়া উঠে; প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে তদনুযায়ী অনুভূতির ছায়া জাগিয়া উঠে।

মতটা খুব বেয়াড়া ও উদ্ভট মনে হইতে পারে; তবে ইহা একটী সঙ্গত অনুমান মাত্র। পদার্থ-বিজ্ঞান (physic) ও চিৎ বিজ্ঞানে ইহাদের উপমা পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে একটা কাঁচখণ্ডের উপর একটা ধাতুমুদ্রা (টাকা পয়সা) খানিক্ষণ রাখিয়া তুলিয়া লওয়ার পর সেই স্থানে হাপা দিলে, তথায় মুদ্রার ছাপটা ফুটিয়া উঠে। অপিচ—

ফটোগ্রাফ্ প্লেটের উপর একখণ্ড কাঠ বা কয়লা রাখিয়া একটু পরে তুলিয়া লইয়া শীঘ্র বা দেরীতে তাকে ডেভেলপ্ করিলে উহাদের গঠনগত ও আকারগত ছাপ ফুটিয়া উঠে। এ সবের কারণ এখনকার জ্ঞানে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কিন্তু চিৎ-বিজ্ঞানের ব্যাপার হইতে যে উপমা দেওয়া যাইতেছে তাহার কোনো জানিত কারণ নাই বটে, তথাপি ঘটনাগুলা খুবই সত্য ও প্রামাণিক, সন্দেহের আর হেতু নাই। আমরা পূর্ব্ব-অলোচিত অতীন্দ্রিয় দর্শন অধ্যায়ে দেখিয়াছি psychometry নামে এক বিদ্যা আছে। কোনো কোনো মিডিয়ম কাচদৃষ্টিযোগে বর্ত্তমান অতীত বা ভবিষ্যৎ, দূরস্থ ঘটনা ও জিনিসপত্র দেখিতে পায়। এমন এমন মিডিয়মও আছে যে মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির ছোঁয়া-নাড়া জিনিষ হাতে করিয়া তার অতীত বর্ত্তমান জীবনের ঘটনা, স্থান ইত্যাদির যথাযথ সত্য পরিচয় দিতে পারে। প্রাচীণ মেস্‌মেরিষ্টরা (সম্মোহ বাদী) ইহার কারণ দেন এই বলিয়া যে ব্যক্তিমাত্রেই নিজ ব্যবহৃত জিনিসে একটা তেজ পদার্থ [effluence] সঞ্চার করিয়া দেয়; সেই অদৃশ্য তেজটার সহিত মিডিয়ম নিজ তেজের একটা সাম্য ঘটাইয়া ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। এরূপ কোনো শক্তি মানুষ মাত্রের আছে কি নাই, তাহা জোর করিয়া "না" বলা যায় না, বিশেষ এই যুগে যখন জড়বিজ্ঞানশাস্ত্র একরূপ প্রমাণ করিয়াছে যে বস্তু মাত্রেই কমবেশী radio-active বা তেজনিঃসারক।

অচার্য্য ব্যারেট ও শ্রীযুৎ গর্নি উভয়ে মিলিয়া S. P. R. সভার গৃহে মোহবিদ্যা [Hypnotism] লইয়া কতকগুলি অদ্ভুত পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় যাহা প্রতিপন্ন হয় তাহা আশ্চর্য্য রকমের বিস্ময়কর।

একজন মোহকারী [Hypnotiser] কয়েকটা জিনিসের উপর পাস্ দিল, অর্থাৎ হাত চালাইল। তারপর বাহির হইতে একজন সেন্‌সিটিভ্ আবেশপ্রবণ [মোহ প্রবণ] লোককে সেই ঘরে আনা হইল। তার আগে মোহকারীকে ঘর হইতে সরানো হইয়াছিল, এবং মন্ত্রপড়া জিনিসগুলার স্থান বদল করিয়া দেওয়া হইল। তৎসত্বেও আবেশপ্রবণ লোকটী চট্‌পট্ করিয়া জিনিসগুলা দেখাইয়া দিতে লাগিল। পাছে টেলিপ্যাথীর কারচুপি মনে হয় এই জন্য আমরাও ঘর হইতে বাহির হইলাম, এবং মোহকারী কোন্ জিনিসে হাত চালিয়াছেন তাহাও জানিলাম না; ফলের কোনো ইতর বিশেষ হইল না। ঘটনা তো সত্য এখন সঠিক কারণ নির্ণয় ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু তার আগে আনুমানিক কারণ যাকে ইংরাজীতে Hypothesis বলে তাহা আন্দাজে ধরিবার চেষ্টা তর্কশাস্ত্রের অসম্মত নহে। কারণ ব্যাখ্যার জন্যে এ যুগের উপস্থিত জ্ঞানে যাহা মনে হয় তাহাই নিম্নে উল্লেখ করা যাউক:—

(১) সাধারণ মত—যে প্রেতেরা অন্যান্য নৈসর্গিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য-জিনিসের মত এই বহির্জ্জগতবাসী জীব তবে সূক্ষ্মজড়ে তাহাদের দেহ গঠিত। উহারা সত্যই বাড়ী বিশেষে আড্ডা করিয়া থাকে—সেনসিটিভ লোকের অনুভূতির সঙ্গে নিকট সম্বন্ধযুক্ত হইলেও ইহার অপেক্ষাধীন নহে।—মিস্ মর্টন দৃষ্ট প্রেত অনেকটা এই মতের সমর্থক। তবে এ মতে প্রেতের কাপড় চোপড়ের ব্যাপারটা বিশ্বাসের পক্ষে অনেকের কাছে মহাবাধা। তাঁরা বলিতে চান, ভূত না হয় বুঝিলাম একটা সূক্ষ্মদেহী অতীন্দ্রিয় জীব; কিন্তু তার কাপড় চোপড় আবার কি কাণ্ড! উত্তরে এই বলা যায় প্রেত যদি সূক্ষ্ম জড় লইয়া দেহ গঠন ও ধারন করিতেই পারিল তবে তার কাপড় চোপড়টাই কি একটা বিষম বাধা? এ আপত্তির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।

(২) প্রেত মূর্ত্তি দ্রষ্টার মানস-সৃষ্টি সুতরাং ছায়া বা মায়াবীরূপধারী; তবে অহেতুকি নয় অর্থাৎ বন্ধ্যায় পুত্রের মত একেবারে অভাব বাচক কিছু নহে; মৃত ব্যক্তির বিদেহআত্মার চিন্তাবলে দর্শকের চিত্তপটে এই আভাস জাগিয়া উঠে। Telepathy বলে বিদেহ-মন দেহীরমনে অন্তার বার্ত্তার প্রক্রিয়ায় ছবি জাগাইয়া প্রেত বোধ জাগায়। জীবিতদের মধ্যে একচিত্ত হইতে অপরচিত্তে ভাবিত ভাবনা যে বিষয়-রূপ জাগাইতে পারে বা দৃষ্টিভ্রম ঘটাইতে পারে পরীক্ষায় তাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কাজেই প্রেতব্যাখ্যায় এ মত অসঙ্গত নহে। মানুষ যেমন স্বপ্নযোগে পূর্ব্বপরিচিত দেশে বা কালে ভাবদেহে বর্ত্তমান হইতে পারে, মৃতব্যক্তির

বিদেহমনও তেমনি পরলোক হইতে স্বপ্নযোগে ঐহিক লীলাস্থল পৃথিবীর স্থানবিশেষে ভাবদেহে (idia-lly) আসিতে পারে এবং অতিন্দ্রিয় শক্তিশালী লোক সেই সময়ে সেই খানে আসিয়া পড়িলে তদ্‌ভাবিত হইয়া সেই সব দর্শন করে। হইতে পারে—কিন্তু এমতে সব প্রেতঘটনা ব্যাখ্যাত হয় না। কেবল একটী মাত্র বিশিষ্ট স্থানেই কেন সেই প্রেত দৃষ্ট হয়?

(৩) উক্ত আপত্তি তৃতীয় মতে খণ্ডন হইতে পারে। এ মতের একটু আভাস কিছু পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মতটী হইতেছে এই যে যাহার প্রেতমূর্ত্তি সেই ব্যক্তির জীবিতকালীন ঘটনাগুলি তাহার বাসভূমির এবং তৎসংলগ্ন জিনিসপত্রে একটা astral বা সূক্ষ্ম ছাপ্ রাখিয়া গিয়াছে যার অনুভূতি-প্রবণ-চিত্ত (Sensitive) এমন লোক সেখানে আসিলেই তাহার চিৎপটে ঐ ছাপ...ছবি জাগাইয়া দেয়—অনেকটা ফনোগ্রাফের রেকর্ডের ব্যাপার। এ অনুমানের হেতু বা যৌক্তিকতা পূর্ব্বেই বিচার করা হইয়াছে। না হইতে পারে যে তাহা নহে তবে এমন সব ঘটনা আছে যাহাতে এ ব্যাখ্যা কোনোমতেই খাটে না।

(৪) কোনো কোনো ভুতুড়ে বাড়ীর ভৌতিক ব্যাপারে মনেহয় যে বিদেহ-মনের (disembodied minds) তীব্র ভাবনা. ঘটিত ভাবরূপ (Thought forms) বাস্তব মূর্ত্তি ধরিয়া সেই বাড়ীতে বিরাজ করে। মূর্ত্তি মানুষের বা স্থানের বা জিনিসের হইতে পারে। অতীন্দ্রিয়-অনুভূতি-প্রবণ লোক কেহ সেখানে আসিলে তাহার চেতনায় তাহা গ্রাহ্য হয়। প্রায়ই যে বাড়ীতে কোনো লোকের স্বতঃ ঘটিত বা পরঘটিত হত্যা ঘটিয়াছে তথায় এই প্রেতমূর্ত্তি দেখা যায়। আর বস্তুতঃ প্রায়ই অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এমন বাড়ীতেই ভৌতিক মূর্ত্তি দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গচ্ছলে বিদেহ কোনো প্রেতমুখে প্রাপ্ত কারণ-ব্যাখ্যা অনুধাবন-যোগ্য। শ্রীযুক্ত মায়ার্স তাঁহার Human personality গ্রন্থের ২য় ভলুমে ৪৫৩ পৃষ্ঠায় Estelle নামধারী বিদেহ আত্মার কথিত বার্ত্তাযোগে প্রাপ্ত যে কারণ ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য। এস্‌টেল প্রেত বলিতেছে :—

"যখন কোনো লোক তীব্রভাবে অন্য কোনো লোককে, স্থানকে বা জিনিসকে ভাবে তখন ভাবিত জিনিসের একটা বাস্তব ছায়ামূর্ত্তি আকাশপটে ফুটিয়া উঠে। ভুতুড়ে বাড়ীতে যে সব প্রেতের কথা তোমরা শোনো তারা সত্যই দেহধারী সজ্ঞান কোনো মায়াবদ্ধ বিদেহ আত্মা নয়; আমার মতে তারা হতব্যক্তির বা অকালে হটাৎ মৃত-ব্যক্তির ছায়া-রূপ মাত্র। যারা উহাদের মৃত্যুর কারণ তাদেরই ভয় বা. অনুশোচনা জনিত তীব্র মানস চিন্তার ফলে হত বা মৃতদের সেই সব ছায়ামূর্ত্তি আকাশপটে গড়িয়া উঠে। তা না হলে নিজেদের বিনাদোষে ব্যাচারীরা হত হইয়াছে বলিয়াই মায়াবদ্ধ হইয়া সংসার গণ্ডীতে ঘুরিয়া মরিবে এ বড় দুঃখের কথা—তবে এরা যে একেবারে মায়াতীত জীব তাওতো নয় কাজেই এদের অনেকেই মায়াধলে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীতে ঘুরিয়া বেড়ায়—"

চিন্তাবলে যে ভাবমূর্ত্তি ফুটাইতে পারা যায় পরীক্ষায় তাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পাঠক পূর্ব্বগামী ছায়াদর্শন প্রবন্ধে দু একটা দৃষ্টান্ত পাইবেন। দেখিবেন টেলিপ্যাথী-যোগে অনেকে দূরবর্ত্তী বন্ধুবান্ধবের চোখে ছায়ামূর্ত্তি জাগাইতে পারিয়াছেন। জীবন্ত দেহীমন যদি তা পারে বিদেহী-মন পারিবেনা কেন তাহার হেতু নাই। ঋষি অধ্যাত্মদর্শী সুইডেনবর্গ বলেন পরলোকবাসী সূক্ষ্মদেহী আত্মাদের মধ্যে ইচ্ছাবলে ভাবদেহ ধারণ করা একটী তদবস্থা-সুলভ শক্তি মাত্র।

(৫) কোনো কোনো ভুতুড়ে বাড়ীর প্রেতদর্শন মতিভ্রম বা উত্তেজিত কল্পনার ফল। আগে হইতে মন 'প্রেত দেখিব' এই আশায় ও উত্তেজনায় এমনি বিকৃত মতি হয় যে তাহাই দেখিয়া বসে। শ্মশানে, গোরস্থানে, অপমৃত্যু ঘটনাস্থানে যদি কোনো কল্পনা প্রবণ লোক আসে তাহা হইলে মনের ইঙ্গিতবলে সে প্রেত দেখিবেই। অনেক ভুতের ভয়ের মূলে এই Suggestion বা Telepathyর ক্রিয়া বর্ত্তমান।

যাহারা অকাট্য প্রমান সাক্ষ্য সত্বেও প্রমান মানিতে বা অপক্ষপাতভাবে পরীক্ষা করিতে অনিচ্ছুক এবং সমস্ত অলৌকিক ঘটনাকে ফাঁকি জাল-জুয়াচুরীর কারসাজি মনে করেন তাহাদের কথা তুলিবার দরকার নাই।

(৬) **অতীতানুভূতি** বা Retro cognition হইতেছে সেই শক্তি যাহার বলে কোনো কোনো সেন্‌সিটিভ্ লোক অলৌকিক উপায়ে অতীত ঘটনা, দৃশ্যস্থান বা ব্যক্তিকে দেখিতে পায়। 'অতীন্দ্রিয় দর্শন' অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

অতীতানুভূতির এক আশ্চর্য্যকর দৃষ্টান্ত 'An adventure' নামক দুই ইংরাজ মহিলা লিখিত গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ১৯১১ সালে লণ্ডন হইতে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঘটনাটী এই :—

উক্ত গ্রন্থের লেখিকা দুজন ১৯০১ সালে ফরাশীদেশের ভারশেঁল রাজবাড়ী দেখিতে যান। তথায় পৌঁছিয়াই তাঁহারা নিজেদের রাজা ষোড়শ লুইএর সময়ের ঘটনা ও দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিতি বোধ করিলেন। সেই সময়ে রাজবাটী ও উদ্যান যেমন যেমন ছিল যে সব লোকজন তখন তথায় মানবলীলা করিয়াছিল যে সব দৃশ্য তখন ঘটিয়াছিল তাহার মায়ালীলার মধ্যে নিজদিগকে বিদ্যমান দেখিতে লাগিলেন। সে কালে রাজবয়স্য, রাজ-সভাসদ বা রাণী রাজকুমারী সখী বয়স্যাদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা, বেশভূষ, আমোদ-আহ্লাদ বা উৎসব রহস্য চলিত ঠিক তাহাই চলিয়াছিল।

ছয়মাস পরে ইহাদেরই একজন আবার যখন ভারশেঁল দর্শনে যান তাঁহারও ঠিক তেমনি মায়াদর্শন ঘটিয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যতবার উভয়ে গিয়াছিলন, আর এরকম ভ্রম হয় নাই।

শ্রীমতী সেজ্‌উইক এই ব্যাপারটীকে পূর্ব্বকথিত পঞ্চম-মতে ব্যাখ্যা করেন—অর্থাৎ কল্পনার তীব্রতাবশতঃ ইতিহাস-অনুযায়ী দেখিবার ইচ্ছার ফলে জাগ্রতভ্রম মাত্র। আচার্য্য ব্যারেট বলেন ইহা পূর্ব্বোক্ত অতীতানুভূতি শক্তির ক্রিয়া ফল।

ভূতুড়ে বাড়ী ও ভৌতিক মূর্ত্তি দেখা এই অতীতানুভূতি শক্তির ক্রিয়াফল বলিয়া মনে হয় না। অতীতানুভূতির শক্তি সকলের নাই; কিন্তু ভূতুড়ে বাড়ীতে ভূতের অস্তিত্ব অনুভূতি যে কেহ সে বাড়ীতে আসিবে তাহারই ঘটে।

মায়ার্স নিজে দ্বিতীয় মতের সমর্থক বলিয়া মনে হয়। সংসারে মায়াবদ্ধ প্রেত পরলোকে থাকিয়া নিজ ইহজীবনের প্রিয়বাসস্থান, জিনিসপত্র, আত্মীয়স্বজন, সৌভাগ্য, বিপদ আপদ সম্বন্ধে স্বপ্নদেখে, এবং স্বপ্নে বিচরন, অভিনয় এই সব করে, ফলে সেন্‌সিটিভ্ তথায় আসিয়া টেলিপ্যাথীযোগে উহার অনুভূতি পায়।

শুদ্ধমাত্র ইংরাজিতে যাহাকে Haunting বলে তাহা একজাতীয় প্রেতের কাজ। ইহারা নিরুপদ্রবী, কাহাকেও ভয় দেখানো বা কাহারও অনিষ্ট করা ইহাদের কাজ নয়, কেবল মূঢ় স্বপ্নাহতের মত ইহারা ইহজীবনের অভিনয় করে; কিন্তু আর একজাতীয় প্রেত-উৎপাত আছে যাহা কার্য্যতঃ অনিষ্টকর, লোকের ভয়োৎপাদক এবং বিড়ম্বনা-কারী। জর্ম্মন ভাষায় ইহাদের Polter geist বলে। অমাদের দেশে উহাকে কি বলে জানিনা। বোধহয় 'দানা' বলে। ছেলে ছোকরা, বউ ঝি— এদের উপর ভর করিয়া ইহারা নানা উৎপাত ঘটায়।

আমাদের দেশে শতকরা ৯০ জন লোকে কোনো না কোনো বিশ্বস্ত ভূতোৎপাতের গল্প শুনিয়াছেন এবং অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশের দৃষ্টান্তগুলির সত্যতা সম্বন্ধে জোর করিয়া বলা কঠিন বা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা তাহাও নিরাকরণ অসম্ভব। কাজেই বিলাতের বা আমেরিকায় যে সব ঘটনা দিতে হইতেছে তাহা বড় বড় নামজাদা বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা পরীক্ষিত।

বাজে গল্প ছাড়িয়া দিয়া বিশ্বাসী অপক্ষপাত নামজাদা বড়লোকদের অভিজ্ঞতা হইতে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের 'Demon of Tedworth' ঘটনা বিশ্ববিখ্যাত। তদানীন্তন রয়াল সোসাইটীর ফেলো রেভারেণ্ড জে গ্লেনভিল নিজে এই ঘটনা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেন।

১ম দৃষ্টান্ত

১৬৬১ খৃঃ-টেডওয়ার্থের এক ম্যাজিষ্ট্রেট্ নাম মম্পেসন একটা ভবঘুরে ড্রামারকে (যুদ্ধঢাকী) গ্রেপ্তার করান। ঘটনার কয়দিন পরেই মম্পেসনের বাড়ীতে ভয়ানক ভৌতিক উপদ্রব আরম্ভ হয়। প্রায় দুবছর ধরিয়া এই উৎপাত

চলে। ঢাকীকে ডাইনীবিদ্যার আলোচনা অভিযোগে বিচারাধীন করা হয় কিন্তু খালাস হয়। বহু সাক্ষী এই সব উৎপাতের সাক্ষ্য দেয়। জনরব শুনিয়া গ্লেনভিল স্বয়ং তদন্ত করিতে যান। গ্লেন্‌ভিল বলেন—"আমি স্বচক্ষে দেখিলাম বিনা স্পর্শে চেয়ারগুলা নড়িতে লাগিল, কোথা হইতে কে জুতা ছুড়িয়া মারিল, বিছানায় শব্দ হইতে লাগিল। যত উৎপাত মিঃ মম্পেসনের দুটী ছোট ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া। আমার সন্দেহ হইল বুঝি ছেলে দুটার দুষ্টামি, কিন্তু তা অসম্ভব, যে সব ব্যাপার ঘটিতে দেখিলাম তা দুটী ছোট ছেলেকে দিয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া প্রকাশ্য দিবালোকে অসংখ্য অবিশ্বাসীর চোখের উপর ঘটিতে লাগিল।"

২য় দৃষ্টান্ত

মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের স্থাপনকর্ত্তা স্বনামধন্য জন ওয়েস্‌লি যখন এপওয়ার্থ জনপদে পৌরহিত্য করিতেছিলেন তখন তাঁর বাড়ীতে এই ধরনের ভৌতিক উপদ্রব ঘটে। জন ওয়েস্‌লি স্বয়ং স্বচক্ষে এই সব ব্যাপার দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন সে সব শয়তানের কীর্ত্তি। তাঁহার ডায়েরী হইতে স্বলিখিত বিবরণ তুলিতেছি :—

"২৫শে ডিসেম্বর—উপদ্রব এত বেশী যে ঘুমানো অসম্ভব। ২৭শে ডিসেম্বর—উৎপাতের মাত্রা এত বেশী যে ঘরদ্বার ফেলে বাহির হওয়া উচিৎ মনে করিনা। অন্যত্র—তিন তিনবার কে যেন আমায় ঠেলে ফেলে দেয় একবার আমার পড়বার ঘরের ডেস্কে আমায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে। একবার আর একটা কামরার দরজায় ঠোকা খাই; তৃতীয়বার পড়বার ঘরে ঢোক্‌বার সময় দরজার চৌকাঠে ধাক্কা খাই। উপদ্রবের সময় কুকুরটার ভাবভঙ্গী যেমন ভয়-সূচক হয় এমন আর কিছুতে না।" কবিসাদি এই প্রসঙ্গে ওয়েস্‌লির জীবন চরিতে লিখিয়াছেন—'ঘটনার সাক্ষ্য প্রমান এমন অকাট্য অভ্রান্ত যে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দেওয়া অসম্ভব। অস্বাভাবিক হইলেও অতি মাত্রায় সত্য।'

৩য় দৃষ্টান্ত

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে 'Bealing Bells' নামক আর এক ভৌতিক উৎপাত রয়াল সোসাইটীর অন্যতম ফেলো মেজর মুর কর্ত্তৃক তদন্ত হয়। এ ব্যাপারে একটা বাড়ীতে দুই মাস ধরিয়া দিনে ও রাতে অসংখ্য দ্রষ্টার সম্মুখে একটা ঘন্টা অনবরত বাজিত। জনরব শুনিয়া মেজর মুর স্বয়ং গিয়া তদন্ত তল্লাস করেন। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁর চোখের সম্মুখে ঘণ্টাটা সজোরে বাজিতে থাকে। মেজর মুর নিঃসন্দেহে বুঝিলেন যে ব্যাপারটা অলৌকিক। বাড়ীর বাসিন্দারা বাড়ী ছাড়িয়া পলায়। সে রহস্য ভেদ আর কেহ করিতে পারিল না।

৪র্থ দৃষ্টান্ত

১৮৫৩-৫১ খৃষ্টাব্দে হেভার নগর হইতে ৩০ মাইল দূরস্থ সাইড্‌ভিল পাদ্রীভবনের ভৌতিক উৎপাত আর একটা বিস্ময়কর ঘটনা। জড়দ্রব্যের চলাচল, ভাঙ্গাচোরা টানা ফ্যালা, নানারকম গোলমাল, প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটিত। দুষ্টলোকের দুষ্টামী ভাবিয়া অনেক গন্যমান্য লোক রহস্যভেদ করিতে গিয়া ব্যর্থ হন।

সাইকিক্যাল সভার পক্ষ হইতে পদার্থ বিজ্ঞানবিৎ আচার্য্য ব্যারেট্ এই জাতীয় অলৌকিক ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত হন। তিনি বহুদিন ধরিয়া নানা ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ও স্বাধীনভাবে তদন্ত করিয়া এ সম্বন্ধে নিজ মতামত সহ এক সুদীর্ঘ বিবরণ সভার ২৫শ সংখ্যক বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন। অন্যান্য বিবরণীতেও অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে।

৫ম দৃষ্টান্ত

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের Dublin University Magazineএ তিনি এক আইরিশ্ কৃষকের বাড়ীতে ঘটিত এক ভৌতিক কাণ্ডের বিবরণ প্রকাশ করেন। আচার্য্য আর দুই অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক বন্ধুসহ তদন্তে যান। তিনি ও বন্ধুদ্বয় বহু প্রকারে পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হন যে ঘটনাগুলা কোনো রকমেই ফাঁকী জুয়াচুরী বা চালাকি কারসাজির কাজ নয়।

১৯১০ জুলাইমাসে ওয়েক্‌সফোর্ডে আর একটী ভৌতিক কাণ্ড আচার্য্য তদন্ত করিতে যান। একটী ছুতার বালককে অবলম্বন করিয়া প্রেতের উপদ্রব হইতে থাকে। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন সন্দেহবাদী তদন্তকারী ছিলেন। আচার্য্য

লেন "আমাদের চোখের সম্মুখে ছেলেটীর বিছানা হইতে চাদর লেপ বালিস্ কে যেন টানিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে ছেলেটাকে শূন্যে তুলিয়া ঘরের মেঝেতে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিল। আলো বেশ জ্বলিতেছিল আমরা একটু দূরে দাঁড়াইয়া সাদা চোখে ব্যাপার দেখিলাম। কেহ যে দুষ্টামি করিয়া এ সব করিতেছে তাহা বলা আর আমরা পাগল বা জ্ঞানশূন্য এও বলা এক কথা!"

এখন কথা এই—এই যে সব দুষ্টপ্রেতের কারখানা ইহার কী ব্যাখ্যা হইতে পারে? পূর্ব্বে যে পাঁচ-প্রকার আনুমানিক কারণ ব্যাখ্যার উল্লেখ হইয়াছে তাহার একটাও এ জাতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা দিতেই পারে না।

হয়তো অনেক উৎপাত ব্যাপার জুয়াচুরী; ভুল দর্শন, মোহদর্শন, ভুলবর্ণনা ইত্যাদির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে, কিন্তু সব ঘটনা যে তা হয় না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। গ্লেনভিল, মেজর মুর, ওয়েস্‌লি প্রভৃতির মত লোক যে মিথ্যা কথা বলিয়া লোকজনকে ঠকাইবেন ইহা কি সম্ভব না বিশ্বাসযোগ্য?

সত্যপিপাসু বৈজ্ঞানিকের কাছে এই এক মহা সমস্যা! আপাতঃজ্ঞানে এ সবের কোনো জানিত নিয়মে ব্যাখ্যা অসম্ভব; তবে আশা করাযায় জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আসল কারণ অচিরে ধরা পড়িবে। প্রকৃতির দিশাহারা গহনবনে মানুষ সবে মাত্র পা বাড়াইয়াছে বাহির দরজা হইতে তাহার অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডারের দু চারিটা তত্ত্ব সবেমাত্র আয়ত্ত করিয়াছে—আসল রত্নখনি এখনো অজ্ঞাত ও অস্পৃষ্ট ভাবেই পড়িয়া আছে।

ব্যক্ত প্রকৃতির বিন্দুমাত্র লাভ হইয়াছে—

এখনোতো অব্যক্ত প্রকৃতির অসীম রাজ্য অনাবিষ্কৃত। অক্লান্ত ধৈর্য্য ও প্রাণপণ অধ্যবসায়ের ফলে একদিন না একদিন মানুষ এই সব পরম রত্নের অধিকারী হইবে। যা অলৌকিক সুতরাং অজ্ঞেয় তা স্বাভাবিক ও সহজজ্ঞেয় হইলেই অকারণের কারণ জ্ঞানযোগে লভ্য হইবেই।

নিজের জ্ঞানের অক্ষমতা ও খর্ব্বতা জানিয়া পণ্ডিত প্রবর হক্সলির সেই অমর উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে হইবে—Sit down before facts as a little child, be prepared to give up every preconceived notion, follow humbly wherever and to whatsoever abyss nature leads—"

কোন? কারণ? —'for nothing is that erre from law.'

আত্মার বিদেহাস্তিত্ব সম্বন্ধে এই শ্রেণীর ঘটনার প্রামানিকতা সব চেয়ে বেশী না হইলেও, বড় কম নহে। যতরকম মত গড়িয়া এই সকল ভৌতিক উৎপাত বা ভূতুড়ে বাড়ীর রহস্যভেদের চেষ্টা হইতেছে সব চেয়ে প্রেতবাদই অতি সহজে ও সুন্দরভাবে ইহাদের মীমাংসা করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ঘটনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মত গঠিত হইতেছে, কিন্তু প্রেতবাদ সমস্ত অলৌকিক ঘটনাকে নির্ঝঞ্ঝাটে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ। 'কারণ ব্যাখ্যা' অধ্যায়ে ইহার সবিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

বিস্মৃতির দেশে

[শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক]

দীপের আলো নাইক, নাহি নির্ব্বাণেরি গন্ধ,
নাইক কুসুম, নাই সুরভি, নাইক মকরন্দ ।
নাইক সেথা রাগ রাগিনী, গীতের সাড়া শব্দ
সকল ধ্বনি নিধন সেথা রোদন সেও স্তব্ধ ।

বক্ষ আছে পাষাণ হয়ে, অন্ধ হয়ে নেত্র,
মরুর মত অনাদৃত গোলাপ ফুলের ক্ষেত্র ।
রূপ নিভে যায় আতস বাজির আলোর ছবি অঙ্কি'
জলরেখার কাছেই ডোবে যশের ময়ূরপঙ্খী ।
দিগ্বিজয়ী ডোবেন অযুত অক্ষৌহিণীর সঙ্গে
সাধ্য কি এ জলরেখার বিন্দুটীও লঙ্ঘে ।

অজ্ঞাত সব বালক সেথা কাঁদে মায়ের জন্য
অচেনা কোন ছেলের লাগি ঝরে মায়ের স্তন্য ।

পথ চেয়ে রয় বিরহিণী বিষম মোহে মত্ত
প্রণয়ী তার কোণ সুদূরে লয়না কোনই তত্ত্ব ।
ধরা এদের ভুলেই গেছে এরা ধরার প্রার্থী,
কেবল যেন সঞ্জীবনী স্মৃতির সুধার আর্ত্তি ।

হেতায় শুধু বায়ুর হাহা অশ্রুজলের বিন্দু
হেতায় জাগে নিবিড় মেঘের অন্তরালে ইন্দু ।
রয় ভোলা দান, বিস্মৃত গান অন্ধকারের কক্ষে
বিসর্জ্জনের দেব প্রতিমা অনন্তেরি বক্ষে ।
সেথায় আছে ভাসিয়ে দেওয়া কঙ্কাবতী বোনটী
আছে যে সব চম্পাপারুল চিনতে নারি কোনটী ।
অপ্সরীরা উর্দ্ধে যেতে নিম্নে করি দৃষ্টি
নিত্য সবে তাদের শিরে করেন কুসুম বৃষ্টি ।
ইন্দিরা লন চড়িয়ে তাদের ঐরাবতের পৃষ্ঠে ।
দেন পারিজাত গন্ধ ভরা চুম্বন অধরোষ্ঠে ।

ভরা-ডুবি

[শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে রৌদ্রে পিঠ পাতিয়া মিনতি ভিজা চুল শুকাইতেছিল। বন্যা-পীড়িত লোকেদের সাহায্য কল্পে একদল ছেলে লইয়া পরেশ চলিয়া গিয়াছে, এ খবর সত্য তাহাকে আনিয়া দিয়াছে। দামোদরের বাঁধ ভাঙিয়া সেবারের মত ভীষণ-বন্যা পূর্ব্বে বড় একটা হয় নাই। সংবাদপত্রে বন্যা প্রপীড়িত লোকেদের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী পাঠ করিয়া মিনতি ব্যথা অনুভব করিয়াছে এবং পরেশ তাহাদের সেবার জন্য যাত্রা করিয়াছে শুনিয়া পরেশের উপর শ্রদ্ধাভরে তাহার মাথা নত হইল। আপনার সুখ দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া পরের সেবার জন্য এরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম

এবং স্বার্থত্যাগ করিতে যে প্রস্তুত সাধারণের মধ্যে অতি সাধারণভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিলেও সে যে ঠিক সাধারণ নহে, এই কথাটা মিনতি স্পষ্ট বুঝিল।

শুধু আজ বলিয়া নয়, একটা জিনিস বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে, পরেশ অপরের দুঃখ বুঝে, তার নিজের হৃদয়ের যে গভীর গোপন বেদনা হাসি দিয়া সে ঢাকিয়া রাখিয়াছে, সেই বেদনার পরম অনুভূতি তাহাকে অপরের বেদনা সম্বন্ধে সজাগ রাখিয়াছে। আহত প্রাণের আঘাত তাহাকে চূর্ণ করে নাই বরঞ্চ গড়িয়া পিটিয়া তাহার মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিয়াছে, যাহাতে পরেশ নিজেকে আর আপনার মধ্যে বদ্ধ রাখিতে পারে নাই, তাই সে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে।

অথচ এই পরেশের উপরই মিনতির মাতা নারাজ—তার সহৃদয়তা, সরলতা, কর্ম্মোৎসাহ সকলের মধ্যেই তিনি স্বার্থের তীব্র গন্ধ পান। পরেশের আসা যাওয়ার মধ্যেও যে একটা দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে, ইহা তিনি স্পষ্ট জানেন বলিয়াই না, তিনি পরেশকে ক্রমাগত নিরুৎসাহ করিয়া আসিতেছেন। মাতার এরূপ অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করিয়া মিনতি মাতাকে বিরত করিতে পারে নাই, তাই মাতার বীতরাগকে একপাশে ঠেলিয়া দিয়া মিনতি তার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা পরেশকে নিবেদন করিয়া দিয়া সার্থকতা অনুভব করিতেছিল। মাতা কন্যাকে আঁটিতে পারেন নাই, কন্যার প্রতি বিরক্তি ভাব দেখাইতে ক্রটী করেন নাই। মাতা-পুত্রীর খিটিমিটি এমন কি নবকান্ত পর্য্যন্ত জানিতে পারিলেন। জানিতে পারিয়াও তিনি যখন কিছু করিলেন না, গৃহিনী অজুহাত পাইলেই কর্ত্তাকে এই কথাটা বারবার বলিতেন যে "তোমার আস্কারা পেয়েইত মেয়ে মাটি হয়ে গেল। কেন সে অত পরেশ, পরেশ করে তা বুঝতে পার না! তোমরা না পার আমার বলনা ছাই তাহলে আমিই তাকে স্পষ্ট বলে দিই, তাহলেই তার আসা যাওয়া বন্ধ হবে।" এরূপ শুনিলে নবকান্ত একটু হাসিতেন, তাহাতে গৃহিনী আরও জ্বলিয়া যাইতেন। আহা, কি হাস যে বলিয়া তিনি চটিয়া চলিয়া যাইতেন।

নবকান্ত জানিতেন তাঁহার স্ত্রী যাহা বলিতেন তাহা যুক্তিহীন নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উঠিত কি বলিয়া তিনি পরেশ ও মিনতিকে এতদূর অবিশ্বাস করিবেন। তাহারা পরস্পরকে ভালবাসে কিনা একথা তিনি জানেন না, যদি ভালবাসিয়া থাকে তাহলেই বা তিনি কি করিবেন?

প্রথম যৌবনে একদিন তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন, এহেন তিনি আজ বয়স্কা কন্যার অতি সামান্য স্বাধীনতার উপর অযথা হস্তক্ষেপ করিতে যাইলে সত্যই আপনার নিকট আপনি যে হীন হইয়া পড়িবেন!

"দিদি"—বলিয়া সত্য যখন ডাকিল তখন মিনতির প্রথম চমক ভাঙ্গিল।

সে উত্তর দিল—কেন ভাই!

—এতক্ষণ একা একা বসে কি ভাবছিলে দিদি?

—অনেক কথা সত্য?

—অনেক কথার মধ্যে একটা কথা আমি বলে দিতে পারি।

—ইস্ কখ্খনও নয়!

—দিদি, পরেশদা'র কথা ভাবছিলে।

মিনতি একটুও অপ্রতিভ না হইয়া নিতান্ত সহজ ভাবেই বলিল—ঠিকত ধরেছিস রে। পরেশদা' ভাই ভারি মজার লোক।

—দিদি পরেশদা'র প্রাণটা ভারি মজার। কতলোক যে তাঁকে বিরক্ত করে, পরেশদা' কিন্তু সব হাসি মুখেই সহেন। কাকেও না বলেন না। এই যে বন্যায় কাজ করতে গেছেন, আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে দিদি, যদি অসুখ বিসুখ করে।

—না ভাই তা হবে কেন। ভাল কাজ করলে ভগবান তাকে রক্ষা কর্ব্বেন। ছিঃ ভাই অমঙ্গলের কথা বলা কি ভাল?

—সত্য চুপ করিয়া রহিল। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সত্য কহিল—দিদি, বাবা তোমার খোঁজ করছিলেন?

—কেন সত্য?—বলিয়া মিনতি শুধু প্রশ্ন করিল।

—তা জানিনে দিদি।

—তা হলে আমি বাবার কাছে যাই, শুনে আসি কেন

ডেকেছিলেন—বলিয়া মিনতি উঠিয়া গেল। সত্যও নীচে নামিয়া গেল।

নবকান্ত বাবু আরাম কেদারায় হেলান দিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, ও মাঝে মাঝে গৃহিনীকে শুনাইতেছিলেন। অন্নপূর্ণা শুনিতেছিলেন কিন্তু সেদিকে তাঁহার মন ছিলনা, কাজেই মাঝে মাঝে ঢুলুনি আসিতেছিল। এই এই সময়ে মিনতি ঘরে প্রবেশ করিল, তাহাকে দেখিবামাত্র নবকান্ত কহিয়া উঠিলেন—এই যে মা, এসেছ, একটু বস। মিনতি মায়ের কাছ ঘেঁসিয়া বসিল।

সংবাদপত্রখানা নামাইয়া রাখিয়া নবকান্ত মিনতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—মা, কদিন ধরে ভাবছি তোমাকে বলব ; কথাটা হচ্ছে এই যে ডাক্তারেরা তোমাকে পড়তে মানা করছেন।

মিনতি কাঠের মতন বসিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। নবকান্ত জানিতেন যে ডাক্তারদের এইরূপ অভিমত সে পছন্দ করিত না, কাজেই তাঁহাদের অমত সত্বেও সে আপনার মতে চলিতেছে বলিয়াই তার লেখাপড়া বন্ধ হয় নাই।

নবকান্তও একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—তাহলে কি বল মা ? মিনতি উত্তর দিতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তাহার মাতা কহিলেন—ও আর কি বলবে ? আগে শরীর ত পরে লেখাপড়া। শরীরই যখন ভেঙ্গে আসছে তখন পড়বে কে ?

মিনতি পিতার দিকে তাকাইয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিল—তাহলে কি করব বাবা ?

নবকান্ত তেমনি ধীরভাবেই উত্তর দিলেন—ঐটেই মস্তবড় কথা। তবে ডাক্তারেরা বলছেন যে ৪।৫ মাস বিশ্রাম দেওয়া দরকার হয়েছে, তারপরে তোমার শরীর গতিক দেখে তাঁরা আবার বিবেচনা করে দেখ্‌বেন যে লেখাপড়া তোমার সহ্য হবে কিনা।

তা আর দেখবার দরকার হবে না, বাবা,—আমি আর পড়ব না। তবে পূজোর ছুটির ত আর বেশী দিন নেই, এই কটা দিন কলেজে যাই—পূজোর পর আর যাব না। যদি শরীর ভাল হয় তাহলে তাঁরাত আমাকে কাজ করতে দেবেন ?

তোমার কাজ করবার দরকার কি মা ?

বাবা, সংসারে কি সত্যিই আমার কোন কাজ নেই ? আমার জীবন কি তবে লম্বা একটানা একটা ছুটি মাত্র !

কন্যার স্বরে অভিমান, স্নেহার্দ্র পিতৃহৃদয় স্পর্শ করিল। তিনিস্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন—শরীরটা একটু শুধরে নাও, মা, তারপরে যা ভাল বোঝ তাই-ই-করো. আমি তোমার কখনও বাধা দিই নাই—এখনও দেব না।

মাতা এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, এইবারে তিনি উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—শোন একবার কথা, উনি কাজ করবেন। ওরে ডাক্তারেরা তোকে লেখা পড়া ছাড়াচ্ছে, কাজ করাবার দায়ে নাকি ? কাজ কাজ করে একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌লি যে, এ সেই পরেশ ছোঁড়ার পরামর্শ আমি দিব্যি করে বল্‌তে পারি। কেনরে বাপু তোর অভাব কিসের ?

অভাবের জন্য কাজ নয়, কাজ স্বভাবের জন্য। হচ্ছিল আমার বাবার সঙ্গে কথা তুমি খামাখা মাঝে পড়ে গোলমাল বাধাও কেন। আর পরেশদা' তোমার কি করেছে যে তাকে বিষ নজরে দেখ। পরেশদা' যেচে পড়ে কাউকে কোন কথা বলেনা এটা জেনে শুনেও তুমি তাঁর ঘাড়ে দোষ দিতে যাও ? তোমার জন্যেইত সে এ বাড়ীমুখো হতে চায়না —অমন একটা ভাল ছেলে তুমি তার কদর বুঝলে না ?

শুন্‌লেত মেয়ের কথা। একেবারে ফোঁস করে উঠ্‌লেন। আমি আর এমন কি বলেছি যে তোর গায়ে ফোস্কা পড়ে। যা দেখি না বলে থাক্‌তে পারিনে তাই বলি। ভালর জন্যই বলি। ওগো চোখ বুজে চুপ করে বসে রইলে যে, মেয়ের কাণ্ড-কারখানা দেখ্‌লেত ?

মা, তুমি কি বল্‌ছ—নিজের মেয়েকে তুমি চেন না ?

কি আর বলব বাছা—যা বলবার কর্ত্তাকে ত বলে রেখেছি। আগে হতে সাবধান হলে এতদূর কি গড়াত ?

মা হয়ে মেয়েকে অপমান করতে তোমার একটু বাধ্‌লনা, মা—বলিয়া মিনতি ঝড়ের মতন ঘর হইতে চলিয়া গেল।

গৃহিনী আপনার মনে বিড়বিড় করিতে লাগিলেন। নবকান্ত স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

নারীজীবন গঠন *

[শ্রীবিরজাসুন্দরী দেবী]

আমরা নারীজাতি, আমরাই নরের জননী ইহা আমাদের কম সৌভাগ্য, কম গৌরবের কথা নহে। তবে আমরা কম কিসে? যে মহামাতৃশক্তির অংশে আমাদের জন্ম, আমাদের বুকে সেই শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে। শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি আমরা মেয়ে শুধু ঘরকন্যার কাজ ছাড়া আর কোন কাজে লাগিনা, আমরা নিতান্ত অবলা আমাদের সাহস শক্তি কিছুই নাই এবং তাহা হওয়াও আমাদের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক। এই জন্মগত সংস্কারজনিত আমরা এত খাটো হইয়া রহিয়াছি যে ২।৪ খানা ভাল সাড়ী এবং কয়েকখানা গহনাই আমাদের জীবনের মূল্য বলিয়া মনে করি এবং ইহা যার নাই তিনিও মনে করেন তাঁর নারীজন্ম এবং জীবন বৃথা। এজন্য আমাদের দেশের পুরুষগণ যে দায়ী তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা আমাদিগকে অশিক্ষিতা করিয়া রাখিয়া, আমাদিগকে শুধু বিলাস বাসনা পরিতৃপ্ত করিবার সামগ্রী মনে করিয়া অবমাননার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন বলিয়াই আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা এবং এই মাতৃজাতিকে শক্তিহীনা করিয়াই আজ তাঁহারাও বলবীর্য্য হারাইয়াছেন। নতুবা আমাদের দেশেই গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী প্রভৃতি কত বিদুষী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলার ন্যায় কত সতী, অহল্যাবাঈ, দুর্গাবতী, কর্ম্মদেবীর ন্যায় কত শত শত বীররমনী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? সাধারণ লোকের ত ইতিহাস থাকেনা। তাহারা নিরবে ফুটিয়া নিরবে ঝরিয়া যায়। এখনও যে উক্ত প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলাগণের ন্যায় দুই চারটী নারীরত্ন এই ভারত ভূমিতে নাই তাহা নহে তবে আমাদের দেশে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষিতা স্ত্রীলোক নাই বলিলেই হয়, উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও তেমন একটা শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। আমরা অনেকেই শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগের দুই চারখানা পাতা উল্টাইলেই নিজকে নিজে এত বড় করিয়া তুলি যেন কত বুঝি, কত জানি, কত শিখিয়াছি—একবার ভুলিয়াও ভাবিনা আমাদের উপর সংসারের কত কঠিন, কত দায়িত্বপূর্ণকাজ অর্পিত হইয়াছে এবং আমাদের শিখিবার জানিবারও কত রহিয়াছে।

গৃহীর যে ধর্ম্ম তাহাই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম। এই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নারীজাতির দ্বারাই পরিচালিত, পরিস্ফুটিত, ও সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই ধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য আমরা সর্ব্বতোভাবে পুরুষদের সাহায্যকারিনী বলিয়াই আমাদের নাম সহধর্ম্মিনী। এই সহধর্ম্মিনী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইলে আমাদের বাল্যকাল হইতেই সহিষ্ণুতা, সেবা, পরোপকার, অতিথি সৎকার, সত্যের আদর, লজ্জা, বিনয়, ক্ষমা, সন্তান পালন প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ শিক্ষাকরা উচিত। অধুনা এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট পুস্তক বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু কাজ করিয়া দেখাইলে বা কাজ করাইলে বালক বালিকাদের যেমন শিক্ষা হয় শুধু পুস্তক পাঠে তেমন শিক্ষা হয় না।

সসর্গদ্বারা ভালহউক, মন্দ হউক সকল কাজই অতি সহজে শিক্ষা হইয়া থাকে। আমি নিজে সেবা পরায়ণ হইলে আমার সন্তানগণও তাহাই শিখিবে; আর আমি যদি ভোগবিলাসপরায়ণা হই, আমার সন্তানগণও তাহাই শিখিবে। এইজন্য পূর্ব্বকালে শৈশবেই ছেলেরা ভোগবিলাসপূর্ণ রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া অতি সামান্য ভাবে গুরুগৃহে আসিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া কষ্টসহিষ্ণু হইত এবং সৎসঙ্গ সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইত, তারপর শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গোড়া শক্ত করিয়া সংসারে প্রবেশ করিত।

* তেওতা-মহিলা-সভায় পঠিত।

মেয়েরা গৃহে পিতামাতার নিকট থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা এবং গৃহকর্ম্ম, সেবাধর্ম্ম শিক্ষা করিত। (অতিথি সৎকার সেবা ধর্ম্মের মধ্যেই পরিগণিত এবং ইহা গৃহীর প্রধান ধর্ম্ম।) সেকালে বাল্যবিবাহ ছিলনা, মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইত। পিতামাতা বিবাহ দিলেও উপযুক্ত পাত্র ভিন্ন যার তার হাতে কন্যা সমর্পন করিয়া "কন্যাদায়" হইতে উদ্ধার হইতেন না। আর মেয়েদের ১০।১২ বছর বয়সেই কথায় কথায় বুঝাইয়া দেওয়া হইত না যে তাহারা একটী সংসারের সুগৃহিনী হইবার উপযুক্তা হইয়াছে। তখন মেয়েদের (উচ্ছৃঙ্খলতা নয়) স্বাধীনতাছিল, এবং গৃহেই শিক্ষার বেশ সুবিধা ছিল, এখনকারমত ছেলেমেয়েদের যত রকম কু-শিক্ষার আড্ডা স্কুলে কলেজে পাঠাইয়া পিতামাতা নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। তখনকার শিক্ষা ছিল প্রকৃত মানুষ তৈরি করিবার জন্য, আর এখনকার শিক্ষা হইয়াছে, ছেলে মেয়ে-দিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-সাগর উত্তীর্ণ করাইবার জন্য। এখনকার শিক্ষা অর্থকরী।

ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে মহান্ বটবৃক্ষের জন্ম, আমরা ক্ষুদ্র হইলেও আমাদের গর্ভেই যত মহাপুরুষ, বীর, কর্ম্মী, জ্ঞানী ধার্ম্মিক লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আবার আমাদের গর্ভেই মিথ্যাবাদী চোর, জালিয়াত, বাটপার, বদমাইস ও জন্মিতেছে। মায়ের গুণেই সুপুত্র এবং মায়ের দোষেই কুপুত্র জন্মিয়া থাকে। মাতা শত কর্ম্মের মধ্যেও সন্তানদিগকে সর্ব্বদা কাছেকাছে, চক্ষেচক্ষে রাখিবেন এবং সত্য কথা বলিতে সৎকাজ করিতে উৎসাহিত করিবেন। কোন্‌টা ভাল কাজ, কোন্‌টা মন্দ কাজ তাহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিবেন। আর খারাপ ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মিশিতে দিবেন না।

হিংসা আমাদের প্রধান শত্রু, পুরুষ হইতে আমরা অধিকতর হিংসুক, সেইজন্যই যত গৃহ-বিচ্ছেদ দেখা যায়, আমাদের দ্বারাই তাহার অধিকাংশ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এবং আমাদের কাছেই ছেলে মেয়েরা অতি শিশুকালেই হিংসাটা শিখিয়া ফেলে। বালক, বালিকাদের হাতে একটী ভাল খাবার জিনিস দিয়া অনেক জননী বলিয়া থাকেন "এই খানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খাইয়া ফেল্, কেহ যেন না দেখে।" আবার কোন জননী একটু সামান্য জিনিস হাতে দিয়াও বলিয়া দেন—সকলে ভাগ করিয়া খাও।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, অতি সামান্য কারণেও মাতার নিকট হইতে উদারতা ও হিংসা দুইরকম জিনিসই ছেলেমেয়েরা শেখে। প্রথমোক্ত বালকগণ যখন বড় হইয়া বিদ্যা শিক্ষার জন্য নানা দেশীয় নানা জাতীয় বালকদের সঙ্গে একত্র বাস করিতে থাকে তখন এই সংকীর্ণতা অনেক কমিয়া যায়, কিন্তু বালিকাদের আর তাহা হয় না। তাহারা শ্বশুর গৃহে যাইয়া শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে এবং তাহার ফলে স্বামী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজন, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন দাস দাসী কাহাকেও সুখী করিতে পারেনা এবং নিজেও সুখী হইতে পারে না। আবার এই শেষোক্ত বালক বালিকাগণ শৈশবেই মাতার নিকট যে সামান্য উদারতাটুকু শিক্ষা করিয়াছিল তাহার ফলে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অহিংসা, স্নেহ, দয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া উঠিল। শিশুদের পক্ষে এই মাতার শিক্ষা মূল হইলেও ইহার সঙ্গে আবার সৎসঙ্গ চাই নতুবা কু-সঙ্গে কু-চর্চ্চায় সং-বৃত্তিগুলি ক্রমে মলিন হইয়া, বীরের কোষবদ্ধ অব্যবহৃত অসির ন্যায় নষ্ট হইয়া যায়। বালক বালিকাগণ যাহাতে মিথ্যা বলিতে না শিখে সেজন্য তাহাদের প্রতি মাতার সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং নিজেরা যাহাতে কখনও উঁহাদের নিকট মিথ্যা না বলি সেজন্যও বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। আমরা মিথ্যা না বলিলে এবং মিথ্যা কথার অশেষ দোষ সন্তানগণকে বুঝাইয়া দিলে তাহারা নিশ্চয়ই মিথ্যাকে ঘৃণা করিতে শিখিবে। মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যস্ত হইলেই বুঝিবে উহারা চুরি করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। এই চুরিও মাতার দোষেই বালক বালিকাগন শিখিয়া থাকে। প্রথম প্রথম হয়ত কাহারো গাছ হইতে একটা সুন্দর লেবু বা আতা, কুল, পেয়ারা ইত্যাদি চুরি করিয়া আনিয়া মাতার নিকট দিল। বালক বালিকাগণ যদিও লোভের বশীভূত হইয়াই আনিয়াছে তবু বুঝিতে পারেনাই যে ইহাকেই চুরি করা বলে এবং ইহা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। মাতাও হয়ত এই অন্যায় কার্য্যের ফল এবং ইহাকেই যে চুরি করা বলে তাহা না বুঝাইয়া বলিলেন "কেহত দেখেনাই ?" তাহারা

তখন বুঝিতে পারিল পরের জিনিস আনাতে কোন দোষ নাই, কেহ না দেখিলেই হইল। তখন হইতে গ্রামে বেশ সাবধানতার সহিত চুরি করিতে শিখিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে একটী পাকা চোর হইয়া উঠিল। তখন চুরিটা তাহাদের এমনি লোভনীয় হয় যে কাহারো কোন ভাল জিনিস দেখিলেই চুরি না করিয়া পারেনা। তখন তাহাদের অসাধ্য কোন প্রকার কু-কাজই থাকিতে পারেনা। এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ একবারে অন্ধকারে আবৃত হইয়া উঠে আর যাহারা শৈশবেই সত্যকথা বলিতে শিখে, তাহারা কোন প্রকার অন্যায় কাজ করিতে পারেনা এবং হাজার বিপদে পড়িলেও মিথ্যার সাহায্যে তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে চায়না। এক সত্যের সঙ্গে সমস্ত সৎবৃত্তিগুলি মিলিত হইয়া তাহাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি আমরা পুরুষদের নিকট উপেক্ষনীয় হইলেও আমাদের নিকট আমরা উপেক্ষণীয় নই। আমাদের হাতেই ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের ভার এবং তাহারাই আমাদের সমাজ ও দেশের উন্নতির মূল। এখন আমাদের এই কথাটী বিশেষভাবে বুঝিতে হইবে। আমরা কিরূপ হইলে আমাদের সন্তানগণ প্রকৃত মানুষ নামের যোগ্য হইয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে এবং আমরাই প্রকৃত নরের জননী বলিয়া গৌরবান্বিতা হইতে পারি।

[আবর্ত্ত]নী গতি

বা

Revolutionary movement.

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

শিবলোক

মহেশ্বর রিপোর্ট রুমে প্রবেশ করে দেখলেন একরাশ দৈনিক রিপোর্ট তাঁর আদেশের অপেক্ষায় টেবিলের উপর পড়ে আছে। অন্য দিনের চেয়ে সে দিন একটু বেলা হয়েছিল, মেজাজটাও তত ভাল ছিল না। একখানা গোপনীয় রিপোর্টে দেখলেন পৃথিবী অতিবেগে অষ্টপ্রহর আবর্ত্তন করছেন, তাতে দিনটা রাত হয়ে যাচ্ছে, রাতটা দিন হয়ে যাচ্ছে, শীতটা গ্রীষ্ম হয়ে যাচ্ছে, গ্রীষ্মটা বর্ষা হয়ে যাচ্ছে, আরও যা সব হচ্ছে তাকে বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বিশ্ববাসী সকলে বলছেন তাঁরা জানতেন পৃথিবী স্থিরা, অচলা, সর্ব্বংসহা। এখন তাঁরা শুনছেন যে তাঁদের সে ধারণা ভুল, পৃথিবী মহা অস্থিরা এবং চঞ্চলা। এখন তাঁদের ইচ্ছা যে মহেশ্বর পৃথিবীর এই আবর্ত্তনী গতির (revolutionary movement) প্রতি একটু সতর্ক দৃষ্টিপাত করেন। কারণ, এতে পৃথিবীর বিদ্রোহিতাই প্রকাশ পাচ্ছে এবং এর পরিণাম হবে শান্তি ও শৃঙ্খলার পর্য্যাবসান।

মহেশ্বর তার ওপর তৎক্ষণাৎ হুকুম লিখলেন—

"যে হেতু আমার গোচর করা হয়েছে যে পৃথিবী বিদ্রোহসূচক আবর্ত্তনী গতি (revolutionary movement) করছেন এবং তাতে সাধারণ স্থিরতা (public tranquility) ভঙ্গ হতে পারে, অতএব

হুকুম হল

তাঁর এই আবর্ত্তনী গতি বন্ধ করে দেওয়া হবে না কেন পৃথিবী তার কারণ দর্শাবেন এবং অপাততঃ ছমাস কাল আবর্ত্তন (revolution) বন্ধ রাখবেন।

আজ মীনরাশিস্থ ভাস্করের একাদশ দিবসে মহেশ্বর ধর্ম্মাধিকরণের মোহর ও আমার স্বাক্ষর যুক্ত করে এই আদেশ দেওয়া হল।

(সহি) শ্রীমহেশ্বর

নন্দী যথারীতি হুকুম জারি করে রিটার্ণ দিলেন।

বৈকুণ্ঠ

নারদ বিষ্ণুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছেন। স্বাগত প্রশ্নাদির পর বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করলেন পৃথিবী-সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি? শুনতে পাচ্ছি পৃথিবী না কি আবর্ত্তন ছেড়ে অচলতা অবলম্বন করেছেন?

নারদ। হাঁ, কথাটা সত্যই। আমি বিমানপথে আসতে আসতে আজই দেখলাম পৃথিবী আকাশপথে অচলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জিজ্ঞাসা করায় বললেন "মহেশ্বরের আদেশ।" আদেশ যাঁরই হক ফলটা বড় অনিষ্টকর হয়েছে। আবর্ত্তন বন্ধ হওয়াতে একদিকে অবিরাম প্রখর সূর্য্যকিরণ, অপর দিকে রাত্রির শেষ নাই, ঋতুর পরিবর্ত্তন নাই, উদ্ভিদ রাজ্যে আর সে হরিৎশোভা নাই, সব মরুভূমি হয়ে গিয়েছে, জীবরাজ্যে যথোচিত জল-বায়ু আলোর অভাবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হয়েছে। শস্য উৎপন্ন হচ্ছে না, জলাশয় সব শুকিয়ে যাচ্ছে। এক কথায়, দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের স্বর্গরাজ্য যেমন প্রণষ্টলক্ষীক হয়েছিল, মহেশ্বরের আদেশে মর্ত্ত্যরাজ্য তেমনি হয়েছে। পৃথিবী যেন স্থিতির কাল শেষ করে প্রলয়ের কালে প্রবেশ কচ্ছেন। শুনছি পৃথিবীর অধিবাসীরা ব্রহ্মার কাছে এর জন্য আবেদন করেছে।

বিষ্ণু বললেন "আমি স্থিতি-কর্ত্তা, পালন-কর্ত্তা, আমাকে কিছুমাত্র না জানিয়ে পৃথিবীর এরূপ করা ভাল হয় নি। আর ব্রহ্মাকে বা আমাকে জিজ্ঞাসা না করে মহেশ্বরেরও এমন হুকুম দেওয়া উচিত হয় নি। যা হক, এখন কি কর্ত্তব্য আদেশ করুন।"

নারদ। আমি মনে করি প্রথমে একবার পিতামহের সঙ্গে দেখা করুন, তারপর তাঁর মতামত জেনে মহেশ্বরের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্ত্তব্য স্থির করাই উচিত। আপনার মত কি?

। তাই হক।

ব্রহ্মলোক

ব্রহ্মা ধ্যানস্তিমিত লোচনে নতুন নতুন সৃষ্টির কল্পনা কচ্ছেন, এমন সময় সংবাদ পেলেন যে বিষ্ণু ও নারদ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুশল প্রশ্নাদির দ্বারা আপ্যায়িত করে আপন কক্ষে নিয়ে গেলেন।

বিষ্ণু বললেন, "ব্রহ্মণ্, বোধ হয় সংবাদ পেয়েছেন যে পৃথিবী আর আবর্ত্তন কচ্ছেন না, এক স্থানেই স্থির হয়ে, অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাতে আমার পালন কার্য্যের যে কত অসুবিধা ও অনিষ্ট হচ্ছে—।" ব্রহ্মা রেগে রক্তমুখ হয়ে বিষ্ণুকে বাধা দিয়ে বললেন "সে কি? তাও কি কখন হতে পারে? এত কেবল আপনার পালনকার্য্যে বাধা জন্মান নয়, এ যে আমার সৃষ্টিবিধির বিপরীতাচরণ করা! পৃথিবীর এমন মতি হল কেন?"

নারদ বললেন "ঘটনাটি সত্যই। আমি প্রত্যক্ষ দেখে এসেছি। আমি পৃথিবীকে এর কারণও জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম। পৃথিবী বললেন 'মহেশ্বরের আদেশ। মহেশ্বর কেন এমন আদেশ দিলেন সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না।

বিষ্ণু। মহেশ্বরের আশুতোষত্বটা ক্রমে দোষের হয়ে পড়ছে। কে বুঝি গিয়ে আবেদন নিবেদন করেছে যে পৃথিবীর আবর্ত্তনে তার অনিষ্ট হচ্ছে, তাই তার দুঃখে দুঃখিত হয়ে, তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে, পৃথিবীর গতি বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি ত কতবার কত অসুরকে এমনি করে বর দিয়ে দেব মানবকে বিপন্ন করেছেন। এও সেই রকম একটা কিছু হবে।

ব্রহ্মা তাঁর কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন "এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ এসেছে?" কর্ম্মাধ্যক্ষ একখানা আবেদনপত্র এনে দেখালেন। তাতে এইটুকু জানা গেল যে পৃথিবীর জন কয়েক ঐশ্বর্য্যশালী অধিবাসী জানিয়েছে যে পৃথিবীর দীনদরিদ্রেরা পৃথিবীর আবর্ত্তন ঘটিয়ে সাধারণ স্থিরতা (public tranquility) ভঙ্গ কচ্ছে, তাতে শান্তি-শৃংখলা পর্য্যুদস্ত হয়ে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে এবং এই সংবাদ পেয়েই মহেশ্বর পৃথিবীর আবর্ত্তন বন্ধ করবার আদেশ দিয়েছেন এবং নন্দী সেই আদেশ পৃথিবীকে জানিয়ে এসেছে। কাযেই স্থির হল মহেশ্বরের কাছে গিয়ে সমস্ত বৃত্তান্তটা না জেনে কিছু করা উচিত নয়। অতএব বিলম্ব

না করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবর্ষি নারদ শিবলোক যাত্রা করলেন।

শিবলোক

অভিবাদন-আপ্যায়ন বিনিময়ের পরে আসল কথাটা আলোচনার জন্য উপস্থিত হল। মহেশ্বর বললেন "আমি ত এর কিছুই জানি না।" দেবর্ষি বললেন "পৃথিবী ত আমাকে বললেন আপনারই আদেশে তিনি স্থিরা অচলা হয়ে আছেন। নন্দী গিয়ে আদেশ শুনিয়ে এসেছেন।"

মহেশ্বরের তথাপি সে কথা স্মরণ হল না। নন্দীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করায় নন্দী সব বৃত্তান্ত বললেন এবং কাগজ পত্র এনে দেখালেন। মহেশ্বর বললেন "আমি স্মরণশক্তির উৎকর্ষের জন্য কখনই বিখ্যাত নই। যা হক বড় দুঃখিত হচ্ছি যে এমন সম্পূর্ণরূপে বিষয়টা ভুলে গিয়েছি।"

ব্রহ্মা বললেন "আমার বিধান বুঝতে না পেরেই লোকে এই রকম ভুল করে। চঞ্চলতা, অস্থিরতা, গতি, আবর্ত্তন —এ সকল প্রকৃতির প্রত্যেক অণু পরমাণুর ধর্ম্ম। পৃথিবীর আবর্ত্তন চিরকালই আছে, তবে মানব সমাজের অশিক্ষিত অবস্থায় লোকে তা জানত না, মনে করত স্থিরা। পৃথিবী স্থিরা হলে যে অবস্থাটা হয় তা দেবর্ষি স্বচক্ষে দেখেছেন। "প্রণষ্টলক্ষীক" এই যে একটি কথা দেবর্ষি ব্যবহার করেছেন, এতেই সমস্ত অবস্থা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। বিজ্ঞান প্রচার কচ্ছে যে বিশ্বের প্রত্যেক অণু পরমাণু চঞ্চল, গতিশীল। চাঞ্চল্যেই শক্তির উৎপত্তি, শক্তিতেই সকল কার্য্যকরিতা—সকল প্রকার আবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন, বিবর্ত্তন। মানব সমাজেও এই চাঞ্চল্য, এই শক্তি, এই পরিবর্ত্তনশীলতা বিদ্যমান। যাঁরা এই চাঞ্চল্য, এই শক্তি, এই পরিবর্ত্তনশীলতা সহ্য করতে পারেন না, দেখতে পারেন না, তাঁরা সমাজের মৃতদেহ দেখতে চান। কোন কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী বিজ্ঞজন বলেন যে সামাজিক কাযগুলি যদি evolution এর নিয়ম অনুসারে হতে দেওয়া যায়, তা হলে আর revolution এর আবশ্যক হয় না। তাঁরা evolution বা revolution কোন তত্ত্বই ভাল করে দেখেন নি বা বোঝেন নি। তাঁরা বৈজ্ঞানিক না হয়েই বিজ্ঞানের ভাষা ব্যবহার করেন। তাতেই বেশ বুঝতে পারা যায় যে evolution সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যেমন অস্পষ্ট, revolution সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানও তেমনি কুয়াশাচ্ছন্ন। আঘাত ও আঘাতজনিত ক্লেশ ব্যতিরেকে কিছুরই উৎপত্তি হয় না। উদ্ভিদ্ জগতে বীজকে বিদীর্ণ না করলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না। ডিমের আবরণ বিদীর্ণ না করলে পাখীর জন্ম হয় না, স্তন্যপায়ী জীবের শিশু মাতাকে অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে জরায়ু ভেদ করে ভূমিষ্ঠ হয়। এ সকল evolution, revolution নয়, কিন্তু তা বলে আঘাত বা আঘাতজনিত ক্লেশশূন্য নয়। তা ছাড়া, অভিব্যক্তির ক্রমও নিরবচ্ছিন্ন সহজ উন্নতির ক্রম নয়। অভিব্যক্তির নিয়মেই কত উদ্ভিদ্, কত জীব, নির্ব্বংশ হয়ে গিয়েছে। অভিব্যক্তির অর্থ ঠিক ক্রমবিকাশ নয়, ক্রমনাশও। নিরবচ্ছিন্ন উন্নতিই এর নিয়ম নয়, এর মধ্যে সমভাবে অবস্থিতি এবং অধোগতিও আছে। এরূপ কল্পনা করাই ভুল যে অভিব্যক্তির একটা নিয়ম আছে বলেই মানব সভ্যতা অনবচ্ছেদে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে থাকবে * আর আবর্ত্তন হলেই মানব সভ্যতার রসাতলে, যাওয়া অবধারিত। বিজ্ঞানের উপদেশ এই যে অভিব্যক্তি ও evolution যেমন প্রকৃতির নিয়মাধীন, আবর্ত্তন ও revolution তেমনি প্রকৃতির নিয়মাধীন।

হঠাৎ ব্রহ্মার মনে হল তাঁর শ্রোতারা তাঁর ছাত্র নন্ এবং তিনিও তাঁদের অধ্যাপক নন। তিনি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললেন "দেখুন আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে আপনাদের কাছে বিজ্ঞানের বক্তৃতা আরম্ভ করে দিয়েছি। আপনারা ত এসকল বিষয়ের পারদর্শী। আপনাদের কাছে এর মধ্যে

* I have already said that evolution is not a law of progress in the moral sense of the word, and also that the general fact of evolution is consistent with prolonged stagnation and even degeneration in particular cases. * * * * It must, therefore, not be imagined that because there is a "law of evolution" civilization is bound to advance from height to height—The Principles of Evolution by Joseph McCabe page 229.

আর নতুন কিছু নাই। মহেশ্বর যাকে পৃথিবীর বিদ্রোহ বলে মনে করেছিলেন সেটা বিদ্রোহ নয় আবর্ত্তন মাত্র *।

পরদিন মহেশ্বর তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করলেন। নন্দী সে হুকুমও পৃথিবীকে গিয়ে শুনিয়ে এলেন। পৃথিবীর অধিবাসীরা মহা আনন্দে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রার্থনা করলে—

মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বংতরিক্ষং।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যংতো অন্বেনং চরেম॥

শস্যসমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোকসমূহ, জল সমূহ, ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্র-পতি আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউন, আমরা অহিংসিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিব।

ঋগ্বেদ ৪।৫৭।৩

বীরপুরুষ †

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

সেণ্ট্ গঙ্গালভোর সুবৃহৎ ধ্বজাগুলি এরই মধ্যে বিস্তীর্ণ অঙ্গনে আনা হয়েছে। মন্দ বাতাসে সেগুলি গভীরভাবে সঞ্চালিত হচ্ছিল। ধ্বজাবাহকগণের বিপুল শালপ্রাংশু চেহারা, আরক্ত বদনমণ্ডল, আর ভার বহিবার ফলে কাঁধ-গুলো ফুলে উঠেছে। ধ্বজাগুলো নিয়ে তারা রঙ্গ করছিল।

রাহুসানিদের জয় করে মাস্‌কালিকোর অধিবাসীরা পূর্ব্বের চেয়ে আরও বেশী ঘটা করে আশ্বিনের মহোৎসবে মেতেছে। ধর্ম্মের জন্য একটা অদ্ভুত আসক্তি সকলেরি মনে জেগে উঠেছে। সারা দেশটা তদানীন্তন শস্য-সম্পদ তাদের বংশ-দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করেছে। রাস্তার উপর প্রতি বাতায়নে নারীরা তাদের বিবাহের আবরনী আস্তৃত করে রেখেছে। পুরুষেরা গৃহদ্বারগুলি দ্রাক্ষালতার মালায় ও চৌকাঠগুলি ফুলের স্তবকে সাজিয়ে দিয়েছে। রাস্তার উপর বাতাসও যত বয়, ততই চারিদিকে একটা বিপুল নয়নবিমোহন তরঙ্গের উল্লাস জনমণ্ডলীকে মত্ত করে তোলে।

গির্জ্জা থেকে শোভাযাত্রা নানাছন্দে এঁকে বেঁকে বেরিয়ে সেই বিস্তীর্ণ আঙিনায় এসে পড়লো। বেদীর উপরে আটজন বিশিষ্ট নিযুক্ত বাহক সেণ্ট্ গঙ্গালভোর পবিত্র মূর্ত্তিটী তোলবার জন্য আদেশ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। ......কাজটা বিশেষ গুরু জেনে তারা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মাথাটা তাদের যেন একটু গুলিয়ে গেছে বলে মনে হয়। গায়ে তাদের বিষম অসুরের বল, চোখে তাদের ধর্ম্মধ্বজীর জ্বালা, নারীর মত কাণে তাদের সুবৃহৎ স্বর্ণ কুণ্ডল। দেহের প্রচণ্ড শক্তিটা একটু ঝালিয়ে নেবার জন্য তারা মাঝে মাঝে নিজের হাতের কব্জি ও বাজুগুলা পরীক্ষা করে দেখছিল, কখনো বা লুকিয়ে চেয়ে পরস্পরে হাসছিল।

বংশ-দেবতার মূর্ত্তিটী প্রকাণ্ড ও খুব ভারী,—কাংস্য ব্রোঞ্জে নির্ম্মিত, হাতদুটী ও মুণ্ডটী রৌপের, রংটা একটু কালো।

মাত্তালা চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"তৈরি হও!"

সর্ব্বত্রই লোকগুলা এ দৃশ্য দেখবার জন্য হুটোপাটি করছে

* "Why that is a revolt" said poor Louis. (XVI of France)
"Sire" answered Liancourt "It is not a revolt, it is a revolution"
French Revolution by Carlyle Book V, chap VII, p. 146.

† গেব্রিয়েল্ ডা' নুন্‌ট্‌জিয়ো হইতে।

লাগলো। বাতাসের প্রতি উচ্ছ্বাসে গির্জ্জার বাতায়নগুলি যেন গর্জ্জন করতে লাগলো। গির্জ্জার মধ্যস্থলটী ধূপধুনার গন্ধে নিবিড় হয়ে উঠেছে। এক একবার বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর আলাপ শোনা যাচ্ছে। লোক-সংঘের সেই প্রচণ্ড উন্মাদনার মধ্যে আটজন বাহকের প্রাণে একটা গভীর ভক্তিভাব জেগে উঠেছে। হস্ত প্রসারিত করে তারা প্রস্তুত হতে লাগলো।

মাস্তালা চেঁচিয়ে বলে উঠলো—রাগ! দুই! তিন!

সব বাহকেরাই একেবারে একযোগে মূর্ত্তিটীকে সিংহাসনে তোলবার চেষ্টা করলে। কিন্তু প্রাণান্তকর তার ভার—মূর্ত্তিটী বামদিকে একটু হেলে পড়লো। বাহকেরা এখনও তার তলার দিকটা বেশ বাগিয়ে শক্ত করে ধরতে পারেনি। বাধা দোবার চেষ্টায় তারা কুঁজো হয়ে পড়লো। রিগাজিয়ো ও জিয়োভানির গায়ে সকলের চেয়ে জোর কম, বেটক্করে পড়ে তারাত ছেড়েই দিলে। তখন মূর্ত্তিটী বিপুলবেগে একপাশে কাৎ হয়ে পড়ল। লুমালিডো চীৎকার করে উঠলো।

হুঁসিয়ার, ভাই, হুঁসিয়ার! বংশ-দেবতার এই আসন্ন-বিপদে সমগ্র জনমণ্ডলী গর্জ্জন করে উঠলো। অলিন্দ থেকে একটা গুরুভার পতনের শব্দ আসতেই জনতার চীৎকার একেবারে থেমে গেল।

লুমালিডো হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে,—তার দক্ষিণ হস্তটী সেই ব্রোঞ্জ মূর্ত্তির নীচে পড়ে গেছে। এই রকম করে বসে সে তার ভয় ও বেদনাভরা চোখ দুটী হাতের উপর নিবদ্ধ করে আছে—হাত আর কিছুতেই সরাতে পারা যায়না, যাতনায় মুখমণ্ডল কুঞ্চিত, কিন্তু সে মুখে কোনো কথা নেই। সিংহাসনের উপর শোণিত-বিন্দু।

সেই ভারটী তোলবার জন্য তার বন্ধুরা সকলে মিলে আর একবার চেষ্টা করলে। কাজটা কিন্তু বড়ই বিপদের। যন্ত্রণার তাড়নায় লুমালিডো মুখ সংকুচিত করে নিলে—নারী দর্শকেরা ভয়ে শিউরে উঠলো।

অবশেষে মূর্ত্তি তোলা হলো, লুমালিডো শোণিতস্রাবী, বিকৃত, পিষ্ট হাতখানি বার করে নিলে। গির্জ্জার দুয়ারের দিকে তাকে হটিয়ে দিয়ে সব লোকেই বলে উঠলো—এখন ঘরে যাও, ঘরে যাও!'

একটী নারী তার অঞ্চল-প্রান্ত ছিঁড়ে তাকে ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধতে দিলে, কিন্তু লুমালিডো তা নিলে না। মুখে তার ভাষা নেই. মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কোলাহল-মগ্ন ও বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী-কারী একদল লোকের পানে সে অপলক নয়নে চেয়ে আছে।

'এবার আমার পালা!'

'না—না! আমার!'

আরে না! আমায় দাও!

লুমালিডোর শূন্য স্থানটী গ্রহণ করবার জন্য তিনজনে দ্বন্দ্ব বেধে গেল।

সে এই প্রতিদ্বন্দ্বিগণের কাছে এগিয়ে এল। নিষ্পেষিত হাতখানি পাশে ঝুলিয়ে অন্য হাতখানি বাড়িয়ে একটু পথ করে নিয়ে সে শুধু বললে—

ও যায়গা আমার।

সে তার বামস্কন্ধ বংশ-দেবতাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য বাড়িয়ে দিলে। ভীষণ মনের বল নিয়ে, দন্তে দন্তাবমৃষ্ট করে, সে তার বেদনা দমন করে রাখলে।

মাস্তালা তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—তোমার কি করবার মতলব বল দেখি?

সে বললে, সেণ্ট গমালিডো আমায় যা আদেশ করবেন।

সকলের সঙ্গে সে হেঁটে চলতে লাগলো। বিস্মিত জনসংঘ দেখে যে সে বেশ চলেছে। ক্ষতটায় রক্ত পড়ছে ও কালো হয়ে আসছে দেখে মাঝে মাঝে কেউ কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—'লু'মা, ব্যাপার কি হে?'

সে জবাব দিলেনা। সে গম্ভীরভাবে এগিয়ে চললো গানের ছন্দে পা ফেলে,—সেই স্ফীত জনতার মধ্যে ও পবন-সঞ্চালিত বিপুল অম্বাবরকের মধ্যে তার মনের ভিতরটাও যেন একটু কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে এলো।

রাস্তার এক কোণে সে হঠাৎ পড়ে গেল। মুহূর্ত্তের গোলমালের মধ্যে বংশ-দেবতাও একবার থামলেন, একটু নড়ে উঠলেন, তারপর আবার অগ্রসর হলেন। মাস্তিয়া স্কাফারোলা লু'মার শূন্যস্থান পূরণ করলে। মূর্চ্ছাচ্ছন্নের পাশে দুজন আত্মীয় এসে তাকে নিকটস্থ একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল।

আনা ডি সেন্‌ট্রজো নামে একজন বৃদ্ধা ক্ষত আরাম করতে খুব নিপুণা। তিনি সেই বিকৃত ও রক্তস্রাবী অঙ্গ-খানা দেখে মাথা নেড়ে বললেন, এর আর আমি কি করবো ?

তাঁর সামান্য জ্ঞানে তিনি কিছুই করে উঠতে পারলেন না। লুমালিডো আত্মসংবরণ করলে, সে কিছুই বললে না। সে বসলো, ক্ষতটার কথা শান্ত হয়ে ভাবতে লাগল। চির-কালের মত অব্যবহার্য্য হাতখানা আড়ষ্ট হয়ে ঝুলতে লাগল—তার হাড়গুলো পর্য্যন্ত ধূলার মত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

দুতিনটে বুড়ো চাষা দেখতে এল। প্রত্যেকে ইঙ্গিতে ও কথায় সেই ভাবই প্রকাশ করলে।

লুমালিডো জিজ্ঞাসা করলে, আমার বদলে দেবতাকে কে বয়ে নিয়ে গেল ?

সকলে বললে, মাত্তিয়া স্কাফারোলা।

আবার সে জিজ্ঞাসা করলে, এখন তারা কি করছে ?

তারা সন্ধ্যা-স্তব গান করছে।

চাষারাও সন্ধ্যা-বন্দনা করবার জন্য বিদায় নিলে। বড় গির্জ্জা থেকে একটা গভীর শব্দ-ঝঙ্কার শোনা গেল।

একজন আত্মীয় ক্ষতের কাছে এক বালতি ঠাণ্ডা জল রেখে বললে, 'তোমার হাতটা এর ভিতর ডুবিয়ে রাখো দেখি। আমাদের ত যেতেই হবে। এস হে আমরা সন্ধ্যা-স্তব শুনিগে।

লুমালিডো একলা রইল। শব্দ-ঝঙ্কার গভীর, গভীরতর হয়ে উঠলো,—সুরও বদলাতে লাগলো। দিনের আলো ক্রমে নিভে এল, পবন-সঞ্চালিত একটা জলপাই গাছের ডালগুলি নীচু জানলায় এসে আঘাত করতে লাগল।

লুমালিডো হাতখানি একটু একটু করে জলে পরিষ্কার করে ফেললে। রক্ত ও অস্থিচূর্ণগুলি ধুয়ে যেতে ক্ষতটা যেন আরও বেশী হয়ে উঠলো। লুমালিডো ভাবলে, একে-বারে অকেজো হয়ে গেছে, একেবারে নষ্ট হয় গেছে ! সেণ্ট্ গঞ্জালুভো, আমি ইহা তোমাকেই নিবেদন করি।

একখানা ছুরি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো। জনহীন পথ,—সব ভক্তেরাই তখন গির্জ্জায় গেছে। গৃহহারা পলায়নপর গরুর পালের মত শরৎ-সূর্য্যাস্তের বিচিত্রবর্ণ মেঘমালা গৃহশীর্ষে ভেসে যাচ্ছে।

মন্দিরের ভিতর সমবেত জনমণ্ডলী বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে তখন কোরাস্ গাইছে। বিপুল জনতা ও জ্বলন্ত বাতিগুলো থেকে একটা গভীর উত্তাপ বেরুচ্ছে। উচ্চ সিংহাসন থেকে সেণ্ট্ গঞ্জালুভোর রৌপ্যময় মূর্ত্তিটি যেন সমুদ্রের মাঝখানে উচ্চ প্রদীপের মত জ্বল্ জ্বল্ করছে। লুমালিডো সেইখানে ঢুকলে। বামহস্তে ছুরিকাটি ধরে সিংহাসনের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে যখন পরিষ্কার কণ্ঠে বললে—সেণ্ট্ গঞ্জালুভো, আমি ইহা তোমাকেই নিবেদন করি—তখন সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপরে সে ডান হাতের কব্জিখানা সেই ভীত জন-মণ্ডলীর চক্ষের সমক্ষেই ধীরে ধীরে কাটতে লাগল। বিকৃতা-কার শোণিত-পরিসিক্ত হাতখানা ক্রমশঃই বিচ্যুত হয়ে এল। মুহূর্ত্তমাত্র ইহা ঝুলে রইলো। শেষে মুদ্রা-দক্ষিণা-পূর্ণ একটী তাম্রপাত্রে বংশ দেবতার পদতলে পড়ে গেল।

রক্তময় থুবড়ো হাতখানি তুলে লুমালিডো স্থিরকণ্ঠে বললে, সেণ্ট্ গঞ্জালুভো, আমি ইহা তোমাকেই নিবেদন করি।

মাতৃনাম

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]
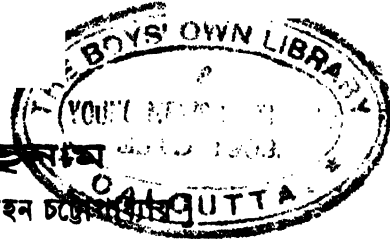
ধার্ম্মিকের এ তীর্থরেণু
গঙ্গাজল এ তৃষ্ণাতুরে,
আর্ত্তজনের রক্ষাকবচ
শ্যামের সুর এ ব্রজের পুরে ;
সম্বল এযে পান্থজনের
সিদ্ধিমন্ত্র যোগাভ্যাসে,
গৃহস্থের এ গীতাধ্বনি
গায়ত্রী এ মন্ত্রপাশে ;
উদ্বোধনের ছন্দ এ যে
শক্তি সাধন জগৎ পরে,
বল্‌রে ও ভাই মধুর বাণী
বল্‌রে মা নাম ভক্তিভরে !
অমার মাঝে পূর্ণশশী
দুঃখদাহত্রিতাপ হরে,
মৃত্যু যাতে শঙ্কা মানে
বল্‌না সে নাম যুক্তকরে ;

খড়্গ এ যে পাপের পরে
পুণ্যজ্যোতিঃ জীবন মাঝে,
বর্ণচারি আচণ্ডালের
কণ্ঠে শিশুর সদাই বাজে ;
প্রেম এ নামে উথ্‌লে উঠে
মুক্তি পায়ে লুটিয়ে পড়ে,
বল্‌রে ও ভাই আকুল প্রাণে
বল্‌রে মা নাম কণ্ঠভরে !
ভক্তজনের কল্পতরু
বর্ম্ম এ যে যুদ্ধমাঝে,
দয়ার নিখুঁত মূর্ত্তিখানি
আহ্বান তার চিত্তে বাজে ;
স্নিগ্ধপাবন প্রাণের বাণী
জীবন মরণ সফল করে,
মাতৃনামের সাধন ব্রতে
বলরে মা নাম ভক্তিভরে ।

চট্টগ্রামে প্রচলিত একটি প্রাচীন রীতি

[শ্রীদয়ানন্দ চৌধুরী]

চরণচুম্বী অনন্ত সাগর-বক্ষে চিরপ্রবাহিতা তটিনী, শ্যামল শস্যক্ষেত্র এবং উত্তুঙ্গ পাহাড়শ্রেণী মনোরম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে যে চট্টগ্রামকে গৌরবময়ী কবিধাত্রী আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছে তাহা নহে পরন্তু আবহমানকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত কয়েকটি কবিত্বপূর্ণ প্রাচীন রীতি এই দেশের গৌরবময়ী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

স্নেহ সতত শঙ্কাশীল। ইহা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রেমাস্পদের বিপদ আশঙ্কা করে এবং তন্নিবারণার্থে নানা ক্রিয়াকাণ্ডের

উদ্ভাবন করিয়া মনের পরিতোষ সাধনে যত্নপর হয়। কোন প্রিয়জনের উন্নতি দেখিলে স্বতঃই মনে হয় বুঝি জগতের অন্যান্য সকলেই তাহার উন্নতিতে ঈর্ষাপূর্ণ হৃদয়ে তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। এই ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টিতে পাছে প্রিয়জনের অমঙ্গল হয় এই ভাবনায় অন্ধ স্নেহ তাহার প্রতিকার সাধনের নিমিত্ত কতকগুলি কাল্পনিক প্রতিষেধক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান একদিকে যেইরূপ কৌতুকাবহ অন্যদিকে সেইরূপ সরল হৃদয়ের অকৃত্রিম স্নেহের পরিচায়ক।

পুত্র, ভ্রাতা বা অন্য কোন পরমপ্রিয় আত্মীয়ের উন্নতিতে কোন পরশ্রীকাতর ব্যক্তি যদি তাহার উপর তোড় বা হোঁয়াড় ফেলিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস হয় তাহা-হইলে চট্টগ্রামের স্থানীয় হিন্দুরা সপ্তাহের মঙ্গলবারে বা শনিবারে উষায় এই তোড় বা হোঁয়াড় পুড়িবার ব্যবস্থা করে। সাধারণতঃ নীচবর্ণের বিধবা রমনীগণকেই এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় এবং তাহারা এই কার্য্যের জন্য পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক দক্ষিণা হিসাবে যৎকিঞ্চিৎ কিছু পাইয়া থাকে।

এই অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দরকার হয়—

(১) যাহার উপর তোড় ফেলা হইয়াছে তাহার বিছানার তল হইতে পায়ের দিকের ও মাথার দিকের কিছু কিছু মাটী। (২) সাতখণ্ড চার মোটীর হাঁড়ি ভাঙ্গা টুক্‌রা (৩) সাতটী লঙ্কা। (৪) সাতটী নারিচপাতা (৫) সাতটী সুতা বীচ। (৬) একটি ঘোড়ার কঞ্চি (একরকম ঘাসের ফুল) (৭) কিছু সরিষা।

অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবার সময় একটী মাটীর কলসীর গলায় সাতগাছা খড় বাঁধিয়া তারপর তাহা জলপূর্ণ করিয়া আনা হয়, আম্রপল্লবে তাহা সাজাইয়া রাখা হয়। একটি সেরী (একসের শস্য ধরে এমন একটী বেতনির্ম্মিত গোলাকার Cylindrical পাত্রের) ভিতর উক্ত দ্রব্যগুলি লইয়া তোড়গ্রস্থ ব্যক্তির মাথার চারিদিকে একবার ঘুরাইয়া লওয়া হয়, পরে একখানা পাথরের থালায় একটি গোবরের conical ঢেলা পাকাইয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। ঐ গোবরের ঢেলাতে তিনখানি কাঠি পুতিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ তিন কাঠিতে তিনখানি নেকড়ার সলিতা তেলে ডুবাইয়া এক একবারে এক একখানি করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। আম্রপল্লবসজ্জিত কলসী হইতে কিছু জল পাথরের থালায় ঢালিয়া দেওয়া হয়, অবশিষ্ট জল ফেলিয়া দিয়া শূন্য কলসীটী ঐ গোবরের ঢেলার উপর এক একখানি সলিতা জ্বলিবার সময় এক একবার 'উবুর' করিয়া ধরা হয়। তখন ঘরের সামনের চালের দুই কোণের এবং পেছনের চালের এক কোণের মোট তিন কোণের শন হইয়া এবং ঐ শনের আঁটি জ্বালাইয়া উক্ত 'উবুর' করা কলসীর উপর ধরা হয়, যখন শন জ্বলিতে থাকে তখন একখানি কাস্ত দিয়া ভস্মিত অংশ কাটা হয় এবং কাটিবার সময় উক্ত বিধবা অনুষ্ঠানকারিনী বলিতে থাকে "মা, বাপ বা অন্য কোন আত্মীয় অজ্ঞানে বা অতর্কিতে যে ইহার উপর তোড় ফেলিয়াছে তাহার সেই পাপমুখ পোড়াইতেছি। যে শত্রু ঈর্ষাপরবশ হইয়া সজ্ঞানে, হাঁটিতে, বসিতে, খাইতে, খেলিতে যে কোন সময়ে ইহার উপর তোড় ফেলিয়াছে তাহার বিষমাখা জিহ্বা কাটিতেছি; তাহার মুখ পোড়াইতেছি। অতএব এই উন্নতিশীলের সকল অমঙ্গল বিদূরিত হইবে, পরম শান্তিতে এই যুবক ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিবে।"

প্রজ্বলিত সলিতার উপর কলসী ধরিলে আস্তে আস্তে যখন তাহাতে জল প্রবেশ করে এবং কলসীস্থিত বায়ু যখন ধীরে ধীরে পলায়ন করে তখন একরকম শব্দ (ভক্ ভক্ শব্দ) হইতে থাকে। এই শব্দই অনুষ্ঠানের সফলতার পরিচায়ক বলিয়া অনুষ্ঠানকারিণী মেয়েদের নিকট নির্দ্দেশ করে। এই শব্দে পরশ্রীকাতর ব্যক্তির বিষ-জিহ্বা পোড়া যাইতেছে ইহাই তাহাদে বিশ্বাস জন্মে। এই অনুষ্ঠানদ্বারা অমঙ্গল বিদূরিত হইয়াছে এই বিশ্বাসে প্রিয়জনের অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হৃদয়ের ভীতি দূর করিয়া তাহারা সরলপ্রাণা পুর-কামিনীগণের নিকট হইতে যথাযোগ্য বক্‌সিস্ আদায় করে।

ঐরূপে তিনখানি প্রজ্বলিত সলিতার উপর শূন্য কলস পর্য্যায়ক্রমে তিনবার চাপিয়া ধরিয়া দাহ কার্য্য শেষ করা হয়। তারপরে আবার সেরীস্থিত উক্ত দ্রব্যগুলি তোড়-গ্রস্থের মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া লওয়া হয়। অবশেষে

তে-মাথা রাস্তার মোড়ে নিয়া গোবরের ঢেলাটি রাখা হয় এবং তাহার উপর স্থাপিত অৰ্দ্ধদগ্ধ সলিতা তিনটি প্রজ্বলিত শণের আঁটির দ্বারা জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই আগুণে সেরীস্থিত দ্রব্যগুলি পোড়াইয়া ফেলিয়া অনুষ্ঠান কারিনী স্নানান্তে বাড়ী ফিরিয়া যায়। আসিবার সময় সে দূর্ব্বাদল তুলিয়া আনে। ইতিমধ্যে যেখানে বসিয়া তোড়পোড়ান হইয়াছিল সেইস্থানের ছাই প্রভৃতিও পরিষ্কার করিয়া গোবর লেপিয়া দেওয়া হয়। এবং শূন্য কলসীটী জলপূর্ণ করিয়া আম্রপল্লবে সাজাইয়া রাখা হয়। সেই স্থানে বিধবা অনুষ্ঠান কারিনী ধান্য দূর্ব্বাদিয়া তোড়গ্রস্থকে আশীর্ব্বাদ করে। পরশ্রীকাতরের ঈর্ষ্যাপূর্ণ দৃষ্টিতে দগ্ধ যেন অৰ্দ্ধমৃতব্যক্তি কোমল হৃদয়া শঙ্কাপ্রবণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনীর হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া সমস্ত বিপদ মুক্ত হয়। দেবীবৃন্দের প্রার্থনা ও ভক্ত বৎসল ভগবানের অপার করুণা অভেদ্য বর্ম্মের মত জীবনযুদ্ধের সকল আঘাত হইতে তাহাকে রক্ষা করে। সে অনন্ত উন্নতি লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হয়।

ভারতীয় শিল্প

[শ্রীমনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত]

প্রাচীনকালের ধারা আজিও প্রবাহিত হইতেছে ; যুগে যুগে ভারত ইতিহাসে অনেক ওলট্‌ পালট হইয়াছে, কিন্তু ভারত তাহার ভারতীয় ভাব বিসর্জ্জন দেয় নাই। পণ্ডিতগণ মাথা ঘামাইতেছেন বেবিলোনের নিনেভা নগরী খৃষ্টপূর্ব্ব কত শতাব্দীতে ছিল ; প্রাচীন মিশরের স্মৃতি আজ শ্মশানের বুকে। আমরা যখন প্রাচীন ভারতের দিকে তাকাই তখন তাহাকে মৃতের ন্যায় দেখি না।

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারতের সাধনাকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। কত কত বৈদেশিক জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছে ; ভারতবর্ষ অঞ্চল বিছাইয়া তাহাদিগকে নিজের করিয়া লইয়াছে। গ্রীকেরা ভারতে গান্ধার শিল্প দান করিয়াছে, মুসলমানেরা ভারতে ঝঞ্ঝার ন্যায় দেখা দিয়াছিল, তাহাদের সভ্যতার ধারা হিন্দু সভ্যতার সহিত মিশাইয়াছে। মোগল রাজত্বের সময় আমরা মোগল শিল্প পাইয়াছি।

ভারতের শিল্প আলোচনা করিলে আমরা তাহার মধ্যে একটি বিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাইব। অজন্তার চিত্র বা হস্তী গুম্ফার ভাস্কর্য্য দেখিলেই বুঝিব, সেই বিশিষ্ট রূপ কি ? এই বিশ্বের মধ্যে যে এক বিরাট শক্তি মিশ্রিত রহিয়াছে, জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলিয়াছে, শিল্পী তাহা, রূপকের সাহায্যে মূর্ত্তি-দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। মানবের জীবনযাত্রার মধ্যে শিল্পী এক মহাছন্দ এবং মাধুর্য্যের আভাস পাইয়াছেন বলিয়া ভারতীয় শিল্প ছন্দ এবং মাধুর্য্যময়। কবি যে রকম তাঁহার রসবোধ ছন্দ এবং অলঙ্কারদ্বারা প্রকাশ করেন শিল্পী সেই রকম তাহার সৌন্দর্য্যবোধ চিত্রের লীলায়িত রেখা এবং মূর্ত্তির লীলায়িত ভঙ্গীদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারতীয় ভাস্কর্য্য এবং চিত্রের প্রথম পরিচয় পাই বৌদ্ধযুগে কিন্তু যেই সৌন্দর্য্যবোধ হইতে শিল্পের উৎপত্তি, তাহা উদয় হইয়াছিল বহু প্রাচীন যুগে,—যে দিন বৈদিক ঋষিগণ সিন্ধুর পবিত্র তটে ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেদিন হইতেই ভারতীয় শিল্পীর সৃষ্টি আরম্ভ। শিল্পের পরিচয় প্রকৃতপক্ষে বহু পরে পাইলেও বলিতে পারি না যে প্রাচীনযুগে শিল্প ছিল না। কারণ জননীর গর্ভস্থ শিশুর ন্যায় শিল্প তখন ভারতের তপোবনে পূর্ণতা লাভ করিতেছিল। যাহা বিরাট যাহা মহান্ তাহার পূর্ণতালাভ করিতে বহুসময় সাপেক্ষ, তাহাই ভারতীয় শিল্পের সৃষ্টি কার্য্য চলিয়াছিল বহু বৎসর ব্যাপিয়া। বৈদিক চিন্তার পূর্ণ প্রকাশ দেখি আমরা বৌদ্ধযুগে। বুদ্ধদেব প্রাচীন ঋষিদের সাধনা সাধারণের গোচরীভূত করান।

ঋক্‌বেদের উষা সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রকৃষ্টতম। রাত্রি

গত হইলে যখন সমস্ত জগৎ জাগরণের আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠে, ঋষিরা তথন উচ্ছসিত হইয়া উষার স্তব গান করিয়াছেন। এইরূপ তাঁহার বন্দনা করিয়াছেন।

"উষা উজ্জ্বল বর্ণের মহিয়সী নারী, আকাশে তাঁহার জন্ম। তিনি তাঁহার প্রণয়ী সূর্য্যের কিরণে সমুদ্ভাসিত, সূর্য্য তাঁহার পশ্চাতে কিরণ বিকীরণ করিয়া অনুসরণ করে। রক্তবর্ণের বৃষবয় যে উজ্জ্বল রথ টানিতেছে তাহাতে তিনি অধিষ্ঠিত। সদ্যস্নাতার ন্যায় লঘু তনু তাঁহার প্রভাময়, নর্ত্তকীর ন্যায় জমকালো আলোকের বেশ পরিধান করিয়া স্বর্গের উদয়াচলে উদিত হন, এবং তাঁহার অনবগুণ্ঠিত অপূর্ব্ব ভুবনমোহিনীরূপ জগৎবাসীর সম্মুখে প্রকাশিত করেন। কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণরাশি উপভোগ করে। গৃহিনী যেমন গৃহের পরিজনবর্গকে জাগাইয়া দেয়, সেরূপ তিনি সকলকে নিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি নিশীথিনীর কৃষ্ণ যবনিকা অপসারিত করেন, তাঁহার স্নিগ্ধ স্মিত হাস্যে জগতের অমঙ্গল দূর হয়, এবং জনসমূহের শিরে আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হয়। উষা প্রানীসমূহের শ্বাস-প্রশ্বাস, উষা প্রাণীসমূহের জীবন। উষার উদয়ে জগতে জাগরণের পুলক আবির্ভাব হয়; বিহঙ্গের মধুর কূজনে বনভূমি মুখরিত হয়, এবং সকলে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। উষা জগতের যত কিছু মাধুর্য্য, যত কিছু রঙ্গ, যত কিছু কর্ম্মতৎপরতা সকলের উৎস। উষা প্রতিদিনই নির্দ্দিষ্ট পথে উদিত হইয়া সোজা পথে চলেন, কথনও পথ ভুলিয়া যান না, এবং নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না। অতীত যুগে যে দীপ্তি বিকীরণ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানেও করিবেন, ভবিষ্যতেও করিবেন। জরা তাঁহার নাই, মৃত্যু তাঁহার নাই; যৌবন তাঁহার অনন্ত; সৌন্দর্য্য তাঁহার অফুরন্ত।

কোন এক চিত্রকর যেন ছবি আঁকিয়া গিয়াছে। কি উজ্জ্বল বর্ণ সমাবেশ! কোন্ চিত্রকরের কল্পনা এমন মহীয়ান্?

পরবর্ত্তী যুগের পুরাণের মধ্যে শিল্পের নিদর্শন আছে। ভবভূতির উত্তররামচরিতে আছে, লক্ষ্মণ পট চিত্র করাইয়া সীতাকে দেখাইয়া ছিলেন। তাহাতে রামের বিবাহ হইতে সীতার বনবাস পর্য্যন্ত সকল ঘটনা অঙ্কিত ছিল। সেই চিত্রের অঙ্কিত দৃশ্যে জনকস্থান প্রভৃতি স্থানের এবং রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, উর্ম্মিলা প্রভৃতির সহিত তাঁহাদের প্রতিকৃতি সমূহের সাদৃশ্য ছিল। রাবণের প্রাসাদে চিত্রশালা (art gallery) ছিল, এরূপ উল্লেখ আছে। অযোধ্যা ও স্বর্ণময়ী লঙ্কা আজ যদি থাকিত তবে বুঝি নগরীর রাণী সুন্দরী ভেনিস (Venice the queen of cities) লজ্জায় মুখ নত করিত।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ময় দানব নামক শিল্পী অপূর্ব্ব প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানে, ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের কাছে ভীমকে আলিঙ্গনের ইচ্ছা জানাইলে কৃষ্ণ একটি লৌহ নির্ম্মিত ভীমের মূর্ত্তি ধৃতরাষ্ট্রের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয় মহাভারতের যুগে, শিল্পীরা ধাতুমূর্ত্তি গঠন করিতে পারিতেন।

সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে চিত্র অঙ্কনের যথেষ্ট উদাহরণ আছে। কালিদাসের নাটকে প্রতিকৃতি অঙ্কনের অনেক উদাহরণ পাই। মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটকের নায়িকা মহিষী ধারিনীর সহচরী সুন্দরী মালবিকা নিপুন গায়িকা ও নর্ত্তকী ছিল। ধারিণী সাবধানতার সহিত সহচরীকে স্বামী নৃপতি অগ্নিমিত্রের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে রাখিতেন; কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ রাজ প্রাসাদের চিত্রশালায় মালবিকার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। ইহার পরে নৃপতি একদিন চিত্রশালায় গমন করিয়া মালবিকার চিত্র দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন, এবং নাটকের শোচনীয় পরিণাম আরম্ভ হইল।

শকুন্তলা নাটকের ৬ষ্ঠ অঙ্কের অধিকাংশই শকুন্তলার প্রতিকৃতি লইয়া, চিত্রের বর্ণনা হইতে কালিদাসের সময়ের অঙ্কন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়; ইহার সহিত অজন্তার পদ্ধতির চিত্র সাদৃশ্য আছে। সেই জন্য শকুন্তলার চিত্র বিশেষভাবে আলোচনা করার দরকার।

রাজা দুষ্যন্ত যখন বিরহকাতর তখন শকুন্তলার সান্নিধ্য অনুভব করার জন্য চিত্রফলকে শকুন্তলার প্রতিকৃতি স্মৃতি হইতে অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

তাঁহাকে কিরূপ আঁকা হইয়াছিল? "যে আম্র বৃক্ষের

তরুণ পল্লব জল সেচনে স্নিগ্ধ, সেই আম্র বৃক্ষের পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তার ন্যায় তাঁহাকে অঙ্কিত করা হইয়াছিল। তাঁহার বদনে স্বেদবিন্দু সঞ্জাত! বাহু আনত এবং কেশান্তের বন্ধন শিথিল হওয়াতে পুষ্পচ্যুত।"

অনেকে বলিয়া থাকেন যে ভারতীয় শিল্পীদের (perspective) জ্ঞান আদৌ ছিল না। সেটা সম্পূর্ণ ভুল তবে সেই দিকে তাঁহারা তেমন ঝোঁক দিতেন না, সেটা ঠিক।

সহচরী চতুরিকা চিত্রফলক লইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, চিত্রের স্বাভাবিকতা ও সজীবতা লক্ষ্য করিয়া রাজার বন্ধু মাধব্য রাজার নিপুনতার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং চিত্রের perspective লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "সাধু বয়স্য! আমার দৃষ্টি যেন চিত্রের উচ্চ নীচ প্রদেশে স্খলিত হইতেছে।" মাধব্যের এই কথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে চিত্রের perspcetive কেমন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। আলো-ছায়ার সম্পাতে উচ্চ নীচ প্রদেশ ভাল ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

চিত্রের পশ্চাৎভাগ (back ground) কিরূপ হইবে রাজা নিজেই বলিতেছেন।

"কার্য্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতবহা মালিনী
পাদাস্ত মণ্ডিতো নিষন্ত-হরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিত বল্কলস্য চ তয়োর্নির্ম্মাতুমিচ্ছামধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণ মৃগস্য বাম নয়নং কণ্ডুয়মানাং মৃগীম্।"

"হংসমিথুন শোভিত স্রোতস্বতী মালিনী সৈকত অঙ্কন করিতে হইবে। যেই হিমালয়ে হরিণ উপবিষ্ট, সেই হিমালয়ের প্রত্যন্ত সকল মালিনীর উভয়-পার্শ্বে বিরাজ করিবে। যেই মৃগী বামনয়ন কৃষ্ণ মৃগের শৃঙ্গে কণ্ডুয়ন করিতেছে সেই মৃগী, তরুর শাখায় অবলম্বিত বল্কলের নিম্নে অঙ্কণ করিতে ইচ্ছা করি।

সৌকুমার্য্য এবং তপোবনের উপযুক্ত শকুন্তলার প্রিয় অলঙ্কার কেমন হইবে?

রাজা বলিতেছেন :—

"বৃন্তং ন কর্ণাপিত বন্ধনং সখে শিরীষমাগস্ত বিলম্বী কেশরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্র মরীচি কোমলং মৃণাল সূত্রং রচিতং বনান্তরে।"

"বন্ধু কর্ণে যাহার বৃন্ত আবদ্ধ এবং গণ্ড প্রদেশে কেশর বিলম্বিত এরূপ শিরীষ কুসুম অঙ্কিত করা হয় নাই।"

শকুন্তলার ছবি যেন কোনও চিত্রকরের অঙ্কিত। তাঁহার অলঙ্কার, কেশগুচ্ছে পুষ্পের স্তবক। হংসমিথুন শোভিত মালিনী সৈকত সমস্তই যেন অজন্তার ছবি।

সংস্কৃত কাব্যের যুগে চিত্রের খুব আদর ছিল; নৃপতি বা অন্তঃপুরের মহিষীরা প্রায়ই চিত্র বিদ্যায় সুনিপুন। মহিষীদের সহচরীদের নাম প্রায়ই থাকে পত্রলেখা, চিত্রলেখা প্রভৃতি। তাহাদের নাম হইতেই তাহাদের চিত্রবিদ্যায় নিপুণতা সূচিত হইতেছে। নৃত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি গুণের মধ্যে, সহচরীদের চিত্রবিদ্যাও একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। শ্রীহর্ষ রচিত রত্নাবলীতেও শকুন্তলা নাটকের ন্যায় প্রতিকৃতি অঙ্কনের উদাহরণ আছে। রত্নাবলীর চিত্রকর শকুন্তলার চিত্রকর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। Technique বা অঙ্কন করিবার প্রণালী এবং অঙ্কন করিবার বিষয়ের সংস্থান প্রভৃতি সমস্ততেই শকুন্তলার চিত্রকর শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলার চিত্রের ন্যায় রত্নাবলীর নায়িকা সাগরিকার চিত্রও অজন্তার প্রথা অনুসারে অঙ্কিত।

আরও কাব্যে এরূপ প্রতিকৃতি অঙ্কনের উদাহরণ আছে।

প্রত্যুত্তর

[শ্রীস্মরজিৎ দত্ত]

গত জ্যৈষ্ঠের উপাসনায় দেখিলাম মদ্রচিত "গীতা ও ভাগবত" শীর্ষক প্রবন্ধের মুখবন্ধের আংশিক সমালোচনা বাহির হইয়াছে। মাননীয় শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন প্রবন্ধের নাম দেখিয়াই প্রথমে তাঁহার আনন্দ হইয়াছিল। এবং তাঁহার ন্যায় বৈষ্ণবের যে ঐরূপ আনন্দ হওয়া স্বাভাবিক ও উচিত তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি ভাগবত তথা পদ্মপুরাণ হইতে শ্লোকাংশ উদ্ধার করিয়াছেন—

শ্রীভাগবতং পুরাণমমলং
যদ্ বৈষ্ণবাণাং প্রিয়ম্।

যাহাহউক, তাঁহার এই কাঙ্ক্ষিত আনন্দ যে প্রথমেই মর্ম্মন্তুদ দুঃখে পর্য্যবসিত হইয়াছে তজ্জন্য লেখক যে কি পর্য্যন্ত অনুতপ্ত তাহা প্রকাশ করিয়া বুঝাইবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। বস্তুতই কোন সম্প্রদায় বিশেষকে মনঃকষ্ট প্রদান করিবার আশায় বা উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ রচিত হয় নাই। তবে লেখক তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছেন তাহাই ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে যে শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ বৈষ্ণবগণ মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া পাইয়াছেন, আশা করি অজ্ঞান ও অনবধানকৃত বলিয়া তাঁহারা সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

তথাপি এস্থলে ইহাও বলিতে বাধ্য যে যে সকল যুক্তিদ্বারা "বৈষ্ণবমর্ম্মন্তুদ বাক্যকলাপের" প্রতিবাদ করা হইয়াছে তাহা সমালোচকপ্রবর শাস্ত্রী মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত না হইয়া অন্য কোনও ব্যক্তির হইলেই যেন উপযুক্ত হইত। লেখক তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুসারে শাস্ত্রী মহাশয়ের সমালোচনার যৎসামান্য প্রত্যুত্তর দিতে চেষ্টা করিবেন

১। মূল প্রবন্ধে লেখক বলিয়াছেন—"শ্রীধরস্বামী প্রাককল্পগতপিত্রভিপ্রায়েণোক্তং নিতান্ত জোর করিয়া বলিয়াছেন।" সমালোচক মহাশয় বলিতেছেন "ইহা বড়ই সাহসের কথা।" কিন্তু এই "বড়ই সাহসের কথা" বলিতে লেখক সে স্থানে রীতিমত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। সে যুক্তির খণ্ডন না করিয়া শাস্ত্রীমহাশয় চৈতন্য চরিতামৃত হইতে কোন এক বিশিষ্ট ব্যাপার প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের উক্তির উদ্ধার করিয়া দেখাইতে চাহেন শ্রীধরস্বামী অভ্রান্ত অথবা অবিবদমান। লেখক শ্রীগৌরাঙ্গের সে উক্তির সংবাদ রাখিতেন এবং আরও জানিতেন—শিবের সেই উক্তি—

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তিবা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ প্রসাদতঃ॥

তথাপি তিনি সত্যের অনুরোধে ঐরূপ বলিতে সাহস করিয়াছেন। শ্রীধর স্বামীর সহিত বিরোধ হইলেই যদি শ্রীগৌরাঙ্গের সেই শ্লেষদ্বারা উপলক্ষিত হইতে হয় তাহা হইলে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি গীতাটীকাকারগণ এবং প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামী, জীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ভাগবত টীকাকারগণও শাস্ত্রী মহাশয়ের এই প্রচ্ছন্নবাণের লক্ষীভূত হইয়া পড়েন। কারণ তাঁহারা স্ব স্ব টীকায় কতস্থানে যে স্বামী হইতে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ মাত্র একটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গে ভাগবতের ১০।২২।১৩ শ্লোকে আছে "ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাব" ইত্যাদি। এখানে এই "আহতা" শব্দের টীকায় শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন "আহতা ইষদক্ষতযোনীঃ।" বৈষ্ণবতোষনী বলিতেছেন "হস্তৈর্গত্যর্থাদাগতাঃ।" ক্রমসন্দর্ভ বলিতেছেন "আহতাঃ শীতপীড়িতাঃ।" আর বিশ্বনাথ বলিতেছেন "আসম্যক্ প্রকারেনৈব হতা মৃতা ইব।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামী কথিত কল্পভেদ সমর্থন করিতে যাইয়া শাস্ত্রী মহাশয় যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা

সিদ্ধান্তই দুর্ব্বল। শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের ঐকমত্য নাই বলিয়া উভয়ের বর্ণিত ঘটনার সত্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যে একজন এককল্পের ও অপরজন কল্পান্তরের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন স্বীকার করিতে হইবে ইহা বড় বিপদের কথা। জ্ঞানের যুগে এ সকল যুক্তির স্থান নাই। বিশেষতঃ কল্পভেদ মানিলেও শ্রীনৃসিংহ দেবের উক্তির যে অসঙ্গতি থাকিয়া যায় তাহা সেই মূল প্রবন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

২। লেখকের নিতান্তই দুর্ভাগ্য যে তিনি যে ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গকে শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন বলিয়াছেন সেই ভাবটা ঠিকমত কি আদৌ সমালোচকপ্রবর ধরিতে পারেন নাই। না বুঝিয়া অনর্থক কতকগুলি বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন মাত্র। লেখক শ্রীগৌরাঙ্গকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়াই বিশ্বাস করেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ যে শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ ব্যতীত অন্যান্য সকল শাস্ত্রেই পারদর্শী ছিলেন তাহাও তিনি স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচারের কথা উত্থাপিত হইলেই প্রথমে শ্রীগৌরাঙ্গ বিনয় প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—

প্রভু কহে ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেহ না বুঝে আমি বুঝাইতে নারি ॥
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীন।
কাঁহা আমি সব শিশু পড়ুয়া নবীন ॥

চৈঃ চঃ আদিলীলা।

বৈয়াকরণ বোপদেব কর্ত্তৃক যে অমৃতসাগর ভাগবত রচনা সম্ভব হইলেও হইতে পারে কৌতুকস্থলে ইহাই স্বীকার করিবার জন্যই ঐরূপ লিখিত হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গকে অনাস্থ বা ন্যক্কৃত করিবার জন্য নহে। মূল প্রবন্ধে "যদি" শব্দটী থাকায় ঐস্থানটী শাস্ত্রী মহাশয়ের আরও দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে "যদি" শব্দটী সন্দেহাত্মক নহে। উহাদ্বারা বাক্যটী অধিকতর ভাবদ্যোতক করা হইয়াছে। কিন্তু কি বিড়ম্বনা! উল্টা বুঝলি রাম!!

৩। ভাগবত যে শ্রীশুকদেবকে "ষোড়শবর্ষং সুকুমার পাদং" অর্থাৎ ষোড়শবর্ষীয় সুকুমার বলিয়াছেন—এবং যাহা মহাভারতের বিরুদ্ধবাদ—শাস্ত্রীমহাশয় তাহার সমর্থন করিয়াছেন এই বলিয়া যে "যোগীর কিছুই অসম্ভব নহে।" অর্থাৎ বুঝিতে হইবে মহাভারত যাঁহাকে মহাপ্রস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন সেই যোগী অভিমন্যুতনয়কে ভাগবত শ্রবণ করাইতে ষোড়শবর্ষ সুকুমারপাদ হইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এ স্থলে ইহাও স্বীকার করা আবশ্যক যে শাস্ত্রী মহাশয় এতৎ প্রসঙ্গে যে ভাগবতোক্তি তুলিয়াছেন তদ্দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে তাহা ঠিক বোধগম্য হইল না।

৪। প্রহ্লাদের প্রার্থনা প্রসঙ্গে মুক্তি সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—সাযুজ্য সারূপ্যাদি কোন প্রকার ভেদের কথা হয় নাই। সামীপ্য হইলেই যে চলিবে আর সাষ্টি সাযুজ্যাদি অপর চারিটী হইলে চলিবে না তাহার কোন প্রমান নাই।

৫। মহাভারতকার যে ভাগবতকার হইতে পারেন তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিতে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন— যেহেতু বেদব্যাস ভাগবতের মতে সপ্তদশ অবতার অতএব তাঁহাদ্বারা এইরূপ বিভিন্ন রীতিতে গ্রন্থ রচনা অসম্ভব নহে। ইহার বিরুদ্ধে বলিবার আর কি থাকিতে পারে। আবার বিষ্ণুপুরান বলিয়াছেন বেদব্যাস একজন নহেন। সুতরাং ইহাও হইতে পারে এক বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়াছেন, অন্য বেদব্যাস ভাগবত রচনা করিয়াছেন। যুক্তির ত অভাব নাই। এখন মানে কে ইহা লইয়াইত বিবাদ। বেদান্তের ভাষা যে মহাভারতের ভাষা অপেক্ষা কঠিন তাহার কারণ বেদান্ত দর্শন উহা কাব্য নহে উহার নাম ব্রহ্মসূত্র। সূত্র aphorism সূক্ষ্মই হইয়া থাকে তাহাকে প্রাঞ্জল করিলে তাহার সূত্রত্ব আর থাকে না। আর "জন্মাদ্যস্য যতঃ" বেদান্তের ১।১।২ সূত্র লইয়াই যে শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ ইহাই কি বেদান্তকার যে ভাগবতকার নহেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নহে?

৬। দেবর্ষি নারদ—যিনি শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে পড়িয়া "মহর্ষি" হইয়াছেন—ব্যাসদেবের লেখাকে দোষ দিয়া যে সত্যই অন্যায় করিয়াছেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শন। ব্যাসদেব প্রবৃত্তিমূলক মহাভারত রচনা করিয়াছেন বটে কিন্তু সেই মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা ও তৎকৃত বেদান্তদর্শন বিরাট স্তম্ভস্বরূপ

দণ্ডায়মান থাকিয়া সাধককে মেঘমন্দ্রে নিবৃত্তি মার্গ আশ্রয় করিতে বলিতেছেন। নিবৃত্তিমার্গ নিতান্ত কঠোর বলিয়া প্রবৃত্তির মধ্যদিয়া নিবৃত্তি পথে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই মহাভারত রচনা। আবার মহাভারত যে কেবল প্রবৃত্তি-মার্গই প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নহে। ইহাতে নিবৃত্তি মার্গ মূলক বহু উপদেশ ও আখ্যায়িকা বিবৃত আছে। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে" প্রচলিত প্রবচন। আর গীতার কথা ত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সুতরাং ভাগবতকার তৎপ্রণীত গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব বৃদ্ধির জন্যই নারদের মুখে আপনার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়।

৭। যেহেতু স্বামিপাদ বলিয়াছেন ভাগবত বেদব্যাস রচিত সুতরাং তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। না করিলে "বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥" ভাগবত বলিতে দেবী ভাগবত বুঝিবার কোন কারণ নাই। দেবী ভাগবত যে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ তাহা লেখকের অবিদিত নাই।

অম্বরীষ শুক প্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠার্থ স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥

অম্বরীষের প্রতি এই গৌতম বচন পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এ কোন অম্বরীষ? ভাগবতে শুকদেব নিজেই অম্বরীষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করাইয়াছেন।

৮। ভাগবতে শ্রীরাধার বা অন্য কোন গোপাঙ্গনার নামোল্লেখ না থাকিবার যে কারণ শাস্ত্রী মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে মানিয়া লইতে পারা যায় না। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"গোপললনাগণের লীলা বর্ণন করিতে করিতে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হওয়াতে শুকদেবের দেহে কখনও স্বেদ, কখন পুলক, কখন কম্প, কখন গদ্ গদ্ বাক্য কখন অশ্রুতে পূর্ণ হইতেছিলেন। তিনি অতিকষ্টে গোপাঙ্গনাগণের লীলা বর্ণন করিয়াছিলেন। কিন্তু নামোচ্চারণ করিতে সক্ষম হন নাই। শাস্ত্রী মহাশয় এ বিষয় কোথা হইতে অবগত হইলেন? ভাগবতে ইহার কোন প্রমাণই কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। শ্রীশুকদেব যে কোন গোপীরই নাম উল্লেখ করেন নাই তাহার কারণ তৎকালে তাঁহাদের নামকরণ হয় নাই। ভাগবতের দশম স্কন্ধের বর্ণিত বিষয় বিষ্ণু পুরাণ হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিষ্ণু পুরাণ প্রাচীনতম। সে গ্রন্থেও রাধা বা অন্য কোন গোপরমণীর নাম উল্লিখিত হয় নাই।

ভক্তাবতার জয়দেবের যুগ হইতেই গোপীগণের নামকরণ হয়। প্রভুপাদ সনাতন গোস্বামীর কথা অবিশ্বাস করিবার সাহস বা ইচ্ছা না থাকিলেও শাস্ত্রী মহাশয়ের বৃহদ্ভাগবতামৃত হইতে উদ্ধৃত তদুক্তি শ্রীশুকদেবকে লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলেও ভাগবতে কোন প্রমাণ না থাকায় উহাকে নিঃসংশয়ে প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারা যায়।

৯। ভাগবতকার স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে গোপীগণ রাসলীলায় গৃহীত হওয়ায় আপনাদিগকে অন্যান্য স্ত্রীজন অপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত মনে করিয়া বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহাদের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ মাত্র একজন্ গোপ বালাকে সঙ্গে লইয়া কাননাভ্যন্তরে অদৃশ্য হইলেন। যথা :—

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মনিন্যোঽপ্যধিকং ভুবি॥
তাসাং তৎ সৌভাগ্যমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

১০।২৯।৪২।৪৩

শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা প্রসঙ্গে যে ভাগ্যবতী বল্লবীকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন তাঁহারও দুর্দ্দশার একশেষ ভাগবতেই বর্ণিত হইয়াছে। কেন যে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়া ছিলেন তাহাই বুঝাইবার জন্য ভাগবত বলিতেছেন—

রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্॥

১০।৩০।৩০

সেই প্রিয়তমা বল্লবললনাও এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অধিকতর অনুরাগ প্রদর্শিত হইলে আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রমণীরত্ন মনে করিয়া গর্ব্বস্ফীত হইলেন।

সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানাঃ মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥
১০।৩০।৩০

তিনি সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া আত্মারাম ভগবান্‌কে একান্ত তদনুরক্ত মনে করিয়া সৌভাগ্যের চরম লাভাশায় আবদার করিলেন—আমি আর চলিতে পারিতেছিনা আমাকে স্কন্ধে বহন করিয়া লইয়া চল!

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয়মাং যত্র তে মনঃ ॥

দর্পহারী মধুসূদন মনে মনে হাস্য করিয়া তাঁহাকে স্বীয় স্কন্ধে আরোহন করাইবার জন্য উপবেশন করিলেন। তিনি যেমন তাঁহার স্কন্ধে অকুণ্ঠিতচিত্তে আরোহন করিতে যাইবেন অমনি ভগবান্ তাহাকে সেই বিজন বনে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যাঁহার সৌভাগ্য ও গৌরব দর্শন করিয়া অন্য গোপীগণ দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বর" তিনিও তাঁহাদিগের সমদশাপন্ন হইয়া অবশেষে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সকল ঘটনা বর্ণন করায় সেই গোপীগণ সবিশেষ বিস্মিত হইলেন—

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥
১০।৩০।৩৪

শাস্ত্রী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রেয়সীর এই ব্যবহার পবিত্র প্রেমপ্রসূত লীলা বিলাস অথবা প্রেমের দৌরাত্ম্য বলিয়া বুঝাইবার জন্য ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিয়াছেন। তিনি কাম ও প্রেমের প্রভেদ দেখাইতে গলদঘর্ম্ম হইয়াছেন দেখিয়া সত্যই আমরা দুঃখিত হইয়াছি। তিনি চরিতামৃত হইতে আরম্ভ করিয়া সেকস্‌পীয়ার পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়া কেন যে অবান্তর আলোচনা করিয়াছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মূল বিষয় অস্পৃষ্টই রহিয়া গিয়াছে।

গোপীগণ যে কাম প্রেরিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগিনী হইয়াছিলেন তাহা ভাগবত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন—"কামাদ্ গোপ্যোভয়াৎ কংসঃ" ইত্যাদি এবং "জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ" ইত্যাদি শ্লোক তাহার অবিসম্বাদী প্রমাণ। শ্রীগৌরাঙ্গই গোপীপ্রেমের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তিনিই তাঁহাদের চেষ্টা কাম হইতে প্রেমে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ চৈতন্য চরিতামৃতের গোপী ও ভাগবতের গোপীর মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমরা শাস্ত্রী মহাশয়কে ভাগবতের দশম স্কন্ধ পুনর্ব্বার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি।

শাস্ত্রী মহাশয় নিতান্তই কোমর বাঁধিয়া কলহ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া আমাদের ঈসপ্‌-এর "নেড়েবাঘ ও মেষশাবক" এর গল্প মনে পড়ে। তিনি মাত্র মূল প্রবন্ধের ভূমিকার সমালোচনা করিয়াছেন। সমগ্র প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। আর সেই ভূমিকার সমালোচনা কেবল দুই একটী কথার অযৌক্তিক প্রতিবাদ। মূল প্রবন্ধের ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে এমন কোন দোষারোপ করা হয় নাই যাহার ফলে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শাস্ত্রী মহাশয়কে শিবের গীত গাহিবার কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ "আমাদের ন্যায় মাংসাসৃক্ পূয বিণ্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিময় অমেধ্য দেহে" এ লীলা করেন নাই। এবং সেই সঙ্গে গম্ভীরভাবে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে—"লেখক মহোদয় চিন্ময় শরীর কিরূপ তাহা ধারণা করিতে পারিলেন? যদি না পারেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের লীলার চর্চ্চায় আবশ্যক কি? অধিকারী হইয়া চর্চ্চা করিলে বা দোষ দিলে ভাল হয় না? শুকদেবের মত উচ্চস্থানে আরোহণ করুন, তখন দোষ দিতে পারেন দোষ দিবেন।" পরে জনক-জাবাল উপাখ্যান শুনাইয়া শ্রীমদ্ ভাগবত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়কে ধন্যবাদ! তবে আমরা নিতান্ত বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি তিনি কেমন করিয়া জানিলেন শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে লেখকের ধারনা কিরূপ? আমাদের বিশ্বাস শাস্ত্রী মহাশয় নিশ্চিতই শ্রীকৃষ্ণলীলা চর্চ্চায় অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় শরীর কিরূপ তাহা হৃদয়ে শুধু ধারণা করিতে পারেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের কথা এই যে এত বড় ধারনাশক্তি লইয়াও ধীমান্ সমালোচক প্রবর লেখকের ভাবটুকু ধরিতে পারেন নাই! যাহাহউক লেখকের বিশ্বাস আছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা

সমালোচকের ধারণা অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে। সরল বিশ্বাসের কথাই বলা হইল।

শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধারণের বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা করিয়া পরদার সঙ্গম করিয়াছিলেন।" অবশ্য লেখক এ "সাধারণের" অন্তর্গত নহেন ইহাই লেখকের বিশ্বাস। যাহা হউক শাস্ত্রী মহাশয় ভাগবতে পরীক্ষিৎ প্রশ্ন তুলিয়া শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ভাষায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—"অথ পরীক্ষিৎ সমীপোবিষ্টানাং বিবিধবাসনাবতাং কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহং সমুত্থিতমালোক্য তচ্ছেদনার্থং পৃচ্ছতি।" পরীক্ষিতের প্রশ্ন ও তদুত্তর সম্বন্ধে আমাদের অভিমত পরে বলিতেছি। উপস্থিত সমালোচকের উক্তির একটু আলোচনা করা যাউক। তিনি বলিয়াছেন অধিকারী না হইলে কৃষ্ণলীলার চর্চ্চা করা অনুচিত, এবং "যাহার কাম জয় না হইয়াছে তিনি যেন এ বিষয় আলোচনা না করেন।" তজ্জন্য নিষেধও করিয়াছেন যথা পদ্মপুরাণে—

ইদং বৃন্দাবনে যত্তু রহস্যং মম বৈশ্রুতম্।
ন প্রকাশ্যং কদা কুত্র বক্তব্যং ন যাশো কচিৎ॥

শাস্ত্রী মহাশয় না হয় জন্মাধিকারী হইয়া এবং কাম জয় করিয়া কৃষ্ণলীলার আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু পরীক্ষিতের সমীপোবিষ্ট বিবিধ বাসনাবান্ কর্ম্মি জ্ঞানি গণের সমক্ষে শ্রীশুকদেব কেন এ লীলা প্রসঙ্গ করিলেন? আর কামজয়ী বিধুভূষণই বা কেন ভগবানের নিষে জানিয়াও কামান্ধ, রিপুদাস "যাশো" স্মরজিতে এ লীলা রহস্য প্রকাশ করিলেন? তাই বলি—

"লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোনু বিজ্ঞাতুমর্হতি।"

পরীক্ষিতের প্রশ্ন ও তদুত্তর সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস—সরল ও দৃঢ় বিশ্বাস—উহা প্রক্ষিপ্ত। কেননা উহা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। যিনি রাসলীলার মর্ম্মী পাঠক তাঁহার মনে এসন্দেহমূলক প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। যিনি "অবরুদ্ধ সৌরভ।" "আত্মারাম ভগবান" হইয়া, "যোগমায়া সমাশ্রয়" করিয়া রাসলীলা করিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে "পরদারাভিমর্ষণ" কথা প্রযোজ্যই হইতে পারে না। যাঁহারা পরমুখে কৃষ্ণের রাসলীলা শ্রবণ করিয়া পঞ্চাধ্যায়ী পাঠ না করিয়াই পরমপুরুষের নিন্দাবাদ বা আচরণে দোষারোপ করিয়াছেন তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যই পরে এই প্রশ্নোত্তর সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রশ্নোত্তর পাঠ করিলে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় প্রক্ষেপকর্ত্তা কৃষ্ণের রাসলীলা যে লোকচক্ষে নিন্দনীয় ইহা বিশ্বাস করিয়াই কৃষ্ণচরিত্রের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তিগুলিও নিতান্ত দুর্ব্বল। আমরা হইলে বলিতাম "রাসলীলায় পরদ্বারাভিমর্ষণ প্রসঙ্গই নাই। রাসলীলা নিজে পাঠ করুন তাহাহইলেই কৃষ্ণচরিত্র কতদূর দূষনীয় বুঝিতে পারিবেন।"

আমার রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের ভাবের কথাই বলিলাম। গোপীদিগের ভাব সম্বন্ধে কিছুই বলি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কি পরকীয়া তাহারই বিচার করিতে নিতান্ত জোর করিয়া অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারনা করিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাহার সংক্ষেপ করিয়া নিম্নে Table আকারে প্রকাশ করিলাম—

পরকীয়া
- কন্যকা
  - সাধনপরা
    - আযৌথকী
      - প্রাচীনা
      - নবীনা
    - যৌথকী
      - মুনি
      - উপনিষদ্
- পরোঢ়া
  - দেবী
- নিত্যপ্রিয়া
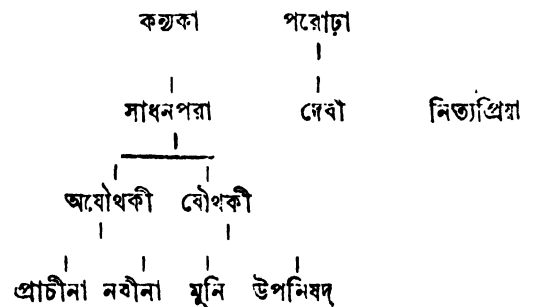
পরকীয়ার বংশকীর্ত্তন করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন "আভ্যন্তরিক দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে গোপাঙ্গনা শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া নহেন। কিন্তু তাঁহারা স্বকীয়া।" তিনি দেখাইয়াছেন গোপ রমণীগণ অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে "দয়িত", "রমণ", "পতি", "আর্য্যপুত্র" প্রভৃতি সম্বোধন করিয়াছেন। এবং দুর্ব্বাসা, শ্রীধর স্বামী ও শ্রীজীবগোস্বামীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অথচ ভাগবতে শুকদেব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।" আর সমালোচক প্রবরই পরীক্ষিতের প্রশ্ন তুলিয়া দেখায়

ছেন যে পরীক্ষিৎ ও তাঁহার সমীপোবিষ্ট শ্রোতৃবর্গও গোপীগণকে পরকীয়া বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তবে শুকদেব, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় অতদূর অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন নহেন বলিয়াই বোধ হয় ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য শাস্ত্রী মহাশয় এত শিবের গীত গাহিয়াও শেষে "গোপাঙ্গনাগণ লক্ষ্মীস্বরূপা" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গোপীদিগের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। কেননা স্বয়ং লক্ষ্মী গোপীদিগের সৌভাগ্য কামনা করিতেন।

যাহাহউক আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলিতেছি ভাগবত গোপীগণকে নিষ্কামারূপে চিত্রিত করেন নাই। ভাগবতবর্ণিত গোপীভাব শ্রীগৌরাঙ্গ নূতন আলোক ও অত্যুজ্জ্বল বর্ণে ফুটাইয়া যে অভূতপূর্ব্ব ও অতুলনীয় আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মহীয়ান গরিমা হইতে "বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"

অলমতি বিস্তরেণ।

পুস্তক সমালোচনা

[পদ্মপাদ]

ধর্ম্ম ও রাজনীতি।—শ্রীবীরেন্দ্র নাথ রায় লিখিত। সৎসঙ্গ গ্রন্থমালার ১ম পুস্তিকা—মূল্য তিন আনা মাত্র—১২নং নন্দলাল বসুর লেন হইতে শ্রীশাক্যসিংহ সেন কর্তৃক প্রকাশিত। লেখক বর্ত্তমান যুগের নবজাগ্রত কর্ম্ম সাধনাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক ভাবিবার কথা বলিয়াছেন—সম্প্রদায়গত ভাবে অনেক স্থলে আমাদের মতের সহিত মিল না থাকিলেও, তাঁহার এই নিবন্ধটি আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। জগতে যুগে যুগে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনায় বিভিন্ন পন্থাকে আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে—সুতরাং তাহা লইয়া তর্ক খানিকটা পর্য্যন্ত চলিলেও—তাহাতে লাভ নাই। লেখক আশা করিয়াছেন তাঁহাদের "এই ক্ষুদ্র প্রেমিক সম্প্রদায় ক্রমবর্দ্ধমান হইয়া কালক্রমে বঙ্গকে ভারতকে এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে একই প্রেমের সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত করিয়া বিশ্বনাথের চরণে নিবেদিত করিবে"—তাঁহার আশা পূর্ণ হোক!

বর্ত্তমান সমস্যা—শ্রীউপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—শ্রীহবি:কর্ণ কাঞ্জিলাল, ৪ নং মোহনলাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার হইতে প্রকাশিত-মূল্য তিন আনা। এই পুস্তিকা খানিতে উপেন্দ্রবাবু আপনার স্বাভাবিক লিপি-চাতুর্য্যের দ্বারা "ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এ দেশে প্রথম ব্যবসা করিতে আসে তখন" হইতে "বর্ত্তমান সমস্যা" অর্থাৎ Non-co-operation পর্য্যন্ত একটা ইতিহাস দিয়াছেন। কোম্পানীর আমলের রাজত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান আমলাতন্ত্রের শাসন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কিরূপ ক্রমে ক্রমে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহার একটা সত্য ইতিহাস জানিলাম বলিয়া মনে হয়। তিনি ভারতবাসীর বিশেষতঃ বাঙ্গালীর জীবন সম্বন্ধে যে কয়েকটি খাঁটি কথা বলিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। ভারতের এই নবজাগরণের দিনে লেখক আশান্বিত তাই তিনি "নিবেদন" করিতেছেন—

হে বাঙ্গালী তোমার আত্মস্থ হইবার দিন আসিয়াছে। বিশ্বাস কর, বর্ত্তমান জীবনযজ্ঞের তুমিই প্রধান ও প্রথম পুরোহিত। তোমার অতীত জীবনের সমগ্র সাধনা স্বরাজ্য-সিদ্ধিকেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। * * *

হে আমার দেবাংশসম্ভূত স্বদেশবাসীগণ! তোমাদের বহুযুগের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আজ আবার পূত হৃদয় লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কর!"

লেনিন—শ্রীফণিভূষণ ঘোষ লিখিত—ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—মূল্য চারি আনা মাত্র।

রুষিয়ার জননায়ক, শ্রমজীবি সংঘের প্রতিষ্ঠাতা লেনিন সম্বন্ধে কয়েকখানি মূল ইংরাজি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। বলসেবী-সম্প্রদায়ের জাগরণ হইতে আরম্ভ করিয়া এতাবৎকাল তাহাদের কার্য্যকলাপ লেনিনের নেতৃত্বে কিরূপে অগ্রসর হইতেছে তাহার একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গান্ধী ও লেনিন শীর্ষক নিবন্ধটি বেশ লাগিল। এই অধ্যায়ে লেখক এই দুই জননায়কের আদর্শ ও কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বই খানিতে মুদ্রাকর-প্রমাদ কিছু বেশী আর স্থানে স্থানে অনুবাদ ও পরিভাষা নির্ব্বাচন তেমন ভাল লাগিল না।

সরস্বতী পুস্তকালয় ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা—হইতে প্রকাশিত স্বরাজপর্য্যায় গ্রন্থরাজির ৫খানি পুস্তক আমরা পাইয়াছি—

১ম পুস্তক—**সহযোগিতা বর্জ্জন প্রস্তাব**—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, বি-এল লিখিত মূল্য তিন আনা মাত্র। সহযোগিতা বর্জ্জন প্রস্তাব আলোচনা করা হইয়াছে!

২য় পুস্তক—**দেশসেবা ও সাধনা**—শ্রীহরিদাস মজুমদার লিখিত মূল্য দেড় আনা মাত্র।

৩য় পুস্তক—**স্বরাজের পথে**—(দ্বিতীয় সংস্করণ)—অধ্যাপক শ্রীঅনিলবরণ রায় প্রণীত-মূল্য ।০। ইনি অসহযোগ আন্দোলনের বিষয়ে নানাদিক হইতে নিজের বক্তব্য বলিতে চাহিয়াছেন—স্থানে স্থানে তাঁহার যুক্তি তেমন জমে নাই অধ্যাপক মহাশয় এখন কোন্ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন জানিবার জন্য কৌতুহল হয়।

৫ম পুস্তক—**স্বরাজ**—শ্রীশরৎ কুমার ঘোষ লিখিত—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির বরিশাল অধিবেশনের বক্তৃতা—লেখক প্রেমের দিক হইতে দেশাত্মবোধের আলোচনা করিয়াছেন। মূল্য ।০ আনা।

৬ষ্ঠ পুস্তক—**স্বাধীন মিশর**—মঈনউদ্দীন হোসায়ন বি, এ সঙ্কলিত। মিশরের লব্ধ স্বাধিনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মূল্য ।০ আনা।

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ } পৌষ ১৩২৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনী

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

চরকার কথা

মহাত্মা গান্ধী সরকার কর্তৃক—ধৃত হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিয়া দেশবাসীকে তদুপলক্ষে কর্তব্যাকর্তব্য বুঝাইয়া বলিয়াছেন—"দেশবাসীগণ যেন আক্রোশবশতঃ সাম্যমৈত্রী-ভাব ত্যাগ করতঃ চণ্ডনীতির অনুসরন না করেন; পক্ষান্তরে তাঁহারা যেন কংগ্রেস প্রোগ্রাম সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করেন; এ পর্য্যন্ত যাঁহারা চরকাব্রত গ্রহণ করেন নাই বা বিদেশী বর্জ্জন করেন নাই তাঁহারা যেন উহা করেন।" মহাত্মা প্রত্যেক নরনারীকে চরকা ব্রত গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। এই উপলক্ষে পূজনীয় রামানন্দবাবু বলেন, মহাত্মার সহিত তিনি ইহাতে একমত হইতে পারেন নাই। রামানন্দ বাবুর যুক্তি এই যে যাহার যেমন সাধ্য, সাধনা ও শক্তি সে সেই ভাবে দেশসেবা করিবে। প্রত্যেক নরনারীই যে চরকা ঘুরাইতে সক্ষম ও দক্ষ তাহা নহেন; পরন্তু তাঁহারা অন্য রকমে নিজ শক্তি দিয়া দেশ-সেবা করিতেছেন, তাহাই করুন; চরকা লইতে উহাদের বাধ্য করিলে না হইবে এদিক না হইবে ওদিক। দুদিক যাইবে। যাহার যেটা কর্ত্তব্য বা পেশা নহে বা যাহাতে তাহার দক্ষতা নাই এমন কাজে তাহাকে জিদ করিয়া অনুরক্ত করায় ফল নাই।

এ সব যুক্তি সুযুক্তি। ইহাতে বলিবার কিছু নাই; বাস্তবিক যাহার যে পেশা বা ব্যবসায় জন্মগত সংস্কার আছে বা পটুতা ঘটিয়াছে তাহা ফেলিয়া অন্য কাজে তাহাকে নিযুক্ত করাইলে সমাজ বা সংঘ অটুট থাকেনা; লোক-যাত্রা নির্ব্বাহও সুকর হয় না——'

তবে একটা কথা আছে। মহাত্মা কি এসব সোজা কথা চিন্তা করেন নাই বা এই সব যুক্তির সারবত্তা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই? তাহা নহে; ভারতবাসী প্রত্যেক নর-নারীর পক্ষে চরকা চালনা যে তিনি বাধ্যতামূলক কর্ত্তব্য বলিয়া বার বার নির্দ্দেশ করিতেছেন ইহার মূলে কোনো নিগুঢ় সারবান হেতু নিশ্চয়ই আছে।

যখন ভারতবর্ষ নিজের সূতা নিজে কাটিয়া নিজের কাপড় নিজে বুনিয়া সমস্ত দেশবাসীর লজ্জা নিবারণ করিত,

বাবুয়ানার সখ মিটাইত উপরন্তু বিদেশী বিলাসীদের সখসাধ পূর্ণ করিত—তখনো প্রত্যেক নরনারী চরকা ঘুরাইত না; ঘুরাইবার দরকারও হইত না; অথচ কাজ চলিয়া যাইত; আর আজই বা তাহা হইলে প্রত্যেক নরনারীকে কেন তাহা করিবার জন্য মহাত্মা জিদ ধরিয়াছেন? সুতরাং তাঁহার মনে মনে একটা গভীরতর মতলব আছে; আমার এ সম্বন্ধে যাহা মনে হয় তাহাই বলিতেছি। এই ভাবে মহাত্মার আদেশটী বুঝিলে উহার সারবত্তা কতক বুঝা যাইবে।

ভারতবর্ষ বৎসরে ৬০ কোটী টাকার কাপড় কেনে বিলাতী কলওয়ালাদের কাছে। বিলাতী কল অতি সহজে ও কৌশলে আমাদের দেশ হইতে বয়ন শিল্প তুলিয়া দিয়াছে। আমাদের পূর্ণ মাত্রায় তাহাদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বয়ন বিদ্যা ভুলিয়া সস্তায় বিলাতী কাপড় কিনিয়া কিনিয়া বিলাসিতা ও অলসতার দাস হইয়া পড়িয়াছি। অথচ এই ৬০ কোটী টাকা বছর বছর এই দেশ হইতে পাইয়া বিলাতী বণিকদের গর্ব্ব, অহংকার, অত্যাচার দিন দিন বাড়িতেছে; আমরাই তাহাদের এই প্রশ্রয় দিয়াছি, দিতেছি—এই প্রচুর টাকা উহাদের একটা মস্ত ভরসা, অবলম্বন; ঐ টাকার জোরেই তাহারা বছর বছর কামান বন্দুকের রাশি বাড়াইয়া আমাদের বন্ধনকে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিতেছে; বিলাতের অর্দ্ধেক লোক পায়ে পা দিয়া বসিয়া জীবনে আরামভোগ করিতেছে ঐ টাকার জোরে—

এখন আমরা যদি এই ৬০ কোটী টাকার কাপড় কেনা বন্ধ করিতে পারি—যদি হঠাৎ একমাসের মধ্যে বিলাতের যত কাপড়ের কল বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ব্যাপারটা কি হয় বুদ্ধিমান মাত্রেই বুঝিতে পারেন। একের পৌষমাস অপরের সর্ব্বনাশ এইতো জগতের নিয়ম—আমাদের সর্ব্বনাশে উহাদের পৌষমাস চলিতে ছিল; এখন আমাদের পৌষমাস হইয়া উহাদের বণিকদের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। তখন unemployed লক্ষ লক্ষ তাঁতি কুলিমজুরদের ভীষণ চীৎকারে ও গর্জ্জনে তর্জ্জনে বণিকপ্রবল পার্লামেণ্টে ইহার কারণ নির্ণয় ও উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইতে পারে।

এত বড় একটী গুরুতর ব্যাপার ঘটাইতে হইলে অর্থাৎ সমগ্র ভারতকে Economic সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সমস্ত ভারতবর্ষকেই লাগিতে হইবে। এই ৬০ কোটী টাকার কাপড় সদ্য সদ্য যোগাইতে হইলে ভারতবাসীকে কি খাটুনিই না খাটিতে হইবে, কি ত্যাগই না করিতে হইবে! তাঁতিকুল একরূপ নির্ম্মূল; গৃহস্থের বাড়ীতে সধবা বিধবা নারীরা চরকাকে এখন ভয়ের চোখে দেখেন। সগোষ্ঠী মিলিয়া দিনরাত চরকা ঘুরাইয়া সূতা কাটিয়া তাহাতে একখান কাপড় বোনার অপেক্ষা ঝনাৎ করিয়া দুটা টাকা ফেলিয়া দিয়া একখানা খাসা মিহি সাড়ী ধুতি যখন পাওয়া যায় তখন আবার চরকা ঘুরাইয়া দুঃখ পাইতে লোকে শিহরিবে বই কি! অথচ এই সব লোকেই সমবেত চেষ্টায় চরকার আশ্রয় না লইলে স্বদেশের বস্ত্র সমস্যা মেটানোর কোনো ভরসা নেই। সমস্ত ভারতবাসীই এখন চরকায় সূতা কাটা ও বস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞ, তা ছাড়া চরকাকে অধিকাংশ লোকে ভয় ও ঘৃণার চোখে দেখে অথচ এই চরকাই আমাদের রক্ষার মূল। এই চরকাকে তার পূর্ব্ব মর্য্যাদায় ও কার্য্যকারিতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে অর্থাৎ সমস্ত লোকের মন হইতে ইহার প্রতি ঘৃণা ও ভয় দূর করিতে হইবে ও উহার চালনা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মাইতে হইবে।

কাজেই প্রথম পর্ব্বেই উহার ব্যবহারকে প্রত্যেকের পক্ষে একটা পবিত্র অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য বলিয়া প্রচার করা দরকার। জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নর, নারী প্রত্যেকেরই মনে এখন হওয়া উচিত যে, এই চরকা আমার স্বদেশের গতি ও মুক্তি ও ত্রাণের হেতু; ইহা ঘুরানো আমার পবিত্র ব্রত, নৈমিত্তিক কাজ। এইভাবে চরকা ঘোরানো বুঝিলে প্রত্যেক লোকই একটা নষ্টশিল্পকে উদ্ধার করিতে পারিবে।

জ্ঞানী, বিদ্বান বা অন্য কর্ম্মকারী বা অন্য পেশাদার নিজ নিজ প্রধান কর্ত্তব্য তো করিবেনই—দিনান্তে খানিকক্ষণের জন্য একবার চরকা ঘুরাইবেন—তাঁহার পক্ষে এটা Symbolic হইবে—তাঁহাদের দেখাদেখি সাধারণ অন্য লোকে ইহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, যাহার সময় শক্তি

ও বিদ্যা আছে সে উহাকে পেশা করিয়া অর্থ উপার্জন করিবে। সকলকেই যে অর্থ উপার্জনের জন্য চরকা লইতে হইবে তা নয়, বা সকলেই যে চরকা ঘুরাইয়া বিশেষ পরিমাণে সূতা কাটিতে পারিবেন তাহা নয়, উহা তাহার পক্ষে দৈনন্দিন পবিত্র কর্ত্তব্য—কেবল দেশ সেবার কর্ত্তব্য বোধ জাগাইবার একটা প্রতীক।

তা ছাড়া সকল শ্রেণীর কর্ম্মীকেই যে জীবনের জন্য চরকা লইতে হইবে তার মানে নাই; এতবড় অথচ এত vitally important একটা নষ্টশিল্প উদ্ধার করিয়া জাতিকে ধ্বংস ও দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইতে গেলে, প্রথম চেষ্টাটা গুরুতর হইবেই, কাজেই সবার পক্ষে উহা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।

যখন ঘরে আগুন লাগে তখন কর্ত্তা গৃহিনী, শিশু সকলেই কিছু না কিছু জিনিষ ঘাড়ে বহন করিয়া পথে বাহির হন। যখন বিজন পথে গাড়ীর চাকা মাটিতে পুতিয়া যায়, অথচ গাড়ী না চলিলে অচিরে বাঘ ভল্লুকের গ্রাসে যাইতে হইবে, তখন আরোহী বাবুই হউন, নবাবই হউন, আর রাজাই হউন চালকের সঙ্গে চাকায় কাঁধ দেন। জর্ম্মাণ আক্রমণে অধিনতার ভয়ে যখন বিলাতের হৃৎকম্প হয় তখন ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, অপণ্ডিত, গ্রন্থকর্ত্তা, শিল্পী, গুণী, জ্ঞানী, কেহই কাঁধে বন্দুক বহিতে ইতস্তত করেন নাই। দেশ ভয়ের অতীত হইলেই যে যার কাজে ফিরিয়া আসিলেন।

এক্ষেত্রেও তাই। উপস্থিত সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক নরনারীর কর্ত্তব্য হউক চরকার পুনঃ প্রতিষ্ঠায় প্রাণপণ সাহায্য। এই Economic ধ্বংস হইতে বাঁচিবার সূত্রপাত হইলেই তখন যে যার কাজে ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু তাবৎকাল একমাত্র পন্থা ও চিন্তা হইতেছে বস্ত্রশিল্পের পুনরুদ্ধার করণ।

গুণী, জ্ঞানী ও ধনী লোকদের চরকা লইতে দেখিলে সাধারণ অজ্ঞানী, গরিব ইতর জনসাধারণ আর সূতাকাটাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবেনা; তখন সকলে মিলিয়া অর্থাৎ ৩০ কোটী ভারতবাসী মিলিয়া যদি প্রত্যহ প্রতিজ্ঞা করতঃ কিছুকাল চরকা চালান আর মোটা কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করেন তাহা হইলে ভারতের বস্ত্রসমস্যা যে ভারতবাসীর মিটিবে না একথা কেহ বলিতে পারে না।

পাঁচটা অভাবের মধ্যে যেটা সব চেয়ে গুরুতর সেইটাই আগে মিটানো বুদ্ধিমানের কাজ। বস্ত্রসমস্যাটা আমাদের সব চেয়ে গুরুতর; এইটার মীমাংসায় এখন দেশের সকলের প্রাণপণ সাধনা দরকার। মহাত্মা যে সকলের পক্ষে এটা compulsory করিতে বলেন তাঁর মনোগত ভাব এই যে যাবৎ না বস্ত্রশিল্প আমাদের হাতে আসিয়া বেশ সিদ্ধিপ্রদ কার্য্যকর হয় তাবৎ প্রত্যেক ভারতবাসী এই চরকাকে আত্মরক্ষার মন্ত্রবৎ গ্রহণ ও সাধন করুন।

৩০ কোটী লোকের একাগ্র সাধনা ও মনোবল বা তপোবল এক বিষয়ে নিয়োজিত হইলে যে অসাধ্য সাধন হয় ইহা কে না বিশ্বাস করিবে? জীব-ব্রহ্মের সুপ্তশক্তির সীমা যে নাই তাহা যে অসাধ্য সাধন করিতে পারে তা মহাত্মা বিশ্বাস করেন তাই তাঁর এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—হে দেশবাসীগণ! আপনারা কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ একমন একপ্রাণ হইয়া এই সবচেয়ে সর্ব্বনাশকর Economic drain বন্ধ করুন—সবদিক রক্ষা হইবে, জাতি বাঁচিবে, দারিদ্র্য দূর হইবে। আর ইহার সহিত যদি রাজনৈতিক সুখদুঃখ জড়িত থাকে তাহারও প্রতিবিধান হইতে পারে।” Emergency বা সঙ্কটকালে কোনো বাছবিচার করা উচিত নয়, সাজেও না। সকলেরই এক বিপদ, সকলেরই সমবেত চেষ্টা দরকার; বিপদ কাটিয়া যাউক তখন যে যাঁর পৈতৃক পেশা বা শিক্ষালব্ধ বা জাতিগত কাজে ফিরিয়া যাইবেন।

তারপর এক কথা—যদি নিজ নিজ প্রধান কর্ত্তব্য বা পেশা সারা করিয়া কেহ অবসর পান চরকা ঘুরাইতে সূতা কাটিতে করুন না, ক্ষতি কি? দেশে বস্ত্রবয়ন একবার পূর্ব্বের মত সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর সকলের চরকা লইয়া পড়িয়া থাকিবার দরকার হইবে না; এই কাজেই দক্ষ ও পটু এক দল গড়িয়া উঠিবে—তখন তাহাদের পেশা হইবে সূতাকাটা, কাপড় বোনা, যেমন পূর্ব্বে ছিল, তেমনি হইবে।

কাজেই আমার মনে হয় সর্ব্বজনের পক্ষে চরকাকে বাধ্যতামূলক করার মূলে মহাত্মার এই অভিপ্রায় সম্ভবতঃ

আছে। উত্তরে কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন "মহাত্মা তো এমন ভাবে কোথাও বলেন নাই, কি করিয়া বুঝিব ইহা তাঁহার মনোগত ভাব কিনা?' আমার উত্তর...diplomacy বলিয়া একটা জিনিষ আছে—মন্ত্রগুপ্তি রাজনীতিবিদের একটা চাল্। সব কথা খুলিয়া বলিতে হইবে, কিছু মানে আছে কি? 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান!' মহাত্মার নিশ্চয়ই এ মনোভাব নয় যে প্রত্যেক লোক তার নিজ নিজ কৌলিক পেশা বা শিক্ষা ও সাধনাসাধ্য কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া কেবলি চরকা লইয়াই পড়িয়া থাকিবে। সমাজগঠন ও সমাজরক্ষার বিরোধ যে এই নীতি তাহা সাধারণ লোকেও বুঝে, আর মহাত্মার মত প্রতিভাবান ভাবুক ব্যক্তি জানেন না এ কথা সম্ভব? কাজেই মনে হয় ও মনে হইবার পক্ষে যুক্তি দেখি যে এই আসন্ন Economic সঙ্কটকালে বস্ত্রবয়ন শিল্পকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য প্রত্যেক লোকেরই সাহায্য করা উচিত। এবং সেই সাহায্য করিতেছি তাহার বাহ্য চিহ্নস্বরূপ চরকা অবলম্বন করা উচিত—কেবল যে সূতা কাটিয়া সূতা জোগাইবার জন্য তাহা নহে—সূতা কাটা যে হেয় অপমানজনক কাজ নয়, উহার যে একটা পবিত্র মর্য্যাদা আছে তাহাই অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য চরকাকে পবিত্র দীক্ষা স্বরূপ উপস্থিত সকলেরই গ্রহণীয়। "যাবৎ সংজায়তে সিদ্ধি"—

নিজের বস্ত্রশিল্প উচ্ছন্নে দিয়া বছর বছর ৬০ কোটী টাকার কাপড় কিনিয়া যে বাহুমূলে অত্যাচারের শক্তিশোণিত জোগাইতেছি সেই শক্তি অপহরণ করিলে অত্যাচার ও ধ্বংস হইতে ত্রাণ লাভ হয়—যদি কয়েক বৎসর সমবেত সাধনা বলে চরকা সাহায্যে এই শক্তি-সঞ্চার বন্ধ করিতে পারি তাহা হইলে কে না সব ফেলিয়া আগে সে কাজে অগ্রসর হইবে?

ছুঁৎমার্গ

সেদিন Statesman কাগজে দেখিলাম কে এক জন দয়ানন্দ স্বামী মহাত্মা গান্ধীকে এই বলিয়া শাসাইয়াছেন যে তিনি রাজনীতি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন করুন; ধর্ম্ম বা সমাজ-ব্যবস্থা লইয়া কোনো হুকুম করা তাঁহার অনধিকার চর্চ্চা। কেন না রাজনীতি ও ধর্ম্ম আলাদা জিনিষ এবং সনাতন ধর্ম্মের উপরে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার অধিকার বহির্ভূত। তিনি যদি এই অস্পৃশ্য জাতিকে জাতে তুলিবার হুকুম চালান, কেহ তাঁহাকে মানিবে না।

এই স্বামীজীটী কে জানি না কিন্তু ইহাঁর চোখ রাঙ্গানি দেখিয়া হাসি পাইল ও দুঃখ হইল। স্বামীজীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—কি যুক্তি বলে তিনি স্থির করিলেন যে মহাত্মাজী রাজনৈতিক পুরুষ বলিয়া ধর্ম্মনীতি লইয়া কথা বলা তাঁহার নিষেধ? দ্বিতীয়তঃ তিনি কোন যুক্তি বলে দেশব্যাপী একটা কুসংস্কারকে ধর্ম্মাচার বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন?

ভারত বিদ্বেষী Statesman পত্রিকা বুঝা গেল স্বামীজীর এই চোখরাঙ্গানিতে খুব খুসি। হইবারই কথা। এই সর্ব্বনাশকর অস্পৃশ্যতা পাপ উচ্ছিন্ন হইলে দেশের সমস্ত লোকের মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ় হইবে, ভারতে এক মহাজাতির গঠন হইয়া উঠিবে সুতরাং ইংরাজের ভেদনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদের রাজনীতির কুটনীতি ছিন্ন করিয়া দিবে ইহা একটা বিষম ভয়ের কথা কাজেই ভারতবাসীর মধ্যে এই জাতিগত দলাদলি বজায় থাকা ইংরাজের কামনা। অতএব Statesman স্বামীজীর মতাবলম্বী ত হইবেই। সে কথা যাউক এখন স্বামীজীর সঙ্গে বুঝা পড়া হউক।

স্বামীজী কি জানেন না যে ভারতবর্ষে ধর্ম্মনীতি আর রাজনীতি কদাপি ভিন্ন ছিল না। ধর্ম্মের ব্যবস্থাকারী ব্রাহ্মণই ছিল ভারতের রাজশক্তির প্রধান অবলম্বন ও ভিত্তিভূমির স্থাপয়িতা। ভারতে রাজাই ছিল ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। ভারতের সমাজজীবনে ধর্ম্ম ও রাজনীতি সমান ক্ষমতাশালী ছিল। আজ যে ভারতে ধর্ম্ম বা সমাজজীবন হীনবন্ধন হইয়াছে তাহার কারণ রাজশক্তি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশী রাজার হস্তে ন্যস্ত বলিয়া। যদি কোনো দুষ্ট প্রথা জাতীয় জীবনকে হীন করে রাজাই তাহার সংস্কার করেন। কিন্তু রাজা বিদেশী ও বিধর্ম্মী বলিয়া আজ দুষ্ট সমাজপ্রথার উচ্ছেদকরণ নিজেদের হাতেই লইতে :ছ। এসময় যদি কোনো নিঃস্বার্থপর দেশপ্রেমিক

শতধা ভিন্ন এই জাতিকে এক মহাজাতিতে গঠিত করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে দেশের সর্ব্বনাশকর কুধর্ম্মপ্রথাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। ভগবদ-গীতার প্রচারক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একদিকে সৎধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন, অপরদিকে রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন একথা কি স্বামীজী জানেন না? কুরুক্ষেত্রের মহাসমর একটা রাজনৈতিক কাণ্ড, এবং এই মহাসমর ঘটনই ধর্ম্ম-সংস্থাপনের প্রধান পন্থারূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা উল্লিখিত হয় নাই কি? রাজনীতির উদ্দেশ্য জাতীয় জীবন অক্ষুন্ন রাখা, এবং জাতীয় জীবন তাহার ধর্ম্মব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কি? পূজা জপ তপ আচার অনুষ্ঠানই কেবল ধর্ম্ম নয়। ধর্ম্মের বৃহত্তর ও ব্যাপকতর অর্থ ধরিতে রাজনীতি উহার মধ্যেই আসে। মনুসংহিতাখানা খুলিয়া দেখিলে স্বামীজির চক্ষু ফুটিতে পারিত।

দ্বিতীয় কথা :—কয়েকটা জাতি বা সম্প্রদায়কে অন্ধ গোড়ামীবশতঃ বা অহঙ্কারবশতঃ হীন বলিয়া ঠেলিয়া রাখিয়া অস্পৃশ্য বিবেচনা করা কি সনাতন উচ্চ হিন্দু ধর্ম্মের শিক্ষা? স্বামীজী যদি ছুঁৎমার্গকে সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করেন তবে সোজা কথায় বলা উচিৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিধি নিষেধ করার মত উদারতা তাঁর জন্মায় নাই এবং তিনি এ বিষয়ে চুপ করিয়া থাকিলেই ভাল হইত।

গুণ কর্ম্ম-বিভাগে নানা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই ভেদ থাকিবে। সমাজজীবনে এ ভেদ থাকিবে, কিন্তু তাই বলিয়া একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কেবল পেশা ব্যবসা ভিন্ন বলিয়াই ঘৃণা করিবার কোনো শিক্ষা বেদান্তবাদী ভারতবর্ষ দেয় নাই। আমি শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বলিয়া একজন মুচিকে ছুঁইলে যে আমার ব্রাহ্মণ্য উঠিয়া যাইবে, এ তত্ত্ব ভারতের সনাতন ধর্ম্ম কোনো কালে শেখায় নাই।

এই অস্পৃশ্যতার অপবাদ যে কত জাতির আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করিয়া দিয়া তাহাদের বৃহত্তর জাতীয় জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা কি স্বামীজী দেখিতে পান নাই? এই ভয়াবহ বিচ্ছেদ যে ধীরে ধীরে দেশের সংঘবলকে কিরূপ ক্ষীন করিতেছে তাহা উঁহার মত লোক যে দেখিয়াও দেখেন না ইহাই সব চেয়ে দুঃখের বিষয়। যে ধর্ম্ম জাতীয়প্রাণের পরিপুষ্টি সাধনে ব্যাঘাত ঘটায় তাহা ধর্ম্ম নহে মহা অধর্ম্ম। সেই মহা অধর্ম্মের মূলে যে দূরদর্শী মহা-প্রাণ কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছেন তাঁহাকে বাধা দেওয়াও যা আর দেশের সর্ব্বনাশ সাধন করাও তা। স্বামীজী ইহা মনে রাখিবেন, যে আধুনিক ভারতবর্ষে রাজনৈতিক মুক্তি আনিতে হইলে এই মুক্তির বিরুদ্ধে যে সব অপশক্তি দণ্ডায়মান তাহাদের উচ্ছেদ করিতে হইবে। এই সব অপশক্তির মধ্যে প্রধান হইতেছে সমাজের বা ধর্ম্মের কুসংস্কারগুলি। এই সব কুসংস্কার বিষের মত জাতীয় জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং যিনি ধর্ম্ম সংস্কার করিবেন তাঁহারও যেমন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করা দরকার, তেমনি যিনি রাজনীতি সংস্কার করিবেন তাঁহার পক্ষেও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা দরকার। অবশ্য এখানে ধর্ম্ম বলিতে অপধর্ম্ম। সুতরাং মহাত্মা গান্ধী ঠিক পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। স্বামীজী গোঁড়ামী বশতঃ অন্ধ ও অদূরদর্শী বলিয়া এইরূপ অর্ব্বাচীনের মত কথা কহিয়াছেন।

তিনি হয়তো বলিবেন যে ধর্ম্মবেত্তা সন্ন্যাসীই ধর্ম্ম লইয়া নাড়াচাড়া করিবেন; কিন্তু স্বামীজী কি ভাবেন যে "যিনি মামুলি ধরণের গেরুয়া পরেন ও শাস্ত্রের বুক্‌নী ছাড়েন তিনিই কেবল ধর্ম্মবেত্তা সন্ন্যাসী? মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত জীবনের ধর্ম্ম ও ত্যাগপূর্ণ আদর্শ দেখিয়াও কি বলিতে চান যে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনধিকারী?

মহাত্মা বিবেকানন্দ তো ধর্ম্ম-সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁর সারা জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল ভারতের রাজনৈতিক মুক্তি সাধন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে এ জাতের রাজনৈতিক মুক্তি না ঘটিলে ধর্ম্ম-সংস্কার অসম্ভব। তিনিই না বলিয়াছিলেন "এদেশের একটা কুকুর যতক্ষণ অভুক্ত থাকিবে ততক্ষণ আমার ধর্ম্ম নাই!" দয়ানন্দ স্বামীজী কি স্বামী বিবেকানন্দের চেয়েও বড় ধর্ম্মবেত্তা। হরি হরি! দয়ানন্দ স্বামীজী জানিয়া রাখুন ভারতের ত্রিশ কোটী জন-সংঘ সেই মতকেই মনে জ্ঞানে অনুসরণ করিবে, কিন্তু তাঁর মত অন্ধবিশ্বাসী সন্ন্যাসীর কথা কেহ মানিবেনা।

এই অস্পৃশ্যতা পাপের জন্য মনে অনুতপ্ত নয় এমন শিক্ষিত ভারতবাসী খুবই কম। সকলেই বুঝিয়াছেন—কার্য্যতঃ পারুন আর নাই পারুন যে অস্পৃশ্য বলিয়া যাহাদের আমরা হেয় বর্জ্জনীয় করিয়া রাখিয়াছি তাহারা সত্যই হেয় নয়। এই পাপেই আজ আমরা বিদেশীর চোখে হেয় হইয়া আছি। ধর্ম্মের নাম দিয়া যে অধর্ম্ম আমরা আচরণ করিয়া আসিতেছি তাহারই পাপের ফলে এই জাতির বন্ধন দশা !

ম্যালেরিয়া

সেদিন বাঙ্গালার ব্যপস্থাপক সভার অধিবেশনে ডাক্তার শ্রীযুক্ত যতিন্দ্রনাথ ম্যালেরিয়া নিবারণ পন্থা নির্দ্দেশের জন্য বজেটে ১৩ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারণের প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই; স্বাস্থ্যমন্ত্রী বুঝাইয়া বলিলেন—এত টাকা ব্যয় করিবার মত অর্থ বাঙ্গালার রাজকোষে নাই। উহা নূতন ট্যাক্স বসাইয়া বা ধার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে।

এ উপায়ে টাকা যা উঠিবে তা মা জগদম্বাই জানেন। বাঙ্গালার নিরন্ন অর্দ্ধভুক্ত প্রজাবর্গ একেই করভারে পীড়িত, আবার নূতন কর দিতে হইলে তাহাদের যে অবস্থা কি হইবে তাহা বুঝা যায়। আসল কথা মরণোন্মুখ এই জাতিটাকে বাঁচাইয়া তোলার যে আশু প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে তাহা সরকারকে কেহ বুঝাইতে পারিতেছে না সরকারও বুঝিয়া বুঝিতেছেন না, ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয় !

ইংরাজের মত ধনসম্পত্তিশালী একটা শাসকজাত তাঁহাদের অধীনস্থ একটা অসহায় রোগজীর্ণ জাতিকে অর্থাভাবে মৃত্যুর কবল হইতে বাঁচাইতে পারিতেছেন না ইহা কে বিশ্বাস করিবে? আর এই অর্থের অনাটন কি একটা ওজর সেই জাতির পক্ষে যাঁহারা নিজেদের সংকটের সময় এই দীনদরিদ্র দেশের নিকট হইতে ৩০০ কোটী টাকা ধার বা দান লইয়াছিলেন! ভারত সরকার কি অন্ততঃ একটা বৎসরও এমন করিয়া আয় ব্যয়ের বজেট করিতে পারেন না, যাহাতে এই ১৩ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হইতে পারে? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে লক্ষ লক্ষ টাকা ও দিল্লীর সৌখীন রাজধানী গঠনে কোটী কোটী টাকা ও আনন্দ উৎসবের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা তো অনায়াসে জলের মত ব্যয় হইতেছে? এসময় তো টাকার অভাব হয় না? স্বজাতীয় মুষ্টিমেয় পোষ্যবর্গকে সুখস্বচ্ছন্দে রাখিবার বেলায় তো মাহিয়ানার অবাধ বৃদ্ধি হইতেছে আর সমগ্র জাতি আজ দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ায় ধ্বংসমুখে চলিয়াছে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য তো কোনো ব্যাকুলতা দেখা যাইতেছেনা?

দেখিয়া শুনিয়া লোকের মনে কি ধারণা হয় খুলিয়া বলিলেই যত অপরাধ! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আজ যদি ইংলণ্ডের কোনো প্রদেশ একটা মারীরোগে উৎসন্ন যাইত তাহা হইলে এই ধনকুবের অপরিমেয় শক্তিপ্রভুত্বশালী শাসকজাতি কি অর্থাভাবের অজুহাতে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতেন?

ইংরাজ বিশ্বদরবারে বলিয়া বেড়ান, ভারতবাসী নাবালক, আত্মশাসনের বুদ্ধিশক্তি তাহাদের নাই, তাই উঁহারা পিতৃস্থানীয় হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে তাহাদের পালনভার হাতে লইয়াছেন এবং যতদিন না তাহারা সাবালক হইয়া আত্মশাসনের উপযোগী হয় ততদিন সে ভার তাহাদের অক্ষম হাতে দিতে নারাজ। স্বীকার করিলাম আমরা নাবালক; তারপর জিজ্ঞাস্য এই যে এই নাবালকদল অন্নাভাবে, চিকিৎসাভাবে, বৈদ্যাভাবে মরিতে চলিয়াছে; পিতৃস্থানীয় সরকার বাহাদুরের এ ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যটা কি তাহা কি বুঝাইয়া দিতে হইবে?

গরিব পিতামাতা ঋণ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসা করে, বড় লোক পিতামাতার তো কথাই নাই। আমাদের পিতৃস্থানীয় সরকার বাহাদুর কি একটা দীন দরিদ্র অসহায় জাতি? এই বিশাল ভারতবর্ষ-দত্ত বিপুল রাজস্ব হইতে কি বৎসরে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব? যে ভারতবাসী রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহাদের সংকটের সময় ৩০০ কোটী টাকা দান করিয়া ফেলিতে পারিয়াছিল, সেই ভারতবাসী নিজের প্রাণসংকট ব্যাপারে কি কয়েক লক্ষ টাকা ধার দিতে রাজী হইবেনা? যে ইংলণ্ড নিজের বিপদের সময় এই নিরন্ন

কাঙ্গাল জাতির কাছে ঋণ লইতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই আজ কৃতজ্ঞতার চিহ্নরূপেও সেই ভারতকে এই প্রাণসংকটের সময় কি কয়েক কোটী টাকা নিজ রাজকোষ হইতে ধার দিতে পারেন না এই বলিয়া যে—হে ভারতবাসী প্রজাবর্গ তোমরা অসময়ে আমাদের অর্থ ও লোক সাহায্য করিয়া বড় উপকার করিয়াছিলে—আজ তোমাদের একটা প্রদেশ করাল ব্যাধির প্রকোপে পড়িয়া উৎসন্ন যাইতেছে তোমাদের রাজকোষে টাকা নাই তোমরাও নিজের পকেট হইতে দিতে অক্ষম, কেননা তোমাদের এক বেলাও পেট ভরিয়া খাওয়া জোটেনা, অতএব আমরা আজ তোমাদের এই দুঃসময়ে কিছু অর্থ সাহায্য করিতেছি" :—

আজ যদি ভারতবর্ষ ইংরাজের স্বজাতীয় স্বধর্ম্মী লোকেরই বাসভূমি হইত যদি ভারত ইংলণ্ডেরই একটা অন্তরঙ্গ অংশ হইত, তাহা হইলে শাসকদল বোধ হয় চোখের উপর এই ধ্বংসলীলা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিত না; আর বাজে আমোদপ্রমোদে এই হতভাগ্য জাতির কষ্টার্জ্জিত অর্থকে জলের মত অপব্যয় করিত না! কে বলিবে? কে দেখাইয়া দিবে? কার এত গরজ? যাহাদের গরজ যাহারা দেশের এই দুরবস্থা দেখিয়া ভাবনায় আকুল তাহারা সরকারচক্ষে শত্রুস্থানীয়! আর যাঁহারা দেশের এই দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার ভার লইয়া শাসকসম্প্রদায়ের সন্তোষ সাধনেই তৎপর তাঁহাদের চেষ্টা যাহাতে সরকারকে এই অর্থের জন্য বেগ পাইতে না হয়, বা সরকারী রাজস্ব হইতে ইহার ভার বহন করিতে না হয়! এ কেবল ভারতবর্ষের মত হতভাগ্য দেশেই সম্ভব যে দেশেরই সন্তান দেশের সেবা করিবার অজুহাতে নিজের পদমর্য্যাদা ও পারিতোষিক পুরামাত্রায় বুঝিয়া লইয়া দেশের রোগ প্রতীকারের জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে চান অস্থিচর্ম্ম সার দেশের লোকের হাড় মাংস নিংড়াইয়া!

উপযুক্ত শক্তি ও অর্থবল থাকিতেও যদি কোন বিদেশী রাজশক্তি তদধীনস্থ দুর্ব্বল জাতির ধ্বংসগতিতে বাধা না দেন তাহাতে স্বতঃই লোকের মনে এই সন্দেহ হয় বুঝিবা এ জাতির চিররুগ্নতা ও দুর্ব্বলতা উঁহাদের বাঞ্ছনীয়! এজাতি খাইয়া পরিয়া রোগমুক্ত হইয়া সুস্থদেহমনে বাড়িয়া উঠিলে বুঝিবা তাহাদের মনে জাতীয় স্বাধীনতার সাধবাসনা জাগিয়া উঠে, এই বুঝি তাঁহাদের ভয়। কিন্তু যে জাতির সার গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের জাতীয় শরীরে রক্ত বৃদ্ধি, সেই জাতির রক্ত ক্ষয় হইলে আসলেতো তাঁহাদেরই ক্ষতি? ভারতের জনসংঘ অর্থে সামর্থ্যে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিলে তো তাঁহাদেরই মঙ্গল, একথা কি দুর্দ্ধর্ষ রাজনৈতিকেরা বুঝেন না?

আমরা মূক মূঢ়, বাকশক্তিহীন আমাদের চেষ্টা চারিদিক দিয়া সীমা নির্দ্দিষ্ট, আমাদের এই মরণ-আর্ত্তনাদ শক্তিসুখ ও ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ইংরাজের কানে পৌছিবেনা—যে সব দেশসেবকের উক্তি গ্রাহ্য হইতে পারে, যাঁহারা এই আসন্ন বিলোপ ভয়ে কাতর তাঁহাদের কাতর উক্তিও ইংরাজের কানে উঠিতেছেনা—কাজেই এই জাতীয় উচ্ছেদরূপ বিপদের প্রতিকার কি ভাবে হইবে বুঝা যায় না।

দেশ যে স্বরাজ চায় এই দুঃখে। আজ যদি ইংলণ্ডেরই এই ব্যাধিঘটিত ধ্বংস শঙ্কা জাগিত তবে কোন্ কালে ইহার প্রতিকার হইত। একদিকে ইংলণ্ডের প্রদেশ বিশেষে লোকক্ষয় হইতেছে অপর দিকে জাতীয় অর্থ অবাধে অপব্যয় হইতেছে, এই অসম্ভব দৃশ্য সেখানে দেখা যাইত না। আর সেক্ষেত্রে ইংলণ্ডের শাসনসভার সাধ্যও থাকিতনা জাতীয় স্বাস্থ্যকে অগ্রাহ্য করিয়া সরকারী অর্থকে নানা বাজে আমোদ প্রমোদে অপব্যয় করা! সেরূপ ঘটিলে দেশপ্রেমিক ইংরাজ রাজনৈতিক বক্তার জলদগর্জ্জনে পার্লেমেণ্ট ভীত ও চকিত হইয়া পড়িত!

কিন্তু ভারতের কথা আলাদা! ভারতের দুর্ভাগ্যদলে এখানে যাহারা যথার্থ দেশবৎসল দেশপ্রেমিক তাহারাই বিশ্বজগতের সমুখে দেশের শত্রু বলিয়া প্রচারিত ও নির্য্যাতিত হয়! আর যাহারা দেশেরঅর্থে দেহের পুষ্টসাধন করিয়া দেশের রোগতাপ দুঃখদৈন্য অভাবঅভিযোগ চাপাদিয়া মনিব প্রিয় হইতে ব্যস্ত তাহারাই সরকার চক্ষে দেশের সত্য বন্ধু।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীবর সত্যই কি বিশ্বাস করেন গভর্ণমেণ্ট অর্থব্যয় করিতে অক্ষম? এবং ঋণ বা ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করত এতবড় একটা সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে?

আমাদের জীবনটাতো কাটিয়া গেল ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি থিওরী নিরাকরণ করিতে; আর কমিশন বসা দেখিতে! অথচ বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিতেরা কি স্বীকার করেন না, উদরে পুষ্টিকর খাদ্য না পড়াতে দেহে তাজা রক্ত না জমিতে পাওয়াতেই ম্যালেরিয়ার ক্রমশঃ জনক্ষয় হইতেছে? এই দেশেইতো সাহেবেরা আছেন আজ ২০০ বৎসর হইতে—তাহাদের কয়টা ম্যালেরিয়ায় মরে? অথচ এই জল বাতাসে এই মাটিতে বাস করিয়া এদেশের লোকেরা দিন দিন নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে! কেবল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে—আর এই খাদ্যাভাব দারিদ্র্যের ফল—প্রধানতঃ কাহার দোষে যে বাঙ্গালী জাতি ধ্বংসোন্মুখ এ লইয়া তর্ক হইতে পারে, কিন্তু তর্কের স্থান নাই—দোষ সম্পূর্ণ দেশের শাসক সম্প্রদায়ের। হইতে পারে আমরা অলস, শ্রমবিমুখ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ; যে যা বলেন সবই আমরা; কিন্তু আমার উত্তর এই—নাবালক ছেলে বা ওয়ার্ড যদি অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অলস, শ্রমবিমুখ, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হইয়া দুঃখ পায়, বা রোগে ভোগে, বা মরে, তথাপি সমস্ত দোষ পিতা বা অভিভাবকের। ইংরাজই বলেন আমরা অজ্ঞ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, মুর্খ, অলস ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আদর্শ অভিভাবকেরই কর্ত্তব্য যাহাতে তাহার ওয়ার্ড উক্ত দোষযুক্ত না হয়, বা হইলে তাহার সংশোধন করা। এই ইংরাজজাতি এককালে উক্ত দোষসম্পন্ন ছিল, তাহাদের ভাল করিল কে? তাহাদেরই শাসকসম্প্রদায় সুশাসন গুণে জাতিকে উন্নত ও স্বাস্থ্যকর, কর্মঠ করিয়া তুলিয়াছে। এদেশে রাজা ইংরাজ, কাজেই রাজধর্ম্ম অনুসারে প্রজার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ঘটানো তাঁহাদের উচিত। নাবালকের স্বাস্থ্য খারাপ হইলে তার জন্য দোষী তার অভিভাবক, যাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের ও কর্ত্তব্যকরণের শক্তির অভাবেই নাবালক রুগ্ন ও স্বাস্থ্যহীন। তেমনি আত্মশাসনে অক্ষম এই জাতি যদি অলসতা, অজ্ঞতা ও মূর্খতা দোষে রোগে ভুগিয়া মরণাপন্ন হয় তবে তার জন্য দায়ী তাহাদের ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট অভিভাবকস্থানীয় ইংরাজ রাজ—যাহারা আত্মশাসনে অক্ষম বলিয়া স্বরাজ লাভের যোগ্য নহে তাহারা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার যোগ্য নয়; এ সময় ও এ ক্ষেত্রে তাহাদের দোষ দিলে চলিবে কেন? আর যদি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস থাকে এই জাতি নিজের চেষ্টায় স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করুক তবে সভ্য ইংরাজরাজের স্পষ্টভাবে অকৃত্রিম মনে তাহাদের সেই সুযোগ দেওয়া উচিত। অর্থাৎ দেশব্যাপী ম্যালেরিয়া দমনের জন্য যে পরিমাণ অর্থ-বলের দরকার তাহার আয় ব্যয়ের ভার উহাদের হাতে দেওয়া হউক। পয়সায় আমাদের অধিকার নাই অথচ দেশকে রোগমুক্ত করিবার ভার দেশীয় মন্ত্রীর উপর! এ হাস্যকর শাসন অভিনয় কেবল হাত পা বাঁধা মুক ভারতবর্ষের মত অধীন দেশেই সম্ভব!

উল্কা-পাত

[শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

উদার আকাশ নীল-নির্ম্মল কিরোণোজ্জ্বল ধরণী,
শান্তমধুর বিমলকান্ত স্নিগ্ধ হরিৎ-বরণী।
শ্যামল-নব-পল্লব-দল ছল-ছল-ছল শিশিরে,
ঘন-বনবীথি মুখরিত, গীতি ভেসে যায় দশদিশিরে।
শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় কচিকিশলয় ধরিয়া,
নবীন জীবন সরসধারায় উঠিয়াছে যেন ভরিয়া!
চুম্বনে জরা যৌবন পায়, মৃত পায় প্রাণ চকিতে
অসাড় জাগিয়া সাড়া দিয়ে ওঠে জড়ের পাষাণ রুখিতে।
কলি ফুটে ওঠে ফুল হয়ে' ফুল আপনা বিলালো গন্ধে
মধু পিয়ে প্রাণ বঁধুয়া বিভোর গায় নানা সুরে ছন্দে।
উতালা বাতাস মাতাল হইয়া শুধু করে যাওয়া আসা যে,
চারিদিকে রটে যে নীরব কথা কাহার প্রাণের ভাষা সে?
ইন্দ্রধনুর সাতরঙে রাঙা আজিকে পরাণ লীলাময়
বন্ধুর পথে ঝরঝর ঝরে নির্ঝর,—সরে' শিলাচয়।
উলসি বিলসি কূলে কূলে ভরা অসীমে চলেছে তটিনী'
যৌবন যেন ধরেনা বক্ষে নৃত্যচপলা নটিনী।
তরুণ অরুণ-কিরণ আসিয়া পরশ বুলায় নিখিলে
হৃদয় জাগিয়া কহে চুপিচুপি—'গত নিশি তারে কি দিলে?
সকাল বেলায় বোকুল তলায় খেলার মালাটী নিলে যে
শত জনমের আশ মিটাইয়া কি মাণিক মোরে দিলে সে?
নিমেষে কাটিল সারা দিনমান তন্দ্রা-বিবশ-নয়ানে
শ্যাম-তরুছায়ে আঁচল বিছায়ে অলস-আবেশ-শয়ানে।
সন্ধ্যার মেঘ ঢেলে দেয় রঙ, সেকি হোরিখেলা আকাশে
দূর সাগরের অজানা গানের সুর ভেসে আসে বাতাসে;

আমার নিশায় শুধু চাঁদ ওঠে' বসে' তারকার বিপণি
শুধু জ্যোৎস্নার গাঢালা আবেশ মুখচেয়ে বুকে কাঁপনি।
দূর হ'তে শুনে বাঁশীর আওয়াজ প্রিয়-অভিসারে চলেছি,
স্বপনের ঘোরে না-জানি কি কথা, কার কানে কানে বলেছি;
সেযে প্রিয়তম মনের মাণিক বুকের রক্ত জীবনে
বুক জুড়েছিল' মর্ম্মর মাঝে আমারি রচিত ভবনে।
আঙিনায় তার পায়ের চিহ্ন তারি করাঘাত দুয়ারে
রূপ নিয়ে ফেরে চারিদিকে মোর তাহারি মধুর মায়ারে!

* * * *

পঞ্জর মাঝে তারি নিশ্বাস বক্ষের মাঝে তারি কম্পন উঠেছে,
সারা দেহময় তাহারি আবেশ মনময় সে-ই ভাব হয়ে আজ ফুটেছে।
নয়নে তাহার অপরূপ রূপ, কানে কানে তার মধুময় ভাষা জাগিয়া,
নিশিদিন শুধু আমার অধরে, তারি অধরের পরশন-মধু লাগিয়া।
হৃদয়ে বাহিরে তারি ফুলদোল, তারি হোরিখেলা উতরোল
হর্ষের এ কি হিল্লোল উঠে' সারা প্রাণে আজ ছায় দোল।

* * *

একি হলো কোথায় সে মোহিনী প্রকৃতি
অনুপরমাণু তার জাগাইয়া দেয় প্রাণে ভীতি।
প্রতি অঙ্গে ক্ষত তার, দীর্ণ বুকে ফেলিছে নিশ্বাস
মৃত্যুর কিনারে এসে কাঁপে প্রাণ, শঙ্কিত বিশ্বাস;
ঐ কাঁপে ধরণীর স্বর্ণাঞ্চল, প্রভঞ্জন আসে
উপাড়িয়া তরুশ্রেণী, মহাবট কাঁপিছে তরাসে।
সাগর হয়েছে' ক্ষুব্ধ, তোলে হাত ভাঙ্গিতে আকাশ
তটিনী নাগিনী সম ফেলে যেন বিষের নিশ্বাস!
উত্তাল তরঙ্গ ভরে' ভেসে যায় ফুল ভারে ভার
অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কলি সৌন্দর্য্যের আনন্দসম্ভার!
ভ্রমর গুঞ্জনহীন নিরাশ্রয় পিক খুঁজে ঠাঁই
আহত ব্যর্থতা শুধু বুক চিরে বলে 'নাই নাই'!
সূর্য্য ঢাকে ক্রোড়ে মুখ, চন্দ্র লুকাইল অন্তরালে
ত্রস্ত প্রপীড়িত আশা ম্রিয়মান দিক্ চক্রবালে।

আমার মনের মণি নিতে চায় কোন্ সে শয়তান
প্রাণ ছিঁড়ে প্রিয়তমে নিতে চায় এত শক্তিমান্?
তিলে তিলে জমাইয়া রাখিয়াছি যেই ধন পুষে'
সেই সে বুকেররক্ত নিশ্বাসে সে নিতে চায় শুষে?
একদণ্ডে পণ্ড করি' উৎসবের সব আয়োজন
কেমনে কাড়িয়া লবে পরাণের প্রিয়তম ধন?
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া প'ড়ে সৌন্দর্য্য নিমেষে হলো' হত
কোন্ দৈত্য অত্যাচারী নিল' আজ সর্ব্বধ্বংসী ব্রত?
ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা ঘনাইয়ে উঠি' অকস্মাৎ
বিদ্যুৎস্ফুরণ সনে হানিল কি ভীম উল্কাপাত?

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

নারীর স্বাতন্ত্র্য বাস্তব হইয়া উঠিতে থাকিবে তখনই যখন সে পাইবে আর্থিক (economic) স্বাধীনতা। প্রথমে অবশ্য চাই ভিতরের স্বাধীনতা, মনের মুক্তি, গতানুগতিক সংস্কার হইতে অভ্যাস হইতে অব্যাহতি, চাই অন্তরে এবং অন্তরের অন্তরে স্ব'এর, ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন; এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা এবং শিক্ষারও বেশী দীক্ষা। কিন্তু ভিতরের জিনিস রূপ লইতে পারে বাহিরেরই আশ্রয় অবলম্বনে; বাহিরের একটা প্রতিষ্ঠা না পাইলে, অন্তরের সত্য পাকা হয় না, প্রকাশের পথ পায় না। সুতরাং নারীর আত্মার ও মনের স্বাতন্ত্র্যকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাকে লাভ করিতে হইবে শরীর ও প্রাণধারণের স্বাতন্ত্র্য। এই কথাটা পাশ্চাত্যের এক জন স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী নারী বড় সুন্দর ও সরলভাবে বলিয়া ফেলিয়াছেন—How can you be courageous when you have not a penny and are incapable of earning one—যখন একটি পয়সা নাই, একটি পয়সা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতাটি পর্য্যন্ত নাই তখন তোমার জোর আসে কোথা হইতে? ফলতঃ ইউরোপে বা আমেরিকায় মেয়েরা সমাজে নিজেদের যতকুটু স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে, তার মূলে আছে তাহাদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যেদিন Married Woman's property Act পাশ হইল, সেইদিন হইতেই ইংলণ্ডে মেয়েদের সামাজিক জীবনে নূতন যুগের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

আমাদের দেশে মেয়েরা অন্নবস্ত্রের জন্য পুরুষের যে কতখানি দাস তাহা বলাই বাহুল্য। বিবাহের মন্ত্রের মধ্যেই মস্ত একটা আধ্যাত্মিকভাবে মণ্ডিত করিয়া—ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, পুরুষের ভার নারীর ভরণপোষণ আর নারীর ভার পুরুষের সেবা। স্বাধীন উপজীবিকার কথা দূরে থাকুক, দানস্বরূপ হউক আর উত্তরাধিকার স্বরূপেই হউক নারীর ধনসম্পত্তি গ্রহণে ও ভোগে ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা যত সব

আঁটঘাট বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের এই উদ্দেশ্যটাই কেবল ফুটিয়া উঠিয়াছে—নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি। স্ত্রীধন সম্বন্ধে কাত্যায়ন এই সাধারণ নিয়মটি করিয়া দিয়াছেন—

প্রাপ্তং শিল্পৈস্তু যদ্বিত্তং প্রীত্যাচৈব যদন্যতঃ।

ভর্ত্তুঃ সাম্যং ভবেৎ তত্র শেষন্তু স্ত্রীধনং স্মৃতং॥

অর্থাৎ, স্ত্রী চেষ্টা করিয়া নিজে যা উপায় করুক অথবা অপরে তাহাকে যা দান করুক, সে সমস্তে স্বামীরও অধিকার আছে; তবে স্ত্রীর নিজস্ব ধন বলিতে যদি কিছু বুঝায় তবে তাহা হইতেছে ঐ শেষোক্ত দানের ধন। অবশ্য একথাটাও এখানে উল্লেখ না করিলে ব্যবস্থাকারদের প্রতি অন্যায় করা হইবে যে তাঁহারা এমন স্ত্রীধনেরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যাহার উপর স্ত্রীদের পূর্ণ ও যথেচ্ছ অধিকার আছে, তাহাতে পিতাপুত্র ভ্রাতা এমন কি স্বামীরও পর্য্যন্ত দান বিক্রয়ের কোন সত্ব নাই। কিন্তু তবুও ফাঁক রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে—এমন অনুশাসন সব হাতে রাখা হইয়াছে যাহার বলে স্ত্রীর এই অধিকার বিনাক্লেশে বাতিল হইয়া যায়। সে যাহা হউক, শাস্ত্রে যাহাই থাকুক, কার্য্যতঃ আমরা দেখি স্ত্রীর নিজস্ব কিছু থাকা অর্জ্জন করা যেন পুরুষের কাছে একটা ভীষণ অস্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়, স্ত্রীর যাহা সব তাহার উপর পুরুষের জন্মগত ভাগ্যগত অধিকার আছে! গল্প শুনা যায়, ইংলণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতার হৈ চৈ দেখিয়া শুনিয়া একটি গেঁয়োলোক চটিয়া গিয়া টেবিলে ঘুষি মারিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—Do you mean to tell me that if my missus had a hundred pounds left her I couldn't spend it without asking her first, "তোমরা কি বল্‌তে চাও আমার বউকে শ'খানেক গিনি যদি কেউ রেখে যায় তবে তাকে আগে জিজ্ঞেস না ক'রে সেটা আমি খরচ করতে পারিনে?" অনেক শিক্ষিত লোকই যে এই গেঁয়োলোকটির মতে—মুখে না হউক মনে মনে মত দিবেন তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিয়া দিতে পারি।

আমাদের দেশে তথা কথিত ছোটলোকের ঘরের মেয়েদের যা কিছু বা স্বাধীন উপজীবিকার প্রয়াস ও অবকাশ আছে; কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েদের তাহা পর্য্যন্ত নাই। শুধু তাই নয়, ভদ্র ঘরের মেয়েদের পক্ষে রোজগার করা একরকম অপমান। অন্নহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় থাকিব, তাও ভাল কিন্তু নিজে উপার্জ্জন করা শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ! মৃত্যুকে বরং বরণ করিয়া লইব, কিন্তু পুরুষের ধর্ম্ম নিজের উপর লইব না। আপত্তি যে কেবল মেয়েদের দিক হইতেই তাহা নয়; সমাজের একটা সমবেত চাপ মেয়েদের ইচ্ছা থাকিলেও, সে ইচ্ছাকে দাবিয়া চাপিয়া রাখে। আমরা একটি ঘটনা জানি, সেটি উল্লেখ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের কি রকম অবস্থা। একটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ঘরের নিতান্ত সহায়হীন দুটি মেয়ে আর কিছু উপায়ান্তর না দেখিয়া শেষে ঘরে বসিয়া বাঁশের চুপড়ি বানাইত আর একটি সহৃদয় ছেলেকে দিয়া সে সব বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দিত; ইহাতে যাহা কিছু লাভ হইত তাহাতেই কোনরকমে উভয়ের দিন চলিত। কিন্তু কথাটা যখন সমাজপতিদের কানে উঠিল তখন তাঁহারা সকলে একেবারে মার মার করিয়া আসিয়া পড়িলেন, "একি অনাচার! কি ঘোর কলিকাল! ব্রাহ্মণের মেয়ে হাঁড়ি ডোমের কাজ করে!" তাঁহারা ছেলেটিকে শাসাইলেন, মেয়ে দুটিকেও ভয় দেখাইলেন—আবার একথাও বুক ফুলাইয়া বলিলেন, তাঁহারা থাকিতে ব্রাহ্মণ কন্যার অভাব কিসের? কিন্তু তার পর অভাগা মেয়ে দুটির অনাহারে প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল—ভাগ্যগতিকে একটা উপায় হইয়া গিয়াছে। মেয়েরা যে কোন অবস্থায় কোন রকম স্বাতন্ত্র্য পাইবার উপযুক্ত নয় সনাতন ধর্ম্মের সে ব্যবস্থার এ একেবারে চূড়ান্ত প্রয়োগ।

কিন্তু তবুও কথাটা কেবল জীবনধারণের কথা নয়। এই একান্ত পরবশ্যতা, শুধু পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা, ইহাতে নারীর অন্তঃকরণ কতখানি দীন হইয়া থাকে, তাহার মন প্রাণ কতখানি অজ্ঞানের মধ্যে ভুলের মধ্যে ডুবিয়া যায়, সেই কথাটির উপরই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। কথায় আছে, অভাবে স্বভাবনষ্ট। বাস্তবিক নারী যখন জানে অনুভব করে তাহার কিছুই নাই, আছে কেবল অভাব, আর সেই অভাব পুরণ করিয়া দিতেছে ও দিতে পারে কেবল পুরুষে তখন তাহার স্বভাব তাহার

নারীর অনেকখানি সঙ্কুচিত অনেকখানি আপনা-হারা হইয়া যায়। স্বভাবের সত্য স্বরূপ সেখানে ফুটিয়া উঠিতে পারে না, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি বিকৃত সংস্কার, কতকগুলি মিথ্যার ময়লা জমিয়া যায়। কি'রকমে, বলিতেছি।

আমাদের দেশ নাকি সীতা সাবিত্রীর দেশ। আমাদের সমাজের বিশেষত্বও এই যে, নারীর এমন অকুণ্ঠিত আত্মদান এমন অটুট একনিষ্ঠা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; আমাদের নারীর নারীত্ব জগতে অতুলনীয়। বাহির হইতে যখন দেখি কথাটা যেন খুবই সত্য বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিতে গেলে, ব্যাপারটার মধ্যে এমন সব জিনিষ ধরা পড়ে যাহাতে আমাদের সে সহজ সরল বিশ্বাসকে অনেকখানিই টলাইয়া দিয়া যায়। আমরা বুঝতে পারি আমাদের মেয়েদিগকে কতখানি ধরিয়া বাঁধিয়া সতী সাবিত্রী করিয়া তোলা হইয়াছে, উপায়ন্তর নাই দেখিয়াই তাহারা কতখানি তাহাদের প্রশংসিত পুণ্যধর্ম্মগুলি আপনার করিয়া লইয়াছে—they have made a virtue of necessity. আপনাকে চিনিবার জানিবার আগে হইতেই আমাদের মেয়েরা শুনিয়াছে, দেখিয়াছে, শিক্ষা পাইয়াছে যে পুরুষের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা ছাড়া তাহাদের অন্য গতি নাই; সমাজের আবহাওয়া, অতীতের অভ্যাস মেয়েদের প্রাণে অজানিতেই এই সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে যে পুরুষের গলগ্রহ তাহাকে হইতেই হইবে—এব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। কেবল ভাবজগতে—মনে প্রাণে এই সংস্কারটি থাকিলেওবা কতক রক্ষা ছিল; কিন্তু বাস্তব ব্যবস্থাও এমন করা হইয়াছে যে শরীরটিকেও ঐ সংস্কার অনুযায়ী বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই, নিজের নিজত্বের সহিত যখন সে কিছুমাত্র পরিচয় স্থাপন করিতে পায় নাই তখনই আমাদের সমাজে মেয়েকে একটি জড়-পুঁটুলির মত পুরুষের সাথে উদ্বাহ-সূত্রে গাঁথিয়া দেওয়া হয়—পুরুষকে উদ্বাহ হইয়াই সে ভারটি বহন করিতে হয়। শিশুকাল হইতেই পরের উপর যে একান্ত নির্ভর করিতে অভ্যস্ত হইতে থাকে, হঠাৎ একদিন জ্ঞান হইলেও সে দেখে এই পর ছাড়া সে একেবারে নিরুপায়, দাঁড়াইবার তাহার স্থানও নাই সামর্থ্যও নাই; কাজেই এই জ্ঞানটিকেও চাপা দিয়া ফেলিতে চায়, ইহার চারিদিকে একটা ধর্ম্মের পুণ্যের জাল বুনিয়া ফেলে। "স্বামীর অভাবে আমার কি উপায় হইবে"—মেয়েদের এই চলিত কথাটির মধ্যে যথার্থ প্রাণের অর্থাৎ অন্তরাত্মার সহিত অন্তরাত্মার মিলের টান কতখানি আর কতখানিই বা নেহাৎ আধিভৌতিক অর্থাৎ আশ্রয়ের অন্নবস্ত্রের আশঙ্কা লুকাইয়া আছে সে প্রশ্ন আমাদের আত্মাভিমানকে আঘাত দিতে পারে, কিন্তু সত্যকে ত বদলাইতে পারে না। শত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিলেও, মানুষের বাঁচিয়া বৰ্ত্তিয়া থাকিবার বৃত্তিকে, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রেরণাকে কেহ নাকচ করিয়া দিতে পারে না—এ একেবারে মানুষের গোড়ার বৃত্তি গোড়ার প্রেরণা। সুতরাং যখন দেখি আমার এই বৃত্তি এই প্রেরণা আর একজনকে ভর করিয়া চরিতার্থ হইতেছে তখন যে তাহাকে দ্বিগুণ জোরে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিব তাহাত খুবই স্বাভাবিক। তবে মানুষ পশু নয়, তাই এই আনকোরা প্রাকৃত বৃত্তিকে প্রেরণাকে একটু ঢাকিয়া চুকিয়া সাজাইয়া রঙাইয়া ধরে, অথবা বড় জোর বাস্তবিকই অন্য কতকগুলি উচ্চতর বৃত্তির সাথে মাথাইয়া মিশাইয়া দেয়; কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের অস্তিত্ব যে থাকে না বা তাহাদের জোর কিছুমাত্র কমিয়া যায় তাহা মনে করা বিষম ভুল, সেটা আত্মপ্রবঞ্চনা। আমাদের সমাজে নারীত্বের আত্মদান একনিষ্ঠা প্রভৃতি বড় বড় কথার নীচে এইরকম একটা অপ্রীতিকর গোপন ইতিহাস, একটা ট্র্যাজেডিই আছে তাহা কেহ খোঁচাইয়া দেখিয়াছেন কি? আমাদের মেয়েরা পতিকে দেবতা মনে করিয়া ভক্তি করে কিন্তু সেই ভক্তির উৎস কতখানি যে ভয়—দেবতা হারাইলে পাছে দেবতার ভোগের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হই—এ কথাটা খুব রূঢ় শুনাইতে পারে, কিন্তু জিজ্ঞাসুর ত তাই বলিয়া পশ্চাদ্‌পদ হওয়া চলেনা।

মেয়েরা যে গোড়াতেই পুরুষদের কাছে, যাহাকে বলে, ভাতে মরিয়া রহিয়াছে। এই গোড়ার বন্ধনটি মুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে নারীর স্বভাব স্বধর্ম্ম কি চায়, কি ভাবে চলে; পুরুষের সহিত তখন সে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিবে তাহার মধ্যে আর কিছু না থাকুক দাতার

ও গ্রহীতার, মনিবের ও দাসের যে একটা অস্বস্তিকর অস্বাস্থ্যকর সম্বন্ধ সেটির কোন ছায়া পড়িবে না—উভয়ের মধ্যে দুটি মুক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠ সত্তার সত্য সম্বন্ধ দাঁড়াইবার সুযোগ হইবে। আধ্যাত্মিক হিসাবে ইহাতে নারীরও মঙ্গল পুরুষেরও মঙ্গল; সমাজেরও ব্যবস্থা একটা নূতনতর স্বাভাবিকতর সত্যতর রূপকে ফলাইয়া ধরিতে পাইবে। আধিভৌতিক হিসাবেও—বিশেষতঃ বর্ত্তমানের অন্নকষ্টের দিনে সকলের সুবিধা হইবে। আমাদের হিন্দুসমাজের অসহায় বালিকাদেরও আর যেনতেন প্রকারে বলিদান দিতে হইবে না, পুরুষদেরও যে ভার ক্রমে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে তাহার লাঘব হইবে—সমাজের যে অর্দ্ধেকভাগ এখন কেবল খরচই করিয়া আসিতেছে তাহারও জমার দিকে কিছু নজর দিলে গোটা সমাজ সমৃদ্ধতরই হইয়া উঠিবে।

নারীর স্বাধীন উপজীবিকার বিরুদ্ধে একটা হেতু দেখান হয়, তাহার মাতৃত্বের ভার। এই হেতু একটা ছুতা মাত্র কারণ, আমরা চোখের সম্মুখে নিত্যই দেখিতেছি নিম্নতর শ্রেণীর অশিক্ষিত ঘরের মেয়েরা এই মাতৃত্বের ভার সত্ত্বেও কত উপায়ে কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিতেছে। আর আমাদের ভদ্র ঘরের মেয়েরা পরিশ্রম হিসাবে কি কিছু কম করিতে পারে, সে পরিশ্রমটার মধ্যে একটু কৌশল একটু সাজান গোছান একটু ইচ্ছা ও উদ্যোগ থাকিলেই যে তাহাকে উপজীবিকার উদ্দেশ্যে খাটান যায় না তাহা নয়; আর যাঁহারা বসিয়া বসিয়া গালগল্প করিয়া শুইয়া গড়াইয়া বা বাজে কাজে সময় কাটান, তাঁহাদের ত কোন অজুহাতই নাই। তারপর এই মাতৃত্বের ভার মেয়েদিগকে সারা জীবনের প্রতিদিন কিছু বহন করিতে হয় না—প্রয়োজন মত অবসর ত লওয়াই যাইতে পারে, এই অবসর ছাড়াও আরও যে যথেষ্ট সময় পড়িয়া থাকে, সেটির সদ্ব্যবহার কয়জন করিতে চাহে বা পারে?

আমাদের দেশে মেয়েদের "ভোট" অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার লইয়া একটা আন্দোলন সম্প্রতি বেশ উঠিয়াছে—বর্ত্তমান যুগের হাওয়া আমাদের সনাতন সমাজের বুকের উপর দিয়া যে চলিতে সুরু করিয়াছে ইহা তাহারই প্রমাণ। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার তখনই সত্যিকার হইয়া উঠে যখন তাহার পিছনে থাকে অর্থনৈতিক অধিকার। তাই আমরা মনে করি পলিটিক্যাল স্বাধীনতা অপেক্ষা ইকনমিক স্বাধীনতাই মেয়েদের পক্ষে বেশী জীবন্ত জিনিষ, এই বস্তুটিই নারীর প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের গোড়া ঘেঁষিয়া চলিয়াছে। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী তাহার একটা স্বাধীন মতামত ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পায় না, আর কোন স্বাধীন মতামত থাকিলেও তাহা প্রকাশ করিবার বা তদনুসারে কার্য্য করাইবার পথ থাকে না—উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দারিদ্রানাং মনোরথাঃ। রাষ্ট্রে অথবা আরও বড়ভাবে সমাজে মেয়েদের যদি স্বাধীন স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে হয়, রাষ্ট্রের সমাজের ব্যবস্থার উপর নারীরও হস্ত-চিহ্ন থাকা যদি প্রয়োজন হয় তবে তাহাকে আগে অর্থ সম্বন্ধে আত্মবশ হইতে হইবে। সমাজের মধ্যে এই আন্দোলন আমরা আগে দেখিতে চাই। তাহা হইলে বুঝিব নারী-রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের আন্দোলনটিই কেবল যে খাঁটি হইয়া উঠিতেছে তা নয়, নারীর সমগ্র জীবনের স্বতন্ত্রতাও সত্যিকার ভিত্তি পাইতেছে। পুরুষেরা এই আন্দোলনে কতখানি যোগ দেয় তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিব নারীর যথার্থ মুক্তির অধিকারের জন্য পুরুষের প্রাণের সায় কতখানি আছে।

তাই বলিয়া নারীর অর্থাধিকারকেই যে আমরা সর্ব্বাসর্ব্বা করিতেছি তাহা কেহ মনে করিবেন না। আরম্ভেই আমরা বলিয়াছি গোড়ার কথা হইতেছে মনের মুক্তি, অন্তরাত্মার উদ্বোধন—শিক্ষা ও দীক্ষা। এই ভিতরের জিনিষ ব্যতিরেকে বাহিরের সব আসবাবই বিফল। বর্ম্মায়, আমাদের দেশে খাসিয়াদের মধ্যে নারীর অর্থাধিকার যথেষ্টই আছে, কিন্তু তবুও তাহাদের সমাজ যে খুব সমৃদ্ধ বা উন্নত ধরণের তাহা মনে হয় না; কারণ সেখানে অভাব এই গোড়ার জিনিষটির। তবুও নারীর স্বাতন্ত্র্য সমাজ-শৃঙ্খলার অন্তরায় যাঁহারা বলেন, তাঁদের দৃষ্টি আমরা ঐ ঐ সমাজের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই—পুরুষের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব ছাড়া নারীর কর্তৃত্ব যে সমাজ গাঁথিয়া তুলিতে পারে, সমাজকে একটা ভিন্ন রকম মূর্ত্তিই দিতে পারে তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ এখানে পাওয়া যাইতে পারে।

পথহারা

[শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

আঁধারে আঁধারে ভ্রমিয়া শ্রান্ত প্রাণ
পথহারা নারী আমি,
আজি বাসনার বন্ধন অবসান
মুক্ত দিবস যামী!
মনে পড়ে সেই আকুল মাধবী রাতে
সিথির সিঁদুর মুছিনু আপন হাতে,
স্নেহ-ডোর কাটি' পাপের পসরা ভার
বহিয়া আসিনু নামি';
আঁধারে আঁধারে ভ্রমিয়া শ্রান্ত প্রাণ
পথহারা নারী আমি।

ছিল যাহা কিছু বলিতে যে আপনার
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সব;
ভুলিতে আপন গোপন বেদনা-ভার
বৃথা গান কলরব!
নিত্যনূতন আমোদ প্রমোদে মাতি'
মদিরা আবেশে বিসরিনু দুখরাতি,
লাঞ্ছিতা নারী-হিয়া-পঞ্জর টুটি'
বাহিরায় হাহা রব;
ছিল যাহা কিছু বলিতে যে আপনার
ছিঁড়িয়া ফেলেছি সব।

সেকি যন্ত্রণা বলিব কেমনে আর
চোখ ফেটে আসে জল;
মন্থন করি' অমিয়ার পারাবার
উঠিল যে হলাহল!

অতীতের স্মৃতি রহিয়া রহিয়া দহে
মরুর অনল-নিঃশ্বাস হৃদে বহে,
জ্বালার সায়রে শয়ন রচেছি যেন
দেহভারে দুরহল।
সে কি যন্ত্রনা বলিব কেমনে আর
চোখ ফেটে আসে জল।

বিয়াকুল হিয়া পিপাসায় সুগভীর
কেঁদে কেঁদে সারা হায়!
গলিয়া গলিয়া হলো সে অশ্রুনীর
নিশিদিন ঝরে' যায়!
সহসা কাহার মধুর পরশে আজি
ক্রন্দন মম ছন্দে উঠিল বাজি'
রমণীর মাঝে সুপ্ত মায়ের প্রাণ
টুটিতে ফুটিতে চায়;
বিয়াকুল হিয়া পিয়াসায় সুগভীর
কেঁদে কেঁদে সারা হায়!

সুখের মাঝারে পাই নাই যেই সুখ
দুখেতে লভেছি আজ;
জনমে জনমে চেয়েছি যাহার মুখ
পেয়েছি হিয়ার মাঝ!
বিদলিত বুকে গোপন সে কোন আশা
আকুল করা সে মরমের মূক ভাষা
মাতৃ গরবে পলকে পুলকি' জাগে
লভিয়া নবীন সাজ;

সুখের মাঝারে পাই নাই সুখ
দুখেতে লভেছি যেই আজ।

পথহারা আমি পতিতা বিশ্বমাঝ
নাই কোথা মোর ঠাঁই ;
হলাহল পিয়ে অমর হয়েছি আজ
আর বেশী নাহি চাই !

একটী চুমায় ভুলে যাই আপনারে
শীতল পরাণ পরশ-সুধার ধারে,
চাইনাকো কিছু জগৎ মাঝারে যদি
খোকারে বক্ষে পাই ;
পথহারা আমি পতিতা বিশ্বমাঝ
নাই কোথা মোর ঠাঁই।

ভল্লা-ভুবি

[শ্রীপুলকচন্দ্র সিংহ]

কর্ম্মকেন্দ্র হইতে পরেশ যেদিন ফিরিল, তাহাকে দেখিবামাত্রই মহামায়া বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁরে পরেশ অমন শুক্‌ন শুক্‌ন যে। ?

—শুক্‌ন আর কৈ পিসিমা ; দিব্যিত তাজা, তবে পথের ক্লান্তিতে হয়ত ও-রকম দেখাচ্ছে—এই বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া পরেশ সটান উপরে চলিয়া গেল।

পিসিমাও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তাঁহার মনে খট্‌কা বাধিয়াছিল। তিনি ও পরেশের অনুবর্ত্তিনী হইলেন।

পরেশ কাপড় চোপড় ছাড়িবার উদ্যোগ করিতেছিল। মহামায়া কাছে গিয়া কহিলেন—আয়ত'রে দেখি গা'টা—বলিয়া কপালে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন—এই যা ভেবেছিলাম, বেশত'রে জ্বর রয়েছে। আমাকে আবার ছাপান হচ্ছিল।

—পিসিমা ; তা হয়েই যদি থাকে—

—সেইটে যে আমার ভাবনার কথা—বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পরে পরেশকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন—ওরে এত অনিয়ম, ধকল তোর সইবে কেন ? এখন আমার ভোগান্তি। তোর এত কেনরে বাপু, এখন তোকে দেখ্‌বে কে !

—পিসিমা, আমাকে দেখবার লোকের অভাব হবে না। এই ছেলের দল এল বলে, তারা আমার সঙ্গেই আস্‌ছিল, আমি তাদের সবাইকে বাড়ী পাঠিয়েছি। তোমাকে যদি একবার নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আন্‌তে পারতাম, তাহলে আর তুমি অমন কথা বলতে পারতে না। মানুষের দুর্দ্দশা যে কি ভীষণ আকার ধরতে পারে—আমি তা নিজে চোখে দেখে এসেছি। ভয় পাচ্ছ কেন, দুদিনেই সেরে উঠ্‌ব'খন।

—তাই হলেই ভাল বাবা। আমার কি অসাধ যে ভাল কাজ তুই করিস। তবে নিজের শরীর বাঁচিয়ে তুই চল্‌তে শিখলিনে বলেই না আমি ভয় পাই।

কলিকাতায় আসিয়া পরেশ দুই দিন বেশ ভালই ছিল, কিন্তু হঠাৎ তৃতীয় দিবসে প্রবল জ্বর দেখা দিল। সমস্ত দিন পরেশের কোন হুঁসই ছিল না। সন্ধ্যার পর একটু ভাল ছিল, কিন্তু রাত্রে আবার অসুখ বাড়িয়াছিল।

ছেলের দল শুশ্রূষার ভার লইয়াছিল, কিন্তু জ্বরটা

বাকাগোছের দেখিয়া মহামায়া ভয় পাইলেন। সুতরাং দেবরকে পরেশের অসুখ সংবাদ জানাইলেন।

পরেশ ফিরিয়া আসিয়াছে নবকান্ত অবশ্য এ খবর জানিতেন না। ভ্রাতৃজায়ার চিঠিখানা পত্নী অন্নপূর্ণার হাতে দিলেন, তিনি তাহা পাঠ করিয়া নবকান্তকে ফেরৎ দিলেন। নবকান্ত চিঠিখানা হাতে করিয়া কহিলেন—তাহলেত, পরেশকে দেখতে—যাওয়া উচিৎ। আজ বিকেল বেলা যাব মনে করছি, কি বল ?

—তা বেশ যেও'খন।

—না, না, আমি একলার কথা বলছিনে। তোমাদের ও যে যেতে হবে।

—আমি ঠিক করে এখন বলতে পারছিনে।

—তুমি কিযে বল তোমার কথা আমি বুঝতে পারিনে।

—তোমরা পুরুষমানুষ তোমাদেরত কোন ঝক্কি পোহাতে হয় না। আমি কি যাবনা বলেছি, তবে আজই এত তাড়া কেন ?

—বৌদি ব্যস্ত হয়েছেন। আমাদের দেখ্‌লেও যে তিনি অনেকটা বল পাবেন।

—ব্যস্ত হয়েছেন, তা তুমিই না হয় যাওনা ! আমারত আর যাওয়া সোজা নয়, এদিককার সব গোছ করতে হবে।

—একবেলা বইত নয়, তার আবার এত উদ্যোগ আয়োজন কিসের দরকার ?

না, আমিত কারু জন্য কিছু করিনে, যা করি নিজের সুখের জন্য। ছেলেমেয়ে দুটোও রাত উপোসী না থাকে তার ত, একটা বন্দোবস্ত করে যেতে হবে।

—তবে তাই হবে'খন। একটু সকাল সকাল ও-বেলা গেলেই হবে। তাহলে সকাল সকাল ফিরতে পারব। আবার ফিরে এসেত হাঁড়ি ঠেল্‌তে হবে।

নবকান্ত একটু হাসিলেন মাত্র। গৃহিণীর আন্তরিক ইচ্ছা তাঁহার অবিদিত রহিল না। তিনি একটু দৃঢ়স্বরেই কহিলেন—ও বাড়ী থেকে যখন খবর এসেছে তখন যে যেতেই হবে। তা তোমরা না যাও, আমি একলাই তবে যাব'খন—তবে কি জান গেলেই ভাল হত।

গৃহিণী এবার উত্যক্তস্বরে উত্তর দিলেন—আমি কি যাই'যাবনা বলেছি। আজ তুমি গিয়ে দেখে এস, তারপরে বোধ না হয় কালই যাব।

যখন তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন মিনতি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আবির্ভাবে কথাবার্ত্তা থামিয়া গেল, ইহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল বলিয়াই সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল। নবকান্ত তাহাকে ডাকিলেন। তাঁহার ডাকে সে ফিরিল এবং পিতার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—বাবা, আমাকে ডাকছ ?

—হ্যাঁ মা, পরেশ এখানে এসেছে, তাকি তুমি জান ?

—না, বাবা, আমাকেত কেউ বলে নি।

—এই দেখ তোমার জ্যেঠিমা কি লিখেছেন—বলিয়া নবকান্ত হস্তস্থিত চিঠিখানা কন্যার হাতে দিলেন। মিনতি চিঠিখানা পড়িবামাত্রই, তাহার মুখখানিতে একটা ম্লান ছায়া পড়িল, নবকান্ত তাহা লক্ষ্য করিলেন। মিনতি চিঠিখানা পিতার হস্তে ফেরৎ দিল, এবং চুপ করিয়া দাড়াইয়া থাকিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

নবকান্ত কহিলেন—এই চিঠি নিয়েই তোমার মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলছিল। আজই ওখানে যাওয়াটা কি উচিৎ নয় ?

—বাবা, আমাকে কি একথার উত্তর দিতে হবে ? গাঢ়স্বরে এই কথা বলিয়া মিনতি আবার চুপ করিয়া রহিল।

—তোমার মা যে আজ যেতে প্রস্তুত নন, তাই আমাকেই আজ একেলা গিয়ে দেখে আস্‌তে হবে।

—বাবা, তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

কন্যার কথা শুনিয়া অন্নপূর্ণা ঝাঁঝিয়া উঠিয়া কহিলেন—দেখ মেয়ের রকম। নেচেই আছেন—মা যাবেনা যখন তোর এত তাড়া কেন। এখন কচিটি নয়, যেখানে সেখানে আমি তোকে যেতে দেব কেন ?

—যেখানে সেখানে আমিই বা যেতে চাইব কেন ? বাবার সঙ্গে আমি জ্যেঠিমার ওখানে যেতে চাইছি, রাগে দিশেহারা এমনতর না হলে, যা মুখে আসে তা বল্‌তে পারতে কি ?

—যা তোমাদের ভাল মনে হয়, তা করগে, আমার ঘাট হয়েছে বাছা, তোমার ভালর জন্তেই বলতে যাই, আর বলব না, যদি বলিত আমার মুখে যেন পোকা পড়ে!

বেগতিক বুঝিয়া নবকান্ত রণেভঙ্গ দিলেন। তিনি গৃহিণীর প্রকৃতি জানিতেন, সুতরাং ইহার উপর কথা কহিলে কথার গর্জ্জন বাড়িবে এবং বর্ষণও যে হইবে তাহা তিনি জানিতেন। যে পীড়িত তাহাকে লইয়াই যে এ.ক্ষত্রে গোল তাহাও তিনি জানিতেন এবং মিনতির ভয়েই অন্নপূর্ণা যাইতে চাহেন নাই, কাজেই সে যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া—পিতৃ সন্নিধানে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে কোন কুণ্ঠা বোধ করিল না, বাস্তবিকই তিনি তখন আর আপনাকে সামলাইতে পারেন নাই, কাজেই উত্তেজনার মুখে মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। নবকান্ত তাঁহার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন, কারণ মিনতি যে তখন উপস্থিত ছিল। তাই চলিয়া যাইবার সময়ে তিনি মিনতিকে বলিয়া গেলেন—তা'হ'লে এই কথাই রইল মা, আজ বিকেলে আমরা যাব। সত্যকেও খবরটা দিও শুনলে সেও যেতে চাইবে। ও-বেলা তিনটের সময় মনে রেখো, দেরী করনা। আহা, পরেশের অসুখ একলা বৌদি হিমসিম খাচ্ছেন—কেই বা দেখে কেই বা শোনে।

—না, বাবা, তার জন্তে ভেবনা। পরেশদাকে দেখবার লোকের অভাব হবেনা। যিনি সকলকে দেখেন, আজ তাঁর অসুখ করেছে তাঁকে কেউ দেখবে না, এও কি হয়?

নবকান্ত একটু হাসিলেন মাত্র। সংসার অনভিজ্ঞা বালিকার সরল বিশ্বাসের সহজ উক্তি সত্যই তাঁর প্রাণ স্পর্শ করিল।

নবকান্ত চলিয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে মিনতিও চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গৃহস্থের খোকা হোক্

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

কুঞ্জ আড়ালে মঞ্জু গীতিকা
তুই ছড়াস্,
কানাচে কানাচে তাজা মধু এনে
ঢেলে গড়াস্।
সোনার অঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ!
তুলিয়া মধুর গীত-তরঙ্গ
কত প্রাণ তুই সুখ-সুমেরুর
চূড়ে চড়াস্!

যে গৃহে কখনো বালককণ্ঠে
উঠেনি সুর,
আশে পাশে সেথা ঢেলে দিস্ তুই
আশা প্রচুর!
ছানিয়া পঙ্ক, ওরে বিহঙ্গ!
ভ'রে দিস্ সব স্নেহের অঙ্ক;
বন্ধ্যা রমণী তারো মনে নব
স্মৃতি জড়াস্!

শ্রমজীবীর কথা

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

আমাদের জ্ঞাতসারে হ'ক বা অজ্ঞাতসারেই হ'ক সমাজের অনেক কাযের ভার রাজশক্তি নিজের হাতে নিয়েছেন। আমরাও স্বীকার করে নিয়েছি সেই সকল কায রাজশক্তির মত একটা কেন্দ্রস্থ শক্তির দ্বারাই ভালরূপে সম্পন্ন হতে পারে। এখন তর্ক এই যে কোন কোন কায সেই তালিকাভুক্ত হতে পারে? দেশের মধ্যে শান্তি রক্ষা ও শান্তিভঙ্গের কারণের নিরসন, এর মধ্যে প্রধান। বলা বাহুল্য এই রাজশক্তি কেন্দ্রীভূত প্রজাশক্তিরই নামান্তর মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রজাশক্তির বিশিষ্টতা ছিল এই যে তা সমাজের ব্যষ্টির স্বাধীনতার (individual liberty) উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হার্বার্ট স্পেনসার, জন ষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ব্যষ্টির বা ব্যক্তির (individual) স্বাধীনতাকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়ে সমষ্টির বা সমাজের (Social) স্বাধীনতাকে তার শাসনাধীন নিম্নস্থান দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কেরা মনে করেন অপরিণতবুদ্ধিমানুষ যেমন ঐশ্বর্য্যের অপব্যবহার করে, স্বাধীনতারও তেমনি অপব্যবহার করতে পারে। অতএব স্বাধীনতা ব্যষ্টিগত না হয়ে সমষ্টিগত হওয়া উচিত, এবং কেবল সমষ্টিগত মাত্র নয়, সমষ্টির অন্তর্গত ব্যষ্টির সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। একেই Communism বা সমসামাজিকতা বলে। উনবিংশ শতাব্দী Individualism থেকে Collectivism পর্য্যন্ত আসিতে চেষ্টা করেছিল, বিংশ শতাব্দীcollectivism-কেও অতিক্রম করে প্রথমে Socialism এ, পরে Communism এ পৌঁচেছে। কিন্তু কোন দেশেরই রাজশক্তি Communism এর সঙ্গে কোন কুটুম্বিতা আজও স্বীকার করেন নি। কাযেই দেশের শান্তিরক্ষার কাযে বা শান্তিভঙ্গের কারণের নিরসনের কাজে তার সহযোগিতা নিচ্ছেন না। কেবল তাই নয়, তাকে বিপক্ষতাচারী বলেই মনে কচ্ছেন।

শান্তির প্রথম ও প্রধান বিঘ্ন বহিঃশত্রুর আক্রমণ। মানুষের ইতিহাস এমন একদিন ছিল যখন প্রবল রাজা দুর্ব্বল রাজার দেশ জয় করে নিতেন, মনে করতেন তাঁর জয় করবার অধিকার (right of conquest) আছে (১) এখন সে দিন নাই, এখন আর প্রবল দুর্ব্বলকে অকারণে বা সামান্য কারণে জয় করে না। সুতরাং সেহেতু শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা অতি অল্প এবং সুদূরপরাহত হয়েছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা প্রায় নাই বলিলেই হয়।

শান্তির দ্বিতীয় বিঘ্ন অন্তঃশত্রুর আক্রমণ। অন্তঃশত্রু দেশের লোক এবং শত্রুতার হেতু লোকের অসন্তোষ। সেইজন্য প্রজা অসন্তুষ্ট হলেই রাজা অসন্তোষের কারণ নির্ণয় করেন এবং তা দূর করতে চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান জগতে এই কারণ হচ্ছে ধনবিভাগ-জনিত সমাজের শ্রেণীবিভাগ এবং শ্রেণীবিভাগ-জনিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তারতম্য। একশ্রেণীর লোক বিলাসে মগ্ন, আর এক শ্রেণীর লোক সেই বিলাসের উপকরণ প্রস্তুত করতে অতি শ্রমে ক্লান্ত। এদের সুখ নাই, শান্তি নাই, স্বাধীনতা নাই। এরা প্রাণকে দেহের মধ্যে রাখবার জন্য শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে। এদের জীবনে আনন্দ নাই, আনন্দ উপভোগের শক্তিও নাই। এমন অবস্থায় এরা যে অসন্তুষ্ট হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? এর জন্য এরা প্রথমেই চায় এই অবস্থার পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্ত্তনের জন্য প্রথমেই তাদের দৃষ্টি পড়ে রাজার দিকে।

(১) স কথং নৃপতি র্যেন ন জিতা পরমেদিনী। (পদ্ম পুরাণ)

তারা জানে তাদেরই শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে রাজশক্তি হয়েছে। রাজা কিন্তু সেদিন পর্য্যন্তও মনে করতেন যে তিনি ঈশ্বরের অবতার, বা ঈশ্বর প্রেরিত বা তাঁর দ্বারা বিশেষ ভাবে নিযুক্ত, সুতরাং তাঁর শক্তি ঐশী শক্তি (১) তিনি সে শক্তিকে যথেচ্ছ নিযুক্ত করতে পারেন, সে সম্বন্ধে অন্যের কিছুমাত্র বলবার থাকতে পারে না। পৃথিবীর রাজারা বংশানুক্রমে এই ধারণা পোষণ করে আসছেন। তাঁদের নীতি এই যে বসুন্ধরা বীর ভোগ্যা, বলের দ্বারা যে যা পেরেছে সে তা নিয়েছে এবং রেখেছে। ক্ষুদ্র সামন্তরাজ বা ভূ-স্বামী সম্বন্ধেও এই নীতি, রাজার সে বিষয়ে কোন কর্ত্তব্য নাই। এখনকার রাজা এ কথাটা স্পষ্ট করে বলেন না, কিন্তু বলের দ্বারা যা অধিকার করা হয়েছে তাতে অধিকারীর একটা স্বত্ব জন্মেছে, vested right জন্মেছে একথা বলতে দ্বিধা বোধ করেন না। যেখানে প্রজাতন্ত্রতা বা সাধারণতন্ত্রতা রাজার উত্তরাধিকারী হয়েছে সেখানেও এই কথা। তারাও ন্যস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। অথচ এই ন্যস্ত অধিকার বা vested right-ই পূর্ব্বোক্ত সম্পত্তি বিভাগ ও তা থেকে উৎপন্ন শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করে যত অনর্থের মূল হয়েছে।

এই অধিকার প্রধানতঃ দুই বিষয় নিয়ে।—(১) ভূ-সম্পত্তি, (২) অন্যবিধ সম্পত্তি। সভ্যতার আদিতে ভূমি ও জল, বায়ু ও আলোর মত সকলের সমান ভোগ্য ছিল, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি ছিল না। তারপর ব্যক্তিবিশেষ তা বলের দ্বারা স্বাধিকার ভুক্ত করে। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে রাজবিধি সেই অবৈধ স্বাধিকারকে বৈধ বলে স্বীকার করে এবং তার রক্ষার ব্যবস্থা করে। এখনকার ভূমিতে স্বত্বাধিকারশূন্য কৃষিজীবী সর্ব্বপ্রকার ন্যায়-ধর্ম্ম-বর্জ্জিত-স্বাধিকার-প্রমত্ত ভূম্যধিকারীর স্বত্বাধিকার স্বীকার করতে চায় না। কৃষিজীবী এবং অন্য অন্য শ্রমজীবী সকলেই এখন ভূমিতে ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধিকার উঠিয়ে দিয়ে ভূমিকে জাতীয় সম্পত্তি (Nationalise) করতে চায় রাজশক্তি তা চায় না, Vested right এর দোহাই দিয়ে ভূম্যধিকারীর স্বত্বাধিকারই রক্ষা করতে চায়। ফলে রাজশক্তিতে ও প্রজাশক্তিতে মতভেদ ও অশান্তি। Christian socialistরা বলেন "The land is the Lord's. All other lords should, therefore, be abolished" আর এদেশের লোকে বলতেন—

পৃথিবী বৈষ্ণবী পুণ্যা সদা প্রিয়তমা হরেঃ।
নারায়ণাদ্ ঋতে নান্যে বসুমত্যাঃ পতির্ভবেৎ ॥
(পদ্মপুরাণ)

অন্যবিধ সম্পত্তির মধ্যে শিল্পবাণিজ্যজাত পণ্যই প্রধান। এর মূলেও সেই ব্যক্তিতন্ত্রতা। শ্রমজীবীরা এবং আধুনিক অর্থশাস্ত্রীরা বলছেন সমস্ত পণ্যই শ্রমলব্ধ সুতরাং শ্রমীর প্রাপ্য। ভূম্যধিকারীর মত ধনীও ছলে, বলে ও কৌশলে শ্রমীর প্রাপ্যের একটা সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র তাকে দিয়ে অবশিষ্ট সমস্ত আত্মসাৎ করে যে ধনসঞ্চয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, বর্ত্তমান অগণিত ধনরাশির অধিকারিত্ব ও প্রভুত্ব তারই উপর নির্ম্মিত হয়েছে। ধনীর প্রভুত্ব যে পরিমাণে বেড়েছে শ্রমজীবীর দাসত্বও সেই পরিমাণে বেড়েছে—শ্রমজীবী সামান্য পারিশ্রমিকের দাস, ঋণের দাস। জীবন ধারণের জন্য নিতান্ত যা আবশ্যক সমস্ত দিন পরিশ্রম করেও সে তা সংগ্রহ করতে পারে না। তার নীরস, নিরানন্দ জীবনের দুর্বিবহ ভার বহন করতেই শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়ে যায়, মনুষ্যত্ব লাভের চেষ্টা করবার জন্য সে শক্তির আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। এ অবস্থায় অসন্তোষ অবশ্যম্ভাবী। শ্রমজীবী অসন্তুষ্ট। সে তার অবস্থার পরিবর্ত্তন চায়। তার নিয়োগকর্ত্তা ধনী অবশ্য কোন পরিবর্ত্তন চান না, কারণ অবস্থাটা অপরিবর্ত্তিত থাকলেই তাঁর পক্ষে সুবিধা। রাজশক্তি ধনীরই সহায়তা করেন। কাযেই রাজশক্তি প্রজাশক্তির মধ্যে বিরোধ হয়। ফল—অশান্তি।

---

(১) এই ধারণা সকলদেশেই সে কালে ছিল। এ দেশেও বলা হইত; "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি।" তাঁর শক্তির মাত্রা "অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভি র্নির্ম্মিতো নৃপঃ।

কৃষিজীবীর অসন্তোষ জনিত অশান্তি ইউরোপের সর্ব্বত্র তার আত্মবোধকে জাগরিত করেছে। ইংলণ্ডে A bill to abolish private property in land নামে একটা আইনের পাণ্ডুলিপি এরই মধ্যে পার্লামেণ্টে উপস্থিত হয়েছে (১)। অন্যান্য দেশের কৃষকেরও আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টা আরম্ভ করেছে। গতবৎসর আগষ্টমাসে Passan তে শ্রমজীবীদের International এর মত কৃষকদের একটা Green International গঠিত হয়েছে। এই কৃষক সঙ্ঘে Bavaria, Austria Hungary, Bulgaria, French Normandy, Croatia এবং Switzerland থেকে কৃষক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিল। Holland ও Denmark প্রতিনিধি পাঠাতে পারেনি, কিন্তু সহানুভূতিসূচক অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছিল। এরই মধ্যে এই আন্তর্জাতিক কৃষক সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যা বহু লক্ষ হয়েছে (২)।

শ্রমজীবীদের অসন্তোষটা একটু গুরুতর আকার ধারণ করেছে। রাজশক্তি এখনও ঊনবিংশ শতাব্দীর "যা হয় হ'ক, হস্তক্ষেপ করা হবে না", (Laissez faire) নীতি ত্যাগ করেনি। কিন্তু প্রজাশক্তি তাকে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য করছে। শ্রমজীবী বলছে ধনীর সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ এখন আছে তার আমূল পরিবর্ত্তন না হলে শ্রমশিল্প-জাত পণ্যের উৎপত্তি এবং তৎসংক্রান্ত সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য বিপন্ন হবে এবং শিল্প বাণিজ্যের বিপদে ধনীসম্প্রদায় (Bourgeoise) তথা রাজশক্তিও বিপন্ন হবে। আত্মরক্ষা জীবধর্ম্ম। সুতরাং এই দ্বন্দ্বে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি উভয়েই পরস্পরকে পরাভূত করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। শ্রমজীবী বলছে যে বর্ত্তমান অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকলে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, অতএব অবস্থাচক্রের একটা আবর্ত্তন (revolution) হ'ক। গতিশীল পদার্থের গতির যেমন বিবর্দ্ধন হয়, সচল সমাজের গতির বেগও Social dynamics এর নিয়ম অনুসারে তেমনি বিবর্দ্ধিত হয়ে চলেছে। এই সময়ে আর একটা আবর্ত্তন revolution হলেই পরিবর্ত্তনটা শীঘ্র সম্পন্ন হয়ে যাবে। রাজশক্তি কিন্তু আবর্ত্তনের নাম শুনলেই ভীত হয়। ফ্রান্সের ষোড়শ লুইএর মত আবর্ত্তনকে বিদ্রোহ বলে ভ্রম করে। রাজশক্তি যদি সমাজকে সজীব ও সচল মনে করে, তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে আবর্ত্তন তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, আবর্ত্তন নিয়তই হচ্ছে এবং হবে। আর যদি সমাজকে নির্জীব ও অচল মনে করে তা হলে আর বলবার কিছু থাকে না।

শ্রমজীবীর অভিযোগ অতি অল্প কথায় সে ব্যক্ত করে—অল্প পারিশ্রমিক এবং কর্ম্মের অনিশ্চয়তা। কারখানায় অনেক মাল তয়ের হয়ে গুদামে জমে গিয়েছে, বাজারে চাহিদা নাই—শ্রমজীবীর পারিশ্রমিক কমে গেল, অথবা ধনী কর্ত্তার ইচ্ছায় তার কর্ম্মটি একবারে গেল। সেই জন্য সে চায় তার কর্ম্মের অনিশ্চয়তা দূর করে দেওয়া হ'ক, আর পারিশ্রমিক বাড়িয়ে দেওয়া হ'ক। রাজশক্তি বলে ও ব্যাপারটা ধনী ও শ্রমীর মধ্যেকার, রাজশক্তি ওতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না—সেই laissez faire. ধনীর কাছে গেলে ধনী বলেন তাঁর নিজের ক্ষতি করে শ্রমজীবীর উপকার করতে তিনি প্রস্তুত নন। তখন শ্রমজীবী গত্যন্তর বিহীন হয়ে দল বেঁধে কর্ম্ম ত্যাগ করে। তাতে শ্রমজীবীর অবশ্য ক্ষতি হয় কিন্তু ধনীর ক্ষতি তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। দারিদ্র্য-দুঃখে অভ্যস্ত শ্রমজীবী তাতে কাতর হয় কিন্তু ততোধিক কাতর হন ধনী। ধনী তখন রাজশক্তির শরণাপন্ন হন, রাজশক্তিও ধনীর কথাটা একবারে অগ্রাহ্য না করে যতদিন শিল্প- বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ থাকে, ততদিন কর্ম্মবিহীন শ্রমজীবীকে ভিক্ষাস্বরূপ কিছু সাহায্য করতে প্রস্তুত হন। এই সাহায্যের অর্থ ধনীর ব্যয় কমিয়ে তাঁর লাভ বাড়ান এবং করদাতার ব্যয় বাড়িয়ে করভার বৃদ্ধি করা। এই ভিক্ষার সঙ্গে রাজশক্তি উপদেশও দেন যে বাজারের তেজী মন্দী হিসাবে তার পারিশ্রমিক কমে গিয়েছে বা কারো কারো কর্ম্মও গিয়েছে, তারা মিতব্যয়ী হয়ে কিছু অল্প পারিশ্রমিকে

১ Nineteenth century and after. October 1921.
(২) The Nation and Athenaeum, June 25, 1921

অধিক কায করতে পারলে শিল্পবাণিজ্যের আবার উন্নতি হবে এবং শ্রমজীবীর অবস্থাও আবার ভাল হবে। রাজশক্তি ধনীর কথার প্রতিধ্বনি করে বলেন কৃষিকর্মে যেমন প্রকৃতির অনুগ্রহে সুবৎসর ও দুর্বৎসর হয়, মানুষ তাকে ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেও তেমনি সুবৎসর দুর্বৎসর হয়, মানুষ তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। সুবৎসরে কাযও যথেষ্ট পারিশ্রমিকও যথেষ্ট; দুর্বৎসরে দুয়েরই অবস্থা মন্দ। এই কথাটা যে ভ্রমাত্মক তা নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে।

একটা সাধারণ বৎসর—যেটা সুবৎসরও নয় দুর্বৎসরও নয়—ধরা যাক হারক রায় পশমী কাপড়ের কল করলেন, মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে হিসাব নিকাশ হল এইরূপ—মূলধনের সুদ শতকরা বার্ষিক ৬৲ টাকার হিসাবে ৬০,০০০৲ টাকা; লাভ শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে ১,০০,০০০, টাকা; মজুরি নিম্নশ্রেণীর মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ৫০০ জনের বৎসরে ১,৮০,০০০৲ টাকা; মজুরি উচ্চ শ্রেণীর ৫ জনের মাসিক ৫০০৲ টাকা হিসাবে বাৎসরিক ৩০,০০০৲ টাকা। এ ছাড়া যা অন্য অন্য খরচ খরচা আছে তার বিশেষ বিবরণ অনাবশ্যক কারণ, লাভটা সকল খরচ বাদে ধরে নেওয়া হয়েছে, আর মূলধনীর প্রধান কথা টাকার সুদ ও লাভ। এইরূপ কয়েক বৎসর চলার পর, ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। সৈনিকদের জন্য পশমী কাপড়ের চাহিদা বাড়ল, লাভ হল শতকরা দু'শ টাকা অর্থাৎ ২০,০০,০০০৲ টাকা (১)। শ্রমজীবীরাও কিছু বেশী পারিশ্রমিক পেলে, কিন্তু বলা বাহুল্য সেটা শতকরা দু'শও নয়, দেড় শও নয়, একশও নয়। শতকরা ২৫৲ থেকে ৫০৲ টাকার মধ্যে। অতিরিক্ত আয় হলে ব্যয়টাও কিছু বেড়ে যায়। ধনীর ব্যয় পূর্ব্বে যদি বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা হয়ে থাকে, এখন না হয় ১,০০,০০০ টাকা হক। তবুও তার উদ্বৃত্ত থাকে ১৯,০০,০০০৲ টাকা। এই টাকাটাও ধনী অবশ্য ফেলে রাখেন না। কতকটা ব্যবসায়ে পুনর্নিযুক্ত করেন, কতকটা দিয়ে কোম্পানীর কাগজ কেনেন কারণ, তাতে প্রত্যক্ষে রাজার সাহায্য করা হয়, পরোক্ষে নিজের লাভও হয়। লাভ ক্রমেই বেড়ে গেল। এই অতিরিক্ত লাভকে ইংরেজীতে বলে profiteering আর শ্রমজীবীর ব্যয়? যুদ্ধের জন্য সকল জিনিষেরই দাম দু-তিনগুণ বেড়ে গিয়েছে। ধনী কিন্তু শ্রমজীবীকে দু-তিন গুণ পারিশ্রমিক দেন নি। তিনি দিয়েছেন বড় জোর দেড়গুণ, অর্থাৎ যে লোকটা দৈনিক একটাকা পেত সে পেয়েছে দৈনিক দেড় টাকা। তাতে তার গ্রাসাচ্ছাদনও সচ্ছল ভাবে চলে নি, উদ্বৃত্ত হওয়াত দূরের কথা! এমন সুবৎসর অবশ্য নিত্য ঘটে না কিন্তু একবার ঘ'টে চার পাঁচ বৎসর স্থায়ী হলে ধনীর পক্ষে ২৫ বৎসরের কায হয়ে যায়। শ্রমজীবীর পক্ষে বিশেষ কোন লাভ নাই।

দুর্বৎসরও নিত্য আসে না। কৃষির পক্ষে যেটা দুর্বৎসর ব্যবসার পক্ষেও সেটা কতকটা দুর্বৎসর। অজন্মা হলে কৃষকের ও জনসাধারণের কেনবার শক্তি কমে যায়। অন্ন কিনতেই সমস্ত বা অধিকাংশ অর্থের ব্যয় হয়ে যায়, কাযেই বস্ত্র এবং অন্য অন্য জিনিষ কেনবার অর্থের অভাব হয়। অন্য কারণেও এ অবস্থা হটতে পারে কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। যে কোন কারণেই হক, বিক্রী কমে গেলেই ধনী কাযের সময় কমিয়ে দেন (short hours), শ্রমীর সংখ্যা কমিয়ে দেন, আবশ্যক হলে কারখানা একবারে বন্দ করে দেন। এতে ধনীর ক্ষতি, লাভ যত হত তত না হওয়া অথবা একেবারেই কিছু দিনের জন্য লাভ না হওয়া। আর শ্রমজীবীর ক্ষতি, অন্নাভাব। ধনীর পূর্ব্বলাভ সঞ্চিত হয়ে আছে আর শ্রমজীবী যে হারে পারিশ্রমিক পেয়েছে তাতে তার দৈনিক অভাবই দূর হয় নি, তা সঞ্চিত অর্থ থাকবে! এই রকম করে পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে হারক রায় কোটীশ্বর হয়ে তাঁর কারখানাটিকে Limited Company করে দিয়ে ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বহুকোটীশ্বর কার্নেগি এর আজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত (২)। আর শ্রমজীবী?

(১) এতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চটের কলগুলি শতকরা ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত dividend দিয়েছে।

(২) কার্নেগি ৯০ কোটি টাকায় আপনার কারখানাটি বিক্রী করে, ব্যবসা থেকে অবসর নিয়েছেন।

সেও এখন বৃদ্ধ, কর্ম্মও নাই, কর্ম্ম করবার সামর্থ্যও নাই। সঞ্চিত অর্থও নাই, অবসরবৃত্তিও (pension) নাই! সে এখন সমাজের গলগ্রহ!

এইবার একবার দেখা যা'ক কারখানাটা নিজস্ব সম্পত্তি না হয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হলে কি হত! মনে করা যাক রাষ্ট্রীয় শক্তিও শতকরা ৬৲ টাকা সুদে ঋণ করে মূলধনের দশলক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন। আরও মনে করা যাক কারখানাটা চালাবার জন্য বার্ষিক ১২০০০ টাকা বেতনে এক জন সুদক্ষ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন। অন্যান্য লোকজন খরচপত্র পূর্ব্ববৎ। তা হলে লাভের টাকাটা হারক রায়ের সিন্দুকে বা ব্যাঙ্কে না গিয়ে রাষ্ট্রীয় কোষে যেত। আর রাষ্ট্রীয় শক্তির ধনলোভ হারক রায়ের ধনলোভের মত মাত্রাতিরিক্ত না হওয়াতে কারখানার উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ বাজারে চাহিদা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হত। সুতরাং অতিমাত্রায় পণ্য উৎপন্নও হত না, তার জন্য কারখানার কাযের সময়ও কম হত না, কারখানা বন্ধও হত না, শ্রমজীবির পারিশ্রমিকও কমত না, অথবা তার কর্ম্মটিও একেবারে যেত না। বরং লাভের টাকাটা রাষ্ট্রীয় ধনাগারে সঞ্চিত হত আর তা থেকে ব্যারাম বা কোন দুর্ঘটনার জন্য পারিশ্রমিক উপার্জ্জনে অক্ষম হলে শ্রমজীবীকে সাহায্য করা যেতে পারত, তার চিকিৎসার ব্যয় বহন করা যেতে পারত, তার এবং তার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা এবং আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা যেতে পারত এবং বৃদ্ধ বয়সে অবসরবৃত্তি দেওয়া যেতে পারত। এবং এ সকলের জন্য জনসাধারণের দেওয়া রাজস্ব স্পর্শ করতে হত না।

এখন কথা এই শ্রমজীবীদের পক্ষ থেকে এ সকল তর্ক যুক্তি রাজা বা রাজশক্তিকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিলেও তাঁরা বোঝেন না কেন? উত্তর—প্রথমত কর্ত্তব্যজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। রাজা বা রাজশক্তি এখনও মনে করেন ধনীসম্প্রদায়ের (bourgeoise) ন্যস্ত স্বত্বাধিকার (vested rights and privileges) রক্ষা করাই রাজধর্ম্ম; শ্রমজীবীর স্বত্ব বা অধিকার কোন কালে কিছু ছিল না, এখন নূতন স্বত্বাধিকারের সৃষ্টি করে অশান্তির সৃষ্টি করা যেতে পাবে না। শ্রমজীবী মনে করে তাত বটেই

> For why? Because the good old rule
> Sufficeth them; the simple plan
> That they should take who have the power.
> And they should keep who can
>
> (Rob Roy's grave, Wordsworth)

দ্বিতীয়তঃ এই নীতিতে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালন করবার জন্য যত মন্ত্রণা সভা, ব্যবস্থাপক সভা, কার্য্যকরী সভা আছে, সর্ব্বত্রই হারক রায় ও তাঁর কুটুম্ব প্রবল। তাঁদের প্রভাব অতিক্রম করা অতি কঠিন।

শ্রমজীবী এখন এটা বেশ বুঝতে পেরেছে তাই তারাও বলছে "Proletarians of all countries, unite" — Marx.

শৈশব-স্মৃতি

[সাজেদা খাতুন]

জীবন-প্রভাতে বসি ভবিষ্য-আঁধারে
আঁকিতাম কল্পনায় স্বপ্নময়ী ছবি—
সহসা উদিবে মম জীবন-অম্বরে
ভুবন-উজ্জ্বল-করা ত্রিদিবের রবি!

আজ কেন হেরি হায় জীবন-সন্ধ্যায়
অলীক সকলি তার নাহি কিছু মূল,
গভীর তিমিরে মগ্ন ধূলায় লুটায়
শৈশবের স্মৃতি মম আকাঙ্ক্ষা বিপুল!

ভাস্কর

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

উচ্চ অধিত্যকার উপরে একটী সুন্দর মন্দির। তাহারও উপরে ঘন দেবদারু পরিবৃত একটা পাহাড়। দেবায়তনের সূক্ষ্মশিখ গম্বুজগুলি পাহাড়ের ধূম্রবর্ণের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রশস্ত সমতলভূমি,—আঙ্গুরের ক্ষেত, শস্তের ক্ষেত, পশুচারণের মাঠ আর অনেক দূরে একটী গ্রাম পার্ব্বত্য নদীর পাশে যেন হারাইয়া গিয়াছে।

মন্দিরের সন্ন্যাসিগণ ঈশ্বরের পরম ভক্ত, বিদ্যানুরাগী, কৃষিকার্য্যে বিশেষ দক্ষ। দিনের আলোকে তাহাদের শুভ্র-পরিচ্ছদ কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে ইতস্ততঃ উড়িতে দেখা যাইত। সন্ধ্যার আঁধারে সুবিস্তৃত মন্দির চত্বরে তাহারা ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনা করিত।

তাহাদের মধ্যে একজন যুবক-সন্ন্যাসী ছিল। তাহার নাম নরবার্ট, সে সুদক্ষ ভাস্কর; কাষ্ঠ প্রস্তর বা রঙ্গিন মৃত্তিকার দ্বারা যিশুখ্রীষ্ট,, মেরি ও অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তি সে এত সুন্দর খোদাই করিত যে দূরদেশ হইতে লোকে তাহা দেখিতে আসিত, এবং তাহাদের গির্জ্জাঘর সাজাইবার জন্য বহুমূল্যে সেগুলি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত।

নরবার্ট অত্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ ছিল। বিশেষতঃ কুমারী মেরীর প্রতি তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। নিশ্চল হইয়া সাষ্টাঙ্গে সে মেরীর বেদীর নিম্নদেশে অনেকক্ষণ পড়িয়া থাকিত, তাহার সন্ন্যাসবেশের বিপুল বেষ্টনী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত।

দিনের বেলাতেও নরবার্ট দেব-ভক্তির মোহে স্বপ্নাতুর হইয়া থাকিত। বিশেষ সন্ধ্যাবেলায় মুক্তচত্বর হইতে সীমান্তলীন অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সে অত্যন্ত অস্থির ও বিমর্ষ হইয়া পড়িত। তার ইচ্ছা হইত, অনেক দূরে পৃথিবীর শেষ সীমায় সে চলিয়া যায়—মন্দির হইতে বহু দূরে।

ধর্ম্মযাজক মহাশয় তাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—তুমি কাছের জিনিষই দেখতে পাওনা, দূরে চেয়ে কি দেখ, বল দেখি? আকাশ, মাটী ও পঞ্চভূত নিয়ে এই পৃথিবী। এই থেকেই ত সব জিনিষ সৃষ্টি হয়েছে। একেবারেই যদি সব জিনিষ দেখতে চাও, তা হলে সে শূন্যদৃষ্টি ছাড়া আর কি হবে?'

* * *

ধর্ম্মযাজকেরা অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তাহাদের অর্থবলও প্রচুর ছিল বলিয়া উপত্যকাবাসী কাহারও কোনো অভাব ছিলনা। তাহাদের মধ্যে মঠের সন্নিকটে একটি সুন্দর শান্তি নিকেতন নির্ম্মাণের প্রস্তাব হইল। শত শত মজুর তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আহুত হইল। পর্ব্বত গাত্রে ক্ষতের মত গভীর প্রস্তর খাত করা হইল। অদ্ভুত নিপুণতা সহকারে তাহারা অসংখ্য পাথরের চাপ পাহাড় হইতে কাটিয়া বাহির করিল, সমস্ত মন্দিরটী ময়দার মত শুভ্র সূক্ষ্ম পাষাণ-ধূলায় আবৃত হইয়া পড়িল।

মঠের উপরিভাগে ঢালু তরু-সমাচ্ছন্ন ভূমিতে গির্জ্জার ছাতের জন্য সুন্দর ওক্ ও পাইন্ গাছের গুঁড়ি চেরাই হইতে লাগিল। তাহার বিচিত্র পীতবর্ণের ধূলায় মঠ আবৃত হইয়া গেল।

এই গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে গুঞ্জনশীল ক্ষুদ্র মানব-সমাজটী নিজের কাজ করিয়া যাইত। ভবিষ্যৎ মন্দিরের জন্য পাথর কাটিতে কাটিতে কেহই জানিতে পারিত না যে, সে পাথর কোথায় রাখা হইবে, বা ঈশ্বর বিশ্বাসীরা তাহা

[Jules Lemaitre এর ফরাসী গল্প হইতে]

দেখিবে কিনা। কিন্তু তারা বেশ জানিত যে ঈশ্বর তাদের কাজ দেখিতেছেন, তাই প্রত্যেকেই সানন্দে এই পবিত্র কার্য্যে সহায়তা করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়িত এবং ক্রমে ক্রমে পাথরের পর পাথর সাজাইয়া তারা আকাশস্পর্শী এক বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল।

মঠের একজন বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক একখানি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পুঁথিতে এই কয়টী কথা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন,—"মহাপুরুষদের সৎকার্য্যের বিষয় কোনও তর্ক করিও না। এই সমস্ত ধর্ম্মদ্বন্দ্ব শেষে ব্যক্তি-বিদ্বেষে পরিণত হয়। একজন এক মহাপুরুষকে মানে, আর একজন অপরকে মানে, এইরূপেই কলহ, অহঙ্কার, বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ধর্ম্মের এই সমস্ত দ্বন্দ্বে মহাপুরুষদের প্রতি ভক্তি না হইয়া কেবল বিদ্বেষই হয়।"

কিন্তু সন্ন্যাসীরা এই মহাবাণীর সার্থকতা না বুঝিয়া বিভিন্ন মহাপুরুষদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে তর্ক যুড়িয়া দিত।

এখন প্রশ্ন উঠিল কোন্ মহাপুরুষের নামে মন্দির উৎসর্গ করা হইবে। ধর্ম্মভাবের মাত্রাটা কিছু কম থাকিলে তাহারা সেই মধুর সন্ধ্যার নির্জ্জনতাটুকু অন্যভাবে উপভোগ করিতে পারিত। নিকটেই ভবিষ্যৎ মন্দিরের অসম্পূর্ণ প্রাকারটী প্রদোষের অন্ধকারে অস্পষ্ট ও বিপুলায়ত দেখাইতেছিল,—যেন একটা প্রচণ্ড ধ্বংসের মত তাহা সুন্দর ও মহান্। নিম্নে রৌপ্যসূত্রের মত দূর বিসর্পী নদী বহিয়া চলিয়াছে. পূর্ব্বদিকে অস্তগামী সূর্য্যের বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। কখনো কখনো কোনও বহু দূরাগত ক্ষীণ শব্দ বা যানচক্রের ঘর্ঘর শব্দ সেই পবিত্র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

মঠাধ্যক্ষ প্রাচীন, তাঁর মতের মূল্য ছিল। তিনি প্রথমেই বলিলেন, 'আমাদের সংঘের স্থাপয়িতা মহাপুরুষ মুষ্টেশের নামে এই মন্দির উৎসর্গ করা হোক্। তা না হলে লোকে মনে করবে যে তাঁর চেয়েও মহত্তর কোনো সাধু আছেন, যাঁর পূজা আমরা করি।'

তাঁহার অধীনস্থ আর একজন অধ্যক্ষ বলিলেন, 'মহাপুরুষ মা[illegible]হিত পরমপিতা যিশুর সৃষ্টি। যাঁর কৃপায় মানুষের পক্ষে মোক্ষলাভ সুলভ হয়েছে, যিনি পবিত্রতার আধার, আসুন, আমরা তাঁরই উদ্দেশে এই মন্দির নিবেদিত করি।'

লোল চর্ম্ম শতায়ু আলকুইন বলিলেন, 'আমি বলি, মহেশ্বরের নামে এই মন্দির উৎসর্গ হোক। তাঁকে আমরা অবহেলাই করে থাকি। পরমেশ্বরের প্রার্থনাটী ধর্ম্মগ্রন্থে না থাকলে লোকে ত তাঁকে ভুলেই যেত। কিন্তু তিনিইত এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্ত্তা। চার হাজার বছর ধরে মানুষ ত আর কোনো দেবতার কল্পনা করতে পারে নি। এখনো যারা তাঁর সন্তান যিশুকে না জানে, তারা তাঁকেই পূজা করে।'

টিকান্ড্ একথা শুনিয়া মস্তক সঞ্চালন করিলেন, তিনি তদানীন্তন একজন প্রধান ধর্ম্মযাজক, কৃষি-কার্য্যের জন্য কখনো মাঠে যাইতেন না, গ্রন্থাগারে বিচিত্র পুঁথির বিচিত্র পাঠোদ্ধার করিতে করিতেই তাঁর সময় কাটিয়া যাইত। সমস্ত বিষয়েই তাঁর নিজের মত ছিল। তাই তিনি বলিলেন, 'পরম শক্তির উদ্দেশে এই গির্জ্জা নিবেদন করাই আমার মত। আমাদের আগামী মহাজীবনেই তাঁর রাজত্ব আসবে। জগতের দিকেই আপনারা একবার চেয়ে দেখুন না! অধর্ম্ম, অন্যায়ের মধ্য দিয়েই কত লোক বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই মহাশক্তিই শেষে জীবের ত্রাণ করবে। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে, তবে আপনাদের সেটা পড়বার মত শক্তি থাকা চাই।'

এ কথা শুনিয়া প্রধান মঠাধ্যক্ষ ভ্রূকুঞ্চন করিলেন, দ্বিতীয় সন্ন্যাসী তাঁকে চুপ করিতে বলিলেন। ত্রিংশৎবর্ষ বয়স্ক এজিনার নামে আর একজন সন্ন্যাসী গভীরকণ্ঠে বলিলেন, 'আমার ইচ্ছা সেন্ট গ্রিগরীর নামে এই মন্দির উৎসৃষ্ট হোক্! রাজা-মহারাজার উপর তাঁর অগাধ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি বেশ জানতেন যে সেবাই ঈশ্বরের দাসানুদাসদের পরম ব্রহ্মাস্ত্র, আর লোককে মুক্তিদানই পরম দান।'

মন্দির-লগ্ন-উদ্যান-পালক বলিলেন, 'আমি সেন্ট্ ফিয়াকৃ্রকেই পছন্দ করি। জীবনে তিনি দরিদ্র ছিলেন,

অথচ ঈশ্বর ভীরু বলে কোন কাজই অবহেলা করেন নি। আর আমরাত দেখতেই পাচ্ছি যে মানুষ সাধারণতই দরিদ্র,—তাদের কাছে আমাদের এমন ধর্ম্মাদর্শ দেখানো উচিত যাতে করে' তারা শিখতে পারে, অনুকরণ করতে পারে।'

এই সময় কুঠার স্কন্ধে একজন কৃষক উদ্যান-বীথিকার নিকট দিয়া যাইতেছিল। মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার যদি মন্দির গড়বার মত পয়সা থাকে ত সে মন্দিরটী তুমি কার নামে নিবেদন করবে?'

'ঈশ্বর, কি কুমারী দেবী, কি স্বর্গের অন্য কোনো দেবতার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলবার নেই, কিন্তু আমার মত জিজ্ঞাসা করলে আমি সাধু এল্রর নাম করবো। তাঁর উপরেই আমার অগাধ বিশ্বাস, তিনি আমার গরুর রোগ সারিয়েছিলেন, আমার মুরগীর তিনটী ছানাও খুঁজে দিছলেন।'

একটু পরে একজন যুবতী সেই পথের বক্রাংশ দিয়া যাইতেছিল। সে দরিদ্র অথচ পরিচ্ছন্নবেশ, বক্ষদেশে একটী শিশু, করলগ্ন আর একটী বয়স্ক বালক। মঠাধ্যক্ষ কৃষককে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাকেও সেই প্রশ্ন করিলেন।

'আমি ঈশ্বর-জননীর উদ্দেশে মন্দির উৎসর্গ করতুম।'

'কেন?'

'তিনি যে সকলের মা।'

নরবার্ট এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া ছিল। চিন্তাকুলহৃদয়ে সে সূর্য্যাস্তের অপচীয়মান শোণিমরাগ দেখিতেছিল। রমণীর উত্তর শুনিয়া সে বলিল, 'নারী, তুমি সত্য বলিয়াছ। আমি কিন্তু ঈশ্বর-জননী মেরীর উদ্দেশে মন্দির নিবেদন করতুম না, আমি কুমারী মেরীকেই আমার দেবতা বলে মেনে নিতুম। তিনি নির্দোষ, অপাপবিদ্ধা, জীবের প্রতি দয়াশীলা, তিনি পবিত্র ও মধুর চরিতা ছিলেন বলেই ত ঈশ্বরের জননী হতে পেরেছিলেন। কুমারিরূপে তাঁর একনিষ্ঠা ও ধ্যানশীলতার পূজা করতেই আমি বেশী ভালবাসি'।

এমন সময়ে মঠের খাদ্যভাণ্ডারের সংরক্ষক সেই সন্ন্যাসি-সংঘের মাঝখানে আসিয়া বলিল, 'সাধুগণ, আমায় যদি আপনারা বিশ্বাস করেন ত আমি ঈশ্বরত্রয়ের মধ্যে কাহারও উদ্দেশে এ মন্দির নিবেদন করতুম না। কোনো সাধুর উদ্দেশেও নয়। সদাব্রত সেণ্ট্ গংগুলই আমাদের অধিনায়ক হোন্।'

'কি কারণটা বল?'

'যে উদার জমিদারের আমরা সেবক, এটী তাঁরই নাম। তাঁর নামে মন্দির উৎসর্গ হলে তিনি খুসী হয়ে আর আমাদের টাকা কড়ির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নির্য্যাতন করবেন না। শক্তিমানদের এই রকম করেই বশে আনতে হবে, কারণ দিনকালও খারাপ পড়েছে, দেবতা-পূজাতে লোকের ভক্তিও কমে আসছে।'

সাধু এজিনার বলিলেন, 'কিন্তু তোমার সেণ্ট্ গংগুল্ মোটেই বিখ্যাত নন। তিনি করেছিলেন কি? তাঁর সম্বন্ধে জানাই বা আছে কি?

হাঁ, তা বটে, তবে পাঁজিতে তাঁর নাম আছে, আর তিনি লোকও নেহাৎ মন্দ নন।'

সাধু টিবাল্ড বলিলেন, 'পাঁজিতে নাম থাকলেই যে তিনি পুণ্যাত্মা হবেন, এমন কোনো কথা নেই।'

ভাণ্ডারী বলিলেন, 'যাই হোক, যিনি আমাদের সর্ব্বতোভাবে তুষ্ট করতে পারবেন, তিনিই খাঁটী লোক। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে সব মন্দিরই পরমেশ্বরের নামে নিবেদিত করা হয়। আমাদের কর্ত্তাকে তুষ্ট করতে পারলে মেরী ও অন্যান্য ভক্তদের মূর্ত্তিও মন্দিরের ভিতর প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারবে।'

গভীর বাদানুবাদের পর ভাণ্ডারীর কথাই গ্রাহ্য হইল। স্থির হইল যে সেণ্ট্ গংগুলের মর্ম্মর-মূর্ত্তি গির্জ্জার প্রবেশ পথের পুরোভাগেই স্থাপিত হইবে। তাহার কিছু উচ্চেই কুমারী মেরীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইবে, আর দ্বার-শীর্ষে ক্রুশ-বিদ্ধ যিশুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

* * * *

এই তিনটী মূর্ত্তি খোদাই করিবার ভার নরবার্টের উপর ন্যস্ত হইল। সেণ্ট্ গংগুলের মূর্ত্তি সে তত অনুরাগের সহিত গড়িল না। জীবিত কালে তাঁহার পেশা কি ছিল, তাহা না জানায় নরবার্ট তাঁহাকে সৈনিকরূপেই গড়িল।

লৌহবর্ম্মাচ্ছাদিত চর্ম্মপরিবৃত-মুষ্টি মূর্ত্তি শীঘ্রই গড়া হইয়া গেল।

পরে কৃষ্ণবর্ণের গ্রানাইট্ পাথর হইতে ষোলো হাত উচ্চ ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্ত্তি খোদিত হইয়া গেল। শাল-প্রাংশু অথচ ক্ষীণ দেহ, প্রকট পঞ্জরাস্থি, মরণাহত জানু, প্রসারিত বাহুতে ভার পড়ায় বাহুমূলে গভীর খাত হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গের শোণিত ধারা স্ফীত পাদদেশের উপর পড়িয়াছে,—যীশু খ্রীষ্টের এই মূর্ত্তিটী যেন বিশ্বমানবের দুঃখের প্রতিচ্ছবি, উপেক্ষিত হতভাগ্যদের করুণ নিরাশা, পরিত্যক্ত সমাজচ্যুতদের গভীর যন্ত্রণা,—ব্যাধি ও ভূতগ্রস্ত, কুষ্ঠরোগী ও যন্ত্রণাপ্রাপ্ত মানুষদের যেন যাতনার সজীব মূর্ত্তি। তবুও সেই বদন-মণ্ডল অনাশক্তির প্রশান্তিতে উজ্জ্বল, মুক্তি ও শান্তির প্রেরণায় মহান্ ভাব-দ্যোতক। রক্তাক্ত দেহ যেন বলিতেছে—'উঃ, কি ভীষণ যন্ত্রণা!'—আর কণ্টক-মুকুটধারী হইয়াও নত মাথাটী যেন স্পষ্ট বলিতেছে,—'ভয় কি! আশা আছে।'

এই কার্য্যে তার সমস্ত ভক্তি, সমস্ত শিল্প নিয়োজিত করিলেও সে কুমারী মেরীর মূর্ত্তিটীর বিষয় ক্রমাগতই ভাবিতে লাগিল। সে যে সেই মূর্ত্তিটীর জন্য তার সমস্ত প্রীতি, সমস্ত নৈপুণ্য এখনও গোপনে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

তখন মঠাধ্যক্ষ বলিলেন, 'হে পুত্র, শিশু খ্রীষ্টকে কোলে নিয়ে মেরী দাঁড়িয়ে আছেন,—তোমার প্রতিভাবলে এই বার এই মূর্ত্তিটী খোদাই কর।

নরবার্ট উত্তর করিল, 'কিন্তু যে ভাবে তাঁর মূর্ত্তি খোদাই করলে তিনি সবিশেষ আনন্দিত হবেন, সে ভাবে তৈরি করলে হয় না?'

অধ্যক্ষ বলিলেন, 'দেখ, ঈশ্বরের জননী বলেই কি তাঁর সর্ব্বোত্তম গৌরব নয়?'

নরবার্ট বলিল, কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁকে গৌরবান্বিত করে' না গড়ে' যে ধর্ম্মচর্য্যা করে' তিনি এই গৌরব পেয়েছিলেন, সেই ধর্ম্মের সাধিকা করে গড়াই ভাল। যদি তিনি শিশু খ্রীষ্টকেই কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকেন, ত' তাঁকে পূজা করতে গেলেই সেই দেবশিশুর চরণোপান্তে আমাদের হৃদয়ের অর্ঘ্য গিয়ে পড়বে। তবে তাঁর মুখে কোন্ ভাবটী দেওয়া সুসঙ্গত হবে?—এটি ভেবে ওঠা বড়ই শক্ত। তাঁর দেহে মনে মাতৃস্নেহের স্নিগ্ধ প্রীতিটীই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠবে,—সেই শিশু জীবনের নশ্বরতা, সন্তানের প্রতি তাঁর অব্যাহত আকর্ষণ এই ভাবটীই জাগ্রত হয়ে পড়বে। দেহ মন দিয়ে মায়ের স্নেহ নিয়ে নিজের ছেলেকে ভালবাসলে পরকে আর তিনি ভালবাসবেন্ কখন? কিন্তু আমি জানি, তিনি আমাদের সকলকেই খুব ভালবাসেন। ঈশ্বরের সঙ্গে সান্নিধ্য আছে বলে তিনি আমাদের চেনেনও বেশী। এমন অনেক পাপ আছে, যা ঈশ্বরও মার্জ্জনা করতে পারেন না। কিন্তু কুমারী দেবী তাঁকে বলেন, তাদের ক্ষমা করুন্—তাদের পাপের বোঝা আমি গ্রহণ করলুম। মানুষ কত হতভাগ্য, যে মাটী থেকে তাদের জন্ম—সেই মাটীই তাদের কত নির্য্যাতন করে। তারা যে সব পাপ করে—তাতে তাদের কতটুকুই বা সহানুভূতি এসব যদি জানতেন, যদি বুঝতেন! আমার শক্তি এদের ভিতর থাকলে এরা ত ঋষি হয়ে পড়তো!' কুমারী দেবীর অপার দয়া, অনন্ত ক্ষমা।—ইহাই তাঁর যথার্থ গৌরব, এমন তাঁর সুন্দর ক্ষমাশীল করযুগল সমগ্র মানবজাতির প্রতি যুক্ত ও প্রসারিত—আমি এই ভাবেই তাঁকে আঁকতে চাই। বক্ষে শিশু খ্রীষ্ট থাকলে তিনি কেমন করে' দুহাত প্রসারিত করবেন?'

'বৎস, তুমি যা বললে তা অত্যন্ত অদ্ভুত ও ধর্ম্মহীনতার উগ্র ঝাঁজে পূর্ণ। আমি তোমায় যেমন বলেছি, তেমনি অবস্থায় কুমারী মেরীর মূর্ত্তি খোদাই করতে তোমায় আজ্ঞা দিলুম।'

কিন্তু নরবার্ট সে কথা পালন করিল না। মূর্ত্তি গড়িবার সময় সে তাহা কাহাকেও দেখিতে দিল না, বলিল যে পরের মন্তব্য তার অর্দ্ধসমাপ্ত কাজ পণ্ড করিয়া ফেলিবে। তাহার আদর্শ স্বপ্ন মোহের ঘোরে সে নিজের মানস-সম্ভব মূর্ত্তি বাটালি দিয়া খোদাই করিতে লাগিল। সুদীর্ঘ ঋজুদেহ বিপুল পরিচ্ছদ শোভিত, মানবের দিকে সন্নতদৃষ্টি. সেই জড়মূর্ত্তি মার্জ্জনা করিবার ভঙ্গিতে দুটী হাত প্রসারিত করিয়া আছেন। তাঁহার দেহের গঠনসৌকুমার্য্য দৃষ্টির

অগোচরে রাখা হইয়াছে, কিন্তু তাঁর মুখখানি এত সুন্দর, তাঁর চোখদুটীতে এমনি স্নিগ্ধদৃষ্টি, অধরবিম্বে এমনি মধুর হাসি, মুক্ত করযুগল এরূপ মার্জ্জনাদ্যোতক যে সে মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই প্রার্থনা করিতে, কাঁদিতে ও ভাল হইতে ইচ্ছা হয়।

• • • •

এইরূপে ক্রুশমূর্ত্তি, কুমারীমূর্ত্তি ও সেণ্টগণগুলের মূর্ত্তি খোদিত হইল। মন্দির গঠনও প্রায় সমাপ্ত হইল। প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই উচ্চে দুটী সূক্ষ্মচূড় ঘণ্টাযুক্ত গম্বুজ নির্ম্মিত হইল। ঈশ্বর নিকেতন গড়িবার জ্বলন্ত উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া সে ছাদের উপরেই দিন কাটাইত, সেখানটা পাষাণের নিবিড় অরণ্য বিশেষ, সেখানকার কারুকার্য্য অতি বিচিত্র ও সূক্ষ্ম,—ছাদের জলনির্গমনের পথগুলির হাঙ্গরমুখ, খিলানগুলির গঠনও অপূর্ব্ব। একদিন সন্ধ্যাবেলা সে আর নীচে নামিল না। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তার বিচিত্র স্বপ্ন দেখিতে ইচ্ছা হইল, পাথরের মিনার-করা কাজের মধ্যে জ্যোৎস্নার বিচিত্র লীলা দেখিবার বাসনা হইল। সে একটা অসম্পূর্ণ গম্বুজের ভারার উপর দাঁড়াইয়া বিস্মিত মনে ভাবিতেছিল—উচ্চস্থান হইতে তাহার চিরপ্রিয় কুমারী মূর্ত্তিটা দেখা যায় কি না। তাঁহার প্রসারিত হস্তযুগল দেখিবার জন্য সে একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। আরও একটু আরও একটু—হঠাৎ তার পা স্থানভ্রষ্ট হইল। সে উচ্চ চীৎকার করিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

পতনকালে ভারাতে লাগিয়া সে মধ্যপথে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তির নগ্ন বাহুটী ধরিয়া ফেলিল। শূন্যপথে সে ঝুলিতে লাগিল—জানু দিয়াও যীশুর বিশালমূর্ত্তি পূর্ণভাবে আলিঙ্গন করিবার উপায় নাই আর তাহার শ্বেতপরিচ্ছদের বিপুল বেষ্টনে সে যথেষ্ট ভারগ্রস্ত হইয়া পড়িল।

সেইখানে খ্রীষ্টের মুখোমুখী হইয়া ভয়ত্রস্ত মনে দীনভাবে পাগলের মত সে তাঁহার নিকট প্রাণভিক্ষা করিল। তার পর সে যথাশক্তি চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু সন্ন্যাসিগণ তখন নিশ্চিন্ত মনে গভীরভাবে নিদ্রা যাইতেছেন। ভয়তাড়িত নিশাচর পক্ষিকুল তার মস্তকোপরি চক্রাকারে উড়িতে লাগিল। আশ্রয় লাভের বৃথা চেষ্টা করিয়া তাহার পদদ্বয় পাষাণগাত্রে প্রতিহত হইতে লাগিল। গ্রাণাইট নির্ম্মিত সেই হাতের উপরে তার আশ্রয়ব্যাকুল আঙ্গুল গুলি নিস্তেজ হইয়া আসিল; তাহার নখ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল; যেন একটা বিষম ভার তাহাকে ক্রমশঃ নীচের দিকে টানিতে লাগিল। একবার যেন মনে হইল—চন্দ্রালোকোজ্জ্বল খ্রীষ্টের মুখখানি অবজ্ঞা ও শ্লেষভরে ফিরিয়া চাহিল। তার আঙ্গুল সরিয়া যাওয়ায় সে তার আশ্রয় হারাইল।

'হায় পাষাণ দেবতা! এই কি তোমার প্রতিহিংসা! হে কুমারী মেরী, তুমি আমায় বাঁচাও!'

তার পরে আবার সে পড়িতে লাগিল।... ... ...

একটুও আঘাত না লাগিয়া সে কুমারীর মর্ম্মর-নির্ম্মিত দুইটী করতালুর উপর পড়িয়া গেল। তাঁহার সকরুণ হাত দু'খানি তাকে ধারণ করিবার জন্য একটুখানি উত্তোলিত হইল। সে যেন শিশুর মত দোলায় শুইয়া রহিল। প্রভাতে সন্ন্যাসীরা তাহাকে দেখিতে পাইলেন। বড় বড় সিঁড়ি প্রস্তুত হইল। একজন সাধু তাকে রক্ষা করিতে আসিয়া দেখিলেন—সে দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছে।

সে বলিল, 'কেন আমায় জাগালে?'

কুমারীর করপদ্মে শয়ন থাকিয়া সে যে মধুর স্বপ্ন দেখিয়াছিল, বা দেবীর সঙ্গে তার যে সব কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সে কাহাকেও কিছু বলিল না। কিন্তু সে রাত্রে মুক্তিদাতা খ্রীষ্টের উদ্দেশে সে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিল,—তখন তাহার মানস কমল দেবতার পুণ্যশ্রীতে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শা[illegible]ায় অনুশাসন ও ঐতিহাসিক যুগ

[শ্রীপ্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

রাজনীতি ও ব্যবহারতত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় অনুশাসন কিরূপভাবে ঐতিহাসিকযুগে অভিব্যক্ত হইয়াছিল তাহা দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাস্তবিক ভারতীয় অনুশাসন কেবল শাস্ত্রীয় যুগেই আবদ্ধ ছিলনা, ইহার প্রয়োগ ও প্রচার ঐতিহাসিক যুগেও সুপরিস্ফুট। দেশ ও কালভেদে অনুশাসনগুলির বহিরাবরণ বদলাইয়া গেলেও মূল বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় নাই। সমাজের উন্নতি বা অবনতির সহিত ধর্ম্মের বহিরাবরণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের যাহা আত্মা, তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতির দুইটা জিনিষ আছে, একটা স্বভাব ও একটা আকার। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Spirit ও form বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মপ্রভৃতির আকার পরিবর্ত্তিত হইতে পারিলেও আত্মার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। ভারতীয় রাজধর্ম্ম—রাজনীতির আকারের কতকটা পরিবর্ত্তন ঐতিহাসিক যুগে হইলেও মূল সূত্র তখন নষ্ট হয় নাই। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির অনুশাসন চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য্য) প্রভৃতি রাজন্যবর্গের শাসনকালে অনুষ্ঠিত দেখিতে পাই। অর্থশাস্ত্রকার পণ্ডিতবর চাণক্য তৎপ্রণীত 'অর্থশাস্ত্রে' যেরূপ শাসন প্রণালীর আভাস দিয়াছেন তাহা ধর্ম্মসূত্রের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পণ্ডিতপ্রবর চাণক্যপ্রণীত অর্থশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য অর্থশাস্ত্রের নামও দেখিতে পাওয়া যায়। লঘু চাণক্য নীতি, বৃদ্ধ চাণক্য নীতি, নীতিসার, চাণক্য রাজনীতি, চাণক্য নীতিবাক্যসার, চাণক্যসারসংগ্রহ নামক অন্যান্য প্রাচীন অর্থশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য, চার্ব্বাক, বৃহস্পতি, বররুচি, ঘটকর্পর প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রকারগণের নাম উল্লেখযোগ্য। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল। চাণক্য তাঁহার মন্ত্রী। চাণক্য মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-শাসন-শৃঙ্খলা মানসে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। অর্থ শাস্ত্র হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়, অর্থশাস্ত্রে অধ্যক্ষ প্রচার ১০ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই, "সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রম্য প্রয়োগমুপলভ্যচ কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্য বিধিঃ কৃতঃ॥" অতএব চাণক্য প্রণীত অর্থশাস্ত্রকে প্রাচীনগ্রন্থরূপে গ্রহণ করিতে পারি। তৎপ্রণীত অর্থশাস্ত্রে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা অবশ্যই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিল। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে যদি মন্বাদির অনুশাসন প্রতিপালিত দেখিতে পাই তাহা হইলে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ লাভ হয়।

আমাদের মনে হয় ভারতের শাস্ত্রীয় অনুশাসন মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অল্পাধিক পরিমাণে ভারতে অনুসৃত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালেও দেশীয় রাজন্যবর্গ ভারতীয় অনুশাসনে ভাবিত হইয়াই রাজ্য শাসন করিয়াছেন। গ্রীসদেশীয় মেগাস্থিনিস্ ভারত সম্বন্ধে ও বিশেষতঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা ও ব্যবহারতত্বাদি সম্বন্ধে বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। তাহার সহিত কৌটিল্য (চাণক্যের নাম) প্রণীত অর্থশাস্ত্রের কথিত বিষয়ে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। নানা কারণে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শাসন কালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের উপকারক। আমরা মৌর্য্যবংশীয় সাম্রাজ্য কাল, গুপ্ত সাম্রাজ্য কাল, সেকেন্দরের অক্রামণকালের ইতিহাস আলোচনা করিব। এই সময়ের ইতিহাসেও ভ্রমণকারীগণের বিবরণে ভারতীয় অনুশাসনের বিকাশ দেখিতে পাই। মনুর অনুশাসনে রাজা প্রজার প্রতিনিধি। মনু বলিতেছেন,—

"স রাজা পুরুষোদণ্ডঃ স নেতা শাসিতা চ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণাং চ ধর্ম্মস্ত প্রতিভূস্মৃতঃ।"

৭।১৭

রাজা প্রজাগণের নেতা, রাজা বর্ণ ও আশ্রমের প্রতিভূ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুর্ব্বর্ণের রাজা প্রতিনিধি। এই অনুশাসনের উপরেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। চাণক্যও অর্থশাস্ত্রে লিখিয়াছেন, "কার্য্যে অনুশাসনই রাজব্রত, কার্য্য সমাপনই তাহার যজ্ঞ, এবং সকলের প্রতি সমদৃষ্টিই সে যজ্ঞের দক্ষিণা ও দীক্ষা। প্রজার সুখেই রাজার সুখ। তাহাদের হিতেই তাঁহার হিত, বস্তুতঃ যাহা সকল প্রজার সুখদায়ক তাহাই তাঁহার পক্ষে সুখকর"—অর্থশাস্ত্র ১৯শ অধ্যায় রাজকর্ত্তব্য (যোগীন্দ্র বসুর অনুবাদ ৫১পৃষ্ঠা Lahiri's edition).

ভারতীয় এই অনুশাসনের ফলেই প্রজাতন্ত্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেকেন্দরের আক্রমণ সময়েও আমরা ভারতে সাধারণতন্ত্র দেখিতে পাই। গ্রীসদেশীয় লেখকগণের লিখিত বিবরণই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সাধারণতন্ত্র ইউরোপের আমদানি নহে। খৃষ্ট জন্মিবার বহুপূর্ব্বেই ভারতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সেকেন্দরের ভারত আক্রমণ সময়ে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেব তৎপ্রণীত Early History of India নামক গ্রন্থে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। তৎপ্রণীত পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায় (Clarendon Press. 2nd Edition) ফুটনোটে স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন।

* * * * According to Curtius (Ix 8) Alexander came to a second nation called Malli (whom Mr. Mc. Crindle confounds with the Malloi of the Ravi) and then to the Sabarcai, a powerful tribe with a democratic form of Government and no king. Their army was said to comprise 60,000 foot, 6,000 cavalry and 500 chariots under the command of three renowned generals.

* * * * The Sabarcai are called Sambastai by Diodorus, who agrees with Curtius in his account of the Government and military force of the tribe" অর্থাৎ কার্টিয়াসের মতে সেকেন্দর মালী নামক দ্বিতীয় জাতির নিকট উপস্থিত হইলেন। ম্যাক্ ক্রিণ্ডেল সাহেব ভ্রমক্রমে রাভিতীরস্থ মাল্লয় বা মালব বা মল্ল বা মদ্র জাতিকেই মালি জাতি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। সেকেন্দর এই জাতিকে পরাজিত করিয়া সাবার্স জাতির নিকট উপস্থিত হইলেন। এই জাতির সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী ছিল। কোনও রাজা ছিল না। ইহাদের সৈন্য ৬০,০০০ পদাতিক, ৬০০০ অশ্বারোহী ও ৫০০ রথী ছিল, তিনজন বিখ্যাত সেনানায়ক সৈন্যকে পরিচালিত করিত। ডিয়োডোরাস এই সবর্সি জাতিকে সম্বষ্ট জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাতির শাসনপ্রণালী ও সৈন্যশৃঙ্খলা বা শ্রেণী সম্বন্ধে ডিয়োডোরাস্ কার্টিয়াসের সহিত ঐক্যমত।"

কার্টিয়াস্ প্রভৃতি লেখকগণ ভারতীয় সাধারণতন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

খৃষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্বেই ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের উপর ভিত্তি করিয়াই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। শাস্ত্রকারগণ মূল সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সূত্র ধরিয়া রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এই গণতন্ত্র শাস্ত্রীয় অনুশাসনের অভিব্যক্তি। কেবল এই সময়ে নহে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালেও গণতন্ত্র দেখিতে পাই। সেকেন্দরের আক্রমণ কালে সিন্ধুদেশে যে সকল জাতির গণতন্ত্র শাসনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এই দীর্ঘ ৮০০ শত বৎসর পরেও সেই সকল জাতির গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাতন্ত্রবাদের সবিশেষ স্ফূর্ত্তি না হইলে এই দীর্ঘ অষ্টশতাব্দী ব্যাপী প্রজাতন্ত্র সম্ভব হইত না। সমুদ্র গুপ্ত উত্তর ভারতের সম্রাট, তাঁহার প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে সভাকবি হরিষেণ লিখিয়াছেন, তাহাতেও গণতন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্র গুপ্তের সাম্রাজ্যের সীমান্তে এই সকল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ছিল। ঐতিহাসিক স্মিথ্ সাহেবের

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে ; তিনি লিখিতেছেন,—

"The author of the Panegyric classifies his lord's campaigns geographically under four heads ; as those directed against eleven kings of the south ; nine named kings of Aryavarta or the Gangetic plain, besides many others not specified ; the chiefs of the wild forest tribes ; the rulers of the frontier kingdoms and republics." (Smith's Early History of India p. p. 268 2nd edition C. P. S.)

অর্থাৎ

এই প্রশস্তিকার (প্রশংসাসূচক গ্রন্থের কর্ত্তা) রাজার যুদ্ধকে ভৌগলিক সংস্থান হিসাবে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—

১। দক্ষিণ দেশের ১১ জন রাজন্যের বিরুদ্ধে। ২। আর্য্যাবর্ত্ত বা গাঙ্গেয় প্রদেশের ৯ জন রাজার বিরুদ্ধে এই নয়জনের নাম পাওয়া যায় এবং অনেকের নাম প্রদত্ত হয় নাই। ৩। বন্যজাতির বিরুদ্ধে ৪। সীমান্ত প্রদেশস্থ রাজন্যবর্গের ও সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে।"

যে সকল জাতির সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী ছিল তাহাদের সম্বন্ধে স্মিথ্ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও এস্থলে প্রদত্ত হইল ; ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়াছিল। স্মিথ্ সাহেব লিখিতেছেন,—

"The Punjab, Eastern Rajputana, and Malwa for the most part were in possession of tribes or clans living under republican institutions. The Yaudheya tribe occupied both banks of the Sutlej, while the Madrakas held the central parts of the Punjab. The reader may remember that in Alexander's time these regions were similarly occupied by autonomous tribes, then called the Malloi, Kathawi, and so forth. The Jumna probably formed the north-western frontier of the Gupta Empire. The Arjunayanas, Malavas, and Abhiras were settled in Eastern Rajputana and Malwa and in this direction the river Chambal may be regarded as the imperial boundary".

(Early Hist. India p. p. 271 2nd edi. C.P.S.)

অর্থাৎ পাঞ্জাব, পূর্ব্বরাজপুতানা, এবং মালব অনেকাংশে নানারূপ জাতির শাসনাধীন ছিল। এই সকল জাতির শাসন প্রণালী প্রজাতন্ত্র। যৌধেয় জাতি শতদ্রুর উভয় তীরে অবস্থিত ছিল। মাদ্রক জাতি পাঞ্জাবের মধ্যপ্রদেশ অধিকারে রাখিয়াছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে সেকেন্দরের সময়ে এই সকল ভূভাগে সাধারণতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল, তখন এই সকল জাতির নাম মল্ল, কথ্ প্রভৃতি ছিল। সম্ভবতঃ যমুনানদী গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তর পশ্চিমসীমান্ত রেখা ছিল। অর্জ্জুনায়ন, মালব, আভীর প্রভৃতি জাতি পূর্ব্ব রাজপুতনা ও মালবে বাস করিত এবং এই দিকে চম্বল নদীকেই সাম্রাজ্যের সীমারূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

উপরোক্ত প্রমাণে নিঃসন্দেহে ভারতীয় সাধারণ তন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল। মন্বাদিশাস্ত্রকারের অনুশাসনের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তিই গণতন্ত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সময় এই সকল স্থান মৌর্য্যবংশের অধীন হইলেও পুনরায় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সহিত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। অন্ততঃ ঐ সকল প্রদেশের আভ্যন্তরীণ শাসন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের কালেও গণতন্ত্রমূলক ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে চাণক্য মন্ত্রী, তৎপ্রণীত অর্থশাস্ত্রেই বলিতেছেন "প্রজার সুখই রাজার সুখ।" আমাদের মনে হয় গণতন্ত্র ভারতের অস্থিমজ্জাগত; প্রজাতন্ত্রের উপরেই ভারতীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, ভারতীয় অনুশাসনের অন্য বিশেষত্ব সাম্রাজ্য স্থাপন। রাজসূয় ও অশ্বমেধ উভয় যজ্ঞের তাৎপর্য্য সাম্রাজ্য স্থাপন। মহাভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। রামায়ণেও অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ রহিয়াছে।

দশরথের অশ্বমেধ, সগরের অশ্বমেধের উপাখ্যান সর্ব্বজন বিদিত। বাস্তবিক জাতিকে বাঁচিতে হইলে সাম্রাজ্য গঠন করিতে হইবে। জাতি এই সারসত্য ভুলিলেই জাতীয় অধঃপতন অনিবার্য্য হয়। ভারতীয় অনুশাসনের এই মহান্ সত্য ঐতিহাসিক যুগেও অল্প বিস্তর দেখিতে পাই। অবশ্যই বৌদ্ধযুগে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ভারতে সবিশেষ ফলবতী হয় নাই। সেকেন্দরের আক্রমণ সময়েও ভারতে অখণ্ড সাম্রাজ্য দেখিতে পাই না। তক্ষশীলার রাজা পুরুর বিরুদ্ধে অভিযানের সহায় হইয়াছিল। বাস্তবিক ভারতীয় অধঃপতনের অন্যতম কারণ সাম্রাজ্যের অভাব। সাম্রাজ্যের অভাবের কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম। এ সম্বন্ধে আমাদের লিখিত "রাজনীতি" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। প্রাচীন ভারতে ঐতিহাসিক যুগে মৌর্য্যবংশ, পুষ্যমিত্র ও গুপ্ত বংশকে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ দেখিতে পাই। হর্ষবর্দ্ধনের সময় গুপ্ত বংশীয় শেষ সম্রাট শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্দ্ধন উভয়ই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ও প্রভুত্ব বিস্তারে প্রয়াসী। বৌদ্ধ ষড়যন্ত্রের ফলে অনেক স্থলে সাম্রাজ্য গঠন হইতে পারে নাই। আমাদের মনে হয় বৌদ্ধগণ হীনপ্রভ হইয়া কতকটা পরিমাণে ষড়যন্ত্রকারী হইয়া পড়িয়াছিল। শশাঙ্কের ও ধর্ম্মপালের সময় তাহাদের ষড়যন্ত্র ঐতিহাসিকের অবিদিত নহে। হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ে বিরক্ত হইয়া বৌদ্ধগণ সংঘের জন্য রাজনীতিক্ষেত্রে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ হইতেই ভারতীয় অধঃপতনের সূচনা হইয়াছে, বৈদেশিক আক্রমণে ভারত বিধ্বস্ত হইয়াছে।

অভ্যুন্নতির ফলেই বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য্য) প্রথমে সেলুকশের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। তৎপৌত্র অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ বিস্তার হয়। প্রিয়দর্শী অশোক সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসনশৃঙ্খলার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিলেও শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে যে সকল অনুশাসন সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, তৎফলে জাতি নিৰ্জ্জীব, স্বতন্ত্র, অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। অশোকের সাম্রাজ্য অনেকটা পরিমাণে 'ঈশ্বরীয় সাম্রাজ্যে' ("Theocracy") পরিণত হইবার যোগাড় হইয়াছিল, এইরূপ ... ... অনুশাসনে জাতীয় মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, জাতীয় অবনতির পথ উন্মুক্ত হইল। অশোক জাতিকে নরম ও শান্ত করিলেও দুর্ব্বল ও অপদার্থ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি দেখিলে তাৎকালিক রাজনৈতিক ভারতের একটা ধারণা জন্মিতে পারে। বিশেষতঃ ভারতীয় প্রাচীন অনুশাসন বলেই চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে পরিচালিত করিয়াছিলেন। মনু প্রভৃতির অনুশাসনের উপর ভিত্তি করিয়াই চাণক্য অর্থশাস্ত্র' লিখিয়াছেন। চাণক্যের (অর্থশাস্ত্রের) অনেক স্থলেই মনু পরাশর প্রভৃতির মত উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের নিম্নলিখিত পৃষ্ঠায় উল্লেখ দেখিতে পাই (যোগীন্দ্র বসুর অনুবাদ দ্রষ্টব্য ৩৮।৭৩।১৯৮ পৃষ্ঠা,) গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না। মনু ভিন্ন অন্যান্য আচার্য্য ও শাস্ত্রকার-গণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। পরাশর, পিশুন, ভরদ্বাজ, কৌণপদন্ত, বাতব্যাধি, অম্ভিয়, বিশালাক্ষ, বাহুদন্তীপুত্র, বৃহস্পতি, ও উশনা প্রভৃতির নাম 'অর্থশাস্ত্রে' বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকস্থলে ইঁহাদের মত তুলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। নিজের গুরুদেবের মতও অনেক স্থলে খণ্ডিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে স্মিথ্ সাহেবের একটী উক্তি এস্থলে খণ্ডন করা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তাঁহার মতে গুপ্ত বংশের সময়ে Classical সংস্কৃত সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়। এই সময়েই সম্ভবতঃ পুরাণ ও স্মৃতিগুলি (বর্ত্তমান যেরূপভাবে পাওয়া যায়) বিরচিত হইয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন "To the same age probaby should be assigned the principal Purans in their present form ; the metrical legal treatises, of which the so-called code of Manu is the most familiar example, and in short the mass of the 'classical' Sanskrit Literature"

Early His. India p p 288

(General literary impulse]

অর্থাৎ পুরাণ সমূহ বর্ত্তমানে যেরূপভাবে পাওয়া যায় সম্ভবতঃ এই যুগেই সেগুলি রচিত হইয়াছিল। ছন্দোবদ্ধ

ব্যবহার শাস্ত্রগুলিও এই যুগেই রচিত হইয়াছে। এই ব্যবহার-শাস্ত্রগুলির মধ্যে তথাকথিত মনুসংহিতা অন্যতম, এবং সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে Classical সংস্কৃত সাহিত্য এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। এ স্থলে দেখিতে পাই অর্থশাস্ত্র খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে লিখিত, কারণ চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক, চন্দ্রগুপ্ত (মৌর্য্য) খৃঃ পূঃ ৩২১ সনে সিংহাসন আরোহণ করেন। কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা খৃষ্টাব্দের ৩২০ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে কুমারগুপ্তের মৃত্যু হইতেই অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীতে অর্থশাস্ত্র বিরচিত, তাহাতে মন্বাদির উল্লেখ কি প্রকারে সম্ভব? মনুসংহিতা প্রভৃতি যদি গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় বিরচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থে মন্বাদির উল্লেখ থাকে কি প্রকারে? অর্থশাস্ত্রে কেবল মনুর মত উদ্ধৃত হয় নাই। অনেক স্থলে অর্থশাস্ত্রের মতের সহিত মনু প্রভৃতির মতের সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। দৃষ্টান্তস্বরূপ অর্থশাস্ত্রের ১৮২ পৃষ্ঠার বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। "গুরুদেব বলেন যে অপরের ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে, ক্ষেত্রস্বামীই বীজের অধিকারী হয়। অপরে বলেন যে গর্ভধারিণী বীজের আধার মাত্র। সুতরাং জনকই পুত্রের অধিকারী। কৌটিল্য বলেন যে মাতাপিতা জীবিত থাকিলে উভয়েই সন্তানের অধিকারী।"

এই উদ্ধৃতবাক্যের প্রথম মতের অনুরূপ মত নারদস্মৃতিতে দেখিতে পাই। (নারদ ১২।৫৫ দ্রষ্টব্য) কৌটিল্যের মত নারদ ও মনুর মতের অনুরূপ। (নারদ সংহিতা বা ধর্ম্মসূত্রের ১২।৫৬।৫৮ দ্রষ্টব্য। মনুর ৯ম অধ্যায় ৫০ হইতে ৫৪ দ্রষ্টব্য) যাজ্ঞবল্ক্যের সহিতও অনেক স্থলে অর্থশাস্ত্রের মিল দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের ১৯৪ পৃষ্ঠায় "বনভূমিতে ... ..." ইহার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের ২,৩৯ এর সহিত, ১৯৫ পৃষ্ঠার "পিতার মৃত্যুর অন্তে পুত্র তাঁহার দেয় কুসীদ ও মূলধন পরিশোধ করিবে" ইহার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের ২।৫১ এবং ৫২ এর, এবং ২০৮ পৃষ্ঠার "সেই ভৃত্যের দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে" ইহার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের ২।১৯৩ এর সাদৃশ্য বিদ্যমান। অন্যান্য অনেক স্থলেই মত-সাদৃশ্য রহিয়াছে। এ স্থলে বলিতে হইবে হয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অর্থশাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিয়াছেন অথবা অর্থশাস্ত্র উঁহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অর্থশাস্ত্রে মনুর উল্লেখ ও মত থাকায় প্রতীয়মান হয় অর্থশাস্ত্রকারই মনু প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইলে মন্বাদি-সংহিতা ৪র্থ বা পঞ্চম খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ রামায়ণ ও মহাভারতে মনুর উল্লেখ আছে। অনেক স্থলেই মন্বাদির মত বিদ্যমান। মহাভারত প্রভৃতি অতিশয় প্রাচীন, বুদ্ধদেবেরও অনেক পূর্ব্বে মহাভারত প্রভৃতি বিরচিত। মন্বাদির স্মৃতি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির পূর্ব্বে হইলে গুপ্ত সময়ে রচিত হইতে পারে না। তৈত্তিরীয় শ্রুতিও বলিতেছেন *—"যদ্বৈ কিংচ মনুরবদত্তদ্ভেষজম্" ইতি এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে শ্রুতিকথিত মনু কে? কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের মৈত্রায়ণী শাখায় "মানব শ্রৌত সূত্রম্" আছে। ঐ বেদের গৃহ্য সূত্র সমূহের মধ্যে "মানবগৃহ্য সূত্র" ও পাওয়া যায়। অনুমিত হইতে পারে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের "মানব ধর্ম্মসূত্র" নামে ধর্ম্মসূত্র থাকিতে পারে, বর্ত্তমান মনুসংহিতা তাহার অভিব্যক্তি মাত্র।

Mc.Donnel সাহেব তৎপ্রণীত History of Sanskrit Literature নামক গ্রন্থে ঐরূপ মতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। মহাভারতে মনুর উল্লেখ আছে, মনুর মত এমন কি কোনও কোনও স্থলে মনুসংহিতার শ্লোক মহাভারতে পরিদৃষ্ট হয়। যদি মনুসংহিতা সংহিতাকারে খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে হইয়া থাকে তাহা হইলে মহাভারতে উহার উল্লেখ থাকে কি প্রকারে? যদি কেহ কেহ বলেন ঐ সকল শ্লোক মহাভারত হইতে সংহিতাকার সংগ্রহ করিয়াছেন, তদুত্তরে আমরা বলিব মহাভারতে মনুর নাম ও তৎপ্রণীত শ্লোক রহিয়াছে কেন? নামের সহিত শ্লোক থাকাতে মনুকে মহাভারত হইতে পূর্ব্বের বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মনুর মতানুসারে ভারতীয় সমাজ পরিচালিত হইয়াছে—এই ইতিবৃত্ত পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

কেবল বাহিরের প্রমাণে ইতিবৃত্তকে অবজ্ঞা করা কোনও ঐতিহাসিকের পক্ষেই সঙ্গত নহে। যদি কেহ বলেন

* তৈত্তরীয় সংহিতা ২।২।১০।২

বর্তমান মনুসংহিতা সূত্রাকারে বৈদিক ও মহাভারতীয় যুগে ছিল, তৎপরে গুপ্ত সাম্রাজ্যীয় যুগে সংহিতাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, তদুত্তরে বলিব পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য বৃহস্পতি প্রভৃতি সংহিতার কোনও মৌলিক বৈদিক সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুসংহিতার যেরূপ 'মানবধর্ম্মসূত্র' অনুমিত হইতে পারে পরাশর সংহিতার সেরূপ হইবার উপায় নাই, ভাষা অংশে মনুসংহিতার ভাষ্য ও পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য, বৃহস্পতি প্রভৃতির ভাষ্য একই প্রকার। এই সকল গুলিই classical সংস্কৃতে লিখিত। Classical সংস্কৃতের দোহাই দিয়া এই গুলিকে খৃঃ ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে ফেলিলে নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য হয়। ভাষা দেখিতে গেলে রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষা মনুসংহিতার ভাষার অনুরূপ। রামায়ণ মহাভারত বৌদ্ধযুগের অনেক পূর্ব্বে বিরচিত। অর্থশাস্ত্রে রামায়ণী ও মহাভারতীয় চরিত্রসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে, "অহঙ্কারী রাবণ রামকে সীতা প্রত্যর্পণ না করায় এবং দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অংশ না দেওয়ায়, তদুপযুক্ত ফল ভোগ করিয়াছিলেন। অহংকারে মত্ত হইয়া সকলকে ঘৃণার চক্ষে দেখাতে দম্ভোদ্ভব, হৈহয় নরপতি অর্জ্জুন, হর্ষোৎফুল্ল বাতাপি, দ্বৈপায়ণদিগের আক্রমণকারী বৃষ্ণিসংঘ সকলেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। * * *

সুবিখ্যাত জিতেন্দ্রিয় জামদগ্ন্য এবং অম্বরীষ ষড়রিপুকে দূর করিয়া অনেক কাল পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন,— অর্থশাস্ত্র p p 17 (Samaddar's Trans.)

এই সকল স্থলে রামায়ণের ও মহাভারতের চরিত্র সমূহের উল্লেখ বিদ্যমান। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি যে চাণক্যের পূর্ব্বে তাহা অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হইল। বিশেষতঃ বুদ্ধের বহুপূর্ব্বে যে রামায়ণী ও মহাভারতীয় যুগ তাহা ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে প্রমাণীকৃত। ভাষার অজুহতে মনুসংহিতাকে খৃঃ ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে স্থাপিত করা নিতান্ত অন্যায়। শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখা অবশ্যই প্রাচীন। এই বেদের শেষ অংশই ঈশোপনিষৎ। ইহার ভাষা কতকটা পরিমাণে classical, রামায়ণ ও মহাভারতের ভাষাও classical, এমতাবস্থায় মনুসংহিতাকে গুপ্তযুগে নির্দ্দেশ কখনই সঙ্গত নহে। এস্থলে স্মিথ্ সাহেব ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ভ্রমাত্মক পন্থা অনুসরণ করিয়া প্রতারিত হইয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের প্রামাণ্য তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, পুরাণগুলিরও কতক অংশ যে অতি প্রাচীন তাহাও তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন,—'which (purans) in their oldest forms were undoubtedly very ancient" E H I p p 20 পুরাণেও মনুর উল্লেখ এমন কি অনেক স্থলে মনুসংহিতার শ্লোক শব্দে শব্দে মিলিয়া যায়। পুরাণ সমূহের প্রাচীনতা স্বীকার করিলে মন্বাদির অধিকতর প্রাচীনতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তাঁহার মতে পুরাণ সমূহ বর্ত্তমানে যেরূপ ভাবে পাওয়া যায় তাহাই ৪র্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে, কিন্তু মূল পৌরাণিক অংশ তদপেক্ষাও প্রাচীন, অতএব মন্বাদি সংহিতা গুপ্তবংশীয় অভ্যুদয়ের কালে বিরচিত বা সংকলিত হয় নাই। এস্থলে স্মিথ্ সাহেব ভ্রান্তমত পোষণ করিয়াছেন। এরূপ ভুল হওয়া বিদেশীর পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক। তিনি তাঁহার ইতিহাসে "শিবের বৃষনন্দী"—the figure of the Indian god Siva, attended by his bull Nandi" এরূপ ভ্রমাত্মক বাক্য লিখিয়াছেন,—p. p, 254 (2nd Ed.,)

অবশ্যই এ সকল ক্ষেত্রে স্মিথ্ সাহেবকে বেশী দোষ দেওয়া যায় না, বিদেশীর পক্ষে এরূপ ভ্রম অনেক ক্ষেত্রেই, মার্জ্জনীয়, কিন্তু আমাদের দেশীয় ঐতিহাসিকও কেহ কেহ ইহা হইতে ভয়ঙ্কর ভুল করেন। আরও একটী কথা মনে হয় এই সকল ইতিহাস বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়, ছাত্রগণের শিক্ষার দোষ অনেক পরিমাণে হয়, নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা অত্যন্ত গর্হিত, উহাতে জাতীয় জীবন সংকুচিত হয়। অনেকে দেশীয় শাস্ত্র পড়ে না, ঐ সকল ইতিহাসই তাহাদের প্রমাণ, তাহারা যে জাতীয় জীবনের প্রকৃত ইতিহাসে বঞ্চিত হইবে ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। প্রাসঙ্গিক ক্রমে ইহা বলিয়া আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব। সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞই আমাদের বর্ত্তমানের আলোচ্য। মৌর্য্যবংশের সাম্রাজ্য বর্ত্তমান ভারতের বহির্ভাগেও বিস্তৃত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বঙ্গোপসাগর হইতে

আরব সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন,—"So that the dominions of Chandra Gupta, the first historical paramount Sovereign or emperor in India, extended from the Bay of Bengal to the Arabian Sea"—চন্দ্রগুপ্ত সেলুকশকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্যের আরও বিস্তার সাধন করিয়াছিলেন, সেলুকশ পরাজিত হইয়া ভারত অধিকারের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, অধিকন্তু তিনি সিন্ধুর পশ্চিম, প্রদেশস্থ এরিয়ানার অধিকাংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৫০০ হস্তীর বিনিময়ে চন্দ্রগুপ্তকে প্যারোপেনিসদই (Paropanisadia) এরিয়া (Aria) এবং অ্যারাকোসিয়া (Arachosia) ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, এই সকল রাজ্যের রাজধানীগুলির বর্ত্তমান নাম কাবুল, হিরাট ও কান্দাহার। স্মিথ্ সাহেব বলেন সম্ভবতঃ জিড্রোসিয়া (Gedrosia) অথবা অন্ততঃ ইহার পূর্ব্বাংশও প্রদত্ত হইয়াছিল *। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য উত্তরপশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। মোগল সাম্রাজ্যের সময়ও সমগ্ররূপে হিন্দুকুশের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয় নাই। স্মিথ্ সাহেব লিখিতেছেন,—

"The range of Hindukush mountains, known to the Greeks as the Paropanisos or Indian Caucasus, in this way became the frontier between Chandra Gupta's provinces of Herat and Kabul on the south and the Seleukidan province of Bactria on the north. The first Indian Emperor, more than two thousand years ago, thus entered into possession of that scientific frontier sighed for in vain by his English successors and never held in its entirety even by the Moghal monarchs of the sixteenth and seventeenth centuries."

E.H.I. p.p. 118.

অর্থাৎ গ্রীকগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণীকে প্যারোপেমিসস্ বা ভারতীয় ককেসশ্ বলিয়া অভিহিত করিত। এই পর্ব্বতশ্রেণীই চন্দ্রগুপ্তের হিরাত ও কাবুল প্রদেশের ও সেলুকশের ব্যাকট্রিয়া প্রদেশের সীমারূপে অবস্থিত ছিল। দুই সহস্র বৎসরের অধিককাল হইল ভারতের প্রথম সম্রাট সেই বিজ্ঞানসম্মত সীমা অধিকার করিলেন, যাহা দখল করিবার জন্য ইংরাজগণ এখনও বঞ্চিত অন্তঃকরণে অবস্থিত। সেই সীমা মোগলগণও সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিতে পারেন নাই। স্মিথ সাহেবের মতে দাক্ষিণাত্যে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত অথবা তৎপুত্র বিন্দুসার দখল করিয়াছিলেন। অশোক কলিঙ্গ জয় করিয়া কলিঙ্গে মৌর্য্য-প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দ্রগুপ্ত বা তৎপুত্র বিন্দুসার যে কেহই দাক্ষিণাত্য জয় করেন, তাঁহাদের মনে ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনা যে সবিশেষ বলবতী ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রীক আক্রমণে ভারতকে বিধ্বস্ত হইতে দেখিয়া চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, সাম্রাজ্য ব্যতীত বিদেশীর আক্রমণ প্রতিহত হইতে পারিবেনা। ভারতীয় সনাতন "অশ্বমেধ যজ্ঞের" প্রকৃত ভাব প্রবর্ত্তিত না হইলে ভারতীয় জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। চন্দ্রগুপ্ত হিন্দু, তাঁহার মন্ত্রী প্রবীণ চাণক্য। চাণক্যের হৃদয়ে শাস্ত্রীয় প্রভাব দৃঢ় অঙ্কিত ছিল, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার উপায় নাই। অত্যাচারী রাজাকে ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রজার কল্যাণ সাধন তাঁহার কার্য্য। শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া অক্ষুণ্ণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার জ্ঞান গবেষণা ও কর্ম্মতৎপরতার ফল। চন্দ্রগুপ্তের মত শিষ্য আর চাণক্যের মত শাস্ত্রজ্ঞানী গুরুর সম্মিলনে রাজনৈতিক সাগরসঙ্গমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ভারতীয় অনুশাসন বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হইয়াছিল। মহাভারতীয় যুগে "খণ্ডচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" ভারতকে এক করিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। রামায়ণেও দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণিত বিষয়ের, সগর রাজার অশ্বমেধ ও সর্ব্বজনবিদিত রামচন্দ্রের লঙ্কেশ বিজয় ও কিষ্কিন্ধ্যা অধিকারের

* The satraphy of Gedrosia or at least the eastern portion of it, seems also to have been included in the cession."—Smith's E. H. I. p. p. 117.

মূলেও সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা। কিষ্কিন্ধ্যা অধিকার করিয়া সুগ্রীবের সহিত "Defensive and offensive alliance" বা বন্ধুতা স্থাপন করিবার মূলেও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। জাতিকে বাঁচিতে হইলে দৃঢ়বল হইতে হইবে। বিভিন্ন-স্বার্থ জাতি অবনতির পথে অগ্রসর হয়। অখণ্ড সাম্রাজ্যে জাতীয় জীবন দৃঢ় সংবদ্ধ হয়। এক শাসন-প্রণালীর অন্তর্ভূত হইলে বিদেশীয় ও বিজাতীয় আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি জন্মে। ক্ষুদ্র রাজ্যের পতন অনেক ক্ষেত্রেই হয়। ভারতীয় বিচ্ছিন্নতার জন্যই ভারত আক্রমণকারীগণের হস্তগত হইয়াছে। সেকেন্দরের সময় আক্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হওয়ার মূলেও অনৈক্য ভারতীয় অনুশাসন প্রতিপালিত না হওয়াতেই জাতীয় জীবন ক্ষুন্ন হইয়াছে। যাহা হউক মৌর্য্য বংশের সময়ে ভারতীয় জীবনে নূতন আশা নূতন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শাস্ত্রীয় অনুশাসন নবভাবে নূতন আকারে ভারতীয় জাতীয় জীবনে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত উত্তরে হিন্দুকুশ ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে আরব সাগর পর্য্যন্ত মৌর্য্য সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের কতক অংশ অনধিকৃত থাকিলেও ভারতের উত্তর অংশের সকল ভূমিভাগ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দাক্ষিণাত্য বিজয় সম্বন্ধে স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, "It is more probable that the conquest of the south was the work of Bindusara than it was effected by his busy father. But the ascertained outline of the career of Chandra Gupta is so wonderful and implies his possession of such exceptional ability that it is possible that the conquest of the south must be added to the list of his achievements" অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য অধিকার সম্ভবতঃ বিন্দুসারের কার্য্য। বিন্দুসারের পিতা চন্দ্রগুপ্ত নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া ইহা অধিকতর সম্ভাবনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের জীবনের কার্য্যাবলী এবং তাঁহার ক্ষমতা এত অলৌকিক, এরূপ বিস্ময়োৎপাদক যে দাক্ষিণাত্য বিজয় তদ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

যাঁহার রাজত্বকালেই দাক্ষিণাত্য বিজয় সংসাধিত হউক চন্দ্রগুপ্ত ও বিন্দুসারের সময় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ছিল। অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই ভারতীয় জাতীয়-জীবন কতক পরিমাণে হীনপ্রভ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও অশোকের রাজত্বকালে শৃঙ্খলা প্রভাব যথেষ্ট ছিল কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে জাতীয় জীবন বিপর্য্যস্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অশোকের মৃত্যুর পর হইতেই ভারতীয় জীবন সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যদিও গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময়ে ভারতে নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল, তথাপিও বৌদ্ধপ্রভাবে নির্জ্জীব ও সঙ্কুচিত জাতি দীর্ঘকাল নবজীবন ভোগ করিতে পারে নাই। ষড়যন্ত্র দুর্ব্বলতার নিদর্শন। বৌদ্ধগণ দুর্ব্বল হইয়াই ষড়যন্ত্রপরায়ণ হইয়া, জাতীয় সাম্রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। ভারতীয় জাতীয় যাহা বিশেষত্ব তাহা নষ্ট করিয়া অস্বাভাবিক কল্পনার ধর্ম্মে জাতিকে অনুপ্রাণিত করিল।

(ক্রমশঃ)

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার]

৯ম স্তবক।

অতঃপর মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমন জন্য উৎকণ্ঠিত হ'ন। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সংকল্প অবগত হইয়া বড় বিমনা হইলেন। রাজা রায় রামানন্দ ও সার্ব্বভৌমকে ডাকাইয়া বলিলেন তাঁহারা উভয়ে যেন প্রভুকে নীলাদ্রি ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে না দেন।

'তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়।
গোসাঞি রাখিতে করিহ নানা উপায়॥"

রামানন্দ ও সার্ব্বভৌম প্রভুর বিচ্ছেদাশঙ্কায় পূর্ব্ব হইতেই ম্রিয়মান ছিলেন—রাজার আদেশ বা অনুরোধে প্রভুর বৃন্দাবন গমনে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তৃতীয় বর্ষ সমাগত হইল এবং গৌড়ের ভক্তগণ পুনরায় নীলাচল রওনা হইলেন। এবারে গৌড়ীয় গৃহস্থাশ্রমী অনেক ভক্তই সপত্নীক নীলাচল যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ সেনের এক বালক পুত্রও পিতামার সহ গিয়াছে—"তাঁহা চলিতেছে প্রভু দেখিতে উল্লাস।"

রাঘব পণ্ডিত প্রভুর বৎসরোপযোগী নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া এক বিশালকায় "ঝাপী" সাজাইয়া মাথায় করিয়া চলিয়াছেন—এই বিচিত্র ঝাপী বৈষ্ণব মণ্ডলে "রাঘবের ঝাপী" বলিয়া পরিচিত। বৈষ্ণববন্দিতা পূজনীয়া আচার্য্যগৃহিণী শ্রীবাসপত্নী মালিনী শিবানন্দ সেনের পত্নী সকলেই প্রভু দর্শনে চলিয়াছেন। ইঁহারা প্রভুর প্রিয় জিনিষ সেই সুদুর নীলাচলে সাদরে বহন করিয়া লইতেছেন। পুরীসন্নিধানে আঠার নালায় আসিলে গোবিন্দ প্রভুদত্ত মাল্য চন্দনে ভক্তগণকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ভক্তগণ নাচিতে নাচিতে কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রভু নরেন্দ্র তীরে ভক্তগণ সহ মিলিত হইলেন এবং সকলে একত্র জগন্নাথ দর্শন করিলেন। পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারও সকলের বাসার সংস্থান হইল। পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্য ও কীর্ত্তন হইল। সেই আনন্দ-সেই উৎসাহ সেই প্রেম পূর্ব্ববারের মতই সকলকে অভিভূত করিল। এ যাত্রার অভিযান-বিশেষত্ব ভক্তিমতী বৈষ্ণব-গৃহিণিগণের নীলাচল আগমন। নীলাচল গমন তখন সহজসাধ্য ছিল না। ভক্তির কত প্রবল উচ্ছ্বাসে অসূর্য্যস্পশ্যা হিন্দুললনাগণের সর্ব্ববিধ ক্লেশ অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া পদব্রজে বঙ্গভূমি হইতে উৎকলের সেই প্রান্ত-সীমায় যাওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল তাহা ধারণা করা কঠিন। প্রভু প্রায় নিত্যই ভক্তগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। অনেকেই প্রভুর প্রিয় জিনিস বাড়ী হইতে বহিয়া আনিয়াছেন।

"প্রভুর ব্যঞ্জন সব রাঁধিল মালিনী।
ভক্তে দাসী অভিমান স্নেহেতে জননী॥"

নিত্যানন্দকে প্রভু এবারে বলিলেন—"শ্রীপাদ তুমি প্রতি বর্ষে নীলাচল আসিও না—আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি নিয়ত গৌড়ভূমিতে বাস করিয়া জীবকে নাম, প্রেম বিতরণ কর। এবারেও সত্যরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভু আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দাও"—উত্তরে প্রভু বলিলেন,—

"বৈষ্ণব সেবা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥

এবারেও সত্যরাজ বৈষ্ণবের লক্ষণ জানিতে চাহিলে প্রভু হাসিয়া বলিলেন—

"কৃষ্ণ নাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥"

প্রভু পূর্ব্ববারে বৈষ্ণবের যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে যে ভক্তগণের সন্দেহ বিদুরিত হয় নাই তাহা বর্ষান্তরে পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা প্রকাশ পাওয়ায় বোধ হয় প্রভু হাস্য করিয়াছিলেন। বর্ষান্তরে বৈষ্ণবের তারতম্য শিক্ষা দিতে গিয়া প্রভু পরিশেষে বলিলেন—

"যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

এক মহাপ্রভু ব্যতীত—যাঁহার প্রেম-কান্তি দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া মাত্রই জীবের মলিন জিহ্বায় "হরিনাম" ফুটিয়া উঠিত—অপর কেহ বৈষ্ণব-প্রধানের এই সংজ্ঞাভুক্ত হইবেন কি না সন্দেহ। এই সংজ্ঞা দ্বারা প্রভু অতর্কিতভাবে স্বীয় স্বরূপেরই আভাষ প্রদান করিলেন।

এই প্রকারে গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতিবর্ষে নীলাচল আগমন করিতে লাগিলেন। পঞ্চম বৎসরে ভক্তগণ রথযাত্রা অন্তে নীলাদ্রি ত্যাগ করিলে প্রভু বৃন্দাবন যাইবার জন্য তীব্র উৎকণ্ঠা সার্ব্বভৌম ও রায় রামানন্দ নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারাও আর বেশী হঠ্ করা সঙ্গত নয় বিবেচনায় তাদৃশ আপত্তি করিলেন না। প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার এই দ্বিতীয় উদ্যম। প্রথম বারে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু উদ্ভ্রান্ত চিত্তে রাঢ়-দেশ দিয়া বৃন্দাবনাভিমুখী হইলে নিত্যানন্দ যে তাঁহাকে ভুলাইয়া অদ্বৈত-ভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ব স্তবকে বর্ণিত হইয়াছে। এবার বিজয়া দশমী তিথিতে প্রভুর বৃন্দাবন যাত্রার দিন অবধারিত হইল। ধীরে ধীরে বিজয়াদশমী তিথি সমাগত ও আসন্নবিচ্ছেদাশঙ্কায় ভক্তমণ্ডলী ম্রিয়মান হইলেন। নীলাচলবাসী গৌড় ও উৎকলের অসংখ্য ভক্ত বিচ্ছেদ অসহনীয় জ্ঞান করিয়া প্রভুর সঙ্গ লইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। নির্দ্ধারিত তিথিতে প্রভু জগন্নাথ দেব দর্শন ও প্রদক্ষিণ করতঃ নীলাচল ত্যাগ করিলেন, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন পথে ভ্রমণ ও তৃতীয় উদ্যমে বৃন্দাবন পরিভ্রমণের রমণীয় কাহিনী বর্ত্তমান আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত নহে। তাহা পৃথক ভাবে সঙ্কলিত হইল।

দ্বিতীয় উদ্যমে প্রভু কানাই-নাটশালা হইতে নীলাচল প্রত্যাবৃত্ত হ'ন। ফিরিবার পথে গঙ্গাতীরে গৌড়ীয় প্রধান প্রধান ভক্তগণের গৃহে পদধূলি দিয়া দ্রুত নীলাচল আইসেন। মহাপ্রভু নীলাচল ফিরিয়া আসিয়াই বৃন্দাবন যাইবার জন্য পুনরায় উদ্বিগ্ন হ'ন। গতবারে তিনি গৌড়ীয় ভক্তগণকে এ বৎসর রথযাত্রা কালে নীলাচল যাইতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই গৌড়ীয় ভক্তগনের বাৎসরিক অভিযানের জন্য আর প্রভুকে প্রতীক্ষা করিতে হইল না। তিনি অবিলম্বে বৃন্দাবন রওনা হইতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। রায় রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সনে প্রভু বৃন্দাবন যাত্রা সম্বন্ধে নানাপ্রকার যুক্তি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব বারে সঙ্গীয় লোকের সংখ্যাধিক্য বশতঃ প্রভুকে বড় অশান্তি ও উদ্বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে। এই অশান্তি বৃন্দাবন পথে তাঁহার স্বচ্ছন্দ গমনে এত অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছিল যে প্রভু সনাতনের একটি কথায় দ্বিতীয় উদ্যমে আর অগ্রসর না হইয়া কানাই-নাটশালা হইতে প্রত্যাগমন করেন। তিনি এবার পূর্ব্বাহ্ণেই প্রকাশ করিলেন—

"একাকী যাইব কাঁহো সঙ্গে না লইব।"

বৃন্দাবন পথে প্রভুর বাহ্য স্ফূর্ত্তি থাকে না। তিনি বিহ্বল চিত্তে পথে ছুটিতে থাকেন—উচ্ছ্বসিত ভাবাবেশ অহর্নিশ তাঁহাকে তন্ময় করিয়া রাখে। এই অবস্থায় দূরদূরান্তরের পথে তাঁহাকে নিঃসঙ্গী যাইতে দেওয়া যে কোন ক্রমেই সমীচীন নহে, ভক্তগণ তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। পথে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সঙ্গী থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। স্থির হইল বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামক এক সাধু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রভুর সঙ্গে যাইবেক এবং সেবাদির জন্য ভট্টাচার্য্যের এক বিপ্রভৃত্যও যাইবে। প্রভু এ বন্দোবস্তে সম্মত হইলেন। প্রভু শেষ রাত্রে গোপনে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। প্রভু প্রসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিয়া ঝাড়িখণ্ডের নিবিড় অরণ্য পথ দিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন পথে-

বারাণসী ধামে বৈদান্তিক শ্রেষ্ঠ শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে কঠোর জ্ঞানকর্ম্মপাশ হইতে ছিন্ন করিয়া প্রেমভক্তির রাজ্যে লইয়া আসেন এবং তৎপূর্ব্বেই প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে রূপগোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ শিক্ষা প্রদান করেন। ক্রমে প্রভু পুরীর সন্নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং বলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে ভক্তগণ আহ্বানে পাঠাইয়া দিলেন।

"শুনি ভক্তেরগণ পুনরপি জীলা।
দেহে প্রাণ আইলা যেন ইন্দ্রিয় উঠিলা ॥"

ভক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়া প্রভু দর্শনে বাধিত হইলেন। নরেন্দ্র সরোবর তীরে প্রভু ভক্তে মিলন হইল। ভক্তগণ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। দীর্ঘ দিনের বিরহানল করুণার প্লাবনে নির্ব্বাপিত হইল। স-ভক্ত মহাপ্রভু আনন্দে জগন্নাথ দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মৃতকল্প পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভু আগমনে আবার সজীব হইয়া উঠিল। প্রভুর নীলাচল প্রত্যাগমন সংবাদ গৌড়ে প্রেরিত হইলে গৌড়ীয় ভক্তগণ আবার মহানন্দে প্রভু দর্শনে নীলাচল যাত্রা করিলেন। এই সময় শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচলে আগমন করিয়া ঠাকুর হরিদাসের বাসভবনে অবস্থান করেন। হরিদাস শ্রীরূপের সঙ্গলাভে পুলকিত হন। রূপের নীলাচল গমন অবগত হইয়া এক দিবস প্রভু রামানন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহ হরিদাসের বাসস্থলে আগমন করিলেন। রূপ গোস্বামী সকল ভক্তকে বন্দনা করিলেন। প্রভুআজ্ঞায় রূপ বৃন্দাবন আসিয়া পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণলীলার ২য় খণ্ড নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নাটকের মঙ্গলাচারণ নাম্নী শ্লোক বৃন্দাবনেই লিখিত হয়। তৎপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের অকালে গঙ্গাপ্রাপ্তিতে ব্যথিত হইয়া রূপগোস্বামী মহাপ্রভুর চরণ দর্শন মানসে নীলাচল আগমন করেন। রূপগোস্বামী পরম পণ্ডিত। তিনি যে কৃষ্ণলীলা নাটক প্রনয়ণ করিতেছেন এ সংবাদ বৈষ্ণব মহলে শীঘ্রই প্রচারিত হইল। একদিবস মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দ সহ হরিদাস মন্দিরে আগমন করিয়া কহিলেন—

"কহ রূপ নাটকের শ্লোক।
যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় দুঃখ শোক ॥"

রূপ পড়িলেন :—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী লব্ধয়ে
কর্ণ-ক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গন সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

("কৃষ্ণ" এই দুই বর্ণে যে কি অমৃত আছে জানি না রসনায় এই শব্দ উচ্চারিত হইলে রসনারাশি লাভে কামনা হয়, কর্ণ-বিবরে অঙ্কুরিত হইলে অর্ব্বুদ সংখ্য কর্ণ লাভের বাসনা হয়, মনে প্রবেশ করিলে যাবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম পরাভূত হয়)

নাম-মহিমা জ্ঞাপক এই অপূর্ব্ব শ্লোক শ্রবণে ভক্তবৃন্দ আনন্দে, বিষ্ময়ে অভিভূত হইলেন। সকলেই বলিলেন—

"নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর।"
"নামের মহিমা ঐছে কাঁহা নাহি শুনি'

বলিয়া নাম-সাধক ঠাকুর হরিদাস আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন "রূপ, এ কোন মহাগ্রন্থ করিতেছ, যাহার মধ্যে এমন সিদ্ধান্তের খনি আছে।" স্বরূপ রূপ গোস্বামী কৃত নাটকের সম্যক পরিচয় দিলেন। অতঃপর ভক্তগণ নাটকের অন্যান্য শ্লোক শ্রবণ করিয়া বিমল আনন্দ লাভ করিলেন। রায় কহিলেন—"ইষ্টদেবের বর্ণনা কি করিয়াছ, পড় রূপ! রূপ সঙ্কুচিত লেন। তিনি ভক্তবৃন্দের নিকট এখনও তাদৃশ পরিচিত হয়েন নাই পরস্পরের প্রতি এখনও সেরূপ ভাব বিনিময় হয় নাই। নীলাচলের ভক্তাগ্রগণ্য রায় রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতির সম্মুখে শ্লোক পড়িতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতে ছিলেন। অনুরুদ্ধ হইয়া রূপ পড়িলেন।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি শ্রিয়ং।
হরি পুরটসুন্দরদ্যুতি কদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতুঃ বঃ শচীনন্দনঃ।

গৌর ভক্তের চির আদরের কলিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু

অবতারের মহান্ উদ্দেশ্য পরিজ্ঞাপক এই শ্লোক শুনিয়া ভক্তগণ সমস্বরে বলিলেন—

"কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া"

রায় কহিলেন, রূপ তোমার কবিত্ব "অমৃতের ধার" দ্বিতীয় নাটকের নান্দী শ্লোক পাঠ কর, সঙ্কুচিত হইয়া, শ্রীরূপ গোস্বামী পড়িলেন—

নিজ প্রণয়িতা সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যরণমুরলীকৃত দ্বিজকুলাধিরাসস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্ম্ম শচী সুতাখ্যাঃশশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যসতু॥

(যিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অজস্র প্রেম সুধা বিতরণ করিতেছেন যিনি "দ্বিজরাজকুলাধিরাজ"—যিনি অজ্ঞানান্ধকার বিনাশক—যিনি জগতের চিত্তহারক সেই শচীনন্দন আমার আনন্দ বিধান করুন)

শ্লোক শুনিয়া কিছু রোষাভাসে বলিলেন, "রূপ, তোমার অপূর্ব্ব কৃষ্ণরস-কাব্য-সিন্ধুমধ্যে এই মিথ্যা স্তুতিক্ষার বিন্দু কেন প্রক্ষেপ করিয়াছে। "রায় উপস্থিতই ছিলেন" তিনিও কম রসিক নহেন। রায় তৎক্ষণাৎ পুলকিত কণ্ঠে বলিলেন—

"রূপের বাক্য অমৃতের পুর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর।"

প্রভু বলিলেন—রায়, লোক উপহাসাস্পদ এই শ্লোক শুনিয়াও কি তোমার উল্লাস হইতেছে—রায় উত্তর করিলেন—

—"লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্ট দেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে॥"

রূপ গোস্বামী সর্ব্ব ভক্তের প্রীতিভাজন হইয়া নীলাচল বাস করিতে লাগিলেন। দোলযাত্রা অন্তে প্রভু তাঁহাকে আদেশ দিলেন—

"ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥"
কৃষ্ণ সেবা রস ভক্তি করিও প্রচার।
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার॥"

রূপ গোস্বামী প্রভু-চরণ শিরে ধারণ করিয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ" বলিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

পুস্তক সমালোচনা

(পদ্মপাদ)

গুরুগোবিন্দ সিংহ—(২য় সংস্করণ) শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,—সরস্বতী পুস্তকালয় ৯নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত মূল্য ॥৵০ আনা। বসন্তবাবু বেশ সুনিপুণ লেখক; শিখগুরুর জীবনীখানি তিনি সংক্ষেপে অথচ বেশ চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রামদাস স্বামী—শ্রীকিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত সরস্বতী পুস্তকালয় হইতেই প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা। শিবাজীগুরু রামদাস স্বামীর জীবনী বেশ সুখপাঠ্য—এই খানি পুস্তক জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে দেখিলে বিশেষ সুখী হইব।

স্বরাজ ও খেলাফত—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত। ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব কলেজ ষ্ট্রীট মারকেট্ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—মূল্য তিন আনা। লেখক বর্ত্তমান স্বরাজ ও খেলাফত আন্দোলনের মূল কারণ হইতে আরম্ভ করিয়া সব ঘটনার বিবৃতি সহকারে সাধারণের বোধগম্য করিয়া সরলভাবে শ্রীমৎ গান্ধীজি প্রবর্ত্তিত পন্থার আলোচনা করিয়াছেন।

ছায়াবাজি!—শ্রীহেমন্তকুমার সরকার। মূল্য আট আনা। বারটি ছোট ছোট গল্পের সমষ্টি। এই গল্প কয়টির মধ্যে বাইজী, ভিখারী, কেরানীবাবু, [illegible], আড়-

কাটী, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি গল্প আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে—

অনিবার্য্য প্রবৃত্তির প্রভাব, ব্যর্থ বাসনার দুঃখ বেদনা, দৈনন্দিন সমস্যার প্রতিবিধানে অসমর্থ মানুষের বিপুল নৈরাশ্য—অবিশ্রাম মানবজীবনের মধ্যে tragedyর সৃষ্টি করিতেছে—এই গল্পগুলির মধ্যে তাহাই চিত্ররূপে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে—যাঁহারা Blood and thunder story র প্রতি বিরূপ তাঁহাদের হয়ত এগুলি ভাল লাগিবে না কিন্তু বাস্তব জগতে বিভ্রান্ত আমরা প্রতিদিনের জীবন সমস্যায় অক্ষম অসহায় আমরা—আমাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন—তাঁহাকে ধন্যবাদ! পুস্তকের নামের সঙ্গে লিখিত বিষয়ের কি যোগ আছে বুঝিলাম না।

পঞ্চকথা—শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার। মূল্য ।৶০ আনা। অধিকাংশ প্রবন্ধেই বর্ত্তমান বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। "ইংরেজীর বদহজম" প্রবন্ধটি গ্রন্থান্তরে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত ছিল। হেমন্ত বাবুর সব লেখার মধ্যে বেশ প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়।

উল্টোকথা—হেমন্ত বাবুর আর একখানি ওই ধরণের বই। মূল্য আট আনা। ইহাতে ভাষা শিক্ষা সাহিত্য শিল্প ও সমালোচনা বিষয়ক নিবন্ধ আছে। তাঁহার এই লেখাগুলি যখন মাসিকে প্রকাশিত হইত তখন আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। কেবল বিশ্বের দরবারে ভারত" প্রবন্ধটি স্থানান্তরিত করিলে বেশ এক ধরনের বিষয় বিন্যাসে সৌন্দর্য্য বাড়িত। এই পুস্তকের নামকরণের সার্থকতা কি?

যুগশঙ্খ—হেমন্ত বাবুর আর একখানি যুগোপযোগী নিবন্ধ-পুস্তিকা। মূল্য ৶০ আনা এই প্রবন্ধগুলি অনায়াসে উক্ত দুই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইতে পারিত—তাহা হইলে লেখক ও পাঠক দুই পক্ষেরই সুবিধা হইত বলিয়া মনে হয়। এই সবগুলি পুস্তকই ইণ্ডিয়ান বুক ক্লাব হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্মগ্রন্থমালা কার্য্যালয়—বড়বাজার, কলিকাতা হইতে পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ নিরঞ্জিখিত চারিখানি হিন্দি পুস্তক পাঠাইয়াছেন—বাঙ্গলা মাসিকে হিন্দি পুস্তকের সমালোচনা বিসদৃশ হইলেও বইগুলি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে বলিয়া প্রাপ্তি স্বীকারের সঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি।

চারিখানি পুস্তকই স্বামী পরমানন্দ প্রণীত মূল পুস্তকের অনুবাদ—ভক্তিমার্গ। (Path of devotion) মূল্য ॥০ আনা।

জীবন আউর মৃত্যুকা প্রশ্ন—(Problem of life and death) মূল্য ।৴০ আনা।

জীবন মৃত্যুর সমস্যা—ইহাতে জীবনমৃত্যু, জন্মান্তরবাদ অমরত্ব লাভ প্রভৃতি গুরুতর প্রশ্নের কথা ব্যাখাত হইয়াছে।

আত্মসংযম—(Self-Mastery) মানব ধর্ম্মের মধ্যে আত্মজয় শক্তি অর্জ্জন, আত্মবিসর্জ্জন প্রভৃতি তত্ত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে।

শান্তি আউর আনন্দকা মার্গ—(The way of peace and blessedness) মূল্য আট আনা।

সত্যের পূজা, ভগবানে বিশ্বাস, আত্মার উন্নতি, আদর্শের উপাসনা, হৃদয়ের মাহাত্ম্য এই কয়টিই শান্তি এবং আনন্দের মার্গ বা পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুস্তকগুলির অনুবাদ আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে আমাদের মত হিন্দি ভাষায় অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের বুঝিবার পক্ষে কোনও রকমে কঠিন মনে হয়নি।

মেবার—১ম খণ্ড। শ্রীরবীন্দ্র নাথ মিত্র বি, এ, প্রণীত। ইউনিয়ন বিউরো ১০ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র। ছোটছেলেদের জন্য মেবারের ইতিহাস, সরল ভাষায় লিখিত। বইখানি ছেলেদের জন্য লেখা সার্থক হয়েছে। শিশু সাহিত্যে এই প্রকার পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

কঙ্খলের রামকৃষ্ণমিশনের বিংশবাৎসরিক কার্য্য বিবরণী—উপহার পাইয়াছি।

বঙ্গীয় খৃষ্টীয় মণ্ডলী—সাহিত্য ও জাতীয় সমস্যা শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক। মূল্য ৶০ আসানসোল বিশ্বাস ভবন হইতে প্রকাশিত। লেখক দেখাইতেছেন যে—ভারতবর্ষের

খৃষ্টান সম্প্রদা ধর্মপার্থক্যে নয় নিজেদের অস্বাভাবিক সাহেবিয়ানা ও চাল চলনের দ্বারা নিজেদের অবস্থা নিজ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারা আপনার দেশের (ভারতের) বিশেষত্ব উপলব্ধ করিয়া যদি জীবনকে সহজ ও সরলভাবে 'জাতীয়' করিয়া গঠন করেন তবে হিন্দু মুসলমান, পার্শি প্রভৃতি যে কোনও সম্প্রদায়ের সঙ্গে স্বজাতির অনুভূতি লইয়া মিলিয়া মিশিয়া ভারতে এক বৃহত্তর জাতির সৃষ্টি করিতে পারেন। লেখক সহৃদয়—দেশ বলিয়া তাঁহার গভীর অনুভূতি আছে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার মত উদার দৃষ্টি ও স্বদেশপ্রীতির উদ্বোধন দেখিলে আমরা কৃতার্থ হইব।

সুনীলা। একখানি ছোট গল্পের বই—শ্রীসুধকান্ত রায় চৌধুরী প্রণীত—

বিশ্বাস ভবন, আসানসোল ও ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস ২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা হইতে শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—বার আনা। সুনীলা, সুরেশের মা, হতভাগ্যের স্মৃতি শির্ষক তিনটী গল্পের সমষ্টি। তেজস্বিনী সুরেশের মায়ের প্রকৃতিটি বেশ ফুটিয়াছে। সুনীলার রাখেশের জীবনের যে পরিণাম—তাহার মধ্যে সর্ব্বস্থলে সঙ্গতি রক্ষা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। হতভাগ্যের জীবনে যে দুইটি চরিত্রের মধ্য দিয়া অসবর্ণ প্রেমকে লেখক হৃদয়ের চিরন্তন গতির দিক দিয়া সমর্থন করিতে গিয়াছেন—যুক্তির প্রাবল্যই তাঁহার সে চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াছে। লেখকের শক্তি আছে—জীবনের দুঃখ বিক্ষোভকে লক্ষ্য করিয়া বাঙালী পাঠককে অনুভব করিবার কছু দিন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

কু-উ। শ্রীক্ষিতি নাথ দাস প্রণীত। ৬২নং পুলিশ হাসপাতাল রোড্ ইটালী হইতে শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য চারি আনা। লেখক যৌবনের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং তাহা তাঁহার মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে—পুস্তকখানি তাহারই উচ্ছাস ও আবেগে ভরা।

ঝড়ের দোলা—ছোট গল্পের বই—

শ্রীসুনীতি দেবী, শ্রীগোকুল চন্দ্র নাগ, শ্রীমণীন্দ্র লাল বসু ও শ্রীদীনেশ রতন দাস, এই চারজন সুলেখকের লেখা পাগল, মাধুরী, শ্রীপতি ও জয়মালা প্রভৃতি চারটি সুন্দর গল্প। গল্পক'টি পড়ে' আমরা খুব উপভোগ করিয়াছি—আজকালকার ছোট গল্প (?) প্লাবিত বাঙলা মাসিকের প্রায় গল্প, ছোট হইলেও পড়িয়া শেষ করিবার ধৈর্য্য থাকে না—ছোট গল্পের যাহা 'আর্ট' তাহা খুব কম গল্পেই বিকাশ লাভ করে—থাকে কেবল তথাকথিত প্রেম অভিনয়ের অসহ্য ঝাঁঝ। আরো যাহা থাকে তাহা লেখকের জন্য শ্রদ্ধা অর্জ্জন করে না। বাঙালীর জীবন বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিন গদ্যের মধ্যে বাঙালী কোনও প্রকারে দিন গুজরান করিয়া যায়—সুতরাং সেই জীবনকে বিচিত্র করিয়া মানব মনের চিরন্তন সত্য বস্তুকে পাঠকের একান্ত অনুভূতির সামগ্রী করিতে পারিলে—লেখক ও পাঠক দু'জনেই ধন্য হন! আমাদের আলোচ্য গল্প গুলিতে ছোট গল্পের এই গুণাবলী সম্যকরূপে পরিস্ফুট না হইলেও—এগুলি যে ছোট গল্প ও সুন্দর, উপভোগ্য হইয়াছে একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

এই বইখানি ফোর আর্টস্ ক্লাব—৮৮ বি, হাজরা রোড্ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ } মাঘ ১৩২৮ { ৭ম সংখ্যা

আলোচনী

আন্তর্জ্জাতিক বর্ণভেদ

বর্ণভেদ-সমস্যা

সে দিন আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সভাপতি বলিলেন যে জগতের এখনকার প্রধান সমস্যা বর্ণভেদ। ইউরোপ আমেরিকা ও এসিয়ার জাতি-বৈরী বিষমাকার ধারণ করিয়াছে ও তাহার মূল হইতেছে কৃষ্ণ, পীত ও শ্বেত জাতির বৈষম্য। বাস্তবিক এমনই বুঝা যাইতেছে যে, কৃষ্ণ ও শ্বেতজাতির বিভিন্ন অধিকার ভয়ানক বিরোধের কারণ হইবে। অথচ এইটাই আশ্চর্য্য যে জাতি-সংঘ কিংবা আমেরিকার নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক এ বিষয় সম্বন্ধে একটা পাকা মীমাংসার কিছুই করিল না বরং সমস্যাগুলাকে দেখিয়াও দেখিল না।

এসিয়ার জনবাহুল্য

এক কথায় বলিতে গেলে এ সমস্যার কারণ এই। এসিয়ার অনেক দেশে লোক সংখ্যা এমন বাড়িয়াছে যে দেশে আর সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব। ৯০০,০০০,০০০ এসিয়া বাসী মাত্র এতটুকু ভূখণ্ডে দিনপাত করিতেছে, যাহা ৬০০,০০০,০০০ শ্বেতাঙ্গগণের অধিকৃত দেশের ছয় ভাগের এক ভাগ। এসিয়ার পাত্র এখন ভরপুর, তাই চারিদিকে এসিয়াবাসী ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য। ভারতবর্ষ হইতে মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-অফ্রিকা, নেটাল, মাডাগাস্কার, ফিজি ও মালয়দ্বীপপুঞ্জে লোক ছড়াইয়া পড়িতেছে। চীনা ও জাপানীরা আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার দ্বারে গিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে। অথচ দ্বার খুলা নাই। এদিকে ইউরোপবাসী প্রায় সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকার উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে, এবং উষ্ণপ্রধান দেশে যেখানে তাহার বংশানুক্রম বসবাস ও পরিশ্রম করা অসম্ভব সেখানে সে ব্যবসায় স্বত্ব আদায় করিয়া এমন কি দেশীয় জনগণকে স্থানভ্রষ্ট করিতেছে।

আমেরিকা ও কানাডার "প্রবেশ নিষেধ" তত্ত্ব

চীনা, জাপানী ও হিন্দুর জনপ্রবাহ রোধ করিবার জন্ত আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কানাডা আইন কানুন তৈয়ার করিয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ইউরোপের লোক-

দিগের সেথানে অগাধ গতি। ইহাদের সহিত চীনা, জাপানী ও হিন্দুর সামাজিক অবস্থার এমন প্রভেদ কিছুই নাই যাহাতে এইরূপভাবে এসিয়াবাসীর প্রবেশ নিষেধ নীতি অবলম্বন করা উচিত। এসিয়াবাসীর লোকসংখ্যা আমেরিকায় কখন খুব বেশী ছিল না। ১৯১০এ এ সমগ্র জনপ্রবাহের মধ্যে শতকরা ৫ জন এসিয়াবাসী, এবং প্রায় ৭০ জন দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-ইউরোপবাসী ছিল।

হিন্দুর সংখ্যা ১৭৮২

চীনা ৭৩,৫৩১

জাপানী ৭২,১৫৭

জাপানীরা কৃষিকার্য্যে সিদ্ধহস্ত। তাহারা কালিফোর্ণিয়ায় পৌছিয়া সাক্রামেণ্টো নদীর জলাভূমিতে আলুর চাষের সুবন্দোবস্ত করিয়াছে এবং ফ্রেস্নো ও লিভিংটন মরুভূমিকে আঙ্গুরের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু কালিফোর্ণিয়া জাপানীর কৃষিকার্য্যে উন্নতি অতি ঈর্ষ্যা ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। বাস্তবিক, কালিফোর্ণিয়া আমেরিকাবাসীর এইদিকে স্বার্থের উদ্বোধন করিয়া পীত ও কৃষ্ণ জাতির প্রতি বিদ্বেষ সর্ব্বাগ্রে জাগাইয়াছে।

জমি খালি পড়িয়া রহিয়াছে, লোকের অভাবে চাষ হয় না, মূলধনের অভাবে ব্যবসা হয় না, কিন্তু তবুও পীতজাতির প্রবেশ নিষেধ। অথচ পীতজাতিই জগতের কৃষিকার্য্য ব্যাপারে অতি নিপুণ। কিন্তু জাতিভেদ নিপুণতা অনিপুণতা মানে না। অতিনিপুণতা সত্ত্বেও জমির সঙ্কুলান না হওয়াতে তাহারা দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছে। ঘরে নিতান্ত স্থানাভাব এবং তাহাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হারও আমেরিকা, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা অনেক কম।

	বর্গমাইল	লোকসংং	লোকসংখ্যা প্রতি মাইল
যুক্তরাজ্য	৩,৬২৭,৫৫৭	৯৮.৪	২৭.১৪
কানাডা	৩,৭২৯,৬৬৫	৭.৪	২.০
অষ্ট্রেলিয়া	২,৯৭৪,৫৮১	৪.৭	১.০৯
নিউজীলাণ্ড	১০৪,৭৫৮	১.০	১.০২
দক্ষিণ-আফ্রিকা	৪৭৩,১৮৪	৫.৯	১২.৬২

	বর্গমাইল	লোকসংখ্যা	লোকসংখ্যা প্রতি মাইল
ইউরোপ		....	১২[illegible].০
চীন	৪,২৭৭,১৭০	৩৩৬.০	৭৪.৩৭
ভারতবর্ষ	১,৭৭৩,০৮৮	৩১৫.১	১৭৭.০৩
জাপান	১৪৭,৬৯৯	৫২.৩	৩৫৪.১৮

এটা অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করেন না যে ভারতবর্ষ এবং কলিকাতা হইতে মাঞ্চুরিয়ার হার্ব্বিন সহর পর্য্যন্ত যদি একটা সরলরেখা টানা যায় তাহার দক্ষিণপৃষ্ঠে পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক বাস করে। সিন্ধুনদীর পশ্চিম এসিয়া খণ্ড ও প্রকাণ্ড সাইবেরিয়া একরকম খালি—মোটে ৫ কোটী লোকের বাস সেখানে। সাইবেরিয়ায় এখন প্রতি বর্গ মাইলে কেবল একজন। কিন্তু সাইবেরিয়ার দিকে রুশজাতির যেরূপ অভিযান তাহাতে এসিয়াবাসীর সেখানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুই আশা করা যায় না।

শ্বেত অষ্ট্রেলিয়া নীতি

ভৌগলিক দিক হইতে বিচার করিতে গেলে অষ্ট্রেলিয়া এসিয়ার এক খণ্ড। ভারতবর্ষ হইতে অষ্ট্রেলিয়া ৭ দিনের পথ। চীন হইতে ১০ দিনের। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরদিকে ভারতবর্ষের দ্বীপপুঞ্জ। যদি যাতায়াতের বিঘ্ন না থাকিত তাহা হইলে এতদিন চীনা, জাপানী ও হিন্দুতে অষ্ট্রেলিয়া ভরিয়া যাইত।

কিন্তু, সেথানকার ঔপনিবেশিক বলে, এসিয়াবাসীর প্রবেশ নিষেধ। তাই আমরা দেখি অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা প্রতি মাইল ১.০৯। জাপানের ৩৫৪ এবং ভারতবর্ষের ১৭৭। অথচ অষ্ট্রেলিয়ার আকার প্রায় ভারতবর্ষের দেড়গুণ। যেরূপ ধীরে ধীরে অষ্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা এখন বাড়িতেছে, তাহাতে প্রায় ১,০০০ বৎসরে মাত্র ১০,০০০০০ হইবে তখন প্রতি মাইল মোটে ৩৪ লোকসংখ্যা হইবে অর্থাৎ জাপানের দশভাগের এক ভাগও নহে। অর্দ্ধেক লোক এখন পূর্ব্ব সীমানায় নগরে বাস করে। বাকী অর্দ্ধেক রেইল লাইনের ধারে ধারে গ্রাম অথবা কয়লার খনিতে। বাকীটুকু একবারেই অনধিকৃত।

ইহা স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে এমন একটা প্রকাণ্ড

দেশ কিছুতেই বেশীকাল খালি থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ আশে পাশে যখন লক্ষ লক্ষ শ্রমশীল ও বহির্গামী লোকের বাস। এসিয়া তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল লোক সংখ্যার অভাব মোচন করিতে অপারগ অথচ এসিয়ার এক অংশে এসিয়া বাসীর স্থান নাই। ঔপনিবেশিকের যুক্তি এই যে তাহার মজুরী এসিয়াবাসী অপেক্ষা অধিক। তাহার অভাব সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে উচ্চতর সভ্যতার পরিচায়ক। এই মাপ কাঠিতে এসিয়াবাসী ও ঔপনিবেশিকের মজুরীর তারতম্য যে রকম উপায়েই হউক রক্ষা করিতে হইবে।

এসিয়াবাসীর দাবী

কিন্তু, উত্তর এই যে ঔপনিবেশিকের খাদ্য ও পরিচ্ছদ বিষয়ক অভাব শীতপ্রধান দেশের অনুযায়ী, তাহা উষ্ণপ্রধান দেশে অনাবশ্যক। সুতরাং আবেদনের প্রয়োজনের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে ঔপনিবেশিকের মজুরীর হার অনুমোদন করা যায় না। বিশেষতঃ, দোকানী, ফেরিওয়ালা, মালি, পাচক, সুতার-মিস্ত্রী, ধোবা প্রভৃতির কাজে ঔপনিবেশিক অপেক্ষা চীনা ও জাপানী অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দেয়। এ সকল ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে। সেখানকার আবহাওয়াও এরূপ যে ইউরোপবাসীর পুরুষানুক্রম ধরিয়া বসবাস অসম্ভব। যদিও "কুইন্সল্যাণ্ড" উপনিবেশিকের মৃত্যু সংখ্যা খুব কম কিন্তু গ্রীষ্মের দিন ও রাত্রি তাহার পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। অষ্ট্রেলিয়ার বেশীর ভাগেই গ্রীষ্মের আধিক্য। সেখানে এসিয়াবাসীর শ্রম ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

বৈজ্ঞানিকের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে অষ্ট্রেলিয়ার স্বার্থপরতাকে কিছুতে প্রশ্রয় দেওয়া যায়না। ইংরাজ মনিষীরাও এসম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট কথা বলিয়াছেন। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের যুক্তিতর্ক এই স্বার্থ পরতাকে হটাইতে পারে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। সাম্রাজ্যের সৌসামঞ্জস্যের খাতিরে এতকাল শ্বেত-অষ্ট্রেলিয়া নীতি অগ্রাহ্য করিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের এক প্রান্তের কয়েকটি নগরের মুষ্টিমেয় রাষ্ট্রনীতি বিশারদ সাম্রাজ্যের দাবী কি ভবিষ্যতেও অমান্য করিবে?

অন্তর্জ্জাতিক শান্তি

এদিকে সমগ্র পৃথিবীতে খাদ্যশস্য ও কাঁচা মালের অভাব নিতান্ত প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধের পর নবীন ইউরোপ ও আমেরিকা সমগ্র পৃথিবীর মাল মসলা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। এসিয়া তাহার দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে। চীনে সে দ্বার রুদ্ধ ছিল কিন্তু দ্বার ভাঙিয়া ইউরোপ একহাতে বাইবেল ও আর এক হাতে তুলাদণ্ড লইয়া প্রবেশ করিয়াছে। এদিকে এসিয়াবাসীর অনাহারের অবস্থা। এসিয়ায় আহার্য্যের অভাব হইলে পাশ্চাত্য-জগতেরও যে বৈষয়িক উন্নতির বিপুল সাধনা বাধা পাইবে। এসিয়ায় ন স্থানং তিলধারয়েৎ। তাই এখানে প্রাণধারণের ব্যবস্থা, কৃষির এমন সুবন্দোবস্ত ও শিল্পের এমন উন্নতি। চীন, জাপান, ভারতবর্ষ মাংসাহারের ব্যবস্থা দেয় না। খাদ্যের জন্য পশু পালন অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে পশু নিয়োগে অধিক খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়। এত করিয়াও দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন। মরসুম বৃষ্টির উপর এসিয়ার নির্ভর। তাহা একপে অনিশ্চিত। সুতরাং চীন ও ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ প্রায়ই বর্ত্তমান। জাপান তাহার শিল্প দ্রব্যের রপ্তানী, তাহার বহির্গামী লোক সংখ্যার ভরণ পোষণের ব্যবস্থার জন্য কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, ও সাণ্টুঙে অভিযান করিয়াছে। ওয়াশিংটনের বৈঠকে যদি প্রাচ্যজগতে শান্তি স্থাপনের জন্য জাপানের শক্তি-মত্ততাই সর্ব্বাপেক্ষা ভয় ও সন্দেহের কারণ বলিয়া অনুমিত হইল তবে এসিয়াবাসীর সহজ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে তাহার বহির্গমনের একটা ব্যবস্থা কেন হইল না? আমেরিকায় পদার্পণ করিলে হিন্দু দণ্ডনীয়। জাপানী ক্যালিফর্নিয়ার কৃষির ও কৃষিজাত শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়া নিপুণতার পরাকাষ্ঠা দেখাইল কিন্তু তাহাতেও সে অনধিকারী। অর্থনীতির দিক হইতে বিচার করিতে গেলে এই যুক্তি টিকে না। অর্থনীতির দিক হইতে বিচার করিতে গেলে সমস্ত জাতি ও দেশের স্বাভাবিক লোক সংখ্যার পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা চাই। সেখানে শ্বেত, কৃষ্ণ, পীতের প্রভেদ নাই। কিন্তু এ বিচার জাতি-বৈঠকে হইল না। জাতি বৈঠকে হিন্দু মূক এবং চীনার সাহস প্রগল্ভতা

বলিয়া বিচারিত। এদিকে এই সকল সমস্যার সুবিচারের অভাবে বর্ণ-বৈরী বিষম আকার ধারণ করিতেছে। জনবহুল এসিয়া ভূখণ্ডের নিকট পাশ্চাত্য জাতির 'প্রবেশ-নিষেধ নীতি' যেমন তাহার উন্নতির অন্তরায় তেমনি তাহার আত্ম মর্য্যাদার হানিকর। অপরদিকে পাশ্চাত্য জাতি সমুদয়ের সাম্রাজ্য-নীতি ক্রমাগত স্বার্থের প্রচণ্ড বিরোধ জাগাইয়া তুলিতেছে। তাই নিরস্ত্রী-করণ বৈঠকের পর্দার অন্তরালে আজ অস্ত্রের ঝনঝনানী শুনা যায়। যাহারা অস্ত্র ত্যাগ করিতেছেন তাহারা অপরহস্তে তাহাই পুনরায় ধারণ করিতেছেন। শুধু পৃথিবীতে যাহারা অস্ত্রের উপর বিশ্বাস করেনা তাহারাই এখন এই শান্তির যুগেও হাস্যাস্পদ।

কুঁচ

[শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র]

ঘন লাল জমী এই উজ্জ্বল-সিন্দুর,
তা'র পরে খোল্‌তাই কজ্জলবিন্দুর!
নিকুঞ্জে কোন্ কবি
আঁকিল সাধের ছবি?—
মসীলেপে মেঘ-ফালি পাশে রাকা ইন্দুর!

অশ্রু ও হাসি মিলে ফুটেছে কি কান্তি,
একটিরে ছেড়ে দেখি অপরটি ভ্রান্তি!
সুষমারি মঞ্জরী
তিলে তিলে প্রাণ ভরি',
ফুটায় যে অরুণিমা গায়ে নীল সিন্ধুর!

গুঞ্জার শোভা হেরি' ভয়ে মন বিত্তে,
পাশাপাশি দুখসুখ গাঁথা রয় চিত্তে!
দোরোখা এ শালখানি
জড়া'য়ে আরাম মানি,—
পূজি গো যুগলরূপ, উপাস্য হিন্দুর!

স্বদেশ ও জাতীয়তা

[শ্রীহীরেন্দ্রলাল দে]

আজকালকার রাজনীতি ক্ষেত্রে "জাতীয়তা" এই শব্দটার খুব বেশী প্রভাব এবং ব্যবহার দেখা যায়। চিন্তা এবং বাস্তব জগৎ এই দুয়েতেই আমরা কথায় কথায় বলে থাকি জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য, জাতীয় শাসন-প্রণালী এবং জাতীয় শাসন-যন্ত্র থাকা আবশ্যক। বর্ত্তমান জগতের অনেকগুলি বড় বড় আন্দোলনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে – এই জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য।

এই "জাতীযতা" জিনিসটা কি? কি করে এই "জাতীয়তা" গড়ে উঠতে পারে?

"জাতীয়তা"টা যে কি রকম বস্তু তাহা কোন সংক্ষিপ্ত কথার দ্বারা প্রকাশ করে বলা শক্ত। তবে মোটামোটি এই বলা চলে যে—যখন কোন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং বন্ধনের দরুণ এমন একটা ঘনীভূত ঐক্যভাব এবং এক-প্রাণতার সৃষ্টি হয়, যার জন্য তারা নিজেদের মতে এক হয়ে থাকতে পারলেই সুখী হয় এবং বিদেশীর শাসন বা অত্যাচার কিছুতেই সহিয়া থাকিতে পারে না, তখনই তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয়তা গঠিত হয়েছে।

এখন দেখা যাক্—এই ঘনিষ্ঠ এবং গভীর ঐক্যের ভাব, এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা—কি কি উপাদান থেকে গঠিত হ'তে পারে।

ভৌগলিক ঐক্য—কোন দেশের চারিদিকে যদি বড় নদী, পর্ব্বত অথবা সমুদ্র ইত্যাদি স্বাভাবিক সীমা বন্ধন থাকে, তবে সে দে[illegible]র লোকদের মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য ও ঐক্যের ভাব দেখা য[illegible] স্বাভাবিক সীমার বাধাবশতঃই বাহিরের সঙ্গে আদা[illegible]দান অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে এবং সেই থেকেই [illegible]াপনা আপনি একটা স্বতন্ত্র জীবন প্রণালী, স্বতন্ত্র সভ্যতার সৃষ্টি হয়। আবার দেশের ভিতরে জল বায়ুর সাদৃশ্যবশতঃ এবং পরস্পরের মধ্যে মিলামিশা ও আদান প্রদানের সুবিধাবশতঃ লোক সমষ্টির মধ্যে ঐক্যের গঠন হয়। Buckle প্রভৃতি মনীষিরা বিভিন্ন সভ্যতার উপর এই ভৌগলিক উপাদানের প্রচুর প্রভাব দেখাইয়াছেন। কিন্তু এই ভৌগলিক ঐক্য জাতীয় ঐক্য-গঠনের বিশেষ পরিপোষক হইলেও ইহা অপরিহার্য্য উপাদান নহে। ভৌগলিক ঐক্য না থাকিলেও জাতীয় ঐক্যের গভীরতা এবং সৌষ্ঠব হইতে পারে। পোল্যাণ্ডের এই ভৌগলিক ঐক্য নাই, কিন্তু পোলিস্ জাতির স্বাদেশিকতা অত্যন্ত গভীর এবং মহান।

আমাদের ভারতবর্ষের ভৌগলিক ঐক্য একেবারে সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ। প্রকৃতি দেবী নিজেই যেন ভারত-বর্ষকে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট সভ্যতার জন্মভূমিরূপে নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছেন। তবে অন্য সব দেশের ন্যায় এখানেও জাতি গঠনে ভৌগলিক ঐক্যের যা প্রভাব তা অনেক আগেই হয়ে গেছে। জাতীয়তা জিনিসটা প্রধানতঃ মনেরই জিনিস। তাই বাহিরের জগতে জাতীয়তার যে উপাদান আছে তার মূল্য খুব বেশী নয়—আসল উপাদান সবই মানুষের মনে এবং প্রাণে।

জাত বা জাতির ঐক্য—আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে আর্য্যজাত, অনার্য্যজাত, উঁচুজাত, নীচুজাত, আবার স্পৃশ্য জাত, অস্পৃশ্য জাত—নানারকম জাত বা জাতি রয়েছে। এ জন্য অনেকে মুরুব্বিয়ানা ক'রে বলে থাকেন যে—যেখানে এত বিভিন্ন জাত রয়েছে, সেখানে কি করে স্বাদেশিকতা এবং একজাতীয়তা হ'তে পারে? কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে অনেক জাতের মানুষ এসে মিশে নাই। ইংরেজেরা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন জাতি হওয়ার আগে

অনেক জাতের লোক এসে ইংলণ্ডে মিশেছিল। বর্ত্তমান যুগে আমেরিকা এবং কানাডাতেও ঠিক তাই হয়েছে। কিন্তু তা স্বত্বেও আমেরিকানরা এবং কানডিয়ানরা এক একটি স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে।

তবে, কোন দেশের বিভিন্ন জাত স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট এক জাতিতে পরিণত হওয়ার আগে তাদের বিভিন্ন প্রাচীন ইতিহাস বা স্মৃতি কতকটা ভুলে যাওয়া দরকার। আবার সমস্ত জাতগুলি এক সমান বা কাছাকাছি স্তরে থাকা আবশ্যক। তাদের মধ্যে কোন জাত যদি নিজকে অত্যন্ত উচ্চ মনে ক'রে অপর সকলকে পায়ের নীচে রেখে দিতে চায় তবে স্বতন্ত্র এবং একীভূত জাতীয়তা গড়ে উঠা অসম্ভব। অস্ট্রিয়া-হুঙ্গেরীর ম্যাগিয়ার (Magyar) জাত নিজকে সবার চেয়ে বড় মনে ক'রে রুমেনিয়ান এবং শ্লাভ জাতদের চেয়ে বরাবর অনেক উপরে থাকৃতে চাওয়ায় সেখানে জাতীয় ঐক্যের সৃষ্টি হল না। ফলে, বহুদিনের সাম্রাজ্য আজ ধুলিসাৎ হয়ে গেল।

যদি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাতেরা নিজেদের অন্য সব জাত চেয়ে পৃথক করে না রাখত—তবে নানান জাতের অবস্থান দোষের জিনিস হয়ে পড়ত না। কিন্তু স্পৃশ্য জাতেরা অস্পৃশ্য জাতদের প্রতি বরাবর এমন ব্যবহার করেছে যে তারা পশুর চেয়েও বেশী অবহেলা এবং অযত্ন পেয়ে এসেছে। অথচ এই তথা কথিত অস্পৃশ্য এবং নীচ জাতেরাই সমাজের ভরণ-পোষণ জুগিয়ে দিচ্ছে এবং তাদের সংখ্যাও স্পৃশ্যদের চেয়ে অনেক বেশী। যে দেশের অধিকাংশ লোক কুকুরের চেয়েও বেশী ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অবমানিত সেদেশের মধ্যে জাতীয় ঐক্য আসবে কোথেকে, জাতীয় মহাপ্রাণ সাড়া দিবে কি করে? বিদেশীয়েরা আমাদের ভারতীয় সমাজের এই কলঙ্কটা দেখালে আমরা খুব চোখ্ রাঙিয়ে এক কথার বদলে দশ কথা বলে যত জবর করেই পাল্‌টা জবাব দিই না কেন আমাদের এই দোষটা যে মহা দোষ, মহা পাপ, সেটা খুব স্পষ্ট করে উপলব্ধি করা এবং অবিলম্বে তার প্রতিকারের বিশেষ চেষ্টা করা অত্যন্ত আবশ্যক। যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র পৃথিবীর যাবতীয় নরনারী, জীবজন্তু, গাছপালা এমন কি জড় বস্তুকে পর্য্যন্ত ভগবানের বিভিন্নরূপ বা বিকাশ বলে প্রচার করেছে, সে দেশে মানুষের পরশকে এত ঘৃণা করা হয় এরচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছু হ'তে পারেনা। অবশ্য বাঙ্গলা দেশে এবং বোম্বাই প্রদেশে এই আকাশ পাতালের ভেদটা অনেক কমিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশে এই ভেদের প্রাচীরটা এখনও তেমনি খাড়া হয়ে আছে। তবে, এবিষয়ে মদ্র দেশই অন্য সব দেশকে হার মানিয়েছে। এই সেইদিনইত এক অস্পৃশ্য জাতীয় বিলাত ফেরত ডাক্তার মরণোন্মুখ রোগীর জন্য ব্যস্ত হয়ে পথ কমাইবার উদ্দেশ্যে কোন উচ্চজাতের পুকুরপার দিয়ে গিয়েছিলেন বলেই সেই পুকুরের জলশুদ্ধ নাকি অব্যবহার্য্য হয়েছিল—কেউ যেন তাতে একরাশ বিষ দিয়ে সমস্ত জলটা দোষিত করে দিয়েছিল।

এই স্পর্শ অস্পর্শের রীতিটা জাতীয় জাগরণে কত বড় বাধা তাহা খুব কম লোকেই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ নেতারাই এদিকে তেমন মনোযোগ দেন নাই। এই অন্ত্যজ এবং অস্পৃশ্য জাতদের মধ্যে প্রাণ দেওয়ার জন্য এবং তাদের উপরে উঠাবার জন্য সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা— আমাদের স্বর্গীয়মহাপ্রাণ নেতা গোখ্‌লে মহাশয়ের রাষ্ট্র নৈতিক দূরদর্শিতার বিশেষ পরিচায়ক। বাঙ্গলা দেশের 'সোসেল সার্ভিস লীগ্' ও এবিষয়ে বেশ ভাল কাজ করিতেছে। তবে সোসাইটী বা লীগ্ আর কত পারবে? সোসাইটী এবং লীগের কাজ অনেক সোজা হয়ে আসে এবং তাদের উদ্দেশ্য সহজে সফল হ'তে পারে যদি আমরা সবাই বরাবর কবির এই গভীর বানী মনে রাখি যে—

"মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দুরে,
অপমান করিতেছ মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।"

এবং যদি মানুষের সেই প্রাণের ঠাকুরকে জাগাইয়া প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করি।

ভাষা—জাতীয় ঐক্য সম্পাদনে জাতের ঐক্য চেয়ে ভাষার ঐক্য অনেক বেশী দরকার। ভাষার দ্বারাই দেশের চিন্তার এবং ভাবের ধারা ও ধা[illegible] গঠিত হয়। ভাষার দ্বারাই দেশের সাহিত্যের, দেশের [illegible] ও আদর্শের ঐক্য এবং দেশের স্বতন্ত্র জাতীয় ভাবের সৃ[illegible] হয়। দেশের গান,

দেশের নাটক, দেশের ছড়া এবং লোক সাহিত্য, পৌরাণিক আখ্যান—জন সাধারণের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার কর্ত্তে পারে অন্য কিছুতেই তাহা পারে না। এজন্য জাতীয় ঐক্য পেতে হলে ভাষার ঐক্যও চাই।

এদেশে হিন্দি, বাঙ্গলা, গুজরাটী, তেলেগু, পাঞ্জাবী, উর্দ্দু প্রভৃতি এত ভাষা রয়েছে যে বিভিন্ন ভাষা ভাষীদের মধ্যে ভাবের ঐক্য খুব বেশী হয়ে উঠ্তে পারেনি। যে সব প্রদেশে—যেমন বাঙ্গলা, গুজরাট ও হিন্দুস্থান—ভাষার ঐক্য আছে সে সব জায়গায় প্রাদেশিকদের মাঝে বেশ ভাবের ঐক্য দেখা যায়। কিন্তু সমস্ত ভারতে কোন এক সার্ব্বজনীন জাতীয় ভাষা না থাকায় জাতীয় ভাবের ঐক্য হ'তে পারে নাই।

বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যা কিছু রাজনৈতিক ঐক্য দেখা যায় তা ইংরাজী ভাষার সাহায্যে হয়েছে। কিন্তু এদেশে হাজারকরা মাত্র ৫।৬ জন ইংরাজী শিক্ষিত। কাজেই ইংরাজীকে জাতীয় ভাষা বলে চল কর্ত্তে যাওয়াটা খুব সমীচীন নহে। এদেশের ভাষা সমূহের মধ্যেই এমন একটা ভাষা নির্ব্বাচন করা আবশ্যক যা সমস্ত দেশেই বিস্তৃতিলাভ কর্ত্তে পারে। স্বর্গীয় লোকমান্য তিলক এবং মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি নেতাগণ হিন্দিকে জাতীয় ভাষা করতে চান। হিন্দিভাষা খুব প্রাচীন হলেও সৌষ্ঠব সম্পন্ন নহে বলিয়া বাঙ্গলা ভাষা ভাষী এবং তেলেগু ভাষা ভাষী এতে আপত্তি করে। কিন্তু হিন্দি ভাষাটাই অন্য সব ভাষার চেয়ে বেশী প্রচলিত—অনেক জাতের এবং জায়গার লোকেই এটা বল্‌তে এবং বুঝতে পারে—এজন্য জাতীয় ভাষা বলে হিন্দির দাবী অন্য সব ভাষার দাবীর চেয়ে বেশী বলিয়া মনে হয়। প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ভাষাটাও শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সমস্ত প্রদেশের মনীষিরা যদি প্রাদেশিক ভাষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দিতেও তাদের চিন্তারাশি এবং ভাবরাশি প্রকাশ করেন তবে অচিরেই হিন্দি[illegible] সমৃদ্ধি এবং সৌষ্টব সম্পন্ন হইতে পারে। অবশ্য সমস্ত [illegible]তের সার্ব্বজনীন ভাষা বলে ইংরাজীটাও আমাদের চর্চ্চা[illegible]তে হবে। হিন্দিটা স্কুল সমূহে বাধ্যতা-মূলক করার [illegible] চেষ্টা হচ্ছে তাহা সম্পূর্ণরূপে সমীচীন। দেশের ঐক্য সম্পাদনে এবং জাতীয় প্রাণোন্মেষে ইংরাজী ভাষার চেয়ে হিন্দিভাষা অনেক বেশী সাহায্য করবে। প্রাদেশিক গর্ব্ব এবং ইংরাজী বিদ্যার অভিমান এবিষয়ে বাধা না দিলেই অদূর ভবিষ্যতে হিন্দিভাষা জাতীয় ভাষায় পরিণত হইতে পারে।

ধর্ম্ম—ধর্ম্মের ঐক্য থাক্‌লেও দেশের জাতীয় ঐক্যটা গঠনের খুব সুবিধা হয়। ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য সম্পাদনে জনসক্সের প্রচারিত 'প্রেজবিটারিয়ানিজম্' যতদূর কাজ করিয়াছে অন্য কিছুতেই তাহা করে নাই। তবে ধর্ম্মের ঐক্য না থাকলেই যে জাতীয় ঐক্য হতে পারে না তা নয়। ইংলণ্ডে 'রিফরমেশনের' পর থেকে ধর্ম্মের ঐক্য রহে নাই, জার্ম্মেনীতেও ধর্ম্মের ঐক্য ছিল না।

তবে জাতীয় ঐক্য উৎপাদনে ধর্ম্মের সম্পুর্ণ ঐক্যের দরকার না থাক্‌লেও ধর্ম্মের গোড়াকার বা ভেতরকার কতকগুলি জিনিসের বা উপাদানের মিল থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। দেশের সমস্ত লোকদের মধ্যে জীবনের মূলনীতি গুলি এক হওয়া চাই। জগতের মধ্যে তাদের স্থান কোথায়। জগতের অন্যান্য জাতি এবং ধর্ম্মের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য কি ইত্যাদি বিষয়ে সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতরে অনেকটা সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য চাই।

ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের বিভিন্নতা হেতু কোনই অমঙ্গল হত না যদি এই দুই ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সাদৃশ্য থাকিত। কিন্তু জগতে আমার স্থান কোথায়, অন্যান্য দেশও ধর্ম্মের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি এই দুই বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ একে-বারে আকাশ পাতালের ব্যবধানের মত—সাদা কালার প্রভেদের মত। মুসলমানেরা যদি জগতের অন্যান্য জাত এবং অন্যান্য দেশের প্রতি তাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সার্ব্বজনীন ভাব অবলম্বন করতে না পারে তবে তাদের সঙ্গে ভারতে হিন্দু ও অন্যান্য জাতের মিলন একেবারেই অসম্ভব হইবে। মুসলমানেরা যদি দেশকে ধর্ম্মের গোড়ামী থেকে যে প্রীতির চোখে দেখ্‌তে না শিখে তবে এইখানেই ভারতীয় একতার প্রধান বাধা থাকিয়া যাইবে। ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনে মুসলমানেরা যে পঞ্জাবের ঘটনা

চেয়ে খেলাফৎকে অনেক উপরে স্থান দিয়েছে এটা অন্য সব সম্প্রদায়ের নিকটই অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয়েছে। তবে আশা করা যায় মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে শিখে উঠ্‌বে যে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় ঐক্য না থাকলে তাদের ধর্ম্মের এ অংশগুলি রক্ষা করা যায় না, এবং এটা দেখ্‌তে পেলেই তারা দেশের ভেতরকার জাতীয় ঐক্যকেই দেশের বাহিরকার মুসলমানদের ঐক্যের চেয়ে বড় বলেই উপলব্ধি করতে পারবে।

শাসনযন্ত্র এবং শাসন প্রণালী—সমস্ত দেশের উপর এক শাসক এবং এক শাসন প্রণালী থাক্‌লেও 'তিয়োডর' (Tudor) রাজাদের স্বেচ্ছাচার মূলক শাসনই ইংরাজদের জাতীয় ঐক্য সম্পাদন করে। ভারতে পূর্ব্বে অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, আকবর প্রভৃতি সম্রাটগণ জাতীয় ঐক্য সম্পাদনের কতকটা সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তাদের শাসন তেমন সর্ব্বব্যাপী ছিল না। তা ছাড়া তাদের সময় যাতায়াতের অসুবিধা হেতু দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল না। ইংরাজেরাই এদেশে সর্ব্বব্যাপী এক শাসন প্রণালী স্থাপন করে, তাদের শাসন প্রণালীর ভাল মন্দ দুইই সমস্ত দেশের উপর সমভাবে ব্যাপ্ত হওয়ায় জাতীয় ঐক্য অনেকটা গঠিত হয়েছে। কিন্তু জাতিগঠনের অন্যান্য উপাদান না থাক্‌লে শুধু এক শাসক এবং শাসন হলেই জাতীয় ঐক্য হ'তে পারে না আয়র্ল্যাণ্ড থেকেই এটা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

ইতিহাস এবং স্মৃতি (Tradition)—কিন্তু জাতি-গঠনের অন্য সব উপাদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপাদান হচ্ছে ইতিহাস এবং স্মৃতি। অন্য সব জিনিষ না থাকলে বা কম থাক্‌লেও সমস্ত লোকের মধ্যে, বিভিন্নজাতের মধ্যে যদি ঐতিহাসিক ঐক্য, অতীত স্মৃতির ঐক্য থাকে তবে সেখানে জাতীয় একতা খুব সহজে এবং গভীরভাবেই আস্‌তে পারে। অতীত বিপদের স্মৃতি, অতীত নির্য্যাতনের স্মৃতি, অতীত গৌরবের স্মৃতি—এসব সমস্ত লোকের মধ্যেই একভাবে থাকা চাই। জাতের অতীত স্মৃতির স্মারক স্বরূপ ঐতিহাসিক পবিত্র তীর্থস্থান সমূহ থাকা চাই। তা ছাড়া, দেশের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষাও আদর্শ সমূহের অবতার স্বরূপ বড় বড় নেতা চাই যাঁদের স্মৃতির পূজা সবাই নিজের প্রাণে এবং হৃদয়ে করে থাকে। জাতের গৌরবের স্মৃতি, অতীত বিপদের এবং যাতনা অত্যাচারের স্মৃতি—এ সব থেকেই জাতির আত্মা পুষ্ট হয়ে থাকে, জাতীয় মহাপ্রাণ জেগে উঠে, জাতের হৃদয় আলোড়িত এবং উদ্বেলিত হয়। এ সব থেকেই জাতির অমর এবং পবিত্র স্মৃতি সমূহের জন্ম হয়—এবং সেই স্মৃতিই হচ্ছে জাতির প্রাণ। বিদেশীয় শক্তি পশুবলে জাতির প্রাণ বিনাশ করবার চেষ্টা করলে জাতীয় আত্মা তখন জেগে উঠে এবং জাতের প্রাণ এত শক্ত হয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় যে তাকে আর কখনও পিষে ফেলা সম্ভব হয় না। জার্ম্মেনীর অত্যাচার এবং পাশব নির্য্যাতন ক্ষুদ্র বেলজিয়ান এবং অর্দ্ধ-সভ্য অশিক্ষিত সার্ব্বিয়ানজাত দ্বয়কে এতদূর জাগাইয়া দিয়াছে যে তাদের আর কখনও লোপ করা সম্ভব হইবে না। সমস্ত পৃথিবীর নিকট আজ এই দুই জাত অশেষ গৌরবের এবং সম্মানের পাত্র। ইংরাজদের ছয়শত বৎসরের অত্যাচারেই আইরিসদের বর্ত্তমান মহাজাগরণের কারণ।

ভারতবর্ষের নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের জীবনী এবং আদর্শ সমস্ত ভাষাতেই প্রচারকরা একান্ত আবশ্যক। চৈতন্য, কবীর, গুরু গোবিন্দ, শিবাজী এদের কাহিনী যেন সবাই জান্‌তে পারে এবং সবার নিকটেই পূজা পায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে যে সব বিরোধ এবং অমিলন হয়েছে, সে সব খুব বড় করে না তুলে তাদের মধ্যে যে সব সভ্যতা এবং রাজনীতির একতা রয়েছে সেসবকেই সাহিত্যে এবং ইতিহাসে বিশেষ ভাবে প্রচার করা আবশ্যক। ভারতের বিভিন্ন জাতেরা যে ইতিহাস এবং সভ্যতার প্রভাবের মধ্যে পড়ে ক্রমে ক্রমে একীভূত হয়েছে ইতিহাসের সে দিক্‌টা, ভারতীয় সভ্যতার সে ধারাটা বিশেষ ভাবে স্পষ্টরূপে আঁকা এবং বহুল প্রচার করা বাঞ্ছনীয়। কারণ এ সব বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ যতটা না হয়েছে, মিলন তার চেয়ে বেশী হয়েছে। মারামারি যতটা না হয়েছে, আদান প্রদান তার চেয়ে [illegible] বেশী হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে এই ঐক্যমুখী [illegible]রাটা—ভারতের

সভ্যতার এই মিলনের প্রবাহটা দেখান আজকালকার ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকদের খুব বড় রকম কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ—এদেশে অশোক, চৈতন্য, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষের; চন্দ্রগুপ্ত, আকবর, শিবাজী, প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি মহাবীরের; তিলক, গোখলে, গান্ধী প্রভৃতি দেশনায়কের; রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি স্বদেশ প্রেমিক কবির জন্মস্থানকে, এবং পলাশী, পাণিপথ, হলদীঘাট প্রভৃতি ইতিহাসের যুগ পরিবর্ত্তনকারী যুদ্ধক্ষেত্র সমূহকে জাতীয় তীর্থস্থান করার চেষ্টা করা উচিত।

এখন দেখা গেল যে, জাতীয়তা জিনিস্‌টা কোন একটা উপাদানের উপরেই সম্পূর্ণরূপে বা বিশেষভাবে নির্ভর করে না। এই জাতীয়তার মূল প্রাণ হচ্ছে একটা ভাব প্রবণতা, একটা মানসিক অবস্থা বা ধারণা। উপরোক্ত উপাদানগুলির কোনটা বা অনেকগুলি বর্ত্তমান না থাক্‌লেও, জাতীয়তার ভাবটা এবং ঐক্যটা আনা যায়। তবে এটা মনে রাখা উচিত যে—এ জাতীয়তার ভাবটা প্রারম্ভে খুব কোমল এবং নরম থাকে। অতি সাবধানে এর সেবা এবং পুষ্টি সাধন কর্ত্তে হয়। দিগ্বিদিক না তাকিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি একে বাড়াইয়া তুলতে গেলেই বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা হবে।

জাতীয়তা এবং স্বাধীনতা—ম্যাটসিনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাতীয় ঐক্য এবং স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর মতে যেখানে স্বতন্ত্র জাতীয়তা রয়েছে সেখানে এমন একটা বিশিষ্ট এবং বিচিত্র সভ্যতা গড়ে উঠে যার থেকে সমস্ত পৃথিবী লাভবান হ'তে পারে! প্রত্যেকজাতি তার নিজের ইতিহাস, নিজের স্মৃতি, নিজের সাহিত্য ইত্যাদি থেকে একটা বিচিত্র রকমের সভ্যতা সৃষ্টি করে। পৃথিবীকে এই স্বতন্ত্র সভ্যতা দান করার জন্যই প্রত্যেক জাতির সৃষ্টি। পৃথিবীর মহামানব জাতির সভ্যতাকে এই বিশিষ্টতা দান করাই প্রত্যেক জাতির বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য। কোন বিশেষ সভ্যতার সৃষ্টি এবং পোষণ করা প্রত্যেক জাতির পক্ষে যেমন গৌরব এবং লাভের বিষয়, সমস্ত জগতের ও এতে লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু রাজনৈতিক ঐক্য এবং স্বাধীনতা না থাক্‌লে এই বিশেষ সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং পোষণ করা নিতান্ত অসম্ভব না হইলেও খুব কঠিন। এজন্য যেসব দেশে—সে বড়ই হউক, আর ছোটই হউক, একটা প্রবল জাতীয়ভাব সভ্যতার একটা বিশেষ রূপ গঠিত হয়েছে সে সব দেশ একীভূত এবং স্বাধীন হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু জগতের বিভিন্ন প্রবল জাতিরা মুখে প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও কার্য্যতঃ তাহা দেখায় না। কারণ আজকালকার মানবগণ খুব সভ্য বলে গৌরব করলেও তারা যে তাদের আদি পূর্ব্বপুরুষ জানোয়ারগণ থেকে খুব বেশী অগ্রসর হ'তে পেরেছে তা নয়। প্রাণী জগতে যেমন দুর্ব্বলের উপর প্রবলের বরাবর একটা লোভ—একটা গ্রাসের ইচ্ছা রয়েছে, অধুনাতন তথাকথিত সভ্য মানবজাতির মধ্যেও সেই সর্ব্বগ্রাসী লোভ অনেকটা বিদ্যমান রয়েছে।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক জগতে এটা কার্য্যক্ষেত্রেও ক্রমে ক্রমে স্বীকার করা হইতেছে যে দুর্ব্বল জাতিদেরও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করার অধিকার রয়েছে। তবে এই অধিকার পুরা মাত্রায় বাস্তবে পরিণত হইতে অনেক দেরী আর অদূর ভবিষ্যতে জাতি সঙ্ঘ যদি বাস্তবে পরিণত হয় প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতার অধিকারটিকেও বাস্তবে পরিণত করে তবু আমাদের মনে রাখতে হবে যে—এ জগতে অন্যান্য সকল বস্তুর ন্যায় স্বাধীনতা বস্তুটিও নিজদের বীর এবং মহত্ব দ্বারা অর্জ্জন কর্ত্তে হয় এবং নিজের শক্তিতে অর্জ্জন কর্ত্তে পারলেই সেটার সুব্যবহার এবং চির উপভোগ করা যায়।

রূপ

[শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার]

হাসিয়া ফুটায়ে দিলে দিকে দিকে তুমি
একা মোরে করি এত মত,
বরণে গরবে কত কি হরষ চুমি'
পুলকে উলসি অবিরত !
এ মোর, তোমারি ছায়া
তব পদনখে
নিয়ত ঝলকে
এই মোর—অযুত পুলকে।

অণুকা রেণুকা কণা চূর চূর করি
উড়ায়ে খেলিছ পলে পলে,
পাখায় পাখায় মোর শিহরি' শিহরি'
স্পর্শ তব বাজে কুতূহলে !
এ মোর, তোমার ছায়া
তব পদনখে
চমকে পুলকে
এই মোর—সকল পালকে !

পরিত্রাণ

[শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

যেন স্বপ্ন কথা।

সেদিন সকাল। আমারা বাহির বারাণ্ডায় চায়ের টেবিলে সকলেই জমায়েৎ; কেউ বা চা পান কর্চ্ছিলেন, কেউ বা সেইদিনকার দৈনিক কাগজ খানায় দুনিয়ার নূতন খবরের জন্য হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময়ে সেই স্ত্রীলোকটি ধীরে কাছে এসে অভিবাদন জানিয়ে দাঁড়াল।

তার চোখ দুটি এখনও যেন চোখে ভাসছে। বড় বড়, টানা টানা, কাল কুচকুচে; সেযে কিরকম তা প্রকাশ করে বলা যায় না। সে চোখ দুটি যেন সকলের করুণা লাভ কর্ব্বার জন্যে সদাই কাতর বাষ্পে ঢাকা। কিন্তু, সেই চোখ দুটিই একটু হিংসার শিখা জ্বালিয়ে তুলেছিল আমার মনে।

মনে হয়েছিল তখন। যে খেতে পায়না, যার পরণে এক-খানা কাপড় জোটেনা তার আবার অমন চোখ কেন? বরং তার চোখের অভাব থাকলে মানুষের মনে বেশী করুণার উদ্রেক হতো।

ওঃ; সত্যই আমি তখন কি ছিলুম! ঐশ্বর্য্যের—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বরী ছিলুম বলে, কখনও সাদা চোখে সত্যের বিচার কর্ত্তে পারিনি। একটা মাদকতা, একটা গর্ব্ব, একটা অহংকার আমার ওপর আধিপত্য রেখেছিল। অন্ধ ছিলুম ঐশ্বর্য্যের অহংকারে তখন।

সেই অচেনা স্ত্রীলোকটি আপনাদের দুঃখ কষ্টের কথা জানিয়ে যে কোন' কাজ পাবার জন্যে যখন অনুরোধ

চাইছিল, তখন আমি আড় চোখে তার আপাদ মস্তক, তার সর্ব্বাঙ্গ, বেশ করে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছিলুম এম্নি ভাবে—যেন আমি বোবা ও কালা। তার কোন কথাই আমার কানে যেন পৌঁছায়নি।

ওঃ, কত বড় অহংকারী আমার হৃদয় ছিল!

স্বামীর দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখলুম। নিজেকে চাপবার যতই তিনি চেষ্টা করুন না কেন, আমার চোখে ধুলো দিতে পারেননি। তাঁর চোখ দুটো একটু রসেছিল। কিন্তু, জানিনা কেন দপ করে জ্বলে উঠে, সেদিন মুখ দিয়ে যে কথাটা বেরিয়ে গেছল', সেটা যে শুধু শেলের মত তাদেরই বেজেছিল তা নয়; পরে আমাকেও এম্নি আঘাত করেছিল যে, সে ব্যথাটা আজও হৃদয়ে জেগে রয়েছে। জীবনে কখনও ভুলতে পার্ব্ব বলে বোধ হয় না।

ওঃ, কি কুৎসিত ভাষা আমার জিহ্বা উচ্চারণ করেছিল!

কথাটা শুনে রমনী যখন ছল ছল বেদনা ভরা চোখে, আমার মুখ পানে ফিরে চাইলো, দেখলুম সে অতি কষ্টে চোখের জল চেপে রাখবার বৃথা চেষ্টা কচ্ছে। বর্ষায় পরিপূর্ণ পদ্মপুট সদৃশ চোখ দুটি, সেই ম্লান বিষাদ ক্লিষ্ট মুখ খানি যে আমাকে কতটা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত করেছিল তা প্রকাশ করে বলতে পারিনা। কিন্তু, পাছে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাওয়ায় তার কাছে ছোট হয়ে যাই সেই ভয়েই জোর করে, নিজের সমস্ত বল দিয়ে আপনাকে দমন কর্ব্বার চেষ্টা কল্লেও আমার চোখ মুখ ও কান যে বিদ্রোহ ঘোষনা করে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়ে ছিল। আমার এমন সাহস ছিল না যে আর মুখ তুলে তার দিকে ফিরে চাই। কিন্তু, যেন অগ্রাহ্য করেই চাচ্ছিনা এই ভাবটাই প্রকাশ কর্ব্বার বৃথা চেষ্টা পেয়েছি।

ওঃ, কতদুর প্রতারণা! নিজেকে প্রকাশ হতে না দেবার জন্য কত ছদ্ম বেশ কত সময়ে না ধরেছি যে, তা নয় কিন্তু, এই বারের এই ঘটনাটা আমার প্রাণে যতটা আঘাত করেছিল ততটা তার [illegible]খনও করেনি।

স্বামী পকেট [illegible] একখানা গিনি বার করে তার দিকে বাড়িয়ে দিতে[illegible] "না, না, ভিক্ষা নেবোনা, কখনও না," এ কথা গুলি [illegible] জোরের সহিত সে তখন বলেছিল।

সকালে বিকালে, ত্রিসন্ধ্যায় কত লোক আমাদের কাছে এসে দুঃখের কান্না গেয়ে যেত। এত আর বেশী দিনের কথা নয়। এখনও যে বৎসর পূর্ণ হয়নি। আমাদের ঐশ্বর্য্যের কথা এরি মধ্যেই গল্প কথায় পরিণত। এম্নি ধারা কত ঐতিহাসিক সত্য আজ সাধারনের চক্ষে উপকথা।

আমি অসন্তোষ প্রকাশ কল্লে স্বামী বোঝাতেন: জাননা অভাব কি! চাইলে, যতক্ষণ থাকবে কিছু দেবে। অবহেলা করে, অশ্রদ্ধা করে বা পাঁচজনের চক্ষু লজ্জার খাতিরে দেবেনা; তাদের বেদনা বুঝে, তাদের কষ্ট ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সাধ্য দূর কর্ব্বার চেষ্টা করো। দেখে ভগবান তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্ব্বেন। কিন্তু, আমি কখনও তা পারিনি।

রমনী তাঁর মুখের দিকে কেবল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চোখের পাতা পড়ল না, মুখের কথা সরল না; হাত বাড়িয়েও নিতে পাল্লেনা। তার পর নিজেকে যেন একটু সামলে নিয়ে টস্ টসে আঙ্গুরের মত চোখ দুটি তুলে, ধরা গলায়, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন" এই টুকু আশীর্ব্বাদ করে যখন তার ডান হাতটি বাড়িয়ে দিল, কি সংযত, কি পবিত্র বলে মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু, দাঁত থাকতে মর্য্যাদা বুঝিনি তখন তার সকল ভাবই আমার চোখে বিসদৃশ ঠেকেছিল।

এর কিছু দিনের পরেই জারমনির গোলার চোটে আমাদের দেশের চারিদিকে সংহার লীলা চলতে সুরু হল, সে দৃশ্য যে কি ভয়ানক যে না দেখেছে জীবনে অনুভব কর্ত্তে পার্ব্বেনা। সুদৃশ্য সৌধমালা বেষ্টিত মনোহর নগরী সব, একে একে হল শ্মশান, জীর্ণ ভগ্নস্তূপ আর মৃতের পাহাড়। সেই চির-পরিচিত রাস্তা ঘাট এখন দেখলে আর চেনা যায় না। চেনবার কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নেই। জীবনে এ দৃশ্য দেখে দেশ থেকে সকল হারা ভিখারি হয়ে যে চিরবিদায় নিতে হবে একথা স্বপ্নেও কখন ভাবিনি।

এম্নি যে একদিন হতে পারে ও হবে এইটুকুই বিশ্বের রহস্য। লীলাময়ের লীলায় ভাঙ্গা গড়া দিন রাতই হচ্ছে। তবে এম্নি যে দিন হবে সেই-ই বোধ হয় শেষ দিন। যেদিন মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি ধ্বংস করে আবার নূতন করে গড়বেন;

তাঁর নিমেষের খেলায় কি হতে পারে মানুষ কল্পনায় তা আনবে কি করে। মানুষের এত যত্নে লালিত, এত সাধের সামগ্রী সব, যা তৈরী কর্ত্তে কত উৎসাহ; কত উদ্যম, কত না অর্থ বৃথায় ব্যয়িত করেছে; সেই সব মানুষের অক্ষয় কীর্ত্তি সবই ধূলিসাৎ—সবই বৃথা; সবই যেখানকার সেই থানে ফিরে যাবে। এইত পরিণাম। সবই দুদিনের খেলা; কে যে একজন অলক্ষ্যে বসে খেলাচ্ছে ও খেলছে তাঁকে খুঁজে বার কর্ত্তে পাল্লে বুঝি এ খেলার ছুট মিলে। খেলায় মুক্তি পাওয়া যায়। খেলার আনন্দে তিনি এত মশগুল হয়ে রয়েছেন, আনন্দই যেন তাঁর আবাস—তিনি আনন্দময়।

বেশ হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি আমার হয়েছে। না, না, শাস্তি বল্লেত ঠিক বলা হয় না। এত শাস্তি নয়, এযে মুক্তি —এযে পরিত্রাণ। এযে একটা এমন কিছুর কবল থেকে আমাকে মুক্ত করে দিয়েছে যা আমাকে গ্রাস কল্লেও একেবারে জীর্ণ কর্ত্তে পারেনি। তার হাত থেকে যে আমায় উদ্ধার করেছে সে যে পরম মিত্র,—প্রাণের সখা। সে যে দয়া করে ঠাকুর তোমার পায়ের তলায় টেনে এনেছে, এ নয় তোমারি তুমিই কোন্ নরকের অন্ধকার হতে কিসের জন্য কুড়িয়ে এনে আজ তোমার মন্দির তলে আশ্রয় দেছ যে তোমারি লীলায় তুমিই প্রকাশ কর্ব্বে। না না, এ আমার শাস্তি নয়, এ পরিত্রাণ!

শব্দের নিত্যত্ব ও ব্যুৎপত্তিবাদ

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

ইংরাজী ন্যায়শাস্ত্র বা Logic এর ভাষায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে যাবতীয় মানব নশ্বর। ব্যষ্টিগত মানব দেশ-কালের সীমামধ্যে আবদ্ধ, সুতরাং নশ্বর। সমষ্টিগত মানব ব্যষ্টি নিরপেক্ষ নহে, সুতরাং ব্যষ্টি ধর্ম্মাক্রান্ত সমষ্টিও নশ্বর। কিন্তু ব্যষ্টি ও সমষ্টি-নিরপেক্ষ যে মানব, সে কখনই নশ্বর নহে। বিরাট নৃতত্ত্ব শাস্ত্রে অদ্যাপি এরূপ প্রাগৈতিহাসিক যুগের কল্পনা হয় নাই যখন পৃথিবীতে একটীমাত্রও মানবের সত্তা ছিল না। 'নাসদাসীন্ নোসদাসীৎ' বেদবাক্য হইলেও আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কারণ আমাদের বুদ্ধি ব্যষ্টি নিরপেক্ষও নহে, দেশ কাল নিরপেক্ষও নহে। ব্যষ্টি নিরপেক্ষ, সমষ্টি নিরপেক্ষ, দেশ-কাল-নিরপেক্ষ মানব ভাব নিষ্কর্ষ বা abstraction মাত্র। ব্যষ্টি ও সমষ্টির নাশে উভয়-নিরপেক্ষ মানবের নাশ কল্পনা করা যায় না, এবং ভাব নিষ্কর্ষ গত ব্যষ্টি বা সমষ্টিরও নাশ কল্পনা হয় না। নতুবা প্রত্যক্ষভূত ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপ আধারের মধ্যে প্রত্যক্ষাতীত বা প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ মানবের আধেয়ত্ব কল্পনাও অসম্ভব হয়। আবার প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ ব্যষ্টি বা সমষ্টির কল্পনা করিতে ব্যষ্টিগত ও দেশ-কালের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ মানবের মন সমর্থ নহে। এরূপ সৃষ্টি ছাড়া কল্পনা করিতেও সৃষ্টি ছাড়া মন চাই। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় কোথায়? সুতরাং এ প্রকার মন বা কল্পনা শক্তির অভাবে চিন্তা বা আলোচনা পদে পদে স্থগিত হয়। কূপ মণ্ডুকের সমুদ্রোপলব্ধির চেষ্টা হাস্যাস্পদ। চার্ব্বাক যথার্থই বলিয়াছেন "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" আমার জন্মের পূর্ব্বের কোনও কিছুই আমার উপলব্ধির বিষয়ীভূত নহে এবং আমার অবর্ত্তমানে কি হইবে তাহার কল্পনাও আমার পক্ষে কল্পনামাত্র। সুতরাং এক্ষেত্রে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" বা "হেসে নাও দুদিন বইত নয়" প্রত্যক্ষবাদীর

পক্ষে হৃদয় গ্রাহ্য উপদেশ। প্রত্যক্ষবাদী কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতে পারেন না। তাঁহার তর্কের ফুৎকারে সকল কল্পনাই উড়িয়া যায়।

কিন্তু এরূপভাবে কল্পনাকে উড়াইয়া দিলে তর্ক চলিতে পারে বটে, কিন্তু কোনও জ্ঞানচর্চ্চা চলে না। কোনও আলোচনা বা সাহিত্য চর্চ্চা করিতে হইলে কল্পনাই আমাদের অবলম্বন। অন্য ভাষায় বলিতে গেলে, কল্পনাই কাব্য, কল্পনাই সাহিত্য, কল্পনাই দর্শন, কল্পনাই বিজ্ঞান, কল্পনাই রাজনীতি, কল্পনাই সংসারে চলিবার বা মনোবৃত্তি চালনা করিবার একমাত্র সহায়। সূর্য্যোদয় প্রত্যহই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতেছে বটে, কিন্তু যতদিন দেখিয়াছি তাহাতে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে এযাবৎ প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইয়াছে; ভবিষ্যতে সূর্য্যোদয় হইবে কি নাহইবে তাহা তর্ক বলিয়া দিতে পারে না, কল্পনা বা কল্পনা-মূলক তর্কে তাহা ভাবিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে। পাত্রস্থ তণ্ডুল সিদ্ধ হইয়াছে কি না জানিবার জন্য কেন পাচক সমস্ত তণ্ডুল এক একটী করিয়া টিপিয়া দেখে না, তাহা প্রত্যক্ষবাদী তার্কিকের তর্কে বুঝাইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান চর্চ্চা করিতে হইলে কল্পনা বা ভাব নিষ্কর্ষ চাই। কল্পনামাত্রের সহায়তায় আমরা প্রত্যক্ষের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে প্রত্যক্ষাতীত বৃহত্তর ও মহত্তর বস্তুকে অবরুদ্ধ করিতে পারি। আমাদের কল্পনাশক্তি আছে বলিয়াই আমরা পূর্ব্বযুগের ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, কল্পনাশক্তির সাহায্যে সমুদ্র যাত্রা না করিয়াও ভারতীয় হিন্দুশিশু পৃথিবীর ভৌগোলিক সংস্থান বুঝিতে সমর্থ হয়, কল্পনাবলে যেমন আমরা পরলোকগত অমর সাহিত্যিক ও মহাপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপের পর্য্যালোচনা করি সেই প্রকার মানব-জাতির ইতিহাসের ভবিষ্যতেরও কতকটা ইঙ্গিত পাই। সুতরাং সেই কল্পনার সাহায্যে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রত্যক্ষ ভাবে যেমন মানব মাত্রই নশ্বর প্রত্যক্ষাতীত ভাবে সেইরূপ দেশ-কাল নিরপেক্ষ মানব অবিনশ্বর। আমরা একদিকে যেমন মানবের আদির কথা জানিনা অন্যদিকে তেমনই মানবের অন্ত বা চরম পরিণতি কোথায় তাহাও জানিনা। তুমি আমি থাকিব না, আর [illegible] থাকিবে না, কিন্তু তথাপি জগৎ মনুষ্যশূন্য হইবে না। কালিদাস, সেক্সপিয়র, পাণিনি গ্রীম, ষ্টিফেন্সন-আর্কিমিদিস প্রভৃতি কোনও কোনও মহাপুরুষের মৃত্যুর পরেই প্রকৃত জন্ম আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এরূপ ব্যক্তিবিশেষের অমরত্ব কল্পনা করিতেছিনা। কিন্তু মানবজাতি যে সকল বড় বড় কার্য্যের আরম্ভ করিবে বা করিয়াছে, তাহা ব্যক্তি বিশেষ বা সমষ্টি বিশেষের তিরোধানে লোপ পাইবে না। যদি কখনও কোনও মানবসৃষ্ট সভ্যতা লোপ পায়, তাহা হইলেও পুনরায় সে সভ্যতা অন্য জাতির দ্বারা গঠিত হইবে। সুতরাং একদিকে যেমন মানুষ নশ্বর, অন্যদিকে তেমনি তাহার নাশ নাই। মানুষ অনাদি অনন্ত।

মানব যদি অনাদি ও অনন্ত হয় তাহা হইলে মানুষের সৃষ্টি যে ভাষা তাহাকেও অনাদি ও অনন্ত বলিয়া ভাবিতে পারা যায়। কিন্তু এখানেও একটা গোলযোগ আছে। কারণ কল্পনার ভাষায় মানুষ অনাদি অনন্ত হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে সে দেশ-কাল অনুসারে পরিবর্ত্তন ও বিস্মৃতির অধীন। সুতরাং প্রত্যক্ষাতীত কল্পনা মাত্র স্থিত মানুষ অবিনশ্বর হইলেও প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত পরিবর্ত্তন-শীল মানবকে অবিনশ্বর যেমন বলা যায় না, তাহার সৃষ্টি ভাষাকেও সেইরূপ অনিত্য বলা যায় না। তবে একথা ঠিক যে ভাষার উৎপত্তি কোথায় কি ভাবে হইয়াছে তাহা আমরা জানিনা এবং ইহার উৎপত্তি বিষয়ে নানা গবেষণা হইলেও সে বিষয়ে কোনও মতবাদ সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় নাই। ভাষার আদি নির্ণয় সম্ভবপর না হইলেই তাহাকে নিত্য আখ্যা দেওয়া যায় না। মানুষের আদি নির্ণয় সম্ভবপর না হওয়ায় মানুষকেও নিত্য বলা হয় নাই। মানুষের ন্যায় ভাষাও যে পরিবর্ত্তন ও ধ্বংসশীল তাহা ঐতিহাসিক যুগেই আমরা দেখিতেছি। এক সংস্কৃত ভাষাতেই কত প্রভেদ! কত পরিবর্ত্তন! সংস্কৃত সাহিত্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোনও ব্যক্তি বিনা পুনরধ্যয়নে বেদের ভাষা বুঝিতে পারেন না। আবার ছান্দস ভাষাতেও মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগে কত প্রভেদ! উপনিষদের ভাষাও অন্যরূপ। তাহার পরে পালি ও প্রাকৃত ভাষা এবং অপভ্রংশ ভাষা ভিন্ন ভিন্ন নামেই পরিচিত। প্রাকৃতের আবার দেশ ও কাল ভেদে

বিভিন্নতা! আবার আধুনিক আর্য্যভাষা সমূহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আর্য্যভাষা ভিন্ন অন্য ভাষাও অনেক। চীনের ভাষা আমরা মোটেই বুঝিনা। দ্রাবিড়ী ভাষাও পৃথক ভাষা। আরবীভাষাও অন্—আর্য্য। আফ্রিকা ও আমেরিকার অসংখ্য ভাষার গণনা করিলে ভাষার অভিন্নতাও থাকে না অনুরূপতাও থাকে না। নিত্যত্বের ত কথাই নাই।

সংস্কৃত ভাষার অতি প্রাচীন বৈয়াকরণ শাকটায়ন * নাকি ধাতু ও প্রত্যয়ের যোগে শব্দের ব্যুৎপত্তি সাধন করিয়া ছিলেন। গার্গ্য প্রভৃতি নিরুক্তাচার্য্য ও ব্যাকরণাচার্য্য ব্যুৎপত্তি বাদের সমালোচনা করিয়াছেন। গার্গ্য বলেন যৌগিক শব্দগুলি ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও সমস্ত শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন নহে। তাহারা ধাতুর ন্যায় স্বতঃ প্রসিদ্ধ। ধাতু যখন ক্রিয়াবাচী তখন সমস্ত নাম ধাতুজাত হইলে ধাতু-প্রতিপাদ্য ক্রিয়াযোগে বস্তু মাত্রের অভিধান হয়। বস্তু-মাত্রে ক্রিয়ার সম্পর্কে নাই। ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকা ও না থাকা অনুসারে নামসমূহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) প্রত্যক্ষ ক্রিয়, (২) প্রকল্প্য ক্রিয় ও (৩) অবিদ্যমান ক্রিয়। কোনও কোনও বস্তুর নামে ক্রিয়ার সম্পর্ক পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা মূলতঃ ক্রিয়া হইতেই নিষ্পন্ন। যেমন 'কর্ত্তা', 'হর্ত্তা', 'পাচক', 'সূচক'। ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ ক্রিয় বলা যায়। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কল্পনা দ্বারা ক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। সেগুলিকে প্রকল্প্যক্রিয় বলা যায় যেমন 'সত্য', 'ব্যাঘ্র' প্রভৃতি কিন্তু ডিম্ব-ডবিত্থাদি কতিপয় শব্দে কল্পনা দ্বারাও ক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপন সম্ভবপর নহে; এগুলি অবিদ্যমান ক্রিয়।

যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে গার্গ্যের আপত্তির সমাধান হইয়াছে। গার্গ্যের আপত্তি ছয়টী। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে—ক্রিয়ার সম্পর্কের দ্বারা বস্তুর নামকরণ হইলে যে যে বস্তুতে ক্রিয়া বিশেষের সম্পর্ক থাকিতে পারে সবগুলিই এক নামে অভিহিত হইতে পারে। গম ধাতু হইতে যদি গো শব্দের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে গো শব্দ দ্বারা গতিশীল বস্তু মাত্রই লক্ষিত হইতে পারে। আবার দ্বিতীয়তঃ যে যে ক্রিয়ার সহিত কোনও বস্তুবিশেষের সম্পর্ক স্থাপন হইতে পারে সেই বস্তুবিশেষের ক্রিয়ার সংখ্যানুযায়ী অসংখ্য নাম হইতে পারে সুতরাং এক ক্রিয়ার দ্বারা বহু বস্তু ও বহু ক্রিয়া দ্বারা এক বস্তু অভিহিত হইলে পদে পদে নামকরনের ব্যর্থতা অনুভব করিতে হয়। ব্যাপ্তি অর্থ বিশিষ্ট অশ ধাতু হইতে যদি অশ্ব শব্দের নিরুক্তি হয়, তাহা হইলে একদিকে যেমন ব্যাপ্তি ক্রিয়ার সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট বহুবস্তু অশ্ব দ্বারা অভিহিত হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনি আহার নিদ্রা গতি প্রভৃতি যত প্রকার ক্রিয়ার সহিত অশ্ব নামক বস্তুর সম্পর্ক হইতে পারে, সেই সকল ক্রিয়া হইতে অশ্ববাচক বস্তুটীর অসংখ্য নাম হইতে পারে। কবিকল্পনায় শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম সমাদৃত হইতে পারে, কিন্তু ভাষার সম্বন্ধে এ প্রকার নামের ভার চাপাইলে ভাষা নিঃসন্দিগ্ধ অর্থ প্রকাশে অসমর্থ হয়। আর বস্তুতঃ পক্ষে ব্যুৎপত্তিবাদিগণ এক একটী ধাতু হইতে এক একটী বস্তুরই নামকরণ করিয়াছেন; এক ক্রিয়া দ্বারা বহু বস্তুর বা বহু ক্রিয়ার দ্বারা এক বস্তুর নামকরণ করেন নাই। সুতরাং শব্দ বা নাম সকলের সমুদায়ার্থই গ্রাহ্য, ব্যুৎপত্তি নিষ্পন্ন অবয়বার্থের কোনও মূল্য নাই। ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ কল্পিতার্থ; ভাষার বিষয়ে এ প্রকার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন এবং ব্যর্থ।

* শাকটায়ন বৈদিক যুগের বৈয়াকরণ, যাস্ক ও পাণিনির পূর্ব্বকালের। যাস্কের নিরুক্ত ও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে তাঁহার উল্লেখ আছে। যজুর্বেদ প্রাতিশাখ্য এবং অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্যেও শাকটায়ন সম্মানিত। সুতরাং তিনি কত প্রাচীন তাহা বলা যায় না। তাঁহারও পূর্ব্বে নাকি ইন্দ্র আচার্য্য নামে একজন বৈয়াকরণ ছিলেন। কিন্তু শাকটায়ন বা ইন্দ্রাচার্য্যের ব্যাকরণ পাওয়া যায় নাই। মান্দ্রাজে Leyden Mss নামে যে পুঁথিশালা আছে তাহাতে Malayalam ও Canarese অক্ষরে লেখা জৈনদিগের সংগৃহীত কয়েকখানি শাকটায়ন ব্যাকরণের পুঁথি আছে। এগুলি শাকটায়নের মূল ব্যাকরণ নহে জৈনদিগের অধ্যবসায়ে খ্রীষ্টীয় ১২শ শতকে এ ব্যাকরণ সংকলিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত এ ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় নাই।

গার্গ্যের আপত্তি খণ্ডন করিয়া যাস্ক বলিতেছেন যে বস্তু ও ক্রিয়ার বহুধা সম্পর্ক অনুসারে এক ক্রিয়া হইতে বহু বস্তুর নাম ও বহু ক্রিয়া হইতে এক বস্তুর নাম হইতে পারে। তবে লোক প্রসিদ্ধ নাম ও তাহার লোক প্রসিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। লোকে দেখাযায় যে বহু বস্তু তুল্য ক্রিয় হইলেও এক ক্রিয়া হইতে এক বস্তুরই নামকরণ হয়, বহু বস্তুর হয় না। তক্ষণ ও পরিব্রজন ক্রিয়া অনেকে করিলেও সূত্রধরের নাম তক্ষা এবং সন্ন্যাসীর নাম পরিব্রাজক। তক্ষা ও পরিব্রাজক শব্দে অন্য বস্তু অভিহিত হয় না। কেন হয়না তাহা বৈয়াকরণ বলিতে পারেন না, কারণ বৈয়াকরণের ইচ্ছা অনুসারে লোকে শব্দ প্রবৃত্ত হয় না। সুতরাং শাকটায়ন এ কথা বলিতে পারেন না। লোকই ইহার উত্তর দিতে পারে। কিন্তু শব্দ প্রবর্ত্তক লোকই বা কোথায়? কোন্ কালে কাহার দ্বারা শব্দ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা জানিবার যেমন উপায় নাই তেমনি কেন ক্রিয়া বিশেষের সহিত বস্তু বিশেষের সম্পর্ক জাত অর্থ লোকে প্রচলিত হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। ফল লাভের আশায় বহু ব্যক্তি উকীলের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও কেহ কেহ ফল লাভ করিতে পারেন, কেহ কেহ পারেন না। সেই রূপ বহু বস্তুর সহিত এক ক্রিয়ার সম্পর্ক থাকিলেও সেই ক্রিয়া দ্বারা কোনও বস্তুর নাম হয়, কোনও বস্তুর হয় না। ইহাই লোক প্রসিদ্ধি। লোকে এইরূপই দেখা যায় যে কোনও ক্রিয়া দ্বারা বস্তু বিশেষেরই নাম হয়, ঐ ক্রিয়ার সম্পর্ক বিশিষ্ট সকল বস্তুর নাম হয় না। গার্গ্যও ত ইহার কারণ প্রদর্শন করিতে পারেন না; কারণ তিনি যে রূঢ় শব্দের সত্তা স্বীকার করেন সেই রূঢ় শব্দ অর্থ বিশেষে রূঢ় হইল কেন এবং অর্থান্তরে রূঢ় হইল না কেন? তাহা গার্গ্যও বলিতে পারেন না, শাকটায়ন ত পারেনই না। অশ্ব শব্দে বাচ্য বস্তুটী ঘোটক না হইয়া বৃক্ষও ত হইতে পারিত? তাহা না হইবার কারণ কি? ইহার উত্তরে একই কথা বলা যায় যে শব্দের ইহাই স্বভাব বা প্রকৃতি। এই ভাবেই ধাতু বিশেষের অর্থের প্রাধান্য অবলম্বন করিয়া বস্তু বিশেষের অভিধান হয়। পক্ষান্তরে তক্ষা ও পরিব্রাজক আহার-নিদ্রাদি অন্যান্য অনেক ক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত হইলেও কেবল তক্ষণ ও পরিব্রজন ক্রিয়া হইতেই তাহাদের নামকরণ হয়। এই ক্রিয়াই তাহাদের বিশিষ্ট ধর্ম্ম। অন্য ক্রিয়া তাহাদের পক্ষে পর-নিরপেক্ষ নহে। আহার নিদ্রাদি ক্রিয়া তক্ষণ ও পরিব্রাজকের ন্যায় অন্যান্য বস্তুতেও আছে।

গার্গ্যের তৃতীয় আপত্তি এই যে এক এক ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যখন বহু শব্দ নানা উপায়ে রচিত হইতে পারে তখন সেই সকল বহু শব্দই সেই বস্তু বিশেষের নাম হয় না কেন? নির্দ্দিষ্ট বস্তুর বাচন নির্দ্দিষ্ট শব্দের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার হেতু কি? 'পুরুষ' শব্দের অর্থ যদি পুরে শয়ন করা হয় এবং 'পুর্' শব্দ ও 'শী' ধাতু হইতে তাহা নিষ্পন্ন হয় তাহা হইলে ঐ প্রকারে নিষ্পন্ন 'পুরিশয়' শব্দে পুরুষ বুঝায় না কেন? অশ্ ধাতু হইতে 'অশ্ব' ও 'অষ্টা' উভয় শব্দই নিষ্পন্ন; তবে 'অষ্টা' শব্দ অশ্বের বাচক নহে কেন? হিংসার্থ তৃদ ধাতু হইতে যদি 'তৃণ' শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তবে 'তর্দন' শব্দও ত তৃণের বাচক হইতে পারে। অর্থাৎ এক ক্রিয়ার প্রতিপদক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এক বস্তুর নাম হইতে পারে। কিন্তু তাহা যখন হয় না তখন শাকটায়নের ব্যুৎপত্তি ভ্রমাত্মক। ইহার উত্তরে যাস্ক বলেন যে শব্দের প্রকৃতি ও লোকপ্রসিদ্ধি অনুসারে যে বস্তুর যে নাম প্রচলিত আছে তাহার বিচার ও পরীক্ষা করাই বৈয়াকরণের কার্য্য। বৈয়াকরণ যখন শব্দ প্রচলিত করেন না, তখন এপ্রকার নাম প্রচলনের হেতুবাদে তাঁহারা সমর্থ হইতে পারেন না। নামের অর্থব্যাখ্যার জন্য বৈয়াকরণকে উপহাস করা চলে না। যাহারা শব্দ প্রচলিত করিয়াছে দোষগুণ তাহাদেরই। গার্গ্যের যদি শক্তি থাকে, তবে তিনি বৈয়াকরণের নিন্দা না করিয়া প্রয়োক্তাদিগের ব্যবহার বা অপব্যবহারের সংশোধন করিয়া তাহাই চালাইতে পারেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু সে শক্তি গার্গ্যের নাই।

গার্গ্যের চতুর্থ আপত্তি হইয়াছে এই যে, যে বস্তু যে নামে প্রচলিত আছে সে নামের নিঃসন্দিগ্ধ অর্থ সেই বস্তু। ধাতু খুজিয়া তাহার সহিত নামের সম্পর্ক সংঘটিত করা ও তাহার অর্থনির্ণয়ের চেষ্টা করা একপক্ষে যেমন নিষ্ফল, অন্যদিকে সেইরূপ অসম্ভব। এরূপ পণ্ডশ্রম করিবার

আবশ্যকতা কি ? শাকটায়ন পৃথিবী শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন "প্রথনাৎ পৃথিবী", অর্থাৎ প্রথন ক্রিয়ার সহিত সম্পর্কে পৃথিবী শব্দ নিষ্পন্ন। ইহা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে পৃথিবী স্বভাবতঃ বিস্তৃত ছিল না, কেহ ইহাকে প্রথিত করিয়াছে। কিন্তু শাকটায়ন বলিতে পারেন কি "কে ইহাকে প্রথিত করিয়াছে ?" অর্থাৎ "কে এই অপৃথিবীকে পৃথিবী করিয়াছে ?" এবং "কোন্ আধারে অবস্থিত থাকিয়া প্রথন-কর্ত্তা এই পৃথিবীর প্রথন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছে ?" প্রথন ক্রিয়ার কর্ত্তা ও আধার উভয়ই যখন কল্পনাতীত তখন শাকটায়নের ধাতু হইতে নাম সৃষ্টিও প্রমাদ মূলক। ইহার উত্তরে যাস্ক বলেন যে শব্দের ধাতুপ্রত্যয়ের বিভাগ দ্বারা ব্যুৎপত্তি না হইলে যোগার্থ বুঝিবার উপায় নাই। আর যোগার্থ না হইলে বিচার হইবে কি করিয়া ? সুতরাং বিচার করিতে গেলেই বিশ্লেষণ আবশ্যক। বিনা বিশ্লেষণে বিচার বা বৈয়াকরণ আলোচনা অসম্ভব। শাকটায়নের "প্রথনাৎ পৃথিবী" এই ব্যুৎপত্তির প্রতি গার্গ্য যে কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত নহে। কারণ আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবী স্বয়ং পৃথু বা বিপুলাতন। অর্থাৎ পৃথিবীর পৃথুত্ব প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট ও অনন্যকৃত। সুতরাং শাকটায়নের অভিপ্রায় না বুঝিয়াই গার্গ্য তর্ক করিয়াছেন। নতুবা তাঁহার চতুর্থ আপত্তির হেতু দেখা যায় না। *

গার্গ্যের পঞ্চম আপত্তি হইয়াছে এই যে শাকটায়ন স্থল বিশেষে বহু নামের ধাতুজত্ব রক্ষা করিতে পারেন নাই। উপরন্তু অনেক শব্দে দুই বা তিন ধাতুর সমবায়ে নিষ্পন্ন করিয়া উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। 'সত্য' শব্দকে 'সৎ+য' এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া 'অস্' ধাতুর 'অস্তি' পদ ও 'ই' ধাতুর কারিতান্ত (নিচন্ত) 'আয়যতি' পদ হইতে যথা ক্রমে অপূর্ব্ব উপায়ে 'সৎ' ও 'য' নিষ্পন্ন করিয়া উভয়ের সমবায়ে 'সত্য' শব্দের ধাতুজত্ব রক্ষা করিয়াছেন। 'অস্তি' পদ হইতে 'বর্ণ বিপর্য্যয়,' দ্বারা হইয়াছে 'সতি'; 'সতি' হইতে বর্ণ লোপ দ্বারা 'সৎ'। আবার 'আয়যতি' হইতে কেবল 'য' মাত্র গ্রহণ এবং অবশিষ্টের বর্জ্জন (বর্ণনাশ দ্বারা) করা হইয়াছে। অতঃপর সৎ+য জুড়িয়া হইল 'সত্য'§। এপ্রকার সমাধান নিতান্তই কষ্ট কল্পিত ও পূর্ব্বাচার্য্য গণের প্রণালী বিরুদ্ধ। অস ধাতুর বিদ্যমানতা ও ই ধাতুর জ্ঞান অর্থ লইয়া সমুদায়ের অবয়বার্থ হইয়াছে 'যাহা বিদ্যমান বস্তুর জ্ঞান জন্মায়' তাহাই সত্য। এই প্রকার উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন না করিলে শাকটায়নের প্রতিজ্ঞা রক্ষা বা নামের ধাতুজত্ব রক্ষা হয়না। তাই অদ্ভুত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিজের সত্য-প্রতিজ্ঞত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বস্তুতঃপক্ষে নামের ধাতুজত্ব নিতান্তই কল্পিত এবং অদ্ভুত কল্পনা মাত্র সাধ্য।

যাস্ক বলেন এখানেও গার্গ্য শাকটায়নের অভিপ্রায় না বুঝিয়াই তর্ক করিয়াছেন। যদি ধাতুদ্বয়ের দ্বারা প্রকৃত অর্থ প্রকাশ না হইত তবেই শাকটায়ন দূষনীয় হইতেন। কিন্তু অর্থ সামঞ্জস্য যখন শাকটায়ন রাখিতে পারিয়াছেন তখন তাঁহার ব্যুৎপত্তির প্রতিবাদ অশিক্ষিত ব্যক্তির আপত্তির ন্যায় আপত্তি-কারকেরই নিন্দার কারণ। অনেক ধাতুজ নামের কথা ছাড়িয়া দিলেও এক ধাতুজ নামের কথাই বহু অশিক্ষিত লোকে জানে না। যাহারা ধাতু দ্বারা শব্দের অর্থ নিষ্পন্ন করিতে না পারে তাহারাই নিন্দনীয়, কিন্তু যাঁহারা এক ধাতু বা অনেক ধাতু হইতে শব্দের ব্যুৎপত্তি-নিরূপণ করিতে পারেন তাঁহারা প্রশংসার পাত্র। অনেক ধাতু হইতে শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রণালী বিরুদ্ধও নহে! হৃ ধাতু, দা ধাতু, ও ই ধাতু যোগে শতপথ ব্রাহ্মণে 'হৃদয়' (= √হৃ + √দা + √ই) শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

গার্গ্যের ষষ্ঠ আপত্তি এই যে প্রথমে বস্তু, পরে ক্রিয়া: কারণ ক্রিয়া দ্রব্যাশ্রিত। দ্রব্য ভিন্ন ক্রিয়ার উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং শাকটায়ন উত্তরকাল সম্ভাব্য ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বকালোৎপন্ন বস্তুর অভিধান করিয়া শব্দার্থের নিত্য সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়াছেন। কারণ বস্তু ও নাম একত্র

* কোনও স্বাধিষ্ঠিত মহাপুরুষ প্রথিত করিয়াছেন একথাও বলা যায়।

§ 'সন্ত' হইতেও পারিত।

উৎপন্ন, অগ্র পশ্চাৎ জাত নহে। ভবিষ্যৎকাল ভাবী ক্রিয়ার উৎপত্তির পূর্ব্বেই বস্তুর উৎপত্তি, এবং বস্তুর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ আর যাহা বলুন গার্গ্য সমস্তই সহ্য করিতে পারেন; শব্দের অনিত্যত্ব তাঁহার অসহ্য।* সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব ভঙ্গকারী ব্যুৎপত্তিবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া শাকটায়ন নিতান্তই হাস্যস্পদ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। সুতরাং বস্তুর নাম ক্রিয়া সাপেক্ষ নহে, ক্রিয়া নিরপেক্ষ।

ইহার উত্তরে যাস্ক বলেন যে ভবিষ্যৎকাল ভাব্য ক্রিয়াদ্বারা পূর্ব্বকালোৎপন্ন বস্তুর নামকরণে শব্দার্থসম্বন্ধের নিত্যত্বভঙ্গরূপ আপত্তিও গ্রহণ যোগ্য নহে। কারণ অনেক স্থলেই এ প্রকার নামকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিল্বাদন ক্রিয়া হইতে 'বিল্বাদ' নাম হইয়াছে। বিল্বাদ নাম বাচ্য বস্তু বা ব্যক্তির উৎপত্তি বিল্বাদন ক্রিয়ার পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক নহে। এই প্রকার 'লম্ব চূড়ক' শব্দ। "পুরোডাশ কপালেন তুষান্ অপনয়তি" এই শ্রুতিবাক্যে পুরোডাশের সহিত সম্পর্কে কপালবিশেষের নাম "পুরোডাশ কপাল"। রূঢ় শব্দের ব্যুৎপত্তিও বেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঘৃত বাচক সর্পিঃ শব্দ গমনার্থ সৃপধাতু হইতে ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। যেহেতু ঘৃত সর্পিত হয় সেই হেতু ঘৃতের নাম সর্পিঃ। সু শব্দ প্রশস্ত-বাচক, অসু শব্দ অপ্রশস্ত বাচক। 'সু' ও 'অসু' শব্দের উত্তর মত্বর্থ র-প্রত্যয় যোগে 'সুর' ও 'অসুর' শব্দ ব্যুৎপাদিত। শ্রুতি বলিয়াছেন প্রজাপতির প্রশস্ত আত্মা হইতে উৎপন্ন হওয়াতে দেবগণ সুর শব্দ বাচ্য এবং প্রজাপতির অপ্রশস্ত আত্মা হইতে উৎপন্ন দেবশত্রুগণ 'অসুর'-শব্দ-বাচ্য। সুতরাং "যাবতীয় নাম ধাতুজাত", শাকটায়নের এই সিদ্ধান্ত বেদ ও ব্যাকরণের মতানুসারী; ইহাতে ভ্রম প্রমাদ নাই। ইহা অভ্রান্ত, সমীচীন ও সমাদরনীয়।

মীমাংসাদর্শনে এই মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা হইয়াছে। মীমাংসা ভাষ্যকার শবর স্বামী বলেন যে শব্দের যে অর্থ লোকে প্রসিদ্ধ আছে সেই শব্দের সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। নিরুক্ত ব্যাকরণাদির সাহায্যে অর্থকল্পনা যে কেবল নিরর্থক তাহা নহে. উপরন্তু কল্পনা জাত অর্থ ব্যবস্থিত অর্থাৎ নিশ্চিত হয় না. ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ বস্তুমাত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। অভিমত বস্তু ব্যতীত অন্যান্য বস্তুতেও ব্যুৎপত্তি-লভ্য অর্থ সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে শব্দের অর্থে সন্দিগ্ধতা উপস্থিত হয়। ধাতু-প্রত্যয়ের বিশ্লেষণে বৈয়াকরণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে অর্থ নির্দ্দিষ্ট হয় না। সুতরাং বাক্যের অর্থ নির্ণয় কালে ব্যুৎপত্তির উপযোগিতা নাই।

মীমাংসাকারও শব্দের নিত্যত্ববাদী। পানিনি কোথাও বলেন নাই যে সমস্ত নাম ধাতুজাত।† মহাভাষ্যে শব্দের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায় শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তিবাদ স্বীকৃত হয় নাই। ন্যায়াচার্য্যগণ যাবতীয় নামের ধাতুজত্ব স্বীকার করেন না। কেবল যৌগিক নামগুলি তাঁহাদের মতে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লাভ করে। রূঢ় শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ সর্ব্বত্র সঙ্গত হয় না।

মোক্ষমূলরের যুগ পর্য্যন্ত ইউরোপে শব্দের নিত্যত্ব বাদ বা ভাষার নিত্যত্ব বাদ চলিতেছিল। হুইট্‌নী তাহা স্বীকার করিলেন না। তিনি দেখাইলেন যে ভাষা মনুষ্যেরই সৃষ্টি; দু এক জন মনুষ্যের সৃষ্টি নহে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভাষার সৃষ্টি হয়। আপত্তি না করিলেই সম্মতি হয়। সম্মতি অজ্ঞাতসারেই লোকে দিয়া থাকে।

* শব্দের নিত্যত্ববাদ ও অনিত্যত্ব নিরাস বিষয়ে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি একটী কৌতুকাবহ উপাখ্যানের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন অনিত্য বস্তু মানুষে সৃষ্টি করে, কুম্ভকার কুম্ভ ও মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করে; সূত্রধর দারুময় বস্তুজাতের সৃষ্টি করে, সুতরাং শব্দ অনিত্য হইলে বৈয়াকরণ ও সংস্কৃত পণ্ডিতগণই শব্দ সৃষ্টির কর্ত্তা হইবেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে ঘটশরাবাদির প্রয়োজন হইলে লোকে যেমন কুম্ভকার গৃহে যাইয়া সেই সকল বস্তু প্রস্তুত করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করে, [illegible] নির্ম্মাণের জন্যও তেমনি সংস্কৃত পণ্ডিতগণের গৃহে অনুরোধ আসিবার কথা। কিন্তু তাহা যখন হয়না, তখন শব্দ [illegible] নহে, মানুষের শব্দ রচনার শক্তি নাই।

† উণাদি সূ[illegible]মূহ পাণিনির রচিত নহে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে অন্তর্নিবিষ্টও নহে। উণাদি সূত্রের সংখ্যা ৭৪৮। এই সূত্রগু[illegible]াকটায়নের নামে প্রচলিত। শাকটায়নই নাম-সমূহের ধাতুজত্ব প্রতিপাদন সর্ব্বপ্রথমে করিয়াছেন।

রাজনীতি বিশারদ বহুদর্শী পণ্ডিত হাম্‌বোল্ট (Humboldt) বলিয়াছেন মানুষ অতীত বা ভবিষ্যৎ জানে না। ঐতিহাসিক যুগের ক্রিয়াকলাপই মানুষের আলোচনার প্রকৃত ক্ষেত্র। ভাষার উৎপত্তি বাদ বা নিত্যত্ব বাদ লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডায় যে আলোচনা হয়, তাহাতে সত্যের সন্ধান না পাওয়া যাইতে পারে। ভাষা মানব জাতির প্রাণস্পন্দনা ও সৃষ্টি শক্তির নিদর্শন। মানব জাতি যেমন প্রাচীন, ভাষাও সেইরূপ প্রাচীন। ভাষাকে চিনিতে হইলে মানুষকে চিনিতে হইবে। ভাষার মূলান্বেষণ করিতে হইলে মানুষের মূলান্বেষণ করিতে হইবে।

আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার টাকার (T. G. Tuker) বলেন যে আধুনিক ভাষা সমূহের আলোচনায় [আমেরিকার বহুসমবায়ী (Polysynthetic) ভাষা সমূহ বাদ দিয়া] আমরা ভাষায় শব্দ রচনার একটা পদ্ধতি দেখিতে পাই। পৃথিবীর ভাষা সমূহের মধ্যে আকৃতিগত যতই পার্থক্য পরিদৃষ্ট হউক না কেন সকল ভাষাতেই অল্পবিস্তর পরিমাণে একটি রচনা প্রনালী আছে, যাহার বিশ্লেষণে আমরা দুইটি জিনিষ দেখিতে পাই। প্রথমটি শব্দের মূল অর্থের প্রকাশক অর্থাৎ ধাতু স্থানীয় এবং দ্বিতীয়টী অন্বয় বা অন্বিতার্থের বাচক। প্রথমটীকে প্রকৃতি বা মূল উপাদান বা ধাতু বলা যায় এবং দ্বিতীয়টীকে অপ্রধান উপাদান বা অন্বয়ার্থের নিদর্শক প্রত্যয়, উপসর্গ বা প্রত্যয় বাচক শব্দ বলা যায়। আধুনিক বিশ্লেষণ-ধর্ম্মী ভাষাসমূহ এককালে সংশ্লেষণ-ধর্ম্মী ছিল এ মতবাদ মানিয়া লইয়া সংশ্লেষণ মূলক ভাষার যুগের ভাষার বিশ্লেষণ দ্বারা ভাষারচনার এই মূল উপাদান দ্বয়ের বিশ্লেষণ চেষ্টা করিব। সমবায়-ধর্ম্মী (agglutinating) ও প্রত্যয় ধর্ম্মী (inflectional) ভাষা সমূহের বিশ্লেষণে আমরা এই দ্বিবিধ মূল উপাদান দেখিতে পাই। প্রথমটী বস্তু বা ক্রিয়ার নাম স্বরূপ ('a naming element', whether of object or of action,) এবং সাধারণতঃ ধাতু নামে অভিহিত। ইহাকে ইংরাজীতে predicative or nominal root অর্থাৎ ক্রিয়া বাচক বা বস্তুবাচক ধাতু বলা হয়। দ্বিতীয় উপাদানটী অন্বয়ার্থক উপাদান বা ব্যাকরণের অর্থবোধক উপাদান, (a formative element or a grammatical sign) সাধারণতঃ প্রত্যয় নামে অভিহিত। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে demonstrative or deictic element অর্থাৎ প্রকাশক, বিকাসক বা নিদর্শক উপাদান বলা হয়। আখ্যাতাত্মক (বা নামবাচক) 'ধাতু' শব্দ দ্বারা সেই মূল উপাদানকে বুঝিতে হইবে যাহা (অবিকৃত বা বিকৃতভাবে) ঐ উপাদানের সহিত অন্য নানা উপাদান মিশাইয়া গঠিত বহু শব্দে বর্ত্তমান থাকে। এক ইস্পাত রূপ মূল উপাদান লইয়া নানা উপায়ে যেমন ছুরি, কাঁচি, ছুঁচ, ক্ষুর, তরবারি, তালা, চাবি, প্রভৃতি অসংখ্য বস্তু প্রস্তুত হয়, এক মূল 'ধাতু' হইতে সেইরূপ ভাষায় নানা উপসর্গ ও প্রত্যয়াদি যোগে অসংখ্য শব্দের সৃষ্টি হয়। সেই সমস্ত শব্দেই সেই মূল ধাতুটীকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইংরাজী be লাটিন fui ও super-bus, গ্রীক phus, ও huper-phues প্রভৃতি শব্দ আলোচনা করিলে ইহাদের মূল উপাদান বা ধাতু স্বরূপে *bhu, *bhu বা *bheu, এই আর্য্য ধাতু (Indo European root অথবা সংস্কৃত ভূ ধাতুর মূল দেখিতে পাই। (অনুজ্ঞা ভিন্ন) এই ধাতুর সাধারণতঃ স্বতন্ত্র ব্যবহার হয় না। [অনুজ্ঞায় লাটিন 'i' যাও, গ্রীক ei, যাও, I.E.—*ei, সংস্কৃত 'ইহি', অথবা 'ভব', 'ভুদ' প্রভৃতিকে মূল ধাতুর রূপ বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাদের স্বতন্ত্র ব্যবহার এখানে দেখা যায়। কিন্তু এখানেও কিঞ্চিৎ বিকৃতি দেখা যায়।] এই ধাতুর স্বতন্ত্র ব্যবহার না থাকায় কেহ কেহ বলিয়াছেন যে এ প্রকারের মূল উপাদান বা ধাতুর বাস্তব সত্তা নাই, ইহা কল্পনা মাত্র বা ভাবনিষ্কর্ষ জাত (abstractions)। ইহাকে ভাবনিষ্কর্ষ বা কল্পনাজাত বলিতেই হইবে; কারণ বিশ্লেষণ ও অনুমান দ্বারা ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হইয়াছে। কিন্তু যদি বলা যায় কোনও কালেই এই ধাতু বা মূল উপাদানের স্বাধীন সত্তা ছিল না, তাহা হইলে তাহা স্বীকার করা যায় না। কেবল মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে এতবড় প্রবল অনুমানটার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। একসূত্রে গ্রথিত অসংখ্য শব্দে যখন ধ্বনি ও অর্থের সা[illegible] সহ (অদৃশ্য রূপ-কার্য্যেকেও সমানার্থ বলিয়া ধরিতে [illegible]হ, এবং নিয়মা[illegible]

সারে বিকৃত ধ্বনিকেও অভিন্ন ধ্বনি বলিতে হইবে) এই মূল উপাদান বা ধাতুটাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখন ঐ সকল সমসূত্র-গ্রথিত শব্দ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই মূল উপাদানের স্বাধীন সত্তা ছিল এ অনুমান অস্বীকার করিলে ঐ প্রকার অর্থ ও ধ্বনির অভিন্নতার কারণ নির্ণয় কি প্রকারে হইবে? প্রণয় বা 'love' অর্থে তুর্কী (Turkish) 'Sev' ধাতুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিলে Sev-mek, to love ; sev-in-mek, to love oneself ; sev-ish-mek, to love one another ; sev-dir-mek, to make to love ; sev-il-mek, to be loved ; sev-me-mek, not to love ; sev-in-dir-il-me-mek, not to be made to love oneself ; প্রভৃতি নানা স্থানে নানা ভাবে এই 'sev' (to love) ধাতুর প্রয়োগ পাওয়া যায় কি প্রকারে? বিশ্লেষণ মূলক কল্পনা দ্বারা আরবী 'qtl' (to kill) ধাতুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার না করিলে নানা স্বরের অন্তর্নিবেশ দ্বারা qtel, qtol, qtil, qtal, qtul, qutl qutel, quta', qata', qātal, qetol, qetol, প্রভৃতি অসংখ্য শব্দে তিনটী অভিন্ন ব্যঞ্জন ও অর্থের অভিন্নতা প্রতিপাদন কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব অর্থ-সহ ধাতু শব্দ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে? এই ধাতু একমাত্র মূল ভাবে (a single concept) প্রকাশ করিত এবং এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হইত অর্থাৎ একাক্ষর বা mosyllabic ছিল। নিরুক্তবাদিগণের (etymologists) অনুসন্ধানে ধাতুর একাক্ষরত্ব নিষ্পন্ন হইয়াছে।

রুচির বিভিন্নতা সত্বেও সর্ব্বমানবে সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে এমন কতকগুলি বিধি প্রণীত বা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই বিধি সমূহের সমষ্টিই মনোবিজ্ঞান বা psychology প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিজ্ঞানও বিজ্ঞান, এবং ইহার বিধিও অভ্রান্তভাবে সর্ব্বত্রই অর্থাৎ জাতিনির্বিশেষে এবং দেশকাল নির্বিশেষে মানবমাত্রে প্রযুজ্য। সুতরাং মানব মনের একটা নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতি আছে। এ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন নাই। আমাদের [illegible]কীর্ণ জীবনে অংশমাত্রে প্রত্যহ সূর্য্যোদয় দেখিয়া আ[illegible] অনুমান করিতে পারি যে বরাবর বহুকাল ধরিয়া এই [illegible]রে প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইতেছে এবং উত্তরকালেও এই প্রকার হইবে। কারণ আমরা প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনশীলতায় বিশ্বাস করি। সেই জন্যই ভাত সিদ্ধ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য দু একটী মাত্র ভাতের পরীক্ষা করিয়া সেই পরীক্ষার ফল দ্বারা সব ভাতগুলির অবস্থা বুঝিয়া লই। ব্যবসাদারের নিকট হইতে বহু সংখ্যক একরূপ প্যাকেট পোষ্টাপিসে আসিলে তাহার দু'একটীর ওজন করিয়াই সমস্তগুলির হিসাব ঠিক করা হয়। প্রকৃতির অপরিবর্ত্তনীয়তাই এই সকলের হেতু। এই কারণেই আমরা বর্ত্তমানের মানব প্রকৃতি দেখিয়া অতীতের বিষয়েও অনুমান করিয়া থাকি। একালে মানব যে ভাবে নানা উপায়ে প্রকৃতিপ্রত্যয় বা বিভিন্ন শব্দের যোগে অভিনব শব্দের সৃষ্টি করে, অতীত কালেও যে সেই প্রকার সৃষ্টি চলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ কি? সুতরাং ঐতিহাসিক যুগের ভাষার প্রকৃতি হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভাষার প্রকৃতির অনুমান ভ্রান্ত হইবে কেন? যদি তাহাই হয়, তবে ভাষার মূল কোথায়, তাহা জানিনা বলিয়া ভাষার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা দ্বারা বর্ত্তমান ঐতিহাসিক যুগের ভাষার প্রকৃতি তাহা হইতে প্রাগৈতিহাসিক ভাষার প্রকৃতি জানিবার চেষ্টা করিবার অধিকার আমাদের না থাকিবে কেন? প্রথমে ভাষার মূল জানা ও তাহার পরে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা, এরূপ ক্রমে কাজ চলিবে না। সন্তরণ না শিখিয়াই জলে নামিতে হয়, নতুবা সন্তরণ শিখা হয় না। ভাষার মূল না জানিলেও বিশ্লেষণ ও তুলনা দ্বারা তাহার প্রকৃতি বুঝিতে হইবে। একদিন হয়ত ভাষার মূলের সন্ধানও মিলিয়া যাইবে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমের আচার্য্যগণের মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে মধ্য পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ভাষার নিত্যত্ব শব্দে বুঝিতে হইবে যে ভাষা মনুষ্যসৃষ্ট হইলেও ইহাতে সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও একটা অপরিবর্ত্তনীয় ধারা আছে। যে মনঃশক্তি দ্বারা ভাষার সৃষ্টি এবং যাহাদ্বারা ইহার পুষ্টি ও বিকাশ হইতেছে সেই মনঃশক্তির মধ্যে যেমন একটী অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতি অজ্ঞাতসারে মানবজাতির ক্রমবিকাশের সহায়ভূত হইয়াছে ও হইতেছে, সেইরূপ মানব সৃষ্ট ভাষার বিকাশের ও একটা

সনাতন প্রকৃতি অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিতেছে, যাহা দ্বারা ভাষা বিভিন্নরুচি বিবিধজাতীয় অসংখ্য মানবের মনোভাবের আদান প্রদানের অসন্দিগ্ধ সাধন হইয়াছে। ভাষার এই প্রকৃতিটীকে চিনিতে পারিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে শব্দ ব্রহ্মের বিকাসে সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও একটা অপরিবর্ত্তনীয়তা আছে, বিশৃঙ্খলার মধ্যেও একটা শৃঙ্খলা আছে, বিনাশের মধ্যেও একটা অবিনশ্বরতা আছে, মনুষ্যের সৃষ্টির মধ্যেও পরমেশ্বরের সৃষ্টিশক্তি নিহিত আছে।

সাপের মণি

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ রায়]

বিত্ত-লোভী চিত্ত-হরণ
সাপের মাথার মণি!
জগৎ মাঝে সুধুই কি তুই
কল্পলোকের খনি?
কবির মনের আলোয় ভেসে,
সুধুই কি তুই বেড়াস হেসে?
সত্যিকারের জগৎ জুড়ে
বিষ ঢালে কি ফণী?

* * *

কাঁটার গাছে গন্ধভরা
পুষ্প যেথায় দুলে,—
সেথায় যে তুই জন্ম নিলি
বিষ-সাগরের কূলে।
পঙ্ক ফুঁড়ে ফুটল কমল,
সেথায় তোমার জন্ম সফল;—
কালবশেখীর তামস মাঝে
বিজলী আলোর মূলে!

* * *

শঙ্কা মাঝে ডঙ্কা বাজায়
সাহস যাহার প্রাণ,
প্রেতের বিকট অট্টরবেও
সচল যাহার গান,
দুঃসাহসের সাধন যাহার,
সফল পাড়ি বিষ-পারাবার;
তারি তরে জন্মিলি তুই,—
বিষের চরম দান!

মাতৃত্ব

[শ্রীবিরজাসুন্দরী দেবী]

মা শব্দটী যেমন মধুর তেমনি কোমল এবং মমতা মাখানো। একটী ছোট্ট অক্ষরে নিবিড় স্নেহ-মাধুরী ক্ষরিতে যে গভীর ক্ষীর সুরধুনী বহিয়া যাইতে আর দেখা যায়না। মাতৃত্ব বিষয়টী যেমন মহত্ব-ব্যঞ্জক তেমনি দায়িত্ব-পূর্ণ। আমাদিগকে এই মহত্ব লাভের ও দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে হইলে যে যে উপাদানে গঠিত হওয়া আবশ্যক আমাদের মধ্যে সেই সেই উপাদানের অনেক অভাব দেখা যায়। বিলাতী সভ্যতার অনুকরণ ও আধুনিক শিক্ষাই ইহার একমাত্র কারণ। বর্ত্তমান কালে আমরা বিলাতী সভ্যতাকে খুব বেশী পছন্দ করি। আর তাহা পছন্দ করিবার কারণ এই যে, আমরা ক্রমেই অন্তদৃষ্টি হীন হইয়া পরিতেছি। বহিদৃষ্টিতে আমরা তাহাদের ভিতর যাহা দেখি তাহা আপাত-মধুর, কিন্তু অন্তদৃষ্টি দিয়া দেখিলে দেখিব উহা একেবারে প্রাণহীন।

মাতার মাতৃত্বের উৎকর্ষ সাধন হয় সন্তান লালন পালন দ্বারা। আমরা যে দেশের সভ্যতায় অনুপ্রাণিত হইবার কসরৎ করিতেছি, সে দেশের মাতাগণ এই মহত্বপূর্ণ সুখে বঞ্চিত, তাঁহারা প্রসবান্তে সন্তান "আয়া"র হাতে সমর্পন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। সে দেশের সন্তানগণ বুঝিতে পারেনা সর্ব্ব-সন্তাপহারা মাতার বক্ষ কত সুখ ও আরামের স্থান। সে হতভাগিনী মাতাগণও বুঝিতে পারেন না বক্ষে সন্তান ধরিয়া কি আনন্দ, কোলে পিঠে লইয়া পালনে কি সুখ। ঐসবদেশে প্রায়ই দেখা যায় সুশিক্ষার জন্য সন্তান-দিগকে বিলাতে রাখিয়া চাকুরী করিতে পিতা ইণ্ডিয়ায় আসেন, মাতাও সঙ্গে আসেন, ছেলেকে শুধু মাসে মাসে টাকা পাঠান [illegible]নের সঙ্গে মাতার কোন সংস্রব থাকে না। মাতা মাতৃ[illegible] দায়িত্ব গ্রহণ করেন না বলিয়া পুত্রও বড় হইয়া মাতার প্রতি কিছু কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে করে না। আমাদের দেশে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন পরিবারেও মাঝে মাঝে এইরূপ সন্তান পালনে ঔদাসীন্য দেখা যায়। তবে ইহাঁদের অধিকাংশেরই বিদেশী আওতায় পড়িয়া রং বদলাইয়া গিয়াছে। এই সব শ্রেণীর মাতা নিজ হাতে সন্তানদিগকে স্নান আহার করানো প্রভৃতি কার্য্যকে হীন কার্য্য মনে করিয়া সকল কার্য্যের ভার দাস দাসীর উপর অর্পন করিয়া নিজেকে অত্যন্ত গৌরবান্বিতা মনে করেন। ধ্যেৎ! ছেলে মানুষ করা ও জঘণ্য জিনিস! আমি নিজে কোন কোন শিক্ষিতা মহিলাকে গর্ব্ব করিয়া বলিতে শুনিয়াছি, "আমাদের এ সব ছেলে মেয়ের ঝঞ্ঝাট বহণ করিতে হয় না। ঝি চাকরবাই সমস্ত করিয়া থাকে।" এ গর্ব্বের জন্য যে আমরা আমাদের নারীত্বের পূর্ণবিকাশ মাতৃত্বকে খর্ব্ব করিতেছি তাহা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন না।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই একটা অবলম্বন চায় কারণ তখন সে নিতান্ত অসহায় থাকে। পালন কার্য্য 'আয়া' কিম্বা ধাত্রী দ্বারা সম্পন্ন হইলে বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়না। কিন্তু স্তন দুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গেই যে সন্তানের শিক্ষা কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে। সেই শিক্ষা এবং শিশুর স্বাস্থ্যের জন্যই সুস্থা এবং শিক্ষিতা মাতার আবশ্যক হয়। শুধু পালনের জন্য নয়। শিশুর দেহ মন দুইই সুস্থ সুন্দর হইয়া বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকে। শিশু যাহার স্তন্য পান করে তাহার মনের ভাব ও ব্যাধিও গ্রহণ করিয়া থাকে। সে সময় সে থাকে বড্ডো অনুকরণ প্রবণ। ক্রমে শিশু বড় হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কথা বুঝিবার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতে থাকে সেই সময় তাহাদের

নিকট কোন কুৎসিত কথা বলিতে হয়না। অবোধ শিশু বলিয়া তাহাদিগকে তুচ্ছ করিতে নাই। তখন হইতেই তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইতে থাকে। সন্তান জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই মাতার প্রতি একটা কঠোর দায়িত্ব অর্পিত হয়। এই জন্যই, সন্তান গড়িয়া তুলিতে সুশিক্ষিতা মাতার আবশ্যক হয়। কথায় বলে "মেয়ে মায়ের জাত।" ইহা আমাদের কম সৌভাগ্য এবং কম গৌরবের কথা নহে। এই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা এই মেঠো গানটী মনে রাখিতে হইবে, "মা হওয়া কি মুখের কথা, কেবল প্রসব করেই হয় না মাতা।" সন্তানগণ যতদিন নিজের ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে সর্ব্বদা কাছে কাছে, চোখে চোখে রাখিতে হইবে। সত্য কথা বলিতে ও সৎকার্য্য করিতে উৎসাহিত করিতে হয়। কিসে তাহাদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হইবে এবং কি প্রকারে তাহারা উন্নত জীবন লাভ করিতে পারিবে সর্ব্বদা সেই প্রকার উপদেশ আমাদের দেওয়া কর্ত্তব্য।

অনেক স্নেহ পরায়না মাতা অন্ধ স্নেহের বশীভূত হইয়া সন্তানের দোষ দেখেন না। এমন কি সর্ব্বদা তাহাদের অন্যায় আবদার সহ্য করিয়া থাকেন। মাতাগণ মনে রাখিবেন, এই অন্যায় আবদার সহ্য করার দরুণ তাঁহারা তাহাদের ভবিষ্যত একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলেন।

আজকাল মেয়েদের যে প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা মাতৃত্ব সাধনের প্রতিকুল, ছেলে মেয়েদিগকে একই নিয়মে স্কুল কলেজে শিক্ষা দিয়া বি-এ, এম্-এ, পাশ করানো হইতেছে। ইহাতে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা হইতেছে বটে, কিন্তু নারী জীবনের চরম সার্থকতা যে মাতৃত্ব তাহার বিষয় কিছুই শিক্ষা পাইতেছে না। মেয়েরা সকালে ও রাত্রিতে স্কুলের পড়া শিক্ষা করে। তারপর বেলা দশটায় কোন প্রকারে নাকে মুখে চারিটী আহার গুজিয়া স্কুলে যায়, পাঁচ ঘণ্টা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা স্কুলে কাটাইয়া চারিটা সাড়ে চারটার সময় বাসায় আসে ইহার পর হাত মুখ ধোয়া, খাওয়া, চুল বাঁধা ইত্যাদির পর সামান্য একটুক বিশ্রাম বা খেলা করিতে করিতে সন্ধ্যা হয়, তার পর তাহাদের পুনঃ পড়া আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে তাহারা গৃহকর্ম্ম, সেবা, সন্তান পালন প্রভৃতি কিরূপে শিক্ষা করিবে? ভ্রাতা ভগিনীদের পালন, সাধ্যমত গুরুজনের সেবা, এবং গৃহকর্ম্মে মাতার সাহায্য দ্বারা মেয়েদের শৈশবেই মাতৃত্বের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। শিক্ষিত সমাজে বাল্য বিবাহ উঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা মঙ্গল জনক সন্দেহ নাই। ইহাতে শিক্ষারও সুবিধা হইয়াছে। মেয়েদের শিক্ষার নিয়মটী ঠিক পুরুষদের অনুকরনে না হইলে এই মাতৃত্ব সাধনে সিদ্ধি লাভ করা কিন্তু আরো সহজ হইত।

জননী—স্বর্গাদপি গরীয়সী। মাতৃত্বের আসন এই মাতারও উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রাণী নির্ব্বিশেষে মাতা হইবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু এই মাতৃত্বের গৌরব লাভ করিবার অধিকার সকলের নাই। সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর নিজ নিজ সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দ্বারা পালন করাই প্রকৃত মাতৃত্ব নহে। অনাথ, নিরাশ্রয়, পতিত, ক্ষুধিত, পীড়িত সন্তান দিগকে নিজ বক্ষে টানিয়া আনিয়া বলিতে হইবে—"আয় বাছারা! দুঃখ কি তোদের? আমি যে তোদের মা!" জগতের কোটী কোটী সন্তানের মধ্যে আপনাকে তিল তিল করিয়া বিলাইয়া দেওয়ার নাম মাতৃত্ব। বন্ধ্যা নারীও এই মাতৃত্বর গৌরব লাভ করিতে পারেন। সন্তান জন্মিলেই বন্ধ্যা নাম ঘুচেনা। যাহার মাঝে মা জাগেনা, ডজন খানিক ছেলে পিলের জননী হইলেও তিনি বন্ধ্যা। তিনি মা নন।

মাতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য সর্ব্ব প্রকার কষ্ট সহিতে পারেন। যে মাতার হৃদয়ে সর্ব্বদা স্নেহের প্রস্রবণ বহিয়া থাকে কর্ত্তব্যানুরোধে আবার সেই স্নেহের স্নিগ্ধ ধারাকে উষ্ণ ধারায় পরিণত করিয়া, মাতা আপনাকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। পুত্র গত প্রাণা শচী দেবী নিমাইকে একদণ্ড না দেখিলে অধীর হইয়া পরিতেন। সেই নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে সন্ন্যাস ত্যাগ করিতে অনুরোধ করায় তিনি বলিয়া ছিলেন, "আমার মা যদি বলেন, আমি [illegible]ই সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিব।" সকলে এজন্য শচী দে[illegible]ক অনুরোধ করিলে, তিনি বলিয়া ছিলেন, "সন্ন্যাস ত্যাগ [illegible]লে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট

হইবে, আমি মা হইয়া নিজের স্বার্থের জন্য তাহাকে এমন কথা বলিতে পারিনা।" কয় জন মাতা ইহা বলিতে পারেন?

ধাত্রী পান্না তাহার একমাত্র স্নেহের অবলম্বন শিশু পুত্রটীকে বধ করিবার জন্য ঘাতকের হস্তে অর্পন করিয়া, রাজপুত্র উদয় সিংহের প্রাণ রক্ষা করিয়া ছিলেন। এই মহান ত্যাগের জন্য তাহার কীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে ইতিহাস পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। আত্মত্যাগই প্রেমের মহত্ব, সতীর সতীত্ব মাতার মাতৃত্ব।

প্রেমের-পরশ

[বেলা গুহ]

তোমার পরশ আজি পেয়েছি প্রাণে,
ঝঙ্কারে বীণা তাই সুমধুর তানে।
শূন্য এ ঝুলি মম
ভরিল হে প্রিয়তম
তোমার এ অনুপম প্রেমের দানে।
তোমার পরশ আজি পেয়েছি প্রাণে॥

ঘুচেছে বেদনা জ্বালা, দুঃখরাশি,
বিরহ বিধুর প্রাণে ফুটেছে হাসি।
মরম-দুঃখ-ভার
গোপন অশ্রু-ধার
বহিতেছে অনিবার তোমার পানে।
ধরণী ধ্বনিত করি হরষ গানে॥

নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ

[শ্রীপ্রমথনাথ মজুমদার]

(১০ম স্তবক)

মহাপ্রভু জীবকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা চির-কাল ধর্ম্মজগতের উজ্জ্বল আলোক-স্তম্ভ রূপে প্রকাশমান থাকিয়া সাধন [illegible] বিভ্রান্ত পথিককে সুদীপ্ত ঋজু পথ দেখাইয়া দিবে। স্ত্রী-সঙ্গ বর্জ্জন তাঁহার অনুশাসনের অন্যতম—প্রধান [illegible] বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ভক্তি বিরোধী বলিয়া তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য। সনাতনকে শিক্ষাদান কালে প্রভু বলিতেছেন—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণভক্ত আর॥

এই অনুশাসন তিনি নিজে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পর

নিত্যানন্দ যখন তাঁহাকে যমুনা ভ্রমে গঙ্গাতীর পথ দেখাইয়া অদ্বৈতগৃহে আনিয়াছিলেন তৎকালে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা আর সকলেরই শান্তিপুর লইয়া যাইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন—স্বধু একজন ব্যতীত।

প্রভু যাঁহার হৃদয় সর্ব্বস্ব জীবন-সম্বল কেবল তিনিই তাঁহার দর্শনের অধিকারী ছিলেন না। তিনি শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া। সন্ন্যাসীর যে স্ত্রী সম্ভাষণ দর্শণ পর্য্যন্ত নিষেধ। সন্ন্যাসী যে "স্ত্রী" শব্দও মুখে আনিবেন না প্রকৃতি বলিবেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে জীব সংসার দূরে রাখিয়া বিষয় ছাড়িয়া সাধন পথে দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার স্বধু এক লক্ষ্য এক উদ্দেশ্য। যিনি সন্ন্যাস লইতে পারিয়াছেন তিনি তো অনেকদুর অগ্রসর। তাঁহার আচরণ জীবের আদর্শ। সন্ন্যাসীর কিঞ্চিন্মাত্র স্খলন হইলে ধর্ম্মের ভাস্বর জ্যোতি যে মলিন হইয়া যাইবে। সন্ন্যাসী জগৎগুরু—তিনিই জীবকে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। প্রভু গৃহস্থাশ্রমী কোন ভক্তকে সন্ন্যাস লইতে বলিতেন না। "বৈষ্ণব-সেবা নাম সঙ্কীর্ত্তণ" এই তাঁহার অমূল্য উপদেশ। গৃহই তাহার উপযুক্ত স্থান। ** মহাপ্রভুর অগণিত ভক্ত বৃন্দের মধ্যে শ্রীবাসাদি গৃহী ভক্তের স্থান অতি উচ্চে। বৈষ্ণব কুলতিলক ত্যাগ বৈরাগ্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস যখন অতুল ঐশ্বর্য্য ও পিতামার স্নেহ বন্ধন হইতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্ত হইয়া শান্তিপুর অদ্বৈত ভবনে প্রভুর চরণতলে উচ্ছ্বশিত হৃদয় বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন প্রভু তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে জীবকে শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন—

"স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু কূল॥
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথা যোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবে উদ্ধার॥

মহাপ্রভুর নীলাচল লীলায় "হরিদাস বর্জ্জন" এক পুণ্য কাহিনী, তাহার গূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে অপারগ হইয়া অনেকে মহাপ্রভুর বিচারে কঠোরতা আরোপ করিয়া থাকেন। এই কাহিনী আরম্ভের পূর্ব্বে তাই এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইল।

ছোট হরিদাস সংসার ত্যাগী বৈষ্ণব। মহাপ্রভুর নিত্য সঙ্গী। হরিদাস স্বকণ্ঠ, তিনি নীলাচলে প্রভু সঙ্গে থাকিয়া সতত তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। বোধ হয় নাম যজ্ঞের মহাসাধক মহাপ্রভুর পার্ষদ ও পরম প্রেমিক নীলাচলবাসী ঠাকুর হরিদাস সহিত পৃথক বুঝাইবার জন্য এই আখ্যানোক্ত হরিদাস "ছোট হরিদাস" নামে পরিচিত ছিলেন। ভগবান আচার্য্য নীলাচলবাসী প্রভুর অন্যতম ভক্ত। তিনি একদিবস প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আচার্য্য ছোট হরিদাসকে মাধবী মাহিতী হইতে প্রভুর ভিক্ষার জন্য কিছু উত্তম তণ্ডুল আনিতে বলেন। হরিদাস দ্বিধা বিহীন চিত্তে তণ্ডুল আনয়ন করেন। এই মাধবী মাহিতী গৌরগত-প্রাণা তপস্বিনী তুল্যা এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবী। প্রভুর সাড়ে তিনজন মর্ম্মী ভক্ত মধ্যে এই রমণী অন্যতমা। স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে অর্দ্ধজন গণনা করা হয়। প্রভু ভোজনে বসিয়া শাল্যান্ন দৃষ্টে আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন এত উত্তম তণ্ডুল কোথায় পাইলে? আচার্য্য বলিলেন মাধবী হইতে মাগিয়া আনিয়াছি। প্রভু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "কে যাইয়া মাগিয়া আনিল" আচার্য্য নির্ভয়ে উত্তর দিলেন—"ছোট হরিদাস।" প্রভু আর কোন বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। অন্নের প্রশংসা করিয়া ভোজন সমাধান করিলেন। নিজ গৃহে আসিয়া গোবিন্দকে আজ্ঞা দিলেন—

"আজি হইতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥"

আকস্মিক বজ্রপতনের ন্যায় মহাপ্রভুর আদেশবাণী হরিদাসের শিরে পতিত হইল। কি জন্য দ্বারমানা হইল কেহই বুঝিতে পারিলেন না। হরিদাস নিজ জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া কোন অপরাধের কার্য্য খুঁজিয়া পাইলেন না। মর্ম্মান্তিক ক্লিষ্ট হইয়া তিনি আহার পরিত্যাগ করিলেন স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

** ঠাকুর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব) বলিতেন (গৃহে থাকিয়া সাধন ভজন) "কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করা।"

যেয়। ব্রহ্মা হইতে যে রূপে আবির্ভূত হইয়াছে চিরদিনই সেইরূপে সেইভাবে অপরিবর্ত্তনীয় হইয়াই আছে। অপৌরুষেয়ত্ব হেতু কেহই উহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত কিছু দেখিতে পান না। উহা সনাতন এবং একভাবেই যুগযুগান্তর চলিয়া আসিতেছে। তাই বলিয়া বেদে যে অবতারের উল্লেখ একেবারেই নাই তাহা নহে। কৃষ্ণ যজুঃসংহিতায় সপ্তমকাণ্ডে আদি অবতার বরাহের কথা আছে। যথা :—

আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ তস্মিন্ প্রজাপতিবায়ু র্ভূত্বাচরৎ স ইমামপশ্যৎ তাং বরাহোভূত্বা হরৎ তাং বিশ্বকর্ম্মা ভূত্বা ব্যমার্ট সা প্রথত সা পৃথিব্যভবৎ॥

এতদ্ব্যতীত আমরা বেদে অন্য স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ না দেখিলেও অবতারের সূচনা বুঝিতে পারি। সমগ্র বেদ তিন ভাগে বিভক্ত সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও আরণ্য বা উপনিষদ্। বেদে সর্ব্বসাকুল্য ৩৩টী দেবতা আছেন দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়। সংহিতাংশে এই সব দেবগণের স্তোত্র পরিগীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে গদ্যাকারে যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় লিখিত আছে এবং আরণ্য বা উপনিষদে নিরাকার নির্ব্বিকার, নিগুর্ণ পরব্রহ্মের আলোচনা হইয়াছে। মূলতঃ কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়াই বেদ। কর্ম্মকাণ্ডে সগুণব্রহ্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে নিগুর্ণ ব্রহ্মের অনুশীলন দেখা যায়। কর্ম্মকাণ্ডেই দেবতাদিগের প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে। দেবগণ সেই ব্রহ্মেরই এক একটী শক্তি বিশেষ। সগুণ সৃষ্টির পরিচালনের জন্য যে যে শক্তির প্রয়োজন তাহাই এক একটী দেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। জল, বায়ু, উত্তাপ, আলোক প্রভৃতির একএকটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মের মূর্ত্তিমতীশক্তি। ব্রহ্ম সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশমান শক্তি নিচয়ের কেন্দ্রস্বরূপ। অবতার শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ উপর হইতে নিম্নে আগমন। নিগুর্ণ ব্রহ্ম সর্ব্বোচ্চ। সগুণ ব্রহ্ম তাহারই পরিণাম অর্থাৎ দ্বিতীয় ভূমি সুতরাং প্রথম ভূমি হইতে নিম্নতর। বেদ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞদ্বারা এই সকল দেবতার অর্চ্চনা করিতে বলিয়াছেন। যজমানকে বর প্রদানার্থ তাঁহারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এ কথাও বেদে উল্লিখিত আছে। ঐশী শক্তির দর্শন, স্পর্শন ও শ্র[illegible]যোগ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইবার যদি সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলে প্রয়োজন হিসাবে সেই মূর্ত্তি লইয়া প্রজামধ্যে বিচরণ কেন না সম্ভব হইবে? সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে অবতারের আবির্ভাব যে সম্ভব তাহা বেদ বরাহাবতারের উল্লেখদ্বারা মুখ্যভাবে এবং দেবতপ্রসঙ্গে গৌণভাবে স্বীকার করিতেছেন। তৎপরবর্ত্তী দার্শনিকযুগে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদ প্রচার দর্শনকারগণের উদ্দেশ্য হইলেও সগুণকে কেহই নির্ব্বাসিত করেন নাই। ষড়দর্শনের মধ্যে পতঞ্জলির যোগ, কপিলের সাংখ্য ও বাদরায়ণের বেদান্তই প্রসিদ্ধ। পতঞ্জলি মহামুনি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে পাণিনি পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনিকৃত বর্ণমালা সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে পাণিনি শিবের আরাধনা করিয়া বর প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারই কৃপায় এই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ রচনা করেন। শিব মূর্ত্তি ধরিয়া সাধকের উপর সিদ্ধিস্বরূপ আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহার তপশ্চর্য্যার উদ্দেশ্য জানিয়া স্বহস্তস্থিত ডমরুধ্বনি হইতে পাণিনির বর্ণমালা প্রকাশ করেন। সকলেই অবগত আছেন এই বর্ণমালা আধুনিক বর্ণমালার অনুরূপ নহে। উহার বিন্যাস ও প্রক্রম অন্যরূপ। এবং মনসংযোগপূর্ব্বক উদাত্তাদিস্বরে ঐ বর্ণমালা উচ্চারিত হইলে অবিকল ডমরুধ্বনি হইতে থাকে। আমরা নিজে উচ্চারণ করিতে না পারিলেও অপরের মুখে স্বকর্ণে ঐ ডমরু ধ্বনির অনুরূপ বর্ণোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। জনশ্রুতি ছাড়িয়া অষ্টাধ্যায়ীর নিজের কথা উল্লেখ করিতেছি পাণিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—"এতানি মাহেশ্বরাক্ষরানি।" ঐ বর্ণমালা যে অমানুষী তাহা পাশ্চাত্য সুধীবর মোক্ষমুলারের সমালোচনা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয়। তিনি বলিয়াছেন অষ্টাধ্যায়ীর বর্ণমালার বিন্যাসে যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রম দৃষ্ট হয় জগতের কোন জাতির কোন বর্ণমালায় তাহা দৃষ্ট হয় না। মানুষের ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতে ক্রমশঃ স্বর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন বাকশক্তির স্ফুরণ হয় পাণিনির বর্ণমালা ঠিক সেইক্রমেই সজ্জিত। যাহা হউক "ধান ভানিতে শিবের গীত" লইয়া থাকিলে চলিবে না ; তবে

তাহার অবতারণায় এইটুকু প্রয়োজন যে শিবের আরাধনায় যদি পাণিনি ঐ বর্ণমালা পাইয়া থাকেন তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে পাণিনির সময়েও অবতারবাদ অপ্রচলিত ছিল না। সুতরাং পতঞ্জলিখানিও যে অবতারবাদের সংবাদ না রাখিতেন তাহা নহে। বিশেষতঃ অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে আমরা "ধ্যান" স্তর বা অঙ্গ দেখিতে পাই। এই "ধ্যানাঙ্গ" সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই অরূপের রূপবত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। অরূপ বস্তু কখন ধ্যেয়রূপে কল্পিত হইতে পারে না।

সাংখ্যকার কপিল সর্ব্বকালব্যাপী এক নিত্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও এককল্পব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ সকলের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে "প্রকৃতি-লীন" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ ইঁহারা পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের তপস্যার প্রভাবে মুক্ত হইয়াও নির্ব্বাণ পদবীতে অবস্থান করেন না। প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকেন, বা প্রকৃতিগত সমস্ত শক্তিই তাঁহাদের শক্তি এই প্রকার বোধে এককল্পকাল অবস্থান করেন এজন্য ইঁহাদের মধ্যে যিনি যে কল্পে ঐরূপ শক্তি সম্পন্ন বলিয়া আপনাকে অনুভব করেন তিনিই সেই কল্পে অপর সাধারণের নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কপিলও মূর্ত্ত অর্থাৎ সাকার ঈশ্বর স্বীকার করিতেছেন। বেদান্তকার একমাত্র ঈশ্বর পুরুষের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এবং তিনিই জীব ও জগৎরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন বলিয়া ঐ সকল বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষদিগকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ অংশভূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, এই পুরুষগণ লোককল্যাণকর এক একটী বিশেষ কার্য্যের জন্যই আবশ্যকমত জন্মগ্রহণ করেন এবং তদুপযোগী শক্তিসম্পন্ন হইয়া আসেন দেখিয়া ইঁহাদিগকে "আধিকারিক" নাম প্রদান করিয়াছেন অর্থাৎ কোন একটী কার্য্যবিশেষের অধিকার বা তৎসম্পাদনার্থ ভার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপ পুরুষেরও আবার উচ্চনীচ শক্তির প্রকাশ দেখিয়া এবং ইহাদের কাহার কার্য্য সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের জন্য এবং কাহারও একটী দেশের কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত দেখিয়া প্রথমোক্ত পুরুষকে "ঈশ্বরাবতার" এবং শেষোক্ত পুরুষকে সামান্য অধিকার প্রাপ্ত "নিত্যমুক্ত ঈশ্বর কোটি" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

তৎপরে মহাকাব্য বা ইতিহাসের যুগে আসিয়া আমরা দেখি রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থেই অবতারবাদ পূর্ণ মাত্রায় প্রচলিত হইয়াছে। রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বতন বাল্মীকিকৃত রামায়ণের বর্ণিত বিষয়ই ভগবানের শ্রীরামরূপে অবতার। আদিকাণ্ডের ১৬শ সর্গে লিখিত আছে :—

মানুষং রূপমাস্থায় রাবণং জহি সংযুগে ॥ ৩ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মার বরে বলোদ্ধত রাবণ ত্রিভুবন বিত্রাসিত করিতেছে দেখিয়া এবং সেই রক্ষোরাজ সুরাসুরবধ্য নহে জানিয়া পিতামহকে পুরস্কৃত করিয়া দেবগণ বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া ঐ বাক্যে তাঁহাকে মানুষরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে নিধন করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন।

ত্রেতাযুগে শ্রীরামাবতারে রাবণ ও কুম্ভকর্ণবধ যদি স্বীকৃত হইল তাহা হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সত্যযুগে বরাহ ও নৃসিংহ অবতার এতদ্দ্বারাই সূচিত হইতেছে। কারণ এই রাবণ ও কুম্ভকর্ণই পূর্ব্বজন্মে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপুরূপে উদ্ভূত হইয়া ভগবানের বরাহ ও নৃসিংহ অবতার কর্ত্তৃক নিহত হয়। সূচনা ব্যতীত রামায়ণে বরাহ অবতারের স্পষ্ট উল্লেখই দৃষ্ট হয়। বশিষ্ঠ লোকোৎপত্তি বর্ণনাকালে বলিতেছেন :—

"স বরাহ স্ততোভূত্বা প্রোজ্জহার বসুন্ধরাং ॥

অযোধ্যা ।১১০।৪

পুনশ্চ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধানন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীরামের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীরামের স্বরূপ প্রতিবোধনার্থ ব্রহ্মা সেই সময় যে স্তব করেন তাহাতে বলিতেছেন :—

"একশৃঙ্গো বরাহস্তং ভূত ভব্যসপত্নজিৎ ॥"১১৯।৬

এস্থলে "একশৃঙ্গ" শব্দের প্রয়োগ হইতে আমরা মীনাবতারও ধরিয়া লইতে পারি। এতদ্ব্যতীত রামায়ণে বামন ও কূর্ম্মাবতারের উল্লেখও আছে। যথা :—

অথ বিষ্ণুর্মহাতেজা আদিত্যাং [illegible]য়ত।

বামনং রূপমাস্থায় বৈরচনিমুপা[illegible] ॥

[illegible]বালি ।২৯।১৯

এবং—

"কোন অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বার মানা করে উপবাস॥

প্রভু উত্তরে বলিলেন—

"—বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।"
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥"

আর একদিন সকল ভক্ত একত্রে প্রভু সকাশে আগমন করিয়া হরিদাসকে ক্ষমা করিতে কাতরে প্রার্থনা করিলেন।

"অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ
এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ॥"

কিন্তু যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপ্রভু নির্ম্মম হইয়া উত্তর দিলেন—

"—কভু নহে বশ মোর মন।
প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

পরে বলিলেন "তোমরা আর বৃথা কথা বলিও না যদি আবার এ সম্বন্ধে কিছু বল আমাকে আর নীলাচলে দেখিতে পাইবে না।" ভক্তগণ ভীত হইয়া প্রস্থান করিলেন। হরিদাসের দণ্ডের ফলে ভক্তগণের এক ত্রাস উপস্থিত হইল।

"স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষণে"

চৈতন্য চরিতামৃত ঠিক্ই বলিতেছেন—

"মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে।
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম বুঝাইতে॥"

হরিদাস প্রভু কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া জীবন দুর্ব্বিষহ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। প্রভু জগন্নাথ দর্শনে যান হরিদাস দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করেন। অনুতাপানল তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল—মহাপ্রভুর অদর্শনজনিত বিচ্ছেদ অসহনীয় হইল। তিনি একদিবস রাত্রিশেষে গোপনে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। ত্রিবেণীতে জাহ্নবী নীরে দেহত্যাগ করিয়া হরিদাস অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ইহার অনতিকাল পর একদিন প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে সমুদ্র স্নানে চলিয়াছেন পথিমধ্যে অশরীরি কণ্ঠে অতি সুমধুর কীর্ত্তন শ্রবণে সকলে বিস্মিত হইলেন। হরিদাসের কণ্ঠস্বর সকলেরই সুপরিচিত। গোবিন্দাদি অনুমান করিলেন হরিদাস আত্মগ্লানিতে বিষাদি ভক্ষণ করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছেন এবং অসৎযোনী প্রাপ্ত হইয়া নিরালম্বে ভ্রমন করিতেছেন। স্বরূপ বলিলেন ইহা তোমাদের মিথ্যা অনুমান।

"আজন্ম কৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রভুর সেবন।
প্রভুর কৃপা পাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ॥
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি সে হয়।
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয়॥"

ইতিমধ্যে প্রয়াগ হইতে কোন বৈষ্ণব নবদ্বীপে আইসেন এবং তিনি হরিদাসের গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগের বিবরণ সকলকে জানান। বর্ষান্তরে শ্রীবাসাদি গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচল আসিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু, হরিদাস কোথায়?" মহাপ্রভু উত্তর করিলেন। "স্ব কর্ম্ম ফলভাক্ পুমান্।" শ্রীবাস তখন হরিদাসের সংকল্প, ত্রিবেণী প্রবেশ প্রভৃতি বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন প্রভু শুনিয়া সুপ্রসন্নচিত্তে বলিলেন

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"

দেহত্যাগের পর হরিদাস জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্ম শরীরে যে মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদরূপে অবস্থান করিতেছিলেন তাহা তাঁহার অশরীরি কণ্ঠের কীর্ত্তনদ্বারাই ভক্তগণ সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

এক দিবস প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতে সুমধুর কণ্ঠে গীত-গোবিন্দের পদ শুনিয়া আবিষ্টচিত্তে গীত লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হ'ন। কণ্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষত হইল কিন্তু প্রভু তন্ময় হইয়া ছুটিয়াছেন, বাহ্যজ্ঞান নাই আস্তেব্যস্তে ভৃত্য গোবিন্দ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

"স্ত্রী গান বলি গোবিন্দ কৈল কোলে॥"

মহাপ্রভু তখন গোবিন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারিতেন ত্রিভুবনে আর কেহ বলিতে পারিতেন না।

"প্রভু কহে গোবিন্দ আজ রাখিলে জীবন।
স্ত্রী পরশ হইলে আমার হৈত মরণ॥"

এই মহাপ্রভুর ধর্ম্ম। এই আদর্শ এই শিক্ষা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভুর লীলাপ্রসঙ্গ অধুনা অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছে। সমাজের স্তরে স্তরে সে লীলার স্নিগ্ধ ধারা মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া বিশ্বাসী অবিশ্বাসী, ভক্ত, অভক্ত প্রায় সকলকেই অভিষিক্ত করিতেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী বঙ্গীয় যুবকও মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও শিক্ষার সম্মুখে আজ সম্ভ্রমে নতশীর্ষ। অনেকেই এইক্ষণ বুঝিতে পারিতেছেন মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও তাহার অনুশীলনকারী ভোগলালসাবর্জ্জিত তীব্র বৈরাগ্যপন্থাবলম্বী সর্ব্বজনবরেণ্য উদাসী বৈষ্ণব ও বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে উদ্দাম ভোগবিলাসস্রোতে ভাসমান নিত্য যোষিৎ সঙ্গে কলুষিত চিত্ত নব সম্প্রদায় যাহারা বৈরাগী নামে অভিহিত হইয়া সেই পরম পবিত্র নামে কলঙ্ক আনিতেছে এতদুভয়ে কত প্রভেদ !! এই সম্প্রদায় প্রভুর শিক্ষা বা ধর্ম্মের ফল নহে এবং কখনও হইতে পারে না। এই সমাজকলঙ্ককারী নব সম্প্রদায় মহাপ্রভুর জগতপাবন সুমহান ধর্ম্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নির্লজ্জভাবে তাঁহার পবিত্র নাম মুখে উচ্চারণ করতঃ সহজলব্ধ ভিক্ষান্নে ঘৃণ্য জীবন বহন করিয়া থাকে। ইহারা গৃহীর দায়িত্বপূর্ণ পবিত্র ধর্ম্ম পালনে পরাঙ্মুখ বৈষ্ণবের ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতেও একান্ত অক্ষম। ইহারা এক মধ্য পথ অবলম্বন করিয়া উভয় আশ্রমের শুভ্রোজ্জ্বল ললাটে মসী লেপন করিতে উন্মুখ। বিষয়াশক্ত, সতত কামিনী কাঞ্চনে পরিবৃত কাহাকেও বৈরাগী বলা যাইতে পারে না। এই নব সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ দৈনন্দিন জীবন বহন প্রণালী দর্শনে ব্যথিত চিত্ত কেহ যদি বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন ধারণা পোষণ করেন তাহা যে কেবল ভ্রমাত্মক হইবে তাহা নয় তজ্জনিত গুরু অপরাধও তাঁহাকে স্পর্শ করিবে সন্দেহ নাই।

অবতারবাদ

[শ্রীস্মরজিৎ দত্ত,]

শ্রীমদ্ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮.

এই ভগবদুক্তি হইতেই অবতারের মূল প্রয়োজন বুঝা যাইতেছে। যখনই ধর্ম্মের বিপর্য্যয় হয় তখনই ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই অবতার। সেই আদি বরাহ হইতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যত অবতার সকলেরই যে ঐ একই উদ্দেশ্য তাহা একটু মনঃসংযোগ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে দেখা যাউক এই অবতারবাদ ভারতীয় ধর্ম্ম সাহিত্যে কতদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ বৈদিকযুগের আলোচনা করিলে দেখা যায় বেদে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের বহুল প্রচার থাকিলেও অবতারের উল্লেখ অত্যন্ত বিরল। বেদের উৎপত্তি বিষয় চিন্তা করিলে বলিতে হইবে বেদে অবতার প্রসঙ্গ না থাকাই যুক্তিসিদ্ধ। কারণ সৃষ্টির প্রথমে বেদ ব্রহ্মা হইতে আবির্ভূত হয়। সে সময় অন্যান্য সৃষ্টি কিছুই হয় নাই। সুতরাং সে সময়ে ধর্ম্ম বিপ্লবের কোন কারণ ছিলনা। সুতরাং ভগবানের অবতারের কোন প্রয়োজন না থাকাই সম্ভব। সুতরাং বেদ ব্যতিরিক্ত লৌকিক গ্রন্থেই অবতার প্রসঙ্গ থাকা স্বাভাবিক। বেদ কোন লোকের রচিত নহে উহা অপৌরু-

ইতি শ্রুত্বা হৃষীকেশঃ কার্মঠং রূপমাস্থিতঃ।
পর্ব্বতং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা শিশ্যে তত্রোদধৌ হরিঃ॥

ঐ।৪৫।২৯

মহাভারত শ্রীকৃষ্ণাবতারের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মুক্তকণ্ঠে যে অবতারবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমেই তদুক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণের উল্লেখ মহাভারতের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি —

১। মৎস্যরূপেণ যুয়ঞ্চ ময়াস্মান্মোক্ষিতা ভয়াৎ॥

বন।১৮৭।৫২

২। ভূত্বা যজ্ঞবরাহো বৈ অপঃ সংপ্রাবিশৎ প্রভুঃ।
দংষ্ট্রৈনৈকেন চোদ্ধৃত্য স্বে স্থানে ন্যবিশন্মহীম্॥

ঐ ২৭১।৫৫

৩। নারসিংহেন বপুষা দারিতঃ করজৈর্ভূশম্॥

ঐ।৬০

৪। এষতে বামনো নাম প্রাদুর্ভাবঃ প্রকীর্ত্তিতং॥

ঐ।৭০

৫। স এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ কৃষ্ণেতি পরিকীর্ত্ত্যতে॥

ঐ।৭২

৬। মহাভারতে রামায়ণ বর্ণনা দ্বারা রামাবতার স্বীকৃত হইয়াছে। সেই প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলা হইয়াছে :—

তদর্থ মবতীর্ণোহসৌ মন্নিয়োগে চতুর্ভুজঃ।
বিষ্ণুঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স তৎকর্ম্ম করিষ্যতি॥

বন।২৭৫।৫

৭। আদিপর্ব্বের ১৮শ অধ্যায়ে অমৃত মন্থন প্রসঙ্গে কূর্ম্মের উল্লেখ আছে।

তদনন্তর পৌরাণিক যুগের ত আর কথাই নাই। প্রত্যেক অবতারের নামানুসারে এক একখানি স্বতন্ত্র পুরাণই লিখিত হইয়াছে। এতাবতায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে এই অবতার বাদ সেই বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে।

এক্ষণে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের সাকার ও সগুণ রূপে আবির্ভূত হইয়া প্রক্রমধ্যে বিচরণ করা সম্ভব কিনা তাহাই আলোচনা করা [illegible]ক এবং এই সঙ্গে ঐরূপ অবতার স্বীকারের প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে কি না তাহাও বিবেচ্য। বেদে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি তদ্ ব্রহ্মেতি॥

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ, তৃতীয় বল্লী,
প্রথম অনুবাদ।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই ভূতনিচয় জাত হয়, যদ্দারা জাত ভূতগণ জীবিত থাকে এবং অন্তে যাঁহাতে প্রবেশ করে তিনিই ব্রহ্ম। সুতরাং দেখা যাইতেছে এই জীবজড়াত্মক বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াও ব্রহ্ম স্বয়ং নির্গুণ। ত্রিগুণময়ী মায়ার সাহায্যে এ বিশ্ব রচিত হওয়াতেই তাহা সগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ হইয়াছে।

এতাবানস্য মহিমহতো জ্যায়াঁযশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত ৩

অর্থাৎ শ্রুতি বলিতেছেন, নির্গুণ হইতে সগুণের আবির্ভাব এবং ব্রহ্ম সগুণ হইয়াও নির্গুণ সত্তায়ও অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সেই নির্গুণ অবস্থা মায়াতীত বলিয়া সগুণ সম্বন্ধে তিনি জ্ঞানাতীত। সৃষ্টি প্রকরণে ভগবানের যতটুকু অংশ প্রযুক্ত হইয়াছে, জীব তাহাও সম্পূর্ণ জানিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টির অন্তর্গত হইয়া সৃষ্টির বহির্ভূত অতিপ্রাকৃত বিষয়ের ধারণা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ বলিয়া যাহা তাহার জ্ঞান গণ্ডীর বাহিরে তাহার প্রকাশ সে আদৌ বুঝিতে পারে না। স্বামী-শিষ্য সংবাদে বিবেকানন্দ বলিতেছেন :—"আত্মজ্ঞান যাঁদের কৃপায় এক মুহূর্ত্তে লাভ হয়, তাঁহারাই সচলতীর্থ অবতার পুরুষ; তাঁরা আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞ; ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞে কোন তফাৎ নেই। মানুষের জানাজানি এই অবতার পর্য্যন্ত। মানব বুদ্ধি ঈশ্বর সম্বন্ধে highest ideal যাহা গ্রহণ কর্ত্তে পারে তাহা ঐ পর্য্যন্ত।" ৮২ পৃঃ

একখানি মুকুরে যদি তদপেক্ষা বৃহত্তর কোন বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় তাহা হইলে মুকুরের আকৃতি অনুসারে বিম্ব অংশতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমস্ত পূর্ণরূপে তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। সেইরূপ জীব সম্বন্ধে নির্গুণ, নিরাকার

ব্রহ্ম সগুণ সাকাররূপেই তদীয় চিত্তমুকুরে প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং ঐরূপ হওয়াই সম্ভব ও উচিত। কেন না সাকার সান্ত বস্তুতে চিত্ত যেমন দৃঢ় হয় নিরাকার অনন্তে তদ্রূপ স্থির হইতে পারে না। আশ্রয়হীন অবস্থায় চিত্ত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়। সেরূপ অবস্থায় ধ্যানের প্রগাঢ়তা বা গভীরতা সম্ভব হয় না। চিত্তকে একটি বিষয়ে নিবিষ্ট করিতে হইলে সে যাহাতে বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারে এইরূপ কোন মূর্ত্তিরই প্রয়োজন। অবতারবাদদ্বারা এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে মূর্ত্তিতে চিত্তনিবেশ অভ্যাস করিয়া যখন ধ্যানের গভীরতা হয় তখন সবিকল্প সমাধি হইতে ক্রমে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উন্নীত হইতে পারা যাইবে। এই নির্ব্বিকল্প সমাধিই নিরাকার, অখণ্ড ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি বা তন্ময়তা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সাধকল্প সমাধি পর্য্যন্ত দ্বৈত ভাব আছে। ঐ দ্বৈতভাব পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে অহং তত্ত্বের লোপ হইবে। অহং লোপের সঙ্গে সঙ্গেই তন্ময়ত্ব বা স্বরূপে বিলয়। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি জীবের চরম লক্ষ্য হইলেও যতক্ষণ সৃষ্টি সংক্রান্ত সগুণের মধ্যে জীব থাকে ততক্ষণ তাহার অহংজ্ঞান থাকায় নির্গুণত্ব বা গুণাতীত অবস্থা অসম্ভব। সুতরাং সগুণ ও সাকার হইতে আরম্ভ করিতেই হইবে। নিরাকারত্ব ও নির্গুণত্ব ব্রহ্মের স্বরূপ হইলেও তাহা জীবের চরম পরিণতি। সুতরাং অধিকারী ভেদে সগুণ ও নির্গুণোপাসনার ব্যবস্থা। কিন্তু নির্গুণের উপাসনা অত্যল্প সাধকেরই সম্ভব। যাঁহারা সবিকল্প সমাধীতে আরূঢ় হইয়াছেন তাঁহাদেরই জন্য চরম সাধনা—শেষভূমি নির্ব্বিকল্প সমাধি। ইহার নিম্নস্তরে স্থিত জীবনিচয়ের দ্বৈতজ্ঞানই দূর হয় না। দ্বৈতের মধ্যে থাকিয়া অদ্বৈতচিন্তা অসম্ভব এবং নিস্ফল। এই দ্বৈত বুদ্ধি পরিপুষ্টির জন্যই অবতারবাদ। ইহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। এই সাকার উপাসনা হইতে আরম্ভ করা সাধকের পক্ষে সুকর। এই জন্যই গীতায় অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে ভগবান বলিতেছেন :—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥১২। ২

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ঐ ৫

দর্শনাদিতে যে নিরাকারবাদের প্রচলন আছে তাহা দর্শনকারগণের স্বানুভূত জ্ঞান। তাঁহারা সমাধিযোগে নিজেরাই আত্মানুভূতি উপলব্ধি করিয়াছেন। অন্যের নিকট শ্রবণ করিয়া অব্যক্তের কোন ধারণাই হয় না। নিজে অভ্যাস করিয়া অনুভব করিতে হয়। এইজন্য উহার নাম দর্শন অর্থাৎ নিজ প্রত্যক্ষীকরণ সাপেক্ষ। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতবর্গ বিবিধ তর্কের অবতারণা করিয়া সূক্ষ্ম বিচার শক্তির সাহায্যে দর্শনশাস্ত্র বর্ণিত ব্রহ্মের স্বরূপ প্রমাণিত করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞ হয়েন না। কারণ ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপবোধ জ্ঞান ও বুদ্ধিসম্মত হইলেও নিজানুভব ব্যতীত প্রকৃতজ্ঞান নহে। ভগবান্ আছেন; তিনি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ ও আনন্দময় ইহা বিচার বলে স্বীকার করিলেও তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভূত না হইলে কোন ফলোদয়ই হয় না। ভগবদারধনার মূল উদ্দেশ্যই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া ও তজ্জনিত আনন্দানুভব। শুষ্ক জ্ঞানে কোন তৃপ্তি হয় না। উহা নিতান্তই মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয়, প্রাণের বা হৃদয়ের নহে। সুতরাং ব্রহ্মের নিরাকারত্ব স্বীকার করিয়া আমার কি ফল? অথবা তাহা অপরকে বুঝাইতে মস্তিষ্ক বিকৃত করিবার প্রয়োজন কি? যাহাতে তাঁহাকে উপভোগ করিতে পারি সেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন থাকিতে পারি তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা তর্ক সাপেক্ষ নহে; সাধনদ্বারা নিজবোধগম্য। সার্ব্বভৌমের মত নৈয়ায়িক, প্রকাশানন্দের মত বৈদান্তিক অনেক আছেন। তাঁহারা যে বিচার বলে ব্রহ্মের নিরাকারত্ব ও নির্গুণত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন তাহার কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু তাঁহারা রসাস্বাদন করেন নাই; রসাস্বাদন বুঝি তাঁহাদের ভাগ্যেও নাই। তাঁহারা রস পরিত্যাগ করিয়া ইক্ষুলতাস্থিচর্ব্বন করেন; রসালের অস্থি চোষণই তাঁহাদের সার। অদৃষ্ট তথা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অমৃতের বিবরণ পাঠে যতটুকু পরিতৃপ্তি তাহাই তাঁহাদের লভ্য। ফলতঃ প্রকৃত অমৃত বহুদূরে অবস্থিত। তাহার সন্ধান অজ্ঞেয়। উপনিষদ দর্শনাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহারা গ্রন্থ [illegible]ই নিয়া থাকেন।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন পাঁজিতে আছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজী নিংড়াইলে এক ফোঁটাও বাহির হয় না। অধুনাতন বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িকগণ এই পঞ্জিকা সদৃশ। পঞ্চদশীকার নারদের জীবনে ইহা দেখাইয়াছেন :—

সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রানি বিবিধানি চ।
জ্ঞাত্বাপ্যর্নাত্মবিত্ত্বেন নারদোঽতি শুশোচহ ॥
বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোধিতা।
পশ্চাদ্ব্ভ্যাস বিস্মার ভঙ্গ গর্ব্বৈশ্চ শোধিতা ॥

এইরূপ নীরস পণ্ডিতদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবত বলিতেছেন :—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধ লব্ধয়ে।
তেষা মসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥ ভাঃ ১০।১৪।৪

পুনশ্চ—শব্দ ব্রহ্মাণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ঠয়া পেরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনু মিব রক্ষতঃ ॥১১।১১।১৮

পুঁথীগত বিদ্যাই জীবনের চরম লক্ষ নহে। "রসো বৈসঃ" এই লক্ষণোপলক্ষিত সচ্চিদানন্দের উপলব্ধিই জীবনের উদ্দেশ্য সুতরাং যাহাতে সেই অমৃতময়ের অমৃতের আস্বাদ লাভ হয় তাহারই চেষ্টা শ্রেয়স্কামী মাত্রেরই প্রয়োজন। চরমজ্ঞান নিরাকার তত্ত্বে লইয়া বসিয়া থাকিলে কোটি জন্মেও তাহার ত্রিসীমায় পৌছাইতে পারা যাইবে না। "এঁচোড়ে" পাকিয়া ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট হইতে হয়। এই জন্যই সাকার হইতে আরম্ভ জীবমাত্রেরই প্রয়োজন। সাকারে চিত্ত স্থির সহজ ; এবং সেইভাবে চিত্ত স্থির হইলে যথা সময়ে নিরাকারে পৌছান যাইবে। অনন্ত আকাশে উড্ডীয়মানপক্ষী যেমন দিগ্ বিভ্রান্তহয়, সান্তের অনন্ত ধারণা-প্রয়াস সেইরূপই বিপৎ সঙ্কুল। অসীম ছাড়িয়া সসীমে কত শীঘ্র চিত্ত স্থৈর্য্য জন্মে তাহা নিম্ন লিখিত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায়। একখণ্ড কাগজের উপর অস্পষ্টীভূত লেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বহু আয়াসেও তাহার প্রকৃতস্বরূপ বুঝিতে পারা যায় না। পরে যখন অন্য পুস্তক বা ব্যক্তি হইতে সেই লিখিত বিষয় অবগত হওয়া যায় তখন যেন সেই অস্পষ্ট লেখা ক্রমশঃই নয়ন সমক্ষে স্পষ্টীকৃত হইয়া আসিতে থাকে। তখন প্রতিবর্ণের পূর্ব্বানুভূত অস্পষ্টতা আর আদৌ বোধ হয় না। মনে হয় এত স্পষ্ট লেখা কেন পূর্ব্বে অস্পষ্ট বোধ হইতে ছিল! ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে পূর্ব্বের অস্পষ্ট অবস্থায় সমস্ত বর্ণমালা লইয়া বিচার চলিতেছিল। কোন বর্ণটী পরীক্ষিত বিষয় প্রযোজ্য ইহাই চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া ছিল। পরে অবগতির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব গৃহীত সমগ্র বর্ণমালাস্থলে এক্ষণে মাত্র যে বর্ণটী প্রয়োজন সেইটীর উপরই চিত্ত নিবিষ্ট সুতরাং বহু ছাড়িয়া একে আসাতে তাহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপ ধারণা যোগ্য একই বিষয়ের চিন্তাদ্বারা তন্ময়ত্ব প্রাপ্তি স্পেকৃতের ধ্যানে নিমগ্ন তৈলপায়িকার তৎস্বারূপ্য প্রাপ্তিরই অনুরূপ। তন্ময়তাই যদি সাধনায় প্রয়োজনীয় হয় তবে অনন্ত বা ভূমা ছাড়িয়া সান্তে আসাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক। সৃষ্টান্তর্গত জীব নিতান্তই সীমাবদ্ধ জ্ঞান বিশিষ্ট। সুতরাং তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই অবতার বা মূর্ত্তির আরাধনা স্রষ্টা কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে এই উপায় পরিত্যাগ তাহার পক্ষে উচিত নহে। কারণ তাহাতে ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ানই সার হইবে। বেদান্ত-কার ব্যাসদেব নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াও সবিশেষের উপদেশ করিয়া পরিশেষে যে বলিয়াছেন :—

রূপংরূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিল গুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ, তদ্বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্ ॥

তাহা ভগবানের অবতার অসম্ভব কল্পনা করিয়া নহে। এখানে "কল্পিতং" শব্দের অর্থ "নিষ্পন্নং বা সম্পন্নং"। যেমন "ভক্তির্ভূর্বশ্চন্দন কল্পিতেবতে" "কল্পিত" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অনন্তগুণময়কে স্বল্পগুণের সাহায্যে জীবের বোধোপযোগী করিতে যে তাঁহাকে পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করা হইল না তজ্জনিত নির্ব্বেদই এই উক্তির কারণ। কোন বিখ্যাত রাজা অশেষগুণ সম্পন্ন বলিলে সাধারণে তৎসম্বন্ধে কোন ধারণাই করিতে পারে না। আবার তাঁহার গুণাবলীর যথাযথ বর্ণনা দ্বারায়ও তাঁহার সম্বন্ধে

একটী দৃঢ় ধারণা জন্মান সম্ভব নহে ; কেননা তাঁহার গুণ অশেষ। অসংখ্য বা অনির্দ্দিষ্ট গুণগ্রামের মধ্যে চিত্ত ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু যদি বলা যায় ঐ রাজা অত্যন্ত প্রজা বৎসল বা দয়াশীল তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্বন্ধে শ্রোতার মনে একটী ধারণা বসিয়া যায়। কিন্তু ঐরূপ একদেশীক বর্ণনাদ্বারা অসত্য কথন হইল না বটে কারণ রাজার অশেষ গুণের মধ্যে উক্ত গুণও আছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাজাকে পূর্ণরূপে প্রচার করা হইল না। এই দোষক্ষালন করিতে হইলে রাজাকে বলিতেই হইবে—"হে মহারাজ! আপনার অসংখ্য গুণরাজির মধ্যে মাত্র দুই একটীর উল্লেখ করিয়া স্বরূপতঃ আপনার গুণের লাঘব করিয়াছি। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ লোকের ধারণা জন্মাইবার জন্যই ঐরূপ করিয়াছি। অতএব আমার দোষ ক্ষমা করিবেন। আপনার সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত হইলে তাহারা আপনারাই আপনার সবিশেষ পরিচয় পাইবার জন্য ব্যস্ত হইবে এবং অনুসন্ধান দ্বারা যথা সম্ভব জ্ঞাত হইবে।" রাজার রাজা ভগবানের প্রতি ব্যাসদেবের উক্তি যে ঠিক এইরূপ তাহার আর সন্দেহ নাই। আবার, একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এই উক্তির মধ্যে নিরাকার বাদী ব্যাসের দ্বৈতবুদ্ধি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কেননা তিনি জগদীশকে সম্বোধন করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন। জগদীশ ও তিনি পৃথক এই বুদ্ধি হইতেই দ্বৈতভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ তিনি যতক্ষণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে থাকেন ততক্ষণ তিনি নিরাকারবাদী। সেই অবস্থা হইতে নামিয়া আসিলেই তিনি সাকারবাদী বা দ্বৈত ভাবাপন্ন। তবে পরিপূর্ণরূপ ব্রহ্মের স্মৃতি বিদ্যমান থাকাতে তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তৃপ্তি হয় না এবং মনে হয় তাঁহাকে ঠিক ভাবে বলা হইল না—তাঁহাকে ছোট করিয়া ফেলিলাম। আবার সকল মানুষই ব্যাস নহে। সুতরাং নিম্নস্তরের সাধকদিগের শিক্ষার জন্য দ্বৈত ভাবের প্রচার ব্যতীত অন্য কোন উপায়ই নাই। দ্বৈত প্রতিষ্ঠা হইলে তবেই অদ্বৈতের স্ফুরণ হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ দ্বৈতভাবের পক্ষপাতী ছিলেন তাহার কারণই এই যে সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ নহে। লোক শিক্ষা অদ্বৈতভাবে সম্ভব নহে। তাহার সম্বন্ধে পরম হংসদেব বলিতেন "হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রু মার্ব্বার জন্য এবং ভিতরের দাঁত নিজের খাবার জন্য সেই রকম মহাপ্রভুর দ্বৈতভাব বাহিরের এবং অদ্বৈতভাব ভিতরের জিনিস ছিল।" ভাগবত বলিতেছেন :—

কোঽতি পুমান্ প্রকৃতিগুণ ব্যতিকরমতিরনীশ ঈশ্বরস্য পরস্য প্রকৃতি পুরুষয়ো রর্ব্বাক্তনাভির্ণামরূপাকৃতিভিঃ রূপ নিরূপণং কর্ত্তুং সকলজন-নিকার-বৃজিন-নিরসন-শিবতম প্রবর-গুণগণৈকদেশ-কথনাদৃতে। ৫।৩।৬

স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁহার জনৈক শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলিয়া ঘোষণা করিবার কথা বলায় তিনি উত্তরে বলেন—"তাঁকে এত বড় বলে মনে হয় যে তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হয় পাছে সত্যের অপলাপ হয় ; পাছে আমার এই অল্প শক্তিতে না কুলায় ; বড় কর্ত্তে গিয়ে তাঁর ছবি আমার ঢঙে এঁকে তাঁকে পাছে ছোট করে ফেলি! আমি ঠাকুর রামকৃষ্ণকে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা প্রভৃতি সকলের চেয়ে বড় বলে জানি-মানাত ছোট কথা।" (স্বামি শিষ্য সংবাদ ২৪ পৃঃ) অবশ্য এতদুক্তির কারণ নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। "আত্মজ্ঞান লাভই পরম সাধন। অবতার পুরুষরূপী জগদ্‌গুরুর প্রতি ভক্তি হইলেই ঐ জ্ঞান কালে আপনিই ফুটে বেরুবে। যখন অবতার আসেন তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত, মুমুক্ষু পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা কর্ত্তে শরীর ধারণ করে আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে একজন্মে মুক্ত ক'রে দেওয়া কেবল অবতারই পারেন।" (ঐ ১৬৮পৃঃ) আচার্য্যে ঈশ্বর বুদ্ধি না হইলে প্রকৃত ভক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" এবং শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—"আচার্য্য চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।" যাহাহউক অবতারে পূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া সম্ভব না হইলেও তাহা যে ব্রহ্মেরই অন্তর্ভুক্ত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। যেমন একটী রশ্মি ধরিয়া সূর্য্যকে দেখা যায় সেই রূপ মূর্ত্তিমতী ঐশীশক্তি রূপ অবতার সাহায্যে সেই পূর্ণ ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। জীব যতদিন জীব থাকে ততদিন তাহার দ্বৈতবুদ্ধি দূর হয়

না। জীব শিব হইলে দ্বৈতজ্ঞানের তিরোভাব হয় এবং অদ্বৈত জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। সেই জন্য বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যত ধর্ম্মশাস্ত্রই আলোচনা করনা কেন কোথাও পূর্ণ অদ্বৈত ভাব পাইবেনা—দ্বৈতভাব কোননা কোন রূপে সংশ্লিষ্ট আছেই। বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রে দ্বৈতবাদ রহিয়াছে। সেই মন্ত্রোক্ত ওম্, ভর্গঃ ও ধীমহি এই শব্দত্রয় হইতে তাহা সুস্পষ্ট অনুমিত হইতেছে। ওম্ শব্দ অ, উ, ম্ এই বর্ণ ত্রয়ের সমষ্টি। অ, উ, ম্ সত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের দ্যোতক, সুতরাং ওম্ শব্দ দ্বারা ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মই সূচিত হইতেছে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মই ওম্ শব্দের লক্ষ্য। ব্রহ্মের গুণাতীত অবস্থা ঐ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে ওম্ শব্দে সগুণ বা দ্বৈতভাব স্ফুরিত হইতেছে। ভর্গঃ শব্দের অর্থ তেজঃ বা জ্যোতিঃ। তেজের তন্মাত্ররূপ। রূপ ব্যতীত তেজের প্রকাশ হয় না। এইরূপ তন্মাত্র তেজোরূপে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইয়া থাকে। তাহা হইলে উহা নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে পারে না। কেননা তিনি অতীন্দ্রিয়। সুতরাং ভর্গঃ শব্দও সগুণ ব্রহ্মের দ্যোতক অর্থাৎ উহাও দ্বৈতভাব সূচিত করিতেছে। ধীমহি শব্দের অর্থ ধ্যান করি। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে সাধকের ধাতৃত্ব বোধ আছে। ধ্যাতা থাকিলে ধ্যেয়ও থাকিবে। যতকাল ধ্যাতা ধ্যেয়, জ্ঞাতা জ্ঞেয়, দ্রষ্টা দৃশ্য ভাব থাকিবে ততকাল অদ্বৈত বুদ্ধির অবকাশই নাই। "তত্বমসি" মহাবাক্যেও দ্বৈতত্ব সূচিত হইতেছে। আমরা যাহাকে তত্ত্ব-জ্ঞান বলি সেই "তত্বং" এই "তত্বমসির অন্তর্ভুক্ত। তৎ+ত্বং+অসি=তত্বমসি তৎ ত্বং অর্থাৎ সেইই তুমি ইহাই তত্বং বা তত্বজ্ঞান। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে তৎ শব্দ দ্বারা সোপাধিক ব্রহ্ম এবং ত্বং শব্দদ্বারা জীবকে নির্দ্দেশ করা হইতেছে। কিন্তু ত্বং এই মধ্যম-পুরুষদ্বারাই দ্বৈতত্ব প্রকটিত হইতেছে। ইহাতে বক্তা ও শ্রোতার উপলক্ষণ আছে। আবার তৎ ও ত্বং এই ভেদ দৃষ্টিও রহিয়াছে। সোহহং বাদেও সঃ এবং অহং দ্বারা দ্বৈতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রুতি বলিতেছেন:—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। এ স্থলেও দৃশ্য দ্রষ্টা, শ্রোতব্য শ্রোতা, মন্তব্য মন্তা এবং ধ্যেয় ধ্যাতার উপলক্ষণ দ্বারা দ্বৈত বুদ্ধি প্রতিপাদিত হইতেছে। বৃহদারণ্যক ইহা স্পষ্ট করিতেছেন:—"যত্রহি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং অভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবা ভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং শৃণুয়াৎ, কেন কমভিবদেৎ, কেন কং মন্বীত, কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।"

সোহংবাদী শঙ্করাচার্য্য স্বকৃত বিষ্ণু স্তোত্রে বলিতেছেন:—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥৩

ইহাদ্বারা শঙ্করের দ্বৈতজ্ঞান সূচিত হইতেছে। তিনি অবতারবাদও প্রচার করিয়াছেন। যথা:—

মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাসদা বসুধাম্।
পরমেশ্বর! পরিপাল্যো ভবতা ভবতাপভীতোহহম্॥ ঐ ৫

মূল কথা প্রেম বা আনন্দই প্রয়োজন অর্থাৎ মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। সেই প্রেম যাহাতে অঙ্কুরিত ও পরিপুষ্ট হয় তাহাই সাধনা। দ্বৈতবাদ ব্যতীত তাহার সম্ভাবনা নাই। ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা যেরূপ সহজে সেই প্রেমাস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। নীরস জ্ঞানমার্গীর পক্ষে তাহা দুরাশা। তিনি দীর্ঘ সাধনার পর স্বীকার করিবেন—"বরং তত্বান্বেষান্মধুকর হতা স্বং খলু কৃতী।" তাই শ্রীরামকৃষ্ণ মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছেন, "ওরে প'দো তুই খেয়ে নে; তোর অত খোঁজে দরকার কি?" "ভগবানের উপর সমস্তভার দিয়ে দুর্গা ব'লে ঝুলে পড় যা কর্ব্বার তিনিই কর্ব্বেন।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"মানুষে ঈশ্বর বুদ্ধি ঠিক ঠিক হ'লে তবে ভগবান লাভ হয়। বৈষ্ণবচরণ বল্‌তো—'নরলীলায় বিশ্বাস হ'লে তবে পূর্ণজ্ঞান হয়।, (লীলাপ্রসঙ্গ, উত্তরার্দ্ধ, ৪১ পৃঃ)।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছেন—"তিনি বাস্তবিকই অবতার ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ।' মনে রাখিবেন—"ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ।"

অনেকের ধারণা অবতারবাদ বিশ্বাস করিতে হইলে ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তা বা সর্ব্বব্যাপিত্ব থাকে না। তিনি দেশকাল দ্বারা নিতান্ত পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। দেখা যাউক এই আশঙ্কার মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে। আমরা বেদে দেখিয়াছি তিনি নিগুর্ণ হইয়াও সগুণ হইতে পারেন। তিনি আপনা হইতে এই বিকারময়ী বিশ্বপ্রকৃতি রচনা করিয়াও নিজে স্বস্বরূপে অবিকৃত অবস্থায় আছেন। ইহা দ্বারা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রমাণিত হইতেছে। তিনি নিজে অব্যয় অক্ষয় রহিয়া ও প্রয়োজন অনুসারে আপনাকে কেন্দ্রীভূত শক্তি নিচয় হইতে জগৎ পরিচালনার্থ শক্তি সঞ্চারিত করিতেছেন। এই এক একটী শক্তিই এক একটা অবতার স্বরূপ ভগবান্ কখনও পূর্ণত্ব ছাড়িয়া অবতার হইতে পারেন না। তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট হইয়া যায়। অবতার কখনও পূর্ণ নহে তাহা অংশাবতার মাত্র। ভগবান্ পরিপূর্ণ অব্যক্ত হইয়া সমগ্র স্বরূপে ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন না। তাই গীতায় বলিতেছেন :—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাব মজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥৭।২৪

তিনি অব্যয় অক্ষয় থাকিয়াও যে অংশতঃ অবতীর্ণ হন নিজে "অজ ও নিত্য থাকিয়াও যে জন্ম পরিগ্রহ করেন তাহা লীলা প্রকাশচ্ছলে স্বকীয় অচিন্ত্য শক্তিমত্তা প্রদর্শনের জন্যই বুঝিতে হইবে। অনন্ত হইতে অংশ আসিলেও সেই অনন্তই রহিল। অর্জ্জুনের অক্ষয়তূনীর এবং হিতোপদেশোক্ত গোপালকে তদীয় গুরুমহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে দীনবন্ধু দাদা কর্ত্তৃক প্রদত্ত অক্ষয় দধিভাণ্ডের বিষয় চিন্তা করিলে এ বিষয়ে কতকটা ধারণা হইতে পারে। যত লওনা কেন পাত্র পরিপূর্ণ রহিবেই। আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা আরও একটু স্পষ্টতর রূপে বুঝা যায়। অনন্ত নীলাকাশ মেঘাচ্ছন্ন। যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর কেবল নিবিড়কৃষ্ণবর্ণ মেঘ। হঠাৎ বায়ুভরে এক স্থানের কিয়দংশ মেঘ অপসারিত হইয়া গেল। সেই অবকাশের মধ্য দিয়া অখণ্ড ব্যোমনীলিমার অংশতঃ দৃষ্ট হইতেছে। তাহা অনন্তের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে আকাশই বলিব। সেই খণ্ডাকাশকে আকাশ বলিলে কি বুঝিতে হইবে যে উহা ব্যতীত আর আকাশ নাই? ব্রহ্মের অবতারও ঠিক এইরূপ আংশিক বিকাশ।

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার সংশয়াপনোদন করিবার জন্য গোপাল বালকগণ তথা সবৎসা ধেনু সকল আপনার শরীর হইতে সৃষ্টি করিয়া নিজে অবিকৃত অবস্থায় থাকিয়া গৃহে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। রাসলীলায় সকল গোপবালিকার যুগপৎ কৃষ্ণ সাহচর্য্য লিপ্সা পূরণার্থ নিজে বহুধা বিভক্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র রক্ষা প্রসঙ্গে অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইয়া অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে অবতার ভগবানের অংশমাত্র। জীবে ঈশ্বর দর্শনই অবতার পদের মূলসত্য। কোন অবতারকেই পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর বলা চলে না। তাই গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন :—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎসত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদে বাবগচ্ছত্বং মম তেজোংশসম্ভবম্ ॥১০।৪১

ভাগবত ও বলিতেছেন :—

অবতারাহ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধে র্দ্বিজাঃ।
যথা বিদাশিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥১।৩।২৬

কিন্তু যাবতীয় অবতারগণের বিষয় চিন্তা করিলে একটী বিশিষ্টতা লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত যত অবতার তাঁহাদের প্রকৃতি হইতে তৎপরবর্ত্তী অবতীর্ণ পুরুষদিগের প্রকৃতি একটু স্বতন্ত্র। শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণ জাগ্রতী ক্রিয়াশীলা শক্তি লইয়াই যেন সম্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রথম হইতেই ঐশীশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে কিন্তু শেষের অবতারগণের শক্তি স্ফূরণ সাধন সাপেক্ষ ছিল অর্থাৎ সাধন দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া উত্তর কালে প্রকটিত হইয়াছিল। তাঁহাদের লৌকিক জীবনের মধ্যে সময় বিশেষে অলৌকিকত্ব দৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা নিজকে প্রকৃত মানুষই মনে করিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যে ঐশীশক্তির আবেশ হইত। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই সম্ভবতঃ ভাগবতে ভগবানকে "ত্রিযুগ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ত্রিযুগ বলিতে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়ে অবতীর্ণ ভগবদংশের ঐশ্বর্য্য স্বতঃ স্ফুরিত ছিল বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী

অর্থাৎ কলিযুগে শক্ত্যাবেশ মাত্র তাহাও ক্ষণস্থায়ী। আবেশ তিরোহিত হইলে তাঁহাদের ব্যবহার প্রকৃত মানুষের মতই হইত। এই বিষয়টী শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহারা আপনাকে কদাপি অবতার বা ঐশ্বরীয় পুরুষ বলিতেন না পরন্তু অপরে বলিলে তাহাতে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইতেন কিন্তু আবিষ্ট অবস্থায় এরূপ কোন সঙ্কোচ বা দিনতা থাকিত না। ইহাও হইতে পারে যে তাঁহারা স্ব স্ব ঐশী প্রকৃতি অন্যের নিকট হইতে গোপন রাখিতেন। সময় ও পাত্রবিশেষ উপস্থিত হইলে ঐরূপ আবেশ বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

"লোকন্তরাণং চেতাংসি কোন্ বিজ্ঞাতু মইতে"।

মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুগীতা পর্ব্বাধ্যায়ে একটী শ্লোক দৃষ্ট হয়

নশকাং তন্ময়া ভূয় স্তথা বক্তমশেষতঃ।

পরংহিব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া॥ ১৬।১২, ১৩

এই শ্লোকের বলে অনেকে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার স্বরূপ হইতে বহু নিম্নে লইয়া আসেন। এমন কি অনেকে তাঁহার অবতারত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না। অবতারের মূল অর্থ ধরিলে শ্রীকৃষ্ণকে কোন মতে অবতারবাচ্য প্রাকৃত মনুষ্য মাত্র বলিয়া মনে করিবার কোন কারণই দেখা যায় না। পক্ষান্তরে তিনি পরবর্ত্তী অবতারগণ অপেক্ষা যে উচ্চতর তাহা তাঁহার জন্ম হইতে তিরোধান পর্য্যন্ত যাবতীয় অমানুষী লীলা আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রমানিত হইবে। কেবল অর্জ্জুন সেই অশ্বমেধ পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন আমি আপনার পূর্ব্ব কথিত ব্রহ্ম বিদ্যা বিস্মৃত হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার উপদেশ করুন। এতদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—তখন আমি যোগযুক্ত হইয়া যাহা বলিয়াছি তাহা এক্ষণে বলিবার শক্তি আমার নাই অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের অসম্ভবতা উভয় চরিত্র বিচার করিলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে। গীতার ব্রহ্ম বিদ্যা কথিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেন চেতসা।

কচ্চিদজ্ঞান সম্মোহঃ প্রনষ্ট স্তে ধনঞ্জয়॥ ১৮।৭২ উত্তরে অর্জ্জুন বলিলেন—

নষ্ট মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎ প্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোঽস্মিগতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

অর্জ্জুনের এই বাক্যে কত দৃঢ়তা ও নৈশ্চিন্ত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ উপদেষ্টা এবং অর্জ্জুন শ্রোতা অর্জ্জুন "যা তা" শুনিয়াই স্বীকার করিয়া লইবার মত লোক নহেন। ভগবানের বিশ্ব রূপ পর্য্যন্ত স্বচক্ষে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত কথা বর্ণে বর্ণে মিলাইয়া লইয়া তবেই তিনি "গত-সন্দেহ" হইয়াছিলেন। আর জ্ঞানে কিরূপ দৃঢ়তা হইলে লোকে ঐ রূপ উত্তর করিতে পারে তাহাও এস্থানে বিবেচ্য। এইরূপ অবস্থায় অর্জ্জুন কতিপয় দিবসের মধ্যে সেই দৃঢ়বদ্ধ জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার তাহার জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন তাহা নিতান্তই অবিশ্বাস্য। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যোগবিদ্যায় যেরূপ পারদর্শিতা তাঁহার জীবনের প্রায় প্রতিঘটনায় দেখাইয়াছেন তাহাতে তিনি অর্জ্জুনের প্রার্থনা শ্রবণ মাত্র তাহা পূরণ করিতে পারিতেন। অর্থাভিহরণ পর্ব্বাধ্যায়ে শিশু কালের দেহে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিল। ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়ে কৌরব সভায় শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছিল। নারদ, মার্কণ্ডেয় ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি ভক্ত ও আপ্ত বাক্য ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। আবার দ্বারকায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন সময়ে যুগপৎ ষোড়শ সহস্র মহিষীর সহিত তৎসংখ্যক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান ও তাহাদিগের মনোরঞ্জনাদি ব্যাপার—তাই একদিন নহে—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একই ভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাস-লীলা ও ব্রহ্ম সম্মোহনও উল্লেখ যোগ্য। এই সকল দৃষ্টান্তে বেশ বুঝিতে পারা যায় তিনি সর্ব্বদাই যোগারূঢ় থাকিতেন। সুতরাং যে অর্জ্জুনকে তিনি বলিয়াছেন—

"ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।"

এবং যে অর্জ্জুন সর্ব্বতোভাবে শরণাপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন।

"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"

সেই অর্জ্জুনকে যে তিনি নিরাশ ও বিষন্ন করিতে পারেন, তাহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। ফলতঃ উক্ত শ্লোক ও তৎপ্রসঙ্গে বর্ণিত উপাখ্যান যে

প্রক্ষিপ্ত তাহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। "অনুগীতা" নাম হইতেই ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ অবতার হইলেও পূর্ণ নহেন। পূর্ণের অংশ মাত্র। ভাগবত শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"

কিন্তু আমরা ভাগবত হইতেই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে শ্রীকৃষ্ণও পূর্ণাবতার নহেন। তিনি ও অংশাবতার।

১। ভাগবতে কৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে ভগবান্ যোগমায়াকে বলিতেছেন—

অথাহিমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাংশুভে।
প্রাপস্যামি ইত্যাদি ॥ ১০।২।২৬

২। গর্গাচার্য্য কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন শ্রবণ করিয়া গোপেশ্বর নন্দ বলিতেছেন :—

মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণ মক্লিষ্ট কারিণং।১০।২৬।১৪

৩। অক্রুর সংবাদে :—

প্রধান পুরুষাবাদ্যো জগদ্ধেতু জগৎপতী।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থেস্বাংশেন বলকেশবৌ ॥১০।৩৮।৩০

৪। সুদাম মালাকার বলিতেছেন :—

ভবন্তৌ কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরং।
অবতীর্ণা বিহাংশেন ক্ষেমায়চ ভবায়চ ॥১০।৪১।৩৬

৫। কংশবধ সময়ে সমুপস্থিত রঙ্গভূমিস্থ দর্শকগণ বলিতেছেন :—

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ হরের্ণারায়ণস্যচ।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি ॥১০।৪৩।২০

৬। অক্রুরের উক্তি :—

সত্বং বিভোঽদ্য বসুদেব গৃহেবতীর্ণঃ।
স্বাংশেন ভারমপনেতু মিহাসি ভূমেঃ ॥১০।৪৮।২০

৭। জরাসন্ধ কর্তৃক অবরুদ্ধ রাজগণের উক্তি :—

লোকে ভবান্ জগদীশঃ কলয়াবতীর্ণঃ।
সদ্রক্ষণায় খলনিগ্রহয়ায়চান্যঃ ॥১০।৭০।৪

৮। ব্রাহ্মণ পুত্র রক্ষা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন নারায়ণ সহ সাক্ষাৎকার করিলে নারায়ণ উভয়কে বলিতেছেন :—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা ময়োপনীতা ভুবিধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাব বনে উরা সুমানং হত্বেহভুয়স্তর য়েতমন্তিমে ॥
১০।৮৯।৫২

৯। পরিশেষে লীলাসম্বরণ কালে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন :—

ময়া নিষ্পাদিতংহ্যত্র দেব কার্য্যমশেষতঃ।
যদর্থমবতীর্ণোঽহমংশেন ব্রহ্মনার্থিতঃ ॥১১।৭।১

এইত গেল ভাগবতের কথা। ভাগবত হইতেও অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থ মহাভারতও শ্রীকৃষ্ণকে অংশাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যথা :—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥
আদি, ৬৮।১৫১

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—অবতারবাদ যদি সত্যই হয় তাহা হইলে তাহা ভারতের "এক চেটিয়া" কেন? ইহাতে যে ভগবানের উপর পক্ষপাতিত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই ঐ দোষ নিরাকৃত হইবে সন্দেহ নাই। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় ভারতবর্ষেই আদিম সভ্যতার পূর্ণবিকাশ হয়। এসিয়ায় চীন ইউরোপের গ্রীস এবং আফ্রিকায় মিশর ব্যতীত অন্যান্য সকল দেশই নিতান্তই অধুনাতন। ভারত, চীন, মিশর ও গ্রীস এই চারিদেশের প্রাচীন সভ্যতার আলোকে ও আদর্শে অন্যান্য জাতি গঠিত হইয়াছে। মধ্যযুগে আরবগণ কর্তৃক এই সভ্যতা প্রতীচ্য ভূখণ্ডে বিকীর্ণ হইয়াছে।

"They (the Arabs) merit" says M. Libri, "eternal gratitude for having been the preservers of the learning of the Hindu and the Greeks ......and Europe was still too ignorant to undertake the charge of the precious deposits. Efface the Arabs from History and the Renaissance of letters will be retarded in Europe by several Centuries"

Historian's History of the World vol VIII

যাহা হউক এই দেশচতুষ্টয়ের মধ্যে একমাত্র ভারতই ভগবৎ প্রাপ্তিকে চরম লক্ষ্য ঠিক করিয়া কর্ম্মের ভিত্তির উপর আপনার লৌকিক জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। সুতরাং যাহা নিতান্ত পার্থিব, যাহা দুই দিন পরেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনা হইতে চলিয়া যাইবে তাহাকে সহজেই পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিতেছিল। সেই জন্যই ভারতের মুনিঋষিগণ জাগতিক উন্নতির প্রতি আদৌ দৃষ্টি না দিয়া কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির পথই অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং তাহার আবিষ্কার করিয়া সমগ্র জগতের সাধারণ সম্পত্তি স্বরূপ রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন আর্য্য মুনিগণ আধ্যাত্ম সাধনের জন্য যে পার্থিব নশ্বর বিষয়ে সম্পূর্ণ অমনোযোগী ছিলেন—অন্ততঃ তাহা যে তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল—তাহা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের দুই একটী ঘটনার আলোচনা করিলে সহজেই বিশ্বাস হইবে।

১। ঠাকুর কাশীপুরে দারুণ ব্যাধিতে ভুগিতেছেন এমন সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ তাঁহাদের কল্যাণের জন্য মনঃশক্তি প্রয়োগে রোগ মুক্তির জন্য সজল নয়নে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেও তিনি ঐরূপ চেষ্টা ম সঙ্কল্প করিতে পারিলেন না। ঐরূপ করিতে যাইয়া সঙ্কল্পের দৃঢ়তা বা "আঁট" কিছুতেই মনে আনিতে পারিলেন না। বলিলেন—এ হাড় মাসের খাঁচাটার উপর মনকে সচ্চিদানন্দ হ'তে ফিরিয়ে কিছুতেই আনতে পারলুম না। সর্ব্বদা শরীরটাকে তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান ক'রে যে মনটাকে জগদম্বার পাদপদ্মে চিরকালের জন্য দিয়েছি সেটাকে এখন তাঁ' থেকে ফিরিয়ে শরীরটাতে আনতে পারি কি রে?

২। বিবেকানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইনি ঠাকুরের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। নরেন্দ্রকে পূর্ব্বে সংসার চালাইতে সম্পূর্ণ কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়াও ঠাকুর তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত শিষ্যের পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মায়ের নিকট একদিনও প্রার্থনা করিতে পারেন নাই। মনে ইচ্ছা থাকিলেও তাহা কার্য্যতঃ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন কিন্তু পার্থিব উন্নতির কথা বলিতে মুখ ফুটে না। সেইজন্য কেহ রোগাদির উপশমার্থ তাঁহার নিকট যাইলে তিনি বলিতেন—আমার দ্বারা ও সব হ'বে না। যাহারা সাধনা দ্বারা সিদ্ধাই পেতে চায় তাদের কাছে যাও।

৩। অনুবীক্ষণ সাহায্যে স্থূল ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা যায় শুনিয়া ঠাকুর পরমহংস ঐ যন্ত্র সাহায্যে ২।১টী পদার্থ দেখিবার জন্য বালকের ন্যায় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ বহু অন্বেষণ করিয়া একদিন অপরাহ্ণে একটী যন্ত্র ঠাকুরের পরিদর্শন নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। ঠাকুর উঠিলেন—দেখিতে যাইলেন; কিন্তু না দেখিয়াই আবার ফিরিয়া আসিলেন। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন মন এত উচুতে উঠে গেছে যে কিছুতেই তাকে নামিয়ে নীচের দিকে দেখ্‌তে পারচিনে। ভক্তগণ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই সে দিন ঠাকুরের মন ঐ উচ্চ ভাবভূমি হইতে নামিল না। কাজেই সেদিন আর অনুবীক্ষণ সাহায্যে কোন পদার্থই তাঁহার দেখা হইল না (লীলাপ্রসঙ্গ)।

এই দৃষ্টান্ত গুলি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে ব্রহ্মানন্দ কি বস্তু, যাহার উপলব্ধিতে জাগতিক সমস্ত সুখ বা কৌতূহল পরিতৃপ্তি এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। সেই জন্যই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন :—

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্‌বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥৬।২১।
যং লব্ধা চাপরং লাভং নাধিকং মন্যতে ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২

ভাগবতও বলিতেছেন :—

যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখং।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥

যাহা হউক বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে জড়বাদ (matorialism) এর দিনে যদি এরূপ আধ্যাত্ম সিদ্ধির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহা হইলে সেই আদিম সভ্যতার যুগে যে এই আধ্যাত্ম সাধন কতদূর প্রবল ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টায় থাকিয়াও আর্য্যঋষিগণ জগতের কল্যাণের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন

না। সর্ব্বভূতে দয়াই ধর্ম্মের মূল। জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কিসে সেই দুঃখ বিমোচন হইবে সে চিন্তাতেও তাঁহারা রত থাকিতেন। মুক্তিতেই আধ্যাত্মিক দুঃখের বিনাশ। কিন্তু সেই মুক্তি সাধনসাপেক্ষ। আবার সাধন শরীর ধারণসাপেক্ষ "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্ম সাধনং"। ভাগবতও বলিয়াছেন :—

আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎপ্রাণধারণম্।

তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥১১।১৮।৩৩

সুতরাং জীব যাহাতে প্রাণ ধারণ পূর্ব্বক এই সাধনায় রত হইয়া আত্যন্তিক দুঃখনাশে সমর্থ হইতে পারে তদ্বিষয়ে ঋষিগণ অনেক ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যদ্দারা জীব কল্যাণের পথে অগ্রসর না হইয়া বিলাসিতার ক্লেদপঙ্কে নিমজ্জমান হয় সে বিষয়ে তাঁহারা কদাপি প্রশ্রয় দেন নাই। আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষ কিরূপে কত সহজে মানুষকে হত্যা করিতে পারিবে তাহারই সুবিধা খুঁজিতেছে; কিসে আসক্তির বন্ধনে মানুষ তাহার চরমলক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভগবান্ হইতে দূরে যাইবে তাহারই চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের জীবন সংগ্রাম বলিতে তাহাদের মরণ সংগ্রাম বুঝিতে হইবে।

কিন্তু আর্য্য মুনিগণ সমগ্র জীবের চরণ কল্যানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের শরীর পোষণোপযোগী বিজ্ঞানাদির যথাযথ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, ধনুর্ব্বেদ, নীতিশাস্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতির বিষয় ছাড়িয়া দিলেও এক আয়ুর্ব্বেদই প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞানের বিরাট শাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদ আলোচনায় জানা যায় এই ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ভারত কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অন্যান্য ব্যবহারের কথা ছাড়িয়া এক নাড়ী বিজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়। হিন্দু চিকিৎসক রোগীর নাড়ী দেখিয়া তাহার শরীরস্থ ধাতুনিচয়ের বিপর্য্যয় অনুধাবন করেন এবং ভিন্ন প্রকৃতির রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করেন। পাশ্চাত্য মতের চিকিৎসক এক তাপমান যন্ত্র (Thermometer) সাহায্যে সকলের ধাতুই পরিজ্ঞাত হন এবং একই রোগের একই ঔষধ সকল ধাতুর রোগীর সেবনের জন্য ব্যবস্থা করেন! যাহাহউক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এতাদৃশ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিলে ঋষিগণের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। জীবন ধারণের জন্য যেমন আহার নিতান্ত প্রয়োজন সেইরূপ রোগীদের চিকিৎসাও অত্যাবশ্যক। রুগ্ন শরীর লইয়া কোন মতেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারা যায় না। রোগী রোগের যন্ত্রনায় অস্থির হইয়া শরীরের চিন্তা করিবে না ভগবানের চিন্তা করিবে।

এই দুই বিষয়ের সুবিধাও ভারতবর্ষে ছিল। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান। এবং ঔষধাদির জন্য ওষধিগণও প্রচুর ছিল। তদ্বারা নির্ব্বিঘ্নে, নিরাড়ম্বরে, নীরবে জীবন যাপন করিয়া ঈশ্বর চিন্তার যথেষ্ট অবসর থাকিত। মূল কথা ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ, অন্যান্য বিষয় সেই প্রাণ রাখার উপায় বা উপাদান মাত্র। সুতরাং ধর্ম্মজগতে ভারতের স্থান যে সর্ব্বোচ্চে তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। আধুনিক পাশ্চাত্য সুধীগণও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন ভারতই জগতের ধর্ম্ম জীবন পরিচালিত করিতেছে। ভারতীয় আদর্শে অন্যান্য জাতির ধর্ম্ম জীবন গঠিত হইয়া এক মহা-সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং যে Pantheism (বিশ্বেশ্বর বাদ) ভারত বহু দিন পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছে সুতরাং ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে ভারতে অবতারবাদ এত অধিক প্রচলিত এবং অবতারের সংখ্যাও এত অধিক। ধর্ম্মসংস্থাপনই যদি অবতারের উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমি ব্যতীত আর কোন দেশে এত অবতারের সম্ভাবনা! কিন্তু তাই বলিয়া একথা কিছুতেই স্বীকার করা চলে না যে এক ভারত ব্যতীত ঈশ্বর অন্য কোন স্থানে অবতীর্ণ হন নাই। যে দেশের ধর্ম্মজীবন যে রূপ অবস্থায় আছে সেই দেশের সেই অবস্থার উপযোগী ভাবে ঐশী শক্তির অবতরণ হইয়াছে ইহা আমরা ইতিহাস আলোচনায় দেখিতে পাই। ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে জড় বাদ এখনও সেখানে বদ্ধমূল রহিয়াছে। পার্থিব উন্নতির প্রতি লক্ষ্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। সকল কর্ম্মেই তাহার আগ্রহ। জীবনের ক্ষীণ স্থায়িত্ব, পার্থিবসুখের অনিত্যতা অদ্যাপি সেখানে

আমূল আলোচিত হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মবীর অপেক্ষা কর্ম্মবীরের সংখ্যাই সেখানে অধিক। তাহাও আবার পার্থিব কর্ম্ম সাধক। তথাপি সমগ্র জাতির সেবাই কর্ম্মের প্রকৃত অর্থ। ইউরোপীয় কর্ম্মবীরগণের মধ্যে তাহাও পরিলক্ষিত হয়। কর্ম্ম ভক্তি ও জ্ঞানের সাধন। তাই কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সূত্র বিজড়িত। তাই কর্ম্মের মূল দৃঢ় করিবার জন্য সেখানে ধর্ম্মবীরেরও নিতান্ত অসদ্ভাব নাই। ভারত ব্যতীত অন্যত্রও যে অবতার হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহা ইতিহাস পাঠেই জানা যায়। সেই সকল অবতারকেও বিভূতিমৎসত্বং বলিয়াই বুঝিতে হইবে। Arabiaতে Mahomet, Palestineএ Jesus, Italyতে Savanarola, Greeceএ Plato, Secratis ও Epictetus Scotlandএ John Knox, Englandএ Simon de Montford, Latimer Cranmer, Cardinal Newman, Germanyতে Martin Luther ও Melanctpon, Scandenaviaতে Odin, Chinaতে Confucius এইরূপ আরও অনেক ধর্ম্মবীর আবির্ভূত হইয়াছেন। কর্ম্মবীরদিগের মধ্যে Englandএ King Arthur, Richard I ও Cromwell, Scotlandএ Bruce ও Wallace France এ Charlemane ও Napoleon, Germany তে Fredric the Great, Italy তে Julius caesar Switzerland এ William Tell, Russiaতে Peter the Great ও Alexander I Greeceএ Alexander the Great, Americaতে Washington ও Lincolnই প্রধান। ইঁহাদিগের প্রত্যেকেই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন স্বজাতিকে অন্যের অত্যাচার তথা হীনতা হইতে উদ্ধার ও উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারাও যে ঈশ্বরের শক্ত্যবতার তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে জগতের প্রতি জাতির মধ্যেই সেই জাতির ধর্ম্মজীবনোপযোগী ক্রমোৎকর্ষ বিধানার্থ ঈশ্বরের নানাবিধ অবতার হইয়াছেন ও হইতেছেন। সুতরাং ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপি হইয়াও যে অংশতঃ অবতীর্ণ হইতে পারেন না তাহা নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণা। যিনি অচিন্ত্যশক্তি তাঁহাতে কি সম্ভব বা অসম্ভব তাহার নির্দ্ধারণ বদ্ধদৃষ্টি জীব কিরূপে করিবে! তিনি বিকারী হইয়াও নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অংশাবতার রূপে দেশ কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন। জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি সবই করিতে পারেন। তাই উদ্যম পর্ব্ব বচনে লিখিত হইয়াছে :—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

ব্যবধান

[সাজেদা খাতুন]

ওপারেতে আছ তুমি এপারেতে আমি,
মধ্যে ব্যবধান তা'র নদী স্রোতগামী।
ইচ্ছা করে পাখী হয়ে মিলি' দুইজনে
বলিব মনের কথা অতি সঙ্গোপনে।
কিন্তু হায়, জানি ইহা অসাধ্য লোকের!
আশা আছে তবু পর-পারে মিলনের।

আকর্ষণ কথিকা

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

১। আধ্যাত্মিক

পাগল চেয়েই আছে, নদীর বয়ে-যাওয়া বুকের ওপর দিয়ে, ঢেউ খেলানো সবুজ মাঠ পেরিয়ে, যেখানে সসীমে অসীমে জড়াজড়ি করে সীমা হারিয়ে ফেলেছে সেই দিকে।

সে যে কবে, তার কোন ইতিহাস নেই, তারিখ নেই; সে যে কোথায় তারও কোন ঠিকানা নেই।

চারদিকে সংসারের হাট, কত কেনা বেচা, টানাটানি ঝগড়া,—তারি মধ্যে যে আমাদের চিরকালের পাগল, সে অসীম-চাওয়া চোক্ দুটী হারিয়ে বসে থাকে;

কেন থাকে?

পৃথিবীর কালো ওড়নায় ঢাকা মুখের উপর হাজার তারা অপলকে চেয়ে থাকে, সূর্য্য ওঠে, চাঁদ হাসে, ফুল ফোটে,—লক্ষ আসা যাওয়ার মধ্যেও যে সব তেমনি থাকে।

এ পাগল যে মানুষের মধ্যে সত্যি আর স্বপ্ন দিয়ে গড়া একটা ব্যাকুল প্রতীক্ষা—এর আরম্ভও নেই, শেষও নেই, এ যে চিরদিনের হঠাৎ একদিন ফাগুন সাঁঝে পাগলের প্রতীক্ষা, চম্‌কে-ওঠা ঘোড়ার মত ছুটতে গিয়ে থম্‌কে গেল। একি হল? এ কোন মায়াবীর স্বপন দিয়ে গড়া খেলার খেয়াল?

এ যে সত্যি। পাগল যে আমাদের নগেন, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে নটবর ঘোষের মেয়ে ক্ষেন্তী।

একরাশ বাসনের বোঝা নামিয়ে ক্ষেন্তী দাঁড়িয়ে নদীর ঘাটে, আর পাড়ের ওপর বসে নগেন।

উপন্যাসের সঙ্গে মিললো না, কবিতার সঙ্গে খাপ খেলো না--তবুও চারটী চক্ষে যা করে নিলে, তা নূতনের মধ্যে পুরোনো, পুরোনোর মধ্যে নূতন।

পথ চাওয়া প্রতীক্ষার শেষ হেসে বল্লে, যা চাও পেয়েছো তো? তুমি যে আমার চিরদিনের চিরন্তন।

পাগল কিন্তু মাথা নেড়ে বল্লে, না না, পেতে চাই না তোমায় ওগো আমার চিরন্তনী! আমরা পেয়ে হারানো, হারিয়ে পাওয়ার মধ্যে এমনি করে অবাক্ হয়ে থাকবো চিরকাল!

যুগে যুগে এই চাওয়া আর চাওয়ার শেষের অবাক্ করা খেলা চলেছে। কত বিচিত্র তার রূপ, কত অফুরন্ত তার ভঙ্গীমা; কিন্তু জীবনে তার একই রূপ.—সে পাগল।

২। আধিদৈবিক

আকাশের বুকে লাল আঁচলখানি ছড়িয়ে দিয়ে সে এলিয়ে পড়েছে। তার কপালে অসীম কালের সিঁদুরের ফোঁটা। পায়ের তলায় তার অসীম দিগন্ত রেখা, রক্তমাখা সবুজ ঘুমের মত। ঢেউ খেলানো মেঘের কোলে কোলে রংএর লুকোচুরীর মাঝে অবুঝ ভাষায়, অচিন্ হরপে লেখা কত হারানো দিনের ভুলে যাওয়া কথা।

হিজল গাছ সোনালী তাজ পরা মাথা নেড়ে বল্লে, এ কিগো! কয়েকটী লালফুল ঝরে পড়্‌লো টুপ, টুপ, টুপ। নদী কেঁপে উঠে বল্লে, চুপ চুপ চুপ—আমারি বুকের পরে যে এর লীলা চলেছে; যতদূর যাই. এ আর ফুরোয় না! আমরা যে চিরন্তনের যাত্রী। বটে, অতদূরে আবার এত মিল। হিজলগাছের ডাল পালাগুলি খুসী হয়ে শিউরে উঠ্‌লো!

হঠাৎ তালবনের গাছে গাছে কাঁপন সুরু হ'ল। হিজল গাছটা চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখে, আকাশের বুকের পরে আগুনের কালোরূপ! তাঁর মনের কথাগুলো ছন্দে গেঁথে গেঁথে উড়ে চলেছে বকের পাতি তাদের জানা বাসায়, অ- জানার পথ দিয়ে।

সেই আগুনের কালোরূপের মধ্যে থেকে ফিন্‌কি দিয়ে ছুটকে বেরুল সোনার তলোয়ার হাতে—দেখা যায় না এমনি

একজন কেউ, কেবল শোনা গেল তার দুন্দুভিধ্বনি তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে চলে গেল।

তারপর সে কি কান্না—অলক্ষ্য থেকে কার লক্ষ চোখের জল ঝর ঝর করে ঝরে পড়লো—হিজল গাছের মাথায় আর নদীর বুকে। অমনি একি কাণ্ড! সন্ধ্যা গেল মিলিয়ে, লীলা গেল ভেঙ্গে।

ভিজতে ভিজতে হিজলগাছ বল্‌লে, একিগো একি?

চিরজীবনের পথে দাঁড়িয়ে নদী বল্‌লে, এ যে রূপের সীমা পাবার তরে অ-রূপের অনাদিকালের বুকফাটা হাহাকার। এর মানে?

নদী হেসে বলে উঠ্‌লো—কুল, কুল কুল!

৩। আধিভৌতিক।

বাপ-মা-মরা বারো বছরের ছেলেটী, পরণে তার ছেঁড়া ন্যাকড়া, মাঘের শীতে গা'হাত পা ফেটে গেছে; কাঁপতে কাঁপতে এসে ধনীর সিংহদরজায় দাঁড়ালো।

শাল গায়ে বুট জুতা পায়ে ধনীর ছেলের হাতের কমলা লেবুটীর ওপর তার চক্ষুকোটর থেকে ক্ষুধাতুর দৃষ্টি স্তম্ভিত হয়ে রইল। বালাপোষ গায়ে হাতীর বাচ্ছার মত থপ থপ করে আস্‌ছিলেন, বড় বাবু। ছেলেটী তাঁর পায়ের কাছে পড়ে বল্লে, দুটী খেতে দাও বাবু, নইলে আজ আমি মরে যাব।

মুখ খিঁচিয়ে বড় বাবু বল্‌লেন, "তা মর না কেন, তোমাকে যে বাঁচতেই হবে এমন তো কোন কথা নেই।"

মোসাহেব দু'জন, দেওয়ানজী ও দারোয়ান একসঙ্গে হেসে উঠ্‌লো। বড় বাবুর কথার ভারী দাম—একেবারে অকাট্য। ছেলেটী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

রোদে পিঠ দিয়ে বসে ছেলেটী ভাবছিল সেই লাল টুক্‌টুকে কমলা লেবুটী—খড়মের ঠোক্কর খেয়ে চম্‌কে উঠতেই কর্কশ কণ্ঠে স্মৃতিরত্ন মশাই বলে উঠ্‌লেন, নচ্ছার বেটা মরবার আর জায়গা পাওনা, প্রাতঃস্নান করে চলিছি, বুড়ো মানুষকে আবার চান করালি? আবার এক ঘা খড়মের বাড়ী খেয়ে সে ভুঁএর উপর মুষড়ে পড়লো,—স্মৃতিরত্ন মশাই শ্রীবিষ্ণু বলে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিলেন।

যার ঘর বাড়ী নেই, সে পথেও দাঁড়াতে পারে না? পিঠে হাত বুলতে বুলতে ছেলেটী উঠে টল্‌তে টল্‌তে চল্‌লো।

রায়েদের প্রফুল্ল 'মর্ণিং ওয়াক' শেষ করে বাড়ী ফিরছিল। সে কলেজে পড়ে, মেসে থাকে,—সে সহুরে চালাক; তাকে ঠকায় কার সাধ্য।

বাবু, দুটো পয়সা দাও না, মুড়ী কিনে খাব। কাল কিছু খাইনি। তার করুণ কান্নায় সহুরে মরালিষ্ট চমকে উঠ্‌লো।

পাজী, কোকেন্‌খোর, তোমার অধঃপাতে যাওয়ার আমি সাহায্য করবো?

ছেলেটীর উদাস কাতর ঘোলাটে চোক দুটীর ওপর তীব্র জ্বালা ছড়িয়ে দিয়ে প্রফুল্ল বল্‌লে, আর ন্যাকামি করতে হবে না, বারো জেলার ভাত আমার পেটে, আমাকেও ঠকাতে চাও, আস্পর্দ্ধা বটে!

ছড়িখানা তার নাকের ডগার ওপর ঘুরিয়ে নিয়ে প্রফুল্ল চলে গেল—

কেউ তার দুঃখ বুঝলো না। সেও বোঝাতে পারলো না।

* * * * *

লাল গামছা খানায় মুখ ঢেকে ঘাটের সোপানে থম্‌কে দাঁড়িয়ে বোস-গিন্নি বলে উঠ্‌লেন, আহা দুঃখীর বাছা এমনি করে মরে গেল!

তাঁর পেছন থেকে একজন বুদ্ধিমান অবুঝ বলে উঠ্‌লো—ও আমি আগেই জান্‌তাম।

ঠাণ্ডা লেগে নিমুনিয়া হয়েছিল বুঝি!

ধনীর বাড়ীর মেথররা এসে হাত পা বেঁধে নিয়ে গেল। যারা স্নান করতে এসেছিল, তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মরল কিন্তু মা-বাপ-হারা ছেলেটী। তার যে বাঁচতেই হবে এমন কোন কথা নেই।

রোগ-শান্তি

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

১

রাজকুমারী ইন্দুলেখার গভীর মানসিক বিকার উপস্থিত হয়েছে—সারা রাজত্বে ঢেঁড়া পড়ে গেল—যে তাঁকে ব্যাধি মুক্ত করতে পারবে, সে রাজার বহুমূল্য কণ্ঠহার উপহার পাবে।

রাজকুমারী কক্ষতলকে আরসী মনে করে তার উপরে নিজের মুখের ছায়া খুঁজতে যান, সুগন্ধ কুসুমের গন্ধ তিনি অনুভব করতে পারেন না, সুকোমল শয্যাতেও তাঁর ঘুম হয় না। তাঁর বসন ভূষণে যত্ন নেই, সৌন্দর্য্য-রক্ষার চেষ্টা নেই, কথাবার্ত্তায়ও সে অনুরাগ নেই। বকুলবৃক্ষের মর্ম্মর বেদিকার উপর বসে' যোগ-ক্লান্ত মৌনীর মত তাঁর সারা সন্ধ্যাটী কেটে যায়,—সখীরা কেউ কাছে গেলে, বা রাণী কিছু জিজ্ঞাসা করলে তিনি অকারণে রাগ করেন। সখী অশোকা ক্ষুণ্ণমনে বললে, 'কই, সই ত আগে এ রকম ছিল না! আগে আমাদের মধ্যে যে গম্ভীরমুখে থাকতো তারই সাজার ব্যবস্থা হতো।' বসন্তলতা বললে, 'ওলো, এর মধ্যে বোধ হয় প্রণয় আছে। না হলে এমন সদাই মন ভার, কারু সঙ্গে কোন কথা পর্য্যন্ত নেই।—সেই যে সেদিন গঙ্গাস্নানে গিয়ে ঘোড়ায় চড়া' রক্তবেশ সেই রাজপুত্র,—' বলতে বলতেই সে থেমে গেল, কারণ রাণীমা এসে তখনি বললেন 'বসন্ত, অশোক—তোরা মা সবই ইন্দুর কাছে কাছে থাকবি। কি জানি কখন ভাগ্যে আমার কি আছে।' বসন্ত জনান্তিকে বললে—'তোমার ভাগ্যে জামাতা লাভ, আর আমাদের ভাগ্যে দূতীগিরি!'

২

একটী মেয়ে—তাও আবার হারাতে হয় ভেবে রাজা ভূপেন্দ্রজিতের বড়ই মন খারাপ। শুভদিনে শুভলগ্নে আজ বিরাট সভার আহ্বান হয়েছে। সুপ্রশস্ত কক্ষতলে যথাযোগ্য আসনে পাত্রমিত্র সবাই বসেছেন। রাজার পাশেই অবনতমুখী ইন্দুলেখা। তাঁর পাশে মন্ত্রী মহাশয়। সভার কার্য্য কতকটা হয়ে এসেছে, এমন সময় একজন তরুণ ভিক্ষুক দ্বাররক্ষকের সহিত সভামধ্যে এলো। গুচ্ছে গুচ্ছে কৃষ্ণ কেশের রাশি তার গণ্ডে অংশে এসে পড়েছে, তার সুন্দর মুখে বিজয়-দৃপ্ত হাসির একটু মধুর আভাস। মুক্ত অঙ্গে রূপের বিলাস, নয়নদ্বয়ে একটা সুদূর চাউনি—অতি গভীর, প্রশান্ত অথচ কোমল। অঙ্গে কাষায় প্রাবার—ঠিক যেন সন্ধ্যার আকাশে গেরুয়া রংএর মেঘের লীলা। এই তরুণ ভিক্ষা-ব্যবসায়ী আজ রাজকুমারীকে নীরোগ করে দেবে বলে রাজ সভার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে এই আগন্তুকের রূপের পানে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তার বিচিত্র সুন্দর রাজোচিত দেহ ও নির্ভীক ব্যবহার দেখে কেউ বিশ্বাসই করতে পারলেনা যে তার চরক সুশ্রুতে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে। 'ধনের লোভে অনেকেই হাঁড়ি-কাঠে মাথা এগিয়ে দিতে আসে'—মন্ত্রী মহাশয় একটু মুচকি হেসে যখন এই সিদ্ধান্তটী প্রকাশ করলেন, তখন সভাতলে একটা অস্ফুট হাস্যের মৃদু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। রাজকুমারী ইন্দুলেখার কিন্তু কোন দিকেই নজর নেই,—তিনি তাঁর গন্ধাঢ্য বসনাঞ্চলটী দক্ষিণ হস্তের দ্বারা ধীরে ধীরে বাম হস্তের তর্জ্জনীমূলে জড়াচ্ছিলেন। তাঁর অঙ্গে আজ বেশী অলঙ্কার নেই, মুক্ত বেণী সুবর্ণময় পৃষ্ঠের উপর বিলম্বিত, খদিরবর্ণ বক্ষোবাসে হৃদয়ের উপর পক্ষবিস্তারী একটী সুবর্ণ প্রজাপতি, নাসায় বেসর, কর্ণে হীরকের প্রোজ্জ্বল দুল, গলায় মুক্তার মোহনমালা, দুই হাতে দুই গাছি হীরক-জড়িত সুবর্ণ-বলয়, আর পদযুগে মুক্তার নূপুর। মুখে তাঁর সে হাসি নেই, চক্ষে তাঁর সে জ্যোতি নেই, সর্ব্বশরীরে যেন একটা অনির্ব্বচনীয় স্তিমিত অবসাদ। পরিপূর্ণ কণ্ঠতল ও বাহুমূল শিথিল হয়ে পড়েছে। সেই লোকবিমোহন রূপের দিকে চেয়ে দেখলেই মা

হয় যেন ইন্দুর উপর অকস্মাৎ রাহুর ছায়া ঘিরে এসেছে।

এতক্ষণ পরে একজন চিকিৎসকের আবির্ভাবে রাজা প্রথমে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভিক্ষুকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি বললেন, 'তুমি দেখছি বয়সে তরুণ অথচ ভিক্ষুক বেশধারী। তুমি আমার কন্যার চিকিৎসা করিতে এসেছ। কিন্তু তোমার হাতে আমার কন্যার চিকিৎসার ভার অর্পণ করবার পূর্ব্বে আমি তোমায় গটাকয়েক কথা বলে নিতে চাই।"

সভাসদ বলভদ্রদেব বললেন, "হাঁ, তা বটেইত। গোটাকতক সোজা কথা তোমার শুনতেই হবে। বাঁকা নয় অর্থাৎ—"

হেমকিঙ্কর বললেন, "হিতং মনোহারীচ দুর্লভং—"

গৌরীবর্দ্ধন বললেন,'কান্তাসম্মিততয়োপদেশ—'

রাজা ভুপেন্দ্রজিত সভাসদ্‌গণকে থামিয়ে বললে 'ভদ্রগণ, আপনাদের বাক্‌পটুতা একটু সংযত রেখে আগে আমার কথাগুলি একবার শুনুন। এই তথাকথিত চিকিৎসক যদি তার কার্য্যে বিফলকাম হয়, তাহলে একে শূলে দেওয়া হবে। আর সদ্যসমক্ষেই কুমারী ইন্দুলেখার ব্যাধি-নির্ণয় ও রোগশান্তি করতে হবে। কেমন হে ভিক্ষুক এতে তুমি রাজী আছ?'

এতক্ষণ পরে তরুণ ভিক্ষুকের মুখে সেই গোপন হাসিটি ফুটে উঠলো। চারু প্রাবারমধ্য হতে সে যখন তার দক্ষিণ হস্তটী বার করলে, তখন দেখা গেল তার হস্তে একটী সুন্দর সেতার। সে হেসে বললে, 'মহারাজ, আপনি যে প্রথম থেকেই আমায় ভুল বুঝলেন। কে বললে আমি বৈদ্য? কে বললে আমি আপনার কন্যার রোগ শান্তি করতে এসেছি? কে বললে আমি অর্থের কাঙ্গাল?' এই কথা গুলি বলতে বলতে তার উদার ললাটপটে ক্রোধের অগ্নি-জ্বালা জ্বলে উঠলো—শিবের তৃতীয় নয়নের মত।

সভাস্থ সকলেই তাঁদের পূর্ব্বসিদ্ধান্ত ধূলিস্মাৎ হয়েছে দেখে প্রবীন জ্যোতির্ব্বিদ গৌরীবর্দ্ধন শর্ম্মার দিকে রোষ-কষায়িতনেত্রে চেয়ে রইলেন।

রাজা ভুপেন্দ্রজিত ততোধিক অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বললেন, 'তুচ্ছ ভিক্ষুক, কে তোমার এই কপট ক্রোধ সহ্য করবে? তুমি তবে কিসের জন্য এই রাজসভায় অনধিকার প্রবেশ করেছ? দ্বাররক্ষী—?'

ভিক্ষুক এইবার শান্তমনে বললে—'মহারাজ ক্রুদ্ধ হবেন না। আমার একটী সকাতর প্রার্থনা আছে। সম্রাটকে প্রার্থনা জানাবার অধিকার সকলেরই আছে। এ কথা আপনার সভার এই বিবুধমণ্ডলী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন।'

মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি প্রার্থনা শীঘ্র বল

'সারা জীবন ধরে আমি যে গানটা শিখেছি, তাই আজ আপনাকে এই মধুর প্রভাতে শোনাবার জন্য আমি অবন্তিকা হতে সারা পথ ছুটে এসেছি।'

সভাস্থলে একটা হৈচৈ পড়ে গেল। মন্ত্রী মহাশয় আর আত্মসংবরণ করতে না পেরে তাকে একেবারে প্রস্থানের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রাজ-সভায় ভিক্ষুকের গান—?'

এতক্ষণে রাজকুমারী ইন্দুলেখা মুখ তুললেন। তিনি বীণানিন্দিত কণ্ঠে মন্ত্রী মহাশয়ের দিকে শিশুসুলভ প্রার্থনায় বললেন, 'হোক্ না ভিক্ষুক, মন্ত্রী মহাশয়, নাথ সভার অঙ্গই ত সঙ্গীত।'

এতদিন পরে বিকৃতবুদ্ধি ইন্দুলেখার মুখে এই কয়টা কথা শুনে রাজা অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। তিনি আদেশ দিলেন, 'আচ্ছা, তোমার প্রার্থনা শুনলুম।'

ভিক্ষুক প্রথমে বলিল, 'আমার নাম জয়ন্ত। অবন্তিকায় আমার দেশ। প্রতি প্রভাতে আমি গঙ্গায় অবগাহন স্নান করি। গঙ্গার ঘাটে গান শোনাইয়া যাহা উপায় করি, তাহাই আমার জীবিকা। আমি শ্রীগুরুদেব লোচনকুমার নিকট অনেক সুর শিখেছি। কিন্তু আমি গান জানি কেবল একটা।' এই বলিয়া জয়ন্ত তার ক্ষুদ্র সেতার সহযোগে দরবারী মালকোষ, কানাড়া, ললিত, বিভাস, খাম্বাজ প্রভৃতি অনেক সুরের আলাপ করল। বিশাল সভাগৃহ স্বর-মূর্চ্ছনায় যেন মূর্চ্ছাহত হয়ে পড়ল। কোথাও একটু

স্পন্দন মাত্র নেই। চারিদিকে স্বরের তরঙ্গে ভরে উঠল। অন্তঃপুরচারিনীরা সভাগৃহের মর্ম্মর জালায়ন পথে এসে দাড়ালেন। রাজকুমারী ইন্দুলেখার কণ্ঠের বসন স্রস্ত হয়ে গেল, কপোলদেশে শোণিমরাগ ফুটে উঠল, বন্ধুর বক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুতচ্ছন্দে জেগে উঠল। ললিতে যে প্রভাত চিত্র ভিক্ষুক তারের স্পন্দনে জাগিয়ে তুলেছে, তা চখের সমক্ষে প্রতিভাত দেখে মন্ত্রী মহাশয়ের রেশমী পাগড়ি খুলে গেল, তর্কশাস্ত্রে সুনিপুণ ও কুশাগ্রবুদ্ধি রাজেন্দ্র মিশ্রের কটিতটে বসন অসংযত হয়ে পড়ল, বহুকল্পদুর্ল্লভ রাজ সিংহাসন পর্য্যন্ত মহারাজের অনুরাগ বেদনায় কেঁপে উঠল। নেপথ্যে শুদ্ধান্তবাসিনীগণের আনন্দ অস্ফুট নূপুরঝঙ্কারে ও অলঙ্কারশিঞ্জিনীতে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। তখন ও জয়ন্তের চম্পক কলিকাসন্নিভ আঙ্গুলগুলি ক্রীড়াচ্ছলে যেন সেতারের সূত্রপথে দ্রুত সঞ্চারিত হচ্ছিল। সেনাপতি মহাশয় কটিদেশ থেকে কোষবদ্ধ কৃপাণ খুলে ভিক্ষুককে পুরস্কার দিলেন, ভ্রান্ত মনে রাজা বহুমূল্য কণ্ঠহারটী জয়ন্তের গলায় পরিয়ে দিলেন, আর প্রেমমুগ্ধা রাজকুমারী ইন্দুলেখা উদ্বেলিত বক্ষতট থেকে সেই পক্ষবিস্তারী সুবর্ণ প্রজাপতিটী মোচন করে জয়ন্তের অভিনন্দন-স্বরূপ মর্ম্মর পাদপীঠে রেখে দিলেন।

পরিশ্রান্ত গায়ক সুর থামিয়ে এবার যখন ক্ষুদ্র সেতারকে প্রিয়তম বন্ধুর মত বক্ষে তুলে নিলেন, তখন তাঁর বদন-কমল আনন্দ ও জয়শ্রীর অরুণ কিরণে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যা পাওয়ার আশা ছিল তা যেন সবই অতি মাত্রায় পাওয়া হয়ে গেছে—এমনি ভাব। তরুণ চিক্কণ প্রশস্ত সুন্দর নবোদ্গতকেশ তার বক্ষস্থল—উত্তরীয়ের দুই অঞ্চল হৃদয়ের মধ্যদেশে একত্র করে' তারই উপরে ঈষৎ বেপমান সুবর্ণ প্রজাপতিটী সংযুক্ত করে দিলেন। তরুণী ইন্দুলেখা লজ্জায় মোহে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

৪

ইন্দুলেখার ভাব পরিবর্ত্তনে রাজার মন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে

গায়ক ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করে' উদাসনেত্রে জনপূর্ণ সভার দিকে চেয়ে গান আরম্ভ করলেন। মধুর মৈথিলী ভাষায় কথা। মিশ্রসুরে যুগযুগান্তের গোপন বেদনা, গভীর আত্মনিবেদন ও বাঞ্ছিতের প্রতি বিপুল আকর্ষণ প্রকাশিত হলো।

জয়ন্ত বললেন, 'কোথায় সেই ধরণীর প্রথম প্রভাত। কোথায় ওগো, কোথায়! শরতের স্নিগ্ধ প্রভাতে গঙ্গার তটে সেই মুহূর্ত্তের চাক্ষুষ মিলন! হে আমার চিরপ্রিয় অন্তরতম দেবতা, তোমার নয়নে কি আকর্ষণ ছিল,—জীবনের সেই একটী প্রভাত আগামী সহস্র জীবনে চিরকালের জন্য জেগে রইল। তোমার কিশোর বয়স, কোমল মন,—কিন্তু হে বন্ধু, তুমি যখন চারুচন্দন লেখায় চিত্রিত হয়ে দেবতার উপায়ন-সম্ভার হাতে করে' নতবদনে সখী পরিবৃতা হয়ে মন্দির পথে যাচ্ছিলে, তখন পান্থ-হারা পথে সৌন্দর্য্যের হিল্লোল জেগে উঠলো।'

মাত্র অর্দ্ধাংশটুকু বলা হয়েছে, এমন সময় কুমারী ইন্দুলেখার বদন পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। গায়ক তা লক্ষ্য করেই গাইতে লাগলেন, 'হে আমার সাধনার ধন! প্রথম দর্শনেই তুমি যে আমার সব কেড়ে নিয়ে আমায় পথের ভিখারী করেছ, দেবি! আজ তাই তোমারি দুয়ারে ভিক্ষার জন্য আমি এসে দাঁড়িয়েছি! আমার ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে দাও, প্রিয়তম দয়িত আমার! অন্নপূর্ণার মন্দির দ্বারে এসে আজ আমায় যেন শূন্য হাতে ফিরে যেতে না হয়,—সিন্ধু নিকটে যার, কণ্ঠ সুখায়ল, কি করবি বারিদ-মেঘে! সমুদ্র কাছে থাকতে যে তৃষ্ণার্ত্তকণ্ঠে ফিরে যায়—মেঘের জলে তার কি করবে! আমার হৃদয় যে আমার চোখের কাছেই ছিল, তাই বন্ধু, তুমি এমনি নিষ্ঠুর হয়ে সেটী কেড়ে নিয়ে এসেছ! হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব, কি করবি মাধবী-মাসে! চন্দ্রের আলোকেই যদি পদ্ম শুখিয়ে যায়, তখন আর বসন্ত-বাতাসে কি হবে! হৃদয়ের রক্তে যে তোমারি প্রেমের উচ্ছ্বাস ছুটে চলেছে, আমি কেমন করে তাকে সংযত করব, বলে দাও! পূজা নিরতা সেই প্রভাতের দেবী—প্রশান্ত নয়ন, সুকুমার দেহ, অপূর্ব্ব বিলাস,—কেমন করে সে সব ভুলতে হয় আজ আমায় শিখিয়ে দাও, বন্ধু আমার! তোমার হৃদয়ের সুমেরু শিখরের প্রজাপতি আজ তোমারি আশ্লেষে আমার অন্তর

তটে এসে বসেছে। সে আজ আমার হৃদয়ের বাণী শ্রবণময় হয়ে শুনে তন্ময় হয়ে পড়েছে! সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা—আমি তোমায় ভুলিনি, ভুলতেও পারবো না, এখন আজ আমায় শেষ কথা বলে বিদায় দাও।

সকলেই তন্ময় হয়ে প্রেমের এই অদ্ভুত আত্মনিবেদনের কথা শুনছিলেন। ইতিমধ্যে গান কখন শেষ হয়ে গেছে, তা কেউই জানতে পারেননি। কিন্তু হঠাৎ যখন ইন্দুলেখা মূর্চ্ছিত হয়ে সেই পাদপীঠ সমীপে পড়ে গেলেন, তখন সকলেই চমকিত হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি তাঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়া হলো।

রাজা বললেন, 'ভিক্ষুক, তুমি মায়াবিদ্যা জানো। তোমারি জন্য আজ আমার কন্যার এ দশা হলো। আমি আদেশ দিলাম—আজীবন তোমার অন্ধকারে কারাবাস।

লৌহশৃঙ্খলিত বন্দী হাসতে হাসতে প্রহরীর সঙ্গে আঁধার কারাগারে চলে গেল।

৫

ক্রমে ক্রমে ইন্দুলেখা সুস্থ হয়ে উঠলেন।

কারাগারের প্রহরীরা সর্ব্বদাই তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে বলে তাদের নামে রাজার কাছে নালিশ এলো।

রাজা কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'প্রহরিগণ, তোমাদের কি বক্তব্য আছে বলে যাও।'

সকলেই বললে, 'মহারাজ, জয়ন্তের সেতার শুনে আমরা কেউ নিজের কাজে মন লাগিয়ে থাকতে পারি না।'

রাজা বললেন, 'সে ভোজবিদ্যা জানে। আচ্ছা, তাকে সভায় নিয়ে এসো।'

রাজকুমারী ইন্দুলেখা ও রাজা ভূপেন্দ্রজিতের নিকট যখন জয়ন্ত এসে দাঁড়ালো, তখনও তার মুখে সেই মধুর হাসি। রাজকুমারী শুধু মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন সেই তরুণ সুন্দর বিকচ মোহন মুখের পানে।

রাজা বললেন, 'ভিক্ষুক তোমার নামে ভয়ানক অভিযোগ আছে। তুমি মায়াবিদ্যার দ্বারা সেতার বাজিয়ে কর্ত্তব্য পরায়ণ প্রহরীদের মায়াচ্ছন্ন করে দাও। এ বিষয়ে তোমার কি বক্তব্য আছে বল।'

জয়ন্ত বললে, 'আমি রাজকুমারীর পানিপ্রার্থি ভিক্ষুক।'

সভাস্থ সকলেই ভাবিল—এ তরুণ বয়সে আঁধার কারাগারে কয়দিন আবদ্ধ থেকেই গায়কটা একেবারে পাগল হয়ে গেল—হায়, হায়! বিধির বিড়ম্বনা!

মহারাজা গর্জ্জন করে উঠলেন, 'উন্মাদ ভিক্ষুক! সত্য করে বল—তুমি কে?'

সেই মেঘস্তনিত শব্দে সারা সভাটী কেঁপে উঠলো।

নির্ভিক ভিক্ষুক স্থির অকম্পিত স্বরে বললে, 'আমি অবন্তিকার রাজপুত্র হেমকেতু।'

বিরাট সভা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ইন্দুলেখা শিউরে উঠলেন।

মুহূর্ত্ত পরে রাজকুমারী ইন্দুলেখা অকম্পিত অথচ লাজ মন্থর চরণে রাজপুত্র হেমকেতুর সম্মুখে এসে তাঁর গলায় বিশদ সুন্দর মুক্তার মোহনমালা বাঞ্ছিতের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।

—

স্বরাজ সাধনায় নারী—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্রে ত্রিবিধ দুঃখের কথা আছে। পৃথিবীর দুঃখকেই হয়ত ঐ তিনটীর পর্য্যায়েই ফেলা যায়, কিন্তু আমার আলোচনা আজ সে নয়। বর্ত্তমান কালে যে তিনপ্রকার ভয়ানক দুঃখের মাঝখান দিয়ে জন্মভূমি আমাদের গড়িয়ে চলেচে, সেও তিনপ্রকার সত্য, কিন্তু সে হচ্চে, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক। রাজনীতি আমরা সবাই বুঝিনে, কিন্তু এ কথা বোধ করি অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারি, এই তিনটীই একেবারে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। একটা কথা উঠেছে, একা রাজনীতির মধ্যেই আমাদের সকল কষ্টের, সকল দুঃখের অবসান। হয়ত একথা সত্য, হয়ত নয়, হয়ত বা সত্যে মিথ্যায় জড়ানো, কিন্তু এ কথাও কিছুতেই মিথ্যা নয় যে, মানুষের কোনো দিক দিয়েই মানুষে দুঃখ দূর করার সত্যকার প্রচেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইয়ে যেতে পারে। যাঁরা রাজনীতি নিয়ে আছেন তাঁরা সর্ব্বথা, সর্ব্বকালেই আমাদের নমস্য। কিন্তু আমরা, সকলেই যদি তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবার সুস্পষ্ট চিহ্ন খুঁজে না ও পাই, যে দাগ গুলো কেবল স্থূল দৃষ্টিতেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়,—আমাদের আর্থিক এবং সামাজিক স্পষ্ট দুঃখ গুলো—কেবল এই গুলিই যদি প্রতিকারের চেষ্টা করি, বোধ হয় মহাপ্রাণ রাজনৈতিক নেতাদের স্কন্ধ থেকে একটা মস্ত গুরুভারই সরিয়ে দিতে পারি।

এই সভায় আমার ডাক পড়েছে দুটো কারণে। একেত মৈত্রমশাই আমার বয়সের সম্মান করেছেন, দ্বিতীয়তঃ একটা জনরব আছে, দেশের পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে আমি অনেকদিন ধরে অনেক ঘুরেচি। ছোটবড়, উচু নীচু, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, বহু লোকের সঙ্গে মিশে মিশে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করে রেখেচি। জনরব কে রটিয়েছে খুঁজে পাওয়া শক্ত, এবং এর মধ্যে যত অত্যুক্তি আছে, তার জন্য আমাকেও দায়ী করা চলে না। তবে, হয়ত কথাটা একেবারে মিথ্যাও নয়। দেশের নব্বুই জন যেখানে বাস করে আছেন সেই পল্লীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক আগ্রহ অনেক কৌতূহল দমন করতে না পেরে অনেক দিনই ছুটে গিয়ে তাঁদের মধ্যে পড়েচি, এবং তাঁদের বহু দুঃখ, বহু দৈন্যের আজও আমি সাক্ষী হয়ে আছি। তাঁদের সেই সব অসহ্য, অব্যক্ত, অচিন্তনীয় দুঃখ দৈন্য ঘোচাবার ভার নিতে আজ আমার দেশের সমস্ত নরনারীকে আহ্বান করতে সাধ যায়, কিন্তু কণ্ঠ আমার রুদ্ধ হয়ে আসে, যখনই মনে হয়, মাতৃভূমির এই মহাযজ্ঞে নারীকে আহ্বান করা আমার কতটুকু অধিকার আছে! যাকে দিই নি, তার কাছে প্রয়োজনে দাবী করি কোন্ মুখে? কিছুকাল পূর্ব্বে 'নারীর মূল্য' বলে আমি একটা প্রবন্ধ লিখি, সেই সময় মনে হয় আচ্ছা, আমার দেশের অবস্থা ত আমি জানি, কিন্তু, আরও ত ঢের দেশ আছে, তারা নারীর দাম সেখানে কি দিয়েছে? বিস্তর পুঁথি পত্র ঘেঁটে যে সত্য বেরিয়ে এল, তা দেখে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। পুরুষের মনের ভাব, তার অন্যায়, এবং অবিচার সর্ব্বত্রই সমান। নারীর ন্যায্য অধিকার থেকে কমবেশী প্রায় সমস্ত দেশের পুরুষ তাঁদের বঞ্চিত করে রেখেচেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাই আজ দেশ জুড়ে আরম্ভ হয়ে গেছে! স্বার্থ এবং লোভে, পৃথিবী জোড়া যুদ্ধে, পুরুষে যখন মারামারি কাটাকাটি বাধিয়ে দিলে তখনই তাদের প্রথম চৈতন্য হল, এই রক্তারক্তিই শেষ নয়, এর উপরে আরও কিছু আছে। পুরুষের স্বার্থের যেমন সীমা নেই, তার নির্লজ্জতারও তেম্‌নি অবধি নেই। এই দারুণ দুর্দ্দিনে নারীর কাছে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়াতে তার বাধ্‌লনা। আমি ভাবি, এই বঞ্চিতার দান না পেলে এ সংসার

বাপী নরহন্তের প্রায়শ্চিত্তের পরিমাণ আজ কি হত? অথচ, একথা ভুলে যেতেও আজ মানুষের বাধে নি।

আজ আমাদের ইংরাজ Government এর বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ক্ষোভের অন্ত নেই। গালিগালাজও কম করিনে। তাদের অন্যায়ের শাস্তি তারা পাবে, তিনি কেবল মাত্র তাদেরই ত্রুটির উপর ভর দিয়ে আমরা যদি পরম নিশ্চিন্তে আত্মপ্রসাদ লাভ করি তার শাস্তি কে নেবে? এই প্রসঙ্গে আমায় কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-খুড়া জ্যেঠাদের ক্রোধারক্ত মুখ গুলি ভারি মনে পড়ে। এবং সেই সকল মুখ থেকে যে সব বাণী নির্গত হয় তাও মনোরম নয়! তাঁরা আমাকে এই বলে অনুযোগ করেন, আমি আমার বইয়ের মধ্যে কন্যা-পণের বিরুদ্ধে মহা হৈ চৈ করে তাঁদের কন্যাদায়ের সুবিধা করে দিইনে কেন?

আমি বলি মেয়ের বিয়ে দেবেন না।

তাঁরা চোখ কপালে তুলে বলেন, সে কি মশায় কন্যা-দায় যে!

আমি বলি, তাহলে কন্যা যখন দায় তখন তার প্রতি-কার আপনি করুন, আমার মাথা গরম করার সময়ও নেই, বরের বাপকে নিরর্থক গালমন্দ করবারও প্রবৃত্তি নেই। আসল কথা এই যে, বাঘের সুমুখে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় করে তাকে বোষ্টম হতে অনুরোধ করায় ফল হয় বলেও যেন আমার ভরসা হয় না; যে বরের বাপ কন্যাদায়ীর কান মুচ্‌ড়ে টাকা আদায়ের আশা রাখে তাকেও দাতা কর্ণ হতে বলায় লাভ হ'বে বিশ্বাস করিনে। তার পায়ে ধরেও না, তাঁকে দাঁত খিঁচিয়েও না; আসল প্রতিকার মেয়ের বাপের হাতে, যে টাকা দেবে তার হাতে। অধিকাংশ কন্যাদায়ীই আমার কথা বোঝেন না, কিন্তু কেউ কেউ বোঝেন। তাঁরা মুখখানি মলিন করে বলেন, 'সে কি করে হবে মশাই, সমাজ রয়েছে যে! সমস্ত মেয়ের বাপ যদি এ কথা বলেন ত আমিও বল্‌তে পারি, কিন্তু একা ত পারিনে!' কথাটা তাঁর বিচক্ষণের মত শুন্‌তে হয় বটে, কিন্তু আসল গলদও এইখানে। কারণ, পৃথিবীতে কোন সংস্কারই কখনো দল বেঁধে হয় না! একাকীই দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ আছেই। কিন্তু এই স্বেচ্ছাকৃত একাকীত্বের দুঃখ, একদিন সংঘবদ্ধ হয়ে বহুর কল্যাণকর হয়। মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, ভার বলে নেয় না, সে-ই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না। আর নেওয়াই নয়, মেয়ে মানুষকে মানুষ করার ভারও তারই উপরে এবং এইখানেই পিতৃত্বের সত্যকার গৌরব।

এ সব কথা আমি শুধু বল্‌তে হয় বলেই বল্‌চিনে; সভায় দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের আদর্শের অভিমান নিয়েও প্রকাশ করচিনে, আজ আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই একথা বল্‌চি। আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন— আমিও তাঁদের একজন। কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছু-তেই আমাকে ভরসা দিচ্চেন না। কোথায় কোন অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্চেন এ হবার নয়। যে চেষ্টায়, যে আয়োজনে দেশের মেয়ে-দের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি কর-বার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি, তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুদ্ধ মাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। গেলেও সে থাক্‌বে না। মেয়েমানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেচি মানুষ হতে দিই নি স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যে দিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেচে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করেনি, তার দেনা আগে তাকে শেষ কর-তেই হবে!

এইখানে একটা আপত্তি উঠ্‌তে পারে যে, নারীর পক্ষে সতীত্ব জিনিসটা তুচ্ছ ও নয়, এবং দেশের লোক তাদের মা-বোন-মেয়েকে সাধ করে যে ছোট করে রাখতে চেয়েচে তাও ত সম্ভব নয়। সতীত্বকে আমিও তুচ্ছ বলিনে কিন্তু একেই তার নারী জীবনের চরম ও পরম শ্রেয় জ্ঞান করাকেও কুসংস্কার মনে করি। কারণ, মানুষের মানুষ হবার যে স্বাভাবিক এবং সত্যকার দাবী একে ফাঁকি দিয়ে যে কেউ যে-কোন-একটা-কিছুকে বড় করে খাড়া করতে গেছে, সে তাকেও ঠকিয়েছে নিজেও ঠকেচে।

তাকেও মানুষ হতে দেয়নি, নিজের মনুষ্যত্বকেও তেমনি অজ্ঞাতসারে ছোট করে ফেলেচে। এ কথা তার মন্দ চেষ্টায় করলেও সত্য, তার ভাল চেষ্টায় করলেও সত্য! Frederic the Great মস্ত বড় রাজা ছিলেন, নিজের দেশের এবং দশের তিনি অনেক মঙ্গল করে গেছেন, কিন্তু তাদের মানুষ হতে দেননি। তাই তাঁকেও মৃত্যুকালে বলতে হয়েছে 'all my life I have been but a slave driver!' এই উক্তির মধ্যে ব্যর্থতার কত বড় যে গ্লানি অঙ্গীকার করে গেছেন সে কেবল জগদীশ্বর জেনেছিলেন।

আমার জীবনের অনেকদিন আমি Sociologyর (সমাজতত্ত্ব) ছাত্র ছিলাম। দেশের প্রায় সকল জাতিগুলিকেই আমার ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ হয়েছে,—আমার মনে হয় মেয়েদের অধিকার যারা যে পরিমাণে খর্ব্ব করেছে, ঠিক সেই অনুপাতেই তারা, কি সামাজিক কি আর্থিক, কি নৈতিক সকল দিক দিয়েই ছোট হয়ে গেছে। এর উল্টো দিকটাও আবার ঠিক এমনি সত্য। অর্থাৎ, যে জাতি যে পরিমাণে তার সংশয় ও অবিশ্বাস বর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছে,—নিজেদের অধীনতার শৃঙ্খলও তাদের তেমনি ঝরে গেছে। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ। পৃথিবীতে এমন একটা দেশ পাওয়া যাবে না যারা মেয়েদের মানুষ হবার স্বাধীনতা হরণ করেনি, অথচ তাদের মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা অপর কোন প্রবল জাত কেড়ে নিয়ে জোর করে রাখতে পেরেচে। কোথাও পারেনি,—পারতে পারেও না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই নয়। আমাদের আপনাদের স্বাধীনতার প্রযত্নে আজ ঠিক্ এই আশঙ্কাই আমার বুকের ওপর জাঁতার মত বসে আছে। মনে হয় এই শক্ত কাজটা সকল কাজের আগে আমাদের বাকি রয়ে গেছে, ইংরাজের সঙ্গে যার কোন প্রতিদ্বন্দিতা নেই। কেউ যদি বলেন, কিন্তু এই এসিয়ায় এমন দেশও ত আজও আছে মেয়েদের স্বাধীনতা যারা একতিল দেয়নি; অথচ তাদের স্বাধীনতাও ত কেউ অপহরণ করেনি। অপহরণ করবেই এমন কথা আমিও বলিনি। তবুও আমি এ কথা বলি, স্বাধীনতা যে আজও আছে সে কেবল নিতান্তই দৈবাতের বলে। এই দৈব বলের অভাবে যদি কখনও এ বস্তু যায়, ত আমাদেরই মত কেবল মাত্র দেশের পুরুষের দল কাঁধ দিয়ে এ মহাভার সূচ্যগ্র ও নড়াতে পারবেনা। শুধু আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সত্যের ব্যত্যয় দেখি ব্রহ্ম দেশে। আজ সে দেশ পরাধীন। একদিন সে দেশে নারীর স্বাধীনতার অবধি ছিলনা। কিন্তু যে দিন থেকে পুরুষে এই স্বাধীনতার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে আরম্ভ করেছিল, সেই দিন থেকে, একদিকে যেমন নিজেরাও অকর্ম্মণ্য বিলাসী এবং হীন হতে সুরু করেছিল, অন্যদিকে তেমনি নারীর মধ্যেও স্বেচ্ছাচারিতার প্রবাহ আরম্ভ হয়েছিল। আর সেই দিন থেকেই দেশের অধঃপতনের সূচনা। আমি এদের অনেক শহর, অনেক গ্রাম, অনেক পল্লী অনেকদিন ধরে ঘুরে বেড়িয়েচি, আমি দেখতে পেয়েছি তাদের অনেক গেছে কিন্তু একটা বড় জিনিস তারা আজও হারায়নি। কেবল মাত্র নারীর সতীত্বটাকেই একটা 'ফেটিস' করে তুলে তাদের স্বাধীনতা তাদের ভাল হবার পথটাকে কণ্টকাকীর্ণ কোরে তোলেনি। তাই আজও দেশের ব্যবসা বাণিজ্য, আজও দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আজও দেশের আচার ব্যবহার মেয়েদের হাতে। আজও তাদের মেয়েরা একশতের মধ্যে নব্বই জন লিখতে পড়তে জানে, এবং তাই আজও তাদের দেশ থেকে আমাদের এই হতভাগ্য দেশের মত, আনন্দ জিনিসটা একেবারে নির্ব্বাসিত হয়ে যায়নি। আজ তাদের সমস্ত দেশ অজ্ঞতা, জড়তা ও মোহের আবরণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সত্য, কিন্তু একদিন যেদিন তাদের ঘুম ভাঙবে এই সমবেত নরনারী একদিন যেদিন চোখ মেলে জেগে উঠবে, সেদিন এদের অধীনতার শৃঙ্খল, তা সে যত মোটা এবং যত ভারিই হোক্, খসে পড়তে মুহূর্ত বিলম্ব হবে না তাতে বাধা দেয় পৃথিবীতে এমন শক্তিমান কেউ নেই।

আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙেচে। আমার বিশ্বাস এখন দেশে এমন একজন ও ভারতবাসী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট গৌরব, বিলুপ্ত সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখতে চায়। কিন্তু কেবল চাইলেই ত মেলেনা, পাবার উপায় করতে হয়। এই উপায়ের পথেই

যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত মতভেদ। এবং এই খানেই একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চির জীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা' পেতে দাও সে যেথানে এবং যারই হোক। এ আমার বই পড়া বড় কথা নয়, এ আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্ত্বকথা নয়,—এ আমার এই দরিদ্র জীবনের বার বার ঠেকে শেখা সত্য। আমি কেবল এই টুকু দিয়েই অত্যন্ত জটিল সমস্যার এক মুহূর্ত্তে মীমাংসা করে ফেলি। আমি বলি মেয়ে মানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হবে, তা সে ফল তার যাই হোক; হাড়ি-ডোমকেও যদি মানুষ বল্‌তে বাধ্য হই, এবং মানুষের উন্নতি করবার অধিকার আছে এ যদি মানি তাকে পথ ছেড়ে আমাকে দিতেই হবে, তা সে যেথানেই গিয়ে পৌছাক। আমি বাজে ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে কিছুতেই তাদের হিত করতে যাইনে। আমি বলিনে, বাছা তুমি স্ত্রীলোক, তোমার এ করতে নেই, ও বল্‌তে নেই ওখানে যেতে নেই,—তুমি তোমার ভাল বোঝনা—এস আমি তোমার মুখে পরদা এবং পায়ে দড়ি বেঁধে রাখি। ডোমকে ও ডেকে বলিনে, বাপু, তুমি যখন ডোম তখন এর বেশি চলা-ফেরা তোমার মঙ্গলকর নয়, অতএব এই ডিঙোলেই তোমার পা ভেঙে দেব। দীর্ঘ দিন বর্ম্মা দেশে থেকে এটা আমার বেশ কোরে শেখা, যে মানুষের অধিকার নিয়ে গায়ে পড়ে মেলাই তার হিত করবার আবশ্যক নেই।

আমি বলি যার যা দাবী সে ষোল আনা নিক। আর ভুল করা যদি মানুষের কাজেরই একটা অংশ হয়, ত সে যদি ভুল করে ত বিস্ময়েরই বা কি আছে, রাগ করবারই বা কি আছে! দুটো পরামর্শ দিতে পারি,—কিন্তু মেরে হাত পা খোঁড়া করে ভাল তার করতেই হবে, এত বড় দায়িত্ব আমার নেই। অতখানি অধ্যবসায় ও নিজের মধ্যে খুঁজে পাইনে। বরঞ্চ মনে হয়, বাস্তবিক, আমার মত কুঁড়ে লোকের মত মানুষে মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাটা যদি জগতে একটু কম করে কোরত ত তারাও আরামে থাক্‌ত এদের ও সত্যকার কল্যাণ হয়ত একটু আধটু হবার ও যায়গা পেত। দেশের কাজ, দেশের মঙ্গল করতে গিয়ে এই কথাটা আমার, তোমরা ভুলোনা।

আজ তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কথা বল্‌বার ছিল। সকল দিক দিয়ে কি কোরে সমস্ত বাঙ্‌লা জীর্ণ হয়ে আস্‌চে,—দেশের যারা মেরু-মজ্জা সেই ভদ্র গৃহস্থ পরিবার কি কোরে কোথায় ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে আস্‌ছে, সে আনন্দ নেই, সে প্রাণ সেই, সে ধর্ম্ম নেই, সে খাওয়া-পরা নেই; সমৃদ্ধ প্রাচীন গ্রাম গুলো প্রায় জন শূন্য,—বিরাট প্রাসাদ তুল্য আবাসে শিয়াল কুকুর বাস করে; পীড়িত, নিরুপায় মৃতকল্প লোক গুলো যারা আজও সেখানে পড়ে আছে, খাদ্যাভাবে, জলাভাবে কি তাদের অবস্থা,—এই সব সহস্র দুঃখের কাহিনী তোমাদের তরুণ প্রাণের সামনে হাজির করবার আমার সাধ ছিল, কিন্তু এবার আমার সময় হলোনা। তোমরা ফিরে এস, তোমাদের অধ্যাপক যদি আমাকে ভুলে না যান ত আর একদিন তোমাদের শোনাব। আজ আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।

চিত্ত-দ্রোহী

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

পলে পলে এই বিফল-মরণ—মানুষ তুই কি ওরে
ভীতি-বিহ্বল শঙ্কা-আকুল কেনরে কিসের তরে ?
ছল ছল আঁখি শুষ্ক অধর
দুর্ব্বল দেহ কাঁপে থর থর
মুখে নাহি কথা শুধু হীন ব্যথা উঠিছে হৃদয় ভরে'
কলঙ্ক মসি ছাইয়া ফেলেছে গৌরব-ভাস্করে !

অসীম আকাশ উদার বাতাস অম্লান ওই আলো
সকলি ব্যর্থ তোর কাছে ছি ছি ! কিছুই লাগে না ভালো ?
গগন-চুম্বী শৈল শিখর
অন্তর ভেদি' ঝরে নির্ঝর
সাগরযাত্রী উচ্ছ্বল নদী বলে প্রাণ মন ঢালো'—
তুই বসে রবি শুধু দিন গুণে হৃদয় বাহির কালো ?

জীবনের বীজ বুকে নিয়ে ক্ষেত হাসিছে সোনার ধানে
ওকি আনন্দ উঠিছে উছসি' প্রভাত-পাখীর গানে,
আঁধারের পর আলোর পরশ
তবু তোর প্রাণে জাগে না হরষ
জরা ও মরার অভিশাপ নিয়ে বেঁচে রবি কোন প্রাণে ?
তোর চারিপাশে ধরা ভরে' গেল নব-জীবনের গানে !

বুকের রক্ত দিলি যে নিঙাড়ি' রাখিলি না কিছু বাকী
তবু কি ভাবিস এত দিন পরে সকলি হয়েছে ফাঁকি ?

হৃদয়ের মাঝে যে রস মধুর
রেখেছিল তোরে করে ভরপুর
আজি বিষ হয়ে সে রসের ধারা মরণ আনিবে ডাকি ?
পূর্ণ জীবন শুধু নিরাশায় শূণ্য হইবে নাকি ?

শরৎ নিশায় জোস্না সাগরে যে রূপ উঠিল ভাসি'
অনু পরমাণু বিহ্বল করে' উঠেছিল যেই হাসি
যে কথায় শুনি' শত সঙ্গীত
প্রাণে মনে পেলি' কত ইঙ্গিত
আকাশে বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিল মিলন বাঁশী
সে সব মিথ্যা ?—শুধু কল্পনা ?—বিফল সর্ব্বনাশী— ?

জীবন গড়িবি জীবন লইয়া বুক ভরা তোর আশা
তুচ্ছ হীনতা লজ্জার ধূলা চরণে দলিয়া হাসা,
শুধু আনন্দ শুধু আগুয়ান
বিশ্ব জিনিতে তোর অভিজান
নয়নে আগুন দগ্ধ করিতে দীনতা সর্ব্বনাশা
সকল ভুলিয়া গৃহ কোনে আজ বাঁধিলি আপন বাসা !

দীন হয়ে তুই নিশি-দিনমান সহিবি নির্যাতন
সান্ত্বনা নাই শুধু ভেবে ভেবে জীর্ণ করিবি মন,
প্রেম যদি আছে নাহি সম্মান ?
গৌরব তোর স'বে অপমান ?
চিত্তের এই বিক্ষোভ ভুলে চিনেনে আপন জন
মনের মানিক রাখ বুকে ঢেকে সে যে বুক ভরা ধন !

অক্ষম তুই ?—সে কথা কেমনে বলিবি সভার মাঝে
প্রাণ ঢেলে তোর ব্যর্থ জীবন ? ছি ছি মরে যাই লাজে'
প্রেম দিয়ে যদি প্রেম নাহি পা'স
করুণ নয়নে কেন ফিরে চাস ?
হৃদয়ের মাঝে রেখেদে সত্য শুভ-সুন্দর সাজে
অসহ হইলে বুক ভেঙ্গে ফেল যদি ব্যথা বুকে বাজে !

শিরায় শিরায় মানুষ জাগায়ে দাঁড়া দেখি তুই বীর
গৌরবে স্ফীত বক্ষ প্রসারি' উন্নত রাখি' শির'
মিছে বুকে তোর কর হানাহানি
দূরে ঝেড়ে ফেল অবসাদ গ্লানি,
সমুখে জীবন-মরণ-সিন্ধু ওইত দাঁড়ায়ে থির
আকাশ হইতে ঝরিছে মাথায় শতেক তীর্থ-নীর !

বুকের রক্ত জমাইয়া তোল নিভৃত গোপন বলে
সুন্দরে আরো সুন্দর কর আপন হৃদয় তলে,
দু'হাতে আগুলি' ঝঞ্ঝা হইতে
সকল আঘাত হবে যে সহিতে'
যদি ভুলে যাস আপন মনেরে বুঝাইবি কোন ছলে
কলঙ্ক-মসি মাখিয়া অঙ্গে হাসাবি শত্রুদলে ?

হৃদয় ভরিয়া নিতে হ'বে দুখ সাদরে বরণ করি'
আঘাতে আঘাতে শুধু হলাহল উঠিবে চিত্ত ভরি'
নয়নের ধারা ব'বে অবিরল
কাঁপিবে জীর্ণ দেহ দুরবল'
প্রাণ বায়ু হ'বে স্পন্দন-হীন নিজ অদৃষ্ট স্মরি'
দানব আসিয়া মনের মানিক নেবে পলে পলে হরি'

তবু জরা হ'তে ত্রাণ পেতে হ'বে চলিতে হইবে আগে
মরণেরে দাও সকল শক্তি যদি সে আজিকে জাগে,
তোমার সকল কর্ম্ম সাধনা
প্রেম দিয়ে যত প্রিয়-আরাধনা,
সকল ধর্ম্ম সফল হইবে জীবনের অনুরাগে
চিত্ত লইয়া শুধু উঠে আজ দাঁড়া দেখি পুরোভাগে ?

শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ঐতিহাসিক যুগ

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—জাতীয় পতন অবশ্যম্ভাবী হইল।

অশোক কলিঙ্গ বিজয় করিলেন, প্রাণে আঘাত পাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার রুদ্ধ করিলেন, নীতির বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন।

অশোকের সময়েও হিন্দুভাব ও বৌদ্ধভাবের মিলন মিশ্রণ ছিল। কারণ তিনি হিন্দু প্রভাব একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাই শাসন শৃঙ্খলা ছিল, সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা ছিলনা। অশোকের সময়ে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের বিস্তৃত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় তখনও ভারতের অনুশাসন কার্য্যকারী ছিল। স্মিথ সাহেব অশোকের সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখিলেই মৌর্য্যপ্রভাব সবিশেষ স্ফুট হইবে। স্মিথ সাহেব বলেন, "The empire comprised therefore, in modern terminology, Afganistan, south of the Hindukush, Beluchistan, Sind, the valiy of Kashmir, Nepal, the lower Himalaya and the whole of India proper except the southeren extremity" "অর্থাৎ বর্ত্তমান নামে বলিতে গেলে আফগানিস্থান, হিন্দুকুশের দক্ষিণ অংশ, বেলুচিস্থান, সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর উপত্যকা, নেপাল, নিম্ন হিমালয় প্রদেশ এবং দক্ষিণ প্রান্ত ব্যতীত সমুদয় ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

দাক্ষিণাত্যের চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য অশোকের সময় স্বাধীন ছিল। মালাবারের তীরস্থ কেরল পুত্র ও সত্যপুত্র খণ্ডরাজ্য গুলিও তৎকালে স্বাধীন ছিল! ভারতের এই সামান্য অংশ ব্যতীত সকল ভারতই মৌর্য্য অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাভারতীয় যুগেও যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়া সমস্ত ভারত অতিক্রম করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ ও সিংহল বোধহয় করদ রাজ্য রূপে পরিণত হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় অর্জ্জুন প্রভৃতি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নানাদেশ জয় করিয়াছিলেন ও কোনও কোনও রাজ্য অবিলম্বে বশ্যতা স্বীকার করিয়া কদররাজ্য রূপে পরিণত হইয়াছিল। মহারাজ অশোকের সময় যেরূপ এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এক শাসনের অধীন হইয়াছিল তদ্রূপ না হইলেও সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা তৎকালেও উপযোগী ছিল। বিজিত রাজ্যের অভ্যন্তরীন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া মিত্র রাজ্যরূপে পরিণত করাই মহাভারতীয় যুগের বিশেষত্ব। কেবল যে সকল রাজা সাম্রাজ্য গঠনের প্রতিরোধ করিয়াছে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। মহাভারতীয় যুগে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী নারদ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞে উৎসাহিত করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রবর্ত্তনা দিয়াছিলেন ব্যাস। বাস্তবিক ভারতীয় জীবনে সাম্রাজ্যের সার্থকতা উপলব্ধি হইয়াছিল, মনুএই সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্যই বিজিত রাজ্যের-প্রতি মহৎ ভাব দেখাইতে ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনুর বিজিত রাজ্য সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অতীব মনোজ্ঞ। তিনি বলিতেছেন—

"জিত্বা সংপূজয়েদ্দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্ম্মিকান্।
প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানিচ॥
সর্ব্বেষাংতু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকির্ষিতম্।
স্থাপয়েত্তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাচ্চ সময় ক্রিয়াম্॥
প্রমাণানি চ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্যান্ যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধান পুরুষৈঃ সহ॥

(৭।২০১, ২০২, ২০৩—মনুসং)

অর্থাৎ জয়লাভ হইলে বিজিতদেশের পূজিত দেবতা জ্ঞানবৃদ্ধ ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবেন অর্থাৎ দান মানাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবেন। তদ্দেশ বাসিগণের

যেরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল সেই নিয়মানুসারে কুটুম্ব পরিজন প্রভৃতির বৃত্তি ও নিয়ত করভার শুল্ক প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবেন। এবং সকলকে অভয় প্রদান করিবেন। সেই দেশ ও পুরবাসী সমূহের অভিমত সংক্ষেপে জানিয়া সেই রাজবংশকেই সেই সিংহাসনে স্থাপন করিবেন। এবং বিপদ ও সম্পদ সময় সাহায্য করিবে এই রূপ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবেন। সেই দেশে যেরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত আছে অর্থাৎ যেরূপ ভাবে ব্যবহারতন্ত্রের প্রচলন সেইরূপ প্রমান নির্দ্দেশ করিবেন এবং দেশস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত রত্ন প্রভৃতি প্রদানে প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত রাজাকে পরিতুষ্ট করিবেন।

বাস্তবিক এইরূপ বিধান বলেই বিজিত রাজ্যে প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে। সাম্রাজ্য গঠনের ইহাই মূলমন্ত্র। যাহাকে স্বাধিকারে আনিতে হইবে তাহাকে সময় মত অভীপ্সিত বস্তু প্রদান করিয়া তদ্দেশবাসিগণের হৃদয়ে সাম্রাজ্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। যথাকালে দান না করিলে তাহাতে ফলোদয় হয়না ; অধিকন্তু প্রজার হৃদয়ে রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে সাম্রাজ্য অটুট থাকিতে পারেনা। যথাকালে দানে প্রজার হৃদয়ে সন্তোষ সঞ্চারিত হয় সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা হয়। তাই মনু বলিতেছেন—

"আদানমপ্রিয়করং দানংচ প্রিয়কারকম্।
অভীপ্সিতানামর্থানাং কালেযুক্তং প্রশস্যতে॥ (মনু ৭।২০৪)

কেবল গ্রহণ অপ্রিয়কর, দানই প্রিয়কারক। অভীপ্সিত অর্থ যথাকালে প্রদান করাই প্রশস্ত। মনু আরও বিশদ ভাবে বলিয়াছেন মিত্রলাভ হইলে হিরণ্য ভূমি প্রভৃতির অধিকারেও যত্নবান হওয়া সঙ্গত নহে। ক্ষতি পূরণ আদায় করা গর্হিত। তাই মনু বলিতেছেন,—

"হিরণ্য ভূমি সংপ্রাপ্ত্যাপার্থিবো ন তথৈধতে।
যথামিত্রং ধ্রুবংলব্ধা কশম প্যায়তিক্ষমম্॥ (৭।২০৮)

হিরণ্য ভূমি প্রভৃতি লাভ করিয়া রাজা সমৃদ্ধ হয়েন না বর্ত্তমানে অতি সামান্য লাভ হইলেও ভবিষ্যতে শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে এরূপ ধ্রুব মিত্র লাভ হইলে তাহাই রাজার বরণীয়।

এই অনুশাসন অনুবলে সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টাই ভারতীয় বিশেষত্ব। বিজিত দেশবাসিগণের ধর্ম্ম ও সমাজ শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিয়া তদ্দেশবাসিগণকে নিজের অভিমুখীন করিবেন। তাহাই ভারতীয় অনুশাসনের তাৎপর্য্য। মহাভারতীয় যুগে জরাসন্ধ সাম্রাজ্য গঠনে চেষ্টিত। তবে তাহার সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা মদমত্ততায় পর্য্যবসিত। সে বিজিত রাজন্যবর্গকে কারারুদ্ধ করিয়া অত্যাচারে দেশ প্রপীড়িত করিতে ছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জরাসন্ধ পরাজয়ে উৎসাহিত করিয়া সাম্রাজ্য পত্তনের ব্যবস্থা করিলেন। বাস্তবিক যুধিষ্ঠিরের শাসন গুণে স্বদেশ বাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমধিক বৃদ্ধিপাইয়াছিল। মহাভারতই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। "তৎপরে সেই অদ্ভুততেজাধর্ম্মনন্দন প্রজাদিগের হিত সাধনে মন অভিনিবিষ্ট করিয়া অবিশেষে সর্ব্বলোকের উপকার করিতে লাগিলেন। রাজা ক্রোধ মদ বিবর্জ্জিত হইয়া সকলের ঋণ পরিশোধ করিতে আজ্ঞা দিলেন। ফলতঃ তাঁহার রাজ্য মধ্যে কেবল সাধু ধর্ম্ম সাধু ধর্ম্ম ভিন্ন আর কোনও কথাই ছিলনা। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির পুত্রেরন্যায় প্রজাগণকে পালন করাতে কেহই আর তাঁহার দ্বেষ্টা রহিলনা। এইরূপে তিনি অজাত শত্রু হইয়া উঠিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরিগ্রহ, ভীমসেনের প্রতিপালন, সব্যসাচী অর্জ্জুনের শত্রু নিবারণ, ধীমান্ সহদেবের ধর্ম্মানুশাসন এবং নকুলের স্বাভাবিকী নম্রতাদ্বারা তাঁহাদের অধিকারস্থ সমস্ত জনপদে বিগ্রহ বা ভয়ের সম্পর্কও রহিল না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকিল, পর্জ্জন্য যথাকালে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সকল প্রজারাই ধন সম্পত্তি সম্পন্ন হইল। বার্দ্ধুষী, যজ্ঞসত্র, গোরক্ষণ, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য সমুদয়ের যথেষ্ট উন্নতি হইল। অনুকর্ষ, নিষ্কর্ষ, ব্যাধি, অগ্নিদাহ মূর্চ্ছা প্রভৃতি কিছুই রহিল না। দস্যু বঞ্চক বা রাজবল্লভগণ রাজার কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ করিত না। ধার্ম্মিকবর মহারাজ যুধিষ্ঠির যে যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তথাকার নৃপগণ, বনিক সমুদায়, রজোগুণ প্রধান লোভী লোক এবং সামান্য জাতি সকলেই সর্ব্বদা রাজার প্রিয় কর্ম্ম, দেবোপাসনা এবং স্ব স্ব অদৃষ্টানু-

সারে ভোগবাসনা চরিতার্থ করিত। সেই সম্রাট সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বংসহ, সর্ব্বব্যাপী ও অসীম কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। কি দ্বিজাতি কি গোপজাতি, সমস্ত প্রজারাই সেই ভূপতির পিতৃকর্ত্তব্য নীতি শিক্ষা প্রদানাদি ও মাতৃকর্ত্তব্য বাৎসল্যাদি গুণ দ্বারা উপকৃত হইয়া তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল"

[—মহাভারত সভাপর্ব্ব—রাজসূয়ারম্ভ পর্ব্বাধ্যায় কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ ১২শ অধ্যায়।] বাস্তবিক এইরূপ জনপ্রিয় রাজাই সম্রাট হইবার উপযুক্ত। বিজিত প্রজাগণ যে রাজার প্রতি অনুরক্ত হয় সেই রাজাই সম্রাট হইতে পারে। ভারতীয় অনুশাসন বলেই এইরূপ শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অর্জ্জুনাদির দিগ্বিজয় ও যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য স্থাপন প্রচেষ্টা হইতে মৌর্য্যবংশের সাম্রাজ্যস্থাপনে বিশেষত্ব আছে। কিন্তু মৌর্য্য প্রচেষ্টাও ভারতীয় ধারা অতিক্রম করে নাই। বরং উহা ভারতীয় ভাবে ক্রমবিকাশ মাত্র। যুধিষ্ঠিরের সময়ে সমস্ত বিজিত দেশকে এক শাসনাধীন আনিবার প্রচেষ্টা কম। কেবল করদ বা মিত্ররাজ্যরূপে পরিণত করিয়া এক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াসই সমধিক। কিন্তু মৌর্য্য বংশীয় সাম্রাজ্যে এক শাসন শৃঙ্খলার অধীন করিবার প্রযত্নই পরিস্ফুট, অশোক নিজেও পিতার রাজ্যকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন; নিজের রাজত্ব কালেও বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছেন। এইরূপে সমস্ত প্রদেশগুলিকে এক শাসন শৃঙ্খলার অধীন করিয়া এক জাতিতে পরিণত করিবার কতকটা সুবিধা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক মৌর্য্য শাসনের এই বিশেষত্বও ভারতীয় অনুশাসনের ফল, মনুর অনুশাসনের ক্রম বিকাশ মাত্র। অশোক প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া সর্ব্বত্র একরূপ শাসনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সম্রাজ্যের মধ্যভাগ পাটলীপুত্র হইতে শাসিত হইত। চারিজন রাজপ্রতিনিধি অন্যান্য প্রান্তস্থিত ভূভাগ শাসন করিতেন।

* "সম্ভবতঃ মধ্য-রাজ্য রাজার প্রত্যক্ষশাসনাধীন ছিল; প্রত্যন্তঃস্থিত প্রদেশগুলি প্রাদেশিক রাজ প্রতিনিধিগণ দ্বারা শাসিত হইত। দেখিলে মনেহয় চারিজন এরূপ রাজ প্রতিনিধি ছিলেন। উত্তর পশ্চিমের শাসনকর্ত্তা তক্ষশীলায় থাকিতেন। পাঞ্জাব, সিন্ধুনদীর অপর তীরস্থ প্রদেশ সমূহ, কাশ্মীর তাঁহার শাসনাধীন ছিল। পূর্ব্ব প্রদেশ বিজিত কলিঙ্গসহ তোসালিস্থিত শাসন কর্ত্তা কর্ত্তৃক শাসিত হইত। তোসালির প্রকৃত স্থান নির্দ্দেশ করা যায়না। মালব, গুজরাত এবং কাথিয়ার প্রভৃতি পশ্চিমস্থ প্রদেশগুলি এক রাজপুত্রের শাসনাধীন ছিল। এই রাজপুত্রের রাজধানী প্রাচীন নগরী উজ্জয়নীতে ছিল। নর্ম্মদার পরপারস্থিত দক্ষিণ প্রদেশগুলি চতুর্থ শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল।" অশোকের সময় এক শাসনাধীন করিবার প্রয়াস সুপরিস্ফুট।

তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য গঠনের প্রচেষ্টায়ও মানবকে একধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার, আভাস পাওয়া যায়! সীমান্ত স্থিত রাজ্যে তিনি প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন, খৃঃ পূঃ ২৫৬ এবং পূর্ব্বেই নানা দেশে ধর্ম্ম প্রচারকগণ প্রেরিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজ্য গুলিতে অর্থাৎ চোল, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র, ও সত্যপুত্র, সিংহলে সিরিয়ার গ্রীক রাজ্য গুলিতে, মিশর সিরিন [Cyrene] মাসিদনে

* 'The central regions seem to have been governed directly from Pataliputra under the king's personal supervision. The outlying provinces were administered by viceroys, of whom apparently, there were four. The ruler of the North-west was stationed at Taxila and his jurisdiction may be assumed to have included the Punjab, Sind, the countries beyond the Indus and Kashmir. The eastern territories including the conquered kingdom of kalinga' were governed by a viceroy stationed at Tosali the exact position of which has not been ascertained. The western provinces of Malwa, Guzerat and Kathiawar were under the Government of a prince whose head quarters were at the ancient city of Ujjain and the southern provinces beyond the Nerbudda were ruled by the fourth viceroy—Smith's E. H. I. P. P. 152 (2nd Ed.)

[Macedonia] এবং এপিরাস্ [Epirus] প্রভৃতি স্থানেও ধর্ম্মপ্রচারক গমন করিয়াছিল। স্মিথ্ সাহেব তাই লিখিয়াছেন,—"The missionary organization thus embraced three continents Asia, Europe and Africa." প্রচার প্রতিষ্ঠান এসিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ এই তিন মহাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার শিলালিপি গুলিও সকলকে এক ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিতে প্রোথিত হইয়াছিল। বাস্তবিক অশোকের সময় পর্য্যন্তই জাতিকে এক করিবার প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। কিন্তু অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মকে রাজকীয় ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া সেই ধর্ম্ম মতের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ভারতীয় জাতিকে অনেক পরিমাণে অকর্ম্মণ্য করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অশোকের সাম্রাজ্যগঠন প্রচেষ্টা দেখিলাম। মহাভারতীয় যুগের আভাস এই সঙ্গে প্রদত্ত হইলে উভয় সাম্রাজ্যের বিশেষত্ব উপলব্ধি হইবে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় কালে অর্জ্জুন প্রভৃতি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। অর্জ্জুন উত্তরে, ভীম পূর্ব্বে, সহদেব দক্ষিণে, নকুল পশ্চিমে গমন করিয়া দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা পাঠ করিলে দেখিতে পাই তিনি কুলিন্দ দেশস্থিত রাজগণকে স্ববশে আনয়ন করেন, কুলিন্দ, কালকুট ও আনর্ত্তদেশ অধিকার করিলেন। তৎপরে মহারাজ সুমণ্ডলকে পরাজিত করিয়া শাকলদ্বীপ ও বিন্ধ্যভূধর সান্নিহিত রাজগণকে পরাজিত করেন। উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশে আগমন করিলেন। তথায় ভগদত্তের সহিত যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত কর প্রদান করিলে তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপিত হইল। ভগদত্তকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় অন্তর্গিরি, বহির্গিরি ও উপগিরি হস্তগত করিলেন। তৎপরে পর্ব্বত বন ও তত্রত্য অনেকানেক ভূপালগণকে আয়ত্ত ও অনুরক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট ধনগ্রহণ করিলেন। তৎপরে উলূক বাসী বৃহন্তকে আক্রমন ও পরাজিত করিলেন। কিন্তু "বৃহন্ত রাজ্য বৃহন্তকেই সমর্পন করিলেন" উলূকবাসী জন সমূহ সঙ্গে করিয়া সেনাবিন্দুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে রাজচ্যুত করিলেন। তৎপরে সোদাপুর, বামদেব, সুদামন, সুসঙ্কুল ও উত্তর উলূক দেশস্থ অনেকানেক ভূপালগণকে অধীনে সমানয়ন করিলেন, এবং পঞ্চগণ জয় করিলেন। পৌরব পুরী অধিকৃত হইল। পর্ব্বত নিবাসী দস্যুদিগকে ও সপ্তবিধ উৎসব সঙ্কেত নামক ম্লেচ্ছদিগকে পরাজয় করিলেন। "অনন্তর তিনি কাশ্মীর দেশসম্ভূত ক্ষত্রিয় বীর দিগকে ও দশমণ্ডলের সহিত ভূপাল লোহিতকে পরাজয় করিলেন। ত্রিগর্ত্ত দারুন কোকনদ দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ আত্ম সমর্পণ করিল। রম্যঅভিসারী নগরী অধিকৃত হইল। উরগ দেশবাসী মহারাজ রোচমান পরাজিত হইল। আয়ুধ রক্ষিত রমনীয় সিংহপুরে অগ্নিসংযোগ করিলেন। তৎপরে সুহ্ম ও সুমালা নাম্নী নগরী গমন করিলেন। বাহ্লীকদিগকে স্ববশে আনয়ন করিয়া দরদস্ত ও কাম্বোজ জয় করেন। পূর্ব্ব ও উত্তরদেশস্থ দস্যুদল অর্জ্জুনের বশীভূত হইল। লোহ, পরম, কাম্বোজ ও উত্তর ঋষিক এই সকলকে পরাজয় করিলেন। নষ্কুট পর্ব্বত ও হিমাচলকে পরাজয় করিয়া ধবল গিরি পৃষ্ঠে সেনানিবেশ করিলেন। ধবল গিরি অতিক্রম করিয়া কিম্পুরুষবর্ষ পরাজয় ও অধিকার করিলেন। গুহ্যক পালিত হাটকদেশ অধিকৃত হইল। মানস সরোবর দর্শন করিলেন। মানস সরোবরের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী দেশ সকল অধিকার করিয়া উত্তর হরিবর্ষে উপস্থিত হইলেন। এই দেশের নাম উত্তরকুরু। এই দেশেস্থ জন সমূহ ধন রত্নাদি প্রদান করিল।

এই অর্জ্জুন দিগ্বিজয় হইতে বুঝিতে পারি অর্জ্জুন আসাম হইতে হিমালয়স্থ সমুদায় প্রদেশ অধিকার করিয়া পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আফ্‌গানিস্থান, তিব্বত, মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ } ফাল্গুন ১৩২৮ { ৮ম সংখ্যা

মাসিক কাব্য সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

নারায়ণ। কার্ত্তিক। লীলা—শ্রীমান্ কৃষ্ণদয়াল বসু একটুখানি প্রাণ—কিন্তু সুন্দর।

মুক্তিগাথা। শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—৪টী সনেট। কবি বলেছেন—

"করি মোক্ষকামী
করিবারে চাও দূর মোরে অন্তর্যামী
তোমার সান্নিধ্য হতে— * * *
তব সৃষ্টি মাঝে
মোর আশেপাশে মোর ক্ষুদ্রতম কাজে
লক্ষ স্থানে তুমি যেগো আছ ধরা দিয়া
সে কথা কেমনে আমি যাবো পাশরিয়া"

এই কথাটাই ফেনিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে ৪টী সনেট করে তুলেছেন। শেষ করেছেন বেশ—

আমার কামনা মাঝে তব তৃপ্তি জাগে—
আমি ভালবাসি ধরা তব অনুরাগে।

দুর্গোৎসব। শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী—নেহাৎ রসহীন মামুলী রচনা। "এ নব হরষ বরষা" আর "চরণ পরশ সরসা" এই একঘেয়ে বস্তাপচা মিল আর অনুপ্রাসে কান ঝালাপালা। অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজারিনী ধরা 'বিবশা' হলেন কি শুধু সরসার সঙ্গে মিলের জন্য? 'সুরভি'—দেখছি সৌরভ অর্থে বাংলায় চলে গেল—এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। 'কদম্ব' বর্ষারম্ভের পুষ্প, শিরীষ গ্রীষ্মের, লেখিকা রচনা মধুর হবে বলে বোধ হয় শরতেই আমদানী করেছেন। 'কদম্ব'ত পুলকে শিউরে উঠ্ছে—কিন্তু শিরীষ আর সেফালি বেচারারা অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছে কেন?

"জাগিয়া ভারত চাহিছে ব্যাকুল চাহনি" বাংলায় Cognate object এর উদাহরণ।

বিচারক। শ্রীশশাঙ্কমোহন চৌধুরীর কবিতাটি বেশ হয়েছে—তবে অনেকস্থলে লেখকের অনবধানতা দৃষ্ট হয়—উপরি উপরি তিনটে তিনটে মিল দিতে গিয়ে লেখক মুস্কিলে পড়েছেন।

"চুমো খেয়ে হাত বুলায়ে
দিতাম নাক তোমার গায়ে।
দিতাম না ঘুম তোমার কায়ে
ঘুম পাড়ানী দিয়ে"—

নেহাৎ তারে-নারে করে সারা।

হারামণি।—কাজী নজরুল। রচনায় কারুণ্য আছে। তবে নাকে কাঁদাটা একটু বেশী বেশী হয়ে পড়েছে। অনুপ্রাসের মাধুর্য্যও রচনার তারল্য সৃষ্টির জন্য—অতিরিক্ত প্রয়াস প্রকাশ পেয়েছে নিম্নোদ্ধৃত ২টী পংক্তিতে—

"আহা—ছলছল কাঁদন চাওয়ার সজল ছায়া
কালোমায়া সারাখনই—
উছলে যেন পিছল ননীরে।"

—তার পরই—ঠিক—"মুখভরা তোর বরণহাসি—শিউলি সম রাশি রাশি—"একেবারে শরতের বৃষ্টির সঙ্গে রৌদ্রের মত। কবি গানটির ১ম পংক্তিতে 'কাঙালী লাগাইয়া ভাল করেন নাই—কারণ মস্তবড় গানে কাঙালীর অনেক গুলি মিলের দরকার হয়েছে, ফলে—"গানের রঙে রাঙালী"—"বিজয় নিশান তাইকি টাঙালি" এইরূপ কষ্টকৃত মিলের শরণ নিতে হয়েছে।

"আচম্‌কা আজ ধরা দিয়ে মরা মায়ের ভরা স্নেহে হঠাৎ জাগালি" এ পংক্তিতে ধরা—ভরা—মরা—এ তিনটে অনুপ্রাশের লালিত্যটা বেশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছে। কবিতাটির বিশেষত্ব হচ্ছে—রচনার লীলায়িত, সহজসরল ললিততরল গতিতে।

স্বরাজ।—শ্রীমতী লীলাদেবী। লেখিকা এ স্বরাজের মানে করেছেন "আত্মতুষ্টি"— ১ম দুপংক্তিই কবিতাটার একটু মর্য্যাদা রেখেছে—

"প্রাণের মাঝে যে প্রেম জাগে ফুরায় না তা ফুরায় না
চোখেই শুধু যে প্রেমজ্বালা জুড়ায় না তা জুড়ায় না"

—বাকী টুকু ছন্দে উপদেশ। তারপর—

মোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের "মরণনৃত্য।" মহা মুস্কিল!

"লক্ষ্য বিহীন রবিশশী তারা
মরণ বিষাণ গানে,
ছুটে উচ্ছল অতল সলিল
তাণ্ডব সেই তানে।"

এর অর্থ ত্যান বুঝলাম না।

"ধরনীর গায় কে মাখালে, হায়
শোণিতের ললাটিকা"

গায়ে ললাটিকা মাখান ব্যাপারটা বুঝলাম না।

"তাপসীর তাপ-গৈরিকজ্বালা
বেয়ে চলে কাটি হিয়া"—

এ-ও দুর্ব্বোধ্য। "প্রলয়োঙ্কার"—কি?

"ভুবনে ভুবনে ছিল যে ভরিয়া তরুণ স্বপ্ন কম"

আচ্ছা এই 'কম' কথাটা কোথা হতে এলো? একি কমনীয় শব্দের "নীয়" বাদ দিয়ে? অনেকের কবিতাতেই এই 'কম' দেখি—বাংলা কবিতায় কমনীয় অর্থেই 'কম' কথাটা চলন দেখিছি—চলেত চলুক—তবে একটা বিশিষ্ট অর্থেই চলা ভাল। দু অক্ষরে একটা মিষ্টি বিশেষণের প্রয়োজন হলেই যেন 'কম' এর আবির্ভাব না হয়। সংস্কৃতে 'কমা' অর্থে শোভা, 'মধুর কম' 'ললিতকম' এরূপ 'সমস্ত' শব্দ তা'র হতে পারে।

মোহিনী বাবুর কবিতাটায় ছন্দের কোনো দোষ নাই—পদবিন্যাসও বেশ সুললিত ও শুচি—কিন্তু শব্দ গুলির সমবায়ের সার্থকতা বড় অল্প—সদর্থ সঙ্গতির অভাবে।

আর্ত্ত। শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমান—কণ্টক—বঞ্চক—ও কঙ্করে মিলিয়ে একটা ঝঙ্কার দিতে গিয়ে দুইটী অলস পংক্তির সৃষ্টি করেছেন—

"কণ্টক বনে বঞ্চক মনে লয়ে যায় বারেবার
গ্লানি আর গ্লানি ঘরে তুলে আনি কঙ্কর ভারেভার"
"ভগবান ভগবান
পারিনাক আর বহিতে এভার জীবনের অবসান"

"পারিনাক আর বহিতে এ ভার" বেশ হলো—কিন্তু "জীবনের অবসান"টা যে কি হবে তা আর বলা হলো না।

"মনানল" কিরূপে চলে? এটী পাঁচজনে লিখলেও আর সহজে চলবে না। কবিতার ছন্দোবন্ধ অনিন্দ্য হয়েছে, রচনাও বেশ সুমধুর—কিন্তু ছন্দ ও লালিত্যের দিকে কবির যতটা ঝোঁক, নিজের "মনানল" বা "মসী কলঙ্ক" বা "মরণের ব্যথাটা" আন্তরিকতার সহিত বলিবার দিকে ততটা ঝোঁক নাই। "মসী কলঙ্ক"টা কবি প্রকাশ করে' না বললেও চলে—কারণ সেত মাসিক পত্রেই মাসে মাসে বেরুচ্ছে। সত্যসত্য কোনো ব্যথা না থাকলে সাধকরে'

ব্যথিত সেজে ছন্দে আর্ত্তনাদ করলে যেমন হয় কবিতাটা তেমনি হয়েছে।

অমর্কের বিদায়। শ্রীঅমর্ক। ব্যঙ্গ কবিতা।

ভারতী। কার্ত্তিক। ভীম-জননী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কবিতাটায় একটা জাতীয় সার্থকতা (National significance) আছে এই জন্যই কবিতাটি সুন্দর। সত্যেন বাবুর পৌরাণিক উপাখ্যান বা ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত অনেক কবিতাতেই বর্ত্তমান জাতীয় জীবনটি প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠে—সে গুলি যেমন আমাদের উপভোগে তেমনি উপকারে আসে।

এ কবিতাটির ঐ বিশেষত্ব ছাড়া অন্য বিশেষত্ব নাই—বরং একটা ক্লিষ্টক্লান্ত একঘেয়ে সুর পাঠকের শ্রুতি ব্যথিত করবে। সমগ্র কবিতার একটী পংক্তি প্রকৃত কবিত্বময়—

ডালপালাতে অন্ধকারের অন্ধ হাওয়ার
উছট লাগে"

সত্যেন বাবুর "স্কন্দধাত্রী" কবিতার অনেক পংক্তিই রস মধুর—

"এ যেনরে দিব্য ছটা মৃত্তিকাপরে
ভানুর ভ্রূণ ভোরাই মেঘের সূতিকা ঘরে"
"পিয়াই ওরে আট পহরে আনন্দেরি ছন্দগান
ওর দে-আশার দীপ্ত আলোয় চন্দ্র তপন স্পন্দমান"
"কাঁপল সাগর আর ধরাধর বাসুকী চঞ্চল
স্বস্তি না পায় অস্থিরতায় ত্রস্ত অসুর দল।"
"বুজতে গেলাম চোখ
মুদলনা নক্ষত্র নয়ন পড়ল না পলক।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

"অসুরছায়া পিণ্ডীকৃত তিমির দহন" জাতীয় অনেক পিণ্ডীকৃত শব্দবিন্যাস ও আছে—অনেক নূতন নূতন সমাস জোরের করে লাগিয়েছেন যা' শুনতেও ভাল নয় যার অর্থও খোলসা নয়। মাঝে মাঝে অনেক অপ্রত্যাশিত মিলের আমদানী করে' পাঠককে বিস্মিতও করেছেন।

প্রকৃতির প্রতিশোধ। শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক। 'কবিতার বিষয়টা মঙ্গলময় কিন্তু কবি সরস করে' এটাকে লিখতে পারেন নাই। ১ম ছ'লাইনেই "একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল"—জাতীয় একটা আওয়াজ কানে বাজে—

ছাত্রাবাস-তে এক হয়েছে চুরি
ডাকাতির মত গোল ভবন জুড়ি।

তারপর কবি নেহাৎ কষ্টে সৃষ্টে মিলিয়ে মিলিয়ে নীরস গদ্যকে নীরস পদ্যাকার দান করেছেন—

বহু জল ছিটাইয়া মন্ত্র পড়ি
বাঁকারির পল ফেরে চোরকে ধরি।
ঘুরেঘুরে অবশেষে উপর তলে
নবাগত বালকেরে ধরিল গলে।

*   *   *

বিনা অপরাধে তার কি গুরু ব্যথা
দুখে-তে যে পড়ে তার লুটিয়া মাথা

*   *   *

চলে গেছে বহু দিন, ভেঙেছে বাসা
কে কোথা গিয়েছে (লয়ে নবীন আশা)

*   *   *

আমারও এখন ঠিক হতেছে মনে
এসেছি এদেরি সাথে (সেই-সে) ট্রেণে

*   *   *

হাকিম বলেন তার প্রমাণও আমি
বিনা দোষে কাঁদায়েছ কত যে (যামি)।

মোটের উপর কবিতাটায় কবি বড়ই অনবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। কুমুদ বাবু এত বেশী বেশী লিখছেন যে তাঁর রচনা গুলি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হবার অবসর পাচ্ছে না। তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি,—রচনার গুণাগুণের জন্য এখন তিনি নিজেই সম্পূর্ণ দায়ী—পত্রিকা-সম্পাদকেরা সে জন্য নির্ব্বিচারেই তাঁহার রচনা গুলি প্রকাশ করছেন।

কুমুদ বাবুর হৃদয়ের ন্যায় প্রকৃত কবি-হৃদয় তাঁহার সহযোগিগণের মধ্যে কাহারো আছে বলিয়া মনে হয় না—সেজন্য প্রকৃত অনাবিল কবিত্ব তাঁহার রচনায় থাকে। কিন্তু তিনি রচনার পরিপাটা ও প্রসাধনের দিকে বড় দৃষ্টি

পাত করেন না—কবিতা গুলি রচনা করে' কিছুদিন পরে দেখ্‌লে নিজেই ত্রুটী গুলি ধরতে পারেন :

ভারতবর্ষ। আশ্বিন। সজ্জন সঙ্গতি। শ্রীকুমুদরঞ্জন। ঘুরতে ঘুরতে দিনে দশবার কুমুদ বাবুর সঙ্গেই সাক্ষাৎ—এও আমাদের সজ্জন সঙ্গতি—শুধু সজ্জন সঙ্গতি কেন, সংসার বিষ বৃক্ষের আর একটি মধুর ফলেরও স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে।—

এটি কিন্তু কুমুদ বাবুর খুব সুন্দর ও সুললিত হয়েছে—

"যে সব কপোত বনের ঝাড় ও ঝোপ ভুলি
ক্ষণিক মুখর করলে বুকের খোপ গুলি
পাখায় মেখে পদ্ম পরাগ, সঞ্চরি'
মনের বনে উড়ল যে সব চঞ্চরী (ভ্রমর)
গভীর স্নেহের নজর ফেলে সৈকতে
যে সব তরী আসল গেল এই পথে
আজকে পরাণ ব্যাকুল তাদের তল্লাসে
আজকে চোখে তাদের লেগে জল আসে।"

বিরাম বিহীন। শ্রীশৈলেন্দ্র কৃষ্ণ লাহা, এম-এ, বি-এল। এম-এ, বি-এল মহাশয় কি যে বল্‌তে চেয়েছেন তা তিনিই জানেন। তাঁর "বেদনার নিমেষের ব্যাকুল বিস্ময়" আমাদের বিস্ময়ই জন্মে দিয়েছে। শেষে লিখেছেন—

"তবুসে আকাশ হতে মেঘেরা নাবেনা
বৃষ্টি আজ কোনো মতে থামেনা থামেনা"

'নাবা'কে 'নামা' বল্লে দোষ কি? অন্ততঃ এখানে মিল হয় বলেও 'নামেনা' লেখাই ভাল ছিল।

অভ্যাগত। শ্রীকালিদাস রায়। এটি ৺রজনীকান্ত সেনের "আমি বঞ্চিত হবো চরণে" গানের parody, কবিশেখর মহাশয়ের ভোজ কি ফুরিয়ে এলো তাই পাঁপর ভাজা পরিবেষণ আরম্ভ করেছেন।

"পাগল বাদল"। শ্রীপ্যারীমোহন সেন গুপ্ত। পাগল বাদল অনেককেই পাগল করেছে। "মেঘ শাঙন-গহন,—আকাশে উদ্বেগ নিবিড়,—আঙিনায় হৃদয় তাপিত—উতল উছল,—জল বেগ পাগল, চপল,—বারি অঝোর বিভোর,—উৎসব শ্রবণমোহন, মেঘখান আবার সজল চপল, হাসি কাঁদন-সিক্ত, বাদলসলিল থই থই, দেশ আঁধায় জাড়িমা ঘেরা, আর বেশ ঘুমের কুহকভরা"—কাজেই বাদলটা পাগল। আর কবি নিজে কি? 'থমকি ঠমকি মেঘ যায়।' 'আকুলি বিকুলি' বিজলী চায়—কাজেই 'ঝলকে ঝলকে' সবাইকে ছুটে যেতে ডেকেছেন। কবির রচনায় কি মাধুর্য্য?

গ্রামের—আধেক আঁধার মাথা ছায়
ধরণী রূপসী দিশি চায়।

"ছায় আঁধার মাথা" আর "ধরণী রূপসীর দিশি চাওয়া" কি মশায়?

"লুকান গোপন যেনরূপ
ফাটিয়া যেতেছে অপরূপ
ধরায় বিরাজে যেন স্তূপ।"

"লুকান গোপন রূপ অপরূপ" ফেটে যাচ্ছে—তাতে ধরায় যেন স্তূপ বিরাজে।—অপরূপ! অপরূপ!

দেয়ালে পুকুরে পড়ে রোদ
আঁকড়ি চুমিয়া লহে শোধ
তরল তপত সুখ বোধ

রোদ দেয়ালকে আঁকড়ে চুম্বন করছে তরল তপ্ত সুখ বোধ হচ্ছে আর তাতে শোধ নেওয়া হচ্ছে—চমৎকার কবিত্ব।

কাঁদন সিক্ত হাসি পাই
গলিতরূপায় অবগাই।

আমাদেরও "কাঁদন সিক্ত হাসি পায়" 'কাঁদন'টা কাব্যলক্ষীর দুর্দশা দেখে, হাসি পায় লেখকের পাগলামী দেখে। আর অধিক আলোচনা করে' লেখককে অযথা মর্য্যাদা দেবনা। এমন অপদার্থ কবিতা বহুদিন পড়ি নাই। রচনা নেহাৎ খেলো, ভাষা এলোমেলো, ছন্দটা কেমন যেন আহ্লাদে ধরণের—ভাব কি আছে, পাগল বাদলের কবিই জানেন

মেসেরপত্র। শ্রীকালি দাস রায়। ব্যঙ্গ কবিতা। কবির মেসে বাস করার দুর্দশার কথা।

বিদায়বেলায়—কাজীনজরুল। চলনসই রচনা। কারুণ্য আছে।

মানসী—কার্ত্তিক — অভিশাপ, আহ্লাদে চণ্ডের একটী গান—কবি লিখেছেন

"গাছে গাছে বেড়ায় নেচে
হাল্‌কা—হাওয়ার হাসি।"

হাওয়ার হাসির নাচন তারি চমৎকার নিশ্চয়ই। বন্ধুগণ। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক—কবিতার মাধুর্য্য আছে—আখ্যানবস্তু করুণরসোপেত। কতকগুলিপংক্তি বড় নীরস ও দুর্ব্বল হয়েছে—

"দুর্গাপূজার দিনও নিকট, স্থিরও নাহি কেউ"
"তখন যেন বৃদ্ধ আহা রাজ্যে ছিল কোথ্"
"মনের ঘরে ধরাছিল যেসব গেছে খসে
গড়ছিল হায় কোন্ প্রতিমা রঙাছিল বসে।"

'কোথা' ও 'কথা', 'আছে' ও 'গেছে' মিল সুষ্ঠু নয়।

কেরানীর প্রেম—সচিত্র কবিতা, পূজার দিনের রসিকতা। বাহাদুরী আছে অপরূপ চিত্রে। কি রুচি!

চিরন্তনী প্রিয়া। কাজীনজরুলইস্‌লাম—বল্‌বার কিছু নাই—নিন্দা বা প্রশংসা কোনোটাই চলেনা।

প্রিয়ার গান—রসিকতার অষ্টাবক্রীয় বিকট চেষ্টা—

"গুণ করেন মা-ষষ্ঠীর কৃপায়
বছরবছর আঁতুড় গঠিত।
সুখর (?) সুবিধার যাহা কিছু
আছেন তারি পিছু পিছু
ভাগ করে' নেন অনেকখানি
দাবীতাতে শাস্ত্রঘটিত।"

হাসি আসে—ব্যর্থ চেষ্টা দেখে।

পল্লীপ্রবাস—শ্রীকালিদাস রায়। কবি পল্লীগ্রামের এক দূর প্রবাসে প্রথম যৌবনে তাঁহার প্রিয়ার সহিত প্রথম ঘরকন্না করেছিলেন,—সেই পল্লীপ্রবাস হতে বিদায় নেওয়ার সময় গেয়েছেন—

"যৌবনেরি কল্পতরু।.. অতুল তোমার অতলপ্রীতি
ইন্দ্রলোকে আসন পেলেও স্মরবো আমি তোমার নিতি
মথুরাতে রাজ আয়োজন
ভুলায় কিরে শ্রীবৃন্দাবন?
অযোধ্যা রাজৈশ্বর্য্যে কি যায় গোদাবরী তটের স্মৃতি?
মোর জীবনের কল্পভুবন শোনো আমার বিদায় গীতি।

কন্যাকুমারী—শ্রীরমণী মোহন ঘোষ।—রমণীবাবুর ভগ্নী আজকাল একরকম থেমে আসছে। আলোচ্য কবিতার ছন্দোমাধুর্য্য আছে অন্য বিশেষত্ব কিছু নাই। ব্যাপারটাও বেশ বুঝা গেলনা।

শরতে। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। অর্থগৌরব শূন্য—ব্যর্থ-অলস ভাষার ছটার উদাহরণ।

"পুষ্পপুরীর কন্দরে
কোন্ মোহিনী বাজায় বীণা কিসুমধুর ছন্দরে"

কবি কন্দর শব্দটির অর্থ জেনে লিখেছেন, না,—কথাটা মিষ্টি বলে বসিয়ে দিয়েছেন? পুষ্পপুরীর গিরি গুহায় বসে কোন্ মোহিনী বীণা বাজাচ্ছে—সে বীণার ছন্দ (?) কি মধুর।

রজত আলোর চুম্বনে
নবীন সুখে গাইছে পাখী দোয়েল শ্যামা খঞ্জনে"

রজত আলো নিশ্চয়ই চাঁদের আলো—তার চুম্বনে (?) পাখী নবীনসুখে গাচ্ছে। শুধু পাখী বলেই কবি থামেন নাই পাখী গুলোর নামও করেছেন দোয়েল, শ্যামা, খঞ্জন। "খঞ্জনে"র একারটা কর্ত্তার বিভক্তি হয়েছে চুম্বনের সঙ্গে মেলাবার জন্য।

"দুল্‌ল লতা হিন্দোলে,
চমকচুমার চপল ছোঁয়ায় অলস ব্যথীর মনদোলে"

এইখানে কবি একেবারে টেক্কা মেরেছেন। মিল বেশ হয়েছে ছন্দে হিন্দোল আছে অনুপ্রাসের ঘটাও আছে ভাষার ছটাও আছে নাই কেবল সার্থকতা আর প্রয়োজনীয়তা।

ব্যথীর মন দুলে গেল, কেমন ব্যথী? অলসব্যথী। কিসে দুলল? চমকচুমার চপল ছোঁয়ায়—এইখানেই বিপদ। আজকাল বায়োস্কোপে দেখি চুমার ছড়াছড়ি নইলে দর্শক জুটেনা, কবিতায় কি পাঠক জুটাবার জন্য চুম্বনের অতিবৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। তা—'চুমাটা' যার তার মুখে লাগিয়ে দিলেই হলো।

অতুল বিভায় সুন্দরী
অলভুবন শিউলিমুখী কাশমালতী কুন্দরই।

সুন্দরী কে ? অঙ্গভূষণ—না পিউলি যুঁথী ?
"ঠিকত কিছু পাইনে খুঁজে লেখার মাথামুণ্ডুরই !"
আবিরভরা কুছুমে
মাতাল আকাশ, থাকিস্ তবে নিঝুম তোরা কোন্ ঘুমে ?

কুমকুমে মাতাল হওয়ার কথা নূতন শুনলাম—আবির কুমকুম আবগারীর মধ্যে পড়লে ক্রয়বিক্রয়ের জন্য তবে Licons০ চাই ?

আকাশ ছাওয়া আলপনা
কোন্ নিপুণের অমল জ্যোতি নবীনচারু কল্পনা

আলপনা গুলো কল্পনা কি পরিকল্পনা যা হয় হোক গে। কিন্তু কোন্ নিপুণের জ্যোতি (?), জিজ্ঞাসা করেই কবি সেরে দিয়েছেন। "নিপুণের অমল জ্যোতি" কথাটার অর্থ কি ? কবি মিষ্টি মিষ্টি শব্দ লাগিয়ে বেশ একটু ছন্দের চটক মেরে সম্পাদক যুগলের কান চারিটা ভুলিয়ে দিয়েছেন। আজকাল কবিযশঃপ্রার্থী অনেকগুলি যুবক এই ফন্দীতে কবি হবার চেষ্টায় আছেন, মাসিক পত্র খুল্লেই প্রায় দেখি এই প্রকারের ছন্দোমিল-সর্ব্বস্ব, ঝঙ্কারময় চটুল ধরণের গোটাকতক পংক্তিতে সুসজ্জিত এক এক কবিতা (?)। —প্রায় সকল সম্পাদকই এই শ্রেণীর আহ্লাদেপনাকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করেছেন। এই সকল কবিতায় প্রাণ নাই আন্তরিকতা নাই—ভাবের গভীরতা নাই বক্তব্য কিছুই নাই—অন্তরের প্রেরণা নাই—ভাষাচ্ছটা আছে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য নাই অনেকস্থলে একেবারেই অর্থ হয় না, অনুপ্রাস আছে কিন্তু অনেকস্থলে তাহা অনুপ্রয়াস, মিলগুলি সুন্দর কিন্তু তাহাতে ভাষার বিশুদ্ধ রীতির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি নাই। ঝঙ্কার আছে, কিন্তু তাহা অলস ও অপ্রয়োজনীয় শব্দের সমবায়ে। এগুলি হয় কবির একটা খেয়াল—নয় একটা হেঁয়ালী নয় এমন একটা কিছু যাহার কোনো অর্থ হয় না কোনো ভাবেরই দ্যোতক নয়। কবিতা লিখ্তে যদি সাধ যায় তবে মনোনিবেশ করে অধ্যয়ন কর, সংসার ও প্রকৃতির নিত্য নূতন লীলাবৈচিত্র্য পর্য্যবেক্ষণ কর, প্রাণে প্রাণে অনুভব কর, সাধক হও ভাবুক হও অবহিত হইয়া অনুশীলন কর, একনিষ্ঠ অনন্যকর্ম্মা হইয়া কাব্যকে জীবনের প্রধান অবলম্বন বা mission কর, শক্তি সঞ্চয় কর, জ্ঞান সাধনায় ব্রহ্মচারী হও, রস সাধনায় বাউল হও আর বলিবার মত বিলাবার মত এমন কিছু অন্তর লোক হতে সংগ্রহ কর যাহা ছন্দিত করলে সাহিত্যের সম্পৎ বৃদ্ধি পায়। নতুবা শুধু ছন্দোবন্দের নিয়ম কানুনটা অধিগত করে আর কতকগুলো সুললিত শব্দ আহরণ করে' যা কিছু একটা 'তারে নারে' করে ভেঁজে দিলেই গীতিকবিতা হবে না। চালাকী চাতুরী বা ফাঁকীজুকী দিয়ে দুপাঁচজনার কানকে প্রবঞ্চিত করলেই বাজি মারা যায় না।

রসজগতের প্রজাপতি কাব্যলোকের মার্ত্তণ্ড রবীন্দ্র নাথ এখনো মাথার উপর জ্বল-জ্বল করে' জ্বলছেন, তাঁর শাসিত সংসারে চটুলতা ধৃষ্টতা বা প্রগল্ভতা করতে লজ্জা হয় না ? তিনি যে জাহাজ বোঝাই কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে কোন্‌টায় শুধু অলস ছন্দোবিলাস আছে ? কোনটায় শুধু বেতালা জলতরঙ্গ বাজান আছে ? কোনটায় শুধু হাবভাবে চমক দেওয়া মণ্ডনসর্ব্বস্ব নটী লীলা আছে ? কোনটা শুধু নিঃস্বাদ নিঃসার ফেনিলতা ? বাঁশ হতে কঞ্চিদড় হয়ে পড়েছে, হাত হতে আম ডাগর এখন। রবীন্দ্র নাথ ছন্দের পিঙ্গল, শব্দ ভাণ্ডারের কুবের সঙ্গীতের ভরত। তিনি ইচ্ছা করলে ছন্দঝঙ্কার মিল ও অনুপ্রাসের বিশ্বজিৎযজ্ঞ করতে পারতেন কিন্তু তিনি কবি তিনি ঝুমঝুমি বাজিয়ে ছেলে ভুলোতে আসেন নাই তাই তিনি বাণীর সহিত সঙ্গীতের মিলন সাধন করিয়েছেন। তিনি "তত্ত্বের নিথরে রসের পাথার" বিস্তার করেছেন—তাই তাঁর জটায় রসমন্দাকিনী নূতন করে ঝরেছে—ভারতের তপোবনের রাণী নূতন করে' উদীরিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে, ভারতের জাতীয় পাঞ্চজন্য তাঁর মুখমারুতে ধ্বনীত হয়েছে, তাই উপনিষদ্ তাঁর লেখনি মুখে সাম-সঙ্গীতে পরিণত হয়েছে তাই তিনি অনন্তলোকের নিমন্ত্রণ-বাণী নারদ। রসের তত্ত্বের ভাবের ও প্রাণশক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করে' যতটা ঝঙ্কার ছন্দোহিল্লোল ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য কবিতাকে দান করতে পারা যায় তা তিনি দিয়েছেন,—অতিরিক্ত দিতে গেলে [illegible]পসীয় আশ্রমে

অপ্রাসঙ্গিকতার অবতারণা করা হতো—অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণের বদলে শিখণ্ডীকে সারথ্য দান করা হতো। অনেক নবীন কবির কবিতায় আমরা রবীন্দ্র নাথের কবিতার চেয়ে অধিকতর অনুপ্রাস, চটুলতর ছন্দোহিল্লোল মধুরতর ঝঙ্কার ও চতুরতর মিল দেখ্‌তে পাই কিন্তু তাঁদের একটা কবিতাও কি তাঁদের গুরুর কোনো কবিতার সমকক্ষ হ'তে পেরেছে? তাঁদের কাহারো কি একটা একটা জীবনবাণী নিরূপিত হয়েছে? তাঁদের কেহই কি রবীন্দ্র নাথের হাতের গাণ্ডীবটা তুলিয়া ধরিতে পারেন জ্যা আরোপণ ত দূরের কথা? একথা কেমন করে বুঝাব এই শিল্পীদের, যে রঙের পর রঙ ঢাল্‌লে আর তুলির বহুলস্পর্শে চমক দিতে পারলেই আলেখ্য সুন্দর হয় না? শুধু আলো ও ছায়ায় শুধু কালো ও সাদায় সুনিপুণ সমাবেশেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র অঙ্কিত হতে পারে। বাজারে অনেক রঙ্গীন ছবি দেখেছি তাতে রঙের চাকচিক্যে চোখ ঝলসিয়ে যায় কিন্তু তবু তাহা পট।

শুধু সাদা কাগজের উপরে কালো রেখা টেনে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন যে ছবি আঁকছেন তা অগুরুর বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ছাপা হলেও ঐ পটগুলো হতে অনেক সুন্দর লাগে। কেন ভাল লাগে? ঐ চিত্রগুলিতে প্রাণ আছে, চিত্ত আছে বলেই ভাল লাগে তাই অমর কবির কথায় বলি—

"বৃথা চেষ্টা ভাই
সব সজ্জা লজ্জা ভরা চিত্ত যেথা নাই।"

প্রকৃত উচ্চদরের কবিত্ব যে শব্দগত নয় ভাবগত তার প্রমাণই হচ্ছে কবিগুরুর গীতাঞ্জলি।

অনুবাদে গীতাঞ্জলির শব্দের মোহিনী শক্তি বিন্দুমাত্র ভাষান্তরিত হয় নাই, পাশ্চাত্য জগৎ পেয়েছে গীতাঞ্জলির রসঘন ভাবটি, তাহারি বোধশক্তিতে পাশ্চাত্য রসগুরুদের মৌলি আমাদের কবির চরণে অবনত হয়েছে। শব্দের ছটায় নয়—'কাঙাল দেশের মনমালিকে ভুবন সমুজ্জল।'

কবিযশঃপ্রার্থী—প্রাংশুলভ্য ফলের জন্য উদ্বাহু বামনের দল! প্রকৃত কবি কাকে বলে চোখের সামনেই দেখছ তার ভক্ত হবার যোগ্যতা লাভ কর। বাণীকে নর্ত্তকী বানিয়ে তার গলায় ঘুঙুর পায়ে নূপুর পরিয়ে মাসিক সম্পাদকদের দরবারে নাচিয়ে বেড়ালেই কবি আখ্যা পাবে না।

যমুনা—ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক। প্রথমেই লীলা দেবীর ঝড়। যমুনার প্রথম পাতেই প্রায় প্রতিমাসেই শ্রীমতী লীলা দেবীর একটি কবিতা থাকে। রমণীর করেই মঙ্গলাচরণের বরণ ডালা—এত আমাদের চির প্রথা। কবি সম্পাদক মহাশয় যে কোনো-কোনো কবি সম্পাদকের মত নিজের কবিতাটাই প্রথমপাতে ছাপেন না এটা বেশ শোভন সন্দেহ নাই। 'ঝড়' কবিতাটা কিন্তু ভাল হয় নাই। "পাগল পরশ উন্মাদ অম্বর"—এর অর্থ কি? আকাশের ঘোর ঘনঘটা চিকুর (?) জলদ জাল—তার জলে ভরা সুনিবিড় (?) সুবিশাল আঁখির সঙ্গে তুলিত হয়েছে কিন্তু উপমাটা কি ভাল হয়েছে?

"গুরুগুরুগুরু গরজন আর থেকে থেকে দেয়া হানে।"
"দেয়া হানে"—কি হানে? অর্থ কি?
চপল চপলা চকিত প্রভায় থেকে থেকে চমকায়
ওগো এ যে তার চারু (?) চুম্বন, করকারই ব্যাথা তায়

শুধু 'চয়ের অনুপ্রাসে ত চলিবেনা, বিদ্যুতের সঙ্গে চারু চুম্বনের উপমাটাও চলে চলুক কিন্তু চুম্বনে করকার ব্যথাটা কি? করকা কি এখানে দন্তপংক্তি?

নন্দীর অনুশাসন। যতীন্দ্র মোহন বাগচী। রচনা Seriocomic, বেশ হয়েছে—দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিচ্ছবি। শেষ পংক্তিটা চমৎকার—

"সবচেয়ে মান লিখিয়া দিলাম
খাস গোলামের ভালে।"

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়ের "মরণ বঁধু" কবিতাটা নেহাৎ মন্দ হয় নাই। এই নবীন কবির হাতটি বেশ মিঠে।

"কে আসিছ তরী বেয়ে ওই পার হতে" বলেই এক নিশ্বাসে আবার বলছেন "কে তুমি আসিছ চলি অপরূপ রথে" কবির কখনও এরূপ অসামঞ্জস্য ঘটাবার ইচ্ছা ছিল না "পথে"র মিল দিতে জন্য কিছু না পাওয়াতেই এই বিভ্রাট। কবিতার শেষ পংক্তিটা বড় দুর্ব্বল হয়েছে।

"যাব বঁধু তোমা সনে নাহি দুখ লেশ।"

এখানেও ঐ "দেশ" এর সহিত মিল দিতে গিয়ে পংক্তিটা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

অ-মানুষ। শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। হেঁয়ালী ধরণের রচনা। কবিতাটা যাতে ভাল করে' বোঝা না যায় সেজন্য মোহিত বাবু চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। 'সব-হারানো' 'আঙুরপেষা' 'সোহাগগাথা' 'কাচের মতন নয়ন তারা' ইত্যাদি পদবিন্যাসে রচনার মাধুর্য্য বাড়ে নাই।

ঘোমটাপরা মিথ্যাময়ী

সেই যে আমার হৃদয় জয়ী

মিথ্যাময়ী ও হৃদয়জয়ীর একটা পুংলিঙ্গ অন্যটা স্ত্রীলিঙ্গ। নইলে মেলেনা। "আমি তোদের কেহই নই" এখানেও রীতিমত ছন্দঃ পতন। পরে ও পড়ে, হাহাকারে ও অন্ধকারে কিন্তু ভাল মিল হয় নাই। 'নেশা' দেখা যায় না, কানের উপরে গুঞ্জরণ করার রীতি নয় কানেই গুঞ্জরণ চলে। যে একটা চুমায় নিশ্বাসরোধ করবে সে কণ্ঠহারে কি প্রকারে জড়িয়ে থাকবে? "অকূল কালো অন্ধকারে সবহারানো পথের শেষে বসে' ঘোমটাপরা, মিথ্যাময়ী আকুল হাহাকারে কাঁদছে" এ-কি রীতিমত হেঁয়ালী নয়?

"বুঝব দরদ প্রেমের সেবায়" দরদ—না—কদর?

রবি-প্রশস্তি। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। কবিতায় শব্দাড়ম্বরই বেশী। ঢাক ঢোল শঙ্খ ঘণ্টার আওয়াজে কতকটা হতভম্ব হয়েগেছে। সুন্দর হয়েছে—

"লহ ওগো লহ..........................

তুমি চির নির্ভর।"

রাজসূয় যজ্ঞের উপমাটাও বেশ সুন্দর হয়েছে—বিশেষতঃ ঐ শিশুপাল গুলোর প্রতি একটু কশাঘাত।

"ভুবনবন্যা জীবনধন্যা বহে আজ ভরপুর" অস্পষ্ট।

"যা কিছু যাহার কলঙ্ককালি যাহা অচলায়তন

সত্য আলোকে ধুয়ে নেয়ে লভি সে দীপ্ত বরিষণ—

সুরচিত নয়। সত্য আলোকে কলঙ্ক কালি ধুয়ে নেওয়া বেশ কথা কিন্তু যাহা কিছু অচলায়তন তাহা শুধু ধুয়ে নিলে চলবে কেন?

"নবজাগরণ হানে" এই হানে কথাটির প্রয়োগ বড় সুন্দর হয়েছে। অচলায়তন,—পুরুষোত্তম, সাহিত্যপরিষৎ ভুবন-ভবিষ্যৎ ইত্যাদি শব্দগুলি পংক্তির শেষে বসিয়া মাধুর্য্য নষ্ট করেছে।

"বঙ্গবাণীরই কোলে দুলে আজ ভুবন-ভবিষ্যৎ" চমৎকার!

ব্রজ—শ্রীগোপেন্দ্রনাথ সরকার: নূতনত্ব, বিশেষত্ব কিছু নাই রচনায় মাধুর্য্য আছে। তৃতীয় পংক্তিতে দুটী অক্ষরের অভাব ঘটেছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়। বিশেষত্ব শূন্য। ২।৪ পক্তি নেহাৎ নিস্তেজ।

রবীন্দ্রনাথ (গান) শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। গানটি বড় মধুর হয়েছে—

"রাগ রাগিনীর রশ্মি টানে

বাণী নিজে বশ্য মানে"

বাণীকে ঘটকীর সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। 'বশমানে' 'বশ্যতা মানে' এ দুটাই শোনা ছিল কবি লিখেছেন বশ্যমানে, 'রশ্মি টানে' এর সঙ্গে মিলটা জোরালো হয়। 'সপ্তসুরের সপ্ত ঘোড়া' ২য় সপ্ত 'সাতটি' হলে ভালো হতো।

"সুরের রাজা যার অপরূপ ভঙ্গীতে" নিস্তেজ।

মর্মীশিশু। শ্রীকুমুদরঞ্জন—চলনসই রচনা।

"দেখতে জোটে অসংখ্য লোক,

যায়না কেন জানা।"

"অসংখ্যলোক কেন দেখতে জোটে জানা যায়না" এই অর্থ প্রকাশ করতে হলে শব্দগুলিকে পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে সাজালে চলবে কেন? আর মিউজিয়ামে মর্মীশিশু এসেছে দেশের লোক এই বিচিত্র দৃশ্য দেখতে জুটেছে ইহা স্বাভাবিক এ ক্ষেত্রে কেন তারা যাচ্ছে তা জানাই বা যাবেনা কেন? শেষ শ্লোকটি নেহাৎ নিস্তেজ—

যায় তাহারা চকিত (?) চলে মোরগ ডাকার আগে

আলোকপুলক গুটিয়ে (?) নিয়ে গভীর অনুরাগে (?)

ঘুম পাড়িয়ে চুপ করিয়ে যায় তাহারে রেখে

সকাল বেলায় আবার কাঁদে কাঠের পুতুল দেখে।

কবিতাটা শেষ হয়ে গেল সহসা! আরো একটা শ্লোক হলে পূর্ণাঙ্গ হতো।

দয়ার সাগর। শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া ভক্তি নিবেদন—রচনায় ভক্তি আছে রচনাও নেহাৎ মন্দ হয় নাই কতকগুলি পংক্তি নেহাৎ নিস্তেজ, তন্মধ্যে—

"লজ্জায় রক্তিম রসে (? রঞ্জিত হবেনা আর
জীবনের পালা (?)
বিদ্যা আর অন্নদানে সমগ্র ভারত আজ
অতিথির শালা"

—বড়ই দুর্ব্বল। অতিথিশালা চলে অতিথশালাও চলে "অতিথির শালা" ভাল শুনায় না। অগ্নিশিখাকে 'অগ্নিময় শিখা' ও 'রজনীযোগে' কে 'রজনী মাঝে' লিখিলে শব্দ বিন্যাসের প্রশংসা করা যায় না। "দয়ার অধীশ" তথৈবচ।

অঞ্জলি। কার্ত্তিক। অতুল। শ্রীগিরিজাকুমার বসু। সহজ সরল ভঙ্গিতে সুন্দর রচনা।

অনাথ। শ্রীরসময় লাহা। মন্দনয়।

চাওয়া। শ্রীমতী লীলা দেবী। আরম্ভ টুকু বেশ—"চাইনা মোরা রতনমণি সাতটি রাজার ধন" শেষ পর্য্যন্ত মাধুর্য্য রক্ষা হয় নাই।

পাগল

(শ্রীসতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়)

সন্ধ্যা যখন অন্ধ হ'ল গভীর মৌনতায়
বিশ্ব যখন মুদ্‌ল আপন আঁখি,
সুপ্তি যখন অন্ধকারের আকুল ক্রন্দনায়
শ্রান্ত শিশু রাখল ক্রোড়ে ঢাকি',
কল্পনারি দ্বন্দ্ব যখন বাস্তবতার সাথে
ক্লান্ত যখন পন্থহারা প্রাণ;
তখন কেন পাগল ওরে পাগল ওরে মোর
আপন মনে গাইবি খেয়াল গান!

ঝঞ্ঝা যখন গর্জ্জে বেগে মত্ত মেঘাঙ্গনে
দম্‌কা বায়ে দীপ্‌টী নিভে যায়,
রুদ্র যখন তাণ্ডবেতে মত্ত আপন মনে
নৃত্য করে দৈত্য পাগল প্রায়,
রুদ্ধ দুয়ার সিংহরাজের অর্দ্ধগুহা পথে
গর্জ্জনেতে চম্‌কে উঠে প্রাণ;
তখন কেন পাগল ওরে পাগল ওরে মোর
আপন মনে গাইবি খেয়াল গান!

মত্ত যখন আপ্‌না লয়ে বিশ্বে সকল প্রাণ
শিথিল যবে মর্ম্ম-বাঁধন ডোর
কান্না হাসির মাঝ্‌খানেতে দিনের অবসান
সুখের আশে রাত হয়ে যায় ভোর;
শ্মশান ভূমির বক্ষে যখন চিতার আগুণ জ্বলে
শিউরে উঠে শঙ্কাতে মোর প্রাণ;
তখন কেন পাগল ওরে পাগল ওরে মোর
আপন মনে গাইবি খেয়াল গান!

বিত্ত যখন ফুরিয়ে আসে চিত্তের মাঝখানে
মিথ্যা যবে ভুলায় সরল পথ
দুঃখ যখন অগ্নি হানে সুখের কমল বনে
রুদ্ধগতি ভগ্ন মনোরথ,
যাত্রী একা অর্দ্ধপথে রাত্রি যখন নামে
গুম্‌রে উঠে জল্পনাতে প্রাণ;
তখন কেন পাগল ওরে পাগল ওরে মোর
আপন মনে গাইবি খেয়াল গান!

শিল্পকলা বিজ্ঞান

[শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১) ৬৪ কলা বিদ্যা সকলি মৌখিক শিক্ষণীয়।

(২) সূপকার (রন্ধন, খাদ্য সামগ্রী, আচার, মোরব্বা, ঔষধাদি প্রস্তুত)

(৩) উদ্ভিদ বিদ্যা (ফুলগাছ সাক-সবজী বৃক্ষাদি রোপন চারা কলম বীজ সংগ্রহ প্রভৃতি)

(৪) প্রাণী বিদ্যা (গোসেবা, পক্ষী, মৎস্য, অশ্ব হস্ত্যাদির চিকিৎসা ও শিক্ষা, রেশম গালার কাজ প্রভৃতি)

(৫) কাম ও সুদ বিলাস প্রসাধন (স্নান পরিচর্য্যা, উৎসাদন অথবা ধূপের ধূমে চুল শুখান অলক্তকরাগ রচনা, পুষ্পাভরণ সজ্জা, কেশরচন কঙ্কতিকা বা প্রসাধনী, কূর্চ্চ বা কুঁচি, চিরুণী দ্বারা সজ্জা, চন্দনাদি অনুলেপন, তিলক পত্ররচনা, চন্দন হরিতাল মনঃশিলা গোরোচনা দ্বারা প্রলেপ, গন্ধদ্রব্য বা লোধ্রচূর্ণ কালেবক উশীর সৌগন্ধ পুটিকা প্রভৃতি প্রস্তুত, সিকথ বা পোমেটম প্রস্তুত, অঞ্জন, ফেনক বা সাবান প্রস্তুত, আচুব্য অলঙ্কার প্রত্যাচুব্য (পরিধেয়) সজ্জা)

(৬) নটকার্য্য (আবৃত্তি, কীর্ত্তন, যাত্রার দলের কার্য্য, হাবভাব নৃত্যগীত বাদ্য-শিক্ষা)

(৭) অশ্বগজরত্ন স্নেন পরীক্ষা

(৮) কেরল শকুন (হস্তরেখা জ্যোতিষ সামুদ্রিক শিক্ষা)

(৯) মুদ্রাশিল্প (অঙ্গভঙ্গির দোষগুণপরীক্ষা, কথকথার মুদ্রাদোষ পরিহার)

(১০) স্বরোদয় (নিঃশ্বাস প্রশ্বাস তত্ত্ব, সভ্যভাবের কথা বার্ত্তায় সুর অভ্যাস, যথাসাধ্য বিনয়াদি সহ ওজন করা কথা আপনার লোকের মত কথা ও সহবৎ শিক্ষা)

(১১) কাব্য (সামাজিক কথা বার্ত্তা রসিকতা, সুচিন্তিত শ্লোক আবৃত্তি, সমস্যাপূরণ প্রভৃতি)

(১২) অস্ত্র নির্ম্মাণ (লাঠি, ধনুর্ব্বান গুলতি অসি গদা শতঘ্নী ভূষণ্ডী প্রভৃতি যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ)

(১৩) স্থাপত্য (গৃহ বাস্তু কুণ্ড নির্ম্মাণ ও তৎকার্য্যে সাহায্য বাসগৃহ, রাজগৃহ, ধান্যশালা মরুবিবিত ধন্বদুর্গ, পাষান বা ইষ্টক বেষ্টিত মহীদুর্গ, জলবেষ্টিত অব্দদুর্গ, মহা বৃক্ষাদি বেষ্টিত বার্ক্ষদুর্গ সৈন্যবেষ্টিত নৃদুর্গ, পর্ব্বত বেষ্টিত গিরিদুর্গ নির্ম্মাণ তন্মধ্যে স্ত্রীগৃহ, অস্ত্রাগার, আয়ুধাগার নির্ম্মাণ, অর্দ্ধ চন্দ্র বা সকলার রাজগৃহ, দেবালয়, মঠ, পান্থশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ, বিচারালয় শিল্পাগার প্রস্তুত)

(১৪) সামান্য বেদাঙ্গ শিল্প দণ্ডনীতি (সামান্য অর্থ শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও রাজনীতির কথা)

(১৫) সামান্য বেদ সম্মত শিল্প (অর্থশাস্ত্র, গন্ধর্ব্ববেদ—বিশেষ গীতবাদ্যাদি, ধনুর্ব্বেদ ও আয়ুর্ব্বেদ)

(১৬) শাস্ত্র বিদ্যা (কথা শিল্প বা কথকতার সাহায্যে ধর্ম্মশাস্ত্র মীমাংসা ও ন্যায় পুরাণাদি শ্রবণ, দেবদেবী প্রতিমার ছবি পুতুলের সজ্জা, মেলার দ্রব্য সম্ভার গুছান)

(১৭) বেদাঙ্গ বিদ্যা (শ্রীধর স্বামীর মতে শিল্প-বিদ্যা) গুরুগৃহে স্মরণ শক্তির সাহায্যে জ্যোতিষ ছন্দ নিরুক্ত ব্যাকরণ কল্প ও শিক্ষা।

(১৮) বেদ বিদ্যা—তপোবনে গুরুর চরণ মূলে বসিয়া কথোপকথন সাহায্যে ঋক যজু ও সাম শ্রবণ, অথর্ব্ব বেদের কর্ম্ম কাণ্ডের আয়োজন।

(১৯) আধ্যাত্ম বিদ্যা শিল্প নহে কিন্তু যাহা আকৃতির

বহিরাবরণ ছয়:বশ ভেদ করিয়া আন্তরিক সত্য প্রকাশ করিতে হইলে নিষ্কাম কর্ম্মে অভ্যাস আবশ্যক এ সময়ে দেহ রথের সারথীর সন্ধান চিন্তার প্রাবল্যে ভাবে উপলব্ধি করা যায়—

(২০) ব্রহ্ম বিদ্যা (মুক্তজীব আত্ম শক্তির উদ্বোধনে গুরু কৃপায় উপলব্ধি করে) এ সময়ে শিল্পি নিত্যের ভক্ত হইয়া পড়েন আত্মার উপাসক হন রূপ ছাড়িয়া নিত্য বস্তু প্রাপ্ত হন। ধর্ম্ম দর্শন ও সাহিত্যের চিত্রে স্থাপত্যে সকল কার্য্যে সকল গানে তাঁহারি গোপন কথা যাহা অব্যক্ত ছিল ব্যক্ত হইয়া যায় আদর্শ ভক্ত শিল্পি আর গোপন করিতে পারেন না।

নিম্নে অন্তর্মুখী প্রাচ্য শিল্প শক্তি হইতে বহির্মুখী পাশ্চাত্য শিল্পকলার পর পর বিশ্লেষণ করা হইল।

বিশ্লেষন পর্য্যায়

ব্রহ্মা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে এই অন্তর্মুখী ব্রহ্ম-বিদ্যার শিক্ষা দিবার সময় বলিয়াছিলেন "যা এই দেখেছ সবই ব্রহ্ম" এই ব্রহ্ম দর্শনের জন্যই সকল শিল্পী ছুটিতেছে। দর্শন লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ সে বিশ্ব-শিল্পীর আদেশ লাভ করিতে পারেন না। ইহাই স্বরাজ প্রাপ্তি।

ব্রহ্ম-বিদ্যা
শিল্পী-ঋষি

বিশ্বরূপ কালরূপী ব্রহ্মের সংহারক রূপ। বিজ্ঞান রূপ বা সাঙ্কেতিক রূপ এই পৃথিবীরই রূপ যা আমরা বিজ্ঞান বলে দেখিতে পাই। ব্রহ্মরূপ দর্শন গুরু কৃপায় তপস্যা দ্বারা লাভ হয়। বিশ্বরূপ দর্শন যজ্ঞের দ্বারা দিব্য চক্ষু লাভ হইলে হয়। সাঙ্কেতিক রূপ আমরা দান বা স্বার্থত্যাগ দ্বারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লাভ করি। "প্রতিভা" বিকসিত হইয়া "আত্মোপলব্ধি" হয় তাহার পূর্ণাবস্থায় "আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়। এই সময়ে সেই ঋষী শিল্পীর সকল সংশয় তিরোহিত সে আনন্দে বলিয়া উঠে "হে অমৃতের সন্তান আজি তাঁকে জেনেছি" কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে কি জেনেছ? তবে সে বলিতে পারে না কারণ "যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যং মনসা সহ" বাক্য সেখানে পৌঁছাতে পারে না জান যে জানায় সে যে তাই। বিশ্ব শিল্পীর শিল্প এই বিশ্ব। তিনি-এ বিশ্বের "ছাঁচ।" ঋষির শিল্প ভারতের বড় বড় মন্দির বুঝতে হলে যে ছাঁচে দক্ষিণ ভারতের মন্দির গুলি গড়া হয়েছে সেই অজান্তার গিরী গুহায় যেতে হয় কিন্তু সেটিও ছাঁচ (Nogetive) তার আসল খানি (Positive) কোথায়! সকলেই বলে বিদ্যুত দেখেছি কিন্তু বিদ্যুৎ কি তা কোন বৈজ্ঞানিকই জানেন না। তার অভিভার লজ সেই ছাঁচ (Electron) খানির আভাষ দিয়ে থেমেছেন। ষোল হাজার গোপিনী কৃষ্ণ ঠাকুরের চারিধারে ঘুরচি মনে করে ঘুরচে কিন্তু ঠাকুরটি সেখান থেকে সরে পড়েছেন। ইহাই প্রাচ্য বিজ্ঞান। সেই আসল বীজাঙ্কুর চারি পাশে হাত ধরাধরিকরে নানা ভাবে নানারকম জীবাঙ্কু নাচছেন সেই নাচার ভঙ্গির ভেদে বস্তুভেদ হইতেছে; মূলে সেই একই রকম জিদ অঙ্কুর সমন্বয়।

ঋষিব্রহ্মচারী তাঁকে জানাতে যা বললেন তাই "বেদ।" ইহাও সেই অপরা বিদ্যা নহে। ইহা নেতি নেতি (Negetive) ভাবে তাঁকে জানবার একটা অব্যক্ত কাকলি। তবে সেই ব্যক্ত জীনিসটা কি তা জানতে হলে প্রথমে চারিটি প্রশ্নের উত্তর জানতে হয়। যেমন অরুন্ধতি নক্ষত্র কোনটি জানাইতে হইলে নিকটবর্ত্তী আর চারটিকে নির্দ্দেশ করিয়া তন্মধ্যে একটীকে অরুন্ধতী বলিয়া দর্শনেচ্ছু ব্যক্তির দূরবর্ত্তী নক্ষত্র সমূহ হইতে অরুন্ধতীর দিকে যথাসম্ভব সন্নিদৃষ্ট করিয়া পরে ঐটি অরুন্ধতী নহে এটিও অরুন্ধতী নহে এটিও অরুন্ধতী নহে এই ভাবে বুঝান হইয়া থাকে সেইরূপ চারটী প্রশ্নের উত্তর উপলব্ধির জন্য দেওয়া হইল। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে এ গুলি পড়িবার পূর্ব্বে বর্ণ জ্ঞানের মত আবশ্যক। এখানে অধিকার ভেদের কথা উঠিতে পারে। যদি দেশের লোক জিজ্ঞাসু হইয়া থাকে তাহা জানিবার উপায় এই যে যখন দেখিবে চারি-দিকে যেন আগুন লাগিয়াছে এরূপ ভাবে পতঙ্গের মত জিজ্ঞাসুরা যখন বহ্নিতে ঝাঁপ দেয়, যখন দেশের জাগরণ হয়, যখন সাপের খোলাস ছাড়িয়া তাহাতে চৈতন্য না দেখিয়া আসল সাপের সন্ধানে লোক ছুটাছুটি করে, তখন ঋষি ব্রহ্মচারী আপনার অনুভূতি হইতে এই ব্রহ্মবিদ্যা রহস্য জানাইবেন। এই জাগরণের সময় সমস্ত জগতে আসিয়াছে

বলিয়া নিম্নে অপরা বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয় যথোপযুক্ত ভাবে দেওয়া গেল।

অথাতঃ কোঽহংইতি জিজ্ঞাসা ।১।

সংসার তাপক্লিষ্ট জীবের সাধন লাভ করিবার পূর্ব্বে স্বভাবতই "আমিকে" এই কথার উত্তর জানিবার আকাঙ্খা হয়।

শরীর মন আত্মেতি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ রূপ সমন্বিতো
দুগ্ধদধি নবনীত ঘৃতবদ্বিবর্ত্ত পরায়ণো জীবোঽহং।

আমি শরীর আমি মন আমি আত্মা আমি স্থূল আমি সূক্ষ্ম আমি আদি কারণরূপী। দুগ্ধ হইতে পরে দধি পরে মাখন শেষ যেমন ঘৃত হয় সেরূপ আমি বিবর্ত্তবাদের মহা নিয়মে দুগ্ধরূপ প্রকৃতি হইতে জীবরূপী হইয়া আছি।

এখানে আমার স্বরূপ কি শাস্ত্র বুঝাইতে চাহিতেছে কিন্তু সাধারণতঃ যে ভাবে লোকে সহজে বোঝে প্রথমে অবিবেকী ব্যক্তিগণ যাহাকে আত্মা বলিয়া বুঝিয়া থাকেন সেই শরীরকেই প্রথমে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শরীরটা স্বার্থপর মনস্বী প্রতিভাজন ও আত্মারাম এই তিন প্রকার জীবের বোধের সৌকর্য্যে এইরূপ বলা হইল। আত্মার বিশ্ব ব্যাপকতা ও আত্মার দেহান্তর গ্রহণ এই সত্য, সৃষ্টির রহস্য বিচিত্রতা মঙ্গল স্বরূপ, লয় তত্ত্বের আনন্দ সর্ব্বত্র এই নিবিড় তিমির প্রসারক ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে প্রকৃতি কালী মাতার রক্তাক্ত খড়্গের (Survivul of the fittest) ভীষণ অট্টহাসির স্রোত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ করিয়া যে আনন্দ বিশ্বে ছড়াইয়া দিতেছে এই তিনটিই জ্ঞাতব্য বিষয়।

বৃহদারণ্যকে কাশিরাজ বলিলেন "এই শরীরেই সেই ভিতরের জিনিস থাকে যাকে আমি বলি" অজাত শত্রু বলিলেন "এই শরীরই যদি তিনি হন তবে নিদ্রার সময় কেহ ডাকিলে তিনি সাড়া দেন না কেন?" উত্তর হইল "তবে এই মনই তিনি তুমি যাকে আমি বল" "তবে মূর্চ্ছার সময় চেতনা হারাইলে মন বা শরীর কারও কোন খোঁজ পাইনা কেন?" "আমি আর বেশী বলিতে পারি না আমি তোমার শিষ্য" রাজা, বল বল আমার সেই ভিতরের জিনিসের কথা।" রাজা বলিলেন "এই তোমার আত্মাই তুমি সেই তোমার ব্যক্তিত্ব। তুমি মাকড়সার মত তোমার মন সেই জালের সূত্র তোমার শরীর সেই জাল তোমার আত্মাই ব্রহ্ম তুমি সেই আত্মা। সেই আত্মাকেই হে মহাত্মা তুমি পূজা কর" "বুঝেছি এই আমার আত্মাই আমার স্বরাজ। আমার পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্ত্রী আত্মজ যা কিছু দেখি সবই হয়ে আছেন। যেমন স্বপ্নে আমি দেখিতে পাই এই সব সেইরূপ আমার আমি দিয়ে বিশ্ব জগৎ তৈয়ারী।"

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ॥

অর্থাৎ যাহা দেখি যাহা করি যাহা ভাবি সবই তাঁর মধ্যে দেখা, তাঁহার দ্বারা ঢাকা শ্রেষ্ঠপথ, সেই ঢাকা ভেদ করিতে পারা কঠিন। মনের মধ্যে সকল কর্ম্মে আসক্তি ত্যাগ করে কর্ম্মের স্রোতে যাহা পাই তাহাই ভোগ করিব সকল কর্ম্ম করিব দেহ রক্ষা করিব ইহাই শ্রেষ্ঠ কার্য্য।

মৃতোপরং কা গতি ।২।

দ্বিতীয় প্রশ্ন মৃত্যুর পরে মানুষের কি অবস্থা হয়।

মৃত্যা পূর্ব্বপরং চ ভাবনাবশাৎ গতি সিদ্ধি জলৌকাবৎ
আত্মবন্ধুদেহে প্রবৃত্তি প্রেরণে চিন্তাবাক্য কর্ম্মাদৃষ্টবশাচ্চ।

অধিকারি মনঃ প্রধানজীবানাং সজ্ঞানে স্বর্ণকারবৎ অবিশুদ্ধ স্বর্ণে বিশুদ্ধালঙ্কার গঠন চেষ্টা পরায়ণ শরীর রূপ মলিন স্বর্ণে উদ্বেগ শূণ্যং মহাপুরুষভাব শুক্রমাপ্নোতি।

তত্ত্বজ্ঞানী দুঃখোৎপত্তি নিবৃত্তি পরায়ণঃ আত্মাময় পুরুষা মামত্রে স্বেচ্ছায়াং দেহং ত্যক্তং অদ্বৈতগুণসম্পন্নায়াম বস্থায়াং স্বরূপে নির্ব্বানে তদধীনে সকল সংকল্প নিঃশ্রেয়সঃ সিদ্ধি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠিল মৃত্যুর পরে আমার কি দশা হইবে। উত্তরে জানিলাম যদি স্বার্থপর অবস্থায় মৃত্যু হয় তবে হঠাৎ অথবা ভুগিয়া, ভুগিয়া চোখের জলে (With longing. lingering look behind) শরীর ছাড়িতে হইবে পরে এই স্বপ্নদ্রষ্টের মত (Ecstasy) অবস্থায় মন তাহার সংস্কার লইয়া আত্মজ বা বন্ধু বান্ধবের দেহে ভূতপ্রেতের মত জন্মান্তরের সুবিধার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তোমার মৃত দেহ শৃগাল কুকুরে খাইবে তুমি জীবিত তোমার মৃত

দেহ ত্রিপাদ দোষযুক্ত। সে দেহ দাহের উপযুক্ত নহে। তোমার আত্মীয় স্বজন ঐ দেহ দাহ করিলে জানিও এ তাহাদের দয়া। তোমার মড়া ফেলিবার লোক জুটিতে পারে কিন্তু সেটি তাদের স্বইচ্ছায় নহে কারণ কেবল আপনার লইয়াই ছিলে তোমার ব্যক্তিত্ব মাত্রই উদ্বোধিত হইয়াছিল, মনুষ্যত্ব নহে তুমি মানুষ হইয়া মরিতে পার নাই এই তোমার দোষ। তোমার মৃত্যুকে নাশ বলা যাইবে এযে সত্যিকারের মরণ এইবার তুমি অবিশ্রান্ত জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে পড়িয়া গেলে। যখন বুঝিবে যে শরীর তুমি এত যত্নে রাখিয়াছিলে তাহা তুমি নহ তুমি মনটি মাত্র। শরীর তার থাকিবার ঘর। তুমি যে গৃহের আলো শরীর সে গৃহের অন্ধকার।

তুমি যখন ভিতরের মনের সন্ধান পেলে তখন সেই তোমার আদর্শ বা গুরুর মত হইলে তবে স্বর্ণকার যেমন খারাপ স্বর্ণ পিটিয়ে আগুণে দিয়ে নিজের আদর্শের অনুরূপ ভাল গহনা করে' তেমনি তোমার দুঃখ কষ্টের দাহন জ্বালাকে বরণ করে তোমার মনকে পবিত্র করিতে হইবে। ক্রমাগত বিরহের দুঃখে দুঃখে পবিত্র হইতে পারিবে। যখন মহাযাত্রার সময় আসিবে তখন তোমায় জানাইয়া আসিবে। সে সময় তোমার বার্দ্ধক্যে যথাসময়ে তোমায় লইয়া প্রতিভার উচ্চ অবস্থার মত, ক্ষানিক নিদ্রার আশ্চর্য্য শক্তির আনন্দের মত আসিবে। তুমি সজ্ঞানে ফুলের মালা গলায় দিয়া চতুর্দ্দোলে চড়িয়া মহাশ্মশানরূপী মহামানবের সাগরের তীরে মহাযাত্রার আনন্দ শুভাগমন করিবে। তুমি তখন সমাজের দেশের প্রাণের জিনিষ তুমি লোক নও ভাব। তোমার জর মরণ নাই বন্ধন নাই। তাদের জীবনে তুমি এই শিক্ষা দিবে যে দেখ ভালবাসা ভক্তি গুরুজনের শ্রদ্ধা. এই সংগুণের জন্য আমি এই অবস্থা লাভ করিয়াছি আমি মরিব না। মহাযাত্রার সেই আদর্শে মিশিতে যাইতেছি। যেখানে আমার গুরুর আদর্শ তাহাতেই আমি মিশে এক হয়ে এক সঙ্গে কার্য্য করিতে চলিয়াছি। আমার আর জন্মান্তর নাই। তোমার দেহ শীঘ্র শীঘ্র দাহ করা হইবে সঙ্গে সঙ্গে দেহের [illegible]য়ার শেষটুকু চলিয়া যাইবে।

আর যখন তুমি জানিবে আমি আত্মা তবে সর্প যেরূপ খোলোস ত্যাগ করে সেইরূপ ভীষ্মের মত স্বেচ্ছায় এই দেহ ত্যাগ করিয়া যাইবে। তখন এ অবস্থা তোমার স্বাভাবিক। তুমি নির্ব্বিকার অবস্থায় ব্রহ্মকে ভজনা করিতে করিতে ব্রহ্মের অঙ্গে অঙ্গ মিলাইবে তখন তোমার সমাধিতে অধিকার হইবে। তুমি দেবযান পথে বিশ্বরূপে রূপ মিলাইবে অরূপ রতন আশা করিয়া রূপ সাগরে ডুব দিবে। তুমি মহাকাশের মহাসামগ্রী হইবে। ভাব রাজ্যে ডুবিয়া ভাবময় হইবে। তখন তুমি আত্মারাম তুমি মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ। তখন তুমি বাকসিদ্ধ ঋষি হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে পিতা পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন "এই যা ভিতরের জিনিস—এর মধ্যে যার অস্তিত্ব আছে দেখতে পাচ্চি তাহা আত্মা তাহা একমাত্র সত্য এবং ওহে শ্বেতকেতু সেই আত্মাই তুমি।" পুত্র বলিল "পিতা আমাকে আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।" পিতা বলিলেন "তাহাই হইবে আচ্ছা বলিতেছি এস এই লবণটুকু জলে রাখ কাল সকালে এই জল লইয়া আমার কাছে আসিও। পুত্র পিতা যাহা বলিলেন করিল। পরদিন পিতা পুত্রকে বলিলেন "কাল রাত্রে জলে যে লবণটুকু ফেলিয়া দিয়াছিলে লইয়া এসো দেখি" পুত্র লবণটুকু কোথায় খুঁজিয়া না পাইয়া নিশ্চয় জানিল যে জলে লবণটুকু গলিয়া গিয়াছে। পিতা বলিলেন "এই জল উপর হইতে তুলিয়া চাখিয়া দেখ ও বল কিরূপ।" পুত্র উত্তর করিল "লবণাক্ত" "তলা হইতে জল লইয়া চাখিয়া দেখ দেখি কিরূপ?" "ইহাও লবনাক্ত" পিতা বলিলেন এইবার আমার কাছে আইস। পিতা বলিলেন "এই দেখ তোমার শরীরের ভিতর যা আছে সত্য করিয়া তুমি তার সত্তাকে জানিতে পারিতেছ না কিন্তু লবণের মত সত্য সত্যই এই তোমার শরীররূপ জলে সেই "আত্মা" আছেন। তাকেই তুমি "আমি" বলে থাক, শরীরের কোন অঙ্গ সে আমি পদবাচ্য নহে। এই ভিতরের আসল জিনিষের ভিতর আর যা কিছুর অস্তিত্ব দেখছো সবই সেই আত্মা। এই আত্মা আর তুমি শ্বেত-কেতু সেই এই আত্মা; বেশ করে বুঝে দেখ ভিতরের জিনিস যা আছে যা কিছু দেখছো সবই আত্মা আর তুমি শ্বেতকেতু সেই সবার আত্মা। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মই হইয়া থাকে।

আবার বৃহদারণ্যকে জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে জনক বলিলেন "দেহান্তরে জীব বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর ন্যায় বৃক্ষাতুল পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ প্রাপ্ত হয় অথবা অঙ্গুষ্ঠ মাত্র সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া সেই দেহে নীত হয় কিম্বা মনের অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য। সংসারী আত্মা তৃণ জলৌকা (জোঁক) যেমন একটি তৃণের অন্তভাগে গমন করিয়া শরীর সংকোচ করিয়া অন্য তৃণ আক্রমণ করিয়া দেহারম্ভ করে জীবও সেইরূপ আয় বন্ধু দেহে আসে। কর্ম্মানুসারে উচ্চ অধিকারী স্বর্ণকার যেরূপ একই স্বর্ণে নানা আদর্শের অলঙ্কার গঠন করে সেইরূপ পঞ্চভূত হইতে দেহ পিতৃমনুষ্য গন্ধর্ব্ব লোকোপযোগী আদর্শের অনুরূপ দেহ গঠন করিয়া তাহার সহিত উন্নীত হয়। যাহারা আপ্তকাম অর্থাৎ একমাত্র আত্মাই যাদের কাম্য তাঁহারা ব্রহ্মবিৎ এজন্য তাঁহারা বিমুক্ত হন। এঁরা দেহাভিমানী নহেন সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্তির ন্যায় নির্ব্বিশেষ আত্মাকে দর্শন করেন। ইহারা জীবদ্দশায় ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন দেহ পাতের অপেক্ষা করেন না। সর্পের খোলোস ত্যাগের মত দেহ আপনিই কিছুতে আটকাইয়া চ্যুত হইয়া যায়।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি প্রকৃতিস্থানে কর্ষতি ॥
শরীরং যদ বপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি স যাতি বায়ুর্গন্ধা নিবাসয়াৎ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ বসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥

ভগবান বলেছেন আমার সনাতন অংশ জীব হইয়া মনও পঞ্চেন্দ্রিয় প্রকৃতির মধ্যে পাইয়া আকর্ষণ করে ভোগ করে। যখন জীবরূপ ঈশ্বর শরীর হইতে নির্গমন করেন তখন যেমন বায়ু গন্ধকে ফুল ইত্যাদি হইতে লইয়া যায় তেমনই শরীর হইতে ইন্দ্রিয় সকল লইয়া যায়। স্থূল শরীর লাভ করিবার সময় যে ষড়ইন্দ্রিয় লইয়া প্রবেশ করে মৃত্যুকালে এই ষড়ইন্দ্রিয় লইয়া নির্গমন করে। সূক্ষ্ম দেহেই হউক স্থুল দেহেই হউক তিনি এই ষড়ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় সকল ভোগ করেন।

"কথম্ভূতো ভগবদ্দর্শনাভাস জনিতানন্দ।৩।

তৃতীয় প্রশ্ন হইল ভগবদ্দর্শনরূপ আনন্দ কিরূপ আমায় বুঝাইয়া বল।

সংসারার্ণবে মজ্জমানো বিপর্য্যস্ত নরঃ যথামৃত্যুরূপাদ্ভয়াৎ কারণয়া ভগতি আত্মসমর্পনন্তবং অনাসক্তবৎ তিষ্ঠতি পশ্যতি চ সহসা বেপথু মাপন্নঃ কৃতজ্ঞতা রসে। বৃষ্টিধারা এবচ ক্ষুরধারা প্রবাহে সিক্তঃ ধন্যো ভগবানিতি কথয়ণ ন কিঞ্চিৎ দেয়ং ইতি স্পৃশুর্গায়ন্ প্রার্থনান্তরালে চক্ষুজল প্রবাহ মধ্যে স্থির লক্ষ্য নব জলধর শ্যাম কলেবরঃ হিমালয় গম্ভীরং কল্লোলিত মহাসমুদ্রবৎ পশ্যন্ অমৃত রসে অন্তর্বাহ্য প্রলেপবিব অনুভবন্ চৈতন্যালোক প্রতিফলিতে নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠে মনসিতিষ্ঠন্ চিরনীরোগ সন্ শরীর মসারং ইতি স্থিরীকৃত্য নির্ম্মল চরিত্র কান্তিদীপ্তিপ্রভা বিশিষ্টঃ প্রিয়দর্শনো ভূত্বা নিত্যানন্দমবাপ্নোতি।

ভগবানকে কিরূপে পাইব তাঁকে পেলে কিরূপ আনন্দ হয় এরূপ ব্যাকুল বিষাদিত ভাব জাগিলে মৃত্যুচিন্তা আসে। মৃত্যু চিন্তা করিতে করিতে বিবেক বৈরাগ্য আসে। বাল্মীকির মত মড়া মড়া বিশ্ব মানবের মত জপিতে জপিতে সত্য সত্যই মনে হয় সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছি ও ভূতের ব্যাগার খাটিতেছি। এই সময়ে হাত পা অবশ হইয়া যখন মৃত্যুকে আত্ম সমর্পণ করিবার মত অবস্থায় বালক যেমন বাপরে মারে করে সেইরূপ ভগবানের নাম মনে জাগে তখনি ভগবানে আত্ম সমর্পনের জন্য প্রবল ইচ্ছা মনে জাগে মুখে উচ্চারণ করি মরি মরি, মড়া মড়া হইয়া পড়ে হরি হরি, রাম রাম। এই সন্ধিক্ষণে কে যেন হিমালয়ের মত মহা সমুদ্রের মত বিরাট মহান বড় করুণা করিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলিতেছেন "মা ভৈঃ" ভয় নাই। এ সময়ে স্নেহময়ী জননীর কোলে আছি বলিয়া মনে হইলে কৃতজ্ঞতায় চক্ষে ধারা বহিতে থাকে। তখন আমরা সেই চক্ষুর জলধারাগঙ্গা জলে আচমন করিয়া বলি হে বিষ্ণু তোমার পরম পদ সকল দেবতাই দেখিতে পাইতেছেন। এ সময়ে যেন ভিতরে বাহিরে অমৃত সঞ্চরিত হইয়া পড়ে। এই এক মুহূর্ত্ত ভগবৎ দর্শনের আনন্দের অমৃত রসে শরীরের স্বাস্থ্য চিরকালের জন্য অক্ষুন্ন থাকিয়া যায়। শরীরি

জীব তখন মনস্বী হইয়া পড়ে ও নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী হয়—আধ্যাত্ম বিদ্যালাভ হয়। মনস্বী ঋষি হয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে। মন কুণ্ঠা শূন্য হয়।

বৃহদারণ্যকে উল্লিখিত আছে "যেমন একাকী মাকড়সা অন্যের সাহায্য ব্যতীত স্বশরীর হইতে সূত্র বহির্গত করে। জাজ্বল্যমান অগ্নি খণ্ড হইতে ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নানারূপে নির্গত হয় এবং এক এক কণাই বিশ্ব দাহনে সমর্থ সেইরূপ ওঁকার-রূপ শব্দ ব্রহ্ম মহাকাশ হইতে তেজ, তেজ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জল, জলে দুগ্ধের সরের ন্যায় এই পৃথিবী ও তাবৎ জীবগণ অবস্থান করিতেছে পৃথিব্যাদি সকলি সেই মধু মহাপ্রলয়ে তেজের দ্বারা জল আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীকে গলাইয়া লইয়া তেজের সহিত উভয়ের লয় হয় শেষে বায়ু আকাশে মিলিয়া উভয়েরই লয় হয়, ওঁকার বীজরূপে পরিবর্ত্তিত হয় এই ওঁকার হইতে অনাহূত নাদ এই শব্দরূপী ক্রমে তেজরূপে প্রতিভাত হয় আবার নূতন বায়ু জল পৃথিবী পর পর সৃষ্ট হয় যেমন বস্ত্রের সূক্ষ্ম তন্তুতে স্থূল বস্ত্র ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত—তেমনি পৃথিবী জলদ্বারা ব্যাপ্ত। যিনি এই পৃথিবীর দেবতা পৃথিবী যাহার শরীর অথচ পৃথিবী যাহাকে জানে না সেই নির্লেপ অমৃতই তিনি। যিনি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তিনিই মনে প্রাণে। তিনি সর্ব্বত্র, কেহই তাহাকে জানে না তিনি এই সকলের অন্তর্য্যামী পুরুষ একমাত্র অমৃত নিত্য এতদ্ভিন্ন যা আছে তাহা তাঁহার ছায়া মাত্র।

আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে :—

"লও এই ন্যগ্রোধ ফলটি লও—এই যে ফলটি ভাঙ্গ" একথা গুরু শিষ্যকে বলিলে শিষ্য ফলটি ভাঙ্গিল। গুরু বলিলেন "কিছু দেখতে পাচ্চ" "না এ ফলের মধ্যে কিছুই নাই"। গুরু বল্লেন "বৎস তুমি এই বাদামের ভিতর অণুগুলি দেখছো এই এক একটি পরমাণুর ভিতর সেই ফলের গাছটি রয়েছে কারণ পুঁতে দেখ সে গাছ বীজ থেকে বেরুবে দেখতে পাবে। মেনে নাও বৎস্য বিশ্বাস কর এই অণুগুলি প্রকাণ্ড ফলের গাছ এই বিশ্ব অণুর আকারে আছে এই মহাসত্য লাভ কর। এই আত্মাই তুমি। যা দেখছো সবই তুমি বুঝলে?" ছাত্র বলিল "আমায় আরো স্পষ্ট করে বুঝান" গুরু বলিতে লাগিলেন "যে খাদ্য খাও তাহার মোটা ভাগ মল হয় মাঝামাঝি সার ভাগে মাংস হয় খুব খাঁটী সূক্ষ্ম সারে মন হয়। যে জল খাওয়া যায় তাও সেইরূপ। মূত্র রক্ত জীবনী শক্তি বা শ্বাস প্রশ্বাসে ও প্রাণরূপে পরিণত হয়। খাদ্যের উত্তাপের অংশে সেইরূপ হাড় মজ্জা ও ইন্দ্রিয়াদির গঠন হয়। মন খাদ্যের বায়ুর অংশে তৈয়ার হয় প্রাণ খাদ্যের জলীয় অংশে বাক্য উত্তাপ অংশে নির্ম্মিত হয় ইহাই যথাক্রমে বায়ু কফ ও পিত্ত।" শিষ্য বলিল বুঝিলাম না গুরু বলিলেন যেমন মধু আস্বাদ করিয়া বলা যায় না কোন ফুলের মধু হইতে তাহা তৈয়ারী হইয়াছে সেইরূপ মানুষ স্বতন্ত্র পিতা মাতা হইতে আসে মৃত্যুর পর তারা সব একই আদর্শের হয়ে যায় তাহাদের ব্যক্তিত্ব ক্রমে সেই মহান আদর্শের মধ্যে এসে এক আত্মা হয়ে পড়ে। নদী যখন সমুদ্রে পড়ে তখন যেমন তার জল নদীর জল সব একহয়ে যায় সেইরূপ সবই সেই আত্মা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত।"

অপিচ "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন দৃষ্টোপরাপরে
"আনন্দ ব্রহ্মনো বিদ্যান ন বিভেতি কুতশ্চন
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং"
ন দৃষ্টে দ্রষ্টারং পশ্যেঃ ন শ্রুতে শ্রোতারং
শৃণুয়াঃ ন বিজ্ঞাতেঃ বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ"

যে বুঝে যে ব্রহ্ম বুদ্ধির বিষয় সে ব্রহ্ম কি বস্তু তাহা বুঝিতে পারে না। যাহার নিকট ব্রহ্ম জ্ঞানের অগোচর সেই ব্যক্তির নিকটই ব্রহ্ম প্রকাশমান হইয়া থাকে। দর্শনকে যে দেখে তাহাকে দেখিতে পাইবে না শ্রবনকে যে শুনিয়া থাকে তাহাকে শুনিতে পাইবে না বিজ্ঞানের ও যে বিজ্ঞাতা তাহাকে জানিতে পারিবে না।

সর্ব্বজন সাধ্য ভগবৎ প্রাপ্তি রূপায়াং সাধনাবস্থায়াং পর্য্যায়ঃ কথমূতঃ ।৪।

চতুর্থ প্রশ্ন হইল সকলে কিরূপ সাধন ভজন করিলে তাঁহাকে পাইতে পারিবে আমার মন?

ভগবদ্ভাব ব্যাকুল বিষাদ চিত্তে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত পাদোবদ্ধাঞ্জলিশ্চ ঊর্দ্ধমুখঃ মৃয়মানঃ শব ইব মন্ত্র শক্তি

প্রসাদেন স্বপ্নাগমে নির্ব্বিশেষঃ চৈতন্যাবস্থায়াং ভগবতঃ শরীরিনাং স্বপ্নে প্রথম ইদ মহ দর্শনাভাষঃ। দ্বিতীয়ে সহাযাত্রা সুষুপ্তাবস্থায়াং অতীন্দ্রিয়ং ভাব চৈতন্যে দৈববানী দৈবদৃষ্টি প্রভাব লক্ষণ সমন্বিত মনস্বিনাং দৈবশক্তি লাভাবস্থায়াং সুষুপ্তৌ জাগরণে অলৌকিক দর্শনে অধিকারঃ।

জাগরণে আত্মজ্ঞানে তদঙ্গে তদধীনে সকল শক্তি আকর্ষিতা আত্মারামে উপপন্নং সমাধিমগ্নং ব্রহ্মজ্যোতি দর্শনে মহাভাব নির্ব্বিকার সমাধি মগ্নায়াং অবস্থায়াং সুষুপ্তৌ জাগরণে অলৌকিক দর্শনে অধিকারঃ॥

ভগবানকে পাইতে হইলে প্রথমে পৃথিবীর সব পাওয়া সব চাওয়ার ইচ্ছা মিটিয়ে নিয়ে ভগবানের প্রাপ্তির আনন্দ যে সব চেয়ে বড় এইরূপ ভেবে, পতিব্রতা নারী যেরূপ দীর্ঘ প্রবাস স্বামী বিরহে কাতরা হইয়া তাঁহার দেখা পাইবার জন্য প্রভাতের স্বপ্নকে তদরূপ দর্শনে নিয়োজিত করেন সেইরূপ ব্যাকুল ভক্ত প্রভাতের স্বপ্ন প্রতীক্ষায় থাকে, বিরহী তার দয়িতকে জাগরণে না দেখিতে পেলে যেমন স্বপনের আশে থাকে, অর্থকামী যেরূপ ছিন্ন কাঁথায় শয়ন করিয়া লক্ষমুদ্রার স্বপ্ন দেখিয়া ক্ষণিক তৃপ্তি অনুভব করে সেইরূপ "ভক্ত বাহুপর বাহুতুলি বৃন্দাবনে কুলিকুলি" উর্দ্ধমুখ অঞ্জলীবদ্ধ হস্ত পদ হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে শবাসনে শয়ান থাকিয়া ইষ্ট মন্ত্র যপ করিতে করিতে ভাবিবে এই জগৎ স্বপ্ন মায়া মাত্র আমি জীব ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহই নই আমিই শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য চেতন, এইটি জানিলে মন্ত্র শক্তি প্রভাবে এই স্বপ্ন চৈতন্য সহজেই লাভ হইবে। মন্ত্রের অর্থ ধ্যান ও ধারনা এক কথায় তপস্যা। স্বপ্নাগমে যেমন চেতনা হইবে স্বপ্নের পর চেতনাবস্থায় কি দেখিলাম কি শুনিলাম কি আনন্দ স্বপ্নরাজ্যে অনুভব করিলাম ইহা মন্ত্র দ্বারা মনে থাকিবে। হস্ত দ্বারা বদ্ধাঞ্জলী করিয়া বুকে ভার দিলে শীঘ্রই স্বপ্ন হইবে। স্ব অর্থে আপনাকে অপ অর্থে পাওয়া। শঙ্করাচার্য্য চেতনাযুক্ত স্বপ্নকে অর্থাৎ যে স্বপ্ন অবস্থায় সাধকের চেতন থাকে "আমি এ সময়ে স্বপ্ন দেখিতেছি" তাহাকে সাধনার অবস্থা (plane) তে থাকা বলেন। এই সময়ে আপনাকে জান (know thy self)। বদ্ধাঞ্জলী হস্তের ভার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্রের উপর বক্ষে থাকায় ঘুমের সময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যাহা রেচক ও পূরক হইতেছিল তাহা মধ্যে চাপবশতঃ কুম্ভক হইয়া স্বতঃ (automatic) প্রাণায়াম হইয়া যায়। জগৎকে স্বপ্ন ভ্রম করা বেদান্তের শিক্ষা এ শিক্ষার আরম্ভ স্বপ্নকে স্বপ্ন ভ্রম করাই আসল উত্তিষ্টত জাগ্রত অবস্থার সূচনা করে। সাধক স্বপ্নাবস্থায় নিজে স্বপ্ন দেখিতেছি এই চৈতন্য লাভ করিলে নিজেকে ভগবৎ শক্তি বিশিষ্ট মনে করে। সে স্বপ্ন জগতে নিজে অন্তর্জগৎ (microcosm) হইয়া বহির্জগতকে (macrocosm) তৈয়ার করিতেছে জানিয়া সৃষ্টির আনন্দে অভিভূত হয়। সেখানে সে ভোগের যা চায় তাই পায়। সেখানে সে দুরারোগ্য রোগের স্বপ্নাদ্য ঔষধ লাভ করে। কবিত্ব জ্ঞান অভিজ্ঞতা প্রতিভা এ সকলি সে স্থানে সুলভ। ভূত ভবিষ্যত যা তার জানিতে ইচ্ছা তাহা মনে উদয় হবা মাত্র তাহা লাভ করে। সেখানকার জগতের নিয়ম (Law of uniformity of nature) কার্য্য কারণ পরম্পরা নহে সেখানে যা চাই তা পাই এই ভাব (Law of necessity) সে সেই স্বপ্ন তীর্থে ভ্রমণ করে সাধক সমাগমে প্রার্থনা করিয়া ধন্য হয়। সে চৈতন্য বুদ্ধ খৃষ্ট মহম্মদ যাহাকে চায় তাহাকে সম্মুখে পায়। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তাহার করস্থিত আমলকীবৎ হয়। এই সকল শক্তির উদ্বোধন হইতে হইতে যতক্ষণ সে এই পৃথিবীতে থাকে ততক্ষণ যেন আর এক ব্যক্তিত্বে (Double personality) বশিষ্ট হয়। একজন তার শরীরের চৌকীদার আর একজন তার "মনের মানুষ"। শেষোক্ত তার ভাবের পথে আনাগোনা করে। তখন সকল ভূতের যে জাগরণের সময় তাহা সেই সংযমীর দিবা তাহা তাহার জাগরণের সময় সে তখন বলে "রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি বুঝিতে নারিনু সখা তোমার পিরীতি"। সে তার মনের মানুষটিকে ভাবের পথে আনাগোনা করিতে দেখে ক্রমে সে তার সঙ্গে যুগলে মিলিত হয়। গাছ হইতে পাকা ফল মাটিতে পড়িয়া যেমন গাছ হইয়া গাছকে পায়। ভ্রূণ যেমন মাতৃ নাড়ী কাটিয়া বাহিরে আসিয়া মাকে পায় তখন সেই [illegible]রাজ্যে। পার্থিব ভোগের তৃপ্তির পর সে সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে চায়

তখন তাহাকে যতদূর সে নিজে বুঝে ততদূর দেখিয়া মুগ্ধ হয়। ইহাই স্বপ্নসিদ্ধি—শরীরি স্বার্থপর লোকের দেখার শেষ অধিকার। তাঁকে দেখতে হলে স্বপ্নে তাঁকে প্রথম দেখা অভ্যাস করিতে হয়।

এইবার সে তার মনের মানুষটি নিজে হইয়া পড়ে শরীরের মানুষ তখন তার গ্রাহ্যের মধ্যে আসে না। তার গভীর ঘুমের অব্যবহিত সময়ে চৈতন্য লাভ হয়। সে সেই সুষুপ্তির সময়ে চেতন হইয়া দিব্য দৃষ্টি শ্রুতি লাভ করিয়া ধন্য হয় কৃতার্থ হয় সে সময়ে সে যা শুনিতে চায় শুনিতে পায়। এইরূপে সে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ভাবে বিচরণ করে। তাহার কথা লোক সমাজ যন্ত্রের মত গ্রহণ করে। এই সুষুপ্তি সমাধিতে সর্ব্বকাম হইলে তাহা জাগ্রত সমাধিতে অধিকার হয়। এই নিদ্রা সকলেই ভোগ করে এক মুহূর্ত্তের নিদ্রায় জীব সেই ব্রহ্মানন্দের মহাসমুদ্রে ভাসমান হইয়া সকল কষ্ট ভুলিয়া যায় অথচ কাহারও মনে থাকে না। এই কথা শ্রুতিতেও আছে—

"যদৈব হিরণ্য নিধিং নিহিতং অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরয়ন্তো ন বিন্দেয় এবমেবেসাঃ প্রজা অহরহঃ ব্রহ্মলোকং গচ্ছন্তোঽপি ন বিন্দেয়ু অণৃনো হি প্রজাঃ"।

জাগ্রত সমাধিতে এখন মনস্বী সাধক আত্মরাম হয়। সে জানিতে পারে "একমেব অদ্বিতীয়ং" সবই এক সে সকলের উপর করস্থিত আমলকীবৎ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা পাতার মত আত্মভোলা হইয়া পরমাত্মার শক্তি জাগাইয়া সে তাহাতে নিজেকে মিশাইয়া দেয়। এখন তাহার জাতীয়তা "স্বদেশ প্রেমের" ভিতরের পদার্থ হইয়া পড়ে—মনের মানুষ আত্মার মানুষের সহিত এক হয়। সে আনন্দ সমাধিতে মগ্ন হইয়া অনাবৃষ্টির দুঃখে তাপিত কৃষকের অনুরোধে ব্যথিত হইয়া যখন অশ্রুজল পরিত্যাগ করে তখন বৃষ্টি আসন্ন হয় ও বর্ষণ আরম্ভ হয়। ইহা মুখের কথা নহে Sir oliver Lodge replies (to Tyndulls apriory objection to prayers for rain) quite airily, that we can ourselves divert water [for power stations etc] & may before long be actually able to control the clouds & cause rain at will". সে তখন নিজেকে তার জাতিকে হারাইয়া পরমহংস হয় ও আনন্দ সমাধিতে মগ্ন হয়। তাহার চিন্তা, বাক্য, কার্য্য সকলি মহানিয়মে চলিতে থাকে সে বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টির উপাদান (Energy) হইয়া পড়ে বস্তু (matter) তাহার চারিপার্শ্বে ঘুরিতে থাকে। সে মনের ভিতর থাকিয়া শরীর হইতে স্বেচ্ছায় বহির্গত (materialised) হয়। সে জীবন্মুক্ত নির্ব্বিকার হইয়া ব্রহ্মের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া সার্থক হয়। সে মহাভূতের মহামূল্য দ্রব্য হয়, প্রকৃতি এইকার্য্যে (Law of conservation of value) সহায়তা করে কারণ প্রকৃতি গুছান মেয়ে—সে রাক্ষসী নহে। এক কথায় তিনি অমানুষ (superman) হন দেবাসুর সংগ্রামের মথিত অমৃতরূপে পরিণত হন। সকল মানুষের মধ্যে সকল দ্রব্যের মধ্যে ঋষি কৃষ্ণের (Jesus Christ) আলোক জ্যোতি যজ্ঞীয় বধ্য পশুরূপে পরার্থে আত্মবলিদান (sacrifice) করেন।

"The cosmic bodies, the planets & suns and other groupings of the ether, may perhaps combine to form something corresponding as it were to the brain cell of some trancendent Mind. This is not an impossibility & it can not be excluded from a philosophic system by any negetive statement based on scientific facts" Life & matter.

আর ওই মহাপুরুষদের কেহই হারায় না। ইহারা বৈদিক ঋষি অবতার ' There is a 'law' of the conservation of value. When the universe has gained something of value it cannot let it go. The tendency of evolution is to increase the actuality of value & no existing universe can tend on the whole towards contraction & decay, because that would foter annihilation and so any incipieont attempt would not have survived ... ...

in the whole nothing really finally perishes that is worth keeping, that nothing once attained is thrown away" Man & the Universe: S. O. Lodge.

বৃহদারণ্যকে লিখিত আছে :—

"যখন বলি এটা গরু—তখন যেমন তার শিং এ হাত দিয়ে দেখিয়ে দিই এই যে গরু রয়েছে ঠিক সেই রকম করে আমার আত্মা আমার ভিতর কোথায় রয়েছে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখিয়ে দাও"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "এই সবার সমষ্টিভূত কারণ ও কার্য্য লইয়া তোমার শরীর তোমার ইন্দ্রিয়াদি যার আলোক তোমার দেহ যার জন্য সুখ দুঃখ ভোগে সক্ষম হচ্চে তাই তোমার আত্মা এই তোমার প্রশ্নের উত্তর। কিম্বা আমার ইন্দ্রিয়াদি যে রথের অশ্ব মন যার সারথী তোমার আত্মা তার রথী। সেই রথীই তোমার আত্মা" যাজ্ঞবল্ক্য আবার বলিতে লাগিলেন "যিনি প্রাণ বায়ুর তরঙ্গে জীবিত এবং সচেতন, সেই জীব যে তোমার মনকে আদর্শের অনুযায়ী গঠিত করছে সেই আধ্যাত্মিক চৈতন্য শরীর যন্ত্রের যিনি যন্ত্রী সেই প্রাণ প্রবাহের আলোক শক্তি সেই তোমার আত্মা।" চক্রায়ণ কহিলেন "আমি সেই ব্রহ্ম, ও সকল হেঁদো কথা ছাড়িয়া দেখাইয়া দাও।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "এরূপ দেখান অসম্ভব, এই যিনি তোমার চক্ষের চক্ষু যার জন্যে তোমার চক্ষু দেখিতে পায় কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি না হলে তোমার লৌকিক চক্ষে কখন দেখা যায় না। আগুনের উত্তাপ যেমন দেখান যায় না। আমাদের চর্ম্ম চক্ষু কতটুকু দেখতে পায় তা বুঝতেই পার সে আবার কি করে সেই প্রচণ্ড আলোর আলোককে দেখবে - যে আলোর জন্যে আমাদের চোখ দেখে সেই আলো চোখ কি করে দেখলে বলত ? এই আত্মা আমাদের ভিতর আছে এবং আমার দোষ নয় যে আমি তোমায় তাঁর কথা কথায় বুঝাতে পাচ্ছি না কারণ আমি কোথায় (plane) আর সেই পূর্ণ আত্মা কোথায়—

> জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাদি প্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে
> তদ্‌ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ব্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে"

[নাথ বসু]

বছর বারো বয়স হলো এর মাঝেতেই ওরে,
আমরা সবাই 'বুড়ী' বলে ডাকছি কেন তোরে,
সেই কথাটী আজকে খুকী বোঝাই তোরে শোন,
জানতে যা তুই মাঝে মাঝে করিস জ্বালাতন।
এই বয়সে গিন্নী যে তুই ঠাকুর মায়ের মত,
ঘর কন্নার রকম রকম কাজ শিখেছিস কত ;
কুটনো কোটা বাটনা বাটা রান্নাঘরের কাজে,
গিন্নীপনা সর্ব্বদা কার সকল কাজের মাঝে ;
মা খুড়ীমার সকল কাজের সঙ্গিনী কে বল ?
সন্ধ্যা সকাল কে বয় কাঁখে কলসী ভরা জল,
কাপড় কেচে কে দেয় সবার পানগুলো দেয় সেজে
খিড়কী ঘাটে সকাল বিকেল বাসন কোসন মেজে,
কে বলে দেয় ধোপা মুদীর পাওনা আছে কত ;
গয়লা বউ আর ময়রা বুড়োর সূক্ষ্ম হিসাব শত ?
পোষা পুষি মঙ্গলা ভুলো কার পিছনে ঘোরে,
ভিক্ষা মাগে কার কাছে রোজ ফকির এসে দোরে,
সঙ্গ কাহার ভাইবোনে সব তিলেক নাহি ছাড়ে,
অত্যাচারে আব্দারে আর পাগল করে তারে ;
বুরুশ করে কামিজ জামা আলনা' পরে রাখে,
মহাভারত পড়ে শুনায় বৃদ্ধা ঠাকুর মা'কে ;

মা খুড়ীমার অসুখ হ'লে কে করে সব নিজে,
গরম দিনে রৌদ্রে পুড়ে, বাদল দিনে ভিজে ?
রোগীর পাশে কাটায় বসে সকল সময় কেবা,
কে গো আমার কল্যাণীয়া মূর্ত্তিমতী সেবা ?
আঙুল গুলি বুলায় কেবা তপ্ত ললাট প'রে,
দূর করে দেয় সকল গ্লানি আপন হাতে করে' ;
রাতের পরে কার কাটে দিন দিনের পরে রাত,
কার চোখে নাই একটুও ঘুম, কার মুখে নাই ভাত ?
কে করে দেয় ঠাকুর দাদার ঠাকুর পূজার সাজ,
ভক্তি ভরে ঠাকুর ঘরে পূজার সকল কাজ ;
সন্ধ্যা বেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ কেবা জ্বালে,
আঁচল গলায় বিভুর পায়ে ভক্তিবারি ঢালে ;
এই বয়সেই মহাষ্টমী, শিবরাত্রির রাতে,
নির্জ্জলা কে উপোস করে ঠাকুর মায়ের সাথে ;
ষষ্ঠিপূজা, নাটাইব্রত, পূজার দিনে, রথে,
হেমন্তেরি যম পুকুর আর সাঁজপূজনীর ব্রতে ;
বার মাসের এমনিতর তেরটি পার্ব্বণে,
মূর্ত্তিমতী ভক্তি কেবা পবিত্রতার সনে ?
অনেক বুড়ী হার মানে যে মোদের খুকীর সাথে,
হোক্ না বয়স অল্প যতই কর্‌বে কিবা তাতে ;
কর্ম্মে, সেবায় ভক্তিতে তুই বৃদ্ধা সবার চেয়ে,
ধন্য হলাম আমরা মাগো বক্ষে তোরে পেয়ে !
নম্য যে তুই সবার মাগো, নাই মা যে তোর জুড়ি,
বাঙ্গলা দেশের সব মেয়েকে তাই তো বলে 'বুড়ী' ।

বরোদার চিঠি

বরোদা
তিরিশে ডিসেম্বর, ১৯২১

ভাই—

তুমি শুন্‌লে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হবে না যে দলে দলে সব স্বদেশ ভক্ত আমরা জাপানী গল্পির ওপরে পোষাকী খদ্দর চড়িয়ে, শতকরা পাঁচজন ছাত্র স্কুল ছেড়ে, সাড়ে তিনজন উকীল ওকালতি বরখাস্ত করে আর দেড়জন রায় বাহাদুর খেতাব ফিরিয়ে, একে আর একজনাকে হাজার বাহোবা দিতে দিতে যখন এবার আমেদাবাদ কংগ্রেসে গিয়ে ভিড় জমালুম,—তখন ৩১শে ডিসেম্বর নাগাত স্বরাজ প্রাপ্তির সম্বন্ধে রবিঠাকুরের পশ্চিমোদয়ের সম্ভাব্যতায় বিশ্বাস করার মতো সন্দিহান হয়ে, আঠাশে তারিখে গভর্ণমেণ্টকে অগত্যা অন্ততঃপক্ষে একটা direct challenge দিয়ে উনত্রিশের রাতারাতি আমেদাবাদকে গুড্ নাইট করা গেল। পেতে পেতে না পাওয়া স্বরাজটা এম্‌নি কোন ফাঁক্ দিয়ে যে বেমালুম ফস্কে গেল তার পাত্তা না পেয়ে আপশোষের জেরটা একটু কমে আস্‌তেই স্থির করে ফেলেছিলুম যে স্বরাজটা পকেটে করে নিতে নেহাৎ নাই পারলুম এবার তবে বিদেশ-ভ্রমণ-জাত জ্ঞানের একটা প্রকাণ্ড থলি যে পিঠে করে নিয়ে যাবো, সে সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহ নাই। বি, বি, সি, আই রেল কোম্পানীকে বহু ধন্যবাদ,—আমাদের ক্যাম্পের সাম্‌নেই তাদের একটা টিকেট ঘর খুলেছিল,—উনত্রিশে সন্ধ্যাবেলা পাঞ্জাবী হোটেলের 'ডাল রোটি' গলাধঃকরণ করে আপ্যায়িত হওয়া থেকে অব্যাহতি নিয়ে, একখানা রয়েল ক্লাসের টিকেট কেটে "রাষ্ট্রীয় মহাসভার" ছাপমারা একখানা লরীতে উঠে পড়লুম। তখন আমেদাবাদ থেকে রেলগাড়ী ছাড়তে মাত্র তেত্রিশ মিনিট বাকী, লরীতে উঠেই তো "প্র—" হাঁকলে 'গাড়ী ছোড়ো', কিন্তু লরীতে তখনও দু তিন জনের বসবার জায়গা

খালি পড়েছিল,তা ভর্ত্তি না হতে "প্র—"র চেঁচামেচিতে লরী ছাড়বার কোনো লক্ষণ driver এর দেখা গেল না। "প্র—" চেঁচিয়ে বল্লে "গাড়ী নেহি মিলনে সে এক পয়সাভি নেহি মিলেগা আউর ষ্টিশনসে মুফ্‌ত ঘুমায় লানে হোগা"—

জবাবে driver "নেহি বাবু—" বলতে সুরু করেই,—পোঁটলা-পুঁটলী-বয়ে-নিয়ে-আসা এক ভদ্রলোককে দেখে দৌড়ে গিয়ে গুটি দুই বস্তা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে—

"ইয়ে মোটর মে আইয়ে বাবুজী—"

এম্‌নি করে দু তিনটা আরো শীকার পাকড়াও করতে তার আরো মিনিট সাত আট গেলো। ইতোমধ্যে "প্র—" "কি nonsense," "কি irresponsible" 'এরা চায় কেবল পয়সা, এরা কি delegate দের সুবিধে চায়?"—ইত্যাদি দু'একটা কথা দারুণ বিরক্তির সঙ্গে বলে যাচ্ছিল। শেষটায় যখন পাশের লরিখানা "ভঁপু" বাজিয়ে ছেড়ে দিলে তখন সে একেবারে অধৈর্য্য হয়ে, "দূর ছাই টাঙ্গাতেই যাবো, এদের লরি আজ রাত আটটায় ছাড়বে—ইয়ে মোটরওয়ালা পয়সা ঘুমায় দেও হামারা—" বলে তার ব্যাগটা নিয়ে লাফিয়ে বাইরে পড়ল। ততক্ষণে মোটরওয়ালার জন পিছু আট আনা, আর মোট পিছু দু'আনা আদায় হয়ে গিয়েছিল,—"অব্‌হি ছোড়তেহেঁ জনাব" বলে সে তখন গাড়ী ছাড়বার উপক্রম করতেই,—"প্র—" রাগে গরগর করতে করতে আবার এসে গাড়ীতে উঠ্‌ল।

তারপর রাস্তায় দারুণ ভিড়। তা ঠেলে মোটর কি এগুতে পারে। প্রথমটা তো অতি কষ্টে ধীরে ধীরে চলল। রকম সকম দেখে "প্র—" ততক্ষণে হতাশ হয়ে পড়েছিল, সে বারবার বিড় বিড় করে বলতে লাগ্‌ল "hopeless, আর টেণ পাওয়া অসম্ভব"—সত্যি ভাই আমারো তখন ভারী বিরক্তি হচ্ছিল—চাপা দুই ঠোঁটের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল "nuissance" এই ট্রেণটা miss করা মানে সারারাত ঘুম না হওয়া,—বরোদা গিয়ে এ ট্রেণটা সাড়ে নটা দশটা রাতে পৌছায়, কাজেই এটায় যেতে পারলে সেখানে একটু ঘুমাবার আশা করা যেতো।

মোটরটা গিয়ে ষ্টেশনের ফটকটায় ঢুকতেই গার্ডএর বংশীধ্বনী "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" প্রাণ বিষম চঞ্চল করে তুল্‌লে। প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে নেমে থার্ডক্লাশের গেট দিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে ঢুক্‌তেই দেখি সেখানে এক টিকিট কলেক্টর বাবু হাত আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছেন আর কাউকে ঢুক্‌তে দিচ্ছেন না। বিষম বিপদ!—তখন করুণ নয়নে একবার তাঁর পানে তাকালুম "Please excuse" বল্‌তে বল্‌তে ছোট খাট একটু ধাক্কা দিয়েই তাঁর হাতখানা সরিয়ে প্ল্যাটফর্ম্মে ঢু'কে পড়তে হলো। ততক্ষণে ট্রেণের মন্থর গজেন্দ্র গমন সুরু হয়েছে। টিকেট কলেক্টর বাবু হাঁ—হাঁ করে উঠ্‌লেন। প্ল্যাটফর্ম্মের ওপরে দাঁড়ানো আর একজন কে রেলের কর্ম্মচারী ছিল, সে বলে উঠল "well let'em go" মনে মনে তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে,—যদিও তার মুখের দিকে চাইবার ফুরসুৎ হয় নি—একটা দরজার হাতল ধরে ঘোরাতে ঘোরাতেই আমি বলে উঠলুম "ভাই, খাড়ে হো কর যায়েঙ্গে ইনকার নেহি করনা"—কারণ "জায়গা নেহি,—দুসরা গাড়ী দেখো"—ইত্যাদি মামুলী আপত্তি শোন্‌বার তখন আর ফুরসুৎ ছিল না।

গাড়ীতে উঠে দেখি বাস্তবিকই সেখানে একেবারে 'ন স্থানং তিল ধারণং'। অগত্যা Corridoor এর মধ্যে Suit case টা রেখে তারি উপরে বসে পড়া গেল।

এতক্ষণে মনের ভিতরে একটু হাতড়ে দেখবার সময় পেলুম। দেখি, তখনও বুকের ধড়ফড়ানিটা যায় নি! জানালা দিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলুম,—বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা কানে মাথায় লাগল, একটুও শীত বোধ হলো না। যে হুটোপুটি করে ওঠা গিয়েছে!

অন্ধকার রাত। ক্রমে ষ্টেশনের লাল নীল বাতিগুলা একে একে ছেড়ে এলাম, তারপর কেবল বাইরে জমাট আঁধার—আর আঁধার। গাড়ীর ভেতরের আলোর রেখা-গুলি জানালার ফাঁকে ফাঁকে বেরিয়ে পড়ে যেখানে লাইনের পাথর কুচিগুলির উপর চকমকি তুলে ছুটে যাচ্ছিল,—তারি পানে চাইতে চাইতে অনেক কথা ভাবলুম। একবার "দাস" কথা মনে পড়লো—জেলে

কেমন আছেন, কোথায় আছেন, কি কচ্ছেন—এই সব। তার পর তোমার কথাও একবার মনে পড়েছিল। তুমি কেন কংগ্রেসে এলে না। প্রথমটায় ভেবেছিলুম তুমি আসবে তার পর সত্যিই তোমায় না দেখতে পেয়ে আবার ভেবেছিলুম "তাইতো, আজকাল তোমার আসা সে তো আর সোজা কথা নয়। বিয়ে থা' করেছো এখন তো আর টাকা পয়সা আমাদের মতো খোলামকুচি মাফিক ওড়াতে পারো না"—ইত্যাদি—"আবার যাতায়াতের দেড়শো টাকা খরচায় গিন্নীর—'ছগাছার' যায়গায় হ'গাছা রুলী দিয়ে সেই টুকটুকে মুখের "ভারী চোট্‌পাট্—খুব কড়াকড়া বুলি' শোনবার আসান হতে পারে, আর 'হুল দিতে একমাস ভুল'না হয়ে বাঁকিয়ে বলা রাঙা ঠোঁটের 'সে কেন দেখায় 'বেবাগী' হবার ভয়'—ঝঙ্কার শোনা থেকে অব্যাহতি পাওয়াটাও হয়তো অসম্ভব নয়! * * * * *

আচ্ছা ভাই "প্রেমের পাল্লা" পরখ করতে গিয়ে সম্মার্জ্জনীর পাল্লাটা পিঠের ওপর মালুম হয়নি তো? কথাটা তোমায় এতদিন জিজ্ঞাসা করি করি করে হয়ে উঠেনি।

আরো কত কত কথা মনে এলো,—এলোমেলো তার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু একটা পর্দ্দার ওপরে তিন চারখানা বায়োস্কোপের ফিলুম চল্‌ছে কল্পনা করলে তার শৃঙ্খলার একটা আন্দাজ পাবে।

তারপর ভাবলুম, আচ্ছা এই যে তিন চব্বিশং বাহাত্তর ঘণ্টা আমেদাবাদে কাটিয়ে গেলুম এতে হিসাব নিকাশ করতে গেলে এমন কিছু গিয়ে টিঁকবে কিনা যা চিরকাল প্রাণে গাঁথা থাকবে—যার একটা স্থায়ী মূল্য আছে। হুড়হাঙ্গামে পালিয়ে যাওয়া গত তিনটা দিনে একবার ঝুপ করে ডুব দিয়ে তলিয়ে গেলুম; খতিয়ে দেখলুম তিনটা জিনিষ হাতে ঠেক্‌ছে! প্রথম হোলো খাদিনগর, যে যে না দেখেছে সে বুঝবে না, কাজেই তোমাকেও বোঝাতে চেষ্টা কোরবো না,—অল্প কথায় ইঁটপাথরের বাড়ীর বদলে খাদির কাপড়ে তৈরী বাড়ীওয়ালা ছোট্ট একখানি সহর কল্পনা করে নাও। দুই নম্বর হোলো,—শুনে আবার লাঠি নিয়ে তেড়ে এসোনা, তোমরা সব যে **moralist**—দুই নম্বর হচ্ছে, এখানকার মেয়েমানুষ। সত্যি আমার এদের ভারী ভালো লেগেছে। বাংলার ঘোমটা টানা নোলকপরা তুলার-বস্তা পারা বারোবছরের বৌএর কল্পনা করতেও মনটা ঠিক যতটা বিবিয়ে ওঠে, এদের উঁচু মাথা, নিঃসঙ্কোচ স্থির দৃষ্টি ঋজু গতি ভঙ্গিমা দেখলে মনে তেমনি আনন্দ হয়। আমাদের দেশের মেয়েগুলার ঘোমটার নীচে থেকে ঠিকরে পড়া সভয় চোখের চাউনিতে চোখ পড়লে যেমন একটা অব্যক্ত সঙ্কোচের অনুভূতি হয়, এদের সোজা চোখের চাউনিতে চোখ পড়লে দৃষ্টি ঠিকরে ফিরে এসে সম্ভ্রমে তাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে। এদের কাপড় পরবার ধরণটুকুও বেশ, অনেকটা ব্রাহ্মিকা মহিলাদের মতো। শুনেছিলুম সত্যেন ঠাকুরের পত্নী এখানকার কাপড় পরবার কতকটা কায়দা বাংলায় নিয়ে ঢুকিয়েছিলেন, তা কিন্তু সত্যিই মনে হয়। তুমি শুনে খুসী হবে যে সভামণ্ডপে স্বয়ং-সেবিকার সংখ্যা সেবকদের চাইতে ঢের বেশী ছিল, আর তারা কার্য্যদক্ষতা ও কষ্টসহিষ্ণুতায় পুরুষদের চাইতে কম ছিল না।

তারপর তিন নম্বর জিনিষটি হচ্ছে যা তুমি কল্পনাও করতে পারোনি। সে হচ্ছে—মহাত্মা গান্ধী!—কতবার তো তাঁকে দেখেছি, কিন্তু যতবার তাঁকে দেখি তাঁকে দেখ্‌তেই শুধু ইচ্ছে করে। বুঝলে—সেদিন নিরালায় বসে একটা অদ্ভুত কল্পনা করতে করতে ফিক্ করে আমি হেসে' ফেলে দিয়েছিলুম। কথাটা কি জানো,—ভাবছিলুম চঞ্চল কুমারী ভরা যৌবনে যদি রাজসিংহকে ভালোবাসতে পেরে থাকেন তবে মেয়ে হয়ে জন্মালে আমিও হয়তো গান্ধীকে ভালোবেসে ফেল্‌তে পারতাম, নইলে তাঁকে যত বারই দেখি ভালোই লাগে কেন? এই কি,—'জনম অবধি হাম—' দুর ছাই যাক্‌গে। তারপর শোনো। সাতাশে তারিখ নেতারা এসে সব মণ্ডপে ঢুকছিলেন, বায়োস্কোপ ওয়ালারা film তুলছিল। হঠাৎ একবার শুনলুম ফটকের কাছে 'মহাত্মা গান্ধীজী কি জয়',—ব্যাপার কি ভেবে মুখ তুলে চাইতেই দেখি, নগ্ন-দেহ কটিদেশে ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড সযত্ন পশ্চাতে মুক্ত শিখা, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দিয়ে কলরব বন্ধ করবার ইঙ্গিত করতে করতে যুবাপুরুষের মতো ক্ষিপ্র পদবিক্ষেপে মহাত্মা

ছুটে আসছেন। সে যেন তড়িৎলেখা! কলির মহর্ষির এই বিদ্যুৎপ্রভ মূর্ত্তি সন্দর্শনে আমার চিন্তাধারা যুগ যুগ অতিক্রম করে সেই সত্যযুগের কোঠায় গিয়া ধাক্কা খেলো। সেই গরিমাময় অতীতে বশিষ্ঠ, ভৃগু, পুলস্ত এঁদের মূর্ত্তি না জানি কি রকম ছিল,—এম্নি কৃচ্ছ্র সাধনে বিকঠমূর্ত্তি, এম্নি ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল কি? বাস্তবিক তাই মহাত্মাকে দেখ্‌লে আর বাকি থাকে না বুঝতে nonco-operation কি। বক্তার হাজার বক্তৃতায় যা না হয়, ঐ অর্দ্ধনগ্ন শুষ্ক মূর্ত্তি দেখ্‌লেই বুঝে নেওয়া যায়,—এই-ই মূর্ত্ত nonco-operation!—সেই শান্ত সমাহিত মুখচ্ছবির ওপরে শিশুসরল হাস্যধারাই বুঝিয়ে দেয় চৈতন্যদেবের মতো ভাঙ্গা কলসীর আঘাতে হতচৈতন্য হবার পরে এই মূর্ত্তিই বল্‌তে পারে—'মাধাই মেরেছিলি কলসীর কাঁনা, তাই বলে কি প্রেম দেবো না?'—একে ঠিক non violence এর প্রতিমূর্ত্তি বল্লেই সবখানি বলা হয় না, এ মূর্ত্ত প্রেম। তারপরে তাঁর বলবারও ভঙ্গিমাটুকু। বক্তৃতা মঞ্চের ওপর ছোট্ট টেবিল খানির উপর বসে শুধু তর্জ্জনি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে বলছিলেন "It is a challenge an irrevocable challenge" তখন গায়ে কাঁটা দিয়ে না উঠেছিলে, এমন লোক সভামণ্ডপে ছিল কিনা জানিনা। স্থির নির্ভিক কণ্ঠে গুজরাটিদের ইংরাজী বলার সেই একটু বিশিষ্ট accent এর সঙ্গে যখন তিনি বলে যাচ্ছিলেন "If L. Reading has come to India to do Justice and nothing less and we want nothing more...then I inform him from this platform with God as my witness...that he has got an open door in this resolution if he means well, but the door is closed in his face if he means ill. If he wants a conference at table where only equals are to sit and where there is not to be a single beggar, then there is an open door and that door will always remain open.—"

তখন সহস্র উৎসুক কর্ণের ভিতর দিয়ে সে বাণী সবার মর্ম্মে বিচিত্র স্পন্দন তুলেছিল,—সে কি গর্ব্বের, সে কি আত্মশক্তির উপলব্ধির, সে কি জয়াশার? আমি ঠিক বলতে পারিনে, তা কিসের। তুমি কি—তুমি ছাই ছিলেই না, তা আর বলতে পারিবে কি করে তা' কি? Oratorial gift যাকে বলে, সুরেন বাঁড়ুয্যে মশাইর সেই বজ্রনির্ঘোষ থেকে অস্ফুট আলাপে মিড়গমক ফেরতার চাতুর্য্য তাতে নেই, গ্ল্যাডষ্টোনের সেই ঝোড়ো হাওয়ার মতো বাক্যছটার সঙ্গে দৃপ্ত অঙ্গভঙ্গি তাতে নেই, ডিজরেলির সে রাজনৈতিক চালবাজীর সঙ্গে বিদ্রূপাত্মক বাক্ চাতুর্য্যের ললিত কলা তাতে নেই, কিন্তু তবু তাতে একটা কিছু ছিল যাতে পঞ্চবিংশ সহস্র নরনারি এই ক্ষীণদেহ লোকটির ওষ্ঠ নিঃসৃত প্রত্যেকটী শব্দ ক্ষুধিত আগ্রহের সহিত শুনে যাচ্ছিল। একটি ছুঁচ পড়লে বাস্তবিক সেই গম্ভীর মৌনতার মধ্যে তার পতন শব্দের অনুভূতি হয়।

তুমি হয়তো আশ্চার্য্য হচ্ছো আমি মহাত্মার এত বড় স্তাবক হ'লাম কবে থেকে! কিন্তু স্তব বলে একে ঠাউরিওনা। এ একেবারে নিছক সত্যবলা। নইলে অসিংহ অসহযোগকে as a policy ছাড়া as a creed আমি এখনও বোধ হয় ভাবতে পারিনে। আমি এখনও ভাবি যে ধরে নাওনা Nonviolent noncooperation এর জ্বালায় অস্থির হয়ে ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে পালাল। কিন্তু তার পরেও তো আত্মরক্ষা বলে একটা পদার্থ আছে? দুনিয়া শুদ্ধ লোক সাত্বিক না বনে গেলে যে কি করে Soul force দিয়ে রাজসিক শক্তির বিরুদ্ধে অহঃরহ লড়া যাবে তা আমার মাথায় খেলেনা। যত জাত আমার স্বাধিনতা কেড়ে নিতে আসবে সবার সঙ্গেই Nonviolent-nonco চলবে নাকি? আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস যে Nonviolence in thought বা বিদ্বেষ-বুদ্ধিহিনতা টা হচ্ছে সত্বগুণের একটা প্রধান উপাদান, কিন্তু nonviolence in action টা policy ধরে কাজ করলে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যের তাতে হানি হয় না। Nonviolent in thought হয়েও যে Violent in action হওয়া যায় এটা তুমি মানো তো? তুমি এতক্ষণ নিশ্চয় বিরক্ত হয়ে উঠছ কারণ চিঠি লিখছি বরদা থেকে, কিন্তু বরোদার একটা কথাও এতে নেই। কিন্তু বরোদার সম্বন্ধে

কিছু বলতে সুরু করলে তা এক কথাতেই যে ফুরিয়ে যাবে! সে কথাটা হচ্ছে, বরোদায় দেখবার কিছুই নেই। তোমার বন্ধুবান্ধব কেউ বরোদার বাসিন্দা থাকলে হয়তো আমার উপর বিষম চটে যাবেন, কিন্তু সত্যি বরোদায় বিশেষ করে দেখবার জিনিষ কিছু আছে বলে আমার মনে হোলনা, অবশ্যি বরোদায় ছিলুমও মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। বরোদায় যে সব বাঙ্গালী ছেলে আছে, তারা একটা মেস্ করে থাকে তার নাম দিয়েছে "Bengal club." এরা সবাই ছাত্র আর বেশীর ভাগই Mechanical Engineering পড়তে এখানে এসেছে। বাংলায় হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগের এমনি অভাব যে ছেলেদের সেই শিক্ষা নিতে হাজার মাইল দূরে এই বিদেশে আসতে হয়েছে। ছেলেদের বেশীর ভাগই পূর্ব্ববঙ্গীয়। এদের মধ্যে বেশ একটা Espirite de corpse এর ভাব আছে মনে হোলো কিন্তু পড়াশুনা ভালো করে বোধহয় খুব কম ছেলেই করে। এদের নিন্দা করতে ফের বসে গেলুম তুমি তাই বলে আমাকে দুর্ম্মুখ বলোনা। যাক, ছেলেদের কয়েকজন কংগ্রেস দেখতে গিয়েছিল সেখানে বাংলার প্রতিনিধিদের তারা নিমন্ত্রণ করে আসে তাই আমরা সব দলে দলে গিয়ে এদের আতিথ্যের ওপর জুলুম সুরু করে দিয়েছিলুম। বেচারারা মনে করল হয়তো জনপঁচিস ত্রিশেক নিমন্ত্রণ রক্ষায় অগ্রসর হবে কিন্তু তিরিশে তারিখের দুপুর বেলা যখন হুড় মুড় করে প্রায় যাট সত্তর জন এসে হাজির হোলো তখন তো বেচারারা একেবারে অপ্রস্তুত! ভাই, আমার এমন লজ্জা কচ্ছিল যে কি বোল্‌ব।

তোমাকে আগেই বলেছি বরোদায় বিশেষ কিছুই দেখ্‌বার নাই। আজ সকাল বেলাই একবার বেরিয়েছিলুম প্রায় দশ৷ বার জন,—সঙ্গে কোমিল্লার অ— বাবু ছিলেন। আমাদের সহর দেখাতে মেসেরই একটী বাঙ্গালী ছেলে নিয়ে বেরিয়েছিল। সেই বল্লে এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য এমন কিছুই নেই, তবে সবাই এসে একবার কলাভবন, রাজপ্রাসাদ দু'তিনটা আর মিউজিয়ামটা দেখে যায় বটে। কলাভবন হচ্ছে এজায়গার Technical Institute. কলাভবনের দালানটী বেশ, ইটপাথরে তৈরী, দিব্যি ফিট্ ফাট্। 'ইটপাথরে তৈরী' বল্‌তে হেসো না, যে দালান ইটপাথরেই তো তৈরী হয়ে থাকে,—ও কথার মানে হচ্ছে এই, যে পাথর আর ইট দিয়ে ইমারৎটা তুলেছে তাতে ইট আর পাথরের সন্নিবেশনে বেশ একটু আর্ট আছে, যাতে বাইরে থেকে তার চেহারাটী ফুটিয়ে তুলেছে ভালো। আকার প্রকারে এটা অনেকটা ঢাকা কলেজের দালানের মতো, তবে ওপরের গম্বুজ কয়টা এর সৌন্দর্য্য অনেক বাড়িয়াছে। ছেলেরা বল্লে এ গম্বুজ ক'টা নাকি Prince of Wales আসার সময় তাড়াতাড়ি করে প্রায় তিনগুণ মিস্ত্রী কারিগর লাগিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল তাঁকে দেখাবার জন্যে। শুনে একটু হাসি পেলো। এটা কি রাজভক্তির বহর, না দাসত্ব-ইপ্সার প্রতিযোগিতা?

কলাভবন তৈরী এখনও শেষ হয় নি। অনেক মজুর এখনও খাট্‌ছে দেখলুম। ভেতরে ঢুকে মিঃ দত্তের সঙ্গে দেখা হোলো। ইনি বাঙ্গালী, কলাভবনের Vice Principal. গল্পে সল্পে বেশ ভালো লোক। ছেলেরাও এঁকে বেশ পছন্দ করে মনে হোলো। প্রায় তিনটী ছেলের কাছ থেকে একই গল্প শুন্‌লুম যে ইনি সাগর-পারে কত কষ্টে বিদ্যার্জ্জন করেছেন; নাকি মলমূত্র পর্য্যন্ত এঁকে সাফ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমাকে বিশ্বনিন্দুক বল আর যাই বল একটী জিনিষ আমার ভালো লাগেনি, সেটা হচ্ছে "সাহেবিয়ানা।" আর শুধু ইনিই কেন, চ্যাটার্জী, ব্যানার্জী, মুখার্জী করে কয়েকটী "আর্জ্জি" আছেন, তাঁদের সবারি অল্প বিস্তর ঐ দোষ,—বা গুণটী—আছে।

কলাভবন দেখে তার Workshop দেখতে যাওয়া গেল। সেটি ছোট্ট খাট্ট হলেও মন্দ নয়। সাজ সরঞ্জাম খুব বেশী না থাক্‌লেও manufacturing scaleএ সব জিনিষ পত্র তৈরী করবার কায়দার বেশ একটু আভাস ছেলেদের দিয়ে দেওয়া হয়। Weaving sectionএ power-loom ও কয়েকটা আছে, Hattersley pattern ও সাধারণ তাঁত তো আছেই। Spinning বা সুতাকাটা শেখাবার কোনো বন্দোবস্ত নাই দেখে দুঃখী হতে

পারলুম্ না। যাই হোক, তারপর dying, cleaning, ও Carpentryর কাজ দেখতে গিয়ে কারখানার গুদামে দেখি অনেক তৈরী জিনিষ পত্র রয়েছে। আমাদের প্রদর্শক বল্লে বরোদার রাজ-সরকার থেকে নাকি এখানকার যা কিছু উৎপন্ন দ্রব্য সব কিনে নেওয়া হয়, কাজেই জিনিষ পত্র বিক্রীর জন্ম এদের ভাবতে হয় না। ব্যবস্থাটা মন্দ নয়।

সেখান থেকে গেলুম রাজার আস্তাবল দেখতে। যেতে যেতে প্র—কে একটা খোঁচা দিয়ে বল্লুম "ভাই কারু কারুর আস্তাবল দেখতেও লোকে আগ্রহ করে যায়, আমাদের কিছুই যে লোকে দেখতে আসে না।" প্র—শুধু মুচ্‌কি হেসে জবাব দিলে 'বরাত!'

আস্তাবলের দরোজায় একটা গুজরাটী সেপাই দাঁড়িয়েছিল। সে তো আমাদের কিছুতেই ঢুকতে দেবে না, বল্লে 'হুকুম নেহি'। সহিসের সর্দ্দার হচ্চেন এক সাহেব, তিনি তখন ওপরে ছিলেন। আস্তাবলে ঢুকতেই যে ফটক আছে, সেটা দোতালা, তারি ওপরে তাঁর দপ্তর। দারোয়ানটার দুষ্টামিতে বিরক্ত হয়ে,—লোকটার ভাব গতিকে বুঝ্‌তে পাচ্ছিলাম ও নিজের এক্তিয়ার দেখাবার জন্ম আমাদের ঠেকিয়েছে, কারণ আমাদের গাইডও বল্লে যে আগে যতবার সে এসেছে কেউ তাদের আটকায় নি,—আমি বিরক্ত হয়ে সরাসর ওপরে চলে গেলুম। সাহেবকে বল্লুম যে আমরা বাইরের লোক আস্তাবলটি দেখতে এসেছি, তোমার বোধহয় আমাদের দেখতে দিতে কোনো আপত্তি নেই? সাহেবটা কিন্তু বেশ ভদ্র। '*By* all means' বলে চেয়ার ছেড়ে সে আমার সঙ্গে নীচ পর্য্যন্ত এলো,—এসে দারোয়ানটাকে ধম্‌কে বল্লে, "দেখনেওয়ালা কোইকো মৎ রুখো।" আমরাও 'Thank you very much' বলে ঘোড়ার প্রাসাদের অন্দর মহলে ঢুকলুম। মহল চক্ মিলান, মধ্যে বেশ বড় একটা উঠান আছে। ঢুকেই প্রথমে বাঁদিকের লম্বা কুঠরীটাতে রাজার নিজের ব্যবহারের জন্ম সব গাড়ী মজুত রয়েছে,—সবগুলি চক্ চক্ তক্ তক্ করছে তাতে ল্যাণ্ডোর সংখ্যাই বেশী। তখন গুনে দেখলাম বত্রিশ খানা মজুত আছে। আমাদের ভেতর কে যেন বল্লে "একদিন এক একখানা গাড়ীতে চড়লে কি গাড়ী চড়বার সুখটা বেশী উপলব্ধি হয় নাকি!" আমিও ঠিক তখন তাই ভাবছিলুম।

গাড়ীর ঘর শেষ হলেই চক্ এর বাঁ ধারের লাইন ধরে ঘোড়ার লাইন শুরু হয়েছে। প্রত্যেক ঘোড়ার এক একটী করে কোঠা, রেলিং দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে এক একটা করে জলের ট্যাব, Water basin ও খড় রাখবার বন্দোবস্ত করা আছে। মহাসুখে ঘোটক রাজেরা আছেন প্রায় সত্তর আশিটি। ঘোড়ার যেমন যত্ন হচ্ছে ভারতবর্ষে শতকরা নিরনব্বুই জন মানুষের অমন যত্ন নেবার কেউ নেই। এই সারটার ঠিক বিপরীত দিকের সারটাতে উঠানের ও-ধারেও ঘোড়ার ঘর। এই দুটো সারকে যে চত্বরটা যোগ করে দিয়েছে, তাতে প্রথম কুঠরীতে ঘোড়ার জোড়তোড়,—চার সেট্ সোণার জোত দেখ্‌লাম কাঁচের আলমারীতে সাজান রয়েছে—তার পরের ঘরের দরোজার ওপরে লেখা রয়েছে "Gold & Silver Cars।" তার দরোজায় তালা চাবি দেওয়া, আবার তার ওপরে গালা দিয়ে সিল মোহর করা। গাইড্ বল্লে এই হচ্ছে দেওয়ানের সিল, তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ এ সিল ভাঙ্গতে পারবে না। সোণা রূপার গাড়ী ক'খানা একবার দেখ্‌বার ঔৎসুক্য হচ্ছিল, কিন্তু সুযোগ মিল্‌ল না। হঠাৎ দেখ্‌লাম যে ঘরের কোনার একটা জানালায় কাচের দরোজা আছে। তাতেই চোখ লাগিয়ে একবার ঐ ঐশ্বর্য্যের বিকারের দিকে চাইতে চেষ্টা করা গেল, কিন্তু অস্পষ্টতার মধ্যে সোণা রূপার রংএর এক আধটু ঝুরকি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।... ... যাক্। তারপরে দেওয়ান উজীর নাজির টাজিরদের ব্যবহারের জন্ম আরো কতকগুলা গাড়ী আছে, কতকগুলা জখমী গাড়ীও একটা ঘরে আছে দেখ্‌লুম। ততক্ষণে বেলা অনেক হয়ে গিয়েছিল, প্রায় এগারোটা, পেটেও আঁচ লেগে উঠেছে, কাজেই তাড়াতাড়ি ফেরা গেল।

বাড়ী ফেরার পথে রাজার 'রজক-গৃহ' দেখে যাওয়া গেল। Steam machine এর সব কাপড় সাফ হচ্ছে।

পদ্ধতিটা বেশ মনে হোলো। আমাদের দিশী ধোপারা যে রকম পিটিয়ে বা আছড়ে কাপড় কাচে তার চাইতে এতে কাপড়ে অনেক কম চোট লাগে। বড় লোকের সবই বড় কারবার; Laundry Manager হচ্ছেন এক বিলাত ফেরত ভদ্রলোক, মাইনে শুনলুম ছশো টাকা। ইনি বাঙ্গালী, দু'চার মিনিট কথা বার্ত্তাও এঁর সঙ্গে কইলাম; ভারী ভদ্র। বল্লেন যে State service এ থেকে তিনি কংগ্রেসে যেতে পারেন নি, নইলে তাঁর যাবার ভারী ইচ্ছে ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটের উপর ভদ্রলোককে আমার ভালোই লেগেছিল, তাঁর সাহেবিয়ানাটুকু ছাড়া। কিন্তু বাইরে এসে যখন শুনলুম যে ইনি ভয়ানক 'anti-nonco-operator' এবং তা-ও 'with a veangeance' তখন একটু দুঃখু হোলো। 'strong partisan' হলেই তাকে আর উদার বলা চলে না, চলে কি? শুনলুম ইনি বলেন, যে ইনি সম্প্রতি co-operator এ পরিবর্ত্তিত হয়েছেন, নইলে স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার ইনিও একজন বিষম Nonco-operator, এবং সেই সময়েই কত বাধা বিঘ্ন দু'হাতে ঠেলে ইনি নাকি প্রথম জাপান যান। তারপর শুধু আপনার পায়ে দাঁড়িয়ে, কত রাজ্যি নেরাজ্যি ঘুরে, agri-culture আর dyeing cleaning শিখে এসেছেন। বুঝলে ভাই, আমার ভারী ইচ্ছে, হচ্ছিল এঁর সঙ্গে একটু ভালো করে কথাবার্ত্তা হয়, তর্কাতর্কি হয়। কারণ এরকম লোককে দলে টানতে পারলে একটু বিজয়ের আনন্দ আছে। কিন্তু জানোই তো বরোদার সঙ্গে বন্ধুত্ব চব্বিশ ঘণ্টার বেশী হবার যো ছিল না।

রাস্তায় "Central Library" পড়ল। আধঘণ্টা খানেক তারি মধ্যে জন কয়েক ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করলুম, Bombay Chronicle খানাও কিছু নেড়েচেড়ে দেখা গেল। বরোদায় এইটিই সব চাইতে বড় পাঠাগার। এর বন্দোবস্ত বেশ চমৎকার; আমেরিকার মতো এই লাইব্রেরী থেকে বরোদার মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে moving libraryর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বাস্তবিক শিক্ষার জন্ত গাইকোয়ার যথেষ্ট সুবিধা তাঁর প্রজাদের দিয়াছেন। আর এ মনে করে আমাদের মনে গর্ব্ব অনুভব করবার আছে, যে এই সুশৃঙ্খলা ও সুশাসনের মূলে বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক, এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার সূচনা হয় ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দেওয়ানীর আমলে। Fine arts এর প্রতিও রাজসরকারের বেশ দৃষ্টি আছে। গান বাজনা, ছবি আঁকা, স্থপতি বিদ্যা ও ভাস্কর শিল্প এই সব যে কোনো ছাত্র ইচ্ছা করলেই শিখতে পারে; কারণ ছাত্রদের এসব শিখতে ভিন্ন কোন খরচ বইতে হয় না। সঙ্গীত বিদ্যালয়টী প্রকাণ্ড একটী পুকুরের পাড়ে—বেশ সুন্দর জায়গায় তোলা হয়েছে।

কোনোমতে তাড়াতাড়ি এই সব দেখা সেরে বাসায় ফেরা গেল। তখন দুপুর উৎরে গিয়েছে ফিরে স্নান-টান করে খেতে না খেতেই দেখি শ্রীযুক্ত র—মহাশয় সস্ত্রীক এসে হাজির। সঙ্গে কলকাতা কংগ্রেস আফি-সের র—, ঢাকা ন্যাশন্যাল স্কুলের বি—, আ— এরা সব। এঁদের দেখে Bengal Club এর ছেলেদের স্ফূর্ত্তির মাত্রা যে পরিমানে বেড়ে গেল, খাওয়া দাওয়ার জাঁক জমকের বন্দোবস্ত করার মতলবটা সে পরিমানে কমে গেল। আগেই তো বলেছি, বেচারারা এত লোক আসবে কল্পনাও করে নি! যাই হোক র— অ্যাণ্ড কোম্পানির তো রাতারাতিই বম্বে পাড়ি দেবার কথা, তাই তারা একটু জল টল রাস্তায় কিনে খাবার মতলব করে তখুনি সহর দেখতে বেরিয়ে পড়ল। আমার তো খাওয়া হয়েই গিয়েছিল আমিও তাদের সঙ্গ নিলুম।

ওদের বেশী সময় নেই, কাজেই ওরা রাজভবন ও মিউজিয়াম ছাড়া আর কিছু দেখতে চেষ্টা করবে না ঠিক হোলো। রাজবাড়ী দেখতে হলে পাসের দরকার। একরাজকুমারীর নাম ইন্দুমতী, তার নামে একটা বাড়ী আছে,—নাম 'ইন্দুমতী মহাল' সেইখানে পাশ দেওয়া হয়। কাজেই সদলবলে সেখানে হাজির হয়ে পাশ নেওয়া গেল। পাশ দেবার সময় তারা বল্লে যে "লক্ষ্মীবিলাস" প্রাসাদে রাজা আছেন সুতরাং সেখানে এখন যাওয়া হবে না, তবে বাকী আর দুইটী প্রাসাদ দেখা যেতে পারে। তাই সহি। কিন্তু সেই দুইটী প্রাসাদেরও একটী ৪।৫ মাইল দূরে, এখন আর

কাজেই যাবার সময় নেই, সুতরাং একখানা বাড়ী দেখেই সন্তুষ্ট থাক্‌তে হোলো। বাড়ীতে এমন উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই, বড় লোকের বাড়ী যেমন হয় তেমনি। এক ঘরে কতকগুলো জহরতের দামী অলঙ্কার আছে—তা দেখ্‌তে আবার Special পাস লাগে। কাজেই আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি ভেবে সে দিকে আর ভিড়লুম না।

বাইরে বেরিয়ে ঠিক হোলো মিউজিয়াম ও বাগান দেখ্‌তে যাওয়া যাক্। এক টাঙ্গাওয়ালাকে র—বাবু জিজ্ঞেসা করলেন। "আজব ঘর যানেমে টাঙ্গা কেৎনা করকে লেওগে?" গাড়োয়ান জবাব দিলে "চার চার আনা।" আমাদের গাইড ছেলেটী—নারায়ণ বল্লে 'বেশ সস্তা হয়েছে এই গাড়ীই নিয়ে নিন। গাড়ীতে তো চড়া গেল। কিন্তু গাড়ী মিউজিয়ামের দরোজায় পৌছতে পৌছুতে যখন আধ ঘণ্টার ওপর লেগে গেল তখন আমার মনে হোলো গাড়োয়ানটা জন প্রতি হয়তো চার চার আনা চেয়েছে। গাড়ী থেকে নেমেই দেখি যে ঠিক সেই কথা। তখন তো গাড়োয়ানের সঙ্গে সে এক তুমুল কাণ্ড। আমি এক এক বার ভাবছিলুম পয়সা কটা দিয়ে দি, আপদ চুকে যাক, কিন্তু সঙ্গে কয়েকটী নাছোড়বান্দা ছিলেন। শেষটায় তাঁদের একটা রফা হয়ে গেল আমরাও রক্ষা পেলুম। কিন্তু তখন মিউজিয়াম এর দরোজায় গিয়ে দেখি দারোয়ানেরা মিউজিয়াম বন্ধ করবার উপক্রম করছে। আমরা বল্লুম যে দশমিনিটের মধ্যে আমাদের একবার দেখিয়ে দাও, আমরা বেশী সময় নেবো না। তাতে তারা বল্লে যে এক রূপয়া তাদের দিলে তারা দেখাতে রাজী আছে। নারায়ণ যখন বল্লে কল্‌কাতার যাদুঘর যারা দেখেছে তাদের এখানে দেখবার কিছুই নেই, শুধু মাহারাট্টাদের কতকগুলি প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া, এবং আমরা যখন প্রত্নতাত্ত্বিক নই তখন আমাদের সেগুলি না দেখা হওয়াতেও বোধ হয় এমন দুঃখ করবার কোন কারণ নেই। আমরাও আপোষে ঠিক করে ফেলেছিলুম যে ঘুষ দিয়ে এ দেখা হবে না, অতএব বাগান দেখ্‌তেই বেরিয়ে পড়া গেল। মিউজিয়াম এর বাড়ীটা এই বাগানের মধ্যেই। বাড়ীটার মাটির নীচে একটা তলা আছে, তাতে বরোদা ষ্টেটের Boy Scout দের আড্ডানা। সেটা দেখে এসে বাগানের অলিগলি দিয়ে চল্‌তে লাগলুম আমরা। বাগানটি বেশ সাজান গোছান.—কল্‌কাতা ইডেন গার্ডেনের অনুযায়ী কিন্তু তার চাইতে ঢের ভালো। আর এ বাগানটার আর একটু বিশেষত্ব আছে, সে হচ্ছে এই যে এটা কল্‌কাতার ইডেন আর জু গার্ডেনস্ একত্র করলে যা হয় তাই। এতে লতানো গাছের বেড়া দিয়ে তৈরী একটা গোলক ধাঁ ধাঁ আছে, আমাদের এক বন্ধুতো তাতে ঢুকে শেষে নিজের অবিমৃষ্যকারিতাকে ধিক্কার দিতে দিতে বেড়া ভেঙ্গে বেরিয়ে, শেষে মুক্তি পেয়ে ছিলেন। ততক্ষনে সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল, আবার ওদিকে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে হবে। কারণ, Bengal Club একটা Library প্রতিষ্ঠা করেছিল তার সেদিন anniversary day বা বাৎসরিক উৎসব। বাসায় ফিরেই দেখি সভা বসে গিয়েছে। ওখানকার স্থানীয় লোকও জনকতক নিমন্ত্রিত হয়ে ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বাংলার আমরা সবাই বেশ খুসী হয়েছি।

এটুক ষ্টেশনে বসে লিখ্‌ছি, কারণ দশটা রাত্তেই খাওয়া দাওয়া সেরে ষ্টেশনে চলে এসেছিলুম। রাত বারোটায় গাড়ী।

বল্‌তে পারো চিঠিটা এখনও অঙ্গহীন রয়েছে কারণ ম-স্ত একটা কথা এখনও লেখা হয় নি,—সেটা হচ্ছে এই, যে nonco-operation এর প্রভাব এখানে কতটুকু হয়েছে। রাস্তায় বেরুতেই লোকজনের কথাবার্ত্তা, পোষাক পরিচ্ছদ,—এ সমস্তটাতেই এই আন্দোলনের কতটুকু হাওয়া এদের লেগেছে তা আমি বুঝ্‌তে চেষ্টা করেছি। কিন্তু খুব যে একটা পরিবর্ত্তন হয়েছে তা বলা যায় না, অবশ্যি একেবারে যে কিছুই না হয়েছে তা বল্লেও ঠিক হবে না। চরখার প্রচলন বেশ হয়েছে, তবে সেটা আগে থাক্‌তেই কিছু ছিল। বাংলার মত এদেশের লোকেরা ম্যাঞ্চেষ্টারের পায়ে দাসখত একেবারে লিখে দিয়েছিল না। তা ছাড়া Central Libraryর পাঠগৃহে আমার সঙ্গে জন ক'এক ভদ্রলোকের আলাপ হয়েছিল, তাতে বুঝলুম গরমদলের সংখ্যা এখানেও অল্প নয়, তবে রাজসরকারের কড়া হুকুমে প্রকাশ্যভাবে প্রচার

পার্থ্য খুব কমই হয়। পাঠগৃহে, Amrita Bazar, Servant, আর Bombay Chronicle এর কাছেই ভিড় বেশী।

বরোদায় বাঙ্গালীর বেশ প্রতিপত্তি আছে। সেটা স্বর্গীয় ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মনীষার ফলে। তাঁর দেওয়ানীতে রাম-রাজত্বের ন্যায় সুখে ছিল এখানকার লোকেরা। তাঁহারি চেষ্টায়, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এখানে প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, সে পুরানো কথা তো জানোই। মেয়েদেরও বেশ উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। দত্ত সাহেবের নাম এখনও হাটে মাঠে ঘাটে সবারই মুখে। কুলী গাড়োয়ান মুদী থেকে আরম্ভ করে বড় ধনী ও সম্রান্ত ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম করে থাকে।

গাড়ী এখুনি এসে পড়বে। এবার ইতি দিতে হচ্ছে। বরোদা ছেড়ে চল্লুম, হয়তো আর কখনো আসা হবে না। কিন্তু এর মধ্যে কোনটুকু মনে থাক্‌বে, কিসের স্মৃতির কণিকা টুকু মনে চিরকাল বরোদার কথা জাগিয়ে দেবে, তা তোমায় এখনও বলি নি।—তা হচ্ছে এর ফুট্‌ফুটে রূপটী, প্রসাধন শেষে উচ্ছ্বলযৌবনা অলঙ্কারসিঞ্জিতা হাস্যময়ী ষোড়শী বেদুইন রমণীর মতো এর রূপটী। বরোদা সহর সাজান, গোছান, দিব্যি;—যেন ছবিখানি। ইতি—

তোমাদের—
শ্রীপ্রিয়কুমার।

গৃহহীন প্রিয়া

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

যায় কোথা যাক্ না সে যাচ্ছে চলে',
তারে তোর মনব্যথা কাজ কি বলে'।
মিছে কেন ডাকাডাকি আস্‌বে না সে।
তারে, পায়ে ধরে' সাধ, ভাল বাস্‌বে না যে।

মুখ খানি পাছে তার দেখে ফেলি তাই,
আগে থেকে ধীরে ধীরে দূরে চলে' যাই।
আকাশেতে তারা গুলি ফোটে যেখানে,—
মোর, মনটাকে টেনে নিয়ে যাই সেখানে।

কতদিন চোখ দুটি দেখি নাই তার!
মনে হয় ঠিক্, তারে ভুলেছি এবার।
কণ্ঠের ভাষাটুকু নাইকো মনে,
তাই একা আজ বসে আছি সঙ্গোপনে।

ফুল গুলা সব আজ উঠেছে ফুটে'
কোথা হ'তে ক্ষ্যাপা মেঘ এসেছে ছুটে'।

আর বেশী দেরী নাই বাদল কারা,
ওই বুঝি পড়ে ঝরি পাগল পারা।

আজ কোন দূর হ'তে ডাক শোনা যায়—
সেই সুর ঘুরে' ঘুরে' মাগিছে আমায়।
আজ মোর ক্ষ্যাপা মন বুঝ্‌তে নারে,
আন্‌মনে বসে' বসে' খুঁজ্‌ছ কারে!

কত ভালো বাসি তারে বলা হবে না
এত স্নেহ ভালোবাসা প্রাণে সবে না।
জানি আমি কেউ তারে বাসে নি ভালো।
ঘরে তার কেউ এসে জ্বালে নি আলো।

আমারে সে দিতে এসে ফিরেছে কেঁদে'
কাঁদিয়েছে আমাকেও হৃদয়ে বেঁধে।
কোথা আছ গৃহহীন এস গো প্রিয়!
যা কিছু তোমার আজ আমারে দিয়ো।

আসল বেদান্ত কি?

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

আসল বেদান্ত শাস্ত্র বলিতে আমি অসম্প্রদায়িক বেদান্ত বুঝিতেছি। উপনিষদ হইতে যে বেদান্ত তত্ত্ব উত্তর-মীমাংসা বা শারীরক সূত্র নামে মহর্ষি বাদরায়ণ কর্ত্তৃক সূত্রাকারে সংকলিত হইয়া প্রথম প্রচারিত হয় তাহাই আসল বেদান্ত। শঙ্কর দর্শন ইহার উপর গঠিত হইলেও তাহা মায়াবাদ নামেই বিশেষভাবে পরিচিত, এবং সাম্প্রদায়িক বটে। বেদান্তের অপর নাম ন্যায়-প্রস্থান। আর উপনিষদ শ্রুতি-প্রস্থান ও ভগবদ্গীতা স্মৃতি-প্রস্থান নামে পরিচিত। এই প্রস্থান ত্রয় আসলে মুক্তি বা মোক্ষ শাস্ত্র। এই কারণে আসল বেদান্তকে মুক্তি বা মোক্ষ শাস্ত্রই বলা হয়।

ইয়োরোপীয় প্রতীচ্যতত্ত্ববিৎরা বেদান্তাদি ষড় দর্শনকে তাঁহাদের দেশের Philosophyর সমজাতীয় শাস্ত্র বলিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য Philosophy ও ভারতীয় দর্শন উদ্দেশ্য ও আলোচনা পদ্ধতিতে এক নহে। পাশ্চাত্য Philosophyর উদ্দেশ্য জীবজগৎ ও ঈশ্বর তত্ত্ব আলোচনা করিয়া কেবল মাত্র চরম সত্য কি তাহার নির্দ্ধারণ করা। লৌকিক জ্ঞানের সার্থকতা ছাড়া তাহার অন্য উচ্চ উদ্দেশ্য নাই, এবং ধর্ম্ম জীবনের সঙ্গে বা জীবের পারত্রিক মঙ্গলের সঙ্গে উহার কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায় না। জীবের ঐহিক আধ্যাত্মিক উন্নতি উহার গৌণফল হইতে

পারে, কিন্তু উহাকে মুখ্যফল ভাবিয়া পাশ্চাত্যরা এ শাস্ত্রের যে আলোচনা করিতেন তাহা মনে হয় না। ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। ইহ-জীবনে আত্ম ও জগৎতত্ত্বের সম্যক দর্শন করাইয়া জীবকে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করানোই ভারতীয় দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কাজেই ইহা আসলে ধর্মশাস্ত্র হইতে সম্বন্ধবিহীন নহে।

হিন্দুর আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য ছিল চতুর্ব্বর্গ লাভ। ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম এই চতুর্ব্বর্গ। এবং প্রত্যেক বর্গেরই জন্য শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল।

ষড়দর্শন ইহারই অন্তর্গত মোক্ষশাস্ত্র মাত্র। বৈদিক উপনিষদ্‌গুলি আসলে সর্ব্বাদিম মোক্ষশাস্ত্র। ইহারাই শ্রুতি নামে পরিচিত। শ্রুতি দিব্যজ্ঞানলব্ধ পরম তত্ত্বের ভাণ্ডার বলিয়া ষড়দর্শন ইহাকে প্রধান প্রমান স্থল মনে করেন। আসল বেদান্ত শ্রুতিসাপেক্ষ বলিয়া প্রধানতঃ ইহা মোক্ষশাস্ত্র।

ত্রিবিধ দুঃখদগ্ধ জীবাত্মাকে মুক্তির সন্ধান দেওয়াই আসল বেদান্ত-প্রমুখ ষড়দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ষড়দর্শনের মূল কথা একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মুক্তি লভ্য। নিত্য ও অনিত্যের বিবেক বা পার্থক্য জ্ঞানই এই তত্ত্বজ্ঞান। জীব জন্মগ্রহনের ফলে প্রাক্তনকর্ম্মগঠিত প্রকৃতির গুণে এই দৃশ্যমান জগৎকে সংসারক্ষেত্রে পরিনত করিয়া মায়া প্রভাবে সমস্ত বস্তুর সহিত আত্ম-অনাত্ম সম্বন্ধ স্থাপন করত নিজেকে সুখী ও দুঃখী করে। নিত্যমুক্ত-শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ অকাম আত্মতৃপ্ত পূর্ণস্বরূপ আত্মাকে দেহের সহিত অভিন্ন বোধ করাতে তাহার এই দুঃখভোগ। এই যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান ইহার ক্রিয়া নানারূপে বন্ধকারক। প্রথম-ভ্রম—দেশকালাতীত আত্মাকে দেশকালবদ্ধ দেহের সঙ্গে এক জ্ঞান; দ্বিতীয়-ভ্রম,—জাগতিক নশ্বর পদার্থকে সেই পূর্ণকাম আত্মার হেয় প্রেয়বোধে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির ইচ্ছা; তৃতীয়-ভ্রম ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে এই বিচিত্র বহুরূপী জগৎ হইতে স্বতন্ত্র এক সত্ত্বা বোধ করা। এই ভ্রমত্রয় মায়ার কাজ। এই ভ্রমের বলে আমাদের মূঢ় আত্মা প্রকৃতির সাহায্যে নির্গুণ জগদ্‌ ব্রহ্মকে সগুন ঋতুসারে পরিনত করে; এই মায়া অনাদি কিন্তু সান্ত; কবে বা কিরূপে জীবে যে ইহার সঞ্চার তা বলা যায় না; তবে ইহার শেষ যে আছে তাহা প্রত্যক্ষ হয়; জ্ঞানী জ্ঞান সাহায্যে ইহার বন্ধন হইতে মুক্তি পায়; জীব-ই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জীব, তবে জীব যে স্ব স্বরূপ জানিতে পারেনা তার কারণ এই অনাদি অনির্ব্বচনীয় মায়া। মায়া একটা রঙ্গীন কাচের আবরনের মত মাঝে থাকিয়া ব্রহ্মকে সংসার রূপে পরিণত করে; বাস্তবিকই জগৎরূপী ব্রহ্মই আছেন; এবং তিনি বহুরূপী; নামরূপ সাহায্যে তিনি অনাদি প্রবাহরূপে বিচিত্র হইয়া বিরাজ করিতেছেন; তিনি বহুতে এক। যেমন ফল, ফুল, পাতা, কাণ্ড, শাখা, বীজ এই সব লইয়া বৃক্ষ তেমনি নদ নদী, গাছ পালা, কীট পতঙ্গ জীবজন্তু, মানুষ, আকাশ বাতাস এই সব লইয়াই ব্রহ্ম। চেতন অচেতন এই দ্বিবিধ প্রকাশে এই বহুরূপী ব্রহ্ম প্রকাশমান; এই জড়জগৎ যেন তাঁহার শরীর, আর এই চিৎজগৎ তাঁহার মন, তিনি সর্ব্বভূতস্থ কূট আত্মা। ব্রহ্ম একটী সমষ্টী বাচক নাম; বহুর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধেই, বহুর একত্র অবস্থানেই ব্রহ্মের স্বরূপ; জীব অজ্ঞানবশতঃ এই জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বোধ করেন। 'জীবই ব্রহ্ম' ইহার এই অর্থ যে যা কিছু দেশকালবদ্ধ বা কারণঘটিত তাহাই জীব। চেতনই হউক বা অচেতনই হউক সমস্তই ব্রহ্মাংশ। উহার নাম রূপ উহার উপাধি মাত্র। এই উপাধির পরিনাম বা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ব্রহ্মের আসল বস্তুর পরিবর্ত্তন নাই। যেমন সুবর্ণ উপাধি ভেদে কুণ্ডল, হার; বলয় বা যেমন মৃত্তিকা উপাধি ভেদে ঘট, পাত্র সরা, কলস, ভাণ্ড; তেমনি ব্রহ্মবস্তুও উপাধিভেদে গাছ পালা, মাটী, কীট, পতঙ্গ, বুদ্ধ, নিউটন ইত্যাদি। সমস্তই ব্রহ্মের স্বজাতীয় বস্তু, তবে বেদান্ত যে বলিয়াছেন 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চণ্‌' তার অর্থ এ নাহ যে ঘট পট আকাশ বাতাস জীব জন্তু নাই; উহার অর্থ এই যে উক্ত বহুরূপে এক ব্রহ্মই আছেন, উহারা ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কিছু নহে, স্বতন্ত্র আত্মাশ্রয়ী বস্তু কিছু নাই; উহারা পরস্পর স্বতন্ত্র এবং তদুপরি ব্রহ্ম স্বতন্ত্র নহে; এক অপরের অস্তিত্বের কারণ। এবং সকলি ব্রহ্মের কার্য্য বা ফল। পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে; যেমন কাণ্ড না থাকিলে শাখা থাকেনা, শাখা না থাকিলে পাতা,

থাকেনা, পাতার অভাবে ফল ফুল হইতে পারে না তেমনি আকাশ বাতাস, জল স্থল, আলোক উত্তাপ আত্মা অনাত্মা পরস্পর স্বতন্ত্র নহে; সকলি এক অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম বস্তুর বিবর্ত্তন *; এবং সকলে মিলিয়া তবে এই ব্রহ্মবস্তু! জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জীব—দ্বৈত নাই। যে দ্বৈতবোধ, নানাবোধ, পরস্পর স্বতন্ত্র এবং মূলে 'ব্রহ্ম স্বতন্ত্র—বস্তুবোধ' ইহাই ভ্রম, বা মায়ার কার্য্য। কম বেশী সবেতেই তাঁহার বিকাশ, কেবল মানুষই পূর্ণবিকাশ। যেমন এক বিন্দু জলে সমুদ্রের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি দেহও আত্মাময় মানুষে ব্রহ্মের পূর্ণপরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের কুটস্থ পরমাত্মাই ব্রহ্মের কুটস্থ স্বরূপের পরিচায়ক। সমস্ত জীবেই তাঁর বিকাশ, তবে আংশিক, মানুষেই পূর্ণ বিকাশ। মানুষ ভুল করিয়া আত্মার বাহিরে ব্রহ্মকে খুঁজিতে যায়। ইহা হইতেই দেবদেবীর ধারণা, স্বর্গ-নরকের কল্পনা। এই সব ভুল ধারণার মূল অবিদ্যা! এই ধারণা হইতেই মানুষ জগত ব্রহ্মকে সংসারে পরিনত করিয়াছে।

জীব কেমন করিয়া জগৎকে সংসারে পরিণত করে তাহারই ব্যাখ্যা সাংখ্য শাস্ত্র করিয়াছেন। জীবের অন্তরে আছেন পুরুষ বা আত্মা, তিনি নিত্যমুক্ত শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ; পুরুষ-অতিরিক্ত আর এক জিনিষ আছে জীবে—তাহার নাম প্রকৃতি (দেহ)-স্বভাব বা nature। উহা জীবের প্রাক্তন কর্ম্মের বীজ হইতে গঠিত, জন্মকালে উহা অব্যক্ত এবং উহার প্রকার তিনরূপ, সত্ব, রজ ও তম। কেহ জন্মাবধি সত্ব প্রকৃতি লইয়া আসে, কেহ বা রাজসিক প্রবৃত্তি আনে, কেহ আনে তামসিক প্রবৃত্তি; জীবের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রকৃতি ফুটিয়া ওঠে; তাহার বুদ্ধি অহংকার ও মন ও ইন্দ্রিয়গুলি জাগিয়া উঠিয়া তত্তৎ গুণধর্ম্মী প্রকৃতির সাহায্যে কাজ করে; যাহার সাত্বিক প্রকৃতি তাহার বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় সাত্বিক কাজে বিকাশ লাভ করে; যাহার রাজসিক প্রবৃত্তি তাহার বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় রাজসিক কাজে ফুটিয়া উঠে; তামসিক প্রবৃত্তিও তেমনি বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয়কে তামসিক কাজে চালিত করে। জন্মকালে এই প্রকৃতি অব্যক্ত থাকে; কেহ বলিতে পারে না, এই জীব কিরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন হইবে। কালক্রমে বুদ্ধি মন ইন্দ্রিয় ক্রিয়াশীল হইলে এই প্রকৃতি ফুটিয়া উঠে। গুণ তিনটী যেন তিনটী রঙ্গীন কাচ-নির্ম্মিত আবরণ, ইহার ভিতর দিয়া পুরুষ জগৎকে দেখে, যার আবরণে যে রঙ্গের প্রাধান্য সে জগৎকে সেই রঙ্গের ভাবে দেখে। এই যে প্রকৃতিবশাৎ জগৎদৃষ্টি ইহাই সংসার। কোনো জীবে একটী মাত্র প্রকৃতিই থাকে না, তিনটী কমবেশী মিশ্রিতভাবে থাকে; কাহারও সত্ব প্রধান, কাহারো বা রজঃপ্রধান, কাহারো বা তমপ্রধান। একের প্রাধান্যে অপরের পরাভব। একের ক্রিয়ায় অপরের বিকাশ। একটীকে অবলম্বন করিয়া অপরের প্রকাশ।

দেহাভিমানী জীবের ধর্ম্ম হইতেছে নিজের ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব বজায় রাখা। এই অস্তিত্ব রক্ষা করিতে গেলে দেহের প্রিয় অপ্রিয় জ্ঞান চাই; অপিচ যাহা প্রিয় তাহা অর্জ্জন করা, এবং যাহা অপ্রিয় তাহা বর্জ্জন করা ইহার কাজ হইয়া পড়ে। দেহের সহিত আত্মাকে অভিন্ন বোধ করিলেই জীব দেহরক্ষার অনুকূলে আসক্তি ও দেহরক্ষার প্রতিকূলে দ্বেষ প্রদর্শন করিবে। তখন বস্তু মাত্রেই প্রয়োজন বোধে হেয় প্রেয় হইবে। আবার এখন যাহা প্রেয় পরে তাহা হেয়, বা তখন যাহা হেয় পরে তাহা প্রেয় হইবে। মানুষ এমনি করিয়াই বস্তুতে হেয় প্রেয় জ্ঞান আরোপ করে। সে ভুলিয়া যায় যে সত্যতঃ কোনো বস্তু হেয় প্রেয় গুণ বিশিষ্ট নয়। সংসারীর চোখে গুণহীন বাহ্যবস্তু গুণযুক্ত হয়। ভাল মন্দ, পবিত্র অপবিত্র; ন্যায় অন্যায়,

* বেদান্ত বিবর্ত্তনবাদী, পরিণামবাদী নয়। বিবর্ত্তন মানে 'ক'ই 'খ'। ক বদলাইয়া খ হইলে পরিণাম হয়। 'ক'ই খ। ভুল করিয়া ক খ হইতে তফাৎ দেখি। এই জগৎই ব্রহ্ম, অজ্ঞানে আমি জগৎকে সংসার ভাবে দেখিতেছি মাত্র। আমার দেখার দোষে জগৎ সংসারবৎ, নচেৎ উহা ব্রহ্মই। চোখের হলুদ রং জন্য বস্তু হলুদ নয়। উহা যা তাই আছে। সংসাররূপ আবরণ ব্রহ্মকে ঢাকা দিয়াছে মাত্র, উহাকে রূপান্তরিত করে নাই। যদু নটরূপে রাম সাজিয়াছে। রামসজ্জা যদুকে বিকৃত রূপান্তরিত করে নাই; তাহাকে ঢাকা দিয়াছে মাত্র। যদুর যদুত্ব নষ্ট হয় নাই। ইহাই বিবর্ত্তন। দস্যু রত্নাকর জ্ঞানী বাল্মিকী হইল, ইহা স্বভাবের রূপান্তর, ইহাই পরিণাম।

ছোট বড়, সুন্দর অসুন্দর এই যে সব দ্বন্দ্ববোধ আপনি আসিয়া পড়ে; এবং সে অভ্যাস বশতঃ বস্তু মাত্রেই এই বা এই গুণ আছে ভাবিয়া বসে। অর্থাৎ নিগুর্ণে গুণের রং মাখাইয়া বসে। এই জন্য সে ব্যক্তি-বিশেষকে প্রিয় অপ্রিয় মনে করে, ও বস্তু বিশেষকে হেয় প্রেয় বোধ করে, এবং তাহাদের অর্জ্জনে পরিবর্জ্জনে উদ্‌ভ্রান্ত হয়। সে তখন ভাবে এই জগৎ তাহারই সুখদুঃখের হেতু রূপে সৃষ্ট; আমি সুখী হইব, আমি দুঃখ পাইব না, ইহা সুখকর উহা সুখকর নয়, এই সব ভেদ জ্ঞান আসে। জগতের জন্য তাহার অস্তিত্ব ইহা না ভাবিয়া তাহারই জন্য জগৎ অস্তিত্ব ইহা সে ভাবে। এবং নিজ স্বার্থানুকূল না হইলে জগৎকে ও জগৎকারণ ভগবানকে দোষী স্থির করে। এই রূপে সে সমস্ত জগৎকে দুইভাগ করিয়া দেখে; এক অংশটা প্রেয় সুতরাং উহা মমতার জিনিস, দ্বিতীয়টা অপ্রেয় সুতরাং নির্ম্মমতার জিনিষ। এবং এই স্থির নিশ্চয় বোধ বশতঃ সে জগৎবস্তুকে স্ব স্ব রূপে দেখে না। সংসারীর দেখা যায় বাহ্যবিষয় মাত্রে তিনরূপ বোধ; (১) প্রেয় (২) অপ্রেয় (৩) উদাসীন। যখন সুখ জনক হয় তখন প্রেয় কাম্য; যখন দুঃখজনক তখন অপ্রেয় বর্জ্জনীয়; যখন উভয়ের কোনো ভাবই নয় তখন উদাসীন। আজ যাহাতে সে উদাসীন কাল তাহাতে সে আকৃষ্ট বা দ্বেষযুক্ত। তত্ত্বজ্ঞানীর চোখে সমস্তই উদাসীন ভাবযুক্ত। তিনি আত্মাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বুঝিয়া নির্ব্বিকার; দ্বন্দ্ববোধাতীত; দেহকে প্রকৃতির হাতে ছাড়িয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত, দেহ সহজজ্ঞানে হেয় প্রেয় বুঝিয়া লইয়া চলিবে; নিজের কোনো চেষ্টাই নাই। কেননা তিনি আত্মারাম। আত্মাতেই তৃপ্তি, আত্মাতেই সর্ব্বকামনাযুক্ত, কাজেই বাহ্যবস্তুতে হেয় প্রেয় বোধ নাই; নিজের সুখ দুঃখ বোধে অর্জ্জন বর্জ্জনে চেষ্টা নাই। পশু পাখীদের যেমন খাদ্যাখাদ্য বিচার করিতে হয় না, সহজ জ্ঞানে যা খাদ্য তাহাই খায়, যতটুকু দরকার ততটুকুই খায় মানুষের তা নয়; মানুষ ভাল মন্দ কম বেশী বোধ জাগাইয়াছে; কাজেই তার হেয় প্রেয় অর্জ্জন বর্জ্জনের এত চেষ্টা ফলে এত সুখদুঃখ।

জাগতিক বাহ্য বস্তুকে এই যে, মমতা অমমতার রং ধরাইয়া দেখা ইহাকেই সংসার বলে। আসলে কোনো বস্তুই হেয়, প্রেয়, ভালমন্দ নয়। সংসারী জীব সুখ দুঃখ তাড়নায় বাহ্যবস্তুকে এই দ্বন্দ্বভাবে ভাগ করিয়া লইয়াছে। আত্মাকে দেহের সঙ্গে এক ভাবাতেই এই দ্বন্দ্ববুদ্ধি আসিয়াছে। আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন এ ভাব আসিলে এই দ্বন্দ্ব ভাব কাটিয়া যাইবে, অর্থাৎ জগৎব্রহ্ম হইতে সংসার আবরণ উঠিয়া যাইবে। বস্তুতঃ এই আবরণ বলিয়া একটা ঢাকনি বা রং জগতের গায়ে নাই; অজ্ঞানেই এই ভ্রম হয়; অথচ এই অজ্ঞান যে একেবারে অসৎ অভাব বস্তু তা নয়; কেননা দেখিতেছি উহার ক্রিয়া! ইহা সৎ বটে অসৎ ও বটে! অনির্ব্বচনীয়! যাহা আছে অথচ নাই তাহা মায়া ছাড়া আর কি! ভোজবাজী বটেই তো! দেখিতেছি লোক অর্থের লোভে, নারীর লোভে ছুটাছুটী করিতেছে, অপরকে দুঃখ দিতেছে, খুন করিতেছে, প্রতারণা প্রবঞ্চনা করিতেছে; ঠকিতেছে, আবার তাহারই পিছনে মত্তের মত ছুটিতেছে, চোখের উপর দেখিতেছে যা নশ্বর, তাহাকেই নিত্য বলিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে! মায়া নয় তো কি? এইই সংসারের গতি! অনন্ত কাল ধরিয়া এই মায়ার ভোজবাজী! এই খেলা! ব্রহ্মজগত মোহচক্রে সংসার জগৎরূপে পরিণত! কিন্তু ব্রহ্মজগৎই সত্য, আর সংসার জগতই মিথ্যা! রজ্জুকে ভ্রমবশতঃ সাপ ভাবিয়া জীব যেমন ভীত হয়, শুক্তিকে রজৎ ভাবিয়া যেমন লুব্ধ হয়, তেমনি জগতব্রহ্মকে দুঃখ হেতু ভাবিয়া, বা সুখস্থান ভাবিয়া জীব ভীত ও লুব্ধ হইতেছে! অথচ ভয় বা লোভের কারণই নাই! সুখ বা দুঃখ মিথ্যা বোধ; সুখ দুঃখেরই এক পৃষ্ঠা, দুঃখ সুখেরই এক পৃষ্ঠা, এক অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সুখ চাও ত দুঃখ স্বীকার কর; দুঃখ হইতে মুক্তি চাওতো সুখের পথে ছোট। উভয়ের অতীত অবস্থা শান্তি এবং অদ্বৈত বোধেই সেই শান্তি; অর্থাৎ কিসের অদ্বৈত? না জগৎ ও ব্রহ্মের; জগতই ব্রহ্ম; ব্রহ্মই জগৎ; জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ অসম্ভব কথা; ইহারা যে দুই

আলাদা স্বতন্ত্র বস্তু তা নয়। অজ্ঞানী সংসারী যাহাকে জগৎ বলে সে জগৎ নাই, যা আছে তা ব্রহ্ম। এই বোধেই মুক্তি। মুক্ত জীব মুক্ত হইলে জগৎকে স্ব স্বরূপে দেখে অর্থাৎ বিকৃত সংসার রূপে দেখে না, ব্রহ্ম রূপে দেখে। ঘটপট আকাশবাতাস জলস্থল এ সব বোধ বা অনুভূতি ঘুচিয়া গিয়া একটা যে একাকার ধোঁয়া মূর্ত্তি হইয়া যায় তা নয়; সমস্তই থাকে, গাছ পালা, লতা পাতা নদ নদী কীট পতঙ্গ, সকাল সন্ধ্যা সূর্য্য চন্দ্র সবই থাকে; স্ত্রী, পুত্র, শত্রু মিত্র সবই থাকে, তবে তাহাদের লইয়াই ব্রহ্ম এই বোধ থাকে। এ সব ব্রহ্মেরই বিচিত্র রূপ। ইহারা বহু হইয়াও এক ব্রহ্মে অবস্থিত ইহাই সমজ্ঞান। জীবনমুক্ত কর্ম্মীর চোখে ইহারা তখন ব্যবহারিক ভাবে অস্তিত্ববান, উহাদের পরমার্থিক অস্তিত্ব ব্রহ্মভাবে ও ব্রহ্মরূপে। জীবভাবে যতদিন আমি থাকিব ততদিন এই সব সম্বন্ধ রাখিতেই হইবে? তবে এ সম্বন্ধ ক্ষণিক একটা সাময়িক ব্যবহারের উপযোগী; একটা জালা বা একটা ঘট মৃত্তিকারই বিকার বটে তবু জালার বদলে ঘট বা ঘটের বদলে জালা লইয়া কাজ হয় না: উহাদের স্ব স্ব উপযোগীতা আছে। মুক্তপুরুষের কাছেও তেমনি স্ত্রী পুত্র ঘর বাড়ী ইহাদের একটা সাময়িক ব্যবহার আছে; সেইটুকুর মধ্যেই উহারা স্ত্রী পুত্র, ঘর বাড়ী; তাহার বাহিরে উহারা জীব মাত্র। অন্যান্য জীব যেমন তেমনি প্রকৃতির নিয়মের অধীন। এই আছে এই নাই; একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যা ইহাদের সম্বন্ধ মূল্য, পরাশান্তি দিবার ইহাদের কোনো মূল্য নাই। সেই পরাশান্তির জন্য ইহাদের সম্বন্ধ অস্বীকারই প্রয়োজন। পাহাড়ে উঠিবার জন্যই যষ্টির দরকার; তার পর আর নাই; কর্ম্মজীবনের একটা সময়ের জন্য সংসারের স্বীকার, তদন্তে উহাদের আর মূল্য নাই। জীবনের যে পরম লক্ষ্য চরম গন্তব্য তাহার জন্য ইহাদের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই।

বেদান্ত বলেন এই যে বিবেক জ্ঞান ইহাই মুক্তির কারণ। আত্মা স্বভাবে মুক্ত, দেহ স্বতন্ত্র, অজ্ঞানেই উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেমন দিক ঠিকই আছে, ভ্রমে আমার উত্তরকে দক্ষিণ মনে হইতেছে, ভ্রম গেলে উত্তরকে উত্তরই দেখিব, তেমনি আমি মুক্ত; অজ্ঞান ঘুচিলেই স্ব-স্বরূপ দেখিব। দেখিব ব্রহ্মই আছেন সংসার নাই বা জগৎরূপ ব্রহ্মই আছেন সংসার রংএ-রঙ্গীন-জগৎ নাই। মমতার চোখে যে বিকৃত জগৎ দেখিতেছিলাম, সেই বিকৃত জগৎই মিথ্যা! একেবারে মিথ্যা! বন্ধ্যার পুত্রের মতই মিথ্যা! উত্তরে দক্ষিণ জ্ঞান যেমন মিথ্যা! অভিনেতাই আসল ব্যক্তি, তাহার নটরূপে রাম রাবনের সাজটাই মিথ্যা! আমি ব্রহ্মই সত্য; আমি সংসারী জীব মিথ্যা! জগৎ ব্রহ্মই সত্য; সংসার-মুখোস্‌পরা জগৎটাই মিথ্যা!

জগতে এই মুখোস যে পরাইয়াছি সে আমিই! আমার অজ্ঞান মাত্র! কোথা হইতে এই অজ্ঞান আসিল? এ প্রবাহ অনাদি; প্রসূতা পুরাণী এই সংসার প্রবৃত্তি। বলিতে হয় বল ব্রহ্ম হইতে; কেননা সৎ অসৎ যা কিছু তাহাই যে ব্রহ্ম হইতে। আমি জানিনা কোথা হইতে আসিল এ মায়া! নিতান্ত জেদ কর বলিব ব্রহ্ম হইতে; কেননা, যা কিছু সৎ অসৎ তাঁহা হইতে জাত, স্থিত এবং তাঁহাতেই লীন।

"ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরম্" এই হইল বেদান্তের মূল কথা। অবশ্য মায়াবাদী বৈদান্তিকের কথা এই। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা শুদ্ধ দ্বৈতবাদী তাঁহার সহিত কলহ করেন যে কথা লইয়া তাহা আসলে কলহের বিষয়ই নহে। মায়াবাদী তত্ত্বগুলি (যে তিনটী উপরে দেওয়া হইল) যে ভাবে ও যে ভাষায় বুঝাইয়াছেন তাঁহার মতে তাঁহার সহিত বুঝিলে গোলমাল থাকে না। মায়াবাদীর 'মায়া' বা 'মিথ্যা' বা 'জীব ব্রহ্ম এক'-এই সব কথা যে ভাবে যে অর্থে বুঝিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া লইলেই গোল মিটে। আসলে দেখা যায় যে মোটা কথায় মারাত্মক ভেদ বড় নাই। যত গোল সূক্ষ্ম লইয়া; কিন্তু প্রত্যেক মত এমন ভাবে খাড়া হইয়াছে যেন প্রধান তত্ত্বেই আসল ভেদ এই তিন সম্প্রদায়ে। দেখা যাউক মায়াবাদী এই তিন তত্ত্ব সম্বন্ধে কি যুক্তি দেন:—

(ক) ব্রহ্ম সত্য—এক মাত্র ব্রহ্মই সত্য; শংকর মতে যাহা দেশ কাল কারণে বদ্ধ নহে, হইতে পারে না তাহাই সত্য। ব্রহ্ম ছাড়া নশ্বর যা কিছু দেখি তাহা দেশে ও কালে

বদ্ধ ও কারনে উৎপন্ন, সুতরাং ইহারা সত্য নহে, মিথ্যা [(non-existent নহে, unreal 'বা দেখায় তা নয়')] সুতরাং ব্রহ্মই সত্য, তিনিই এক মাত্র দেশ কাল কারণাতীত। প্রমান ? শ্রুতি। তা ছাড়া বিশিষ্টবাদী রামানুজ বা দ্বৈতবাদী মাধ্ব ব্রহ্মকে অসত্য বলেন না। দেশে কালে, কারণে বদ্ধ নয় এমন আর একটী জিনিস থাকিলে ব্রহ্ম 'অসীম' হইতে পারেন না। এক ছাড়া দুই থাকিলেই এক অপরকে বাধা দিবে—সুতরাং শঙ্করের definition অনুসারে ব্রহ্মই সত্য, এমন সৎ বস্তু ছাড়া এইরূপভাবে সত্য, আর কিছু নাই। যা আছে তা মিথ্যা অসত্য unreal। non-existent নহে।

খ। জগৎ মিথ্যা :—শঙ্কর যে জগৎকে উড়াইয়া দিয়া non-existent বা অভাব পদার্থ বলেন ইহা কেহই বিশ্বাস করেন না। যা উপলব্ধি করিতেছি যা প্রত্যক্ষ হইতেছে তা নাই বলা এক পাগলের সাজে। তিনি বলেন উহা non-existent নহে উহা unreal। উহা মূলে বা স্বরূপে যা তা আমরা দেখি না। জগৎ যদি existentই হইবে তবে উহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে তিনি কেন এত যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিবেন ? এখন আমার বক্তব্য এই যে শঙ্কর যে জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন তাহা এই ঘটপটাদির সমষ্টি বিচিত্র বহুরূপী বিশ্ব নহে ; তাহা সংসার অর্থাৎ জীব যে জগৎকে অজ্ঞান রচিত একটা মমতা স্বার্থের আবরণে আবৃত করিয়া বিকৃত করিয়া দেখে সেই জগৎ। জীব বস্তু মাত্রেই 'আমার', 'তোমার', 'তাহার' ছাপ দেয় ; বস্তু মাত্রেই হেয়, প্রেয়, রং মাখায় ; অমুক মনুষ্যজীব নয়, আমার ছেলে ; অমুক নারী জীব নয় আমার স্ত্রী বা কন্যা অমুকটী বৃক্ষ সমষ্টী নয়, আমার বাগান ; অমুকটা বাড়ী নয়, আমার বাড়ী ; অমুক নরবাচ্য জীব নয়, আমার বন্ধু বা আমার শত্রু ; অমুকটা বৃক্ষ ফল নয়, আমার সুখাদ্য তোমার অখাদ্য ; ইত্যাদি সব জিনিসে, সব স্থানে সব জীবে সংসারী মানুষ জন্ম হইতেই রং মাখাইয়া নিজ নিজ মনোমত সংসার গড়িয়া খেলা করে ; এবং সেই সংসারটীর ভাল মন্দতে তার জীবন মরণ এই ভাবে। প্রত্যেক সংসার আলাদা সৃষ্ট ; কারো বা সুখের ; কারো বা দুঃখের ; কারো যশোলাভের ক্ষেত্র, কারো মানলাভের ক্ষেত্র ; কারো অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র ; কারো বা পুণ্যার্জ্জনের ক্ষেত্র। দূরদূরান্তরে একটা লোকজনপূর্ণ নগর হঠাৎ ধ্বংস হইয়া গেলে আমার কিছুমাত্র চাঞ্চল্য হয় না, অথচ আমার পোষা পাখীটা মরিলে বা বাছুরটার ঠ্যাং ভাঙ্গিলে বা বা খোকার আমার আঙ্গুল কাটিয়া গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোল পাড় করি ! একজন দরিদ্র অনাথার সমস্ত পুঁজি চুরী গেলে আমার কোনোই বিরামের হানি হয় না অথচ আমার উঠান হইতে একখানা ইট কেহ লইয়া গেলে তিনরাত্রি আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় ! এই হইল সংসার ! মানুষ এই বিচিত্র বহুরূপী বিশ্বকে এমনি ভাবেই হেয় অংশে ও প্রেয় অংশে ভাগ করিয়া সংসার গড়িয়া লইয়া সুখে দুঃখে বাস করে ; শুধু তাই নহে ; অনিত্য নশ্বর বলিয়া সমস্ত জানিয়াও তাহাই আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে ; এবং জগৎকে ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র দেখিয়া স্থির করিয়া সুখ সুবিধার জন্য তাঁহাকে উপাসনা করে ; নিজে ও এই জগৎ যে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এই ভাব মনে পোষণ করে ; সমস্ত ভয়, দুঃখ ও অভাবের মূল এই দ্বৈতজ্ঞান ; আমি আলাদা ভগবান আলাদা ; জগৎ স্বতন্ত্র ভগবান স্বতন্ত্র। জগৎকে ব্রহ্মভাবে দেখা দূরে থাক, জগৎ ভাবেই দেখেনা। এবং দেহকে আমার সঙ্গে এক দেখে ; ফলে বাহ্যবস্তুর সঙ্গে দেহের সুখদুঃখ সম্বন্ধ থাকায়, বাহ্যবস্তুকেই আমার সুখদুঃখের হেতু দেখে।

এই যে জগতে সংসারবোধ ইহাই শঙ্কর মতে মিথ্যা ; অথচ সংসার বোধ যখন আছে তখন একেবারে মিথ্যা নয় তবে জ্ঞানোদয়ে কাটিয়া যায় কাজেই 'অসৎ' ইহা অজ্ঞান বা মায়ার কাজ। সাংখ্যমতে অবিবেকের ফল। কেন জগৎকে সংসার বলিয়া ভুল করি ? ইহাই জীবের প্রকৃতি inherent nature, heredity অনাদি প্রবৃত্তি এই প্রসূতা পুরাণী এই সংসাররূপী জগৎ মিথ্যা। কিন্তু এই নদনদী গাছপালা জীব-জন্তু-ময়ী প্রকৃতি মিথ্যা নয় ; ইহাই ব্রহ্ম এই ব্রহ্মের বিশেষ রূপ সগুণমূর্ত্তি। তবে এরূপ মূর্ত্তিও মিথ্যা unreal আজ আছে এমন, কাল হইবে অন্যরূপ, নিত্যপরিনামী, পরিবর্ত্তনশীল। ব্রহ্মই এই জগৎ, জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম অন্যত্র। এই নদনদী গাছপালা জলস্থল কীট-

পঞ্চম-ময় যে জগৎ ইহা সত্য কেননা ইহা ব্রহ্মের রূপ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। যতো বা ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদি। তজ্জলান্‌'। জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সব শ্রুতি বাক্য বিশ্বকে অস্বীকার করা হয়না; এরূপস্থলে শঙ্কর—যাঁহার প্রধান-প্রমান শ্রুতি—তিনি কি জগৎকে উড়াইয়া দিবেন, ভেল্কী বা ভোজবাজী বলিয়া? Illusion, Maya, Magic এ সব কথা দৃশ্যমান বিশ্ব রূপ সম্বন্ধে নয়; এসব কথা সংসার সৃষ্টি সম্বন্ধে। এই "জগৎ" লইয়া জীব ইন্দ্রিয় সাহায্য অভিমান যোগে,—বুদ্ধি বলে যে psychological সংসার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে এই মিথ্যাত্ব নির্দ্দেশ। এ সংসারের ভ্রম জ্ঞানোদয়ে থাকেনা; কিন্তু বিশ্বরূপ জ্ঞান কি মুক্তজীবের থাকেনা? জনক যাজ্ঞবল্ক্য, শুকদেব শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব পরমহংসদেব ইঁহারা তো মুক্তজীব? তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান হওয়ার পর কি এই সব দৃশ্যমান ঘটপট গাছপালা জীবজন্তু, পথঘাট, লোটাকম্বল ফাঁকা ভেল্কীর মত উড়িয়া গিয়াছিল! না শঙ্কর নিজেই ধোঁয়া ফাঁকা দেখিতেন? এই কি একটা কথা? মুক্ত হইলে বাহ্যবস্তুতে অন্যজীবে কোনো মমতা বোধ থাকে না; আমার ইহা, আমার উহা নয়; ইহা সুখদায়ক উহা কষ্টদায়ক; ইহা সুন্দর উহা অসুন্দর; ইহা মুড়ী উহা শিব; ইহা পবিত্র উহা অপবিত্র; এই সব ভেদ জ্ঞান চলিয়া যায়। পরমার্থতঃ কোন বস্তুতে বা জীবে হেয় প্রেয় ভাবজনক কোনো গুণ নাই, ব্যবহারতঃ আছে, সংসারে থাকিয়া এ ব্যবহারিক ভেদ মানিতেই হইবে। জীবন্মুক্তকেও মানিতে হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য তো ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি মৈত্রেয়ীকে অপর স্ত্রী অপেক্ষা জ্ঞানী মনে করিতেন, অন্য মুনিপত্নীকে স্ত্রী ভাবিতেন না, পরের লোটাটি নিজের বলিয়া লইতেন না। কেন এসব করিতেন? ব্যবহারিক জগৎ সংসারে থাকিলে তা করিতে হইবেই। তিনি চাষাই হউন বা মুনিই হউন। তবে চাষা ব্যবহারিককেই চরম সত্য ভাবেই দেখে তার চোখে সংসারটাই সার সত্য। সেই ভাবিয়া সে সুখদুঃখ রাগদ্বেষ দ্বন্দ্ব বোধ যুক্ত হয় পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞ মুনি সংসারটার পিছনে জগৎরূপ ব্রহ্ম দেখেন, দ্বন্দ্ব ভাবে মুগ্ধ হন না, যাবৎ দেহ ধারণ তাবৎ প্রকৃতি-ধর্ম্ম মানিতে হইবে বলিয়া ব্যবহার মানিয়া লন, কিন্তু পরমার্থই তাঁর প্রজ্ঞা স্থিতি লাভ করে। এহেন জগৎ সংসারকে আচার্য্য সংসার মিথ্যা ও মায়া বিজৃম্ভিত বলিয়া অন্যায় করেন নাই। বিরুদ্ধ বাদীরা তাঁহাকে ভুল বুঝেন।

যদিই ধরা যায় সংসার কল্পিত জগৎ এই বিশ্ব বা phenomenal world তাহা হইলেও তাঁর মত অটল। কেন না, যে world সর্ব্বদা পরিনামশীল, এই আছে এই নাই, এখন একরূপ; তখন একরূপ; এই ছাড়া যখন আমার জ্ঞানের দ্বারা তার প্রকৃতরূপ জানা অসম্ভব, things are not what they appear; তাহা হইলে এজগৎ মিথ্যা বই কি? আমার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গঠনবশতঃ ক খ'য়ের মত দেখাইতেছে। আর একটা ইন্দ্রিয় থাকিলে হয়তো 'গ'এর মত দেখাইত; কিন্তু underlying substance তা অক্ষুণ্ন এক, নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। ইংরাজী দর্শনের ভাবে হিন্দু দর্শন বুঝিতে গিয়ে আমাদের এই সব গোলমাল লাগে। আসলে হিন্দু দর্শন মোক্ষশাস্ত্র; দুঃখ হইতে মুক্তি দিবার পন্থা দর্শক। cosmic creation কি করিয়া হইল এসব মুখ্য বিষয় উহার নহে, উহা অবান্তর ভাবে আসিয়াছে।

তবেই দেখাগেল; দৃশ্যমান জগৎ (বিশ্ব) বা সংসার দেশে কালে খণ্ডিত ও ছিন্ন বারণে উৎপন্ন, সুতরাং উহা সত্য নহে। উহা মিথ্যা, কেমন মিথ্যা? শশবিষাণের মত বা আকাশকুসুমের মত নহে। উহা সৎ হইলেও অসৎ অসৎ হইলেও সৎ। ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মের বাহ্যরূপ যা নিত্য পরিবর্ত্তনশীল তা সত্য নহে। (ক্রমশঃ)

পঞ্চামৃত

বস্ত্রাভাব

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ গুলির দর দিন দিন ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে, এমন কি কোন দ্রব্য দ্বিগুণ ত্রিগুণ কোন দ্রব্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, অন্যান্য জিনিষ যাহা হউক তাহা হউক ফলতঃ বস্ত্রের মূল্য ঠিক চতুর্গুণ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি হইবার আশঙ্কা নিয়তই মানব গণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। দেশশুদ্ধ অন্ন বস্ত্রের জন্য হাহাকার উঠিয়াছে। লোকের পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই তদনুসঙ্গিক অন্যান্য জিনিস পত্রাদি অগ্নিমূল্য হওয়ায় লোকে কোন্ দিক্ সামলাইবে, তাহাদের বামে আনিতে ডাহিনে কুলায় না। দেশের পনর আনা লোকই মধ্যবিত্ত ও গরিব শ্রেণীভুক্ত বাকি এক আনা ধনী লোকের সুলভ বা দুর্ম্মূল্যে তত ক্ষতি বা বৃদ্ধি নাই। ইতর লোকে দিন মজুরীতেও প্রত্যহই যাহা কিছু আয় করিতেছে, কিন্তু ভদ্র লোকের মধ্যে যাহাদের স্বল্প বেতনের চাকরী উপজীবিকা কিম্বা যাহারা পৈতৃক সামান্য জমী জমার উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে অথবা চাকরী জীবির মধ্যে যাহার কর্ম্ম দোষে বেকারাবস্থায় আছে তাহাদের এই মহার্ঘতায় কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কার্পাস আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্ত্র বহুপূর্ব্ব কাল হইতে ভারতবর্ষ কার্পাসের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল, মনুসংহিতায় কার্পাস সূত্রের উপবীত ধারণ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মনুর সময়ও কার্পাসের প্রচলন ছিল। কার্পাসের উপকারীতা যে অশেষ তাহা জগতে কোন জাতিকেই বুঝাইতে হইবে না। পুরাবৃত্ত পাঠে জানা যায় বহু পূর্ব্ব কাল হইতে একমাত্র ভারতবর্ষ হইতে এসিয়া ও ইউরোপের নানা স্থানে এবং আরব, পারস্য, মিশর দেশে কার্পাস প্রেরিত হইত। এমন কি শতাব্দী পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষই সমগ্র পৃথিবীর কার্পাস বস্ত্র সরবরাহ করিত। দুঃখের বিষয় কালমাহাত্ম্যে দেশে এখন কার্পাসের চাষ নাই, কার্পাস হইতে সূত্র নির্ম্মাণের বা সূত্র হইতে বস্ত্র প্রস্তুতের উন্নতি কল্পে লোকের তত চেষ্টা নাই। আজ ভারতবাসী বিদেশীয় কার্পাসের ও তদুৎপন্ন বস্ত্রের ভিখারী, যদি পূর্ব্বের ন্যায় দেশে কার্পাস চাষ বর্ত্তমান থাকিত, চরকায় সূতা কাটা হইত ও তাঁতে বস্ত্র বয়ন প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে কি আর আমাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া ৬।৭ টাকা জোড়া দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিতে হইত! যুদ্ধারম্ভ হওয়ার পর হইতে এযাবৎ দেশে যে বস্ত্র কিরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই, এই ছয় বৎসরে দেশ উলঙ্গ হইয়া গেল। দেশের প্রায় বার আনা লোকের একখানি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। গৃহস্থের ঘরে মহিলাকুল যে কি দুরবস্থায় লজ্জা নিবারণ করিতেছে তাহা ভগবানই জানেন কত স্থানে বস্ত্রাভাবে কত যে আত্মহত্যাদি হইয়া গেল তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কত শত কুলমহিলা লজ্জায় গৃহের বাহির হইতে পারে না।

বিগত শতাব্দী হইতে ভারতে দৈনন্দিন কার্পাস চাষের অবনতি ঘটিতেছে। এ বিষয় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এতদ্দেশে পাট ও শন চাষের আধিক্য ও কতিপয় উচ্চ শিক্ষিত লোকের চাকুরী-প্রিয়তা ও বাবুগিরীতেই ইহার অবনতি। কেবল পাট ও শন চাষের আধিক্যে যে কার্পাসেরই অবনতি ঘটিয়াছে তাহা নহে। অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও তৈলশস্য প্রভৃতি সমস্ত জিনিসের অবনতি ঘটিতেছে। বর্ত্তমান দেশব্যাপী দুর্ম্মূল্যতার

কারণই ইহা। অধুনা ভারতবর্ষের লোকের কৃষি-বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তাহাতে আবার কৃষি বিজ্ঞানভিজ্ঞ অজ্ঞান কৃষকগণের উপরই সম্পূর্ণ কৃষিকার্য্যের ভার ন্যস্ত সুতরাং কৃষির উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতিই ঘটিতেছে; শিক্ষিতেরা "বাবু" সাজিয়া পরের দ্বারস্থ। বর্তমান যুগে মার্কিন প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বনে কার্পাস চাষের উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে এবং তজ্জন্যই ঐ সকল দেশীয় কার্পাস গুণে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। এক্ষণে কার্পাস উৎপাদনে ভারতবাসীর দৃষ্টি পতিত হইয়াছে মাত্র বিশেষ কোন চেষ্টা অবলম্বিত হইতেছে কিনা বলা যায় না। প্রজাহিতৈষী সহৃদয় গবর্ণমেণ্টও কার্পাস চাষের প্রচলন চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে কয়েকবৎসর মার্কিন দেশীয় উৎকৃষ্ট বীজ কৃষকদিগকে বিতরিত হইয়াছিল কিন্তু দেশীয় অজ্ঞ কৃষকগণের কার্পাস চাষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা হেতু তাহারা সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তির উপদেশ ও যোগদান একান্ত কর্ত্তব্য এবং বাঞ্ছনীয়।

কার্পাস নানা জাতীয়। ইদানীং ভারতবর্ষের নানা স্থানে অত্যল্প পরিমাণ নানা প্রকারের কার্পাস উৎপন্ন হইতেছে। তন্মধ্যে কোন জাতীয় কার্পাস বঙ্গদেশে সমধিক পরিমাণ উৎপন্ন হইতে পারে এ বিষয়ে অনুসন্ধান লওয়া ও পরীক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় কার্পাস এ দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১। বড় কার্পাস—ইহাকে বোম্বাই বারাম কার্পাস বলে। ইহার গাছ অত্যন্ত বৃহৎ হয়। ১৪।১৫ ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই কার্পাসের সূত্র মোটা, বীজ গুলি পরস্পর সংলগ্ন অর্থাৎ জোড়া ভাবে অবস্থিত। বীজের গায়ে অধিক পরিমাণে তুলা থাকে, কিন্তু বীজ হইতে তুলা অতি সহজে বিশ্লেষিত হয় না। ইহার পত্র গুলি বড়, আকারে স্থল পদ্মের ন্যায় ও পত্রাগ্র পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই জাতীয় কার্পাস এতদঞ্চলে অনেক গৃহস্থ বাটীতে ২।১০টী করিয়া আছে।

২। ঢাকাই বা ছোট কার্পাস—এই কার্পাসের গাছ এদেশে অত্যল্প দেখা যায়। এই গাছ গুলিতে ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত ফল দেয়। ইহার গাছ ৬।৭ ফিট লম্বা, পত্র গুলি ছোট ও পত্রাগ্র তিন ভাগে বিভক্ত ইহার সূত্র কোমল, সূক্ষ্ম চিক্কণ, এক কালে এই কার্পাসে জগদ্বিখ্যাত ঢাকাই মসলিন প্রস্তুত হইত।

৩। তোলা বা মোটা কার্পাস—ইহা আসাম, শ্রীহট্ট, জলপাইগুড়ী, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের কোন কোন অংশে জন্মে। ইহার অনেক গুলি ফল হয় এবং উহা খুব মোটা হইয়া থাকে, সূত্রও মোটা হয়, পার্ব্বত্য প্রদেশে ভাল জন্মে।

৪। দেশী বা জেঠুয়া কার্পাস—ইহা বিহার প্রদেশে স্থানে স্থানে জন্মে; গাছ ছোট, সূত্র মোটা ও পরিষ্কার হয়।

এক্ষণে কার্পাস চাষের প্রণালী যৎকিঞ্চিৎ নিম্নে বর্ণিত হইল। যদিও এতদঞ্চলে ইহার চাষের বাহুল্য নাই, তথাপি গৃহস্থ বাটীতে আমরা যাহা সামান্য পরিমাণে রোপণ করিয়াছি, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।

দোয়াঁশ মৃত্তিকাই কার্পাস চাষের উপযোগী বাতাতপ সঞ্চার বহুল উন্মুক্ত উচ্চ ভূমি ও জমীতে নানা প্রকার তরি তরকারী উৎপন্ন হয় এবং যে জমীতে আশু ধান্য, কপি, ফুল, ফল, আলু, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি জন্মে সেরূপ মৃত্তিকাতেই কার্পাস চাষ করা আবশ্যক। উদ্ভিজ্জ বহুল মৃত্তিকা বা অনাবাদী জঙ্গলময় পতিত জমীতেও বেশ জন্মিতে পারে। মৃত্তিকায় বালির পরিমাণ বেশী হইলে ঘন ঘন জল দেওয়ার আবশ্যক হয়। মাঘ বা ফাল্গুন মাস হইতে বৃষ্টি পতন হইলেই সুবিধা বুঝিয়া বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ২।৩ বার করিয়া গভীর রূপে জমীতে চাষ দেওয়া আবশ্যক। কর্ষণের পর মই দিয়া মৃত্তিকা সূক্ষ্ম রূপে চূর্ণীকৃত করা আবশ্যক। তৎপরে বৈশাখ মাসের মধ্য ভাগে প্রথম বৃষ্টিপাত হইলেই ৩।৪ হাত অন্তর দুই সারি বান্ধিয়া প্রত্যেক সারিতে ৩।৪ হাত অন্তর এক ইঞ্চ গভীর এক একটী গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ৪।৫টী রোপণ করিতে হইবে। রোপণের জন্য বীজ গুলি উৎকৃষ্ট ও নূতন চাই। একেবারে বীজ গুলি সারিতে বপন বা হাপরে চারা তুলিয়া সেই চারা প্রত্যেক সারিতে একটী করিয়া বেশ সুপুষ্ট গাছ ৩।৪ হাত অন্তর রোপণ

করিলেই চলিবে। তবে আষাঢ় মাসে এই কার্য্য শেষ করিতে হইবে। চারা নাড়িয়া রোপণ বা ক্ষেত্রে একেবারে বীজ বপন উভয়ের ফলন একরূপ হইবে।

প্রতি বিঘায় দেড় পোয়া পরিমাণ বীজ লাগে, রোপণের পূর্ব্বে অত্যল্প পরিমাণ তুঁতিয়া মিশান ঘন গোময় জলে বীজ গুলি ভিজাইয়া রোপণ করিলে তদুৎপন্ন গাছ গুলি সতেজে বৃদ্ধি হইবে ও কীটাদি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। বর্ষাকালে কার্পাস গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই সময় মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া আগাছা পরিষ্কার ও মৃত্তিকা শিথিল করিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাইটের আবশ্যক করে না। গাছ গুলির উভয় পার্শ্বে নালা কাটিয়া মাটি গুলি গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে বর্ষার অতিরিক্ত জল নির্গমনের সুবিধা হয় ও প্রবল ঝড় বাতাসে বৃক্ষ পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আবার শুকার সময় ঐ নালাতে জল সেচন করিলে তাহাতে গাছের বিশেষ উপকার সাধিত হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে গাছের শাখার অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া দিলে ঝাড় বান্ধে ও ফসল বেশী হয়। ইহার জমীতে সার দেওয়া আবশ্যক। উপযুক্ত সার পাইলে ফলনও অধিক হয়। গোময়, গোমূত্র, পচা পাতা, নীলের সিটী প্রভৃতি সুলভ ও সহজ লভ্য সারই বিশেষ উপযোগী। ভূমি উর্ব্বরা ও উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে বিনা সারেই প্রথম বৎসর সুফলপ্রদ হয়, কিন্তু গাছ গুলি যতদিন বাঁচিবে, ততদিন পূর্ণ ফসল প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় বৎসর হইতে প্রত্যেক চৈত্র বা বৈশাখ মাসে জমীতে সার দেওয়া উচিত। তাহা হইলে বর্ষাকালে উহা পচিয়া বৃক্ষের পোষণোপযোগী হইবে। সার দিতে না পারিলে ভাল ফলন হইবে না। ক্ষেত্রে জল সেচনের আবশ্যক হয় না, তবে জমী নিতান্ত শুষ্ক ও গাছ সতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে না দেখিলে প্রয়োজন মত জল সেচন করিতে হইবে।

যেখানে গাছগুলি সতেজে বৃদ্ধি হইয়া ৬।৭ হাত উচ্চ ও ঝোপ হইবে, তুলা সংগ্রহ হইবার পরই সেই গাছ গুলি ছাঁটিয়া দিবে, আবশ্যক বোধ করিলে দুইটী গাছের মধ্যস্থ একটী গাছ কাটিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া যাইতে পারে নতুবা পর বৎসরে ঘন সন্নিবিষ্ট গাছে অত্যন্ত আওতা হওয়ায় ফলন অল্প হইয়া পড়ে। মূল কাণ্ডের দুই হস্ত মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া সমস্ত অংশ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা ছাঁটিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে কোনরূপ গাছের শাখাগুলি ফাটিয়া না যায়। ফাটিয়া গেলে সেই শাখাটী শুকাইয়া যাইবে, তাহাতে নূতন পত্রোদ্গমাদি হইবে না। এমন কি এইরূপ ২।৩টী শাখা ফাটিয়া গেলে সেই গাছটি একেবারেই মরিয়া যাইবে। পুরাতন শাখায় ফলন কম হয়, ও উৎপন্ন তুলাও গুণে তত ভাল হয় না। ছাঁটিবার পূর্ব্বে বা পরে ক্ষেত্রটী কোপাইয়া তাহাতে সার মিশাইতে হইবে, ইহাতে গাছের তেজ বৃদ্ধি হইবে। ঘনসন্নিবিষ্ট শাখা দুইটী গাছের মধ্যস্থ একটী গাছ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে সহজেই রৌদ্র ও বায়ু চলাচল করিতে পারে ও ঐগুলি সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়। গাছ কাটিয়া পাতলা করিলে গাছের অল্পতার জন্য ফসলের কোন হানি হইবে না, অধিকন্তু কর্ত্তিত গাছগুলি জ্বালানীকাষ্ঠের জন্য ব্যবহৃত হইবে। অথবা মোটা শাখাগুলি ছোট ছোট খণ্ড করিয়া গর্ত্ত মধ্যে পুড়াইয়া লইলে সুন্দর তামাক খাওয়ার কয়লা হইবে, ইহা টিকে অপেক্ষাও তেজস্কর হইবে ও শীঘ্র আগুন ধরিবে।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে ক্রমাগত ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত ফলগুলি পরিপক্ক হইয়া ফাটিতে থাকে, তখনই বাছিয়া ফাটা ফলগুলি সংগ্রহ করিবে। প্রাতঃকালে তুলায় হিমজল মিশ্রিত থাকে, এই সময় সংগ্রহ করিলে দাগী হইতে পারে সুতরাং বৈকালেই সংগ্রহ করিবে। একবারে সমস্ত ফল পরিপক্ক হয় না বলিয়া ২।৩ দিন অন্তর ফাটা ফলগুলি তুলিয়া ঝুড়িতে রাখিবে। ফাটা ফল তুলিবার পরেই তুলা ছাড়াইলে সমস্ত তুলা ছড়াইয়া আইসে বীজ গাত্রে কিছুই লাগিয়া থাকে না। তুলা গুলির আঁইশ পাতলা করিবার জন্য ৩।৪ দিন রৌদ্রে বেশ করিয়া শুকাইয়া লইবে। প্রতি গাছ হইতে অন্যূন এক পোয়া হইতে অর্দ্ধ সের বা তিন পোয়া তুলাও সংগ্রহ হইতে পারে।

শ্রীগুরু চরণ রক্ষিত।

কৃষক। পৌষ

বস্ত্র সমস্যা—সহরে চরকা

সহরের অনেক অনেক স্থানে সূতা কাটা আরম্ভ হইয়াছে। চরকার আলোচনা শুনিয়া ও দেশ সেবায় ইচ্ছুক হইয়া অনেকে চরকায় সূতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সূতায় কি হইবে?

চরকায় মধ্যবিত্ত লোকের যেমন সাংসারিক সাহায্য হইবে, উহা তেমনি এক সৌখীন সামগ্রী বটে। চরকায় সূক্ষ্ম সূতা কাটা উঁচুদরের আর্ট কিন্তু কেবল সূতা কাটিয়া এই সখের তৃপ্তি হয়না সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারোপযোগী জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারিলেই সখ মিটে। সকলের পক্ষে ঘরে তাঁত বসাইয়া এই সখ মিটাইবার সুযোগ নাই। আসামের প্রতি গৃহে ছোট ছোট তাঁত আছে। ধনী বা দরিদ্র সকল ঘরের মেয়েরাই তাঁতে কাপড় বুনেন। ইহাতে মজুরী বা দরের হিসাব আসেনা। বাড়ীর বাগানে যে তরকারী হয় বা পুকুরে যে মাছ ধরা হয় তাহাতে ব্যয় কত পড়িল তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বাগানের তরকারী বলিয়া বা পুকুরের মাছ বলিয়া তাহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যাঁহাদের ফুলবাগানের সখ আছে মূল্য হিসাবে তাঁহারা ত একটি পয়সাও তুলিতে পারেন না কিন্তু ফুল বাগিচায় মাতিয়া আছেন, এমন লোকেরও ত অভাব নাই। আমি বলি, চরকা এবং তাঁতও আর দশটা সৌখিন জিনিষের মতই চলিতে পারে। ধাপায় কপির চাষ করিয়া অনেকে উপার্জ্জন করিতেছেন। পয়সা দিলেই কেনা যায় তবু সুবিধা পাইলেই বাড়ীর বাগানে একটু তরকারী জন্মাইবার সখ কর্ত্তা ও গিন্নীর সমান। পয়সা দিয়া কেনা যায় বলিয়াই ইহা অযত্নের নহে। তেমনি চরকায় দরিদ্রেরা উপার্জ্জন করে বলিয়াই উহা অযত্নের নহে। এতদিন চরকার চর্চা ছিলনা বলিয়াই চরকা বা তাঁতে সখ মিটাইবার কথা কেহ ভাবেন নাই। একটি বড় দরকারী জিনিষ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এক্ষণে দরিদ্র উহাতে জীবিকা উপার্জ্জন করিবেন, মধ্যবিত্ত সাংসারিক ব্যয় কমাইতে পারিবেন, আর যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তাঁহারা সখ মিটাইতে পারিবেন। ভাবিয়া দেখুন আমাদের মেয়েরা লেস বুনিতে কার্পেট বুনিতে কত সময় যাপন করেন। সেটা কিছু মন্দ কাজ নয়। কিন্তু তার সঙ্গে চরকাটাও ধরিতে পারেন আর চরকার কাটা সূতা বাড়ীতে বুনিয়া গামছা, আসন, ঢাকুনি ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া কতই না আনন্দ পাইবেন। তাই বলিতেছিলাম, আসামের ভগ্নীদের তাঁত চালাইবার অভ্যাস থাকায় তাঁহারা চরকার সূতা কাটিয়া পুরাপুরি সখ মিটাইতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গালি মেয়েদের সে সুবিধা নাই কেননা তাঁতটা আমাদের মেয়েদের মধ্যে কোন কালেই বড় একটা চলিত ছিল না। এখন যুবকদের কাজ তাঁতে লাগিয়া পড়া। অনেকের হয়ত তাঁত বুনিবার সখ আছে, কিন্তু এত অর্থ নাই যে বাড়ীতে সমস্ত সরঞ্জাম কিনিয়া একটি তাঁত বসান। এস্থলে পাড়ার কয়েকজন একত্র হইয়া একটি করিয়া তাঁত বসাইতে পারেন। আন্দাজ দুই শত টাকা হইলে মায় সরঞ্জাম একখানা তাঁত বসান হয়। প্রথম প্রথম একটু বেশী সময় দিতে হইবে। তাঁতের সরঞ্জাম যোগাড় করা এবং এমন লোক ঠিক করা দরকার যে, ঐকাজে সাহায্য করিবে এবং দরকার হইলে বুনিতেও পারিবে। তাঁত বসাইবার কিছু দিন পরে কাপড় বোনা আরম্ভ হইলে হয়ত দেখা যাইবে যে, বুনিবার খরচ বেশী পড়িতেছে। কিন্তু লাগিয়া থাকিলে এটাও ঠিক যে, ঘরে বা নিজেদের সমিতিতে কাপড় বুনিয়া বরাবর লোক্‌সান যাইবে না।

যাঁহাদের শীকারের সখ আছে, তাঁহারা যখন শীকার করিতে বাহির হন, তখন এক রাজসূয় যজ্ঞের যোগাড় আরম্ভ হয়। আবশ্যকীয় এটা সেটা সংগ্রহ করিয়া শীকারদলের লোকেরা কত আনন্দ পান। হয়ত দশ বারো টাকা ব্যয় করিয়া চড়ুইভাতি ও শীকারের ব্যাপার মিটাইয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন, তখন সঙ্গে ৪ টী কি ৫ টী পাখী যার মূল্য দুই কি আড়াই টাকা। সখ মিটাইতে লোকে খরচ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু চরকা ও তাঁতের সখ ঠিক এধরণের নয়। উহাতে শীকারের মত এত সাময়িক উত্তেজনা নাই। তাহা হইলেও অন্ততঃ ইহাকে তরকারী বাগানের সখের সহিত তুলনা করিতে পারা যায়। কালোপযোগী বীজবেলা, নিড়ান কদল তোলা লাগিয়াই আছে। বর্ষের আরম্ভ হইতে শেষ

পর্য্যন্ত মালির কাজের শেষ নাই. একই জমিতে ভিন্ন ভিন্ন সার দিয়া কেমন ফসল হয় তাহা দেখার জন্য গৃহস্থ উৎকণ্ঠা ও আনন্দ অনুভব করেন। বয়ন কার্য্যেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রং ফলাইয়া রকমারি পাড় তৈয়ারী করিয়া বা টুইল ইত্যাদি জটিল বয়ন কার্য্য করিয়া সখ মিটান যায়—তাঁতির এ কাজের অভাব হয় না। আমার ইচ্ছা হয় দেখি যে পাড়ার সান্ধ্য বৈঠকগুলিতে রাজা, উজীর না মারিয়া কার বাড়ীতে কত সুতা হয়, কার চরকা ভাল, কে বেশী সুত কাটেন ইত্যাদি আলোচনা হইতেছে। সে কালের ধরণের টানা হাঁটাই সুবিধা, না ড্রামের উপর ঘুরাইয়া টানা করা মোটের উপর ভাল; "বোয়া" কেনাই ভাল, না প্রতিবারে "বোয়া" বাঁধাই ভাল, এইরূপ আলোচনা বাংলা দেশের জড়তা দূর করিবে। স্পোর্টে যে বাঙ্গালীর সখ নাই তাহাও নহে। মোহনবাগানের খেলার দিনে বাঙ্গালীর ভিড়ে মাঠে স্থান হয় না। আমি বলি এই স্পোর্টিং ভাবটা আরো বাড়াইয়া চরকা তাঁতে প্রয়োগ কর। খেল সাঁতরাও লাফাও বাইচ দাও, সঙ্গে সঙ্গে চরকা তাঁতটাও ধর—তবেই উহার মর্ম্ম বুঝিবে। !

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়
(খুলনাবাসী)

সাহেবী বিজ্ঞাপন

অপার অনন্ত বারিধির উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া একখানা মস্ত বড় যাত্রিজাহাজ ছুটিয়াছে। জল! জল!—নিরবচ্ছিন্ন জল! কূল কিনারা বুঝি নাই। মাঝে মাঝে কচিৎ কখন দুই চারিটা উড়ন্ত মাছ; তা ছাড়া কেবলই অবিশ্রান্ত বীচিবিক্ষুব্ধ জল-কল্লোল!

এক ষ্টেসন হইতে জাহাজ খানা ছাড়িয়াছে, পর দিন বেলা তিনটায় গিয়া অন্য ষ্টেসনে ভিড়িবে, ইতিমধ্যে বিশ্রাম কোথাও নাই।

জাহাজখানার স্ত্রী-পুরুষ লইয়া প্রায় আড়াই শত যাত্রী। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা সকাল-সন্ধ্যায় জাহাজের ডেকে ঘুরিয়া ব্যায়াম-বিচরণ করে।

একদিন ভোরের বেলা ভ্রমণের সময় হটাৎ এক মেম সাহেব বেদনায় অধীর হইয়া পড়িলেন। পেটে অসহ্য বেদনা, প্রাণ বুঝি যায়!

মেমের আর্ত্তরবে জাহাজের সমস্ত ভদ্র সম্ভ্রান্ত সাহেব ও কালা আরোহী একত্র হইলেন। সকলেরই মনে একটা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার ভাব। মেম এখন আর দাঁড়াইয়া থাকিতে অক্ষম।

দেখিতে দেখিতে হঠাৎ নিরবলম্বনা লতার ন্যায় লুটাইয়া পড়িলেন। কি হইল, কি হইল, বলিয়া সকলের মুখেই প্রশ্ন কিন্তু মেমের মুখে এখন আর বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই। পেট জোরে চাপিয়া ধরিয়া মেম কেবল গোঁগাইতেই লাগিলেন।

জাহাজে ডাক্তারী ঔষধ-পত্র ও ডাক্তার ছিল। ডাক্তার যন্ত্রপাতি লইয়া অগৌণে আসিলেন। ডাক্তারের প্রশ্নে মেম অতিকষ্টে নিজের পেটে যে একটা বিষম বেদনা উঠিয়াছে, এই কথাটা বলিলেন।

ডাক্তার অনেক ঔষধ খাওয়ালেন, অনেক প্রক্রিয়া করিলেন। কিছুতেই কিছু হইলনা। সে দারুণ বেদনা কিছুতেই কমে না; ডাক্তারের তিন চার ঘণ্টার পরিশ্রম সবই বুঝি পণ্ড হইয়া যায়। মেম বুঝি আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বারিধিগর্ভে সমাধি লাভ করেন।

ডাক্তার হতাশ হইলেন। ক্রমে মেমের সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া পড়িল। দর্শকগণের মুখে একটা বিষাদের ছায়া ঘনাইল।

এ কি এ! এই যে এক সাহেব দেখিতেছি হঠাৎ মুমূর্ষু মেমের দিকে অগ্রসর হইতেছেন! কে ইনি? মতলব কি?

জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। সাহেব নিজেই বিনীত ভাবে দর্শকদিগকে বলিলেন, ভদ্রমহোদয়গণ! রোগিণীকে আমি একটু দেখিতে পারি কি? আমার এক আধটা ঔষধ আছে, আমার বিশ্বাস তাহা প্রয়োগ করিলে এখনই রোগী আরোগ্য হইবে।

এর আর কথা কি? আপনি এখনই ঔষধ প্রয়োগ করুন। দর্শকগণের অনুমোদনে সাহেব তাঁহার পকেট হইতে একটি শিশি বাহির করিলেন এবং তাড়াতাড়ি কর্কটা খুলিয়া এক ফোঁটা ঔষধ মেম সাহেবের দাঁতকপাটীলাগা মুখে অতি কষ্টে ফেলিলেন।

এক মিনিটও কাটিল না। মেম সাহেব যেন একটা আশ্বস্তির শ্বাস ফেলিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন,—আঃ বাঁচলুম!

দর্শকগণের মধ্যে চিকিৎসকের ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। সকলেই সাগ্রহে ঔষধের নাম টুকিয়া লইলেন। মেমসাহেব উঠিয়া চিকিৎসক সাহেবকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন! ইতিমধ্যে বেলা তিনটা বাজিল। জাহাজ খানা ষ্টেসনে ভিড়িল। সাহেব তাঁহার লগেজ-পত্র লইয়া এই ষ্টেসনে নামিয়া পড়িলেন। রোগমুক্ত মেমসাহেবও এই ষ্টেসনে নামিলেন। জাহাজের ডেকের উপর দাঁড়াইয়া অনেকে দেখিল—কিছুদূর গিয়াই ঐ সাহেব-মেম হাতধরাধরি করিয়া হাসিয়া-রসিয়া কথা কহিতে কহিতে যাইতেছেন।

ব্যাপার কি? শেষে প্রকাশ পাইল,—ঐ সাহেব-মেম স্বামি-স্ত্রী। জাহাজের ঘটনাটা একটা সাহেবী ঔষধের বিজ্ঞাপন মাত্র।

"স্বরাজ"

আয়ারল্যাণ্ডে স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠা

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

গত ডিসেম্বর মাসের ৬ই তারিখে আয়ারল্যাণ্ড স্বারাজ্য লাভ করেছে। আমরা তাহাকে অভিনন্দন করি।

অনেকে বলছেন এটা আয়ারল্যাণ্ডের পুনর্জন্ম। কথাটা অসঙ্গত, কারণ তার জরামরণহীন, চিরযৌবন চিরঞ্জীব আত্মা জীর্ণবাসের মত তাকে কোন দিনই ত্যাগ করে নি। তবে বলা যেতে পারে সে মোহাবিষ্ট হয়ে ছিল এবং সাতশত বৎসরব্যাপী সেই মোহের আবেশ-কালে পরবশতার সকল যন্ত্রণাই তাকে ভোগ করতে হয়েছে। তার বিজেতৃজাতীয় ভূম্যধিকারীরা তার কৃষকসন্তানের উপর অকথ্য অত্যাচার অবিচার করেছে। তার ফলে তার দারিদ্র্য দুঃখের অবধি ছিল না। দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে, দলে দলে লোক দেশ ত্যাগ করে দেশান্তরে চলে গিয়েছে। শিক্ষার অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থায় দেশের ভাষাটা পর্য্যন্ত লুপ্ত প্রায় হয়েছে। পরাধীনতার যত প্রকার লাঞ্ছনা আছে, তার মধ্যে স্বজাতীয় ভাষা, চিন্তা ও মননের স্বাতন্ত্র্য-লোপই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। এই স্বাতন্ত্র্যের চিহ্নমাত্র যাতে না থাকে, তারই জন্যে বিজিত জাতির পূর্ব্ব ইতিহাসকে ক্ষুন্ন করে, তার কীর্ত্তিকলাপকে লঘু করে, নিজ জাতীয় যশঃ কীর্ত্তিকে গুরু করে, নিজ সাহিত্যের ভাব বিজিত জাতির মনে অনুপ্রবিষ্ট করে দিয়ে, বিজেতৃ-জাতি তার মনন, কথন ও লিখনকে স্বাভাবিক অভিব্যক্তির পথ থেকে ভ্রষ্ট করে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথের অনুগামী করতে চেষ্টা করে। আয়ারল্যাণ্ডেও এ চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। তার ফলও যথেষ্ট হয়েছে। ১৫৯১ সালে, আয়ারল্যাণ্ড-বিজয়ের চার শ বছর পরে, যখন ডাবলিন-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে ইংরেজী-ভাষা একটা শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। অর্থাৎ তখনও আইরিশ-ভাষাতেই সকল বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হত। তার পর যত সময় যেতে লাগল ততই ইংরেজীর প্রাদুর্ভাব এবং আইরিশের পরাভব হতে লাগল, শেষে ইংরেজীই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা হল। দেশের লোকের কথিত ভাষাতেও এর প্রভাব বেশ দেখা যেতে লাগল। ১৮৬১ সালে কেবল আইরিশ-ভাষাতেই কথা বলতে পারত এমন লোকের সংখ্যা ছিল ৩,১৯,৬০২। ১৮৯১ সালে ঐরূপ লোকের সংখ্যা হয় ১,০৩,৫৬২, অর্থাৎ ত্রিশ বছরের মধ্যে ২,১৬,০৪০ জন লোক শিক্ষা-ব্যবস্থার গুণে মাতৃভাষা ভুলে গিয়েছিল! আয়ারল্যাণ্ডের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত, অথচ এই বিশ-

বিদ্যালয়েই ইউরোপের তমিস্র যুগে পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞানের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছিল

কিন্তু দারিদ্র্যদুঃখই বল আর জাতীয় ভাষার লোপই বল, বা তথাবিধ অন্য কিছুই বল, এসকল ত মূল ব্যাধি নয়, এসকল উপসর্গ মাত্র। মূল ব্যাধি হচ্ছে পরবশতা। সামান্য সামান্য বিধি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রজার হিতকল্পে দু'একটা সদনুষ্ঠান, দু'একটা উচ্চপদে দেশের দু'এক জনকে নিযুক্ত করা—এ সমস্ত মুষ্টিযোগে মূল ব্যাধির প্রশমন হয় না। কাযেই পরবশতার স্থানে আত্মবশতা স্থাপন করে মূল ব্যাধির নিরাকরণের জন্য আইরিশরা এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করলে। এই সিনফেন (Sein fein) আন্দোলনের কেন্দ্রস্থানে ডাইল আইরিয়েন (Dail Eireann)। এর পূর্ব্বেও এই উদ্দেশ্যে অন্য অন্য অনেক সভা সমিতি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু Dail Eireann এর বিশেষত্ব এই যে এর সদস্যেরা কেবল বচনের উপর নির্ভর না করে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বর্জ্জন করলে এবং কেবল তাই করেই ক্ষান্ত হল না, আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে। ইংরেজের পার্লামেণ্টারি শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে আইরিশ সাধারণ-তন্ত্র [Irish Republic] প্রতিষ্ঠিত করলে, সাধারণ-তান্ত্রিক-সেনা [Republican Army] প্রস্তুত হল, বিচারালয় স্থাপিত হল এবং জমি সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য এবং কৃষকদের উন্নতির জন্য Land commission নিযুক্ত হল। আবশ্যক অনুষ্ঠানের কিছু বাকী থাকল না [১]। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অবশ্য এ সমস্ত নির্লিপ্ত দর্শকের মত দেখলেন না। কোন গবর্ণমেণ্টই এমন অবস্থায় নির্লিপ্ত হয়ে থাকতে পারেন না। কোন গবর্ণমেণ্টই সহজে কোন পরিবর্ত্তন চান না, শাসিতের দ্বারা বলপূর্ব্বক প্রচলিত পরিবর্ত্তন ত চানই না। সুতরাং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট Sinn Fein দের এই ধৃষ্টতা দমন করতে সেনা ও অস্ত্রধারী পুলিস পাঠালেন। এদের সঙ্গে সাধারণ তান্ত্রিক সেনাদের [Republican Army] ছোট খাটো যুদ্ধ ত নিত্যই হতে লাগল। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে খুন, জখম, ঘরে আগুন দেওয়া ত নিত্য ঘটনা হয়ে উঠল। তা ছাড়া এরা যেখানে পেলে সেইখানে থেকে Sinn fein বিচারক ও বিচারালয়ের কর্ম্মচারীদের ধরে এনে নির্দ্দয় ভাবে দণ্ডিত করতে লাগল। একজন সারকিট জজের [Circuit Judge] দখলে বিচারাধীন মোকদ্দমার একটা ক্যালেণ্ডার Calender পাওয়া গিয়াছিল। বিচারে তাঁর এক বৎসর নয় মাসের কঠোর কারাদণ্ড হল। কর্কের মেয়র (Mayor) Mc Sweeneyর দণ্ড ও জেলে প্রায়োপবেশনে মৃত্যুর কথা এখনও সকলের মনে আছে। কিন্তু এসকল সত্ত্বেও Sinn Fein আদালত বন্ধ হয় নি। বরং ব্রিটিশ আদালত পরিত্যাগ করে এই আদালতেই সকল শ্রেণীর অর্থী প্রত্যর্থী বিচারের জন্য আসত। আইন ব্যবসায়ীরাও ব্রিটিশ আদালত পরিত্যাগ করে Sinn Fein আদালতে ব্যবসা চালাতে লাগলেন। বিচারকার্য্যও এমন সুন্দর ভাবে নিষ্পন্ন হ'তে লাগল যে ইউনিয়নিষ্টরা (Unionists) প্রোটেষ্টাণ্ট বিশপেরা (Protestant Bishops) এমন কি রেসিডেণ্ট মাজিষ্ট্রেটরাও (Resident Magistrates) এর খুব প্রশংসা করতে লাগিলেন। এই সময়ে ১৯২০ সালের বসন্ত কালে একজন জমিদার খুন হয়। গোরুচুরিও অনেক হ'তে লাগল। জানা গেল জমিসংক্রান্ত বিবাদই এর মূল। তখন ব্রিটিশ পুলিস Sinn Fein দমনে ব্যস্ত। এসকল ঘটনার তদন্ত করবার সময় তাদের নাই। এদিগে অপরাধের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। Sinn fein নেতারাই এসম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ভার নিলেন এবং এর যে মূল কারণ জমিসংক্রান্ত বিবাদ তার নিষ্পত্তির জন্য Land Commission নিযুক্ত করলেন। অন্যান্য ঘটনারও যথাযোগ্য অনুসন্ধানাদি করে এইরূপ অশান্তির নিবারণ করলেন।

এ দিকে এই দেশব্যাপী অশান্তির মধ্যেই Sir Horace Plunkett পরিচালিত Co-operative movement খুব সফলতা লাভ করলে। এর ফলে সাধারণ লোকের জীবন অতি শান্ত, শিষ্ট, ও সভ্য ভব্য হয়ে উঠল। এই সকল

(১) সবিশেষ বিবরণের জন্য Talbat press Dublin, কর্তৃক প্রকাশিত The Constructive Work of Dail Eireann দেখুন। দাম 6d. (লেখক)

ঘটনা-বৈচিত্র্য দেখলে আইরিশদের প্রতিভা ও কার্য্যদক্ষতা যে সর্ব্বতোমুখী তাতে আর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এই প্রতিভা বিকাশের ও কার্য্যদক্ষতা প্রয়োগের প্রধান অন্তরায় পরবশতা ও পরবশতা-হেতু শক্তির ও সুযোগের অভাব। এই অন্তরায় তিরোহিত করবার প্রযত্নই Sinn Fein আন্দোলনের প্রাণ।

কিন্তু আইরিশরা যা ন্যায্য প্রাপ্য বলে দাবী করেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তা সহজে দিতে চান না। কোন গবর্ণমেণ্টই নিজের ক্ষমতা, নিজের অধিকার, যা এত কাল নির্বিঘ্নে ভোগ দখল করে আসছেন, সহজে অন্যকে দিতে চান না। কিন্তু এই নিয়ে আয়ারল্যাণ্ডে এত এবং এমন কাণ্ড সব হয়ে গিয়েছে এবং এখনও হচ্ছে যে এক্ষমতা এঅধিকার তাকে না দিলেও আর চলে না। কাযেই মারামারি কাটাকাটি কিছু দিনের জন্য স্থগিত রেখে, উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা উভয় পক্ষের মধ্যে যাতে একটা মিটমাট হয়ে যায় তার চেষ্টা করতে লাগলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা হল। প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাবিত সন্ধির সর্ত্ত ঠিক করতে নিযুক্ত হলেন। অনেক বাদপ্রতিবাদ ও তর্কবিতর্কের পর গত ডিসেম্বর মাসের প্রথমে ব্রিটিশ মন্ত্রীরা কতক গুলি সর্ত্ত ঠিক করে আইরিশ প্রতিনিধিদের হাতে দিলেন। আইরিশ প্রতি-নিধিরা যথা সময়ে তা আইরিশ মন্ত্রি-সভায় উপস্থিত করলেন। কিন্তু আইরিশ মন্ত্রিসভা তা গ্রহণ করলেন না ৪ঠা ডিসেম্বর প্রতিনিধিরা মন্ত্রিসভার উত্তর নিয়ে ডাবলিন থেকে লণ্ডনে ফিরে এলেন। ৫ই ডিসেম্বর সমস্ত দিন এই নিয়ে বিচার, বিতর্ক, মন্ত্রণা পরামর্শ হল। এমন সব সমস্যা উপস্থিত হতে লাগল যে তার যেন-আর সমাধান নাই। উভয় পক্ষই প্রায় হতাশ হয়ে পড়লেন। ৬ই প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় পূর্ব্ব সর্ত্তগুলির সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করে কতকগুলি নূতন সর্ত্ত ব্রিটিশ মন্ত্রীরা প্রস্তুত করলেন এবং পুনর্বিবেচনার জন্য আইরিশ প্রতিনিধিদের হাতে দিলেন। তাঁরা পুনর্বিবেচনা করে দশটার সময় তাঁদের মন্তব্যসহ সর্ত্ত-গুলি নিয়ে মন্ত্রণাগৃহে ফিরে এলেন। তখন যেন সকলের নৈরাশ্যের ভিতরেও একটু আশার আলো দেখা গেল। আবার উভয়পক্ষের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক বাদপ্রতিবাদ হল। পূর্ব্বে যে সকল বাধা দুরতিক্রম্য বলে বোধ হয়েছিল এখন এক এক করে তারা অন্তর্হিত হল। দুটার সময় সকল সমস্যার সমাধান হল, আর কোন মতানৈক্য থাকল না। সাতজন ব্রিটিশ মন্ত্রী ও পাঁচজন আইরিশ প্রতিনিধি উভয় পক্ষ-সম্মত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এই সন্ধি দ্বারা আয়ারল্যাণ্ড স্বারাজ্য লাভ করে Irish Free state হল। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্ত্রনাগৃহে তখনকার ব্রিটিশ মন্ত্রীরা আর এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করেছিলেন যা দ্বারা ইংল্যাণ্ডের আমেরিকান উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে United States of America রূপে আজ সভ্য জগতের শীর্ষস্থানে বিরাজ করছে।

তরুণ ভারতের আহ্বান

কোনো জাতির জাতীয় শিক্ষা বল্‌লে বুঝ্‌তে হবে,' তাদের প্রকৃতি ও চিরাগত প্রথায় স্বভাব-সঙ্গত পন্থায় পরিপুষ্টি লাভের সুযোগ; বুঝ্‌তে হ'বে সেই শিক্ষা, যাহা তাদেরই বিশেষ গুণগুলির বিকাশ ও পরিপোষণের জন্য সেই জাতিরই মনীষিগণ দ্বারা পরিচালিত; বুঝ্‌তে হবে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে, অথচ, মৌলিক কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রেরণা পূর্ণ পরিবেষ্টনীর মধ্যে পরিচালিত যে শিক্ষা, তেমন শিক্ষা; এক কথায় উপনিষদের আদর্শানুযায়ী শিক্ষা, যাহা মানুষকে বাহ্যপ্রকৃতির সহিত নিয়মিত, ও তাহার উপযোগী করিতে গিয়া, অন্তঃপ্রকৃতির যাহা দাবী তাহা অগ্রাহ্য করে না।

ভারতবর্ষে বিগত সহস্র বৎসরের পরাধীনতা শিক্ষাকে অসার করে ফেলেছে, যাহা স্বাভাবিক, যাহা স্বদেশী তাহাই ভুলে', বর্জ্জন করে' বিজাতীয় ভাব ও চালচলনের অভ্যাস ও অনুকরণ হয়েছে এখনকার শিক্ষার নামান্তর। আমাদের শিক্ষকশ্রেণী, তাঁদের শিক্ষাপ্রণালী, যন্ত্রাদি ও শিক্ষাসৌধের আধুনিকতার বিষয়ে গর্ব্বানুভব করছেন। কিন্তু আমাদের ভারতীয় রাজকবি যথার্থ বলেছেন,—"মানব-শিক্ষকের পদ্ধতির অভাব গুরুতর", এবং "দেয়ালগুলোর চাইতেও আমাদের বেশী প্রয়োজন ওদের গায়ের জানালাগুলোর।" আরও, কেবল আধুনিকতাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়—বরং আমাদিগকে শিক্ষার বর্ত্তমানের সীমারও বাহিরে নিয়ে যাওয়া চাই।

প্রথমতঃ বাড়ী ও ইস্কুল' এই দু'য়ের ভেতরে একটা মিলমিশের ভাব থাকা চাই! অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই, গৃহগুলো হয়েছে অচেতন, উদাসীন; আর ইস্কুলগুলোতে হয়েছে, বিদেশীর প্রাধান্য। বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের দেওয়া হয়, অবিবেচিত আদর এবং ভোজন; অথবা অযথা তিরস্কার এবং কঠোর ব্যবহার। ইস্কুলে ছেলেমেয়েদের, তাদের ভিতরকার স্বাভাবিক দীনতা এবং বৈদেশিক সভ্যতার উচ্চতার কথা এত জোরে এবং অবিরাম শুনতে হয় যে এখনো যে আত্মপ্রচারের চেষ্টা এদেশে টেঁকে রয়েছে সেইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়। এমন কি আজকালকার ভারতীয় শিক্ষকরাও যেন আমলা-তন্ত্রের ছাঁচে-ঢালা, তাঁরা যে 'অফিসিয়াল' সে বিষয়ে তাঁরা সজ্ঞান। গৃহে, ইস্কুলে, কেবলই সন্দেহ, কেবলই ভয়। প্রেম, ভগবদ্ভক্তি, জাতীয় আদর্শ, ভিতরের যিনি নিয়ন্তা, শ্রদ্ধাসহকারে তাঁকে মেনে নেওয়া; সকল জানার উপরে ভগবদ্ জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বরিক বৃত্তিনিচয়ের পরিপুষ্টি, যাঁদের হাতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত, তাঁদের উপরে, এই সব বিষয়ের প্রভাব অতি সামান্য। মুখস্থ করার আগ্রহাতিশয্যে আমরা ভুলে' গিয়েছি যে প্রকৃত শিক্ষা মনকে একটা প্রাণবান্ বস্তু বলে স্বীকার করে; এবং মন বাহিরের কাছে যাহা পায় গুণে ও পরিমাণে যা'তে করে' তা'র চাইতেও অধিক প্রতিদান দিতে পারে, তারই চেষ্টা করে। আমাদের মাতাপিতা তাঁদের নিজেদের অভিরুচি ও খেয়ালের বশে চলেন, আর যাঁরা শিক্ষক, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়, তাঁরা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার বাহন, তাঁদের মধ্যে পুস্তকের দোকানের কাগজ-দেবতা, মুখর হয়ে প্রকাশিত।

এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জাতীয় সপ্তাহে ভারতের কতিপয় শিক্ষা-বিভাগের বিশেষজ্ঞ কর্তৃক শিক্ষক ও জনক জননী সংঘ নামক এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং তদবধি এই সংঘ স্নেহ-প্রীতির ভিতর দিয়া শিক্ষাদান পদ্ধতির সুকুশল ব্যবহার, শিশুচরিত্রের পর্য্যালোচনা ও শিশুদের অভাব-অসুবিধার উপলব্ধি এবং এদের

অভ্যন্তরে ঐশ্বরিক জ্যোতির সত্তার সম্ভাবনা, ইত্যাদি বার্ত্তা প্রচার করে আসচে। বক্তৃতা, ম্যাজিক লণ্ঠন, ইংরাজী ও দেশীয় ভাষাসমূহে লিখিত সাহিত্য প্রচার ইত্যাদিদ্বারা এই সংঘ ভারতভূমির সর্ব্বত্র শিক্ষক ও জনকজননী মণ্ডলীর নিকটে ভাবী বংশধরদের শিক্ষার সত্য ধারণা ও প্রকৃষ্ট প্রণালীর কথা শুনিয়ে আসছেন।

সমগ্র ভারত, সিংহল এবং ব্রহ্মদেশের বহু শিক্ষিত নরনারী এই সংঘের সভ্য ও পরিপোষক শ্রেণীভুক্ত। তরুণ ভারতের আহ্বান শোনবার মতো অবস্থা যদি আপনাদের থাকে, এবং উদীয়মান দেশরথীদের আশা আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করবার মতো হৃদয় যদি আপনাদের থাকে, তা' হ'লে অচিরে এই সংঘের প্রকাশিত সাহিত্য সংগ্রহ করুন এবং সংঘের নিরূপিত গ্রন্থাদি পাঠ করে' ইস্কুলে ও গৃহে বালক বালিকাদের বর্ত্তমান দুর্ভাগ্যের সুপরিবর্ত্তনের চেষ্টা করুন।

আধ্যাত্মিকতার লীলাভূমি এদেশের ভবিষ্যৎ মহান্। পৃথিবীর সমগ্র সভ্যজাতির নিকট শান্তি, প্রেম ও একতার বাণী প্রচারের জন্ত ভগবান্ এই দেশকে ভার দিয়েছেন। এই আশার পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুযায়ী আমাদের প্রচেষ্টাও হওয়া চাই। আজ যাহারা শিশু, কাল তাহারা হ'বে দেশ-নায়ক। ইহাদিগকে, সুনিয়ম, আনন্দ ও একতার পরিবেষ্টনীর মধ্যে গড়ে' তোলাই হ'বে আপনাদের ঈপ্সিত নিশ্চিত ও নীরব সাধনা। ভারতমাতা আপনাদের কাছে ইহাই প্রত্যাশা করেন। *

বিরাজ বৌ

[শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়]

বিরাজ যখন নয় বৎসরের বালিকা, তখনই তের চৌদ্দ বছরের বালক নীলাম্বরের সহিত তাহার বিবাহ হয়। এই সময় হইতেই নীলাম্বর বিরাজকে ভালবাসিত এবং তখনই হইতে—ভাল করে জ্ঞান বুদ্ধি হবার পূর্ব্বেই বিরাজ তাহার প্রাণটি নীলাম্বরকে দিয়াছিল।' নীলাম্বর বাবাকে লুকাইয়া, মাকে লুকাইয়া, বিরাজকে দিয়া তামাক সাজাইয়া লইত, তাহার কাণ মলিয়া দিত, মারিত এবং বিরাজও একদিন মার খাইয়া নীলাম্বরের পেট কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। এইরূপ ঝগড়াঝাঁটী ও মার পিটের মধ্য দিয়াই তাহাদের ছেলে বেলার ভালবাসা অভিব্যক্ত হইত। ক্রমে উভয়ের প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া উঠিল; নীলাম্বর 'গায়ে হাত দিয়া টের না পাইলেও বিরাজ নীলাম্বরের দেহের সঙ্গে মিশিয়া গেল।'

কয়েক বৎসর পরেই বিরাজের শ্বশুর মারা গেলেন, পরে তাহার শাশুড়ীও একদিন তাঁহার তিন বছরের মেয়ে পুঁটীকে বড় ব্যাটার হাতে সঁপিয়া দিয়া স্বর্গারোহন করিলেন। তাহার পর হইতেই বিরাজ গৃহিনী। পনের ষোল বছর বয়সে বিরাজের একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়া আঁতুড়েই মরিয়াছিল, সেই অবধি সে নিঃসন্তান; পুঁটিকেই নিজের মেয়ের মত মানুষ করিয়া আসিতেছে। এই সময় হইতেই বিরাজের চরিত্রের সমস্ত দিকগুলি আমাদের চোখে পড়ে।

বিরাজের চরিত্র আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই

* প্রীতি ও সহানুভূতিকে একমাত্র আদর্শ করিয়া শিশু-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার জন্ত মধ্যভারতবর্ষের গোয়ালিয়রে "শিক্ষক ও জনক জননীসংঘ" স্থাপিত হইয়াছে। অধ্যাপক আর, কে, কুলকর্ণী তার সম্পাদক। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা শিশু-শিক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থার কথা প্রচার করিতেছেন। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ এবং ইহার প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তকাবলি—ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট ১১ নং কলেজ স্কোয়ারে পাওয়া যায়। উঃ সঃ

আমরা দেখিতে পাই যে, শরৎচন্দ্রের 'বিন্দু' 'সন্ধ্যা' 'সৌদামিনী' 'শৈল' 'কুসুমের' মত বিরাজও যেন অভিমানিনী। এইরূপ একটা অভিমানের মধ্য দিয়া চরিত্রগুলি ফুটাইয়া তোলা শরৎচন্দ্রের একটা বিশেষত্ব। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলির যে একটা প্রাণ আছে, তাহা যেন আমরা এই খানটাতে হাত দিলেই টের পাই। বিরাজের এই অভিমানের মধ্য দিয়াই আমরা দেখিতে পাই তাহার চরিত্রের বিকাশ ও পরিণতি। তাহার এই অভিমান আমরা তাহার ছোট বেলাতেও দেখিতে পাই। ছেলেবেলায়, অসুখ হওয়ায় এক দিন সে দোর দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; নীলাম্বর তাহার অসুখের কথা বিশ্বাস না করিয়া, দোর খুলিয়া দিতে দেরী হওয়ার জন্য বিরাজকে মারিতে উঠিয়াছিল; সেই দিন বিরাজ ইষ্টদেবতার নাম ক'রে দিব্যি করিয়াছিল, স্বামীর সঙ্গে আর কোনদিন কাটাকাটি না তর্ক করিবে না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই অভিমান বাড়িয়াই চলিয়াছিল। পুঁটীর প্রতি তাহার স্নেহ স্বামীর প্রতি তাহার ভালবাসা, সবই আমরা বিরাজের এই অভিমানের মধ্য দিয়া দেখিতে পাই। বিরাজ পুঁটীকে পোড়ামুখী বলিয়া গাল দিলেই যেন আমরা বুঝিতে পারি সে পুঁটীকে কত ভালবাসে।

আদর্শ হিন্দুরমনীর কাছে স্বামীই সব, স্বামী ভিন্ন সে কিছুই জানে না। বিরাজও আদর্শ পতি-পরায়ণা। তাহার স্বামীভক্তি বলিয়া বুঝান যায় না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জিনিষ। স্বামী কেন রোগা হইয়া যাইতেছেন, কেন তিনি খাইতে পারেন না, কেন তাঁহার গা গরম, এই চিন্তাই বিরাজের সর্ব্বদা। মনে তাহার স্বামীভিন্ন কোন চিন্তা নাই, দেহ তাহার স্বামী সেবায় চিররত। তাই সে স্বামীকে বলিতে পারিয়াছিল, "তুমি গুণে একটী ভাত কম খেলে আমি বলে দিতে পারি, রতি পরিমাণে রোগা হলে আমি গায়ে হাত দিয়ে ধরে দিতে পারি।" গ্রামে যখন ঘরে ঘরে বসন্ত দেখা দিল, তখন স্বামীর একটু জ্বর হওয়াতেই বিরাজ যে দিন মা-শীতলার পূজা দিয়া উপবাস করিয়াছিল, সেই দিন নীলাম্বর অসন্তুষ্ট হইয়া যখন বলিল, "এই গুলো তোমার পাগলামি নয়!" তখন বিরাজ উত্তরে বলিয়াছিল, "মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতেত বুঝতে স্বামী কি বস্তু!" বস্তুতঃ স্বামী যে কি বস্তু বিরাজ তাহা বুঝিয়াছিল। পুঁটীকে বিরাজ মানুষ করিয়াছে, 'পুঁটী আমার সুখী হো'ক' ইহা সে চায়, কিন্তু পাছে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া, পুঁটীর বিবাহ দিয়া, স্বামী অভাবে কষ্ট পান, এই ভয়ে বিরাজ বড় ঘরে পুঁটীর বিবাহ দিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু নীলাম্বর তাহার মা বাপ মরা বোনটীকে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া ঋণকরিয়া বিবাহ দিয়াছিল। ভগিনীর বিবাহের পূর্ব্বেই পীতাম্বর বিষয় ভাগ করিয়া লইয়াছিল। নীলাম্বর একাই ঋণের চাপে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। পতিপ্রাণা বিরাজ স্বামীর এই অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন বলিল, "কি খেলে মরণ হয় বলে দিতে পার? হয়, বলে দাও, না হয় আমাকে খুলে বল কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্ছ?" বিবাহের সর্ত্ত পূরণ করিতে করিতে নীলাম্বরের জমি বন্ধক পড়িল, ক্রমে তাহার সব বিক্রয় হইয়া গেল। অভাবে দুঃখে নীলাম্বরের মূর্ত্তি বিরাজের চোখের সামনে কালী হইয়া যাইতে লাগিল। সেই মূর্ত্তি, সেই মুখের পানে চাহিয়া বিরাজের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, বিরাজের সমস্ত সৌন্দর্যের বড় সৌন্দর্য্য তার হাসি কোথায় লুকাইয়া গেল; উপায়ন্তর না দেখিয়া, রাত্রি জাগিয়া গোপনে মাটীর ছাচ তৈয়ারী করিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া বিরাজ দিনপাত করিতে লাগিল। এত কষ্ট সত্ত্বেও, যেদিন নীলাম্বর বিরাজকে কিছুদিনের জন্য মামার বাড়ী যাইতে বলিল, এবং ছোট বৌও ঐ অনুরোধ করিল—সেদিন বিরাজ ছোট বৌকে বলিল, "ঘুম ভেঙ্গে উঠে ওর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারবো না।"—এমনি পতিগতপ্রাণা বিরাজ। ইহারই মুখে বলা সাজে "আমার মত সতী আরও সংসারে থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে একথা মানিনে।"

বিরাজ অসামান্যা রূপবতী ছিল, কিন্তু রূপের গর্ব্ব তাহার ছিল না। এই রূপের কথা প্রসঙ্গে যে দিন বিরাজ সুন্দরীর দুরভিসন্ধির সন্ধান পাইল, সেই দিনই সুন্দরীকে তাড়াইয়া দিল। আবার এইরূপের উল্লেখ করিয়া যেদিন

নীলাম্বর বলিয়াছিল, "তোমার মত কটা মেয়েমানুষ এমন নির্গুণ মুর্খের হাতে পড়ে?" সেইদিন বিরাজ রাগিয়া বলিয়াছিল "তুমি কি মনে কর আমি এইসব কথা শুনে খুসি হই? এই যেমন রাজরাণী হতে পারতুম তোমার হাতে পড়েই এমন হয়েছি। রূপ, রূপ, রূপ, তুমি স্বামী তুমিও কি এর বেশী আমার আর কিছু দেখনা?"

বিরাজ নিজের মুখে তাহার যে সতীত্বের গৌরব করিত সে সতীত্ব কত বড়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি সেই দিন যে দিন গ্রামের জমিদার-পুত্র রাজেন্দ্রকে বিরাজ মুখের মত লাথি মারে। রাজেন্দ্র এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে 'হুইস্কির ফ্ল্যাস্ক পিঠে বাঁধিয়া, বন্দুক ও চারি পাঁচটা কুকুর লইয়া নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়া সিক্তবসনা বিরাজকে দেখিয়া পতঙ্গের ন্যায় তাহার রূপের আগুণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বিরাজ তাহা জানিত; কিন্তু একটা কুকুরের ভয়ে সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে চাহিল না।'

বিরাজের দেহে 'আর একটা বস্তু ছিল, সে তাহার অপরিমেয় সাহস।' গ্রামের জমিদার পুত্র রাজেন্দ্রকেও সে ভয় করিতনা। যে কায়মনবাক্যে সতী, তাহার আবার ভয় কি? তাই সেদিন, অতি প্রত্যূষে ছোট বৌকে লইয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়া যখন দেখিল, অদূরে রাজেন্দ্র কুমার দাঁড়াইয়া, তখন রাজেন্দ্রকে সে বলিতে পারিয়াছিল, আপনি ভদ্রসন্তান, বড়লোক, একি প্রবৃত্তি আপনার? আপনি যে কতবড় ইতর তা ঐ ঘাটের প্রত্যেক কাঠের টুকরা পর্য্যন্ত জানে, আমিও জানি।"

নীলাম্বর বিরাজকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত, কারণ তাহার এই সতী সাধ্বী গৃহলক্ষ্মীকে সে চিনিত। জমিদারের ছেলের সঙ্গে ঘাটে এই কথা কহা ব্যপারটা লইয়া পীতাম্বর যখন দাদার কাছে আসিয়া, বিরাজের চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিতে লাগিল, তখন নীলাম্বর তাহাকে ধমকাইয়া বলিল, কি করে জানলি যে তার কথা কহিবার আবশ্যক ছিল না।" তারপর বিরাজ যখন জিজ্ঞাসা করিল, "সব কথা বিশ্বাস করেছ?" নীলাম্বর তখন উত্তর করিল, "শুধু এই টুকু বিশ্বাস করেছি যে, তুমি তার সঙ্গে যখন কথা কয়েছ, তখন অনেক দুঃখেই কয়েছ। সে কথা ও ছাড়া আর কি হ'তে পারে বিরাজ?" বিরাজের উপর এমনি প্রগাঢ় বিশ্বাস নীলাম্বরের। বিরাজের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কয়জন স্ত্রীর এমন স্বামী-সৌভাগ্য ঘটিয়া থাকে!

কিন্তু বিরাজের দারুণ অভিমানই একদিন তাহার সর্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়াইল। গাঁজায় জ্ঞান হারাইয়া যে দিন নীলাম্বর বিরাজের উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস হারাইয়া, তাহার সতীত্বের উপর কটাক্ষ করিল, সেই দিন অভিমানিনী বিরাজ তাহার সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিল। জ্বরে, দুশ্চিন্তায়, অনাহারে মৃতকল্পা স্ত্রীকে প্রবঞ্চনা করিয়া নীলাম্বর শবদাহ করিতে গিয়াছিল, এ দুঃখে, এ অভিমানে বিরাজ কেবল যমকেই ডাকিতেছিল। কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও যখন তাহার মনে হইল, "স্বামীর সারাদিন খাওয়া হয় নাই," অথচ ঘরে চা'ল নাই, তখন বিরাজ, জীবনে কোন দিন যাহা করে নাই, তাহাই করিল, অন্তরালে চাঁড়ালবাড়ী চাল চাহিতে গেল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল স্বামী আসিয়াছে। নীলাম্বর গাঁজা খাইয়া আজ বেহুঁস হইয়া গিয়াছিল। বিরাজ আসিতেই তাহাকে নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, "শোন, এত রাত্তিরে একা কোথায় গিয়েছিলে?" পাছে স্বামীর খাওয়া না হয়, এই জন্য বিরাজ সত্য গোপন করিতে চাহিল; কিন্তু নীলাম্বর যখন তাহার অমূল্য চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়া ভীষণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না শুনে, তোমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত আমি খাব না।" তখন অভিমানিনী বিরাজ আর সহ্য করিতে পারিল না। সে অনেক কথা শুনাইয়া দিল; নীলাম্বর ক্রোধে অন্ধ হইয়া বিরাজের মাথায় পানের ডিবা ছুড়িয়া মারিল; রক্তে বিরাজের মুখ ভাসিয়া গেল। সব সহ্য করিতে পারিত বিরাজ, কিন্তু স্বামী তাহার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিয়াছে, ইহা কেমন করিয়া সহ্য করিবে? দুঃখে, অভিমানে, ঘৃণায়, বিরাজ, 'তাহার সব চেয়ে বড় লোভ, স্বামীর পায়ের নীচে মরিবার লোভটা' পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, গৃহ ছাড়িয়া অন্ধকারে মিশাইয়া গেল।

অনেকে এই জন্য বিরাজের উপর দোষ দেন, বলেন, এতদূর করা বিরাজের মত সতীর উচিত হয় নাই। তাঁহারা বলেন, নীলাম্বরের ও-সন্দেহ হইবারই কথা। এত

রাত্রিরে বাড়ীর বাহির হওয়া, ও তাহার কারণ গোপন করায় নীলাম্বরের মনে পীতাম্বরের সেই ঘাটের ব্যাপারের কথাগুলি আজ নূতন অর্থ লইয়া আসিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে যোগ দিল বিরাজের ইদানীন্তন উদাসীন ভাব এই তিনটীতে মিলিয়া নীলাম্বরের মনে সন্দেহ এখানে সম্ভব নয় কি? বিরাজ কেন সত্য কথা স্বীকার করিল না?” বিরাজের গৃহত্যাগ যে অন্যায় হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু ইহা বিরাজের অনুরূপই হইয়াছিল, সে যে কতদূর অভিমানী, তাহাত ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়! যার জন্য চুরি করে, সেই চোর বলিলে মানুষের অভিমানের সীমা থাকে না। যে বিরাজ এত স্বামীপরায়ণা, তাহার উপর স্বামী কোন ক্রমেই সন্দেহ করিতে পারেন, এই চিন্তাটাই বিরাজ সহ্য করিতে পারিত না। তাই যখন সে দেখিল, স্বামী তাহার উপর সন্দেহ করিতেছেন, তখন সে আরও গোঁ ধরিয়া বসিল, কিছুতেই বলিবেনা!...শেষে নীলাম্বরের নৃশংস অত্যাচারেই সে গৃহত্যাগ করিল।

বিরাজ গৃহত্যাগ করিল বটে, কিন্তু সে ‘সূর্য্যমুখীর’ মত ফিরিয়া আসিতে পারিত, কিম্বা মরিতে পারিত - ভাগিনী বিরাজ দুইএর মধ্যে কিছুই করিল না। আজ ক্রোধে ও অভিমানে মিলিয়া যে আগুণ জ্বালিয়াছিল, তাহাতে তাহার হৃদয়-রত্নখানি পুড়িয়া ছারখার হইয়া গেল। সে তাহার ‘পরমনিধি’ সতীত্বের মর্য্যাদা কমাইতেও দ্বিধা করিল না।

গৃহছাড়িয়া নদীতীরে আসিয়া বিরাজ প্রথমে আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হইল। দারুণ অভাবের দিনে, ‘স্বামীর পাতে শুধু ভাত দিতে না পারিয়া’ বিরাজ আর একদিন, আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা এড়াইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু সেদিন সে আত্মহত্যা পাপ মনে করিয়াছিল—আজ সে পাপের কথা মনে হইল না; ঘাটে আসিয়া হাত পা বাঁধিতে লাগিল। হঠাৎ ঘাটের ওপারের মাচাটার উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। সেই সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল, স্বামীর সেই কথা—“তোমার ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত খাব না”। ঐ কথা কয়টি আলোচনা করিতে করিতে তাহার মন আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। “এ অপমান যেথকরি, স্বয়ং নারায়ণও সহ্য করিতে পারিতেন না।” ভাবিতে ভাবিতে বিরাজ স্বামী ভুলিল, মরণ ভুলিল, এক দৃষ্টে, প্রাণপণে ওপারের ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল, রাজেন্দ্রের কথা বিরাজের মনে উদয় হইল, সহসা সে ভীষণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্য্যন্ত খাবে না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবেত! বেশ!” এই ভাবিয়া সে ঐ ‘পাপিষ্ঠের’ কাছে যাইবার জন্য সুন্দরীর নিকটে গেল। সেই রাত্রিতেই রাজেন্দ্র বিরাজকে লইয়া বজরায় চড়িয়া যাত্রা করিল।

বিরাজ যে এ কাজ করিল, সে তখন অভিমানে জ্ঞান হারাইয়াছিল। কি করিতেছিল, তাহা সে জানিত না—, সে শুধু স্বামীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই একটা কিছু করিল, কি সেটা, তাহার পরিণাম কি তাহা সে ভাবিল দেখিল না। সে মন্ত্রচালিতের ন্যায় আসিয়াছিল, মন্ত্রচালিতের ন্যায় নৌকায় উঠিয়াছিল, প্রস্তরীভূতের ন্যায় বসিয়াছিল হঠাৎ রাজেনের কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল, যেন সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইল—সতী সাবিত্রীর মত সতী সে একি করিতে বসিয়াছে! তাহার ‘দুই চোখ্ ও রক্তমাখা সিঁথির সিঁদুর চামুণ্ডার ত্রিনয়নের মত জ্বলিয়া উঠিল’ ‘মাগো একি করলুম গো!”—বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দীর্ঘকাল বাত-শ্লেষ্ম-বিকারে হাসপাতালে পড়িয়া থাকার পর যখন বিরাজের জ্ঞান হইল, তখন ধীরে ধীরে তাহার অতীতের কথা মনে পড়িল, যেন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। ঘুম ভাঙ্গিলে সে যে উঠিয়া স্বামীর মুখ না দেখিয়া একটি দিনও থাকিতে পারে না। তখনই বাড়ী যাইবার জন্য তাহার মন কাঁদিয়া উঠিল; একবার ভাবিল, সে যে পাপ করিয়াছে। তারপর মনে হইল, অন্তর্যামী জানেন যথার্থ পাপ সে করে নাই। তথাপি যেটুকু করিয়াছিল, এতদিনের স্বামী সেবায় সেটুকুও কি মুছিবে না! এই আশায় ভর করিয়া বিরাজ চলিতে লাগিল, ‘তাহার শতছিন্ন বস্ত্র জটা বাঁধা রুক্ষ একটুখানি চুল মলিন ভিক্ষাকন্ধ একখানি ছোট কাঁথা গায়ে।’ আবার তাহাকে রোগে ধরিল, তার উপর পথশ্রম, অনশন, অর্দ্ধাশন ক্রমে আর সে, চলিতে পারে না! জীবনে তাহার দুইটী সাধ ছিল—এক সাধ, শেষ সময়ে স্বামীর কোলে যেন মাথা

রাখিতে পারে ; আর এক সাধ, সীতা সাবিত্রীর মত হয়ে মরণের পর সে যেন তাদের কাছেই যায়। আজ তাহার ভয় হইল কোন সাধই বুঝি মিটিল না ! ছোটবেলা হইতেই তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, দেহ নিষ্পাপ না হইলে কেহ স্বামীর পায়ে মরিতে পায় না। তাই, একবার দেহটা যাচাই করিয়া লইবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু যতটুকু পাপ বিরাজ করিয়াছিল, ইহাতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট হইয়াছিল তাই ভগবান্ তাহার সাধ মিটাইলেন। অতিকষ্টে বিরাজ তারকেশ্বর পৌঁছিল। এধারে, বিরাজকে হারাইয়া অবধি, মণিহারা ফণির ন্যায় নীলাম্বর তীর্থের পর তীর্থ ঘুরিয়া অবশেষে তারকেশ্বরে পৌঁছিল। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে অজ্ঞাতসারে নীলাম্বর বিরাজের রুগ্নহাত খানি মাড়াইয়া ফেলিল, বিরাজ স্বামীর চরণতলে স্থান পাইল।

নীলাম্বর ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে আনিল, কিন্তু বাঁচাইতে পারিল না। বিরাজ বুঝিল তাহার দেহ নিষ্পাপ হইয়াছে তাই সে স্বামীর চরণতলে মরিতে পাইতেছে। বুঝিল ভগবানের কি অসীম দয়া ! এখন আর তাহার কোন দুঃখই ছিল না সে সুন্দরীকেও ক্ষমা করিল। একদিন সকলকে কাঁদাইয়া সীতাসাবিত্রীর মত সতী বিরাজ তাদের কাছেই চলিয়া গেল। নীলাম্বর একদিন দুইহাত জোড় করিয়া ভগবানকে বলিয়াছিল, "ভগবান্ আমার যা আছে সব নাও কিন্তু আমার একে নিও না।" ভগবান্ আজ আর তাহার সে কথা শুনিলেন না।

অভিমানিনী বিরাজ পাতিব্রত্যের, সতীত্বের আদর্শ। তাহার নিজের মুখের কথাতেই বলিতে ইচ্ছা করে সতীত্বে সে কারো চেয়ে এক তিল কম নয়, তা তিনি সাবিত্রীই হন্ আর যেই হন্, হলেনই বা তিনি দেবতা।

বিরাজ কত বড় সতী, বুঝিয়াছিল ছোটবৌ মোহিনী। তাই সে বিজয়ার দিন বিরাজকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল "শুধু এই আশীর্বাদ কর দিদি, যেন তোমার মত হতে পারি তোমার মুখে আর কোন আশীর্বাদ পেতে চাইনা।" মোহিনী জানিত, বিরাজ দেবতার অংশ ছিল ; তাই সে একদিন দেওয়ালে টাঙ্গান অন্নপূর্ণার ছবির দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল "দিদি ওর অংশ ছিলেন একথা আর কেউ জানুক আর নাই জানুক আমি জানি।"

বিরাজের পতিভক্তি কত বড় তাহা জানিত নীলাম্বর। তাই সে নিজের দোষে বিরাজকে হারাইয়া অবধি, তাহার অভাব হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিল। তাই সে একদিন বিরাজকে জন্মের মত হারাইয়াছে ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল "নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালুম ভগবান্ করুন পরজন্মে যেন তাকে পাই।"

বিরাজ কত বড় স্নেহময়ী ছিল, বুঝিয়াছিল পুঁটী, যাহাকে বিরাজ পোড়ামুখী, কালী বলিয়া গাল দিয়া, আদর করিত। তাই পুঁটী বিরাজের শেষ সময়ে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল "তুমি ম'রো না বৌদি' আমরা কেউ সইতে পারবো না। তোমার দুটী পায়ে পড়ি বৌদি আর দুটো দিন বাঁচ।"

আত্মশক্তির উদ্বোধনেই ভারতবর্ষের মুক্তি—সে মুক্তি-সম্পদের অধিকারী একা ভারত নয়, সমগ্র বিশ্ব—তাই বিশ্ব-ভারতের মহাযজ্ঞ আজ নিখিল নর-নারীর আহুতি চায়।

উপাসনা

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ   চৈত্র ১৩২৮   ৯ম সংখ্যা

আলোচনী

প্রবাসী-সাহিত্য *

প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাবের আদান প্রদানের আপনারা যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা যদি স্থায়ী হয় তাহা হইলে সকলেরই মঙ্গল। সাহিত্য জিনিষটা বইয়ের নহে, জীবনের। তাই প্রবাসী বাঙ্গালীর সাহিত্য চর্চা প্রবাস জীবনের ছাপে অঙ্কিত হইবেই। জীবনটা প্রবাসে আর এক রকম আকার ধারণ করে। সেই আলাদা রূপটাকে ফুটাইয়া তুলা প্রবাসী সাহিত্যের কাজ। বাঙ্গালার সেই চির-কলতান উদার গঙ্গার তীরে শান্তির নীড় পল্লীগ্রামে যে ধীর মন্থর গতিতে জীবন প্রবাহ চলিতেছে তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাণ। একদিক হইতে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান নব-নাগরিক সাহিত্য বাঙ্গালা দেশের পোষাকী-সাহিত্য তাহা পাশ্চাত্যের আমদানী টেবিল চেয়ার ও চায়ের পেয়ালা সজ্জিত ড্রইং রুমের জিনিষ। তাই তাহা তত নিবিড়ভাবে এখনও বাঙ্গালী জাতির প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। এবং তাই যাহা স্বাভাবিক, সহজ সরল জীবনকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়াছে, যেমন তারক গাঙ্গুলী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, নিরুপমাদেবী, জলধর সেন ও নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গল্প উপন্যাস তাহা আমাদের জীবনের আদরের সামগ্রী হইয়াছে। কলিকাতার বৈঠকখানার সাহিত্য নহে। প্রবাসী সাহিত্যে কৃত্রিমতার ভয় খুব বেশী কারণ প্রবাস-জীবন বড় কৃত্রিম হয়—তাহার সঙ্গে বাঙ্গালার সমাজ, ধর্ম্ম ও ইতিহাসের সাক্ষাৎ যোগাযোগ যে নাই।

বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের সেই সহজ সরল জীবনের রসবোধ যাহা বাঙ্গালার লোকসাহিত্যের প্রাণ তাহা আমাদের এখানে ঘটিয়া উঠে না। কারণ এখানে আমরা গ্রাম ছাড়িয়া সহর-বাসী। বাঙ্গালাদেশের সেই গরু-চরা মাঠ, ছায়া-ঢাকা খেয়াঘাট, বনে-ঘেরা কুটিরের নিত্য নূতন রস উৎসবের মাদকতা হইতে আমরা বঞ্চিত। সেখানকার সেই সুন্দর রসভরপুর মধুর জীবন প্রাতঃকালের অবকাশের মধ্যে কত অশ্রু-সজল ভৈরবীগানে পথহারা পথিক পরাণ-

* কানপুর বঙ্গ-সাহিত্য সমাজের অধিবেশনে পঠিত।

তরুণ হৃদয়কে কাঁদাইতেছে, মধ্যাহ্নের কর্ম্মক্লান্তির আবেশে কত ভাটিয়াল, কত গম্ভীরা, কত বাউল, কত প্রসাদীগানে ক্ষুধা তৃষ্ণার অন্নজল দিতেছে এবং ঝিল্লী-মুখরিত রাত্রের নিস্তব্ধতার মধ্যে কত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের কত কাহিনী শুনাইয়া কত সুখ দুঃখের আশা নিরাশার বিহ্বলতাকে নিবিড় ঘুমের মধ্যে সজাগ রাখিতেছে।

যুগ-যুগান্ত কালের ইতিহাসলব্ধ সে রসবোধের সাড়া আমরা বিদেশে পাইব না। নাই বা পাইলাম। আমাদের ত বাঙ্গালীর চোখ আছে, বাঙ্গালীর চোখ দিয়া আমরা প্রকৃতির অপরূপ খেলা মানবজীবনের অবিরাম লীলা দেখিব, আমাদের ত বাঙ্গালীর প্রাণ, আজ নিখিল বিশ্বকে এখানে আমরা বাঙ্গালীর প্রাণের রূপে গড়িব।

বাঙ্গালীর চিন্তার যে মূল সূত্র সে বহুর মধ্যে এক এবং একের মধ্যে বহুকে জ্ঞানের দ্বারা নহে, হৃদয়ের অনুভূতির দ্বারা, প্রেমের দ্বারা অনুসন্ধান করে তাহা এখানেও আমাদের নিকট বিচিত্র রসবস্তু আনিয়া দিবে। কবীরের মায়াবাদ এক এবং সুরদাসের নীতির মূল প্রস্রবণ আর এক। এখানে ভক্তি জ্ঞানের সঙ্গে অতি নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। মানব জীবনের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা ভয় ও ভালবাসা এখানে সেই এক ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা—তাঁকে ভজন কর, ধ্যান কর তিনি সমস্ত অজ্ঞানের অন্ধকার-জাল দেবেন। এই হল যুক্ত প্রদেশের আত্মার বাণী।

এর সঙ্গে বাঙ্গলার বিহ্বলতা, বাঙ্গালার আত্মনিবেদন, মধুর ভাবের আকাশ পাতাল প্রভেদ। তুলসীদাসের রামায়ণ ও কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব—জাতিগত সাধনার বিশিষ্টতা। তুলসীদাসের দার্শনিক ব্যাখানের পরিবর্ত্তে আমাদের কৃত্তিবাসে পাই হাস্যরস। যেমন অঙ্গদ-রায়বার ও লবকুশের কথা কাটাকাটি। শান্ত সংযত আরাধনার পরিবর্ত্তে পাই ভক্তের দুর্গোৎসব। বাঙ্গালীর ভাব-সাধনা রামায়ণের ঘটনা পরম্পরায় কত না মধুর রস, কত না ভক্তির লীলা-খেলা কত না বিরহ মিলনের অবিরাম পর্য্যায় খুঁজিয়া পাইয়াছে।

বাঙ্গালার ও যুক্ত প্রদেশের একটা মিলন কেন্দ্র তবুও আছে, তাহা হইতেছে বৃন্দাবন লীলা কিন্তু ব্রজবিলাস কাব্যে যাহা কৃত্রিমতা ও ইন্দ্রিয় ভোগের স্পর্শ দেয় তাহা বাঙ্গালাদেশে কত না নিবিড় ও তুরীয় রসভোগের আশ্রয় হইয়াছে। বৃন্দাবন ত আমাদের বাঙ্গালা দেশেরই মত শস্যশ্যামল শ্যাম সুন্দর—নদিয়ার গৌরনিতাই বাঙ্গালাদেশের অন্তঃস্থলে বৃন্দাবনকে আনিয়া যুক্ত প্রদেশের একদিককার ভাবসাধনার সহিত আমাদের সাধনার মিলন সংঘটন করিয়াছেন—এই সাধনা এ দেশে এক সময় খুব পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, এখন তাহা জন সমাজের কুরুচির গভীর অতলে পড়িয়া রহিয়াছে। এদিককার লোক-সাহিত্যে কবীর সুরদাসের নহে—বাঙ্গালী আপনারই প্রাণের সতেজ স্পন্দন শুনিবে। তাই যুক্ত প্রদেশ বাসীর মধ্যে আমাদের অতুলনীয় অতুল প্রসাদ সেন মহাশয় বাঙ্গলার সাহিত্যকে মনোরম সম্পদ দান করিয়াছেন তাঁহার গীতিকবিতায়। তাঁহার গীতিকাব্য হইতেছে বাদলরাতের এক প্রহেলিকাময় অভিসার—মানব ও ভগবৎপ্রেমের এক ব্যাকুল সমাবেশ—কিন্তু লক্ষ্ণৌর ঠুংরীর সেই চঞ্চল চরণ-ভঙ্গ যাহা বাঙ্গালার কাব্যে নাই তাহা তিনি অর্জ্জন করিয়াছেন, যুক্ত-প্রদেশের সেই রংয়ের হোলি খেলায় তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতি চুনীর গানগুলি মানবপ্রেমের অদ্ভুত অনুভূতির বিচিত্র রঙে রঙীন করিয়াছেন, আর ইহাদিগকে গ্রথিত করিয়াছেন তিনি এ দেশের লোকচৈতন্যের প্রথিত একটি মোটা সূতোতে। ইহা হইয়াছে প্রবাসী সাহিত্যের একটা সহজ সুন্দর দান।

পুরাতন রূপক, ভাষার কৃত্রিমতা ও অত্যুক্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া একই রসকে একই আখ্যান বস্তুকে আশ্রয় করিয়া সুন্দর সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে, এবং ইহাতে বাঙ্গালী ও অযোধ্যাবাসীর দুইয়েরই প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইবে। ইহার ফলে বাংলা ও যুক্ত-প্রদেশের সাহিত্যের দুইয়েরই পুষ্টিলাভ। এখানকার সাহিত্যে যাহা কিছু পুরাতন, গতানুগতিক ও কৃত্রিম তাহা ঝরিয়া যাইবে, অপরদিকে লোকসাহিত্যের সহজ সরল ভাব আমাদের নব-নাগরিক সাহিত্যকে নূতন রসসঞ্চারে অভিষিক্ত করিবে।

যুক্ত-প্রদেশের ভাবধারা আর একদিক হইতে বাঙ্গালার সাহিত্যকে পুষ্টিবিধান করিতে পারে। উর্দ্দু সাহিত্যের যে তীব্র ভাবোন্মাদ তাহা সংস্কৃত শিক্ষা দীক্ষার পরিপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে নাই। সে ভাবোন্মাদ মরুভূমির তৃষ্ণার মত জ্বালাময়—তাহার জন্ম পশ্চিম এসিয়ার মরুভূমিতে। কিন্তু এই জ্বালাময় আকাঙ্ক্ষাকে সুফীগণ বড় মধুর রসে আপ্লুত করিয়াছিলেন। কখন যে সাকী পিপাসার্ত্ত পথিকের পিয়ালা ভরিয়া দিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া দিবে। বেদনাতুরের অঙ্গে শ্রান্তির হস্ত বিলেপণ করিবে জানি না, কিন্তু এটা জানি যে এই জগৎটাই একটা প্রকাণ্ড সরাই আর জগতের প্রত্যেক জীবই বেদনাক্লিষ্ট, ক্লান্ত পথিক। তাই একদিন নিশ্চয়ই জীবনের শ্রান্ত অপরাহ্নে যখন পশ্চিম আকাশ ভরা পিয়ালার রঙের মত লালে লাল তখন পথের সীমানায় অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে কুম্ভ ভরিয়া আনিয়া সাকী সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে—তখন হয়ত পথিকের জীবনের সেই শেষ সার্থকতার সাক্ষী আর কেহ রহিবে না তাহাদের দুজনের প্রেমবিহ্বল নেত্র ছাড়া। এই রসবস্তু ত এদেশের অতি পরিচিত—বাংলার লোক সাহিত্যের হরগৌরীর মায়া মমতা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন—রাধার অভিসার হইতেও ইহা স্বতন্ত্র।

এইগুলি হইতেছে রস-বস্তু হিসাবে বিশ্বের সামগ্রী, শুধু বাংলার নহে। এবং প্রবাসী সাহিত্য যদি বাংলাদেশকে এই রস ও আখ্যান-বস্তুর সহিত পরিচয় করাইয়া দেয় তাহা হইলে বিশ্ব সাহিত্যেরও ভাব সম্পদ পুষ্টিলাভ করিবে সন্দেহ নাই। এখানকার গ্রামে গ্রামে যে সকল ইতিহাস যে সকল ভক্তের কাহিনী, যে সকল ধর্ম্মোপদেশ বচন, প্রবাদ আখ্যায়িকার আকারে প্রচলিত তাহাদের মধ্য হইতে রস-বস্তু সংগ্রহ করিতে হইবে। লৌকিক গান গজল ও গাথা সংগ্রহ করিতে হইবে। সংগ্রহ করিয়া বাংলার প্রাণ দিয়া তাহার নূতন আকার দিতে হইবে। বাংলার সাহিত্য ভারতবর্ষের চিন্তাধারার সহিত 'বিশ্ব-চিন্তার যে সংযোগ আনিয়াছে তাহার দ্বারা অন্তপ্রদেশের সাহিত্যের যাহা কিছু গতানুগতিক ও আড়ষ্ট তাহা নবজীবন পাইবে। যাহা এখন প্রাদেশিক তাহা তখন বিশ্বের রসবস্তু হইবে। তুলসীদাসের দাস্যভাব তখন আধুনিক সেবাব্রতের নব-ইন্ধন জোগাইবে, সাকীর ব্যাকুল প্রেম তখন বিশ্বপ্রেমের দারুণ-পিপাসা মিটাইবে। এই হইল আমাদের দান। আমরা পাব এদেশ হইতে ইহার অনুভূতির তীব্রতা, লইব ইহার রঙের খেলা যে রঙের খেলার পরাকাষ্ঠা আমরা কাশীর বস্ত্রশিল্পে দেখিতে পাই, স্ত্রীলোকের দৈনন্দিন পরিচ্ছদে যাহার সৌন্দর্য্য এ দেশের কাজরীর উৎসব নৃত্য, লভিব আমোদ প্রমোদে যাহা গ্রাম্য জীবনকে আমোদিত, ঘাট মাট তট মাঠকে সুষমায় মণ্ডিত করিয়াছে উল্লসিত করিতেছে। বঙ্গ-সাহিত্যকলায় যেমন আমাদের অতুল প্রসাদ সেনের বিশিষ্টতা, তেমনি বঙ্গ-চিত্রশিল্পে আমাদের বন্ধু সমরেন্দ্র নাথ ও তাঁহার ছাত্র এই রঙের মাধুরী ভারতীয় চিত্রকলাকে দান করিয়া কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের রং ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের বাহুল্য তাঁহাদের শিল্পের সৃষ্টিকে প্রাদেশিক ছাপ দিয়া একটা স্বাতন্ত্র্য দিয়াছে। দুই ক্ষেত্রেই উত্তরের ভাব-সাধনা বাঙ্গালীর প্রতিভার নিকট, বাঙ্গালীর ছাঁদে, নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। রসবস্তু জিনিষটা বিশ্বজনীন। সাহিত্যের প্রধান কাজ হইতেছে মানুষকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হইতে টানিয়া আনিয়া সমগ্রের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া। এই পরিচয় খুব নিবিড় হওয়া চাই, গোপী ও গোপীজন বল্লভের মত নিবিড় হওয়া চাই, এবং ইহার অনুভূতি সাকীর পিয়ালার বুদ্বুদের মত সহজ হওয়া চাই। রাধা ও সাকী লোক-সাহিত্যের নিত্য রস-বস্তু।

কিন্তু উর্দ্দু গীতিকবিতায় সাকীর রূপক রাধার রূপক অপেক্ষা অধিক বেদনাময়। এ অভিসার যেন না-পাওয়ার দিকে অভিসার, জীবনটা একটা অবিশ্রান্ত বিরহের পর্য্যায় যেখানে গোলাপ বিদ্যুতের খেলা, বর্ষার অন্ধকার অথবা সন্ধ্যার রক্তিম আভা মানব-জীবনের প্রেমের নিকট গূঢ় রহস্য নিত্য প্রকাশ করিতেছে। রাধার প্রেমে দেবত্বের ভাবের আধিক্য আখ্যান বস্তুকে বৈচিত্র্যকে রোধ করিয়াছে। সাকী মানবীয়, তাই বিরহ-মিলনের পর্য্যায় এখানে আরও স্বাধীন, বাধাবন্ধনহীন ও স্বতন্ত্র। কিন্তু

সাকী মানবী হইলেও দেবতার মত অলভ্য। প্রেমের বিফলতাই হইতেছে প্রেমের সার্থকতা—প্রেমের মিলন নহে। প্রেমের এই নিরাশ: মা.সিয়রি করুণ রাগিণীর তারে উর্দ্দু সাহিত্যকে বাঁধিয়া দিয়া ইহাকে বিষাদ-মূলক গীতিকাব্যের মধ্যে উচ্চ আসন দিয়াছে। ইহার রস-সামগ্রী বিশ্বজনের উপভোগ্য। ইহার আখ্যান বস্তু রাধাকৃষ্ণের রূপক অপেক্ষা কম স্বাভাবিক নহে, তাই ইহা মানবজীবনের উপর ছায়াপাত করিয়া আমাদিগকে আরও নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে। সাকীর ভালবাসায় শুধু যে মানুষ-ভালবাসার সৃষ্টি করিতেছে তাহা নহে, প্রেমাস্পদের নূতন নূতন রূপ আপনার মনোমত অহরহ সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে।

আখ্যান বস্তু বিচিত্র, নানা প্রদেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন। বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের ধারার রীতি হইতেছে এই, রস ও আখ্যান-বস্তুকে সীমা হইতে অসীমের দিকে, খণ্ড হইতে অখণ্ডের দিকে লইয়া যাওয়া—এই রীতিতে আমাদেরও গ্রহণ করিতে হইবে—ইহার ফলে যাহা কিছু রঙীন কাগজের ফুলের মত কৃত্রিম রূপক, দার্শনিক তত্ত্ব শুষ্ক অথবা পুরাতন গল্পের কাঠামে আবদ্ধ তাহা আপনি ঝরিয়া পড়িবে—ফুটিবে কেবল রূপ ও অরূপের চির নূতন লীলা, ও সেই লীলার চির-নূতন সত্য শিব ও সুন্দর মূর্ত্তি।

পল্লীবাণী

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

আজ হতভাগ্য পল্লীবাসী বাঁচিতে চায়, অনশন-ক্লিষ্ট রোগ-শোক-প্রপীড়িত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লীবাসী আজ বুঝিয়াছে, তাহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দুটি সহানুভূতির কথা বলিতেও কেহ নাই, তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে দিনে দিনে দণ্ডে দণ্ডে এই মরণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, নিজেদের দিকে চাহিতে হইবে। তাহারা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে যে আর সে সোণার পল্লী নাই, অন্নাভাব জলকষ্ট রোগভোগ প্রভৃতিতে তাহারা আজ ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত—জনশূন্য পল্লীশ্মশানে দাঁড়াইয়া স্তূপীভূত হতাদরের মধ্যে তাহারা আজ বুঝি নবজীবন সৃষ্টি করিতে চায়,—কিন্তু অসহায় অনাশ্রয় নিঃসম্বল এই দরিদ্র নরনারায়ণ বুভুক্ষিত অস্থিচর্ম্মসার—অর্থবল নাই, জনবল নাই—কি করিবে তাহারা? তাই এত বিপর্য্যের মধ্যেও অশিক্ষিত অসভ্য "চাষা" তাহারা এখনও তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পানে করুণ নয়নে চাহিয়া আছে আশা যে এই জ্ঞানী গুণী বাবুর দল, তাহাদিগকে আজ আপনার কোলে টানিয়া লইয়া বলিয়া দিক তাহাদের সত্যকার অভাব কোথায়? কি তাহার কারণ? আর তাহার প্রতিকারেরই বা উপায় কি?

তাহাদের আজ কে বুঝাইবে যে, পল্লীর প্রাণের দীনতা, মনের দুর্ব্বলতা, দেহের অক্ষমতাকে দূর করিতে না পারিলে আর সে হতশ্রী পল্লীর নষ্ট গৌরব ফিরিয়া আসিবেনা। এই হিংসা, দ্বেষ, পরানুবাদ পরচর্চ্চা, এই স্বার্থসাধনের হীন চেষ্টা, পরস্বাপহরণের ঘৃণিত জঘন্য প্রবৃত্তি, দরিদ্র প্রজার বুকের রক্ত শোষণের দ্বারা মহাজনের ধনপুষ্টির জলৌকা-বৃত্তি; এই একদিক একমুষ্টি অন্নের কাঙাল গৃহহীন ব্যথাতুর পল্লীবাসী, অন্যদিকে ভোগসুখলালিত আরাম-বিলাসী ধনিক সম্প্রদায়—এ অস্বাভিক অসামঞ্জস্য এই অনিয়মের কে নিরসন করিবে? কোথায় সে, কোথায় সে মহাপ্রাণ? কে সে পল্লীপ্রাণ সরল সুন্দর মহাপুরুষ, যে আপনার সর্ব্বস্ব বলি দিয়া আত্মনামঘোষনার মদমত্ততা হইতে নিজেকে সর্ব্বান্তঃকরণে রক্ষা করিয়া শুধু পল্লীসেবা করিবে কে সে? কোথায়? আমি বলি—

ওরে মোর বাঙলার পল্লীবাসী প্রিয়
সমস্ত দেশের মাঝে তুমি বরণীয়!

সুখে দুঃখে বেদনায়, সংসার সংঘাতে,
প্রভাতের সূর্য্যালোকে, দুর্য্যোগের রাতে
তোমরা রয়েছ স্থির, অচঞ্চল আহিতাগ্নি রূপে,
ভারতবর্ষের সব পল্লী দীনতার মোহ-অন্ধকূপে।
তোমার উপর দিয়ে বহে যায় যে কালবৈশাখী,
তোমার চরণতলে ভূমিকম্প ওঠে থাকি থাকি,
জীর্ণ গৃহ ভূমিসাৎ শ্রাবনের ধারা জলধারে,
দিনের দুর্ভর দৈন্য বিপর্য্যয় আসে ভারে ভারে ;
অত্যাচার অনাচার অবিচার, ব্যাভিচার শত
তোমার দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপিতেছে জানি অবিরত,
আরো জানি মূক হয়ে সহিয়াছ ঢের
নির্ম্মম সে অপমান এমনি সে দুর্ভাগ্যের ফের !
আরো ভাল জানি আমি, অন্তঃস্থলে করি অনুভব
এ দীন রিক্ততা দুঃখ তোমাদের অচিন্ত্য বৈভব !
তাই মোর প্রাণ বলে, মনবলে, বলে অন্তর্যামী
দেবতার ভীম বজ্র একদিন আসিবেই নামি।
তোমরা যে হতপ্রাণ, তোমাদেরই শূন্য গৃহমাঝে
মহাপ্রাণ জন্ম লভি', বাহিরিবে তোমাদেরি কাজে,
তোমাদের অপমান রাজটিকা কপালে তাহার,
হাসিয়া পরিবে গলে তোমাদের বেদনার হার,
নিজ বক্ষ পাতি লবে সংসারের সহস্র আঘাত ;
সেই দিন নবসূর্য্যে প্রকাশিবে পল্লীর প্রভাত !

কিন্তু বাঙলার দুর্ভাগ্য তথা বর্ত্তমান শিক্ষার দুর্ভাগ্য এই, যে দীন মৌন মূক, নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়কে লইয়া আমার দেশ, যে শ্রমিক সম্প্রদায় মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া দেহের রক্ত জল করিয়া আমাদের সর্ব্ব প্রকার সুখ সম্ভোগের উপাদান জোগাইতেছে, আমরা হীন বর্ব্বরের মত তাহাদিগকেই এ পর্য্যন্ত পদদলিত করিয়া আসিতেছি, দেশের সরল প্রাণগুলি কঠোরতার অত্যাচার-দণ্ডে মথিত করিয়াছি, হতশ্রদ্ধা অবহেলায় আঘাতের পর আঘাত করিয়া দেশের সত্য নাড়ীর যোগকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। শাসন শোষন যন্ত্রের দোষ দিয়া আমরা দেশ-হিতৈষী সাজি কিন্তু আমরা বংশপরম্পরায় এই সরল-প্রাণ অনাড়ম্বর জীবনগুলির উপর পীড়ন করিয়া যে মহাপাপ করিয়াছি তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমরা ছাড়া আর কে করিবে ? দণ্ড আমাদের লইতেই হইবে। আজ দেশের সাধারণ সম্প্রদায় যে কারণেই হোক শেষ নাগের মত সহস্র ফণা বিস্তার করিয়া গর্জ্জন করিতেছে—আমরা সাবধান না হইলে তাহাদের বিষ নিঃশ্বাসে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইব। এই মথিত ফণিগণের মুখ নিসৃত হলাহল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার জন্য শত সহস্র সর্ব্বত্যাগী ভোলানাথের প্রয়োজন। আত্মাভিমানী শিক্ষিত সম্প্রদায়, ভোগগর্দ্দভ ধনীকুল, স্বার্থপরায়ণ মহাজন সম্প্রদায় আজ যাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন কাল তাহার কবল হইতে তাঁহাদের হেকেল, সেক্সপীয়র, তাঁহাদের পাইক পিয়াদা চাপরাস কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই দীন সম্প্রদায় স্বরাজ চায় না। নবপ্রবর্ত্তিত শাসনসংস্কার চায় না, দেশ-শাসনের আত্মকর্তৃত্বকে বরং তারা ভয়ই করে—তাহারা চায় বাঁচিতে, নিজের শ্রমলব্ধ ফলের অধিকারী হইয়া, মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া তাহারা জীবন ধারণ করিতে চায়। অতি তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষাও কি তাহাদের পূর্ণ হইবে না ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিবে ভবিষ্যৎ !

বহুদিন হইতে উপাসনার এই 'পল্লীবাণী' স্তম্ভে আমরা বাঙলার দুর্দ্দশা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতেছি। কোনও কোনও স্থলে এক একখানি এইরূপ ধ্বংসোন্মুখ গ্রামের অভাব অভিযোগের কথা বাঙলার চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও কর্ম্মীগণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। আজ আবার সেই কথা বলিবার জন্যই এই মুখবন্ধ !

নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা সব্ডিভিশনের অন্তর্গত লোকনাথপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। একদিন ছিল, যখন এই গ্রামের সুখ স্বাস্থ্য ও সম্পদের কথা পল্লীবাসীর গল্পের সামগ্রী ছিল। বহু পূর্ব্বে এই গ্রামে নীলকুঠী ছিল—তাই ইহার নাম কুঠী লোকনাথপুর। সে আজ বহুদিনের কথা তাহার পর এই গ্রামের উপর দিয়া কত না পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। এই গ্রামে পূর্ব্বে ৩০০-৪০০ শত ঘর লোকের বসবাস ছিল—কাহারো কোনও অভাব ছিল না—গোলা ভরা ধান, গাল ভরা হাসি যে পল্লীসুখের গল্প-কথা

তাহা এই গ্রাম দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইত। পল্লীগ্রামের সহজ সরল জীবনের মধ্যে অনাবিল আনন্দ ধারা নিয়ত উৎসারিত হইয়া পড়িত। পল্লীবৃদ্ধের দল একদিন জাতি নির্বিশেষে একস্থানে বসিয়া পল্লীর সুখ সাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতেন। গ্রামে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ছিল, পল্লী যুবকের কর্ম্মঠ দেহ ও তেজব্যঞ্জক মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইত যে এ গ্রামের মধ্যে একটা জীবন্ত প্রাণ আছে। গ্রামে বার মাসে তের পার্ব্বন ছিল, অতিথি অভ্যাগত আসিয়া ফিরিত না! ধর্ম্ম ছিল, কর্ম্ম ছিল পল্লীর মধ্যে আনন্দ উৎসবের আয়োজন ছিল—আর সবার উপর ছিল সকলের একপ্রাণতা! তেহি ন দিবসা গতাঃ।

আজ সেই সৌন্দর্য্যশালিনী, ঐশ্বর্য্যময়ী সুখশান্তি বিধায়িনী পল্লীজননী হতশ্রী, নিরাভরনা। সে রূপ নাই, সে ঐশ্বর্য্য নাই, সে সুখ নাই, সে স্বাস্থ্য নাই। গ্রাম প্রায় জন শূন্য, রোগের আক্রমনে, ক্ষুধার তাড়নায়, পানীয় জলের তৃষ্ণায় এখন গ্রামখানি প্রায় উৎখাত, দু-পাঁচঘর মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবার তাহাদের উদরান্নের সংস্থানে প্রবাসী, যাহারা পিতৃ পিতামহের ভিটায় গতপ্রাণ হইয়াও পড়িয়া আছে তাহাদের মধ্যে কেহ দুর্ব্বল অসহায় দীনদরিদ্র, কাহারো দু'মুঠো অন্নের সংস্থান হয় কাহারো হয় না,—কেহ বা কথঞ্চিত স্বচ্ছল অবস্থায় থাকিলেও অবসাদগ্রস্থ, নানা প্রকার মোহে অজ্ঞান। নিজের গণ্ডা কোনও প্রকারে গুণিয়া ঘরে তুলিয়া তাঁহারা দিন গুজরান করেন। যাহার অভাব দুঃখ অনুভব করিবার ক্ষমতা আছে সে দুর্ব্বল দরিদ্র, আর যাঁহার সে অভাব অভিযোগ দূর করিবার সামর্থ্য আছে তিনি সমস্ত অনর্থের মূল আত্মসাবধানী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বসিয়া আছেন। 'চাচা আপন বাঁচা' দলের লোক আজ কেহ বাহিরে কেহ ঘরে কিন্তু দরিদ্র গ্রামবাসীর কাছে তাঁহাদের মূল্য কিছু নাই!

আজ, এই ধ্বংশপ্রায় শ্মশান সদৃশ লোকনাথপুর গ্রামে অন্ন বস্ত্রের অভাব যথেষ্ট আছে কিন্তু মানুষ বাঁচিলে যে অন্ন বস্ত্রের অভাব ঘুচিতে পারে—কিন্তু যে তৃষ্ণার জলের উপর মানুষের জীবনীশক্তির ক্ষয় বৃদ্ধি নির্ভর করে' তাহা এই গ্রামে মূলেই নাই। গ্রামের উত্তরস্থিত একমাত্র জলাশয়—"বিলকে" আর বিল বলা যায়না। চতুপার্শ্বস্থ আবাদী জমীর ধোয়া জল নামিয়া নামিয়া "বিল" এখন 'বাচড়ায়' পরিণত। নিরন্ন দরিদ্র গ্রামবাসী তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া শুধু ক্ষুব্ধ আর্ত্তনাদে বৃথা ভগবানের করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করে। কারণ মানুষের করুণার উপর আর তাহাদের আস্থা নাই। আজ পনের বৎসর হইতে এই সরল গ্রামবাসী বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, হতভাগ্যরা এখনও তাই বিশ্বাসের শেষ সম্বল ভগবানে বিশ্বাস হারায় নাই! এই দশ পনের বৎসর কত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের অসহ্য তৃষ্ণাকে তাহারা প্রবোধ দিয়াছে,—আর না এই বার, এ দারুণ যন্ত্রনার এইবার উপশম হইবে। কিন্তু কৈ কিছুইত হয় নাই।

তাহারা বৃথা বিশ্বাস করিয়াছে, অকারণ মনকে প্রবোধ দিয়াছে—আর অসহায় ভাবে জলকষ্টের অসহ্য যন্ত্রনা সহ্য করিয়াছে। জলাভাবে এই গ্রাম প্রতি বৎসর নানা রোগের আক্রমণে এখন প্রায় জনশূন্য। এই অসহায় সরল বিশ্বাসী গ্রামবাসীর প্রাণপাতের জন্য দায়ী কে? অপরাধ কাহার?—তাহা গ্রামবাসীই ভাল জানে! তাহাদের নিজেরও কি দোষ নাই? আছে, কিন্তু যাহারা বুদ্ধির বড়াই করেন, যাঁহারা ধনমদে গর্ব্বিত, যাহারা সাধ্য থাকা সত্ত্বেও কিছু করেন নাই, যাহারা নানা দুরভিসন্ধিতে এ গ্রামের কোন সৎকর্ম্মকে, কোনও মঙ্গল অনুষ্ঠানকে গড়িয়া উঠিতে দেন নাই, সেই আত্মাভিমানী, বুদ্ধিমানেরা এই তৃষ্ণার্ত্ত গ্রামবাসীর প্রাণ হরণের জন্য দায়ী কিনা?

তাঁহাদের তীক্ষবুদ্ধি আছে, অসাধারণ বাক্‌পটুতা আছে, নানা ভাবে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিবার ভঙ্গী আছে, কাজের বেলায় চালবাজী করিবার 'হিকমৎ' আছে, এই অবহেলা কর্ম্মহীনতা এবং কর্ত্তব্য-শৈথিল্যের জন্য ইহকালে তাহারা কোনও বিচারের অধীনে আসিলেন না। কিন্তু একজন মাথার উপর জল জল করছেন তাঁহার অব্যাহত কঠোর অব্যর্থ শাসন দণ্ডের কাছে কি জবাবদিহি করিবেন? তাঁহারা কি মনে করেন সেখানেও মকর্দ্দমার তদবীর চলিবে, সাক্ষী, সওয়ালজবাবের ফিকির ফন্দিতে সেই হাই-

কোর্টেও তাঁহারা মুক্তি পাইবেন? কখনই না। আমি আগেই বলেছি—

দেবতার তীব্র বজ্র এক দিন আসিবেই নামি!

—কিন্তু এই শ্লেষ, এই অভিযোগ কি আজ আমাকেও ব্যথিত করিতেছে না? আমিও কি অপরাধী নহি? আমিও ত তাহাদের একজন, তবু আমি আমার বিবেকের কাছে সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

ভগবান জান তুমি এ বড় নির্ম্মম
মন যার আছে তারে দাও নাই ধন!

গ্রামের এই শোচনীয় অবস্থা আজ পল্লীর রাখালবালক গণের সরল সুন্দর হৃদয়কে আঘাত করিয়াছে তাই আজ বাঙলার সমস্ত ধ্বংসোন্মুখ পল্লীপ্রাণের প্রতিনিধি রূপে লোকনাথপুরের এক মুসলমান বালক শুকুরআলি তাহার স্বাভাবিক ভাষায় পল্লীর এই বেদনার কথা কতনা মর্ম্ম-স্পর্শী ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছে—

আহা শুন সবে এক ভাবে
করি নিবেদন,
লোকনাথপুরের কথা কিছু
শুন দিয়া মন!
আহা অতি উত্তম গিরাম (১) খানি,
রাস্তা ঘাট ভালো
অবশেষে জলের কষ্টে
গরীব মারা পলো।
আহা বড়লোক যাহারা ছিল
দেখিয়া সবায়
আপন আপন বাড়ীতে সব
ইন্দারা কাটায়;
আহা, গরীব লোক সব ভাব্‌ছে বসে
আমাদের কি হ'বে,
জল বিনা ছেলে মেয়ে
সকল মারা যাবে!
অতি শতজন (২) তারিনি বাবু
সর্ব্বলোকে কয়,
জলের কষ্টে গরীব মরে
চক্ষে না তাকায়।
আহা, ভবানন্দ বাবু এসে মোদের
সাহস খুব দিলো
দিঘি কেটে জল খাওয়াব
ভয়কি আছে বল।
আহা, বাবুর কথা শুনে সবে
সন্তোষও হইল,
বুঝি দিঘি কেটে বিখ্যাত নাম
জগতে রাখিল।
আহা, হলোনা তা এই আমাদের
ছার কপালের দোষে
মাঝখানেতে কতক লোক
মলো হেসে হেসে।
আহা দিঘির জল খাবো বলে
বড় আশা ছিল
দশ আনা লোক মারা গেল
ছয় আনা রহিল।
আহা এই পর্য্যন্ত দিঘির কথা
মনে হ'তে গেল
পুকুর কাট্‌বেন মহেন্দ্র বাবু
শুন্‌তে পাওয়া গেল।
ভবানন্দ বাবু আশা দিয়া
নৈরাশ করিলো
মহেন্দ্র বাবু করবে কি তাই
আবার ভাবনা হলো।
আহা হরি বাবু ভেবে চিন্তে
বলিছেন এই কথা
এক সঙ্গে সব কাট্‌ব পুকুর
এত মানুষ পাব কোথা?
এবার বলে নাছিব সবার
ভাগ্যে ফলে গেল
আহা, কিদার বাবুর মনে কিছু
দয়া প্রকাশিল

(১) গ্রাম। (২) সজ্জন।

আহা, দিন দুঃখির কষ্ট বাবু
সহিতে না পেরে
ইঁট্ তোয়ারী করলেন কিছু,
'খুদের খুনি'র (১) ধারে।
জলদান করিবে বাবু
স্বর্গে স্থান পাবে
ইহকাল জগৎ মাঝে
গুণ কীর্ত্তন করিবে।
আহা কি বলিব মহাদয় গণ
বাবুর দয়া ছিল
জন কত্তকের মতে পড়ে
করিতে নারিল।
গোচুনা পড়িলে দুধে
যেমন নষ্ট হয়
সেই রকম হয়েছে বাবুর
ভাবে জানা যায়।
আহা বিশ্বাস মশায় কয়না কথা
বেড়ায় ফাঁকে ফাঁকে
দিঘি পুকুর কড়া (২) হ'ল তা'র
একুন (৩) করে রাখে।

শেষ কালেতে চারু বাবুর
কথা মনে হ'ল
লোকের কষ্ট দেখে ২৭ সালে
ইট তোয়ার করিল।
প্রভাস বাবু বলে অল্প ইঁটে
পাঁজা না হইবে
ক্ষিতিশ বাবু বলে ইট্ সব
পুইশালে (৪) পুড়িবে।
আহা গরীবের জন্য বাবুরা
আবার লেগে গেল।
লাভের মধ্যে পরাণপুরেরা
পুইশাল চাপা পলো।
আহা মাতা পিতার কোলে যেমন
শিশু বালক থাকে
বড় লোক থাকিলে গরীবের
সেই হালেতে রাখে।
শুকুর আলি বলে কাতর হালে
ধরি সবার পায়
অজ্ঞান রাখালের কথায়
রাগ্‌বেন না মশায়।

হায় অধঃপতিত পল্লীবাসি, কবে রাখালের মত এমনি প্রাণের সরলতায় সমবেদনার অনুভূতিতে জাগিয়ে উঠিবে?

অহিংসা ও যুদ্ধ

[শ্রীহেমচন্দ্র মজুমদার]

গভীর অরণ্যের ভীষণ নির্জ্জনতাকে উপেক্ষা করিয়া শান্ত ও মধুর সুর-লয়-সংযোগে শান্তি দেবী নিবিষ্ট মনে গাহিতে ছিলেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতি জাতং
সদয়-হৃদয়-দর্শিত পশুঘাতং।
কেশব-ধৃত-বুদ্ধ-শরীর
জয় জগদীশ হরে॥

এমন সময় শান্তির প্রশান্তিকে অভিভূত করিয়া বনভূমি কম্পিত করিয়া, জলদ গম্ভীর গর্জ্জনে সত্যানন্দ গাহিলেন—

ম্লেচ্ছ-নিবহ-নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতুমিব কিমপি করালং।
কেশব-ধৃত কল্কি-শরীর
জয় জগদীশ হরে॥

শান্তি ও সত্যানন্দ উভয়েরই লক্ষ্য জগদীশের জয়।

(১) একটী বিলের নাম। (২) (৩) একুন। (৪) ইটের ভাঁটী।

শান্তি চাহিতেছেন প্রেম ও করুণা। সত্যানন্দ রণবাদ্য বাজাইতেছেন "যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।"

শান্তি বৌদ্ধ, সত্যানন্দ হিন্দু। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই শান্তির ভিখারী, উভয়েই মোক্ষকামী। অহিংসা উভয়েরই তুল্যরূপে উপাস্য। শান্তির যুদ্ধে অনুমোদন নাই। যুদ্ধের আয়োজনে সত্যানন্দের মন-প্রাণ সমাহিত। জীবন ও জগতের প্রতি দুই জনের দৃষ্টি দুই রকমের। কাহার দৃষ্টিতে কতটুকু সত্য প্রতিফলিত হইয়াছে?

অহিংসা পরমধর্ম্ম সত্য। হিন্দুধর্ম্ম সাধারণ ভাবে এবং বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে এই অহিংসার অমৃত-বাণী বিশ্বে প্রচার করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধও কি সময় সময় অবশ্য কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-কার্য্য হইয়া উঠে না বা উঠিতে পারে না? যুদ্ধেরও কি ন্যায্যতা থাকিতে পারে না? অহিংসা ও যুদ্ধ পরস্পর বিরোধী, না অহিংসাবাদীরও যুদ্ধ করিবার অধিকার ও আবশ্যকতা আছে? সকল যুদ্ধেই কি অহিংসাবাদ ক্ষুণ্ণ হয়?

স্বর্গভ্রষ্ট দেবগণ স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত অসুরগণের সঙ্গে যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, দেবগণ কি তাহা অন্যায় বোধ করিয়াছিলেন? রঘুকুল তিলক রামচন্দ্র যে জানকী উদ্ধারের নিমিত্ত পরস্ত্রী হরণ-কারী রাবণের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহা কি অন্যায় হইয়াছিল? মহাবীর অর্জ্জুন যে উত্তর গো-গৃহে কুরুসৈন্যের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, অথবা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহাতে কি ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই?

পুরুরাজ যে দিন পৃথিবী বিজয়ী বীর অলীকসন্দরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন কিংবা বীর সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক আক্রমণের গতিরোধ করিয়া সেলুকস্‌কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ন্যায়ের বিধান ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল?

অথবা যেদিন হিন্দুগণ মুসলমান আক্রমণকারীর সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাগ্য পরীক্ষায় পাণিপথে সমবেত হইয়াছিল তখন তাহারা ন্যায়ের পথ উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল? ভারত-ইতিহাসের এই জলন্ত দৃষ্টান্তগুলি কি ন্যায়বিগর্হিত?

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারিযুগের ইতিহাসই যদি অন্যায় ও অধর্ম্মের ইতিহাস হয়, তবে কোন কষ্টিপাথরে ন্যায়-অন্যায় ও ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা হইবে?

ব্যক্তিবিশেষের মত জাতিবিশেষেরও ন্যায়-বোধ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। কোনও জাতির ন্যায়-বোধ সেই জাতির ইতিহাসে প্রতিফলিত হইয়া থাকে! ইতিহাসের সাক্ষ্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সংগ্রাম ও সংঘর্ষের লীলা নিকেতন পাশ্চাত্যদেশের ইতিহাস, প্রাচ্যের চক্ষু লইয়া পরীক্ষা করিলে, অতি বীভৎস ও মানবজাতির কলঙ্কের ইতিহাস বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যুদ্ধ সম্বন্ধে গ্রীক সভ্যতার আদি হইতে আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যের অন্তর্বোধের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে দেশের নীতি পরাধিকার ও পরসম্পদ খর্ব্ব করিয়া স্বাধিকার ও স্বসম্পদের বৃদ্ধি। জড় বিজ্ঞানের জীবন সংগ্রাম নীতি পাশ্চাত্যের অন্তর্বোধকে আরও দৃঢ়তর করিয়া দিয়াছে। আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাস এই নীতির সচেষ্ট প্রয়োগদ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট। মানুষের আশা ও আকাঙ্খা অসীম। যেখানে স্বাধিকার বোধ প্রবল, সেখানে পরাধিকার-বোধ দুর্ব্বল হইবারই কথা। অধিকারের সীমা এই সসীম বহির্জগৎ। কাজেই স্বাধিকারে স্বাধিকারে সংঘর্ষ ও সমর অনিবার্য্য। ইতিহাস চঞ্চল ও অস্থির।

ভারতবর্ষের অন্তর্বোধ ও ইতিহাস অন্যরকমের। এ দেশের নীতি—অহিংসা, উপায়—স্বধর্ম্মপালন। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বিরোধ ও প্রতিযোগিতা মূলক নয় পরন্তু ঐক্য ও সহযোগিতা মূলক। এ দেশের স্বধর্ম্মপালনে সমাহিত মানব আত্ম-প্রতিষ্ঠ ও আত্ম-তৃপ্ত। পরাধিকার ও পর সম্পদের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি নাই। প্রতিবেশীর ঐশ্বর্য্যদর্শনে তাহার হৃদয় ব্যথিত হয় না। স্বধর্ম্মসেবার মানুষ আত্মবিসর্জ্জন করে কিন্তু পরোৎপীড়ন করেনা। অহিংসারূপ পরমধর্ম্ম এখানে জীবজগতে সমভাবে পরিব্যাপ্ত যুদ্ধ এখানে নিতান্তই আপদ্‌কালের অবলম্বন, অধর্ম্ম বিনাশ ধর্ম্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য বিহিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তাহাই প্রমাণ করিতেছে। রামায়ণের যুদ্ধ মহাভারতের যুদ্ধ ঐতিহাসিক যুগের যুদ্ধ, আধুনিক যুগের

যুদ্ধ, ভারতবর্ষের সকল যুদ্ধই আত্মরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা কল্পে সংঘটিত হইয়াছে। ভারতবাসী কখনও ধনৈশ্বর্য্যের লোভে প্রতিবেশীর প্রতি অস্ত্রাঘাত করে নাই। যুদ্ধ এখানে আপদধর্ম্ম। কিন্তু এই আপদধর্ম্ম ও শরণ্য কি না এবং তাহা পালনে অহিংসাবাদ ক্ষুণ্ণ হয় কি না অথবা হিংসাই যুদ্ধের এক মাত্র কারণ কি না, শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী অতি প্রাচীন কালে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছে ও সমাধান করিয়াছে। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই আদর্শ-বাদী কিন্তু আদর্শবাদী হইলেও বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। ভারতবর্ষ হইতে এই প্রশ্নের দুই রকম মীমাংসা হইয়াছে।

ছাগশিশুর প্রাণ রক্ষার্থ যিনি নিজ জীবন দানে অগ্রসর হইয়াছিলেন সেই করুণা-কাতর প্রেমিক সন্ন্যাসী ভগবান বুদ্ধ অহিংসাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। বুদ্ধদেব আপদধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন আপদধর্ম্ম ধর্ম্ম হইতে পারে কিন্তু অহিংসা পরম ধর্ম্ম। হিংসা দ্বারা হিংসার শান্তি হইতে পারে না। অহিংসার দ্বারাই হিংসার উপশান্তি হইতে পারে, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। অতএব অহিংসারূপ পরম ও সনাতন ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ শরণ্য এবং তাহাতেই বিশ্বের কল্যাণ।

শ্রীকৃষ্ণ জলদ গম্ভীর স্বরে এই অহিংসাবাদরূপ ভিক্ষু-ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়া প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে পৃথিবীর এক মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধে ব্রতী হইতে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। এই উদ্বোধন মন্ত্রের ভৈরব গর্জ্জনে অহিংসাবাদ দুর্ব্বল, হীন ও ক্লীবকর্ম্ম বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব উভয়েই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও দার্শনিকের অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে যার যার মত প্রচার করিতেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস এই বিবিধ মতের মূর্ত্ত প্রয়োগস্থল কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধ ও সম্রাট অশোকের বৌদ্ধভারত।

বৌদ্ধ সাহিত্যে অহিংসাবাদের কার্য্যকারিতা প্রদর্শিত হইয়াছে। হিংসা দ্বারা কিরূপে হিংসাই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অহিংসাদ্বারা হিংসা কিরূপে জিত ও সমূলে বিনষ্ট হয়, বৌদ্ধ সাহিত্যে বহু আখ্যান ও উপাখ্যানে তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অহিংসাবাদের প্রভাবে নৈতিক পারমিতার (পূর্ণতা) যে মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা মানব জাতীর আধ্যাত্মিক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বৌদ্ধ অহিংসাবাদই যীশুখ্রীষ্টের মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রজীবনে অহিংসাবাদ কতটা সফলতা লাভ করিতে পারে সম্রাট অশোকের বৌদ্ধ ভারত তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অশোকের শিলালিপি সমূহ ভারতবর্ষের চিরগৌরব ঘোষণার্থে এখনও সাক্ষ্য দিতেছে।

হিন্দু শাস্ত্রেও অহিংসার যথেষ্ট প্রশংসা আছে। বস্তুতঃ অহিংসা ভারতীয় হিন্দু জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ। ধর্ম্ম জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বৌদ্ধ ভিক্ষুর মত হিন্দু সন্ন্যাসীও অহিংসা ধর্ম্মে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বভূতে নির্ব্বৈর ভাব ভারতবর্ষে জ্ঞানের লক্ষণ বলিয়া চিরকালই প্রসিদ্ধি আছে।

অহিংসাবাদী বৌদ্ধের যুদ্ধে অনুমোদন নাই। কিন্তু অহিংসাবাদ হিন্দুর ধর্ম্ম-যুদ্ধে নিষেধ নাই, বিধি আছে, অপালনে প্রত্যবায়ও আছে।

ভারতবর্ষের চির উপাস্য আদর্শ দেবজীবন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম আদর্শের সাক্ষাৎকার করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা আদর্শে পৌছিবার পথ আবিষ্কার করিয়াছে এবং মানব জাতিকে সেই পথে চলিবার জন্য আহ্বান করিতেছে।

হিংসার ঘাৎপ্রতিঘাতে হিংসার বৃদ্ধি। কিন্তু প্রতিঘাতের অভাবে হিংসার বিনাশ। যেমন শূন্যে উৎক্ষিপ্ত তীর কাহাকেও বিদ্ধ না করিয়া গতি শক্তি হারাইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে তদ্রূপ হিংসাও বাধাপ্রাপ্ত না হইলে হিংস্রতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মানব প্রকৃতিতে প্রেমের অধিকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। প্রেমের প্রবল শক্তির কাছে হিংসা আত্মসমর্পন করে। সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু জীবমুক্ত সাধুর সমুখে হিংস্রতা ত্যাগ করিয়াছে, পাষণ্ড ও দস্যু মহাপ্রেমিকের সংস্পর্শে সাধুজীবন লাভ করিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বস্তুতঃ অহিংসাই যে অবলম্বনীয় এবং তাহাতেই বিশ্বের কল্যাণ, এ বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে মতবৈধ নাই।

কিন্তু হিন্দু আরও সূক্ষ্মতর দৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছে সকল লোকের সমসূত্রপাতে অভিব্যক্তি হয় নাই। অভিব্যক্তির ক্রমানুসারে কর্ম্মের পথও ভিন্ন ভিন্ন। এক সময়ে এক সরল রেখায় সকলের গতি চলিতে পারেনা। হিন্দু মতে ধর্ম্ম যুদ্ধে অহিংসাবাদ ক্ষুণ্ণ হয় না। হিংসাই যুদ্ধের এক মাত্র কারণ নয়। যুদ্ধ করিবার অন্য কারণও থাকিতে পারে। হিন্দু ও বৌদ্ধের কর্ম্ম প্রণালী ও কর্ম্মের আদর্শের একটু বিভিন্নতা আছে।

আদর্শবাদী হিন্দু বাস্তবের সীমা লঙ্ঘন করে নাই। হিন্দু দেখিয়াছে মানবপ্রকৃতি পশু, মানব ও দেবতা এই তিন প্রকৃতির একটা বিশিষ্ট সংমিশ্রণে গঠিত। মানুষের দেব প্রকৃতি তাহার মানব প্রকৃতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, মানব প্রকৃতি পশু প্রকৃতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন। দেব প্রকৃতিতে সংগ্রাম নাই, সেখানে অহিংসা ও মৈত্রী নিত্য প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক ও সহজ ধর্ম্ম। কিন্তু মানব ও পশু প্রকৃতি দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সমর ক্ষেত্র। অন্তর্জগতে এই ত্রিবিধ প্রকৃতির অহর্নিশ সংগ্রাম চলিতেছে। যতদিন এই দ্বন্দ্বের অবসান না হয়, দেব প্রকৃতিতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ না হয়, ততদিন জীবন সংগ্রাম বিশেষ। এই সংগ্রাম জীবন বিকাশের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। প্রাকৃতিক বিধানে এই সংগ্রামের পরিণামে দেব প্রকৃতির জয় যেমন সুনিশ্চিত, পশু ও মানব প্রকৃতির অথবা তমঃ ও রজঃ গুণের বিনাশও তেমনি অবধারিত। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মানব মাত্রকেই এই বিধির বিধান মানিয়া চলিতে হইবে। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার উপায় নাই। প্রকৃতিকে নিগ্রহ করিবার পথ নাই। প্রকৃতি তাহার আইন ও অনুশাসন মত কাজ করাইয়া লইবেই লইবে। প্রকৃতির গতি রোধ করিতে পারিলেও তাহা অকল্যাণেরই কারণ হইবে। কেন না তাহাতে বিকাশের গতি স্থগিত হইয়া যাইবে তমঃ ও রজঃ গুণ বিনষ্ট না হইয়া অথবা সত্বগুণে পরিণত না হইয়া অশুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া যাইবে। এবং সুযোগ পাইলেই আত্মপ্রকাশ করিবে।

বহির্জগৎ অন্তর্জগতের স্থূল প্রতিচ্ছবি। অন্তর্জগতের সংগ্রাম বহির্জগতে স্থূলভাবে বিপ্লব সংঘর্ষ ও যুদ্ধাদিতে পরিণত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে যে যুদ্ধ তাহারও ইহাই কারণ।

সংগ্রাম মাত্রেই রজোগুণের ক্রিয়া প্রবল থাকে। এই রজোগুণ আবার ব্যক্তির বা জাতির প্রকৃতি অনুসারে তামসিক বা সাত্বিক গুণের দ্বারা কথঞ্চিৎ নিয়মিত হইয়া থাকে। যে সংগ্রামে তামসিকতা প্রবল তাহা প্রধানতঃ হিংসা, লোভ, কাম, ক্রোধ, মোহাদি দ্বারা পরিচালিত।

এরূপ আসুরিক যুদ্ধে হিন্দুর অনুমোদন নাই। সত্ব প্রধান হিন্দু জাতির রজোগুণ সত্বগুণের দ্বারা প্রভাবান্বিত। যে যুদ্ধের লক্ষ্য দেব প্রকৃতির জয়, পশু প্রকৃতির বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপন এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ হিন্দুর স্বধর্ম্ম সঙ্গত। স্বধর্ম্ম পালনে হিন্দুর পূর্ণাধিকার চিরকালই থাকিবে।

কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে এইতত্ব বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সত্বপ্রধান হিন্দু ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইলেও তাহার ধীর, স্থির, শান্ত ও বিচারপরায়ণ স্বভাব বিনষ্ট হয় না। কুরুক্ষেত্রের উভয় পক্ষের অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে উপস্থিত হইয়া অবশ্যম্ভাবী রক্তপাতের পরিকল্পনায় মহাবীরের দেবাত্মা ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে। তাহার মুখ পরিশুষ্ক মন বিভ্রান্ত। হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িয়াছে।

অর্জ্জুন বলিতেছেন "হে কৃষ্ণ আমি শুধু রাজ্যসুখ লোভে এই মহা পাপ করিতে পারিনা। শত্রু পক্ষ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার দোষ দেখিতে পারিতেছে না। কিন্তু আমি জানিয়া শুনিয়া কিরূপে এই পাপ কার্য্যে যোগদান করিব। আমি শস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম। ইহারা আমাকে হনন করুক, তবুও আমি ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। হায়! সামান্য রাজ্য সুখ লোভে কি মহাপাপই না আমরা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম।"

শ্রীকৃষ্ণ—"বীর! তোমার এই ভাব আর্য্যজনের উচিৎ হয় না। ক্লীবতা অবলম্বন তোমার মত বীরের উপযুক্ত হয় না। ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া তুমি উত্থিত হও।"

অর্জ্জুন—"পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব ও স্বর্গের আধিপত্য পাইলেও আমার এই শোক যাইবার নয়। আমি রুধির প্রদিগ্ধ ভোগ চাই না। আমি যুদ্ধ করিব না। সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

ত্রিলোকের রাজত্বও মহাবীরের নিকট তুচ্ছ। লোভ ও হিংসা তাহার বিশাল হৃদয়ে স্থান পায়না। তামসিক গুণের প্রেরণায় মহাবীর যুদ্ধ করিতে পারে না। তাহার যুদ্ধ করিতে হইলে শ্রেষ্ঠতর কারণ চাই।

শ্রীকৃষ্ণ—"ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ তোমার কল্পনার খেয়াল মাত্র। ইহা তোমার মিথ্যাচার, ইহা তোমার স্বধর্ম্ম নয় পরধর্ম্ম। স্বধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়স্কর কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ। তুমি উঠ, যুদ্ধ কর।"

অর্জ্জুন—"যদি আমি যুদ্ধ না করি?"

শ্রীকৃষ্ণ—"তোমার স্বধর্ম্ম নাশ হবে, পাপ হবে।"

অর্জ্জুন—"যুদ্ধ করিলেও ত লোকক্ষয় জনিত পাপ হইবে।"

শ্রীকৃষ্ণ—"না পাপ তোমাকে স্পর্শ করিবেনা।"

ধর্ম্মপ্রাণ পাপভয়-ভীত অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইতেছেন—প্রাকৃতিক বিধানে জীবনচক্রে তোমার যে স্থানটী নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই স্থানের কর্ত্তব্য করাই তোমার স্বধর্ম্ম; নিজের কোট ছাড়িয়া অন্যের কোট দখল করিবার তোমার অধিকার নাই। কল্পনা বা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া স্বাধিকার অতিক্রম করিলেও তুমি পরাধিকারের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে না, ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। তোমার অভিব্যক্তির ক্রমনাশ হইবে। কল্পনা অপেক্ষা প্রকৃতির শক্তি অধিক। প্রকৃতির গতি রোধ করিবার শক্তি তোমার নাই। স্বেচ্ছায় যুদ্ধ না করিলেও তুমি প্রকৃতির প্রেরণায় অবশ হইয়া যুদ্ধ করিবে। অজ্ঞান-উপহত হইয়া যুদ্ধ না করিয়া তুমি বরং জ্ঞান পূর্ব্বক যোগ-যুক্ত হইয়া যুদ্ধ কর। আরও তুমি এই যুদ্ধের কর্ত্তা নও নিমিত্ত মাত্র। লোকক্ষয়ও তোমার লক্ষ্য নয়। ভগবৎ বিধানে যথা ধর্ম্ম তথা জয় সুনিশ্চিত। তুমি ধর্ম্মের জয়কে লক্ষ্য করিয়া যোগাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ কর। যোগযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিলে তোমার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইবে। তুমি দেবপ্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ করিবে। এই দেশ ভবিষ্যতের দৃশ্যপট।

অন্যদেশ ও অন্যজাতি যুদ্ধ করে হিংসা ও লোভ প্রণোদিত হইয়া। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী যুদ্ধ করে—আত্ম-রক্ষা, অধর্ম্মবিনাশ ও ধর্ম্মের সংস্থিতির জন্য। যতদিন সকল ভারতবাসী ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়াছে, যতদিন মানব জাতির প্রকৃতি পশু প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত না হইয়াছে, তত দিন অহিংসাবাদী ভারতবাসীর ধর্ম্মযুদ্ধে অধিকার আছে। ততদিন—"জীবনং খলু সংগ্রামো বৃত্রহা তত্রচেশ্বরঃ"। ততদিন একদিকে ভাগবতী প্রতিশ্রুতি—

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এবং ভাগবৎ আদেশ—"তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।" অপরদিকে ভারতবাসীর স্বীকারউক্তি—

"স্থিতোহস্মি গত সন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।"
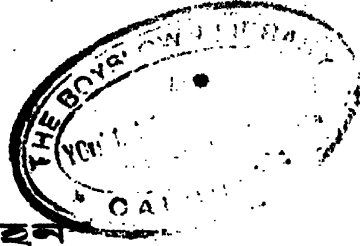
আবাহন

[বেলাগুহ]

ওরে আমার আপন ভোলা,
শুনিস্‌নি কি মায়ের বাণী ?
পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে,
কর্‌ছে হাওয়া কানাকানি।
চোখমেলে আজ দেখ্‌না চেয়ে
সোণার আলো ফেল্‌ছে ছেয়ে,
শিউলি ফুলের সৌরভে আজ
উঠ্‌ছে মেতে বিশ্ব খানি।
বিশ্ববীণায় বাজে মায়ের
দুঃখ-হরা অভয় বাণী ॥

আপ্‌না নিয়ে ব্যস্ত থাকার
সময় এতো নয় ওরে ভাই,
সবার সাথে সমান যোগে
মায়ের কাজে চল্‌নারে যাই।
যা' পেলি তুই জীবন ভরে,
রাখিস্‌নে আর আপন ঘরে,
নিঃস্ব হয়ে আয়না পথে
ভয়-ব্যথা-সুখ-দ্বন্দ গ্লানি
অর্ঘ্যভরে সব দিয়ে দে
জনম জীবন ধন্যমানি ॥

আসল বেদান্ত কি?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

শঙ্করের 'মিথ্যা জগৎ' অর্থে বিশ্বজগৎ আছে, তবে ক্ষণিক, নশ্বর, পরিবর্ত্তনশীল, দেশে কালে বদ্ধ, কারণে জাত; আর যদি জগৎ মানে সংসার হয় তবে তাও ক্ষণিক, নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল, দেশে কালে বদ্ধ ও মায়ামোহে অজ্ঞানে জাত যে অর্থেই হউক জগৎ 'সত্য' নহে। রামানুজ ও দ্বৈতবাদী মধ্বও কি বিশ্ব বা সংসারকে সেই লক্ষণযুক্ত মনে করেন না? তবে তাঁহারা বলেন যা দেশে কালে আছে ক্ষণিক হইলেও সত্য; তা বস্তুতন্ত্র বটে, মায়ার ভেল্কী নহে। এ কেবল কথার মার প্যাঁচ; দেখিবার বা ভাবিবার ধারা; যেমন কোলের ছেলেকে এক মা বলিল অন্ধের যষ্টি সর্ব্বস্ব ধন; অপর মা বলিল "শত্তুর!" মানে কি? দুজনের কাছেই ছেলে ছেলে; কেবল ভাবিবার ধারা; একজন ছেলেকে সর্ব্বসুখের হেতুভাবে দেখিতেছে; অপরে দুঃখের জনক ভাবে দেখিতেছে, কেননা, ছেলে যত দুঃখ দেয় এমন কেহ না; রোগে ভুগিলে, মরিয়া গেলে, বা কুপুত্র হইলে ছেলে যত কষ্টদায়ক এমন কিছু না। রামানুজ মধ্ব দল বেশী logical শঙ্কর না হয় একটু reflective কিন্তু logical কমও নন। তাঁহার সত্যের মাপ কাঠিতে 'জগৎ' খাপ খাইল না, কাজেই তাহা অসত্য। শঙ্কর বলিতে পারেন—"আমার তত্ত্ববিচার তোমার প্রণালীতে দেখ

কেন? তোমার ক্ষণিক সত্য আমার কাছে 'মিথ্যা'। হয় হউক।" নিত্য সত্য নির্ব্বিকার ব্রহ্ম মিথ্যা ও বিকৃত রূপ কেন লইলেন? রামানুজ-মধ্ব বলিলেন—'তাঁহার লীলা'। শঙ্কর বলিলেন 'তাঁহার মায়া'। ভগবান খেলা করিতেছেন বলাও যা ভগবান ম্যাজিক দেখাইতেছেন বলাও তা। আসল কারণ অনির্ব্বাচ্য বলিয়াই এই assumption তো? কথার মার প্যাঁচ বই কি? ব্রহ্মরূপী জগতে ভয়ের, মৃত্যুর, দুঃখের কোনো কারণ নাই; তবু লোক ভয় মৃত্যু ও দুঃখ বিভীষিকা দেখে—দেখিতেছে সংসারে সুখ নাই, নশ্বরে শান্তি নাই তবু সেই মিথ্যার দেওয়ালে মাথা ঠুকিতেছে! মায়া নয়তো কি? অজ্ঞান অবিদ্যাগ্রস্ত না হইলে তা কেহ কি করে? নিজেকে জগৎব্রহ্ম হইতে তফাৎ করিয়া যত অনর্থ ঘটাইতেছ মায়া নয়তো কি? যে জমীখণ্ডের জন্য মাথা ফাটাফাটি করিতেছ তা কোথায় থাকে? তুমি কোথায় যাও?—মায়া নয় তো কি? নুড়ীকে সর্ব্বশক্তিমান দয়াময় ভাবিয়া তাহার পায়ে মাথা ঠুকিতেছ, তাহার মাথায় দুধ ঢালিতেছ, ধরণা দিয়া উপাস পাড়িতেছ, অথচ যাঁকে ডাকিতেছ, তিনি তোমারই ভিতরে নিকট হইতে নিকটতম, আত্মীয় হইতে পরমাত্মীয় রূপে বিরাজমান, তুমি মায়া ভ্রান্ত অজ্ঞানী জীব নওতো কি? কাজেই দেখা যাইতেছে শঙ্কর জগৎকে বা সংসারকে মিথ্যা বলিয়া ঠিকই করিয়াছেন। শঙ্করের উক্ত মিথ্যা জগৎ হইতেছে এই সংসার; বাহ্যবস্তু সমষ্টিভূত বিশ্ব নয়। প্রত্যেকে তার সংসার রচনা করে—এই অর্থেই আমিই এই জগৎ করিয়াছি ইহার সদর্থ হয়।

তৃতীয়তত্ত্ব জীবই ব্রহ্ম। এই জগৎ (দৃশ্যমান বিশ্ব) জীব সমষ্টিভূত। হার যেমন মণিগণের সমষ্টি, তেমনি ব্রহ্ম জীব সমষ্টি। বুদ্ধ, নিউটন, গাছপালা, নদ নদী, কীট পতঙ্গ, জলবিন্দু ধূলিকণা, সবই জীব; এই বহুর সমষ্টিই ব্রহ্ম জগৎ। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তিনিই উপাদান তিনিই কর্ত্তা, তিনিই নিমিত্ত সমস্ত। কথাই অক্ষর, অক্ষরই কথা। জীবকে ব্রহ্মাংশ বলাও যা, ব্রহ্ম বলাও তা, বরফ যদি বলে আমি জল তাতে কি মিথ্যা বলা হয়? ঘটস্থ আকাশ যদি বলে আমি মহাকাশ তবে কি সে ভুল বলিবে? যেমন কাণ্ড, মূল, পাতা, ফুল, ফল সব ভিন্ন করিয়া দিলে বৃক্ষত্ব থাকেনা, তেমনি সব জীব যদি বলে আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তবে ব্রহ্ম থাকেন কোথা? থাকিলেও তা অসীম, এক অবিচ্ছিন্ন বস্তু নন। আর এই যে ভেদ বা বিচ্ছিন্ন ভাব ইহাও যে তত্ত্বতঃ মিথ্যা। তুমি নিজেকে এক জীব অপরকে স্বতন্ত্র এক জীব বল কেন? জড়ের দিক দিয়া ধরিলে জীবের দেহের শেষ কোথা? কেবল হাত পা ত্বক মাংস অস্থি যুক্ত খোলসটা জীবের দেহ নহে; একটু ভাবিলেই দেখা যায় সমস্ত জড়বিশ্বটাই যে আমার দেহ। কেবল তফাৎ এই যে দেহটা ঘনীভূত আবরণ বাকী যা বাহিরের জলবাতাস মাটী আলো গাছপালা প্রাণী সবই যে আমারই দেহ। প্রমাণ? আমার হাতটা কাটা গেলে আমি বাঁচিতে পারি কিন্তু আমার চতুর্দ্দিকস্থ বাতাস জল, মাটী সূর্য্যালোক উত্তাপ সরাইয়া লও আমি একদণ্ডও বাঁচিবনা। যা নহিলে একমুহূর্ত্ত দেহ রক্ষা হয় না তা আমার দেহ নয়তো কি? আমার পা কাটা গেলে দশ বছর বাঁচিব, কিন্তু সূর্য্য নিভিয়া গেলে, বা ইথর নষ্ট হইলে একদিনও বাঁচিব না! এই যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে জড়ের একত্ব, ইহাতে যে ভেদ দেখে তা আমার অজ্ঞান। আমার জ্ঞান ও তাই চৈতন্যও তাই। এই আপাতঃ ভিন্ন ভিন্ন জীবের অস্তিত্বেই আমার জ্ঞান বা চৈতন্য। একদেহ এক চৈতন্য এক আত্মা-এক বিরাট পুরুষ-চিন্ময় ব্রহ্ম। এই জীব দেহের যেমন একাংশ হাড়, একাংশ মাস, একাংশ আঙ্গুল, চুল, নখ, পা চোখ তেমনি এই ব্রহ্ম দেহের নানা অংশ রূপী জীব; একে বহু। বহুতে এক। জড় প্রবাহ প্রবহমান, গতিশীল, চঞ্চল নশ্বর, কিন্তু চৈতন্য এক স্থান অচল, সর্ব্বজ্ঞ: এই দিক্ দিয়া দেখ আমি-জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই আমি

দর্শন শাস্ত্র সাধারণ অজ্ঞানীর চোখে জগৎ দেখেন না: তত্ত্বের চোখে, পরমার্থ বোধে higher stand point হইতে তত্ত্ব দেখেন। এভাবে অসংখ্য জীব নাই, এক জীব; এবং তাহাই ব্রহ্ম। বৃক্ষ ভাবে দেখিলে কাণ্ড মূল, পাতা, আলাদা নয়। প্রত্যেককে আলাদা চোখে দেখিলে স্বতন্ত্র বোধ হয়; এই বোধটাই আসল বোধ নয়। সাধারণ অজ্ঞানীর বোধ লইয়া তত্ত্ব দর্শন হয় না। আমি

জীব ভগবান বলিলে অজ্ঞানী শিহরিতে পারে। কেননা, তার ভগবান সম্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র মনগড়া ধারণা আছে; তার সঙ্গে ভয় ভক্তির সম্বন্ধ আছে; দেনা পাওনার কারবার আছে। তত্ত্বজ্ঞানীর ভগবান স্বরূপ নহেন; যা কিছু অস্তি তাই বা তার সমষ্টিই ব্রহ্ম। ভগবান নহেন। ভগবান ব্রহ্মের একটা aspect মাত্র।

ভগবান সম্বন্ধে সাধারণের যে মনুষ্যধর্ম্মী Being এর ধারণা আছে তাহা যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ জীব ব্রহ্মের ঐক্য Sacrilegous শুনাইবে। এই জন্য অদ্বৈততত্ত্ব সাধারণের জন্য নয়। "যথেচ্ছাং পিবতাং দ্বৈতং অদ্বৈতং তু পরাসত্যং।" যা সত্য তা জোর করিয়া বলাই ভাল; লোকের বুদ্ধি বৈকল্য ঘটিবে এই ভয়? সত্যপ্রচারক তত্ত্বজ্ঞানী সে ভয় করেন না। তাঁহারা বলেন সত্যই অমৃত, ইহাতে ভয় বা দুঃখ বা বিপদ নাই। "ভূমৈবসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"

পাপ-পুণ্য; সুখ-দুঃখ; ন্যায়-অন্যায়; শুচি-অশুচি এ সব ভেদাভেদ অজ্ঞানের ফল। অজ্ঞানে নেত্রদোষে যেমন এক চন্দ্র দ্বিচন্দ্র বোধ হয় তেমনি অজ্ঞানেই প্রকৃতি গতি দ্বিধা ভাগ হইয়া গিয়াছে; ন্যায়-অন্যায়, পাপ পুণ্য ইত্যাদি। অজ্ঞান যাউক প্রকৃতি আপন নিয়মে কাজ করিয়া যাইবে, ভুল ভ্রান্তি হইবে না, ইতর জীবে এবং সিদ্ধযুক্ত পুরুষে প্রকৃতিই কাজ করে; ইতর জীবে instinct, সিদ্ধ পুরুষে; intuition একে অজ্ঞানে, অপরে সজ্ঞানে কাজ করে। উভয়েই immoral beings। পাপ পুণ্যাতীত জীব। সংসারী জীবই intellect অহং বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়। সুতরাং জীবই ব্রহ্ম এ কথার অর্থ এই যে স্বরূপে উভয়েই এক [equal] নয়। স্বরূপে উভয়ই এক [identical] যাকে জীবসমষ্টি জগৎ বলি তাই ব্রহ্ম। essenceএ উভয়ে এক,রূপেও এক। অর্থাৎ নিত্যপরিবর্ত্তন-শীলতা জীবেও যেমন, ব্রহ্মেও তেমন। এই নামরূপ লীলা অনাদি। সৃষ্টি বলিতে ভয় বল, কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে যাকে সৃষ্টি বলে, কর্ত্তা উপাদান উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন সকলের সংযোগে দেশকালে এই এক নির্ম্মাণ কাজ—এ ভাবে সৃষ্ট নয়, হয়ও নাই। যিনি কর্ত্তা, তিনিই উপাদান, তিনিই উদ্দেশ্য যদ তিনিই এ ভাবে যাহা হয় তাহা হইতেছে। আরম্ভ দেখি নাই, শেষ ও দেখিব না,যাহা দেখিতেছি তাহা তাইই। অতীতে ভবিষ্যতে যতদূর মানস চক্ষু যায়—এইই ভাব। ইহাকে সৃষ্টি বল, বল ক্ষতি নাই। জ্ঞান ও শক্তির লীলা, জড়ও জানিনা অজড়ও জানিনা; জানি শুধু জ্ঞান ও জ্ঞান-শক্তির মায়াবাজী।

এইরূপে বুঝা যায় মোক্ষ শাস্ত্র সাংখ্য ও আসল বেদান্ত মূলে এক। দুঃখের মূল সংসার; সংসার অবিবেক বা অবিদ্যা প্রসূত। আত্মার সহিত অনাত্মার একত্ব বোধই অজ্ঞান। উভয়ের স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানেই মুক্তি। জ্ঞানরূপী শুদ্ধাত্মাই সত্য; পরিণামী প্রকৃতি বা মায়াময়ী অবিদ্যাই মিথ্যা। অবিবেক বা অবিদ্যা নাশেই মুক্তি। কথা একই প্রতিপাদ্য একই; বলিবার ধারা, দেখিবার ধরণ আলাদা।

শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ঐতিহাসিক যুগ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

কাম্বোজদেশ তিব্বত ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, অশোক প্রভৃতির সময় ও তিব্বতকে কাম্বোজনামে অভিহিত করা হইত। নেপালী ইতিবৃত্তেও তিব্বত "কাম্বোজদেশ" নামে অভিহিত* এবং উত্তর হরিবর্ষ বা উত্তর কুরুদেশকে বর্ত্তমান সাইবেরিয়া বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ তিব্বত ও মধ্য এসিয়ার বহ্লিক যা,বাহ্ল প্রভৃতি রাজ্য যে অর্জ্জুনের অধিকৃত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখা যায়না। কিন্তু অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়ে কোনওরূপ শাসন কর্ত্তা নিয়োগ দেখিতে পাইনা। অবশ্যই যে স্থলে কোনও রাজা শরণাপন্ন হইয়াছে অথবা বিরুদ্ধাচরণ করে নাই সে স্থলেই তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। এবং সকলকে যুধিষ্ঠিরকে সম্রাট স্বীকার করিতে হইয়াছে।

এক্ষণে ভীমের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা আমাদের আলোচ্য। ভীমসেন পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয়েন, তিনি পাঞ্চাল, বিদেহ, গণ্ডক, দশার্ণ অধিকার করিলেন। দশার্ণাধিপতি সুধর্ম্মা তাঁহার সেনাপতি হইলেন। অশ্বমেধেশ্বর রোচমান পরাজিত হইল। পুলিন্দ নগরে সুকুমার ও সুমিত্রনামা ভূপালদ্বয় বশীভূত হইলেন, চেদিরাজ শিশুপাল কর প্রদান করিলেন। অবশ্যই পূর্ব্বে মগধসাম্রাজ্যের সম্রাট ভীম কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। কোশলাধিপতি বৃহদ্বল পরাজিত হইলেন। উত্তর কোশল ও মল্লাধিপতি স্ববশে নীত হইলেন। ভল্লাট ও শুক্তিমান পর্ব্বত পরাজয় করিলেন, কাশীরাজ সহিত সুবাহু বশীভূত হইল। মৎস্য ও মলদগণ এবং পশুভূমি বিজিত হইল। তৎপরে প্রতিগমনপূর্ব্বক মদধার, মহীধর ও সোমধেয়দিগকে জয় করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বৎসভূমি অধিকৃত হইল। ভর্গ ও নিষাদাধিপতি এবং মণিমান্ প্রভৃতি রাজন্যবর্গ পরাজিত হইলেন। দক্ষিণমল্ল ও ভোগবান্ পর্ব্বত অধিকৃত হইল। শান্তবাসে শর্ম্মক ও বর্ম্মকগণ সমানীত হইল, বৈদেহক ও জগতীপতি জনক পরাজয় স্বীকার করিলেন। ছলপ্রকাশে শক ও বর্ব্বরগণ আয়ত্তবশ হইল। তৎপরে মগধদেশ প্রতি ধাবমান হইলেন। গিরিব্রজে উপস্থিত হইয়া জরাসন্ধ তনয়কে সান্ত্বনা ও হস্তগত করিলেন। কর্ণকে পরাজয় করিলেন। তৎপরে পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকী কচ্ছবাসী মনৌজা রাজা পরাজিত হইল। তৎপরে সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্কটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে ও সুহ্মদিগের অধীশ্বর এবং মহাসাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণকে জয় করিলেন। মহারাজ লৌহিত্যকে পরাজয় করিলেন। সাগরকূলবাসী ম্লেচ্ছগণ নানারূপ উপহার প্রদান করিল। (মহাভারত সভাপর্ব্ব ২৮।২৯শ অধ্যায়)। এই বিবরণ হইতে দেখিতে পাই সমুদ্রমেখলা বঙ্গভূমি পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। বঙ্গ, বিহার যুক্তপ্রদেশ তাঁহার অধিকৃত ছিল। আসামের উত্তরাংশ অর্জ্জুন দখল করিলেন এবং দক্ষিণাংশ ভীমকর্তৃক অধিকৃত হইল। লৌহিত্য দেশ সম্ভবতঃ আসামের দক্ষিণাংশ। সাগর কূলবাসী ম্লেচ্ছরাজগণ ভীমকে বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু বস্ত্র, মণিমৌক্তিক, কম্বল, কাঞ্চন, রজত, বিদ্রুম প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিল।" এই ম্লেচ্ছ রাজগণ, ব্রহ্ম ও আরাকান প্রদেশস্থ রাজগণ কিনা তাহাও সুধিগণের বিবেচ্য। অবশ্যই এ সম্বন্ধে দৃঢ়তর প্রমাণ দেওয়া যায় না।

* "Nepalese tradition applies the name Kamboja-desa to Tibet (Foucher Iconographie Bouddhique P. P. 134)—Smith's E. H. I, p. p, 173 Foot note I.

যাহা হউক পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল ইহাতে সন্দেহ করিবার কোনও হেতু নাই। হইতে পারে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্তও যুধিষ্ঠিরের শাসন অঙ্গীকার করিয়াছিল। এক্ষণে দক্ষিণ দেশে যুধিষ্ঠিরের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহাই দ্রষ্টব্য। সহদেব দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি মথুরা, মৎস্যদেশ অধিকার করিলেন। অধিরাজাধিপতি দন্তবক্রকে পরাজিত ও করদরাজারূপে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। নিষাদভূমি, গোশৃঙ্গ পর্ব্বত অধিকৃত হইল, নবরাজ্য বিজিত হইল, কুন্তিভোজ প্রীতিপূর্ব্বক সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন, চর্ম্মন্বতী তীরে জম্ভকাত্মজ মহারাজ পরাজিত হইল। তথা হইতে নর্ম্মদার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অবন্তিদেশে মহাবীর বিন্দ ও অনুবিন্দকে পরাভূত করিয়া ভোজকটে গমন করিলেন। তথায় ভীষ্মক ভীষক যুদ্ধে পরাজিত হইলেন, ক্রমে পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করিলেন। কিষ্কিন্ধ্যার সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। মাহিষ্মতী নগরীতে উপনীত হইলেন। এই দেশের রাজা নীল পরাজিত হইলেন। সহদেব ক্রমে ত্রৈপুর রক্ষক ও পৌরবেশ্বর সুরাষ্ট্রাধিপতি কৌশিকাচার্য্য অসকৃতিক প্রভৃতিকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। তৎপরে সূর্পাকর তালাটক ও দণ্ডকগণ বশীভূত হইল।

সাগরদ্বীপবাসী ও ম্লেচ্ছযোনি সম্ভূত ভূপতি, নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণপ্রাবরণ, নররাক্ষসযোনিজ কালমুখ, কোলাগিরি, সুরভীপট্টন, তাম্রাক্ষদ্বীপ, রামকপর্ব্বত ও তিমিঙ্গল বশীভূত করিয়া, একপাদ পুরুষ কেরক, পঞ্চয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূতদ্বারা নিজায়ত্ত করিয়া কর সংগ্রহ করিলেন। তৎপরে সমুদ্রের কচ্ছদেশে অবস্থান করিয়াই পুলস্ত্যনন্দন বিভীষণের নিকট দূত পাঠাইলেন। বিভীষণ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার শাসন শিরোধার্য্য করিলেন।" (মহাভারত, সভাপর্ব্ব ৩০ অধ্যায়)।

এই বিবরণ হইতে মনে হয় কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠিরের প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এমন কি সিংহলও তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। তবে এক শাসন প্রণালির অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রয়াস এস্থলেও দেখিতে পাইনা। কেবল সার্ব্বভৌম সম্রাটরূপে স্বীকার করিলেই চলিয়াছে।

এস্থলে নকুলের দিগ্বিজয় বর্ণনা করিলে পশ্চিমে যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা প্রতীয়মান হইবে। রোহিতক দেশ, মরুভূমি সৈরিষক ও মহেত্থদেশ অধিকৃত হইল। তদনন্তর দশার্ণ, শিবি, ত্রিগর্ত্ত, অম্বষ্ঠ, মালব পঞ্চকর্প্পট, মধ্যমক বাটধান ও দ্বিজগণকে পরাজয় করিয়া প্রস্থান করিলেন, "পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেতনামকগণকে পরাজিত করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদ্রতীরস্থিত ও জনপদবাসী শূদ্র ও আভীরগণ, যাহারা সরস্বতী নদী আশ্রয় করিয়া মৎস্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পর্ব্বতবাসী সমস্ত পঞ্চনদ, অমর পর্ব্বত, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকটপুর ও দ্বারপালকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। অনন্তর আজ্ঞাক্রমে রামঠ, হারহূণ ও প্রতীচ্য ভূপাল দিগকে আপনার বশে আনিলেন। বাসুদেব ও যাদবগণের সহিত মিলিত হইলেন। অবশেষে শাসলে উপস্থিত হইয়া মদ্রদিগের নগর অধিকার করিয়া মাতুল শল্যকে প্রীতিপূর্ব্বক বশীভূত করিলেন। পরিশেষে সাগরগর্ভস্থ পরম দারুণ ম্লেচ্ছপহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে বশীভূত করিলেন। (মহাভারত-সভাপর্ব্ব ৩১ অধ্যায় সিংহ সংস্করণ)।

যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য পশ্চিমদিকে সিন্ধু, বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। মালব রাজপুতনা তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনায়াসে প্রতীয়মান হয়। মরুভূমি সৈরীষক রাজপুতনা বলিয়াই বোধ হয়। এস্থলে একটু বিশেষ জিনিষ দেখিতে পাই, নকুল মালব প্রভৃতি জয় করিয়া দ্বিজগণকে পরাজিত করিলেন, এবং "পুষ্করারণ্যবাসী উৎসবসঙ্কেতনামকগণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন" এই দ্বিজগণ ও উৎসবসঙ্কেতগণ সম্ভবতঃ গণতন্ত্র শাসন প্রণালীতে শাসিত হইত। কারণ এরূপ "গণ" অন্য কোথাও উল্লিখিত দেখিতে পাইনা। কোনও রাজার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত এখানে করা হয় নাই। "দ্বিজগণ" ও "উৎসবসঙ্কেত নামকগণ" বলায় সাধারণ তন্ত্র বলিয়াই বোধ হয়। বিশেষতঃ সেকেন্দরের আক্রমণ কালেও এই প্রদেশে গণতন্ত্র দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত বংশের সমুদ্র গুপ্তের সময়ও এই প্রদেশে গণতন্ত্র বিদ্যমান ছিল। সমুদ্র গুপ্তের

সময়েও আভীরগণকে গণতন্ত্র শাসন প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাই। মহাভারতীয় বিবরণেও আভীর গণের উল্লেখ রহিয়াছে। এই সকল কারণে প্রতীতি হয় মহাভারতীয় যুগেও ঐ প্রদেশে সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল।

যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য যে বহুদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল তাই পাইলাম। মৌর্য্য সময়ের সাম্রাজ্য হইতে যে বিশেষত্ব তাহাও পরিদৃষ্ট হইল। মৌর্য্য সময়ে রাজ প্রতিনিধিগণ শাসন করিত। মহাভারতীয় যুগে তদ্দেশবাসী রাজগণকেই অনেকক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বৈদেশিক দৃষ্টান্তের অনুকরণে হয় নাই। পারস্যসাম্রাজ্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠিত হয় নাই। মৌর্য্য সাম্রাজ্যে গ্রীকগণের প্রভাব ছিল না। ইহা ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। স্মিথ সাহেবের মতে পারস্য রাজ্যই আদর্শ রূপে চন্দ্রগুপ্তের নিকট বিভাত ছিল। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন,—"The Maurya empire was not, as some recent Writers fancy that it Was, in any way the result of Alexander's splendid but transitory raid, The nineteen months which he spent in India were consumed in devastating warfare, and his death reduced fruitless all his grand constrative plans. ChandraGupta did not need Alexander's example to teach him what empire meant. He and his countrymen had had before their eyes for ages the stately fabric of the Persian monarchy and it was that empire which impressed their imagination and served as the model for their institutions, in so far as they were not indegenous. The little touches of foreign manners in the court and institutions of Chandra Gupta, which chance to have been noted by our fragmentary authorities, are Persian, not Greek; and the Persian title of satrap continued to be used by Indian Provincial Governors for ages down to the close of the fourth cenury A. D.

E, H. I. pp. 136-137.

অর্থাৎ কাহারও কাহারও মতে সেকেন্দরের বিপুল কিন্তু অল্পকাল স্থায়ী আক্রমণই মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কারণ, আমাদের তাহা মনে হয় না। ১৯ মাস সেকেন্দর ভারতবর্ষে ছিলেন, এই সময় যুদ্ধেই অতিবাহিত হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর সহিতই সকল প্রতিষ্ঠান-শক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সাম্রাজ্য কি বস্তু বুঝিবার জন্য সেকেন্দরের দৃষ্টান্তের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাঁহারও দেশবাসীর সম্মুখে বহুশতাব্দীব্যাপী পারস্য রাজ্য ছিল, এই সাম্রাজ্যই তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল, দেশীয় ভাব ব্যতীত যে বৈদেশীক ভাব শাসন-প্রণালিতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহার আদর্শ ঐ পারস্য সাম্রাজ্য। ঐতিহাসিকগণ চন্দ্রগুপ্তের দরবারে ও শাসন-তন্ত্রে যে বৈদেশীক ভাবের ক্ষীণ আভাস দেখিয়াছেন তাহা গ্রীক প্রভাব জানিত নহে, উহা পারসিক প্রভাবের ফল। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ "satrap" এই পারসিক পদবীতে অভিহিত হইতেন। খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্তও শাসন কর্ত্তাগণের এই উপাধি ছিল"

আমাদের মনে হয় সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ সম্বন্ধে চন্দ্রগুপ্ত পারসিকগণের নিকট ঋণী নহেন, প্রথম কারণ রামায়ণ ও মহাভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট; রামায়ণী ও মহাভারতীয় আদর্শেই চন্দ্রগুপ্ত অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। চাণক্য যাঁহার মন্ত্রী ও গুরু, তাঁহার পক্ষে বৈদেশিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া অসম্ভব। অর্থশাস্ত্রের বিধান অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের শাসন কার্য্য পরিচালিত হইত। অর্থশাস্ত্র প্রাচীন ঋষিগণের প্রণীত শাস্ত্রের সার সংগ্রহ। চাণক্য অর্থ শাস্ত্রের প্রথমেই লিখিতেছেন,—

"পৃথিবী লাভ ও পালনের জন্য আর্য্য ঋষিগণ প্রণীত সকল রাজনীতি শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া এই অর্থশাস্ত্র প্রণীত হইল।"

অর্থশাস্ত্র, ১ম অধ্যায় (Samaddar's Ed.)

রামায়ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবার কারণও যথেষ্ট বিদ্যমান। রামায়ণ ও মহাভারত ভারতীয় সকল ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ আদর্শ এই দুই গ্রন্থ হইতে, প্রাচীন কাল হইতেই পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। রামায়ণী আদর্শ সম্বন্ধে স্মিথ সাহেব (ফুট নোটে) পাদটীকা লিখিয়াছেন, "A patriotic Hindu critic urges that Chandra Gupta needed to go no further for his model than the story of Dasaratha in the Ramayana" যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য গঠনের আদর্শও চন্দ্রগুপ্তের সম্মুখে প্রকট ছিল, মহাভারতে সাম্রাজ্য গঠনের প্রয়াস সম্বন্ধে বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়, রাজসূয় যজ্ঞ প্রণোদিত করিবার সময়ে নারদ বহুতর সম্রাটের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বের অষ্টম অধ্যায়ে নারদ কর্ত্তৃক যমের সভাবর্ণন প্রসঙ্গে এই সকল সম্রাটগণের নাম বিবৃত হইয়াছে। ব্যাসদেব যখন যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবর্ত্তিত করেন তখন মরুত্ত রাজার বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন। মহাভারতে দেখিতে পাই "ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীপতি মরুত্ত সমস্ত রাজাদিগের সহিত সেই স্থানেই যজ্ঞ করিয়াছিলেন'—মহাভারত আশ্বমেধ পর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায় (বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদ)।

বৈদিক যুগ হইতেই অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ প্রচলিত। এই যজ্ঞে কেবল ক্ষত্রিয়ের অধিকার। সম্রাট ব্যতীত অন্যের এই যজ্ঞে অধিকার নাই। বৈদিক সময় হইতেই রাজন্যবর্গ সাম্রাজ্য গঠনে তৎপর। অতএব নিঃসংশয়ে বলিতে পারি চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ পারসিকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়েন নাই। এ সম্বন্ধে আরও অনেক ভাবিবার আছে, ভারতীয় জাতির স্বভাবের বিশেষত্ব আছে, অন্যান্য জাতিকে ও ধর্ম্মকে ভারতীয় জাতি ভারতে স্থান দিয়াছে, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মমত বা রাজনীতি গ্রহণ করে নাই। ভারতীয় স্বভাব অনেকটা পরিমাণে আত্মনিষ্ঠ এই আত্মনিষ্ঠার জন্যই ভারতীয় জাতি বৈদেশিক আদর্শ গ্রহণ করে নাই। চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। অন্য কারণ, অশোক যখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী তখন তিনি অন্যান্য জাতিকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রভাবিত করিয়াছেন সত্য কিন্তু অন্যান্য জাতি হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ভারত অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করে নাই, পরন্তু অন্যকে নিজের ভাবে ভাবিত করিয়াছে। ভারত এই বিশেষত্বের বলেই হুনরাজা মিহিরকুলকে শৈব ধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিল। শকরাজগণের মধ্যেও হুবিষ্ক পুত্র বাসুদেব হিন্দুভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন, এসম্বন্ধে স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন,—

Huvishka was succeeded by Vasudeva whose thoroughly Indian name, a synonym of vishnu, is a proof of the rapidity with which the foreign invaders had succumbed to the influence of their environment. Testimony to the same fact is borne by his coins, almost all of which exhibit on the reverse the figure of the Indian God Siva, attended by his bull Nandi and accompanied by the noose, trident and other insignia of Hindu iconography"

E. H. I. p. p. 253-254 (2nd Ed.)

ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে অন্য দেশের ভাব ভারত গ্রহণ করে নাই, ভারতীয় মৌলিক ভাব বহু শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিয়াছে। দুই চারিটা আচার পারসীকগণ গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু গ্রীকগণ যেরূপ ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, পারসীক প্রভাবও তদ্রূপ কার্য্যকারী হয় নাই। এস্থলে আরও একটা চিন্তার বিষয় বর্ত্তমান, ভারতীয় ও পারসীক জাতির সহিত অতি প্রাচীন কাল হইতেই সম্বন্ধ ছিল। পারসীকগণের জেন্দআবেস্তা গ্রন্থের দেবগণের সহিত বৈদিক দেবগণের সাদৃশ্য বিদ্যমান। 'সুর' ও 'অসুর' শব্দের সহিত 'হুর' ও 'অহুর' প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্য বর্ত্তমান। এরূপ বহু জিনিসের সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকাতে কে কাহার প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে বলা কঠিন। পারসীক সাম্রাজ্য গঠনের মূল উপাদান ভারতীয় বৈদিক গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করা অসম্ভব নহে।

মাথা মুণ্ডিত করিয়া শাস্তি প্রদান পারসিকগণের নিকট

হইতে পরিগৃহীত হইতে পারে * কিন্তু রাষ্ট্রীর মৌলিক উপাদন ভারতীয়। স্মিথ্ সাহেব নিজেও স্বীকার করিয়াছেন শাসন ও সমাজ মৌর্য্য কালে মূলতঃ ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিল। সামান্য পারসিক আচার দু একটী গ্রহণ করিতে পারে, তিনি লিখিতেছেন—

"The Indian administration and society so well described by Mogastheanes, the ambassador of Solukos, were Hindu in character with some features borrowed from Persia but none from Greece" E. H. I. pp. 225.

এই স্থলেই তিনি আরও বলিয়াছেন গ্রীকগণের প্রভাব কেবল চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য কোনও বিষয়ে পরিদৃষ্ট হয় না। তিনি লিখিতেছেন—

"Although it certainly appears to be true that Indian Plastic and pictorial art, such as it was drew its inspiration from Hellenistic Alexandrian models during the Maurya period, the Greek influence merely touched the figure of Hindu civilization and was powerless to modify the structure of Indian Institutions in any essential respot." E. H. I. pp. 225.

গ্রীক প্রভাবে ভারত যেমন প্রভাবিত হয় নাই সেরূপ পারসীক প্রভাবেও প্রভাবিত হয় নাই। অশোকের স্তম্ভে যে পারসীক ভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা কেবল ভাস্কর্য্যের সম্বন্ধেই পরিদৃষ্ট হয়। * শাসন শৃঙ্খলার আদর্শ ও সামাজিক আদর্শ বিদেশ হইতে গৃহীত হয় নাই। উহা ভারতের নিজস্ব, বৈদিক যুগ হইতে "অশ্বমেধ" "রাজসূয়" প্রভৃতির অনুষ্ঠান চালিয়া আসিয়াছে। (ক্রমশঃ)

স্বদেশ ও সাধনা

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

"হে ভারত সর্ব্ব দুঃখে রহ তুমি জাগি'
সরল নির্ম্মলচিত্ত; সকল বন্ধনে
আত্মারে স্বাধীন রাখি;"

* * * *

"স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে কর প্রতিষ্ঠিত,
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ কর চিত!"

* * * *

"তাঁরি হস্ত হতে নিয়ো তব দুঃখভার,
হে দুঃখী হে দীনহীন! দীনতা তোমার
ধরিবে ঐশ্বর্য্য-দীপ্তি, যদি নত রহে
তাঁরি দ্বারে! আর কেহ নহে নহে নহে
তিনি ছাড়া আর কেহ নাই ত্রিসংসারে
যাঁর কাছে তব শির লুটাইতে পারে—"

"এই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, এই সৃজনের প্রারম্ভে * * * প্রণাম করি তাঁকে যিনি আমাদের এই দেশে আহ্বান

---

* "In certain unspecified cases, serious offences were punished by the shaving of the offender's hair, a penalty regarded as specially infamous" E. H. I. pp. 128 See also note 3 "This was a Persian punishment,

* "The style is Persian rather than Greek and the mechanical execution is perfect" E. H. I. pp. 153.

রেছেন—ভোগ করবার জন্য নয় ত্যাগ করবার জন্য।" আজ পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যশালী জাতিরা ঐশ্বর্য্য ভোগ করছে কিন্তু তিনি আমাদের জন্ম দিয়াছেন জীর্ণ কন্থার উপরে—আমাদের তিনি ভার দিয়াছেন" দুঃখ সইবার জন্য "দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিবার" জন্য। তিনি বলেছেন, অভাবের মধ্যে তোমাদের পাঠালাম তোমরা আমার বীর পুত্র সব! ভোগবিলাসকে প্রশয় দিয়ো না—রিক্ততাকেই তোমার পরম আশ্রয় করো!

আমরা দরিদ্র বলেই নিজের সত্য শক্তিকে আমাদের নিতান্তই স্বীকার করতে হ'বে। আমরা যে এত স্তুপাকার অজ্ঞান রোগ দুঃখ দারিদ্র্য-যুগ্ম সংস্কারের দুর্গদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা ছোট নই!—আমরা বড়—একথা সবেই প্রকাশ—নইলে শঙ্কট আমাদের সামনে কেন? সেই কথা স্মরণ করে যিনি দুঃখ দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি অপমান দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম, যিনি দারিদ্র্য দিয়েছেন তাঁকে প্রণাম।"

হে আমার স্বদেশ, তোমাকে আজ "আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি সেত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে নয়—সেখানে দুর্ভিক্ষ দারিদ্র্য, সেখানে কষ্ট আর অপমান! সেখানে গান গেয়ে ফুল দিয়ে পূজো নয়, সেখানে প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে পূজো করতে হ'বে।—আমার কাছে সেইটাই বড় আনন্দ মনে হচ্চে!—সেখানে সুখ দিয়ে ভোলাবার কিছু নেই—সেখানে নিজের জোরে সম্পূর্ণ জাগতে হ'বে সম্পূর্ণ দিতে হ'বে।—মাধুর্য্য নয়, এ একটা দুর্দ্ধর্ষ দুঃসহ আবির্ভাব; এ নিষ্ঠুর, এ ভয়ঙ্কর! এর মধ্যে সেই কঠিন ঝঙ্কার আছে যাতে করে' সপ্তসুর এক সঙ্গে বেজে ওঠে'—তাঁর ছিঁড়ে পড়ে যায়! মনে করলে বুকের মধ্যে উল্লাস জেগে উঠে! আমার মনে হয় এই আনন্দই পুরুষের আনন্দ—এই হচ্চে জীবনের তাণ্ডব নৃত্য—পুরাতনের প্রলয় যজ্ঞের আগুনের শিখার উপরে নূতনের অপরূপ মূর্ত্তি দেখবার জন্যই পুরুষের সাধনা!

বাঙলার বাঙালী আমি, দীন দরিদ্র ভারতের সন্তান আমি, অত্যাচারে উৎপীড়িত হৃতসর্ব্বস্ব আমি, রিক্ত কাঙাল উৎপাত অপহার জাতি আমি, তবু মানি—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যে তোমারে করে অপমান
আপনার দৃপ্ত বলে রিক্ততার বাড়ায় সম্মান,
এই চাহি আমি
দুর্জ্জয় দৈন্যের মাঝে হে অচল তুমি থাক স্বামী!

হে আমার জন্ম জন্মান্তরের সাধনভূমি বাঙলা, তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার! তোমার সৌভাগ্য জানি, দুর্ভাগ্যকেও মানি, কিন্তু তুমি যে তোমার সনাতন সত্যকে তোমার চরণের আশিষ-নির্ম্মাল্যের মত এখনও আর্ত্ত আতুরের মধ্যে বিতরণ করছ এইখানেই ত তোমার সৌন্দর্য্য, এইখানেই ত তোমার গৌরব!! তুমিত শুধু আমার বহিরিন্দ্রিয়কে তোমার শোভাসম্ভারে মুগ্ধ কর নাই, তুমি তোমার অন্তরের অমূল্য সম্পদে আমাকে ধন্য করেছ।

হে আমার সুন্দর দেশ,—তুমি শ্যামায়মান বনশ্রীতে নিবিড় হয়ে প্রাণকে স্পর্শ করে আছ, তোমার "দিগন্ত প্রসার ক্ষেত্র' যে আমার এই দুটী মুগ্ধ নেত্রকে অপলক করে রেখেছ। তোমার স্নিগ্ধ নদীর কল কল ধ্বনি আমার উৎকর্ণ অতৃপ্তির মধ্যে মায়ের স্নেহ আহ্বানের মত নিয়ত মধুর হয়ে আছে। শীতে বসন্তে নিদাঘে, বর্ষায় শরতে হেমন্তে, তুমি তোমার আলো বাতাসের অমোঘস্পর্শে অফুরন্ত রস গন্ধের মহিমায়, ধরণীর মাধুর্য্য-অনুভূতিতে তুমি যে আমাকে অভিভূত করে রেখেছ—

* * * এই বাঙ্গালার
দিগন্ত প্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নিলাম্বরে
আচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জ্জনতটে বাজায় কিঙ্কিনী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া সাথে মিশি স্নিগ্ধ পল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে;—

আমিত তারই অনুরাগী। আমার বাঙালী জীবনের সাধ সাধনা, ধ্যান ধারণা ত বাঙলার মাটির সঙ্গে মিশে আছে—

এইত আমার স্বদেশ, বাইরের নিয়ত উৎসারিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমি যেমন আমার স্বদেশের বানী মূর্ত্তিকে প্রকট দেখছি—অন্তরের মধ্যেও তেমনি অনুভব করছি আমার দেশের ভাবময়ী সনাতনী অধিষ্ঠাত্রী দেবী অখণ্ড রসে পরিপূর্ণ, সর্ব্বকল্যাণসংবিধায়িনী জননীকে!

আমার ভিতর বাহির এক করেছে
সেইত আমার দেশের মাটি
ও তার রূপের জোয়ার ঢেউ তুলেছে
মাগ্‌না খোলা ভাবের ভাঁটি।

বাঙালী! তুমিত আজীবন ভাবের সাধক, তোমার ভাবনা ধারণাত ভগবানের দান—তুমি স্বদেশকে ভাবসাধনায় অন্তরের সামগ্রী করে তোল, দেশাত্মবোধকে নিয়ত জাগ্রত চৈতন্যের মধ্যে রাখলে তোমার আদর্শ তোমার অন্তর-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

স্বদেশের সাধনাত সামান্য কথা নয়—সে যে যুগব্যাপী জন্মজন্মান্তর কাল পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে, সেযে আমাদের দেহের সকল কর্ম্মশক্তিকে ব্যগ্র বাহুর দ্বারা আলিঙ্গন করিতে চায়! সেত সংবাদ পত্রের দু' এক স্তম্ভে লিপিচাতুর্য্য দেখান নয়, বক্তৃতামঞ্চ হইতে ওজস্বিনী ভাষায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মরণকে বরণ করার সাহস দেখাইয়া সমাগত শ্রোতৃবর্গের করতালি প্রাপ্তির মধ্যেই পর্য্যবসিত নয়। বহুদিন হইতে "সাধা কথার ছাঁদা বুলি" অনেক শুনিয়া আসিতেছি, দেশহিতৈষণার ছলে আত্মস্বার্থ সিদ্ধির অনেক প্রকার সহজ পন্থার নিদর্শনও পাইয়াছি, কিন্তু আর নয়; এখন এই মহাসৃষ্টির সময় চাই প্রাণমন ঢালিয়া সাধনা।

আজ দেশের, এই মহা অভ্যুদয়ের দিনে আমাদের স্বদেশসাধনা যেন নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধের দুরূহতার মধ্যে সুন্দর ও সফল হইয়া ওঠে।

আমরা যেন আমাদের "দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে, ব্রহ্মকে, জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে সমস্ত অনৈক্য ও বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্ম্মশালার কঠোর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মুক্তিময় উদার নির্ম্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া" দিতে পারি। "শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খৃষ্টান, পূর্ব্ব ও পশ্চিম কাহারো প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই।" ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক করিবার জন্য আমরা আজীবন সাধনা করিব।—"জগতের সম্মুখে মানবতার মহান আদর্শ সুসংস্থাপিত করিবার জন্য ধর্ম্মের নামে, সত্যের নামে, প্রীতির নামে, চরিত্রতার নামে, মনুষ্যত্বের নামে, দেবত্বের নামে, প্রসন্ন চিত্তে আমরা আমাদের সমস্ত জীবনকে উৎসর্গ করিব।" এইত আমার স্বদেশ-সাধনা, এ সাধনার মূলমন্ত্র একতা স্বার্থত্যাগ, অকৃত্রিম অনাবিল স্বদেশ প্রীতি! এ মহামন্ত্রে কৃপণ মুক্তহস্ত হয়, আত্মম্ভরী পরসেবাব্রত-গ্রহণ করে, কাপুরুষ লজ্জাহীন চির বিভীষিকা বিসর্জ্জন দেয়।

স্বদেশ-দেবতার এই সাধনা ত কোনও বিশেষ দেবালয়ে নয়, লোকালয়ে নয়, কোনও সম্প্রদায় বিশেষের কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে নয়!—আমার স্বদেশ-দেবতার পাদপীঠ আমাদের শতধা-বিদীর্ণ রক্তসিক্ত ছিন্ন-হৃদয়-কমলের দলে দলে, আমাদের সাধনার ক্ষেত্র অসহায় দীন দুঃখী ভারতবাসীর কুটীরে কুটীরে,—যেখানে অনশনে ক্লিষ্ট রোগজীর্ণ অত্যাচার প্রপীড়িত আর্ত্তপ্রাণ শ্বাসরোধের অপেক্ষায় মাত্র আছে। আমাদের কর্ম্মচেষ্টার গতিকে আমরা যে আজ সেই দিকেই নিয়ন্ত্রিত করিব! যেখানে সোনার ভারতের পোড়া মাঠে, শতছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত দুর্ভাগা কৃষকগুলি, গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র ভোগ করিয়া, বরষার অবিরাম বর্ষণ মাথা পাতিয়া সহ্য করিয়া, মুখ বুজিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না, আমার অন্তরের সমস্ত শক্তিকে আজ সেখানেই নিয়োগ করিতে হইবে। যেখানে মানুষের নির্ম্মম ব্যভিচার নিয়ম ও শৃঙ্খলার দোহাই দিয়া নারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করছে, মানুষের সম্মান রাখছে না, জাতীর স্বাভাবিক অভ্যুত্থানকে স্বীকার না করে আঘাতের পর আঘাত করে যাচ্ছে, জাতি বিগত মনুষ্যত্ব খর্ব্ব, মনুষ্যত্বের পদে পদে অসম্মান, সেখানেই যে আজ আমাদের সাধনার সূচনা আর সেই খানেই যে ভারতের সর্ব্বমঙ্গল সাধনের দ্বারা আমাদের এই স্বদেশ-সাধনার মহাব্রত উদ্‌যাপন করতে হবে—মাভৈঃ! তারজন্য—

রে মৃত ভারত,
শুধু সেই এক আছে, নাহি অন্য পথ।

বাঙলা দেশের সেকালের কথা

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে W. Ward নামে একজন ইংরেজ The History, Literature and Religions of the Hindoos নামে এক খানি বই লেখেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে বইখানির বিষয়গুলির আবিষ্কার হয় নি। গ্রন্থকার স্বয়ং এদেশে বাস ক'রে, দেখে শুনে লিখিত বিষয়গুলির বর্ণনা করেছেন। সেই বর্ণনা থেকে সেকালের বাঙলার এই বিবরণ সংকলিত হ'ল।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সবেমাত্র বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পেয়েছেন। নবাবের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে বটে কিন্তু প্রজার সঙ্গে কোন পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয় নি। কেউ বলে বাঙলার কৃষক কোম্পানীর প্রজা, কেউ বলে জমিদারের প্রজা। জমিদার বাস্তবিক ভূম্যধিকারী কি নামে মাত্র ভূম্যধিকারী তা তখনও স্থির হয় নি। কিন্তু জমিদার খাজনা আদায় করে গবর্ণমেণ্টকে দেন এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রজার কাছ থেকে টাকায় চার আনা অতিরিক্ত আদায় করে নেন। এছাড়া আমলার বেতন, নজর বা সেলামী, বিবাহাদি উপলক্ষে দানও নিয়ে থাকেন। কৃষক তার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদনটা পায়। এক হাজার গ্রাম খুঁজিলে হয় ত একটি ধনি কৃষক পাওয়া যায়। চল্লিশ পঞ্চাশটা গোরু-বাছুর আছে এমন একজন কৃষক তিনখানা গ্রামের মধ্যে একখানা গ্রামে পাওয়া কঠিন। ইংলণ্ডে যেমন স্বাধীন, সাহসী, সুখী কৃষীবল (yeomanry) দেখতে পাওয়া যায়, এ দেশে তা অতি দুর্লভ। ফসল কাটার আগে জমিদারের খাজনা দিতে পারে এমন কৃষকের সংখ্যা অতি অল্প। জমিতেই ফসল থাকতে তার ওপর দাদন নিয়ে অনেককে খাজনা দিতে হয়। কার্য্যতঃ বাঙলার অধিকাংশ কৃষকই শস্য-ব্যাপারীর চাকর মাত্র। এই ব্যাপারী বা মহাজন কৃষকের পক্ষ থেকে জমিদারকে খাজনা দেয় এবং যতদিন না ফসল কাটা হয় ততদিন তার সংসার খরচটাও চালিয়ে দেয়। ফসল কাটা হলে এই সমস্তর হিসাব হয়। হিসাব হলে মহাজনকে দিয়ে যদি কিছু বাঁচে ত কৃষক তা পায়। আর ফসলের দামের চেয়ে ঋণের পরিমাণ যদি বেশী হয়ে যায় ত মহাজনের খাতায় কৃষকের নামে সেটা আবার ঋণ বলে লেখা হয়। পরবৎসর যদি ফসল ভাল হয় ত ঋণ শোধ হয়। আর কৃষকের দুর্ভাগ্যে যদি তা না হয় ত মহাজন তার জমিজমা বেচে নিয়ে তাকে পথের ভিখারী করে ছেড়ে দেয়।

খাজনা ধার্য্য হয় জমির গুণ অনুসারে। রেশম পোকার জন্য তুঁতের চাষের উপযুক্ত জমির খাজনা বিঘাপ্রতি পাঁচ টাকারও বেশী। ধানের জমির খাজনা বিঘাকরা আট আনা থেকে দু টাকা। যেখানে ভাল ধান জন্মায় সেখানে ধান টাকায় চার মণ পাওয়া যায়। বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবশ্য দাম এর চেয়ে বেশী। মধ্যবিত্ত লোকেরা যে চাল খায় কল্‌কাতায় তার দাম দেড় টাকা বা দু টাকা মণ। যেখানে ধান প্রচুর জন্মে সেখানে চালের দাম দশ আনা বার আনা মণ। সকল জিনিষ পত্রই খুব সস্তা। গম একটাকা মণ, যব আট আনা, মটর ছ আনা, সরষের তেল চার টাকা, ঘি দশ টাকা বার টাকা, চিনি চার টাকা, গুড় দেড় টাকা, মরিচ চার আনা সের, জয়িত্রী ষোল টাকা, দুধ টাকায় এক মণ দশসের, দই ঐ রকম, মাখন আট আনা সের, পাউরুটী টাকায় কুড়ি খানা বা দশ সের, নুন তিন টাকা মণ। গৃহপালিত পশু—দুধাল গাই একটা পাঁচ টাকা, একটি বাছুর একটা আট আনা,

এক জোড়া ভাল বলদ আট টাকা, দুধাল মহিষ একটা কুড়ি টাকা, ভেড়া ভাল একটা বার আনা, সাধারণ ভেড়া একটা আট আনা, দুধাল ছাগল একটা দু টাকা, পাঁঠা আট আনা, ছাগল বা ভেড়ার বাচ্চা চার আনা, কচ্ছপ একটা পাঁচ আনা, ডিম টাকায় দেড়শ, শূয়র মাঝারি রকমের একটা আট আনা, বন্য হরিণ একটা এক টাকা, পেরু একটা চার টাকা থেকে ছ টাকা, ময়ূর দু আনা, খরগোস এক জোড়া আট আনা, সজারু একটা দু'আনা। বালক বালিকাও গৃহস্থালীর কায কর্ম্মের জন্য অনেক স্থানে বিক্রী হয় বিশেষতঃ হরিহরছত্রে। একটী বালকের মূল্য তিন টাকা; বালিকার মূল্য দু'টাকা। কল্‌-কাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে জিনিষ পত্রের দাম এর চেয়ে শত করা পঁচিশ টাকা বেশী। অন্য অন্য স্থানে স্থানীয় অবস্থা অনুসারে কিছু কম বা বেশী। দিনাজপুরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র খুব সস্তা।

দিন-মজুরের মজুরি ছিল দৈনিক এক পেনী তখনকার হিসাবে এক পেনীর মূল্য তিন পয়সা। কোন কোন স্থানে দেড় পেনী, দু পেনীও ছিল। কল্‌কাতায় দিন-মজুরের দৈনিক মজুরি তিন পেনী, রাজ মিস্ত্রীর পাঁচ পেনী, সাধারণ ছুতোরের ৪ পেনী-থেকে ৬ পেনী, ভাল ছুতোরের এক শিলিঙ। এখনকার দিনে এই অত্যল্প মজুরির আয়ে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু তখন তাহাতেই এক রকম করে চলত। জ্বালানী কাঠ কিনতে হত না। শাক সবজী, ফলমূলও বিনামূল্যে পেত। মুসলমানেরা মুরগী পুষত। হিন্দুদের অনেকেরই বাড়ীর জমিতে দুটো চারটে ফলের গাছ থাকত। এসকল থেকেও কিছু আয় হত। তা ছাড়া জীবন ধারণের প্রণালীও অতি সহজ ছিল। জুতো পায়ে দেওয়া বা হ্যাট মাথায় দেওয়া ছিল না। মাটির ওপর একখানি মাদুর মাত্র বিছানা। পোষাকের মধ্যে দু জোড়া ধুতি বা শাড়ী তা গৃহিনীর হাতের চরকা কাটা সুতাতেই হত। শিশু-সন্তানগুলি উলঙ্গই থাকত। একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তান নিয়ে যে পরিবার, তাদের মাসে দু মণ চা'ল লাগে। দু'মণ চালের দাম একটাকা কি দেড় টাকা। মজুরির ওপর বা সামান্য কিছু আয় হত তাই দিয়ে নুন তেল হত। গরীব লোকের সাধারণ খাদ্য ভাত শাক সবজী আর কাঁচা লঙ্কা। এর ওপর শ্রেণীর লোকে ভাতের সঙ্গে একটু তেল ও খায়। সাধারণ লোকে আলোর জন্য তেল জ্বালাত। বাতী ছুঁতো না। তবে ঠাকুর ঘরে বড় লোকেরা মোম বাতী জ্বালাত। পল্লীগ্রামে বাড়ী ভাড়ার প্রথা নাই। অতি গরীব লোকও একটু জমি নিয়ে নিজের ব্যয়ে তার ওপর ঘর করে'। সে জমির খাজনাও বছরে দু'আনা।

কাপাস সুতোর কাপড়ই (Cotton piece goods) দেশের প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য। তখন তুলোর চাষও ছিল খুব। তুলোর মণ ছিল চার টাকা থেকে আট টাকা। সকল জাতের স্ত্রীলোকই চরকায় সুতো কাটত। তাই চরকা তখনকার বিলিতি চরকার মতই ছিল, কেবল একটু ছোট। এক এক ঘরের গৃহিনী সংসারের অন্য সব কায করেও মাসে সাত শিলিং [তিন চার টাকা] দামের সুতো তয়ের করতে পারত। কাপড় প্রায় কেউ কিনে পরত না। ঘরের চরকার তৈরী সুতো তাঁতীকে দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিত। তাঁতীও প্রায় সকল গ্রামেই ছিল। শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, হরিপাল, বরাহনগর, চন্দ্রকোনা, ঢাকা, রাজবলহাট, কৃষ্ণ-দেবপুর, ক্ষীরপাই, রাধানগর, বেলকুচি, হেরেলা গ্রামে ভাল মিহি কাপড় তয়ের হত।

শান্তিপুর, পেঁড়ো, দ্বারহাট, ক্ষীরপাই, রাধানগর, ঘাটাল, ঢাকা, মালদহ, জঙ্গীপুর, রাজমহল, হেরেলা, বেল-কুচি, নদীয়া, রামপুর, বোয়ালিয়া, সোণারগাঁ; চন্দ্রকোনা এবং বীরভূমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি ছিল। এই সকল কুঠী থেকে তাঁতীদের দাদন দেওয়া হত। তাঁতীরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফরমাইশ মত কাপড় তয়ের করে এনে দিত। ঢাকার কুঠীতে একবার এক বৎসর আশী লক্ষ টাকার কাপড় কেনা হয়েছিল। লেখক (W. Ward) বলেন কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী তাঁকে এই কথা বলেছিলেন, কিন্তু ঠিক কোন সালের কথা তা তিনি ভুলে গিয়েছেন। শান্তিপুর ও মালদহে বৎসরে বারলক্ষ থেকে পনরলক্ষ টাকার কাপড় কেনা হত। অন্য অন্য স্থানেও দু লক্ষ থেকে বার লক্ষ টাকার কাপড় কেনা হত।

বাঙালী ব্যবসাদারদেরও অনেক কুঠী ছিল। তাদের মধ্যেও অনেকে কুড়ি হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার কাপড় খরিদ বিক্রী করত। কেউ কেউ দু-তিন লাখ টাকার কাপড়ও খরিদ করত।

শান্তিপুর ও ঢাকায় মসলিন তয়ের হত। এক এক থান মসলিন একশ টাকায় বিক্রী হত। লেখক (W. Ward) বলেন এ বিষয়ে হিন্দু শিল্পীদের কলাকৌশল-জ্ঞান অতি আশ্চর্য্যজনক। অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ করে তিনি জেনেছিলেন যে সোণারগাঁ ও বিক্রমপুরে কয়েক ঘর তাঁতী ছিল যারা অতি সূক্ষ্ম মসলিন তয়ের করতে পারত। এক এক থান মসলিন বুনতে চার মাস সময় লাগত এবং তা পাঁচ শ টাকায় বিক্রী হত। ঘাসের ওপর বিছিয়ে রেখে তার ওপর শিশির পড়তে দিলে, কাপড় আর দেখতে পাওয়া যেত না।

বালুচর, বাঁকুড়া ও অন্য অন্য স্থানে রেশমের কাপড় তয়ের হত। এর অধিকাংশ কোম্পানী কিনে নিত। দেশী ব্যবসাদারেরাও অনেক কিনিত।

যে সকল কাপড় রপ্তানি হত, তার মধ্যে প্রধান—তিন রকম মলমল, চার রকম নয়নসুখ, তরমদান, খাসা, সরবতী গড়, পাটনাই, ভাগলপুরী, ঢাকাই, জামদান, ডুরিয়া, চারখানা, রুমাল, বাঁদীপোতা, পালঙপোষ, স্করবতী, লংক্লত দোসূতী, তে-হাতা, বুলবুল চশমা, ছিট, খড়েয়া, নেনারসী বুটিদার, সুকরফেণী, তারতর, কালাগিলা, ক্ষীরশক্র, কারাধারী, কুটনী, সুসী তিমিতি, বাফতা ইত্যাদি। হিন্দুস্থানের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশেই বয়ন শিল্প খুব প্রচলিত ছিল। কত রকম কাপড় যে তয়ের হত তার বর্ণনা করা সুসাধ্য নয়। বাঙলা দেশ ও তার নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যে সকল কাপড় তয়ের হত তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এই শিল্পের বিস্তার সম্বন্ধে একটা সামান্য ধারণা হতে পারে। সূতোর সূক্ষ্মতা ও বুননের গাঢ়তা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন নামের মসলিন ঢাকা অঞ্চলে তয়ের হত। সাদা মসলিন ছাড়া, ডুরে ও চারখানা মসলিনও হত। খুব মিহি মসলিন ঢাকা ছাড়া প্রায় আর কোথাও হত না। অন্য রকমের মসলিন গঙ্গার পশ্চিম প্রদেশে হত। আর কতকগুলি সকল প্রদেশেই হত। ঢাকার অতুলনীয় মসলিনের সঙ্গে তুলনার যোগ্য না হলেও সাধারণ ব্যবহারের যোগ্য সাদা ও ফুলদার মসলিন কাশীর উত্তর প্রদেশে অনেক পরিমাণে হত। কালিকো নামে আর একরকমের কাপড়ও বহুল পরিমাণে তয়ের হত। কালিকো (Calico) এক শ্রেণীর কাপড়ের সাধারণ নাম। এর ইংরেজী নাম এখনও হয় নি, সুতরাং এই নামেই এ কাপড় এদেশে ও ইউরোপে পরিচিত। উত্তর বাঙলায় মহানন্দা ও ইচ্ছামতী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে "খাসা" তয়ের হত। বাঙলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে লক্ষ্মীপুরের নিকটে বাফতা তয়ের হত। ওড়িষ্যার প্রধান বস্ত্র "সানা"। মেদিনীপুরের নিকটেও এ কাপড় তয়ের হত।

এখন "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

মাসিক-কাব্য-সমালোচনা

[পঞ্চভূত]

ভারতবর্ষ, মাঘ। ভিখারী শিশু—কবি কুমুদরঞ্জনের এক টুকরো কবিতা। শেষ তৃতীয়াংশ টুকু মন্দ হয় নাই।

"নির্ম্মম।" শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ। কবিতাটি পড়ে' বিশেষ কোনো স্পষ্ট ভাবের সন্ধান পাওয়া গেলনা। লেখকেরও কিছু বলবার মত কথা মনে এসেছিল বলে' মনে হয় না। লেখক বেশ ছন্দোবদ্ধ মিলাতে পারেন। এমন উদ্দেশ্য বিহীন ২৪শ লাইন পড়ে মনে হয় জলধর বাবু যেমন অন্যমনস্ক ভাবে অনেককে লিখতে বলেন তেমনি কান্তি বাবুকেও অন্য মনস্ক ভাবে লিখতে বলে ছিলেন—কান্তি বাবুও অন্যমনস্ক ভাবে এটাকে লিখে পাঠিয়েছেন।

রূপ। শ্রীপ্রবোধ নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,

বি, এল। একত প্রবোধ বাবুর নামই বড় তারপর সম্পাদক মশায় তাঁর ডিগ্রী টিগ্রী যা ছিল সব নামে জুড়ে দিয়ে দীর্ঘকে দীর্ঘতর করেছেন। ভারতবর্ষ সম্পাদক মহাশয় লেখকের নামের সঙ্গে তাঁর সরকার প্রদত্ত ও গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত খেতাব গুলো যোগ করে দিতে কখনোত ভুলেনইনা কখনো কখনো নিজেও ২।১টা খেতাব বা বিশেষণ তৈয়ারী করেও জুড়ে দিয়ে নাম গুলো গাল ভরা করে' তুলেন। দেখে শুনে লোকে বলে ভারতবর্ষে খেতাবের ভারি আদর। লম্বা চৌড়া খেতাব থাকলে চাই কি ১ম পাতেই লেখা প্রকাশিত হয়। —খেতাবে লেখার মর্য্যাদা—কিছুই বাড়েনা তার প্রমাণ সম্পাদক ম'শায় নিজেই। তাঁর কোনো খেতাব না থাকা সত্বেও তাঁর লেখার মর্য্যাদা আছে তাঁহাকেও সকলে সম্মান করে। পক্ষান্তরে অমুকের আধহাত লম্বা খেতাব থাকা সত্বেও তাঁর লেখার পাতা পাঠক তাড়াতাড়ি উল্টে চলে যায়। বিনা খেতাবের শরৎ বাবুর লেখার জন্য পাঠক ভারতবর্ষ পাতি পাতি করে খোঁজে। সম্পাদক ম'শায় কি ভাবেন রচনার দুর্ব্বলতা ও অসারতা খেতাবের দীর্ঘতায় ঢাকা পড়ে?

অবান্তর কথা নিয়ে অনেক জায়গা নষ্ট করা গেল। এম, এ, বি, এল মহাশয়ের কবিতার কোনো বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্য নাই। কবি নিশ্চয়ই ভক্ত কারণ তিনি সিন্ধুতরঙ্গে গোপিকায় আলুলিতা বেণী দুলতে দেখেছেন এবং তরঙ্গের নৃত্যে ভ্রমরগুঞ্জন ও নূপুর ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। মহা-সিন্ধুর নিকট কবি ঋণী—তিনি শেষে বলেছেন—

শ্যামরূপ জাগাইয়া করিলে হে বড় উপকার
হে বন্ধু শ্যামল সিন্ধু, লহ মোর লক্ষ নমস্কার।

দোলা। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। সুরচিত প্রবীন কবির লেখনীর উপযুক্তই বটে।

তথাগত। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। এর নামের আগে 'শ্রী' নাই কেন বুঝলাম না। কবিতায় লেখকের বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সব পংক্তি গুলিতে কিন্তু মিল নাই।

নিরঞ্জন। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। মর্ম্মস্পর্শী। সরল সহজ স্বচ্ছ। আগাগোড়া কারুণ্যে মণ্ডিত—পাঠ কালে চোখ জলে ভরে' যায়। হৃদয়ের রক্তে লেখা চিত্র যতটা প্রাণস্পর্শী হয়—রামধনুকে টুকরো টুকরো করে ছন্দে গাঁথলেও তেমনটী হয় না। অনেক রচনাতেই বহু বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ দেখি তাহাতে ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় কিন্তু প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। কখনই ভুলতে পারি না অমর কবির কথা "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."

কবিতাটিতে ছন্দের ঝঙ্কার নাই—বিচিত্র বিলাস লীলা নাই—অনুপ্রাসের অতিপ্রয়াস নাই—পদ বিন্যাসের ঘটা নাই—মিলের বাহাদুরী নাই—শব্দ হিন্দোলের কারুকার্য্য নাই—অলঙ্কারের চটক নাই—কিন্তু যা আছে তা কাব্য বিলাসীদের অনেক কবিতাতেই নাই।

মোমের পুতুল ও কাটা কাপড়ের দোকানের ছবি দেখে আর তৃপ্তি হয় না তাই এই জীবন্ত অনাড়ম্বর প্রতিমাটী দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হয়েছি।

আজকাল শব্দশিল্পের প্রাধান্যই বেশী—তাই 'যৌবনের সঙ্গে আর 'প্রেম' আসে না—যৌবনের সঙ্গে 'মৌ-বনে'র আদর বেশী। এই আন্তরিকতাশূন্য শব্দ বিলাসীদের প্রকৃত কবি বলা যায় কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ করি। আন্তরিকতা ও দরদ থাকলে আমাদের ঘর সংসারে, আমাদের গৃহের আশে পাশে, আমাদের সোণার বাংলাতেই যথেষ্ট কবিত্বের উপকরণ পাওয়া যেতে পারে—উপকরণের জন্য কল্পনার আরব সাগর পার হয়ে যেতে হয় না। 'ইরানী' অপেক্ষা 'কুড়ানীর' মধ্যেই যথেষ্ট জিনিস পাওয়া যেতে পারে—যার অনুভূতি "Too deep for tears."

"হায় কবি, খোঁজ নাক প্রাণ
সাকীর সরাব লাগি ছুটে যাও ইরাণ তুরাণ।"

হাজার হাজার কাগজের ফুল চেয়ে একটি সজীব কুন্দ অধিক আদরণীয়।

কেন্দ্রিকাকর্ষণ। শ্রীঅনিলকৃষ্ণ চৌধুরী। গণিতের কবিতা। গণিতের বিষয় হলেও লিখতে পারলে বেশ কবিতা হতো। কিন্তু লেখকের হাত কাঁচা—ছন্দে জ্ঞান নাই—রসবোধও নাই। তাই শিব গড়তে বাঁদর গড়েছেন।

ভারতী, মাঘ। জাতের লজিক। শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী। বিড়াল পাতে মুখ দিলে জাত যায় না—অথচ মানুষ জাতে চাঁড়াল বলে' ঘরে উঠলেই হাঁড়ী নষ্ট হয় এবং সে হাঁড়ীতে খেলে জাত যায়। এই কথাটা অবনী বাবু নীরস পদ্মে পঙ্গু ছন্দে বল্‌তে চেয়েছেন, তবে কবি 'নামে'তেই বলেছেন 'লজিক' কাজেই কবিতা নয়। পাতে বিড়াল মুখ দিলে সত্যই পাত নষ্ট হয় এই লজিক প্রমাণ করবার জন্য ভারতীর ৮৯৯ পাতাখানি নষ্ট করবার প্রয়োজন ছিল না।

মনস্বী শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের 'মহামানব' মোটের মাথায় মন্দ হয় নাই।

"হে মহামৌণি! গহন তোমার চেতন তলে
মহা বুভুক্ষা বারণ তৃপ্তি মন্ত্র জ্বলে"
ধন্বন্তরি! মন্বন্তর মন্থ শেষ
তব করে হেরি অমৃত ভাণ্ড অবিদ্বেষ।"

বেশ জম্ জমাট রচনা। এতে মোহিত বাবুর চটুল ঠুংরি বা গজলী ঢঙ নাই। এই কবিতাটীতে মোহিত বাবু মাজা দোলানো ছেড়ে সোজা হয়ে পৌরুষ চালে চলেছেন।

কবি শেষে বলেছেন—

"হোক্ জাতি পীঠ সূতিকা ক্ষেত্র,—শ্মশান ভূমি
মহাদেব নয়, মহামানবের চরণ চুমি।"

অল্প পরিসরের মধ্যে উপসংহার টুকু রুদ্ধশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে।

কয়াধূ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। শিল্প হিসাবে কবিতাটি খুব উৎকৃষ্ট না হইলেও প্রাণের দিক্ হতে ইহা জীবন্ত এবং স্থলে স্থলে জলন্ত। সময়োচিত রচনা—কয়েকটি পংক্তি তুলে দিলেই কবিতার সার্থকতা সম্যক উপলব্ধ হবে—

"যে দিকে চাই কেবল দেখি লাঞ্ছিত প্রহ্লাদ"
"যে দিকে চাই মলিন অধর উপবাসীর চোখ
যে দিকে চাই গগন ছোঁয়া নীরব অভিযোগ—
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল।"
"নির্দ্দোষীরে খুনীর বাড়া দিচ্ছেরে দণ্ড"
"হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, হায়রে আফশোষ
অপ্রবুদ্ধ দম্ভ এবে জাগায় বিধির রোষ,"
"চিত্তবলের লড়াই সুরু পশুবলের সাথ"
"তীর্থ হলো বন্দীশালা শিকল অলঙ্কার"
"রাজ রোষেরি রোশনায়ে তোর মুখ হলো উজ্জ্বল"
"আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার
বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ন্যায্য অধিকার।"

নিম্নলিখিত পংক্তি কটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

"আসার পথে কেবল দেখে এলাম অলক্ষণ
বিদ্বিল মোর বিধবা দেশ স্তম্ভ অগণন।
ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হলো বন্ধ।
শ্মশানে স্বমুণ্ডে লাথি ঝাড়ছে কবন্ধ
ক্ষিপ্ত পারা আকাশে চাই সেথায় দেখি হায়
রক্তস্নাত সিংহ শীর্ষ পুরুষ অতিকায়।
অঙ্কে তাহার লুটায় কেরে মুকুট পরা শির
সিংহ নখে ছিন্ন অঙ্গ চৌদিকে রুধির।

দ্বিতীয় শৈশব। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। কুমুদ বাবুর এই শ্রেণীর কবিতা গুলি ফুলের মত অন্তরের প্রেরণায় ফুটে উঠেনা—কতকগুলি ফুলের পাঁপড়িকে কাঁটায় বিঁধে ফুলের আকার দান করা বলে' মনে হয়। শেষ ৩টী পংক্তি সুন্দর।

"পশ্চিমেতে ডুবছে ছল ছল রবি
চোখের জলে দুলছে বুড়া অন্ধছবি।"

যমুনা, মাঘ। শ্রীমতী লীলা দেবীর আবাহন। কতক গুলি লজিত শব্দের অনর্থক সমবায়। মা সরস্বতী শুনে খুসী হবেন না।

ঝিল্লীধ্বনিকৃত বল্লীবাটে ও কল্লোলিনীকলপল্লীঘাট—শুনতে মন্দ নয় কিন্তু সমাস ভাঙলে কি পাওয়া যায়?

সুকবি যতীন্দ্রমোহন যমুনার সম্পাদক। তাঁর মস্তিষ্ক এখনো প্রকৃতিস্থ আছে বলেই জানি। কবিতাটি কেন পছন্দ করে' তিনি ১ম পাতে ছেপেছেন তিনিই জানেন। কবিতাটির অর্থ আমরা উদ্ধার করতে পারলাম না আমাদের পাঠকবর্গকে আমূল উপহার দিই।

ঝিল্লীধ্বনিকৃত বল্লী বাটে হে
কল্লোলিনীকলপল্লী ঘাটে হে
নিকুঞ্জ মঞ্জরী মল্লীপাটে হে
জাগো জাগো শতদল বাসিনী।

মৃত্যুঞ্জয়ের বনগিরি নন্দ [?]
সুন্দর ফুল্ল অম্লান অন্ধ
কুঞ্চিত শঙ্কিত বঞ্চিত বদ্ধ
জাগো মা সরস্বতী তারিণী।
অবিদ্যা কলুষিত নিপীড়িত কাম্য
সৌধ বিচিত্র নগর সুরম্য
ছেদ খেদ নির্ব্বেদ নাই শুভ সাম্য
জাগো জাগো শত শুভ কারিণী
কল্প তরু পুষ্প বিশুষ্ক শীর্ণ
ভঙ্গিতরঙ্গ নির্ঝর জীর্ণ
খিল্লিত বর্জ্জিত ক্ষোভিত দীর্ণ
জাগো পরাবিদ্যা হে যোগিনী।
শত শত ষোলকলা সুবিমল চন্দে।
নিন্দিত যে আনন্দ অতুলন ছন্দে
বিস্মৃত বিশ্ব এই গীতানন্দে
মণিময় বিক্রম ধারিণী।
ঝঙ্কার ঝঙ্কার টঙ্কার সে বানী
গম্ভীর সুমধুর ওঙ্কার নাদিনী
হে হংসবাহিনী হে বিন্দুবাসিনী। (?)
জাগো মাগো অপরূপ কামিনী।

মা সরস্বতী যদি বুঝিতে না পেরে কবিতাটি নিয়ে ব্রহ্মার কাছে যান তা'হলে ব্রহ্মাও বিপদে পড়বেন।

পরশ পূজা। কাজী নজরুল ইসলাম। কবির যা বলবার তা ১ম ছয় লাইনেই বলা শেষ হয়ে গেছে। এক কথাই ধানাই পানাই করে বার বার ভেঙ্গে আরো দশ লাইন বাড়িয়ে একটা গানে দাঁড় করিয়েছেন।

শিবসুন্দর। শ্রীযোগীন্দ্র নাথ রায়। সুরচিত। কবিতার কোন পংক্তিই প্রথম শ্রেণীর নয় তবু কবিতাটি সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। অন্তরের প্রেরণা যে কবিতার জন্ম দান করে তা প্রত্যেক পংক্তিতে সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও হৃদয়গ্রাহী হয়। ইহা নির্জীব শব্দ সমুচ্চয় নয়—ইহার প্রত্যেক অনলঙ্কৃত প্রত্যঙ্গে প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে।

ভারতী, অগ্রহায়ণ। বনফুলের "গোরু।" কবি বলেছেন গোরু বেচারা নেহাৎ নিরীহ বলে' সবাই গোরুর উপর অত্যাচার করে, সিংহ সবল তার কাছ দিয়ে কেহ ঘেঁষে না।

সুখের সাহারা। শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়। বুকের রক্তে লেখা, প্রতি আখরে চোখের জল টলমল করছে। কিরণ বাবুর রচনা ভঙ্গিটি বড়ই মধুর এবং কতকটা যেন অভিনব ধরণের। সত্যকথা বলিতে কি শুধু ছন্দের কেরামতী, উপমার আতস বাজী, অনুপ্রাসের ঠুন ঠুনী ভাল লাগে না। প্রাণ চাই। কিরণবাবুর লেখনীতে দরদ আছে। রচনায় সারল্য ও সাবলীল গতি আছে। আর সব চেয়ে একটা বড় গুণ এইযে প্রত্যেক পংক্তি বুঝা যায়। প্রধান গুণ সর্ব্বত্র সেজন্য হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মস্পর্শী। কবিতাগুলি কবির জীবনের নানা অনুভূতিরই অভিব্যক্তি শুধু কল্পনা কাননের অর্থহীন কূজন নহে।

কবিতাটির ১ম—২৪পংক্তি তেমন সুন্দর হয় নাই—একরপংক্তির পৃথক মূল্যও নাই, গোটা কবিতাটির উপক্রমণিকা স্বরূপ কতকটা কষ্টকল্পনার সাহায্যে রচিত। ভাষাও স্থলে স্থলে বিরূপ। "চারু অঙ্গী" শ্রুতিকটু। "ফুল্ল অলকনন্দা" শুদ্ধ নয়। অলকানন্দা—স্বর্গঙ্গা তাহার ফুল্লতা অলঙ্কার দুষ্টি। "তোরণে তোরণে উড়িল কেতন "রচিত দিয়া সে স্বর্ণ" "তাহা স্বর্ণ দিয়া রচিত"—ইহাকে "রচিত দিয়া সে স্বর্ণ" বলিলে চলিবে কেন' ?

"মেনকারম্ভা গান গাবে নীল মেঘের কাজল চক্ষে" এ পংক্তিতে মেনকারম্ভার গান গাওয়ার কথা হচ্ছে—তার সঙ্গে "চক্ষের কাজল" না এসে "কণ্ঠের মাধুর্য্য" এলেই ভাল হতো। মিতান্ত দুর্ব্বল শোনাচ্ছে নিম্নোদ্ধৃত দুই পংক্তি—

"ফুলেমোড়া পথ ভেলভেটবৎ নাহিক ধূলির চিহ্ন
কল্পনাতীত অন্যের কারো স্বর্গের বাসী ভিন্ন।"

কবি যখন তার স্বভাব সিদ্ধ সরল ভঙ্গিতে আরম্ভ করলেন—
"কার পরে রোষে একালাটিবসে? দেখে জ্বলে ওঠে অঙ্গ,
বাঁধিসনি চুল পরিস নি ফুল কতনা জানিস রঙ্গ
বেলা বয়ে যায় ইন্দ্র সভায় নাচগান সুরু হয়তো
যাবি যদি চল না যাবিত বল একা আমি যাই নয়তো।

তখন হতে প্রকৃত কবিতা আরম্ভ হলো। তারপর হতে সমস্তটা অকপট সত্য কথা। এই কৃত্রিমতার যুগে সত্য

কথা এমন সরল ভঙ্গিতে খুব কম কবিই বলিতে পারেন। কবির অকপটতা ও সরল মধুর ভঙ্গির গুণে কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতার পুনরাবৃত্তি হতে পায় নাই।

ছেঁড়া খাতা। শ্রীসুধীর চৌধুরী। প্রথম দিকটায় কবির সঙ্গে সঙ্গে ঠিক যাচ্ছিলাম কিন্তু যেই তিনি—

"অজানা আঁধার দেশে কোন মহা বিভীষিকা মাঝে" যেতে সুরু করলেন আমরা আর আগাতে পারলাম না। কবির জন্য একটু ভাবনাও হয়েছিল কিন্তু যখন শেষে পড়লাম—

পরিপূর্ণ সুখে
শয়ন লভিয়া বুকভরি (?)

বিপুল বিস্ময়ে ভরা আপনারে অনুভব করি"—তখন আশ্বস্ত হওয়া গেল।

কবি কুমুদরঞ্জন—"স্রোতের মুখে" লিখে ফেলেছেন
"দেখরে ওই রাঙা রবি ডুবছে পূবে"

কবি "দেখরে" বলে' ডাক দিলেও আমরা "পূবে" ক'খনো রবিকে ডুবতে দেখি নাই। রবি এই প্রথম [কুমুদ রঞ্জনের কবিতায়] পূবে ডুবিল। রবি পূবে ডুবুক আর নাই ডুবুক—অনুপ্রাসত হলো। অনুপ্রাসই এঁদের কবিতার প্রধান অবলম্বন উহার জন্য সবই মার্জ্জনীয়।

"পূরবীর সুরভি (সৌরভ ?) অই বায়রে উবে"। অতিরিক্ত কবিত্ব। "চরণ চিণে" বুঝি চরন চিহ্ন ?

কবিতাপড়ে মনে হয় কবির বলবার কিছুই ছিলনা ছন্দ গাঁথতে পারেন কয়েক পংক্তি যাহা কলমের ডগায় এলো সাজিয়ে মিলিয়ে ভারতীর পাত পূরণের জন্য পাঠিয়েছেন। কুমুদরঞ্জনের কলমের চাষে ফসল প্রচুর—কিন্তু তার আগাছাই বেশী।

গজল গান—শ্রীমোহিত লাল মজুমদার। ছন্দের কেরামতী আছে। মিল গুলিও সুন্দর কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। কাণ পর্য্যন্তই পৌঁছায় প্রাণে প্রবেশ করেনা। কবিতায় কোন সংহতির সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। মিলের দ্বারাই সমস্ত কবিতাটি পরিচালিত—জুতসই ও লাগমাফিক্ মিল (libyme) খুসিমত পংক্তি গুলিকে সাজায়েছে। তা ছাড়া এত নিছক শরাবের গজল, কবিতাও 'সুরত্ সুরার' নেশায় বেহোঁস-মস্তানা কাজেই এতে আবোল তাবোল যথেষ্টই আছে।

কবিতায় আরব পারশ্য হতে উপকরণ যথেষ্ট সংগৃহীত হয়েছে—গুলনার বাগের বিলকুল ফুল, বোস্তানের বস্ত গালে-গালদিয়ে-লালে-লাল-নাশপাতি, রোজার-উপোষভাঙ্গা ভুরুর একটুকু চাঁদ, বিছার মতন জুলফি, চিবুকের দিলদাগা তিল, লায়লী অধর লালা ফুলটির মূল, গুলবাগের বিলকুল বুলবুল ইত্যাদি অনেক জিনিসই আছে। নাই কবিতার কোনো মেরুদণ্ড।

মোহিত বাবু মা সরস্বতীকে গোলাপ ফুলের মালা পরিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টায় আছেন—কিন্তু তাঁর ভক্তির বড় অভাব—চটক দেওয়ার চেষ্টাই বেশী। ভক্তি থাকলে শিশির সিক্ত কুন্দর মালাও তাঁর আদরণীয়। ভক্তির সহিত না দিলে সমরখন্দ বোখারার তামাম দৌলত ঢেলে দিলেও তাঁর প্রীতিকর হবে বলে' মনে হয় না।

পারসীশব্দের মোহ আরবী ভাবের মোহ, গোলেস্তা ও বোস্তানের মোহ, গোলাপী নেশা ও বুলবুলি চটুলতার মোহ কবিকে এত বেশী আচ্ছন্ন করেছে যে ঘরের পাশের সবজিনিসই যেন কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া শব্দের ঝঙ্কার বাড়াবার জন্য কবি অকথ্য কথন অসাধ্যসাধন করতে আরম্ভ করেছেন।

যে কবিতার সমষ্টিগত সৌন্দর্য্যই প্রধান-সম্পৎ সে কবিতাকে বিশ্লেষণ করলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়। কিন্তু যে কবিতার সৌন্দর্য্য ব্যষ্টিভাবে পংক্তিতে পংক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্ত্তমান, তাকে বিশ্লেষণ করে দেখালে কবির বা কবিতার কোন অমর্য্যাদা হবেনা। মোহিত বাবুর এই কবিতাটিকে আমরা একটু নাড়াচাড়া করে দেখি।

১ম পংক্তি। "গুলনার বাগে ফুল বিলকুল, নাশপাতি" এই "নাশপাতির" অন্বয় দ্বিতীয় পংক্তির সঙ্গে অথচ "নাশপাতি"কে বিলকুলের সঙ্গে পড়ে একটু বেশ থামতে হয় তার পর পড়তে হয়—

"গালে গাল দিয়ে লালে-লাল হলো বোস্তানে"

শুধু কাণে শুনলে "নাসপাতি"র-ফুলের সঙ্গে সম্বন্ধ

আছে বলে' মনে হয় কিন্তু চোখে দেখলে ছেদ দেখে ঠিক করা যায় যে "নাশপাতী" গোলেস্তানের সম্পত্তি নয় উহা বুস্তানের।

মোহিত বাবু খুব বড় একটা অপরাধ করেছেন তা আমরা বল্‌তে চাইনা শুধু এই কথাটা বল্‌তে চাই—এই রূপ চটুল চুটকি ছন্দে প্রত্যেক পংক্তিতেই Sentence এর শেষ হওয়া ভাল কারণ এ ছন্দের কাণের উপরই আধিপত্য বেশী। দীর্ঘপয়ারাদিতে ছন্দের স্রোতোবেগ এক পংক্তি হইতে একাধিক পংক্তিতে মিলের সীমা অতিক্রম করিয়া অবাধে চলিয়া যায় কিন্তু এ সকল ছন্দে ছোট ছোট ঢেউগুলি পংক্তি পার না হইলেই বেশী কলধ্বনি তোলে। একপংক্তিতে করিয়া Sentence হলে আরো ভাল শোনায় যেমন—

গগনে গরজে মেঘ—ঘন বরষা,
কূলে একা বসে আছি—নাহি ভরসা।

২য় পংক্তি। "গালে গাল দিয়ে লালে লাল হলো বোস্তানে"—এই পংক্তিটি সর্ব্বাংশে সুন্দর হয়েছে। কিন্তু পরপংক্তি—ঘাসের সবুজ সাটিনে নীলের আবছায়া—নিতান্ত অলস এবং তৎপরপংক্তির সহিত সম্পর্কশূন্য। তার পর কহিল সহেলী... কোন্ কাণে—একটু কেমন এলো মেলো। নার্গিশাক্ষি একটু শ্রুতিকটু। "ভুরুর একটুকু চাঁদ". কবি এখানে ভুরুর বক্রতার সঙ্গে দ্বিতীয়ার চাঁদের বক্রতার উপমা দিয়াছেন ভুরুর ঘনকৃষ্ণ বর্ণটাই এত প্রবল যে কোন উপমাতেই উহা মন ছাড়া হতে চায়না। "ইয়ারা, তোমার পিয়ালা শপথ—" তার পর সবটা বলা হলোনা —বাকী অংশ "সেই দিনই" পরের পংক্তির সঙ্গে অন্বিত হচ্ছে।

কালকস্তুরী জুল্‌ফি যে তার ঘাল করে
বিছার মতন নড়ে যে গালের গুলবাগে।

বিছার অত্যাচারে কস্তুরীটা মাটী হয়ে গেছে—কস্তুরীর সঙ্গে ঘাল করারও সম্বন্ধ নাই। গালের গুলবাগে বিছার আবির্ভাবটায় একেবারে রসভঙ্গ হয়ে গেছে।

"পিয়ারী! ও তোর ঠোঁটের চুণানী লালচুণী
জুড়াবে দরদ আমি যে স্বপন জাল বুনি।"

চুণীর দরদ জুড়াবার শক্তি কবিপ্রসিদ্ধি নয় চুণীর জন্য জাল বুনবার আবশ্যকতা আছে বলেও মনে হয়না। তার-পর লায়লী মজনুর কথাটাও বেশ ভাল বোঝা গেল না। তার পর শেষটাও এলোমেলো।

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে। ঐ কবি। মোহিত বাবুর রচনা কখনই স্বচ্ছ হয় না এবং রচনায় প্রসাদ গুণও বড় থাকেনা। এ কবিতার স্থলে স্থলে বড়ই অস্পষ্ট। জটিল পাণ্ডিত্য ও সাভিমান জ্ঞানাভিজাত্যের মোহে কবিতাটি আগাগোড়া আচ্ছন্ন। কবিতায় ভক্তের নিবেদন অপেক্ষা বিনয়ের অহঙ্কারটাই বেশীমাত্রায় ফুটেছে।

সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনার দিনে তাঁহাকে অর্ঘ্যনিবেদনের জন্য কেহ আহ্বান করেনাই—। সেজন্য নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি লিখেছেন—

হেরি মোর মুগ্ধ দৃষ্টি, রিক্তহস্ত নিরুচ্ছ্বাস নিষ্প্রভবদন ডাকে নেই কেহ মোরে—ধন্যবাদ! সেযে বড় হ'ত অশোভন কবি যদিও ধন্যবাদ দিয়েছেন কিন্তু বদনের নিষ্প্রভতা রচনায় থেকেই গেছে।

কবিতাটীর আরম্ভ সুন্দর।

'মূকেরে বাচাল করে হেরিনাই শুনিয়াছি দেবতার বরে
বাচালে অবাক করে একথা যে সত্য বুঝি অন্তরে অন্তরে।
'যতটুক সেই দিন অগ্রসরি পথে মোর সেই মোর পূজা
আনন্দ আরতি মোর সেযে তোমা নিত্য আরো বড়
করে বুঝা।

বড় সুন্দর কথা।

পৌষ। ইরাণী। ঐ কবি।

কবিতাটীতে মিলের বাহাদুরী আছে। মিলের খাতিরেই শব্দনির্ব্বাচন ও পংক্তি রচনা সেজন্য কবিতাটী কতকটা অসম্বদ্ধ ও অসমৃদ্ধ। জমাট ভাব কোথাও নাই বরং কোন কোন স্থলে চিত্র বেশ ফুটেছে। বিশেষতঃ ২য় ও ৩য় শ্লোকে। পংক্তিতে পংক্তিতে কেবল মাত্র শব্দগত বন্ধন, প্রাণের কোন বন্ধন নাই বলে' অন্তরে কোন সম্পূর্ণাঙ্গ-রূপানুভূতি হয় না কাজেই কোন স্থায়ী স্মৃতিও থাকে না। কাণের উপর নৃত্যচটুলচরণের মঞ্জীরধ্বনি খেলিয়া যায় তাহার অনুরণনও থাকে না। অনেক স্থলেই এতই অস্পষ্ট যে

বোঝা যায় না—বরং পাঠককে আবছায়া দিয়ে ফাঁকি দেওয়া হইয়াছে বলে' মনে হয়। কতকগুলি পংক্তি আমাদের বেশ ভাল লেগেছে।

কালো ডানার শ্বেতমরালী। স্নানের ঘরে হাম্মামে
ছড়িয়ে পড়ে চুলের পালক শুভ্র তনুর ডান বামে।

* * *

তারার চোখে চাঁদের আলো ঠাউরে না পায় কোন তিথি
বুঁদ হয়ে চাঁদ গড়িয়ে পড়ে বাদশা বাড়ীর গম্বুজে।

* * *

ঝাঁপটা খানা দুলছে মাথায় ফণীর ফণায় মণির প্রায়
শিরায় শিরায় গানের গমক সুরের সুরায় দিল তোলা।

ইত্যাদি।

কবিতাটী যৌবনের যৌবনে কন্দর্প দেবতার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন। ২।১টী পংক্তি উদ্ধারণ করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন কবিতা "কাঁচলী খানি খুলেই আবার মুচকি হেসে বুক ঢাকে" "গুরু উরুর গুমর ভরা জোড় পায়েলা পায় বাজে" "সাহস ভরে অধরপরে দিলাম চুপে দিলমোহর" "নুইয়ে পল গোলাপ শাখা ঘুমিয়ে প'ল বুলবুলে"।

সুশ্বেতা। শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ দত্ত।

কবিতাটী আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। দুর্ভিক্ষের ভৈরব চিত্র সত্যেন বাবু কলা কুশলতার সহিত আগেও এঁকেছেন কিন্তু মাতৃ মমতার মধুর চিত্র এত চমৎকার সত্যেন বাবুর হাতে এই প্রথম। এক দিকে পৈশাচিক নারকী চিত্র অন্যদিকে স্বর্গীয় মাতৃহৃদয়ের রমনীয় চিত্র পাশাপাশি বড়ই সুন্দর ফুটেছে।

প্রবাসী। আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ।

কলঙ্ক। শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী। বিশেষত্ব শূন্য। "সঞ্জীবিছ মো-সবারে" "নিশ্চিন্তে ঘুমাই" সুপ্রয়োগ নহে।

অন্তরঙ্গ। শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী। সুদীর্ঘ কবিতা। মাঝে মাঝে বেশ সরস হয়েছে—মাঝে মাঝে এলিয়ে পড়েছে—স্থলে স্থলে বেশ স্পষ্ট—স্থলে স্থলে প্রহেলিকার মত।

শীতের নিঃস্বতা... ....বারে বারে।
জীবনে কি দিতে......................শূন্য তলে।

এই দুটি অংশ সুন্দর।

স্থলে স্থলে কবিগুরুর ভাবের ছায়াপাত হলেও কবিতার রচনাভঙ্গি মৌলিকতা বর্জ্জিত নহে।

"পথের পাথরে প্রাণাঘাত, জানি সে কেমন।
বাতাসে খেলিতে পাখা কি যে সুখ, জানে তাহা মন"।

একি পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা? ভাল বুঝিলাম না। বসুন্ধরাকে প্রগল্‌ভ কেন বলা হলো বুঝিলাম না।

"চরণের ঘায়, কত যে হৃদয় বুঝি গুঁড়া হয়ে যায়" ভাল লাগলনা। তুমি না......তরুবনছায়" এই দু লাইনে ৪।৫টা ছাপার ভুল। গোপনতা কিরূপে চলে?

"কিছুতে পাত না তুমি কার।
নূপুরের শিঞ্জিনীতে ভরি রহে সকল বিমান"। অদ্ভুত। নূপুর শিঞ্জিনীতে বিমান ভরিবে ভরুক কিন্তু শিঞ্জিনী যে ধনুকের ছিলা। শিঞ্জিনী অর্থে ভূষণের শব্দ হইতে পারেনা। ছোট খাটো ভাষার দোষ আরো অনেক আছে।

হবচন্দ্র রাজা তার গবচন্দ্র মন্ত্রী। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। শিশুরঞ্জন কবিতা, সুন্দর সুরচিত।

হবচন্দ্র রাজা তার গবচন্দ্র মন্ত্রী
ছেঁড়া তার সেতারের তালকানা যন্ত্রী

* * *

হবচন্দ্র রাজা তার গদাই কোটাল
বুনো ওলে যেন বিষ মরিচের ঝাল।

* * *

হবচন্দ্র রাজা তার বিশু কম্মকার
ভোঁতা বাটুলের বাট ভেরেণ্ডা শাখার

* * *

হবচন্দ্র রাজা তার ভবেশ্বরী রাণী
আটবেকী পরা যেন গোদা পা'খানি।

উপমা গুলিতে বেশ চমৎকারিত্ব আছে।

আলোর পোকা। বনফুল রচিত। মন্দনয়। শেষ দুলাইন সুন্দর।

নারী। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। রচনার ভঙ্গিটী সুন্দর।

প্রজাপতি। ঐ—স্তাকামির পরাকাষ্ঠা। এই সকল আহ্লাদে ঢঙের কবিতায় ফাঁকিই বেশী।

উপচে পড়ে গো-পরিমল (?)
পাপড়ি পেয়ালাসে
পান্‌পুলকে মাতল বাতাস
প্রভাত বেলা কে ?

* * * *

রূপ চুরাণো রস সিরাজী
কাড়ল পরাণ কাড়ল আজি
চুপ তোরা কর ! নেই অবসর
রসের জোগানে।

ধমক দিলেই লোকে চুপ করবে কেন ?

প্রভাতে। শ্রীনীহারিকা দেবী। কবিতাটিতে অনেক-গুলি মিষ্টি মিষ্টি শব্দ আছে—মিলগুলিও বেশ। কিন্তু অধিকাংশ পংক্তিরই কোন অর্থ হয়না—কোনোকোনোটার আবার অন্বয়ই হয়না। "পাখীর গুঞ্জনে (?) কোন্‌জনে স্বরগের স্বপনসুধা ঢাল্‌ছে। পুলকঝরি নদী পাহাড় সিন্ধুতে পড়ছে। কোন্ দেবতা চেতন দোলায় সকলকে নিশ্বাসিয়া তুলছে। কোন সাধকের অঞ্জলি জাগরনের মন্ত্র ঢেলে চঞ্চলিয়া তুলছে। কবিতায় এইরূপ অনেক প্রকার নিরর্থক ব্যাপার ঘটছে—আর প্রবাসী সম্পাদকের প্রশ্রয় পেয়ে এই শ্রেণীর কবিতা ক্রমেই বেড়ে চলছে।

ভাদরের পল্লী। শ্রীহরিপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত। ছন্দটি বেশ মিষ্টি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। ক্ষুদ্র পংক্তির মধ্যেও এক অংশের সহিত অন্য অংশের কুটুম্বিতাত নাই-ই পরিচয়ও নাই।

"রজনে রাঙাবন—অঙ্গনে মল্লী"
"কোড়া হাঁকে "থুব থুব"—ডাহুকের ডঙ্কা"

কবি লিখেছেন—

ধুধু করে শুধু ধান—সবুজের সজ্জা
ধান মরুর মত ধুধু করুক—কিন্তু
"দিগবলয়েতে ভাঙে নীলিমার লজ্জা."

আমরা বুঝলাম না। কবি মোদককে আমরা বলি শুধু চিনিতে সন্দেশ হয় না কিছু ছানা চাই।

দরদী। শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক। কবিতার মিল গুলিতে বাহাদুরী আছে। কুমুদ বাবুর এ শ্রেণীর উৎপ্রেক্ষা বহুল কবিতায় পংক্তি গুলিতে ভাল জমাট বাঁধে না। এটার পংক্তি গুলো বড়ই এলোমেলো হয়েছে।

যেমন—

সেই পারে হায় করুণ বীনায় সুর দিতে
আটকে দিতে অশ্বমেধের অশ্বকে
সেইসে চালায় পুষ্পকরথ স্ফূর্তিতে
নয়ন নীরে চেতায় চিতা ভস্মকে।

তাছাড়া, অনাবশ্যক 'রে' 'গো' 'হে' ও 'হায়' অনেক স্থলই দুর্ব্বল করে' তুলেছে।

জীবন। শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার। সুন্দর কবিতা।

দুঃখ দিবে বক্ষে মিশে বিকাশ কর গীতি
বিরহ ব্যথা মাঝারে যথা সাঁতার কাটে প্রীতি।

চমৎকার পংক্তি দুটী।

শ্রীনরেন্দ্র দেবের 'শোধবোধ' শিশুরঞ্জন সুরচিত কবিতা। রচনায় বেশ চাতুর্য্য আছে।

"মিশিরের বউ সোনার তালটা
ফিরে পেয়ে বলে 'কেমন চালটা
চেলেছি বাগিয়ে মধুকে পাল্টা
ঘরে ফিরে এলো তাইত মালটা।"

পথ। শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী

গতির নিস্তেজ মন্থরতা, ক্লিষ্ট কাতরতা—রচনাকে দুর্বোধ ও ম্রিয়মান করেছে। স্থলে স্থলে মৌলিক ভাবোদয় থাকলেও ভঙ্গির জন্য কবিতাটি চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

সন্ধ্যাতারা। শ্রীগোপেন্দ্র নাথ সরকার।

কবিতাটি মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

সন্ধ্যা তারা তুইকি ঝরা নীল আকাশের ফুল
কিংবা ভোলার ভালেরনয়ন নেশায় ঢুলু ঢুল।

* * *

রতির ভালের রঞ্জনটীপ,
দেব দেউলের কাঞ্চন দীপ
বাসর রাতির নূতন বধূর ঘোমটা তোলা মুখ
কিংবা কারো মিলন নিশার একটি ফোঁটা সুখ।

মর্ম্ম-অভিসার। শ্রীহৃষিকেশ চৌধুরী।

কবিতার নামও যেমন দুর্ব্বোধ রচনাও তাই।

তপ্ত নিশ্বাস কাঁপ্‌ছে ও কার রক্ত গোলাপ বুকে
কার কপোলের দীপ্ত সরম অস্ত তপন মুখে?
অরূপ প্রেমের ইঙ্গিত এ বিনাভাষার ছলে
বচন হারা কি ভাবখানি ঘুমায় গগন তলে?

এই প্রেমেরি মূর্ত্তি মোরা বুকের রক্ত রাগে
রাঙাই নিতি, অরূপ সেথা রূপ হয়ে তাই জাগে।

'অকেজোর গান'—লিখেছেন কিন্তু কাজী।

"ঘাসের ফুলে মটর শুটীর ক্ষেতে
আমার এ মন্ মৌমাছি তাই উঠেছে আজ মেতে"

ঘাসের ফুলে মন্ মৌমাছি মাতুক আপত্তি নাই—কিন্তু মটর শুটির ক্ষেতে রসনা-মৌমাছির মাতবার কথা। ফুলত শুটিতে পরিণত হয়েছে।

"রোদসোহাগী পৌষ প্রাত" অপরূপ সৃষ্টি।

"বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে ফুলের মৌ খেতে"

মন্ মৌমাছি মেতে উঠেছিল তারই মৌ খাবার কথা—কিন্তু কবি নিজেই মৌ খাচ্ছেন দেখা যাচ্ছে। তবে কুঁড়ির পাতে পাতে মৌ খেতে কেমন করে' ঢুক্‌লেন সেটা ভাব্‌বার বিষয়।

"আজ কাশ বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে"

পৌষ মাসে নদী শুকাবার কথা বটে কিন্তু পৌষ মাসে ত কবির মনোবন ব্যতীত অন্যত্র কাশ ফোটে না। তবে ফোটেনা বলেই কি শ্বাস ফেলে যায়? তবে পৌষ মাসে 'শ্বাস-কাস' ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব বটে। কবি যে অজানিতার উদাস (?) পরশ পেতে চলেছেন তার নাকছাবি বাবলা ফুলের,—এ পর্য্যন্ত একরকম বোঝা গিয়েছিল—কিন্তু "গায় শাড়ী তার অপরাজিতার" যোগ হওয়াতেই গোল বেধে গেল,—এ অজানিতা তবে কে?

অমৃত পিয়াসা। শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

সুন্দর সুরচিত কবিতা। একটী পূর্ণাঙ্গ সজীব কবিতা কতকগুলি ললিত পংক্তির প্রাণহীন গ্রন্থন নয়।

ভয়ঙ্কর। শ্রীসুধীর কুমার চৌধুরী।

মানবকে তিনি ভয়ঙ্কর বলিয়া কল্পনা করেছেন—মানব কি নয় ভাল করেই বলেছেন—মানব সত্য কি তা ভাল করে' বল্‌তে পারেন নাই—কেন এত ভয়ঙ্কর তার পরিচয়ও তেমন দেন নাই কেবল থেকে থেকে বলেছেন—

"তোমারে হেরিয়া আজি ভয়ে হিয়া কাঁপে থর থর"

শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ রায় "কাঁটা ফুল" কবিতায় কুমুদ-রঞ্জনী ঢঙে উপমার তুবড়ী ছুটিয়ে বাজী মারতে চেষ্টা করেছেন—চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

'ষড় ঋতু—শ্রীমতী নীহারিকা দেবী। ইনি ছয় জুড়ীতে ছয় ঋতুর বর্ণনা সারতে চেয়েছেন—একটা জুড়ীও জোরালো হয় নাই। এ শ্রেণীর জাপানী ঢঙের কবিতা শ্রীমান যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের হাতে উৎরায় ভাল।

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্রের "রামধনু" সুন্দর কবিতা। কবির উৎপ্রেক্ষাগুলি হৃদয় গ্রাহী হয়েছে।

কিন্তু তাঁর "ঝড়ে" কবিতাটা ব্যর্থ হয়েছে।

কবি বলেছেন—

"তরুনঞ্চ মালঞ্চমোর ভাঙ্‌ল লতার মঞ্চ"

"প্রেত পঞ্চের তাণ্ডব তাঁর লতার মঞ্চ ভেঙে মালঞ্চ ত তঞ্চ নঞ্চ করে দিল।" বরঞ্চ সে জন্য "পঞ্চভূত" কিঞ্চিত দুঃখিত হতে পারে—কবিতাটিকে সুখ্যাতি করতে পারে না।

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরীর "চলার বেগে" চল্‌বে না। কবিতার ভাবটি বেশ ভালই ছিল ফোটাতে পারেন নাই। কবির হাত কাঁচা, কিন্তু ভাব্‌বার ভঙ্গিটি ভাল।

ক্ষণের সঙ্গী। কবিতাটি মন্দ নয়—

"পথের ধারের বনের হরিণ মত
চকিত চেয়ে পলায় যারা ছুটে
গবাক্ষেরি বদন কমল মত
লাজুক যারা ফুটেই পড়ে টুটে

কুবলয়িত গবাক্ষের বদন কমলের ফুটেই টুটে পড়ার ভাবটি আমাদের বড়ই ভাল লাগল।

সিন্দবাদ। শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। ছোট খাট ত্রুটী থাকা সত্বেও কবিতাটি মন্দ হয় নাই। শেষ দু লাইন কবিতার অঙ্গীভূত নয়—মিছিমিছি কেন লাগালেন তিনিই জানেন। কবি লিখেছেন—

"সিন্ধু সরণে (?) নির্ভয়মনে চলিছে সিন্ধবাদ"
ভাগ্যে তাহার শাস্ত্র তাহারে করেনা শস্ত্রপাত।.

শেষে চুড়ার উপর কাকের পালক চড়িয়ে চক্রবর্ত্তী মহাশয় "সিন্ধবাদে" রচনাস্থলে হিন্দুবাদকে একটু ব্যঙ্গ করেছেন।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "ঠোঁটের ফাঁকের দাঁতটি" বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। "সীঁত সিদুরে কুঁদকুঁড়ি" চলন সই।

"নারী'—শ্রীগণেশ চরণ বসু। ভাবটি সুন্দর কিন্তু এই ভাবটি প্রকাশ করতে কবিকে এত অধিক শব্দের আশ্রয় লইতে হইল কেন, বুঝলাম না। ভাবটুকু শব্দতরঙ্গে সাঁতরাতে সাঁতরাতে ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে।

আভ্যুদয়িক। শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী। পড়িতে পড়িতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে—ভাবের সূত্র হারিয়ে যায়—শব্দের ঘূর্ণিতে মাথা ঘুলিয়ে যায়। দুর্ব্বোধ্যতার গোলকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে। পড়া শেষ হলে যেন শান্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচা যায়—এ ত কবিতা উপভোগ নয় এ যেন সাধের উপরোগ। রচনা বড়ই ক্লান্তকর, বড়ই অসরল। সুধীর বাবুর কবিতায় আর যাই থাকুক প্রসাদ গুণ একেবারেই নাই।

শ্রীজীবনময় রায়ের 'সন্দিহান'ও সুধীর বাবুর 'আভ্যুদয়িকের' ছোটভাই।—অযথা দীর্ঘ ও নীরস।

সন্ধানী। শ্রীকুমুদরঞ্জন—চলনসই। জটিলতা নাই—পাণ্ডিত্যের ভান নাই—সোজাসুজি রচনা।

শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশ গুপ্তের শিশুরঞ্জন কবিতা—নবাব খাঞ্জাখাঁ সব দিক হতেই সার্থক কবিতা। রচনা ভঙ্গিটি চমৎকার।

সুরেশ চন্দ্রের 'সন্ধ্যাসুন্দরী' সুন্দর সরস কবিতা। সন্ধ্যার মৌন কারুণ্য বেশ পরিস্ফুট হয়েছে।

হিসাব নিকাশ। সরল, সহজ, সুবোধ, সরস ও স্বচ্ছ রচনা।

"মরছি যখন বৃথায় পাঁজি ঘেঁটে
মাহেন্দ্রক্ষণ কখন গেছে কেটে।
স্নান করিনি অর্দ্ধোদয়ের যোগে
কাটলবেলা দোকান দারীর ঝোঁকে

অর্চ্চনা, কার্ত্তিক। আক্ষেপ। শ্রীপতি প্রসন্ন বাবু ওমার খৈয়াম (নিশ্চয়ই ফিট্‌জ জেরাল্ডের হইতে) হইতে অনুবাদ করেছেন। চলনসই অনুবাদ। আমরা বাংলায় ওমার খৈয়ামের অনুবাদ বলে যে কবিতাগুলি পাইতেছি উহাতে ওমারের নিজস্ব খুব কমই আছে। ফিটজজেরাল্ডের যে অনুবাদ বা ভাষান্তরে গ্রন্থনা তাইত "বৃন্তকে বৃন্তস্বরূপ অবলম্বন করে' আপনার রসসৌন্দর্য্যে ফুটে উঠেছে।" উহাতে ফিটজ জেরাল্ডের নিজস্ব কবিতাই অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গীয় কবি আবার যখন ফিটজ জেরাল্ড হতে অনুবাদ করতে বসেন তখন উহাতে "আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে" বঙ্গীয় ভাবাবেগ যোগ দিয়ে আপনার করে নেন। ফলে ওমারের কবিতা বাংলায় একটা নূতন সৃষ্টিই হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীযুক্ত কান্তি চন্দ্র ঘোষের অনুবাদটা কতকটা ঐরূপই দাঁড়িয়েছে।

শুকতারা। শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের উর্ব্বশীর ছন্দে গ্রথিত অযথা দীর্ঘ ও শব্দাড়ম্বরময়। স্থলে স্থলে গদ্যাত্মক—কিন্তু স্থলে স্থলে সম্ভ্রমময় গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত। লেখকের বিশেষণ প্রয়োগে সুবিবেচনার অভাব অনেকস্থলে অলস বিশ্লেষণের সংখ্যাই বেশী। "মহাশ্বিদীপ্ত মহীয়ান শুভ্র গরীয়ান" "মৌন চক্ষু" "ধরা রিক্তা স্রাস্তা বিবশা কাতরা দৈন্যক্ষুধাতুরা" "সুরিঞ্জিত শশা" "হেদুত নিস্তব্ধ অদ্ভুত" "ছায়াময় স্বপ্নজড়িমা" "নিস্তব্ধ নির্ব্বাক সাঁথ" এ ছাড়া "অসীমপুলক মাখি গায়", শঙ্খধ্বনির রণরণি" ইত্যাদি ভাষার প্রয়োগ সুষ্ঠু নয়। "রাতুল চরণে'এর বদলে 'চরণে রাতুল" চলেনা।

অপূর্ব্ব আগমণী। শ্রীগোপেন্দ্র নাথ সরকার।

তুইত ভালবাসিস্ শ্মশান
বাংলা আজি শ্মশানস্থলী
দিগ্‌বসনা শবাসনা
নেচে নেচে আয় মা চলি'।
করোটি সে অর্ঘ্যথালা
নৃকঙ্কালে গাঁথব মালা
অট্ট হেসে কণ্ঠে মা তুই
পরিস হয়ে কুতুহলী।

শোণিতরাঙা হৃদয় আমার
রক্তজবা হবে পূজার
রোদন হবে বোধনমন্ত্র
আরতি দীপ চিতাবলী।

কবিতাটী শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের নারায়ণে প্রকাশিত "অপূর্ব্ব আগমনী" শীর্ষক কবিতার অবিকল প্রতিধ্বনি। নারায়ণে প্রকাশিত "অপূর্ব্ব আগমনী":—

দোলায় চড়ে' আয় জননি
রোদনে তোর বোধন বাজে
অট্টহাসির কোলাহলে
আয় এ ভীষণ শ্মশান মাঝে
শ্মশান ভাল বাসিস্ বলি
করনি এ দেশ শ্মশানস্থলী,
কুকুর শৃগাল ভূত প্রেত পাল
পিশাচ বেতাল হেথায় রাজে।
তোর—মড়ার কাঁথায় আসন রচি
ভাঙ্গা কংস নেচে বাজাই
নৃকঙ্কালে মাল্য গাঁথি
করোটিতে অর্ঘ্য সাজাই।
শ্মশান ভরা শবের পরি
রুদ্রাণী তোর বরণ করি
আয়মা এবার মহাকালী
ছিন্নমস্তা তারার সাজে।

তারা। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মণ্ডল। রবীন্দ্র নাথ প্রবর্ত্তিত অসম মাত্রিকছন্দে গল্প-কবিতা। বিষয়ে বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু ছন্দ মিলের ছোট খাটো অনেক ত্রুটী থাকা সত্বেও কবির রচনা ভঙ্গি সরস একথা পাঠককে স্বীকার করিতেই হইবে। লেখককে আমরা বিষয় নির্ব্বাচনে অবহিত হতে বলি।

"উচ্চনীচে" শ্রীঅবনী কুমার দে। কোন বিশেষত্ব নাই।

অর্চ্চনা, অগ্রহায়ণ।

যাত্রা। শ্রীভক্তি সুধা রায়। কবিতায় 'অসীমপারে' 'অচিন্ পথ' 'সাঁজের ছায়া' 'পাগলপারা মনে' 'নিরুদ্দেশের উদ্দেশে' "মরণমঞ্জির সন্ধান" ইত্যাদি সবই আছে কিন্তু কবিতাটী আধ্যাত্মিক হয় নাই আধিভৌতিকও হয় নাই, বরং আধা-ভৌতিক গোছের হয়েছে।

"এইকি সংসার?" নামক কবিতায় শ্রীমতি শৈলবালা রায় চৌধুরাণী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন।

"উপেক্ষার তীব্রবাণ ঘৃণা অবহেলা
দুর্ব্বল সে ক্ষীণ হৃদে করে সদা খেলা।"

এর উপর আর সমালোচনা চলে না।

কবি কুমুদ রঞ্জনের "রামধনুতে" কোন রঙই ফোটে নাই। "মৃণাল সে ভুজ" সত্যেন্দ্র নাথের "দর্ভতোমার আসন খানির" ছোট ভাই। "কেশরী তার কটি খানি" বা "কুশ তোমার আসন খানি" কি চল্‌তে পারে?

"এস"। শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী।—পড়ে' "শুকতারার" রচয়িতার রচনা বলে আদৌ মনে হয় না। 'এস' অর্চ্চনার কবিতা কুঞ্জের আবর্জ্জনা। এর সমালোচনা লেখনীর দ্বারা সম্ভব নয় সমার্জ্জনীর আবশ্যক।

শ্রীমতি বীনাপাণি দেবীর "সাথীহারা" বাগচী ম'শায়ের "এস" অপেক্ষা ভাল।

শ্রীমতী শশাঙ্ক শোভা দেবীর "প্রতিজ্ঞায়" আন্তরিকতা আছে।

অর্চ্চনা, পৌষ। "কন্যার প্রতি" কবিগুণাকর মহাশয়ের। কবিতার মিল গুলি বেশ ভালই হয়েছে। এক জায়গায় মুস্কিল হয়েছে—

"ব্যস্ত মহা রন্ধনে"

কবি বলতে চান "রন্ধনে মহা ব্যস্ত" কিন্তু হয়ে গিয়েছে "মহা রন্ধনে ব্যস্ত" মাংস তৈল' ইত্যাদির আগে 'মহৎ শব্দ বস্‌লে সাঙ্ঘাতিক অর্থ হয়ে যায়, 'মাংস তৈল'. উনুনে চড়লে অর্থাৎ রন্ধনে সে অর্থ কি আর ছাড়বে? রসিকতা যাক্,—'মহা' একটি বিশিষ্ট পদ নহে কাজেই বিশেষণ ভাবে শব্দের পরে চল্‌বে না সমাসে 'মহৎ' শব্দ স্থলে স্থলে 'মহা' হয়ে যায়। সুতরাং "ব্যস্ত মহা" চল্‌বে না।

বঙ্গপ্রকৃতি। শ্রীরসময় লাহা। কবিতায় মাধুর্য্য আছে ভাষার বেশ পরিপাট্যও আছে। বহুদিন আগে প্রবাসীতে

"ঋতু সংহার ও কুমার সম্ভব" নামে ঠিক এই ভাবের ১টী কবিতা পড়িয়াছিলাম।

"উল্টা দেশ।" শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক ২১ পংক্তি মন্দ হয়নাই।

প্রত্যুপকার। শ্রীদ্বিজপদ মুখোপাধ্যায়। লেখকের ভাব্‌বার ভঙ্গিটী মন্দ নয় কিন্তু হাত এখনো নেহাৎ কাঁচা।

বৃন্দাবন। শ্রীপূর্ণ চন্দ্র বিদ্যারত্ন -বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্য হীন কয়েকটি নীরস পংক্তি সবগুলোয় মিলও নাই।

উত্তর দেশে। শ্রীকালিদাস রায়। কবি অলকাবাসের প্রত্যাশায় উত্তর দেশে যাত্রা করে মহা বিপদে পড়েছিলেন। অমর্কের বৃত্তি নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন সে অলকাপুরী নয় সে অলর্ক (ক্ষেপা কুকুর) পুরী। সেখানকার যক্ষেরা—

> অগস্ত্যের শির'পরে ত্যজে নিষ্ঠীবন
> গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুরে করে বিতাড়ন।"

বিয়োগে। শ্রীজগদীশ চন্দ্র দাস। ঠিক কবিতা হয় নাই। কয়েকটি পংক্তিতে লেখক একটী নিগূঢ় মর্ম্ম বেদনা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেছেন

প্যারিসের সৌধ সম্পদ

[শ্রীবিনয়কুমার সরকার]

[১]

ফরাসী কবি বলিতেছেন—"যুবক ভারতের ছোকরা কবিদের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে চাই ফরাসী কাগজে।" চিত্রকর বলিতেছেন—"প্যারিসে নব ভারতীয় শিল্পীদের হাতের কাজ দেখাইবার আয়োজন করিতে অনেক প্রদর্শক বা দোকানদারকেই রাজি করানো সহজ। ওফিস ন্যাশ-ন্যাল দেজ্ ইউনিভার্সিতে" (Office National des Universites) দুনিয়ার ফরাসী সভ্যতা ও শিক্ষা বিস্তারের এক বিপুল কর্ম্মকেন্দ্র। ইহার বড় কর্ম্মকর্ত্তা পেতিদুতইয়ে (Petit Dutailles) এবং ছোট কর্ত্তা ফির্ম্যাঁ রোজ (Firmin Roz) উভয়েই বলিতেছেন :—"ভারতীয় ছাত্র ও অধ্যাপকদের জন্য ফ্রান্সে সকল প্রকার সুযোগই সৃষ্ট হইতে পারে।" সমর লাইব্রেরির কর্ত্তা চাহিতেছেন বর্ত্তমান ভারত সম্বন্ধে ভারতবাসীর তৈয়ারি ছবি ছাপা চিরকুট হাণ্ডবিল কেতাব পুথি গ্রন্থ। মাসিক কাগজের সম্পাদক বলিতেছেন—"প্রবন্ধ লিখিয়া দাও। ফরাসীতে না পার, ইংরেজিতে লেখ। আমরা তর্জ্জমা করিয়া ছাপিব।" বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক পত্রিকা হইতেও ডাক পড়িতেছে একাধিক।

সকল তরফ হইতেই ফ্রান্সে যুবক ভারতের তলব পড়িয়াছে। ফরাসী সমাজে ভারতীয় আন্দোলন শীঘ্রই বেশ সজাগভাবে দেখা দিবে। ফ্রান্স ভারতবাসীর পক্ষে আর একটা আমেরিকায় পরিণত হইতে চলিল। এই মজা দেখিবার জন্য ভারত সন্তান দলে দলে ফ্রান্সে আসিতে সুরু করিবে না, কি? ইহাতে পয়সা খরচ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা মহাবালেশ্বর, কোদাই ক্যানাল, শিমলা, নৈনিতাল দার্জ্জিলিঙে বসবাসের পয়সা খরচ করিতে সমর্থ অন্ততঃ তাঁহারা কেন প্যারিসে আসিবেন না?

প্যারিসে অনেকগুলি আমেরিকান প্রতিষ্ঠান দেখিতেছি। ছাত্র ছাত্রীদের সুযোগ সুবিধা ঘটাইবার জন্য এক পরিষৎ আছে। তাহার নাম আমেরিকান ইউনি-ভার্সিটি ইউনিয়ন। লড়াইয়ের সময় বহু কেতাব আমেরিকা হইতে ফ্রান্সে পাঠানো হইয়াছিল—ফৌজের জন্য। সেই গুলাকে কেন্দ্র করিয়া একটা লাইব্রেরী স্থাপন করা

হইয়াছে। তাহার নাম আমেরিকান লাইব্রেরী। মার্কিণ সওদাগরদের জন্য আছে আমেরিকান চেম্বার অব্ কমার্স। নিউ ইয়র্কের গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোম্পানী প্যারিসের এক অতি প্রসিদ্ধ ব্যাঙ্ক। আমেরিকান একস্‌প্রেস কোম্পানীর এক শাখা এখানে আছে। প্যারিসের যে কোনো বিদেশী লোক এই কোম্পানীর নাম জানে। ফরাসীরাও বিলাতী টমাস কুক কোম্পানীকে যত খানি জানে এই মার্কিণ কোম্পানীকেও ততখানি জানে। ইহাঁদের ব্যবসায় ব্যাঙ্কিং। বিশ্ব ভ্রমণের সকল প্রকার ব্যবস্থা করাও ইহাঁদের কাজ। প্যারিসের মার্কিণ হোটেল, রেষ্টরেণ্ট কাফে গুলাও অতি প্রসিদ্ধ। ওষুধের দোকান হইতে ধোপা নাপিত মুচির দোকান পর্য্যন্ত, এমন কোন দোকান দেখিতেছি না যাহাতে মার্কিণ ব্যবসাদারের প্রতিপত্তি নাই। অপর দিকে দাঁত বাঁধাইবার ডাক্তার হইতে চরমপন্থী নরমপন্থী, বুর্জ্জোয়া বোল্‌শেভিক সকল প্রকার ইয়াঙ্কি কাগজওয়ালাই এই সহরে ঘরকন্না করিতেছে। প্যারিসে গোটা মার্কিণ জীবনকে সকল অঙ্গেই স্পর্শ করা যায়। ভারতবাসীর পক্ষে ফ্রান্স এই হিসাবে আমেরিকার একটা বেশ কর্ম্মঠ উপনিবেশ।

"ফ্রাস আমেরিক" নামে একটা প্রতিষ্ঠান হইতে নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। এটা ফরাসী ও মার্কিণ সমাজে বন্ধুতা বাড়াইবার যন্ত্র। প্যারিসের যত বড় বড় নামজাদা লোক এই যন্ত্রের চালক! উপস্থিত হইয়া দেখি খাঁটি ফরাসী একজনও উপস্থিত নাই! অবশ্য যাঁহার নামে নিমন্ত্রণ চিঠি পাঠানো হইয়াছিল তিনি এক ফরাসী রমণী। আর একজন ফরাসী পুরুষ উপস্থিত। ইনি ফ্রান্সের সকল প্রকার বৈদেশিক আন্দোলনে হাজির থাকেন। অথচ নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্য মার্কিণ যুবতীগণকে ফরাসী সমাজে জানা-শুনা করাইয়া দেওয়া। কাণ্ড দেখিয়া কোনো ব্যক্তি যদি বলে ফরাসীরা বড় অ-মিশুক জাতি। অর্থাৎ বিদেশী-দের সঙ্গে লেনদেন করিতে ফরাসী স্ত্রীপুরুষেরা বেশী তিজেনা—তাহা হইলে নেহাৎ অন্যায় হইবে না। নিমন্ত্রণ চিঠিতে কমিটির নাম দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম বুঝি বা ফরাসী সমাজের নবাব আমীর ওমরাও রাণী, বেগম, শাহজাদা, ডাচেস, কাউন্টেস্ ইত্যাদির পাল্লায় ঘর গম্ গম্ করিবে।

বিশেষতঃ, যে সকল মার্কিণ মেয়েকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে তাঁহারা প্রত্যেকেই ফরাসী সরকারের "ছাত্রবৃত্তি" পাইয়া থাকেন। অর্থাৎ ফ্রান্স ইহাদের প্রত্যেকের রেলজাহাজ ভাড়া, খোরপোষ এবং ইস্কুল কলেজের বেতন খাস গবর্ণমেণ্টের তহবিল হইতে বহন করিতেছে। উপস্থিত দেখিলাম বিশ জন। আলাপ পরিচয়ে জানা গেল ফ্রান্স যেমন বিশ জন মার্কিণ ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার ভার লইয়াছে, যুক্তরাষ্ট্রও তেমনি ষাটজন ফরাসী ছাত্রীর উচ্চ শিক্ষার ভার লইয়াছে। তাহারা আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিণ সভ্যতার সহিত পরিচিত হইতেছে। এই ধরণের ছাত্রী বিনিময় (এক্‌সচেঞ্জ অব ষ্টুডেণ্টস্) আজকালকার একটা নূতন অনুষ্ঠান।

ফ্রান্স-আমেরিক পরিষদের এই প্রীতি-সম্মিলনে ফরাসী নরনারীর যৎসামান্য অনুরাগও না পাইয়া মার্কিণ ছাত্রীরা এবং অভ্যাগত স্ত্রী-পুরুষগণ সবিশেষ মর্ম্মাহত হইল। জাতে জাতে বন্ধুত্ব বাড়ানো সহজ কথা নয়। লড়াইয়ের ঠেলায় ফরাসীরা "উপরোধে ঢেঁকি" গিলিয়াছেন, অথবা "গুতোর চোটে বাবা" বলিয়াছেন। তাই বলিয়াই কি মার্কিণ জাতকে ইহারা জাতে তুলিয়া লইয়াছে?

[২]

বড়দিনের ছুটিতে ফ্রান্সে এক তুমুল কাণ্ড ঘটিয়া গেল। লেনিন পন্থীরা নরম পন্থী সোশ্যালিষ্টদেরকে একঘরে করিয়া ছাড়িল। তুর (Tours) সহরে সোশ্যালিষ্টদের কংগ্রেস বসিয়াছিল। প্রধান সমস্যা ছিল—মস্কো সহরে প্রচারিত "তৃতীয় স্যাঁতার ন্যাশন্যাল" মতের কমিউনিজম্ ফরাসী সোশ্যালিষ্টরা আগাগোড়া স্বীকার করিবে কিনা। প্রায় এক হাজার ভোট হইল বিরুদ্ধে, আর দুই হাজার দুই শতেরও অধিক ভোট হইল স্বপক্ষে। কাজেই ফরাসী মজুর চাষী মহলে বোল্‌শেভিকীর জয় জয়কার ঘোষণা করিয়া ১৯২১ সাল ফ্রান্সের সম্মুখে নূতন নূতন প্রশ্ন আনিয়া হাজির করিতে চলিল।

কমিউনিষ্ট দলের এক কর্ত্তার নাম কাশাঁ (Cachin)

ইনি লিখিয়াছেন "লিম্যানিতে" কাগজে :—"এই ঘটনার বুঝিতে হইবে যে ফ্রান্সের জন সাধারণ রুশ বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত। আর বুঝিতে হইবে যে, ফরাসী সমাজেও ধনীদের বিরুদ্ধে শ্রমীদের লড়াই শীঘ্রই তুমুল ভাবে দেখা দিবে।" ক্যাশাঁ একজন যুবা। এই ধরণের আর এক যুবার নাম কুতুরিয়ে (Couturior)। দুনিয়ার সকল পথ-আবিষ্কারের কাজেই ছোক্‌রাদের কৃতিত্ব। সর্ব্বত্রই যুবারা বুড়াদের যথার্থ নায়ক।

কঁকর্দ প্লাসের জলের ফোয়ারা গুলি দেখিতেছি আর পায়চারি করিতেছি। সেইনের অপর পারে শাঁবার দে দেপুতে বা ফরাসী হাউস অব কমন্সের ভবন। হুবহু গ্রীক ইমারত আর কি! চারধারে আলোকমালা। নদীর এপারে শাঁবারের গ্রীক ঢঙেরই দুইটা আফিস। অনতিদূরে ম্যাদলেইন মন্দির, এটাও গ্রীক রীতির বিরাট বাস্তু। স্কোয়ারের চার কোনে ফ্রান্সের নানা নগরীর নারী মূর্ত্তি—ষ্ট্রাসবুর, লিল ইত্যাদি। আর একদম মধ্যস্থলে মিশরের লুক্‌সর হইতে আনীত ওবেলিস্ক।

ভাবিতেছি স্থাপত্য শিল্পের প্রাণ নির্ভর করে প্রধানতঃ গবর্ণমেণ্টের বদান্যতার উপর। চিত্রশিল্পের-জীবন সরকারী কোষের উপর ততটা নির্ভর করে না। যদি কিছু পয়সা থাকে তবে যে কোনো গৃহস্থেই ছোট বড় মাঝারী ভালমন্দ চলন সই ছবি কিনিয়া ঘরের দেওয়ালে ঝুলাইবেই ঝুলাইবে। এইজন্য লক্ষপতি ক্রোড়পতি হইবার দরকার নাই। কাঙ্গালের কুঁড়েতেও যীশু মেরি অথবা কালী কোয়াম্ন কৃষ্ণের পট থাকা কিছু কঠিন নয়। কেহ খরিদ করে বেশী পয়সার ছবি, কেহ রাখে কম পয়সার এই যা প্রভেদ। কাজেই চিত্রশিল্পীদের বাজারের অভাব হয় না। ইহাদের শিল্পের ক্রেতা জনসাধারণ। কিন্তু কাদামাটি, কাঠ, ধাতু, পাথরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ-শিল্প-সম্বন্ধে পুরাপুরি এই কথা বলা চলেনা।

দেব দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া ভাস্করেরা অনেক সময়ে জন সাধারণের ধর্ম্ম প্রীতির উপর নির্ভর করিতে পারে সত্য। কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই ছাড়া অন্য কিছুর দোহাই দিয়া যে সকল স্থপতি শিল্পশক্তির প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত তাহাদের বাজার কোথায়? গ্রামের পঞ্চায়েৎ নগরের মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন, আর দেশের রাজ দরবার।

এমন কি ধর্ম্ম সম্পর্কিত মূর্ত্তির গঠনেও এই ধরণের "সঙ্ঘ" বা "গণে"র অর্থশক্তি আবশ্যক। বিপুল মন্দির তৈয়ারী করা দুজন একজন ধনীলোকের কাজ নয়। অবশ্য অনেক সময়ে লক্ষপতিরা একাকীই জগৎ প্রসিদ্ধ মন্দির মঠ গির্জ্জার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর, দুনিয়ার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই এই সমুদয় বাস্তু নির্ম্মাণের পশ্চাতে খাড়া জনগণের সমবেত শক্তি। এই শক্তিকে যে নামই দেওয়া হউক গণ, শ্রেণী, পূগ, সমূহ পরিষৎ বিহার।

এই সকল অট্টালিকা গড়িবার সুযোগেই স্থপতিরা নানাবিধ মূর্ত্তি গড়িবার "অর্ডার" পায়। যদি গথিক ক্যাথিড্রাল নির্ম্মিত না হইত তাহা হইলে খৃষ্টানধর্ম্মের দেবদেবী ঋষিমহর্ষির মূর্ত্তি আজ চোখে দেখিতে হইলে একমাত্র চিত্রশিল্পের শরণাপন্ন হইতে হইত। এই জন্যই লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক অথবা প্যারিসের বড় বড় মিউজিয়ামেও স্থাপত্যের নিদর্শন পাই একমাত্র নকলে। অর্থাৎ আসল বস্তুগুলা দেখিতে ইচ্ছা করিলে যথাস্থানে আসিয়া গির্জ্জার ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। কাজেই বলিতে হয় যে, গির্জ্জা মন্দিরাদি নির্ম্মাণে যে সমুদায় গ্রাম নগর দেশের সঙ্ঘেরা টাকা খরচ করিয়াছে তাহারাই উচ্চ অঙ্গের স্থাপত্য শিল্পেরও সংরক্ষক। সেই সকল সঙ্ঘ না থাকিলে স্থপতিদের প্রতিভা ফুটিয়া উঠিত না।

বাস্তু শিল্পের আওতায় এবং আনুসঙ্গিক ভাবে স্থাপত্য শিল্পবিকাশ পায়। বাগান, প্রাসাদ, রাস্তা, সাঁকো, লাইব্রেরী, থিয়েটার, আমোদ ভবন ইত্যাদি বাস্তু গঠনের জন্য দায়ী কাহারা? সর্ব্বত্রই গবর্মেণ্ট অথবা গবর্মেণ্টের এক শ্রেণীভুক্ত পয়সাওয়ালা কোনো না কোনো সঙ্ঘ। এই ধরণের সঙ্ঘ যে দেশে বা যে সমাজে নাই সেইদেশে বা সেই সমাজে বাস্তু শিল্পীদের এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থপতিদের ভাত জুটিতে পারে না। সেই মুলুকে ভাস্কর্য্য একদম স্বপ্নের বস্তু।

এই জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে আজ

পর্য্যন্ত ভারতে স্থপতি দেখা দিল না। বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইল। কেন না গতানুগতিক ধর্ম্ম রক্ষার জন্ত আজও মাদুরা নগরের কারিগর দেবদেবী গড়িতেছে, আজও বাঙালী কুম্ভকারেরা প্রতিমা তৈয়ারি করিতেছে। আর অবশ্য কলিকাতার গড়ের মাঠে অক্টারলনি মনুমেণ্ট এবং ইডেন গার্ডেনে ঝীল ও ব্যাগুষ্টাণ্ড আছেই! অধিকন্তু দিল্লীতে ক্রোড় ক্রোড় টাকা খরচ করিয়া একটা রাজধানীই তৈয়ারী করা হইল। কিন্তু এই বিরাট কাণ্ডের ইট, কাঠ মর্ম্মরের গন্ধ শুঁকিয়া কোনো ভারত সন্তানের প্রতিভা বাস্ত বা স্থাপত্য শিল্পের দিকে গজিয়া উঠিতে সুযোগ পাইল কি? প্যারিসের রাস্তায় বাহির হইলেই এই চিন্তাটা আপনা আপনিই মাথায় আসে।

[৩]

নেপোলিয়নের নামে একটা ও বড় সড়ক প্যারিসে দেখিতেছি না। মাত্র একটা চুনো গলি—রিু বোণাপার্ট (rue Bonaparte) তাও আবার ইস্কুল পাড়ায়। বিস্ময়ের কথা।

তবে নেপোলিয়নের স্মৃতি মাখানো দেখিতেছি অনেক ঠাঁই। প্লাস ভাঁদোম (Place Vendome) প্যারিসের একটা প্রসিদ্ধ স্কোয়ার ওপেরার নিকট কঁকর্দের নিকট তুইয়ারী জার্দাঁ (jardin) বা পার্কের নিকট এই এস্প্লানেডে আছে একটা মনুমেণ্ট যেটা দেখিয়া মনে পড়িল লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার আর নেলসন স্তম্ভ। এভাঁদো স্তম্ভটা নেপোলিয়নের তৈয়ারি। ওষ্টার্লিটস্ যুদ্ধের বিবরণ ইহার গায়ে খোদা। স্তম্ভের মাথায় প্রায় দেড়শত ফিট উঁচুতে নেপোলিয়ান সশরীরে দণ্ডায়মান। রোমে নাকি ট্রাজানের একটা স্তম্ভ আছে এই ধরণের। নেপোলিয়ন তারি ঝাড়া নকল আমদানি করিয়াছেন।

নেপোলিয়ন ওষ্টার্লিটস্ কখনো ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার জীবনে এই যুদ্ধই প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই যুদ্ধের স্মারক স্বরূপই ১৮০৬ সালে আর্কদ ত্রিয়োঁফ গড়িবার হুকুম দেওয়া হয়। এই খিলান বা ফটক দেখিলে মনে হয় যেন প্রাচীন মিশরের লুকসর কার্ণাকের বিরাট পাইল চোখের সামনে উপস্থিত। জগতের সকল সমুদ্রগুপ্তই দিগ্‌বিজয়ের জন্ত একই প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ কায়েম করিতে অগ্রসর হন। প্যারিসের খিলানের গায়ে যে সকল লেখা পড়িতেছি ফ্যারাও সম্রাটদের মন্দিরে, ও বেবিলনে এবং "গোপুরমে" সেই সকল লেখাই প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্থাৎ দেশ জয়, নগর লুণ্ঠন, পররাজ্য হরণ ইত্যাদি একদিকে, অপরদিকে নিজ বাহাদুরী, নিজ সৈন্ত সামন্ত ও সহযোগীদের বাহাদুরী ইত্যাদি। হরিষেণের প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে আমরা যে আকারে পাই প্যারিসের আর্ক দ' ত্রিয়োম্ফের গায়ে নেপোলিয়ানকে একদম সেই মূর্ত্তিতেই পাকড়াও করিতে পারি। চতুর্থ শতাব্দীর হিন্দু, উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী, আর খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৪০০ বৎসর কালের মিশরীয় র‍্যামসেস বা আর কেহ—সবারি প্রকৃতি এক ছাঁচে ঢালা। নেপোলিয়নের এই স্তম্ভ বা ফটকের আনুষঙ্গিক অনেকগুলা মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। ১৭৯২ হইতে ১৮১৫ পর্য্যন্ত যুগের প্রধান প্রধান সামরিক ঘটনা স্থাপত্য শিল্পে স্থান পাইয়াছে।

নেপোলিয়ান ছিলেন বিলকুল "ক্লাসিক"। অর্থাৎ বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা করিতেন যে গ্রীক রোমানেরা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছে তাহার বেশী মানুষের আর কিছু করিবার নাই। তাঁহার কল্পনার দৌড় এই লাইনে অল্পই দেখা যায়।

"গ্রীক রীতির নকল কর—যেখানে সেখানে—" ইহাই ছিল নেপোলিয়ান যুগের চরম বাণী। এমন কি মন্দিরের কল্পনায় ও তখনকার ফরাসী বীরদের হুকুম একটা আস্ত গ্রীক দেবালয় খাড়া করিতে হইবে। তাহা করা হইয়াছেও। প্যারিসের ম্যাদলেইন গির্জ্জা দেখিয়া কাহার সাধ্য বিবেচনা করে যে এটা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের আলয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউস দেখিয়া কোন লোক মনে করিবে কি যে গোলদিঘীর সামনে এ একটা পাঠশালা? ম্যাদলেইন মন্দির অবিকল তাই। অট্টালিকার বারেন্দায় স্তম্ভ গুলা অতি সুন্দর দেখাইতেছে। এই কোরিন্থিয় (Corinthian) স্তম্ভ দেখিতে পাই শাঁপার যে পূর্ত্ত ভবনে ও ব্যবসায়ী মহলে ষ্টক এক্সচেঞ্জের ভবনকে বলে বুস (Bourse) দুপুরবেলা এখানকার হট্টগোলে

একদিন দর কষাকষি না দেখিলে বর্ত্তমান জগৎ না দেখার সামিল হয়। এই বাড়ীটাও খাটি গ্রীক। এখানেও কোরিন্থীয় স্তম্ভের সারি। রোমে ভেস্পাসিয়ানের আমলের একটা মন্দির আছে। সেটা এই বুর্সের বাস্তু কল্পনার জনক।

বুর্স, ম্যাদলেইন আর সাঁপর তিনটা তিন অতি বিভিন্ন কাজের ঘর। অথচ ফরাসীরা তিনটার নির্ম্মাণে একই বাস্তুরীতি অবলম্বন করিয়াছে। শিল্পকলা হিসাবে এ এক বিষম খিঁচুড়ি। প্যারিসবাসী তা নিত্য হজম করিতেছে। তা ছাড়া এখানে গথিক, ওখানে রেনেসাঁস, এখানে শিখর ওখানে গম্বুজ বাস্তু শিল্পের চরম হযবরল প্যারিসে মজুদ। জগতের কোনো সহরেই শিল্পকলার খিঁচুড়ি এড়ানো অসম্ভব।

নানা লোকের নানা চোখ। ক্লাসিক ঢঙের অট্টালিকার আকৃতি আমার চোখে বিশেষ আনন্দ দায়ক বোধ হয় না। নিটোল চোস্ত চাঁছা কার্নিশ এবং সোজা বাঁকা বা শোওয়া লাইনগুলা মনোরম সন্দেহ নাই। কিন্তু যে বাস্তু আকাশ ফুঁড়িয়া শূন্যের ভিতর নব নব রূপ আঁকিয়া রাখেনা সেই বাস্তু দেখিয়া আমার পেট ভরে না। অর্থাৎ আমি চাই শিখর গম্বুজ, মিনার, অথবা ছুঁচোল অভ্রভেদী স্পায়ার। কাজেই রাজপ্রাসাদ জাতীয় হর্ম্ম্য আমার নিকট প্রীতিজনক বস্তু নয়। এইগুলা দেখিতেছি দুনিয়ার সর্ব্বত্রই প্রায় এক প্রকার। দোতলা বা তিনতলা ঘর, বড় বড় জানালা ভেনেসিয়ান লাগানো, চক্‌মিলান বাড়ী ইত্যাদি। এই সকল গৃহের জানালার সারি অতি সুশ্রী বটে। প্যারিসের যে কোনো রাস্তায় হাঁটিতে হাঁটিতে জানালা বা দুয়ার শ্রেণীর শোভা সর্ব্বদাই নয়ন আকৃষ্ট করে।

কিন্তু চিত্তের তৃপ্তি হয়, এক মাত্র যখন চোখে পড়ে এক আধটা গোলাকার বা অর্দ্ধগোল মস্‌জিদ সদৃশ বাড়ী কিম্বা হিন্দু মন্দিরের গড়ন। পশ্চিমারা যাহাকে বলিবে স্যারাসেনিক বা মুসলমানী ষ্টাইল সেই ষ্টাইলই লাগে মরমে। ইয়োরোপে ইহার নিদর্শন বিরল নয়। আর লাগে ভাল এই কারণেই গথিক রীতি। নোটর দাম গির্জ্জা এইজন্য চিত্তাকর্ষক। আবার রেনেসাঁস রীতির নিদর্শন গ্রাঁ প্যালে, ওতেল দ'ভিল ইত্যাদি এই কারণেই মনোরঞ্জক নয়। ইহাদের ছাদগুলা একদম মাঠের মতন যেন শুইয়া রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, শাঁবার বুর্স ও ম্যাদলেইন আমার দিলমাফিক নয়। তবে কোরিন্থীয় স্তম্ভওয়ালা বারান্দাযুক্ত ঘরের উপরে একতালা বা দোতলা মুসলমানী ডোম বসাইলে সে বাস্তুর মূর্ত্তি দেখিতে পাই সেখানে কুর্নিশ করিতে সর্ব্বদাই রাজি আছি। নেপোলিয়নের কবরটাকে (লণ্ডনের সেণ্ট পলস্‌ ক্যাথিড্রাল এর মত) সেলাম করিতে পারি। প্যারিসের প্যাটেওঁ ও (Pantheon) এই হিসাবে সেলাম যোগ্য।

প্যাটেওঁ কে গির্জ্জাও বলিতে পারি। মোটের উপর লোকরা জানে এটাকে ফরাসীদের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার অ্যাবি বলিয়া। অর্থাৎ বড় বড় ফরাসী মহাত্মাদের গোর দেওয়া হয় এই বাড়ীতে। ভল্টেয়ার, রুসো ইত্যাদির কবর এখানে। অনেকের বাতিক নামজাদা লোকের কবর দেখিয়া বেড়ানো। তাঁহারা পেঁয়ার লাশেজ (Pere Lachaise) এর কেওরাতলায় আসিলে মনোবাঞ্ছা মিটাইতে পারেন। সকলের ঠাঁই ত আর প্যাটেওঁতে জুটিতে পারে না। লাশেজ ছিলেন চতুর্দ্দশ লুইয়ের পুরোহিত। ইঁহার কবরের আওতায় স্থান পাইয়াছেন রোমাণ্টিক কবি মুসে সঙ্গীত গুরু শোপ্যাঁ (chopin), মিশরীয় সাঙ্কেতিক ভাষার প্রথম পাঠক শাঁপোলিয়ো (champollion) বিপ্লব প্রবর্ত্তক সিইয়ে (Sieyes) ইত্যাদি মোলিয়্যারের সমাধি ও এই গোরস্থানেই খুঁজিতে হইবে।

প্যারিসের দৈনিক কাগজগুলা নেহাৎ ছোট। চার পৃষ্ঠা মাত্র তার ভিতর বিজ্ঞাপনই এক পাতা। কিন্তু এইটুকু আকারেও দেখিতে পাই জগতের সকল প্রকার সংবাদই ছাপা হয়। বিশেষ লক্ষ্য করিতেছি যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা গবেষণার দিকে এবং শিল্প কারখানার উদ্ভাবিত নূতন কলযন্ত্র প্রক্রিয়ার দিকে সম্পাদকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তা ছাড়া পাঁচ ছয় লাইন উদ্ধৃত করিয়া জগতের বড় বড় কাগজের প্রকাশিত লোকমতগুলা প্রচার করা হইয়া থাকে। এই হিসাবে আমেরিকার সংবাদপত্রগুলা অনর্থক বাজে খরচের আধার মনে হইবে। অবশ্য মার্কিণরা ব্যবসা জানে। কাগজ চালাইতে বসিয়া তাহারা

টাকা জলে ফেলেনা, সুদে আসলে খরচ উসুল করিয়া লয়। কিন্তু এত ছাপাছাপি সত্বেও আমেরিকার নরনারী ফরাসী জাত অপেক্ষা কোনো অংশে বেশী শিক্ষিত সভ্য করিৎকর্ম্মা বা রাষ্ট্রনীতিক বিবেচনা করিবার জো নাই।

একজন ফরাসী ব্যবসায়ীর কারবার চলে বিলাতের সঙ্গে। ইহাকে বলি "ভাবিয়াছিলাম প্যারিসে আসিয়া দেখিব নিউইয়র্কের তুলনায় এ একটা পাড়াগাঁ বা মধ্যযুগের নগর। কিন্তু দেখিতেছি ঠিক উন্টা। বৈষয়িক জীবনের কোনো অনুষ্ঠানে প্যারিস নিউ ইয়র্কের নিকট হার মানিতে পারে না। অধিকন্তু মনে হইতেছে ফ্রান্সে দারিদ্র্য একেবারেই নাই।" ব্যবসায়ী বলিতেছেন:—"দারিদ্র্য নাই বলা চলেনা। তবে মার্কিণ সমাজে টাকা পয়সা যেমন মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের ঘরে জমা দেখা যায় ফ্রান্সে তাহা পাইবেন না। আমাদের ধন সম্পত্তি সমাজের সকল শ্রেণীতে কম বেশী ছড়ানো দেখিতে পাইবেন।" কথাটা বোধ হয় যেন মিথ্যা নয়।

[৪]

দেখিতে দেখিতে দুই মাস কাটিয়া গেল। এই আট সপ্তাহে এক দিনও শীতে কাহিল হইতে হয় নাই। নিউ ইয়র্কের শীত হজম করা থাকিলে প্যারিসের শীত অতি মারাত্মক বোধ হয় না। অন্ততঃ এত দিনে ত বাধা শীত পাইলাম না। নিউ ইয়র্কের শীত এখানে পড়িলে হয়ত বা অনেকে মারাই পড়িবে। কেন না ঘর গরম করিবার যথোচিত ব্যবস্থা সকল বাড়ীতে নাই। কিন্তু পয়সা খরচ করিতে পারিলে নাওয়াও যায়, গরম ঘরে বাস করাও যায়, আর দুইবেলা পূরা পেট খাওয়াও যায়। প্যারিসের বাজারে সব জিনিষই দেখিতে পাই কিনিবার লোকও বিস্তর।

রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট মিল রঁবা (Millerand) ইস্কুল দেখিতেছেন, হাসপাতাল দেখিতেছেন। ফরাসিরা শিশু জীবনের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি সমর্পণ করিতেছে। একে লোক মরিয়াছে যুদ্ধে অনেক, তাহার উপর, যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই ফ্রান্সের লোক সংখ্যায় ভাটা পড়িয়াছে। কাজেই অন্ততঃ পক্ষে টিউবারকুলোসিস আর অন্যান্য ব্যাধি নিবারণের আন্দোলন ফরাসী সমাজে অতি প্রবল। সঙ্গে সঙ্গে সন্তান পালন, শিশুরক্ষা, ইত্যাদি শব্দ সমাজ সেবক মহলে খুব চলিতেছে। ফরাসীতে শুনি পিয়েরি কুলতিয়র [puericulture] জমির চাষ, মাছের "চাষ" রেশমের "চাষ ইত্যাদি চাষের অনুরূপ এই শিশু সন্তানের "চাষ" ইংরেজিতে শব্দটা এখনো পারিভাষিক রূপে চলে নাই। কিন্তু না চলিবার কোন কারণ দেখি না।

১৯১৪ সালের নবেম্বরে যখন নিউ ইয়র্ক পৌছি তখন ভারতবাসীরা আমেরিকাকে জানিত অতি সামান্য মাত্র। আট নয় বৎসর বিদেশ গমনের ফলে গোটা কয়েক ভারতীয় ছাত্র ইয়াঙ্কি মুল্লুক পর্য্যন্ত আসিয়া ঠেকিয়াছিল। এই সকল ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়া মার্কিণ মাষ্টার মহাশয়েরা প্রদেশে প্রদেশে কিছু কিছু ভারত তত্ত্ব লাভ করিতে পায় ক্রমশঃ ছাত্রদের মধ্যে দুই চার জন রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলন কায়েম করে। তাহাদের চেষ্টায় ইস্কুল পাড়ার বাহিরে মার্কিণ "সমাজের" কোন কোন মহলে যুবক ভারতের কৃতিত্ব এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরানা ভারতের গল্পও ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। অধিকন্তু বিবেকানন্দ প্রবর্ত্তিত বেদান্ত-কেন্দ্র সমূহের আবহাওয়ায় আসিয়া ইয়াঙ্কি মুল্লুকের মিষ্টিক তত্ত্বের ব্যাপারীরাও ভারতবর্ষের খবর শুনিতে কথঞ্চিৎ আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু মোটের উপর কুরুক্ষেত্র সুরু হইবার সময় ভারতের তথ্য ইয়াঙ্কিস্থানে অজানা ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু আজ ছয় বৎসর পরে দেখিতেছি আমেরিকার বহুনরনারী অনেক ভারতীয় নরনারীর নাম জানে। যুক্তরাষ্ট্রের এমন কোনো প্রদেশ নাই যেখানকার কোনো না কোনো দৈনিক কাগজ মাসে অন্ততঃ দশবার ভারতীয় পল্লী নগরের, ভারতীয় নেতৃবৃন্দের, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সংবাদ প্রকাশিত না করে। আজ যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরা "ভারতবর্ষ" বলিলে একটা কোনো মার্কামারা মত বিশেষ বুঝে না। ইহারা জানে যে ভারতবর্ষে ততগুলা দল আছে যতগুলা দল ইহারা দেখে নিজেদের সমাজে। ভারতকে এইধরণের বিশেষ করিয়া জানা, বা তলাইয়া মজাইয়া বুঝা আমেরিকায় বেশ গভীর ভাবেই সুরু হইয়াছে।

ভারতবর্ষেও আমেরিকাকে এই ধরণের "ইন্টেন্সিভ"

না গভীরভাবে তলাইয়া বুঝা সুরু হয় নাই কি? অবশ্য আমেরিকার যত দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, ও ত্রৈমাসিকে ভারতের সম্বন্ধে লেখা অথবা ভারতবাসীর লেখা বাহির হইতেছে ততগুলা মার্কিণ সম্বন্ধে লেখা অথবা মার্কিণ নরনারীর লেখা ভারতীয় পত্রিকায় বাহির হয় না সহজেই আন্দাজ করিতেছি। কিন্তু হেমচন্দ্রের আমলে আমেরিকা ভারতবাসীর চিন্তায় যে ধরণের অলীক বা ভাবুক উচ্ছ্বাসের উৎস বিবেচিত হইত আজ আমেরিকা কি সেই অবস্থায় অথবা তাহার কাছা কাছি অবস্থায় আছে? কখনই না। ১৯২১ সালের ভারতবাসী ভারতে বসিয়াই অন্ততঃ এইটুকু সমঝিয়াছে যে আমেরিকায় কোনো এক ফর্মুলা দিয়া কাজ হাঁসিল করা চলবে না। ওখানে নানা জাতি, নানা মত, নানা আদর্শ, নানা প্রতিষ্ঠান। কাজেই যুবক ভারতকে আমেরিকায় দেখা করিতে হইবে নানা রূপে। ভারতবর্ষে এমন কোনো লোক নাই যিনি গোটা দেশের প্রতিনিধি স্বরূপ আমেরিকায় আসিতে পারেন; আর ইয়াঙ্কিস্থানেও এমন কোনো লোক নাই যাহাকে ভারতের নর নারী গোটা মার্কিণ দেশের প্রতিনিধি বিবেচনা করিতে পারে। এই তত্ত্বটুকু হজম করিতে পারাই আন্তর্জাতিক লেন দেন সম্বন্ধে যথেষ্ট বিজ্ঞতা ও পারদর্শিতার পরিচয়। মনে হইতেছে যে ইয়াঙ্কি ভারতীয় আদান প্রদানে আমরা আজ সেই পারদর্শিতা কথঞ্চিৎ লাভ করিয়াছি। এই পারদর্শিতা যত বাড়ে ততই মঙ্গল।

যা'ক, আমেরিকার কথা এখন তুলিবার প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি, আজ ফ্রান্সে-ভারতে সেই অজ্ঞতার সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধ ছিল মার্কিণে আর ভারতে ১৯১৪ সালে [অন্ততঃ পক্ষে ১৯০৫ সালে] প্রশ্ন এই; "ওহে ফরাসী মজুর, জমিদার, ব্যাঙ্কার, পণ্ডিত, ডাক্তার, বক্তা, এঞ্জিনিয়ার, সেনাপতি, রাষ্ট্রবীর, সোস্যালিষ্ট, বোলশেভিষ্ট—তুমি কয়জন ভারত সন্তানের নাম কাণে শুনিয়াছ বা ছাপার অক্ষরে দেখিয়াছ? ঠিক এই প্রশ্নই করিতেছি ভারতবাসীকে? "ওহে যুবক ভারতের মজুর, চাষী, বৈজ্ঞানিক, ইস্কুল মাষ্টার, ব্যবসাদার, প্রচারক, লেখক, বক্তা, রাষ্ট্রবীর দেশ নায়ক ইত্যাদি—তুমি কয়জন তোমার স্বশ্রেণীর অর্থাৎ নিজ ব্যবসায়ভুক্ত ফরাসী নরনারীর নাম করিতে পার?" ১৯১৪ সালে অথবা ১৯০৫ সালে ভারতবাসী এই ধরণের প্রশ্নে আমেরিকা সম্বন্ধে যে জবাব দিত এবং আমেরিকাও ভারত সম্বন্ধে যে জবাব দিত, ১৯২১ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে ফ্রান্স সম্বন্ধে ভারতবাসী এবং ভারত সম্বন্ধে ফরাসী সেই জবাবই দিবে। সেই জবাবটার আকার প্রধানতঃ এইরূপ:—"ফ্রান্স একটা দেশ বিশেষ জানোয়ার নয়।" "ভারতবর্ষ একটা দেশ বিশেষ জানোয়ার নয়।" কিছু রং চড়াইয়া বলা হইল কেননা পাঠশালার ছাত্রেরাও জানে যে ভারতখানাকে হজম করিবার জন্য দুপ্লে ছিলেন ফ্রান্সের আড়কাঠি। আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রে ভারতীয় ফৌজ আসিয়া উত্তর ফ্রান্সে এক শীত লড়িয়াছে। তা ছাড়া গণ্ডা গণ্ডা বিলাতী শিক্ষিত ভারতীয় ব্যারিষ্টার অন্ততঃ একবার করিয়া প্যারিসের নৈশ মজা লুটিয়া গিয়াছেন।

প্রশ্ন করিতেছি,—১৯১০ সালে বষ্টনের টেক্নলজিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের নাম অথবা এমন কি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কয় গণ্ডা ভারত সন্তানের কাণে পৌঁছিয়াছিল?" আবার প্রশ্ন করিতেছি—"ফ্রান্সের কোন্ সহরের কোন্ শিল্প বিদ্যালয়ে জগৎ প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার বা রাসায়নিক বা আর কোনো কার্য্যকরী বিদ্যার ধুরন্ধর গড়া হইয়া থাকে?"

যাহা হউক, এই অজ্ঞতার অবস্থা শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে বুঝিতেছি। এই দুই মাসে তাহার অসংখ্য ইঙ্গিত পাইয়াছি। ইচ্ছা করিলে গোটা ভারতকে হিমালয় পর্য্যন্ত হইতে উপড়াইয়া আনিয়া ফ্রান্সে বসানো যায়।

দুই মাসে ফরাসী বোল বুঝিবার ক্ষমতা বেশী বাড়িল না। তাহার কারণ কথা শুনিতেছি কম। হৈ হৈ রৈ রৈ আর টো টো করার পর যেটুকু সময় হাতের পাঁচ তাহার অধিকাংশই খরচ করি ফরাসী লেখা পাকাইতে; বড় বড় চিঠি লিখিতে এখন আর ভয় পাইনা। ডিক্‌শনারির সাহায্যে লেখাটা যথাসম্ভব নিভুর্ল করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু ব্যাকরণ হিসাবে যেটা নির্ভুল ভাবিতেছি সেটা বন্ধুদের

নিকট উপস্থিত করিবামাত্রেই দেখি ফরাসী ভাষার ধাতে এটা সয়না! ছোট খাট রচনা ও হাত মক্স করিতেছি। আর যদি সময় থাকে ফরাসী কেতাব পড়ায় লাগাইয়া দিই। কোনো বই আগা গোড়া পড়িবার দুরাশা রাখি না। অধিকন্তু কোনো এক ধরণের বই পড়িতে বসিলে আবার ভাষার গলি ঘোঁজ বড় রাস্তা ছোট রাস্তা নজরে পড়িবে না। কাজেই পাঁচফুলে সাজি সাজাইতেছি, অর্থাৎ তিন পাতা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা, দেড় পাতা দার্শনিক গ্রন্থ, আড়াই পৃষ্ঠা উপন্যাস বা কবিতা, আধ পাতা ইতিহাস গ্রন্থ, আর খানেক সংবাদপত্র ইত্যাদি। কাজেই কাণ শুধরাইবার সুযোগ কৈ?

[৫]

আমরা বড় জোর আমাদের সাহিত্যবীরদের রচনার সন তারিখ উল্লেখ করিতে শিখিয়াছি কিন্তু চিত্র শিল্পীদের রচনার ঐরূপ ঠিকুজি এখনও রাখিতে অভ্যস্ত হই নাই। আরও শিল্প সম্বন্ধে সম্প্রতি আমরা নেহাৎ আনাড়ি বলিলেও চলে। প্যারিসের লোকেরা কোন্ বাড়ীটা কবে তৈয়ারি হইয়াছে তাহাও বলিয়া দিতে পারে। অধিকন্তু কোন্ ইমারতটা কাহার হাতের বা মাথার তাহাও ইহাদের জানা আছে। অর্থাৎ লেখক, গায়ক, নর্ত্তক, বক্তা, চিত্রকর, স্থপতি ও বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে সঙ্গে আর্কিটেক্ট বা বাস্তুশিল্পীরাও ফরাসী সুধীমহলে যথোচিত সমাদর লাভ করিয়া থাকে।

রাস্তায় হাঁটিতে সুরু করিলেই বুঝা যায় যে প্যারিস নিতান্ত নূতন সহর। পুরানা আমলের মান্ধাতা আমলের কথা বলিতেছিনা, ধরা যাউক নেপোলিয়ানি যুগের কথা প্যারিসের রাস্তাঘাট লণ্ডনের রাস্তাঘাটের মতনই কদর্য্য জঘন্য কদাকার আঁকা বাঁকা সরু গলি ছাড়া আর কিছু ছিল না। সেইনের উপর দুইটা বড় সাঁকো নেপোলিয়নের হুকুমে সুরু হয়—ওষ্টার্লিটস আর ইয়েনা (Jena) যুগের স্মৃতি রক্ষার জন্য। ম্যাদ্‌লিন গির্জ্জা আরস্ ভবনের সূত্রপাতও এই যুগেরই ঘটনা। এতোআল পাড়ার বিজয় স্তম্ভ আর ভাঁদোম স্তম্ভ এই দুইটাও অবশ্য নেপোলিয়নের আগে ছিল না। সপ্তদশ সতাব্দীতে আওরাঙজেবের সমসাময়িক চতুর্দ্দশলুইয়ের আমলে অবশ্য কতকগুলা প্রশস্ত বুলভার ও অ্যাভিনিউ তৈয়ারি করা হইয়াছিল কিন্তু প্যারিসের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র সেইদিন—১৮৫২ হইতে ১৮৭০ সালের ভিতর। এই যুগটাকে "দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের" যুগ বলে। তৃতীয় নেপোলিয়ন এই যুগের কর্ণধার। ওস্মান (Haussmann) নামক এক ব্যক্তি ছিলেন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। তাঁহার ছিল নবাবী সখ। প্যারিসকে তিনি সাজাইয়া গিয়াছেন সুরম্য অট্টালিকায় আর সুন্দর সুন্দর দোকানে।

ওস্মানেরি খেয়ালে ওপেরা ভবন সুরু হয়। এইটার নির্ম্মান শেষ হইয়াছে ১৮৭৫ সালে তৃতীয় রিপাব্লিকের আবহাওয়ায়। এই আমলে তিন তিনটা বড় প্রদর্শনীর মেলা বসিয়াছে। এই মেলার জন্য যে সকল ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল সেইগুলা স্থায়ী আকারে প্যারিসের সৌধ সম্পদ বাড়াইয়াছে। ১৮৭৮ সালের মেলার জন্য তৈয়ারি হয় ত্রোকাদেরো; ১৮৮৯ সালের অনুষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছে এফেল স্তম্ভ; আর ১৯০০ সালের প্রদর্শনীর চিহ্ন দেখিতেছি গ্রাঁপ্যালে ও পেতিপ্যালে ভবনে এবং এই দুই হর্ম্মের নিকটবর্ত্তী আলেক্‌জাঁদার সাঁকোতে। এই সাঁকো পার হইয়াই যাইতে হয় নেপোলিয়নের কবরে আর সমর মিউজিয়ামে।

ওতেল দ' ভিল বা টাউন হলও এই আমলেরই বাড়ী। ১৮৭১ সালের বিপ্লবে প্যারিসের গুণ্ডারা পুরানা বাড়ীটা পুড়াইয়া দিয়া ছিল। এই বিপ্লবের আমলকে কমিউন (Commune) শাসনের কাল বলে। সেই কমিউন ছিল খানিকটা আজ কাল কার বল্‌শেভিকীর মাসতুত ভাই। মজুরের দল ও জনসাধারণ মিলিয়া পুলিশ পাহারাওয়ালা আর সরকারী পল্টনকে লাগাইয়া দিয়াছিল খুব উত্তম মধ্যম। তবে জনসাধারণের লাঠৌষধি টেক্‌সই হয় নাই। কমিউন শাসনের আয়ু ছিল মাত্র ৭৩ দিন। এই আড়াইমাসের ভিতর ইহারা ধ্বংস করিয়াছিল ৩১টা সরকারী কাছারি আর ২৩৮ টা বড় বড় বাড়ী। ইহাকে বলে বিপ্লব।

ফরাসী সৌধগুলার ইতিহাস অতি বিচিত্র। একই বাড়ীতে নানা যুগে নানা পরস্পর বিরোধী কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা লুক্সাঁবুর (Luxembourg) ভবনের

নাম অনেকেই শুনিয়াছি। বাড়িটা প্যারিস প্রসিদ্ধ। যে বাগানে বাড়ীটা অবস্থিত সেই বাগান [জাঁর্দা] সহরের অনেকখানি দখল করিয়া রহিয়াছে। লুক্সাবুর ভবনে দেখিতে পাই চিত্র ও স্থাপত্যের গ্যালারি। জীবিত অথবা সম্প্রতি মৃত শিল্পীদের রচনা ছাড়া আর কোনো কাজ মিউজিয়ামে স্থান পায় না। বলা বাহুল্য এই গ্যালারিতে যে সকল শিল্পী বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে হাতের কাজ দেখাইবার সুযোগ পায় তাহারাই ভাগ্যবান্ পুরুষ।

লুক্সাঁবুর ভবনের প্রধান অংশে আজকাল চলে "সেনা" বা সেনেটের কাজ কর্ম্ম। নেপোলিয়ানের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত সেনেট এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। বাড়ীটা কিন্তু অনেক দিনের পুরাণা। ত্রয়োদশ লুইর সময়ে [১৬২০ খৃঃ] ইহাকে দেখি রাজপ্রসাদরূপে। বিপ্লবের সময়ে ১৭৮৯ সালে ইহাকে কিছু কালের জন্য পরিণত করা হইয়াছিল জেলখানায়।

প্যাটেঁও ভবনটা প্রথমে ছিল গির্জ্জা। বিপ্লবের কর্ত্তারা ১৭৮৯ সালে ইহার চৌহদ্দি হইতে ধর্ম্মের সংস্রব উঠাইয়া দেয়। বাড়ীটাকে স্মৃতি ভবনে পরিণত করা হয়। ঘরের কপালে লেখা পড়িতেছি রাস্তা হইতে—ও গ্রাদ ওাম লো পাত্রি রকনেসাঁৎ [Auz grands hommos la Patric reconnaissant]। অর্থাৎ জন্মভূমি তাহার বীর সন্তানগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে, অথবা তাঁহাদের কীর্ত্তি স্মরণ করিতেছে। মিরাবো, ভল্টেয়ার, রুসো ইত্যাদি স্মরণ যোগ্য বীর। নেপোলিয়ানের পতনের পর যখন বুর্ব্বঁ বংশ ফিরিয়া আসে তখন বাড়ীটা হয় আবার ধর্ম্মগৃহ বা গির্জ্জা। ১৮৩০ সালের বিপ্লবে পুনরায় ইহার গত্যন্তর ঘটে. অর্থাৎ ইহা স্মৃতি ভবনে পরিণত হয়। তৃতীয় নেপোলিয়নের হুকুমে আর একবার এখানে ধর্ম্মাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজ কাল এখানে কোনো প্রকার ধর্ম্মের আওতা নাই। প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া প্যাটেঁও ফরাসী সমাজে বীরপূজার আয়তন স্বরূপ দর্শকগণের কৌতূহল আকর্ষণ করিতেছে। বাড়ীটার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে ১৭৬৪ সালে।

ভাঁদোম স্তম্ভের উপর দিয়াও অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছে। নেপোলিয়নের ওষ্টার্লিট্স কীর্ত্তির স্মৃতি ভবন করিবার জন্য ইহার সৃষ্টি; ফরাসি শত্রুর কামান গলাইয়া স্তম্ভের গাত্র মণ্ডিত করা হইয়াছিল। মাথার উপর ছিল নেপোলিয়নের মূর্ত্তি। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর বুর্ব্বঁ রাজারা সেটা সরাইয়া ফেলিয়া বসাইলেন বুর্ব্বঁ বংশীয় এক স্মারক চিহ্ন। বুর্ব্বঁদের বেআদবি লুই ফিলিপ সহ্য করিলেন না। তিনি সেখানে দাঁড় করাইলেন সুপরিচিত নেপোলিয়নি পোষাকে নেপোলিয়নকে। তৃতীয় নেপোলিয়ান আসিয়া আবার নেপোলিয়ানের মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তন কায়েম করিলেন। তাঁহার হুকুমে নেপোলিয়ানকে পরানো হইল রোমান রাজবেশ। ঠিক এই পোষাকই ছিল স্বয়ং নেপোলিয়ানের পছন্দ সই। বস্তুতঃ বুর্ব্বঁদের বেআদবির আগে ভাঁদোম স্তম্ভের নেপোলিয়ানের পরণে রোমান পোষাকই ছিল। ১৮৭১ সালে কমিউনিষ্ট বিপ্লবীরা স্তম্ভটাকে ধুলিসাৎ করে। কিন্তু তৃতীয় রিপাব্লিকের আমলে স্তম্ভটা আবার নেপোলিয়নকে মাথায় করিয়া খাড়া রহিয়াছে।

[৬]

প্যারিস সেইন নদীর দুই ধারে অবস্থিত। ২৪ টা সাঁকো। সাঁকোকে বলে পঁ (pont)। নদীর ভিতর একটা ছোট দ্বীপ; নদীটা অবশ্য খাল বিশেষ। এই দ্বীপেই প্যারিসের জন্ম; ক্রমশঃ দ্বীপের দুই ধারে বস্তি বাড়িয়া চলিয়াছে। আজও এইজন্য দ্বীপটাকে বলা হয় সিতে (La Cite) বা সহর। দ্বীপের প্রধান সব কটা বাড়ী প্রত্যেক বিদেশীই জানে। কেন না সেটা কোতয়ালী বা সদরখানা আর একটা বাড়ী জগদ্বিখ্যাত, তার নাম "নোতর দাম"। এখানকার প্যালে দ' জুষ্টিশ [Palais de Justice] বা হাইকোর্ট ভবনও ফরাসী সমাজে নামজাদা। এইটাকে বলা যায় ব্যবসায় পাড়া। রিওডি (রাস্তা) ওস্মান বুলভার সাঁজ এলিজে, বুলভার দেজই আলিয়া, ইত্যাদি এই অঞ্চলের নাম জাদা সড়ক। তুলারি বাগান কন্কর্দ প্লাস, নাসিয়ো প্লাস; ইত্যাদি এই পারে। লুভর ব্যস্তির, ওপেরা, বিব্লিওটেক ন্যাশন্যাল, ত্রোকাদেরো, ম্যাদলেইন, পঁ প্যালে, ওতেল দ' ভিল ইত্যাদি সৌধ

এদিককার গৌরব। বলা বাহুল্য বড় বড় দোকান বাস্ত ব্যবসায় ভবন ইত্যাদিও এই অংশেই অবস্থিত। এমন কি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও এই উত্তর পারেই ব্যবসায় পাড়া গড়িয়া উঠিতেছিল। সুতরাং সেই ধারা আজও বজায় আছে বলিতে হইবে।

সেইনের দক্ষিণ পারে বুলভার সাঁ জার্ম্যাঁ, বুলভার সাঁ মাইকেল [St Michel], বুলভার রাসপাই [Raspail] বুলভার মঁ পার্ণাস [Mont parnasse] ইত্যাদি রাস্তা প্রসিদ্ধ। এই দিককার বাগানগুলা নামজাদা। লুকসাবুর জার্দাঁ, জার্দাঁ দে প্লাত্ বা ব্যোটানিক্যাল গার্ডেন, শ্যা দ' মার [Champ de Mars] এই তিনটার নাম দেশ বিদেশে অনেকেরই জানা। ইস্কুল কলেজগুলা এই অঞ্চলে। শাঁবার দে দে পুতে, "সেনা", নেপোলিয়ানের কবর, এফেল মনুমেন্ট, আঁস্তিতিউ প্যাষ্টয়র, সুকুমার শিল্পের কলেজ "অ্যাস্তিতিউ দ' ফ্রান্স [বা পরিষৎ] সম্পূর্ণ কেন্দ্র পরিষৎ ইত্যাদি ভবন দক্ষিণ পারের গৌরব।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম "সর্ব্বন" [Sorbonne] পাদ্রি বা পুরোহিত সর্ব্বনের [Sorbon] প্রতিষ্ঠিত বলিয়া। প্যাটেওঁ বা স্মৃতি মন্দির বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কলেজের লাগাও। দক্ষিণ পার কে মধ্যযুগে—কার্ত্তিয়ে ল্যাতাঁ [quartier latin] বা ল্যাটিন পাড়া বলিত,—এই অঞ্চলে ল্যাটিনজ্ঞ টুলো পণ্ডিত পুরোহিতরা বসবাস করিতেন বলিয়া। আমরা ভট্টাচার্জ্জি পাড়া বলিলে যাহা বুঝিয়া থাকি "কার্ত্তিয়ে ল্যাতাঁ" বলিলে ফরাসীরা ঠিক তাহাই বুঝিত আজও তাহাই বুঝিয়া থাকে।

আজকালকার প্যারিসে ধনী লোকেরা বসবাস করে এতো অঞ্চলের হোটেলাদিতে। ব্যবসায়ীদের হট্টগোল জাকজমক সব ওপেরার চারদিকে [বিশেষতঃ বুলভার দেজ ইতলিয়াঁ সড়কের আশে পাশে।

প্যারিস সহরটাকে মোটের উপর বলিতে পারি—গোলাকার সেইন বহিতেছে মাঝামাঝি—উলটা অর্দ্ধচন্দ্রের আকারে। এই হিসাবে এখানে কাশীর কথা মনে পড়ে। আর এক তরফ হইতে বলি প্যারিসে হাবড়ার পুলের উপর দাঁড়াইলে দুই দিক যেমন দেখায় আলেকজাঁদার পঁ হইতে অথবা অ্যাস্তিতিউ লুওরের পঁ হইতে প্যারিসের দুই অংশ সেইরূপ দেখায়। তবে এখানে বিপুল জাহাজের গতিবিধি নাই। আর নাই কারখানার ও জেটির ধোঁয়া।

অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো লোক কলিকাতা দেখিয়া মনে করিবে জগতের এক অতিসমৃদ্ধিসম্পন্ন জাতির মহানগরী তাহার সম্মুখে অবস্থিত। এই ধরণের সহর দেখিবার পর তাহার মাথায় আসিবে না যে বাঙ্গালী জাত অথবা ভারত সন্তান দরিদ্র, পল্লীবাসী, কুটির শিল্পী কিম্বা চাষী মাত্র। কলিকাতা বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি সহরগুলা যতদিন স্বশরীরে বর্ত্তমান ততদিন খোলা চোখে কেহই ভারত সন্তানের দারিদ্র্য স্বীকার করিবে না।

প্যারিসের ধন সম্পদে আর বোম্বাই কলিকাতার ধন সম্পদে প্রভেদ কোথায়? যুবক ভারতের জন্য হইয়াছে এই প্রশ্নেরই জবাব শুনিয়া। "পরদীপশিখা নগরে নগরে তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে," এই বাণীতে যে ধনবিজ্ঞান স্থাপিত হইতে পারে সেই ধনবিজ্ঞান খুলিয়া বিশদ করিয়া লিখিবার ও প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে। এই হেঁয়ালি পূর্ণ বচনের মর্ম্ম দুনিয়ার মামুলি ধনবিজ্ঞানবিদেরা একদম বুঝেন না। তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টাও আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই। যুবক ভারতের নিকট বর্ত্তমানজগৎ সেই ধনবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাই আশা করিতেছে।

সাহিত্যে রাজনীতি (?)

[শ্রীশক্তিপদ ভট্টাচার্য্য]

মাসের পর মাস বাংলা মাসিকের পাতা এমন সব দু' একটী প্রবন্ধে পূর্ণ হইতেছে, যাহা দেখিলে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখে ম্রিয়মান হইতে হয়। বাংলার পুরুষ ও স্ত্রী সাহিত্যিক উভয় পক্ষই আজ যেরূপভাবে তাঁহাদের শক্তির অপব্যয় করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই আশার কথা নহে। গর্ভ মধ্যস্থ প্রাণহীন শিশুটী যখন কেবল মাত্র অবয়বে পরিপুষ্ট হইতেছে তখন হইতেই যদি তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিসদৃশ সমালোচনা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর আঘাত পড়ে তবে সেই অসহায় শিশু কতক্ষণ জীবিত থাকিতে পারে এবং কেমন করিয়াই বা পরিপুষ্ট হয়?

তাই যখনই দেখি অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া দু' একজন খ্যাতনামা বা অখ্যাতনামা সাহিত্যিক সাহিত্যের বাজারে রাজনৈতিক ব্যবসায় চালাইতে ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছেন তখন সত্যই লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া আসে।

এই আলোচনায় আমি ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার-মিলন প্রভৃতি প্রবন্ধের কথা উত্থাপন করিব না কারণ আমার বিশ্বাস তাঁহার ঐ সারগর্ভ প্রবন্ধগুলির, তাৎপর্য্য আজও সকলে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই এবং সম্ভবতঃ ঐ সকল প্রবন্ধের ব্যর্থ অনুকরণের প্রয়াসেই এমন সব প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, যাহার সারা কলেবরে চিন্তার দৈন্য স্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সব প্রবন্ধেও প্রবীন সাহিত্যিকদের মস্তিষ্ক বিগড়াইতেছে।

কিছুদিন আগে 'সাহিত্য' পত্রিকা একজন পাকা ওস্তাদ সাহিত্যিকের লেখা লইয়া 'স্বরাজে'র সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতে বৃথাই চেষ্টা করিয়াছিল; এবং উক্ত প্রবীন সাহিত্যিক অবশেষে 'স্বরাজ' 'পররাজের'ই নামান্তর মাত্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। গর্ভ মধ্যস্থ অপরিণত অবয়ব শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দোষগুণ বিচার যেমন হাস্য-স্পদ উক্ত প্রবীণ সাহিত্যিকের স্বরাজের প্রকৃতি নির্দ্ধারণও প্রায় তদ্রূপ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার ওই ওস্তাদী লেখনীর যাদুবিদ্যায় অনেকেরই চোখে যে ভেল্কী লাগিয়া ছিল তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে পর পর তিন সংখ্যা উপাসনার ঐ ভেল্কীর কাটান গাহিতে হইয়াছে। স্বরাজ এখনও গর্ভ মধ্যস্থ ভ্রূণ, এখন হইতেই যদি ইহার দোষগুণের সমালোচনা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে দোষের ভাগটাকেই বড় করিয়া দেখিয়া ইহার আগুশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করি তাহা হইলে কেহ আমাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিবে কে?

স্বরাজ জাতির সাধনায় গড়িয়া উঠিবে। জাতির প্রতি-নিধিগণ ঠিক সময়ে গড়িয়া ভাঙ্গিয়া, ভাঙ্গিয়া গড়িয়া স্বরা-জের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করিতে থাকিবেন, স্বরাজ শুধু ভার-তের একলার সম্পত্তি নয় ইহা সমগ্র মানব জাতির চির জীবনের সাধনা। মানুষের অহংবুদ্ধি পাঁয়তারা ভাঁজিয়া আজ পর্য্যন্ত যাহা ছকিয়াছে তাহাইত আজ মাঝপথে হোঁচট খাইতেছে। এত দেখিয়াও আজিওকি আমরা এই ক্ষুদ্র বুদ্ধির বড়াই করিব? তাই মহাত্মা আজও স্বরাজের কোন বিশেষ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন নাই। মনস্বী বিবেকানন্দও কি ঐ কথা বলেন নাই? তিনি নিবেদিতাকে লিখিয়া গিয়াছেন— "The details come as I go. I never make plans. Plans grow, and work themselves, I only say, awake, awake," আজ মহাত্মা গান্ধীও ঐ একই কথাই বলিতেছেন—যে মুহূর্ত্তে ভারতের তেত্রিশ কোটি লোক এক

বাক্যে বলিবে "আমরা স্বাধীন" সেই মুহূর্ত্তেই ভারত স্বাধীন হইবে।

অপরিপক্ক ও অপরিণত চিন্তা লইয়া এই যে স্বরাজের বিশ্লেষণ ইহা বাস্তবিকই হাস্যোদ্দীপক। বাংলার প্রবীন নবীন খ্যাতনামা অখ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ বুদ্ধিকে নাস্তানাবুদ করিয়া স্বরাজের প্রকৃতি নির্দ্ধারণে ব্যতিব্যস্ত; যেন স্বরাজ তাঁহাদের ল্যাবরেটরির টেষ্ট টিউবের (Test-tube) মধ্যে।

যে দেশে গঠন নাই সে দেশে সমালোচনা বড় ভয়ানক; বিশেষতঃ অপরিণত বুদ্ধি লইয়া সমালোচনা করিতে গেলে সমালোচনা তখন নিন্দা রটনায় পরিণত হয়। আধুনিক জগৎ গঠন মূলক সমালোচনার পরিপন্থী তাই আজ সমালোচকের কাজ তত সোজা নয়। যে সমালোচনা কেবলই ভাঙ্গিয়া যায়—সঙ্গে সঙ্গে গঠনের পন্থার ইঙ্গিত করে না সাহিত্য-জগতে আর সে-সব সমালোচনার স্থান নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালী সমালোচকের আদর্শ অন্যরূপ এবং আমরা প্রত্যেকেই আজ সমালোচক হইয়াছি এবং সমালোচনার এইরূপ অযথা আড়ম্বর দেখিয়া প্রবীন সম্পাদকদেরও তাক লাগিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি ফাল্গুনের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী 'নারীর কথা' (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে) শীর্ষক প্রবন্ধে এরূপ এলোপাতাড়ি বক্তৃতার ছড়াঝাঁট দিয়াছেন যে তাহাতে আবর্জ্জনা দূরীকৃত হওয়ার চেয়ে স্তূপীকৃতই হইয়াছে বেশী। প্রথম হইতেই যেরূপ অবজ্ঞাভরে তাচ্ছিল্যের লেখনী লইয়া লেখিকা জাতীয় বিদ্যালয়ের উপর তাঁহার ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় সত্যযুগ হইলে জাতীয় বিদ্যালয় এতদিন ভস্মীভূত হইয়া যাইত।

জাতীয় বিদ্যালয় এখনও আশার নেত্রে আদর্শের বস্তু, ছায়াময়, কায়াময় নহে। লেখিকা কি জানেন না যে বর্ত্তমানে যে পদ্ধতিতে জাতীয় বিদ্যালয় সকল পরিচালিত হইতেছে তাহা জাতীয় বিদ্যালয়ের পদ্ধতি নহে। পৃথিবীর ইতিহাসের সহিত তাঁহার যদি কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিত বা তিনি যদি একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন। বিপ্লবের সময় গঠন সঠিক হয় না। যুদ্ধের সময় জাতি যুদ্ধেই প্রাণমন নিয়োগ করে, বিদ্যালয় তখন তাহাদের নিকট একটা চলার পথে বিশ্রামাগার মাত্র। আমাদের দেশেও আজ জাতীয় বিদ্যালয়ের নামকরণ মাত্র হইয়াছে ইহার আকার অবয়ব যাঁহারা স্থির করিবেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কারাগারে, কেহ বা কারাগারে যাইবার পথ পরিষ্কার করিতেছেন। লেখিকা মহোদয়াকে সসম্ভ্রমে ফাল্গুনের প্রবাসীর শ্রদ্ধাভাজন প্রবীন সম্পাদকের সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এ সময় আরাম কেদারার শুইয়া শুইয়া অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে জাতীয় বিদ্যালয়ের উপর অযথা আক্রমণ উদারতার পরিচায়ক নহে।

জাতীয় বিদ্যালয় স্বরাজ-আন্দোলনের একটা অংশ বিশেষ মাত্র। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উপর জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতি অবনতি সম্পূর্ণরূপে না হউক অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। আজ যাহার নামকরণ হইয়াছে কালে সে বর্দ্ধিতাবয়ব হৃষ্টপুষ্ট হইবে কিন্তু অন্তর্যামী সমালোচক এখন হইতেই মনগড়া কথায় জাতীয় বিদ্যালয়ের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। যিনি পুস্তকখানির নামমাত্র লইয়া তাহার সমালোচনা করেন সে সমালোচক হয় অন্তর্যামী আর না হয় উন্মাদ; তাই জাতীয় বিদ্যালয়ের সমুদয় অলিখিত অংশ লইয়াই লেখিকা মহোদয়া যখন মনগড়া কথায় তাহার যা' তা সমালোচনা করিয়াছেন তখন আমরা দুঃখিত না হইয়া পারি নাই।

লেখিকা আরম্ভ করিয়াছেন:—

"শুনছি আমাদের নাকি জাতীয় বিদ্যালয় হবে—আর তাহলেই দেশের অশিক্ষা, অন্ন বস্ত্র আদি যত সমস্যা, কষ্ট, দুঃখ সব দূর হবে। সেখানে চরকা কাটিতে শিখিয়ে, বস্ত্র সমস্যার আর 'একলিপি বিস্তার সমিতির মতানুযায়ী' (?) হিন্দী ভাষা শিখিয়ে শিক্ষা সমস্যার মীমাংসা করা হবে; অন্ন সমস্যার জন্য কৃষিবিদ্যা শেখানো হবে কিনা ঠিক জানি না। এর আদর্শ নাকি খুব উঁচু কোন অংশে বিলিতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চেয়ে কম নয়! পাঠ্য বইগুলির সংখ্যাও খুব কম হবে না; ছাত্রদের বেশ গভীর জ্ঞান যাতে হয় সেইরূপ সংখ্যা থাকবে। মোট কথা যদি (?) আমাদের এই জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তার বোঝার ভার বিলিতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চেয়ে হালকা ত হবেই না বরং আরও ভারীই হবে।"

এখানেও ঐ একই কথা,—লেখিকা যদি অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্না ভবিষ্যদ্দর্শিনী হ'ন তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু তা যদি না হন তাহা হইলে পুণরায় আমরা বলিতে বাধ্য যে, জাতীয় বিদ্যালয়ের গঠন প্রণালীর জন্য

দেশের মনীষি বৃন্দের মস্তিষ্কের প্রয়োজন, তাঁহারা কোন প্রণালীতে জাতীয় বিদ্যালয় পরিচালিত করিবেন এবং কোন প্রণালীতে করিবেন না, তাঁহাদেরও এ কথা আজ জানা নাই। ইহার জন্য কত চিন্তা কত গবেষনা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। কিন্তু লেখিকার সে দেরীটুকু সহ্য হয় নাই, তিনি নিজেই মনগড়া করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের খসড়া তৈয়ারী করিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করিয়াছেন।

তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকাশ "শুনছি আমাদের নাকি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনা হবে" "মোটকথা যদি আমাদের এই জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়" ইত্যাদি। সুতরাং যে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহারই কথায় আজও ভবিষ্যতের গর্ভে প্রাণহীন ভ্রূণ তাহার বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করার চেয়ে সম্বরণ করাই উদারতার পরিচায়ক।

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন "সেখানে চরকা কাটতে শিখিয়ে বস্ত্রসমস্যার ও একলিপি-বিস্তার-সমিতির মতানুযায়ী হিন্দী-ভাষা শিখিয়ে শিক্ষা-সমস্যার মীমাংসা করা হবে।" চরকা সম্বন্ধে তাঁহাকে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মাঘের উপাসনার 'আলোচনী' পাঠ কর্ত্তে অনুরোধ করি।

তৎপরে লেখিকা একেবারে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন "মোটকথা যদি আমাদের এই জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তার বোঝার ভার বিলিতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চেয়ে হালকা ত হবেই না বরং আরও ভারীই হবে।"

বোঝা ভারী হবে কি হালকা হবে তা এখনও গবেষনা ও আলোচনা সাপেক্ষ; আমরা সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতি-শ্রুতি আপাততঃ লেখিকাকে দিতে অপারগ—তবে তাঁহাকে একটু ধৈর্য্য ধারণ কর্ত্তে অনুরোধ করি।

তিনি আরও লিখেছেন "আমাদের ছেলেরা ত' হুজুগে মেতে নন-কো-অপারেশন করলে, জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়তে ঢুকলো.. ইত্যাদি।"

যারা হুজুগে মেতেছিল হুজুগ ফুরুতেই তারা সুড় সুড় করে যে যার গোয়ালে ঢুকে পড়েছে, এখন যারা জাতীয় বিদ্যালয়ে পড়ে আছে তারা আর যাই হোক হুজুগে নয়। লেখিকার মতে নন-কো-অপারেশন একটা হুজুগ, এর উত্তর আমাদের দেশের অনেক মহা মনস্বী অনেক রকমেই দিয়েছেন আমি আর দিতে চাই না।

লেখিকা বিপ্লব অপেক্ষা বিবর্ত্তনের অধিক পক্ষপাতী। তিনি বলেছেন"........তার চাইতে যদি ঐ বিলিতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কতকগুলো নিয়ম বদলে দিতে পারা যায় তবে হয়ত আমরা এতগুলি স্বাস্থ্যহীন নীরুৎসাহ ছেলের পরিবর্ত্তে বলিষ্ঠ উৎসাহী দীর্ঘায়ু ছেলে দেখতে পাই।" তাঁর এই মতের বিচার ভার পাঠকের উপর থাক। লেখিকা মহোদয়া যদি শিক্ষা সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে অন্ন-সমস্যার কথাটা একটু ভেবে দেখতেন তা হলে বোধ হয় ছেলেদের স্বাস্থ্য-হীনতার তথ্যটা তাঁর কাছে আর একটু পরিষ্কৃত হ'ত। শিক্ষার আর একটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অঙ্গ যা ঐ বিলিতি বিদ্যালয় গুলোতে অসম্ভব হয়েচে সেটা হচ্চে ব্রহ্মচর্য্য। দশটা না বাজতে বাজতে নাকে-মুখে-চোখে দুটো আধ সিদ্ধ ভাত গুজে অফিসী কেতায় স্কুল করা ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান শত্রু। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রবর্ত্তন কর্ত্তে না পারলে সে শিক্ষা এদেশে ফলপ্রসূ হবে না।

প্রাতঃ ৭টা থেকে ১১।১২ টাকে লেখিকা পাঠের পক্ষে প্রশস্ত সময় বলে ইঙ্গিত করেছেন। এ যুক্তিটী আমাদের সমীচিন বলে মনে হয়। আশা করি জাতীয় বিদ্যালয়ের স্থাপন কর্ত্তারা—সময়ে এ কথাটা ভেবে দেখবেন। তৎপরে আমার বিশ্বাস লেখিকা সমালোচনা করিতে বসিয়া অনুকরণ বিপত্তিতে পড়িয়াছেন। সাহিত্যামোদী পাঠক-গণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে বাংলা-সাহিত্যে কিছুদিন হইল এমন একজন স্ত্রী-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহার অগাধ-পাণ্ডিত্য-ব্যঞ্জক সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া সমাজের আবর্জ্জনার স্তূপে আগুণ ধরাইয়াছে। হয়ত ইঁহার লেখনী একদিন খাঁটী সোনাই বাহির করিবে। আমার বিশ্বাস ঐ লেখনীর অনুকরণের বিফল প্রয়াসে লেখিকার এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। তাঁহার লেখনী অন্তরের সদিচ্ছাকে ছাড়িয়া অযথা খানিকটা বিষ উদগীরণ করিয়াছে।

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ } বৈশাখ ১৩২৯ { ১০ম সংখ্যা

কুমারিল ভট্টের 'শিষ্ট শব্দ'

(তন্ত্র বার্ত্তিক হইতে)

[শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়]

পূর্ব্ব পক্ষ

ব্যাকরণ শাস্ত্র যখন বেদ বা ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, তখন শব্দ প্রয়োগের কোনও বিধি নাই। সূত্র॥

যেখানে একমাত্র শব্দের একাধিক অর্থ লোকপ্রসিদ্ধ সেখানে উভয় অর্থের একটী মুখ্য ও অপরটী গৌণ। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রয়োগ হইতে মুখ্যার্থটী বাছিয়া লইতে হয়। এক কালে এক শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগ হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে 'যব,' 'বেতস,' ও 'বরাহ' শব্দ স্থান বিশেষে যথাক্রমে 'প্রিয়ঙ্গু,' 'জম্বু' ও 'বায়স' অর্থে প্রযুক্ত হয়। ইহাদের মুখ্য অর্থ নির্ণয় করিতে হইলে বেদের প্রয়োগ দেখিতে হইবে। কারণ বেদের প্রয়োগ অভ্রান্ত। বেদে আছে—'উদুম্বর-কাষ্ঠ নির্ম্মিত যূপ যব-জল দিয়া ধুইবে'। 'যব' শব্দের বিষয়ে আরও আছে—'যখন অন্যান্য শস্য শুকাইয়া যায়, তখন এই শস্য বাড়িতে থাকে'। এই উভয় স্থলে 'প্রিয়ঙ্গু' অর্থে 'যব' শব্দের প্রয়োগ হয় নাই। কারণ ফাল্গুন মাসে যব জন্মে; তখন অন্য শস্য থাকে না। 'প্রিয়ঙ্গু' শরৎকালে পাকে; তখন অন্য শস্য থাকে। সুতরাং বেদের প্রয়োগ হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে 'প্রিয়ঙ্গু' 'যব' শব্দের গৌণ অর্থ। কারণ এ অর্থ বেদের প্রয়োগে সঙ্গত হয় না। এই প্রকারে অন্যান্য শব্দেরও মুখ্য ও গৌণ অর্থ নির্দ্ধারণ করা যায়।

কিন্তু যে স্থলে 'গো', 'গাবী', 'গোণী' প্রভৃতি বহু শব্দ দ্বারা এক অভিন্ন বস্তুর অভিধান হয়, সে স্থলে কোন্‌টী মুখ্য শব্দ, কোন্‌টী গৌণশব্দ, অর্থাৎ কোন্‌টী শুদ্ধ (শিষ্ট বা সাধু) শব্দ আর কোন্‌টী অশুদ্ধ (অশিষ্ট বা অসাধু) শব্দ তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। আমরা সমস্ত শব্দই প্রাচীন অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রয়োগে প্রাপ্ত হই; তাঁহাদের প্রয়োগ বিচার করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধতা নির্ণয়ের কোনও পদ্ধতি প্রচলিত নাই। যে সকল বর্ণ সমষ্টি কোনও নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাহাকেই অবশ্য শুদ্ধ শব্দ বলিতে

হইবে আর যদ্দ্বারা অর্থ প্রকাশ হয় না তাহা শব্দই নহে; সুতরাং তাহাদের শুদ্ধাশুদ্ধতা লইয়া মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই। বেদের প্রয়োগ হইতে শুদ্ধাশুদ্ধত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ বেদে যে সকল শব্দই পাওয়া যাইবে তাহার কি মানে আছে? শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধত্ব নির্ণয় বা সংখ্যাবধারণের জন্যত বেদের অবতারণা হয় নাই। ধর্ম্মই যখন বেদের লক্ষ্য, তখন ধর্ম্মোপদেশ ব্যতীত বেদে আর কোনও কথা পাওয়া যাইবে কেন? সুতরাং যে শব্দ বেদে পাওয়া যাইবে না তাহা অশুদ্ধ এ কথা বলিবার কোনও হেতু নাই। কারণ বেদে না থাকিলেও ঐ সকল শব্দের দ্বারা অর্থ প্রকাশ হয়। আবার প্রাকৃত শব্দ ছাড়িয়া দিলেও 'হস্ত', 'কর', 'পাণি' প্রভৃতি সমার্থক শব্দ আছে, তাহাদিগের কোনওটীকে শুদ্ধ আর কোনওটীকে অশুদ্ধ ত বলা হয় না।

যদি বল শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধতা কোনও অচিন্তনীয় কারণের বশবর্ত্তী, তাহা হইলে যখন 'এই শব্দ শুদ্ধ', 'এই শব্দ অশুদ্ধ' বলিয়া বেদে কোনও নির্দ্দেশ নাই তখন অন্য কোনও প্রকার প্রমাণ দ্বারা ঐ শুদ্ধাশুদ্ধতা গ্রহণ করা যায় না। (১) ইন্দ্রিয় বোধ দ্বারা শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধতা নির্ণয় হইতে পারে না; কারণ ইন্দ্রিয়বোধ দ্বারা আমরা বর্ণজ্ঞান মাত্র প্রাপ্ত হই, আর প্রত্যেক শব্দই শুদ্ধাশুদ্ধনির্বিশেষে বর্ণসমষ্টি দ্বারা গঠিত। (২) অনুমান দ্বারা হইতে পারে না; কারণ বর্ণ সমষ্টির দ্বারা অর্থ প্রকাশ বিষয়ে কোনও অনুমান খাটে না। লোকে যে শব্দের যে অর্থ বুঝে তাহাই সেই শব্দের অর্থ। (৩) কোনও ব্যক্তি বিশেষের উক্তিদ্বারা হইতে পারে না। কারণ লোকের উক্তি ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও অনুমান সাপেক্ষ, এবং ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা অনুমানের সহিত শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধতার কোনও সম্পর্ক নাই। (৪) আর শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধতা যখন কোনও 'কর্ম্ম' নহে তখন বেদের বিধি নিষেধের বিষয়ীভূত নহে।

শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধতা বিশুদ্ধ ভাবনার সাধনভূত বলিয়া বেদে শুদ্ধ শব্দ ও অশুদ্ধ শব্দের নির্দ্দেশ অপ্রাসঙ্গিক নহে বলিয়া যুক্তি করা যায়, তাহা হইলেও অসংখ্য শুদ্ধ শব্দের জন্য অসংখ্য বিধি ও অসংখ্য অশুদ্ধ শব্দের জন্য অসংখ্য নিষেধ বাক্যের আবশ্যক হয়। আবার শুদ্ধ অপেক্ষা অশুদ্ধ শব্দেরই সংখ্যা বেশী। সুতরাং এরূপ ভাবে বিধি ও নিষেধ সম্ভবপর নহে। কলঞ্জ (বিষাক্ত শরের দ্বারা নিহত পশু) ভক্ষণ নিষেধ করিয়া বেদে এক কথায় অসংখ্য ব্যষ্টিগত পশুর মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু শব্দের বিষয়ে একবিধি বা এক নিষেধ দ্বারা বহু শব্দ গ্রহণ বা বহু শব্দ বর্জ্জনের উপদেশ চলে না। আর অর্থ প্রকাশই যদি শব্দের উদ্দেশ্য হয় এবং অর্থ বিশিষ্ট শব্দকে যদি শুদ্ধ শব্দ বলা যায়, তবে শব্দবিষয়ক কোনও বিধি নিষেধের আবশ্যকতা হয় না। কারণ 'জলপান করিবে', 'অগ্নি পান করিবে না', ইত্যাদি বিধির ন্যায় 'নিরর্থক শব্দ ব্যবহার করিবে না' এই বিধিও নিরর্থক। অগ্নি যেমন পেয় নহে, নিরর্থক শব্দও সেইরূপ কেহ ব্যবহার করে না।

যদি শুদ্ধ শব্দ ও অশুদ্ধ শব্দের উপদেশ অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে শুদ্ধ শব্দের উপদেশ করা হইবে? না, অশুদ্ধ শব্দের? না, উভয়বিধ শব্দের? এ বিষয়ে পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যাঃ" * অর্থাৎ "পাঁচটী মাত্র পঞ্চনখ বিশিষ্ট প্রাণী ভক্ষণ যোগ্য" এই কথা বলিলেই যেমন বুঝা যায় সে উল্লিখিত পাঁচটী ছাড়া অন্য পঞ্চনখ পশু অভক্ষ্য, সেইরূপ কেবল মাত্র শুদ্ধ শব্দের উপদেশ হইলেই তাহা হইতে অশুদ্ধ শব্দের অনুমান করা যাইবে। আবার এক একটী শব্দের বহু অপশব্দ। যেমন এক 'গো' শব্দের অপশব্দ 'গাবী গোণী, গোতা, গোপোতলিকা' প্রভৃতি। সুতরাং শুদ্ধ শব্দের উপদেশই সুবিধাজনক। কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে। কারণ স্বয়ং বৃহস্পতি বক্তা হইয়া সহস্র দিব্য বৎসর † ধরিয়া ইন্দ্রকে শব্দপারায়ণ বলিয়াছিলেন।

* শ্বাবিধং শল্যকং গোধাং খড়্গ কূর্ম্ম শশাংস্তথা। ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥ মনুঃ॥ সজারু, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খরগোস এই পাঁচটী 'পঞ্চ পঞ্চনখ'। ইহাদের মাংস ভক্ষ্য। এবং উষ্ট্র ভিন্ন একদিকে দন্ত পশুও ভক্ষ্য।

† দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং প্রবিভাগস্তয়োঃ পুনঃ। অহস্তত্রোদগয়নং রাত্রিঃ স্যাদ্দক্ষিণায়নম্॥ মনুঃ॥

কিন্তু তথাপি তাহার শেষ হয় নাই। সুতরাং শব্দোপদেশ সম্ভবপর নহে।

শব্দের প্রয়োগ দ্বারা যে কোনও অপূর্ব্ব ফল লাভ করা যায় ইহাও স্বীকার করা যায় না। কারণ যদি শব্দের প্রয়োগে অপূর্ব্ব কোনও কিছু থাকে, তবে তাহা কোথায় থাকিবে? শব্দ প্রয়োগের নিম্ন লিখিত ষড়্‌বিধ উপাদানের মধ্যেই যাহা থাকে থাকিবে ইহার অতীত কিছুই নাই। (১) শব্দ, (২) অর্থ, (৩) শ্রোতা, (৪) শব্দ ও অর্থের বোধ, (৫) বক্তা, (৬) উচ্চারণ। [১] অন্যের উদ্দেশে শব্দটীর উচ্চারণ করা হয় এবং শ্রোতা তাহা বুঝিয়া লয়েন। ইহার মধ্যে "অপূর্ব্ব" কোথাও নাই। ২। শব্দের অর্থ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, সকলই তাহা জানে। ইহার মধ্যেও অপূর্ব্ব নাই। ৩। শ্রোতা কেবল শব্দটী শ্রবণ করেন এবং স্বাভাবিক শক্তির বলে লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করেন। ইহাতে অপূর্ব্ব কিছু নাই। ৪। শব্দ ও অর্থের বোধ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই হইয়া যায়। ইহাতেও অপূর্ব্ব থাকিতে পারেনা। ৫। বক্তা লোকপ্রসিদ্ধ যথানির্দ্দিষ্ট শব্দের উচ্চারণ করেন। নিজে কিছুই করেন না। সুতরাং ইহার মধ্যে অপূর্ব্ব কিছুই নাই। ৬। উচ্চারণ কার্যটাও অতি ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং ইহার উপরও কোনও অপূর্ব্বের প্রভাব নাই। সুতরাং শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধতার সহিত ধর্ম্মবিষয়ক অপূর্ব্ব কোনও ফলোৎপত্তির কোনও হেতু দেখা যায় না।

শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও ব্যাকরণের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় ব্যাকরণ শাস্ত্রে কোনও উদ্দেশ্যের উল্লেখ নাই। প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রারম্ভে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কোন্ বিষয়ের উপদেশ হইবে তাহার উল্লেখ থাকে যেমন "ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যাম," "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা," ইত্যাদি। কিন্তু পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণ শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই। সুতরাং ব্যাকরণ শাস্ত্রের যে "ধর্ম্ম" উদ্দেশ্য তাহা স্বীকার করিবার হেতু নাই। অর্থাৎ ধর্ম্মের সহিত ব্যাকরণ শাস্ত্র বা শব্দ শাস্ত্রের কোনও সম্পর্ক নাই।

আপত্তি হইতে পারে যে বেদে আছে "তস্মাদেষা ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে" অর্থাৎ "তার পর এই ব্যাকৃত বাক্য উক্ত হইল"। সুতরাং বেদে ব্যাকরণের সার্থকতার সমর্থন হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। বেদের প্রত্যেক বাক্যই ব্যাকৃত; তাহার আর পুনরায় বিশ্লেষণের আবশ্যকতা নাই। স্বর ব্যঞ্জনের বিশ্লেষণ ও উদাত্তাদি স্বর সংযোগে বেদের উচ্চারণ কিরূপে করিতে হইবে তাহা গুরু-পরম্পরা ক্রমে শিষ্যগণ শিখিয়া থাকে। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের জ্ঞান এবং তদনুসারে ক্রিয়াকলাপই ধর্ম্মের সাধন। উচ্চারণ বা ব্যাকরণ ধর্ম্মের সাধন নহে।

বৈয়াকরণগণ ব্যাকরণ শাস্ত্রের বেদবিহিতত্ব প্রমাণ করিবার জন্য একটী বেদ মন্ত্রের আবৃত্তি করিয়া থাকেন। সেটী এই:—

"একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ সুষ্ঠু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি॥" অর্থাৎ "একটী শব্দ সুন্দররূপে জ্ঞাত ও শুদ্ধরূপে প্রযুক্ত হইলে তাহা স্বর্গে ও ইহলোকে কামবর্ষী হয়।" কিন্তু ইহা বেদাধ্যয়নের প্রশংসা মাত্র। 'প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন করিবে' ইহাই বিধি। তাহা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া পুনরায় বিধি হইয়াছে যে 'প্রত্যহ একটী মাত্রও ঋক্, যজুঃ বা সাম পাঠ করিবে'। তাহাও যাহারা করিতে অসমর্থ তাঁহাদের জন্য বিধি হইয়াছে যে 'বেদের একটীমাত্র শব্দও যদি নিয়ম-মত উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলে তাহাই অভিমত ফল প্রদান করিবে'। সুতরাং বৈয়াকরণগণ উল্লিখিত বেদ মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

আর একটী মন্ত্র বৈয়াকরণগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়—"তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় ইতি কুর্ব্বন্তঃ পরাবভূবুঃ। তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ॥" অর্থাৎ "সেই অসুরগণ 'হে অরয়ঃ' (=হে অরিগণ) স্থানে 'হেহলয়ঃ' বলিয়া অজ্ঞতা বশতঃ পরাভূত হইয়াছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছ ব্যবহার পরিত্যাগের জন্য অপশব্দ প্রয়োগ করিবেন না। কারণ অপশব্দই ম্লেচ্ছাচার।" * কিন্তু এই বেদবাক্য কেবল আবৃত্তির

* 'হে' শব্দটী প্লুতস্বরবিশিষ্ট বলিয়া ইহার সন্ধি অন্ত স্বরের সহিত ব্যাকরণ অনুসারে নিষিদ্ধ। "প্লুত প্রগৃহ্যা অচি নিত্যম্।" সুতরাং সন্ধি করাতে বাক্য অশুদ্ধ হইয়াছে।

বিকৃতি নিন্দিত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে বেদ উচ্চারণ করিবার সময় প্রকৃত উচ্চারণ বজায় রাখিতে হইবে, অন্যথা ধর্ম্মলোপ হইবে। আর সাধারণ জ্ঞান দিয়া বুঝিতে গেলেও 'অপশব্দ' শব্দের অর্থ 'অশুদ্ধ' বা 'অর্থহীন শব্দ' হইতে পারে না। 'অপশব্দ' শব্দের অর্থ 'ভ্রষ্টোচ্চারণ শব্দ'। শাস্ত্রে আছে 'ম্লেচ্ছ শব্দের উপদেশ করিবে না'। ইহাতে আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে যে সকল ভাষা প্রচলিত আছে তাহা শিখিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কারণ আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে ঐ সকল ভাষার ব্যবহার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে 'গাবী', 'গোণী' প্রভৃতি যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে তাহা ম্লেচ্ছ শব্দ নহে। সুতরাং 'অপশব্দ' শব্দে যদি 'ম্লেচ্ছ শব্দ' বুঝায়, তাহা হইলেও 'গাবী' প্রভৃতি শব্দে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে না।

বৈয়াকরণদিগের পুঁজি আরও একটী বেদমন্ত্র আছে :—
"আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ।"

অর্থাৎ আহিতাগ্নি ব্যক্তি যদি অপশব্দ উচ্চারণ করেন, তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি সারস্বতী যজ্ঞ করিবেন।" কিন্তু এই মন্ত্রে 'মিথ্যা কথা', 'বিকৃত বেদোচ্চারণ' বা 'ম্লেচ্ছ ভাষা উচ্চারণের' প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। এখানেও অপশব্দ শব্দে অশুদ্ধ শব্দ বুঝায় না।

যদি অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারণে পাপই হইবে তবে কল্প শাস্ত্র, সূত্র গ্রন্থ, স্মৃতি শাস্ত্র, মীমাংসা শাস্ত্র, গৃহ্য গ্রন্থ প্রভৃতিতে এত অশুদ্ধ শব্দ থাকিবে কেন? মশক কল্পে আছে "সমানমিতরং জ্যোতিষ্টোমেন"। এখানে নপুংসকলিঙ্গ 'ইতর' শব্দের রূপ 'ইতরৎ' না হইয়া 'ইতরং' হইয়াছে। ইহা অশুদ্ধ প্রয়োগ। সূত্রগ্রন্থে আছে "সদসি স্তুবীরন্"। এখানে ক্রিয়াফল আপনার নহে বলিয়া 'স্তুবারন্' পরস্মৈপদে প্রযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। আশ্বলায়নে আছে "প্রত্যাসিত্বা প্রায়শ্চিত্তম্"। এখানে 'প্রত্যাসিত্বা' ভুল। আশ্বলায়নেই আছে "আজ্যোনাক্ষিণী অজ্য"। এখানে 'অজ্য' ভুল, হওয়া উচিত 'অক্ত্বা'। নারদীয় শিক্ষায় আছে—

"প্রত্যুষে ব্রহ্ম চিন্তয়েৎ"। হওয়া উচিত 'প্রত্যুষসি'। মনু বলিয়াছেন "জ্ঞাতারঃ সন্তি মেত্যুক্ত্বা" (=মে+ইতি+উক্ত্বা)। মীমাংসা সূত্রে আছে "গব্যস্য চ তদাদিষু" (৮, ১, ১৮)। 'গব্য' শব্দের ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ অর্থ 'গরুর শরীর হইতে জাত'। কিন্তু জৈমিনি 'গবাময়ন্ যজ্ঞ' অর্থে ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। জৈমিনি সূত্রেই আছে "দ্যাবোস্তথেতি চেৎ।" এখানে "দ্যাবাপৃথিব্যোঃ" স্থানে 'দ্যাবোঃ' করা হইয়াছে। গৃহ্যসূত্রে আছে "মূর্দ্ধ্ন্যভিজিঘ্রাণম্", হওয়া উচিত "মূর্দ্ধ্ন্যভিঘ্রাণম্।" নিরুক্ত গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই অশুদ্ধ শব্দ দেখা যায়।" ব্রাহ্মণো ব্রবনাৎ"—'বচনাৎ' হওয়া উচিত। "ব্রুবোবচিঃ" (পাণিনি ২।৪।৫৩)। পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতিতে ব্যাকরণ দুষ্ট পদের অন্ত নাই। 'উভাভ্য' একটী উদাহরণ। এমন কি বেদেও স্থানে স্থানে এমন শব্দ পাওয়া যায়, যাহা না লৌকিক, না ছান্দস, কোনও ব্যাকরণের নিয়ম মানে না। উদাহরণ—"মধ্যে আপস্য [=অপাম্]", "নীচীন বারম্ [=দ্বারম্]", ইত্যাদি।

আবার যাঁহারা শব্দশাস্ত্রের ধুরন্ধর পণ্ডিত, সেই পাণিনি, পতঞ্জলি ও কাত্যায়ন [ত্রিমুনি], তাঁহারাই ব্যাকরণের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন। অন্যে পরে কা কথা। যাঁহারা অশ্বারোহণে পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাদের বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকিলে কি তাঁহারা অশ্বের সত্তা বিস্মৃত হন।

ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান পাণ্ডা পাণিনির একটা সূত্র হইল—জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ [পাণিনি ১।৪।৩০]"। এখানে "জনিকর্ত্তুঃ" শব্দের অর্থ কি? 'জনি' শব্দে যদি 'জন' ধাতু বুঝায়, তাহা হইলে 'জনিকর্ত্তৃ' শব্দে 'জনি ধাতুর কর্ত্তা' বুঝাইবে, 'উৎপাদক' বা 'জনক' অর্থ হইবে না। আবার তাহা যদি ছাড়িয়াই দেওয়া যায়, তাহা হইলেও 'জনি-কর্ত্তুঃ' পদ অশুদ্ধ। কেন না পাণিনিরই সূত্র "ন তৃজকাভ্যাম্" [২।২।১৫] অনুসারে এখানে 'তৃচ্' প্রত্যয়ান্ত 'কর্ত্তৃ' শব্দের সমাস হয় না। "প্রযোজকো হেতুশ্চ ১।৪।৫৫" সূত্রে 'অক' প্রত্যয়নিষ্পন্ন 'যোজক' শব্দেরও সমাস হইয়াছে। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ তাঁহারই প্রণীত ব্যাকরণ শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে।

এইরূপ কাত্যায়নের বার্ত্তিকে "দন্তৈর্হল্ গ্রহণস্য জাতিবাচকত্বাৎ সিদ্ধম্" সূত্রে 'অক' প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দের সমাস হইয়াছে। ইহাও পাণিনির ২।২।১৫ সূত্র অনুসারে অশুদ্ধ। আরোও আছে "আন্তভাব্যস্তু কালশব্দ-ব্যবায়াৎ"। এখানে 'আন্তভাব্য' কিরূপ সমাস? যদিও কোনওরূপে সমাসের নাম করা যায়, তথাপি 'সমাস' হইলেই আর 'বিশেষণ' হয় না। তাহা হইলেই যাহা বিশেষণ নহে এমন একটী শব্দের উত্তর 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে। ইহা পাণিনির ৬।১।১২৪ সূত্রে নিষিদ্ধ।

পতঞ্জলির ভাষ্যেও আছে "অবিরববিকন্যায়েন"। ইহা একটী তৎপুরুষ সমাস, ইহার মধ্যে একটী দ্বন্দ্ব সমাস আছে। 'অবিশ্চ অবিকশ্চ, অবিরবিকৌ, অবিরবিকয়োঃ ন্যায়েন'। এখানে প্রথমান্ত 'অবিঃ' পদের বিভক্তি পাণিনির ২।৪।৭১ সূত্র অনুসারে থাকিবে না। সুতরাং শুদ্ধ পদ হইবে "অব্যবিক ন্যায়েন'। আবার 'অন্যথাকৃত্বা চোদিতম্ অন্যথাকৃত্বা পরিহারঃ' প্রভৃতি স্থলে পাণিনির ৩।৪।২৭ সূত্র অনুসারে 'ণমুল্' প্রত্যয় হওয়া উচিত ছিল।

যদি কেহ বলিতে চাহেন যে এই সকল পদকে নিপাত বলিলেই ত সকল গোল কাটিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ যেখানে 'প্রসিদ্ধি' ও 'স্মৃতি'র মধ্যে বিরোধ, সেখানে স্মৃতিরই বলবত্তা। অর্থাৎ পাণিনির নির্দ্দিষ্ট সূত্র যখন এসকল স্থলে প্রযুজ্য হইতে পারে, তখন প্রসিদ্ধির দোহাই দিয়া সে বিধিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অর্থাৎ পাণিনি প্রভৃতির প্রয়োগকে দেশপ্রসিদ্ধি বলা যায় না, কারণ তাঁহার সূত্রে ওগুলিকে ব্যতিরেক বলা হয় নাই।

আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন পাণিনির সূত্র পাণিনির ভাষায় প্রযুজ্য নহে। কারণ কোনও কর্ম্মের ফল সেই কর্ম্মেই বর্ত্তে না। যাহা লক্ষণ তাহাই লক্ষ্য হইতে পারে না। এ যুক্তির কোনও কার্য্যকারিতা নাই। কারণ বহু স্থলেই সূত্র বিশেষের সাহায্যে সূত্রান্তরের সিদ্ধি করা হইয়াছে। পাণিনির ১।১।১ সূত্রের ব্যাখ্যায় মহাভাষ্য বলিয়াছেন "এখানে পদান্ত ক্ না হইয়া চ্ হইল কেন?" অর্থাৎ ৮।২।৩০ সূত্র এখানে প্রযুক্ত হইল না কেন? এই রূপ আরও অনেক স্থানে আছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে শুদ্ধ শব্দ প্রয়োগের বিধি যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য; সূত্র বা তাহার টীকা প্রণয়নের জন্য নহে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করা যায় না। [১] কারণ শুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ ইহলোক ও পরলোকে কামবর্ষী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। [২] এবং অগ্নিহোত্রীর পক্ষে অপশব্দ প্রয়োগের জন্য সারস্বতী যজ্ঞ রূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। কারণ যে ব্যক্তি যজ্ঞ করেন তিনি চিরকালই অগ্নিহোত্রী অর্থাৎ এককালে অগ্নি উৎপাদন করিয়াছেন। আবার মহাভাষ্যে 'বৈদিক' ও 'লৌকিক' উভয়বিধ শব্দেরই উপদেশ হইয়াছে। আর বস্তুতঃপক্ষে বৈদিক শব্দ ও লৌকিক শব্দ প্রায়শঃ অভিন্ন। বেদে যে সকল শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, লোকেও তাহার অধিকাংশের প্রয়োগ আছে। 'গৌঃ', 'গাবঃ' প্রভৃতিকে মহাভাষ্য লৌকিক প্রয়োগের শব্দ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা নহে; ইহারা বৈদিকও বটে, লৌকিকও বটে। বৈদিক শব্দের উদাহরণে মহাভাষ্য "শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে" প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও ঠিক নহে।' কারণ এই সকল 'শম্' প্রভৃতি শব্দ লোকেও প্রচলিত আছে। অন্যপক্ষে ব্যাকরণ শাস্ত্র যদি কেবল মাত্র লৌকিক শব্দের জন্য হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র 'গাবী' প্রভৃতি শব্দই আলোচ্য হয়। কারণ এই সকল শব্দের বেদে প্রয়োগ পাওয়া যায় না। 'গৌঃ' শব্দকে বৈদিক বলা যায় না। কারণ মনু বলিয়াছেন যাবতীয় স্মৃতিই শ্রুতি হইতে উদ্ভূত। সুতরাং শ্রুতি হইতে বহু শব্দই লৌকিক প্রয়োগে আসিয়াছে। আর যদি কেবল মাত্র বৈদিক শব্দের জন্যই ব্যাকরণ হয়, তাহা হইলে তাহা বৃথা। কারণ বেদেই তাহাদের প্রয়োগ অক্ষুণ্ণভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র বৈদিক শব্দের জন্য বিধি প্রণয়ন, মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ কৃষিবিদ্যার বিধির ন্যায় নিষ্ফল। কারণ তাহা সকলেই জানে।

রক্ষা, ঊহ, আগম, লঘু, অসন্দেহ প্রভৃতি ব্যাকরণের বহুবিধ উপযোগিতার কথা মহাভাষ্যে আলোচিত হইয়াছে।

* ইহাও বৃথা। কারণ বিনা ব্যাকরণেই এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

(১) রক্ষা। বেদরক্ষার্থ ব্যাকরণের কোনও প্রয়োজন নাই। গুরুপরম্পরায় বেদের প্রাপ্তি। গুরুর মুখে শুনিয়া শিষ্যকে বেদ শিখিতে হয়। সামান্য মাত্র পাঠ বিকৃতির জন্য গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। শব্দমাত্র ব্যাকরণের বিষয়। বেদরক্ষা ব্যাকরণের বিষয় নহে। বরং বেদরক্ষার বিধি বেদেই আছে যেমন সামবেদের সামবিধান। সামবিধানের ঔচ্ছিক্য খণ্ডে সামবেদের প্রকৃতরূপ রক্ষার জন্য উপদেশ আছে। ইহাতে প্রস্তাব প্রভৃতি সামবেদের পঞ্চ বিভাগের উপদেশও আছে। কিন্তু ব্যাকরণে এসকল বিষয়ের কোনও উপদেশ নাই। সুতরাং বেদরক্ষার্থ বৈদিক পণ্ডিত বৈয়াকরণের নিকট যাইবেন কেন? যাঁহার নিকট জলপূর্ণ পাত্র থাকে তিনি কি হাত ধুইবার জন্য অন্যত্র যান? আয়ুর্বেদের পণ্ডিতের নিকট লোকে স্বাস্থ্যরক্ষা ও ঔষধের উপদেশের জন্যই যায়।

যদি বল বেদরক্ষা না হউক কাব্যাদি রক্ষা ব্যাকরণের দ্বারা হইতে পারে। তাহাও নহে। কারণ কাব্যাদি প্রচলিত ভাষার দ্বারা নির্ম্মিত এবং কাব্য রচনা বা ছন্দো গণনার রীতি ব্যাকরণ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় না। বরং ব্যাকরণের বশবর্ত্তিতায় ভাষা কর্কশ হইয়া পড়ে।

আবার ব্যাকরণ অনুসারে শুদ্ধ হইলেই সে পদের ব্যবহার চলেনা। পদের ব্যবহারের জন্য লোক প্রসিদ্ধি দেখিতে হইবে। আর যদি লোক প্রসিদ্ধি দেখিয়া শব্দের প্রয়োগ করা হয় তবে ব্যাকরণ পড়িবার আবশ্যকতা থাকে না। সুতরাং রক্ষার্থে ব্যাকরণের প্রয়োজন নাই।

(২) উহ। অর্থাৎ অধ্যাহারাদির দ্বারা প্রকরণাদির বোধ। এ বিষয়েও ব্যাকরণের উপযোগিতা নাই। বর্ণাগম, বর্ণবিকার, বর্ণলোপ প্রভৃতির বড় বিশেষ উপযোগিতা নাই। প্রধান যজ্ঞের প্রকরণাদির উপদেশ বেদেই আছে। অপ্রধান যজ্ঞের দেবতা, উদ্দেশ্য ও প্রকরণাদি জানিবার বিধি কল্প সূত্র ও মীমাংসা শাস্ত্রে আছে। ব্যাকরণে সে বিষয়ে কিছুই নাই। বেদই সকল জ্ঞানের আধার। এক বেদেই যাবতীয় শব্দের প্রয়োগ ও সনাতন প্রসিদ্ধি আছে। ব্যাকরণ না পড়িয়া বেদ পড়িলেই সনাতন শব্দ জ্ঞান লাভ করা যায়। আবার বেদে না থাকিলেও লোকে প্রসিদ্ধ 'গাবী' প্রভৃতি শব্দ ব্যাকরণের বচনের ফুৎকারে উড়িয়া যাইবার নহে। আবার ব্যাকরণ যখন অনিত্য মনুষ্যের সৃষ্টি তখন সনাতন যজ্ঞাদিতে তাহার বিধি নিষেধ প্রযুজ্য হইতে পারে না।

(৩) আগম। যজ্ঞানুষ্ঠানই বেদাধ্যয়নের উদ্দেশ্য—বেদাধ্যয়ন যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল নহে। বেদাধ্যয়নই যজ্ঞানুষ্ঠানের মূল। সেখানে ব্যাকরণের কোনও কৃতিত্ব নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়নের বিধি আছে। কিন্তু ষড়ঙ্গ শব্দে যে ব্যাকরণাদি বুঝিতে হইবে তাহা কে বলিল? আখ্যান, অনুমান, প্রকরণ, অন্বয়, স্থান ও নাম—এই ছয়টী বেদাধ্যয়নের অঙ্গ। এই ছয়টীই বেদে আছে, ব্যাকরণে নাই। আর ব্যাকরণ অনাদি নহে, সুতরাং বেদের অঙ্গ নহে। আবার 'বেদোধ্যেয়ঃ' বাক্যটীর 'বেদঃ অধ্যেয়ঃ' এরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া 'বেদঃ ধ্যেয়ঃ'

* কানি পুনঃ শব্দানুশাসনস্য প্রয়োজনানি? রক্ষোহাগম লঘ্বসন্দেহাঃ প্রয়োজনম। (১) রক্ষার্থং বেদানামধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। লোপাগমবর্ণবিকারজ্ঞোহি সম্যগ্ বেদান্ পরিপালয়িষ্যতি। ইতি ॥ (২) উহঃ খল্বপি। নসর্বৈর্লিঙ্গৈর্নচ সর্বাভির্বিভক্তিভির্বেদে মন্ত্রা নিগদিতাস্তে চাবশ্যং পুরুষেণ যজ্ঞগতেন যথাযথং বিপরিণময়িতব্যা স্তান্নাবৈয়াকরণঃ শক্নোতি যথাযথং বিপরিণময়িতুম্। তস্মাদধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। ইতি ॥ (৩) আগমঃ খল্বপি। ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্ম্মঃ ষড়ঙ্গো বেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চেতি। প্রধানঞ্চ ষড়ঙ্গেষু ব্যাকরণম্। প্রধানে চ কৃতো যত্নঃ ফলবান্ ভবতি। ইতি ॥ (৪) লঘ্বর্থঞ্চাঽধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। ব্রাহ্মণেনাবশ্যং জ্ঞেয়াইতি। নচাঽন্তরেণ ব্যাকরণং লঘুনোপায়েন শব্দাঃ শক্যা বিজ্ঞাতুম্। ইতি ॥ (৫) অসন্দেহার্থঞ্চাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্। যাজ্ঞিকাঃ পঠন্তি স্থূল পৃষতীমাগ্নি বারুণীমনড্বাহীমালভেতেতি। তস্যাং সন্দেহঃ, স্থূলাচাসৌ পৃষতী চেতি স্থূলপৃষতী, স্থূলানি পৃষন্তি যস্যাঃ সেয়ং স্থূলপৃষতীতি। তাং নাবৈয়াকরণঃ স্বরতোঽধ্যবস্যতি। যদি পূর্বপদ প্রকৃতি স্বরত্বং ততো বহুব্রীহিঃ, অথ সমাসান্তোদাত্তত্বং ততঃ তৎপুরুষ ইতি ॥

এইরূপ ব্যাখ্যাও হইতে পারে। এ সকল বিষয় মীমাংসা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ব্যাকরণ অধ্যয়নের অনুকূল মন্ত্র ওটী নহে।

আবার বেদেই কিছু কিছু ব্যাকরণের আলোচনা আছে। সুতরাং ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়নের যে বিধান তাহা এই বেদমধ্যস্থ ব্যাকরণে প্রযুজ্য হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, দধিকে কেন দধি বলা হয়, ইত্যাদি নানারূপ ব্যাকরণের তথ্য ও বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি বেদে আছে। ইহা ছাড়া প্রাতিশাখ্য সমূহে বেদের বর্ণ বিশ্লেষণ, উচ্চারণ, সন্ধি, স্বর, ব্যঞ্জনও সন্ধক্ষর, উদাত্তাদি স্বর প্রভৃতি বেদাধ্যয়নের নানা উপদেশ আছে। এবং লৌকিক ভাষা বিষয়ে কোনও উপদেশ নাই। সুতরাং প্রাতিশাখ্য সমূহ বেদাঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণ বা পতঞ্জলির মহাভাষ্য বেদ সংক্রান্ত নহে, সুতরাং তাহাদের বেদাঙ্গত্ব নাই।

(৪) লঘু। সহজে শব্দের উপদেশ ব্যাকরণ শাস্ত্রে দেয়না। অন্যথা সরল বস্তুর মধ্যে নানা প্রকারের জটিলতা আনিয়া দেওয়াই ব্যাকরণের কার্য্য। সাধারণ জ্ঞানে লোকপ্রসিদ্ধ যে সকল শব্দ বালকেও আয়ত্ত করে, ব্যাকরণ তাহার জন্য কত ধাতু, কত উণাদি ও অন্যান্য প্রত্যয়, কত পরিভাষা, কত অনুমান, কত অনর্থক যুক্তির অবতারণা করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধিকেও বিহ্বল করিয়া দেয়।

(৫) অসন্দেহ। উপরে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে সন্দেহ নিরাস ব্যাকরণ দ্বারা হয় না। জটিলতার সূচনা দ্বারা সন্দেহ বৃদ্ধি করাই ব্যাকরণের কার্য্য। সন্দেহ নিরাস বরং কল্পসূত্রে অনেক বিষয়ে করে। শব্দের অর্থনির্ণয় ব্যাকরণের বিষয় নহে; কেবল ধাতু-প্রত্যয় বিশ্লেষণ যাহার কার্য্য তাহা দ্বারা বেদের ব্যাখ্যাও হইতে পারে না, সন্দেহনিরাসও হয় না। গম্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিয়া বৈয়াকরণ 'গো' শব্দের অর্থ করিবেন 'গতিশীল'। তা তাঁহার মতে শয়ানাবস্থায়ও 'গো'কে গতিশীল বলিতে হইবে। এইরূপ 'কুশচ্ছেদনকারী' = 'কুশল'; 'উত্তম্ভ পরীধুক' = 'উদার'; যাহা কর্ত্তিত হয় তাহা 'বৃক্ষ'; অশ্বের কর্ণ = 'অশ্বকর্ণ' [বৃক্ষবিশেষ]; অজের কর্ণ = অজকর্ণ [উদ্ভিদ বিশেষ]; ইত্যাদি নানা স্থানেই বৈয়াকরণ অনর্থক সন্দেহ আনয়ন করেন। 'স্থূল পৃষতী' প্রভৃতি যে-সকল শব্দে স্বরের উচ্চারণ অনুসারে সমাসের বিভিন্নতা হয়, সে সকল শব্দও ব্যাখ্যাকারগণ বলিয়া দেন। আর তাঁহাদের নির্দ্দেশ ব্যতীত বৈয়াকরণ ইহার অর্থনির্ণয় করিতে পারেন না।

যদি ব্যাকরণ শাস্ত্র বেদ বাক্যের অর্থ নির্ণয় দ্বারা সন্দেহ নিরাস করিবার জন্য উপযোগী হইত তাহা হইলে নিম্ন লিখিত প্রশ্নসমূহেরও উত্তর দিতে পারিত। ১। অর্থবাদ মন্ত্র সমূহ বেদের বিধি নিষেধের মধ্যে গণ্য হইবে, না বেদাঙ্গ রূপে পরিগণিত হইবে? ২। বেদে 'উদুম্বর' শব্দের প্রয়োগ কি কেবল ঐ বৃক্ষের প্রশংসার জন্য, অথবা উহার দ্বারা নির্ম্মিত যূপকাষ্ঠে যজ্ঞের কোনও ফল প্রদানে সমর্থ? ৩। বেদের কোনও স্থানে যুক্তির অবতারণা থাকিলে তাহাকে বিধি বলা যাইবে? না, অর্থবাদ বলা যাইবে? ৪। কোনও মন্ত্রের দ্বারা প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়? কি অপ্রত্যক্ষ? ৫। হস্তপ্রক্ষালনের জন্য একটী মাত্র ঘটের ব্যবহার কর্ত্তব্য? না সকল ঘটেরই, ব্যবহার করা যায়? ইত্যাদি। এসকলের মীমাংসা মীমাংসা শাস্ত্রে হইয়াছে; শব্দের অর্থ নির্ণয় কল্পসূত্রের দ্বারা হইবে; তবে ব্যাকরণের প্রয়োজনটা কি?

মহাভাষ্য এখানেও নিরস্ত হয়েন নাই। ব্যাকরণ চর্চ্চার আরও অনেক প্রকার প্রয়োজন কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্তই অনর্থক।

১। তেঽসুরা হেলয়ো হেলয় "ইত্যাদি
পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

২। দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্ বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্র শত্রুঃ
স্বরতোঽপরাধাৎ॥

একটী আখ্যায়িকা আছে যে বৃত্রাসুরের পিতা ইন্দ্রের বধ সাধনের জন্য যে যজ্ঞ করেন তাহাতে দৈত্য-কুল-পুরোহিত বলেন "ইন্দ্র শত্রো বর্দ্ধস্ব"। কিন্তু তৎ পুরুষ সমাসের স্বরের পরিবর্ত্তে বহুব্রীহি সমাসের স্বর উচ্চারিত

হওয়ায় বাক্যটীর অর্থ হয় "ইন্দ্র যাহার শত্রু অর্থাৎ বধকর্ত্তা তিনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন।" কিন্তু তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় ছিল "ইন্দ্রের শত্রু অর্থাৎ বধকর্ত্তার জয় হউক।" এখানে শুদ্ধাশুদ্ধ শব্দের কথা নাই। বিকৃত উচ্চারণের নিন্দা আছে।

৩। যদধীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে। অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥"—নিরুক্ত। অর্থাৎ অর্থ না জানিয়া কেবল মাত্র উচ্চারণ দ্বারা যে পাঠ তাহা অগ্নিশূন্য স্থানে শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় কখনও জ্বলে না' এই অর্থ মহাভাষ্য সম্মত। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ অন্যরূপ—"যদি বেদ ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল মাত্র পড়িয়া শুনান হয়, তবে তাহা বৃথা।" কারণ বেদের উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ। তাহা না বলিয়া দিলে যজমানের কি লাভ হইবে?

৪। "যস্তু প্রযুঙক্তে কুশলো বিশেষে শব্দান্ যথাবদ্ ব্যবহার কালে। সোঽনোনন্তমাপ্নোতি জয়ং পরত্র বাগ্ যোগবিদ্ দুষ্যতি চাপ শব্দৈঃ॥" মহাভাষ্য ইহার অর্থ করেন "যে কুশল বাগ্‌যোগবিৎ ব্যক্তি ব্যবহার কালে শুদ্ধশব্দের প্রয়োগ করেন তিনি পরলোকে অনন্ত জয় লাভ করেন, আর যিনি অপশব্দ প্রয়োগ করেন তাঁহার পাপ হয়।" এখানেও মন্ত্র ব্রাহ্মণের খাঁটি উচ্চারণের প্রশংসা ও বিকৃত উচ্চারণের নিন্দা হইয়াছে।

৫। "অবিদ্বাংসঃ প্রত্যভিবাদে নাম্নো সে ন প্লুতিং বিদুঃ। কামং তেঽপিতু বিপ্রোষ্য স্ত্রীষ্বিবায়মহং বদেৎ॥"

"অভিবাদন কালে যাঁহারা নামের প্লুত স্বর না জানেন তাঁহারা প্রত্যভিবাদনে স্ত্রীলোকের ন্যায় উত্তর পাইবেন।" সুতরাং স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযুজ্য উত্তর পাইবার ভয়ে ব্যাকরণ পড়িবে। লোকপ্রসিদ্ধি হইতেই যাহা জানা যায় তাহার জন্য ব্যাকরণ অনাবশ্যক।

৬। "প্রযাজাঃ সবিভক্তিকার কার্য্যাঃ"। অর্থাৎ প্রযাজ মন্ত্রের উত্তর বিভক্তিযোগ করিবার যে বিধি আছে তাহা সুসম্পন্ন করিতে হইলে ব্যাকরণ পড়িবে। বিভক্তি জানিবার জন্য ব্যাকরণ পড়িবার আবশ্যকতা নাই—বেদেই সব আছে। আবার তাহাতেও যদি না কুলায় তবে ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের ষড়্‌হ গ্রন্থে এই সকল বিষয় আছে।

৭। "যো বা ইমাং পদশঃ স্বরশোঽক্ষরশো বাচং বিদধাতি স আর্ত্বিজীনো ভবতি।" "যিনি পদ, স্বর ও অক্ষর ভাগ করিয়া বাক্য উচ্চারণ করিতে জানেন তিনি আর্ত্বিজীন।" আর্ত্বিজীন হইতে ইচ্ছা কর ত ব্যাকরণ পড়িবে। এখানে যিনি বেদ পড়িয়াছেন তাঁহার কথাই বলা হইয়াছে।

৮। "চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তা সো অস্য ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্ত্যাঁ আবিবেশ॥" বাক্যটী ভাষার বিষয়ে প্রযুজ্য কি না তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ।

৯। চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তানি বিদু-
র্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।
গুহা ত্রীনি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা
বদন্তি॥"

এখানেও অর্থ লইয়া মত ভেদ আছে। মহাভাষ্য বলেন নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত এই চারি প্রকার পদের কথা এখানে বলা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

১০। উতত্ব পশ্যন্ন দদর্শ বাচম্ উতত্ব শৃণ্বন্ন
শৃণোত্যেনাম্।
উতত্বস্মৈ তন্বং বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

মহাভাষ্য ইহার অর্থ করেন "কেহ বাক্যকে দেখিয়াও দেখে না, কেহবা শুনিয়াও শুনে না, আবার কাহারও নিকট বাণী পত্যাভিলাষিণী সুবাসা জায়ার ন্যায় আত্মদেহ দান করে।" কিন্তু বস্তুতঃ এখানে লোকপ্রসিদ্ধ শব্দার্থ জ্ঞানের প্রশংসা হইয়াছে।

১১। সক্তু মিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা
বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানিজানতে ভদ্রৈষা
লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি॥

এখানে মহাভাষ্য বলেন চালুনী দ্বারা সক্তু পরিষ্কার করার ন্যায় বৈয়াকরণ মনের দ্বারা বাক্যকে পরিষ্কার করিয়া ব্যবহার করেন। কিন্তু বস্তুতঃ এখানেও দীর্ঘকালের অধ্যবসায় দ্বারা বেদ মন্ত্রের অর্থজ্ঞানের প্রশংসা হইয়াছে।

১২। আহিতাগ্নিরপশব্দং প্রযুজ্য প্রায়শ্চিত্তীয়াং সারস্বতীমিষ্টিং নির্বপেৎ।

পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

১৩। "দশম্যুত্তরকালং পুত্রস্য জাতস্য নাম বিদধ্যাদ্ ঘোষবদাদ্যন্তরন্তঃস্থম্ অবৃদ্ধং ত্রিপুরুষানূকমনরি প্রতিষ্ঠিতং, তদ্ধি প্রতিষ্ঠিততমং ভবতি দ্ব্যক্ষরং চতুরক্ষরং বা নাম কৃতং কুর্যান্ন তদ্ধিতম্।" অর্থাৎ পুত্রের জন্মের দশ দিন পরে নামকরণ হইবে। নামের আদিতে ঘোষবর্ণ থাকিবে, ইত্যাদি। এখানে মহাভাষ্য বলিতে চাহেন যে ব্যাকরণের সূত্র না পড়িয়া পুত্রের নামকরণের বিধির অনুষ্ঠান হয় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যয়, বর্ণ, প্রভৃতি ব্যাকরণের সৃষ্টি নহে; তাহা লোকে প্রতিষ্ঠিত আছে। ব্যাকরণ কেবল মাত্র সেই লোক প্রতিষ্ঠিত ভাষা হইতে এই সকল উপাদান গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং ব্যাকরণ না পড়িয়াও এ জ্ঞান অসম্ভব নহে। বর্ণসংখ্যা গণনা ব্যাকরণের কার্য্য নহে, ইহা স্মৃতির সাহায্যে প্রত্যক্ষজ্ঞান। ঘোষাঘোষ বর্ণ প্রভৃতির কথা শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যে আছে; সুতরাং ব্যাকরণের উপযোগিতা এক্ষেত্রে নাই।

১৪। বরুণের নামে একটী মন্ত্র আছে, তাহাতে বরুণকে 'সপ্তসিন্ধু' প্রভৃতি বলা হইয়াছে। মহাভাষ্য 'সপ্ত সিন্ধু' শব্দের অর্থ করেন 'সপ্ত কারকবিভক্তি'। এই হেতু বলেন যে 'বিভক্তি' কি তাহা জানিবার জন্য ব্যাকরণ অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু এ কথাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ এখানেও লোক প্রসিদ্ধ প্রয়োগের ব্যাখ্যাই ব্যাকরণ করিতে চাহে। আবার 'সপ্ত সিন্ধু' শব্দে যে ও প্রকার ব্যঞ্জিতার্থ প্রকাশ পাইবে তাহারই বা কি কারণ আছে? ব্যঞ্জনার্থ যদি ইহার গ্রহণীয় অর্থ হয়, তাহা হইলেও 'সপ্ত সিন্ধু' শব্দে 'সপ্ত বিভক্তি না বুঝাইয়া যজ্ঞবিষয়ক কোনও সাতটী বস্তুর বাচক হইতে পারে। কিম্বা হোতৃকর্ত্তৃক উচ্চারিত কোনও সাতটী মন্ত্রের কথা হইতে পারে।' অথবা সামাদি হইতে সাতটী বাক্যের কথা থাকিতে পারে। অথবা যজমান, পুরোহিত, হোতা প্রভৃতি সাত ব্যক্তির উল্লেখ থাকিতে পারে। সুতরাং এজন্ত ব্যাকরণ অবশ্য পাঠ্য নহে।

ব্যাকরণ যদি শব্দ সংশোধন করে, তবে সে সংশোধন ক্রিয়া হয় কি প্রকারে? উৎপাদন, বিবর্ত্তন, অপবর্গ প্রভৃতি উপায়ে কোনও 'অপূর্ব্ব' লাভ বা অভিনব শক্তিসঞ্চার কি এই সংশোধন ক্রিয়ার অর্থ? আর কোন্ বস্তুর সংশোধন হইবে তাহাও ত বুঝা যায়না। 'শব্দ' ও 'বর্ণ' বলিলে কি বুঝায়? শব্দত্ব বা বর্ণত্ব বাচক বস্তুর সংশোধন সম্ভবপর হইলে ঢক্কানিনাদ শব্দেরও সংশোধন হইতে পারে। 'গাবী' শব্দেও বর্ণ আছে, 'গৌঃ' শব্দেও বর্ণ আছে। 'গৌঃ' শব্দের 'গ' বর্ণ যদি শুদ্ধ হয়, 'গাবী' শব্দের 'গ' বর্ণ অশুদ্ধ হইবে কেন? এই প্রকারে সংশোধন করিয়া লওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে অশুদ্ধ শব্দের সত্তা থাকে না। দুইটী বর্ণের ত আর মিশ্রিত উচ্চারণ হয় না। আবার যাঁহারা বর্ণ বা অক্ষরের ক্ষণস্থায়িত্ব বাদী তাঁহাদের বর্ণের সংশোধন ক্রিয়া অচিন্তনীয়। যাহার স্থিতি নাই, উৎপত্তি মাত্রেই যাহার বিনাশ, তাহার আবার সংশোধন কি? যজ্ঞাগ্নিতে শক্তু আহুতি দিলে শক্তু ত ভস্মসাৎ হইয়া যায়? তাহার সংশোধন হয় না। এই প্রকার অগ্নি সংস্কারের ন্যায় শব্দ সংস্কার কেবল মাত্র শিষ্যের প্রতারণা। তাহাতে শব্দের নিত্যত্ব থাকে না। যাহা লোকে প্রসিদ্ধ তাহাই শব্দ। তাহাই নিত্য। তাহার সংস্কার কল্পনা হইতে পারে না।

সিদ্ধান্ত বা উত্তরপক্ষ

সূত্র। শব্দের সিদ্ধি যখন প্রযত্ন সাপেক্ষ, তখন ইহাতে আমাদের অবসর আছে।

১। লোকে প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া 'গাবী' প্রভৃতি শব্দের নিত্যত্ব কল্পনা হইয়াছে। কিন্তু যখন অর্থশূন্য শব্দের ব্যবহারই হয় না, তখন অর্থবত্তা ও প্রয়োগ দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হয় না। যদি অর্থশূন্য শব্দ থাকিত তবেই এ যুক্তি খাটিত। সুতরাং বর্ত্তমান সূত্রে সন্দেহ সূচনা করিয়া উপপত্তির চেষ্টা হইতেছে। পূর্ব্ব পক্ষের যুক্তি যে অকাট্য নহে তাহাই সূত্রকার বলিতেছেন।

২। এক জন এক শব্দের যেরূপ উচ্চারণ করে, অন্য জনে সেই শব্দের ঠিক সেইরূপ উচ্চারণ করে না। কারণ উচ্চারণ প্রযত্ন-সাপেক্ষ। সুতরাং লোক প্রসিদ্ধ শব্দ মাত্রই শুদ্ধ শব্দ ইহা বলা অযৌক্তিক। এই কারণেই

অর্থাৎ প্রযত্নের ইতর বিশেষ বশতঃই 'গো' শব্দ হইতে 'গাবীঃ' 'গোণী' প্রভৃতি বহু শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। ৩। ব্যবহার ও উচ্চারণের অনৈক্য বশতঃ যাবতীয় শব্দই শুদ্ধ শব্দ হইতে পারে না। ৪। স্পৃষ্টতা, ঈষৎস্পৃষ্টতাদি প্রযত্নভেদে উচ্চারণ বৈষম্য সংঘটিত হয় বলিয়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের উচ্চারণে ভেদ দেখা যায়। অশিক্ষিত লোকের শুদ্ধ উচ্চারণ না হওয়ায় লোকে অশুদ্ধ শব্দ প্রবর্ত্তিত হয়।

(৫) শুদ্ধ শব্দ সত্য ও অশুদ্ধ শব্দ অসত্য। সুতরাং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া অশুদ্ধ শব্দ বর্জ্জন করা আবশ্যক। শাস্ত ও অশাস্তের বিচার যেরূপ শাস্ত্র, শব্দ ও অপশব্দের বিচারও সেইরূপ শাস্ত্র। সুতরাং ব্যকরণকে শাস্ত্র না বলিবার হেতু নাই।

(৬) অর্থবত্তা হইতে শব্দের শুদ্ধত্ব নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ কেবলমাত্র শুদ্ধ শব্দেরই লোকে ব্যবহার হয় তাহা নহে। অশুদ্ধ শব্দের ও ব্যবহার হয়। 'দেবদত্ত' স্থানে 'দেবতত্ত' উচ্চারণ করিলে তাহার অর্থবত্তা থাকিতে পারে, শুদ্ধতা থাকে না। 'গাবী' প্রভৃতি শব্দও সেইরূপ।

পূর্ব্ব পক্ষের যুক্তিতে সন্দেহের অবতারণা করিয়া অতঃপর উপপত্তির চেষ্টা হইতেছে।

সূত্র। বহু শব্দের একার্থকতা যুক্তিযুক্ত নহে।

শব্দ ও অর্থের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, যাহাতে শব্দ বিশেষের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য বস্তুর প্রতীতি হয়। সুতরাং যদি একটী নির্দ্দিষ্ট বস্তুর বাচক একাধিক শব্দ থাকে তাহা হইলে শব্দ ও বস্তুর মধ্যে সেই অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক থাকে না। কারণ বহু শব্দের সহিত এক বস্তুর সম্পর্ক আসিয়া জুটে। একটী বস্তু ও একটী শব্দ যদি অবিচ্ছিন্ন ভাবে সম্পৃক্ত হয়, তাহা হইলেই একতরের উল্লেখে অন্যতরের প্রতীতি সঙ্গে সঙ্গে জন্মে। নতুবা বস্তু ও বাচকের বিভিন্নমুখিতা বশতঃ সম্পর্কেরও বিভিন্নমুখিতা অবশ্যম্ভাবী। একটী নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট শব্দের একটা শক্তি আছে। যখন একটী শব্দের অপভ্রংশে আমরা সেই শক্তি নিহিত করি, তখন এই অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের অপব্যবহার করা হয়। সাধারণ কথোপকথনের জন্য একটা বস্তুর একটা নামই কল্পিত হয়, বহু নাম এক বস্তুর হয় না। কারণ তাহাতে অর্থপ্রতীতির ব্যাঘাত জন্মে। বস্তু মাত্রেরই যখন একটা নির্দ্দিষ্ট নাম আছে, তখন অন্য একটা নামের উল্লেখ মাত্রেই অন্য একটা বস্তুর প্রতীতি হইবে। নামের বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের বিভিন্নতা আসিয়া জুটে।

হস্ত, কর, পাণি প্রভৃতি যে-সকল শব্দ অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, তাহারা স্মৃতি-সম্মত। সুতরাং যে সকল শব্দ পরিহার করিবার উপায় নাই। সচরাচর কোনও নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে, তাহারা স্মৃতি-সম্মত। সুতরাং সে-সকল শব্দ পরিহার করিবার উপায় নাই। সচরাচর কোনও নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য যখন নির্দ্দিষ্ট শব্দ ছাড়িয়া অন্য শব্দের ব্যবহার হয় তখনই বুঝিতে হইবে যে বক্তার বাক্ শক্তির বিকৃতি ঘটিয়াছে। এইজন্যই 'গো' শব্দের উচ্চারণে অসমর্থ বা অজ্ঞ ব্যক্তি 'গাবী' শব্দের উচ্চারণ করে। শ্রোতা অনুমান ও লক্ষণা দ্বারা এই 'গাবী' শব্দের মূল 'গো' শব্দটীকে চিনিয়া লইয়া তবে অর্থ নির্ণয়ে সমর্থ হয়। সুতরাং শব্দের আকৃতি, শব্দার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক, ও শব্দের শক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে একটী মাত্র শব্দে এই শক্তি নিহিত হইলেই এই সকল সম্পর্কের স্থিরতা থাকে। বহু শব্দে থাকে না।

সুতরাং যখনই কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট অর্থের বাচক বহু শব্দ ভাষায় পাওয়া যাইবে তখনই বুঝিতে হইবে যে ঐ সকল বহু শব্দের মধ্যে একটী মূল শব্দ এবং অপরগুলি তাহারই অপভ্রংশ। সুতরাং যেটী মূল শব্দ সেইটীই শুদ্ধ, আর যে গুলি অপভ্রংশ সেই গুলিই অশুদ্ধ শব্দ।

এই সকল স্থলে মূল শব্দের প্রত্যভিজ্ঞান হইবে কি প্রকারে? ইহার উত্তরে সূত্র হইল :—

সূত্র। বিশেষ বিশেষ প্রয়োগস্থলের সবিশেষ অনুধাবন দ্বারা শব্দের বাচকতা নির্ণয় করিতে হইবে।

পৃথক পৃথক শব্দের প্রত্যেক উদাহরণটী ধরিয়া খুঁটিনাটি আলোচনা ও সবিশেষ অনুধাবন সম্ভবপর নহে।

কারণ শব্দ অসংখ্য। সুতরাং কতকগুলি সাধারণ নিয়ম থাকা আবশ্যক, যাহা দ্বারা শব্দের শুদ্ধতা নির্ণয় ও অর্থ নির্ণয় হইতে পারে। ব্যাকরণে এই প্রকারের সাধারণ নিয়ম আছে। সুতরাং শব্দে অর্থ নির্ণয় ও শুদ্ধতা নিরূপণ বিষয়ে ব্যাকরণের উপযোগীতা আছে। কিন্তু ব্যাকরণের নিয়মের মূল ত আর ব্যাকরণের নিয়মই নহে; লৌকিক প্রয়োগ হইতেই ব্যাকরণের সূত্র জন্মিয়াছে। আবার ব্যাকরণের সূত্র দ্বারাই লৌকিক প্রয়োগ নিয়মিত হয়। সুতরাং ব্যাকরণ ও লৌকিক প্রয়োগের মধ্যে একটা ইতরেতর সম্পর্ক আছে। এ প্রকার ইতরেতর সম্পর্ক মানিয়া লওয়া কঠিন ব্যাপার। কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে ব্যাকরণ যে প্রকার লৌকিক প্রয়োগ দেখিয়া রচিত হইয়াছে, তাহাতে এক একটী নির্দ্দিষ্ট শব্দ ছিল। হইতে পারে তখন শব্দের প্রকৃতার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা হয় নাই। এই সকল শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াই ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে, এবং সেই ব্যাকরণ অন্যান্য শব্দের অর্থ নির্ণয় ও শুদ্ধতা নিরূপণে সমর্থ। সুতরাং অবশেষে ব্যাকরণই লৌকিক প্রয়োগ নিয়মিত করিবার উপায় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। লৌকিক প্রয়োগ ও ব্যাকরণের পরস্পর সম্পর্কটা বুঝিয়া উঠা দায় হইত যদি লৌকিক প্রয়োগে অর্থ শূন্য শব্দ থাকিত। কিন্তু প্রত্যেক শব্দের এক একটা অর্থ লোক প্রসিদ্ধ থাকাতেই ব্যাকরণের পক্ষে লৌকিক প্রয়োগের মূল সূত্র অবধারণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। সে সকল শব্দের হয়-ত সকল স্থলে শুদ্ধ অর্থ ছিল না। যুক্তি ও অনুমান দ্বারা ব্যাকরণ তাহা ঠিক করিয়া লইয়াছে। সুতরাং ব্যাকরণ অনর্থক নহে। শাস্ত্ররূপে ইহার উপযোগিতা আছে।

এই স্থলে তর্ক উঠিয়াছে, বেদের প্রয়োগ হইতে অর্থ নির্ণয় ও শুদ্ধতা নিরূপণ হইতে পারিত। লৌকিক প্রয়োগ মানিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে কথিত হইয়াছে :—

তাহা হইতে পারে না, কারণ বেদে সকল প্রয়োগ নাই। বেদেও যেমন, লৌকিক প্রয়োগেও তেমনি কতিপয় শুদ্ধ শব্দের ব্যবহার আছে। স্মৃতিতে যত শুদ্ধ শব্দ আছে তাহাদের একত্র সংগ্রহ হয় নাই। কারণ শব্দ সংখ্যা অসংখ্য, গণিয়া শেষ করা যায় না। আবার তা ছাড়া অঙ্গ ও শাখা প্রশাখা সহ বেদ অনন্ত, তাহার মধ্যে কোথায় কি শব্দ আছে কে তাহার সন্ধান করিতে পারে? আয়ত্ত করা ত দূরের কথা। পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে শব্দের অর্থবত্তা আছে তাহাই শুদ্ধ। কিন্তু সাধারণ লোকে বিনা শিক্ষায় শব্দের অর্থবত্তা নির্ণয় করিতে পারে না বলিয়া ব্যাকরণ শাস্ত্র আবশ্যক হইয়া পড়ে। প্রয়োগ ও ব্যাকরণ এই উভয়ের সাহায্যেই শব্দের প্রকৃত অর্থবত্তা নির্দ্ধারণ হয়। প্রচলিত ভাষায় 'গাবী' শব্দের অর্থবত্তা থাকিলেও তাহা ব্রাহ্মণের অব্রাহ্মণত্বের ন্যায় অসিদ্ধ কারণ তাহা ব্যাকরণ স্মৃতির বিরুদ্ধ। ভাব প্রকাশ নানা উপায়েই হইতে পারে। অশুদ্ধ শব্দ দ্বারাও হইতে পারে, সঙ্কেত মাত্র দ্বারাও পারে। কিন্তু বেদ ও স্মৃতির আদেশ অনুসারে ধর্ম্ম কর্ম্মে শুদ্ধ শব্দেরই ব্যবহার কর্ত্তব্য। নতুবা ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইতে হইবে! যাহার বাক্‌শক্তি বিকৃত সে শুদ্ধ শব্দের উচ্চারণে অসমর্থ হইলেও স্মৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে অবিকৃত-বাক্ শক্তি ব্যক্তি শুদ্ধ শব্দের উচ্চারণে অবহেলা করিবে না। ব্যাকরণে সূত্র, ভাষ্য ও বার্ত্তিকে অশুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া ব্যাকরণের নির্দ্দেশ না মানিবার হেতু নাই। কারণ তাহারা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যাকরণাদিতে শুদ্ধ শব্দ উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই বলিয়া যে আপত্তি হইয়াছে তাহাও ঠিক নহে। কারণ ইহার উদ্দেশ্য স্বতঃসিদ্ধ এবং বেদাদিতে উক্ত হইয়াছে। তা ছাড়া বার্ত্তিকে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে ধর্ম্ম রক্ষাই ব্যাকরণের উদ্দেশ্য। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সুতরাং বেদাদি প্রতিষ্ঠিত ব্যাকরণের নিত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই হইল আমাদের শাস্ত্রের শিষ্ট ও অশিষ্ট শব্দের প্রয়োগ লইয়া কথা কাটা কাটির সার মর্ম্ম। এই কথা কাটা কাটির মধ্যে ভাষাতত্ব বিষয়ে গভীর, গবেষণার পরিচয় আছে। কিন্তু তথাপি ভাষার উদ্দেশ্য ধর্ম্ম রক্ষা এই কথাতেই এত পরিশ্রম সমস্তই পণ্ড হইয়াছে। ভাষা ভগবৎ সৃষ্ট নহে এবং ইহার উদ্দেশ্যও ধর্ম্ম রক্ষা নহে। শিষ্ট শব্দের প্রয়োগ করিলেই তাহা দেবতাদিগের প্রতি-

বিধান করিবে আর অশিষ্ট শব্দে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে এই প্রকার চিন্তা লইয়া কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলে না। ভাষার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। ব্যাকরণের কঠোরতা সে পরিবর্ত্তন রোধ করিতে পারে না। এত ব্যাকরণের কঠোরতা সত্ত্বেও ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বেদের ভাষার বিকাশে লৌকিক ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যাকরণ-কার, ভাষ্যকার ও বার্ত্তিকারের ভাষার মধ্যেও অশিষ্ট প্রয়োগ আত্মবিকাশ করিয়াছে।

শিল্পকলা বিজ্ঞান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়]

আধ্যাত্ম নীতি-বিদ্যা

আধ্যাত্ম বিদ্যা শিল্পের ফসল ক্ষেতের মূলের রস জুগিয়ে আসে তাই গীতায় "আধ্যাত্ম বিদ্যা বিদ্যানাম" বলা হয়েছে। শ্রীধর স্বামী টিকায় লিখেছেন এর পর থেকে শিল্পের আরম্ভ। পাশ্চাত্য জগতে চরম উপাধি লাভের পর যেমন শিক্ষার আরম্ভ করে, ভারতে যেমন সারা জীবন মরণের পরের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হই, মধ্যে জীবন মরণের সন্ধি স্থলের মত যেমন কোন দাঁড়ি কেটে বলা যায় না যে এই পর্য্যন্ত বিদ্যা এর পর শিল্পের আরম্ভ, সেই রূপ আধ্যাত্ম বিদ্যা যে, শিল্প নয় তা ঠিক বলা যায় না শিল্পী ও কর্ম্মী তাদের কাজের জোরটা পায় এ বিদ্যার কাছে। অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে না পেলে শিল্পী যে জোরের সহিত সমস্ত দুঃখ দূর করে আনন্দের মন্ত্র জপতে জপতে সৃষ্টি করতে থাকে তার মূলে থাকে তার এই বিদ্যার মন্ত্র নিষ্কাম কর্ম্ম সঙ্গে থাকে তার অর্জ্জুনের রথের সারথীর মত পরামর্শ দাতা কৃষ্ণ সারথী রূপী বিবেক। সে নারদের বীণার মত নারায়ণের নাম জপ কর্ত্তে কর্ত্তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোঁদল বাধিয়ে দিয়ে মজা দেখে। সে ভগীরথের গঙ্গার মত আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায় সে যখন আপনার তুলি হাতে চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত হয় তখন তার তুলি যেন যাদুকরের যাদুর মত রং গুলাকে আপনা আপনি তার ভিতর থেকে বাহ্য জগতের সৃষ্টি কর্ত্তে বলে দিয়েছে মনে হয় এ যেন বীণার সুরের সুরধুনীর উৎপত্তির মত অদ্ভুত।

বাহ্যজগতে আমরা যা কিছু দেখি তা তো খানিকটা স্থান কাল Space time খানিকটা আকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বেদান্তে যাকে মায়া বলেছে বৈজ্ঞানিকেরা "Sensum"—Bit of space time in which some sense quality inheres, created out of nothing by physical process—বলে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা আমাদের অনুভূতির গোড়াকার এক দৃষ্ট বস্তুর অনুরূপ একটা মনের অবস্থা। বাস্তবিক জগতের যাবতীয় দ্রব্য সূর্য্যালোকের মত সাধারণ সম্পত্তি। আমার পুস্তক, অন্যে লইতে পারে আমার দাঁতের পীড়া কিন্তু লইতে পারে না ভাবিয়া দেখিলে দুইটিই একরূপ কথায় বলি "আমার"। লাল রং দ্রব্যে নাই দেখি বলে লাল রংয়ের দ্রব্য বলি [Berkely—theory of vision] আবার একটি ছাতির বাট যখন লাঠির মত ব্যবহার করি তখন সে লাঠি। তাহার বহুরূপ ব্যবহারগত মাত্র things in themselves—Kant. দ্রব্যের গুণও দ্রব্যে নাই কেন না একটি গোল পয়সা ধারের দিক থেকে দেখলে ডিম্বাকার দেখায়।

সেই আদি পুরুষ আমাদেরই মধ্যে একটা পাকা আমি

complete Human Personality যা অনন্ত কাল থেকে আমাদের দুঃখ কষ্টের মধ্যে জাগিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করছি। সেইটা যেন একটা আসল মন্ত্রনাদ, word God কাল পুরুষ Space time অজানা বেদনার মত এই একটা কিছু এ ছাড়া যে জানি বলে, সে জানে না কারণ সে আমাদের অনুভূতিকে [Sensation] জানায়। শাস্ত্রে তাঁকে বলে অমতো অর্থাৎ মনের বাহিরে যা কিছু তাই। এই নিষ্কাম সাক্ষার মোটা ভাব mani festation হচ্ছেন মায়া বা প্রকৃতি Positive primordial Energy সেটা যদি কৃষ্ণ ঠাকুরের মত একটু বামে হেলে দাঁড়িয়ে থাকে বলি, আবার সে কথনও কৃষ্ণ কথনও কালী হ'তে পারে এটা স্বীকার করে নিই তবে তাকে কতকটা কল্পনায় বুঝিতে পারি। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকরা দই আর সাপের বিষ দুই পদার্থ বিশ্লেষণ করে একই উপাদান পেয়ে স্তম্ভিত হচ্ছেন যখন তারও অনেক আগে ঋষি মুনিদের ভিতর বেদে ধ্বনিত হয়েছে "যস্য ছায়া অমৃত যস্য মৃত্যু।" বাস্তবিক মৃত্যু ও জন্ম একই জিনিষের দুটি দিক তালে তালে নাচছে। জগৎ ও জীব সেই একেরই দুটি দিক। সেই এক মহামায়াকে কিছুই নয় বা শূন্য বলে ধরে নিলে এক দিকে যুক্ত অনন্ত প্রকৃতি [positive Energy) অন্য দিকে অবিদ্যা বা প্রধান সূক্ষ্ম আকাশ (The negative Electron—"Sir Oliver Lodge) সমস্ত গণিত শাস্ত্রের আদিই এই বিন্দু তার একদিগে যুক্ত অনন্ত অন্যদিকে নিযুক্ত অনন্ত infinity; সূক্ষ্ম আকাশই স্থূল আকাশের Ether এর আদি, যাহা সমস্ত বৈজ্ঞানিককে মেনে নিতে হয়েছে। এই স্থূল আকাশ থেকে তিনটি গুণের (Vital faculty) উদ্ভব। তম গুণ বিরাট জাগ্রত স্থূল জগৎ বায়বীয় ভাবের জমাট শ্লেষ্মারূপী এই স্থিতি শীল শারীর রূপী পার্থিব বিশ্ব জগৎ Phenomena supraliminally controlled or Occurring in Ordinary life; রজগুণ হিরণ্য গর্ভরূপী স্বপ্নগ্রস্থ সূক্ষ্ম জগৎ জলীয় ভাবের তরল কফময়ী গতিসম্পন্ন মন রূপী ভাব জগৎ phenomena subliminally controlled সত্ত্ব গুণ তৈজস রূপী সুষুপ্ত কারণজগৎ আগ্নেয় বাস্পীয় সৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন পিত্তরূপী আত্মা জগৎ phenomena claimed as spiritually controlled. প্রতি গুণের উপরে আবরণের মত অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটি কোষ আছে। প্রফেসর Myres তাঁহার Human personality গ্রন্থে এই ত্রিগুণের কথাই বলিয়াছেন। তমোগুণের অন্নময় কোষে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যাপার, প্রাণময় নিঃশ্বাস প্রশ্বাস খাদ্য হইতে রক্ত গঠন আলো, উত্তাপ জৈবিক বিদ্যুৎ জন্ম মরণ ও জনন সম্বন্ধীয় ব্যাপার, মনোময় কোষ স্মরণ মননাদি, বিজ্ঞানময় ইচ্ছা, সুখ দুঃখ অনুভব, আনন্দময় আমিত্ব জ্ঞান অহঙ্কার যেমন জন্ম physiological individuation নিদ্রা স্বপ্ন Oscillations of the conscious threshold রূপ, পরিবর্ত্তন Metamorphoses গুটিপোকার প্রজাপতি রূপ পুরুভুজ, এক জনের ভিতর দুই জনকে অনুভব multiplex personality হাত কাটা লোকের হাতে কষ্ট বোধ, মৃত্যু physiological disolution এই কয়টি।

রজোগুণের অন্নময় কোষে ভিতরের বিষয় transcendental world অনুভূত হয় আবছায়ার মত অতীন্দ্রিয় ভাবে (Telepathic) ও এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অন্য ইন্দ্রিয়ে বোধগম্যহয় telaesthotic যেমন হাতের কনুই lobe দিয়া কেহ কেহ শুনিতেপায়, হিষ্টিরিয়ার রোগীর শক্তি বৃদ্ধি, দীপক রাগিনীতে বাতির আলো জ্বালা হয়; অন্ধেরা ভিতরের আলোকে কাজ কর্ম্ম করে; প্রাণময় কোষ মন্ত্র শক্তির দ্বারা কাগ্য হাত বুলাইয়া বেলেস্তারার ফোস্কা উঠান Stigmatisation ও রোগ আরোগ্য করণ Psychotherapeutics। মনোময় কোষে পিতার ব্যবহারে সন্তানের ভাব পরিবর্ত্তন, মানসিক পুষ্টি অত্যধিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি Hyperœsthesia অনুভূতিঅভাব anaesthesia কষ্টহীনতা Analgesia স্বপ্নানুভূতি Hypermnesia ভবিষ্যৎ দর্শন ও কথন verdical hallucination & Telepathy যোগ সিদ্ধি Telaesthesia or clairvoyance; বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিভা Inspiration of genius ইচ্ছাশক্তি hyperboulia অন্যের উপর প্রভাব telergy আপনাকে দূরে সৃষ্টি self projection ; আনন্দময়

কোষের জন্ম spiritual individuation নিদ্রা বা যোগ নিদ্রা trance ভাবলাগা Ecstasy মহাযাত্রা Irrevocable self projection of the spirit এই সকল হয়।

সত্ত্বগুণের অন্নময় কোষে বোধ হয় যেন লোকে জগতের অন্য দেবভাবের লোকের দ্বারা সর্ব্বদা অনুপ্রণোদিত অথবা ভূতসিদ্ধ; প্রাণময় কোষে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস মলত্যাগাদি অন্যভাবের novel & purposive metastasis of secretion একমন হইয়া দ্বিভাবে সৃষ্টি Materialisation একাগ্রভাব; মনোময় কোষে জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি জড়িত retrocognition মৃতের সহিত পরিচয় phantasms of the dead নিদিধ্যাসন precognition বিজ্ঞানময় কোষে ইচ্ছানুরূপ ভূতগ্রস্থ হওন possession ফলবতী প্রার্থনা Extension of will power in to the spiritual world; আনন্দময় কোষের জন্ম অবতাররূপে Descent into generation নিদ্রা সুষুপ্তি সমাধি ভাবের Visions inspired by spirits পূর্ণস্বরূপাবস্থা percursory emergence in to completer personality, ecstacy with perception of spiritual world মৃত্যু বা পূর্ণ দেহে জন্ম birth into completer personality সিদ্ধ পুরুষ লক্ষণ vital faculty fully exercised in spiritual world.

আধ্যাত্মিক Individualised self মানুষ যখন জন্মায় তখন সূর্য্যালোকের মতই ছড়িয়ে পড়ে ইহার এক এক অণু বর্ণহীন colourless film of matter ইহাই প্রাণ ইহাই বীজ। প্রকৃতির গর্ভে ইহাই ভগবানের স্বরূপ নরাকারে কোন প্রভেদ থাকে না [গীতা ২।২০] সূর্য্যালোক যেমন ছড়িয়ে পড়ে কিছুর ভিতর দিয়ে inter mediate agencies সেটা মায়াই হউক যাহাই হউক সেইরূপ এই বীজেরা নরাকার প্রাপ্ত হইলে ইহাদের ব্রহ্মার সপ্ত মানস পুত্র sensalia বশিষ্ঠ অত্রি অঙ্গিরাদি নামে অভিহিত হয়। ইহারা মানুষের গোত্রকৃৎ ঋষি ভাগ্য-বিধাতা star। আতসী কাচের ভিতরে সূর্য্যালোকে যেমন সাত বর্ণ দৃষ্ট হয় এইরূপ মূলে বর্ণ না থাকলেও উপাধিভেদে গুণ কর্ম্মে বর্ণভেদ হয়, এই গুণ ও কর্ম্ম যথাক্রমে গোত্র ও প্রবর নামে অভিহিত। সাতটি রংয়ের আদি যেমন তিনটি রক্ত, পীত, সবুজ মানব সৃষ্টিরও মূলে শারীরিক মানুষ ভূত সৃষ্টি চরিত্রবান মানুষ প্রজাসৃষ্টি ও আত্মিক মানুষ ও দেব সৃষ্টি বীজালোকের logos এই তিন সৃষ্টি বিচিত্র Down pouring of the logos জন্যই দেবগণ নরগণ ও রাক্ষসগণ এই তিন গণের বিধান।

গানের সপ্ত সুরের মত এই মানস পুত্রেরা সপ্ত জাতীয়। পূর্ণ মানুষের ভিতর এই সাতটি রংয়ের সামঞ্জস্যে তাহাদের ভিতরে শ্বেতবর্ণ দেখা যায়। সূর্য্যের উদয় অস্তের বিভিন্নতায় যেমন রংয়ের ভিন্নতা হয়, সূর্য্যালোকে বিশ্লেষণে spectrum analysis যেমন কোন কোন বর্ণের দুর্ব্বোধ্যতা গভীরতা ultra violet rays উপলব্ধি হয় সেইরূপ এই মানস পুত্রেরা বর্ণাতীত, এ জন্য এরা কোন সুরের (Law) ভিতর আসিতে প্রথমটা চায় নাই। ইহারা যেন শাপগ্রস্থ হইয়াই মানুষের শরীররূপে বদ্ধ আছে। এই শরীর বন্ধন জীবের বন্ধন limitation হইলেও তাহা প্রয়োজন necessary; নায়াগ্রার জলস্রোত রুদ্ধ না হলে মানুষের কাযে আসবে কেন, যন্ত্র চালনা করিতে চাহিবে কেন? মানবের জন্মের সময় লগ্ন বিচার করিলেই বুঝা যায় যে সে সপ্ত মানস পুত্রের কোন গোত্রের। সে সূর্য্য বংশের হইলে রামের মত তার অদৃষ্ট, চন্দ্র বংশের হইলে সীতার মত, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শনি শুক্র যাহাই হউক ঐ ঐ গ্রহের মতই তার অদৃষ্ট গ্রথিত হইবে। এই সপ্ত বর্ণের এক একটি গ্রহের ভাবের নামই এক একটি জাতি group; ভৃগু মুনি এই সাতটি জাতির combination মিশ্রণ করে' তাঁর ভৃগু সংহিতা করেছেন। এই নক্ষত্র দ্বারাই মানুষ গুণ প্রাপ্ত হয় এই নক্ষত্রের সাজসজ্জা Order & arrangements হইলেই লোকের কর্ম্ম state of evolution নির্দ্ধারিত হয়। যে কেহ গুরু মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে শরীর বুদ্ধি ছাড়িয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে সে যে বর্ণেরই হউক পরমহংসত্ব লাভ করে' তখন তাহার জাতি থাকে না। যখন সে মনোময় শরীর থেকে ক্রমে আত্মময় আনন্দময় শরীরে যেলে তখনি তার বর্ণ সামঞ্জস্য লাভ হয়, সে আবার শ্বেত

বর্ণের হয় ইহাই স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তি বা সালোক্য সাজুজ্য সামীপ্য নির্ব্বাণ যাহাই বলা হউক সে সেই অবস্থায় পৌছে। এই স্বরাজ্য প্রাপ্তি না হইলে শিল্পীর শিল্প, সাহিত্যিকের সাহিত্য, অর্থহীন উপন্যাসের মত। নির্দ্ধারণ করা যাউক এখন এই সুর বাঁধার উপায় একটি লোকের সুখ দুঃখ লইয়া তাহাদের গড়া নিয়ম অনুসারে যদি আইন বাঁধিতে থাকি তবে সেটা (cosmic law) পার্থিব পাশবিক নিয়ম হইবে যে নিয়মে অভিব্যক্তি (Evolution সেই নিয়ম। এ নিয়মের দেবী কালী ভয়ঙ্করী এখানে "জোর যার মুলুক তার" (Survival of the fittest), যৌন নির্ব্বাচন (Natural selection) বেশী লোকের কথাই সত্য, majority must be granted এই রূপ ভাবের কথা আসিবেই এজন্য ইহার সহিত যে লোকদের সামঞ্জস্য তাহারা মানুষের সভ্যতা মানে না অভিজ্ঞতা মানে না আইন মানে না এক কথায় বেদ মানে না তাদের অনিয়মী বা অনার্য্য বলি। প্রচলিত বিষয়ের সহিত তাদের সুর মেলে না বলেই তারা বেসুর বেতালা খেয়াল। তারা অসুর কিন্তু অসুর নইলেও মানুষের সমাজ চলে না। সমুদ্র মন্থনের অমৃত দেবভাগ্যে থাকলেও অসুরও এই মন্থন কার্য্যে সাহায্য করে। তাদের মঙ্গলময় ভগবান শিবটি সেই অসুরদের বর দেবার জন্য সদা ব্যস্ত। সভ্যতার তীব্র আলোকে যাদের চোখে ধাঁধা লাগে তারাও সেই অসভ্যদের সরল অবস্থায় যেতে চায় Ibsen প্রভৃতির মতেরও মূল্য আছে। বলসাভিষ্ট স্বরাজ স্থাপনে অনেক সাহায্য করে। চাঁড়াল না জাগলে দুর্দ্দৈব দমন করা যায় না। শিবসিদ্ধ হতে তাই চাঁড়ালের মড়া না হলে চলে না।

Etiquette এর মত এদের নৈতিক নিয়ম আইন বা বাহিরের Drill মাত্র। এদিকে নৈতিক নিয়ম Ethical law পূর্ব্বের লিখিত cosmic law পার্থিব নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী প্রফেসর হক্সলি এই কথাই বলেছেন—Indeed moral precepts are directed to the end of curbing the cosmic process ; জনষ্টিও সেদির এই কথাই বলেছেন—"Nature does not work by moral rules. Nature red in tooth and claw, does by system all that good men by system avoid"। পাশ্চাত্য সভ্যতা ছিন্নমস্তার মত এই পথে চলেছে সেই জন্যই তারা বহিরাবরণে শ্বেত বর্ণ বর্ণসংকর আকার ধারণ করেছে ; এরা সমাজে স্থিতির দল, উদ্দেশ্য ভোগ স্বাধীনতা লক্ষণ জড়তা। অন্তরে নিষ্কাম পরমহংসের মত নিবৃত্তির পথে যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র সম্প্রদায় যায় তাদের লক্ষ্য নবঘনশ্যাম কৃষ্ণঠাকুরের বর্ণের দিকে। এই কৃষ্ণঠাকুরটি স্থিতির দেবতা। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সাধনার ধন। যে পশু শক্তির জন্য মানুষ ভয়ে শাদা হয়ে যায় সেই ভয়ের কারণ ক্ষত্রিয় শক্তিও তাদের গঠিত স্বেচ্ছাচারি আইনকে সমূলে উৎপাটন করাই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য। এই জন্যই তিনি একবিংশতি বার পরশুরাম অবতারে ধরণীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষে নিজ যদুবংশ পর্য্যন্ত ধ্বংশ করেছেন। এ দল গতির দল রজোগুণী একাঙ্গের রসে ইহারা অনভিজ্ঞ এরা কাজ নিয়েই আছে। পরকে রক্ষার ধর্ম্ম নিয়ে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, অর্থ নিয়ে যাদের কারবার তারা বৈশ্য, কাম যাদের ধর্ম্ম তারাই শূদ্র বা ক্ষুদ্র ধর্ম্মাবলম্বী। এদের সবারই লক্ষণ বিনয়। ভৃগুমুনি পদাঘাত করে কৃষ্ণঠাকুরের বিনয় পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণের নৈতিক নিয়মের মূলে নিষ্কাম কর্ম্ম, লক্ষ্য অহিংসা, ইহার কার্য্য চেষ্টা।

সাত্ত্বিক গুণ সম্পন্ন সমাজের লক্ষ্য মোক্ষ তাহারা ঋষি মুনী ও ব্রাহ্মণ বা সাধুপদবাচ্য তারা সৃষ্টির দল। ভাব নিয়ে তাদের কাজ। সব কাজের গোড়ায় এই ভাব রস যোগায়। ব্রহ্মা এদের দেবতা। এরা কারো কাছে কোন পূজা চায় না, অমানী হয়ে মান দেয় এজন্য এদের সবাই পূজা করতে যায় কিন্তু বোঝেনা ব্রহ্মার পূজার ব্যবস্থা যেমন শাস্ত্রকাররা রাখেন নাই তেমনি ব্রাহ্মণ যখন সম্মান চাইবে দলপতি হতে যাইবে তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে পরিণত হইবে।

এখন আমরা আধ্যাত্ম শক্তি বা আত্মশক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদের এই সাতটী বর্ণের সাতটি সুরের পরিচয় আবশ্যক। তবেই আমরা স্বরাজের সুর (constitution) বুঝিব।
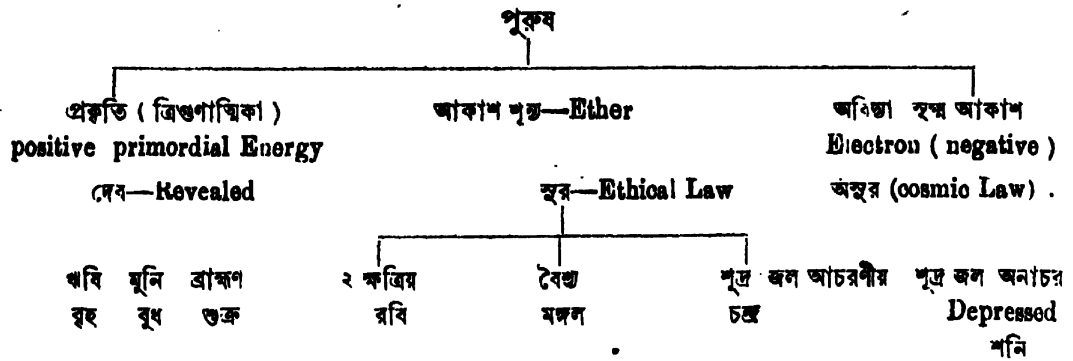
সপ্তবর্ণে স্বরাজ্য বা আধ্যাত্মশক্তির সাধন :

ঋষি	মুনী	ব্রাহ্মণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	শূদ্র	শূদ্র (জল অনাচরণীয়)
বৈদিক			দান			তপ
মনু	বেদ (মোক্ষ)		শ্রুতি, (ধর্ম)	সদাচার (অর্থ) (কাম)		স্বস্যচ প্রিয়মাত্মনঃ (যথা কাম)
কৃষ্ণ	মন্মনা মদ্ভক্ত		স্বধর্ম,	নিস্ত্রৈগুণ্য, নিষ্কাম		নৈষ্কর্ম্য
	মদ্‌যাজি		ধর্ম	সংঘ	অহিংসা	অহিংসা
	বুদ্ধ		জগৎ মিথ্যা			জীবব্রহ্ম
শঙ্কর	ব্রহ্ম সত্য					
চৈতন্য	নামে রুচি		বৈষ্ণবসেবন	"তৃণাদপি"		সংকীর্ত্তন
খৃষ্ট	sacrifice		Faith hope	love		Humour

ভারতবর্ষের ভিতরের শক্তি জাগাইতে "গীতায়" শ্রীভগবানের চেষ্টা। প্রথম অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র যেমন নিজের শরীরটিকে তার সাম্রাজ্য মনে করে আঁকড়ে ধরে থাকে অথচ তার ভিতর সব জয় করে বসে আছে যে সঞ্জয় তার কাছে প্রথম জেনে নেয় যে তার ভিতর যে সুনীতি (ধর্মক্ষেত্র) ও দুর্নীতির [কুরুক্ষেত্র] যুদ্ধ হচ্ছে তার ফলে সে বাস্তবিক উঁচুতে উঠছে না নীচুতে নামছে। কে না জানে যে তার সব চেয়ে প্রিয় দুর্মদ বিষয় বাসনা যার সঙ্গে অতিকষ্টে যুদ্ধ জয় করা যেতে পারে সেই দুর্য্যোধন যে দিকে নিয়ে যায় সে সেই দিকেই যায়। তার বুদ্ধিরূপী দ্রোণ তো তার শরীরের কাম ক্রোধাদি থেকেই পুষ্ট সে সুবুদ্ধি ও কুবুদ্ধি দুই ভাবেই তাকে বুঝাচ্ছে তার সত্যগ্রহ ভীষ্ম সেও তার দুর্য্যোধনের দিকে। এই ধৃতরাষ্ট্ররূপী শরীরী মানুষ তার স্বার্থ ত্যাগ করে যখন রজস্তুক অর্জ্জুনের অবস্থায় মনস্বী সাধক হয়ে পড়ে তখন সে এতদিন বেসুরা বাজছিল এখন ভিতরে তার কৃষ্ণ সারথী রূপী বিবেক আবছায়াভাবে তাকে মন্ত্রণা দেয় সে সুরে (Law) অভ্যস্ত হয়। সে তখন বিশ্বরূপ দেখে স্বধর্ম কর্ম্মে সুরু করে দেয়। ফলে সে তার ভিতরের বিবেকের বাণী শুনতে অভ্যস্থ হয়ে তাকে সে তার ভিতরের "পাকা" আমিকে" দিয়ে প্রবুদ্ধ হয়। এই বার সে ক্ষত্রিয় শক্তিকে ধিক্কার দিয়ে বশিষ্ঠের ব্রাহ্মণ-শক্তি লাভ করে। এইরূপে সে নেপোলিয়ানের মত অভেদ্য হয় বলিতে সমর্থ হয় যে সে গুলি এমন ছাঁচে ঢালা হয় নাই যা নেপোলিয়ানকে বিদ্ধ করতে পারে কারণ সে যে অচ্ছেদ্য অভেদ্য অচল শক্তিমান। জ্ঞান self knowledge ভক্তি self reverence ও কর্ম্ম self control এই তিনের দ্বারা সর্ব্বশক্তিকে আহ্বান করে আত্মশক্তি লাভ করে। আপনাকে (Individuality) জাতির মধ্যে হারিয়ে ফেলে সে আপনার স্বরাজ্য সুর বেঁধে সার্থক হয়।

ফিরে চল!
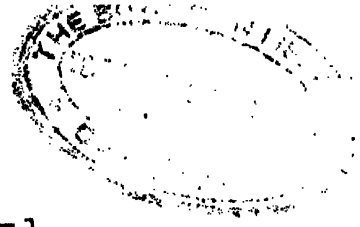
[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

ওরে, তুই যদি এত দুর্ব্বল, এত অক্ষম, এতই দৈন্য তোর
তবে কেন বল্ বাহিরিলি পথে, এতদিন পরে, রাত না হইতে ভোর?
তুই ভেবেছিলি—শেষ-যামিনীর একটু আঁধার এখনি কাটিয়া যাবে
চেনা-পথ ছেড়ে যেতে নাহি যেতে, নয়ন আমার উষার আলোক পাবে,
পরিচিত স্বর-লহরীর মাঝে প্রভাতের পিক এখনই ধরিবে তান
বন-মল্লিকা সেফালি গন্ধ দুহাতে বিলায়ে আকুল করিবে প্রাণ,
ভোরের বাতাস কাণে কাণে বুঝি কয়ে যাবে "ওগো হয়নি তোমার ভুল"
তোর চেনা-লতা আশা দেবে প্রাণে প্রভাতে পরিয়া নিশির শিশির-ফুল,
ওরে নির্ব্বোধ, ভেবেছিলি তোর এই পথই চেনা, হবে দেখাশুনা চির-পরিচিত সনে,
আপন গরবে উপেখি' আঁধার, তাই বুঝি তুই চলেছিলি আনমনে?
তাকি হয়? তোর চেনা পথ কোথা?—কবে ক'ার দেখা?—কিসেরই বা পরিচয়?
স্বপনে বা মনে অথবা ক্ষণিক, দেখছিস যারে, সে কিরে আপন হয়?
আপনার মনে তুলিয়া তর্ক, কত দিনরাত করেছিস যদি হেলা
আজ কেন তবে নিশার আঁধারে করিবারে সাধ প্রাণ লয়ে ছেলে খেলা!
তুই ভেবেছিলি প্রভাত বেলায় প্রাণের খেলায় বিজয়-মাল্য পরি'
ফিরে যাবি ঘরে নর্ম্মসখার দুটী হাত ধরে' সবে বিস্মিত করি'
শ্যামল অঙ্গ বহিয়া গলিয়া পড়িবে তোদের তরুণ কিরণ রাশি
সকল যাত্রা ভাবিয়া কুসুম কৌতুকভরে আপনি উঠিবে হাসি!
পাখী গেয়ে যাবে বন্দনা গীতি, জাগাইয়া প্রীতি নবীন যুগল প্রাণে,
তোরা চলে যাবি পথ দিয়ে শুধু, কেহ বুঝিবে না কোথায়, কিসের টানে!
ঘরের দুয়ারে আসিয়া সহসা বাঞ্ছিত ধনে বক্ষে আগুলি ধরি,
মুখপানে চেয়ে কহিবি আদরে, শত চুম্বনে অধর গণ্ড ভরি,—
"তোমারে খুঁজিতে বাহিরিনু রাতে কখনও ভাবিনি পাব তোমা হেন ধনে,
জনমে জনমে ছিলে বুকে মোর, ছিলেগো আমার সকল পরাণ মনে!
এই দেখ বুকে তোমার পরশ, অধরেতে মোর তব মধু পরশন,
তব পথ চেয়ে অপলক আঁখি—এতদিন পরে এলে কি পরাণ ধন?

তোমার মানসী মূর্ত্তিটি আছে কত রূপ নিয়ে, সুন্দর হয়ে অন্তর মাঝখানে,
কাণে লেগে আছে শত মূর্চ্ছনা অজানিতে তাহা উঠিছে তব গানে।”
কভু নিবি বুকে বুকের পরশ দু'টী হাত নিয়ে নয়নে বুলাবি কভু,
শুধু মুখ চেয়ে কাটাইবি কাল তৃষিত পরাণ তৃপ্ত হ'বে না তবু,
চুম্বনে ক্ষণে যৌবন-সুধা জীবন-মরণ সিন্ধু-মথন করি'
চিরকাল তরে ওরে ও কাঙাল রেখে দিবি তোর শূন্য হৃদয় ভরি'।
তোর সে পরাণ প্রিয়তম শুধু নামাইয়া আঁখি কহিবে মধুর ভাষে,—
—“তোমার ও বুকে যদি ঠাঁই পাই, পরাজয়ে বল কি আমার যায় আসে ?”
ভেবেছিলি তুই, এঁকেছিলি মনে কতনা বর্ণে কত না যতন করি'
তাইয়ে পাগল ছুটে এলি চলে, চলেছিস্ তাই আজও এই পথ ধরি !
ফিরে চল, ওরে ফিরে চল তুই, ওরে দুর্ব্বল ওরে ও দৃষ্টি-হীন,
—শেষ রজনীর ঘোর কেটে যা'ক উষার আবলোকে ফুটিয়া উঠুক দিন !
হৃদয়ে যাহারে আপনার জানি প্রিয়তম বলে অন্তরে দিল ঠাঁই
তারে শুধু আজ মন দিয়ে চাও স্বরূপ তাহার তোমার বাহিরে নাই।

পঞ্চামৃত

[ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক]

ঐখানে—ঐ দূরে কুঞ্জদ্বারের বাহিরে,—আমাদের জাতিগত বিশিষ্টতার গণ্ডীর বাহিরে,—আমাদের আয়তনের সীমান্তের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাক ; সাবধান আর ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিও না। এতদিন বুঝি নাই, চিনি নাই, তোমার প্রকৃত পরিচয় পাই নাই ; তাই তোমার প্রেমের আহ্বানে,—তোমার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ঝঙ্কারে মৃগের ন্যায় আত্মহারা হইয়া তোমাকে আমাদের বিশিষ্টতার গণ্ডীর ভিতরে আসিতে দিয়াছিলাম, আমাদের রসের ও ভাবের কুঞ্জকুটিরে তোমাকে বসিতে দিয়াছিলাম। তাহার ফলে আমাদের ইহকাল নষ্ট হইয়াছে—ব্যবসার-বাণিজ্য, শিল্পকলা, কারিগরী-হুনরী, ধন দৌলত, ঐশ্বর্য্য সম্পদ, বিলাস বসন-ভূষণ—ঐহিকের শ্লাঘার ও সুখের সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছে—চূর্ণ ও ধূলিসাৎ হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যে পরকাল আমাদেরই কেবল অনুভূতিগম্য বিষয় ছিল, যাহার দিকে তাকাইয়া আমরা হেলায় ইহকালকে জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম, আমাদের সেই আশা-সুখের, তৃপ্তি-তুষ্টির, স্থিতি-শান্তির পরলোক,—অনন্ত অক্ষয় অসীম পরকালও এখন আমাদের দৃষ্টিগত নহে ; সে দিকে যেন আর আমরা ঠিকমত তাকাইয়া দেখিতে পারি না। ইহপরকাল নষ্ট হইলে আমাদের থাকে কি ? তোমার সান্নিধ্যে, তোমার সাহচর্য্যে, তোমার অনুচিকীর্ষার আমরা অধিকতর পরাধীন হইয়াছি। যে হিন্দু

"কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"

বলিয়া সগর্ব্বে বাহ্বাস্ফোট করিত, বসন-ভূষণ সাজ-পরিচ্ছদের কোন ধার ধারিত না, পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বরাট্ হইয়া জগতে বিচরণ করিত,—সেই হিন্দু এখন বসন-ভূষণের দাস হইয়াছে, পোষাক পরিচ্ছদের পরাধীন হইয়াছে,—সেই হিন্দু অনুচিকীর্ষার বশে এখন লম্বশাটপটাবৃত কাপুড়ে বাবু হইয়াছে! যে হিন্দু দম্ভ করিয়া বলিতেন যে—

'কভী ঘী ঘনা,
কভী মুঠি ভর চনা,
কভী চনা ভী মনা!"

অর্থাৎ যখন যাহা পাই, তখন তাহা খাই, ঘী পাইলে সানন্দে ঘৃত ভোজন করি, আবার তাহার পরিবর্ত্তে এক মুষ্টি ছোলা পাইলে, তাহা চিবাইয়া সানন্দে দিন যাপন করি, বিধাতার বিধানে যদি সেই মুষ্টিমের চনাও না পাই তাহা হইলে তেমনই আনন্দে উপবাসে দিন যাপন করি,—সেই হিন্দু ইংরেজি শিখিয়া ইংরেজ সাজিয়া প্রথম প্রভাতে শয্যায় শায়িত থাকিয়া কাককুলের কা-কা রবের সঙ্গে চা-চা রব করিতে থাকে, দিনমানের মধ্যে পাঁচবার ভোজন করিয়াও যাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না,—সেই হিন্দুর ইহকালই বা কোথায়, পরকালই বা কেমন? যে হিন্দু একদিন জগন্ময় করিয়া দিয়াছিল,

"নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতঃ
কো বিধিঃ কো নিষেধঃ॥"

যে ত্রিগুণাতীত সত্ত্বরজঃতমের কোন ধারই ধারে না, তাহার পক্ষে বিধিই বা কি, নিষেধই বা কেমন? সেই তোমার সাহচর্য্যের দোষে, তোমার অনুচিকীর্ষার প্রভাবে অশনে-বসনে, পান-ভোজনে, চলনে বলনে জীব-সামান্য সকল ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তোমাদের দাসানুদাস হইয়াছে। আজ হিন্দু ফ্যাসনের দাস, বিচারালয়ে Precedent বা পূর্ব্ব ব্যবহারের দাস, সমাজে Etiquette-এর দাস, ভোজনে পদ্ধতির দাস,—উঠিতে, বসিতে, চলিতে, ফিরিতে, শয়নে, স্বপনে, বসনে, ব্যসনে, গৃহে, বাহিরে, হাটে, মাঠে, ঘাটে, রাজদ্বারে, মহাশ্মশানে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বব্যাপারে তোমার ভাবভঙ্গীর ও রীতি পদ্ধতির গোলাম! এত দাসত্ব—এমন পরমুখপ্রেক্ষিতা পরানুবর্ত্তিতা, পরস্পরাবশ্যতা—আমরা ভারতের হিন্দু কোন কালে কোন যুগে, কোন বিদেশীয় বিজেতার অধীনে থাকিয়া ভোগ করিনাই। আমাদের সাধু সন্ন্যাসী, সিদ্ধ মহাত্মা, সকলেই পূর্ব্বে নিজ নিজ আসনে থাকিতেন, আসন ছাড়িয়া কাহারও হুকুমে এক পদও অগ্রসর হইতেন না; আমাদের গৃহস্থ হিন্দু পূর্ব্বে পল্লীর গণ্ডির মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়া বারো মাসে তেরটা পার্ব্বনের উল্লাস আনন্দে মগ্ন থাকিতেন, কীর্ত্তন আনন্দে বিভোর থাকিতেন, কখনও নিজের গণ্ডি কাটিয়া রাজার আয়তনে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করিতেন না। আমরা মোটা ভাত মোটা কাপড়ে তুষ্ট ছিলাম, হাজার বৎসর কাল খড়ম ছাড়িয়া বিনামা ব্যবহার করিনাই, উত্তরীয় এবং শাল-কম্বল ছাড়িয়া দর্জ্জির সেলাই করা কোট-পাৎলুন পরিধান করিনাই, গাড়ু গামছাই আমাদের সম্বল ছিল, নিজের পায়ের উপরে ভর দিয়া ভারতবর্ষের সকল দূর-দূরান্তরে তীর্থ ভ্রমণ করিতাম; আমরা স্বাবলম্বী ও স্বপ্রতিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু জাতি ছিলাম। মোগলের প্রজা হইলেও মোগলের দাসানুদাস নকলনবিশ ভাড় ছিলাম না কেবল তোমার প্রেমে আত্মহারা হইয়া, পূর্ব্বাপর বিবেচনাবর্জ্জিত হইয়া, আজ আমরা ভিতরে-বাহিরে, ঐহিকে-পারত্রিকে তোমার দাসানুদাস হইয়া পড়িয়াছি। তাই কাতর কণ্ঠে সবিনয় ও সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিয়া তোমাকে বলিতেছি,—

ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক,
রাইয়ের কুঞ্জে আর এস না!"

ইহাই আমাদের অসহযোগ, ইহাই আমাদের Non-co-operation, ইহাই আমাদের boycott—ইহাই আমাদের তাহাই যাহার সাহায্যে আমাদের জাতিগত, ধর্ম্মগত, ব্যাপার ও ব্যবহারগত আত্মরক্ষা করা চলে। যদি দেহ-বলে, বুদ্ধিবলে, প্রাণের বলে তোমার সমকক্ষ হইতাম, তাহা হইলে না হয় তোমার সাহচর্য্য করিয়া লাভালাভের খতিয়ান করিতাম; কিন্তু আমরা যে অতি দুর্ব্বল; তোমার সহিত সমকক্ষতা করিবার সামর্থ্য আমাদের যে একটুকুও নাই। কাঙ্গেরু-শিশু যেমন ভীত হইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টায় মায়ের কুক্ষিগত থলীর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, আমরাও তেমনি

আমাদের সামাজিক আচার-ব্যবহারের,পল্লীজীবনের কমণ্ঠ আবরণে আত্মগোপন করিয়া, আত্মরক্ষা করিতে চাই। সে অবসরটুকু হইতে তুমি আমাদের বঞ্চনা করিতে কেন চাও? আমরা বাঁচিতে চাই, হিন্দুর ছেলে হইয়া হিন্দুয়ানীসমেত হইয়া আমাদের জাতিগত ও দেশগত বিশিষ্টতার আবরণে আবৃত থাকিয়া আমরা বাঁচিতে চাই। তুমি বাঁচিতে দিবে না কেন? আমরা রাজনীতি বুঝি না, —জানি না.— কেবল চাহি আমার বিনষ্ট সনাতন পল্লীবাস, চাহি আমার অপহৃত শিল্পকলা, চাহি আমাদের অবহেলায় উপেক্ষিত ঐহিক ও পারত্রিক সুখ স্বচ্ছন্দতা। দেড়শত বৎসরকাল তোমার সহিত প্রেম করিয়া—

"রাজার নন্দিনী মোরা,
হয়েছি ব্রজের পথের
কাঙ্গালিনী।"

আর কাঙ্গাল থাকিতে চাহি না, আর ব্রজের পথে পথে নিঃসম্বল হইয়া ঘুরিতে-ফিরিতে পারি না। তাই প্রথম প্রভাতে আমি গোষ্ঠে বলদেবের শৃঙ্গনাদ শুনিয়া জাগরিত হইয়াছি, নয়নোন্মীলন করিয়া তোমাকে কুঞ্জদ্বারে দেখিতে পাইয়া সভয়ে সকাতরে তোমাকে বলিতেছি—ঐখানেই দাঁড়ায়ে থাক,. আর আগাইও না। দেবতা তুমি, তোমাকে 'দূর হইতেই নমস্কার করিতেছি। তোমার সহিত সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও সারূপ্য—এই চারি মুক্তির কোন মুক্তিই প্রার্থনা করি না। বৈষ্ণব আমরা চিনি হইতে চাহি না, চিনি খাইতে চাহি—মুক্তি চাহি না —ভক্তিই চাহি। দেশভক্তি মাতৃভক্তি—বংশভক্তি—কুলভক্তি—কর্ম্মভক্তি, এই পাঁচভক্তি-সাধনা করিতে চাই। কাজেই বাধ্য হইয়া, অভাবে পড়িয়া, স্মৃতির বৃশ্চিক দংশনে অধীর হইয়া অতীতের পেষণে চূর্ণবৎ হইয়া বলিতে হইতেছে,

"যা' রে বিদেশী বঁধু,
আমি তোরে চাই না।"

যখন শতচেষ্টা করিয়াও তোমার অনুরূপ হইতে পারিলাম না, হিন্দুয়ানী ছাড়িয়া ইয়োরোপের ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে পারিলাম না, সাহেবের খোলস পরিয়াও যখন শ্বেতাঙ্গের জাতিভুক্ত হইলাম না, সেনাপতি স্মাটস্ ও দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়িয়া ভারতবাসীকে আসিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় লইতে বলেন,—যখন এই সপ্তসরিদ্বরা ভারতভূম ছাড়া আমাদের অন্যত্র আর জুড়াইবার স্থান নাই.—তখন ভারতবর্ষের প্রতি রেণুতে যে ভাব জড়ান—মাখান রহিয়াছে তাহাকে জীবনের সার সম্বল করিয়া আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাহি। বাপের বেটা হইয়া মায়ের ক্রোড় আলো করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি বলিয়াই বারে বারে ডাক দিয়া স্পষ্ট বলিতে হইতেছে—

"ঐখানে দাঁড়ায়ে থাক,
রায়ের কুঞ্জে আর
এস না।"

সাহিত্য—পৌষ

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা

আহার—

১। ক্ষুধা বুঝিয়া আহার করিবে। ক্ষুধা না পাইলে জোর করিয়া খাইবে না। ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলে খাওয়া বন্ধ করিবে। যখন ক্ষুধা না পায় তখন কিম্বা ক্ষুধা নিবৃত্তির পর, লোভে পড়িয়া কিম্বা কাহারও উপরোধে পড়িয়া, অথবা অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, অনিচ্ছার সহিত যাহা কিছু খাইবে, তাহা হজম হইবে না। সে খাদ্য খাওয়া না খাওয়া সমান। তাহাতে শরীরের কোন উপকার হয় না; বরং অধিকাংশ স্থলেই অনিষ্টই হইয়া থাকে।

২। খাদ্যদ্রব্য ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবে। ঈশ্বর মুখের ভিতর যে ৩২টি দন্ত দিয়াছেন, তাহা খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া খাইবার জন্য; উহা কেবল অনাবশ্যক শোভার জন্য নহে। জীবের পাকস্থলী একটী প্রকাণ্ড রসায়ন-বিজ্ঞানাগার। এখানে খাদ্য দ্রব্য রাসায়নিক প্রণালীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া শরীরে শোষিত হইয়া রক্ত, অস্থি, মেদ, মজ্জা, মাংসে পরিণত হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণের ফলে যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয়, পরিপাক ক্রিয়াও তত

সহজ হইয়া আসে। কঠিন খাদ্য বিনা চর্ব্বণে উদরস্থ করিলে, পাচক রস তাহাকে জীর্ণ করিতে পারে না। খাদ্য দ্রব্য যতক্ষণ মুখের ভিতর থাকে, ততক্ষণই কেবল তাহা চর্ব্বণ করিবার সুযোগ থাকে। উদরস্থ হইবার পর সে সুযোগ থাকে না; কারণ, পাকস্থলীতে দন্ত বা দন্তের ন্যায় খাদ্যদ্রব্য পেষণ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিবার উপযোগী কোন পেষণ যন্ত্র নাই। খাদ্য দ্রব্য ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া খাইলে খাদ্যের পূর্ণ আস্বাদ পাওয়া যায়; মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল হওয়াতে পরিপাক ক্রিয়ার বিলক্ষণ সাহায্য হইয়া থাকে।

৩। গুরুভোজন সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। পাচক রসের পরিমাণ এবং শক্তি অসীম নহে। পাচক রস যে পরিমাণ খাদ্য জীর্ণ করিতে পারিবে, তাহাই কেবল শরীর মধ্যে শোষিত হইতে পারিবে। বাকী অংশটা অজীর্ণ থাকিয়া শরীরকে কেবল ক্লেশ দিয়া অবশেষে প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া যায়

৪। যাহা সহ্য হইবে, এবং যে খাদ্যে রুচি হইবে, তাহাই খাইবে। ইহার অন্যথা করিলে যে কি ফল হয়, তাহা সকলকেই সময়ে সময়ে অনুভব করিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও লোভ সংবরণ করিতে অভ্যাস করা উচিত।

৫। দুইবার পূর্ণ আহারের মাঝখানে যদি জলখাবার খাইতে হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব ফলমূল হইলেই খুব ভাল হয়।

৬। যখন শরীর ক্লান্ত থাকিবে, কিম্বা যখন তুমি ক্রুদ্ধ থাকিবে, তখন কিছুই খাইও না। সে সময় যাহা কিছু খাইবে, তাহাই শরীরে বিষবৎ কার্য্য করিবে।

৭। বেশ স্ফূর্ত্তির সহিত আহার করিবে। খাদ্য এবং আহার ক্রিয়া দুইই যেন আনন্দদায়ক হয়। ইহার ফল অতি চমৎকার এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম উপকারী।

৮। পিঠা পরমান্ন এবং মিষ্টান্ন অল্প পরিমাণে খাইবে। কেবল মিষ্টতার লোভে অধিক মিষ্টান্ন খাওয়া উচিত নয়। খাদ্য অধিক মিষ্ট হইলেই তাহা বেশী পুষ্টিকর হয় না।

৯। খাইবার সময়ে বরফ দেওয়া জল পান করিও না। বরফ জল পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়।

নিদ্রা—

১। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৮ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবশ্যক।

২। পুরাতন একটী প্রবচন আছে যে, মধ্য রাত্রির পূর্ব্বে এক ঘণ্টার নিদ্রা মধ্যরাত্রির পরবর্ত্তী দুই ঘণ্টার নিদ্রা যাইবার সমান এই প্রবচনটী স্মরণ রাখিবে।

৩। যে ঘরে উত্তমরূপে বায়ু সঞ্চালন হয়, শয়ন করিবার পক্ষে সেই ঘরই প্রশস্ত।

৪। ধনী লোকেরা পক্ষীর নরম পালখ-নির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করেন। পালখের শয্যা খুব দামী, ধনগর্ব্বের পরিচায়ক, এবং খুব আরামদায়ক হইতে পারে; কিন্তু তাহা একটুও স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়; বরং প্রতিকূলই বলা যায়।

৫। যাঁহাদের সুনিদ্রা হয় না, কিম্বা সহজে ঘুম আসে না, তাঁহারা যদি রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে এক মাইল, অন্ততঃ, অর্দ্ধ মাইলও, ভ্রমণ করিয়া আসেন, তাহা হইলে সুনিদ্রার পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইতে পারে।

৬। চিৎ হইয়া শয়ন করিবে না; পাশ ফিরিয়া শুইবে।

স্নান—

১। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে একখানি ভাল সাবান মাখিলে গাত্রের সমস্ত ময়লা দূর হয়, এবং রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার সহায়তা হয়।

২। প্রত্যহই আহারের পূর্ব্বে উত্তমরূপে তৈল মর্দ্দন করিয়া, শীতল জলে ধারা-স্নান করিবে। সঙ্গে সঙ্গে একখানি হনিকোম্ব তোয়ালে বা খস্‌খসে গামছার দ্বারা গা উত্তমরূপে রগড়াইয়া ফেলিবে। গাত্র মর্দ্দনের ফলে গায়ের ময়লা, অতিরিক্ত তৈল প্রভৃতি ত উঠিয়া যায়ই; অধিকন্তু ইহার দ্বারা চর্ম্ম সতেজ হয়, রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়া দ্রুত হয়। সুতরাং স্নানকালে গাত্র মার্জ্জনা বলকারক ঔষধের (টনিকের) কাজ করে। যাঁহারা স্নানের পরই শীতবোধ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ধারা-স্নান প্রশস্ত নহে।

৩। স্নানের অব্যবহিত পরে, গা মুছিয়া কাপড় না ছাড়িয়া, হঠাৎ কোন ঠাণ্ডা ঘরে যাওয়া, কিম্বা যে ঘরে থাকিবে সে ঘরের জানালা-দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতে দেওয়া উচিত নয়। স্নানের পর গায়ে একটা জামা দিলে ভাল হয়।

৪। রাত্রিতে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে ঈষদুষ্ণ জলে গামছা বা তোয়ালে ভিজাইয়া গা একবার মুছিয়া ফেলিতে পারিলে সুনিদ্রার সহায়তা হয়।

দন্ত—

১। প্রত্যেকবার আহারের পর দাঁত মাজিয়া ফেলা উচিত। কেবল কুলকুচা করিয়া মুখ ধোওয়া নয়, দাঁত রীতিমত মাজা কর্ত্তব্য; যেন দাঁতের গায়ে, কিম্বা দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খাদ্যকণা লাগিয়া না থাকে। আর প্রত্যহ নিদ্রা ভঙ্গের পর এবং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার করিয়া দাঁত উত্তমরূপে মাজিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

২। দাঁত মাজিবার জন্য কোন একটা ভাল রকম দন্তমঞ্জন ব্যবহার করা উচিত।

৩। দাঁত মাজিবার জন্য দন্তমঞ্জনের সঙ্গে চিয়াড়ী, দাঁতন, টুথ ব্রাস, কিম্বা ডেণ্টাল ফ্লস বা ফ্লানেলের মত দাঁত মাজিবার এক প্রকার বস্ত্র খণ্ড ব্যবহার করিলে, দাঁতের ফাঁকের খাদ্যকণা দূর হইয়া যায়। চেয়াড়ী বা দাঁতন ব্যবহার করিতে হইলে, দাঁতের মাড়ীর যাহাতে ক্ষতি না হয়, সে পক্ষে সাবধান হইতে হইবে। ডেণ্টাল ফ্লস প্রায় সকল বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

৪। শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় দন্তেরও ব্যায়াম আবশ্যক। কঠিন খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া খাইলে দাঁতের বেশ ব্যায়ামের কাজ হয়।

৫। দাঁতের মাড়ী আঙ্গুল দিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলিলে সেখানে খাদ্যকণা লাগিয়া থাকিতে পারে না, মাড়ীর কোন ক্ষতিও হয় না।

৬। বিশেষ প্রয়োজন না বুঝিলে দাঁত তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। দাঁত তোলাইবার প্রয়োজন বুঝিলে আগে অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হইবে, এবং উপযুক্ত ডাক্তারের দ্বারাই দাঁত তোলাইতে হইবে।

সাধারণ—

১। প্রত্যহ নির্দ্ধারিত সময়ে নিয়মিত ভাবে এমন ব্যায়াম করা উচিত, যাহাতে চামড়ার ঠিক নীচে পর্য্যন্ত রক্ত সঞ্চালন হয়। ব্যায়াম প্রণালী সুনির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে শরীরের সকল অংশে সমান ভাবে রক্ত সঞ্চালন হয়।

২। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ও নিয়মিত ভাবে কোষ্ঠ উত্তমরূপে সাফ হওয়া কর্ত্তব্য।

৩। কাফি, চা ও মাদক দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রত্যহ, প্রতি মুহূর্ত্তে, যতটা সম্ভব বিশুদ্ধ বায়ু, যত বেশী পরিমাণে সম্ভব, সেবন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

৪। প্রত্যহ হাসি-মুখে শয্যা ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে; তাহা হইলে সমস্ত দিনই হাসি-মুখে কাটাইতে পারিবে। মনের প্রসন্নতার তুল্য স্বাস্থ্যকর পদার্থ আর কিছুই নাই।

৫। কখনও বিরক্ত হইও না। বিরক্তির কারণ ঘটিলেও নিজেকে প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা করিবে।

স্বাস্থ্য সমাচার—মাঘ
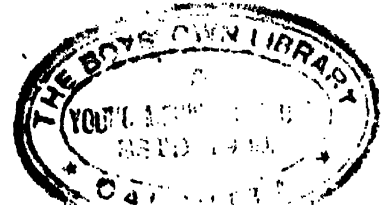
সংগ্রহ

ভেনাস ডি মিলো

পাথর কাটিয়া যে অপরূপ স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করিতে পারা যায় ভাস্করদের বাটালীর মুখে সে কথাটা ধরা পড়িয়াছে। বাটালীর মুখে পাথরের গায়ে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া অমর হইয়া আছেন অনেক ভাস্কর শিল্পী। তাঁহাদের অনেকের নাম আমরা জানি—অনেকের আবার জানি না। 'ভেনাস ডি মিলো'তে যাহার কল্পনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার নামও আমরা জানিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু নাম না জানিলেও এটা যে শিল্প-জগতের অপূর্ব্ব সৃষ্টি তাহা জগতের বিখ্যাত শিল্প-সমালোচকেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

এই মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্য যেমন স্বপ্ন লোকের, ইহার সৃষ্টি-রহস্যের চারিদিকও তেমনি রহস্যের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ভূমধ্য সাগরের মেলস দ্বীপে। কিন্তু কে যে ইহার রচয়িতা, কোথায় এবং কখন যে ইহা রচিত হইয়াছিল সে খবর এখনও জানিতে পারা যায় নাই এবং কখনো যে জানিতে পারা যাইবে সে সম্ভাবনাও ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কারণ অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর যে এই মূর্ত্তিটি মাটির তলে অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষজ্ঞরা বলিতেছেন, যে দুই চারিটি বিখ্যাত গ্রীক-শিল্পী পাষাণের গায়ে নিজেদের কল্পনার রেখা রাখিয়া অমর হইয়া আছেন, ভেনাস ডি মিলো তাঁহাদেরই এক জনের রচনা—উহাতে তাঁহাদের চির পরিচিত নিপুণ বাটালীর ছাপ আছে।

'ভেনাস ডি মিলোর' বর্ত্তমান ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে মাত্র একশত বৎসর আগে। মেলস দ্বীপের ইয়রগস বোট্টানিয়া নামে একজন কৃষক পাহাড়ের ধারে মাঠে কাজ করিতে গিয়া কতকগুলি পাথর সরাইয়া ফেলিতেই একটি গুহার মত জিনিষ দেখিতে পায়। আরো কতকগুলি পাথর সরাইয়া ফেলিতেই বাহির হইয়া পড়ে, অপরূপ, অনিন্দ্যসুন্দর এই ভেনাস ডি মিলো। কে যে উহাকে সেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, কেন যে প্রায় বিশটি শতাব্দী ধরিয়া জগতের এই দুর্লভ দ্রব্যটি অন্ধকারে বন্দী হইয়া লোক চক্ষুকে ফাঁকি দিয়াছে, মূর্ত্তিটিকে কেহ চুরী করিয়া ওখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, না শিল্প-বিদ্বেষী ভেণ্ডালদের ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমুদ্র-সলিল-ঘেরা মেলসে উহাকে গোপন করা হইয়াছিল আজ এসব প্রশ্নের উত্তর মিলিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

এযুগের লোকদের ভেনাস ডি মিলোর পরিপূর্ণ তনু-তটকে দেখিবার সুযোগ হয় নাই। কারণ তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন ইয়রগস ইহাকে আবিষ্কার করে, শোনা যায়, তখন ইহার সর্ব্বাঙ্গই সম্পূর্ণ ছিল। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ একত্র করিয়া এই দেহটিকে সম্পূর্ণতা দান করা হইয়াছিল—পা হইতে কটি অবধি এক ভাগ এবং কটি হইতে মাথা অবধি আর একভাগ। বাঁ হাতটি এমন কৌশলে গড়া ছিল যে, তাহাও কাঁধ হইতে খুলিয়া লইয়া আবার বসাইয়া দেওয়া যাইত। আজ এই নীচের ভাগ এবং বাহু দুটির কোনই সন্ধান আর মেলে না।

মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হইবার কিছুদিন পরেই একখানি ফরাসী জাহাজ মেলস দ্বীপের বেলা ভূমে আসিয়া হাজির হয় এবং একজন যুবক ফরাসী অনন্যসাধারণ কিছু আবিষ্কারের জন্য নূতন জিনিষের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন। সহজেই ভেনাস ডি মিলোর সংবাদ তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবক ইয়রগসের কাছে যাইয়া ভেনাসকে কিনিবার সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু তাঁহার হাতে তখন টাকা ছিল না। সুতরাং স্থির হইল কনস্তান্তিনোপল হইতে টাকা পাঠাইয়া দিয়া মূর্ত্তিটি লইয়া যাওয়া হইবে। কনস্তান্তিনোপলে আসিয়া ফরাসী রাজদূতকে মূর্ত্তিটির কথা বলিতেই অর্থ সহিত তাঁহার লোক গিয়া মেলসে হাজির হইল। কিন্তু সেথানে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারা গেল, দ্বীপের প্রধান পুরোহিত মূর্ত্তিটি কোন গ্রীক নৃপতিকে উপহার দিতে চেষ্টা করিতেছেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে মূর্ত্তিটি যখন জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হইতেছিল তখনই ফরাসীদের একখানি যুদ্ধ জাহাজ আসিয়া মেলসে নজর করিল।

ইহার পর ভেনাস ডি মিলোকে লইয়া গ্রীকে ফরাসীতে বেশ একটা ভাল রকমেরই যুদ্ধ হইয়া গেল। যুদ্ধে ফরাসীরা জয়ী হইয়া নর সৃষ্টির এই দুর্লভ রত্নটিকে আত্মসাৎ করিয়া প্যারিসে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই যুদ্ধেই ভেনাস ডি মিলো এরূপভাবে অঙ্গ হীন হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু কেহ কেহ বলেন এ গল্প আগা গোড়াই গল্প। ইহার ভিতর এতটুকুও সত্য নাই। মূর্ত্তিটি ফ্রান্সে লইয়া আসিবার পথে হঠাৎ কি করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। নিজেদের দোষ চাপা দিবার জন্ত পরিশেষে এই যুদ্ধের গল্প পরিকল্পিত হইয়াছে।

ভেনাস ডি মিলো সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপারই এইরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ইহার সম্বন্ধে যেটুকু নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে তাহা হইতেছে—ভেনাসকে পাওয়া গিয়াছে মেলসদ্বীপে। এই ভগ্নবাহু মূর্ত্তিটির সৌন্দর্য্য ভাস্কর্য্য জগতে এখনও অতুলনীয়, ফ্রান্সের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ নর-নারীরা ইহাকে প্যারিসের শিল্পাগারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ছবির জহুরী

ছবি আমরা সকলেই দেখি এবং সকলেই আপনাকে ছবির সমঝদার বলিয়া মনে করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করি না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ছবির সৌন্দর্য্য উপভোগ করা সহজ জিনিষ নহে—তাহার কোথায় কোন সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে, রেখা ও রঙের সমাবেশে কোন্ অপূর্ব্বতা অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা ধরিতে হইলে অনেকখানি সাধনার প্রয়োজন হয়—পাকা চোখ না হইলে তাহা চোখে পড়ে না।

অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পকলা-লক্ষ্মীর ভক্ত-সেবকদের অনেক ছবিই এইজন্য এদেশে অনেকখানি অবহেলা ও অশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু কেবল মাত্র এদেশে নহে, পাশ্চাত্য জগতেও যে ছবির সমঝদার খুব বেশী নাই তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। নীচে আমরা কতকগুলি নমুনা দিতেছি। তাহা হইতেই আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

নটিংহামের মি, এইচ, আর, হারবার্ট যুদ্ধের পূর্ব্বে ৩০০৲ টাকা দিয়া একখানা ছবি কিনিয়াছিলেন। সম্প্রতি লণ্ডনের কোনো পাকা চিত্র জহুরী তাঁহাকে জানাইয়াছেন, সে খানি রেমব্রাণ্ডের একখানি বিখ্যাত ছবি; উহার দাম কম পক্ষে দেড় লক্ষ টাকা।

মিঃ ডেভিস নামে ব্রিষ্টলের জনৈক ভদ্রলোক কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে রান্না ঘরে তিনি একখানা ছবি ঝুলিতে দেখেন—সেখানা ল্যাণ্ডশিয়ারের নিজের হাতে দাগা একখানা বিখ্যাত চিত্র। সেই ধোঁয়া এবং ঝুলের ভিতর ল্যাণ্ডশিয়ার যদি নিজের এই ছবিখানাকে আবিষ্কার করিতেন তবে দুনিয়ার কলাজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা হইতে তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

একবার প্যারিসের একটি ছবির দোকানদার কোন সুতোরের নিকট হইতে ২০ ফ্রাঙ্ক দিয়া একখানি ছবি কিনিয়াছিল। ফ্রেমটার ছিল তার প্রয়োজন। সুতরাং ছবিখানির সে কোনোই যত্ন লয় নাই। ছবিখানি র‍্যাফেলের "আদাম হাবা"। জহুরীর হাতে পরিষ্কৃত হইয়া এই অনাদৃত ছবিখানি অবশেষে আশি হাজার ফ্রাঙ্কে বিকাইয়াছিল।

কোরট্রাইয়ের কাছে ইউরেগহামে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই আলবার্ট ডুরারের একখানি ছবি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ছবিখানি কি করিয়া একটি কৃষক রমণীর হাতে আসিয়া পড়িয়াছিল। সে সেখানি একজন স্থানীয় বাজে চিত্রকরকে বিক্রয় করে। বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা

করাইতেই উহা ডুরারের ছবি বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। ছবিখানি কিছুদিন পূর্ব্বে মিউনিকের জাতীয় মিউজিয়াম হইতে চুরী গিয়াছিল। ছবির ব্যবসা যাহারা করে তাহারাও যে সব সময় ছবির সমজদার নহে উপরের ঘটনা দুইটিই তাহার প্রমাণ।

বার্ম্মিংহামের একটি ডাক্তার একবার রোগী দেখিতে গিয়া একখানা দুর্লভ ছবি আবিষ্কার করেন। ছবিখানি ধুলো কাদামাখা হইয়া অযত্নে লুটাইতেছিল। সামান্য কয়েকটি টাকা দিতেই তাহারা ছবিখানি ডাক্তারের নিকট বিক্রী করে। বাড়ীতে আসিয়া ডাক্তার ছবিখানি পরিষ্কার করিয়াই বুঝিতে পারিলেন, 'ক্যানভাস'কে সার্থক করিয়া বিখ্যাত চিত্রকর লেলীর মানসসুন্দরী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

র‍্যাফেলের নির্দ্দোষীর হত্যা (Massacre of Innocents) একখানি বিখ্যাত চিত্র। এই ছবি খানি অনেকদিন আগে ইটালির কোন সহরে একটি বিধবার কুটিরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিধবাটি চিত্রকরের নাম জানার পূর্ব্বে সামান্য কয়েকটি টাকার বিনিময়েই উহা বিক্রী করিতে রাজি ছিলেন। কিন্তু ক্রেতা জোটে নাই। অবশেষে র‍্যাফেলের নাম শোনার পর ক্রেতা জুটিল বহু। কিন্তু এই বিধবাটি উহা তখন ১,২০,০০০ টাকাতে বিক্রি করিতে রাজি হয় নাই।

একবার একটি শিল্পী স্পেন পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। রাত্রিতে তিনি কোন সরাইয়ে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় কয়েকজন দস্যুর দ্বারা আক্রান্ত হন। দস্যুদের লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িতেই তাহারা পলাইয়া গেল। শিল্পী তাহাদের কাহাকেও আহত করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার গুলি চালানো একেবারে ব্যর্থ হইল না। একখানা ছবি দেয়ালে টাঙ্গানো ছিল। গুলি লাগিয়া সূতা ছিঁড়িয়া সেখানে মাটিতে পড়িয়া গেল। শিল্পীর পাকা চোখ। তিনি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন সেখানা ডেলাক্রোয়েজের নিজের দাগা একখানা চমৎকার ছবি—দাম লাখো টাকা। তিনি সরাইওয়ালার নিকট হইতে মোটে ১৫ শিলিং দিয়া ছবিখানি কিনিয়া লইলেন।

এইরূপ আরো অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। কোরেজিও, ভেনডাইক, র‍্যাফেল, রুবেনস প্রভৃতির কত ছবি যে কত অনাদৃত অবস্থায় চারিদিকে ছড়াইয়া আছে তাহার ঠিকানা নাই। প্রকৃত শিল্পীর চোখে যখন পড়ে তখনই আসল মূল্য ধরা পড়ে, আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও তাহার কদর বুঝিতে পারি না। —রায়

শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ঐতিহাসিক যুগ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী]

পারসীকগণের আবেস্তা গ্রন্থও বৈদিক ভাবে ভাবিত হইয়া থাকিবে। বাস্তবিক সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয়, সাম্রাজ্য সংরক্ষণ ও শাসন শৃঙ্খলা ভারতীয় অনুশাসনের অভিব্যক্তি মাত্র। চন্দ্রগুপ্তের শাসন শৃঙ্খলা "অর্থশাস্ত্রের" উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থশাস্ত্রে বৈদিক প্রভাব আদপেই পরিদৃষ্ট হয় না। বরং ভারতীয় অর্য্যগণের গ্রন্থ হইতেই অর্থশাস্ত্র সংকলিত।

সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা মৌর্য্য বংশের সহিতই পরিসমাপ্ত হয় নাই। কারণ সুঙ্গ বংশীয় পুষ্য মিত্র (পুষ্পমিত্র) মৌর্য্য বংশীয় রাজা বৃহদ্রথকে বিনষ্ট করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পুষ্যমিত্র মিলিন্দকে পরাভূত ও বিতাড়িত করেন। উত্তরে ভারতে অখণ্ড প্রতাপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ১৮৪ খৃঃ পূঃ পুষ্যমিত্র সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

তিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ উভয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত এস্থলে বিশেষ সাদৃশ্য পরিস্ফুট। পুষ্প মিত্রের অশ্বমেধের সম্বন্ধে বর্ণনা কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস প্রণীত "মালবিকাগ্নি মিত্রম্" নামক নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে গুপ্ত বংশীয় সমুদ্র গুপ্ত ও সাম্রাজ্য স্থাপন ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অশোকের প্রচার পুষ্যমিত্র ও সমুদ্র গুপ্তের সময় কতকটা রুদ্ধ হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র বৌদ্ধগণকে নির্য্যাতন করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। অবশ্যই ভারত ধর্ম্মের নির্য্যাতন তেমন প্রবল নহে। কোনও স্থলে সম্রাট বা রাজা বৌদ্ধ হইলে অতিরিক্ত মাত্রায় অত্যাচার করিয়াছেন। তৎকালে হয়ত কোনও কোনও হিন্দুরাজাও সামান্য অত্যাচার করিয়াছেন। বৌধ ও জৈনদিগের নির্য্যাতন যে অতি সামান্য হইয়াছে তাহা স্মিথ্ সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন। নির্য্যাতনের জন্য ভারত হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিতাড়িত হয় নাই। স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন—"The wonder rather is that persecutions were so rare and that as a rule the various sects managed to live together in harmony and in the enjoyment of fairly impartial official favour" অর্থাৎ আশ্চার্য্যের বিষয় এইযে নির্য্যাতন কদাচিৎ হইত। এবং স্বভাবতঃই বিভিন্ন মতাবলম্বীগণ একত্রে শান্তিতে বাস করিত এবং পক্ষপাত পরিশূন্য ভাবে রাজকীয় অনুগ্রহ লাভ করিত। বাস্তবিক ভারতে যেরূপ toleration ছিল এরূপ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এই toleration এর জন্যই ভারতে নানা জাতি বাস করিতেছে ও করিয়াছে। কেহ আঘাত না করিলে ভারত কাহারও ধর্ম্ম মতে আঘাত করে নাই, আঘাতেরও প্রতিঘাত সবিশেষ হয় নাই। প্রিয় দর্শী অশোকের অনুশাসন toleration এর জন্য বিহিত হইয়াছিল। গৌণ কর্ত্তব্যরূপে toleration অনুশিষ্ট হইয়াছিল। স্মিথ্ সাহেবের ভাষায় বলিতে হয়—"A high place was given to that of showing toleration for and sympathy with the beliefs and practices of others ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় toleration সম্বন্ধে স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন বর্ত্তমানেও রাজস্থানে ইহার প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি লিখিয়াছেন—"The notion of toleration being a royal duty still survives. Buhler was told in Rajputana, a raja ought not to be exclusive in the point of worship, but favour all the various sects among his subjects" (Ind V1 183) This principle has been acted on frequently" অর্থাৎ toleration যে রাজকীয় ধর্ম্ম তাহা অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। বুলার সাহেব রাজপুতনায় জানিয়াছিলেন রাজার কোনও বিশেষ পূজায় বা ধর্ম্মে পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নহে। প্রজাপুঞ্জের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই অনুগ্রহ করিবেন। এইমত অনেক ক্ষেত্রেই অনুসৃত হইয়াছে।"

ভারতীয় ধর্ম্মের বিশেষত্বের জন্যও নির্য্যাতনের সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। অধিকারবাদ স্বীকার করায় ভারতীয় হিন্দু ধর্ম্ম কাহাকেও স্বধর্ম্মে বল পূর্ব্বক আনিতে চেষ্টা করে নাই। বরং অন্যান্য জাতীয় লোক নীরব প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম সদ্ভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্মিথ্ সাহেব হিউয়েনসঙ্গের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তকে যে কাল রঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা সঠিক বলিয়া বোধ হয় না। তিনি তৎপ্রণীত ইতিহাসের ১৯১ পৃষ্ঠার ফুটনোটে বৌদ্ধ নির্য্যাতন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"The instance of Sasanka described by the nearly contemporary Hiuen Tsang [Beal Records, i 212 ; ii 42, 91, 118, 121] is fully proved" P. P. 191 Foot note. এবং তিনি ৩১৯-৩২০ পৃষ্ঠায় শশাঙ্কের কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন। শশাঙ্ক বোধি বৃক্ষ উৎপাটিত করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের পদ চিহ্ন পরিশোভিত পাটলি পুত্রের প্রস্তর ফলক ধ্বংস করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ সংঘারাম বিধ্বস্ত ও সন্ন্যাসীগণকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। হিউয়েনসঙ্গ এই ঘটনার ৩০।৪০ বৎসর পরে আসিয়া এ সম্বন্ধে জানিয়া লিখিয়াছেন। এই ঘটনা সম্ভবতঃ ৬০০ খৃষ্টে ঘটিয়াছে।

আমাদের মনে হয় শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত যেরূপ কাল রঙ্গে চিত্রিত হইয়াছেন তিনি সেরূপ ছিলেন না। ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় শশাঙ্কের চরিত্র যেরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তৎকালিক সংকীর্ণ-মনা, ষড়যন্ত্রকারী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শশাঙ্ককে ঐরূপ ভীষণ চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। গুপ্তগণের অভ্যুদয় হইতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় সূচিত হইয়াছে, বৌদ্ধ প্রভাব পরিক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বৌদ্ধগণ হীনপ্রভ হইয়া হিন্দুর নরপতির প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিতেও কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় নাই। ধর্ম্মবিদ্বেষ বশে বৌদ্ধগণ নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিয়াছেন। ইহা অনেকটা পরিমাণে মানবীয় স্বভাব। তৎকালিক বৌদ্ধগণ যে মহত্ব অনেক পরিমাণে হারাইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিউয়েনসঙ্গ সেই সকল ষড়যন্ত্রকারী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মুখের বিবরণে বিশ্বাস করিয়া শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তকে ঐ রূপ ভীষণ চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধগণ ভগবান্ আচার্য্য শংকর সম্বন্ধেও ঐরূপ কুকার্য্যের উল্লেখ করে। তাহারা এখনও একটি কড়া রাখিয়া দিয়াছে। তাহারা বলে সেই কড়াতে ভগবান্ শংকর বৌদ্ধগণকে তৈলে ভাজিতেন। এরূপ অমানুষিক বর্ব্বরোচিত কার্য্য জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শংকরের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আচার্য্যের বিচার জালে পরাভূত হইয়াই বৌদ্ধগণ এরূপ মিথ্যা রটনা করিয়াছে। এরূপ মিথ্যা রটনা দুর্লভ নহে। নবাব সিরাজের চরিত্রও মিথ্যারূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিবর্গ কর্তৃক চিত্রিত হইয়াছে। তদনুবলেই ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে চিত্রিত করিয়াছেন। স্বার্থ বড় জিনিষ। উহাতে মানুষকে অপদার্থ করে। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিদ্বেষের বশে লোককে অন্যায় রূপে চিত্রিত করা মানবীয় স্বভাব। বোধ হয় পাশ্চাত্য দেশের 'electioneering' dodge' এইরূপ স্বার্থের ফল। ঐতিহাসিকগণও অনেকক্ষেত্রে নিজের মনঃকল্পিত ভাবে ভাবিত হয়েন, হিউয়েন্‌সঙ্গ নিজে বৌদ্ধ, তাঁহার পক্ষে বৌদ্ধগণের বাক্য বিশ্বাস করা খুবই স্বাভাবীক, বৌদ্ধগণও নিজেদের চক্রান্ত গোপন করিয়া শশাঙ্কের চরিত্রেই দোষারোপ করিয়াছে। বাস্তবিক ভারতে নির্য্যাতন স্পৃহা ভারতীয় উপাদান নহে। তাহা না হইলে চার্ব্বাক প্রভৃতি হিন্দু সমাজের অঙ্গীভূত থাকিতে পারিত না, হিন্দুরাজ্যে মুসলমানগণ অবাধে থাকিতে পাইত না। জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ঐতিহাসিকের দৃষ্টি অতিক্রম করিলে অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস বিপর্য্যস্ত হয়। Sir Walter Raleigh যখন পৃথিবীর ইতিহাস সংকলনে তৎপর তখন একদিন তাঁহার গৃহের নিকট গোলমালের শব্দে তিনি বাহিরে আসেন ও জিজ্ঞাসায় দুই ব্যক্তির নিকট হইতে একই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা প্রাপ্ত হয়েন। তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন—ইতিহাস লেখা কিরূপ কষ্টসাধ্য, ব্যাপার বাস্তবিক একই ঘটনার দুইটা দিক্ আছে। ঐতিহাসিকের পক্ষে উভয় দিক বিবেচনা করাই সঙ্গত। স্মিথ্ সাহেব নিজেও অপক্ষপাতের প্রশংসা করিয়াছেন, তাই তিনি তাঁহার পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"Nor is it possible for the writer of a history, however great may be his respect for the objective fact, to eliminate altogether his own personality"

. P. P. 4

বৌদ্ধগণের চরিত্র অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়াছিল। হিন্দুসভ্যতা পুনরায় মাথা তুলিতেছিল। ইহা তাৎকালিক ঐতিহাসিক সত্য, এমতাবস্থায় নরেন্দ্র গুপ্তকে অকারণে দোষী করা হইয়াছে।

এক্ষণে আমারা পুনরায় সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আলোচনা করিব, সমুদ্র গুপ্তের সময় গুপ্ত সাম্রাজ্য হুগলী নদী হইতে যমুনা ও চাম্বল নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গার সমতটে আসাম, হিমালয়ের দক্ষিণ .... ভূভাগ, রাজপুতনা ও মালবের জাতিগুলি সাম্রাজ্যের সহিত অধীনতাসূত্রে সংবদ্ধ ছিল। দাক্ষিণের রাজ্য গুলিও সম্রাটের সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাঁহার প্রতাপ সুদূর দক্ষিণেও প্রবেশ করিয়াছিল। *

* The dominion under the direct Government of Samudra gupta in the middle of the fourth century thus comprised all the most populous and fertile countries of Northern India. It extented from the Hoogly on the east to the Jumna and Chambul on the west and from the foot of the Himalays on the North to the Narmada on the south beyond these wide limits

সমুদ্র গুপ্তও হিন্দু, তাঁহার পক্ষে বৈদেশিকভাব গ্রহণ অপেক্ষা দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া স্বাভাবিক। স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন—"Samudragupta an orthodox Hindu learned in all the wisdom of the Brahmans" ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তির পক্ষে দেশীয় আদর্শ গ্রহণ করাই সম্ভব। সমুদ্রগুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ ভারতীয় শাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন কারণ তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ যে ভারতীয় জাতির সাম্রাজ্যের প্রাণ তাহা পরিস্ফুট, সমুদ্র গুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর না হইলেও পূর্ব্ব, উত্তর পশ্চিমে ও দক্ষিণ পশ্চিমে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাবের অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় মালব, গুজরাত, সৌরাষ্ট্র, বা কাথিয়ার অধিকৃত হয়। তিনি পশ্চিম ভারতে শকদিগকে পরাভূত করিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের পরে তাঁহার পুত্র প্রথম কুমার গুপ্ত ৪১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে উপবেশন করেন, তাঁহার সময়েও সাম্রাজ্য অটুট ছিল। অধিকন্তু সাম্রাজ্য পরিবর্দ্ধিত ও হইয়াছিল; কারণ তিনিও পিতামহ সমুদ্র গুপ্তের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। স্মিথ্ সাহেব বলিতেছেন, "on the contrary, it probably gained certain additions for Kumara like his grand father, celebrated the horse-sacrifice as an assertion of his paramount sovereignty."

E. H. I. p. p. 283-284

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগেও অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর মধ্য ভাগেও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে দেখিতে পাই। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে পরবর্ত্তী গুপ্ত বংশের রাজা আদিত্য সেন অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন, "The most notable member of the later Gupta dynasty was Adityasena, who asserted his independence after the death of the para mount sovereign Harsa in 648 A. D. and even presumed to celebrate the horse-sacrifice in token of his claim to supreme rank."

E. H. I. p. p. 295

অর্থাৎ শেষ গুপ্তবংশের প্রসিদ্ধ রাজা আদিত্য সেন, তিনি হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন হন, এবং সম্রাট বলিয়া অভিমানে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন," এই সকল ঐতিহাসিক প্রমাণে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় ভারতীয় অনুশাসন জাতীয় জীবনে যথার্থ কার্য্যকর হইয়াছিল; ভারতের রাজন্যবর্গ সাম্রাজ্য গঠনে চেষ্টিত ছিলেন, অবশ্যই বৌদ্ধধর্ম্মের ফলে ভারতীয় জাতির অধঃপতন হইয়াছে, মৌর্য্যবংশীয় অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার হয়, মগধে বৌদ্ধধর্ম্ম তৎপূর্ব্বেও ছিল, কারণ অজাত শত্রু বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। রাজকীয় ধর্ম্ম হওয়াতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অশোকের সময় হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমাদের মনে হয় অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মকে রাজকীয় ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে সকলকে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টিত হইয়া ভারতীয় জাতির অধঃপতনের বীজ বপন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুশাসন ফলে জাতি সম্মিলন বা প্রতিষ্ঠান শক্তি power of organisation হারাইয়াছিল, আমাদের মনে হয় প্রতিষ্ঠান শক্তিই জাতীয় জীবনের প্রধান-

(Continued from the last page) the frontier kingdoms of Assam and the gangatic delta, as well as those on the southern slopes of the Himalayas, and the free tribes of Rajputana and Malwa were attached to the empire by bonds of subordinate alliances whilst almost all the kingdoms of the south had been over run by the emperor's armies and compelled to acknowledge his irresistible might"

E. H. I. p p. 271-272

উপাদান, প্রাণীবিদ্যায় দেখিতে পাই সম্মিলন বা প্রতিষ্ঠান শক্তির বলেই জীবের প্রাণ বিধৃত।

শরীর বিজ্ঞানের কোষগুলি (cells) সম্মিলন শক্তির অনুবলে বিধৃত হইয়া শরীর রূপে অবস্থিত, সমাজ জৈবিক প্রকৃতির অনুবলে গঠিত, জাতি ও জৈবিক প্রকৃতি বলে উদ্ভূত, জাতীয় জীবন বহু শতাব্দী ব্যাপী চেষ্টায় পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠে, অনুকূল ও প্রতিকূল জিনিষের ভিতর অনুকূল গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধি পায় প্রতিকূলতায় রোগাক্রান্ত শরীরের ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বৈদিক ও মহাভারতীয় যুগে ভারতীয় জাতি বহু সহস্র শতাব্দী ব্যাপী সাধনায় যে জীবন গঠন করিয়াছিল তাহার উপর প্রতিকূল আঘাত লাগিতে লাগিল, বৈদিক, রামায়নী ও মহাভারতীয় যুগের কর্ম্মপ্রবণ জাতি বৌদ্ধ যুগের কল্পনার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া সুপ্তি-মোহ মদিরায় উদ্‌ভ্রান্ত হইল। মৌর্য্যবংশ হইতে গুপ্ত বংশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই যখন হিন্দুগণের অভ্যুদয় হইয়াছে তখনই সাম্রাজ্য প্রচেষ্টা পরিস্ফুট, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, পুষ্পমিত্র, সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি সকলেই সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়া জাতি গঠনে সমুৎসুক, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের শিক্ষা দীক্ষার ফলে জাতির সম্মিলন শক্তির অভাবে সাম্রাজ্য বিধ্বংশ হইয়াছে জাতি "বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত" হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষায় মানুষ অস্বাভাবিক স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। নির্ব্বাণের কাল্পনিক আদর্শে উদ্‌ভ্রান্ত হয়—অধিকার বাদ না মানায় সকলকে সন্ন্যাসী করিবার প্রচেষ্টায় সামাজিক কর্ত্তব্য-বিস্মৃতি ঘটে। সাধারণের কার্য্যে অবহেলায় জাতীয় জীবন সঙ্কুচিত হয়। "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" সার্ব্বজনীন হওয়ায় অমানুষিক অস্বাভাবিকতায় জাতীয় জীবন ক্ষুণ্ণ হয়, সর্ব্বোপরি যজ্ঞের মূলে কুঠারাঘাত করায় জাতীয় জীবন কর্ম্ম বিহীন হইয়া পড়িল, স্বতন্ত্রতায় প্রতিষ্ঠান বা সম্মিলন শক্তির অভাব ঘটিল, জাতি খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হইল।

সাম্রাজ্য প্রচেষ্টা সম্মিলন বা প্রতিষ্ঠান শক্তির অভিব্যক্তি, অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞ সম্মিলন শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, জীবনের ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠান শক্তি, সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিত আত্মস্থ ভাবই স্বতন্ত্রতা, তাহা মানবের ব্যক্তিগত আদর্শ হইলেও সমাজগত আদর্শ প্রতিষ্ঠান শক্তি, হিন্দুধর্ম্মের এই মহান্ শিক্ষা জাতি ভুলিয়া গেল, বৌদ্ধধর্ম্মের কাল্পনিক আদর্শে উদ্‌ভ্রান্ত হইল, জাতীয় জীবন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল, প্রতিষ্ঠান শক্তির অভাবেই জাতীয় অধঃপতন হয়।

যাঁহারা ভারতীয় জাতিভেদের দোষ প্রদর্শন করেন তাঁহাদের এস্থলে একটু চিন্তা করিবার বিষয় আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম জাতি ভেদের উপর আঘাত করিয়াছে। বৌদ্ধ ভারতে জাতিভেদের তীক্ষ্ণতা ছিল না। ইহা অনেক ঐতিহাসিক বলেন, মৌর্য্যগণ জন্মে ক্ষত্রিয়ের ঔরষে শূদ্রানীর গর্ভে, চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক কন্যা গ্রহণ করিলেন, গুপ্তবংশের সময়েও জাতিভেদের দৃঢ়তা সমধিক ছিল না, ইহা স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন। হর্ণেল [Hornle] সাহেবও এসিয়াটিক সোসাইটীর জরর্ণালে জাতিভেদের শিথিলতার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, স্মিথ সাহেব তৎপ্রণীত ইতিহাসে ২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন বালাদিত্যের ভগ্নী ব্রাহ্মণ বসুরাটের সহিত বিবাহিতা হইয়াছিল। পরমার্থ বসু বন্ধু জীবন চরিতকার তিনিই এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধ যুগে জাতিভেদ শিথিল থাকাতেও জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন তখনই জাতি নূতন প্রাণ পাইয়াছে। এই সার সত্য আমরা ইতিহাস পাঠে প্রাপ্ত হই। ব্রহ্মদেশে ভারতের মত জাতি ভেদ নাই, মুসলমান গণের ভিতরেও ভারতের মত জাতি ভেদ নাই, রুষিয়ায়ও ভারতের মত জাতিভেদ নাই, কিন্তু ব্রহ্মের মত অধঃপতিত দেশ আর কয়টী আছে? ভীম বিক্রান্ত তুরস্কের মুসলমান সাম্রাজ্য আজ কিরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। বাস্তবিক সম্মিলন শক্তিরই জয় হয়। ভারতীয় জাতিভেদ সম্মিলন শক্তির বিরোধী কিনা তাহাই বিবেচ্য। বহু শতাব্দী ব্যাপী ক্রমবিকাশের ফলে জাতিভেদ প্রথা ভারতীয় জীবনে বদ্ধমূল হইয়াছে। ইহা জৈবিক প্রাকৃতিক নিয়মে অভিব্যক্ত হইয়াছে। জাতি তাহার ঐতিহাসিক ধারা ভুলিতে পারে না। দীর্ঘকাল এক সমাজের ও শাসনের অধীভূত থাকিয়াও আয়র্লণ্ড ইংলণ্ড

হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সমুৎসুক। দীর্ঘকাল পোলণ্ড রুশীয় শাসনের অধীভূত, সামাজিকতায়, বিবাহে ও আহারে, পোল জাতির সহিত স্লাভ জাতির মিলন মিশ্রণ ছিল। তথাপিও পোলণ্ড স্বাধীন হইবার জন্য কত রক্ত ব্যয় করিয়াছে। জন্মগত দীর্ঘকালের সংস্কার ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে সহজ নহে। জাতি তাহার ইতিহাস ভুলিতে পারে না, কিছুকালের জন্য বিস্মৃত হইলেও আবার পুনরায় উদিত হয়। আইরিশগণ তাই তাহাদের নিজেদের শাসন অস্ত্র. নিজেদের ভাষা, নিজেদের ধর্ম্ম, সকল নিজ নিজস্ব জিনিষ গ্রহণ করিয়া উদ্বুদ্ধ হইতে কৃত-সংকল্প, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, জন্মগত সংস্কারই জাতীয় জীবনের ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা, ভারতীয় জাতিভেদের প্রতিকূলে অনেক ঘাত প্রতিঘাত হইয়াছে।

কবীর পন্থি নানক পন্থি গৌড়ীয় বৈষ্ণব, ও রামাইতের ভিতরে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পন্থি জাতিভেদের মূলে আঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের চেষ্টাই সর্ব্বোপরি, কিন্তু জাতিভেদের কঠিনবর্ম্মে আঘাত লাগিলেও একেবারে মূল সূত্র ছিন্ন হয় নাই। আবার আঘাতকারী সমূহ হিন্দুসমাজের কুক্ষিগত হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই সকল জাতিভেদ বিরোধী সম্প্রদায় ভাঙ্গিতে গিয়া দল বাঁধিয়াছে। বৌদ্ধগণ সংঘের, কবীর প্রভৃতি সম্প্রদায় পন্থির সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমানেও ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য্য সমাজ, থিয়োসফিষ্ট দল ভাঙ্গিতে গিয়া নিজেরা দল হইয়া পড়িয়াছে। বহুশতাব্দীর বিকাশে যাহা জাতির স্বভাব রূপে পরিণত হইয়াছে তাহা ভাঙ্গিবার জো নাই। যে সকল কাল্পনিক অন্যায়মত জাতিভেদের আশ্রয়ে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে সেইগুলি ভাঙ্গিলেই চলিতে পারে, মূলসূত্র ছিন্ন হইতে পারে না। কারণ উহার ভিত্তি প্রকৃতিতে। প্রকৃতির অন্যথা ভাব হইবে না, ভারতীয় জাতিভেদ যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা আমাদের লিখিত "রাজনীতি" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, আমাদের মনে হয় ভারতীয় অধঃপতনের কারণ প্রতিষ্ঠান শক্তির অভাব। বর্ত্তমানের ইউরোপীয় যুদ্ধ হইতে এইটি শিক্ষার বিষয় আছে, প্রতিষ্ঠান শক্তিরই জয়। বোধ হয় ইউরোপের সকল রাজ্যই এই অমূল্য শিক্ষালাভ করিয়াছে। ভারতীয় জাতি জাতিভেদের জন্য পতিত হয় নাই, জাতিভেদই ভারতীয় অবনতির কারণ নহে। স্বতন্ত্রতা ও কর্ম্ম-কুণ্ঠাই জাতীয় অধঃপতনের কারণ, ঐতিহাসিক অনেক স্থলে কেবল ঘটনাপরম্পরা দেখিয়া সিদ্ধান্ত করেন কিন্তু কার্য্য কারণ পরম্পরা লক্ষ্য করেন না, এই জন্য অনেক স্থলে ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় না। ইতিহাস বুঝিতে হইলে কার্য্য কারণ পরম্পরার অনুসন্ধান করিতে হইবে, ঘটনা পরম্পরার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে ভারতীয় জাতিকে বুঝিয়া উঠা সুকঠিন হইবে। কারণ ভারতীয় জাতীয় বিশেষত্ব কার্য্যকারণ অনুসন্ধানে, জাতীয় বিচার তজ্জাতির মানদণ্ডে অনেকটা পরিমাণে করিতে হয়, সাদৃশ্য দেখিয়া তুলনা করা চলিতে পারে কিন্তু প্রত্যেক জাতীয় বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। প্রত্যেক জাতীর উত্থান পতনের ধারা একরূপ নহে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের ধারাও স্পেনীয় মুর সাম্রাজ্যের পতনের ধারা একরূপ নহে। মৌলিক কোনও কোনও কারণ এক হইতে পারে, উত্থান সম্বন্ধেও তাই, কেবল বাহিরের ধারা দেখিয়া উত্থান পতনের ধারা নির্দ্দেশ করা কখনই সমীচীন নহে। বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বৌদ্ধভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতিভেদ ভাঙ্গিতে গিয়া আবার নিজেরাই সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে। ইহাই প্রকৃতির প্রতিশোধ, অবশ্যই জাতিভেদ স্বীকার করিলাম বলিয়াই আমরা কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে বলিলাম না। আজকাল কার জাতিভেদ শাস্ত্রীয় জাতিভেদ হইতে কতকটা পরিমাণে বিচ্যুত হইয়াছে। ভৌগলিক সংস্থান বা দেশজ লোকাচার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। অবশ্যই এই লোকাচার প্রভৃতিও বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছে। অধিক দিন চলিলে সাধ্য হইয়া যাইতে পারে, মূল সূত্র রক্ষা করিয়া লোকাচার প্রভৃতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে।

অনেক সময়—সমাজ সংস্কারকগণকে একটী ভ্রমাত্মক ধারণা বশে কার্য্য করিতে দেখিতে পাই। তাঁহারা যাহাদের উপকার করিতে সমুৎসুক তাহাদের বাদ দিয়াই কার্য্য করেন। সমাজের হিতকল্পে কার্য্য করিতে ব্যগ্র তাঁহাদিগকে

সমাজকে বাদ দিয়া কার্য্য করেন। সমাজের কোনও অঙ্গকে বাদ দিয়া কার্য্য করিলে তাহা দোষাবহ ও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সমাজ সেবা নহে। যাহার উপকারে ব্যাপৃত হইলাম তাহাকে বাদ দিলে কাহার উপকার হইবে? এই সার তথ্যটি ভুলিয়া অনেকক্ষেত্রে সমাজের জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াও ফল লাভে বঞ্চিত হন। আজ কালকার পতিতোদ্ধার অনেকটা পরিমাণে তজ্জাতীয়, "Depressed Class mission" নামক জিনিষটা আমাদের মনে ঐরূপ ভাবের সঞ্চার করিয়া দেয়। একজনকে জাগাইতে হইবে বলিয়াই অন্যকে বিদলিত করিতে হইবে—ইহা কোন ধর্ম্ম? গোরক্ষা করিতে গিয়া মনুষ্য হত্যার মতন। স্বাভাবিক পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়াই প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইবে। অস্বাভাবিক চেষ্টায়—উন্মত্ত চেষ্টায় জাতির মঙ্গল হয় না।

যাহাহউক আমাদের প্রস্তাবিত বিষয় অনুসরণ করা যাউক, বাস্তবিক স্বতন্ত্রতাই জাতীয় অধঃপতনের কারণ, স্বতন্ত্রতার ফলে সাধারণের কার্য্যে অবহেলা আসে সম্মিলন শক্তি থাকে না। বৌদ্ধধর্ম্ম ও অশোকের অনুশাসন ভারতকে কিরূপভাবে নির্জ্জীব করিয়াছে তাহাই আমাদের বর্ত্তমানের আলোচ্য। অশোক প্রথম জীবনে শৈব বা শাক্ত ছিলেন। কলিঙ্গ বিজয়ের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁহার সময়ে ইতর প্রাণি হত্যা নিবারণের জন্য প্রবল চেষ্টা হইয়াছিল। "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" রূপ অনুশাসন বলে পশু পক্ষী হত্যা নিবারিত হইয়াছিল। যজ্ঞ বন্ধ হইল। পশু পক্ষী হত্যা করিলে প্রাণ দণ্ড পর্য্যন্ত হইত, একদিকে পশু পক্ষীর প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া মানব হত্যার বন্দোবস্ত করা হইল। যজ্ঞের মূলে আঘাত করায় কর্ম্মপ্রবণতা কমিয়া গেল। জাতির সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইল। সকলের জন্য অহিংসার ব্যবস্থা করায় জন সমাজ ভণ্ড ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। রাজা দেশ অমান্য করিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে লাগিল। জীবনে যে বৈধ হিংসার আবশ্যকতা আছে তাহা ভুলিয়া ইতর প্রাণীকে রক্ষা করিতে গিয়া মানবের ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

স্বভাব দোষ

(শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার)

[১]

এককালে ভালছেলে বলিয়া পরেশের বেশ খ্যাতি ছিল। অবাধে ক্রমে ক্রমে চারিটা পাশ দিয়া সে যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে সকলেই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই কতকগুলি ঘটনায় পরেশের প্রতি গ্রাম্য ভদ্রলোকদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। দুর্ম্মুখ, অহঙ্কারী, উচ্ছৃঙ্খল ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য বিশেষণগুলিতে তাহাকে অভিহিত করিয়া অনেকেই বোসেদের বৈঠকখানা সরগরম করিয়া তুলিতেন। কিন্তু যাহাকে লইয়া এত বিরক্তি, সে পরম নিশ্চিন্তে পল্লীজীবনের অনুদ্বিগ্ন শান্তি উপভোগ করিতে একটুও বাধা পাইত না। তাহার কারণ সামাজিক হিসাবে ইতর ভদ্র নির্ব্বাচণ করিবার চলিত প্রথাটী সে মানিত না। সমাজের সর্ব্বস্তরে তাহার অবাধ গতিবিধি ছিল। বিশেষতঃ সে আদর্শবাদী নব্য যুবক অশিক্ষিত পল্লীবাসিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সে কলিকাতা হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। ম্যাজিক লণ্ঠন, ম্যাপ, গ্লোব ইত্যাদি লইয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছোটলোকদিগের মধ্যেই কাটাইয়া দিত।

এই কার্য্যে তাহার মাত্র একজন উৎসাহদাতা ছিলেন; তিনি বড় তরপের বিজয়বাবু। বিজয়বাবু গ্রাম্য সম্পর্কে পরেশের ঠাকুরদা। পরেশের প্রতি ঠাকুরদাদার স্নেহ কোন ঘটনাতেই লাঘব হয় নাই।

পরেশের বড়ভাই সুরেশবাবু ছিলেন নিতান্ত ভাল মানুষ। তিনি কোন হাঙ্গামা পছন্দ করিতেন না। পরেশ এক একটা কাণ্ড বাধাইয়া মাঝে মাঝে গ্রামে যে তুমুল উত্তেজনা ও আন্দোলন উপস্থিত করিত তাহাতে বড়ই বিরক্ত হইতেন। কিন্তু পরেশকে পারিয়া উঠা তাহার ক্ষমতার অতিরিক্ত ছিল। বকুনি, শাসন ইত্যাদি পরেশ মাথা পাতিয়া লইত বটে কিন্তু কার্য্যকালে সব ভুলিয়া যাইত। সুরেশবাবু ক্ষুন্নমনে ছোট ভাইটীর ভবিষ্যত ভাবিয়া আকুল হইতেন—বিবাহ চাকরী ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলিতেন, পরেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিত। দাদা বিশেষ পীড়াপীড়ি করিলে সে মুখ ভার করিয়া বৌদিদিকে বলিত। 'দেখ দেখি দাদার অন্যায়? আমাকে বাড়ী থেকে তাড়াবার মৎলব আঁটা হচ্ছে বুঝি?' বৌদিদি বক্রকটাক্ষে স্নেহ-কৌতুক বর্ষণ করিয়া বলিলেন,—'হ্যাগো যশোদার দুলাল, যাও—সন্দিপণী-মুনির পাঠশালা থেকে তো পালিয়ে এসেছো—এখন রাখালদের নিয়ে গরু চরাও গে।' পরেশ বালকের মত উচ্চ হাস্য করিয়া বলিত, 'বাঃ বৌদিদি! তোমার কি বুদ্ধি। এমন সুন্দর উপমাটা তুমি পেলে কোথায়? গ্রামের গরু গুলোকে চরাবো বলেই তো এসেছি। তাইতো গোকুলে এত সাঁড়া পড়ে গেছে।' 'থামো পণ্ডিত-পাগল, তোমার গুণের ব্যাখ্যা শুনবার অবসর আমার নেই।'

বাহিরের তাপে পরেশের কিছুই হইল না কিন্তু ঘরের চাপে সে একটু দমিয়া আসিল। একদিন সে অসহিষ্ণু হইয়া দাদার নিকট বলিয়া ফেলিল, গ্রামের লোক ভালই করুক আর মন্দই করুক আমি কিছুই বলিব না। কোন ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা বলিব না, ছোট্‌লোকদের নিয়াই থাকিব।

সুরেশবাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন, পরেশও নিজেকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভদ্রলোকদের সঙ্গ সে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়া পরিহার করিতে চেষ্টা করিত।

[২]

সকালবেলায় পরেশ তাহার অভ্যস্থ পাঠে নিমগ্ন হইয়া আছে; এমন সময় বৌদিদি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ঠাকুরপো শুনছো!

কি?

তোমাকে আজ বাজারে যেতে হচ্ছে?

আমাকে? না সে হবে না বৌদিদি; আমার কিছু হ'লে দাদা উপেন্দ্র-বজ্রা ছন্দে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের কসুরত দেখাবেন।

'তুমি কি চিরকালই ছেলেমানুষ থাকবে নাকি? আজ গনেশ নেই, তোমার না গেলেই চল্‌ছে না!

উত্তম্; কিন্তু কর্ম্মেই আমার অধিকার—ফলভোগ করবে তুমি!

চাদরখানা কাঁধে ফেলিয়া পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। বৌদিদি ফর্দ্দ ও টাকা তাহার হাতে দিয়া কি কি আনিতে হইবে বুঝাইয়া দিলেন।

বাজারে পরেশকে দেখিবামাত্র বিজয়বাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—কিহে ভায়া, আজ যে কাশীতে ভূমিকম্প; তুমি বাজারে?

পরেশ হাসিয়া বলিল,—সংসারে সংসারী সাজি' ভবের উন্নতির চেষ্ট কর্‌ছি।

অকারণ উচ্চহাস্যের ভিতি বিরাটবাহুখানা তাহার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বলিলেন, বটে! আর কি মাছ এসেছে দেখি! ঠাকুরদা অগ্রসর হইলেন, পরেশ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

বাজারের এক পার্শ্বে একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক কয়েক আঁটী জলজ শাক সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছে—তাহার পরিধানে ছিন্ন জীর্ণ সিক্ত বসন। অর্দ্ধমুক্ত ঘোম্‌টার মধ্য হইতে তাহার ক্লিষ্ট মুখখানির কিয়দংশ ও ভীত চকিত চক্ষু দুটী দেখা যাইতেছিল। ছোট-তরফের অজয়বাবু তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রাসভকণ্ঠে বলিলেন, কিরে মাগী শাক্ ক' আঁটী করে দিচ্ছিস?"

অবজ্ঞাভরে উচ্চারিত কর্কশ, কদর্য্য 'মাগী' শব্দটী

পরেশের কর্ণে বিঁধিল ; সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। সঙ্কুচিতা রমণী ছিন্নাঞ্চলে অঙ্গের অনাবৃত অংশগুলি আবৃত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে করিতে নিম্নস্বরে বলিল, "দু' আঁটী করে-তো সকলেই নিচ্ছে।"

"ঐতো শাক্, তার আবার এত দাম?" বলিয়া অজয়-বাবু চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত জিজ্ঞাসু-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 'চার আঁটী করে দিবিনে?' বলিতে বলিতে চক্রবর্ত্তী অগ্রসর হইয়া হস্তস্থিত যষ্ঠিদারা শাকগুলি উল্টাইয়া দিয়া বলিলেন, "এ সব বুড়া পাতা আর থাড়া দেখছি যে রে মাগী? মোট ক' আঁটী আছে?" 'আবার মাগী?' এই বর্ব্বরোচিত সম্বোধন পরেশের অন্তরে বিষাক্ত শরের মত বিদ্ধ হইল। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এই অপমান সূচক উক্তি, সে নম্র-বিনয়ে উত্তর করিল, "আজ্ঞে দশ আঁটী।" "তার মধ্যেও তো দু' আঁটী একেবারে ছোটরে? দুটো পয়সাই ঠিক দাম হয়, তা' যাক্, এই আট আঁটীই নাও; দাওনা অজয় দুটো পয়সা ফেলে।" চক্রবর্ত্তীর সহৃদয়তায় কৃতার্থ হইয়া অজয়বাবু বলিলেন, "না ও দু' আঁটী আর আলাদা কোথায় বেচ্‌বে? নেরে সবগুলোই তুলে নে।" চাকরকে হুকুম করিয়া, তিনটী পয়সা রমণীর সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিয়া অজয়বাবু ফিরিলেন। পরেশ অগ্রসর হইয়া বলিল, "কাকা, আর দুটো পয়সা দিয়ে যান।"

"কেন?"

দশ আঁটী শাকের দাম পাঁচ পয়সা না?

বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি পরেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দু' আঁটী করেতো ও দিতেই চেয়েছিল, আমি তিন আঁটী করে নিলাম, অন্যায় কি হ'ল বাপু?"

লজ্জা করে না আপনাদের এই সব দুঃখী মেয়েদের উপর জুলুম করতে? ওতো রাজী হয়নি তিন আঁটী করে দিতে, অথচ আপনারা জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করলেন না? ছিঃ কাকা, ওদের জিনিষের কি দর দস্তুর করতে আছে? পাঁচটা পয়সা পেলে আধসের চাল হবে, দেন দুটো পয়সা।" চারিদিকে লোক জমিয়া গেল, ক্রুদ্ধ অজয়বাবু কর্কশকণ্ঠে বলিলেন, 'বাজারে দাম দিয়ে জিনিষ কিন্‌তে এসেছি, ভিক্ষে দিতেতো আসিনি। সস্তায় কিন্‌তে পেলে ছাড়বো কেন বাবাজী?'

"এতো কেনা নয় এতো লুঠ। পয়সা দেবার পূর্ব্বে এক-বারতো জিজ্ঞাসা করলেন না, খোস খেয়ালে তিনটে পয়সা ফেলে দিয়ে দিব্বি চলে আসছে?"

অজয়বাবুর কথা কাড়িয়া চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—তোমাকে কে মোড়লী করতে ডাক্‌লে বাপু? দাদার পয়সা থরচ কর কিনা, গায়তো লাগে না? গতর খাটিয়ে যারা পয়সা রোজগার করে তাদের হিসেব করে চল্‌তে হয়—অত খয়রাত করা চলে না, বুঝেছো?

অবজ্ঞাভরে চক্রবর্ত্তীকে উপেক্ষা করিয়া পরেশ কাতর-স্বরে বলিল, "দিন্‌না কাকা দুটো পয়সা ফেলে?"

চক্রবর্ত্তী মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, "যদি ও না দেয় তা'হলে তুমি কি করবে?"

"কি আর করবো? মনে করবো আপনাদের হৃদয় এত সঙ্কীর্ণ যে, কাজটা যে গর্হিত হৃদয় হীনতা তা' পর্য্যন্ত অনু-ভব করতে পারছেন না?"

চক্রবর্ত্তী ধৈর্য্য হারাইলেন। পরেশকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যাহা বলিলেন, তাহা হইতে অশ্লীল বিশেষণগুলি বাদ দিলে এইরূপ দাঁড়ায়, "বটে! ....আমরা হৃদয়হীন, আর তুমি......বড় হৃদয়ওয়ালা না? কায়েতের ঘরের...... লেখাপড়া জানা......গোমূর্খ! ব্রাহ্মণ, গুরুজনের সঙ্গে কি করে কথা কইতে হয় তা' পর্য্যন্ত শেখ নাই।

পরেশ নিষ্ঠিবন-বর্ষি ক্রোধ কম্পিত চক্রবর্ত্তীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, দুটো পয়সার জন্ম যাঁরা এত লঘুত্ব দেখাতে পারেন, তাঁদের গুরুত্বটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছি না?"

শুন্‌লে তো অজয়? এই বাজারের মাঝখানে দশজনের সামনে? বেটা এম, এ পাশ করা বেল্লিক, তোমাকে মজাটা টের পাওয়াচ্ছি।"

এমন সময়ে অকস্মাৎ ঠাকুর দাদার সবলহস্তের প্রবল-আকর্ষণে পরেশ বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্বেও অপসৃত হইল।

পরেশ নিশ্চিন্তে পুনরায় বই খুলিয়া বসিয়াছে এমন সময়ে সুরেশবাবু উচ্চকণ্ঠে তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তোর জালায় দেখ্‌ছি গ্রামে বাস করা দুর্ঘট হয়ে উঠ্‌লো। বলি এ সব কি কথা?"

পরেশ প্রশান্তকণ্ঠে বলিল, "মজার কথা! তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা? চক্রবর্ত্তী মশাই বলেছেন, তিনি আমাকে মজাটা টের পাওয়াবেন; এবার আর তোমায় কিছু করতে হবে না।

সুরেশবাবু হতাশভাবে ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—স্বভাব-দোষ!

উচ্চহাস্য করিয়া পরেশ উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, এই এতদিনে ঠিক ধরেছ!

চোখো চোখি

[শ্রীশৈলজা মুখোপাধ্যায়]

শোক্‌ভরা দুনিয়ায় কালো দুটি চোখ্‌
শুধু, জাগ্রত রো'ক ভাই জাগ্রত রো'ক্‌!
তবে কাজ নাই রোশ্‌নাই এ, জ্যোস্নায় সই,
আয় এক্‌লাটি বসে' ভাই দুটো কথা কই!
দ্যাখ্‌ বুকে, গেছে এঁকে পদাঘাত চিহ্ন!
ফুল নাই ঝরা পাতা শাখাওত' ছিন্ন!
নাই নাই চারিদিকে করে বুক হায় হায়!
দুটি কালো চোখ্‌ মোরে ডাকে শুধু আয় আয়!

দুটি চোখে দেখাদেখি কোন্‌ সন্ধ্যায়
সখী, বল্‌ দেখি তার তরে কেন মন ধায়?
তার নাই ভাব, নাই ভাষা, কিছু তার নাই, নাই!
মন বলে আছে সব, তারে আমি চাই ভাই!
আয় সখী ধরে রাখি বুকে ওই দৃষ্টি,
বলিহারি তারে ভাই, করেছে যে সৃষ্টি!
পুড়ে' খাক্‌ হোক্‌ সব,উড়ে যায় যাক্‌ না
জল ভরা দুটি চোখ্‌ বুক ভরে থাক্‌ না!
আমি তারে বাঁধ্‌ব শত বাহু বাড়ায়ে
যাও সখী ঘরে যাও থেকো নাক দাঁড়ায়ে!
আমি হেথা রই বসে, জল ভরা চক্ষে
মরণের তরে সই, দুরু দুরু বক্ষে!
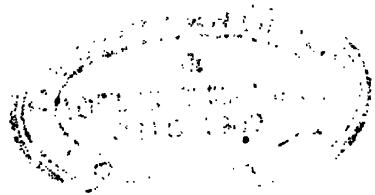
আমাদের কথা

[শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী]

ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ব্যাপারে নানা রকম গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া আমরা খুবই সুখী হইয়াছি, এবং হইবারই কথা। কারণ দুই যুধ্যমান্ জাতির ভিতর একপক্ষে অন্তর্বিবাদ আরম্ভ হইলে, অন্যপক্ষ উল্লাস করিয়াই থাকে।

আজ মণ্টেগু পদত্যাগ করিয়াছেন, কাল কর্জ্জন পদত্যাগ করিবেন, তাহাতে আমাদের কোনই লাভ নাই, অথচ আমরা আনন্দে অধীর হইয়া ভাসিতেছি, নন-কো-অপারেশনের ফলেই বুঝি আজ ইংলণ্ডের এই অবস্থা। আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে ইংলণ্ডের এই গোলযোগ, ভারতের স্বার্থের জন্য নহে, ভারতে ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্য। মণ্টেগু ভারত প্রীতির জন্য চাকুরী গ্রহণ করেন নাই, সে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষের পুরোমতে ইংলণ্ডের স্বার্থ ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। মণ্টেগুর ষ্টেট্‌সেক্রেটারী-পদ গ্রহণে, ভারত ভ্রমণে, 'রিফর্ম' প্রদানে কিম্বা পদত্যাগে তাহারা কোনই খবর রাখে নাই যাহারা এই ভারতের খাঁটী ভারতবাসী। আজ মণ্টেগু সাহেব লয়েড্ জর্জ্জের বিরুদ্ধে ভারত প্রীতির' পরিচায়ক অনেক 'চার্জ্জ' উত্থাপন করিলেও আমারা দরিদ্র ভারতবাসী যেমন ছিলাম তেমনিই আছি। মণ্টেগু সাহেব কি ভারতবন্ধু? বিলাতের অনেক ভাল লোকইত ভারতের বন্ধু। সেই সময় কটন, হিউম বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের রিফর্ম বিল পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারত-প্রীতির চিহ্ন স্বরূপ ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিতেন, আজ কেয়ারহার্ডি বাঁচিয়া থাকিলে ইংরেজের অভিভাবকত্বে চিরশিশু ভারতের অমঙ্গল হইতেছে দেখিয়া নিশ্চয়ই "হাউস্ অব্ কমন্সে" একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিতেন। কিন্তু শত শত মহান্ ইংরেজের হৃদয় হইতে ভারতের জন্য অজস্র ধারায় প্রীতি প্রবাহিত হইয়া ভারতের তপ্ত বক্ষকে শীতল করিতে করিতে বলিয়া যাইবে ইংলণ্ডের গৌরব, ইংরেজের স্বার্থ রক্ষাটাই প্রত্যেক ইংরেজের জীবনে-মরণে একান্ত প্রার্থনা, ইংরেজ ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের জন্য তুচ্ছবোধে ত্যাগ করে। এই খানেই দেখিতে পাই, রক্তমাংসের মানুষ চারিকোটী ইংরেজ রক্তমাংসের মানুষ তেত্রিশকোটী ভারতবাসী হইতে বড় কেন?

আমরা আত্মকলহে চিরাভ্যস্ত এবং অভ্যস্ত বলিয়াই আজিও বিদেশী কর্ত্তাকে বন্ধু মনে করিয়া ধন্য হইতেছি। বন্ধুর সেই ভালবাসার বাঁধন আজ লৌহ শৃঙ্খলের বন্ধনের চেয়েও গুরুভার বোধ হইতেছে। আমরা জাতীয় মুক্তি বা স্বরাজের জন্য চেষ্টা করিতেছি—কিন্তু চরিত্রের নানা রকম হীনতা বাদ দিলেও পদের গৌরব, নামের গৌরব ও ক্ষমতার গৌরব, এই তিন গৌরবের টানে আমরা এমন জায়গায় উপস্থিত হইব সে-স্থান হইতে আর তাকাইয়া দেখিতে পারিব না, আমাদের উদ্দেশ্য কি ছিল। অনবরত আত্মকলহের ফলে স্বরাজের কথা আর আমাদের মনেও থাকিবে না—তখন দেশ ধর্ম্ম-স্বরাজ সব একাকার। আমাদের কলহ ও বিরোধে ভয়ের কিছুই নাই, আত্মকলহ ও আত্ম বিরোধই ভয়ের বস্তু। প্রত্যেকটী অন্তর স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে সেখানে ভারতজ্ঞান ভারত-প্রেম কতখানি! আমাদের আত্মকলহ দমনের একমাত্র উপায় ভারত-জ্ঞান।

ইংরেজের নিকট হইতে বহিস্কার লাভ করার আগে তাহার চরিত্রটী বুঝা দরকার। ইংরেজের স্বজাতিপ্রেম, বিপদে ধৈর্য্য, ও নির্ভীকতা, কর্ম্মে একাগ্রতা, তেজস্বিতা ও অদম্য সাহসই আমাদের প্রথম শিক্ষনীয় বিষয়। ইংরেজ

চরিত্রের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন অনেকে তাহার ফলে নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়াও দিয়াছেন। কিন্তু এইবার সেই গুলিকে কাজে লাগাইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "যে বীর্য্য, অধ্যবসায় ও স্বজাতির একান্ত সহানুভূতির বলে তাঁহারা এই রাজ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, যে সদা জাগরূক * * * * যতদিন জাতীয় জীবন হইতে এই সকল গুণ লোপ না হয় ততদিন তাঁহাদের সিংহাসন অচল। এই সকল গুণ স্বামিজী আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন, যতদিন তোমাদের চরিত্রের ভিতর এই সব গুণ না আসিবে ততদিন তোমাদিগকে পরবশ থাকিতেই হইবে, কিন্তু তবুও আমাদের চোখ ফোটে না। স্বরাজ চাই, স্বাধীনতা চাই, স্বায়ত্বশাসন চাই, আর যাহাই চাই না কেন, সর্ব্বাগ্রে এই গুণ গুলি আমাদের চাই-ই। এই সব গুণ যে আমাদের নাই তা নয় যথেষ্ট আছে। কিন্তু যাহা জাতির মুক্তিপথে প্রথম পদবিক্ষেপের কালেই নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষ ভাবে তাহা বিকাশ পাওয়া আবশ্যক। সুদীর্ঘপথ অতিক্রম কালে তাহাদের অভাবে আবার মারা না যাইতে হয়। এই মহদ্গুণ গুলি আমাদিগকে একটী একটী করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে হইবে না, যে দিন যে মুহূর্ত্তে ঐ ইংরেজের ইংলণ্ড প্রীতির মত আমার কায় মনোবাক্যে উপলব্ধি হইবে ভারতের স্বার্থই আমার স্বার্থ, পরলোকেও আমি ও ভারত অচ্ছেদ্য, ভারতের মহত্ব আমারই উপরে পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে সেই দিনই এ সকল মহদ্গুণ অনন্ত অজস্রধারায় আমার অন্তর হইতে প্রবাহিত হইবে।

বিলাতী সব জিনিষই 'বয়কট' করিও, কিন্তু বিলাতী মহদ্গুণ গুলি গ্রহণ করিও। ভারতের 'কাঁচামাল' এমন কি সমুদয় ধনরত্নও বিলাতে রপ্তানীর জন্য বোম্বাই 'ডকে' সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই, বিলাতী স্বজাতি প্রীতি বিলাতী তেজস্বিতা, বিলাতী অদম্য সাহস ও কর্ম্ম-নিষ্ঠ আমাদের প্রতি গৃহকোণ যেন ছাইয়া ফেলে। যদি ইংরেজকে জয় করিতে চাই, তাহা হইলে এই ভাবেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, ইংরেজ আপনা হইতেই দেউলিয়া হইয়া পড়িবে। জগৎ উন্নত হইবে-পৃথিবী শান্ত হইবে। এইরূপে আমার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে শক্তি ক্ষয় হইবে না। প্রতি পদবিক্ষেপেই মনে রাখিতে হইবে, ভারতই আমার স্বার্থ আমি ভারতের জন্যই জীবিত, তাহা হইলেই দশদিকের অমঙ্গল কাটিয়া যাইবে, যাত্রার পথে বিভ্রম ঘটিবে না, আত্মকলহ বিদূরিত হইবে।

কোট প্যান্ট, ছুরি কাঁটায় সাহেব হইবার পূর্ব্বে ভারত সত্ত্বায় সত্ত্ববান হইয়া, ভারতের প্রতি খড়কুটাকে সাহেবী গুণের আধার করিয়া তুলিতে পারিলে ইংরেজের এদেশে বাহাদুরী করার আর কিছুই থাকিবে না। তখন আর কিছুই থাকিবে না। তখন আমরা সবাই সাহেব। যে জন্য আমরা ইংরেজ হইতে নিজেকে ছোট ভাবি, সে ভাব তখন দূর হইয়া যাইবে। শারীরিক শক্তিতে একজন ইংরেজ একজন ভারতবাসীর চেয়ে বড় নয়, ইংরেজ বড় তার মনোবলে। সে তাহার শক্তির যতটুকু সন্ধান পাইয়াছে সে তাহাকেই অসীম মনে করিয়া অকুতোভয়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যায় এবং সেই জন্য জয়ীও হয়। আর আমরা, যেখানে শক্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে, সেখান হইতে এত নিম্নে আছি বলিয়া নিজেদের ভাবি, অথবা কথার চোটে শক্তির সীমা ডিঙ্গাইয়া ভগবানের এতটা কাছে চলিয়া যাই যে, ফলে আমারা কি সেই বোধই আমাদের হয় না—সুতরাং কাজও করা হয় না। ইংরেজ এবং ভারতবাসীতে কর্ম্মজগতে এইখানেই প্রভেদ।

বর্ত্তমানে আমরা ফাঁকি দিয়া লোকের কাছে নিজেকে বড় বুঝাইতে চাহিতেছি। বিশ্বপ্রেমে আমরা এখন তন্ময়, ভারতপ্রেম এখনও জন্মে নাই, জন্মিতে দেইও নাই। ভারত প্রেমে অনেক মাল-মসলার দরকার হয়, বিশ্বপ্রেম বিনা পয়সার, মুখের কথায়ই চলে। ইংরেজ শত শত বড় বড় উদারনীতির ধ্বজা উড়াইলেও সে জানে তার বিলাতকে, তাই সে দুনিয়ার রাজা, আর আমরা চাই বিশ্বকে অথচ নিজের বলতে একটা আস্তানা নাই, তাই আমরা পথের কাঙ্গাল—প্রভেদ ত এইখানেই। ও সব ফাঁকা কথায় বোকা, নিকর্ম্মা ভুলিতে পারে কিন্তু কোন, মানুষ ভুলিবে না। যদি Cosmopolitan Club (বিশ্বপ্রেমিক মণ্ডলে) এর মেম্বার হও, তবে সেখানে তোমার রক্তের সঙ্গে স্বর্গ-

ভাবে মিশ্রিত ভারত-সত্বাটুকু লইয়া যাইও। সেখানে ইংরেজ জার্ম্মাণ ফরাসী আমেরিকান সকলেই নিজ নিজ ভাবে পুষ্ট রহিয়াছে কিন্তু তুমি সেখানে তোমার নিজস্ব কি লইয়া উপস্থিত হইবে? তুমি ভারত-সত্বাকে—যাহা তোমার নিজের বিশেষত্ব তাহাকে দূর করিয়া বিশ্বপ্রেমের খোলের ভিতর দুর্ব্বলতাকে পুরিয়া বড় বড় কথা আওড়াইয়া বড় হইবে ভাবিতেছ? তুমি অনাহারে ক্লিষ্ট, তোমার প্রতিবেশী রোগে মৃত্যুশয্যায় শায়িত, রোগীর জন্য রাত্রি জাগরণে তোমার মস্তিষ্ক এখন বিকৃত প্রায়, এখন বিশ্ব-প্রেমের চিন্তা তোমার কাছে একটা পাগলের প্রলাপ বকুনি মাত্র। আগে নিজে সুস্থ হও, অন্যকে সুস্থির কর, তারপর ভাব তুমি কে, তোমার ধর্ম্ম কি, বিশেষ সীমা কোথায়! স্বাভাবিক অবস্থায় ধারাবাহিক চিন্তার দ্বারা বুঝিতে পারিবে, বিশ্বপ্রেমের ভাণ্ডারী তুমিই। আদি-অন্ত শূন্য হইয়া অতীতের ভারত গৌরব ভুলিয়া, ভবিষ্যৎ ভারতের কল্পনা ত্যাগ করিয়া মাঝখানে এমন অসামঞ্জস্য বিশ্বপ্রেমের কথা উত্থাপন করিলে পরিণামে নিজের তহবিলই শূন্য দেখিতে হইবে।

বিশ্বজ্ঞানের গোড়ার কথাই ভারতজ্ঞান। যতদিন ইংরেজ থাকিবে এমন ভারতরাজ্য শত শত লুপ্ত হইলেও, শত শত আবার অর্জ্জিত হইবে।

স্বদেশ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

[৫]

কৃপণের যদি শ্রেণী বিভাগ করা যায় ত' তিনটি মোটা ভাগ দাঁড়ায়। প্রথম নম্বর কৃপণ, সাত্বিক; অন্তরে-বাহিরে আত্মীয়-পরে সকল বিষয়েই সে কৃপণ। সে নিজে খায়-পরে না, পরকেও খাইতে-পরিতে দিতে তাহার যে একটা মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয়—তাহার মধ্যে কোন ভেজাল নাই,—একেবারে খাঁটি। কার্পণ্য তাহার আত্মরক্ষার হাতিয়ারের সামিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃপণ, কৃপণতাকে দোষ বলিয়া মনে করে; কিন্তু কার্পণ্য তাহার এমন মজ্জাগত যে তাহা হইতে মুক্তিলাভ করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। আরম্ভে যে ব্যয়টাকে সে প্রচুর মনে করে, শেষে গিয়া তাহা এমন অনটন ঘটায় যে লজ্জায় তাহার মাথা কাটা যায়। তাই এই শ্রেণীর কৃপণ অর্থকে ভয় করে—কারণ তাহার অভিজ্ঞতা বলিয়া দেয়—অর্থই অনর্থের মূল। তৃতীয় শ্রেণীর কৃপণ, কার্পণ্যকে একটা বাহাদুরির জিনিষ মনে করে; তাহাতে তাহার লজ্জাও নাই, গ্লানিও নাই। নিজের সম্পর্কে সে কৃপণত' নয়ই পরন্তু পরকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা তাহার ভিতর একান্ত এবং অপরিসীম। সে অন্যলোকের দারিদ্র্যকে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের পাপের ফল বলিয়া বিবেচনা করে।

কৈলাসপুরের জমিদার তিনকড়ি রায়কে দেশের সকলেই কৃপণ বলিয়া জানে। তাহাকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করা যায় তাহার বিবেচনার ভার পাঠকগণের উপর ন্যস্ত রহিল। আমরা যথাসাধ্য তাহার সত্য স্বরূপটি বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

অবনীমোহনের পাল্কি যখন তিনকড়ি রায়ের ফটকের সম্মুখে পৌঁছিল তখন তিনকড়ি গোবিন্দজীর পূজা শেষ করিয়া সবে মাত্র প্রজাদের সহিত বৈষয়িক কাজে মন দিবার উপক্রম করিতেছিল। নাকের ডগা হইতে ব্রহ্মতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ; গায়ে একখানা নামাবলী, পরণে কেটের মোটা ধুতি কচিৎ হাঁটু ঢাকা পড়ে; পায়ে খড়ম। তিনকড়ি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—এসো ভাই।

অবনীমোহন প্রতিনমস্কার করিতে ভুলিয়া কতকটা কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তিনকড়ি এবার আগ্রহভরে তাহার হাত ধরিয়া বলিল—চল ভাই, ভিতরে বসবে চল।

মন্ত্রচালিতের মত অবনীমোহন তিনকড়ির পিছনে পিছনে গিয়া ফরাস-বিছানার উপর বসিল।

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—তামাক খাও ত?

অবনীমোহন পকেট হইতে চুরটের কেশটা বাহির করিয়া বলিল —না —চুরুট আছে ;—এই যে।

তিনকড়ি কেস্‌টা হাতে করিয়া বলিল,—থাক্‌গে চুরোট পথে ঘাটে খেও—এখন গড়-গড়ায় তাওয়া সেজে দিক্‌।

অবনীমোহন বলিল, তোমার বাড়ীতে আমি কোন জিনিষই গ্রহণ করবো না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তুমি প্রমাণ করতে পারবে যে তুমি একজন প্রজাপীড়ক অত্যাচারী স্বার্থপর জমিদার নও।

তিনকড়ির মুখ একটি ছোট্ট হাসিতে বিকচ হইয়া উঠিল। সে বলিল—আইনের দাবী কিন্তু অন্যরকম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমাণ না হয় যে আমি অত্যাচারী—প্রজাদের, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে পীড়ন করেছি—ততক্ষণ আমাকে নির্দ্দোষী বলে ধরে নেওয়াই বোধ করি আইনের রীতি।

অবনী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—সে কথা ঠিক কিন্তু সম্প্রতি আমরা আদালতে আইনের সূক্ষ্ম বিচার করিতে বসিনি। দুই বন্ধুতে আমরা একত্র হয়েছি—ঠিক করে নিতে যে, যে-কোন উপায়েই যেন গরীব মারা না হয়।

তিনকড়ির শাদা দাঁতগুলি মুখের একদিক হইতে অপরদিক পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িল—সে বলিল, তবে ত' আর কিছুরই গোল নেই—বন্ধুর কাছে বন্ধুর ছোট হতেও লজ্জা নেই—আর কিছু অন্যেরও থাকতে পারে না। তুমি যা অনুরোধ করবে আমি নিশ্চয় রাখব।

অবনী বলিল, তুমি কি জানতে পেরেছিলে আমি আসবো?

তিনকড়ি বলিল, না—ও কথা আমাকে কেউ বল্লেও বিশ্বাস করতুম না। তোমার পায়ের ধুলোর সৌভাগ্য যে আমাদের ঘটতে পারে এত আমার কল্পনার অতীত।

ঘটে! বলিয়া অবনীমোহন গটকাটা তুলিয়া লইয়া কয়েকটা নিস্ফল টান দিয়া বলিল,—কেন বলত' তিনকড়ি,—এই দুঘর ছোট জমিদার চিরটাকাল লড়াই করে মলো?

তিনকড়ি হাসিতে লাগিল,—আমি মুক্ষু সুক্ষু মানুষ, —ও সব আমার বুদ্ধির বাইরে। তবে এইটুকু বুঝি যে, যে বড় তারই নীচু হওয়া সম্ভব। বাঁশটাই নীচু হয়ে মাটি ছোঁয়; মাটির পক্ষে বাঁশের ডগা পর্য্যন্ত উঁচু হওয়া সম্ভব নয়। আজ তুমি এসেচো—আজকে সব লড়াই শেষ হয়ে গেছে।

অবনীমোহন তিনকড়ির কথাগুলি ধীর ভাবে শুনিয়া মুখখানি আরো গম্ভীর করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার এই কথায় সত্যি বলচি আমি মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি।

তিনকড়ি কি একটা বলিতে যাইতেছিল, অবনী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, আগে আমার কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনেই নেও, তারপর যা কিছু তোমার বল্‌বার থাকে বলো।

অপ্রস্তুতের মত তিনকড়ি অবনীর মুখের দিকে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া রহিল। সে আবার আরম্ভ করিল,—লড়াই শেষ হয়ে গেছে—বল্লেই কি শেষ হয়ে যায় তিনকড়ি? লড়াই মানুষ হাতে পায়ে, বন্দুকে-কামানে করে, কিন্তু বন্দুকে বন্দুকে লড়াইও হয় না—সেই বন্দুকের পিছনে যে প্রবৃত্তি থাকে সেইত লড়াইটা করায়। তুমি কি বল্‌তে চাও যে সেই প্রবৃত্তিটার শেষ হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে!

তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল, কখনো কি তার শেষ হয়!

অবনী বলিল, স্বীকার করচি তার শেষ হয় না ; কিন্তু তাকে সংযত করা যায়। সেটা মনুষ্যত্বের দ্বারা সংযত হয়—

আর সংযত হয় ভয়ে। যেখানে ভয়ে হয় সেখানে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়—সেই ভয়ের কারণটিকে সরিয়ে নিলে প্রবৃত্তি তুমুল হয়ে উঠে।

তিনকড়ি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল—তাইত'—তুমি ভাই মনের ভেতরের কথা কি সুন্দর টেনে বার কর। এই সব বুঝি তোমাদের এম-এ ক্লাসে পড়ান হয়েছিল ?

অবনী এইবার হাসিয়া ফেলিল।

স্পষ্ট না বুঝিলেও তিনকড়ি কতকটা বুঝিল যে সে একটা বেফাঁস কি বলিয়াছে, তাই একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল,—আমি ভাই কিছু জানিনে—মাপ কোরো।

অবনী বলিল, যাক্‌গে সে সব কথা, আমি যা বল্‌তে এসেচি—তাই বলি।

তিনকড়ি তাহার কথায় মন দিল।

অবনীমোহন ভূমিকার সহিত আরম্ভ করিল, দেখ, একটা অতি সহজ কথাই তোমাকে বলব কিন্তু সেটা হয়ত তোমার কাছে একান্ত নতুন বলে' মনে হবে, যে, আমি যেন কি একটা অসম্ভব উল্টো-পাল্‌টা বল্‌চি। কথাটা এই, আমরা জমিদার অর্থাৎ বড় লোক; স্বোপার্জ্জিত ধনে বড়লোক নই। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষের কেউ সৎ কিম্বা অসৎ উপায়ে, দরিদ্রকে বঞ্চিত করে, যে টাকা জমিয়ে গেছেন—আমাদের সম্পূর্ণ অদৃষ্টের জোরে সেটার অধিকার আমাদের হাতে এসে পড়েছে। বুঝছ ? অর্থাৎ যদি এই বংশে না জন্মে অন্য কোন বংশে আমাদের জন্ম হতো ত' আমাদেরও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একমুঠো অন্ন সংগ্রহ করতে হতো। নয়কি ?

তিনকড়ি নীরবে ঘাড় নাড়িল।

অবনী আবার আরম্ভ করিল,—তাই আমার একান্ত অনুরোধ যে—আমরা একথা যেন ভুলে না যাই—যেন কোনদিন গরীব লোকের উপর আমাদের নির্যাতন না গিয়ে পৌঁছয়।

অবনী কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া তিনকড়ি বলিল,—এই কথা কটি বল্‌তে তুমি নিশ্চয়ই এতদূর আসনি।

উত্তরে অবনীমোহন বলিল, না—আরো বল্‌বার আছে; কিন্তু সমস্ত বক্তব্যের সার অর্থই হচ্চে ঐ ক'টি কথা।

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল।

তিনকড়ি ধীরে ধীরে বলিল, তোমার কি মনে হয় আমি কারুর উপর নিগ্রহ করেছি ?—কারুকে তার সত্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি ?

অবনী বলিল, আমাদের গ্রামের কাছে নদীটাকে যে বাঁধা হয়েচে তা' কি তুমি জান ? তা' কি তোমার হুকুমেই হয় নি ?

তিনকড়ি বলিল, হাঁ, আমি দাঁড়িয়ে থেকে তা বাঁধিয়ে এসেচি, জানি বৈকি। ওর অধিকারত আমার আছে।

গম্ভীর গলায় অবনী বলিল—তা থাক্‌তে পারে কিন্তু ওতে কত গরীবের ক্ষতি করা হয়েচে—সে কথা কি তুমি কোন দিন ভেবে দেখেচ ?

উত্তরে তিনকড়ি বলিল,—গরীবের লাভ হবে বলেইত আমি নিজের পয়সা খরচ করে ওটা করিয়ে দিয়েছি।

অবনী বলিল, লাভ ? লাভ অবশ্য তোমার প্রজাদের ; কিন্তু অত সঙ্কীর্ণ হলে চলে কি ?

তিনকড়ি বলিল, আচ্ছা আমি যদি নদী না বাঁধতুম ত' কি দাঁড়াত ? হয় তুমি বাঁধতে—নয়ত জলটা বয়ে চলে যেত। তাতে তোমারও লাভ হতো না—আমারও হতো না। আমি যদি না বেঁধে তোমায় বাঁধতে দিতুম ত' ক্ষতি হতো আমার, লাভ হতো তোমার—অর্থাৎ কিনা তোমার প্রজাদের ; তাতে কি তোমার সঙ্কীর্ণতা হতো না ?

অবনী মোহন চুপ করিয়া রহিল। সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া যাহা ভাবিয়াছিল তাহাও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ।

তিনকড়ি বলিল, এখন তুমি যদি বল যে আমার অধিকার নেই—ত কেমন করে আমি চুপ করে থাকি ! তখনি আইন আদালত—লাঠি সোঁটার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

অবনীমোহন বলিল, যাক্‌গে ও কথা। আমি বুঝতে পেরেছি যে আর আর কোন উপায় নেই। এদিকে কাটলে রাম মরে, ওদিকে কাটলে রাবণ মরে।

তিনকড়ি মৃদু হাস্য করিল।

অবনী বলিল, আচ্ছা ভাই তিনকড়ি, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। তুমি সকলের সঙ্গে আমার চেয়ে বেশী মেশ, তাই তুমিই এর ঠিক উত্তর দিতে পারবে বলে মনে করি।

এই কথাগুলি বলিবার আগে অবনী বুঝিতে পারে নাই যে উচ্চারিত হইবার পর সেগুলি তাহাকে কতখানি লজ্জা দিতে পারে। তাহার মনের মধ্যে ত্বরিতে কয়েকটি প্রশ্ন উঠিয়া পড়িল। তিনকড়ি সকলের সহিত বেশী মিশিতে পারে, তুমি কেন পার না? জন-সাধারণের সহিত মিশিবার সুযোগ তাহার চেয়ে কি তিনকড়ির বেশী? জন-সাধারণের সহিত মেশাটাকে কি তবে সে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে?

তিনকড়ি আগ্রহভরে অবনীর আরক্ত মুখের উপর চক্ষু ফেলিয়া বলিল—কি?

কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করিয়া সে বলিল, তুমি কি মনে কর এবার দুর্ভিক্ষ হবে?

তি। তার ত বড় বাকি দেখচিনে। বৃষ্টি হবে বলে ত মনে হয় না। হলেও আর ষোলআনা ধান হতেই পারে না।

অ। আচ্ছা, এই দুর্ব্বৎসরে আমরা কি প্রজাদের কোন রকম করে সাহায্য করতে পারিনে?

তিনকড়ি অবাক হইয়া বলিল, আমরা,—আমরা? আমরা আর কি করতে পারি? সে ব্যবস্থার ভার ত সরকার বাহাদুর করেই থাকেন।

অ। কি করেন?

তি। কেন, সেবছর দুর্ভিক্ষে এ তল্লাটের সব সড়ক ত পাথর বাঁধিয়ে দেবার কথা ছিল; কিন্তু টাকার অভাবে হয়ে উঠেনি—এবার হয়ত সেই কাজেই আবার হাত দেওয়া হবে।

অবনীমোহন সহসা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ক্রোধভরে বলিল, বাস্, আর ও কথা মুখে উচ্চারণ কোরোনা।

তিনকড়ি বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে ইহাতে এতখানি রাগ করিবার কি আছে!

কেন?

কেন?—অবনী উত্তেজিত হইয়া বলিল, কেন? সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। উঃ কি হৃদয় বিদারক ব্যাপার! হাড়ের উপর চামড়াটা কোনক্রমে লেগে আছে—আর তারা ভীষণ রোদে ভারি হাতুড়ি দিয়ে কিনা পাথর ভাঙচে! এই নির্ম্মমতার জন্যে মানুষ মানুষকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না! যাদের শুশ্রূষার দরকার, যাদের পথ্যের প্রয়োজন—তাদের দিয়ে ঐ কাজ,—আর মজুরি দিলে দু' পয়সা!

তিনকড়ি বিজ্ঞের মত বলিল, তবুওত, সেই বা দিচ্চে কে?

অবনী অধীর হইয়া বলিল,—তার চেয়ে যদি দেশের সমস্ত লোক না খেয়ে মরে যায়—তাও ভাল।

তিনকড়ি শান্ত গম্ভীর হাস্য করিয়া বলিল, এটা তোমার গা-জুরি কথা।

অবনীমোহন আত্ম সংবরণ করিয়া বসিয়া বলিল, তিনকড়ি, এ বছর কিন্তু ভাই এই ভীষণ কাণ্ডটি আর ঘটতে কিছুতেই দেওয়া হবে না। এরি জন্যে আমি তোমার স্মরণ হয়েছি। বন্ধুর মুখরক্ষে তোমার করতেই হবে।

তিনকড়ি কথার কোন উত্তর দিল না। মাথায় হাত দিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে বলিল—দুর্ভিক্ষে আমাদেরও বিপদ কম নয় কিন্তু;—প্রজারা খাজনা একটি পয়সা দিতে পারবে না; কিন্তু সরকার বাহাদুর একটি কানা কড়িও রেহাই দেবেন না।

অবনী বলিল, তাত জানিই হে, কিন্তু আমরা কি মনে করলে দু'-পাঁচ হাজার বার করে দিতে পারিনে?

তিনকড়ি চোখ দুটি ডাগর করিয়া বলিল—বল কি? দু-পাঁচ হাজার! দু পাঁচ শো বার করতেই যে—

অবনী অধীর হইয়া বাধা দিয়া বলিল, নাও, নাও, আর ন্যাকামি করতে হবে না। লাক টাকা তোমার ঘর খুঁড়লে এই মেজের তলা থেকে বেরোয়।

তিনকড়ি ত্রস্ত নেত্রে অবনীমোহনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অবনীমোহন উঠিয়া পড়িয়া বলিল—আচ্ছা আজ এই পর্য্যন্ত থাক। আর একদিন আবার আসবো। সেদিন

কিন্তু এমন বিহ্বল হয়ে পড়লে চলবে না। সেবার একটা উপায় করতেই হবে।

তিনকড়ির উঠিবার সাধ্য পর্য্যন্ত ছিল না। বেহারাদের পাল্কি বওয়ার শব্দ যখন আর শুনা গেল না—তখন সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিল যে ঘামে দেহের হরিনামের ছাপগুলি পর্য্যন্ত মুছিয়া বেমালুম হইয়া গেছে।

[৫]

নীলাম্বর ভট্টাচার্য্য নাকি অল্প বয়সেই মুগ্ধবোধ এবং অমরকোষ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; টোলে প্রবেশ করিয়া তাই অধ্যাপক ও সহতীর্থের কাছে তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি জমিয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার দশা হইল আমাদের কথামালার খরগোশটির মতই। অন্য ছাত্রেরা বহু অগ্রবর্ত্তী থাকায় তাঁহার চেষ্টা আহার এবং নিদ্রাদেবীর সহজ সাধনায় পর্য্যবসিত হইল। গুরুগৃহে বিপুল অন্ন ধ্বংশ করিয়া তাঁহার দেহটি বপু হইল, কালো রংএর উপর বার্ণিশের জেল্লা খুলিল। কিন্তু চিরদিন কিছু কাহারো এমনটি চলিয়াই আসিতে পারে না। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে নীলাম্বর এখন অবনীমোহনের গৃহে পৌরহিত্যের উপলক্ষ্যে নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। সকালে উঠিয়া অবনীমোহনের একমাত্র কন্যা মণিমালিকার অধ্যাপনা চলিত। সাহিত্য পড়াইতে নীলাম্বর নাকি অতিশয় দক্ষ, কিন্তু অঙ্ক-শাস্ত্র তাঁহার কাছে বাঘ এবং ততোধিক দুরুহ হইয়া উঠিতেছিল ইংরাজি। এদিকে কর্ত্রীর বড় ইচ্ছা যে কন্যা ইংরাজিতে পণ্ডিত হইয়া উঠে—যে হেতু তিনি বলিতেন যে আজিকালিকার ছেলেরা ইংরাজি নহিলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। এই লইয়া ক্রমেই একটা সমস্যার মত দাঁড়াইতেছিল।

এদিকে কর্ত্তার ইচ্ছা যে মণি গান গাহিতে শেখে, কিন্তু কে শিখায়!

অতএব পণ্ডিত মহাশয় জানিতেন যে তাঁহার সর্ব্ব সুবিধার খনিস্বরূপ এই রত্নটি তাঁহার ভাগ্য আকাশ হইতে অচিরে খসিয়া একজন মাষ্টারের হাতে যাইবে। সেই কথা মনে করিলেও তাঁহার রাগের উপক্রম হইয়া পড়িত এবং তাহারি তাড়নায় শাস্ত্র সমুদ্র মন্থন করিয়া এই অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন যে জম্বুদ্বীপে চতুর্ভুজের বসতি ছিল—এবং তাহারই বংশধরেরা এখনো সেখানে বাস করে। কিন্তু এই গভীর প্রত্নতত্ব শুনে কে? এক একদিন অবনীমোহনের নিতান্ত কাজ কর্ম্ম না থাকিলে, কাব্য-অধ্যয়ন ব্যপদেশে এই বিষয়ের দীর্ঘ বক্তৃতা শ্রবণ করিতে হইত। বিতণ্ডাও হইত প্রচণ্ড!

সেদিন অবনীমোহন তর্কের জন্য কোনরূপ উৎসাহ না দেখাইলেও পণ্ডিত মহাশয় একটি জটিল তত্ত্ব ক্রমে ক্রমে উপস্থিত করিলেন। তিনি নারীজাতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং শিক্ষা অশিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ মতবাদ প্রকাশ করিয়া বসিলেন, যাহাতে কিছুতেই চুপ করিয়া থাকা চলে না।

নীলাম্বর বলিলেন, যদি শাস্ত্র মান্‌তে হয় ত' কিছুতে স্ত্রীজাতের উপর বিশ্বাস করা চলে না।

অবনী গম্ভীর হইয়া বলিল—কেন?

পণ্ডিত মহাশয় স্ত্রীকুল ও রাজকুলের শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া বলিলন—এই যে শাস্তর—এ একেবারে অভ্রান্ত।

অ। শাস্ত্র মাত্রেই ত আপনার কাছে অভ্রান্ত!

নী। কেন হবে না মশায়, মুনি-ঋষিরা ত' আর যে সে লোক ছিলেন না। তাঁরা এসব যোগ-বুদ্ধিতে জান্‌তে পারতেন।

নিরুত্তরে অবনীমোহন একটু হাস্য করিল।

নী। আপনার এসবে বিশ্বেস নেই ; ইংরিজি পড়লেই মানুষ কেমন একটা তেড়্‌খ্যাঁচ্ মেরে যায়। ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই একেবারে নাস্তিক বনে যায়।

অ। ভক্তি-বিশ্বাস অযথা-নিন্দাকারীদের উপর আস্‌তেই পারে না।

নী। অযথা কি রকম—আমি আপনাকে হাজার হাজার প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।

অ। তা পারবেন না কেন? যাদের শিক্ষা-দীক্ষার কোন খোঁজ খবরই আমরা রাখিনে—যাদের দুনিয়ার বাইরে—পর্দার আড়ালে আটকের মধ্যে ঘেরাও করে রাখি তাদের কাছ থেকে বড় বেশী কি আশা করতে পারি পণ্ডিত মশাই?

বিদ্রূপের কণ্ঠে পণ্ডিত বলিলেন, হুঁ—শিক্ষা দীক্ষা—শত ধৌতেন মলিনত্বং ন জহাতি।

অ। তা হলে কি আপনি বলতে চান্ যে শিক্ষা-দীক্ষার কোন দরকার নেই—কয়লা কয়লাই থাকুক?

নীলাম্বর নস্য লইতে লইতে বলিলেন—হাঁ কতকটা তাই বটে।

উত্তর শুনিয়া অবনীমোহন অবাক হইয়া গেল।

নীলাম্বর বোধকরি মনে মনে খুসী হইলেন। এমন একটা কথা বলিয়াছেন যে এম-এ-পাশ-বাবু একেবারে নির্ব্বাক!

কিছুক্ষণ পরে অবনীমোহন বলিল, পণ্ডিত মশাই, কিন্তু কয়লার খাদেই হীরে পাওয়া যায়।

নীলাম্বর একটা উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য—ও সব শোনা কথা—কিচিরমিচিরদের লোক ভোলানো কথা। এই লোভ দেখিয়ে কত লোককে খাটিয়ে নিচ্চে—উঃ ব্যাটারা কি চালাক্!

নীলাম্বরের বক্র বুদ্ধি দেখিয়া এবারে অবনী মোহন স্তম্ভিত হইল।

পণ্ডিত হর্ষে মৃদু-মৃদু দোল খাইতে লাগিলেন।

অবনী মোহন বলিল, পণ্ডিত মশাই, মানুষের যে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন, তা কি আপনি মানেন?

মাথা নাড়িয়া নীলাম্বর বলিলেন—খুব মানি, পণ্ডিতি করে খাচ্চি আর এ-কথাটা মানিনে!

অ। স্ত্রীলোক কি মানুষ নয়?—এই মানুষ হিসেবে তাদের কি শিক্ষার দরকার নেই।

নী। তরকারিতে নুন দেন—তাই বলে কি দুধে নুন দেবেন?

তর্কের অসঙ্গতির বহর দেখিয়া অবনীমোহন নিরস্ত হইয়া গেল। কিন্তু মনে মনে যাহা এতদিন কল্পনার মত একটা ছায়ার আকারে ছিল আজ তাহা দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হইয়া গেল।

এই সময়ে ভিতর হইতে ডাক আসিল। কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া ভিতরে গিয়া অবনীমোহন আনন্দময়ীকে ডাকিয়া বলিল—দেখ তোমাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি।

আনন্দময়ী মনে মনে খুসী হইয়া উঠিল—হঠাৎ একি সৌভাগ্যের উদয় তাহার ভাগ্যে ঘটিল! পরামর্শ শুনিবার আগ্রহ তাহার চোখে-মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

অবনীমোহন ভূমিকা না করিয়াই বলিল দেখ আমি আর ঐ নীলাম্বরকে দিয়ে মণিকে পড়াব না, লোকটা এত সংকীর্ণ!

আনন্দময়ী মৃদু হাস্য করিল। সে দিন যে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত একটা ঘোর তর্ক হইয়াছে তাহা তাহার বুঝিতে কিছুমাত্র দেরী হইল না।

আনন্দময়ী বলিল, তা' উনি ইংরিজী-টিংরিজি জানেন না মোটা-মুটি কাজ চালাতে পারেন। সে'ত আমি অনেক দিনই জানি।

অবনীমোহন একটু রাগ করিয়া বলিল—তা আমিও জান্‌তুম গো,—কিন্তু ও কেবল মুখ্খু নয়—একটা গো-মুখ্খু অতি হতভাগা—

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, থাক্ থাক্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষকে আর আকথা কুকথা বলে কাজ নেই।

অবনীমোহন বলিল—ওটা গরু, পণ্ডিত না হাতি। আনন্দময়ী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। বলিল, আচ্ছা হয়েচে খাবে চল।

খাইতে খাইতে দুই জনের গভীর পরামর্শ চলিল। প্রথমে ইংরাজি শিক্ষার কথা তাহার পর গান। এই দুই কাজই নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে—এমন একটা সহজ উপায় এত হাতের কাছে থাকিতেও তাহাদের এতদিন মনে হয় নাই ভাবিয়া দুই জনেই অবাক হইয়া গেল।

অবনীমোহন বলিল—তাহলে কাল সকালেই চিঠি লিখে দেবে?

উত্তরে আনন্দময়ী বলিল—তুমি ঠিকানা লিখে দিও।
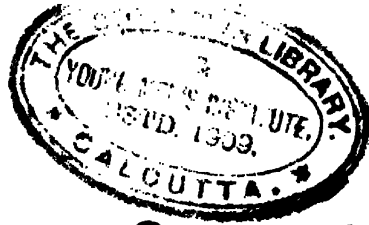
জীবন ও সাহিত্য

[শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়]

বিশ্বপ্রবাহের দিকে চাহিয়া অবাক্ বিস্ময়ে মুগ্ধ হইলাম। যে দিকে চাহিলাম, দেখিলাম এক বিরাট অন্ধ আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের অদ্ভুত লীলা; অনুপরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া কত সৌরজগৎ, কত গ্রহ নক্ষত্র দেখিলাম; দেখিলাম, এক বিপুল চাঞ্চল্যের স্পন্দনে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি স্পন্দিত হইতেছে। একটা অকারণ পরিবর্ত্তন যেন জগৎটাকে লইয়া ভাঙ্গা গড়ার অনন্ত খেলা জুড়িয়া দিয়াছে। তাহার ভাঙ্গাও যেমন উদ্দেশ্যহীন, গড়াও তেমনি; কে যে ইহার নিয়ামক, কোন্ উদ্দেশ্যে যে ইহা প্রবর্ত্তিত, তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিপর্য্যস্ত হইতে ছিলাম—

তার পর আবার চাহিয়া দেখিলাম—জড়জগৎ লইয়া অন্ধ শক্তির এ একটা উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, সর্ব্বত্রই যেন একটা প্রাণের স্ফুরণের আভাস পাইলাম। যেখানে শুধু জড় নিয়মের প্রতিষ্ঠা দেখিতে ছিলাম, সেখানেও দেখিলাম প্রাণ মৃদু মৃদু কাঁপিতেছে তার পর আরও ভালকরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, প্রাণময় জগতের এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চারিদিকে ফুটিয়া উঠিল। কত কোটি বৎসর ধরিয়া কত স্তর ভেদ করিয়া চেতনার কত না স্তরে স্তরে ধাপে ধাপে উঠিয়া আসা দেখিতে লাগিলাম। আজ তাই জড় চেতনের ভেদ আর থাকে না, সর্ব্বত্র একই অণুপ্রবিষ্ট প্রাণের বিকাশ চেষ্টা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যে প্রাণ ক্ষুদ্রতম পরমাণুর মধ্যে গতি-চাঞ্চল্য আনিয়াছে, সেই প্রাণই আবার মানুষের মধ্যে কত না চিন্তায়, কত না ছন্দে ও ভঙ্গীতে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। আজ তাই এই প্রাণের ধারাটিকে ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে বসিয়াছি।

আজ বুঝিতেছি কত অনন্ত কালের বিপুল ধৈর্য্য ও প্রতীক্ষার পথ বাহিয়া প্রাণ চেতনার পথে কত ধীরে কত শঙ্কিত গতিতে কত আঁক বাঁক বাহিয়া শুধুই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। আসিতে আসিতে সেই বিশ্বগত প্রাণ চেতনা যেন মানুষের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কেন্দ্রীভূত ও সংহত হইয়া সচেতন হইয়া, আপনার দিকে চাহিয়া দেখিতে পারিয়াছে। কত যুগযুগান্ত সাধনার ফলে যেন আমি রূপ একটি চেতনা কেন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বপ্রাণ মানবের মধ্যে চেতনা ঘনরূপ ধরিয়া আপনার ধর্ম্মের সহিত, প্রয়োজনের সহিত, মর্ম্মের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু তা বলিয়া একথা বলিতেছি না, যে মানুষের রূপ ধরিয়াই একদিনেই বিশ্বপ্রাণ আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে। যুগযুগান্ত যে প্রাণ মানবেতর সৃষ্টির মধ্যে ভ্রূণরূপে পরিণত হইতেছিল, তাহা আদি মানবের মধ্যে নিতান্তই শিশুরূপে আকাশের আলোক বাতাসের সহিত পরিচিত হইতে বসিল মাত্র। তাহার মধ্যেও ভাষা ভাল করিয়া ফুটে নাই; তবে একটা অস্ফুট ক্রন্দন দিনরাত এই সম্ভাবনাটিকে আনন্দের সহিত প্রচার করিতে লাগিল যে প্রাণ শিশু কথা কহিবে, সে যে এতকাল চুপ করিয়াছিল তাহা বাক্‌শক্তি হীনতার চিহ্ন নয়। যে কথা তাহার বলার সে লক্ষ্য তাহার চলার, তাহাকে দু'হাত বাড়াইয়া সে শুধু ধরি ধরি করিতেছে কিন্তু ধরিতে পারিতেছে না। মানুষের এই প্রথম জীবনাবস্থা তাই একটা দ্বন্দ্ব—যুগযুগান্ত অভ্যস্ত মূঢ় মূক চেতনার সহিত আত্মচেতনা স্ফূর্ত্তির (Self-consciousnessএর) আত্মবোধের এ একটা বিপুল সংগ্রাম। প্রতি শিশুকে এই সংগ্রামজয় করিয়া তবে ভাষার দুর্গটি অধিকার করিতে হয়।

সংগ্রামের সময় সংগ্রামের উপায়টাই যেমন প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া প্রতীত হয় বিশ্বমানবেরও প্রথম

অবস্থায় তাহার উপায়টাই উদ্দেশ্যের স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তখন কয়লা আর জল আর আগুণ সংগ্রহ করাটাই তাহার জীবনের প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়; আর তা ছাড়া যে কোনও প্রয়োজন আছে তাহা যেন মনেই হয় না, তখন শুধুই মনে হয় বাঁচিয়া থাকাটাই হইতেছে সব চেয়ে সেরা প্রয়োজন, ইহার বাড়া আর কোন প্রয়োজন নাই, থাকিতে পারে না।

যতদিন পশু-জীবনের মূঢ় চেতনার সহিত মানবের আত্ম-চেতনায় এই বিরোধ চলিতে থাকে, যতদিন এই আবরণ কাটাইয়া সে উঠিতে না পারে, ততদিন ইহাই মনে হয় বটে যে বাঁচিয়া-থাকাটা শুধু আহার অন্বেষণে ও গ্রহণেই সার্থক আর অন্য কোথাও বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা নাই। এই আবরণ কিন্তু কাটিয়া যায়—যে মর্ম্মান্তিক সন্ধানের টানে প্রাণ লক্ষ কোটি বৎসরের ভূস্তর ভেদ করিয়া আসিয়াছে সেই প্রয়োজনই তাহাকে আত্মচেতনার মধ্যে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করে এবং তখন প্রাণের কি যে সত্যকার লক্ষ্য তাহাও দৃষ্টিতে আসিয়া পড়িতে থাকে।

বলিয়াছি যে প্রাণেরই মূর্ত্তরূপ এই মানুষের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই যাহা মানুষের বাস্তবিক প্রয়োজন তাহাই বিশ্বপ্রাণেরও লক্ষ্য। এই জন্যই বুঝিবার চেষ্টা করিব যে এই মানব জীবনের গতি কোনদিকে এবং তাহার প্রয়োজন কিসে।

কিন্তু মানুষের প্রয়োজন কি বুঝিতে হইলে মানুষ কি তাহাও ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। প্রথম অস্ফুট হইলেও দেখিয়াছি যে জীবন মাত্রই একটা চেতন গতি—চেতনার অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি। বিজ্ঞান বলে গতি মাত্রই একটা বাধাকে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া। আকাশে যদি বায়ুস্তর না থাকিত, পাখীর আকাশ-গতি চিরতরেই বন্ধ হইয়া যাইত; পায়ের নীচে যদি মাটির বাধা না থাকিত মানুষকে গাছেরই মত স্থাবর হইয়া থাকিতে হইত। অনুভবের দিক দিয়াও দেখা যায় যে এই জীবন একটা বাধা পরম্পরার অতিক্রমন মাত্র তবে ইহা চেতনারই পরিণতি,- জড়জগতের গতি হইতে জীবন গতির ইহাই ভেদ। এই জন্যই জীবন একটা বদ্ধতার অনুভব এবং ওই বদ্ধতাকে ছাড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা। প্রতি মানবের মধ্যে জীবনের এই রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

কিন্তু ইহা হইতেই তথাকথিত প্রত্যক্ষবাদী ভুল করিয়া বলিয়া বসিতে পারেন যে সুতরাং জীবন মানেই হইল বদ্ধতা একটা সীমাবদ্ধ চেতনা। বাস্তবিক কিন্তু জীবন তাহা নয়। জীবন বদ্ধতাকে ছাড়াইয়া জয় করিয়া যাওয়ার চেষ্টা—ইহা হইতেই বলা যাইতে পারে যে জীবন হইতেছে স্বচ্ছন্দগতির মধ্যে, ইহার পরিণতি হইতেছে, ভূমার মধ্যে বন্ধনহীনতার মধ্যে—বন্ধনে নয়, জড়তায় নয়। সেই জন্য মানব প্রাণের অনন্তকালের কান্না এই বলিয়া—ভূমৈব তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।

জীবনের পরিণতি যখন দেখা যাইতেছে বন্ধন মুক্তির মধ্যে তখন দেখা চাই এই বন্ধন কোথায়।—মানব জীবনের সীমা বোধের বেদনা কোথায় জাগিতেছে, কোন্‌দিক দিয়া মানব প্রাণ আপনার পথ কাটিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে? দেখিতে পাই তিনটী দিক হইতে এই বন্ধন সয়তান মানবপ্রাণকে স্বচ্ছন্দতাহীন করিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই তিনটী হইতেছে অজ্ঞানের বন্ধন, অশক্তির বন্ধন ও অনুভব সঙ্কীর্ণতার বন্ধন। মানুষ চায় জ্ঞানের সর্ব্বভেদী দৃষ্টি, ইচ্ছার সর্ব্বজয়ী শক্তি (অর্থাৎ কর্ম্মে আত্মপ্রতিষ্ঠা) আর অনুভবের সর্ব্ববোধ বা বিশ্বযোগ। মানুষ হইতেছে

............a principle of restlessness
Which would be all, have, see, know
taste, feel all—
This is myself *Pauline*

কিন্তু অজ্ঞান তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে, অশক্তি তাহাকে খঞ্জ করিয়া ফেলে অনুভবের অভাবে সে বদ্ধ বিযুক্ত হইয়া জীবনের দিন গুলি মলিন বিষন্ন অতৃপ্তি লইয়া কাটাইতে থাকে। কিন্তু তবুও এ অবস্থা চিরকালের ও চিরদিনের নয়।

মানবের মধ্যে এই যে অজ্ঞানের অবস্থা ইহা যদি প্রস্তরের অ-জ্ঞান বা জ্ঞানের অত্যন্তাভাব হইত তাহা হইলে চিরকাল মানবকে এই তমসাচ্ছন্ন হইয়াই থাকিতে হইত।

তাহার অজ্ঞানের নাম জ্ঞানাভাব কিছুতেই নয়, উহা হইতেছে অস্পষ্ট জ্ঞান, এই অস্পষ্ট জ্ঞান আমাদিগকে পীড়া দেয়, চিন্তার ধারার সঙ্গে আমাদের অনুভবগত সত্যের গরমিল থাকে বলিয়া প্রাণ কিছুতেই শান্ত হইতে চায় না। কোন একটি বৃহত্তর সত্য যেন তাহার মনীষাকে উজ্জল করিয়া লইয়া তাহার সহিত সত্যকার যোগ স্থাপন করিয়া তাহাকে মুক্তি দেয় না, সেই জন্যই সে কেবলি অশান্ত হইয়া জীবন কাটাইতে থাকে, কেবলি বিরোধের ক্লান্তি জমিয়া উঠিয়া তাহার চিত্তের উপর একটা বদ্ধতা ও মুক্তিহীনতা চাপাইয়া দেয়। কিন্তু যতই এই অস্পষ্টতা কাটিতে থাকে ততই এই ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে যেন আমাদের সহিত বাহিরের অনন্ত সত্যের কোথায় একটা পরম আত্মীয়তা রহিয়াছে; ভূমার সহিত আমাদের যেন সত্যকার বিরোধ কোথাও নাই। জ্ঞান (philosophical knowledge) আমাদিগকে এই অসীমতার ইঙ্গিত দিয়াই নিরস্ত হয়। সে শুধু একটা দিক নির্দ্দেশ করে কিন্তু লক্ষ্যের এতটুকু সত্যকার আভাস সে আমাদিগকে দিতে পারে না। জ্ঞান চিনি সম্বন্ধে আমাদিগকে এতটুকুই শুধু বলিতে পারে যাহা দ্বারা ভবিষ্যতে চিনির আস্বাদন হইলে, তাহাই যে চিনি এতটুকু বলিতে পারা যায়। কিন্তু চিনির প্রকৃত স্বাদের আভাস এই জ্ঞান কখনও দিতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে এখানে জ্ঞান বলিতে আমরা মনন দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানই বলিতেছি।

কর্ম্মের মধ্যে আবার আমাদের জীবনের ইচ্ছার দ্বন্দ্বটি দেখিতে পাই। কর্ম্মের লক্ষ্য কোনও বিশেষ ফল প্রাপ্তি কি না ততটা বিচার না করিলেও ইহা বলা যাইতে পারে যে কর্ম্মের মধ্যে আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে অনুভব করিবার চেষ্টা করি। যেখানে আমাদের কর্ম্ম যত অপ্রতিহত সেখানে আমাদের কর্ম্ম তত সার্থক। সে কর্ম্মে এতটুকুও অশক্তিও আমার কাটিয়া যায় বা কাটিতে পারে তাহাই আমার কর্ম্ম আর যাহা কিছু সবই অকর্ম—বালকের পাহাড় টানাটানির মত শূন্য।

কর্ম্ম করিতে গিয়া, জ্ঞানতঃ হোক, অজ্ঞানতঃ হোক আমরা একটা বহিঃ শক্তিকে স্বীকার করিয়া লই তখন এই কথাটিই মনে হয় যে সেই শক্তি আমার শক্তি হইতে ক্ষুদ্র কিংবা আমার সহায়। বহিঃশক্তি যে মানবের সীমাবদ্ধ শক্তি ইহাতে বিপুলতর তাহা বেশী তর্ক করিয়া কর্ম্মিকে বুঝাইতে হয়না। একদিন না একদিন এ কথা বুঝিতেই হয় যে মানবীয় শক্তি সেই বিরাট শক্তির অনুগত হইয়া চলিয়াই স্বয়ং বিরাট ও বিপুল হইয়া দাঁড়ায়। এখানেও দেখিতেছি যে ইচ্ছার দিক দিয়াও মানব সার্থক হয় সেদিন যেদিন সে আপনার ইচ্ছার সহিত, তাহাকে ঘিরিয়া যে অনন্ত ইচ্ছার লীলা চলিতেছে তাহার আত্মীয়তা স্থাপন বা অনুভব করিতে পারে।

জ্ঞান যাহার ইঙ্গিত করে, কর্ম্ম যাহার সহিত আত্মীয়তা করিতে আমাকে বাধ্য করে সেই ভূমার সহিত যদি একান্ত একাত্মকতা সত্য ও সম্ভব না হইত তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইই ব্যর্থ হইয়া যাইত। কারণ আত্মীয়তা পাতাইয়া যতই সুবিধা ও শক্তি আমার লাভ হোক্ না কেন, সে যদি নিতান্তই পর হয়, তাহা হইলে এই আত্মীয়তা শুধু আপনারই ক্ষুদ্রতার একটা নিদর্শন হইত এবং এই আত্মীয়তার কবচ গলায় ঝুলাইয়া বাঁচিয়া থাকা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। প্রয়োজনের খাতিরে এই আত্মীয়তা যে কত বড় অভিশাপ তাহা যাহার চোখ আছে,সেই বুঝিতে পারে। বাহিরের এই যে বিচিত্র সত্তা, আমার জ্ঞানকে, আমার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া আপনার অনুরূপ মহিমায় বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা যে আমারই আত্মার চরম প্রকাশ, তাহা যে সত্যই আমার অন্তরতম আত্মীয় সে কথা কর্ম্মজীবন প্রমাণ করে না, জ্ঞান তাহা প্রত্যক্ষ করায় না অথচ এ জীবনও ত এই সত্তার চাপে আজও দুর্ব্বহ অভিশাপ হইয়া উঠে নাই।

তাহার কারণ আর একটু দূরে, অন্তরের আরও নিকটে সন্ধান করিতে হইবে। মানবের অনুভূতি আসিয়া তাহাকে এই পরম প্রার্থিত সত্যটিকে দেখাইয়া দিয়া অজেয় আনন্দের উচ্ছ্বাস বলিয়া উঠে—

তত্ত্বমসি

যাহা ভূমা, যাহা অসীম উদার, তাহা যে এই অজ্ঞানমুগ্ধ বিচ্ছিন্ন আমিরই সত্য স্বরূপ অনুভূতি আসিয়া তাহাই

ঘুচাইয়া দেয় এবং তাহার সহিত পরিপূর্ণ মিলন ঘটাইয়া আত্মার এই যে আনন্দময় রসরূপ তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়।

অনুভবের প্রকৃতি বিচার করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যাহা আমরা অনুভব করি তাহা আমাদের চেতনার নিকট প্রত্যক্ষ—তাহা রূপবিশিষ্ট। কিন্তু এই রূপ সাক্ষাৎকারের মধ্যে একটি বিশেষত্ব আছে। অনুভবের প্রধান লক্ষণই হইতেছে অহং বিস্মৃতি, আমি-বোধের অপসারণ বা বিনয়। যে আমিত্বের সীমাবদ্ধ গণ্ডীটুকু টানিয়া লইয়া মানব বিচ্ছিন্ন হইয়া, সহস্র বিরোধের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অনুভবের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অহং-সীমাটি লুপ্ত হইয়া যায়, অথচ অহং লোপের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চেতনার লোপ হইয়া জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটে না। যদি তাহা হইত, অনুভবের after-effect বা "রেশ" টুকু স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত থাকা সম্ভব হইত না! ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে অহং লোপের সঙ্গে মানব আপনাকে হারায় না, আপনাকে এতটা বিস্তৃত বলিয়া দেখিতে পায় যাহাতে জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের আমি-তুমির সমস্ত বিরোধ কাটিয়া যায়। এই জন্যই এই অহংলোপের অপর নাম তন্ময়তা। সুতরাং বলিতে পারা যায় অনুভব-তন্ময়তা আমাদিগকে বদ্ধতা হইতে মুক্ত করে সীমার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দেয়। মানবাত্মা অসীমের সহিত আপনার তাদাত্ম্যতা বা তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বস্তু-সাক্ষাৎকার বলিতে হয় বল, ভাব বলিতে হয় বল—অনন্তের, ভূমার এই যে আনন্দময় অবাধ প্রকাশময় স্বরূপ আমি-বোধ পর্য্যন্ত যাহাকে ব্যাহত ও খণ্ডিত করিতে পারে না, ইহাই মানব প্রাণের চরম লক্ষ্য। এই ভাব বস্তুটি একটি অখণ্ড সত্তা। এই ভাবের অবস্থায় আমিও থাকে না এইজন্য অনুভূতি বলা চলে না অনুভূতি অনুভব কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে। ভাবের অপার আনন্দময় সত্তায় অভিষিক্ত হইয়া যখন আমি জাগ্রত হয় তখন আমির যে অনুভূতি হইয়া থাকে তাহাকেই রস নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ ভাব রস কিন্তু একই। ভাব অনুভবের লক্ষ্যভূত বস্তু। ভাবেরই প্রকাশ রসানুভবে এবং রসানুভবেরই চরম পরিণতি ভাবে, ভাব ও রসের পরস্পর সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য।

মানব প্রাণে এই অনুভব, এই রসবোধ হঠাৎ আকাশ হইতে অশরীরি হইয়া নামিয়া আসে না। আলম্বন বিনা প্রাণে ভাবের উদ্বোধন হয় না, রসরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না। বাৎসল্য ভাবটি বস্তুতঃ অসীম রস-স্বরূপ হইয়াও একটি শিশুকে আশ্রয় করিয়াই ফুটিয়া উঠে; তেমনি সর্ব্বত্রই আলম্বন লইয়া রসের প্রকাশ হইয়া থাকে; সীমার নিবিড় সঙ্গ না পাইলে, বিশেষ না হইলে অসীম বিশ্ববস্তু যেন পুরা পুরি প্রকাশই হয় না।

দুইটি বিশেষ আলম্বন লইয়া এই ভূমার আনন্দরূপ প্রকট হইয়া থাকে। কখনও তাহা বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্যে গন্ধে ও গানে কখনও মানবের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ মান অভিমানে, আশা নিরাশায় বেদনায় বিশাল হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া দেখা দিয়াছে। এইরূপ যে দেখিয়াছে সে-ই আপনার অনুভূতির মধ্যে অন্তরের নিবিড় মুক্তি পাইয়া ধন্য হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই অনুভূতির স্বধর্ম্মই হইতেছে তন্ময় করিয়া ফেলা। এই তন্ময়তা আসে বলিয়াই অনুভূতির মধ্যে রসরূপ প্রকট হইতে পারে। অনুভব মাত্র একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য! যখনই কাহারও মধ্যে রস প্রকট হইয়া পড়ে তখনই তাহা কোন না কোনো medium মিডিয়ম লইয়া, বাহ্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। রসরূপের ধর্ম্মই এই প্রকাশ হওয়ায়—এবং এই রসরূপটিকেই চলিত ভাষায় আর্ট বা শিল্প নাম দেওয়া হইয়া থাকে।

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অসীমের আত্মপ্রকাশই বলি আর মানবের মধ্যে তাহার রসময় আত্মদর্শনই বলি, উহা যখন ব্যক্তির মনকে মুগ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে সেই ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, শিল্পী যখন অনুভবের প্রবল আবেগে জীবনের পরম কেন্দ্রস্থানে উপনীত হন, তখন উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া যেমন ভাস্বর জ্যোতি আসিয়া পতিত হয় তেমনি ভাব ও শিল্পীর বিশেষ "মিডিয়মের" মধ্য দিয়া অনুভবের প্রাণময় স্পন্দনে ছন্দিত হইয়া অপূর্ব্ব রসরূপে চেতনাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া তোলে—তখনই শিল্প সৃষ্টি হয়।

শব্দে, বর্ণে, সুরে, বস্তুসংস্থান, গতিবৈচিত্র্যে কত 'মিডিয়মের' মধ্য দিয়াই না এই শিল্পরূপ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। ব্যক্তিগত সংস্কার ও সাধনার উপর এই মিডিয়মের কথা নির্ভর করে। যাহাই হোক প্রত্যেকের মধ্যেই প্রাণের ভঙ্গী তাহার অসীমতা ও রসাবেগ প্রকাশ না পাইলে তাহা কখনও শিল্প হইতেই পারে না। তাহার মাঝে যখন অসীমের ব্যঞ্জনা কিম্বা স্ফূর্ত্তি Suggstion or revelation] হয় তখনই যে শিল্প গঠিত হয় তাহাকে সাহিত্য নামে বিশেষিত করা হইয়া থাকে।

এইখানেই সাহিত্যের সহিত জীবনের যোগ বলিয়া আমার মনে হয়। *

"নিদ্রিত নারায়ণ"

(আলোচনা)

[শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দোপাধ্যায়]

"নিদ্রিত নারায়ণ" পুস্তকখানিকে ঠিক নাটক বলা চলে না। কার্য্যপরম্পরার যে দ্রুত তাল তাহা ইহাতে নাই। কথোপকথনের ভিতর দিয়া চরিত্র অঙ্কনের রীতিও ইহাতে প্রকাশ পায়না। মানুষের হৃদয়ের উপর তাগিদ দিবার নিমিত্ত যে দুঃখের প্রতিমূর্ত্তি আমাদের গরীব গৃহস্থের গৃহে এবং সহরের বস্তিতে মানুষকে নিরন্তর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহারই স্বরূপ এই নাটকে চিত্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার দেশের দারিদ্রতার সহিত সুপরিচিত। এ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান তাঁর যথেষ্ট আছে। সেই কারণে এই নাটক খানি আমাদের মনের উপর অনেক খানি দাগ বুলাইয়া যায়। অবশ্য আমাদের তৃপ্তি এ অতৃপ্তির কারণ দুইই আমারা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে চাই। কারণ তা'না হ'লে কোন নাটকেরই মানব প্রাণের সহিত সংযোগটুকু পরিপূর্ণরূপে ব্যক্ত হ'তে পারে না।

প্রথম দৃশ্যে নাট্যকার slumlife দেখাইয়াছেন। এ চিত্র আমাদের দেশে একেবারেই নূতন। পল্লী সভ্যতার পরাকাষ্ঠা যে দেশে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে সেখানে ইহার কল্পনাও কেহ করিতে পারিত না। তবে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষ বিলাতী সভ্যতার অনুবর্ত্তী হইতে গিয়া অপরিসীম দুঃখের ভাগী হইল। বিলাতী অনুকরণে শিল্প এবং বাণিজ্য প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে হইলে বিলাতের মত শ্রমজীবিদিগের পঙ্কিল জীবন এ দেশে আমদানি হওয়া অনিবার্য্য। সেই জন্য ভারতবর্ষের বর্ত্তমান যুগের নূতন সমস্যাগুলি সমাধান করিবার জন্য গ্রন্থকার শিক্ষার্থীর নয়ন দিয়া শ্রমজীবিদিগের বস্তির দৃশ্য দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

সেখানে উনানে আগুন পড়ে না। যায়গার টানাটনি। একদিকে নর্দ্দমার পচা গন্ধ অন্যদিকে যুবক ও বালকদিগের চেহারায় পাপাচারের কালিমা সেইখানে নাটকের প্রারম্ভ। নেপথ্য হইতে দুইটি কঙ্কালসার স্ত্রীলোক তাহাদিগের দুঃখের কাহিনী শুনাইয়া গেল। দারু এবং দরিদ্রতা পুরুষকে নিস্পন্দ করিয়া দিয়াছে। প্রলোভন এবং পেটের দায় স্ত্রীলোকের সরম পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে। আছে কি? বলিতে বাধে—নিষ্ঠুর সমাজ এবং নিদ্রিত নারায়ণ। মাষ্টার মহাশয়ের কথায় "সে ও ক্রমাগত তার চারিদিকে দেখছে, যে মানুষ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটে, তারপর বাড়ী এসে খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি গালাগালি করে, তারপর শুঁড়ি বাড়ী ঢুকে মদ খায়, তারপর বেশ্যা বাড়ী গিয়ে রোগ নিয়ে ফিরে আসে, তারপর হাসপাতালে গিয়ে মরে। এর ভিতর থেকে, এমন ব্যবস্থার মধ্যে বাবুলাল ছাড়া আর কি রকম মানুষ আশা কর?"

অথচ এই শ্রমজীবিদিগের অবস্থাই দেশের প্রকৃত উন্নতির পরিচারক। তাহাদের কষ্টের জন্য শুধু কি তাহারাই দায়ী? দায়ীত্বের বোঝাও তাহাদের স্কন্দে

* ২৮শে মাঘ কানপুর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

চাপাইয়া দিয়া দেশ কি নীরব থাকিবে? "এদের ভিতর যে দুঃখময় ভগবান্ আপনার হীনতায় নিরন্তর কাঁদছেন তাঁর জন্য ও ব্যক্তিগতভাবে এদের প্রতি "আমাদের শ্রদ্ধা জেগে উঠ্‌বে না কি?

লেখক স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, ব্যক্তিগত ভাবে শ্রমজীবিরা নৈতিক শক্তির অভাবে পরিশ্রান্ত হইয়া পাপাচারের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকে; তারপরে অভ্যাস-রাক্ষুসী তাহাদের তাড়না করিবার ভার লয়। সেই জন্য সমাজের পক্ষ হইতে যদি অশিক্ষিত দুর্ব্বল প্রকৃতির শ্রমজীবিদিগের জন্য যথার্থ সহানুভূতি, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ এবং আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে দেশের এবং দশের জন্য যাহারা কায়িক পরিশ্রম করিয়া প্রাণপাত করিতেছে তাহাদের যথার্থ মূল্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিশোধ হইত। কিন্তু শুনিবে কে? নারায়ণ নিদ্রিত। লেখক ভরসা দিয়াছেন, "তাঁকে জাগিয়ে তুলবে সমাজের উদারতর স্নেহকরুণ শিক্ষা।' অতএব বস্তি ছাড়িয়া যেখানে শিক্ষার রশ্মিজাল বিস্তৃত হইতেছে এইরূপ গৃহস্থের প্রাঙ্গনে যাইবার প্রয়োজন। দেখা যাক্ সেখানে কোন আশা আছে কিনা।

সকলেই জানেন, সেখানেও শান্তি নাই। বাঙ্গালী আজও নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখে নাই। দাসত্বের শৃঙ্খল আষ্টে পৃষ্টে বাঁধিয়া কে কবে সোয়াস্তি পেয়েছে? "আর দিন চলবে না; গয়না পত্র সব ত গেল এখন আর বিক্রী করবার কিছু নেই। খাট্‌তে রাজি আছি, যে কোনও চাকুরী, জুতো ঝাঁটা সব সইব, তবুও খাট্‌তে পাব না, চাকুরী জুটবে না। সংসারে সুখ নেই।" ইহাই কি গৃহস্থ বাঙ্গালীর জীবনের চরম সত্য নহে? নাট্যকারের ভাষায় বলি। "ভাই স্কুল থেকে ফিরে এসে একখানা রুটিও পাবে না। আর একজন কাপড়ের অভাবে কাঁথাটা জড়িয়ে বিছানায় বসে থাক্‌বে। অথচ আর একটী গুনধর ভাই মদ্যপানে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়াও তৃপ্ত নহে। বিধবা করুণাদিদি ভাই বোনেদের সকল উৎপাত সহ্য করিয়া নিরন্তর ভাবিতেছে, "ভগবানই অসহায়ের সহায়, এ সব আর জন্মের ধার শোধ।"

এইখানে পুস্তকখানি একবার বন্ধ করিয়া ভাবিতে ইচ্ছা করে। সত্যই কি ভগবান অসহায়ের সহায়? এ সমস্তই কি আর জন্মের ধার শোধ? ভারতবর্ষ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সুখ দুঃখ এমন কি স্বাধীনতা পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে তাঁর শরণাপন্ন হইয়াছি। তবুত তিনি সহায় হলেন না। আর্য্য সন্তান আজও দরিদ্রতায় ও লাঞ্ছনায় নিপীড়িত। অথচ মা আমাদের গরীব ঘরের মেয়ে ন'ন। আর জন্মের এমন কি পাপ আছে যাহার জন্য যুগ যুগ ধরে মায়ের সন্তান মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত রয়েছে?

ভারতবর্ষের চিরন্তন জ্ঞান আমাদের মুখ চাপা দিয়া বলিয়া উঠে "এ সমস্তই অলীক, ক্ষন স্থায়ী, এ'র জন্যে এত ভাবনা কেন?" আমাদের সন্দেহ হয়, নাট্যকারও হয়ত এই মতে সায় দিবেন। তা'না হলে তিনি নারায়ণকে নিদ্রিত রেখে সমগ্র জাগতিক দুঃখের চিত্রকে স্বপ্নের ভিতর দিয়া দেখাইতে চা'ন কেন? কাল বৈশাখী ঝড় এবং বৃষ্টির মধ্যে একটী দুঃখ ক্লিষ্টা রুগ্না বালিকার স্বপ্নের ভিতর দিয়া তিনি আধুনিক সামাজিক ও আর্থিক সকল দুঃখের পরিচয় দিলেন। এইরূপ প্রহেলিকার প্রয়োজন ছিল কি? নাটকের পক্ষে হয়ত ইহা শোভন হইয়া থাকিবে, এবং এইভাবে প্লটটিকে বিস্তৃত না করিলে লোক চরাচরের অশ্রুপাত পর্য্যন্ত জীবন্তভাবে প্রস্ফুটিত করা হয়ত দুরূহ হইত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস এইরূপ মায়ার সৃষ্টি লেখকের উদ্দেশ্যকে খানিকটা খর্ব্ব করিয়াছে। দেশের বর্ত্তমান দুঃখকে যে ব্যক্তি যত স্পষ্ট করে সাহিত্যে প্রচার করতে পারবেন তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা ততই বাড়িবে। আশা করি রাধাকমল বাবু দরিদ্রতার নিখুঁত ছবিগুলি যেভাবে চক্ষের সামনে নিত্য দেখ্‌ছেন তাহাই আমাদের কাছেও বহিয়া আনিবেন। আমরা স্বপ্ন চাহি না। আমরা যে ঘুমিয়ে আছি তাহা আমরা জানি। কিন্তু আঘাতের উপর আঘাত এসে পড়ুক। বুদ্ধের আত্মা আমাদের দেশে উদয় হউক্। তাঁর মত সমানুভূতি লাভ করিবার জন্য আমরাও যেন মিথ্যা সম্পদ ও আলস্য পরিহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হই। বাণী মন্দিরে সেই শুভ-বুদ্ধির প্রার্থনা করি।

কি বলিতেছিলাম—মলিনার স্বপ্নের কথা। আমরা স্থির চিত্তে বলিতে পারি ইহা স্বপ্ন নহে একেবারে বাস্তব। করুণাদিদির কোলে মাথা রাখিয়া ঘুম-পাড়ানী গান শুনিতে শুনিতে মলিনা স্বপ্ন দেখিতেছে। পিতা বিপিন পয়সার অভাবে মেয়ের বিবাহ দিতে অক্ষম, মদের আশ্রয় লইয়াছে। মলিনাকে কত কুকথাই শুনাইয়া গেল। এ গালি গালাজের উত্তর মলিনা পরক্ষণেই এক দুঃখী বৃদ্ধের কাছে পাইল, "বিয়ে না হলে জাত যায়। জাত দিয়ে কি হবে ? ছোট লোক, জাত গেলে কিছু নয়, কেউ পুছে না, আর ভদ্দর লোক জাত গেলে একেবারে পাগল হয়ে পড়ে। পেটে ভাত নেই তখন জাত আবার কি !" মলিনা স্বপ্নের মধ্যেই প্রবোধ মাষ্টারকে তাহার দোসর পাইল। আমাদের মনে হয়, "প্রবোধ" নামটি তার সকল রকমে সার্থক হইয়াছে। মলিনা এখন মাকে দেখিতে চায় কিন্তু সকল মাইত' কালীমায়ের অংশ। লেখক কৌশলে কালীমায়ের মূর্ত্তির ভিতর দিয়া বিশ্বজননীর বক্ষে মানব সন্তানের দুঃখের প্রতিচ্ছবি দেখাইলেন। সন্তানের দুঃখে মা জ্বলে পুড়ে কালো হয়েছেন, সন্তানের চক্ষের জলে তাঁর এলোচুল সিক্ত; সন্তানের কাপড় নেই মা ও নিরাভরণা। মলিনা জিজ্ঞাসা করিল, "মা তোমার শিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন ?" মা উত্তর দিলেন, "এই সংসারে তোর স্বামী মিল্‌ল না, তাই আমি সিঁদুর মুছে ফেলেছি।" মলিনা স্বপ্নের ঘোরে বুঝিল তাহার দুঃখের বোঝা অল্প নহে সে বলিল, "তুমি চলে যেও না মা, আমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমার যে এখানে বড় কষ্ট হয়। তুমি চলে গেলে একলা বড় ভয় কর্ব্বে।"

এম্‌নি করে স্বপ্নের মলিনা এবং বাস্তবের স্নেহলতা সমাজ পদ্ধতিকে তুচ্ছ করে নিত্য মায়ের ঘরে চলে যাচ্ছে। তবু ছাই সমাজের চেতনা হয় না। এরূপ জড় সমাজে নারায়ণ কিরূপে জাগ্রত থাকিবেন ?

তথাপি নাট্যকার শেষ দৃশ্যে নব জাগরণের আশ্বাস দিয়াছেন। এই অংশটি লেখকের ভাবুকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। অশরীরী হরগৌরী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। স্ত্রী মূর্ত্তি বলিল, "এই যে আমার বুকের ভেতর রোগীর যাতনা, আমার বক্ষে আশাহীনের তপ্তশ্বাস—এই যে আমার উদরে ক্ষুধিতের তীব্র যাতনা, আমার হস্ত পদে কুষ্ঠ রোগীর বেদনা, একি আমি অন্ধ হলাম নাকি ?"

সকল সন্তাপহারী মঙ্গলময় পুরুষ মূর্ত্তি বলিলেন, "আমি যে তোমাদের সঙ্গে অনন্তের যাত্রী তোমাদের ফেলে যে আমার স্বতন্ত্র গতি নাই। তোমাদের প্রত্যেকের গতিতে আমার গতি, তোমাদের সবাইকে নিয়ে আমায় পরমগতি। তোমাদের একজনও পেছিয়ে পড়ে থাক্‌লে আমার যাওয়া হবে না। অজ্ঞানে, রোগে, দারিদ্রে, অপবিত্রতায় কেউ অক্ষম হলে আমি যে আমার সকল জ্ঞান, সকল সৌন্দর্য্য সব পূর্ণতা তাকে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব।"

স্বয়ং বিরাট পুরুষ যদি আমদের দলপতি হ'ন আমাদের বলিবার কিছু নাই। নাটকের শেষ গানটী শুধু আমাদের সম্বল—

"পাপাই যদি থাকে
আমি ভয় করি না তা'তে
শুধু, জানিয়ে দিও, বুঝিয়ে দিও মোরে
ফিরছ তুমি আমার সাথে সাথে।
পাপের বোঝা ভারি জানি হবে
তুমিই যে সব খালাস করে লবে,
নাই যদি নাও, তাই বা কিসের ক্ষতি
তোমার বোঝা বইব আমার মাথে।"

নারায়ণ জাগিবেন, সকলকে আনন্দলোকের তীরে পৌঁছাইয়া দিবেন ইহা ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে। কিন্তু এক যায়গায় লেখকের সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন, "নারায়ণ নিদ্রিত, সমাজ নারায়ণের ঘুমঘোরে আবৃত, ব্যক্তি কখনও অভিভূত কখনও বা স্বপ্নাবিষ্ট।" আমাদের অল্প বুদ্ধি ইহাতে সায় দিতে চাহে না। আমাদের বিশ্বাস, "মানুষ অভিভূত, সমাজ স্বপ্নাবিষ্ট এবং সেই জন্যই নারায়ণও আমাদের দেশে নিদ্রিত।" অবশ্য তিনি যে দিন জাগাবেন সেই জাগরণই সত্য হবে। কিন্তু তিনি নিদ্রিত বলে আমরা সকল আশা ভরসা ত্যাগ করিতে পারি না। তাঁর অসীম করুণার কি ভাবে উদ্রেক হইবে নাট্যকার তাহার

আভাস দেন নাই। হয়ত তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তাঁর করুণা অন্তঃশীলা ফল্গুর ন্যায় মানব অন্তঃকরণ ভেদ করিয়াই নিরন্তর বাহির হইতেছে। সেই জন্যই বোধ করি নিদ্রিত নারায়ণের অস্পষ্ট সান্ত্বনার চেয়ে জাগ্রত মানব সন্তানের এতটুকু দয়া বা স্নেহ মনকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। রাধাকমল বাবু মানুষের দরদ বোঝেন। সহানুভূতির 'শান্ত শীতল রাগ'টুকুও তাঁর হৃদয়ে বর্ত্তমান। আমরা ভরসা করি ভবিষ্যতে তিনি নারায়ণের উপর বরাৎ না দিয়া, কি ভাবে দরিদ্রের ক্রন্দনের অস্ফুট ধ্বনি লোকচিত্তের প্রসার সম্পাদন করে তাহা দেখাইয়া আমাদের প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন। কল্পনাদিদির স্নেহপ্রবণ ভাবটুকু আমরা সমগ্র দেশের মধ্যে ব্যাপ্ত দেখিতে চাই। তবেই মানুষ মানুষকে ভালবাসিবে—তখন অতীত কালের মত দেবতাকে দেশে দেশে জাগাইবার ভার আমাদেরই লইতে হইবে।
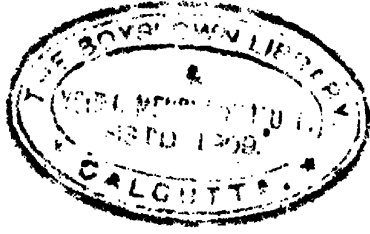
"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ — জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯ — ১১শ সংখ্যা

আলোচনী

[বিশ্বভারতের বাণী]

ইউরোপের মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপুল আয়োজনের বিরাট ব্যর্থতা এসিয়াবাসীর নিকট প্রকট করিয়াছে। মানুষের বিজ্ঞান বা সমাজের শক্তির চরম উন্নতির মাঝখানেও যে একটা প্রকাণ্ড নিষ্ফলতা মুখব্যাদান করিয়াছে তাহাতে পাশ্চাত্য মনস্বীগণও এখন ত্রস্ত, হতবুদ্ধি। তাই পাশ্চাত্যের সমস্ত কল্পনা ও ভাবুকতা নূতন প্রকার গঠনে এবং গঠনের নূতন উপকরণ সংগ্রহে আজ বদ্ধপরিকর। বিজ্ঞানের কৌশল, শিল্পের উন্নতি, রাষ্ট্রের বিস্তারের মধ্যেও মানুষের মধ্যে প্রাণের টান, হৃদয়ের যোগ না থাকিলে যে সমাজের শান্তি ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশ সুদূর পরাহত,—ইহাই বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা। তাই বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রগঠন, সমাজবন্ধন সকলই আজ নূতন মাপকাটিতে বিচারিত হইতেছে। প্রাচ্য জগতের বহু পুরাতন মাপকাটিটা আজও কি পরিত্যক্ত রহিবে, যুগধর্ম্ম গঠনে কোন কাজে লাগিবে না ?

নূতন সভ্যতা প্রজাপতির মত পুরাতন সভ্যতার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। কিন্তু প্রাচ্য জগতে আমরা এখনও সেই উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতার বুলি আওড়াইতেছি। উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ও শিল্পবন্ধন শ্রেণী-বিভাগ ও সংঘর্ষের ভিত্তিতে স্থাপিত। প্রাচ্য জগতে নূতন প্রজাতন্ত্র ও নূতন শিল্পরীতি পাশ্চাত্যের অনুকরণে গঠন করিতে যাইয়া আমরা যে সামাজিক অশান্তি ও সাম্যতন্ত্রের স্থূল ভাব আমদানী করিয়াছি তাহা আমাদের সভ্যতার বিকাশ ও আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিশ্ব-শক্তিকে একেবারে বর্জ্জনও করা যায় না। ইহা কখনও সম্ভব নহে যে আমরা যুগ-শক্তি হইতে কিছুই সঞ্চয় করিব না। এটা কিছুতেই বলিলে হইবে না যে,—আমরা অর্থ চাই না, বিজ্ঞান চাই না রাষ্ট্রের শাসন চাইনা, সভ্যতা চাইনা, কারণ বর্ত্তমান যুগে সবই স্বার্থসিদ্ধির উপকরণ যোগাইয়াছে, অথবা মানবত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায় হইয়াছে। আমরা প্রজাতন্ত্র গঠন করিব, কিন্তু রাষ্ট্র আমাদের সর্ব্বভুক্ হইবে না, ইতিহাসলব্ধ সমাজ শাসনের বিচিত্র অনুষ্ঠান গুলির স্বাধীনতা আমরা অক্ষুন্ন রাখিব। আমরা নূতন শিল্প ব্যবসায় অবলম্বন

করিব কিন্তু ধনী ও শ্রমজীবীর সংঘর্ষ আনিব না, যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমবায়পদ্ধতিতে আমাদের গ্রাম্য সমাজে কৃষি ও শিল্প যুগপরম্পরায় অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তাহাকে আমরা পুনর্জীবিত করিব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আমরা অবলম্বন করিব। কিন্তু বিজ্ঞানের ভীষণ নিষ্ঠুর ভাব আমরা গ্রহণ করিব না, প্রকৃতির বিচিত্র মূর্ত্তির মধ্যে আমরা অফুরন্ত রসাস্বাদনের উপকরণ গ্রহণ করিতে থাকিব। বিজ্ঞানের মিথ্যা আদর্শ আছে বলিয়া বিজ্ঞানকে ত্যাগ করা যায় না। রাষ্ট্র দুর্ব্বলপীড়নের যন্ত্র হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করা যায় না। বর্ত্তমান শিল্পরীতি ধনী ও শ্রমজীবির বিরোধ ঘটাইয়াছে বলিয়া শিল্পকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায় না। সহজ সরল জীবনের মধ্যে একটা ভাবুকতা আছে জানি—সে ভাবুকতা বর্ত্তমান সভ্যতার বিলাস উপভোগের দম্ভকে লাঞ্ছনা না দিলে নূতন শিল্প-বন্ধন নূতন রাষ্ট্রগঠনের কোন সম্ভাবনাও নাই তাহা জানি; কিন্তু সভ্যতার বিকারের উপর রাগ করিয়া বনে যাইলে চলিবে না। বরং বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদিগকে যে বিজ্ঞানের সম্পদ, যে রাষ্ট্র ও সমাজ-গঠনের উপকরণ দান করিল তাহা ঘরে তুলিয়া লইতে হইবে। আমাদের জাতির ভাণ্ডারে যাহা কিছু নিত্যবস্তু সযত্নে রক্ষিত আছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে হইবে। ভাণ্ডার আমরা খালিও করিব না, বাহির হইতে কোন দ্রব্য প্রত্যাখ্যানও করিব না।

এই গ্রহণ কাজ বড় কঠিন কাজ। বর্জ্জন অপেক্ষা অনেক কঠিন। ভারত ও ইউরোপের সমাজ বন্ধন, উভয়ের সভ্যতার ক্রমবিকাশের মূল সূত্র, উভয়ের শিল্প রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের আদর্শের আলোচনা করিয়া আমি এ পর্য্যন্ত গ্রহণের কথাই বলিয়াছি। কারণ বর্জ্জনের পথ ধ্বংসের পথ, গ্রহনের পথে আমাদের ভুল হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহাই জীবনের পথ, প্রতিষ্ঠার পথ। যাহা আমাদের বিশেষত্ব তাহা হইতে আমরা কিরূপে বিচ্যুত হইয়াছি, এবং বর্ত্তমান যুগ-শক্তির মধ্যে তাহা সাধনার দিক হইতে, অথবা সমাজগঠনের দিক হইতে, তাহা আমরা পুনরায় কিরূপে ফিরিয়া পাইতে পারি আমি তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, বর্জ্জনের দিক দিয়া নহে, অবাধ গ্রহণের দিক দিয়াও নহে, সমন্বয়ের পথে আমাদের সভ্যতা স্বাধীনতা লাভ করিয়া বিশ্ব-বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

পাশ্চাত্যের মহাযুদ্ধ ও দেশের নানা ঘটনা পরম্পরার আশা ও নিরাশার প্রত্যাবর্ত্তনের মধ্যে এই কথাটি স্পষ্ট বুঝিয়াছি—এবং আমাদের এই কয় বৎসরের চিন্তা ও সমাজের ক্রমবিকাশের ধারাও ইহা নির্দ্দেশ করিতেছে—যে আমাদের সভ্যতার ভবিষ্যৎক্রমবিকাশে আমাদের রাষ্ট্র ও শিল্পবন্ধনের মূল শক্তি ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতা না হইয়া সমূহের সমবায়-শক্তির মহিমা হইবে। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজ, সমিতি, পঞ্চায়েৎ, দল ও শ্রেণী সমাজ-শক্তির আশ্রয় ও আধার হইয়া রাষ্ট্রীয়-জীবন ও বৈষয়িক উন্নতির সুযোগ বিধান করিবে। এইরূপে এমন একটা সমূহ-শক্তি রাষ্ট্র ও শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা লাভ করিব যাহার পরিচয় এতদিন আমরা কেবলমাত্র ধর্ম্মে, দর্শনে ও সমাজ ব্যবস্থায় পাইয়াছিলাম।

নানাদিক বিচার করিয়া জগতের বর্ত্তমান মনীষীগণ এই স্থির সিদ্ধান্তে এখন উপস্থিত হইয়াছেন যে কেন্দ্রীকরণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনক্ষেত্রে জনশক্তির প্রসার সমাজ ও ব্যক্তি-জীবনের মুক্তিলাভের প্রধান উপায় - ধর্ম্মের সংঘ, চারুশিল্পকলা এবং ব্যবসায় শিল্পের সমবায়, রাষ্ট্রের পঞ্চায়েৎ, জাতীয় জীবনকে একটানা কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার কবল হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়—সমাজের বৈচিত্র্য ও ব্যক্তি জীবনের স্বাধীনতা বিকাশের একমাত্র আশ্রয় ও আধার। তাই বর্ত্তমান যুগই হইতেছে সমূহ গঠনের যুগ—কি ধর্ম্ম, কি শিল্প কি সমাজ-সেবা, কি রাষ্ট্র সব দিকেই এখন সমূহের প্রাধান্য।' ইহাই হইতেছে যুগ-ধর্ম্ম, এবং এই যুগধর্ম্মের প্রভাবে ভারতের প্রাচীন ও জীর্ণ সমাজব্যবস্থার উপর ইউরোপীয় ভাবুকতার স্পর্শ বালার্ক কিরণের মত সঞ্জীবনী শক্তি আনিয়াছে।

ভারতের অধ্যাত্ম সাধনার মূলতত্ত্ব এই যে সে একককে বহুর মধ্যে, খণ্ডের মধ্যে, বিশ্ব-বস্তুকে অসংখ্য বিশেষের মধ্যে, উপলব্ধি করিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্র-বন্ধন ও শিল্পরীতিও সেই সূত্র ও খণ্ডের আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে, বহু সমূহের অবাধ

বিকাশের মধ্যে ভারতবাসীর জীবনকে এক সুরে বাঁধিয়া দিবে। একদিকে অসংখ্য গ্রাম্যসমাজের মিলন ও বিরাট সমবায়ের দ্বারা যেমন কৃষি ও শিল্প কার্য্যের উন্নতি সাধিত হইবে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর সমবেত স্বামিত্বে খনির ও কারখানার পরিচালনে নবনাগরিক ব্যবসায়ের অর্থের অত্যাচার ও অনৈক্য দূর হইবে, অপরদিকে অসংখ্য স্বাধীন কেন্দ্রে কৃষক-প্রজাতন্ত্র নূতন দায়িত্ব লাভ করিয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান শোষণ ও যন্ত্রবৎ পরিচালন-রীতিকে প্রতিরোধ করিবে। দেশে যে রাষ্ট্রীয় ভাবুকতা এখন দেখা গিয়াছে ইহার ফলে যদি সত্য সত্যই আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ সমাজ শাসন শক্তিকে জাগাইয়া তাহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্যসমাজ ও কৃষি ও শিল্প সমাজের সম্মিলিত সমবায়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তাহা হইলে আমরা শুধু যে পাশ্চাত্য জগতের গত শতাব্দীর শিল্প ও রাষ্ট্র বিপ্লবের নিদারুণ ইতিহাস এদেশে পুনরাবৃত্তি করিব না তাহা নহে, আমাদের অতীত ইতিহাসের জীবনধারার মূল সূত্রকে খুঁজিয়া পাইয়া তাহাকে আরও শক্ত, আরও বিচিত্র আরও ব্যাপক ভাবে বুনিয়া সমস্ত দেশকে শান্তি ও সুসামঞ্জস্যের, সামাজিকতা ও জাতীয়তার সুদৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়া দিব। বিলাতের আমদানী নূতন ডেমোক্রেসি ও শিল্পরীতির প্রগল্‌ভতা ও মিথ্যা আড়ম্বরের পরিবর্ত্তে আমরা তখন সমাজের স্বাভাবিক শক্তি ও যোগ্যতার পরিচয় পাইব।

বিশ্বসভ্যতা এক্ষণে রাষ্ট্র ও শিল্পের নিগড়ে শৃঙ্খলিত। মানুষ শান্তিরক্ষা ও বিলাসভোগকল্পে রাষ্ট্র ও শিল্পকে সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু যাহা সমাজরক্ষা ও সমাজস্থিতির কারণ তাহাই এই যুগে ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ না দিয়া সমাজের মুক্তির অন্তরায় হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে এখন তাই এমন এক সমাজবন্ধন রীতির প্রয়োজন হইয়াছে যাহা মানুষকে আবার তাহার অনুভূতি ও জন্মাধিকারের স্ফুরণ করে তাহাকে স্বাভাবিক এবং সহজ বন্ধনে বাঁধিয়া দেয়, যেখানে তাহার উপর শাসন প্রভুর অলংঘ্য বিধান না হইয়া দাসের স্বেচ্ছাসেবায় পরিগণিত হইবে। আমার বিশ্বাস, এই নূতন সমাজবন্ধনে ভারতবর্ষের সমূহতন্ত্র নূতন উপকরণ দান করিয়া পাশ্চাত্যের নূতন শাসন ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিবে। সর্ব্বগ্রাসী রাষ্ট্র ও শিল্পের অত্যাচার বর্ত্তমান সভ্যতার হলাহল বিষ। রুষিয়ার সাম্যতন্ত্র সেই বিষকে পান করিয়া জগতে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা সুরু করিয়া দিয়াছে। বিশ্বমানব বর্ত্তমান যুগের নির্ম্মম মন্থনে ক্লিষ্ট, বেদনাতুর। আমাদের আশা, বিশ্বমানবের বেদনার অবসান তখন হইবে যখন প্রজালক্ষ্মী সাগর-মন্থন হইতে পূর্ব্বকূলে উঠিয়া দাঁড়াইবেন, বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবারণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিবেন। নারায়ণের নিকট ভারতলক্ষ্মীর এই যাচ্ঞা ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থম্, জগদ্ধিতায়, ইহাই হইল ভারতাত্মার বাণী। ভারতবর্ষ তাহার মনোময় রূপটি খুঁজিয়া পাইলে বিশ্ব-বস্তুও লাভ করিবে।

অতিথি

[শ্রীরবীন্দ্র নাথ মৈত্র]

এসেছিলে যবে—
কৃষ্ণকলিকার মত ভাদরের মৃদু মেঘরবে,
সন্ধ্যাশেষে গৃহহীন পথহারা পথিকের সম
সঙ্গিহীন, গৃহদ্বারে মম,

ভাবিনাই মনে
ক্ষণের অতিথি আসি সাথী হবে সমস্ত জীবনে,—
আঁকি দিবে চিরতরে সুগভীর আঘাতের লিখা
ক্ষণিকের বিদ্যুতের শিখা।

রুদ্ধ বাতায়নে
তখন উন্মাদ বায়ু মাথা খুঁড়ি' ফিরে ক্ষণে ক্ষণে।
ভেদি আকাশের বুকে ঘনকৃষ্ণ মেঘ-যবনিকা
উঁকি দেয় নক্ষত্র-বালিকা ;

আর কেহ নাহি
শুধু ক্ষিপ্ত সুপ্তিহীন ঝঞ্ঝা ফিরে রুদ্র তালে গাহি,
নষ্টনীড় চাতকীর, ফুলঝরা কদম্বশাখায়
তীব্র হাহাকার শোনা যায়।

আভরণ-হীনা
তখন দাঁড়ালে আসি মৃদুপদে একান্ত মলিনা
দুয়ারের পাশে মম। কেশ প্রান্তে তখন তোমার
অনিবার ঝরে মুক্তাধার,

শ্রীঅঙ্গ কাঁপায়
বর্ষার পাগল বায়ু সোহাগের সহস্র চুমায়,
সারা শ্যাম তনুহতে শত দীর্ণ আবরণ টুটি'—
অঙ্গরাগ উঠিতেছে ফুটি।

দীর্ঘ দুটি আঁখি
সন্ধ্যার নক্ষত্র সম স্পন্দহীন মোর মুখে রাখি'
শেষ শিশিরের শীর্ণা স্রোতস্বিনী সমস্নিগ্ধ স্বরে
শুধাইলে অতি ধীরে ধীরে,—

"শুধু ঠাঁই মাগি
তবপাদ-পীঠ তলে বাদলের রাতিটার লাগি।"
কেবা তুমি, কেন এলে না শুধামু কহিলাম ধীরে
—"তুমি দেবী আজি এ মন্দিরে।"

ঝর ঝর ঝর
মেঘ গিরিমালা ভেদি' পড়ে ঝরি অজস্র নির্ঝর,
জলকেলিরত শত নভতলে চপলা বালার
হেমকুম্ভ ঝলে অনিবার !

ধীরে, ধীরে, ধীরে,
স্নিগ্ধ করপুট খানি রাখি মোর রোগতপ্ত শিরে,
সকল অঙ্গের জ্বালা সিক্তকেশ পাশে মুছি নিয়া
নতনেত্রে রহিলে চাহিয়া।

বাহুর বাঁধনে
ধরা দিয়েছিলে কিনা এত দিনে কিছু নাহি মনে,
আনন্দে আচ্ছন্ন ছিনু। আঁখি মেলি হেরিনু প্রভাত
পোহায়েছে বরষার রাত।

আনন্দ উতল
বাহু প্রসারিতে হেরি হা হা করে শূন্য শয্যাতল,
শিয়রে রয়েছে পড়ি একগাছি কদমের মালা,—
যজ্ঞশেষ ক্ষীণ বহ্নি জ্বালা।

—দূরে কতদূরে ?
কোথা গেলে জানি না'ক' পাব কি পাব না পুন ফিরে,
চলে গেলে, রেখে গেলে চিরদিন স্মরণের সাথী
সেদিনের বরষার রাতি।

অতিথি অজানা—
কোন্ স্বাতীনক্ষত্রের শুচি শুভ্র স্নিগ্ধ জল কণা
মরম শুক্তির মাঝে চিরবাস বেঁধে গেলে এসে
নিমিষের পরিচয় শেষে।

সেই স্মৃতি মুকুতার
অমল আলোক লীলা উদ্ভাসিছে হৃদয় আমার।
বৈশাখের সন্ধ্যাশেষে,
আজিকার সুনিবিড় মেঘস্তূপ স্তব্ধ নীলাকাশে
মনে আসে তার কেশপাশ ;
আজি যে শ্বসিয়া উঠে চারিদিকে উতলা বাতাস !

ক্ষণিকের পরিচয়ে চিরদিন হলে, আপনার
হে অনিন্দ্যা অতিথি আমার
অন্তরের চিরসাথী, আসন্ন বরষা আজিকার
নূতন করিয়া বার বার,
রসে ভরি তোলে প্রাণ মধুস্মৃতি তব অভিসার !

বিপ্লব-বাদ*

[শ্রীঅমূল্যকুমার ভাদুড়ী]

বর্ত্তমান রাজকীয় আইনের প্রতিবাদ এবং রাজশক্তির পরিবর্ত্তন চেষ্টার নাম—বিপ্লব বাদ। বহুদিন হইতে মানুষ রাজার শাসন মানিয়া আসিতেছে বহুকাল তাহার মনে পড়ে নাই রাজশক্তির এ শাসনে কতখানি অধিকার—যে দিন তাহার এ প্রশ্ন মনে উঠিল সে দিন তাহার সুপ্ত স্বাধীন স্বত্বা মাথা তুলিল; বাস্তবিক একের ওপর অন্যের শাসনের কি অধিকার? মানুষের মন অতীতের অস্পষ্ট আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া ফিরিয়া গেল সন্ধান করিতে কেন তারা এতদিন অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে, কতদিন তারা ভগবানের দেওয়া অধিকার পরের হাতে সঁপিয়া দিয়াছে? আদিম যুগে ত এমন ছিল না—তখন আলো আর আকাশের মত মানবের ইচ্ছারও উন্মুক্ত অনন্ত বিস্তার ছিল—কেহ রোধ করিত না—রোধ করিলে মানুষ নিজেই তাহার প্রতিবিধান করিত কাহারও মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিত না তখন তাহার শৌর্য্য ছিল আত্মরক্ষার ক্ষমতা ছিল এখনকার অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক—কারণ তখন সে ছিল আত্ম নির্ভরশীল। তারপর আসঙ্গলিপ্সায় মানুষ দলের সৃষ্টি করিল, দলের যে শ্রেষ্ঠ তাকেই সব দান করিল চাহিয়া লইল সুধু অরাতির অভিযানে আশ্রয়—সেই দৌর্ব্বল্যের স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিতে আজো মানুষের সন্ততি আবদ্ধ—কিন্তু বুঝিলাম না বিজেতার অধিকার কি! সেখানেও কি স্বেচ্ছা আছে, চুক্তি আছে, না শুধু প্রবলের অধিকার। যদি ইচ্ছা থাকে—চুক্তি থাকে—তা বুঝি অব্যক্ত (implied) ধরিয়া লইতে হয়।

যদি এই স্বেচ্ছাকৃত চুক্তিই সত্য হয়, তা হইলেও আমার ইচ্ছা কি ইচ্ছা নহে আমি কি সুধু পরের ইচ্ছারই দাসত্ব করিয়া যাইব, আমার এই সতেজ ইচ্ছা কি আমার পূর্ব্ব পুরুষের অনুমিত ইচ্ছার অত্যাচার ঝাড়িয়া ফেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না? কেন পারিবে না—আমিও ত' মানুষ অমৃতের পুত্র—যাহারা আমার বিরুদ্ধে যাইবে তাহারা আমার শত্রু, তাহারা মানুষের শত্রু—ভাঙিয়া ফেল তাহাদের শাসন, এমন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা কর যেখানে ব্যষ্টির ইচ্ছা অপ্রতিহত, -যেখানে আইন, কাহাকেও বাধ্য করে না, যেখানে সহযোগই আইনের ভিত্তি এই মনোবৃত্তির উপর বিপ্লব বাদ প্রতিষ্ঠিত।

বিপ্লববাদ হত্যার ধর্ম্ম নহে—যে ধর্ম্মের পুরোহিত গডউইন, টাকার, টলষ্টী ও প্রধোন সে ধর্ম্ম হত্যাকে প্রশ্রয় দেয় না—সে ধর্ম্ম চায় নির্ব্বিরোধ বাধায়, যুক্তিতে সার্ব্বজনীন প্রেমে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা বোধ, ফুটাইয়া তুলিতে—সে চায় ক্ষতে প্রলেপ দিতে—আঘাত করিয়া রক্তপাত করিতে চায় না—তাহার অস্ত্র তরবারি নয়—প্রেম, হত্যা নয় আলিঙ্গন, ব্যথা নয় আনন্দ।

বিপ্লববাদ প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। তুমি রাজা—তুমি প্রবল তুমি আমাকে পীড়ন করিতে পার; তোমার সৈন্যবল আছে, তোমার অর্থবল আছে—তোমার অস্ত্র আছে। কিন্তু এই পীড়নটাই কি সত্য—এই ক্ষমতার অভিব্যক্তিই কি শ্রেষ্ঠ সত্য—আমার ন্যায়বোধ কি মিথ্যা—আমার অন্তরাত্মার অনুভূতি কি অবহেলার?

তুমি রাজা শাসন করিবে তোমার তরবারি দেখাইয়া তোমার স্নেহের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই—তুমি আমার পৌরুষকে ভাঙিয়া কুৎসিত করিয়া কাপুরুষ করিবে—আমার মহৎ প্রবৃত্তির স্থান তোমার সভায় নাই, কেন তোমার কি অধিকার? আমার নিজেকে তুমি

* Prof Jethro Brown অবলম্বনে।

শাসন করিতে দিবে না। আমায় তোমার আইনের নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। আমার চারি দিকে শুধু মানা আর জুজুর ভয়—কেন, আমি কি চিরদিন শিশুই থাকিব? তোমার দেওয়া আইনের চাইতে আমার নিজের গড়া আইন কি আমার কাছে আরো পবিত্র নয়? এই বিপ্লব বাদ।

বিপ্লব বাদের দণ্ডনীতি প্রেম। সেখানে মার খাইয়া প্রেম দিতে হয়। মানুষ অপরাধ করে তার বিকৃত বুদ্ধির দোষ—এই বিকৃত বুদ্ধিকে শিক্ষা দিয়া শোধরাইয়া লইতে হইবে। কণ্টকে নৈব কণ্টকম্ নয়—অত্যাচার দিয়া অত্যাচার রোধ নয়। অত্যাচারকে বক্ষ পাতিয়া লইয়া অত্যাচারীকে আলিঙ্গন কর, দেখিবে তোমার স্পর্শমণি তাহাকে সোণা করিয়াছে।

বিপ্লব বাদের যাহারা চারিপন্থী বিপ্লব বাদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অনেক অস্ত্র সংগৃহীত আছে, তাহা পরে বলিবার আশা রহিল—আমি শুধু বিপ্লববাদ কি তাহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম। বিপ্লববাদ ভুল হইলেও সমাজের এবং শাসনের অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসাবে বিশেষ মঙ্গল করে; স্বায়ত্তশাসন ইহার লক্ষ্য, অত্যাচারের প্রতিরোধ করাই ইহার উদ্দেশ্য—উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিশ্চয়ই সাধু, পথ লইয়া মতভেদ আছে থাকিবেও।

ফকিরের ডায়েরী

"কুহু" তান হ'ল "ক—খ"।

[ফকির—ডিসেম্বর, ১৯১৯]

বাঙ্গালা দেশে একখানি অট্টালিকা তৈরি হ'ল,—নানারকম অলঙ্কার প'রে ক্রমে ক্রমে সেখানি এত সুন্দর হ'য়ে উঠ্ ল যে দেশের মধ্যে তার সম্মান হ'ল সব চেয়ে বেশী,—তারপর প্রথমে পাড়ায় ও ক্রমশঃ দেশব্যাপী হ'য়ে তার অনুকরণ চ'লতে লাগল,—সব শ্রেষ্ঠ জিনিষেরই যেমন অনুকরণ হ'য়ে থাকে,—আর যা হওয়াই উচিৎ। কিন্তু এখানে অনুকরণটা হ'ল অন্ধ। আদর্শটা কি বা কেমন যে ছিল এবং বাস্তবিক সেটা কি দিয়ে তৈরি তা' কেউ দেখলে না—জানলে না— চেষ্টা ও ক'রলে না-শুধু তাড়াতাড়ি ক'রে যেন একটা হুজুগে প'ড়ে যেমন দেখলে, "মাছি মারা গোমস্তা"র মত তেমনি নকল ক'রতে সুরু ক'রলে, তার ফলে হ'ল—এই যে ["পণ্ডিত মশায়ের কাছে শোনা কথা"] আসল বাড়ী খানির পোঁতা ছিল ছিল গভীর আর গাঁথ্ নি ছিল চুণ শুরকীর আর বড় বড় পাথরও তার সঙ্গে ছিল, কিন্তু নকল নবীশগুলো তাড়া-তাড়িতে আর অভাবে প'ড়ে পোঁতা মোটেই দিলে না, আর কেবল কাদা দিয়ে ভাজা ভাজা ইঁট গেঁথে তুল্ লে। আসল বাড়ীটার দেয়ালে নানাজাতীয় মূল্যবান পাথর বসান ছিল। নকল নবীশরা যত রাজ্যের কাঁচ এনে তাদের কাদার দেয়াল ঢেকে দিলে। পণ্ডিত মশায় কিন্তু ঠিকই বুঝে ছিলেন— তিনি ও রকম অনুকরণ ক'র্ত্তে কত নিষেধ ক'রলেন কিন্তু দক্ষিণে পেলেন বিদ্রুপ। তবুও কথা তাঁর ফ'ল্ ছে, প্রত্যহই তাদের মধ্যে অনেকে সামান্য ঝড় বৃষ্টিতেই গ'লে কাদা ইঁট আর কাঁচ ভাঙ্গার গাদায় পরিণত হচ্ছে,—

হ্যাঁ,—তার পর সেই যে আদর্শ বাড়ীখানির কথা ব'লেছি—তার মধ্যে ছিল একটা অদ্ভুত প্রাণী, তারই সাধনা ও শক্তি সেই গোটা বাড়ীটাকে প্রাণ দিয়েছিল, সেই টুকুই ছিল সেই বাড়ীর শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য, সেই প্রাণীটিকে ক্রমে পক্ষীরূপ ধ'রতে দেখা গেল,—পালকের উপর কত রকম সুন্দর রামধনুর মত রঙচঙে পালক উঠ্ তে লাগল আর তার কণ্ঠ দিয়ে গান যা বেরুতে লাগল—তেমন গান কেউ কখন শোনেনি,—পক্ষীকুলের রাজ্যপাট তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ল,—কোকিল যেখানে বসন্ত সেইখানে

যায়—কিন্তু এই পক্ষীরাজকে ভিন্ন দেশের লোকে অকালেই নিয়ে যেতে লাগল, আশ্চর্য্য;—সে সব জায়গাতেই তোর সঙ্গেই বসন্তও যেন গিয়েছিল।

এ দিকে, বেশ অনুকরণ চ'ল্‌তে লাগল—দুনিয়ার যত অকেজো পাখী ঐ সব রংকরা কাদার ঘরে আশ্রয় নিলে—তারা গান কেউ জান্‌তো না—তবে ভরসা ছিল যদিও তাদের স্বর কর্কশ তবুও পক্ষীরাজের অশ্রুতপূর্ব্ব সুর কোন রকমে কপ্‌চাতে পারলেই নাম ছুটে যাবে। তাদের সেই মরা মরা, ওঠা ওঠা, পাথ্‌নার উপরেই তারা যেখানে যা রঙীন্ দেখ্‌লে এনে চাপালে,—ভাবলে কতই না সুন্দর দেখাবে। কিন্তু ভুল,—ভুল, পণ্ডিত মশায়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফ'ল্‌ল—তাদের প্রায় সবারই আজ সামান্য ঝড়েই কাক্ বা বকের মত অবস্থা—কেউ মরা কেউ আধমরা।•

[প্যাঁচ্‌কাটা রঙীন্ ঘুড়ি গুলো যেমন শেষে তালগাছে বেধে, বাতাসের ঘায়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়—ঠিক তেমনি,— উড়বার আগে ঘুড়ি গুলোও ভাবে সারাদিনই প্যাঁচ খেল্‌বে।]

যাক্ তারপর,—পক্ষীরাজের যশঃ সৌরভ তাঁর গানের সুরে ভেসে ভেসে পৃথিবীময় ছড়িয়ে প'ড়ল কিন্তু পণ্ডিত মশায় তাঁকেও উপদেশ দিতে ছাড়েননি হয়তো সেটা তাঁর বেয়াদপি হয়েছিল,—তিনি বলেছিলেন অত বড় একটা শক্তি শুধু গান গেয়ে হাওয়ার সঙ্গে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে গাঁয়ের কাজে লাগানর সার্থকতা ও দরকার অনেক বেশী বিশেষতঃ যখন গাঁয়ের ভীষণ দুরবস্থা। যাহোক্ তাতে বিশেষ ফল হয়নি পক্ষীরাজের বরং গরম লেগেছিল। তবুও মধ্যে মধ্যে গান থেমে গিয়ে কান্না বেরুত,—সত্যের এমনি রীতি।

আজ একটা ভারি গোলমাল এমন একটা ঝড় হঠাৎ এসেছে,—বৈশাখের বিষ ক্রিয়ায় জ্যৈষ্ঠ্যে কাল বৈশাখী এমন ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে—তার হাওয়ায় এত আগুন যে পক্ষীরাজের প্রাসাদের হীরের টুক্‌রো গুলো পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে,—দেয়াল থেকে সমস্ত পালিশ্ গলে' পড়ে' বড় বড় পাথর বেড়িয়ে পড়েছে—যা দিয়ে প্রথমে প্রাসাদ তৈরি হ'য়েছিল—আর পক্ষীরাজের গানের গলায় সুরের বদলে অভিযোগের চীৎকার উঠেছে—ইন্দ্রধনুর পালক্ ডুবে গিয়ে যেন আবার কাল মেঘের গর্জ্জন সুরু হ'য়েছে পক্ষীরাজ আজ আবার সেই সত্য গরুড় রূপে প্রকাশিত হ'য়েছেন—আজ তিনি ব'ল্‌ছেন, যে আগুনে ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব পুড়ে ছাই হ'য়ে যাচ্ছে তাতে আমার পালক পুড়্‌বে তা আর আশ্চর্য্য কি? আর তা পোড়াতেই আমি বেশী সুখ পাব—আমার ভাইদের সঙ্গে যখন আমায় দাঁড়াতে হবে তখন আর আমি কেন কাছারীর পোষাক প'রে থাকব?

ওরে অন্ধ, ওরে মূঢ়, ওরে বিপথগামী অনুকরণকারিগণ আজ তোরাও ফের্—রাবণ যে আজ সীতাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছে।—তোরা কি শুধু গানের ব্যর্থ প্রয়াসেই মত্ত থাকবি? সত্যের রুদ্র আলোতেও কি তোদের চোখ্ ফুটবে না? পণ্ডিত মহাশয়ের বারণ তোরা কেউ না শুনতে পারিস্, কারণ মাতৃকুলনাসনও ভূতপূর্ব্ব গুরুকুলের প্রতি ভক্তি নাশ ক'রে থাকে—কিন্তু তোদের আদর্শকেও তো সত্যভাবে গ্রহণ ক'রবার চেষ্টা ক'রতে পারিস্। চেয়ে দেখ্ হঠাৎ আজ তোদেরই আদর্শের বুকের ভেতর থেকে সত্য ছুটে বেরিয়েছে—আগুন চাপা মাটীর ওপর কি ফুল গাছ বেঁচে থকতে পারে? ওরে পক্ষীকুল আজ তোরাও ফের্—তোরা বৃথা আর কোকিল হ'ব না ভেবে গরুড় হ'বার চেষ্টা কর্—এজন্মে যতদূর এগুতে পারিস্ তাই ভাল।—গান বন্ধ হয়ে যাক্—কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠুক্ সত্যের মন্ত্র, বক্ষে বক্ষে স্পন্দিত হ'ক সাধন ছন্দ।
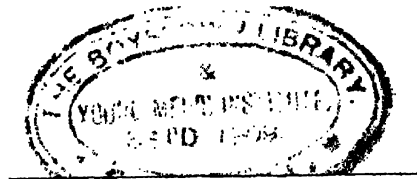
সামাজিক কথা

ছোটলোক

[শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

সমাজে দুই শ্রেণীর লোক বাস করে। উচ্চশিক্ষিত শ্রেণী ভদ্রলোক আখ্যা পায় ; আর বিদ্যাহীন, দরিদ্র শ্রেণী ছোটলোক নামে ঘোষিত হয়। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে বেশ প্রীতির ভাব নাই। ভদ্রলোকেরা ছোটলোকদের প্রাপ্য সম্মান ছাড়িয়া দেয় না উপরন্তু তাহারা ছোটলোকদিগকে ক্রীতদাস করিয়া তুলিয়াছে। ফলে ভদ্রলোকদিগের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষ ভাব জন্মিতেছে। আর বিদ্বেষ ভাব জন্মানও অস্বাভাবিক নয়।

সেইজন্য এই ছোটলোকদের সম্বন্ধে ভদ্রলোকদের মধ্যেও আধুনিক সময়ে দুইটি দল হইয়াছে। এক দলের মত ছোটলোকদের মাথায় করিয়া লও। অপর দলটি বলেন—'ওরা ছোটলোক, ছোটলোকদের মত ব্যবহারই উহাদের উচিত প্রাপ্য। উহাদিগকে পদানত করিয়া রাখ, যাহাতে কখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে না পারে তাহার পথ খুঁজিয়া বাহির কর।"

ইহার মধ্যে কোনটি মান্য আর কোনটিই বা ত্যাজ্য তাহা বিচার করিতে হইলে দেখা যায় যে দুইটির মধ্যে কোনটিই ভাল নয়—মাথায় তোলাও ভাল নয় আর পদদলিত করা উচিত নয়। অতএব উহাদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা বিবেচ্য। সে কথা ভুলিয়া আজিকার দিনে লোকে চায় 'এস্‌পার কি ওস্‌পার।' 'এস্‌পার কি ওস্‌পার' লাভক্ষতি বিবেচনা করিয়া দেখা কত আবশ্যক তাহা কেহ সহজে বুঝিতে চাহে না।

অসহযোগ আন্দোলনের দিনে ইংরাজি শিক্ষা ত্যাগ করা উচিত কি না? উচিত হইলে কেন উচিত আর অনুচিত হইলেই বা কেন অনুচিত এবিষয় ভাববার জন্য বড় কেহ একটা প্রস্তুত নহে। হুজুগে কায করিলে যেমন চরিত্র থাকেনা, তেমনি আবার ছোটলোক সম্বন্ধে কি করা উচিত না উচিত' তাহা না ভাবিয়া কিছু বলিতে যাওয়াটাও চরিত্রহীনতার লক্ষণ।

আজ তো সাধারণ লোকে ছোটলোক সম্বন্ধে কোন কথাই ভাবিতে প্রস্তুত নহে। জাতীতে নীচ হইতে পারে, অপরিস্কার, অপরিচ্ছন্ন হইতে পারে কিন্তু কি উপায়ে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে, কি করিয়া তাহাদের ন্যয্য সম্মান ছাড়িয়া দিতে হইবে এ কথা ভাবিবার অবসর বুঝি বা জনসাধারণের নাই! সেই জন্য তাহারা একজনের মত নির্ব্বিচারে মানিয়া লইয়া অল্প বুদ্ধির পরিচয় দিতে ছুটিয়াছে। অনেকে আবার ছোটলোকদের 'সম্মান বজায়' রাখিবার কথা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন. ছোটলোকদেরও যে সম্মান থাকিতে পারে শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন। ছোটলোকও যে মানুষ, তাহাদের দেহ যে রক্ত মাংস দিয়া গঠিত শুনিয়া বিদ্রূপ বাণীতে দেশ ভরাইয়া ফেলিতে পারেন। কিন্তু নাসিকা কুঞ্চিত করা, শিহরিয়া উঠা, বিদ্রূপবাণীতে দেশমাতানো কি ভদ্রতার পরিচায়ক? ছোটলোক কি মানুষ নয়? তাহারাও কি সমাজের অঙ্গ নয়? তাহারা কি সমাজের উন্নতি কল্পে প্রাণ ঢালিয়া পরিশ্রম করে না? সমাজের উপর তাহাদের কি কোন দাবীই চলিতে পারে না? যদি ছোটলোকদের দাবী ভদ্রলোক গ্রাহ্য না করেন, তাহাদের যোগ্য সম্মান তাহাদের ছাড়িয়া না দেন তাহা হইলে কি ছোটলোকদের মনে ক্ষোভ জন্মিবে না?

সমাজের উপর তাহাদের কি বিতৃষ্ণা জন্মিবে না? অবশেষে তাহারা কি সমাজের বুকের উপর দাঁড়াইয়া বুকের রক্ত শোষণ করিবে না? কোন শ্রেণীকেই পদানত করিতে যাওয়া মস্ত ভুল। যাহারা এই ছোটলোকদিগকে পদানত করিয়া রাখিতে চায়, তাহারা কি সঙ্কীর্ণমনা নয়? তাহারা কি সমাজের ঘোর শত্রু নয়? সমাজের অঙ্গহানি করিবার তাহাদের অধিকার আছে কি?

পশু পক্ষীদেরও দল আছে তবে সে দলকে আমরা সমাজ বলি না। সেই পশু পক্ষীরা সকলকে সকলের যোগ্য সম্মান ছাড়িয়া দেয়। প্রবাদ আছে গঙ্গার তীরে কোন মৃত জন্তু আসিয়া লাগিলে শকুনি দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ না তাহাদের দলের কর্ত্তা বা জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতীয় কোন পক্ষী না আসে ততক্ষণ তাহারা মৃতদেহ স্পর্শ করে না। (এখানে শ্রেষ্ঠ জাতি মানে এমন একদল যে দলকে সমস্ত শকুনী তাহাদের কর্তৃত্বের ভার দিয়াছে।) শকুনী, যে পাখীকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দেখি তাহারাও যোগ্য সম্মান ছাড়িয়া দিতে পারে আর মানুষ হইয়া মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ মানুষকে যোগ্য সম্মান ছাড়িয়া দিবে না—এ যে অতি আশ্চর্য্যের কথা।

আজ আমরা যে দলকে ছোটলোক আখ্যা দিতেছি হয়ত এমন একদিন আসিবে যেদিন তাহারা আমাদিগকে পদদলিত করিতে ছাড়িবে না। তখন ভদ্রলোকের প্রতি ঈর্ষ্যা মনের মধ্যে আপনা হইতে স্ফুরিত হইবে। ছোটলোক হইতে অসংখ্য কর্ম্মী জন্মিলেও তাহারা ভদ্রলোকদিগের সহিত একজোটে কাষ করিবে না। তাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত করিবে। ফলে আপাতত না হইলেও শেষে এই ভদ্র ও তথাকথিত ছোটলোকদের সমাজগুলি পরস্পর পরস্পরকে পীড়ন করিতে থাকিবে। দেশে সুশৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিবে। সে মনের ব্যথা সহজে মুছিবে না অত্যাচারীর প্রত্যেক শব্দটী তাহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। তাহারা অভিমানের ভরে ভদ্রলোকদিগের সহিত আদান প্রদান করিবে না। তখন সকলের মনে রবীবাবুর সেই কথা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে—

> 'হা মোর দুর্ভাগা দেশ, যাহাদের কর অপমান
> অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।'

২

ছোটলোকদের প্রাপ্য সম্মান ছাড়তে ভদ্রলোকদের এত আপত্তি কেন? কিছুদিন আগে আমাদের দেশে ছোটলোকেরাই আমাদের মানুষ করিয়া তুলিত; আমাদের লালন পালনের ভার সেই ছোটলোকের হস্তে ন্যস্ত ছিল। তখন আমরা বাড়ীর ঝি চাকরের নাম ধরিয়া ডাকিতে সাহস পাইতাম না। 'দাদা' 'কাকা' বলিয়া চাকরকে ডাকিতাম ও সেও স্নেহভরে আমাদের কত আবদার শুনিত। কিন্তু যত দিন যাইতেছে ততই আমরা ঝি-চাকরের সম্মান নষ্ট করিতে ছুটিয়াছি। ফলে আমরা নিজেরাই অসম্মানের পাত্র হইয়া উঠিতেছি। চাকর আমার অপেক্ষা দরিদ্র ও মূর্থ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি? আমা অপেক্ষা দরিদ্র বলিয়া যদি আমি সেই নির্ধনকে অপমান করিতে ছুটি তবে সে অপমান তাহার নয়, আমার নিজের। আজ আমরা এ কথা ভুলিয়া গিয়াছি; ভুলিয়াছি বলিয়াই তো ছোটলোকদিগের প্রতি অসদাচরণের অভিপ্রায় মনের মধ্যে জাগিতেছে।

আমাদের এই ব্যবহারে আমাদের ক্ষতি যথেষ্টই কিন্তু ছোটলোকদের লাভ অনন্ত। তাহারা ভদ্রলোকদিগের আচরণে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিবে এবং নিজেদিগকে স্বাধীন ভাবে চালাইতে চেষ্টা করিবে। ফলে দেশে হাহাকার পড়িয়া যাইবে। পড়িয়া যাইবে বা বলি কেন পড়িয়া গিয়াছে।

দেশে পাটের কলের অভাব নাই। পাটের কলে কাষ করিলে বা দু'পয়সা করিতে পারিলে ম্যাথর ম্যাথর থাকে না। সে ম্যাথর আর এখন ঘৃণ্য হয় না, তখন ভদ্র-লোকের পরম বন্ধু হইয়া উঠে। তখন ভদ্রলোকেরা সেই ম্যাথরের করমর্দ্দন করিতে পারিলে কৃতার্থ বোধ করেন। কিন্তু তাহার জাত ভাইরা তাহাদের সম্মান দেয় না। সেও ভদ্রলোকের সংস্পর্শে আসিয়া জাত ভাইয়ের সম্মান ভুলিয়া যায়, তখন তাহার জাত ভায়েরা তাহার ঘৃণ্য হইয়া উঠে। ফলে এক শ্রেণীর মধ্যে একদল লোক অপর দলকে ঘৃণা করিতে থাকে—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

যখন ঘৃণাই নিজেদের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে তখন ঘৃণা মুছিয়া ফেলা কি উচিত নয়? ঘৃণাকে ত্যাগ করিয়া হৃদ্যতা করা কি শ্রেয় নয়? ভদ্রলোক ও ছোটলোকদের মধ্যে যে একটা অনীতির ভাব আছে তাহা কি মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে? অশিক্ষিত ও নীচকে শিক্ষিত ও উচ্চকরা কি ভদ্রলোকের কাযের বাহিরে? সমাজে যখন থাকিতে হইবে তখন আর ভণ্ড সাজিয়া লাভ কি? সমাজের মঙ্গল বিধানে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া আমাদের এই অপবাদ যাহাতে দূর হয়, তাহার বিধান করা উচিত। ছোটলোকও যে আমাদের দেশের ভাই—এই কথা মনে করিয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করাই এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কায।

আমরা পরাধীন। আমাদের মূর্খতারই জন্য আজ আমরা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী। তাই আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল মুছিবার সময় সমগ্র দেশবাসীর মধ্যে প্রীতির ভাব চাই। প্রীতির ভাব না থাকিলে সমাজের দেশের মঙ্গল সাধনা সুদূরপরাহত।

মানুষ মানুষকে ভালবাসিবে তাহাতে তো কোন লজ্জা নাই। তখন সমাজের একটা অঙ্গকে পদদলিত করা ভাল দেখায় না। দেশের মঙ্গলের জন্য সমাজের এই কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিতে হইবে। ফলে তখনই আমরা মানুষ হইব যখন আমাদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব দূর হইবে ও প্রীতির ভাব উদ্রিক্ত হইবে—ছোটলোককে ঘৃণার চক্ষে দেখিব না। দেশের অঙ্গ বলিয়া তাহাদিগকে কোলে তুলিয়া লইব। তাহাদের অভাব মনে মনে অনুভব করিব।

পল্লীস্বাস্থ্য

(শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায়)

বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে বাংলার অতি আদরের পল্লীগুলি একদিকে দিনে দিনে যেমন অনাদরে হতশ্রী ও ব্যাধির কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া উঠিতেছে, ঠিক অপর দিকে, কার্য্যতঃ না হউক অন্ততঃ মনে মনে তাহাদের সংস্কার ও উন্নতি বিধানের সঙ্কল্প সকলের মধ্যেই জাগিতেছে। এই সাধু সঙ্কল্পকে প্রকৃত চেষ্টায় ও সেই চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের কতকগুলি নিয়মানুসারে কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। আর এই কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে হইলে জনসাধারণের ও স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদিগের উভয়েরই একযোগে সাহায্য প্রয়োজন। অধিকাংশ পল্লী গুলিই ম্যুনিসিপালিটীর অধীনে নহে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডই সে গ্রামের পারিপার্শিক ও স্বাস্থ্যের সার্ব্বজনীন উন্নতির জন্য দায়ী। কিন্তু এই ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সভ্যগণ প্রায়ই অর্থাভাবের কৈফিয়ৎ দিয়া সে দায় হইতে মুক্ত হইবার সহজ পন্থা আবিষ্কার করিয়া থাকেন।

এই যে প্রতিবৎসর ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি করাল ব্যাধি পল্লীর বক্ষ হইতে অসংখ্য নর নারীকে উজাড় করিয়া লইয়া যাইতেছে। সাধের "পাখী ডাকা, ছায়ায় ঢাকা পল্লীবাট" এখন হিংস্রজন্তুসঙ্কুল গভীর অরণ্যে, "ধেনুচরামাঠ" মহাশূন্যে, দিনান্তে ঘরে জ্বালা দীপ" একটা বিরাট অন্ধকারে পরিণত হইতেছে—কেন কিসের জন্য? এর জন্য দায়ী কে? এর কারণ পল্লীর অস্বাস্থ্য, আর এর জন্য দায়ী গ্রামের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাঁহারাই কোথায় এ বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অশিক্ষিত জনসাধারণকে স্বাস্থ্যনীতির সাধারণ নিয়মগুলি শিক্ষা দিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দেশের কল্যাণে মনঃসংযোগ করিবেন, না তাঁহারই গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া দেশকে রাক্ষসীর মুখে তুলিয়া দিয়া, বালাম চাউল, কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো ও বৈদ্যুতিক পাখার মোহে প্রলুব্ধ হইয়া আজ সহরবাসি। নিশ্চেষ্ট, অলস, কর্ম্মশূন্য জীবন যাপনের ফলে দেহ বেশ স্থূলকায় হয় ও উদরে যথেষ্ট মেদ সঞ্চার হয় সত্য; কিন্তু এই দেহের স্থূলতার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিও এত স্থূল হইয়া পড়ে যে তাঁহার

নিজের সামান্য কর্ত্তব্যও ভুলিয়া যান। তাঁহাদের দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট রোগশোককাতর অধম অক্ষম গ্রামবাসীর যে জীবন ধারণের অধিকার আছে এ কথা অনুভব করিবার মত হৃদয়ও তাঁহাদের থাকে না।

পল্লী গ্রামের সংস্কার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই মোটামুটিভাবে কতক গুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

১। সাধারণে শিক্ষাদান।

২। পরিস্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা।

৩। দূষণাদি হইতে রক্ষা।

৪। রোগ নিবারণের উপায় নিরূপণ।

১। সাধারণে শিক্ষা দান—প্রত্যেক পল্লীবাসীকেই সাধারণ ভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলাই প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া চাই। এই শিক্ষার উপরেই পল্লীর উন্নতি নির্ভর করে। কারণ সাধারণকে দেশের ভাল মন্দ বিচার করিবার উপযোগী করিয়া না তুলিলে, উন্নতির দিকে যতই কেন চেষ্টা হউক না কেন, সমস্তই বৃথা হইবে। অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসগুলির কি বিষময় পরিণাম তাহা ম্যাজিক লণ্ঠন (lantern slides) বা সরল ভাষায় বক্তৃতার দ্বারা জন সাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। অল্পস্থানে অতিরিক্ত লোকের বাস বা লোক সমাগমের কুফল, ধূলার অপকারিতা, অপরিচ্ছন্নতার দোষ এই সমস্ত সকলকে বলিয়া দিতে হইবে। শিশুদিগের মৃত্যু সংখ্যা কি প্রকারে হ্রাস হইতে পারে, কলেরা টাইফয়েড আদি ব্যাধি হইতে কি উপায়ে আগে হইতে যত্ন লইলে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে এই সমস্ত বিষয় তাহাদের সহিত বসিয়া বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইবে। দূষিত বায়ু সেবন, অপরিষ্কার জল পান, অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস প্রভৃতির কুফল তাহাদের চক্ষের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে ধরিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলে করিতে হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সম্মিলিত শক্তি ও সাহায্য প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশস্থলে দেখিতে পাই যে যাহারা অভাবগ্রস্ত তাহারা চির দিনের অজ্ঞানতার মোহে অন্ধ হইয়া অলস হইয়া থাকেন যাহার ব্যথা সে যদি তাহা প্রাণ দিয়ে অনুভব না করে তবে অপরের আহা! উঃ হুঃ তে আর যাই হোক নিবারণের কোনও উপায় হয় না।

পল্লী গ্রামের অধিকাংশ কুটীরগুলিও মাটির তৈয়ারী এবং একটি মাত্র দ্বার ভিন্ন অন্য কোন স্থান দিয়া বাহিরের বাতাস বা আলোকের প্রবেশাধিকার নাই। ফলে ক্ষয়রোগ ধীরে ধীরে পল্লীগ্রামেও আপনার অধিকার বিস্তার করিতেছে।

গরুবাছুরগুলি বাসগৃহের সম্মুখে বা গৃহসংলগ্ন প্রাঙ্গনে থাকে এবং রাশি রাশি গোময় স্তূপীকৃত হইয়া গৃহস্বামীর স্বাস্থ্যনীতি জ্ঞানের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

এই সমস্ত কুটীর নির্ম্মাণকালিন মৃত্তিকাসমূহ পার্শ্বস্থিত স্থান হইতে গভীর ভাবে খনন করিয়া আনান হয়। এর অনিবার্য্য ফলে ঐ সমস্ত উৎখাত স্থান দূষিত জলে পূর্ণ হইয়া মশককুলের বংশ বৃদ্ধি করিবার সহায় হয় এবং অনেক সময়ে এই জল দ্বারা বাসন মাজা, মুখধোয়া প্রভৃতি অনেক গৃহস্থালীর কার্য্যও সম্পাদিত হয়। এই জন্যই জনসাধারণকে স্বাস্থ্যের উপযোগী করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ বিষয়েও শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

২। পানীয় জল। পল্লীগ্রামে পরিস্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা করাও একটা মহাসমস্যা! জলকষ্টই পল্লীগ্রামের একটা বিভীষিকা! পুস্করিণী, ডোবা, কূপ প্রভৃতি যে কোন জলাশয় হইতে পানীয় জল সরবরাহ হইয়া থাকে। গ্রামে একটা পুস্করিণী থাকিলে তাহার জল পঙ্কিল ও দূষিত হইবেই, কারণ মুখ ধোয়া, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রোগীর বিছানা কাচা, মূত্রত্যাগ, নিজে স্নানকরা ও গরু বাছুর ভেঁড়া প্রভৃতি জীবজন্তুকে স্নান করান সমস্ত কাযই ঐ এক পুস্করিণীতেই করিতে হইবে। আর স্বাস্থ্যনীতির কোনরূপ অনুশাসন না মানিয়া কূপ খনন করিবে ঠিক পাইখানা বা কাঁচা ড্রেণের অতি সন্নিকটে যাহাতে পূতিগন্ধময়, বমনোদ্দীপক, সর্ব্বরোগ উৎপাদক দূষিত কূপজলের ব্যবস্থা করা হয়। লতাগুল্ম, ছোট ছোট গাছ প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য তাহার পাড়ে জন্মায় ও তাহাদের শুষ্ক পত্র গুলি কূপের জলে অনবরত পড়ে। এই নৈসর্গিক শোভা সম্পূর্ণ করিবার

জন্য বিহঙ্গ-কুলও অদ্ধি সন্ধি খুঁজিয়া বাসা বাঁধে এবং নিশ্চয়ই নবদ্বার নিষিদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে না। গ্রামের বালকবালিকারাও ফুল, নারিকেল ছোবড়া, থুথু, ইট প্রভৃতি ফেলিয়া কোন্‌টা ভাসে কোন্‌টা কিরূপ শব্দ উৎপাদন করে বৈজ্ঞানিক জগতের এই মৌলিক তথ্য টুকু আবিষ্কার করিবার প্রলোভনও নিশ্চয়ই ত্যাগ করে না। তারপর পল্লীবাসী ক্ষিপ্রহস্তে গরুর দড়ীটা খুলিয়া লইয়া স্ব স্ব ঘটি বা ঘড়া বাঁধিয়া ঐ কূপজল তুলিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা করেন।

এই সমস্ত অপকারের প্রতীকার করিতে হইলে জন সাধারণকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে, ইহা কতদূর অনিষ্টকর তাহা বুঝাইয়া দিতে হইবে, নচেৎ আপনা হইতে তাহাদের এ অভ্যাসের পরিবর্ত্তন হইবে এরূপ আশা করাই অন্যায়। পরিষ্কার পানীয় জলের কোনরূপ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। গ্রামে একটা কিম্বা দুইটা আদর্শ পুষ্করিণী খনন করাইয়া যাহাতে কেবল মাত্র পানীয় জলের জন্য তাহা ব্যবহৃত হয় সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্ষীণ স্রোত নদীর জলও পুষ্করিণীর জলের মত কলুষিত হইবার সম্ভাবনা কেননা তাহাতে সাধারণ পাইখানার কার্য্যগুলিও সম্পন্ন হয় এবং কলেরা ও টাইফয়েডের জীবাণুগুলি জলের সহিত আসিয়া বিনা পরিশ্রমে লোক মধ্যে প্রকাশ পাইবার সুযোগ পায়। এই জন্য এই সমস্ত জলাশয় হইতে জল লইয়া না ফুটাইয়া পান করা বিধেয় নহে। সাধারণকে পরিষ্কার পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা এবং এই দূষিত জলের অপকারিতা সম্বন্ধে সম্যক রূপে শিক্ষা দেওয়া উচিত। সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ এ সম্বন্ধে অবহিত না হইলে অর্থসাপেক্ষ কাজ চিরদিনই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

৩। দূষনাদি হইতে রক্ষা।—দূষিত পদার্থ সম্পূর্ণ রূপে দূর করা সুকঠিন। মানুষের মলমূত্র, গৃহের ও অন্যান্য আবর্জ্জনা, অপরিষ্কার আবদ্ধ জল ইত্যাদি কি প্রকারে দূর করা যাইতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে। মিউনিসিপালিটী বিহীন স্থানে পাইখানা বা মলমূত্র ত্যাগ করিবার স্থানের কোনরূপ সুব্যবস্থা নাই। লোকে সচরাচর সে কার্য্যটা মাঠে বা নদীর ধারে সারিয়া লইয়া থাকে। ইহার মানে অনেক প্রকারের পরাঙ্গপুষ্টজীব (parasites) উদার মনুষ্যদেহে আশ্রয় গ্রহণ করে তন্মধ্যে ক্রিমি এবং শোণিত শোষক বক্রদন্তী কীটের (Hook worm) প্রভাবই বেশী; কলেরা বা টাইফয়েড দূষিত জলের মধ্য দিয়াই গ্রামে ছড়াইয়া পড়ে। যতদিন সঙ্গতিপন্ন এবং শিক্ষিত জনসম্প্রদায় এই খোলা মাঠে বা বনে পাইখানার কার্য্য সমাধা করিবেন, ততদিন এই কু-অভ্যাস গুলি সাধারণের ভিতর হইতে দূর করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়াই থাকিবে। ছোট ছোট বালক বালিকারা উঠানে, বাড়ীর ভিতরে বা বাহিরে যে কোন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে। সুতরাং প্রত্যেক বাড়ীতে পাইখানা প্রস্তুত করান প্রয়োজন। ইহা ব্যয়সাপেক্ষ বা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর না হইলে বসত বাটীর এবং পানীয় জলের জলাশয় হইতে কিছু দূরে সাধারণ পাইখানা নির্ম্মাণ করান উচিত এবং প্রত্যেক লোককে ঐ পাইখানায় যাইতে বাধ্য করিতে হইবে। এই সাধারণ পাইখানা পরিষ্কার রাখিবার জন্য গ্রামবাসীদের মধ্যে চাঁদা করিয়া মেথর নিযুক্ত করা দরকার। ইহাও যদি সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে ১ ফুট প্রস্থ, ১॥ ফিট গভীর ও ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ করিয়া গর্ত্ত কাটিয়া খানা পাইখানা (trench latrines) প্রস্তুত অতি সহজেই হইতে পারে এবং প্রত্যেকে নিজে নিজের ময়লা মাটি চাপা দিয়া আসিতে পারে। এই সমস্ত স্থানে যাহাতে গরুবাছুর যাইতে না পারে সে জন্য বেড়া দিয়া উত্তমরূপে ঘিরিয়া রাখা প্রয়োজন।

বাড়ীর কোণে কোণে আবর্জ্জনা, ধূলা শুষ্ক পত্রের রাশি ও গোময় প্রভৃতি সঞ্চিত হইয়া পচিয়া দুর্গন্ধ হয় এবং মশা ও নানা রোগের সৃষ্টি করে। বাড়ীর বাহিরে বা রাস্তায়ও এই সমস্ত আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ সেখানে পচিলে গোময় চন্দন হইয়া যায় না, উপরন্তু বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে সেই সমস্ত ময়লা ধৌত হইয়া পার্শ্বস্থিত পুষ্করিণীতে পড়িয়া তাহাকেও দূষিত করিয়া তোলে। সুতরাং সমস্ত আবর্জ্জনা গ্রামের বাহিরে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গর্ত্ত করিয়া পুতিয়া ফেলাই প্রয়োজন।

গ্রামে অন্ততঃ ছয়মাস অন্তর বন জঙ্গল আগাছা প্রভৃতি কাটান এবং রাস্তাঘাট প্রত্যহ পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। আগাছার পরিবর্ত্তে গ্রামে নিমগাছ ও গৃহের চতুর্দ্দিকে তুলসী গাছ লাগান ভাল, কারণ তাহাতে স্বাস্থ্যের উপকারই হয়। দূষিত জলপূর্ণ ডোবা, খানাখন্দ প্রভৃতি মাটি ফেলিয়া পূর্ণ করা উচিত, কেননা তাহাদের অনিষ্টকারি ক্ষমতাটাই বেশী।

পল্লীগ্রামে মুনিসিপালিটীর অধিকৃত কি অনধিকৃত অধিকাংশ স্থানেই অপরিষ্কার জল, বৃষ্টির জল এবং অন্যান্য দূষিত জলের একমাত্র নির্গমন পথ কাঁচা পয়োনালা। সাধারণতঃ এই সমস্ত পয়োনালার কোনই উপকারিতা নাই এবং এতই অপরিস্কার ভাবে থাকে যে অতি দুর্গন্ধময় আস্তাকুড়ও ইহা অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। অনেক সময়ে তাহার উপর বা আশেপাশে ছোট ছোট গাছ জন্মায় এবং জল নিকাশের বিশেষ বিঘ্ন ঘটায়। পল্লীগ্রামের উপোযোগী করিয়া পয়োনালা করিতে হইলে তাহার আদর্শ এইরূপ হওয়া প্রয়োজন।

১। পয়োনালা যথারীতি ঢালু হইবে এবং সম্ভবমত স্থানে স্থানে ইট সুরকি দিয়া পাকা করিতে হইবে।

২। মাঝে মাঝে নিয়ম করিয়া ময়লা ও সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করিতে হইবে।

৩। এই সমস্ত পয়োনালার জল কোন পুকুরে বা অন্য কোন জলাশয়ে পড়িবে না।

৪। প্রণালী করিয়া মনুষ্য আবাসের বাহিরে ইহার জল নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মৃত দেহের ব্যবস্থা—মানুষ কিম্বা কোন জীবজন্তু মরিলেও তাহার ব্যবস্থা অতি শীঘ্র করিতে হয়। পল্লীগ্রামে পশুপক্ষী রাস্তার কিম্বা মাঠে ফেলিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হয়। পরে শৃগাল, কুকুরে টানিয়া আনিয়া অনর্থ ঘটায় এবং তাহা পচিয়া দুর্গন্ধে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠে। মানুষের মৃত দেহের সৎকারও যেখানে সেখানে হয়, কখন নদীরজলে ফেলিয়া দেয়, কখন আবার বাড়ীর সন্নিকটে মাটীতেও পুতিয়া ফেলে। এসমস্ত বড়ই গুরুতর অপরাধ এবং ইহা স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি করে। এই জন্য এই মৃতদেহ সৎকার বিষয়েও কতকগুলি নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

শবদাহের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা প্রয়োজন। গ্রামে নদী থাকিলে নদীর ধারে দাহ করিবার ব্যবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। মৃতের কাপড় বিছানা প্রভৃতি পোড়ান এবং পরে সমস্ত ভস্ম নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক দরিদ্র গ্রামবাসী অর্থাভাবে কাষ্ঠ সংস্থান করিতে না পারায় মৃতদেহ দাহ না করিয়া বা অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়। ইহাতে জল দূষিত হইয়া অনেক রোগ উৎপাদন করে। গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকে গরীবকে এবিষয়ে সাহায্য করিলে দেশ অনেক অকল্যাণের হাত হইতে মুক্তি লাভ করে।

মুসলমানদিগের গোরস্থানও মনুষ্য আবাসের সন্নিকটে হওয়া উচিত নহে। সমাধিস্থানের গর্ত্ত অন্ততঃ ৬ ফিট গভীর, ১॥ ফিট প্রস্থ এবং পার্শ্ববর্ত্তী কবর হইতে ২ ফিট দূরে হওয়া কর্ত্তব্য। সমাধি ক্ষেত্রে যাহাতে শৃগাল কুকুর প্রবেশ করিতে না পারে সেই জন্য ঘিরিয়া রাখা প্রয়োজন। মাটীর আর্দ্রতা নষ্ট করিবার জন্য কবরের উপর ঘাস ও ছোট গাছ লাগান ভাল।

রোগ নিবারণ—পল্লীগ্রামের শোচনীয় অবস্থার আর একটি প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া। বর্ষাকালে এমন একটি ঘর থাকে না যেখানে ৫ জনের মধ্যে ৩ জন না ভুগে। তারপর ম্যালেরিয়া বারোমাসই বন্ধুর মত, পরমাত্মীয়ের মত আমরণ ছায়ার মত সহগামী হইয়া থাকে। ক্ষীণ হস্তপদ, রুগ্নদেহ, রুক্ষকেশ, বৃহৎ প্লীহা, ও যকৃত প্রভাবে স্ফীত উদর বিশিষ্ট একএকটি গ্রামবাসী পঞ্জিকার পৃষ্ঠে সালসার বিজ্ঞাপনের সালসা ব্যবহারের পূর্ব্বাবস্থার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি হইয়া বাস করে। এই দুষ্ট ব্যাধির নিরাকরণ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, কারণ ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার একের চতুর্থাংশ উৎপত্তির স্থান এই পল্লীগ্রামে। সহরে বা পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া নিবারণের সাধারণ পদ্ধতি এক হইলেও, সহরে যাহা সম্ভব, নানা কারণে পল্লীগ্রামে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোক শুধু দরিদ্র নহে, স্বাস্থ্যনীতির মোটামুটি নিয়ম সম্বন্ধেও অজ্ঞ বা অন্ধ। মশকের দংশন

হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য জাল দিয়া বাড়ী ঘেরা, বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা বা অন্য কোন বহু ব্যয়সাপেক্ষ কার্য্য করা সম্ভবপর নহে। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা অর্থাৎ এনোফিলিস্ জাতীয় মশকের (Anophilines) সংখ্যা যাহাতে হ্রাস পায় তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যনীতির সামান্য জ্ঞানও যাঁহার আছে, তাঁহাকে এ বিষয়ের ভার লইতে হইবে। সুযোগ্য চিকিৎসকের অধীনে থাকিয়া চল্‌তি দাতব্য ঔষধালয় [travelling Charitable Dispensary] হইতে কুইনাইন বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিলে গ্রামবাসীদের বিশেষ উপকার হয়।

রোগপ্রতিষেধকল্পে কুইনাইন এবং মশারি ব্যবহারের উপকারিতা সম্বন্ধে সকলকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। অনেক লোকের মনে এমন কি শিক্ষিত লোকের মধ্যেও কুইনাইন সম্বন্ধে যে কুসংস্কার আছে তাহা সম্পূর্ণ রূপে দূর করিয়া দিতে হইবে।

ব্যাপক রোগ নিবারণ [Epidemic diseases] গ্রামের কোন বাড়ীতে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, টাইফয়েড প্রভৃতি হইলে গ্রামবাসীদের সাবধান হইতে হইবে।

রোগীর মলমূত্র প্রভৃতি সমস্ত নিঃসৃত পদার্থ যথা সম্ভব সত্বর সরাইয়া ফেলিয়া গৃহের সংক্রমণ দোষ বিশোধন করিতে হইবে।

মাছি ঐ সমস্ত রোগের জীবাণু বহন করে সেই জন্য সমস্ত খাদ্য ও জল ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয় এবং তাহা সিদ্ধ করিয়া আহার করা উচিত।

রোগীর কাপড় বা বিছানা কাচা, বাসন মাজা প্রভৃতি পুষ্করিণীর জলে করিতে নাই।

পুষ্করিণী বা কূপের জল দূষিত হইয়াছে এরূপ সন্দেহ হইলে চিরঞ্জন চূর্ণ [Bleaching powder] দ্বারা শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

রাঁচির স্মৃতি

[শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায়]

(গল্প)

১

ইংরাজী সাহিত্যে সসম্মানে এম, এ, পাশ করিয়াও যখন এত বড় দেশে একটা কাজ খুঁজিয়া পাইলাম না, তখন বাবা ও মা একটী লজ্জানম্র ঘোমটা-পরা বধূর সঙ্গে আমার যাহাতে মিলন হয়, তাহারি চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। অবস্থা আমাদের মন্দ না হইলেও বিবাহ করিতে মোটেই তখন ইচ্ছা ছিল না। এমনি সময়ে খবরের কাগজে রাঁচিতে মোটা মাহিনায় একটী মাষ্টারী জুটিল। সহসা বাবা ও মাকে অনেক বুঝাইয়া 'দুর্গা শ্রীহরি' বলিয়া রাত্রি সাড়ে নটায় রাঁচি এক্সপ্রেসে চড়িয়া বসিলাম।

কাগজে পড়িয়াছিলাম—একটী ছাত্রকে ইংরাজী পড়াইতে হইবে। মাসিক মাহিনা একশত টাকা। কিন্তু রাঁচির ষ্টেশন হইতে বহুদূরস্থিত ডাক বাংলোটীর সম্মুখস্থ একখানি সুদৃশ্য একতলা বাড়ীর নিকটে যখন পুশ্-পুশ্ হইতে ভ্রমণ-ক্লান্ত হইয়া নামিলাম, তখন গেটের নিকটে দণ্ডায়মানা একটী সুবেশা তরুণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তিনিই আমার শিষ্যা। জিনিষপত্র যথাস্থানে নামাইয়া যখন বাহিরের রুক্ষ কঠোর ভূমির উপর চায়ের টেবিলে বসিলাম, তখন দেখি—দাড়িগোঁফ-কামানো একটী ভদ্রলোক ঢিলা পায়জামা পরিয়া আসিয়া সাদরে আমার করমর্দন করিলেন। অন্তরতম বন্ধুর মতই তিনি

সহজভাবে আমার পাশে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'যে আপনাকে আজ অভ্যর্থনা করেছে, সে আমার ভাই-ঝি প্রতিভা। ও এবার বি, এ, দেবে: ইংরাজীটা মাস দুই-এ একরকম তৈরি করে দেবেন, আর ততদিনে আপনি অন্য একটা কাজও জুটিয়ে নিতে পারবেন? কি আপনার নামটী বল্লেন যে—'

এ পর্য্যন্ত আমি তাঁহাকে কোনই পরিচয় দিই নাই। আমি সলজ্জে বলিলাম, 'শ্রীনলিনকুমার গাঙ্গুলি।'

সিগারটী ধরাইয়া শীতল বাবু বলিলেন, 'তাহলে আমাদেরই জাত! প্রতিভা, চা যে আজ জুড়িয়ে গেছে মা! মাষ্টার মশাই না, না, কি যেন আপনার নামটী বললেন।'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'নলিনকুমার গাঙ্গুলি। 'মাষ্টার' বললেই যথেষ্ট হতো আমিত আপনার ছেলের মত।'

'হাঁ, ভূপেন বেঁচে থাকলে তোমারই মত হত বটে। ঐ দেখুন! আপনাকে একেবারে 'তুমি' বলে ফেল্লুম। মাপ করবেন, কিছু মনে করবেন না! সম্প্রতি বেদের প্রাচীনতার সম্বন্ধে একটা ইংরাজি প্রবন্ধ লিখছি, আমার মাথাটা জার্ম্মান্ ও ফরাসী ভাবে ভরা রয়েছে। আপনি বোধ হয় ও ভাষা দুটো জানেন না? তা, আপনাকে শিখিয়ে নিতে পারি। এই ধরুননা, বপ্ ও গোল্ডষ্টুকর্ বলছেন—,

সবুজ শিল্কের শাড়ী-পরা চায়ের পেয়ালা হস্তে প্রতিভা আসিয়া সহসা বলিল, 'মাষ্টার মশাই' আমার জ্যেঠা মশাইকে আপনি এখনো চিনতে পারেন নি! শ্রোতা একবার পেলে হয়! আজকের প্রথম দিনটা হাল্কা গল্পেই কাটুকনা!' বলিয়া সে হাসিয়া ফেলিল। শীতল বাবু তখন বেতের সোফার উপর হেলিয়া পড়িয়া চুরুটে দম দিতেছিলেন।

দেখ, মাষ্টার, প্রতিভা ত হিষ্ট্রি পড়েনা ভাল করে, তাই যা-তা বলে। তুমি ওর হিষ্ট্রিটাও সময়মত একটু দেখো। চব্বিশ ঘণ্টাই পিয়ানো নিয়ে আছে, আর ঐ ছোট গল্প লেখা! আচ্ছা, তুমিই বল, ওতে কি হবে? যে লেখায় রিসার্চ্চই না রইলো, তার মর্য্যাদা কি বলত? পড়কার্লাইল, এমার্সন, কাণ্ট, বার্গ্‌সঁ; আর নয়ত পড়— বেদের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।'

প্রতিভা সম্মুখের আর একটী চেয়ারে বসিয়া হাস্যোজ্জল মুখে বলিতে লাগিল, 'এখন পিয়ানো আর ছোট গল্পের নিন্দে হচ্ছে, তারপর সন্ধ্যা বেলায় মজা দেখবেন! তখন গান শোনা চাই-ই চাই, আর গান শোনা হয়ে গেলেই কোথায় মোপাসাঁ, কোথায় হাউপ্‌টমান, কোথায় শ'—। সে দেখবেন এখন কাণ্ডটা! কিরণ বাবুর সঙ্গে সেদিন ঋগ্বেদের রচনা-কাল নিয়ে জ্যেঠা মশাইয়ের কি তর্ক! তিনি অক্স্‌ফোর্ডের হিষ্ট্রিতে অনার্স, তিনি বল্লেন—চার হাজার, আর ইনি বলেন দশ হাজার বছর! শেষকালে এই টেবিলটা যখন পুস্তকের বোঝায় কাত্ হয়ে পড়বার যোগাড়, তখন এক পশলা বৃষ্টি এসে ছয় হাজারেই রফা করে দিলে! তবু কি ছাড়েন? পরদিনই আবার কিরণ বাবুকে আদালত থেকে আনালেন। ওঁর যে দুখানা বই আমেরিকা থেকে ছেপে বেরিয়েছে, সে দুখানায় আবার কাটাকুটি চলতে লাগলো। তাই বলি দেশ ছেড়ে এসে জ্যেঠামশাই বেশ কাঠখোট্টা যায়গাটী মনের মত করে খুঁজে নিয়েচেন! আপনার কেমন লাগছে, মাষ্টার মশাই?

শীতল বাবু কহিলেন, 'দেখ, তোমার ওপ্রশ্নটা করা ঠিক হয়নি। উনিত মাত্র তিন ঘণ্টা হলো এসেছেন। কেমন হে, মাষ্টার? একটা যায়গার সব বুঝে নিতে অন্ততঃ তিনমাস লাগবে, আর তিনমাস লাগবে মতামত ঠিক করতে। কি বল?,

আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে হাঁ, তাত ঠিক।'

চৈত্র মাসের মধুর জ্যোৎস্নায় ক্রমে মাঠখানি ভরিয়া গেল। মেঘগুলি যেন খুব কাছে, বাতাসটা যেন বেশ মোলায়েম বলিয়া মনে হইল। আমার সমস্ত ব্যাপারটা এমনিই নূতন ও অভিনব বলিয়া মনে হইতেছিল যে আমি চায়ে চিরকাল অনভ্যস্ত হইলেও কখন যে দুই পেয়ালা চা সেই দারুণ গ্রীষ্মে উদরসাৎ করিয়া ফেলিলাম, তাহা আমি নিজেই বুঝিতে পারিলাম না। এই ক্ষুদ্র পরিবারটীর সংসারে বেশী দাবীদাওয়া নাই। শীতল বাবু অবসর প্রাপ্ত সেশন্স্ জজ্ আর প্রতিভা পিতৃমাতৃহীনা আদরনীয়া পুত্রীস্থানীয়া। সম্পূর্ণ ব্রাহ্ম মতাবলম্বীও নয়,

হিন্দুয়ানির বজ্রবন্ধনেও বাঁধা নাই—এ এক বেশ মজার পরিবার! আর এই সরলহৃদয়া মেয়েটী—এ আমার সমক্ষে কোনই কপট লজ্জা করে না, প্রাণ খুলিয়া হাসে প্রাণ খুলিয়া কথা কয়, প্রাণ খুলিয়া ঠাট্টা করে। আমার কিন্তু বড়ই লজ্জা করিতে লাগিল। ইহাকে পড়াইব কি করিয়া—তাহাই আমার বিষম সমস্যা হইল। অনেক ইংরাজী ও বাংলা গল্পে পড়িয়াছি, কি রূপে ছাত্রীর প্রতি প্রেম-সঞ্চার করিয়া মকর-কেতন বিজয় নিশান উড়াইয়াছেন। ভয়ে, ভাবনায়, লজ্জায় আমি একরূপ অস্থির হইয়া পড়িলাম।

২

দক্ষিণ দিকের সুপ্রশস্ত বারাণ্ডায় বসিয়া প্রতিভাকে পড়াইতেছি। শীতল বাবুকে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অধ্যয়ন আগারের বাহিরে আর দেখা পাবার সম্ভাবনা নাই। সে দিন রবিবার। হুহু করিয়া বর্ষা-স্নিগ্ধ মধুর বাতাস ছুটিয়া আসিয়া প্রতিভার অস্নাত কেশপাশ বিস্রস্ত করিয়া দিতেছিল। এই মেয়েটীর অফুরন্ত আনন্দের উৎস ইহার সর্ব্বাঙ্গে একটা অপরূপ লাবণ্য ও তারুণ্য আনিয়া দিয়াছে। কোন বিষয়ই তাহার নিকট শক্ত ঠেকেনা, একবার ইঙ্গিত করিলেই সমস্ত বিষয়টী বুঝিয়া লয়, আর কি তীক্ষ্ণ ধীশক্তি! সেদিন পড়া হইয়া গেলে প্রতিভা একখানি ছোট নীল সিল্কে বাঁধা খাতা আনিয়া তাহার রচিত গোটাকয়েক ছোট গল্প শোনাইল। সে বাংলা ভাষাটা রীতিমত আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে দেখিলাম। কয়েকটী গল্প আমার বেশ ভাল লাগিল। সব গুলিই বাংলা দেশের পল্লীচিত্র,—সব গল্পেই আধুনিক রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা ছাপ আছে। আমি কিন্তু এই নারীটিকে এখনো বেশ ভাল বুঝিতে পারিলাম না, অথচ তাহার সঙ্গে প্রায় সারা দিবসই আমার কাটিয়া যায়।

'আচ্ছা, মাষ্টার মশাই, এই যে দেশময় একটা ভাবের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, বলতে পারেন কোথায় গিয়ে এর শেষ? আমার ত মনে হয়, ভাব যখন আকুল হয়ে ওঠে বুকের ভিতর, তখন সে ভাষা পাবেই। আমাদের এই আকুল ক্রন্দন একদিন বিশ্বেশ্বরের দরবারে পৌছিবেই পৌছিবে।'

বলিতে বলিতে প্রতিভার প্রতিভাদীপ্ত সুন্দর আননে একটা অপরূপ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। সে জ্যোতিরেখা এ পর্য্যন্ত একদিনও দেখি নাই। চাঁপা রংএর সিল্কব্লাউজের মধ্য হইতে তাহার দেহের একটা তরুণ দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইল, সেই প্রীতি-ফুল্ল নয়নদ্বয় হইতে শাক্ত তেজ বাহির হইল, সে সজোরে ফাউন্টেন-পেনটা টেবিলের উপর ফেলিয়া বলিল, জগতের দরবারে আমাদের কোথায় আসন, দেখুন দেখি!'

আমি মহা সমস্যায় পড়িলাম। রাজনীতি আমার মাথায় ঢুকিত না, সংপ্রতি খবরের কাগজ পড়িতাম বটে, কিন্তু বিদেশে শিক্ষকতা করিতে আসিয়া রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে আমি মোটেই রাজী ছিলাম না। আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, আজ আসুন আমরা মিলটন্‌টা শেষ করে ফেলি।'

আবার যে বড় 'আপনি' বলছেন? আপনার ভারি অন্যায় মাষ্টার মশাই!'

না,—না, আপনি যে বুঝতে পারছেন না! ষোড়শ-বর্ষ অতিক্রম হয়ে গেলে ছেলের সঙ্গেই বন্ধুর মত ব্যবহার করতে হয়—তা জানেন ত? আচ্ছা বেশ, এখন বলুন ত, আমরা বন্ধু কি না?'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই আমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল। প্রতিভা হাসিয়া কহিল, 'তবে আপনিই হারিলেন কিন্তু। আপনি ত গুরু, আমি ত শিষ্য। তবে কেমন করে আপনি আমায় সম্মান করেন? লজিকে আপনার তর্কটাকে কি বলে, জানেন ত?' বলিয়াই সে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। প্রভাতের সেই প্রশান্ত নীরবতাটী আনন্দ-হিল্লোলে ভরিয়া উঠিল।

'না, মাষ্টার মশাই, আপনি বাংলা দেশের নারীদের অবস্থা যে কি হয়েছে, তা এখনো বুঝতে পারেন নি। এ দেশ দেখে কে এখন বলবে যে এই খানেই সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা জন্মেছিলেন? কে বলবে যে দধীচীর বুকের হাড় এ দেশেই দান করা হয়েছিল? কে বলবে যে পতির নিন্দা শুনে সতী আগুণে ঝাঁপ দিয়েছিলেন এই দেশেই? অতীতের একটা শ্মশান-অন্ধকার

আমাদের দেশের উপর যেন ঝুঁকে পড়েছে!

কয়দিন ধরিয়া প্রতিভাকে খুব খবরের কাগজ পড়িতে দেখি। আমি নিঃসঙ্গ অবস্থায় মোরাবাদি-পাহাড়, রাঁচি-হিল ও লেক্, মিশানারীগণের কুঠী ও রেল-লাইনের ওপারে ডোরোণ্ডায় গিয়া বেড়াইয়া আসি। কখনো বা একটা উচ্চাবচ স্থানে বসিয়া মুণ্ডা তরুণীদের সুর-লয়-হীন গান শুনি। তাহারা কানে ফুল গুঁজিয়া দিনের কাজ সারিয়া স্বাস্থ্যসম্পৎপুষ্টদেহে পাহাড়ে পথ দিয়া আনমনে চলিয়া যায়। কখনো ছোট ছোট ভাসা ভাসা মেঘখণ্ডগুলি দেখিতে দেখিতে স্বদেশের কথা মনে ভাবিতাম। কিন্তু আজকাল একটা মস্ত বড় চিন্তার বিষয় হইয়াছে যে কেমন করিয়া প্রতিভাকে চমৎকৃত করিয়া তুলিব। কারণ পড়িবার ও চা খাইবার সময় ছাড়া তাহাকে এখন আর সর্ব্বদা দেখিতে পাই না। যখনই দেখিতে পাই, তখনই লক্ষ্য করি যে সে মুখে বিষাদের একটা কালো ছায়া পড়িয়াছে। সে যেন বড়ই অন্যমনস্কা। কিন্তু একদিনও পড়ার অবহেলা করিতে দেখিনাই।

ক্রমশঃ শুনিলাম যে তাহার জ্যেঠামহাশয় এই কিরণ বাবুটীর সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিরণ মুখোপাধ্যায় সিভিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট—তিনিও এই প্রতিভারত্নটিকে শিরোমুকুট করিবার জন্য ধনুকভাঙ্গা পণ করিয়া বসিয়াছেন। কিরণ বাবু লোকটী বড়ই দাম্ভিক সাহেব, পরিচয় পাওয়া সত্বেও এ পর্য্যন্ত এই নগণ্য মাষ্টারের সঙ্গে একদিনও কথা কন নাই। একে আমি অজ পাড়াগেঁয়ে, তায় মাষ্টার!

সহসা একদিন সকালে দেখি—প্রতিভা ব্লাউজ, সেমিজ, শাড়ী, জুতা, ব্রেসলেট, রিষ্ট-ওয়াচ ছাড়িয়া একখানা খদ্দরের শাড়ী পরিয়া পাঠাগারে অপূর্ব্ব বেশে আসিয়া হাজির! প্রতিভাকে দেখিলেই আমার একটা প্রীতিপূর্ণ সম্ভ্রমের ভাব মনে উপস্থিত হইত। আমি গোঁড়া হিন্দুর ছেলে—আমি ত্রিসন্ধ্যা করিতাম, শুচিবাস পরিতাম, নিজের রান্না নিজে করিতাম, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতাম—এ সমস্ত সে লক্ষ্য করিত। প্রথমে শীতল বাবু খুব আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার স্নেহময়ী ছাত্রী বলিল, 'তা, জ্যেঠামশাই ওঁর যদি খানসামার হাতে খেতে অভক্তি হয়!' তখন শীতল বাবু সম্মতি দিয়াছিলেন। আজ প্রতিভার এই অপূর্ব্ব অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিয়া আমি আনন্দে বলিয়া ফেলিলাম, 'এ কি, প্রতিভা! এ তোমার কি বেশ হয়েছে!' পরমুহূর্ত্তেই আমি নির্ব্বাক হইয়া পড়িলাম—আর আমার কথা ফুটিলনা। কিন্তু প্রতিভা সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাবে বলিল, 'শুনুন কাল রাত্রে জ্যেঠামশাই-র সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি আর বিদেশী চালে চলতে পারবোনা। দিনরাত কি একটা ভুল, একটা মিথ্যা একটা আবছাওয়া নিয়ে কাজ করা যায়? আমি যেন আমার এই সমস্ত মিথ্যা আড়ম্বরের ভিতর থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছি। এই ইংরাজী, এই চা, এই পোষাক, এই কেতাদুরস্ত-ভাব আমায় যেন কণ্ঠ চেপে মেরে ফেলছে! পাখীকে সোনার খাঁচায় ক্ষীর-সর খেতে দিলেও সে ঐ নীলাকাশের অসীম দেশে ছুটে যেতে চায়। তবে আমি পড়াটা এখন ছাড়বো না, আসুন আজ কালাইল শেষ করি।'

তাহার সুসংযত দৃঢ়তা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। বেশ বুঝিতাম—সে আমায় মনে মনে ভক্তি করিত, আমার আচার-পূত ব্রাহ্মণাদর্শে সে একেবারে মুগ্ধমানা হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের বাড়ীর সকল গল্পই সে শুনিয়াছে, সে সেই পাড়াগাঁর স্নিগ্ধ শীতল জীবনের একটা ক্ষীণ আভাস পাইবার জন্য ছটফট করিত, তাহাও জানিতাম। সে কেবলি বলিত—'আপনাকে দেখে আমার সেই শ্মশানচারী মহেশ্বরকে মনে পড়ে। খোলা গায়ে আপনাকে বড়ই সুন্দর দেখায়। সেই গৌরসুন্দর নধরকান্ত ত্যাগীর রূপটা আপনার ভিতর যথার্থই ধরা পড়েছে।' বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলিয়া যাইত।

সে আমার কাছে একটী প্রকাণ্ড প্রহেলিকা।

৩

পরদিন বিকালে আমি নিজের ঘরেই শুইয়া একখানা দর্শন শাস্ত্রের জটিল বই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। শীতল বাবু এখানি গতকল্য আমায় পড়িতে দিয়াছেন।

এমন সময় প্রতিভার পড়িবার ঘরে মৃদু কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইলাম। কিরণ বাবু বলিতেছেন, 'মাষ্টার বুঝি এসব নূতন চাল আমদানি করেছে? শীতল বাবুও যেমন ভ্যাবাগঙ্গারাম! কোথেকে এক পাড়াগেঁয়ে ভূত জুটিয়েছেন—'

প্রতিভা স্থিরকণ্ঠে বলিল, 'কিরণ বাবু, মান রেখে কথা কইবেন। আপনার মত সকলের অবস্থা না হতে পারে, প্রাণ বলে মস্ত বড় জিনিসটা সকলেরই বুকের নীচে আছে। আপনি আর আমায় ও কথা শোনাবেন না। আমার কান ঝালপালা হয়ে গেছে।'

কি। বেশ ত, আমিত তোমার কাছে একটা শেষ কথা শুনতে চাই। আমিত এই মাসেই বদলি হয়ে যাচ্ছি। যদি বিয়ে হয়—

প্র। না, বিয়েব কথা আর আমায় বলবেন না। আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। যেখানে দুজনের আদর্শ নিয়েই ঝগড়া, সেখানে আপনি মনের মিল আশা করেন?

কি। বেশ, তুমি যখন আমায় প্রত্যাখ্যানই করলে—

প্র। আপনাকে কবে আমি গ্রহণ করেছিলুম বলুন দেখি?

কিরণ বাবু একটু রাগিয়া বলিলেন, 'দেখ, প্রতিভা, তোমার নিজেরও একটা কর্ত্তব্য আছে ত? যে জ্যেঠামশাই বুকের রক্ত দিয়ে তোমায় মানুষ করেছেন, যিনি তোমার এই অদ্ভুত খেয়াল দেখে একরকম শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন, যিনি তোমায় লেখাপড়া শেখাবার জন্য—'

প্রতিভাও উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি আপনার লম্বা লেক্‌চার্ শুনতে চাইনি। ওসব আদালতের জন্য রেখে দিন। আর জ্যেঠামশাই-এর সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন, তা বলবার আপনার কোনও অধিকার নাই। আমাদের ঘরের কথায় আপনার কি সংস্রব?'

কিরণ বাবু খট্‌মট্ করিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিয়া গেলেন, 'গুড্ বাই, গুড্ বাই—ঢের হয়েছে, প্রতিভা।'

আর কিছু শোনা গেলনা। শীতল বাবুর লাইব্রেরীতে একটা কোলাহল হইতেছে বুঝিতে পারিলাম। আমার এ সময়ে এখানে থাকা উচিত নয় ভাবিয়া তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়া পাশের দরজা দিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

প্রতিভার অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে আমার আগমনের কোনো সম্বন্ধ আছে—ইহা শীতল বাবুরও মত কি না বলিতে পারিনা। লোকটী নিতান্ত নিরীহ, অধ্যয়নশীল কিন্তু সর্ব্বদাই ভাবে আত্মহারা। ক্রমাগত পারিবারিক শোক সহিয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মে আস্থা হারাইয়াছেন। বেশ বোঝা যাইত যে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রীটির সঙ্গে কিরণ বাবুর বিবাহ দিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আমার প্রতিভাকে বড় ভাল লাগিত কেমন টানা টানা প্রশান্ত নয়ন দুটী! হাত দুখানি কি সুন্দর! স্বাস্থ্য ও তারুণ্য ময় গৌরীমূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে সত্যই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলাম,—একটুখানি নয়, একেবারে সর্ব্বস্ব দিয়াই ভালবাসিয়াছিলাম। কিন্তু কথাবার্ত্তায় বা ভাবভঙ্গীতে তাহাকে এ কথা কোনও দিন বলি নাই। আমি গরীবের সন্তান—পয়সার চেষ্টায় দুদিনের জন্য বিদেশে আসিয়াছি, আমার অত বাড়াবাড়ি করিলে চলিবে কেন? আজ প্রদোষের সূর্য্যাস্তরাগ দেখিতে দেখিতে কেবলই মনে হইতেছিল যে একবার ছুটিয়া গিয়া বলি, 'ওগো আমার অন্তরতম, তুমি কি এখনো আমায় চিনতে পারোনি? সেই প্রথম দিনে তুমি ফিকে লাল রংএর শাড়ীখানি পরে যখন ফটকের কাছে দাঁড়িয়েছিলে এলোচুলে একখানি বই হাতে করে'—সেই প্রথম দর্শনেই যে তোমাকে ভাল বাসিয়াছিলাম!' ছি ছি, আমি কি পাগল! আমার ও সব চিন্তা করাই অন্যায়!

বাড়ী ফিরিয়া দেখি, আমার ঘরের ভিতর হইতে ত্বরিতপদে প্রতিভা বাহির হইয়া গেল। যেন একটা বসন্তের দমকা হাওয়ার মত। আমি অতি অসাবধানী ছিলাম বলিয়া ছাত্রীর কাছে প্রায়ই তিরস্কৃত হইতাম, প্রতিভা এইরূপ প্রত্যহই আমার অজ্ঞাতে যে জিনিষপত্র যথাস্থানে রাখিয়া যায়, তাহা সেদিন প্রথম জানিতে পারিলাম।

আমি মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। একি! এ সব কি!

৪

দুবেলা পড়ান অনেক দিন উঠিয়া গিয়াছে। সকালে প্রতিভা একবার আসে, তা-ও ঘণ্টাখানেকের জন্য। অবনতবদনে আসে, চুপচাপ পড়া শুনিয়া উঠিয়া চলিয়া যায়। আর তাহাকে আমার মুখের দিকে চাহিতে দেখি নাই। একি লজ্জা, না পূর্ব্বরাগ? আমার হাসিও পাইত, দুঃখও হইত। আনন্দে হাসি পাইত,—সেও কি আমায় ভালবাসে না? বোধ হয় বাসে। নহিলে সে লজ্জাবতী লতার মত দিনে দিনে এত সংকুচিতা হইয়া পড়িল কেন? আমার কাছে তাহার ত কোনই লজ্জা ছিলনা। কিরণ বাবু শেষ উত্তর পাইয়া আর আসেন না, শীতল বাবু সন্ধ্যার মজলিশে আর তেমন সদানন্দ ভাবে উচ্চ হাস্য করেন না, প্রতিভাও আর জ্যেঠাকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করে না। আমি যেন একটা নিষ্ঠুর অভিশাপের মত এই সুখের সংসারটার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছি! সেদিন স্ত্রীর আদর্শ ও আমার নিজের বিবাহ সম্বন্ধে মতামতের আলোচনা প্রতিভা নিবিষ্টমনে শুনিতেছিল। আমি যে একটা লজ্জা-সংকোচভীতা, নিরক্ষর, গুণ্ঠনবতী দশ বারো বছরের পাড়া-গেঁয়ে মেয়েকেই বিয়ে করিব, ইহা শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল। 'সত্যি?' বলিয়া সে যখন হাসিল, তখন তাহার প্রস্ফুট কুসুমের মত বিম্বাধর হইতে যেন একটা মোহ ছড়াইয়া পড়িল। সে কোনও বিষয়ে আশ্চর্য্য হইলে শিশুসুলভ প্রশ্ন করিয়া বসিত 'সত্যি?' তাহা বড় মিষ্ট শোনাইত।

আর একদিন নিরাভরণা প্রতিভার মুখখানি বড়ই ম্লান দেখিলাম। আমি সেখানে আসিতেই সে মুখ ফিরাইয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সে বলিল, 'আপনি এখানে কেন এলেন?'

আমি অপ্রতিভ অপরাধীর মত সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিলাম। প্রতিভা কহিল, 'শুনুন, শুনুন, আপনি যে আমার সব গোলমাল করে দিলেন! আমি এখন কি নিয়ে থাকি, বলুন দেখি! হিন্দু গৃহীর আদর্শ আপনার জীবনেই আমি প্রথম দেখলুম। এ উজ্জল হোমশিখা আমার সারা অন্তর পুড়িয়ে শুদ্ধ করেছে, এ জীবন-যজ্ঞ আপনি না হলে যে শেষ হবে না! আমায় কেন এমন নিঃসম্বল করে দিলেন?'

আমি গাঢ় কণ্ঠে বলিলাম, 'দেখ, প্রতিভা, তুমি একদিন বলেছিলে যে মিথ্যাকে ঢেকে রাখা যায় না। তুমি কি আমায় বুঝতে পারোনি? কিন্তু তোমায় আমায় মিলন যে একেবারেই অসম্ভব—আমরা যে বড় গরীব, প্রতিভা! আর তোমার জ্যেঠামশাই বা মত দেবেন কেন?

'বলুন, আমায় পায়ে একটু যায়গা দেবেন?'......

তারপর ঘটনাগুলি যেন বায়োস্কোপের ছায়াবাজির মত ছুটিয়া চলিল। শীতল বাবু ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামীনির্ব্বাচনে কোনই আপত্তি করিলেন না। একদিন শুভলগ্নে ছাত্রীর গলায় প্রীতিমাল্য পরাইয়া দিলাম। বাড়ীতে বাবা আমার মুখদর্শন করিবেন না বলিয়াছিলেন। প্রতিভা ইহা শুনিয়া সেদিন আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়াছিল। শেষ শীতল বাবুকে লইয়া যে দিন দেশে ফিরিলাম, সে দিন মা বউ দেখিয়া ও তাহার কুলশীলাদি বংশপরিচয় জানিয়া সানন্দে বলিলেন, 'আহা, যেন লক্ষ্মী প্রতিমা! তা এত বড় লোকের মেয়ে, হাতে দুগাছি শাঁখা কেন, মা? তখনি ত বলেছি—নলিন আমার তেমন ছেলে নয়!'

রাত্রে প্রতিভার মুখে সব শুনিলাম; বাবা আমার সাদরে গ্রহণ করেছেন। আমি প্রতিভার হাতখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বলিলাম, 'প্রতিভা, তোমার খুব বরাত-জোর!

প্রতিভা হাসিয়া বলিল, 'আমার, না তোমার?'

'আমার কিসে?'

'বাঃ! রাঁচি থেকে স্বদেশী মন্ত্র চালিয়ে কে আমায় কেড়ে এনেছিল গা? ও মাষ্টার মশাই, কথা কইছেন না যে?'

'আহা, সাহেবের বিবি হতে পারলে না!, ঐ দুঃখটাই রয়েগেল!'

'ঈস্! বাঙ্গালীর আঁস্তাকুড়ও আমার ভাল'—এই বলিয়া প্রতিভা আমার দিকে বক্রদৃষ্টি করিল।

কৃষক—সে দেশের ও এ দেশের

(শ্রীহৃষীকেশ সেন)

ইংলণ্ডের কৃষি শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে Herbert Spencer বলেন "In old Poor Law times, the farmer gave for work done the equivalent, say, of house-rent bread, clothes and fire ; while the rate payers practically supplied the man and his family with their shoes, tea, sugar, candles, a little bacon etc. The division is, of couse, arbitary but unquestionably the farmer and the rate-payers furnished these things between them." তিনি আরোও বলেন কৃষি শ্রমজীবী ছিল যেন "half labourer and half pauper "(১) সেই জন্য Poor rate থেকে তাকে সাহায্য করা হত এবং এই সাহয্যকে সাধারণতঃ বলা হত "make-wages"

ইংলণ্ডের কৃষিশ্রমজীবীর মানে কৃষক নয়। সেখানকার কৃষক farmer। কৃষক জমিদারের কাছে জমি বন্দোবস্ত করে নেয়, নিয়ে জমির চাষ আবাদ করে। জমিগুলি পৃথক পৃথক খণ্ড নয়, এক একটি অখণ্ড জোত। তারই মধ্যে কৃষকের বাসগৃহ, গোয়ালঘর, গোলা, ভাণ্ডার প্রভৃতি সবত আছেই তা ছাড়া মজুরদের থাকিবারও ঘর আছে। তার মধ্যে রাস্তা আছে, পয়ঃ প্রণালী আছে। এ সকল করে দেন জমিদার। হাল, গোরু, বীজ ও মজুর কৃষকের নিজের। কৃষকের জমিতেও কোন স্বত্ব নাই, জমিস্থিত ঘর দুয়ারেও কোন স্বত্ব নাই। নির্দ্দিষ্ট মেয়াদে, নির্দ্দিষ্ট খাজনায় কৃষক জমি নেয় এবং মেয়াদ শেষ হলে যদি পুনরায় বন্দোবস্ত না নিতে পারে ত তাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়। জমিদার কৃষকের কাছে খাজনা নেন কিন্তু রাজাকে রাজস্ব দেন না। এঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা সামন্তরাজ (feudal caief) ছিলেন। আবশ্যকের সময় সৈন্য দিয়ে রাজার সাহায্য করিতেন। এই জন্য রাজাও তাঁদের কাছে রাজস্ব নিতেন না। এখন আর তাঁদের সৈন্য দিয়ে রাজাকে সাহায্য করিতে হয় না, পূর্ব্বের রাজসেবা স্মরণ করে রাজস্ব নেওয়া থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। এখন জমিতে তাঁদের ন্যায্য অধিকার জন্মে গিয়েছে। সেই অধিকারের বলে তাঁরা জমিদারী ভোগ দখল করেন। Hyndman এঁদেরকে বলেন "a handful of marauders, who now hold possession, have and can have no right save brute force"

এই রূপ জমিদারের কাছ থেকে কৃষক জমি দিয়ে নিজের হাল গোরু দিয়ে মজুর দিয়ে চাষ আবাদ করে। এই মজুরদেরেই কৃষিশ্রমজীবী (agricultural labourers) বলা হয়, স্বয়ং কৃষক এ শ্রেণীর মধ্যে নয়। কৃষিশ্রমজীবীদের অবস্থা শোচনীয়। ইংলণ্ড শিল্প বাণিজ্য প্রধান দেশ, কৃষির সেখানে তেমন আদর নাই। কৃষিশ্রমজীবীর মজুরিও সেই জন্য অন্যান্য শ্রমজীবীদের মজুরির চেয়ে অনেক কম, সুতরাং অবস্থাও তুলনায় অনেক হীন। তাদের মজুরি থেকে, জীবনধারণের জন্য যা নিতান্ত আবশ্যক তাও ভাল করে চলে না। তাই তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য Poor rate থেকে কিছু কিছু দেওয়া হত। তাই এদেকে লক্ষ্য করে Herbert Spencer উপরি উক্ত কথাগুলি বলেছেন।

এই অবস্থাই বরাবর চলছিল। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষকদের ও কৃষিশ্রমজীবীদের দুরবস্থা দূর করবার জন্য একটা Land

Enquiry Committee নিযুক্ত হয়। এই Committee তাঁদের রিপোর্টে বলেন যে কৃষিশ্রমজীবীদের মজুরি যথেষ্ট নয়; আইনের দ্বারা একটা নিম্নতম মজুরির হার অবধারিত করে দেওয়া আবশ্যক, এবং এই কাযের জন্য পঞ্চায়তের মত একটা মজুরি নির্দ্ধারক সমিতি নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক ("In order to secure to the laborer a sufficient wage it is necessary to provide for the fixing of a legal minimum wage by means of some form of wages-tribunal.) এই বৎসরই শ্রমজীবী প্রতিনিধিরা (Labor party) Farm Wages Board স্থাপন করবার জন্য একটা আইনের পাণ্ডুলিপি পার্লেমেণ্ট পেশ করলেন। মিঃ লয়েড-জর্জও এই বৎসরই, (১৯১৩ খৃঃ) তাঁর জমি সম্বন্ধীয় আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল প্রত্যেক কৃষক ও কৃষিশ্রমজীবীকে একটু জমি দেওয়া হয় যা তার নিজস্ব হবে এবং যাতে সে নিজের বাসের জন্য একখানি কুটীর নির্ম্মান করতে পারে এবং কুটীরসংলগ্ন শাক-সবজীর একটু ক্ষেতও করতে পারবে। তা ছাড়া তিনিও বলেছিলেন যে শ্রমজীবীদের একটা নিম্নতম মজুরি আইনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু পরবৎসরই (১৯১৪ খৃঃ অব্দে) ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হল। সুতরাং এ সকল কল্পনা আর কাযেপরিণত হতে পেলে না।

এই সময়েই বেশ করে বুঝতে পারা গেল যে ইংলণ্ডে যে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাতে ইংলণ্ডের খাদ্যের অভাব পূরণ হয় না। স্বাভাবিক অবস্থাতেই বিদেশের শস্য অনেক পরিমাণে ইংলণ্ডের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। যুদ্ধের সময় বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ বন্ধ হল, বাণিজ্যের জাহাজ যুদ্ধসম্ভার বইতেই ব্যস্ত, খাদ্যদ্রব্য বইতে জাহাজ পাওয়া গেল না। ইংলণ্ডে মহা অন্নকষ্ট হল। তখন দেশেই যাতে আরও অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য জন্মায় তার চেষ্টা হতে লাগল। জমিদারদের সখের শিকারের বন, উপবন প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হতে লাগল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মিঃ আসকিথ (Asquith) একটা কমিটি নিযুক্ত করলেন; বললেন দেশের বড় বিপদ, খাদ্যাভাব থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে; দেশে অধিক পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করতে হবে। কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে কমিটি তারই অনুসন্ধান করবেন (১)। কমিটি যথারীতি অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে কৃষিশ্রমজীবীদের একটা নিম্নতম মজুরী স্থির করে দিতে হবে, কৃষকের গম-যবের একটা নিম্নতম মূল্য নির্দ্ধারিত করে দিতে হবে এবং যাতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তার উপায় করে দিতে হবে (২)। কমিটির এই সকল কথা বিধিবদ্ধ করে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে corn production act নামে এক আইন হল। কিন্তু এই বৎসরেই (১৯২২ খৃঃঅঃ) এই আইন রদ হয়ে যাবে। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে এই আইন হবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল; আবার এই বছরই এই আইন উঠে যাবার পক্ষেও যথেষ্ট কারণ ঘটেছে!

(২)

কৃষক ও কৃষিশ্রমজীবীদের প্রতি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ আচরণ দেখে শ্রমজীবী প্রতিনিধিরা পার্লেমেণ্টে এক আইনের পাণ্ডুলিপি করেছেন, যা দ্বারা তাঁরা জমিতে

(1) Having regard to the need of increasing home-grown food supplies in the interest of national security, (the committee) is to consider and report upon the methods of effecting such increase."

(2) The committee recommended that "the state should fix a minimum wage for the ordinary agricultural laboner, guarantee to the farmer a minimum price for wheat and oats and take steps to secure the increase of production which is the object of this guarantee.

ব্যক্তিবিশেষের স্বত্বাধিকার উঠিয়ে দিতে চান। পাণ্ডুলিপির নাম A bill to abolish private property in land (১)। এতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে ইংলণ্ডে কৃষি-কার্য্যের উপযুক্ত যত জমি আছে সে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হবে এবং এইরূপ জমির যত কৃষিক্ষেত্র এবং তৎসংক্রান্ত ঘর বাড়ী প্রভৃতি আছে তাও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হবে (The state is to become the owner of the land itself and of all farm houses, farm buildings & Co. or other improvements or works erected upon or made therein.) কৃষিসম্বন্ধীয় জমি ছাড়া অন্য জমিও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হবে। এই আইনের বিধানগুলি কার্য্যে পরিণত করবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হবে, তার নাম Public Lands Committee. এই কমিটি জমির খাজনা এবং বন্দোবস্তের সর্ত্ত ঠিক করে দেবে এবং দেখবে যে জমির রীতিমত চাষ আবাদ হচ্ছে। এই শেষোক্ত কাযটি জমিদার গু করতেনই না, বরং সখের জন্য শিকারের বন উপবন করে অনেক জমি ফেলে রাখতেন। কিন্তু জমি পতিত না থাকে তা দেখা কমিটির একটা প্রধান কায হবে। তা না হলে আইনের প্রধান উদ্দেশ্য—কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা—ব্যর্থ হয়ে যাবে। জমি ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকিলে এটা হতে পারে না। সেই জন্য জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হওয়া উচিত।

(৩)

ইউরোপের অন্যান্য দেশের কৃষকের এবং কৃষিশ্রমজীবী-দের অবস্থাও তথৈবচ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বাভেরিয়ার [Bavaria] কৃষক আন্দোলনের প্রধান পরিচালক Dr. Schlittenbauer মিউনিকের (Munich) ফরাসি ও ব্রিটিশ কনসলকে [consul] একটা স্মারক-লিপি দেন। তাতে জারমানির কৃষির অবস্থা বিবৃত করে বলেন যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রুসিয়া, মেক্লেনবুর্গ, সাকসনি প্রভৃতি প্রদেশে আর সামান্য কৃষক ছিল না বড় বড় জমিদারেরা তাদের অস্তিত্ব লোপ করে দিয়েছিল। সামান্য কৃষকের অস্তিত্ব লোপের অর্থ কতকগুলি ভূমিশূন্য শ্রমজীবীর সৃষ্টি। এদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়ের স্থিরতা নাই, এরা পল্লী ছেড়ে সহরে বাস করে নিজের এবং অন্যের স্বাস্থ্য নষ্ট করে এবং সমাজের পাপের ভার বৃদ্ধি করে। সামান্য কৃষকের অভাবে, কৃষিজাত খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ কমে গিয়েছে এবং আমেরিকার ও আর্জেনটাইনের গম প্রভৃতির আমদানী অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছে। রুশিয়া ও রুমেনিয়া কেবল এই প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পেয়েছে। মধ্য-ইউরোপের দেশগুলির কৃষিজীবীরাও এইরূপে পল্লীবাসীর সংখ্যা কমিয়ে নগরবাসীর সংখ্যা বাড়িয়েছে। ছোট ছোট কৃষকদের জমাজমি বড় লোকেরা সব কিনে নিয়ে শিকার-ভূমিতে পরিণত করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ Dr. Schlittenbauer বলেন যুদ্ধের পূর্ব্বে Baron Seefried নিম্ন অষ্ট্রীয়ার ত্রিশ জন কৃষকের জমি নিয়ে একটা বৃহৎ উপবন [park] তৈরী করেছেন। জারমান প্রিন্স Hohenlohe উত্তর হাঙ্গেরীর [Hungary] শত শত কৃষকের জমি নিয়ে বড় বড় উপবন তৈরী করেছেন। এই সকল উপবনে তিনি কখন কখন কাইসার উইলহেল্ম [Kaiser Wilhelm] কে নিয়ে শিকার করতে আসতেন। যারা জমিজমাটুকু বজায় রেখে এই শোচনীয় অবস্থা থেকে কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, তারা অতি হীন ভাবে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের শিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই, প্রায় সকলেই নিরক্ষর, অজ্ঞ, কুসংস্কার বিশিষ্ট। আর্থিক অবস্থাও তদ্রূপ। সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পরিশ্রম করেও সকল রকম সুখ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিরানন্দ জীবনের অবসানের প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু চিরদিন সকলের সমান যায় না। অভিব্যক্তি, মন্থর-গতি হলেও, এক দিন এসে উপস্থিত হয়। যখন এর গতি একটু দ্রুত হয়, লোকে তখন একে আবর্ত্তন [revolution] বলে। যুদ্ধ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আবর্ত্তন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ রোধ—এই সকল কারণে সহরের লোকের খাদ্যাভাব ঘটল আর তাতেই পল্লীবাসী কৃষকের উন্নতির সূত্রপাত হল। রুশিয়া ও আমেরিকা থেকে যে গম আমদানী হত তা যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন

(1) Nineteenth Century and after. December 1921

বুলগেরিয়া, রোমেনিয়া, বাভেরিয়া ও হাঙ্গেরীকেই খাদ্যের গম যোগাতে হল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মধ্য ইউরোপের আর্থিক ভিত্তি [economic basis] ছিল শিল্পজাত বাণিজ্য পণ্য এবং সকল দেশের রাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল এই শিল্প-বাণিজ্যে-লিপ্ত ধনকুবেরদের [bourgeois] স্বার্থরক্ষা। এই রাষ্ট্রনীতির উদ্ভাবন ও পরিচালনও ছিল এই ধনকুবের bourgeois এবং তাদের প্রতিনিধিদের হাতে! বিগত যুদ্ধ এই আর্থিক ভিত্তিকে শিল্পবাণিজ্য থেকে কৃষির উপর সংস্থাপিত করে দিলে এবং যুদ্ধের আনুষঙ্গিক আবর্ত্তন খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বিতরণ অভিজাতবর্গের হাত থেকে কৃষকের হাতে এনে দিলে। এর ফলে অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, এবং জারমানির প্রায় দশ লক্ষ কৃষক জমির স্বত্বাধিকার পেয়েছে। এখন এই দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কৃষক, যে একাল পর্য্যন্ত দাসবৎ ছিল, আজ প্রভুবৎ রাষ্ট্রনীতি পরিচালন করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ শুধু কল্পনা নয়, বাভেরিয়াতে প্রকৃতই তাই হয়েছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে সেখানে যে সমাজতান্ত্রিক আবর্ত্তন [Social democratic revolution] হয় তাতে রাজবংশ এবং অভিজাত বংশ নিপাতিত হয়। আবর্ত্তনকারীদের নেতা Kurt Eisner'ও নিহত হন। কিন্তু অদম্য শ্রমজীবী এতেও দমিত হয় নি। আবর্ত্তন কার্যও স্থগিত হয় নি। ফলে শ্রমজীবী কৃষক জমির স্বত্বাধিকার পেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এখন Dr. Heim ও Dr. Schlitterbauer এর নেতৃত্বে বাভেরিয়ার কৃষক ধনকুবেরদের সর্ব্বপ্রকার গর্ব্ব খর্ব্ব করে দিয়েছে। সহরের ভূমিশূন্য শ্রমজীবীদেরও প্রাধান্যের হ্রাস হয়েছে। এরা এখন দেশের সর্ব্বত্র কৃষক মন্ত্রণা সভা (agricultural chambers) স্থাপন করেছে। এই সভাগুলি এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে তারা আপন আপন এলেকায় ত সর্ব্বপ্রধানই, এমন কি Landtag [State Diet] কেও কৃষি বিষয়ে তাদের পরামর্শ শুনতে বাধ্য করে। হাঙ্গেরীতে এখন জেলায় জেলায় যে কৃষক সমিতি স্থাপিত হয়েছে, তার সংখ্যা ২৫০০। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এর একটিও ছিল না। ত্রিশ একার [প্রায় ৯০ বিঘা] মাত্র জমির অধিকারী একটিমাত্র কৃষক, Stephen Szabo দেশের ব্যবস্থাপক সভায় কৃষকের প্রতিনিধিত্ব করতেন। এখন এই কৃষকটি সেখানকার কৃষি-মন্ত্রী। এর পূর্ব্বে এই পদে ব্যারণের [baron] নীচে কেউ নিযুক্ত হন নি। দেশের রাষ্ট্রনীতি পরিচালনেও এই কৃষক সমিতিগুলি খুব প্রাধান্য লাভ করেছে।

অষ্ট্রীয়াতেও খাদ্যাভাব পূরণ করিবার জন্য চাষের উপযোগী যত জমিতে পূর্ব্বে বড় লোকের শিকারের জন্য বন ছিল সে সমস্তই আবাদ করা হয়েছে। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে পল্লীবাসীদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা হচ্ছে।

সুইডেন নরওয়ে কৃষি প্রধান দেশ। সেখানে বড় বড় কলকারখানার সংখ্যা অতি অল্প। শতকরা ৮৫ জন লোক পল্লীগ্রামে বাস করে। পল্লীবাসীদের অধিকাংশেরই নিজের জোতজমা আছে এবং তাতে তাদের স্বত্বাধিকার আছে। কৃষিকর্ম্ম ছাড়া, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের অনেকই তারা ঘরে প্রস্তুত করে। এই রূপে কৃষিজাত খাদ্যাদি এবং গৃহজাত শিল্পাদি তাদের প্রায় সকল অভাব দূর করে। তাদের মত স্বাধীন, স্বচ্ছ ও সুখী লোক অতি অল্পই আছে। M. de Laveleye বিবেচনা করেন ইউরোপের মধ্যে এরাই সব চেয়ে সুখী।

ডেনমার্কে গত শতাব্দীর শেষে দু লক্ষ আশী হাজার পরিবার পল্লীগ্রামে বাস করত। এর মধ্যে এক লক্ষ সত্তর হাজার ঘর নিষ্কর জমির স্বত্বাধিকারী; ত্রিশ হাজার ঘর খাজনা দিয়ে জমির চাষ আবাদ করে, আর ছাব্বিশ হাজার লোক কৃষকদের মজুরি করে। সমস্ত লোকের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন নিজ জমিতে স্বত্বাধিকারবান্। মিঃ ষ্ট্রাচি [Strachey] বলেন সে দিন পর্য্যন্ত ডেনমার্কের জমিদাররা অত্যন্ত অত্যাচারী ছিল আর প্রজারা ছিল কাঠকাটা জলতোলা চাকরের মত। মিঃ ষ্ট্রাচি বলেন তাদের অবস্থা বাঙলাদেশের হতভাগ্য দরিদ্র রায়তের অবস্থার মতই শোচনীয় ছিল। এখন ইউরোপীয় কৃষকদের মধ্যে ডেনমার্কের কৃষকই সব চেয়ে স্বাধীন,

শিক্ষিত ও রাষ্ট্রনীতি অভিজ্ঞ, কিন্তু ডেনমার্ক দেশটি ছোট, জমির পরিমাণও অল্প। গড়ে প্রত্যেক কৃষকের ক্ষেত্রের পরিমাণও অল্প। তা থেকে যা উৎপন্ন হয় তাতে সচ্ছন্দে তার সংসার চলে না। তা বলে সে তার জমিটুকু ত্যাগ করে না। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সেখানে একটা প্রজাতন্ত্রবাদীদের দল হয়েছে। তারা বলে রাজা এবং রাজত্ব আছে প্রজার ইচ্ছায় এবং প্রজার হিতের জন্য। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে এদের কোপেনহেগেন নগরে একটা কংগ্রেস হয়। তাতে তারা প্রস্তাব করে যে দেশে যত দেবত্তর সম্পত্তি [ecclesiastical property] আছে এবং অনাবাদী পতিত জমি আছে, সেই সমস্ত নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হ'ক ; তা হলেই জমির পরিমাণের অল্পতা দূর হবে। তারা আরও চায় যে কৃষির উন্নতির জন্য কৃষককে রাজকোষ থেকে অর্থ সাহায্য করা হোক, কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করা হ'ক এবং কৃষিশ্রমজীবীদের বাস স্থানের উন্নতি করে দেওয়া হ'ক।

সুইজারল্যাণ্ডে প্রায় সকলেরই অল্প বিস্তর জমি আছে। যারা কলকারখানায় কায করে তাদেরও জমি আছে। যখন শিল্প, বাণিজ্যের অবস্থা মন্দ হয় তখন কৃষিই তাদের প্রধান অবলম্বন। অন্য সময়ে কারখানার কাযের অবসরে তারা কৃষিকর্ম্ম করে। এতে প্রজাসাধারণের কাযের অভাব হয় না। অন্ন কষ্টও সুতরাং হয় না। সামাজিক সাম্য এমন আর কোথাও নাই। এখানে প্রভু ও ভৃত্যের সামাজিক মর্য্যাদা সমান। তারা একত্র পান ভোজন করে এবং গ্রাম্য পরিষদে একত্র বসে সাধারণ কাযকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে। দেশময় এদের সভাসমিতি আছে। তাতে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আন্দোলন আলোচনা খুব স্বাধীনভাবে এবং নির্ভীক ভাবেই হয়। এইজন্য সুইজারল্যাণ্ডের প্রজা সুখী ও সন্তুষ্ট। রাষ্ট্র-নৈতিক মতামতের জন্য রাজদ্রোহিতার জন্য বা সমাজ-দ্রোহিতার জন্য পৃথিবীর অন্য দেশ থেকে যারা নির্ব্বাসিত হয়, তারা এখানে আশ্রয় লাভ করে এবং নির্ভয়ে আপন আপন মতামত প্রচার করে; কিন্তু এসকল মতামত সুইস প্রজার মনে কোন প্রকার বিকার জন্মাতে পারে না। কারণ তারা সুখ-সন্তোষ-কবচের দ্বারা রক্ষিত।

অর্থশাস্ত্র বিশারদেরা এবং সমাজতন্ত্রবাদীরা একবাক্যে বলেন যে যে দেশের কৃষিদল সুখী ও সন্তুষ্ট সে দেশে সমাজতান্ত্রিক আবর্ত্তন কখন সফল হ'তে পারে না। সমাজের স্থিতি বৃদ্ধির মূল কৃষিবল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই কৃষীবল কোন রাজ্যেই তার ন্যায়তঃ প্রাপ্য অধিকার পায় নি। তাই ইউরোপের সকল রাজ্যের কৃষকেরা তাদের প্রাপ্য অধিকার আদায় করবার জন্য সমবেত চেষ্টা করছে। শ্রমজীবীরা যেমন বলছে Proletarians of all countries unite তেমনি কৃষকেরাও বলছে সম্মিলিত চেষ্টা না করলে কোন ফল হবে না অতএব সম্মিলিত হও। এই উদ্দেশ্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে Passau এ শ্রমজীবীদের International এর মত একটা Green International গঠিত হয়েছে। এই কৃষক সঙ্ঘ Bavaria, Austria, Hungary, Bulgaria, French Normandy, Croatia, এবং Switzerland থেকে কৃষক প্রতিনিধিরা সমবেত হয়েছিল। হলাণ্ড ও ডেনমার্ক প্রতিনিধি পাঠাতে পারে নি কিন্তু অভিনন্দন পত্র পাঠিয়েছিল। বাভেরিয়ার Dr. Heim এই আন্দোলনের প্রধান পরিচালক। এই কৃষকসঙ্ঘের সদস্য-সংখ্যা এখন হাঙ্গেরীতে ৩০,০০,০০০; অষ্ট্রীয়াতে ২,৫০,০০০; বাভেরিয়াতে ৩,৬০,০০০; ক্রোশিয়াতে ১,৫০,০০০; এবং বুলগেরিয়াতে ১,০০,০০০। [১]।

[আগামীবারে সমাপ্য]

১ The nation and the Athanaeum of June 1921.

মানবের আদি উৎপত্তি ভূমি।

[শ্রীদেবেন্দ্র নারায়ণ বাগ]

গত ১৩২৮ সনের বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে ঋগ্বেদের সময়ে ভারত প্রবন্ধে অবিনাশ বাবু, আর্য্যজাতি বাহির হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আষাঢ় মাসের 'নারায়ণে' অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়, এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'মানবের আদি জন্ম ভূমি' হইতে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রধান কয়েকটী, এবং উক্ত গ্রন্থের কয়েক স্থল সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে।

বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রধানতঃ ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, মঙ্গোলিয়াই হইতেছে স্বর্লোক বা আদি স্বর্গ, এবং ইহার অন্তর্গত আলৃটাই পর্ব্বতের সানুদেশই আদি মানব বিরাটের আদি উৎপত্তি স্থান।

তাঁহার প্রধান অবলম্বন বেদ, পুরাণ প্রভৃতিও তাঁহার সহায়তা করিতে কৃপণতা প্রকাশ করে নাই।

তাঁহার সংগৃহীত বেদমন্ত্র সমূহ ইহার কতটা সহায়তা করে, এবং মানবের যুক্তি ইহার কতখানি নির্ব্বিরোধে মানিয়া লইতে পারে দেখা যাক্।

বিদ্যারত্ন মহাশয় সৃষ্টি সম্বন্ধীয় মোট পাঁচটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় কতদূর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে দ্রষ্টব্য।

৩।৮১।১০ এবং ১।৮২।১০ মন্ত্র দুইটী বলিতেছেন, পরমেশ্বর দ্যাবা ভূমির সৃষ্টি করেন।

১।৮২।১০ মন্ত্রের বিদ্যারত্নকৃত ব্যাখ্যা—

"সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর প্রথমে জলের সৃষ্টি করেন, তৎপর ঐ জলমধ্যে দ্যাবা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথমে দ্যাবা পৃথিবী জল মধ্যে নিমগ্ন ছিল, পরে উহাদের প্রান্তদেশ সকল দৃঢ় হইলে দ্যাবা পৃথিবী স্থলে পরিণত হয়।"

তাঁহার মতে এই দ্যাবা পৃথিবী অর্থে দ্যো ও পৃথিবী বা মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ।

আমরা সর্ব্ব প্রথম প্রতিবাদ করিয়া রাখিতেছি—এই দ্যাবা পৃথিবী, দ্যো বা দিব ও পৃথিবী নহে, বা মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ ও নহে।

ইহার পর তিনি বলিতেছেন—"দ্যো ও পৃথিবীর উৎপত্তির পরই আমরা বেদে ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ ও ত্রিদিবের উল্লেখ দেখিতে পাই।

যথা—ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসো অধ্যজায়ত।

ততো রাত্রি অজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণব॥ ১।১৯০।১০

পরমেশ্বর সৃষ্টি বিষয়ে উৎকট চিন্তা করিলে, উত্তর মহাসাগর গর্ভে ঋতাপরনামা সত্যলোক ও রাত্রি জনপদের উৎপত্তি হইল, এবং পরমেশ্বরের সেই উৎকট তপস্যা হইতে পশ্চিম সাগর গর্ভে সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্র প্রধান (আপঃ) অন্তরীক্ষ জনপদের উৎপত্তি হইয়াছিল।

যদি মানিয়া লওয়া যায় ঐ ১।৮২।১০ মন্ত্রের দ্যাবা পৃথিবী মঙ্গোলিয়া এবং ভারতবর্ষ, তাহা হইলে দেখা যায়—

সূর্য্যের উৎপত্তির পর জলের উৎপত্তি, তাহার পর একই কালে বা একই সময়ে মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ উৎপন্ন ও স্থলে পরিণত হয়।

দ্যাবাপৃথিবীর পরই যে অন্তরীক্ষের উৎপত্তি হয়, তাঁহার উপরোক্ত ১।১৯০।১০ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তো প্রতিপন্ন হইতেছে না।

উক্ত মন্ত্রে তিনি যে 'সৃষ্টি বিষয়ে উৎকট চিন্তাপরায়ণ' পরমেশ্বরের আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি 'উত্তর সাগর গর্ভে ঋতাপরনামা সত্যলোক' এবং 'সেই উৎকট তপস্যা হইতেই অন্তরীক্ষের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।'

এখানে 'সেই উৎকট তপস্যা' নিশ্চয়ই প্রথমোক্ত 'উৎকট তপস্যাকে—যাহার ফলে সত্যলোক উৎপত্তি হয়—নির্দ্দেশ করিতেছে। আর মন্ত্রের প্রথমে 'ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভী' প্রভৃতি, এবং পরে 'ততো রাত্রী অজায়ত' এবং তাহারও পরে 'ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ' আছে।

তাহার পরের দুইটী মন্ত্র :—

সমুদ্রাৎ অর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।

অহো রাত্রাণি বিদধৎ বিশ্বস্য মিষতো বশী। ২।১৯০।১০

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।

দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তরিক্ষ মথো স্বঃ॥ ৩।১৯০।১০

ইহার প্রথমটীর বিদ্যারত্ন কৃত ব্যাখ্যা—"সেই জলময় উত্তর মহাসাগরগর্ভে সংবৎসর নামে একটী জনপদের উৎপত্তি হইল, বশী প্রভু পরমেশ্বর সকলের চক্ষের সামনে দেখ দেখ করিতে করিতে সেই উত্তর সমুদ্রগর্ভে অহঃ ও রাত্রি নামে আরও দুইটী মহান্ জনপদের সৃষ্টি করিলেন।"

দ্বিতীয়টীর কোনো ব্যাখ্যা করা তিনি অনাবশ্যক মনে করিলেন। তবে এই সিদ্ধান্ত তাঁহার মতে হইল ৩।৮১।১০, ১।৮২।১০ মন্ত্রে স্বঃ ও পৃথিবীর উৎপত্তি, এবং এই ১।১৯০।১০, ২।১৯০ ১০ ও ৩।১৯০।১০ মন্ত্রে সমুদ্রগর্ভে দিব ও অন্তরীক্ষের উৎপত্তির কথা আছে।

কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় কোনো-কিছুই অস্পষ্ট রাখিতে চাহেন না, ইহার কয়েকটী পৃষ্ঠার পর তিনি ঐ ৩।১৯০।১০ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন,—"এইরূপে উত্তর সমুদ্রগর্ভে সত্যলোক, অহর্লোক, রাত্রিলোক ও সংবৎসর লোকের উৎপত্তি হইলে ধাতা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা এই চারিটী লোকের নাম 'দিব' রাখিলেন, এবং ভ্রাতাসূর্য্য ও কুল্লতাত চন্দ্রকে উক্ত দিবে পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন।"

১ম বর্ষের 'মন্দারমালায়' বিদ্যারত্ন মহাশয় ঋগ্বেদের—

সকৃৎহদ্যোরজায়ত সকৃৎ ভূমি রজায়ত।

পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎপয়ঃ তদন্যো নানু জায়তে॥ ২২।৪৮।৬

মন্ত্রটী উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন—"স্বর্গ পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ একবার মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে। প্রথম উৎপত্তির পর উহার ধ্বংস হইয়া আর কোনও নূতন স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষের সৃষ্টি হয় নাই।"

এবং বলিতেছেন—"ঋগ্বেদের ৩।১৯০।১০ মন্ত্রের সহিত ইহার স্পষ্ট বিরোধ। কেন না এই ৩।১৯০।১০ মন্ত্র বলিতেছেন—ধাতা ভগবান পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পের ন্যায় সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির সৃষ্টি করিলেন। এই বিরোধ মীমাংসা জন্য আমাদেরকে বাধ্য হইয়া এইরূপ অর্থ করিতে হইল,—ধাতা সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মা, নূতন সূর্য্যমণ্ডল (কনিষ্ঠ ভ্রাতা সূর্য্যের রাজ্য) নূতন চন্দ্র মণ্ডল [মহর্লোক] নূতন দিব [সমগ্র সাইবিরীয়া] নূতন পৃথিবী [সাইবিরীয়ার কোনও স্থান পৃথিবী নাম দিয়া] নূতন অন্তরীক্ষ [তিব্বত তাতার মঙ্গোলিয়া] নূতন স্বঃ [উত্তর কুরু] পত্তন করিয়াছিলেন।"

শুধু এই স্থলেই নহে, মঙ্গোলিয়ার আদি জন্মভূমিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহাকে উক্ত 'মানবের আদি জন্মভূমি' বইখানার মধ্যে আগাগোড়াই এইরূপ 'বাধ্য হইয়া' অপব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।

এখনে কেবল তাঁহার মূল প্রমাণ কয়টী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

৩।৮১।১০, ১।৮২।১০ মন্ত্রের তাঁহার কৃত ব্যাখ্যা হইতে, দ্যাবাপৃথিবী- মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ—একই সময়ে উৎপন্ন, এবং ১।১৯০।১০ মন্ত্রে 'দ্যাবাপৃথিবীর উৎপত্তির পর ঋতাপরনামা সত্যলোকের উৎপত্তি হয়' প্রমাণিত হইতেছে।

তিনি যে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন—"মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষের উৎপত্তির পর অন্তরীক্ষের [আফগানিস্থান ইত্যাদি] উৎপত্তি হইলে, অন্তরীক্ষের মধ্য দিয়া মঙ্গোলিয়ার ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতি দেবাখ্য নরগণ ভারতে আসেন, এবং পরে তাঁহাদের অনেকে পুণরায় মঙ্গোলিয়ায় ফিরিয়া যাওয়ার বহুপর সত্যলোকের উৎপত্তি হইলে ব্রহ্মা প্রভৃতি তথায় উপনিবেশ স্থাপন করেন"—ইহা তাঁহারই ১।১৯০।১০ মন্ত্রের নিজ ব্যাখ্যা দ্বারাই খণ্ডিত হইতেছে।

তিনি ৮।১২১।১০, ["জলগর্ভে প্রথম যজ্ঞ জনপদের উৎপত্তি হয়" এই ব্যাখ্যা ইনি করেন। কিন্তু এই যজ্ঞ জনপদ প্রথম যজ্ঞ ভূমি ভারতবর্ষস্থ সপ্তসিন্ধু প্রদেশকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।] ৩।৭৩।৯ [বিদ্যারত্ন মত "এষাং সর্ব্বেষাম্ জনপদানাং মধ্যে পিতা দ্যৌরেব প্রত্ন পুরাতনঃ"

এখানে এই 'এষাং জনপদানাং' 'এষাং লোকানাং' ধরিতে হইবে। এই মন্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই,—মন্ত্র প্রণেতা মহ, জন, তপ, সত্য প্রভৃতি লোক সমূহ মধ্যে স্বঃ পুরাতণ বা স্বঃ ও পুরাতণ তাহাই উল্লেখ করিতেছেন।] মন্ত্র দুইটী উদ্ধৃত করিয়া ভূর্লোক হইতে দৌ এর প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতে চাহেন। আমরা আগর বলিয়া রাখি দৌ এবং দ্যাবাপৃথিবী স্বতন্ত্র লোক। ভূর্লোক হইতে দৌ এর প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইলেও মানবের আদি উৎপত্তি ভূমি নির্ণয়ে কিছুই যায় আসে না।

এবং এই মন্ত্রে তাহা প্রমাণিত হইতেছেও না।

দ্যাবাপৃথিবী পুরাতণ পূর্ব্বনিকেতন ইহা সমর্থন জন্য তিনি এই মন্ত্রগুলি আহরণ করিয়াছেন:—

মহী দ্যাবা পৃথিবী জ্যেষ্ঠে। ১।৫ ।৪

রোদসী দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরাঃ। ৭।১৭।৬

দ্যাবা পৃথিবী পূর্ব্বজে। ২।৫৩।৭

ঈলে দ্যাবা পৃথিবী পূর্ব্ব চিত্তয়ে। ১।১১২।১

পুরাণ্যোঃ সদ্মনোঃ কেতু। ২ ৫৫।৬

আর মঙ্গোলিয়ার আদি জন্মভূমিত্ব সমর্থক বলিয়া সর্ব্বশেষে তাঁহার সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ নিম্নলিখিত মন্ত্র সমূহ—

য ইমে দ্যাবা পৃথিবী জনিত্রী। ৯।১১০।১০

দেবী দেবস্য জনিত্রী রোদসী। ৮।৯৭।৭

রোদসী দেবপুত্রে প্রত্নে মাতরাঃ। ৭।১৭।৬

উভে রোদসী মহান্তং ত্বা মহীনাং সম্রাজং চর্ষণীনাং।

দেবীজনিত্রী অজীজনৎ ভদ্রাজনিত্রী অজীজনৎ।
১।১৩৪।১০

উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষই মানবের আদি জন্মভূমি। সকল দেবতা এই উভয় দেশেই জন্মিয়াছেন। হে ইন্দ্র! মনুষ্যদিগের রাজা তোমাকে ভদ্রাজনিত্রী দ্যাবাপৃথিবীই গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন।"

ইহা হইতে প্রমাণিত হইতেছে,—তাঁহার মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষে এককালে মানবের উৎপত্তি হইয়াছিল, বা উহারা একত্রেই দেব ও মানবের আদি জন্মভূমি।

তাঁহার সংগৃহীত এই প্রমাণ হইতে 'মঙ্গোলিয়াই আদি জন্মভূমি' ইহা যে ভিত্তি বিহীন প্রমাণিত হইল।

অতঃপর আমরা তাঁহার কয়েকটী ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করিয়া, তাঁহার অধ্যাহৃত এই মন্ত্রগুলি হইতেই ভারতবর্ষের আদি জন্মভূমিত্ব প্রমাণ করিব।

অগ্নি প্রথমে ইল স্পদে সমিদ্ধঃ। ১।১০।২

অগ্নে ইলা সমিধ্যসে। ২।২৪।৭

অগ্নির্ণাভা পৃথিব্যা জাতপদে ইলায়াঃ।

অগ্নি পৃথিবীর আদি উৎপত্তির স্থান ইলার পদে উৎপন্ন হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় এখানে পৃথিবী অর্থে সমগ্র ভূমণ্ডল গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ তাঁহার মতে পৃথিবী অর্থে ভারতবর্ষ।

অগ্নি আবিষ্কার কালে, অর্থাৎ বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে 'গান্ধার, বঙ্গ প্রদেশ, পূর্ব্ব তুর্কিস্থান প্রভৃতি সপ্তসিন্ধু সংলগ্ন কোন কোন স্থলের উৎপত্তি হইলেও, তৎকালীন ঋষিগণ তাহার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। এবং পৃথিবী বা ভারতবর্ষের আদি উৎপত্তি স্থান সপ্তসিন্ধু প্রদেশেই অগ্নির উৎপত্তি হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী যুগে ভূমণ্ডলের আর আর স্থল উৎপন্ন হইলে, এবং তথায় সপ্তসিন্ধুবাসী আর্য্যগণ উপনিবেশ স্থাপন করিলে, আদি জন্মভূমি পৃথিবী বা ভারতবর্ষের নাম হইতে সমগ্র ভূমণ্ডলই পৃথিবী নামে অভিহিত হয়।

অভি ন ইলা যুথস্য মাতা। ১৯।৪১।৪

সায়ন বলিতেছেন—অস্মান্ ইলাভূমি যুথস্য গোসংঙ্ঘস্য মাতা নির্ম্মাত্রী। যাস্ক—ইলা যুথস্য সর্ব্বস্য মাতা [দুর্গাচার্য্য—যুথস্যমাতা মেঘ যুথস্য নির্ম্মাত্রী।]

সায়ন ইলাকে ভূমি বলিয়াছেন, দ্যো নহে। মেঘ যুথস্য নির্ম্মাত্রী কথাটী, প্রাচীন সপ্তসিন্ধুর শৈশব-চিত্র।

উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণে সাগর বেষ্টিত সপ্তসিন্ধু, সর্ব্বক্ষণই সমুদ্রোত্থিত বাষ্পসঞ্জাত মেঘসমূহের ধারাবর্ষণে অভিষিক্ত হইত।

তিনি বায়ুপুরাণ হইতে যে 'মেরুমধ্যম্ ইলাবৃতম্' কথাটীর উদ্ধার করিয়াছেন, এবং "ভু ভুবঃ স্বমহঃ জনঃ তপঃ সত্যলোক মহারাজ অগ্নিধ্রের ইলাবৃতাদি নব পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া কালে নববর্ষে বিভক্ত হয়, এবং এই ইলাবৃতের নাম অনুসারেই আদি স্বর্গের নাম ইলাবৃতবর্ষ হয়"—

ইত্যাদি যে আজব-কেচ্ছার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্য হইতে তথ্য আবিষ্কার জন্য পৃথিবী 'সুপার-কলম্বসের' প্রতীক্ষা করিতেছে।

বেদে 'ইলাবৃতবর্ষ' শব্দ নাই।

ইহার পর তিনি দেবতা ও মানব একই ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা লইয়া একটু আলোচনা করা যাক্।

তিনি অধ্যাহার করিতেছেন "দিব্যন্তি দীপ্যন্তে প্রতিভয়া ইতি দেবাঃ দেবতা বা। যাঁহারা জ্ঞানবান্ ও যাঁহারা প্রতিভা দ্বারা দীপ্তি পাইতেন তাঁহারাই দেবতা।"

এবং বায়ুপুরাণ হইতে উদ্ধার করিতেছেন "তেষামপি হি দেবানাং নিধনোৎপত্তি উচ্যতে। দেবতাদিগের জন্মও ছিল মৃত্যুও ছিল।"

এবং—"যম একজন মনুষ্য ছিলেন, তিনি মৃত্যুর পর পরলোকে যান, তথা হইতে পরে কর্ম্মফলে পিতৃলোকের রাজত্ব পান।"

তথাহি—"নচিকেতার মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কি না, ইত্যাদির উত্তরে যম বলেন আমিও। ইহার কিছুই জানিই না, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি বড় বড় দেবতারাও বহু অনুসন্ধান করিয়া ইহার অনুমাত্র তথ্যও জানিতে পারেন নাই"—ইত্যাদি কঠোপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চাহেন—

"ভারতের নচিকেতা যে যমের সহিত দেখা করিতে পিতৃলোকে যায়; তাহা নিশ্চয়ই ভৌম। আরও স্বর্গ নরক প্রভৃতির রাজা যম মানুষ, স্বর্গ—মঙ্গোলিয়া, নরক—মানস-সরোবরের উত্তর তীর। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি দেবগণ এখন অন্তর্য্যামী স্বয়ং ব্রহ্ম বলিয়া অর্চিত হইতেছেন, পরকাল তত্ত্বানভিজ্ঞ তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন না।"

এখানে আমাদের দুই একটী জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইতেছে। যম মৃত্যুর পর যে পরলোকে যান তাহা কোনলোক? ভূ ভুব ইত্যাদির মধ্যে তো ইহার স্থান নাই দেখিতেছি। এই অপাংক্তেয় গো-বেচারীর একটা কিনারা কেন বিদ্যারত্ন মহাশয় করিয়া দিলেন না?

তিনি যখন সাত-সাতটা আস্তো লোককেই [ভূ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যঃ] এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর মধ্যে উদারতার পরিচয় স্বরূপ একে একে স্থান দান করিলেন, তখন ঐ উত্তর-মেরুপ্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চলে ইহাকে একটু স্থান ছাড়িয়া দিলে কি এমনিই বেশী ক্ষতি হইত? যাঁহা বায়ান্ন তাঁহা আটবট্টি!

আমরা কিন্তু নচিকেতার এইরূপ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক প্রশ্নের কোন তাৎপর্য্যই বুঝিতে পারিলাম না। প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া 'বে-অকুফ বনিয়া' ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন নিশ্চয়ই!

তাঁহার বোঝা উচিত ছিল, যমরাজ ব্যাপারটা 'ফাঁস' করিতে অনিচ্ছুক! আরও বোঝা উচিৎ ছিল—যম যখন মৃত্যুর পরও স্বশরীরে স্ব নামে [আত্মাতো দূরের কথা!] স্বঃ বা পিতৃলোকে বর্ত্তমান [খোস্ মেজাজে বহাল্ তবিয়তে] তখন মৃত্যু ব্যাপারটা নিশ্চয়ই ভারত বা যে কোন বর্ষ হইতে মঙ্গোলিয়া বা মানস-সরোবরের উত্তর ধার দিয়া 'মর্ণিং ওয়াক্' করিয়া আসা মাত্র!

আর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতির জন্য আমরা আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি। তাঁহারা এত দিন খুব ফাঁকি দিয়া ব্রহ্ম ত্রিকালজ্ঞ প্রভৃতি বড় বড় 'টাইটেল' দখল করিয়া পূজা খাইয়া আসিয়াছেন, এইবার তাঁহাদের অন্ন গেল!

একটা অস্বস্তির কথা আমাদের মনে পড়িল,—

১ম বর্ষের 'মন্দার মালার' 'স্বাস্থ্য ও সদাচার' প্রবন্ধে বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছেন,—"ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ দুই-তিন সহস্র বৎসর জীবিত থাকিতেন।"

আমরা তাঁহাদের 'উপরতি'র তারিখটী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করি। আরও প্রার্থনা করি—ভগবান ব্রহ্মা প্রভৃতি নররত্নের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন্!

তাহার পর তিনি দেবতাদের যে সকল অপকীর্ত্তি কুকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এ বিংশশতাব্দির যুগে অযুক্ত থাকিলেই যেন সঙ্গত হইত।

তবে তাঁহারা গোবধ করিয়া যজ্ঞ করিতেন বলিয়া যে ঈষৎ 'আফ্‌শোষ' তিনি প্রকারান্তরে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মাড়োয়ারী ভ্রাতৃবৃন্দের এবং 'গো-রক্ষিণী' সভার সহানুভূতির উদ্রেক হওয়ার সম্ভব!

ফলতঃ তিনি—'দেবগণ আহার নিদ্রা ভয় * * * প্রভৃতি সংস্কারশীল সাধারণ মনুষ্য ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর জীব নহেন”—ইহা পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন।

একস্থলে তিনি বলিতেছেন—“ভাষা প্রনয়ণ করিবার শক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বে যে সকল জাতি দ্যো পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেনেরী প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবিষ্ট হন, এবং নিজেরা কোনো ভাষার সৃষ্টি করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা আজিও ভাষাহীন জাতি।”

তাৎকালান এই কেনেরী দ্বিপটী 'আদি স্বর্গের [মঙ্গোলীয়ার]' কোন্‌দিকে ছিল ?

অন্যত্র—“উত্তরকুরু অতি আধুনিক জনপদ, উহা মানব সৃষ্টির বহু সহস্র সৎসর পরে স্থলে পরিণত ও মানব জাতি দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল।”

'অতি আধুনিক' কথাটী 'চতুর্থ পন্থী' বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভিধানে কি অর্থ প্রকাশ করে ?

অন্যত্র—“বর্ত্তমান 'বেলুর্টাগ'ই প্রাচীন কালের 'গন্ধ মাদন' পর্ব্বত।” কোথায় কাশ্মীর শীর্ষে অবস্থিত বেলুর্টাগ' আর কোথায় বা [অবশ্য তাঁহার প্রদত্ত ম্যাপ অনুসারে] মঙ্গোলিয়ার পশ্চিমস্থ গন্ধমাদন !

তাঁহার ম্যাপে মানস-সরোবরের অবস্থিতি সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যায়।

দেবাখ্য নরগণসহ পর্ব্বত সরোবর প্রভৃতি ও ক্রমশঃ দক্ষিণে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল, ইহাও সম্ভব হইতে পারে হয়তো !

এখানে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালীর একটু পরিচয় :—

ঋগ্বেদের—বধীৎ ইন্দ্রো বরশিখস্য শেষঃ যৎ হরিয়ুপীয়াম্। ৫।২৭।৬

সায়ন—হরিয়ুপীয়ায়াং হরিয়ুপীয়ানাম কাচিন্নদী কাচি নগরী বা।

উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিতেছেন—“এই হরিয়ুপীয়ার অপভ্রংশে কালে ইউরোপ শব্দের বুৎপত্তি হইয়াছে।”

এই হরিয়ুপীয়া, কোনো একটী নদী বা কোনো একটী নগরী যাহা সায়নই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন নাই, সেই অনিশ্চিত বস্তুটাই অপভ্রংশের দোহাইয়ে ইউরোপ মহাদেশে পরিণত হইয়া গেল !

যৎবা রুমে রুশমে শ্যাবকে কৃপে। ২।৪।৮

বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিতেছেন—“রুম রুশম শ্যাবক ও কৃপ, সায়নের মতে এই চারিজন রাজার নাম। তাহা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই রুম শব্দ ইটালীর রোম বা তুরস্কের কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল্ নহে। কেননা বৈদিক যুগের শেষ সময়েও টাইবার তীরস্থ রোমের পত্তন হয় নাই। এই রুম শব্দ আফ্‌গানিস্থানের রোমক পত্তন বাচী।”

যাহা চারিজন রাজার মধ্যে একজনের নাম 'হইলেও হইতে পারিত' তাহার পরবর্ত্তী কয়েকটী লাইনে, বিনা যুক্তি প্রমাণে একদম্ আফ্‌গানিস্থানের রোমক পত্তন সাব্যস্ত হইয়া গেল।

তৎপরে বলিতেছেন “শ্যাবক কৃপ কি বা কোন্ জনপদ তাহা আমরা জানিনা, কিন্তু রুশম্ দৃষ্টে মনে হয় ইহা হইতে রুশিয়া শব্দের জন্ম হইয়া থাকিবে। আমরা বেদের কোন মন্ত্রেই আফ্রিকার উৎপত্তি বা বিনাশের কথা দেখিতে পাই না, পুরাণেও আফ্রিকার কোনও প্রসঙ্গ দেখা যায় না, তাহাতেই মনে হয় উহা বায়ু বিষ্ণু মৎস্য পুরাণ রচনার পর স্থলে পরিণত হইয়াছিল। আফ্রিকার অঙ্গুরীয়াকার ও সাহারা মরুর প্রভাব দর্শনে মনে হয় যে এই মাত্র আফ্রিকা ডিম হইতে বাহির হইয়াছে।”

বিদ্যারত্ন মহাশয় বেদের মন্ত্রে আফ্রিকার উৎপত্তি ও বিনাশ [?] খুঁজিয়া পান নাই। এই উদ্ধৃত অংশ টুকুর মধ্যে সিকি ডজনটেক 'মনে হয়'—থিওরী আমরা খুঁজিয়া পাইলাম কিন্তু।

এইরূপ 'মনে হয়' 'হইলে হইতে পারে' 'হইয়া থাকিবে' প্রভৃতি দ্বারা ঐতিহ্যের অবধারণা করা পণ্ডশ্রম মাত্র !

তাঁহার মতেই [মন্দার মালা—৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা] “পাণিনী খৃষ্ট পূর্ব্ব নয়শত অব্দের লোক, বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ পাণিনী অপেক্ষা অন্ততঃ এক হাজার বৎসরের বড়।”

তাহা হইলে উক্ত পুরাণ হয় ৩৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে

রচিত। ৪০০০ হাজার বৎসরের পিরমিড্, এবং অন্ততঃ ছয় হাজার বৎসরের হায়রোগ্লিফিক লিপি যে মিশরবা আফ্রিকার বক্ষে বিরাজিত, উক্ত পুরাণদ্বয় হইতেও তাহা অর্ব্বাচীন ?

আর এক কথা, তিনি আফ্রিকার সাহারা মরু দৃষ্টে উহাকে 'সেদিনের' মনে করিয়াছেন। তাঁহার 'আদি জন্মভূমি মঙ্গোলিয়ার' গ্রেট ডেজার্ট গোবি এবং সাহারা এই দুয়ের,—অর্থাৎ সাহারা আফ্রিকার যতটা অংশ ব্যাপিয়া আছে তাহার অনুপাতের সহিত, মঙ্গোলিয়া মধ্যস্থ গোবির বিস্তৃতির অনুপাতের 'ফারাক্' কি 'আস্মান্ জমীন্' হইবে ?

বিদ্যারত্ন মহাশয় একস্থলে বলিতেছেন—"আমরা ঋগ্বেদে স্পষ্টতঃ ভূ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইনা।"

উক্ত বেদের ১০।৬২।৫ মণ্ডলের ভূর্ভুবঃস্ব তৎসবিতুর্বরেণ্যং এই গায়ত্রী মন্ত্রটীর ভূ শব্দটী কি অস্পষ্ট ?

অন্যত্র বলিতেছেন—"বেদে আকাশ শব্দ নাই।"

সূর্য্যোসোমো যমঃ কাল * * * পবনোদিকপতি-ভূর্মিরাকাশংখচরামরা। এই বেদ মন্ত্রস্থ আকাশ ও কি নিরাকার ?

অন্যত্র বলিতেছেন—"পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণাদিক তথৈবচ। এই শ্লোকস্থ আকাশ, যাহা শূন্য অসীম অনন্ত গগণ, তাহা অমুকের দক্ষিণে বা পূর্ব্ব পশ্চিমে এমন হইতে পারে না।"

এবং শঙ্কর ভাষ্যের 'আকাশ পরম আত্মা' শ্রুতির 'আকাশোবৈব্রহ্ম' এই নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া বলিতেছেন —"এই ভাষ্যে তৃপ্ত হইলাম না, এই সকল শ্রুতি অর্ব্বাচীন। আকাশ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ইহা কোনো কোষে নাই" ইত্যাদি। আমরা বলিতেছি, তিনি এখানে এই আকাশ শব্দের অর্থের বিপর্য্যয় করিয়াছেন।

এখানে পরাশরোক্ত আকাশ [পিতৃণাং স্থানমাকাশং ইত্যাদি] হইতেছে 'অন্তরীক্ষ, অন্তর+ঈক্ষ্য গ্রহনক্ষত্রাদির মধ্যবর্ত্তী অবকাশ স্থান, প্রমাণ অথর্ব্ববেদোক্ত' অন্তরিক্ষেণ দ্যাবাপৃথিব্যো মধ্যবর্ত্তী লোকেন'।

এই দ্যাবা পৃথিব্যো বা দ্যাবা পৃথিব্যোই হইতেছে, দ্যো ও পৃথিবী বা দিব ও পৃথিবী। দ্যাবাপৃথিবী কথাটী এ পর্য্যন্ত কোন ভাষ্যকার নিরুক্তকার কর্ত্তৃকই দ্যো ও পৃথিবী বা দিবও পৃথিবী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। আর ইহা তাঁহার উক্তি হইতেই আমরা যথাকালে প্রমাণ করিব) আর এই শ্রুতি এবং শঙ্করউক্ত আকাশ শব্দ অভাব পদার্থ শূন্য অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

কেন না যে আকাশ বা অন্তরীক্ষ পঞ্চভূত বা পঞ্চ তন্মাত্রের একটী—ব্যোম [Ether] যাহা সৃষ্ট ভাব পদার্থ, তাহা অনন্তও নহে অসীমও নহে।

এই অভাব পদার্থ শূন্যই অনন্ত অসীম অব্যক্ত ব্রহ্ম। জ্ঞানাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, এবং মহামান্য শ্রুতি এই অর্থেই উহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিজ অভিধানে আকাশের অর্থ হইতেছে অনন্ত অসীম গগণ অর্থাৎ sky ?

তাহা হইলে অনন্ত অসীম ব্রহ্মের স্থান কোথায় ? দুইটী অসীমের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

বিদ্যারত্নী তাৎপর্য্যে বোধ হয় ব্রহ্ম হইতেছেন ব্রহ্মাখ্য একজন নর, এবং তাঁহার পরমায়ু বড় জোর পাঁচ হাজার বৎসর ?

অতঃপর আমরা বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত সমর্থনকারী অতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকটী কথা লইয়া আলোচনা করিব।

অতুলবাবু 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া' হইতে উদ্ধৃত করিতেছেন :—There is positive evidence that much of north and east of Asia has been land since the primary era."

যদি এই possitive evidence থাকাই স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তখন মঙ্গোলিয়ার অস্তিত্ব কোথায় ? আল্‌টাই বেষ্টিত মঙ্গোলিয়া কি এশিয়ার উত্তর পূর্ব্বে ? আর তাঁহার কথিত—"সপ্তসিন্ধু, বঙ্ক, গান্ধার, পূর্ব্ব তুর্কীস্থান ও আল্‌টাই বেষ্টিত মঙ্গোলিয়া প্রাচীনত্বে সমান।" এই মতই যদি ধরা যায়, তাহা হইলে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সর্ব্ব প্রথম মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ উৎপত্তির মতটা দাঁড়ায় কোথায় ?

"আধুনিক [Quarternary] মহাযুগের প্রথম ভাগে স্থলে পরিণত পারস্য দেশে" ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্র তাড়িত হইয়াছিলেন, ইন্দ্র আদি মানব বিরাটের প্রপৌত্র।

Tartiary মহাযুগের অন্তর্গত pliocener যুগে বা তাহারও পূর্ব্বে Miocene যুগে মানব জাতির সৃষ্টি বা উৎপত্তি হইয়াছে। ইন্দ্র প্রভৃতি মনুষ্যগণ উক্ত Miocene যুগে বর্ত্তমান ছিলেন যদি ধরা যায়, তাহা হইলে গোটা তিন-তিনটা যুগ—Miocene, pliocene, pleistocene. অতীত হওয়ার পর পরবর্ত্তী Quarternary মহাযুগের প্রথম ভাগে তাঁহারা পারস্যে যুদ্ধ ইত্যাদি করিয়াছিলেন ইহা কীদৃশ কথা?

আর আধুনিক [Quarternary] মহাযুগেরই বহুপর স্থলে পরিণত সাইবিরীয়ার উত্তর অর্দ্ধাংশে ইন্দ্রের ভ্রাতা ব্রহ্মা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাই বা কিম্বিধ ব্যাপার?

আরও তিনি 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া' হইতে যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন primary মহাযুগে উত্তর পূর্ব্ব এশিয়ার কতক অংশ স্থলে পরিণত হইয়াছিল" তিনি নিজেই এই মত [positive evidence] মানিলেন কোথায়? সাইবিরীয়ার উত্তর অর্দ্ধাংশ যে South Asia ইহা প্রচলিত কোন্ ভূগোলে লেখে?

অতুলবাবু বলেন—"ঋগ্বেদের ২।১৯০।১০ মন্ত্রে সমুদ্র হইতে দিনরাত্রি বৎসর প্রভৃতির উদ্ভব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?"

বৈদিক যুগের প্রথমভাগে ঋষিগণ সূর্য্যকে পূর্ব্ব সাগর হইতে উদিত হইতে, এবং পশ্চিম সাগরে অস্ত যাইতে দেখিয়াছিলেন।

সমুদ্র গর্ভ উত্থিত সূর্য্যের উদয় হইতে দিন, এবং সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া যাওয়াতে রাত্রি হয়; ইহা হইতেই, দিনরাত্রি যে সমুদ্র হইতে জাত ইহাই তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল।

ইহার সমর্থক অবিনাশবাবু উল্লিখিত এই দুইটি ঋক্—সূর্য্য পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে অস্ত যাইতেন ৫।১৩৬।১০ সূর্য্য সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হন। ৩।৫৫।১

পৃথিবী বা ভারতবর্ষের আদি উৎপত্তি স্থান সপ্তসিন্ধু প্রদেশই যে মানবের আদি জন্মভূমি, বিদ্যারত্ন মহাশয় সংগৃহীত পূর্ব্বে উল্লিখিত বেদমন্ত্র হইতেই আমরা প্রমাণ করিব।

এখানে আমরা ঐ মন্ত্র কয়েকটার এবং সংক্ষেপে তাহার তাৎপর্য্যের উল্লেখ করিতেছি:—

দ্যাবা পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ইহার সমর্থক—১।৫৬।৪। ২।৫৩।৭ মন্ত্র। দ্যাবা পৃথিবী পূর্ব্ব নিকেতন ইহার সমর্থক ১।১১২।১, ২।৫৫।৬ মন্ত্র। দ্যাবা পৃথিবী আদি জন্মভূমি ইহার সমর্থক—

৯।১১০।১০, ৮।৯৭।৭, ৭।১৭।৬, ১।১৩৪।১০ এই মন্ত্র সমূহ।

বেদের এই দ্যাবা পৃথিবী শব্দের অর্থ যে বিদ্যারত্ন মহাশয় কথিত দ্যো ও পৃথিবী বা মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ নহে, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়।

১৮

"দ্যাবা পৃথিবী কি? তাহা বহুবৈদিক ঋষি, ও একালের ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, যাস্ক, উবট, শঙ্কর, হলায়ুধ, সায়ন, মহীধর এবং দয়ানন্দ প্রভৃতি জানিতেন না। নির্ঘণ্টুকারও দ্যাবাপৃথিবীর পদার্থ গ্রহণে সমর্থ হন নাই।"

অর্থাৎ বেদের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত কেহই দ্যাবা-পৃথিবী অর্থে 'মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ' বলেন নাই।

আমরা বেদের এই দ্যাবাপৃথিবীকে ('দিবো দ্যাবা' পাণিনী, পৃথিবী—ভূ—ভূমি, দিবোপমা পৃথিবী, দেশপ্রীতি হইতে যথা—পরবর্ত্তীকালের জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।) পৃথিবী বা ভারতবর্ষের আদি উৎপত্তিস্থান সপ্তসিন্ধু প্রদেশ বলিতে চাই।

উল্লিখিত বেদমন্ত্রের দ্যাবা পৃথিবী, ভূ—পৃথিবী বা ভারতবর্ষের আদি উৎপত্তি ভূমি,—মানবের আদি জন্মভূমি, মহান্ সপ্তসিন্ধু প্রদেশকেই সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে।

ইহার সমর্থক প্রমাণ—

বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন—"বিশ্বদেবনিবিৎ দ্যাবাপৃথিবী ভুবন [সমগ্র ভূমণ্ডল] অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। মনু পৃথিবী শব্দ ভূমণ্ডল অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।"

মানবের আদি জন্মভূমি ভূ—পৃথিবী বা ভারতবর্ষের নাম হইতেই পরবর্ত্তীকালে সমগ্র ভূমণ্ডল পৃথিবী নামে খ্যাত হয়।

আরও—দুইটী দেশ, [বিদ্যারত্ন কথিত—মঙ্গোলিয়া ও ভারতবর্ষ] একই সময়ে [ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ড, ধরিয়া] সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন পূর্ব্বনিকেতন বা আদি জন্মভূমি হইতে পারে না।

জগতের মহামান্য সুপ্রাচীন বেদ কখনই এইরূপ প্রলাপের অবতারণা করেন নাই।

এই 'দ্যাবাপৃথিবী' 'রোদসী' প্রভৃতি ভূ বা ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রাচীন ভূমি মহান্ সপ্তসিন্ধু প্রদেশ বুঝাইতেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

সামশ্রমী, কুর্জ্জন সাহেব এবং অবিনাশ বাবুর সিদ্ধান্ত সমূহ, ভারতের আদি গেহত্বের সর্ব্বাংশে সমর্থন করে।

যে জাতির বেদের বয়স অন্ততঃ লক্ষ বৎসর, তাহারা যে পৃথিবীর সর্ব্বাদৌ সভ্য [আর্য্য], এবং তাহাদের জন্মভূমি সপ্তসিন্ধু প্রদেশ যে পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম মনুষ্য অধ্যুষিত পূণ্য ভূমি, তাহা সকল দিক হইতেই সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ঐতিহাসিক যুগ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী]

অশোকের এই দানে আজিও ভারত দুর্ব্বল রহিয়াছে। বহুকাল ব্যাপী বৌদ্ধ ধর্ম্মের অমানুষিক মত বাদে জাতি দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। যখনই কোনও হিন্দুরাজ-জাতীয় জাগরণে সচেষ্ট হইয়াছে তখনই বৌদ্ধগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে মিহিরকুল বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন ইহা যেরূপ সত্য, হর্ষবর্দ্ধন সেইরূপ হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছেন ইহাও তেমনই সত্য। অশোকের সময় ইতর প্রাণীর হত্যাকারীর যেরূপ শাসন হইয়াছে তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

অশোকের যজ্ঞাদির প্রসার বন্ধ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান প্রচারের সার্থকতা উদ্‌ঘোষিত করিলেন। সদয় ব্যবহার, দান, জীবনরক্ষা, সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতিই ধর্ম্ম। এই সকল উপদেশের ফলে যজ্ঞের প্রসার রুদ্ধ হইল। যজ্ঞে মিলন শক্তি—প্রতিষ্ঠান শক্তির বিকাশ হইত, তাহা রুদ্ধ হইল। কর্ম্মপ্রবণতাও খর্ব্ব হইল। জাতি কেবল দান দয়া লইয়াই বাঁচিতে পারে না। বিশেষতঃ উৎসব আনন্দ না থাকিলে সাধারণ লোক উচ্চ অঙ্গের ধারণা নিয়া বাঁচিতে পারে না। যজ্ঞ মিলন ক্ষেত্র। যজ্ঞ কর্ম্ম ক্ষেত্র। যজ্ঞের প্রসার রুদ্ধ হওয়ায় জাতি কর্ম্মকুণ্ঠ ও প্রতিষ্ঠান শক্তি রহিত হইয়া পড়িল। অশোক নিজের জীবনে কর্ম্ম ও ভাবের সমাবেশ রাখিলেও জাতির যে সর্ব্বনাশ করিলেন তাহা বর্ণনাতীত, জাতিকে প্রতিষ্ঠান শক্তিতে বঞ্চিত করায় জাতি সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইল, তিনি যে বীজ বপন করিয়া গেলেন তাহাই মহামহীরুহরূপে জাতীয় সৌধের ধ্বংস সাধন করিল। জাতীয় আত্মায় বৈদিক ভাব থাকিলেও বাহিরের পরিবর্ত্তন অনেকাংশে হইয়াগেল, বিশেষতঃ- বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের সন্তানরূপে পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় জাতির ক্ষতি সমধিক পরিমাণে করিতে সক্ষম হইল। অশোক, "দয়া দান, সত্য, পবিত্রতা নম্রতা ও ভক্তি প্রভৃতির অনুশীলন করিতে ব্যবস্থা দিলেন * এইগুলি হইতেও ধ্যানের প্রাধান্য দিয়াছেন, † সমস্ত দেশবাসীকে কর্ম্মবিমুখ করিয়া ধ্যান করিতে বিধান দেওয়া কিরূপ অমানুষিক তাহা ধারণা করা অসম্ভব।

* Besought his congregation, the inhabitants of a vast empire, to cultivate the virtues of 'compassion, liberty, truth, purity, gentleness and saintliness," E.H.I.P.P. 169.

† "Of these two means, pious regulations are of small account, whereas meditation is of greater value" pillar Edict VII.

যাহাদের মন বিক্ষিপ্ত, তাহাদের পক্ষে ধ্যান করিতে বিধান দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। এইরূপ বিধান অনুসারে চলিলেই ভণ্ডামীর প্রশ্রয় হয়, "মনে মনে মন কলা" খাওয়ার বাতিক সমাজে বাড়িয়া যায়। সকলের পক্ষে ধ্যান সম্ভব নহে। এইরূপ রাজকীয় আদেশের ফলে জাতি কর্ম্মকুণ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে, কর্ম্মবিহীন করাতে জাতি সাধারণের কার্য্যে অবহেলা করিতে শিখিয়াছে, ধ্যানরূপ 'দিল্লীর লাড্ডু' গ্রহণ করিয়া তামসিকতার গভীর গহ্বরে ঘোর নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া জাতি সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছে। অশোকের এই সকল অনুশাসন শুনিতে যত মধুর, জাতীয় জীবনে তত মধুর নহে। ভাল লাগিতে পারে কিন্তু উপকারী নহে।* যাঁহারা মানবীয় মনোবিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা সাধন পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ধ্যান কিরূপ জিনিষ, আপামর জনসাধারণকে কর্ম্ম বিমুখ করিয়া ধ্যানের ব্যবস্থা দেওয়া একরূপ নৈতিক বাতুলতা। এইরূপ মুখরোচক অনুশাসন অনুবর্ত্তন করিয়াই জাতি স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছে। এক প্রকার 'গোলাপি নেশায়' মশগুল রহিয়াছে। সামাজিক কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছে। কর্ম্মকুণ্ঠায় সুবিধা বাদী' হইয়া পড়িয়াছে, ভণ্ডামীর প্রশ্রয় হইয়াছে। প্রতিষ্ঠান শক্তির বিনাশ হইয়াছে। জাতি অধঃপতনের মুখে অগ্রসর হইয়া বিনাশের মহিমা উদ্বোধিত করিয়াছে। ধর্ম্মের উন্মাদনা বড়ই ভীষণ বস্তু। উন্মাদনার বশে খ্রীষ্টিয়ানগণ Crusade করিয়াছে। মুসলমান "জেহাদ" প্রচার করিয়াছে আর বৌদ্ধ ধর্ম্মী অশোক কেবল জাতিকে নহে সমস্ত এসিয়ার পূর্ব্বাংশকে অপদার্থ করিয়াছেন। তিনি কেবল অনুশাসন শিলালিপিতে লিখিয়া রাখিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। ইহার প্রসার ও প্রচার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। স্মীথ্ সাহেব লিখিয়াছেন, "The Emperor did not neglect to provide official machinery for the promulgation of his doctrine and the enforcement of his orders. All the officers of state, whom, in modern phraseology, we may call Lienteant Governors Commissioners and District Magistrates were commanded to make use of opportunities during their periodical tours for convoking assemblies of the lieges and instructing them in the whole duty of man. Certain days in the year were particularly set apart for this duty, and the officials were directed to perform it in addition to their ordinary work." Ibid P.P. 169

অর্থাৎ সম্রাট মত প্রচার ও আদেশ প্রতিপালন সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে ভুলেন নাই। রাজকীয় সকল কর্ম্মচারীগণ তাহাদের মফঃস্বলে ভ্রমণ কালে সভাসমিতি আহ্বান ও মানবীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানে আদিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল কর্ম্মচারীবর্গকে আজকালকার নামে ছোটলাট, কমিশনার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলা যাইতে পারে।

বৎসরের মধ্যে কতক সময় এই উদ্দেশ্যে পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। এবং কর্ম্মচারীবর্গ তাহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্যের সহিত এই ধর্ম্ম প্রচার করিত।" এইরূপ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ ভারতীয় নীতি। অবশ্যই এই কর্ম্মচারী সমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় ও রাজকীয় অনুগ্রহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিপত্তি হইল। বৌদ্ধমতের অস্বাভাবিকতায় জাতীয় জীবনের অমঙ্গলের সূত্রপাত হইল কিন্তু ধর্ম্ম বিস্তার ও রক্ষা কল্পে কর্ম্মচারী নিয়োগ ভারতীয় শাস্ত্রের বিধান। বিষ্ণুধর্ম্মসূত্রে দেখিতে পাই—"বর্ণাশ্রমানাং স্বে স্বে ধর্ম্মে ব্যবস্থাপনম্" রাজধর্ম্ম। এই সকল শাস্ত্রীয় অনুশাসন মূল করিয়াই ধর্ম্ম শিক্ষা রাজকীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল! এস্থলেও অশোক ভারতীয় শাস্ত্রেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তবে ভারতীয় অনুশাসনের মর্য্যাদা অশোকের সময় সামান্য রূপে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। ভারতীয় অনুশাসনে সমাজ ও ধর্ম্ম প্রজাসাধারণের হস্তে নিয়োজিত, কেবল ধর্ম্মের প্রতিকূল কার্য্য নিয়ন্ত্রন ও স্ব স্ব ধর্ম্ম যাহাতে লোক পালন করে, তাহাই রাজকর্ত্তব্য, কিন্তু বিধান দিবার অধিকার রাজার নাই।

অশোক এই অনুশাসন অবহেলা কতকটা পরিমাণে করিয়াছেন, কারণ তিনি বিধান দিয়াছেন ও বিধান প্রতিপালিত হয় কি না তজ্জন্য 'সেনসর' (Censors) নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে গুপ্তচরের প্রাধান্য ও অত্যাচারও হইয়াছে। ভারতের Toleration এর মূল ভিত্তি সাধারণের আত্ম নিয়ন্ত্রনে। সাধারণ শাশ্বত ধর্ম্মানুশাসন রহিয়াছে। প্রত্যেকের অধিকার অনুসারে কর্ত্তব্য পালনই শাস্ত্রীয় বিধান। ভারতীয় অনুশাসনের বিশেষত্বই এই যে রাজাও শাস্ত্রীয় বিধানের অধীন। রাজার ধর্ম্মই প্রকৃত রাজ্য। অশোক ধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপ আদেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, যে কেহ আদেশ অমান্য করিয়াছে তাহাকে কঠোর শাস্তি দিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালেও হর্ষবর্দ্ধন অশোকের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মের নামে অযথা পরাধীনতার পেষণে লোকের ধর্ম্মের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ভারতীয় বিধানে রাজা ধর্ম্মের প্রতিনিধি ও রক্ষক, কিন্তু বিধান দিবার অধিকার তাহার নাই। প্রজাসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ জ্ঞানী ঋষিগণই ব্যবস্থাপক। রাজা কেবল সেই ব্যবস্থাগুলি যাহাতে প্রতিপালিত হয় তাহাই করিবেন। সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজার ইহা হইতে অধিক অধিকার ছিল না। আমাদের মনে হয় রাজ অধিকার ঐ পর্য্যন্ত থাকাই বিধেয়, উহার অতিরিক্ততায় মানবীয় বিকাশ রুদ্ধ হয়। অশোক দান করিতে কুণ্ঠিত হস্ত ছিলেন না, কর্ম্মচারীগণ দানবিভাগের পরিদর্শন জন্য নিযুক্ত ছিল। রাজকীয় দান ভারতের সনাতন রীতি, সেই দানের চিহ্ন অদ্যাপিও দেবত্তর, ব্রহ্মোত্তর প্রভৃতিতে প্রকট, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতিও অদ্যাপি দানে প্রতিপালিত। অশোক দানের ব্যবস্থা যাহা করিয়াছিলেন তাহাও ভারতীয় শাস্ত্রবিধিবলে; বিষ্ণুধর্ম্মসূত্রে দেখিতে পাই।

"ব্রাহ্মণেভ্যোভুবং দদ্যাদ্ যেষাং চ প্রতিবাদয়েৎ তেষাং স্ববংশ্যান্ ভুবঃ প্রমাণং দানচ্ছেদোপবর্ণনং চপটে তাম্র পট্টেবা লিখিতং স্বমুদ্রাঙ্কিতং চাগামিনৃপতি পরিজ্ঞানার্থং দদ্যাৎ" ইতি। অর্থাৎ—ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিবে, যাঁহাদিগকে দিবে তাঁহাদের বংশাবলী যাহাতে ভূমির প্রমাণ, সীমা পরিচ্ছেদ জানিতে পারে এরূপ বর্ণনা পট্টে অথবা তাম্র পট্টে লিখিয়া (ভবিষ্যতের নৃপতিগণও যাহাতে তদনুসারে কার্য্য করিতে পারে এই জন্য) নিজের মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া দিবে। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন,

"দত্ত্বা ভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যং তুকারয়েৎ।
আগামি ভদ্র নৃপতি পরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ
পটেবা তাম্রপট্টেবা স্বমুদ্রোপরিচিহ্নিতম্।
অভিলেখ্যাত্মনো বংশ্যানাত্মানং চ মহীপতিঃ॥
প্রতিগ্রহ পরিমানং দানচ্ছেদোপবর্ণনম্।
স্বহস্ত কালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্॥"

ব্যাস ও বলিয়াছেন :—

"স্থানং বংশানুপূর্ব্বীচ দেশং গ্রামমুপাগতান্।
ব্রাহ্মণ্যংস্তথাচান্যান্ যাজ্ঞানধিকৃতানপি॥
কুটুম্বিনোঽথ কায়স্থান্ দূতবৈদ্য মহত্তরান্।
মেদচণ্ডাল পর্য্যন্তান্ সর্ব্বান্ সম্বোধয়ন্নিতি॥
মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যায় মুকস্থনবে।
দত্তং ময়াঽমুকায়াদ্যদানং সব্রহ্মচারিণে॥
অনুচ্ছেদ্য মনাহার্য্যং সর্ব্বভোগ বিবর্জ্জিতম্।
চন্দ্রার্ক সমকালীনং পুত্র পৌত্রান্বয়া গতম্॥
দাতুঃ পালয়তুঃ স্বর্গং হর্ত্তুর্নরকমেবচ।
ষষ্টিবর্ষ সহস্রানি দানেচ্ছেদে ফলং লিখেৎ॥
স্বমুদ্রাবর্ষমাসার্দ্ধ দিনাধ্যক্ষাক্ষরান্বিতম্।
এবং বিধং রাজকৃতং শাসনং সমুদাহৃতম্॥"

বাস্তবিক অশোকের—

"Almoner's department" দানপত্র প্রভৃতি কার্য্য পরিদর্শন ও রক্ষণ জন্যই সৃষ্ট। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"The distribution of charitable grants made by the Sovereign and members of the royal family was carefully supervised both by the censors and other officials who seem to have been organized in a Royal Almoner's department."

Ibid P. P. 171 (Rock Edicts V. XII. Pillar edict VII. Queens' Elliot.)

শাস্ত্রীয় অনুশাসনই অশোকেরএই শাসন শৃঙ্খলায় অভি-

ব্যক্ত। ভূমির নিবন্ধ, লেখ্য প্রভৃতির জন্যই 'ডিপার্ট-মেন্টের' সৃষ্টি।

অশোকের সময়ে পান্থশালা ও পশুগণের জন্য পশুশালা প্রভৃতি পথপার্শ্বে নির্ম্মিত হইত। বৃক্ষাদি রোপণ, বিশ্রাম গৃহ নির্ম্মাণ, কূপ খনন প্রভৃতি কার্য্য মনুষ্য ও পশুর উপকারার্থ করা হইত। বাস্তবিক এই অনুষ্ঠানগুলি অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে চলিয়া আসিয়াছে। বৈদিক যুগেও পান্থশালার প্রচলন দেখিতে পাই, ঋগ্বেদের ১। ১৬৬। ৯ সূত্রে 'পান্থ ও পান্থনিবাসের' উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের রৈক্যজান শ্রুতিসংবাদে ও জানশ্রুতি "বহুদায়ী বহুপাক্য" এইরূপ উল্লেখ আছে। তখন যে অতিথি প্রভৃতির জন্য ধর্ম্মশালা, পান্থশালা নির্ম্মাণ করা হইত তাহা জানশ্রুতি রৈক্যসংবাদেও পরিস্ফুট। অতএব অশোকের এই বিধানও ভারতীয় শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ফল।

অশোক রুগ্ন প্রভৃতির জন্যও বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া রোগী আতুরগণের খাদ্য ও ঔষধাদি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মনুষ্য ও পশু সকল প্রাণীই এই সকল ঔষধালয়ে চিকিৎসিত হইত। স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন,—

"Arrangements for the healing of man and beast were provided not only throughout all provinces of the empire but also in friendly independent Kingdoms of southern India and Hellenistic Asia; medicinal herbs and drugs, wherever lacking, being planted, imported and supplied as needed" Ibid. P. P. 171-172.

অর্থাৎ—কেবল সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশ নহে, স্বাধীন মিত্র রাজ্য, গ্রীক্ এসিয়াও পীড়িত মনুষ্য ও পশুগণের রোগ মুক্তির জন্য বন্দোবস্ত ছিল। আবশ্যক মত ঔষধের বৃক্ষ রোপিত, ঔষধাদি আমদানি করা ও যোগান দেওয়া হইত।

এই বিধানও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ফল, শঙ্খ বলিতেছেন, "দত্তাদ্দান মর্চয়িত্বা ব্রাহ্মণায় নিমিত্ত পূর্ব্বং শেষেভ্যঃ। কৃপণাতুরানাথ ব্যঙ্গী বিধবা বালবৃদ্ধানৌষধা বাস্থাশনাচ্ছাদনৈর্বিভৃয়াৎ॥"

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা সহকারে দান করিবে। অন্যান্য সকলকে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিকে কার্য্য করা প্রবৃত্তির জন্য দান করিবে। কৃপণ, আতুর, অনাথ, অঙ্গহীন, বিধবা, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতিকে ঔষধ, আবাসস্থান, ভোজ্য বস্তু আচ্ছাদন প্রভৃতি দিয়া ভরণ পোষণ করিবে। ইহা রাজ ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণকে দান করিবার বিধির তাৎপর্য্য এই। ব্রাহ্মণগণ জ্ঞান বিজ্ঞান বিস্তারে ব্রতী। দান উচ্চ ব্যক্তিকে করিতে হয়, দান উচ্চাভিমুখীন, দয়া নিম্নাভিমুখীন। যাহাকে দান করিলাম সে আমাকে দান গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিল, এই বোধ না থাকিলে দানের তাৎপর্য্য থাকে না। কারণ দানের তাৎপর্য্য চিত্তশুদ্ধিতে, দান করিয়া আনন্দ না পাইলে সে দানে কোনও লাভ নাই দানজাত আনন্দ না চাহিলেই পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা যেমন উচ্চগামী ও স্নেহ যেমন নিম্নগামী সেইরূপ দান উচ্চগামী ও দয়া নিম্নগামী। ব্রাহ্মণকে দান করিবার তাৎপর্য্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বিস্তার। ঔষধ প্রভৃতি বিনামূল্যে প্রদান করিবে। আহার বাসস্থান ও আচ্ছাদন প্রভৃতিও দিতে হইবে। অশোকের চিকিৎসালয়ে কেবল শঙ্খ লিখিত নহে অন্যান্য শাস্ত্রকারগণও ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বশিষ্ঠ বলিতেছেন,—

"ক্লীবোন্মত্তান্ রাজা বিভৃয়াৎ তদগামিত্বাদ্রিক্থস্য॥"

আপস্তম্ব বলিয়াছেন,—

"আবসথে বসংশ্চোত্রিয়া নত্তিণীন্ বাসয়েৎ তেষাং যথাগুণমাবসথাঃ শয্যাহন্নপানংচদেয়ং গুরুনমাতাংশ্চ নাতিজীবেৎ"

এস্থলে অতিথিশালার ব্যবস্থা রহিয়াছে। মনু অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় প্রভৃতির অনুশাসন দিয়াছেন, তিনি বলিতেছেন,—

"শ্রোত্রিয়ং ব্যাধিতার্ত্তৌচবালবৃদ্ধাবকিঞ্চনৌ। মহা কুলীনমার্য্যাস্ত রাজা সম্পূজয়েৎ সদা।"

ব্যাধিত ও আর্ত্তব্যক্তিগণকে সম্যকরূপে পূজা করিবার বিধির তাৎপর্য্যই শঙ্খ লিপিতের ভাষায় ঔষধ,

বাসস্থান; ভোজ্যবস্তু প্রভৃতি প্রদান। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই বিধান চলিয়া আসিতেছে, মহাভারতেও সভা-পর্ব্বে নারদ যুধিষ্ঠিরকে যে প্রশ্নাবলী করিয়াছিলেন তাহাতে দেখিতে পাই "আশ্রিত দীন দরিদ্র ও অনাথ ব্যক্তিদিগকে ধনধান্য প্রদান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ত? শাস্ত্রীয় এই সকল বিধানের ফলেই অশোকের সময় চিকিৎসালয় প্রভৃতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে। কেবল অশোকের সময়ে নহে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমসময়ে চৈনিক পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ এদেশে আগমন করেন। খৃঃ ৪০৫ হইতে ৪১১ পর্য্যন্ত এ দেশে বাস করিয়াছিলেন। তিনিও দাতব্য ঔষধালয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্মিথ্ সাহেব তৎপ্রণীত ইতিহাসে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিতেছেন,—"The people were rich and prosperous, and seemed to him to emulate each other in the practice of virtue. Charitable institutions were numerous; rest-houses for travellers were provided on the high ways and the capital possessed an excellent free hospital endowed by benevolent and educated citizens.

'Hither come!' we are told, 'all poor or helpless patients suffering from all kinds of infirmities. They are well taken care of and a doctor attends them; food and medicine being supplied according to their wants. Thus they are made quite comfortable, and when they are well, they may go away."

No such foundation was to be seen elsewhere in the world of that date; and its existence anticipating the deeds of modern christianity, charity, speaks well both for the character of the citizens who endowed it, and for the genius of the Great Asoka, whose teaching still bore such wholesome fruit many centuries after his decease. The earliest hospital in Europe, the Maison Dieu of Paris, is said to have been opened in the seventh century.

Ibid p. p 280.

আমাদের মনে হয় অশোকের অনুশাসনের ফলে এই-রূপ দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় নাই, ভারতীয় শাস্ত্রের অনুশাসনই ইহার জনক। গুপ্ত সাম্রাজ্য সময়ে হিন্দু প্রভাবই সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এই মাত্র, অশোকের জীবনের প্রধান কার্য্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার ও প্রচার। অশোকের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে স্মিথ্ সাহেব যাহা লিখিয়াছেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য।

"The influence of Buddhist doctrine on the heretical Gnostic sects appears to be undoubted; and many writers have suspected that more orthodox forms of christian teaching owe some debt to the lessons of Gautama but the subject is too obscure for discussion in those pages."

Ibid p. p. 176.

ভারতীয় চিন্তা গ্রীক্‌দেশীয় দার্শনিক চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অশোকের পূর্ব্বেও ভারতীয় চিন্তা গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোকে ও পিথাগোরাস্‌কে প্রভাবিত করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। এরিষ্টটল্‌ও ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। বিশেষতঃ Stoics বা উদাসীনগণের সাহিত্যেও ভারতীয় যোগীগণের মতসাদৃশ্য বিদ্যমান। নব্য প্লাটনিক প্লেটিনাস প্রভৃতির মতে ভারতীয় ছায়া সুপরিস্ফুট। এরিষ্টটল্ সেকেন্দরের শিক্ষক। সেকেন্দরের ভারত অভিযানের পূর্ব্বেই ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকার বিশেষ সম্ভাবনা। বাণিজ্য ও দার্শনিক চিন্তার মধ্য দিয়া দর্শনের ব্যপদেশেই ভারতের সংবাদ গ্রীস্ দেশে নীত হইয়াছিল। খৃষ্টান ধর্ম্মের উপর প্রভাব বিস্তার সম্বন্ধে "Sermon on the mount" যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশের সহিত উহার সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। যাহা হউক গ্রন্থবাহুল্যের আবশ্যক নাই। ক্রমশঃ

অনাগত

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

কেন তুমি অমন করে'
চেয়ে থাক মুখের পানে
বুঝতে কিগো পারছ না সই
দুখের কাঁটা বিঁধছে প্রাণে ?
তুমি কেন শিউরে ওঠো
বুঝতে তুমি পারবে না যে
ব্যথার ব্যথী হও কেন গো
তাইতে ব্যথা বক্ষে বাজে !

বুকের মধ্যে কেমন করে
কিসের ব্যথা ঘনিয়ে আসে
পাঁজরের এই হাড় গুলো সব
নড়ে ওঠে গভীর শ্বাসে ;
মনের কাঁদন্ রুধতে গিয়ে
নয়ন ছুটায় হাজার নদী
জানি আমি এ সব কারণ
রাখব জেনেও নিরবধি !
জেনে শুনে করছি কিগো
তাইত্তো বলি—তোমার জেনে
ফল হবে না—আমি দেখ,
ভাগ্যটাকেই নিলাম মেনে !

সারা বুকে তুমি আমার
মিশিয়ে আছ পরশ হয়ে
বুকের মাঝে সে কি কাঁপন
সত্যি তোমায় বক্ষে লয়ে ;

ওষ্ঠ তোমার উঠ্‌লে কেঁপে
প্রাণের বাঁধন যায় যে খুলে
এই দেহটার সব খানি যে
বিশ্ব দোলায় ওঠে দুলে ;
গণ্ড তোমার সয় না ছোঁয়া
আপনি রঙীন হয়ে ওঠে
চুমার ভরে এক নিমিষে
হাজার গোলাপ আপনি ফোটে,
কেন এমন হয় তা জানি
জেনেই বা কি করছি বল ?
"জেনে শুনে বরা পাগল"
এই কথাটাই সত্যি হল !

এই যে দু'টী বাহুলতায়
বাঁধলে আমায় কঠিন ডোরে
আপন হাতেই ছিঁড়িবে বাঁধন
বল্‌তে পার কেমন করে ?
আমার চোখের এক ফোঁটা জল
নয়ন দিয়ে মুছিয়ে নিতে
এলিয়ে পড়া চুলের রাশি
যতন করে গুছিয়ে দিতে ;
বুক দিয়ে যে বুকের ব্যথা
জুড়িয়ে দিতে আলিঙ্গনে
পরশ দিয়ে সকল দেহে
সোহাগ তোমার সঙ্গোপনে,

আদর সোহাগ চুমার মাঝে
লজ্জাবতী নেতিয়ে ছিলে
এই যে তুমি গলে গলে
সকল প্রাণে বিছিয়ে দিলে—
এই যে গভীর এই যে মধুর
জানি এরও অর্থ জানি
তবু কেন সয় না প্রাণে
মন কি আমার অভিমানী ?

দিন যে আমার যাবে কেটে
রাত্রি এসেও দেবে দেখা
কেমন ক'রে কাটছে জীবন
এই কথাটাই ভাব্ব একা,
প্রভাতের এই আলোর প্রদীপ
ভুবন ভরে' উঠ্‌বে জ্বলে,
কিরণ তাহার হিরণ বরণ
জড়িয়ে দেবে থলকমলে,
ফুলফোটা বন মধুর করে
গাইবে পাখী তেমনি সুরে
প্রাণটাকে মোর উদাস করে'
নিয়ে যাবে কোন সুদূরে,
রোদের তেজে আঁউরে যাবে
ঘুঘু-ডাকা দুপুর বেলা,
সাঁঝের বাতাস ঝিরঝিরিয়ে
জল নিয়ে যে করবে খেলা,
রাতের আঁধার আন্‌বে সাথে
চাঁদের আলো তারার মালা
আমি জানি বাড়বে তা'তে
বিরহের সে দারুণ জ্বালা !

এই যে আমি মিশিয়ে আছি
তোমার মধু স্পর্শ মাঝে,
জড়িয়ে আছ এই যে আমায়
হৃদয় ভরা হর্ষ লাজে—
আমায় ছেড়ে প্রিয়তমে
চাও না হ'তে স্বর্গ-সুখী
আমার ব্যথায় ব্যথিত তুমি
দুঃখে আমার সমদুখী !
আমার নয়ন জলের ধারা
সয় না জানি তোমার প্রাণে
আমার মলিন মুখের ছায়া
তোমার বুকে বেদন হানে !—

জানি ইহার মূল্য জানি
ফল কিছু নাই এ সব জানায়
অনাগত এই বিরহ
তবু কেন এমন কাঁদায় ?

জানি তুমি আসবে ফিরে
আবার আমায় নেবে বুকে
সোহাগ ভরে' আদর করে'
রাখ্‌বে আমায় সুখে দুখে ;
জান কি গো জান তুমি
তোমায় ছাড়ার কত ব্যথা
ওগো আমার প্রিয়তমা
আমার লজ্জাবতী লতা ?

পঞ্চামৃত

(১)

বীরবলের পত্র

বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলুম যে ইউনিভারসিটির পরমায়ু ফুরিয়েছে। ও ব্যাপার আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে, টাকার অভাবে।

ইউনিভারসিটির ব্যয় নাকি বেশীর ভাগ অপব্যয়। তাই আমাদের Education Minister ইউনিভারসিটিকে টাকা আর জলে ফেলতে দেবেন না। আর যদি কিছু-কিঞ্চিৎ দেন ত সে টাকার কানদেগে (ear marked করে) দেবেন। ইউনিভারসিটি ও কানমলা টাকা নেবেন না। আর টাকা না হলে গভর্ণমেণ্টও চলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যও চলে না, কংগ্রেসও চলে না, কিছুই চলে না, সুতরাং ইউনিভারসিটিও চলিবে না।

আমাদের Education Minister ইউনিভারসিটির উপর কোনরূপ violent হস্তক্ষেপ করতে চান না, শুধু non-co-operation করতে চান। হাতে মারা প্রহার, কিন্তু ভাতে মারা আহার, এ মত দেখছি উপরে উঠে গিয়েছে।

অবশ্য ইউনিভারসিটি চুপ করে নেই। তার কথা হচ্ছে এই—

'আমার খরচ ব্যয় কি অপব্যয় তা তুমি বুঝবে কি? ব্যয় ও অপব্যয়ের প্রভেদ এত সূক্ষ্ম, যে স্থূলদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না। তার পর একের মতে যা ব্যয় অপরের মতে তা অপব্যয় হতে পারে। আমার মতে minister-দের যে মাইনে দেওয়া হয় তার ষোল আনাই অপব্যয়। সে যাই হোক্ আমাব কোন ব্যয়টা সদ্ব্যয় আর কোনটি অপব্যয় সে কৈফিয়ৎ আমি তোমার কাছে দিতে বাধ্য নই। আমি যে রকম ভাল বুঝি সেই রকম খরচ করবার অধিকার আইনতঃ আমার আছে। হিসেব তুমি দেখতে পারো, কিন্তু তার উপর হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা তোমার নেই—ইউনিভারসিটি হচ্ছে স্বরাট্।"

এর উত্তরে Minister মহাশয় বলেন :—

"তোমার স্বরাজ্য আমার সাম্রাজ্যের ভিতর। আর তা যদি না মানতে চাও ত মেনো না, একটি পয়সাও পাবে না। রাখো তোমার আইন। আমার হাতে টাকার থলি আর তোমার হাতে ভিক্ষের ঝুলি, অতএব কে কার অধীন তা সবাই জানে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা-সচিবের এ লড়াই হচ্ছে মনের সঙ্গে ধনের লড়াই। অতএব ধনেরই জয় হবে। ইউনিভারসিটি হচ্ছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বৈশ্য-ক্ষত্রিয়ের কাছে ভিক্ষা না পেলে তার কপালে উপবাস ঘটিবে আর তার ফল মৃত্যু।

অতএব এটা নিশ্চিত যে রিফরম কাউনসিলের প্রথম এবং প্রধান কীর্ত্তি হবে, ইউনিভারসিটি ভাঙ্গা। লোকমত এ কার্য্যে সহায় হবে, কেন না এ হচ্ছে ভাঙ্গার যুগ, তাই একটা ভাঙ্গা হচ্ছে দেখলেই লোকে খুসি হবে। ও বিদ্যালয় বন্ধ করবার পর, তার লোকজন ও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে কি করা যায় সেটাই হচ্ছে আপাতত আসল ভাবনার কথা।

আমি এ বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করছি আশা করি বাঙ্গালার বিদ্বজ্জন সমাজ আমার আরজি বিনা বিচারে ডিসমিস করিবেন না। এ সব প্রস্তাব অনেক ভেবে চিন্তে করা হয়েছে।

(১) ইউনিভারসিটি বন্ধ হলে অধ্যাপকদের কি গতি হবে? আমার পরামর্শ যদি নেন ত, গণিতের অধ্যাপকেরা বড় বাজারে চলে যান মাড়োয়ারীর খাতা লিখতে,

কেমিষ্ট্রীর অধ্যাপকেরা পেটেন্ট ঔষধ বানান—ওতে দু-পয়সা আছে. Physics-এর অধ্যাপকেরা বিজলী বাতি বিজলী পাখার মিস্ত্রি হোন, আর সাহিত্যের অধ্যাপকেরা আট আনা সিরিজের বই লিখুন। তাও যদি না পারেন ত খবরের কাগজ লিখুন। বাকী থাকল এক দর্শনের অধ্যাপক। তাঁরা সকল কর্ম্মের বার অতএব তাঁরা চরকা নিয়ে বসে যান—তাহলে তাঁদের হাতে ঐ চরকার ভিতর থেকে বেদান্ত-সূত্র বেরবে।

(২) ছাত্রদের পথ সব দিকেই খোলা! তাদের কতক পাঠানো হোক টোলে কতক জেলে, কতক পাঠশালায় কতক পশুশালায়, কতক হাটে আর কতক মাঠে। হাটে গোল করবার জন্য আর মাঠে গুলি ডাণ্ডা খেলবার জন্য।

(৩) লাবরেটারির যন্ত্রপাতি সব যাদুঘরে পাঠান হোক। মৃত বিজ্ঞানের কঙ্কালস্বরূপ সেখানে সে সব কাঁচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হবে। এতে দু-দলের উপকার করা হবে—এক জনগণের, আর এক প্রত্নতাত্ত্বিকদের। জনগণ ঐ সব ত্রিভঙ্গ বিভঙ্গ অপরূপ বস্তু হাঁ করে দেখে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হবে। তারা চিনতে পারবে যে ও সব হচ্ছে রূপকথার দেশের রাজকন্যার যাদুর যন্ত্র-তন্ত্র, আর ওরই ভিতর মানুষের জিওনকাঠি মরণ কাঠি দুই লুকোনো আছে। অপর পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐ সকল কঙ্কালের ভিতর থেকে, বৈজ্ঞানিক যুগের তত্ত্ব সব উদ্ধার করিবেন; এবং তার জন্য সরকারের কাছ থেকে মোটা মাইনে পাবেন।

(৪) বইগুলো নিয়েই পড়েছি মুস্কিলে। ও অনাসৃষ্টির কোথাও যায়গা হবে না, এমন কি পাগলা গারদেও নয়। অতএব পুরাকালে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীর যেরূপ সৎকার করা হয়েছিল, ইউনিভারসিটি লাইব্রেরীরও তদ্রূপ হওয়া উচিৎ! তবে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান বলে পাজিপুথির অগ্নি সৎকারের বিরুদ্ধে আমার একটা নৈসর্গিক কু-সংস্কার আছে। তাই ও প্রস্তাব আমি মুখে আনব না। তবে তা করবার লোকের অভাব হবে না। বিস্তানাহের মুরদাফরাস দেশে ঢের মিলবে।

(৫) Senate Houseকে, মাধববাবুর বাজারের অন্তর্ভূত করা হউক। ইউনিভারসিটি উক্ত বাজারকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। তাতে সরকারের অগাধ টাকা ব্যয় হত, অথচ এক পয়সাও আয় হত না। আর আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হলে, সরকারের এক পয়সাও ব্যয় হবে না, উল্টে ঢের টাকা আয় হবে। আমার বিশ্বাস ও-ঘরের যে ভাড়া পাওয়া যাবে তার থেকে একটি নূতন minister অর্থাৎ fish market minister-এর মাইনে দেওয়া যাবে।

(৬) আমার শেষ প্রস্তাব এই যে ইউনিভারসিটি কলেজে একটি নূতন পুলিসকোর্ট বসানো হোক। বিষয়ে নজির আছে। ডফ সাহেবের কলেজ ইতিপূর্ব্বে জোড়াবাগান পুলিসকোর্টে পরিণত হয়েছে। এই নজির অনুসারে, ইউনিভারসিটি কলেজকে, গোলদিঘি পুলিস-কোর্টে রূপান্তরিত করা হোক। গোলদিঘির ধারে যে একটা পুলিসকোর্ট থাকা দরকার একথা বোধ হয় কোনও মিনিষ্টারই অস্বীকার করবেন না।

আশাকরি Reform Council আমার উক্ত প্রস্তাব সব গ্রাহ্য করবেন। ইতি "বিজলী"

(২)

শিবের নৃত্য

[অনুবাদক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

—:)•(:—

[শিবের নটরাজ মূর্ত্তি ভারতীয় শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ভারতীয় শিল্প যে কি বস্তু তাহা উপলব্ধি করিবার মত রসবোধ আমরা হারাইয়াছি—উহা আমাদের চোখে উদ্ভট, এমন কি বিকট কল্পনা বলিয়াই বোধ হয়। আমাদের মধ্যে যাঁহারা আবার একটু খোলা মনে শ্রদ্ধার সহিত ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় লইতে চাহেন, তাঁহারাও অনেকে এখানে সহজে স্বাভাবিকতার অভাব দেখিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পড়েন। কিন্তু এই শিল্পই যে স্বভাবের জীবনের কতখানি প্রাণচঞ্চলা অভিব্যক্তি তাহা সুন্দরের প্রকৃত পূজারীর চোখে এড়াইয়া যায় না।

ফরাসী দেশের আধুনিক কালের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ভারতীয় শিল্পসৃষ্টির এই দিকের কথাটা এমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে, তাহার অনুবাদটি আমাদের বাঙ্গালি পাঠকদের কাছে উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। অগুস্ত রোদিন (Auguste Rodin) ভারতীয় শিল্পের যে ব্যাখ্যান-মূর্ত্তি দিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার, তাহাতে পাই শিল্পকে দেখিবার বুঝিবার শিল্পীর নিজস্ব ভঙ্গি। দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্যের মহাশিল্পী তাঁহার কথা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, দিয়াছেন কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সূত্র—ইহার সাহায্যেই আশা করি অনেক অন্ধের দৃষ্টিশক্তি খানিকটা খুলিয়া যাইবে।]

নটরাজের গোটা মূর্ত্তিখানি দেখিতে দেখিতে

পূর্ণ প্রস্ফুটিত জীবন, জীবনের নদ, বাতাস, রৌদ্র, উচ্ছ্বসিত হইয়া চলার সজাগ অনুভব—সুদূর প্রাচ্যের শিল্প আমাদের কাছে এই ভাবে প্রতিভাত!

* * *

সেই যুগে মানবশরীর দেবত্ব লাভ করিয়াছিল—এ জন্য নয় যে আমরা তখন জিনিষের উৎপত্তির কাছে কাছে ছিলাম, কারণ বাহিরের গড়ন ত আমাদের বরাবর সেই একই রকম রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু এইজন্য যে বর্ত্তমান যুগে মনের দাসত্বই হইতেছে এই ধারণা যে আমরা সব কিছু হইতেই মুক্ত, এই জন্য যে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট পথের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছি। আমাদের রুচি বিকৃত।

এক পাশ হইতে দেখিলে, শিবমূর্ত্তিটিকে বোধ হয় যেন একখানি সুচারু চন্দ্রকলা।

গড়নের এই গরিমায় কি প্রতিভা!

আজ সেই পিত্তলে গাঁথা সৌন্দর্য্য নিথর।

আলোক অতি মৃদু সঞ্চরিত। স্পষ্ট অনুভব হইতেছে, সে আলোক স্থানভ্রষ্ট হইলেই, ঐ সব পুঞ্জীভূত স্তব্ধ পেশী বুঝি উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে।

ছায়া সরিয়া সরিয়া যাইতেছে, মূর্ত্তিটিকে জড়াইয়া ধরিতেছে, কি একটা অব্যক্ত মাধুর্য্যে উহাকে মণ্ডিত করিতেছে। যে অজ্ঞাত রাজ্যে ঐ নিবিড় তমিস্রা এতদিন বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখান হইতেই আজ সে বাহির হইয়া আসিতেছে।

চলনের ভঙ্গীতে কতই আভাস! গড়নের রেখায় কি অতীন্দ্রিয় অস্পষ্টতা! কি একটা দিব্য সামঞ্জস্যে নিয়মিত সেই অঙ্গে কোথাও বিষম বা বিরুদ্ধ কিছু নাই। প্রত্যেক জিনিষটি আপন আপন যথাযথ স্থানে। স্থৈর্য্যের মাঝে হাত দু'খানিতে আবর্ত্তনের গতি স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে—লক্ষ্য কর, স্কন্ধের অস্থির ঝোঁক; লক্ষ্য কর কাঠামখানি, বুকের অস্থিশ্রেণী কেমন সুনিবদ্ধ তরঙ্গিত পেশী সম্ভার তাহাকে তুলিয়া ধরিয়াছে, স্কন্ধের অস্থির সহিত একলক্ষ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। পাঁজরার দুই পাশ নামিয়া গিয়াছে, —কোথাও তাহা স্তম্ভিত, কোথাও বা নিষ্পেষিত—বাড়িয়া দুই উরুতে পরিণত হইয়াছে, সে যেন দুইটি সংযোগ দণ্ড দুইটি উৎক্ষেপণী (lever); সুষম কোণ বেড়িয়া দুখানি সুন্দর পা পৃথিবীর উপর লীলারত——

এক পার্শ্ব হইতে দেখিতে দেখিতে

কি মনোহর ঐ যে হাত দুখানি বক্ষ ও উদরকে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কি সুচারু ভঙ্গিমা, Venus de Medici'র হস্তভঙ্গিমাও উহার নিকট পরাস্ত। Venus de Medici'র বাহু দিয়া যেন আপন তনুরুচি রক্ষা করিতেছে —শিবও তাহাই করিতেছে, কিন্তু কি একটা চতুর গতিভঙ্গে।

দক্ষিণ দিকের ছায়া ধড়টিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া উরুর উপর দিয়া নামিয়া গিয়াছে—উরুর অর্দ্ধেক ছায়ায় ঢাকা আর অর্দ্ধেকের উপর পড়িয়াছে আলোছায়ার বক্রছায়া———

* * *

ফলতঃ, সমস্তই নির্ভর করিতেছে সামর্থ্যের, লঘুতার, বৈপরীত্য সমাবেশের ভাবগম্ভীরতার তাহার উপর। খুঁটিনাটির একটিও আপনা আপনি কিছু সার্থক নয়। তাহাদের প্রত্যেকটি যেন সুরের এক একটি অতিরিক্ত খেলাপ, সমস্ত মূর্চ্ছনার সহিত না মিলিলে তাহারা সব ব্যর্থ।

পা দুখানির দীর্ঘায়তপেশী ফুটাইয়া ধরিতেছে, শুধু গতির বেগ।

উরুযুগল যুগল টানে পরস্পর পরস্পরের দিকে সন্নিহিত হইয়াছে—অতি সতর্কে যেন মধ্যের ঐ প্রহেলিকাময় ভঙ্গিমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সে গরিমাময় ছায়াক্ষেত্র উরুর উপরে লীলায়িত আলোকে অধিকতর গোচর হইয়া উঠিয়াছে।

শিবের সম্মুখভাগে

শিল্পীর কাছে এই ঠাম সুপরিচিত। কিন্তু কিছুই এখানে সুলভ সাধারণ নয়। সমস্ত ভঙ্গিটিতে রহিয়াছে স্বাভাবিকতা, কিন্তু সে স্বভাব যেন লুকাইয়া আছে কোন্ সুদূরে। এখানে আছে কি একটা জিনিষ, সকলের চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না—অজ্ঞাত অতল সব, জীবনের একেবারে মূলদেশ। সৌষ্ঠবে রহিয়াছে লাবণ্য, লাবণ্যের উপর বলনভঙ্গী। সব জিনিষ একটা জিনিষে গিয়া পরিণত হইতেছে—তাহাকে মাধুর্য্য বলিতে পার, কিন্তু তাহা হইতেছে বীর্য্যান্বিত মাধুর্য্য! তারপর, কথায় আর ব্যক্ত হয় না।

* * *

কাঁধ হইতে কোমর পর্য্যন্ত, কোমরের দুই পাশে সমান্তরালে প্রক্ষিপ্ত উরু পর্য্যন্ত ছায়ার মালা সব ঝুলিয়া রহিয়াছে।

পা দুখানির উপর বিভিন্ন ধরণের আলোক সম্পাত। ঐ যে উরুটি অপর পাখানির উপর প্রলম্বিত ছায়া ফেলিয়াছে।

বলন যদি একটা ভিতরের জিনিষ না হইত, তবে কাঠামো এমন ভরাট, এমন নমনীয় হইত না। অন্যথা, দক্ষিণের ঐ আলো সংযোগে উহাকে দেখাইত বিশুষ্ক বিশীর্ণ।

শিবমূর্ত্তির বর্ব্বরভাবের কথা

অজ্ঞানী জিনিষকে সহজ করিয়া ফেলে, নীচে নামাইয়া দেখে। গরীয়ান শিল্পে যে জীবন তাহার অজচ্ছেদ সে করে মাত্র—তাহার নজরে কিছুই পড়ে না, সে চায় ছোটকে ক্ষুদ্রকে। যদি ভাল লাগাইতে চাও, যদি চোখ মেলিয়া দেখিতে চাও, তবে আরও অভিনিবেশ দরকার।

নম্রভাবে শিবের মস্তক দেখিতে দেখিতে

ঐ যে ওষ্ঠাধর ফুলিয়া উঠিয়াছে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়াছে—কি ভোগৈষণার লক্ষণে ভরপুর।

* * *

মুখটুকুর কোমলতায় মিল দিয়াছে ঐ নয়নের কোমলতা।

* * *

ওষ্ঠাধর যেন আনন্দের হ্রদ, তাহারই তীরে জাগিয়া কি মহিমাপূর্ণ নাসারন্ধ্র।

* * *

মুখটুকুর সে রসাল তরঙ্গিত মাধুর্য্য—সর্পের মত বঙ্কিম গতিভঙ্গ।

ভরা চক্ষু নিমীলিত—একখানি রোমের জালে যেন তাহা আবৃত।

* * *

নাসিকার দুই ধারি উন্মুক্ত অবকাশের মধ্যে কি কোমলভাবে অঙ্কিত।

কথার সৃষ্টি করে ঐ মুখ—কথা যখন বাহির হয় মুখ গতিশীল হইয়া উঠে—কি মনোহর উরগের গতি সেখানে।

* * *

চক্ষু দুটি যেন একটি কোণে লুকাইয়া—কি বিশুদ্ধ রেখা, প্রশান্তভাব—যেন দুটি তারা হামাগুড়ি দিয়া আছে।

চক্ষু দুটি কি শান্তি মাখান—কি প্রশান্ত গড়ন তাহাদের সে শান্তির কি স্থির আনন্দ।

হনুটিতে আসিয়া সব স্তব্ধ—সব বাঁক আসিয়া সেখানে মিলিয়াছে।

* * *

ঐ মিলনকেন্দ্রের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া একই ভাব আর এক রূপ লইয়া প্রকাশিত হইতেছে। মুখের গতিরেখা উঠিয়া আবার গণ্ডে যাইয়া মিশিয়াছে।

একটি বাঁক কর্ণ হইতে উঠিয়াছে ঘুরাইয়া ধরিয়াছে আর একটি ছোট বাঁককে—ঐ ছোট মুখখানি আর কতক

নাসারন্ধ্র কে টানিয়া রাখিয়াছে। নাসিকা ও হনুর তলা দিয়া গণ্ডাস্থি পর্য্যন্ত একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত ঘুরিয়া আসিয়াছে।

গণ্ডের রেখা ঘুরিয়া উপরে উঠিয়া বাঁকে বাঁকে ঢেউ দিয়া মিশিয়া গিয়াছে।

শিবের মস্তক, মূর্ত্ত বাণী

চক্ষু জোড়া আপন আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। একটু খানি ছায়ার স্পর্শে তাহারা আরও ভাসিয়া উঠিয়াছে—কি দিব্য বিলাস, কি দিব্য জ্যোতি সেখানে।

মুদিত নয়নে ইঙ্গিত পাইতেছি হারান দিবসের মাধুর্য্য। বহুমূল্য স্ফটিকের মত নির্ম্মল করিয়া অঙ্কিত ঐ চক্ষু। চক্ষুর পাতায় গড়িয়াছে যেন একটি রত্নপেটিকা, আর তাহারই মধ্যে ঐ চক্ষুতারকা। ভ্রূর বাঁক ঐ বিসর্পিত মুখেরই বাঁকের মত।

কত মধুর চিন্তার আকর ঐ মুখ—আবার ভয়ানকের আগ্নেয়গিরি।

যুগ যুগ ধরিয়া ঐ পিত্তলের মধ্যে এমন করিয়া জড়বস্তুর মত বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে যে অতীন্দ্রিয় সত্তা। ঐ মুখে মাখা অনন্তের পিপাসা—ঐ চক্ষুতে ফুটিতে চাহিতেছে দৃষ্টি ও ভাবা।

ঐ মুখের ভিতর দিয়া জীবনের শ্বাস প্রতিনিয়ত আসিতেছে যাইতেছে—ভ্রমরদল যেন অবিরল প্রবেশ করিতেছে পড়িতেছে আবার উড়িয়া যাইতেছে। মধুর নিশ্বাসে কি সৌরভ।

পুস্তক সমালোচনা

[পদ্মপাদ]

কান্তকবি রজনীকান্ত

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত—৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট বেঙ্গল বুক কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ৪৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত "রামেন্দ্র-সুন্দর" প্রকাশিত হইবার পর হইতে কান্তকবির জীবনীর জন্ত বিজ্ঞাপন স্তম্ভ দেখিয়া সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া ছিলাম কবে উহা প্রকাশিত হইবে। যে দারুণ দুঃখ বেদনার পুরোহিত বিন্দু বিন্দু করিয়া যন্ত্রণা-যজ্ঞে আপনাকে আহুতি দিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবনী সর্ব্বজন প্রিয় কবি বলিয়া নয়, হাস্যরসিকে মজলিশী লোক বলিয়া নয়, আনন্দবর্ষী সুকণ্ঠ বলিয়া নয়, তিনি যে সাধনাযজ্ঞের ঋত্বিক

> দুঃখময়ের পূজার ফুলে ভরি' অর্ঘ্য-থালা
> বুকের রক্তে ভিজিয়ে দিয়ে ভুলে গেঁথে তাঁরই বরণ মালা;
> আপন সুরের যাকিছু সকল
> সবার চেয়ে প্রাণের প্রিয়, তাই ঢেলে সে করছে বরণ জয়!

তাই তাঁহার জীবনী বাঙালীর আগ্রহের সামগ্রী। মরণকে তিনি সত্যই জয় করিয়া গিয়াছেন তিনি ভাগ্যবান পুরুষ Blessed are those that suffer তিনি নিজে বলেছেন "আমার এত সৌভাগ্য,—আমার ব্যারাম না হ'লে বুঝতে পারতাম না। কোন পুণ্যে এই অসুখ হয়েছিল?" আপনার জীবনে সাফল্য লাভ করিয়া মৃত্যুতে তিনি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙালী তাঁহাকে হারাইয়াছে—চির জীবনের জন্যই হারাইয়াছে! বাঙালী তাঁহার কাছে খাঁটি বাঙালার মর্ম্মকথা আর শুনিতে পাইবে না, তাঁহার মধুর কণ্ঠের সহজ সরল সঙ্গীত লহরী আর বাঙালীর কাণে অমৃত বর্ষণ করিবে না, বৎসরে বৎসরে সকল কল্যাণ-কর্ম্মে বাঙালীর ভাগ্যে আর রজনীকান্তের স্নেহমধুর স্পর্শ লাভ ঘটিবে না—কিন্তু তাঁহার এই দৈহিক মৃত্যুর চারিধারে তিনি যে বিপুল অবকাশের রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাঙালী তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে সত্যরূপে

চিনিবার-জানিবার ও অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছে—বাঙালীর হৃদয়-পাদপীঠে তাঁহার স্নেহসজল, হাস্য-উজ্জল মূর্ত্তিটি চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। "তাঁহার কর্ম্মজীবনের মধ্যে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের হীন চেষ্টা ছিল না, আত্মনাম ঘোষনার মদমত্ততা ছিল না, অথচ তিনি তাঁহার নিস্তব্ধ জাগ্রত কর্ম্মজীবনের মধ্যে আত্মবিস্মৃত মহত্ব দ্বারা যে সুনাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার স্মৃতিকে অমর করিবে।"—তবুও আমরা আমাদের বৈচিত্র্য বিহীন নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের মধ্যে স্মৃতি রক্ষা করিবার প্রয়োজন বোধ করি। এ প্রয়োজন লৌকিক নয়—অন্তরের। ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসা অন্তরের সামগ্রী কিন্তু পূজা উপাসনা, অর্চ্চনাও সেই অনুভূতিরই পরিতৃপ্তি সাধনের আকিঞ্চন—রজনীকান্তের জীবনী লেখাও সেই আকিঞ্চন—।

রজনীকান্ত মানুষ হিসাবে, আমাদের বড় আত্মীয় ছিলেন—বাঙালীর দুঃখ দৈন্য দুর্ব্বলতা অবসাদ তিনি প্রাণ দিয়া অনুভব করিতেন, নিজের অভ্রান্ত দর্শনের ফলে বুঝিয়াছিলেন এই অত্যাচার-পীড়িত, ব্যথিত বাঙালীর 'গলদ'' কোথায় তাই তিনি প্রাণপণে আপনার বিভূদত্ত প্রতিভার দ্বারা সেগুলি সহজ স্পষ্ট ভাবে সাধারণের গোচরে আনিয়াছেন; হৃদয়ের অফুরন্ত সুধা উজাড় করিয়া হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন। তিনি বাঙালীর হৃদয়ের ভাষা জানিতেন, বাঙালীর সাধনা ও আদর্শের বাণী তাই তিনি অত সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

আবার বাঙালীর সৌন্দর্য্য, বাঙালীর ঔদার্য্য, বাঙালীর মহত্ব তাঁহার হৃদয়কে স্পন্দিত উদ্বোধিত করিয়াছে! সাম্প্রদায়িকতা তাঁহার হৃদয়কে সংকীর্ণ করিতে পারে নাই, সাময়িক উত্তেজনায় তিনি চিরন্তন আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই, তাই তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ধার্ম্মিকতার ভণ্ডামি নাই, সমাজ সংস্কারকের (?) গুণ্ডামি নাই—আত্মম্ভরীর 'প্রলাপ' নাই, আশাহতের 'বিলাপ' নাই—যাহা আছে তাহা 'প্রাণের কথা'—তাই তাহা আমাদের প্রাণকে এমন ভাবে স্পর্শ করে! কান্তকবির জীবনী পাঠ করিলে এই কথাই মনে হয়।

নলিনীবাবু যেভাবে বিষয়-বিন্যাস করিয়াছেন তাহাতে কবির জীবনটি নানা ভাবে, বেশ পাঠকের মনকে আকর্ষণ করে—হাস্যরসিক, গায়ক-কবি দুঃখ বেদনায় মধ্যে কেমন আপনার সাধনার পথটি ধীরে ধীরে বাছিয়া লইয়াছেন তাহা বুঝা যায়—"দুঃখ-দহনে" জলিয়া জলিয়া জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যে অসামান্য জ্যোতির বিকীর্ণ করিয়া গেল তাহা বাঙালীর

> নয়নে এখনো রয়েছে মাখানো
> মুছিলে যাবার নয়—
> তাহার বিমল উজল আভায়
> তাঁহারি মূর্ত্তি সুন্দর ভায়—
> অসীম দুঃখ বেদনার ধায়
> বিলয়ে লভেছে জয়।

গ্রন্থকার প্রথমেই—

> জ্বলুক যতই জ্বলে
> পর জ্বালা-মালা গলে,

নীল-কণ্ঠ কণ্ঠে জ্বলে হলাহল দ্যুতি—লিখিয়া চরিত্র বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন—এই দুই লাইনে রজনীকান্তের ভাবীজীবনের ধারা উপলব্ধি হয়! সত্যই রজনীকান্ত জ্বালারমালা পরিয়া—নীলকণ্ঠ হইয়াছিলেন।

"Child showes the man" একথা রজনীকান্তের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তাঁহার কবিত্ব শক্তির প্রথম বিকাশ সময়ে দেখিতে পাই—

> ফুল যে ঝরিয়া পড়ে—কথা নাহি মুখে!
> তার ক্ষুদ্র জীবনের বিকাশ বিনাশ,
> তার ক্ষুদ্র আনন্দের তুচ্ছ ইতিহাস;
> র'য়ে গেল কিনা এই মর-মর্ত্ত্য বুকে,
> সেকি তা দেখিতে আসে? হেসে ঝরে যায়।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ব্যঙ্গ কবিতা ও সঙ্গীত রচনার সূচনাও আমরা তাঁহার প্রথম জীবন হইতেই দেখিতে পাই! কবি রজনীকান্ত ভাবুক ছিলেন, আপনার ভাবে বিভোর হইয়া তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া যাইতেন, গান গাহিতে গাহিতে তিনি তন্ময় হইয়া

থাকিতেন! নিজের মধ্যে বড় একটা কিছুর অনুভূতি না জাগিলে এমন হয় না, হইতে পারে না।

রজনীকান্ত একাধারে কবি, ভাবুক গায়ক ছিলেন এবং কোনও একটি স্বরেই তাঁহার জীবন কষ্টকল্পনায় আবদ্ধ বা আত্ম-চেষ্টায় অস্বাভাবিক হইয়া উঠে নাই! নলিনীবাবুর লিপিকুশলতায় রজনীকান্তের জীব বেশ স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয়!

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের "বঙ্গ ভঙ্গের সংবাদে বাংলার ঘরে ঘরে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বাঙ্গালার সেই দুর্দ্দিনকে স্মরণীয় করিবার জন্য, বঙ্গ-জননীর স্নেহাঞ্চলবাসী একই ভাষাভাষী সন্তানগণের মধ্যে বহির্বিচ্ছেদের পরিবর্ত্তে অন্তর্মিলন গাঢ়তর করিবার মানসে আবালবৃদ্ধবনিতা সকল বাঙ্গালীই সেদিন অরন্ধনব্রত অবলম্বন করিয়া শুদ্ধচিত্ত ও সংযমী হইলেন এবং পরস্পরের মণিবন্ধে 'রাখী' বন্ধন করিয়া প্রাণের টান দৃঢ়তর করিলেন।" "শক্তিমান রাজপুরুষগণের বঙ্গ-বিভাগ-আদেশ রহিত করিবার জন্য বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে এই যে আন্দোলনের তরঙ্গ বহিয়াছিল তাহাই "স্বদেশী আন্দোলন" বলিয়া প্রখ্যাত। এই স্বদেশী আন্দোলনকে স্থায়ী করিবার জন্য যাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন দেশের ও দশের মঙ্গল কামনায় এই কর্ম্মে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছিলেন, রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম।"

তাঁহার "মায়ের দেওয়া মোটাকাপড়" "আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট" "মা বলে ভাই ডাক্‌লে পরে ধরবে টিপে গলা" ইত্যাদি "গানের সঙ্গে সঙ্গে কবি রজনীকান্তের নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে, বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল!" প্রকৃত মাতৃভক্ত সন্তানের মত যে দিন রজনীকান্ত * * * মায়ের স্নেহাশীষ ভরা দান অতি যত্নে বাঙ্গালীর মাথার উপর তুলিয়া দিলেন, সে দিন বাঙ্গালী রজনীকান্তকে আরও ভাল করিয়া চিনিবার সুযোগ পাইল!"

কিন্তু রজনীকান্তের ভাব ধারণা শুধু যে এক বাঙলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে—এবং তাঁহার এই দেশাত্মবোধ যে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয় এ কথাও সত্য নহে। তাহার বহু পূর্ব্বে "কাব্য নিকুঞ্জে" ভারত মাতাকে কবি আহ্বান করিয়াছিলেন—

ভারত কাব্য-নিকুঞ্জে,—
জাগ সুমঙ্গলময়ী মা!

সমস্ত ভারতের লুপ্ত মহিমার কথা কবির প্রাণকে ব্যথিত করিল তাই কবি খেদ করিয়া বলিলেন—

সেথা আমি কি গাহিব গান
যেথা গভীর ওঙ্কারে সাম-ঝঙ্কারে
কাঁপিত দূর বিমান!
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ
আর কি আছে সে প্রাণ!

কিন্তু কবি আশান্বিত—তিনি অবসাদগ্রস্থ দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন—

কিশের শঙ্কা বাজাও ডঙ্কা প্রেমেরি গঙ্গা বো'ক
মায়েরি রাজ্যে মায়েরি কার্য্যে ফুটেছে আজ যে চোখ্
* * * *
তোরা আয়রে ছুটে আয়;
ঘুমের মা আজ জেগে উঠে ছেলে দেখতে চায়!

এই উন্মাদনার মধ্যে কবির আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে, একটা বিনম্র তেজ আছে—তাই তিনি দরিদ্র, ক্লিষ্ট দেশভ্রাতৃগণকে আত্মসাবধানী মন্ত্র শুনাইলেন—

ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান
মোটা হোক সে সোণা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান;
মিহি কাপড় পরবো না আর যেচে পরের কাছে;
ইত্যাদি

"স্বদেশী যুগে কান্ত কবি এমনি করিয়া দেশবাসীকে উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'শেষ কথা" বাঙ্গালীকে আশায় আশ্বাসে ও আকাঙ্খায় উদ্দীপিত করিয়াছিল,—

বিধাতা আপনি এসে পথ দেখালে,
তাও কি তোরা ভুলবি?

বিধাতা আপনি এসে জাগিয়ে দিলে
তাও কি ঘুমে ঢুলবি ?
বিধাতা পণ করা আজ শিখিয়ে দিলে,
তবু কি ভাই ভুলবি ?

"মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে, নিদারুণ রোগ যন্ত্রনার মধ্যেও তিনি দেশের চিন্তা নিমেষের জন্ম ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই রোগ-যন্ত্রনায় কাতর অবস্থায় * * * * "অমৃত" নামক গ্রন্থ উৎসর্গকালে এই 'মন্দভাগিনী' জন্মভূমির স্নেহের দুলাল বলিয়াছেন—

"কুমার! করুণানিধে; দেখ র'ল দেশ!"

এইবার কয়েকটি পরিচ্ছেদের কথা বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

গ্রন্থকার যে প্রণালীতে পরিচ্ছেদগুলি সাজাইয়াছেন তাহা ভালই হইয়াছে—তবে আমাদের মনে হয় রজনী-কান্তের জীবনপ্রসঙ্গে তিনি এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যে তাহা না বলিলে বেশ চলিত এবং এমনকি দু'এক স্থানে তাঁহার অভিমত আমাদের একেবারেই ভাল লাগে নাই। যেমন "হাস্যরসে" পরিচ্ছেদে—

"দ্বিজেন্দ্রলালের গৌরব ইত্যাদি ইত্যাদি"

"হাস্যরস-সৃষ্টিতে রজনীকান্ত বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়।" "বঙ্কিমচন্দ্র "ফতোয়া" দিয়া গিয়াছেন—ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গ্যে (?) কিছু মাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন নাই। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ কিন্তু অতি বিনীত ভাবে বলিতেছি, বঙ্গসাহিত্যের সায়েনশা বাদসার এই ফতোয়া আমরা আভূমি কুর্ণিশ করিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না"—গ্রন্থকারের এই উক্তি কতদূর শোভন হইয়াছে পাঠকই তাহার বিচার করিবেন। আর একস্থানে দ্বিজেন্দ্রলালের "গানে ও কবিতায় ব্যঙ্গ্য [?] অপেক্ষা কৌতুক বেশী, মেকির উপর কশাঘাত অপেক্ষা তাহাকে লইয়া রসিকতা করবার ভাবটা বেশী, কেবল হাসির জন্ম লোককে হাসাইবার চেষ্টা অধিক, বেশীরভাগ ভাঁড়ামি বা Fun বা রঙ্গ—Humour বা Satire কম। ইহা পড়িয়া মনে হয় গ্রন্থকার উপযুক্ত অভিনিবেশ সহকারে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও ব্যঙ্গ কবিতা পাঠ করেন নাই। তিনি বঙ্গসাহিত্যে Parody সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে "রসের কালাপাহাড়" আখ্যা দিয়াছেন এবং উহা নক্কারজনক বিকৃত বীভৎস রস প্রভৃতি বলিয়া তাহার আনুকুল্যে যে সব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা অবান্তর বলিয়াই বোধ হয়।

"রহস্যবিদ্ রবীন্দ্রনাথ কখনও প্যারডি রচনা করেন নাই!" এই ভ্রান্ত ধারণাকে সমর্থন করিতে গিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন প্যারডিতে "রসের সৃষ্টি হয় না—সংহার হয়, তাই তিনি এই রচনায় কখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই" রবীন্দ্রনাথ এই কথা শুনিয়া বিশেষ তুষ্ট হইবেন কি ?

রোজ নামচা পরিচ্ছেদটি অপূর্ব্ব! পড়িতে পড়িতে কখন কৌতূহল হয় কখন রুগ্ন রজনীকান্তের যন্ত্রণা-মথিত মনের কথাটি দুঃখে ব্যথায় পাঠকের প্রাণ ভরিয়া তুলে, দুঃখদেবতার হোমানলে কবিকে যখন আপনার প্রত্যেক রক্তবিন্দুটি আহুতি দিতে দেখি তখন যেমন বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইয়া আসে তেমনি দুর্ব্বল অসহায় মানবের আহত জীবনে নিদারুণ কঠোর শাস্তির কথা মনে হইয়া চক্ষু জলে ভরিয়া আসে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রোগাতুর রজনীকান্ত যেমন রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন তেমনি আবার তাহাকে বন্ধুর মত বরণও করিয়াছেন। এই ব্যাধি ক্লেশের মধ্যেও তাঁহার আনন্দ-ঘন মূর্তিটিকে হাস্যরসপূর্ণ উক্তি গুলি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুত আলোকের মত চোখের সাম্নে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই দেহের যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার মনের দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না—কাশিম বাজারের স্বনামধন্য দানবীর মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দুস্থ বিপন্ন পরিবারকে আপনার উদার আশ্রয় দান করিলেন। রজনীকান্তের মৃত্যুর পর ঋণভার প্রপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্থ পরিবার এক প্রকার পথে দাঁড়াইলে একমাত্র, মহারাজের অপার করুণাই তাহাদিগকে রক্ষা করিল। মহারাজের উপর নির্ভর করিয়া এবং দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎচন্দ্রকে তাঁহার অকৃত্রিম সহায়ক রূপে পাইলেও তাঁহার দারিদ্র্য দুঃখের পরিমাণ কিছু কম ছিল না। সেই বিদগ্ধ প্রাণের মধ্যেও ভক্ত ও ভগবানের প্রতি তাঁহার

যে অচলা ভক্তি তাহা সাধারণের জীবনে দুষ্প্রাপ্য! ভগবানের উপর বিশ্বাস না থাকিলে তিনি কখনও আপনাকে এমন করিয়া ফিরিয়া পাইতেন না!

নলিনীবাবু বহু পরিশ্রমে পুস্তকখানিকে মনোজ্ঞ করার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৫ খানি হাফটোন ছবি দিয়া বই খানির শ্রীবৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুন্দর এণ্টিক কাগজে, ছাপা—।

আমরা অবগত হইলাম গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকে প্রতিশ্রুতি দিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সাহায্য করেন নাই বাঙ্গলার পাঠক পাঠিকারা এই পুস্তক খানি ক্রয় করিলে শুধু যে স্বর্গগত কবির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইবে তাহা নহে—দরিদ্র গ্রন্থকারও উপকৃত হইবেন।

বেহার চিত্র। [প্রথমখণ্ড] শ্রীযতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। ৬৮।৫ রসারোড নর্থ কলিকাতা রায় চৌধুরী এণ্ড কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ মাত্র

বেহারের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না পাইলেও বেহারের চিত্রগুলি বেশ উপভোগ করিলাম। কারণ মানব চরিত্রের দুর্ব্বলতা বা হাস্যোরসোদ্দীপক অপূর্ণতা মাত্রেই উপভোগ্য। লাঠির আঘাতে ভিখন বালিকা পুত্রবধূর, "মাইয়া গো" বলিয়া ভূতলে পতনের মধ্যে যে কলঙ্ক রহিয়া গেল তাহা ভিখন সিংএর পাশব কঠোরতার পরিচায়ক, ইহাতে পাঠকের হাস্যধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভিখন সিংএর এই নৃশংস প্রবৃত্তি মর্ম্মস্পর্শী! ইহাতে অপূর্ণতা অপেক্ষা তীব্রতাই অধিক।

"রেলপথে" যেন শেষের মধু পাওয়া গেল।—শুধু রেলপথে কেন—আমাদের জীবনপথে নিয়তই এই রূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে,—যদি নিজে ঐ চরিত্রের অন্যতম না হইয়া দর্শক হইতে পারি। যতীনবাবুর এসব চিত্রে বড় সুন্দর হাত! তাঁহার কোনও গল্পই .... খুব মন্দ হয় না। বেহার চিত্রের দ্বিতীয় খণ্ড পড়িবার আশায় রহিলাম।

ব্যথার দান। সৈনিক কবি, কাজী নজরুল ইস্‌লাম প্রণীত। মোসলেম পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা। ছাপা বাঁধাই অতি সুন্দর।

কাজী নজরুল ইস্‌লামের নাম অতি অল্প দিনেই বাঙলার পাঠক পাঠিকাদের কাছে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছে। তাঁহার কবি-প্রতিভার নিদর্শন এ পুস্তকে বিশেষ নাই। তবে কবি প্রাণের কারুণ্য ও মাধুর্য্যে দিনলিপিগুলি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। কবির লেখনিতে উপযুক্ত ভাষায় প্রাণের অনুভূতিটুকু বেশ ফুটিয়াছে। সৈনিক কবির কবিতাবলী পুস্তকাকারে দেখিবার আগ্রহে রহিলাম!

কাঞ্চনতলার কাপ্—ভূতপূর্ব্ব "বিজলী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার প্রণীত বিজলী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক আনা ফুটবলের কাপ্ লইয়া পুস্তকখানি লিখিত হইলেও এক দিক দিয়া ইহার ভাষা ও ভাব প্রকাশের ভঙ্গি সাহিত্যিকগণের প্রণিধানযোগ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিকে উপাসনার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধাকমলবাবু এবং অন্যদিকে সবুজপত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বঙ্গভাষার গতি নির্ণয় লইয়া ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। সবুজপত্র সম্পাদক 'প্রাদেশিক' ভাষা 'লেখ্য ভাষা' হইতে পারে এই তর্ক উত্থাপন করিলে প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত এই পুস্তিকা খানি প্রকাশ করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করা হয় যে বাঙলার এক জেলাতেই বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহার আছে—যদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে এমনি নূতন নূতন প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করিয়া পুস্তক লেখা হয় তাহা হইলে একটা সর্ব্ববাদীসম্মত আদর্শ না থাকিলে অর্থ গ্রহণে যে বিপত্তি হইবে তাহার প্রতিকারের উপায় কি? ইহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। শ্রীযুক্ত প্রমথবাবু 'প্রাদেশিক ভাষা'র যে পক্ষপাতী তাহা 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত কয়েকটি পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় লিখিত গল্প দেখিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু সে তর্ক এখন পর্য্যন্ত কোনও একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় নাই।

এই পুস্তক খানির মধ্যে এমন একটা সাবলিল গতি আছে, রঙ্গব্যঙ্গের মধ্য দিয়া চিত্রটি এমন সুন্দর ফুটিয়াছে যে ভাষার [দুরূহতা যদিও লেখক পরিশিষ্টে টিকা করিয়া-

ছেন] সত্ত্বেও আমাদের ইহা ভাল লাগে। কবিতাটি সঙ্গীতাকারেও গীত হইতে পারে। সে সব বিষয়ের সুবিধার জন্য লেখক যথাসম্ভব টিকা করিতে ক্রটী করেন নাই। মূল্য অতি অল্প। প্রত্যেকের কাছেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির আদর হইবে আশা করা যায়।

ঐশ্বর্য্য। উপন্যাস। শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত মূল্য ২৲ দুই টাকা। পুস্তকখানি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।
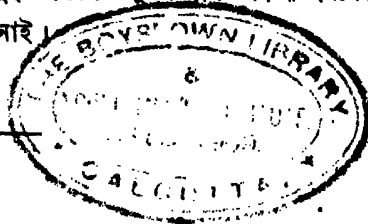
নিবেদন

উপাসনার পরিচালকবর্গের বলিবার কিছুই নাই, নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ের জন্য পত্রিকা প্রকাশে এই ক্রটি হইতেছে। সম্পাদক মহাশয়ের বার বার অসুস্থতায় তাঁহার আলোচনী দু'এক মাস দিতে পারা যায় নাই। এই বৎসরের জন্য গ্রাহক অনুগ্রাহকগণ আমাদের ক্ষমা করিবেন। আগামী বর্ষ হইতে পত্রিকা প্রকাশে কোনও প্রকার ক্রটি যাহাতে না হয় এবং উপন্যাস ছোটগল্প.কবিতা গান ও ছবি যাহাতে পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা যাইতেছে। উপাসনার প্রত্যেক বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাদের যোগ্যতা আগামী বর্ষের প্রথম সংখ্যা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

গ্রাহকগণের নিকট আমাদের সানুনয় নিবেদন তাঁহারা এতদিন যে অনুগ্রহ-দৃষ্টিতে উপাসনাকে দেখিয়া আসিতেছেন তাহা হইতে যেন উপাসনা বঞ্চিত না হয়। উপাসনার তরুণ কর্ম্মীর দল বর্ত্তমান বর্ষে আশানুরূপ ফললাভ করিতে পারে নাই—তবে আপনাদের সহানুভূতি থাকিলে তাহারা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে।

কর্ম্মকর্ত্তা—উপাসনা।

উপাসনার কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হইয়াছে—মলাটের শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"সাগর-মাঝে রহিলে যদি ভুলে, কে করে এই তটিনী পারাপার ;
অকূল হ'তে এসগো আজি কূলে, দুকূল দিয়ে বাঁধগো পারাবার,
লক্ষ-যুগ পশরা লয়ে শিরে—বিশ্ব আজি দাঁড়ায়ে ঐ তীরে।"

১৭শ বর্ষ | আষাঢ় ১৩২৯ | ১২শ সংখ্যা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

বর্ষার নবীন মেঘ এল ধরণীর পূর্ব্বদ্বারে,
বাজাইল বজ্রভেরী। হে কবি, দিবেনা সাড়া তা'রে
তোমার নবীন ছন্দে ? আজিকার কাজরী গাথায়
ঝুলনের দোলা লাগে ডালে ডালে পাতায় পাতায় ;
বর্ষে বর্ষে এ দোলায় দিত তাল তোমার যে বাণী
বিদ্যুৎ-নাচন গানে, সে আজি ললাটে কর হানি'
বিধবার বেশে কেন নিঃশব্দে লুটায় ধূলিপরে ?
আশ্বিনে উৎসব-সাজে শরৎ সুন্দর শুভ্র করে
শেফালির সাজি নিয়ে দেখা দিবে তোমার অঙ্গনে ;
প্রতি বর্ষে দিত সে যে শুক্ল রাতে জ্যোৎস্নার চন্দনে
ভালে তব বরণের টিকা ; কবি, আজ হ'তে সে কি
বারে বারে আসি তব শূন্যকক্ষে, তোমারে না দেখি'
উদ্দেশে ঝরায়ে যাবে শিশির-সিঞ্চিত পুষ্পগুলি
নীরব-সঙ্গীত তব দ্বারে ?

জানি তুমি প্রাণ খুলি'

এ সুন্দরী ধরণীরে ভালবেসেছিলে। তাই তারে
সাজায়েছ দিনে দিনে নিত্য নব সঙ্গীতের হারে।
অন্যায় অসত্য যত, যত কিছু অত্যাচার পাপ
কুটিল কুৎসিত ক্রূর, তার পরে তব অভিশাপ
বর্ষিয়াছ ক্ষিপ্র বেগে অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম,
তুমি সত্যবীর, তুমি সুকঠোর, নির্ম্মল, নির্ম্মম,
করুণ কোমল। তুমি বঙ্গ-ভারতীর তন্ত্রীপরে
একটি অপূর্ব্ব তন্ত্র এসেছিলে পরাবার তরে।
সে তন্ত্র হয়েছে বাঁধা ; আজ হতে বাণীর উৎসবে
তোমার আপন সুর কখনো ধ্বনিবে মন্দ্ররবে,
কখনো মঞ্জুল গুঞ্জরণে। বঙ্গের অঙ্গন তলে
বর্ষা বসন্তের নৃত্যে বর্ষে বর্ষে উল্লাস উথলে ;
সেথা তুমি এঁকে গেলে বর্ণে বর্ণে বিচিত্র রেখায়
আলিম্পন ; কোকিলের কুহুরবে, শিখীর কেকায়
দিয়ে গেলে তোমার সঙ্গীত ; কাননের পল্লবে কুসুমে
রেখে গেলে আনন্দের হিল্লোল তোমার। বঙ্গভূমে
যে তরুণ যাত্রিদল রুদ্ধদ্বার-রাত্রি অবসানে
নিঃশঙ্কে বাহির হবে নবজীবনের অভিযানে
নব নব সঙ্কটের পথে পথে, তাহাদের লাগি'
অন্ধকার নিশীথিনী তুমি, কবি, কাটাইলে জাগি'
জয়মাল্য বিরচিয়া, রেখে গেলে গানের পাথেয়
বহ্নিতেজে পূর্ণ করি' ; অনাগত যুগের সাথেও
ছন্দে ছন্দে নানা সূত্রে বেঁধে গেলে বন্ধুত্বের ডোর,
গ্রন্থি দিলে চিন্ময় বন্ধনে, হে তরুণ বন্ধু মোর,
সত্যের পূজারী!

আজো যারা জন্মে নাই তব দেশে,
দেখে নাই যাহারা তোমারে, তুমি তাদের উদ্দেশে
দেখার অতীত রূপে আপনারে করে' গেলে দান
দূরকালে। কিন্তু যারা পেয়েছিল প্রত্যক্ষ তোমায়
অনুক্ষণ, তারা যা হারাল তার সন্ধান কোথায়,

কোথায় সান্ত্বনা ? বন্ধু-মিলনের দিনে বারম্বার
উৎসব-রসের পাত্র পূর্ণ তুমি করেছ আমার
প্রাণে তব, গানে তব, প্রেমে তব, সৌজন্যে, শ্রদ্ধায়,
আনন্দের দানে ও গ্রহণে। সখা, আজ হ'তে, হায়,
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমকি উঠিবে মোর হিয়া
তুমি আস নাই বলে', অকস্মাৎ রহিয়া রহিয়া
করুণ স্মৃতির ছায়া ম্লান করি' দিবে সভাতলে
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছন্ন গভীর অশ্রুজলে।

আজিকে একেলা বসি' শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের
আলোকে সম্মুখে তব, উদয়-শৈলের তলে আজি
নবসূর্য্যবন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দ গানে ? সে গানের সুর
লাগিছে আমার কানে অশ্রু সাথে মিলিত মধুর
প্রভাত-আলোকে আজি ; আছে তাহে সমাপ্তির ব্যথা,
আছে তাহে নবতন আরম্ভের মঙ্গল-বারতা ;
আছে তাহে ভৈরবীতে বিদায়ের বিষণ্ণ মূর্চ্ছনা,
আছে ভৈরবের সুরে মিলনের আসন্ন অর্চ্চনা।

যে খেয়ার কর্ণধার তোমারে নিয়েছে সিন্ধু পারে
আষাঢ়ের সজল ছায়ায়, তার সাথে বারে বারে
হয়েছে আমার চেনা ; কতবার তারি সারি-গানে
নিশান্তের নিদ্রা ভেঙে ব্যথায় বেজেছে মোর প্রাণে
অজানা পথের ডাক, সূর্য্যাস্তপারের স্বর্ণরেখা
ইঙ্গিত করেছে মোরে। পুন আজ তার সাথে দেখা
মেঘে ভরা বৃষ্টি ঝরা দিনে! সেই মোরে দিল আনি,
ঝরে'-পড়া কদম্বের কেশর-সুগন্ধি লিপিখানি
তব শেষ বিদায়ের। নিয়ে যাব ইহার উত্তর
নিজ হাতে কবে আমি, ওই খেয়াপরে' করি' ভর,
না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে ;

দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখী-জাগা বসন্ত প্রভাতে,
নবমল্লিকার কোন্ আমন্ত্রণ দিনে; শ্রাবণের
ঝিল্লিমন্দ্র সঘন সন্ধ্যায়; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি-গুণ্ঠনতলে।

ধরণীতে প্রাণের খেলায়
সংসারের যাত্রাপথে এসেছি তোমার বহু আগে,
সুখে দুঃখে চলেছি আপন মনে; তুমি অনুরাগে
এসেছিলে আমার পশ্চাতে, বাঁশিখানি লয়ে হাতে,
মুক্ত মনে দীপ্ত তেজে, ভারতীর বরমাল্য মাথে।
আজ তুমি গেলে আগে, ধরিত্রীর রাত্রি আর দিন
তোমা হতে গেল খসি', সর্ব্ব আবরণ করি' লীন
চিরন্তন হ'লে তুমি, মর্ত্ত্য কবি মুহূর্ত্তের মাঝে
গেলে সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্য্যে তারায় তারায়।
সেথা তুমি অগ্রজ আমার; যদি কভু দেখা হয়,
পাব তবে সেথা তব কোন্ অপরূপ পরিচয়
কোন্ ছন্দে কোন্ রূপে? যেমনি অপূর্ব্ব হোক নাকো,
তবু আশা করি যেন মনের একটি কোণে রাখো
ধরণীর ধূলির স্মরণ, লাজে ভয়ে দুখে সুখে
বিজড়িত,—আশা করি, মর্ত্ত্যজন্মে ছিল তব মুখে
যে বিনম্র স্নিগ্ধ হাস্য, যে স্বচ্ছ সতেজ সরলতা,
সহজ সত্যের প্রভা, বিরল সংযত শান্ত কথা,
তাই দিয়ে আরবার পাই যেন তব অভ্যর্থনা
অমর্ত্ত্যলোকের দ্বারে,—ব্যর্থ নাহি হোক এ কামনা।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাচীনত্ব

[শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়]

আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর এই ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে অনেক আচার্যসন্তান ও সুধীভক্ত উপস্থিত আছেন। ইঁহাদের নিকট আমার ন্যায় শুষ্ক ঐতিহাসিককে বক্তৃতা করিবার জন্য সহসা আহ্বান করিয়া মহারাজ বাহাদুর যেন প্রস্ফুটিত কমলবনে একটি মত্ত মাতঙ্গ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

এখানে আমি নিজের সংসার সিদ্ধির জন্য আপনাদের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিব।

অধুনা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সন্দেহপাত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে বৈষ্ণবধর্ম্ম অত্যন্ত আধুনিক এবং অনার্য্য সভ্যতা সম্ভূত। বৈষ্ণবগণের পক্ষে ইহা বড় গুরুতর কথা, সুতরাং এ প্রশ্নের সম্যক আলোচনা প্রয়োজন।

বৈদিক শাস্ত্রকে ভিত্তি করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্য্য সভ্যতা ও আর্য্যধর্ম্ম মত গঠিত হইয়াছিল। ঐ বৈদিক শাস্ত্রে যদি বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা পাওয়া যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম নিশ্চয়ই অতি সুপ্রাচীন এবং আর্য্য হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ বিশেষ।

কে হিন্দু ইহা নির্দ্ধারণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। এই বিষয়ে যথেষ্ট তর্ক বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থিরীকৃত হইয়াছে যে হিন্দু বেদ, ব্রাহ্মণ ও গো এই তিনের প্রতি সম্মানদানদ্বারা পরিচিত। কিন্তু এমতও সকলে গ্রহণ করেন না। অন্যদল বলেন যে নেতি নেতি করিয়া (by the process of elimination) হিন্দুর সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে হইবে। যাহা হউক বৈদিক সাহিত্য যখন ভারতের প্রাচীন সম্পত্তি এবং তাহা যে আর্য্য সভ্যতা হইতে উৎপন্ন তদ্বিষয়ে যখন কোন সন্দেহ নাই, তখন এই বৈদিক সাহিত্যে আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনত্বের নিদর্শন অনুসন্ধান করিব।

ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে তদ্ধৈতদ্ঘোর আঙ্গিরস কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস এব স বভূব। (৩।১৭।৬ ছান্দোগ্য) এইখানে আমরা বৈষ্ণবধর্ম্মের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের নামের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাইতেছি। কিন্তু ইহার যথার্থ অর্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট মত ভেদ আছে। 'কৃষ্ণ' বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কৃষ্ণ নহেন অপর এক কৃষ্ণ এবং তাহার সহিত দেবকী পুত্র শব্দের যোগ থাকায় স্পষ্টতঃই অপর কাহাকেও লক্ষ্য করা হইতেছে এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আমরা কিন্তু যখন একই স্থলে কৃষ্ণ ও তাঁহার পরিচয়রূপে দেবকী পুত্র শব্দ পাইতেছি তখন নিঃসন্দেহে ইঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করিব।

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই অংশেই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। আঙ্গিরস শ্রীকৃষ্ণকে শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শিষ্যকে যাহা উপদেশ দিতেছেন তাহা যে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গভীর তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর এই তত্ত্বোপদেশ শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের একেবারে সন্দেহ নিরসন হইল। সুতরাং এ তত্ত্ব পরম রহস্যময় ও গভীর। তত্ত্বটী কি? জীবনযজ্ঞ দর্শন। অর্থাৎ জীবনকে যজ্ঞের আহুতিরূপে দর্শন করা হইতেছে। সমস্ত জীবনকে যজ্ঞরূপে আহুতি প্রদান করিতে হইবে। ইহার দক্ষিণা কি? "অথ যত্তপোদানমার্জ্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।"

এই স্থলে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল সূত্রই কথিত হইয়াছে। তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল। পরদেবতাকে অনুভব

করিবার জন্ম তপশ্চর্য্যার বিধান বৈষ্ণবধর্ম্মেও আছে। অন্য সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া লইয়া শ্রীভগবানে মনোনিবেশ করার নামই তপস্যা। জীবন যজ্ঞের দ্বিতীয় কথা হইতেছে দান। নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া যে প্রেমধর্ম্ম যাজন করিতে হইবে ইহাও শ্রীচৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সার কথা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও আছে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ
যত্তপাস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণং ॥

তৃতীয় কথা হইতেছে আর্জ্জব-সরলতা।

বৈষ্ণব ভক্তের সরলতার কথাও সর্ব্ব-জনবিদিত।

অহিংসা—সর্ব্বজীবের প্রতি একটি করুণ প্রেমভাব রাখিতে হইবে। সর্ব্বজীব বলিতে পশু, বৃক্ষ লতাও বুঝিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বৈষ্ণবের অহিংসাধর্ম্ম পালন রীতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে বৈষ্ণব না খাইতে পাইয়া শুকাইয়া মরিলেও বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিবেন না—বৃক্ষচ্যুত পদার্থই তাঁহার ভোজ্য। 'সত্যবান' হওয়াও প্রত্যেক ধর্ম্মের সাধনারই প্রথম তিনিই জীবনযজ্ঞের উপযুক্ত হইবেন। যিনি উল্লিখিত সমস্ত গুণগুলিদ্বারা বিভূষিত তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব।

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই অংশে যে শুধু 'কৃষ্ণ' নামেই মিল আছে তাহা নহে, বৈষ্ণবধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বগুলির সহিতও ইহার ঐক্য দেখা যায়।

যজ্ঞতত্ত্ব সম্বন্ধে দীক্ষার বর্ণনা আছে। "স যদ শিশিষতি যৎ পিপসতি যন্ন রমতে।" সাধককে আহার বিহারে সংযত হইতে হইবে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম নিবৃত্তি মূলক। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই নিবৃত্তির উপদেশ আছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

যোঽশনায় পিপাসে শোকং মোহং
জরাং মৃত্যামত্যেতিবতং বৈত আত্মানং
বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ
বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ
ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচৈটং চরন্তি ॥

বৃহঃ ৩।৫।১

ব্রাহ্মণগণ যে মূলতত্ত্বের অনুসন্ধান পাইয়া পুত্র, বিত্ত, ইহ ও পরলোকের সুখ ত্যাগ করেন। তাঁহারা ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মচর্য্যা করিবেন। উপদেষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য স্বয়ং আচরণ করিয়া এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি উভয়পত্নী ও সমস্ত বিত্ত পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিতেছিলেন এমন সময় মৈত্রেয়ী সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে চাহিলেন। মৈত্রেয়ী ও যাজ্ঞবল্ক্য দুইজনে বন গমন করিয়া নিবৃত্তিমূলক সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবও প্রথম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুসারে ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবধর্ম্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্তর্গত। মহাপ্রভুর জন্মলীলা বিবাহাদি আলোচনা করিলে জানা যায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বৈষ্ণবগণদ্বারা অবহেলিত হয় নাই।

অধুনা সমাজে বর্ণ সঙ্কট ও আশ্রম-সঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় মহাবিপ্লব ঘটিয়াছে। বর্ণ শাঙ্কর্য্য অপেক্ষাও আশ্রম শাঙ্কর্য্য অধিকতর ভীতিপ্রদ। আমাদের দেশে চারিটী আশ্রম ছিল। পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনের বিধি ছিল। তৎপর

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"

চিরকাল গার্হস্থ্য কর্ম্মে ডুবিয়া থাকিলে চলিবে না। জীবনের অর্দ্ধেক অংশ পরিব্রাজক ও যতি ধর্ম্ম আচরণ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত হইতে হইবে। আজকাল আর এ-নীতি কেহ পালন করেন না। দেশে এমন অনেক লোক এখন কর্ম্মী হইয়াছেন যাঁহাদের বহু পূর্ব্বেই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ছিল। তাঁহারা পরিত্যাগ করেন না বলিয়াই দেখিতে পাই অনেক অপরিপক্ক যুবক যাহাদের উচিত ছিল পরিপূর্ণ বিদ্যাশিক্ষার পর গার্হস্থ্যাশ্রমের জন্য উপযুক্ত হওয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশ সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছে। আজ বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতির জন্য প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ ও প্রকাশ, লুপ্তপ্রায় তীর্থ উদ্ধার

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই তপস্যার কথা লিখিত আছে—
ভুক্তি মুক্তি আদিবাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

প্রভৃতি নানা কথাই শুনিলাম, কিন্তু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতি-পালিত না হইলে কোন সংস্কারই কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীশ্রীচৈতন্তদেব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্মে সমস্ত আর্য্যলক্ষণই আছে।

অধুনা কেহ কেহ বলিতেছেন যে খৃষ্টীয় পঞ্চম বা সপ্তম শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এ কথা যে ভিত্তিহীন তাহা ভুপাল রাজ্যের অন্তর্গত ভিলসার নিকটবর্ত্তী কোচনগর নামক স্থানে আবিষ্কৃত এক স্তম্ভের উৎকীর্ণ প্রশস্তি হইতে জানিতে পারা যায়। ঐ লিপিতে লিখিত আছে যে ডিয়নের পুত্র গ্রীক জাতীয় হেলিওডোরাস্ তক্ষশিলার অধিপতি অ্যাণ্টিআলকায়িডস্ দ্বারা দূতরূপে কোচনগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ভাগবতের নামে একটি স্তম্ভ উৎসর্গ করেন।

এই স্তম্ভলিপির বয়স খৃঃ পূঃ ১৩০-৪০। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বেও ভারত-বর্ষে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পারে যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম তথা হিন্দুধর্ম্ম তখন অত্যন্ত উদার ছিল। গ্রীক ও যবনকেও নিজের গণ্ডির মধ্যে টানিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে নাই। অধুনাও বৈষ্ণবধর্ম্মের ঐরূপ উদারতা প্রকাশ পাইয়াছিল কি না এবং আছে কি না তাহা বিচারের ভার আমি আপনাদের উপর দিতেছি।

তৎপরে বৈদেশিক নৃপতি কণিষ্কের বংশধর হুবিষ্কের পুত্র বাসুদেব নাম গ্রহণ করিয়াছেন দেখিতে পাই। তিনি যে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া হিন্দু হইয়াছিলেন তাহা এই নামগ্রহণ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার প্রচেষ্টাতেই বোধ হয় বৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল বিস্তৃতি হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে গুপ্তসাম্রাজ্যের অনেক অধিপতি ও বৈষ্ণবধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন।

তাহার মধ্যযুগের ক্রমবিকাশ ইতিহাসের সাধারণ সম্পত্তি, সে লইয়া এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।*

পঞ্চামৃত

১

শিল্প ও ভাষা

(শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

"বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে
ভগবতী ভারতী দেবী নমস্তে।"

বাঙ্গালা ভাষা যে বোঝে সেই এ শোলোকটা শুনলেই বলবে—'বুঝলেম' কিন্তু ভারতী কাগজের মলাটের নিচে থেকে টেনে বার করে আজকালের একখানা ছবি সবার সামনে যদি ধরে দিই, সাড়ে পনেরো আনার চেয়ে বেশী লোক বলবে বুঝলেম না মশায়! এই শেষের ঘটনা ঘটতে পারে হয় যে ছবিটা লিখেছে সেই আর্টিষ্টের ছবির ভাষায় বিশেষ জ্ঞান না থাকায় অথবা যে ছবি দেখছে, চিত্রের ভাষার দৃষ্টিটা তার যদি মোটেই না থাকে। ভারতীর বন্দনাটা যে ভাষায় লেখা সেই ভাষাটা আমাদের সুপরিচিত আর ভারতীর ছবিখানা যে ভাষায় রচা সে

---

* গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর ত্রয়োদশ বাৎসরিক অধিবেশনে শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কথিত ও শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার বি, এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

ভাষাটা একেবারেই আমাদের অপরিচিত সেই জন্যে চিত্র পরিচয় পড়েও ওটা বুঝলেম না এমনটা হ'তে বাধা কোনখানে ? চীনেম্যানের কানের কাছে খুব চেঁচিয়ে সরস্বতীর স্তোত্রপাঠ করলেও সে বুঝবে না কিন্তু ছবির ভাষার বেলায় সে অনেকখানি বুঝবে, কেননা ছবির ভাষা অনেকটা সার্বজনীন ভাষা—'অব্‌র্' কথাটা ফরাসীকে বল্লে সে গাছ বুঝবে, আবার 'অব্‌র্' শব্দ হিন্দুস্থানীর কাছে মেঘরূপে দেখা দেবে, ইংরেজ সে এই শব্দটার কোনরূপ কোন অর্থ আবিষ্কার করতে পারবে না কিন্তু তাঁদের ভাষায় আবর্' হয় গাছ নয় অভ্র স্বরূপ হয়ে দেখা দেয়, কথিত ভাষার মত কৃত্রিম উপায়ে জোর করে চালিয়ে দেওয়া রূপ নিয়ে নয়, সুতরাং ছবির ভাষার মধ্যে বরাবরই হয় অপরিচয়ের প্রাচীর এত কম উঁচু যে সবাই এমন কি ছেলেতেও সেটা উল্লঙ্ঘন করে উঁকি দিতে পারে কিন্তু ঐ একটু চেষ্টা যার নেই তার কাছে ঐ এক হাত প্রাচীর দেখায় একশো হাত দুর্গপ্রাকার, ছবি ঢেকে সবটা ! কবির ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন করে ইঙ্গিত করতে করতে, আবার এই কথিত ভাষা যেটা আসলে কানের দিয়ে এখন সেটা ছাপার অক্ষরের মূর্ত্তিতে চোখ দিয়েই ঢুকছে সোজা মনের মধ্যে। 'নবঘনশ্যাম' এই কথাটা—ছাপা দেখলেই রূপ ও রং দুটোর উদ্রেক করে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে ! নাটক যখন পড়া হয় কিম্বা গ্রামোফোনের মধ্যে দিয়ে শুনি তখন কান শোনে আর মন সঙ্গে সঙ্গে নট নটীদের অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি মায় দৃশ্য পটগুলো পর্য্যন্ত চোখের কোন সাহায্য না নিয়েই কল্পনায় দেখে চলে, ছবির বেলাতে এর বিপরীত কাণ্ড ঘটে,—চোখ দেখলে রূপের ছাপগুলো মন শুনে চলো কানের শোনার অপেক্ষা না রেখে ছবি যা বলছে তা, বায়স্কোপের ধরা ছবি, চোখে দেখি শুধু তার চলা ফেরা, ছবি কিন্তু যা বলে সেটা মন শুনে নেয়।

* কবির মাতৃভাষা যদি বাংলা হয় তবে বাংলা খুব ভাল করে না শিখলে ইংরেজ সেটা বোঝে না, তেমনি ছবির ভাষা অভিনয়ের ভাষা এসবেও দ্রষ্টার চোখ দোরস্ত না হলে মুস্কিল। মুখের কথা একটা না একটা রূপ ধরে আসে। কাগ্ বগ্ বল্লেই কালো সাদা দুটো পাখি সঙ্গে সঙ্গে হাজির ! শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার রংএর সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে—রূপ-কথা, অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপের চলা বলা নিয়ে চল্‌তি ভাষা। কবিতার ছবির অভিনয়ের ভাষার মতো সুর আর রূপ দিয়ে বাক্য সমূহকে যথোপযুক্ত স্থান কাল পাত্রভেদে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর মতো সাজিয়ে গুজিয়ে শিখিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিলে তবেই যাত্রা সুর করে দিলে বাক্য-গুলো, চল্লো ছন্দ ধরে যথা—

> করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী
> চললিহুঁ সঙ্কেত- গেহা
> অমল তড়িত দণ্ড হেম মঞ্জরী
> জিনি অপরূপ সুন্দর দেহা '

কিন্তু বাক্যগুলোকে ভাষার সূত্রে নটনটী সূত্রধার ইহাদের মতো বাঁধা হলনা, তখন কেবলি বাক্য সকল শব্দ করলে— ও, এ, কে, কৈ, ঐ, কিম্বা খানিক নেচে চল্লো পুতুলের মতো কিন্তু কোন দৃশ্য দেখালে না বা কিছু কথাও বল্লে না, কোলাহল চলাচল হ'ল খানিক, বলাবলি হলনা যেমন—

> ' হল হিয় হিহির বিভিন্ন মাত
> হয় শান্ত কি ক্লান্ত কৃতান্ত গতি
> করি গর্জ্জি গুঞ্জিত ভৃঙ্গ সবে
> ত্যজ মৃত্যু কি চিত্ত কি নিত্য রবে ?'

শোলোকটা কি যেন বলতে চাইলে কিন্তু খাপছাড়া ভাবে, এ যেন কেউ তুরকী আরবী পড়ে ফরাশি মিশালে' ! কিন্তু কথাকে কবি কথা বলালেন ভাষা দিয়ে, চালিয়ে দিলেন ছন্দ দিয়ে কথাগুলো তবে সজাগ সজীব অভিনেতার মতো নেচে গেয়ে বাঁশি বাজিয়ে চল্লো পরিষ্কার—

> ' চলিগো চলিগো যাইগো চলে' ।
> পথের প্রদীপ জ্বলে গো
> গগন তলে।

বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।'

ছবির বেলাতেও এমনি, সুরসার কথাবার্ত্তা এসবের সূত্রে রূপকে না বেঁধে, আঁকা রূপগুলো অমনি যদি ছেড়ে দেওয়া যায় পটের উপরে, তবে তারা একটা একটা বিশেষ্যের মতো নিজের নিজের রূপের তালিকা দ্রষ্টার চোখের সামনে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, বলেনা চলে না—পিদুম,, ফুল, ফুলদানি, বাবু, রাজা, পণ্ডিত, সাহেব কিম্বা অমুক অমুক অমুক এর বেশি নয়। কিন্তু প্রদীপ আঁকলেম, তার কাছে ফেলে দিলেম পোড়া সল্‌তে, ঢেলে দিলেম তেলটা পটের উপর—ছবি কথা কয়ে উঠলো, "নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈল দানম্!"

ছবিকে ইঙ্গিতের ভাষা দিয়ে বলানো গেল চলানো গেল। নাট্যকলা প্রধানতঃ ইঙ্গিতেরই ভাষা বটে কিন্তু তার সঙ্গেও কথিত ভাষার সঙ্কেত অনেকখানি না জুড়লে নাটকাভিনয় করা চলে না—এই লেকচার লিখছি সামনে এতটুকু 'টোটো' ছেলেটা বোবা নটের মতো নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করে চল্লো, ভেবেই পাইনে তার অর্থ! হঠাৎ অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে শিশুনট বাক্য আর সুর জুড়ে দিলে অং অং ভুস্ ভুস্, বোঁ বন্ বল্ সোঁ শন্ শন্, হিং টিং ছট্ ফট্, আয় চট্ পট্, লাগ লাগ ভোজবাজি, চোর বেটাদের কারসাজি, ঠিক দুপুরে রোদ্দুরে, তালপুকুরে উত্তুরে, কার আজ্ঞে? না কথিত ভাষার আজ্ঞে পেয়ে বোবা ইঙ্গিৎ যাদু-মন্ত্র কথা কয়ে ফেল্লে যেন ঘুড়ি উড়িয়ে চল্লো ঘুরে ফিরে!

ছবির ভাষা, কথার ভাষা, অভিনয়ের ভাষা ও সঙ্গীতের ভাষা এই রকম নানা ভাষা এ পর্য্যন্ত মানুষ কাযে খাটিয়ে আসছে। এর মধ্যে সঙ্গীত শুধু যা বলতে চায়, কিম্বা যখন কাঁদাতে চায় বা হাসাতে চায়, কাকুতি বা মিনতি জানাতে চায় তখন ছবির ভাষা ও কথার ভাষাকে অবলম্বন না করেও নিজের স্বতন্ত্র ভাষার মীড় মূর্চ্ছনা ইত্যাদি দিয়ে সুব্যক্ত হয়ে উঠতে পারে। রংএর ভাষারও এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা আছে—আকাশের রূপ নেই কিন্তু রংএর আভাস দিয়ে সে কথা বলে। কিন্তু আর সব ভাষা, কথিত চিত্রিত অভিনীত সমস্তই এ ওর আশ্রয় অপেক্ষা করে। সুর আর রূপ, বলা ও দেখা এরা সব কেমন মিলে জুলে কাজ করে দু একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। মধুর বাক্যগুলো কানের জিনিষ হলেও মাধবীলতার মতো চোখের দেখা সহকারকে আশ্রয় না করে পারে না। দৃশ্য বা ছবিকে আশ্রয় না করে কিছু বলা কওয়া একেবারেই চলেনা তা নয় যেমন—

'কাহারে কহিব দুঃখ কে জানে অন্তর
যাহারে মরমী কহি সে বাসয়ে পর
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে
এতদিনে বুঝিনু সে ভাবিয়া অন্তরে'

এখানে মনোভাব বাচন হল, কোনরূপ কোন ভঙ্গি ছবি বা অভিনয়ের সাহায্য না নিয়েও! বাচনের বেলায় বাক্য স্বাধীন কিন্তু বর্ণনের বেলায় একেবারে পরাধীন যেমন—

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন
আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন'

নবযৌবন আর বৃন্দাবনের বসন্ত শোভার ছবি বাক্যগুলোর মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের মতো চমকাচ্ছে!

'আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল
আর কাল হৈল মোর যমুনার জল'

বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো কালো যমুনা তার ধারে কদমতলা তার ছায়ায় সহচরী সহিত রাধিকা—

'আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ
আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন'

রাধিকার রত্ন অলঙ্কারের ঝিকিমিকি থেকে দূরের কালো পাহাড়ের ছবি দিয়ে Landscapeটা সম্পূর্ণ হল, ছবি মিলে গেল কথার সঙ্গে, কান চোখ দুয়ের রাস্তা একত্র হয়ে সোজা চল্লো মনোরাজ্যে!

এর পর আর ছবি নেই বর্ণনা নেই শুধু কথা দিয়ে বাচন—

এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী
এমন ব্যথিত নাহি শুনে এ কাহিনী'!

এবারে কথিত ভাষায় ছবির সাক্ষাদর্শন—

'জলদ বরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়—
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিষে নিমিখ নাহি রয়
সই দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে!'

একেবারে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ছবি দেখা কথার ভাষা দিয়ে!

এইবার অঙ্গভঙ্গি আর চলার সঙ্গে বলা কথার যোগাযোগ পরিষ্কার দেখাবো—

'চলিতে না পারে রসের ভরে
আলস নয়নে অলস ঝরে
ঘন ঘন সে যে বাহিরে যায়
আন ছলে কত কথা বুঝায়'!

চোখের সামনে চলাফেরা সুরু করে দিলে কথার ভাষা অভিনয় করে নানা ভঙ্গিতে!

চিত্রিত ভাষা কথিত ভাষা অভিনীত ভাষা এসব যদি এ ওর কাছে লেনা দেনা করে চল্লো তবে কথিত ভাষার ব্যাকরণ অলঙ্কারের সূত্র আইন কানুন ইত্যাদির সঙ্গে আর দুটো ভাষার ব্যাকরণাদির মিল থাকিতে বাধ্য! কথার ব্যাকরণে যাকে বলে 'ধাতু', ছবির ব্যাকরণে তার নাম 'কাঠামো' [Form], ধারণ করিয়া রাখে বলেই তাকে বলি ধাতু! ধাতু ও প্রত্যয় একত্র না হলে কথিত ভাষায় শব্দরূপ পাই না, ছবির ভাষাতেও ঠিক ঐ নিয়ম—মাথা হাত পা ইত্যাদি রেখা দিয়ে একটা কাঠামো বা ফর্ম্মা বাঁধা গেল কিন্তু সেটা বানর না নর এ প্রত্যয় বা বিশ্বাস কিসে হবে যদি না ছবিতে নর বানরের বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় দিই! শুধু এই নয় বিভক্তি যিনি ভাগ করেন, ভঙ্গি দেন তাঁর চিহ্ন লেজ ইত্যাদি নানা ভঙ্গিতে কাঠামোয় জুড়ে দেওয়া চাই, বানরের সঙ্গে গাছের কি বনের, নরের সঙ্গে ঘরের কি আর কিছুর সন্ধি সমাস সন্ধান করা চাই। বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে নানা বস্তুর সঙ্গে নানা বস্তুর সন্ধি সমাস করার সূত্র আছে ছবির ব্যাকরণে, বচন ক্রিয়া বিশেষ্য বিশেষণ, সর্ব্বনাম অব্যয় এমন কি মুগ্ধবোধের সবখানি অলঙ্কার শাস্ত্রের সবখানির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া চলে ছবির ব্যাকরণ আর অলঙ্কারের ধারাগুলো! কথিত ভাষার বেলায় 'ভু' ধাতু গক্ প্রত্যয় করে হয় যেমন 'ভৃঙ্গ' ছবির ভাষায় কালো ফোঁটার উপরে দুটো রেফ্ যোগ করিলেই হয় 'দ্বিরেফ্ ভৃঙ্গ', আবার ভৃঙ্গের কালো ফোঁটায় রেফ্ না দিয়ে গুও প্রত্যয় দিলে হয় 'ভৃঙ্গার যেমন 'ভু' ধাতুতে 'গিক্ প্রত্যয় জুড়লে হয় 'ভৃঙ্গি'!

ছবি লিখার উৎসাহ নেই কিন্তু ছবির ব্যাকরণ লেখার আস্থা আছে এমন ছাত্র যদি পাই তো চিত্রকরে আর বৈয়াকরণে মিলে এই ভাবে আমরা ছবি দেওয়া একটা ব্যাকরণ রচনা করিতে পারি, কিন্তু একা এ কাজে নামতে আমার সাহস নেই কেননা ব্যাকরণ বলে জিনিষটা আমার সঙ্গে কি কথিত ভাষা কি চিত্রিত ভাষা দুয়ের দিক দিয়েই চিরকাল ঝগড়া করে বসে আছে। সংকীর্ত্তিত ভাষা যেমন তেমনি সংচিত্রিত ভাষাও একটা ভাষা, ব্যাকরণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে এইটে যদি সাব্যস্ত হল তবে এও ঠিক হ'ল যে ছবি দেখা শুধু চোখ দিয়ে চলে না ভাষা জ্ঞানও থাকা চাই দ্রষ্টার, ছবি স্রষ্টার পক্ষেও ঐ একই কথা। 'রসগোল্লা খেতে মিষ্টি টাপুর টুপুর পড়ে বিষ্টি' এটা বুঝতে পারে না পাঠশালায় না গিয়েও এমন ছেলে কমই আছে কিন্তু শিশুবোধের পাঠ থেকে ভাষা জ্ঞান বেশ একটু না এগোলে—

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়-কমল-বন মাঝে!

এটা বোঝা সম্ভব হয় না চট্ করে বালকের। শুধু অক্ষর কিম্বা কথা অথবা পদ কিম্বা ছত্রের পর ছত্র লিখিতে পারলে, অথবা চিনে চিনে পড়তে পারলেই সুন্দর ভাষায় গল্প কবিতা ইত্যাদির লেখক বা পাঠক হয়ে ওঠা যায় একথা কেউ বলে না, ছবি অভিনয় নর্ত্তন গান ইত্যাদির বেলায় তবে সে কথা খাটবে কেন! যেমন চিঠি লিখিতে পারে অনেকে তেমনি ছবিও লিখিতে পারে একটু শিখলে প্রায় সবাই, কিন্তু লেখার মতো লেখার ভাষা, আঁকার মতো আঁকার ভাষার উপর দখল ক জনে পায়? কাযেই বলি

যে ভাষাই হোক তাতে স্রষ্টাও যেমন অল্প দ্রষ্টাও কচিৎ মেলে ভাষা জ্ঞানের অভাববশতঃ। ফুলকে দেখারূপে আঁকা এক, ফুলের ভাষা শুনে নিজের ভাষায় ফুলকে বর্ণনা করায় তফাৎ আছে কে না বলবে!

বাংলা দেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা, কিন্তু সেই অপ্রচলিত ভাষা চলিত বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে একটা অদ্ভুত ভাষা হয়ে প্রচলিত যেমনি হল অমনি, বাংলার পণ্ডিত সমাজ খুব চলন হল সেই ভাষার, সবাই লিখলে কইলে বুঝলে বুঝালে সেই মিশ্র ভাষায়, চলিত বাংলায় খাঁটি বাংলায় লেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়লো, ফল হ'ল—এক কালের চলিত ভাষা সহজ কথা সমস্তই দুর্বোধ্য হয়ে পড়লো, এমন কি কথার অক্ষর মূর্ত্তিটা চোখে স্পষ্ট দেখলেও কথাটার ভাব-অর্থ ইত্যাদি বোঝা শক্ত হয়ে পড়লো! বাংলা অথচ অপ্রচলিত কথাগুলোর বেলায় যদি এটা খাটে তবে ছবির ভাষার বেলায় খাটবে না কেন? ছবির মূর্ত্তির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষা বোঝাও দুঃসাধ্য হয়ে যে পড়ে তার প্রমাণ দেশের ইতিহাসে ধরা থাকে, আর সেইগুলোর নাম হয় অন্ধযুগ, এই অন্ধতার মধ্য দিয়ে আমাদের মতো পৃথিবীর অনেকেই চলেছে সময় সময়! চোখে দেখা মাত্রই যার সবখানি বোঝা না গেল সে ছবি ছবিই নয় একথা না হয় শিল্পীর উপরে জবরদস্তিতে চালানো গেল কিন্তু আমাদের নিজ বাংলার মুখের কথা আমরা অনেক সময়ে নিজেই বুঝিনে বোঝাতেও পারিনে ভাষাতে পণ্ডিতেরা না বুঝিয়ে দিলে, তবে কি বলবো বাংলা ভাষা বলে বস্তুটা বস্তুই নয়?—'ছীয়াল', 'ছিমনী', 'ছোলঙ্গ' এ তিনটেই বাংলা কথা কিন্তু বুঝলে কিছু? ফরিদপুরের ছেলে 'ছোলঙ্গ' বলতেই বোঝে, বহরমপুরের লোক বোঝে না, বাংলা শব্দকোষ না আয়ত্ত হ'লে, ওয়েবষ্টার জ্ঞান নিয়েও বুঝতে পারে না 'ছোলঙ্গ' হচ্ছে বাতাবি লেবু নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা কমলা বীজপুর! 'ছীয়াল' 'ছিমনী' এ দুটোও বাংলা কিন্তু বাংলার সাধুভাষা বলে কৃত্রিম ভাষা নিয়ে যাঁরা ঘর কন্না করেছেন তাঁরা এর একটাকে শৃগালের অপভ্রংশ আর একটা ইংরাজী চিম্নি কথার বাংলা বলেই ধরবেন কিন্তু এ দুটোই তা নয়—ছীয়াল মানে শ্রীল বা শ্রীমান ও শ্রীমতী আর ছিম্নি মানে পাথর কাটা 'ছেনী' শৃগালও নয় চিম্নিও নয়! দুশো বছর আগে যে ভাষা চলিত ভাষা ছিল, পট ও পাটার ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাচীন বাংলা পুঁথির ভাষাও অপ্রচলিত হয়ে গেছে সুতরাং যে শোলোকটা এবারে বলবো তা বাংলা হলেও আমাদের কাছে চীনে ভাষারই মতো দুর্বোধ—

'ঘাত বাত হাত ঘর জোহি অয়লাহু
ন ভেতল চোলে আবে সবে থকলাহু'

পরিচিত বাংলায় আন্দাজে আন্দাজে এর যতটা ধরা গেল তার তর্জ্জমা করলেম তবে অনেকটা বোধগম্য হল ভাবার্থ টা—

ঘাট বাট হাট ঘর করিনু সন্ধান
চোরে না পাইয়া মোরা হইনু হয়রান!

দুই তিন শত বছরের আগেকার বাঙ্গালী যে চলিত ভাষায় কথা কইতো তাই দিয়েই উপরের কবিতাটা লেখা আজকের আমরা সে ভাষা দখল করিনি অথবা ভুলে গেছি কবিতা দুর্বোধ হ'ল সেইজন্য, ভাষার দোষেও নয় কবির দোষেও নয়।

কথিত ভাষার হিসেব পণ্ডিতেরা এইরূপ দিয়েছেন—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, মিশ্র অথবা সংস্কৃত, ভাষা আর বিভাষা! আর্টের ভাষাতেও এই ভাগ যথা—শাস্ত্রীয় শিল্প Academic art, লোকশিল্প Folk art, পরশিল্প Foreign art, মিশ্রশিল্প Adapted art. লোকশিল্পের ভাষা হল—পটপাটা গহনাগাটি ঘটিবাটি কাপড়-চোপড় এমনি যে সব art শাস্ত্রের লক্ষণের সঙ্গে না মিল্লেও মন হরণ করে। শাস্ত্র ব্যাকরণ ইত্যাদি 'পণ্ডিতানাম্ মতম্' যে artএর সঙ্গে যোগ দেয়নি কিন্তু 'যত্র লগ্নং হি হৃৎ' হৃদয় যার সঙ্গে যুক্ত আছে, শুক্রাচার্য্যের মতে তাই হল লোক-শিল্পের ভাষার রূপ। আর যা 'পণ্ডিতানাম্ মতম্' যেমন দেবমূর্ত্তি রচনা শিল্প-শাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত অথবা রাজা বা পণ্ডিতগণের অভিমত শিল্প সেই হ'ল শিল্পের সংস্কৃত ভাষা কোথাও লোক-শিল্পের চলিত ভাষাকে মেজে ঘষে সেটা প্রস্তুত কোথাও প্রাচীন লুপ্ত ভাষাকে চলিতের সঙ্গে মিলিয়ে.

নব কলেবর দিয়েও সাধুভাষারূপে সেটা প্রস্তুত করা হয়। পরশিল্প হ'ল যেমন গান্ধারের শিল্প, একালের অয়েলপেন্টিং! মিশ্র শিল্প চীনের বৌদ্ধশিল্প, জাপানের নারা মন্দিরের শিল্প, এসিয়ার ছাঁচে ঢালা এখনকার ইয়োরোপীয় শিল্প, গ্রীসের ছাঁচে ঢালা স্থান বিশেষের বৌদ্ধশিল্প, এবং এখনকার বাংলার নবচিত্রকলা পদ্ধতি! সুতরাং শিল্পের ভাষা রহস্য বড় জটিল হয়ে উঠেছে ক্রমেই. কাকে রাখি কাকে ছাড়ি এও এক সমস্যা! সব ছেড়ে দিয়ে বাংলার নবচিত্রকলাকেই ধ'রে দেখা যাউক—ছবিগুলো সমস্যা হয়ে উঠলে তো বড় বিপদ! ছবির ছবিত্ব চুলোয় গেল, সেগুলা হয়ে উঠলো ব্যাকরন ও ভাষাতত্ত্ব এবং বর ঠকানো কূট প্রশ্ন! নব চিত্রকলায় এ ঘটনা যে ঘটেনি তা অস্বীকার করবার যো নেই যখন সবাই বলছে কিন্তু ছবিটা যে সমস্যার মতো ঠেকে সেটা ছবির বা ছবি লিখিয়ের দোষে অথবা ছবি দেখিয়ের দোষে সেটা ত বিচার করা চাই! "বায়বা যাহি দর্শতে মে সোমা অরং কৃতাঃ, তেষাং পাহি শ্রূধী হবং!" সব অন্ধকার ছবির সমস্যার চেয়ে ঘোরতর সমস্যা আমাদের মতো অজ্ঞানের কাছে কিন্তু বেদের পণ্ডিতের কাছে এটা একেবারেই সমস্যা নয়! ছবি যেমন্ তেমনি রাজাও, রাষ্ট্রনীতি যুদ্ধ-বিগ্রহ, সৈন্য সামন্ত, ধুম ধাম, হাঁক ডাক, দ্বারপাল দুর্গ ইত্যাদির দুর্গমতা নিয়ে একটা মস্ত সমস্যার মতো ঠেকেন প্রজার কাছে কিন্তু উপযুক্ত মানুষ বলে রাজার একটা স্বতন্ত্র সত্ত্বা আছে—যেখানে রাজা হন রাজামহাশয়, দুর্গম সমস্যা নয় তেমনি ছবি মূর্ত্তির সত্ত্বা হল সুন্দর ছবি বা সুন্দর মূর্ত্তি বা শুধু ছবি শুধু মূর্ত্তিতে। রাজাকে উপযুক্ত মানুষের সত্তার দিক দিয়ে দেখার পক্ষেও যেমন দুর্গদ্বার ইত্যাদির বাধা আছে এবং কার কার কাছে নেইও বটে, ছবি মূর্ত্তির সত্তার বোধের বেলাতেও ঠিক একই কথা। ছবিকে মূর্ত্তিকে শুধু ছবি মূর্ত্তির দিক দিয়ে বুঝতে পারলে আর সব দিক সহজ হয়ে যায় কিন্তু এ কাজটাও যে সবাই সহজে দখল করতে পারে,—হঠাৎ ছবিমূর্ত্তি দেখেই তাদের সত্তার দিক দিয়ে তাদের ধরা চট্ করে যে হয় তা নয়, সেই ঘুরে ফিরে আসে পরিচয়ের কথা!

সুরের ভাষা যে না বোঝে সঙ্গীত তার কাছে প্রকাণ্ড প্রহেলিকা দুর্বোধ শব্দ মাত্র! সুতরাং এটা ঠিক যে মানুষ কথা কয়েই বলুক অথবা সুর গেয়ে কি ছবি রচে' কিম্বা হাতপায়ের ইসারা দিয়েই বলুক সেটা বুঝতে হলে যে বোঝাতে যাচ্ছে তার যেমন যে বুঝতে চলেছে তারও তেমনি ভাষা ইত্যাদির জটিলতা ভেদ করা চাই।

কথায় যেমন ছবি ইত্যাদিতেও তেমনি যখন কিছু বাচন করা হল তখন সবাই সেটা সহজে বুঝলে, না হলে বাচন ব্যর্থ হ'ল—'হুঁকো নিয়ে এস' এটা ব্যাকরণ আড়ম্বর অলঙ্কার ইত্যাদি না দিয়া বল্লেম তবে হুকোবরদার বুঝলে পরিষ্কার। দরজার দিকে আঙ্গুল হেলিয়ে বল্লেম 'যাও' বেরিয়ে গেল হুকোবরদার, একটা মটর কারের ছবি এঁকে দোকানের দরজার উপর ঝুলিয়ে দিলে সবাই বুঝলে এখানে মটরকার পাওয়া যায় কিন্তু বর্ণনের বেলায় ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার ইত্যাদির অবগুণ্ঠন আর আবরণ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া গেল কথা ছবি সুরসার সমস্ত, কেমন করে সে বোঝে ভাবার গতিবিধির সঙ্গে যার মোটেই পরিচয় হয় নি!

দেবমাতা অদিতি তিনি স্বর্গেই থাকেন সুতরাং দেব ভাষাতেই তাঁর অধিকার হল, একদিন তিনি শুনলেন জল সব চলেছে কি যেন বল্‌তে বল্‌তে! দেবমাতা বামদেবকে শুধালেন ঋষি! অ-ল-লা এইরূপ শব্দ করিতে, করিতে জলবতী নদিগণ আনন্দ ধ্বনি করতঃ গমন করিতেছে, তুমি উহাদের জিজ্ঞাসা কর, উহারা কি বলিতেছে? অদিতির মতো, ঋষিরও যদি জলের ভাষা-জ্ঞান জলের মতো না হতো, তবে তিনিও শুধু অ-ল-লাই শুনতেন, কিন্তু ঋষি আপনার প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা নিয়ে বিশ্বের ভাষা বুঝে নিয়েছিলেন, জল কি বলে, মেঘ কি বলে, নদী সমুদ্র কি বলে, সমস্তই তিনি অবগত ছিলেন, কাজেই মেঘ থেকে ঝরে পড়া জলের সেদিনের কথাটি দেবভাষাতে তর্জ্জমা করে অদিতিকে জানানো তাঁর সুসাধ্য হল যথা—"জলবতী নদিগণ ইহাই বলিতেছে মেঘসকলকে ভেদ করে জল সমূহের এমন শক্তি কোথায়! ইন্দ্রই মেঘকে বিনাশ করতঃ জল সমূহ মুক্ত করেন. মেঘের আবরণ ইন্দ্রই ভেদ করেন।"

অ-র-ণ্য এই কটা অক্ষর জুড়ে দিলেই মূর্তিমান অরণ্যটা আমাদের চোখ দিয়ে সাঁ করে গিয়ে আজকাল প্রবেশ করে মনে, কিন্তু ভাষা যখন অক্ষরমূর্তি ধরেনি, শব্দমূর্তি দৃশ্যমূর্তিতে চলেছে, তখন দেখি শুধু অরণ্য এইটে বাচন মাত্র করে দিয়েই ঋষির ভাষা স্তব্ধ হচ্ছে না, কিন্তু ছন্দে সুরে, অরণ্যের ভাষা শব্দ আর নানা রহস্য ধরে ধরে তবে অরণ্যের সত্তা আবিষ্কার করতে করতে চলেছে ঋষির ভাষা জিজ্ঞাসা আর বিস্ময়ের ভিতর দিয়ে—অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি। কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি নত্বা ভীরিব বিদন্তি॥ বৃষারাবায় বদতে যদুপাবতিচিচ্চিকঃ। আঘাটি-ভিরিব ধাবয়ন্নরণ্যানির্মহীয়তে॥ উতগাব ইবাদন্ত্যুত বেশ্মেব দৃশ্যতে। উতো অরণ্যানিঃ সায়ং শকটীরিব সর্জতি গামংগৈষ আ-হ্বয়তি দার্বং গৈষো অপাবধীৎ। বসন্নরণ্যান্যাং সায়মক্রুক্ষাদিতি মন্যতে॥ ন বা অরণ্যানির্হংত্যন্যশ্চেন্নাভি গচ্ছতি। স্বাদো ফলস্য জগ্ধায় যথাকামং নি পদ্যতে॥ আঞ্জনগন্ধিং সুরভিং বহ্বন্নামকৃষিবলাং। প্রাহং মৃগাণাং মাতরমরণ্যানিমশংসষং॥ ১৪৬ দেবমুনি ঋক্‌দেব॥

"হে অরণ্যানি! হে অরণ্যানি! তুমি যেন দেখিতে দেখিতে লুপ্ত হও (কত দূরেই তুমি চলিয়াছ) অরণ্যানি তুমি গ্রামের বার্ত্তাই লওনা, তোমার ভয় নাই এমনি ভাবে একাকী আছ!

জন্তুরা বৃষের ধ্বনিতে কি যেন বলিতেছে, উত্তর সাধক পক্ষীরা চিচ্চিক স্বরে যেন তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে এ যেন বীণার ঘাটে ঘাটে ঝনৎকার দিয়া কাহারা অরণ্যানীর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে! বোধ হইতেছে অরণ্যানীর মধ্যে কোথাও যেন গাভী সকল বিচরণ করিতেছে কোথাও অট্টালিকার মত কি দৃশ্যমান, ছায়ালোকে মণ্ডিত সায়ং কালের অরণ্য যেন কত শত শকট ওখান হইতে বাহির করিয়া দিতেছে! কেও! গাভী সকলকে ফিরিয়া ডাকিতেছে, ও কে! কাষ্ঠ ছেদন করিতেছে, অরণ্যের মধ্যে যে বাস করে সেই লোক বোধ করে সন্ধ্যাকালে যেন কোথায় কে চীৎকার করিয়া উঠিল! বাস্তবিক কিছু অরণ্যানী কাহারো প্রাণবধ করে না অন্যান্য শ্বাপদ জন্তু না আসিলে ওখানে কোন আশঙ্কা নাই, নানা স্বাদু ফল আহার করিয়া অরণ্যে সুখে দিন যাপন করা যায়, মৃগনাভি গন্ধে সুরভিত অরণ্য যেখানে কৃষিগণ নাই, অথচ বিনা কর্ষণেই প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হয়। মৃগগণের জননীস্বরূপা এমন যে অরণ্যানী তাঁহাকে এইরূপে আমি বর্ণন করিলাম॥"

এখন উপরের এই অরণ্য বর্ণনার একটা তর্জ্জমা বাংলায় না করে ছবির ভাষায় করলে অনেকের পক্ষে বোঝা সহজ হতো সবাই বলবে! ভাল কথা—বর্ণনাটা ছবিতে ধরতে আর্টস্কুলের পরীক্ষার দিনে কাঁচা আধপাকা পাকা সব আর্টিস্টদের হাতে দেওয়া গেল ফল কি হল দেখ—কচি আর্টিষ্ট যে ছবি দিয়ে শুধু বাচন করতেই জানে সে 'অরণ্যানী' এইটুকু মাত্র একটা বনের দৃশ্যে বাচন মাত্র করে হাতগুটিয়ে বসলো—আর তো বাচন করিবার কিছু পায় না! পক্ষীর চিক্‌চিক্ বৃষের রব, বীণার ঝনৎকার এসব তো ছবিতে ধরা যায় না, বাকি সমস্তটা মরীচিকার মতো এই দেখতে এই নেই! এদের স্থিরতা দিয়ে ছবিতে ধরলে সমস্তটা মাটি কিন্তু আধপাকা আর্টিষ্ট little learning বা স্বল্প শিক্ষা যাকে ভীষণ, সমস্ত পরীক্ষায় ভুলিয়ে নিয়ে চলে সে 'অরণ্য' কথাটি মাত্র ছবিতে বাচন করে খুসি হলো না সে নির্ব্বাচন করতে বসে গেল—যেন যা হচ্ছে, যেন যা দেখা যাচ্ছে এমনি সব ছায়ারূপ মায় কস্তুরীগন্ধী সোনার মৃগটাকে পর্য্যন্ত রং রেখার ফাঁদে ধরতে চল্লো মহা উৎসাহে! প্রজাপতিকে যেমন ছেলেরা কুঁড়োজালিতে ধরে সেই ভাবে সব ধরলে ছবিতে চিত্রভাষায় নাতিপরিপক্ক আর্টিষ্ট কিন্তু দেখা গেল ধরা মাত্র সব চিত্র পুত্তলিকার মতো কাট হয়ে রইলো, ঋষির গতিশীল বর্ণনা দুর্গতিগ্রস্ত হয়ে গিল্‌টির ফ্রেমের ফাঁস গলায় দিয়ে অপঘাত মৃত্যু লাভ করলে! তারপর এল পাকা শিল্পীর পালা সে ঋক্‌বেদের সুক্তটা হাতে পেয়েই তার সমস্ত রসটা মন দিয়ে পান করে ফেল্লে, তারপর ছবির শাদা কাগজে মোটা মোটা করে লিখলে—ছবি মানে Book illustration নয়, একমাত্র Stage craft এই বর্ণনার illustration, চিত্র শব্দ আলো ছায়া এবং নানা গতিবিধি ইত্যাদি দিয়ে ফুটিয়ে দিতে পারে নিখুঁতভাবে, আমি stage manager নই

সুতরাং আমাকে ক্ষমা করবেন। কথাগুলো অরণ্যের সত্তাকে একদিক দিয়ে বোঝাচ্ছে, ছবির ভাষা অন্যদিক দিয়া তাকে বোঝাবে এই জানি, illustration চান্, না ছবি চান্ সেটা জান্‌লে এই পরীক্ষায় অগ্রসর হব ইতি—

পুঃ—ঋষিরা এক জায়গায় বলেছেন অন্যের রচনার সাহায্যে তোমরা স্তুতি করিওনা, সুতরাং আমার নিজের মনোমতো রচনা দিয়ে আমি ঘরে গিয়ে অরণ্যের স্তুতি ছবি দিয়ে লিখে পাঠাবো মনে করেছি; বিদায়—

যে ছেলেটা সব চেয়ে জ্যেঠা পরীক্ষক যদি পাকা হন তো জ্যেষ্ঠ হিসেবে তাকেই দেবেন ফুল মার্ক, আর কাঁচা যার পক্ষে ignorance is bliss তাকে দেবেন পাস্ মার্ক আর মাঝামাঝি লোকটিকে দেবেন শূন্য এটা নিশ্চয় বল্‌তে পারি। ছবি, কথা, ইঙ্গিৎ, সুর সার ইত্যাদি যদিও এরা ভাষা—কিন্তু ব্যক্ত করার উপায় ও ক্ষেত্র এদের সবারই একটু একটু বিভিন্ন, এরা মেলেও বটে না মেলেও বটে এরা একই ভাষা-পরিবারভুক্ত কিন্তু একই নয়—"Language is a system of signs, of Ideas and of relations between ideas. These signs may be spoken sounds as in ordinary speech or purely Visual (নাট্য-চিত্র) or as the Egyptian Hieroglyphs (অক্ষর মূর্ত্তি বা নিরূপিত বাক্য) or as construction of movements as in the finger language used by deaf-mutes (ইঙ্গিৎ)"—F. Ryland).

মানুষের ভাষা সব প্রথম শব্দকে ধরে আরম্ভ হল কি চিত্রিত রূপকে ধরে তা বলা শক্ত, তবে স্বভাবের নিয়মে দেখি—জন্মাবধি শিশু শব্দ শোনা, শব্দ করা, আলো ছায়া এবং নানা পদার্থের রূপ রং ইত্যাদি দুটোই এক সঙ্গে ধরে বুঝতে এবং বোঝাতে চলেছে! ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং যে চোখের তারা ফিরিয়েছে বা যে হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে তারি থেকে কথিত চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিনে সৃষ্টি হয়েছে বল্লে ভুল হবে না।

পুরাকালের ও প্রাকালে মানুষ যে সব শব্দ করে এ ওকে ডাক্‌তো, সে তাকে আদর করে কিছু শোনাতো কি জানাতো, যে বাক্য তারা বল্‌তো তার সুর সার ইঙ্গিৎ আভাষ কোন কালের আকাশে মিলিয়ে গেছে কিন্তু সেই সব দিনের মানুষের চিত্রিত যে বাক্য সমস্ত তা এখনো যে গুহায় তারা থাক্‌তো—তার দেওয়ালে বিচিত্রবর্ণ আর মূর্ত্তি নিয়ে বর্ত্তমান আছে, ইউরোপে এসিয়ার নানাস্থানে কত কি যে ছবি তার ঠিকানা নাই—গরু, মহিষ, শৃগাল, হস্তী, অশ্ব, মৃগযূথ, দলে দলে জলের মাছ, যুদ্ধ বিগ্রহ অস্ত্র শস্ত্র কত কি! চিত্রের ভাষা দিয়ে তারা কি বোঝাতে চেয়েছিল তা এখনো ধর্‌তে পাচ্ছি—দিনের খবর, রাতের খবর, জলের খবর, বনের পশুর খবর, এমন কি হরিণের চোখটা কেমন তার খবরটা পর্য্যন্ত! সেই সব ইতিহাসের বাহিরেও যুগের মানুষ এবং সাধক পুরুষেরা নিজেদের তপস্যালব্ধ চিত্রভাষার সাহায্যে মনোভাবগুলো লিখে গেছে, সুতরাং ছবিকেও খুব আদিকালে ভাষা হিসেবেই মানুষ যে দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। শব্দের দ্বারায় বাক্যের দ্বারায় যেমন, আঁকা ও উৎকীর্ণ রূপের দ্বারাও তেমনি, পরিচিত সব জিনিসকে চিহ্নিত নিরূপিত নির্ব্বাচিত করে চলেছে মানুষ এই হ'ল গোড়ার কথা। যে সব কিছু জীবন্ত কিম্বা যারা গতিশীল কেবল তাদেরই আদি যুগের মানুষেরা চিত্রের ভাষায় ধর্‌তে চেয়েছে, গাছ, পাথর, আকাশ যারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, শব্দ করে না, চলে না, বলেও না, আলোতে অরণ্যানীর মতো হঠাৎ দেখা দেয় আবার অন্ধকারে হঠাৎ মিলিয়ে যায়, ছবির ভাষায় তাদের ধরা তখন সম্ভব বোধ করেনি মানুষ, হয়তো বা কথিত ভাষাতেও এসব বর্ণন করেওনি তখনকার মানুষ, কেন যে তা এক প্রকাণ্ড রহস্য! ধর্‌তে গেলে বিদ্যুৎগতিতে দৌড়েছে যে হরিণ কি মাছ তাদের ছবিতে ধরার চেয়ে, পাথর, গাছ কি ফুল যারা স্থির রয়েছে চিরকাল ধরে আঁকা দিয়ে তাদেরই ধরা সহজ ছিল কিন্তু তা হয়নি, গাছ, পালা, পাহাড়, পর্ব্বত, এরা বাদ পড়ে গেল, আর যাদের শব্দ অঙ্গভঙ্গি এই সব আছে—এক কথায় যাদের ভাষা আছে—পুরাতন মানুষের ছবির ভাষা আগে গিয়ে মিল্‌লো তাদেরই সঙ্গে! এ যেন মানুষের সঙ্গে চারিদিকের

যারা এসে কথা কইল, তাদেরই পরিচয় আগে লিখতে বসলো মানুষ, জলকে মানুষ জিজ্ঞাসা করলে—জল তুমি কেমন করে চল? জলস্রোতের রেখা ও গতি ভঙ্গি দিয়ে এঁকে, ইঙ্গিত করে, শব্দ করে পর্য্যন্ত যেন জানিয়ে দিলে—এমনি করে ঢেউ খেলিয়ে এঁকে বেঁকে চলি! হরিণ তুমি কেমন করে দৌড়ে যাও? হরিণ সেটা স্পষ্ট দেখিয়ে গেল! কিন্তু গাছকে পাথরকে শুধিয়ে মানুষ পরিষ্কার সাড়া পেলে না—গাছ তুমি নড় কেন? এর উত্তর গাছ, মর্ম্মর ধ্বনি করে দিলে—এই এমনিই নড়ি থেকে থেকে জানিনে কেন! গাছের কথাই বোঝা গেল না, ছবিতেও তার রূপ ধরলেনা মানুষ! পাহাড় দাঁড়িয়ে কেন! আকাশ দিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ফিরে এল কেন! ছবির ভাষায় এদের কথা লেখা হলই না শুধু এদের বোঝাতে মানুষ গাছ বলতে গোটাকতক দাঁড়ি কসি, পাহাড় বলতে একটা ত্রিকোণ চিহ্ন দিয়ে গেল কখন কখন কতকটা চীনে অক্ষরের মতো,—রূপাভাস কিন্তু পুরো রূপ চিত্র নয়। ব্রতধারী মানুষ কামনা ব্যক্ত করবার সময় পুরাকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত যে কথা, ছবি, সুর, নাট্য ইত্যাদি মিশ্রিত ভাষা প্রয়োগ করে চলেছে তার রীতি আমাদের এখনো ধরে থাকতে হয়েছে—শুধু এক কালের অস্ফুট শিশুভাষা স্ফুটতর হয়ে উঠেছে কালে কালে—ভাবসম্পদে অর্থ শব্দ বর্ণ ইত্যাদিতে ভরে উঠতে উঠতে, এইটুকু পার্থক্য হয়েছে পুরাকালের ব্রতধারীর ভাষার সঙ্গে এখনকার ভাষার।

যে মানুষ ছবি কথা কিম্বা কিছু দিয়েই এককালে জননী পৃথিবীকে ধারণার মধ্যে আনতে পারিনে স্ফুট ভাষার সাহায্যে সেই মানুষ আস্তে আস্তে 'একদিন পৃথিবীকে নিরূপিত করলে—আলপনার পদ্ম পত্রের উপরে একটি বুদ্বুদের আকারে, স্তোত্রের উদাত্ত অনুদাত্ত সুরে ধরা পড়লো বসুন্ধরা—'হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্র দ্বারায় তোমার স্তব করেন!' জীবন্ত হরিণ যে দ্রুত চলেছে তাকে ব্যক্ত করতে হল যেমন গমনশীল রেখা, তেমনি গমনশীল বাক্য ও সুর বর্ণন করে চল্লো আকাশে ভ্রাম্যমানা পৃথিবীকে। স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ, অকার থেকে ক ইত্যাদি শব্দ এই মিলিয়ে হল কথিত ভাষা, আর আকার থেকে আরম্ভ করে চন্দ্রাকার ও তার বিন্দুটি পর্য্যন্ত নানা রেখা বর্ণ ও চিহ্ন মিলিয়ে হল চিত্র বিচিত্র ছবির ভাষা, এবং হাতপায়ের নানা সংকেত ও ভঙ্গি নিয়ে হল অঙ্কের পর অঙ্ক ধরে গতিশীল নাটকের চলতি ভাষা, এই হল ভাষার আদি ত্রিমূর্ত্তি, এঁর পার্শ্ব দেবতা হল দুটি—'বাচন' ও 'বর্ণন', এই মূর্ত্তি নিয়ে ভাষা এগোলেন মানুষের কাছে। ঋষি বলেছেন—"হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্বপ্রথম বস্তুর নামমাত্র বাচন করিতে পারে, তাহাই তাহাদিগের ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান—নামরূপ হল গোড়ার পাঠ! এর পরে এল—বন্দনা থেকে আরম্ভ করে বর্ণনা পর্য্যন্ত, আবৃত্তি থেকে সুর করে বিবৃতি পর্য্যন্ত—"বালকদিগের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল তাহা বাগ্দেবীর করুণাক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইল"—ভাষা, বোধোদয় বস্তুপরিচয় ইত্যাদি ছাড়িয়ে অনেকখানি এগোলো। তার পরে এলো ভাষার মহিমা সৌন্দর্য্য ইত্যাদি—'যেমন চালনীর দ্বারায় শক্তুকে পরিষ্কার করা হয় সেই ভাবে বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন (সেই ভাষাকে প্রাপ্ত হইলে পর) যাহাদিগের চক্ষু আছে কর্ণ আছে এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন......সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার লাভ করেন...ঋষিদিগের বচন রচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী স্থাপিত আছেন... বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞদ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন...ঋষিদিগের অন্তঃকরণের মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন, সেই ভাষা আহরণপূর্ব্বক তাঁহারা নানাস্থানে বিস্তার করিলেন সপ্ত ছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে"...। বিশ্বরাজ্যের প্রকট রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ সমস্তই পাচ্ছিল মানুষ ভাষাকে পারার আগে থেকে কিন্তু মনের মধ্যে তবুও মানুষের একটা বেদনা জাগছিল—মনের কথাকে খুলে বলবার বেদনা, মানসকে সুন্দররূপে প্রকট করার বাসনা, সুপরিষ্কৃত ভাষাকে পাবার জন্যে বেদনা মনে জাগছিল? মানুষের সব চেয়ে যে প্রাচীন ভাষা তাই দিয়ে রচা বেদ এই বেদনের সুরে ছত্রে ছত্রে পদে পদে ভরা দেখি 'আমার কর্ণ,

আমার চক্ষু, আমার হৃদয় নিহিত জ্যোতি সমস্তই তোমাকে নিরূপণ করিতে অবগত হইতে ধাবিত হইতেছে—দূরস্থ বিষয়ক চিন্তা ব্যাপৃত আমার হৃদয় ধাবিত হইতেছে—আমি এই বৈশ্বানর স্বরূপকে কিরূপে বর্ণন করি কিরূপেই বা হৃদয়ে ধারণ করি!" কিম্বা যেমন—"কিরূপ সুন্দর স্তুতি বলের পুত্র ইন্দ্রকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিবে।" হৃদয়ের বেদনার অন্ত নাই. দেখতে চেয়ে শুনতে চেয়ে প্রাণ ব্যথিত হচ্ছে, ধাবিত হচ্ছে! অতি মহৎ জিজ্ঞাসার উত্তর পাচ্ছে মানুষ অতি বৃহৎ পরম সুন্দর কিন্তু তার প্রত্যুত্তরের মতো মহাসুন্দর ভাষা খুঁজে পাচ্ছেনা!—"যজ্ঞের সময় দেবতারা আমাদিগের স্তব শুনিয়া থাকেন, সেই বিশ্বদেবতা সকলের মধ্যে কাহার স্তব কি উপায়ে উত্তমরূপে রচনা করি!" মনের নিবেদন সুন্দর করে উত্তম করে জানাবার জন্য বেদনা আর প্রার্থনা। কোন রকমে খবরটা বাৎলে দিয়ে খুসি হচ্ছেনা মানুষের মন. সুন্দর উপায় সকল উত্তম উত্তম সুর সার কথা গাথা ইঙ্গিতাদি খুঁজছে মানুষ এবং তারি জন্যে সাধ্য সাধনা চলেছে—"হে বৃহস্পতি! আমাদিগের মুখে এমন একটি উজ্জ্বল স্তব তুলিয়া দাও, যাহা অস্পষ্টতা দোষে দূষিত না হয় এবং উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়!" ছবি দিয়ে যে কিছু রচনা করতে চায় সেও এই প্রার্থনাই করে—রং রেখা ভাব লাবণ্য অভিপ্রায় সমস্তই যেন উজ্জ্বল এবং সুন্দর হয়ে ফোটে। ধরিত্রীকে বর্ণন করতে ঋষি গতিশীল স্তোত্র আর ভাষা চাইলেন। ভাষার মধ্যে এই গতি পৌঁছয় কোথা থেকে। মানুষের মনের গতির সঙ্গে ভাষাও বদলে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি—বাঙ্গালার পক্ষে সংস্কৃতমূলক সাধুভাষা হল অচল ভাষা, কেননা সে শব্দকোষ ব্যাকরণ ইত্যাদির মধ্যে একেবারে বাধা, মনের চেয়ে পুঁথির সঙ্গে তার যোগ বেশি! বাঙ্গালীর মন বাংলায় জুড়ে আছে, সুতরাং চলতি বাংলা চলছে ও চলবে চিরকাল—বাঙ্গালীর মনের গতির সঙ্গে নানা দিক থেকে, নানা জিনিষ যুক্ত হতে হতে; ঠিক জলের ধারা যেমন চলে দেশ বিদেশের মধ্যে দিয়ে। ছবির দিক দিয়েও এই বাংলার একটা চলতি ভাষা সৃষ্টি হয়ে ওঠা চাই, না হলে কোন্ কালের অজন্তার ছবির ভাষায় কি মোগলের ভাষায় অথবা খালি বিদেশের ভাষায় আটকে থাকা চলবেনা। ঋষিরা ভাষাকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করেছেন—'হে ইন্দ্র, হে অগ্নি! মেঘ হইতে বৃষ্টির ন্যায় এই স্তোতা হইতে প্রধান স্তুতি উৎপন্ন হইল!' বৃষ্টির জল ঝরণা দিয়ে নদী হয়ে বহমান হল, তবেই সে কাযের হল, আর জল আঁট হয়ে হিমালয়ের চুড়োয় বসে রইলো—গলোওনা, গলালেও না চালালেও না, জলের থাকা নাথাকা সমান হল। বাঁধা বস্তুর বা styleর মধ্যে এক এক সময়ে একটা একটা ভাষা ধরা পড়ে যায় কথিত ভাষা চিত্রিত বা ইঙ্গিৎ করার ভাষা সবারি এই গতিক! যেমনি style বেঁধে গেল অমনি সেটা জনে জনে কালে কালে একই ভাবে বর্ত্তমান রয়ে গেল—নদী যেন বাঁধা পড়লো নিজের টেনে আনা বালির বাঁধে! নতুন কবি নতুন আর্টিষ্ট এরা এসে নিজের মনের গতি ভাষার স্রোতে যখন মিলিয়ে দেন তখন style উল্টে পাল্টে ভাষা আবার চলতি রাস্তায় চলতে থাকে। এ যদি না হতো তবে বেদের ভাষাই এখনো বলতেম, অজন্তার বা মোগলের ছবি এখানে লিখতেম এবং যাত্রা করেই বসে থাকতেম সবাই! ভাষা সকল গোলক ধাঁধার মধ্যেই ঘুরে বেড়াতো অথচ দেখে মনে হতো ভাষা যেন কতই চলেছে!

বঙ্গবাণী।

ঋগ্বেদসংহিতা

(২) মঙ্গলাচরণম্

১।১৬।৯

যজ্ঞভূমে আলায়েছ, ওগো ঊষা, পুণ্য হোমানল,
অরুণের আঁখি মেলি' নীলিমারে করেছ উজ্জ্বল,—
যজ্ঞসেবী মানুষের দিব্য তেজে চিত্ত আলোকিয়া,
দেবতার কর্ম্মভার, হে কল্যাণী, এনেছ বহিয়া।

ফুলন্ত জ্যোতিঃর দল দিকে দিকে পড়িছে ঝরিয়া,
দ্যুলোকের কালো বাস, ওগো দেবী, নিয়েছ হরিয়া—
অরুণের রাগে রাঙা তুরগেরে জুড়িয়াছ রথে,
এস আজ বিশ্ববাসী নিখিলের চেতনার পথে!

আকুল-হৃদয়ে-চাওয়া বয়ে আন রতনের ঝাঁপি ;
তোমার পরাণ ছুঁয়ে বিশ্বে প্রাণ উঠিয়াছে কাঁপি।
শাশ্বত অতীত ফেলে তব রূপে তার রূপছায়া—
জ্যোতির্ম্ময়ী কায়া মাঝে আজি তব জাগে নব মায়া।

দেবগণ-মাতা তুমি—অদিতির নিত্য সহচরী ;
জাগে ওই হোমশিখা—জাগ তুমি ভূমা রূপ ধরি।
বরষি আশিষ দেবী ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ-পূর্ণ কর হিয়া,
জন-গণ-মন মাঝে দাও স্থান, বিশ্ব-বরণীয়া।—

আর্য্য-দর্পণ—বৈশাখ।

(৩) দেবজ্যোতিঃ
১।১৩।১১

একি হেরি অপরূপ!—ফোটে ওই পুঞ্জিত-কিরণ
মিত্র অগ্নি বরুণের দীপ্তি-ভরা উদার নয়ন!
দ্যাবা পৃথ্বী অন্তরীক্ষ পূর্ণ করি—বিশ্ব বিথারিয়া
আত্মরূপী সবিতার দিব্যজ্যোতিঃ উঠে হিল্লোলিয়া!

আসে সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময়ী পুণ্যরুচি উষারে চাহিয়া—
প্রিয়ারে খুঁজিয়া যেন প্রণয়ীর উচ্ছ্বসিত হিয়া।
মর্ত্ত্য যেথা যুগ-বাহী তোলে আঁখি দেবতার পানে
সবিতার আশীর্ব্বাদ নামে সেথা নিত্য সুকল্যাণে!

এই তাঁর দেবলীলা—সবিতার এই তো মহিমা—
সংহরিয়া দীপ্তি তাঁর কর্ম্মমাঝে রচিলেন সীমা ;—
মুক্ত হ'ল রথ হতে অশ্ব তাঁর বিচিত্র বরণ—
ঢাকে বিশ্ব রাত্রি ওই বিস্তারিয়া মায়া-আবরণ!

অন্তরীক্ষ মাঝে যেথা সবিতার ফোটে চিত্র কায়া,
মিত্র আর বরুণের আঁখিকোলে নাচে নব মায়া।—
দিব্য দ্যুতি অশ্ব তাঁর বিশ্ব হতে সংহরিল কালো—
ব্যাপ্ত করি চরাচর উদ্ভাসিত অন্তহীন আলো!

আর্য্য-দর্পণ—জ্যৈষ্ঠ।

কৃষক—সে দেশের ও এদেশের

[শ্রীহৃষীকেশ সেন]

এই ত গেল সে দেশের—ইউরোপের কৃষকের কথা। আর এদেশের কৃষক? সে কূপমণ্ডুকের মত গতিশীল বহির্জগতের সকল প্রভাব থেকে আপনাকে দূরে রেখে আসছে। সে পৃথিবীর কোন সংবাদই রাখে না, সংবাদ রাখতে পারে এমন শিক্ষাও সে পায় নি। সে যে মানুষ, পূর্ণ মনুষ্যত্বে যে তারও দাবী আছে, এ ধারণা তার নাই। তার এই মোহনিদ্রা ভাঙিয়ে আত্মবোধকে জাগিয়ে দেয়, এমন ব্যবস্থাও দেশে নাই।

বাঙলার কৃষক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দুর্ব্বহ ভারে প্রপীড়িত। অত্যধিক শোষণে প্রজা যখন এমন নিঃস্ব হয়ে পড়ে যে তার কাছ থেকে সহজে আর রাজস্ব আদায় হয় না, তখন রাজস্বের ঠিকা দেওয়াই সনাতন রীতি। এতে লাভ হয় এই যে রাজস্ব-আদায়ের জন্য যে কঠোরতা অবলম্বন করতে হয় তার জন্য রাজার দুর্নাম হয় না, দুর্নাম হয় ঠিকাদারের। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই নীতি অনুসারেই এক শ্রেণীর লোককে রাজস্বের ঠিকা দিয়েছিলেন। এই রাজস্ব-ঠিকাদারদের (revenue-farmer) শিষ্টাচারের অনুরোধে জমিদার বলা হয়। এই বন্দোবস্তে লাভ যা কিছু তা হল তথা-কথিত জমিদারের আর ক্ষতি যা কিছু তা হল কৃষকের। প্রবন্ধান্তরে আমি এই বিষয়টা সবিস্তারে দেখিয়েছি। মোটের উপর এ বন্দোবস্তে জমির উপর কৃষকের কোন স্থায়ী স্বত্ব জন্মায় নি। প্রজা—ভূম্যধিকারীর আইন অনুসারে যদি কখন কোন কৃষকের স্বত্বাধিকার জন্মায় ত বাকী খাজনার দায়ে তা নিলামে

বিক্রী হয়ে যেতে পারে। আর, বিক্রী হলে প্রায় জমিদারই তা নিজে কিনে নেন। তার পর সে জমিতে কারও আর কোন স্বত্ব না জন্মাতে পারে, সে জন্য সেলামী নিয়ে মেয়াদী পাট্টায় তা বিলি করা হয়। সম্প্রতি এক মোকদ্দমায় এক ইংরেজ সাক্ষী এই সাক্ষ্য দিয়েছেন—

"The tenants were given leases of land for a fixed period of five years by a *Kabulyat*. They invariably paid *Salamees* and then the rate of rent was fixed. At the end of five years the tenants took fresh leases by similar *Kabulyats* without the *Salamies*. The rate of rent was not necessarily the same at which they held land for the previous five years. Zirat land he (witness) can settle out to any body irrespective of whether he was a previous tenant or not. If the ryot did not apply for a fresh *Kabuliyat* on the expiry of five years, he was liable to ejectment by legal process. If the tenant's holding had been deluviated and after a time had reformed again, the tenant had no right to get possession of it. He was to make an application and arrange for the terms of the rent and the *Salami*."

এই সাক্ষীর নাম Mr. Eaves Clare Smith এবং সাক্ষ্যে যে বিষয়ের বর্ণনা করা হয়েছে তা Court of Wards এর প্রজা-সম্বন্ধে বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট তাই সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে জেলার কর্তৃপক্ষীয়েরা যদি এই রীতিতে জমির বন্দোবস্ত করেন, তা হলে অন্য লোকে এরূপ করলে তাঁরা আপত্তি করেন কেন? সাক্ষী একথার কোন উত্তর করেন নি (১)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং Settlement-এ প্রজার কি ক্ষতি হয়েছে এবং প্রবল জমিদারের অনিষ্ট করবার ক্ষমতা কত বৃদ্ধি পেয়েছে, এটা তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে একটা বিধি ছিল যে প্রজার কাছ থেকে আবওয়াব আদায় করা হবে না। জমিদার কিন্তু সে বিধি মানেন না। একথা সকলেই জানে তথাপি যদি প্রমাণ আবশ্যক হয় ত তাও পাওয়া গিয়েছে একটা মোকদ্দমায়। ত্রিপুরার রাজা প্রজার কাছ থেকে কতকগুলি আবওয়াব আদায় করেন। জেলার কালেক্টার এই আয়ের উপর কর ধার্য্য করেন। ত্রিপুরারাজ তাতে আপত্তি করেন এই বলে যে এ আয় জমিসংক্রান্ত, সুতরাং এর উপর আয়কর বসতে পারে না। হাইকোর্ট মীমাংসা করেন যে এ আয় জমিসংক্রান্ত বৈধ আয় নয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের বাঙলা দেশের শাসন বিবরণীতেও (Administration Report) উল্লিখিত আছে যে জমিদারেরা এখনও আবওয়াব আদায় করে থাকেন। সুতরাং জমিদারদের এই অবৈধ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের অবিদিত নাই। কিন্তু তথাপি কৃষকের দুর্ভাগ্যবশতঃ তার কোন প্রতিকার হয় না। তার একমাত্র কারণ এই যে কৃষক তার নিজের শক্তি জানে না। যে দিন সে তা জানবে সেই দিনই সে তার নিজের হিতের জন্য, রাজার হিতের জন্য, এবং দেশের হিতের জন্য তার প্রয়োগ করবে।

প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনটা অনেকবার সংশোধিত হয়েছে। আর একটা সংশোধনের আবশ্যক বুঝে বাঙলার ব্যবস্থাপক সভার এক সদস্য একটা আইনের খসড়া সভায় পেশ করবার অনুমতি চান। দু জন বড় জমিদার-সদস্য এতে আপত্তি করেন। প্রস্তাবটা ভোটে দিয়ে দেখা গেল ৪২ জন এর বিপক্ষে এবং ২২ জন মাত্র এর সপক্ষে ভোট দিয়েছেন! কাযেই প্রস্তাবটা অগ্রাহ্য হয়ে গেল। এ থেকে বেশ দেখতে পাওয়া যায় যে ব্যবস্থাপক সভায় জমিদার পক্ষই খুব প্রবল এবং কৃষকপক্ষ অত্যন্ত দুর্ব্বল। এর পরে

[১] Report of the evidence of Mr. Eaves Clare Smith given in the court of the District Magistrate of Monghyr in the case against Mr. Harry Grant, Zemindar, Bhagalpur, as to the conditions under which land was let out to tenants by the Court of Wards.—Bengalee, August 10, 1920.

আর একজন সদস্য প্রস্তাব করেন যে ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন বে-সরকারী সদস্য, Director of Land Records, জনকয়েক Settlement officer এবং জনকয়েক সবজজ ও মুন্সেফ নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হ'ক। প্রজা-স্বত্ববিষয়ক আইনের কিরূপ সংশোধন আবশ্যক এই কমিটি তারই রিপোর্ট করবেন। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান রাজস্ব-সচিব-রূপে বলেন যে অনেক দিন থেকে গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে চিন্তা করছেন, সুতরাং কমিটি নিযুক্ত করতে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি নাই, কিন্তু কমিটির সদস্য নিযুক্ত করবেন গবর্ণমেণ্ট। অর্থাৎ যাঁরা "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি" নীতি অনুসারে কায করতে সম্মত হবেন তাঁরাই সদস্য হতে পারবেন এতে যদি প্রস্তাবক রাজী হন তা হলে তিনি (মহারাজাধিরাজ) প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারেন। প্রস্তাবক তাতেই সম্মত হালেন, প্রস্তাবটিও গৃহীত হল। তারপর বাঙলার গবর্ণর ২০ জন সদস্য নিযুক্ত করেছেন তার মধ্যে বড় বড় জমিদার আছেন ৫ জন, বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারী আছেন ৯ জন, আর অন্য লোক আছেন ৬ জন। এই ছ'জনের মধ্যে ক'জন জমিদার আছেন তা নাম দেখে চিনতে পারা যায় না। একজন আছেন প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের বিশেষজ্ঞ। এই বিশেষজ্ঞটিকে বাদ দিয়ে অন্য লোকের মধ্যে যে পাঁচ জন থাকেন, যদি ধরে নেওয়া যায় যে তাঁরা সকলেই কৃষকবন্ধু তা হলে জমিদার সদস্যের সঙ্গে সংখ্যায় এঁরা সমান। কাযেই এই প্রস্তাবিত আইনের শুভাশুভ নির্ভর করছে ৯ জন সরকারী কর্ম্মচারী-সদস্যের উপর, অর্থাৎ তাঁরা যে পক্ষে যোগ দেবেন সেই পক্ষই অধিকাংশত্ব (majority) লাভ করে জয়ী হবেন। সরকারী কর্ম্মচারী-সদস্যেরা অবশ্য সকলেই সম্মানিত ভদ্রলোক, honorable gentlemen. এই প্রসঙ্গে এইরূপ আর একটি কমিটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বিহারের প্রজাদের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্য একটা Rent Law Commission নিযুক্ত হয়েছিল এবং তার সাহায্যের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। এই কমিটির সদস্য ছিলেন কয়েক জন সরকারী কর্ম্মচারী, কয়েক জন নীলকর এবং কয়েক জন জমিদার। এরা যথারীতি অনুসন্ধান করে একটা রিপোর্ট দিয়েছিলেন এবং কমিশন এই রিপোর্টের ভিত্তিতে একটা আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু প্রজার সৌভাগ্যক্রমে গবর্ণমেণ্ট সে পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেন নি। এবারকার কমিটির সদস্যেরা অনুগ্রহ করে একথাটা স্মরণ রাখবেন; তাঁরা একথাও অবশ্য ভুলবেন না যে যদিও জমিদার মনে করেন যে তাঁর ভূ-স্বামিত্বে প্রজা পরম সুখে আছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে জমিদার তার অযথা খাজনা বৃদ্ধি করেছেন, তাকে নানা রকমে শোষণ করে দরিদ্র করেছেন, এবং তার উপর আরও কত অত্যাচার করেছেন। আর জমিদারের এই অত্যাচারের জন্যই গবর্ণমেণ্টকে আইনের দ্বারা তাঁর ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করতে হয়েছে (২)।

এখন দেখা যাচ্ছে জমিদারের ক্ষমতার সঙ্কোচটা এখনও যেমন হওয়া উচিত তেমন হয় নি। এখনও বৈধ অবৈধ নানাপ্রকার অত্যাচার আছে। সুতরাং প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনটার বাস্তবিকই একটা সংশোধন আবশ্যক হয়েছে। আশা করা যাক সংশোধনটি যেন কেবল কতক গুলি কথার রদ-বদলে পর্য্যবসিত হবে না। মূল নীতিরও সংস্কার হবে। এবং সংশোধিত ও সংস্কৃত হয়ে আইনটি, Lord Lawrence এর ভাষায় যেন সেই আইন হয় "which should thoroughly protect the raiyat and make him what he is now in name only, a *free man*."

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের কৃষকেরও অন্যান্য দেশের কৃষকের মত নানা অভাব অভিযোগ আছে যার জন্য সে তার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। গভর্ণমেণ্ট এই অসন্তোষের বৃদ্ধির লক্ষণ দেখে খাজনা আইনের সংশোধন আবশ্যক মনে করেন। প্রজা চায় জমিতে দখলী স্বত্ব Occupancy right এবং সেই স্বত্বের পুরুষানুক্রমিক অধিকার hereditary right. তালুকদার এতে ভীত হয়ে গভর্ণরের শরণাপন্ন হন। গভর্ণর তাঁদের অভয় দিয়ে বলেন যে তালুকদারের বিনা অনুমতিতে প্রজাকে এমন

[২] Land Revenue Policy of the Indian Government, 1902.

অধিকার কখনই দেওয়া হবে না। বলা বাহুল্য নেপথ্যে এমন কথা বলিবার অধিকার গবর্ণরের নাই। কোন অধিকার দেওয়া বা না দেওয়া গবর্ণরের হাতে নাই। সেটা আছে ব্যবস্থাপক সভার হাতে। যা হ'ক আপনার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করে গবর্ণর তালুকদারদের কাছে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তারপর Select Committee তে কৃষক প্রতিনিধিরা যখন দখলীস্বত্ব ও তার পুরুষানুক্রমিক অধিকার চাইলেন, তখন তালুকদার প্রতিনিধিরা প্রকাশ্যে বললেন যে গবর্ণমেণ্ট তালুকদারের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তাঁদের বিনা অনুমতিতে কৃষককে ঐরূপ অধিকার দেওয়া হবে না। Board of Revenue কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু রাজস্বসচিব তালুকদারদের পক্ষই সমর্থন করলেন, বললেন গবর্ণমেণ্ট যখন কথা দিয়েছেন, তখন সে কথা রাখতেই হবে। অনেক তর্ক বিতর্ক হল। তারপর যথারীতি ভোটে গেল। ফল হল সপক্ষে অর্থাৎ কৃষকের পক্ষে ১৯ টি ভোট, আর বিপক্ষে অর্থাৎ তালুকদারের পক্ষে ৪০ টি! আর এই ৪০টি ভোটের মধ্যে ১৭টি ছিল সরকারী কর্ম্মচারী-সদস্যদের! এইরূপে যে আইন পাশ হল তাতে কৃষক যে জমিতে স্বত্বাধিকার চেয়েছিল তা ত পেলেই না, বরং যা ছিল তাও গেল। তালুকদারকে ক্ষমতা দেওয়া হল যে তিনি ইচ্ছা করলে কৃষকের জমি খাস করে নিয়ে নিজে চাষ আবাদ করতে পারেন। আইনের নাম হল সংশোধিত খাজনার আইন! সংশোধিতই বটে, তবে প্রভেদ এই যে সংশোধনটা চেয়েছিল কৃষক, পেলে তালুকদার!! এতেও তালুকদার সন্তুষ্ট নয়, তিনি চান বাঙলাদেশের মত খাজনার একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেই জন্য স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় জয় লাভ করে তালুকদারেরা গেলেন রাজপ্রতিনিধির কাছে এবং অন্যান্য কথার মধ্যে বললেন তাঁদের সঙ্গে তাঁদের প্রজার সম্বন্ধ বেশ মধুরই আছে, কেবল কতকগুলি জনপ্রিয়তা-অন্বেষী রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনকারী সেই মধুর সম্বন্ধের একতানতা ভঙ্গ করতে চায়। এর এক মাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে, তাঁরা বলেন, তাঁদেরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া।

কৃষকদের এই হৃদয়পোষিত স্বত্বাধিকার লাভের আশা ভগ্ন হওয়ার একটা প্রত্যক্ষ ফল হয়েছে "ঐক্য" আন্দোলন। কৃষকেরা দলে দলে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছে এবং দিচ্ছে। তালুকদারেরা পূর্ব্বেই বলে রেখেছিল যে আগেকার কৃষাণ সভার মত এই ঐক্য আন্দোলনও আজিতেতরদের (agitator) উত্তেজনার ফল। এখনও সেই কথা বলছে। এ নিয়ে কোন শান্তি ভঙ্গ বা শান্তি ভঙ্গের সম্ভাবনা ঘটলে বা না ঘটলেও শান্তিরক্ষকেরা আজিতেতরদের স্কন্ধেই দায়িত্বটা, সত্যই হ'ক আর কল্পিতই হ'ক, চাপিয়ে দেন। যখন কোন স্থানে কলেরা সংক্রামক ভাবে দেখা দেয় তখন গ্রাম্য চৌকীদার সামান্য উদরাময়কেও কলেরা বলে রিপোর্ট করে। প্লেগের সময় গলার ব্যথা হলেই তাকে প্লেগ বলে রিপোর্ট করা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাধি সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম বড় একটা দেখা যায় না। এর একটা ফল এই হয় যে চিকিৎসক রোগনির্ণয়ের জন্য সবিশেষ ব্যস্ত হন না, কেবল "মা ফলেষু কদাচন" এই মহানীতিবাক্য স্মরণ করে ঔষধ—অনেক সময়েই পেটেণ্ট—প্রয়োগ করেন। যা হ'ক, কৃষক এখনও সকল আশা ত্যাগ করেনি। তার অভিযোগের অনুসন্ধান হচ্ছে এবং যতদূর প্রকাশ হয়েছে তাতে জানা গিয়েছে যে তার অভিযোগ অমূলক নয়। কৃষক এখনও আশা করছে একটা যথোচিত প্রতিকার হবে।

২

প্রতিকার বিধানের সময় স্মরণ রাখতে হবে যে ভারতীয় কৃষক পৃথিবীতে একক নয়। সেও পৃথিবীর অন্যান্য কৃষকের মধ্যে একজন। জেনিভায় যে শ্রমজীবীদের বৈঠক হচ্ছে, তাতে ভারতীয় শ্রমজীবীদের পক্ষে দুটো কথা বলবার লোক আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এবং ততোধিক দুঃখের বিষয় এই যে ভারতীয় কৃষককে "শ্রমজীবীর" মধ্যে গণনা করা হয় নি। কৃষক জমির অধিকারী সে নিজের জমিতে নিজের চাষ করে, অন্যের মজুরি করে না, এই বিবেচনা করেই বোধ হয় কৃষককে শ্রমজীবী সংঘে স্থান দেওয়া হয় নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষক তার জমির মালিক নয়। ইউরোপের কৃষকও তার জমির মালিক নয়।

ইউরোপে যাঁরা জমির মালিক তাঁদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বলপূর্ব্বক জমি অধিকার করে নিয়ে সেই জমির বিজিত অধিবাসীদেকে দাস [Serf] করে তাদের দ্বারা জমির চাষ আবাদ করাতেন। ক্রমে দাস প্রথা উঠে গেল। তাদের স্থানে যারা এখন চাষ আবাদ করে, তারা ঠিকাদার [farmer], জমিতে তাদের কোন স্বত্ব নাই। ভারতে কিন্তু তা নয়। এখানে বন জঙ্গল কেটে পতিত জমি উদ্ধার করে,কৃষক তাতে চাষ আবাদ করে তার স্বত্বাধিকারী হয়। একজন শিকারী যেমন একটা হরিণকে শরবিদ্ধ করলে, সেটা তারই হয়; পরে অন্য শিকারী তাকে শরবিদ্ধ করলে আর তার হয় না, তেমনি জমিরও যে প্রথমে বন কেটেছে জমি তারই হয়। এই প্রথাই পরবর্ত্তী হিন্দু রাজত্বে রাজবিধি বলে স্বীকৃত হয়। তাই মনু বলেন—

"স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্।"

ইউরোপীয় কৃষক সংঘবদ্ধ হয়ে তার অবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করছে। ভারতীয় কৃষক কি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে?

তারিখের শাসন *

(১)

[শ্রীকিরণ শঙ্কর রায়]

শীতের সকাল বেলার মিঠে রোদটি শিশির-ভেজা ঘাসের উপর এসে পড়েছে। দূর চিমনীর নীলাভ ধোঁয়া আকাশের গায় ধীরে রেখা টেনে চলেছে। এমনতর সকালে মনে, এই বলে কেবলি আক্ষেপ হয় যে জীবনটা কেন একটি পরিপূর্ণ আলস্যে কাটিয়ে দেওয়া যায় না। যে কালে জন্মগ্রহণ করা গেছে সে কালে তা একেবারে অসম্ভব। এ হচ্ছে কাজের যুগ, কোন একটা কাজ না করলে লোকে বলবে সময় নষ্ট হচ্ছে। একটা বই নিয়ে বসা গেছল বলা বাহুল্য বইটে Benjamin Franklin-এর জীবন চরিত বা Smiles-এর Self-Help নয়, কিন্তু উঠতে হবে Cowper's letters-এর নোট লিখতে। আজকে সকালে Cowper's letters পড়াটা লঘু পাপে গুরু দণ্ড বলে মনে হচ্ছে।

ছেলেবেলায় পড়েছিলুম "জাড্য-দোষ বড় ভয়ঙ্কর" এবং সেই থেকে শিশুশিক্ষার অনেক বুলির স্যায় ও বুলিটাও লেখকের রচনায়, বক্তার বক্তৃতায় এবং অন্য অনেক স্থানে শুনে আসছি। শুনেছি যে সময়ের যে মূল্য আছে সেটা না জানা থাকাতেই আমাদের দেশের এমন অবস্থা। এত যে উপদেশ শুনলুম তবু যে আলস্যদোষ গেল না, তার কারণ ও দোষ আমাদের মজ্জাগত। আসল কথা ওটা যে একটা দোষ তা স্বীকার করতে আমরা মোটেই রাজী নই।

সময়ের যে একটা মূল্য আছে এটা আমরা আমাদের দেশে মানি নি। না মানাতেই যে ঠকেছি একথা বলতে পারি নে। কারণ, কি জন্য যে ঠকেছি তা ঠিক করতে বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, অর্থনীতিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতির মধ্যে মতভেদ ঘটেছে—কেউ বলেন ম্যালেরিয়া হওয়াতেই দেশের দুরবস্থা, কেউ বলেন ধর্ম্মহীন হওয়াতে এই দুরবস্থা, কেউ বা বলেন দেশের সাহিত্যে এত প্রেমকবিতার প্রাদুর্ভাব হওয়াতেই দেশের এই দুরবস্থা। বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয় আমাদের দেশে এ সব ধারণা ছিল না, অধিকাংশ জীবনের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না ব'লে জীবনটাই

* এই প্রবন্ধটী বহু পূর্ব্বে সবুজপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের অনুরোধে লেখক পুনরায় উহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন।

উদ্দেশ্য হ'ত। তাই তখনকার জীবনের যে নমুনা আমাদের হাতে আসে তাতে Æsthetics-এর চেহারা দেখতে পাই। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সুবাসিত বারিতে স্নান ক'রে, গাত্রে চন্দন লেপন ক'রে, লীলাকমল হাতে নিয়ে রাজ-সভায় গিয়ে বসতেন—সেখানেও পোলিটিক্যাল বাকবিতণ্ডা ছিল না। সেখানে হয়ত কোন নূতন কবি কোন নূতন রচনা পাঠ করবেন। কাজের তাড়া নেই—আবশ্যকের উৎপাত নেই। ভেবে দেখুন দেখি বিংশ শতাব্দীতে এমনতর ঘটনা ঘটতে পারে কি না। ধরুন এই ট্রাম, ছক্কর মোটর গাড়ীতে পূর্ণ কলিকাতা সহরে আমরা চন্দন চর্চ্চিত দেহে লীলাকমল হাতে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট হাউস, বা টাউনহল বা সিনেটহল অভিমুখে যাচ্ছি আমাদের কণ্ঠে ফুলের মালা, শ্রবণে মণিকুণ্ডল, কর্ণমূলে সুবর্ণ বলয়। ধরুন সিনেট হাউসে রবীন্দ্র নাথ তাঁর নূতন কোন কাব্য পাঠ করবেন; তাঁর উচ্চাসনের দুই দিকে রজত দীপাধারে সুগন্ধি তেলের বাতি জ্বলছে, ভেবে দেখুন যদি এমন একটা ব্যাপার সম্ভবও হ'ত তবে সে কি বিসদৃশ হত; এক রবীন্দ্র নাথ ছাড়া সেখানে আমরা সকলেই কেমন বেমানান হতুম। এসব যে এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে তার একটি কারণ হচ্ছে তখন সময় আমাদের ভৃত্য ছিল এখন আমরা সময়ের ভৃত্য। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ জড়-প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়ে কেবল যে জড়-প্রকৃতির দাস হয়েছে তাই নয় সময় নামক না-জড় না-চেতন না-সূক্ষ্ম না-স্থূল এক অদ্ভুত পদার্থের দাস হয়েছে এবং তার ফলে জীবন যাত্রা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে শ্রীহীন হয়েছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভিড় ঠেলে যখন যেতে হবে, তখন গলায় মালা পরাও চলে না, হস্তে বলয় রাখাও চলে না—তখন গায়ে চন্দন লেপন নিতান্তই বাহুল্য কারণ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সে চন্দন থাকবে না। এ সব ইতরতার মূলই হচ্ছে সময়ের যে মূল্য আছে এই জ্ঞান—এবং এ জ্ঞান আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শেই লাভ করেছি।

(২)

সময়ের মূল্যজ্ঞান থেকে আমরা আর একটি গুণের সন্ধান পেয়েছি—সেটির নাম হচ্ছে Punctuality। ইংরেজ বলেন Punctuality is a virtue। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে আমাদের এই পুণ্যলোভাতুর দেশেও পুণ্য-সঞ্চয়ের এত সহজ উপায়টা কারো মনে ইতিপূর্ব্বে আসেনি। সাতটায় সময়ে আসব বলে ঠিক সাতটায় এলেই যে পুণ্য অর্জ্জন করা যায়—এটা দেশের দুরবস্থার আলোচনার সময়ে যতই স্বীকার করি না কেন আমাদের মন তা কিছুতেই মানতে চায় না—তাই ও পুণ্যটার সম্বন্ধে আমরা একেবারে নির্লোভ। কাজের পক্ষে ওটাতে সুবিধা হতে পারে কিন্তু কাজ যে ইচ্ছার চেয়ে বড় এ কথায় সায় দেওয়া কঠিন।

আমাদের বোঝা উচিত যে সময়ের প্রতি এই অভূতপূর্ব্ব শ্রদ্ধা কর্ম্মক্ষেত্রে যতই ফলদায়ক হোক না কেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তা একেবারেই অচল। কি এক কুক্ষণে মাসিক পত্রের আবির্ভাব হ'ল, সম্পাদক বল্লেন যদি বছরে সাড়ে তিন টাকা ক'রে আমাকে দাও তবে প্রতি মাসের ২রা তারিখে আমি সাহিত্য-রস যোগাবার ভার নেব। সেই থেকে সে তারিখে যদি পাঠকদের উক্ত রস যোগান না হয় তবে তাঁরা রাগ করেন। সাহিত্য-বৃক্ষের রস নাববার সময় হলে তা আপনিই বার হবে এই নিয়মই হচ্ছে স্বাভাবিক। মাসিকপত্রের বাঁধা ভাঁড়ের উদর পূর্ণ করবার জন্যে তারিখে তারিখে তাকে যে রস বার কর্ত্তেই হবে এ অপমান যেন সে কোন দিন স্বীকার না করে। তারপর গরজ কার, যে রসভিক্ষু তার, না যে রস যোগাবে তার? যদি স্বয়ং সম্রাটও হুকুম দেন যে এই শীতের সকালে অশোকমঞ্জরী ফুটে উঠুক—তবে সে কি ফুটবে? বসন্তের হাওয়া চাই, ভ্রমরের গুঞ্জন চাই, সুন্দরীর চরণ-স্পর্শ চাই তবে না সে দেখা দেবে? সবুজপত্রের আর কোন গুণ থাক্ আর না থাক্ একটি এই মহাগুণ আছে যে তা ধার্য্য তারিখে বার হয় না।

তাই বলছি, আমরা যারা কাজের হুকুম মানিনে, এস দল বেঁধে আজ মহাসমারোহে আলস্যকে রাজসিংহাসনে বসাই—বৃদ্ধ সময়ের সেখানে নিমন্ত্রণ হবে না। 'জয় হে আলস্য—উদার অগাধ আলস্য,—জয় তোমারি জয়—

আমাদের চিত্তে তোমার আসন অটল হোক। যারা সকালে ঠিক ছয়টায় উঠে, দশটায় খেয়ে এবং ন'য়টায় শুয়ে ভাবে জীবনটা বেশ কেটে যাচ্ছে আমরা তাদের কেউ নই। কিম্বা জীবনের স্রোতে যারা সজোরে নৌকা বেয়ে পণ্য নিয়ে বন্দরের দিকে ছুটে চলেছে আমরা তাদেরও কেউ নই; নদীর স্রোতে আমরা আমাদের নৌকা ভাসিয়েছি—শুধু ভেসে যাওয়ার আনন্দে। উপরে আকাশে নির্ম্মল স্নিগ্ধ প্রভাত আসে, নিস্তব্ধ দুপ্রহর আসে, বেদনার মধ্যে রঙীন উদাস সন্ধ্যা আসে, তারায় ভরা রাত্রি আসে, যারা ঘরে যাবার তারা ঘরে যায়—আর আমরা—আমরা কোথায় যে ভেসে যাই তা আমরাই জানি না। চোখে যে কিসের নেশা লাগে বলতে পারি না—বুকে যে কিসের ব্যথা জাগে বোঝাতে পারি না। তোমরা কাজের লোক তোমরা ধিক্কার দাও, হিতৈষীরা আশা ছেড়ে দেন, গুরুজনেরা ভৎর্সনা করেন কিন্তু আশা আছে একদিন পারের নাগাল পাবই। এতদিন যে ভুলিয়ে বেড়াল তার দেখা পাবই—কোন এক শুভ্র উষায় দক্ষিণে হাওয়ায় এই ছোট্ট তরী তার ঘাটে পৌছিয়ে দেবে—তখন সমস্ত জীবনের নিষ্ফলতা বেদনা তার সামনে ধরে বলব,

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা
নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেছে ঢালা
পিয়ো হে পিয়ো!
তোমারি লাগিয়া এরে বুকে কয়ে'
বহিয়া বেড়ানু সারারাতি ধরে,
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয়!
রোদনের রঙে লহরে লহরে
রঙ্গীন হোলো
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো গো তোলো!

শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ঐতিহাসিক যুগ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী]

এক্ষণে আমাদের ভারতীয় শাসন শৃঙ্খলার ও সামরিক শৃঙ্খলার আভাস প্রদান করিতে হইবে। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শাসন সময়ে গুপ্তসাম্রাজ্যে ও হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে যেরূপ শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত ছিল তাহা শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শাসন তাঁহার সচিব কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থশাস্ত্র শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিকাশ। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। স্মিথ সাহেব তৎপ্রণীত ইতিহাসে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শাসন সম্বন্ধীয় যে বিবরণ প্রকট করিয়াছেন, মেগাস্থিনিস্ যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত অর্থশাস্ত্রীয় বিধানের সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান। অর্থশাস্ত্রীয় বিধানের সহিত ভারতীয় শাস্ত্রীয় বিধানেরও সাম্য সবিশেষ স্ফুট। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের শাসন প্রণালীর ভিত্তি ভারতীয় শাস্ত্রে। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের 'চতুরঙ্গবল' দেখিতে পাই। চন্দ্রগুপ্তের স্থায়ী সৈন্য [Standing army] ছিল, ভারতীয় বিধানই এইরূপ। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, "It was not a militia, but standing army, drawing liberal and regular pay,, and supplied by the Government with horses, arms, equipment and stores."

মহাপদ্মনন্দের ৮০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক, ৮,০০০ রথী এবং ৬,০০০ হস্তী ছিল, চন্দ্রগুপ্ত [মৌর্য্য] সৈন্যসংখ্যা আরও বাড়াইয়াছিলেন। তাঁহার ৬০০,০০০ পদাতিক ও ৩০,০০০ অশ্বারোহী ৯,০০০ হাজার হাতী ও অনেক রথ ছিল। প্রত্যেক রথে চালক ব্যতীত চারিজন সৈন্য থাকিত। ৯০০০ হস্তীতে ৩৬০০০ হাজার সৈন্যও ছিল। মহাপদ্মনন্দের ৮০০০ রথ ছিল। চন্দ্রগুপ্ত আরও বাড়াইয়াছিলেন। স্মিথ সাহেব, ২৪০০০ রথী ছিল, এরূপ মনে করিয়াছেন এবং সর্ব্বসাকল্যে চন্দ্রগুপ্তের সেনা বিভাগে ৬৯০,০০০ সৈন্য ছিল এরূপ স্থির করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন পরিচারক ও সঙ্গীদলও ছিল। খৃষ্টীয়ষোড়শ শতাব্দেও [১৫০৯—৩০] বিজয় নগরের মহারাজা কৃষ্ণদেবের ৭০০,০০০ পদাতিক সৈন্য ৩২০০০ অশ্বারোহী ও ৫৫১ হস্তী ছিল। এসম্বন্ধে স্মিথ সাহেবের ইতিহাসের ১২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অন্ধ্র রাজ্যেরও ১০০,০০০ পদাতিক, ২,০০০ অশ্বারোহী ও ১,০০০ হস্তী ছিল। [স্মিথ সাহেব কৃত ইতিহাসের ১২৪ পৃঃ ফুটনোট দ্রষ্টব্য] চন্দ্রগুপ্তের সৈন্য-বিভাগ অতি সুচারুরূপে শাসিত হইত। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন, "The formidable force at the disposal of Chandragupta * * was controlled and administered under the direction of a war office organised on an elaborate system: A commission of thirty members was divided into six boards, each with five members, to which departments were severally assigned as follows: Board No I in co-operation with the admiral—Admiralty. Board No. 11—Transport, commissariat and army service, including the provision of drummers, grooms, mechanics, and grass-cutters. Board No. 111— Infantry. Board. No. IV—Cavalry. Board. No.V—War Chariots. Board. No. V1— Elephants E. H. 1. P. P. 124.

অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের অধীনস্থ প্রবলবাহিনী, সমর সংসদ দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত হইত। এই সমর সংসদ সুশৃঙ্খলায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ত্রিশজন সদস্যে এই সংসদ্ গঠিত। এই সংসদ্ ছয় বিভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক বিভাগে ৫জন সদস্য ছিল।

নিম্ন প্রকারে প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যাবলী নিয়মিত ছিল। ১ম বিভাগ—নৌবিভাগ, ২য়—রসদ ও রসদ বহন, সৈন্যনিয়োগ এবং বাদক দলের, সহিস্ সমূহের, যন্ত্রকার-দিগের ও ঘাস সংগ্রহকারী সমূহের.........সংস্থান, দ্বিতীয় বিভাগের কার্য্য। তৃতীয় বিভাগ—পদাতিক, ৪র্থ বিভাগ—অশ্বারোহী, ৫ম বিভাগ—সমর রথ এবং ষষ্ঠ বিভাগ—হস্তী আরোহী সৈন্যের কার্য্য ন্যস্ত ছিল।" চন্দ্রগুপ্তের এই সমর সংসদ ভারতীয় বিধির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মহা-ভারতীয় যুগের চতুরঙ্গ বলই তাঁহার সৈন্য বল, এই প্রতিষ্ঠান যে সম্পূর্ণ ভারতীয় তাহা স্মিথ্ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন,—"The military organization of Chandragupta shows no trace of Hellenic influence. It is based upon the ancient Indian model." P. P. 137.

অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্তের সামরীক প্রতিষ্ঠানে কোনওরূপ গ্রীক্ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রতিষ্ঠান প্রাচীন ভারতের আদর্শে গঠিত। স্মিথ সাহেব চন্দ্রগুপ্তের সৈন্য-শৃঙ্খলায় নৌবিভাগের পত্তনকে তাঁহার আবিষ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "All Indian armies had been regarded from time immemorial as normally comprising the four arms, cavalry, infantry, elephants and chariots and each of these arms would naturally fall under the control of a distinct authority; but the addition of co-ordinate supply and admiralty departments appears to be an innovation due to the genius of Chandragupta." E. H. I. P. P. 124.

অর্থাৎ স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতীয় সৈন্য চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। অশ্বারোহী, পদাতিক, হস্তী সৈন্য ও

রথারোহী এবং ইহার প্রত্যেক বিভাগের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই কর্তৃপক্ষের আবশ্যকতা। কিন্তু রসদবাহী বিভাগ ও নৌবিভাগ চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভার আবিষ্কার বলিয়াই প্রতীতি হয়, আমাদের মতে নৌবিভাগ চন্দ্রগুপ্তের আবিষ্কার নহে, মনু নৌসৈন্যের বিধান দিয়াছেন। মনু বলিতেছেন,—

"স্যন্দনাশ্বৈঃ সমেযুধ্যেদনূপে নৌ দ্বিপৈ স্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসি চর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে॥"

মনু ৭অ।১৯২

মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথিভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অগাধোদকেতু-নৌভিঃ।" বাস্তবিক নদনদী সমন্বিত ও সমুদ্রমেখলা ভারতে নৌসৈন্য না থাকিলে যুদ্ধ এক প্রকার অসম্ভব হইত, অর্থশাস্ত্রেও দেখিতে পাই "নাবধ্যক্ষ" ও নৌসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীও রহিয়াছে। অর্থশাস্ত্রে রাজকীয় জাহাজে আগমনকারীগণের আবশ্যক ভাড়া দিবারও বিধান রহিয়াছে। দুর্গ সান্নিধ্যে গমনকারী জাহাজের পরীক্ষা করিবার বিধান এবং হিংস্রিকা বা দস্যুজাহাজও শত্রুরাজ্যে গমনশীল জাহাজ বিনাশের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। পূর্ব্ব হইতে এরূপ বিধান ছিল বলিয়াই এইরূপ বিধানের সম্ভব। ইহা নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কারণ এই বিধানগুলি চাণক্য শাস্ত্র হইতে সংকলন করিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের বিধান এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

"নাবধ্যক্ষ,। নাবধ্যক্ষ সমুদ্রগামী জাহাজ, ও যে সকল জাহাজ নদীমুখ, স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক হ্রদ ও স্থানীয় সুরক্ষিত দুর্গের নিকটবর্ত্তী নদীতে গমনাগমন করে তাহাদের হিসাব পরীক্ষা করিবেন। সমুদ্রতীরস্থ ও নদী ও হ্রদের নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল নির্দ্ধারিত শুল্ক প্রদান করিবে। * * * বণিকগণ পত্তনে [Port town] তাহাদের নির্দ্ধারিত শুল্ক প্রদান করিবে। রাজকীয় জাহাজে আগত যাত্রীগণ আবশ্যক ভাড়া দিবে, যাহারা শঙ্খ ও মুক্তা সংগ্রহে রাজকীয় নৌকা ব্যবহার করিবে তাহারা আবশ্যক ভাড়া দিবে; অথবা তাহারা নিজ নিজ নৌকাও ব্যবহার করিতে পারিবে। নাবধ্যক্ষ পণ্য পত্তনে প্রচলিত রীতিনীতি অবধান করিবেন এবং পত্তনাধ্যক্ষের আদেশ প্রতিপালন করিবেন। পণ্যপত্তনে যখন কোনও বাত্যাহত জাহাজ উপস্থিত হইবে তখন পত্তনাধ্যক্ষ তাহাকে পিতার ন্যায় অনুগ্রহ দেখাইবেন। যে সকল জাহাজের পণ্য জল দুষ্ট হইয়াছে তাহাদের শুল্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। অথবা অর্দ্ধেক শুল্ক লইয়াই তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল জাহাজ গন্তব্য পথে কোনও বন্দরে অল্পক্ষণের জন্য অবস্থিতি করিবে, তাহাদিগকে শুল্ক প্রদানে অনুরোধ করিতে হইবে।

হিংস্রিকা [দস্যু জাহাজ piratical vessel] ও যে সকল জাহাজ শত্রুর রাজ্যে যাইতেছে এবং যে সকল জাহাজ পণ্যপত্তনে প্রচলিত নিয়মাবলি পালন করে নাই, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে হইবে।"

অর্থশাস্ত্র পৃঃ ১৩৭—১৩৮
[যোগীন্দ্র বসুর অনুবাদ]

অর্থশাস্ত্রের এই বিধান দৃষ্টে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় চন্দ্রগুপ্তের বহু পূর্ব্ব হইতেই নৌবিভাগের পত্তন হইয়াছিল। দস্যু-জাহাজ বিনষ্ট করিতে হইলে নৌসেনার আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার্য্য। "রাজকীয় জাহাজ বলিতে নৌবিভাগীয় জাহাজই প্রতীয়মান হয়। বহু পূর্ব্ব হইতে নৌবিভাগের পত্তন না হইলে ঐরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। রসদ বাহী বিভাগ [Transport commissariat etc] সম্বন্ধে স্মিথ সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন ভারতে যুদ্ধের যেরূপ প্রবলতা ছিল, যে দেশে একটা জাতি কেবল যুদ্ধ ব্যবসায়ী, যে দেশের সৈন্য সংখ্যা ক্ষুদ্র রাজ্যেও এত অধিক, সে দেশে রসদবাহী বিভাগ স্থাপন মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময় হইয়াছিল ইহা আদপেই হইতে পারে না। সেকেন্দরের ভারত আক্রমণ সময়ে পুরু ও অন্যান্য যে সকল জাতি তাঁহার গতিরোধে কৃত সংকল্প হইয়াছিল, তাহাদের সৈন্য সংখ্যা বিপুল। চতুরঙ্গবল তাহাদের সকলেরই ছিল। সৈন্যেরা দূরদেশে গিয়াও যুদ্ধ করিত।

এমতাবস্থায় রসদ বহন প্রভৃতির জন্য বন্দোবস্ত ছিল না, ইহা আদপেই সম্ভব নহে। স্মিথ সাহেবও বলিয়াছেন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া সমর অভিযান করিত। যাহারা যুদ্ধ প্রিয় তাহাদের পক্ষে রসদবাহী বিভাগ না থাকা কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। এস্থলে স্মিথ সাহেবের অনুমান ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়। মনু ছয় প্রকারের বলের উল্লেখ করিয়াছেন। মনু বলিতেছেন,—

"সংশোধ্য ত্রিবিধং মার্গং ষড়্‌বিধংচবলং স্বকম্।

সাংপরায়িক কল্পেন যায়াদরিপুরং শনৈ: ॥" ৭।১৮৫ মনু

মনু কথিত এই 'ষড়্‌বিধং বলং' চন্দ্রগুপ্তের ছয় বিভাগীয় বলের সহিত মিলিয়া যায়। বিশেষতঃ জলে নৌযুদ্ধের ব্যবস্থাও মনু দিয়াছেন, ত্রিবিধ মার্গ শোধন করিতে বলিয়াছেন।

এই ত্রিবিধ মার্গ ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের মতে "জাঙ্গল, আনূপ ও আটবিক।" আনূপ শব্দের অর্থ জলপ্রায় অর্থাৎ জলময়। নৌসেনার বন্দোবস্ত না থাকিলে ইহার সম্ভাবনা হইতে পারে না। ছয় প্রকারের বল বলিতে কর্ম্মচারীগণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, এই কর্ম্মচারীগণই রসদ ও রসদবাহী বিভাগ, ভাষ্যকার মেধাতিথি ও ষড়্‌বিধ বলের মধ্যে "কোশ কর্ম্ম করাত্মকং * * * বলং" বলিয়া, কর্ম্মচারীবর্গকে সৈন্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মৃত সৈন্যের পারিবারিক সাহায্য ও বিশেষ কৃতিত্বের পুরস্কার বিহিত হইত। একটা বিশেষ সমর-বিভাগ ব্যতীত ইহার সম্ভাবনা নাই। স্থায়ী সৈন্যগণ যে মাসিক হিসাবে বেতন পাইবে তাহার বিধানও পরিস্ফুট। শুক্রও.........বলিতেছেন। "বাহন বোধাস্তং সততমবীক্ষণং, প্রতি মাসং দ্বিসৌবর্ণিকী বৃত্তিঃ, * * * স্বর্যাতেষু দানমতুক্রোশো, বিদিতেষু-স্বপ্রদানং * * *," অর্থাৎ বাহন ও যোদ্ধাদিগকে সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে। প্রতি মাসে দুইটী সুবর্ণ মুদ্রা বেতন দিবে। কোনও সৈনিক মরিলে তাহার উত্তরাধিকারীগণকে দান ও দেয় বিধান করিবে। অর্থাৎ তৎ পুত্রাদিকে অর্থ সাহায্য প্রভৃতি করিবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধে কৃতকার্য্যতা প্রদর্শন করিবে তাহাকে বেতন হইতে অধিক প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করিবে। এই সকল বিধান দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হয় প্রাচীন ভারতে সমর বিভাগের অভ্যুন্নতি সাধিত হইয়াছিল। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ও তাহার সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সৈন্যবলে বলীয়ান্ হইবার জন্য ভারতীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান অনুসরণ করিয়াছিলেন।

আমাদের বিবেচনায় চন্দ্রগুপ্ত সমর বিভাগে নিজের মৌলিকতা প্রদর্শন করেন নাই। কেবল পূর্ব্বতন ব্যবস্থাগুলিকে কালোপযোগী করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতেও নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই মর্ম্মে প্রশ্ন করিতেছেন, "সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ, প্রবল পরাক্রান্ত, সদচরিত্র সৈনিক পুরুষদিগকে ত যথোচিত সম্মান করিয়া থাকেন? * * সমস্ত রণ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে একজন শাসনাবজ্ঞ যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন না?" এই সকল দেখিলে মনে হয় সমর বিভাগ ভারতীয় অনুশাসনের ফল। মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পাটলিপুত্র নগরের মিউনিসিপালিটির [Municipality] ব্যবস্থা ছিল। স্মিথ্ সাহেব লিখিয়াছেন, "The administration of the capital city, Pataliputra was provided for by the formation of a Municipal Commission, consisting of thirty members, into six boards or committees of five members each." এইরূপ মিউনিসিপ্যালিটির প্রবর্ত্তন ভারতীয় অনুশাসনের ফল। স্মিথ সাহেবও বলিয়াছেন,—অতি প্রাচীন কাল হইতে 'পঞ্চায়েৎ' প্রচলিত ছিল। আভ্যন্তরীণ কার্য্য এই পঞ্চায়েৎ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিত। মিউনিসিপ্যাল সংসদ এই পঞ্চায়েতের বিকাশ মাত্র। (স্মিথ সাহেবের ইতিহাস ১২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) এই............ [Corporation] ছয়টী বিভাগে নিম্ন লিখিত কার্য্য বিভক্ত ছিল। প্রথম বিভাগ—শিল্পকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, শ্রমজীবীগণের বেতন নির্দ্ধারণ, পবিত্র ও আসল জিনিষের উপাদান-রূপে ব্যবহার নিয়মন। পারিশ্রমিক অনুযায়ী দৈনিক কার্য্য সম্পাদন প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রিত করা প্রথম বিভাগীয় কর্ত্তব্য।

শিল্প ও শিল্পীকে রাজকীয় শাসনের অঙ্গরূপে শাসন করা হইত। ইংরাজী ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,

"Nationalization of industrial arts. এই শৃঙ্খলা-দেখিলে জর্ম্মনীর "State Socialism"এর সাদৃশ্য মনে পড়ে। বাস্তবিক ভারতে বহু পূর্ব্ব হইতে 'State Socialism' চলিয়া আসিয়াছে। ইহারই ফলে ভারতীয় সমাজ তন্ত্র এক অভিনব আদর্শ স্থাপন করিতে পারিয়াছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের সময়ে শিল্পী সমূহ রাজকীয় বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিত। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন,—"Artisans were regarded as being in a special manner devoted to the royal service, and capital punishment was inflicted on any person who impaired the efficiency of a craftsman by causing the loss of hand or an eye." অবশ্যই আমরা এরূপ কঠোর শাস্তির পক্ষপাতী নহি। কিন্তু এই বিধান দেখিলে শিল্প বিভাগ যে রাজকীয় জাতীয় শাসনের অঙ্গীভূত ছিল তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। শাস্তির এরূপ কঠোরতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় বিভাগ :—বৈদেশিক অধিবাসীগণ ও অতিথি-গণের সম্বর্দ্ধনাই এই বিভাগের কার্য্য। বর্ত্তমান ইউরোপীয় consul গণ এই কার্য্য করেন। সকল বৈদেশিককে বিশেষ নজরে রাখা হইত। তাহাদিগকে বাসস্থান ও সাহায্যকারী escort এবং আবশ্যক হইলে ঔষধাদি প্রদানেও সাহায্য করা হইত। বৈদেশিকগণের মৃত্যু হইলে যথোচিত ভাবে সৎকার করা হইত। তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি কমি-শনারগণ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন ও প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে প্রদান করিতেন। [স্মিথ সাহেবের ইতিহাস ১২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য] এই বিধান অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। এ বিষয়ে স্মিথ সাহেব যে অনুমান করিয়াছেন তাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তিনি লিখিতেছেন,—"These officials corresponded exactly with the *Proxenoi* and it is possible that Chandragupta borrowed this institution from Greece. But his other arrangements show no trace of Greek influence"

Ibid P. P. 125 F. N.

এবং অন্যত্র ও লিখিয়াছেন,—"The duties of the officers maintained by Chandragupta to attend to the entertainment of foreigners' [Strabo x v. 1, 50—2] were identical with those of the Greek 'Proxenoi', and : it is possible though not proved that the Indian institution may have been borrowed from the Greek."

Ibid P. P. 25, Foot Note.

আমাদের মনে হয় স্মিথ সাহেবের এই অনুমান যথার্থ নহে। কারণ মহাভারতেও বৈদেশিক বণিক প্রভৃতির সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। মহাভারত সভাপর্ব্বে নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিতেছেন "হে রাজন! লাভ প্রত্যাশায় দূর দেশ হইতে সমাগত বণিকগণের নিকট আপনার শুল্কোপজীবী রাজপুরুষেরা ত যথোক্ত শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকে? সেই সকল বণিকেরা ত সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়? এবং ত্বদীয় লোক দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ত পণ্যদ্রব্য আনয়ন করে?"

—মহাভারত, সভাপর্ব্ব—৫ম অধ্যায় :

বণিকগণের সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা থাকে বৈদেশিক অতিথিগণের ব্যবস্থা থাকাই অনুমিত হয়। অর্থ শাস্ত্রেও নাগরক-প্রণিধি [civics] অধ্যায়ে ভ্রমণকারীদিগের সংবাদ স্থানিক বা গোপকে প্রদান করিতে হইবে এরূপ বিধান রহিয়াছে। "ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষগণ কোন ভ্রমণকারী তথায় বাস করিতে আসিলে গোপ বা স্থানিককে সংবাদ প্রেরণ করিবেন" এই গোপই Village accountant. নগরেও দশ, কুড়ি বা চল্লিশটী পরিবারের হিসাব রাখিবার জন্য এক একজন গোপ নিযুক্ত ছিল। সমাহর্ত্তৃ প্রচারেও দেখিতে পাই "স্থল পথে বা জল পথে আনীত বৈদেশিক পণ্যের শুল্ক, বর্ত্তনি [Custom duties etc] প্রভৃতি" নিরূপণ সমাহর্ত্তৃর [Collector General] কর্ত্তব্য। বাস্তবিক প্রাচীন ভারতীয় আতিথেয়তা সমধিক প্রসিদ্ধ। রাজার পক্ষেও এইরূপ বিভাগের প্রবর্ত্তন বিশেষ স্বাভাবিক। যুধিষ্ঠিরের সভায়ও অনেকানেক রাজন্যবর্গকে দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রবক্তই রাজকীয় অতিথি। তাঁহারা যথোচিত

সম্মান সম্বর্দ্ধনার সহিত অবস্থিতি করেন। মহাভারতে দ্রৌপদী যে অতিথিশালা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন তাহাও দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক এই বিধান গ্রীকদিগের নিকট হইতে পরিগৃহীত হয় নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বিধান।

তৃতীয় বিভাগঃ—তৃতীয় বিভাগের হস্তে জন্ম মৃত্যুর তালিকা প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্য ন্যস্ত ছিল। জন্ম মৃত্যুর খবর প্রদান সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। স্মিথ সাহেবের মতে এই তালিকাবলে রাজকর স্থাপনের সুবিধা হইত, ও সম্ভবতঃ প্রত্যেক লোক প্রতি "মাথট" আদায় হইত, তিনি লিখিতেছেন,—"The taxation referred to probably was a poll-tax at the rate of so much a head annually.* আমরা কিন্তু এরূপ 'মাথটের' চিহ্নও অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই না। লোক গণনার ব্যবস্থা পূর্ব্বকালেও ছিল। মহাভারতে দুর্য্যোধন ঘোষযাত্রার সময় গো গণনা করিবার ব্যপদেশে বনভূমিতে যুধিষ্ঠিরাদিকে নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাইতে গিয়াছিলেন, "গো সকলের বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যাদি নিরূপক অঙ্ক প্রদান করিবার" জন্যই দুর্য্যোধন ঘোষ-যাত্রার প্রস্তাব ধৃতরাষ্ট্রের নিকট করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন যে গো সকলের শ্রেণী বিভাগ ও সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহাও মহাভারতে দেখিতে পাই। বনপর্ব্বে ২৩৮ অধ্যায়ে লিখিত আছে—["দুর্য্যোধন তথায় বাস করিয়া শত সহস্র গো সন্দর্শন পূর্ব্বক গণনা ও চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে সম্যক্ বিদিত হইলেন। পরে বৎস সকলকে যথাক্রমে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে দমনাই বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ বালবৎস ধেনু সকলকে গণনা করিলেন। অনন্তর ত্রিবর্ষ বয়স্ক বৃষদিগের সংখ্যা নিরূপণ তৎসমুদায় অঙ্কিত করিয়া গোপালগণের সমভিব্যাহারে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন"] বাস্তবিক যে স্থলে গো গণনা ও চিহ্ন প্রদান রাজকীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত সে স্থলে লোক গণনার সম্ভাবনাই সমধিক।

সৈন্য গণনা ও শৃঙ্খলা মহাভারতে সুস্পষ্ট, অর্থশাস্ত্রের বিধান দেখিলেও মনে হয় কোন রূপ 'মাথটের' ব্যবস্থা ছিলনা। কিন্তু গ্রাম ও নগরের সকল তথ্যই সংগৃহীত হইত, অর্থশাস্ত্রে যে সকল করের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে 'মাথট' (poll-tax) দেখিতে পাওয়া যায় না। নির্দ্ধারিত রাজস্ব, উৎপাদিত শস্যের ষষ্ঠাংশ, সেনাভক্ত (প্রজা কর্ত্তৃক সেনাগণের প্রদত্ত কর), বলি (ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য প্রদত্ত কর), কর (সামন্ত রাজগণ প্রদত্ত কর), উৎসঙ্গ (রাজ পুত্রের জন্মোৎসব জন্য প্রদত্ত কর), পার্শ্ব, পারিহীনিক [পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট শস্যের ক্ষতি পূরণ], ঔপায়নিক [প্রজা প্রদত্ত উপহার], কৌষ্ঠেয়ক [রাজ নির্ম্মিত হ্রদ প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত কর]।

[অর্থশাস্ত্র দ্বিতীয় খণ্ড ১৫শ অধ্যায় ১০৭ পৃষ্ঠা]

এই কর সকলের মধ্যে কোথাও মাথট বা poll tax দেখিতে পাই না, সমাহর্ত্তা বা Callector-General এর কার্য্য প্রণালী দেখিলেও জন্ম মৃত্যু তালিকা দ্বারা মাথট নির্দ্দেশ করিবার কোনও বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থলে আমরা অর্থশাস্ত্রের সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এই রূপ কোনও poll-tax বা মাথটের গন্ধমাত্রও আপনারা পান কি না? "সমাহর্ত্তৃ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গোপ পাঁচটী বা দশটী গ্রামের হিসাব পরিদর্শন করিবেন * গ্রামের সীমা স্থির করিয়া, ভূমি কর্ষিত কি অকর্ষিত, সমভূমি, অম্লভূমি, উদ্যান, শাকসব্জীর উদ্যান, বন, বেদী, দেবমন্দির, পয়ঃ প্রণালী, শ্মশান, ছত্র, জলছত্র, পুণ্যস্থান, পশুচারণ ভূমি, রাজ পথ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম, ক্ষেত্র, বন, রাজপথের সীমানির্দ্দেশ করিয়া তিনি দান, বিক্রয় এবং যে সকল ক্ষেত্র রাজকর প্রদানে অব্যাহতি পাইবে তাহা তালিকাভুক্ত করিবেন।

গৃহগুলি কর প্রদান করে, কি রাজকর হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক তিনি প্রত্যেক গ্রামের চতুর্ব্বর্ণের অধিবাসীর সংখ্যা, প্রত্যেক গ্রামের কৃষক, গো পালক, বৈদেহক, কারিকর, শ্রমিক, ক্রীতদাস, দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ জন্তুর সংখ্যা

* মনুও বলিয়াছেন, "গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশ গ্রামাধিপতং তথা বিংশতি শতেশংচ সহস্র পতিমেবচ" বিষ্ণুও বলিয়াছেন, "তত্রস্ব গ্রামাধিপান্ কুর্য্যাৎ দশাধ্যক্ষনিতি।"

তালিকাভুক্ত করিবেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক গৃহ হইতে কি পরিমাণে সুবর্ণ, বিষ্টি, শুল্ক এবং দণ্ড সংগৃহীত হইতে পারে তাহাও নির্দ্ধারণ করিবেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি প্রত্যেক গৃহস্থ যুবা ও বৃদ্ধের সংখ্যা, তাহাদের চরিত্র, জীবিকা এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখিবেন। এই প্রকারে স্থানিক জনপদের চতুর্থাংশের বিবরণ তালিকাভুক্ত করিবেন।"

অর্থশাস্ত্র ১৫৬ পৃঃ দ্বিতীয় খণ্ড ৩৫ অধ্যায়।

এ স্থলে জন সংখ্যার অনুপাতে মাথটের উল্লেখ নাই। গৃহস্থের যে পরিমাণে জমি জমা আছে তদনুরূপ কর নির্দ্ধারণের ব্যবস্থাই পরিস্ফুট, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুর সংখ্যা নির্দ্দেশ কখনই মাথটের জন্য নহে, বরং উহাকে মহাভারতের প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়।

নগরের বিধানেও এইরূপ কোনও করের উল্লেখ নাই, সে স্থলেও জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির তালিকা প্রস্তুত করিবার বিধান রহিয়াছে।

"সমাহর্ত্তর ন্যায় নাগরক নিজ নগরের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিবেন, এক জন গোপ দশটী পরিবারের, কুড়ি পরিবারের বা চল্লিশটি পরিবারের হিসাব রাখিবেন। এ সকল পরিবারের প্রত্যেক স্ত্রী পুরুষের জাতি, গোত্র, নাম এবং ব্যবসায় ব্যতীত তাহাদের আয় ব্যয়ের পরিমাণও অবগত থাকিবেন।" নগরেও জন সংখ্যার হিসাব রাখিবার বিধান আছে। কিন্তু কোনও কর ধার্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাই না। বিশেষতঃ এইরূপ কর ধার্য্য করা ভারতীয় বিধানে কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। অধিকন্তু অতিরিক্ত কর গ্রহণ শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,—'অন্যায়েন নৃপো রাষ্ট্রাৎ স্বকোশংযোঽভিবর্দ্ধয়েৎ। সোঽচিরাদ্বিগতশ্রীকো নাশমেতি সবান্ধবঃ॥ প্রজাপীড়ন সন্তাপ সমুদ্ভূতো হুতাশনঃ। রাজ্ঞঃ শ্রিয়ং কুলং প্রাণাননদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন ;—

"অন্যায়েন হি যো রাষ্ট্রাৎ করং দণ্ডং চ পার্থিব! শস্যভাগং চ শুল্কং চাপ্যাদদীত স পাপভাক্॥"

এবং আরও বলিয়াছেন,—

"এবং প্রবর্ত্ততে যস্তু লোভংত্যক্ত্বা নরাধিপঃ, তস্য পুত্রাঃ প্রজায়ন্তে রাষ্ট্রং কোশশ্চবর্দ্ধতে"॥

মহাভারতেও দেখিতে পাই,—

"ধর্ম্মার্জ্জিতো মহাকোশো যস্য স্যাৎ পৃথিবীপতেঃ"। সোঽত্যন্ত প্রবরোঽপ্যত্র পৃথিবীমধিতিষ্ঠতি"॥

যড় ভাগই রাজার প্রাপ্য। অর্থশাস্ত্রে যে কয়েক প্রকার করের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে "কৌষ্ঠেয়ক" রাজ নির্ম্মিত হ্রদ প্রভৃতির জন্য কর। উহা Irrigation tax. অন্যান্য কর সম্বন্ধে খাজনা বা কর বিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হইবে। এই সকল কারণে মনে হয় আদম সুমারী কর ধার্য্যের জন্য বিহিত হয় নাই, শাসন শৃঙ্খলার অপূর্ব্ব বন্দোবস্তের ফলেই প্রাচীন ভারতে ঐরূপ বিধান কার্য্যকরী হইয়াছে।

সুজাতা
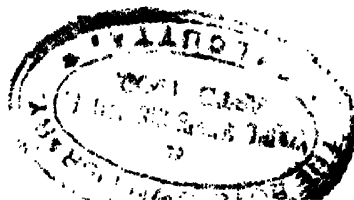
[শ্রীপ্রবোধকান্ত বসু]

গভীর রজনী,

অন্ধকারে স্তব্ধ সুপ্ত সকল ধরণী
যেন কোন্ পুত্রহারা জননীর মত
মূর্চ্ছায় পড়িয়া আছে। তারা লক্ষ শত
চেয়ে আছে অনিমেষ তারি মুখ পানে
যেন চাহে পড়িবারে তার দু'নয়নে
কি ভাষা উঠেছে ফুটি গভীর গোপন!
—হেনকালে অর্থহীন কিসের বেদন
বাজিল পরাণে তব?—কোনকালে যার
পাও নাই কোন পরিচয়, হে কুমার
তারি তরে বাহিরিয়া এলে? শয্যা'পরে
এখনো ঘুমায় প্রিয়া দু'মৃণাল করে
বক্ষ মাঝে শিশুটিরে ধরিয়া আঁকড়ি,
—উজ্জ্বল নিচোলবাস বক্ষ হতে সরি
খলিয়া পড়িয়া গেছে। এখনো অধরে
স্বপনের মৃদু হাসি; কপোলের পরে
লজ্জার অরুণ আভা। শয়ন-শিয়রে
সৌরভে জ্বলিছে দীপ, স্বর্ণ আভা তার
ছড়ায়ে পড়েছে গৃহে; মণিময় হার
কোমল কণ্ঠের পরে উঠেছে জ্বলিয়া
আহতা ফণীর মত।—রয়েছে ফলিয়া
তারি আলো মুক্তবন্ধ কাচুলির পরে

থরে থরে

নিবিড় কুন্তলরাজি কপোলের কাছে
ছড়াইয়ে আছে।

হেন রাত্রিকালে

অসীম আনন্দ মাঝে হৃদি অন্তরালে
কি ব্যথা বহন করি এলে বাহিরিয়া!
—প্রাণপ্রিয় পত্নীপুত্র রহিল পড়িয়া
পশ্চাতের অন্ধকার তলে! শুনিলে কি
উন্মুক্ত আকাশ ভ'রে নক্ষত্রের সে কি
ব্যাকুল আহ্বান?—কিম্বা এই পৃথিবীর
বিদীর্ণ আঁধার বক্ষ হতে যে গভীর
ক্রন্দন উঠেছে ধ্বনি' বাতাস ভরিয়া
তারি সুর রক্তে তব প্রবেশ করিয়া
ব্যাকুল করিল তোমা' অজানিত টানে!
—অর্দ্ধরাতে জাগি উঠি তাই দু'নয়নে
তন্দ্রা নাহি আর।

আজ স্বপনের প্রায়

অতল বিস্মৃতি গর্ভে কোথায় মিলায়
গর্ব্বোজ্জ্বল সিংহাসন, রাজকার্য্য সব
—অন্ধকারে ক্ষণিকের দীপ্ত মহোৎসব!
কোথা আজ ব্যর্থতার শত কলরব
জীবনের লক্ষ কোলাহলে?—ডুবে যায়,
ডুবে যায় কোথা কোন তিমিরেতে হায়
মহৈশ্বর্য্য, রক্তযুদ্ধ, অসি ঝনংকার
মৃতের স্তূপের পরে জয়ের চিৎকার
পিশাচের অট্ট হাসি সম! অতীতের
সকল উজ্জ্বল আলো নিভে নিমেষের
কোন্ ঝঞ্ঝাঘাতে? এক নব শিহরণ

প্রাণমন

আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে অজানা বিস্ময়ে
মৌন পরিচয়ে।

সুপ্ত রাজপুর

উৎসবান্তে শব্দহীন কপিলাবস্তুর
ঘরে ঘরে নিভে গেছে দীপ। চারিধার
ব্যাপিয়া বিরাজে এক বিরাট আঁধার

অতল রহস্য বুকে।—এ গভীর রাতে
হে সুজাতা, দেখিলে কি আকাশের পাতে
ছায়াপথে লেখা কি সে করুণ কাহিনী!
পুঞ্জীভূত মেঘসব নিয়ে যায় বাণী
ছুটে যায় উল্কাবেগে বাধাবন্ধ হারা
কাননে, কান্তারে, শৈলে,—পাগলের পারা!
—তাই তুমি সুপ্তি হতে উটিয়াছ জেগে।
অন্তর হয়েছে পূর্ণ দুঃসহ আবেগে।
ভাষাহীন তারি কিগো প্রকাশ বেদনা
তোমারে অধীর করে? যে সুর অজানা
চঞ্চল শিরায় তব দিয়েছে গো দোল
রেশ তারি বক্ষে তব অনন্ত কল্লোল
করেছে সৃজন। তাই আজ অন্ধকারে
নির্ব্বাক চাহিয়া আছ দিগন্তের পারে,
—যেখানে তোমারি মত অব্যক্ত গুঞ্জন
না পারিয়া টুটিবারে সকল বন্ধন
গুমরি উঠিছে কোন্ অজানা ব্যথায়!
জান না হৃদয় তব কারে আজ চায়
তবু তারি লাগি শুধু অশান্ত ক্রন্দন
থাকি থাকি উঠে উচ্ছ্বসিয়া!—যেই ধন
চাহ তুমি,—তার বিশ্বে পেলে না সন্ধান,
তব প্রাণ
কাঁদিয়া উঠিল তাই, হে মহা বৈরাগি,
সুদূরের লাগি।
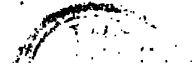
দ্বিতীয় পক্ষ

[শ্রীমোহিনী মোহন মুখোপাধ্যায়]

সে? সে আবার বিয়ে করবে? কেন, আমাকে কি তার পছন্দ হয় না? সেই দশ বছর বয়েসের সময় কপালে সাদা চন্দনের চিত্র এঁকে গোলাপী চেলী পরে একটা মধুর প্রভাতে যখন তার হাত ধরে শ্বশুর বাড়ীর নারী-পরিবৃত প্রাঙ্গনে গিয়ে দাঁড়ালুম, তখন সকলেই আমার ঘোমটা খুলে লজ্জা রাঙ্গা মুখখানি দেখে বলেছিলেন, 'বাঃ! দিব্যি বউ হয়েছে! বেশ ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটী! আহা, কি সুন্দর চাউনিটি! ঠিক যেন কচি ফুলটা!' তারপর স্বামীর সঙ্গে প্রায় আড়াই বছর কেটে গেছে, কত ভাবে কত রকমে তাঁর হৃদয়খানি বুঝে নিয়েছি, কিন্তু আজ যখন আমার ছোট ভাই চারু একখানা লাল চিঠি এনে আমায় বললে, 'এই দেখ, দিদিমণি, মুখুয্যে মশাইএর পরশু বিয়ে। দিদিমণি, আমি তোমার সঙ্গে নিমন্ত্রণে যাবো, আমায় নিয়ে যাবে ত?'

এর মধ্যে যে একটু কথা ছিল। এই আড়াই বছর কাল আমার বেশীর ভাগ সময় বাপের বাড়ীতেই কেটে গেছে। ছেলে বেলায় মা হারিয়ে ঠাকুর মাকেই 'মা' বলে জানি। আমার বাবা দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে করলেও তিনি আমার মার মোহময় স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেননি। আমার মাকে নাকি খুব সুন্দরী দেখতে ছিল। তাই বাবা যখনি আমার দিকে চেয়ে দেখেন, তখনি বুঝতে পারি যে একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসে তাঁর জীবনের অন্তঃস্থলটা পর্য্যন্ত আলোড়িত হয়ে ওঠে। তাই যখনি যে আবদার করেছি, তখনি তা পুরোমাত্রায় পূর্ণ হয়ে গেছে। বাপের বাড়ীতে সকলেই আমার অনুরাগী ছিল। কিন্তু

আমার বৈমাত্র বোন ছিল দুটী,—তারা বড় হয়ে উঠছে, তাদের বিয়ের ভাবনাতেই বাবা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছেন। এমন অবস্থায় তিনি আমার আর শ্বশুর বাড়ীতে তত্ব করতে পারতেন না। কিন্তু যিনি আমার মাতৃহীন স্বামীকে ছেলে বেলা থেকে মানুষ করেছিলেন—সেই খুড়শাশুড়ী কিছুতেই এ ত্রুটী সহ্য করতে পারতেন না। আমার স্বামীর তথনো পঠদ্দশা, মাথার উপর খুড়ীমা ছাড়া আর কেউ নেই, তাই আমার বাপকে এমন নির্য্যাতিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল।

দুবার শ্বশুরবাড়ী ছিলুম—মোট সাড়ে তিন মাস। স্বামীর পড়া শুনার ক্ষতি হবে বলে খুড়ীমা আমায় সেথানে রাখতে চাইতেন না, আর আমারও বাপের বাড়ীর জন্য ভারি মন কেমন করতো। তাই যথন বাবা খুড়ীমাকে গিয়ে বললেন, 'বেয়ান, এবার একবার অমলাকে নিয়ে যাই, মা-মরা নাতনীটির জন্য ওর ঠাকুমা বড়ই কান্নাকাটি করেন।' খুড়ীমা গম্ভীরমুখে বললেন, 'তা বেশ ত, নিয়ে যাও বেই একেবারে, আবার ঘর করবার জিনিষ পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিও। নইলে বউকে পাঠাতে হবে না।' বাবা ছিলেন নিতান্ত ভাল মানুষ; তিনি আমায় নিয়ে এসে ঠাকুমাকে সব কথা বললেন। ঠাকুমা আমায় চুমু খেয়ে বললেন, 'আহা, সোণার মেয়ে মুথ ঝামটা থেয়ে যেন শুকিয়ে গেছে।'

স্বামী প্রায়ই আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে আসতেন। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা কথনো ভুলবোনা। পরের কাছে ঘাড় নোয়াতে তিনি জানতেন না। আমায় তিনি সর্ব্বস্ব দিয়েই ভাল বাসতেন। আমার কাছে কথনো কোন বিষয় লুকানো তাঁর স্বভাব ছিল না। শ্বশুর বাড়ীতে কত অকর্ম্ম করে ফেলেছি, তিনি সে সব নিজের নামে চাপিয়ে দিয়ে আমায় বকুনি থেকে অম্লান মুথে বাঁচিয়েছেন; খুড়ীমা আমায় কত বকতেন, কিন্তু আমার হৃদয়-দেবতা নিশীথের নীরব আঁধারে আমায় বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলতেন, 'অমু, আজ কথা কইছ না যে? খুড়ীমা বুঝি বকেছে? ছিঃ, বকলে মন থারাপ করে থেকো না লক্ষীটি, তা হলে আমারও বড় কষ্ট হবে।' আমি বলতুম, 'না গো না, কেউ বকেনি তোমার অমুকে।' তিনি আবার জিজ্ঞাসা করতেন, 'তবে তোমার মুথে হাসি নাই কেন?' আমি বলতুম, 'হাসি কি অত সস্তা গা?' কিন্তু আমায় হাসতেই হতো, নইলে সেদিনকার ঝগড়া মিটতো না। আমি বাপের বাড়ী এলে ঘন ঘন তাঁর চিঠি আসতো—অনুরাগভরা, সকরুণ, অশ্রুসজল তাঁর মনের ভাবটী সে-সব চিঠির ছত্রে ছত্রে আঁকা আছে। আমি তাঁর কাছে থাকলে তিনি পড়াশুনা কিছুই করতেন না, অথচ পরীক্ষার সময় সব মেডেল ও স্কলার-শিপ্‌গুলোই নিজে দখল করতেন। আমি ভারি আশ্চর্য্য হয়ে যেতুম। তিনি হেসে বলতেন, 'অমু, তোমার প্রেমের জোরে পেয়েছি। তোমার মুথের দিকে একবার চাইলে যে কেবলই চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। তুমি যে বড় ছোট্ট—তাই এত ভালবাসি।' আমার নাম দিয়েছিলেন—'কচি ফুলটী'। ঐ নামে ডাকলে আমি কিন্তু ভারি চটে যেতুম। আমার বিয়ে হয়ে গেছে, এথনও আমি 'কচি ফুলটী'? আমায় রাগিয়ে দেবার জন্য তিনি আবার বলতেন, 'আচ্ছা, এইবার থেকে তোমার নাম রইলো—পাকা ফলটী। কেমন, হলো ত?' নাইতে গেলে ছাতের উপর থেকে তাঁকে গোপনে ঢিল ছুঁড়ে মারতুম, ছুটীর দিনে তিনি যথন নির্জ্জন ঘরে পড়াশুনা করতেন—আমি নিঃশব্দে গিয়ে সশব্দে তাঁর বই মুড়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত তাঁর সর্ব্বাঙ্গে পড়ে যেতুম, তিনি শুধু হাসতেন। কিন্তু সর্ব্বদাই ভয় হত—পাছে খুড়ীমা টের পান। একদিন তিনি সরোষে বললেন, 'আচ্ছা বউ, তোমার কি একটু আক্কেলও নেই, বাছা? দিনের বেলা, সংসারের কাজ কর্ম্ম সব থইথই করছে, আর তুমি কোন্ মুথে বিমলের ঘরে গিয়ে এথন গোল করছো? কি পুরুষঘেসা বউ গা—কেন, একবার কি রান্নাঘরে যেতে নেই? লজ্জাসরমও কি নেই, বাছা?' ছি ছি ছি, আমার সে-সব কথা শুনে মরে যেতে ইচ্ছা হতো। রাগটা শেষে গিয়ে পড়তো তাঁরই উপর কিন্তু তিনি খুড়ীমার মুথের উপর কথনো কোনও কথা বলতে সাহস করতেন না।

আজ যখন চাকর হাত থেকে এই অদ্ভুত নিমন্ত্রণ পত্রখানা গোপনে নিয়ে দেখলুম, তখন দেখি তাতে এই কয়টী কথা লেখা আছে—

"শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আগামী ৬ই আষাঢ়, শনিবার আমার কন্যা শ্রীমতী বীণাপাণী দেবীর সহিত রাইপুর নিবাসী শ্রীমান্ বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের শুভ-বিবাহ হইবে।" ইত্যাদি। আর পড়তে ইচ্ছা হলোনা। পত্রখানা টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ছাতে গিয়ে দক্ষিণ বাতাসে উড়িয়ে দিলুম। বুকের ভিতর যেন কেমন করতে লাগল। উপরে ঠাকুরমার ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে মেঝের পড়ে কাঁদতে লাগলুম। শুধু মনে হল—এতদূর? পুরুষকে বিশ্বাস নেই। আমাকে এতদিন সে যা বলেছে, সব মন যোগানো কথা।

২

সত্যিই সে নাকি বিয়ে করবে। আমার শ্বশুরবাড়ীর একটা পুরাণো চাকর আজ আমাদের বাড়ী এসেছে। সে আমাদের চাকরের কি-রকম কুটুম্ব। ঠাকুরমা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হাঁ ছিদাম, তুমি রঘুনাথের কি রকম কুটুম গা?'

সে বাঁকুড়া অঞ্চলের লোক। তার কথাগুলা কি রকম অদ্ভুত ধরণের। সে নাদুস্নুদুস পেটটী দুলিয়ে বললে, 'তা জাননা, গিন্নিমা? রঘু যে আমাদের মালতীর ভাতারের দেশের লোক গো। ওদ্দের যে এক গেঁয়ে ঘর।'

সকলে এই নিবিড় সম্বন্ধ-রহস্য শুনে হো হো করে হেসে উঠলো। ঠাকুরমা আবার জিজ্ঞাস করলেন, 'ছিদাম, তোমার দাদাবাবুর নাকি কাল বিয়ে?'

ছিদাম উত্তর দিল, 'তুমি শোননি, গিন্নিমা? তোমরা তত্ব করনি বলে খুড়ীমা একেবারে পেল্লাও হয়ে উঠেছে। দা'ঠাকুরকে কেবলই খুদুচ্চে বিয়ে করবিনি, করবিনি? দা'ঠাকুর ত এদিকে ঘরকে এসে কান্দতে লেগেছে। তেনার নাকি এবার মতও হয়েছে। বড় যে লেখাপড়া-ওলা জামাই করেছিলে! আপনারা কেবল লেখাপড়ার কথা বলো, আমরা বলি উটো কিছু লয়।'

সবাই এ খবর শুনে অবাক হয়ে গেল। এও সম্ভব? তত্ব হয়নি বলে খুড়ীমা না হয় রাগ করতে পারেন, কিন্তু সে? বাবা বললেন, 'না হয় সর্ব্বস্ব বেচে জিনিষপত্র নিয়ে অমুকে শ্বশুরবাড়ী রেখে আসি।' বাবার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। বোধহয় আমার স্বর্গীয়া জননীর কথা তাঁর মনে পড়ছিল।

লাজলজ্জার মাথা খেয়ে আমি বাবাকে বললুম, 'না, বাবা, আমি শুধু হাত-পা নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাবো। আজ বিকেলে আমায় সেখানে রেখে এসো।' বাবার সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক হলো, শেষে আমার বিকালে যাওয়াই স্থির হলো।

আমাদের বাড়ীতে যেন একটা মৃত্যুশোক উপস্থিত হলো। অমন ভালো জামাই করলেন বাবা, আর সেই জামাই খুড়ীমার কথা শুনে আবার একটা বিয়ে করতে যাচ্ছে! লেখাপড়া শিখে শেষে এই দশা হলো? ছিদাম নিরক্ষর লোক হয়েও ত ঠিক বলেছে! আমি ঠিক কিছুই বুঝতে পারছিলুম না, আমার চোখের উপর একটা কালো পর্দ্দা ধীরে ধীরে খসে পড়লো। যখন জ্ঞান হলো তখন দেখি—তিনি আমার শিয়রে দেবতার মত বসে আছেন। সব ব্যাপার ধীরে ধীরে মনে আসতে লাগলো, ভাবলুম বুঝি এ স্বপ্ন, আবার চোখ বুজলুম, আবার চাইলুম, সাদরে তাঁর শুভ্র হাতখানি টেনে আমার বুকের উপর চেপে ধরলুম, তিনি আমায় চুম্বন করলেন—তেমনি কোমল, অস্ফুট, স্নিগ্ধ, প্রীতিময় চুম্বন। আমি তখন যে কিছুই জানতাম না, কিন্তু এই সরল সহজ চুম্বনে আমার কিশোর দেহে একটা তীব্র উচ্ছ্বাস রি রি করে বয়ে যেত। হৃদয়-কমল যেন বিকচ হয়ে উঠতে চায়, মন যেন কিসের মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়, প্রাণ যেন দাসীর মত কার পদতলে লুটিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু সত্যই কিসে? সে এখানে কি করে এলো? আমি স্বপ্ন কি সত্য জানবার জন্য বললুম, 'আজ কিবার গা?

'আজ শনিবার '

'আজ না তোমার বিয়ের দিন?'

'হাঁ'

'তবে এখানে কেন ?'

'কেন, আসতে নেই বুঝি ?'—বলে একটু মুচকে হাসলেন। হাসলে তাকে বড়ই সুন্দর দেখাত। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। আবার যেন আমার আচ্ছন্নভাব ফিরে এল।

৩

একরাশ চুল তাঁর কোলের উপর এলিয়ে পড়েছে, তিনি সাদরে আমার কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, তখন রাত প্রায় একটা। এখনো যে বড় বীণাপাণীর কাছে যাননি ? সে নিশ্চয়ই আমার চেয়েও রূপসী, আমার চেয়েও বিদুষী, সে নিশ্চয়ই ধনী কন্যা,—তবে কেন তিনি আমার সঙ্গে ছল করছেন ? ছেলে বয়েসে আমার বিয়ে হয়েছিল, আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে শিখিনি, তাঁর কথা মনে পড়লেই তাঁর সেই দৃপ্ত ভাবভঙ্গী, সেই তেজস্বী মূর্ত্তি, সেই অটল প্রতিজ্ঞা, সেই পুরুষোচিত ব্যবহার, এই সব আমার মনে পড়তো। তিনি যদিই বা বিয়ে করেন, আমি শুধু তাঁর চরণের দাসী হয়ে থাকবো, আর কিছু চাই না। কিন্তু একদিন ত তিনি আমায় সব দিয়ে ভাল বেসেছিলেন, কতবার শপথ করে বলেছিলেন যে আমি ছাড়া 'আর কেউ তাঁর নেই! সে সব মিথ্যা ? বিশ্বাস হয় না যে! তাই জিজ্ঞাসা করলুম, 'হাঁ গা, এ সব সত্যি ?'

'কি সব ?'

'বীণাপাণীর সঙ্গে তোমার বিয়ে ?'

'আচ্ছা পাগল ত! একটা বিয়ে করে আবার আর একটা করতে আছে ? একমন্ত্র দুবার করে দুজনের কাছে পড়া যায় ? আমার ত সব কেড়ে নিয়েছ—ঐ আংটী পরা ছোট্ট মুঠোর ভিতরে!'

'তবে সেই নিমন্ত্রণের চিঠি ? ছিদাম—এসে যে বললে—'

'বিমল—বিমলকে চেনোনা ? আমার মিতে বিমল ? আজ তার বিয়ে। কোথায় বরযাত্র যাবো, আমোদ করবো, না খবর গিয়ে হাজির—শ্রীমতী অমলাসুন্দরী আমার বিয়ের সংবাদে অজ্ঞান হয়ে আছে। আর ছিদামকে আমিই পাঠিয়েছিলুম—তোমার মনে ধোঁকা দেবার জন্য। সে বেটা মেদিনীপুরী ভূত—চোয়াড়ের সর্দ্দার। এখন হল ত ? বেশ মেয়ে যাহোক! তুমি না আমায় জিজ্ঞাসা করতে যে তুমি মরে গেলে আমি আবার বিয়ে করবো কিনা ? তখন যে বললে বিশ্বাস হত না, আজ দেখলে ত ? কচি ফুলটীর ত বেশ পেটে পেটে বুদ্ধি!'

আমি আনন্দে অধীর হয়ে তাঁর কণ্ঠটী বাহুবেষ্টিত করলুম। তিনি বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, তোমার এও বিশ্বাস হল ? নারীর মন কিনা! সব কথাই আমার মনযোগানো, না ?'

আমি উঠে বললুম, 'না—না—না, বড় ভুল হয়ে গেছে, এবারটীর মত শেষ ক্ষমা কর, হৃদয়ের দেবতা আমার!'

এই বলে তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়লুম।

গুণের আদর

(কয়েকখানি চিঠি)

[শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার]

[শ্রীশ——মণি]

*   *   *   *   *

......ভাল কথা। বসন্তর বিয়ের কথা হচ্চে। তুমি কিছু শুনেছ? এ পক্ষ, ও পক্ষ, সে পক্ষ, আমি সবই শুনেছি। বিয়েতে ঢের কাব্য আছে, ঢের পদ্য আছে। বসন্ত গুণের আদর করে, ভাই, আমরা তার কি বুঝব? আমাদের নিজেদের গুণ নেই আমরা গুণের আদর কি বুঝব? মাসিকপত্রে শ্রীমতি ইন্দুবালার পদ্য আর গল্প পড়ে ইন্দুবালাকে বিয়ে কত্তেই হবে—তার যে গুণ আছে। মন্দ নয়! বসন্তও কবি, শ্রীমতিও কবি। কাব্যে কাব্যে মিলন! সুন্দর! এবার কাব্যে কাব্যে মিলন হয়ে পৃথিবীতে একটা মহাকাব্যের সৃষ্টি হবে দেখছি। বসন্ত ও গুণ, শ্রীমতি ও গুণ, এবার গুণে গুণে 'গুণ' হয়ে মাল্টিপ্লিকেসন। এই আমার মত এক আধটা ম্যাথামেটিসিয়াণ থেকে সব মাটি করে। আর দেখ, ইন্দুবালার গুণ আছে, অতএব তার আর কিছু দেখবার দরকার নেই—জাত, কুল, মান, ধর্ম্ম ইত্যাদি। মাসিকপত্রগুলিই যে ঘটক হয়েছে। তোমরা দেখ, শোন, পড় পদ্য; আর বসন্ত lives poetry! এবং বিয়েতে আজকাল ত জাতবিচারের দরকার নেই। বসন্তর তা—প্রয়োজনও নাই। বোধ হয় বিয়েতে বরযাত্রী যাবার সৌভাগ্য আমার হবে না। তুমি যাবে?

তোমার—শ্রীশ।

২

বসন্ত——শ্রীশ

প্রিয় শ্রীশ,

তোমার চিঠিখানা সময় মতই পেয়েছিলাম। উত্তর দিতে দেরী হোলো—উত্তর দিতামই না অমন চিঠির, যদি না তুমি আমার old class friend হতে।

তোমার মত educated youngmanএর একটু advanced ideas থাকা উচিত। You are a disappointment to the country। তোমাদের nature-টা inflexible হয়ে পড়েছে—যা হওয়া উচিৎ ছিল না। যদি আমি ইন্দুর পদ্য পড়ে মুগ্ধ হয়ে থাকি, যদি আমার প্রাণ তাকে চায়, তাতে তোমার আপত্তি কি? গুণে মুগ্ধ হওয়াটা কি একটা অপরাধ? যদি সে আমাকে সুখী কত্তে পারে, যদি তার presence আমার জীবনে একটা অনন্ত জ্যোৎস্না আনতে পারে, তাতে তোমার আপত্তি কি, বাধা কেন? Allow me to see her feed me with poetry—let me drink poetry from her—তার কোমল হাতের কচি পদ্য, তাই নিয়ে আমাকে পূর্ণ হতে দাও। Well, merit can never fail to cast a fascination on the human mind, can it? দেখ, ফুল দেখে তুমি মুগ্ধ হও, পাখির রূপ দেখে তুমি মুগ্ধ হও, আকাশের চাঁদ দেখে তুমি মুগ্ধ হও—আমি যদি একটু পদ্য দেখে মুগ্ধ হই, সেটা কি একটা বড় দোষ? গুণে মুগ্ধ কে হয়নি ভাই? আর, সে মেয়ে মানুষ, আমি পুরুষ মানুষ, তারও বিয়ে কত্তে হবে, আমায়ও হবে। যদি তার পদ্য পড়ে, তার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকেই বিয়েটা করি, দোষটা কি হোলো? তোমরা যে ভাবে বিয়েটা চাও,—অর্থাৎ একটা ক্রীতদাসী করা—আমি তা চাই না। আমি চাই, সে আমার বন্ধু হবে, সখী হবে, সমান সমান হবে। She

will fascinate me and I her,—we shall live in an eternal dream of fascinations.

তুমি যা বল—দেখা শুনা, কথাবার্ত্তা, মতামত আরো অনেক nonsense—এসবের আমি কিছুই দরকার দেখি না। Seen beauties are good but those unseen are better, and I am not keen on physical perfections। আমি ত তার গুণে মুগ্ধ, দেখা শুনা আর কি করব—beauty does not produce poetry. আর বলছ মতামতের কথা— বলি, মতামত কার নেব? জানত, আমার একজন ছাড়া আর কেউ নেই। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে তারা আমাদের জাত নয়, কিন্তু মেয়ের বাপ মা রাজী আছেন, আর মেয়েটির "গুণ" আছে, যাতে করে আমি মুগ্ধ হয়েছি। I found my mother sensible enough to say, "Do my son, what will make you happy." কথাবার্ত্তা?—I myself did it. I wrote to Indubala herself—যদিও উত্তরটা তার বাবা দিয়েছিলেন। তারা perfectly willing from the very beginning—আর না হবেই বা কেন? I have received you know, the most liberal education that your University has in it to impart—I have inherited from my father property worth thousands, and perhaps দেখতে নেহাৎ কুশ্রী নই। what more can she want?

দেখ প্রত্যেক মানুষেরই নিজের বৃন্তে ফুটতে পাওয়া উচিৎ। একটু নিজের ইচ্ছে মত, স্বাধীন ভাবে জীবনটা গঠিত হওয়া দরকার। না হলে মনের এবং হৃদয়ের full expansion হয় না। In other words, you cannot live a full and ample life. অতি ছেলে বেলা থেকে —since my father's death—নিজের মনের মত করে নিজেকে গড়ে তুলিছি। আমার educationটাও নিজের পছন্দ মত করে নিয়েছিলাম। যেখান দিয়ে অন্যের মতামত প্রবেশ কত্তে পারে, এমন রন্ধ্র আমার কোথাও খুঁজে পাবে না। কার মতামত আমাকে influence করবে? And, তোমার blessed মতামত অপেক্ষা আমার উদ্দেশ্যের attaiment অনেক বেশী valuable and important.

তোমার 'সমাজ'? ভাই, তোমার সমাজের ঢের কাজ আছে, সমাজ তাই করুক। আমার জন্য সমাজ এত ব্যস্ত কেন? বিয়ে করাটা এমন একটা পাপের নিমন্ত্রণ বা প্রশ্রয় নয়, যার জন্তে আমি নিজেকে সমাজের সামনে দণ্ডনীয় বলে মনে কত্তে পারি। সমাজ আমাকে অগ্রাহ্য করবে? দণ্ডনীয় করবে? মনে কর যদি আমি সমাজকে অগ্রাহ্য করি, যদি তার দণ্ড থেকে দূরে গিয়ে বিদেশে বাস করি—সমাজ তখন কি করবে? ধরে আনবে? যদি, ধর, আরো অনেক লোক অমনি করে, তখন তোমার সমাজ কি করবে? সমাজ নিয়ে মানুষ নয়, মানুষ নিয়ে সমাজ। আমাকে বাদ দাও, তোমরাই বাদ পড়বে। বন্ধু, আমার বিশ্বাস—প্রত্যেক লোকেরই একটা না একটা বিশ্বাস থাকে· তোমারও আছে—দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করে, সমাজের চিরকালই একস্থানে স্থির হয়ে থাকা উচিত নয়। Society must be dynamic, not static। জিজ্ঞাসা করি, এটা তোমার সমাজের wisdom না unwisdom যে একই ব্যবস্থা অন্ধের মত সবারই উপর, সব সময় সমান ভাবে চাপান হবে? প্রবাহ তুমি কতক্ষণ আটকাবে, যখন দেখতে পাচ্ছ যে You live in a world of changes? মানুষের মনটা একটা কল নয়, জানত? তোমার শাস্ত্র? যদি তোমার শাস্ত্র সমাজকে ধ্বংশ করতে চায়, যদি সমাজকে ক্ষীণ করতে চায়, তবে বন্ধু, তোমার শাস্ত্র নিয়ে তুমি থাক, আমি পারব না। শাস্ত্রটার যেন বাপমা নেই, মনে হয় ওটাকে orphanage এ পাঠিয়ে দেওয়া উচিৎ।

তোমার সমাজ! এটা কেবল যত অকাজের কাজ করে বাবুয়ানা করে।—always idly busy: আমায় নিয়ে সমাজের মস্ত মাথা ব্যথা।—এই দুর্ভিক্ষে যে শত শত লোক না খেয়ে মরছে, বস্ত্র অভাবে উলঙ্গপ্রায় থাকছে, সমাজের লোক তারা নয়? সমাজ তাদের জন্তে কি করছে? এই যে শত শত নাবালিকা তোমার সমাজের চোখের সামনে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করছে, বাপ মা শ্বশুর

শাশুড়ীর ঘর অন্ধকার করছে, কোথাও বা অন্নাভাবে মরে যাচ্ছে, কোথাও বা কুলভ্রষ্টা চরিত্রভ্রষ্টা হয়ে কত শোচনীয় অনর্থের মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছে, বন্ধুবর, সমাজের তারা নয়? —সমাজ তাদের জন্যে কি কচ্ছে? তোমার সমাজ! এই যে শত শত লোক ছেলের বিয়েতে টাকা টাকা করে কন্যা-দায়গ্রস্ত পিতাকে প্রাণান্ত কচ্ছে, যা দেখতে না পেরে মেয়েগুলো দিন দুপুরে কাপড়ে আগুণ লাগিয়ে মরছে—তারা সমাজের নয়? সমাজ তাদের জন্যে কি কচ্ছে? ধন্য তোমার সমাজ! Do not talk of this infernal, damnable abominable thing—চুলোয় যাক তোমার সমাজ—this imbruted offspring of man's wicked-

ভাই, সমাজের বিস্তর কাজ আছে—আমার বিয়ে বাদ দিলেও। Let it oil its own machine.

তোমরা উঠতে বসতে বল, "ধর্ম্ম" শাস্ত্র and all that humbug। তোমরা অধার্ম্মিক, নাস্তিক, তাই অমনি কর। আমার বিয়েটা কি এই বাংলা দেশ থেকে তোমার ধর্ম্মকে উঠিয়ে দেবে মনে কর? না, বলতে চাও, আমার সঙ্গে আমার বাপমার, আমার ভগবানের যে সম্বন্ধ, আমার এই বিয়েটা সেই সম্বন্ধগুলিকে একেবারে কেটে দুখানা করে দেবে? আমি কি খাই, কি পরি, কাকে বিয়ে করি, তাই নিয়ে কি তোমার ধর্ম্মটা উঠে যাচ্ছে? Why dont you take in this broad fact that religion can never be abolished from anywhere? Do you mean to tell me that my marriage will interfere with your devotion to God? Do you mean to say that your society has the power to prevent me from worshipping as a Hindu by reason of my marriage? তোমাদের চেয়ে বড় নাস্তিক এবং অহিন্দু আর কেউ আছে কি না, জানি না। তোমাদের পাগলামিটাকে একটু ছেঁটে ছুঁটে ফেল। ধর্ম্ম নিয়ে বলবার আগে একটু বুঝে বলতে হয়। ঈশ্বর তোমারও আছে, চোরেরও আছে, সাধুরও আছে, মদের দোকানে আছে আবার দেবালয়ে আছে। ঈশ্বরকে কেউ দিতে পারে না, কাড়তে পারে না। কথায় কথা ঢের বেড়েছে এ কথার এই পর্য্যন্ত। * *

* * * *

তোমার বন্ধু
বসন্ত।

৩

মণি——শ্রীশ

শ্রীশ,

* * * *

বসন্তের বিয়ে নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গিয়েছে। আমি যেতে পারিনি। বোধ হয় একটু রাগ করবে—তার মাও বোধ হয় ক্ষুণ্ণ হবেন। যাক, একবার ওদের বাড়ী গেলেই—সব গোল চুকে যাবে।

মেয়ের বাপের অবস্থা বড়ই খারাপ। বসন্তের একটা শালা আছে এবার বিয়ে পাশ করেছে। ওপক্ষের খরচ পত্রও বসন্তকে দিতে হয়েছে। * * *

* * * *

আমি তার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে তার কাছে কোন মতামত প্রকাশ করিনি বা তাকে কিছু বলিনি। তার প্রধান কারণ এই যে এসব ব্যাপারে আমার যে তেমন একটা মতটত আছে তা নেই, আর আমি এত মাথা ঘামাতে পারিনে। করুক যার যা খুসী—এত আমাদের মাথা ঘামানর দরকারটাই বা কি? দ্বিতীয় কারণ, বসন্তকে ছেলেবেলা থেকেই জানি—সে যা ধরে, তা করেই, কারুর বড় একটা মতটতের তোয়াক্কা রাখে না। যাক, সুখে থাকলেই হোলো। * * *

মণি।

শ্রীশ——মণি

মণি,

হয়েছে কি? চিঠির পর চিঠি লিখেও এই তিন মাসে একটিরও উত্তর আসে না কেন? আছ, না মরেছ? যদি

আছ, ত কোথায় এবং চিঠির জবাব নেই কেন? আর যদি মরেছ, ত তোমার বাড়ীর লোকেই বা সে খবরটা— দিচ্ছেনা কেন—আমার এই শুধু শুধু ডাকের পয়সাটা নষ্ট করাচ্ছে! * * *

তোমার স্নেহের

শ্রীশ।

৫

মণি——শ্রীশ

প্রিয় শ্রীশ,

* * * * ইন্দুবালা মোটেই কবি নয়। সে নামটি পর্য্যন্ত লিখতে পারে না— সম্পূর্ণ নিরক্ষর। দেখতে যেমন কুশ্রী, স্বভাবটাও তাই— রুক্ষ, অপ্রিয়, ক্রোধপূর্ণ। তার বাপের চোখ কান পর্য্যন্ত দেনায় ডুবেছে। ভাইটা এবার বিয়ে পাশ করেছে। প্রথমে কিছুই কেউ জানেনি। যত কিছু পদ্য আর অন্যান্য রচনা ইন্দুবালার নামে বেরুত, সবই তার এই ভাইটার লেখা। বিয়ের পর প্রথম দুই এক আলাপেই ইন্দুর প্রকৃত অবস্থা বসন্ত ধরে ফেলেছিল, তার পর তদন্ত করে সবটাই বার করে ফেলল। বসন্তের যেমন রাগ তেমনি আক্ষেপ আর তুমি এর কোনটাকে দোষ দেবে বল? ইন্দুকে তখুনি ত্যাগ করলে, তার পর ওর বাপ আর ওর ভাইয়ের নামে মোকর্দ্দমা আনতে উদ্যত হোলো—অবশ্য মোকর্দ্দমা করে কেলেঙ্কারী করতে তাকে কেউ দেয়নি। আহা, বেচারা যেমন 'গুণ' চেয়েছিল, তার ভাগ্যে তেমনি জুটল। যাবার সমস্ত ঠিক করে মাকে বল্লে, "তোমার ইচ্ছে হয় তুমি থাক, আমি এ জোচ্চোর দেশে আর থাকবো না। আজই বোম্বাই রওয়ানা হলাম, সেখানেই বসবাস করব, দেশে আর ফিরব না।" তার মা বল্লেন, "যাবার দরকার কি? আবার বিয়ে কর।" সে কথায় বসন্ত কোন উত্তর দেয়নি। তার মা যখন টেলিগ্রাম্ করে আমায় আনিয়ে বসন্তকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে বম্বে যেতে বল্লেন, আমি তখনই জানতাম, বসন্ত ফিরবে না—সে তেমন পাত্রই নয়। তিনি নেহাৎ ক্ষুণ্ণ হবেন, তাই গিয়েছিলাম। বাস্তবিক বসন্তের জন্যে বড়ই দুঃখ হয়। যদি এ জুয়োচুরি না ঘটত, তবে দুটি জীবন কেমন সুখের উপর ভাসতে ভাসতে যেত! বিয়ে স্থির হবার সময় একটু ভাল রকম দেখাশুনা এবং খোঁজ খবর উচিৎ ছিল। এবং তার পক্ষ থেকে আমাদের কিছু করা কর্ত্তব্য ছিল।

* * * *

আমি ইন্দুবালার ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "তুমি এসব করেছিলে কেন?" সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সরল ভাবে এই চমৎকার উত্তরটি দিয়েছিল—"আমি প্রথম প্রথম আমার নিজের নামেই লিখে মাসিক পত্রিকায় পাঠাতাম, কিন্তু কেউ ছাপাত না। তার পর ওর নামে দিতে আরম্ভ করলাম, দেখি সবই ছাপা হতে লাগল! আমারও দেওয়া চলতে লাগলো—মনে করলাম, পরে বই করে বার করলে বেশ কাটতি হবে আর লাভ হবে। এত কাণ্ড যে হবে তাকি আমি জানি! শুনে আমি অবাক!

তোমার

মণি।

বকুল-স্মৃতি

[শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়]

আমি দিই ভাষা, শুধু ভালবাসা প্রাণ দিয়ে সাধা সুর
আজি, তব অন্তর-মধু দিয়ে মোরে করিয়াছ ভরপুর !
আমার মরম-কুঞ্জ-কুসুমে ভরি' যে পূজার ডালা
কলি ছিঁড়ে আজি তোমার সকাশে গাঁথি যে বরণ মালা
কার তরে ওগো কার পথ চাহি জানো কি গো প্রিয়তম
কোন তটিনীর ছায়া সুশীতল বক্ষে বেতস নম ?
ছল ছল ছল, জল-কল্লোল উচ্ছল নদীতটে
আমাদের কথা যাহা রটে ওগো সে কথা সত্য বটে !

- পরশে তোমার ফুটাইলে কলি গন্ধ দিলে যে ফুলে;
পাতার আড়ালে তরুরে ঘেরিয়া লতা হিল্লোলে দুলে,
বিন্দুজলের শুষ্কতৃষায় চাতক মরে যে ডাকি'
কে তুমি আস গো ধরার বক্ষে করুণার-ধারা মাখি ?
সব কথা জানি, সব কথা মানি, সব করি অনুভব
তুমি ছিলে, আছ, হৃদয়ে বাহিরে করিতেছ উৎসব।
আজি তুমি দিলে পাঠায়ে তোমার মরমের সুধামধু
যৌবন আজ ধরেনাক' বুকে, —লজ্জিতা নব বধূ !

বকুলের ফুলে গাঁথিয়াছি মালা দিয়েছি তোমারি গলে
শ্রান্ত হইয়া কভু বা পড়েছি তোমারি বক্ষে ঢ'লে
কভু দিছি চুমা, কভু অনাদর, কভু ফেলা আঁখিজল
কভু কঠোরের নির্ম্মম হাসি, কভু দোষী দুরবল ;
কখনও শুনেছি অভিমান ভরা না শুনাব যেই কথা
'পরাণ-পোড়ানি' দিবস যামিনী 'হিয়া-দগদগী' ব্যথা:
সব মনে পড়ে ভাবে যবে মন কত যে দিয়েছ ঢেলে
নিজেরে বিলায়ে অধমের ঠাঁই কিবা তুমি ফিরে পেলে ?

ভুলে যাই সব তোমার মাঝারে তুমি যে আমার সব
হারাণ-মাণিক, ফিরে-পাওয়া-ধন, কাঙালের বৈভব !

হৃদয় নিঙাড়ি' তরল সুধায় 'বকুল গন্ধ বলি'
পিয়াসী জনারে ভুলাইতে চাও, কেন প্রিয়তম ছলি' ?

তোমার বুকের বকুল বাগানে, ফুল-সম্ভার মাঝে
তুমি কি আমার মূর্ত্ত-মানস, প্রেম-সুন্দর সাজে ?
তরল হইয়া গলিয়া পড়িছে বকুলের মধু যত
মন-মধুপের নাহি গুঞ্জন শুধু আছে পানে রত !
গন্ধ যে তার পুলকিয়া দেহ, আকুলিয়া প্রাণমন
শিহরিয়া তনু, আকুল বাতাস দেয় কার পরশন ?

এত সুন্দর, এত সুগন্ধ মদির আবেশে ভরা
এত পবিত্র এত উজ্জ্বল এত উন্মনা-করা,
এত যে গভীর এত গম্ভীর এত যে মৌন-মূক
তুমি যে কেমন স্নিগ্ধ-মৌন — মহিমায় ভরা বুক !
অন্তরে তব কত মধু আছে, কত প্রেম কত প্রীতি
কত রূপ দেহে, কত রস প্রাণে, কণ্ঠে করুণ গীতি !
পরশ তোমার কত যে মধুর বিরহ-বিধুর পাশে
গুণ-সৌরভ পিছনের স্মৃতি কেমনে বহিয়া আসে !—

আজ আমি তাহা মনেপ্রাণে ওগো জেনেছি বুঝেছি ভালো
ঢালো মধু প্রাণে ওগো মধুময়-ঢালো তুমি-আরও ঢালো' !

———

সত্যেন্দ্র-স্মৃতি

কবিবর সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি

বঙ্গে নবজীবনের সুপ্রভাতে আজি অকস্মাৎ
মাতৃভূমি করি অন্ধকার
কোথা গেলে দেশবন্ধু জনানন্দ মধুচ্ছন্দা কবি
রসসিন্ধু, হে বন্ধু আমার।
কাব্যরাষ্ট্র-যুবরাজ কোথা গেলে হে কবি-'প্রবীর'
রথীদের শিরোচূড়ামণি,
অতুল শোকাগ্রে আজি কল্পকুঞ্জে জ্বলে দাবানল
দেশভরা হাহাকার ধ্বনি।
না হ'তে বোধন মা'র হে পূজারী কোথায় চলিলে
ত্যজি অধিবাসন-সম্ভার?
কার শঙ্খ আমন্ত্রণে দলে দলে জুটিবে সাধক
কে ল'বে শ্রীনান্দীপাঠ-ভার?
জাতীয় জীবনাহবে হোতা, তব, আহুতি ইন্ধনে
পুষ্ট ত্যাগ-যজ্ঞানল-শিখা,
কে রচিবে হোমভস্মে, হে তরুণ-সমাজের গুরু,
তারুণ্যের ভালে জয়টীকা?
মুক্তিতীর্থ-যাত্রিগণ কার গীতে লভিবে পাথেয়,
শক্তি-উৎস, উৎসাহদীপনা?
কার মন্ত্রে অগ্নিমন্ত্র হবে হায় দেশমাতৃকার,
কার সূক্তে হবে উপাসনা?
স্বদেশের প্রতি ব্যথা তব কাব্যে হ'লো স্পন্দমান
হ'লো বন্ধু, ছন্দোময়ী ছবি।
প্রতি হৃদিস্পন্দ তার অনুভব করিলে অন্তরে
হে মরমী, হে দরদী কবি!
বিম্বিত হইল তব চিত্তাদর্শে জাতীয় জীবন
শ্রেণীবদ্ধ ছায়াচিত্রপ্রায়
শুনালে অভয় মন্ত্র অমৃতের পুত্রবৃন্দে পুনঃ
গান্ধীচিত্তপোবনচ্ছায়—।

তুমি ছিলে বঙ্গমা'র অকুণ্ঠিত কণ্ঠের গৌরব
তুমি তার স্বরূপ বাঙ্ময়
শৃঙ্খলিত দশভুজ আজি তার কণ্ঠও নীরব
দুনয়নে শুধু ধারা বয়।

বাণীর মন্দিরালিন্দে হিন্দু আর মুসলমান দোঁহা
মিলাইলে, প্রেম-পুরোহিত,
গঙ্গা যমুনার সাথে মিলাইলে "সাতীল আরবে,"
'সহজে'রে 'সুফী'র সহিত।
'কল্যাণের' সহ তুমি বিনাইলে 'ইমন'-মাধুরী,
'কাফি' সাথে 'সিন্দুর' মূর্চ্ছনা,
চামেলী গুলের সাথে দিলে দূর্ব্বা তুলসী করবী
করিবারে দেবীর অর্চ্চনা।
বঙ্গে নবজাতীয়তা গঠনের প্রজাপতি তুমি
সাহিত্যের নানক-কবীর,
পুরাণের ভক্তিরসে কোরাণের শক্তির মিলনে
তব প্রেম গহন-গম্ভীর।
তোমার অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তার গর্ভে হেরি মুকুলিত
ভবিষ্যৎ ভারতের আশা,
তোমার সঙ্গীত সুরে, পাবে ঢুঁড়ে, ইস্‌লামহিন্দুর
যুক্তবঙ্গ, অন্তরের ভাষা।

ছন্দের পিঙ্গল তুমি। গৌড়ে দিলে ছান্দোগ্য নবীন
বিরচিলে নব "থেরী গাথা"
বঙ্গকাব্য-কলাশ্রীরে দিলে নব্য ভঙ্গি অপরূপ
তুমি "সাম্য-সামের" উদ্গাতা।
তোমার মানসকন্যারূপে জন্ম হ'লো, এ ভাবার
হোমভূমে, ছন্দোভারতীর,
শোভি' অঙ্গ শাঁখা শাড়ী আলতায় সিঁদুরে কাজলে
উজলিল মোদের কুটীর।

হে 'স্বচ্ছন্দ', ছন্দঃশ্রীরে দিলে 'মঞ্জুমরালের' গতি·
খঞ্জনের আঁখি-চপলতা,
খগেন্দ্রের ক্ষিপ্রবেগ, কপোতের গ্রীবাভঙ্গি কিবা
নৃত্যে "মত্তময়ূরের" প্রথা।
ছান্দস পিঞ্জরে তব ছয়রাগ ছত্রিশ রাগিণী
ঝঙ্কারিল অমৃত-ব্যঞ্জনা
যাদুকর, বশমন্ত্রে কল্পনার সহস্র নাগিনী
ও চরণে লুটাইল ফণা।
তোমার ও চিত্তদ্রুমে কল্পলতা উঠিল জড়ায়ে
প্রসবিল সোনার স্বপন
তোমার মানসহ্রদ-তটে ফুটে 'পরীদের' লীলা,
কিন্নরীর নূপুর নিক্কন।
বিতরিল কল্পলক্ষ্মী, শিল্পি, তব "বিদ্যুৎ তাঞ্জামে'
'বিদ্যুন্মালা' বিচ্ছুরিয়া নভে,
"বুল্ বুল্-গুলজার" তব কাব্যকুঞ্জ হইল নীরব,—
হায় হায় চিরমূক রবে!

মেঘমল্লারের সনে কে গাহিবে বসন্তবাহার,
'কেকা' সহ 'কুহু'র মিলন?
কার স্পর্শে শুষ্কশীর্ণ পুরাবৃত্ত রেখার রঞ্জনে
হবে চারু "তুলির লিখন"?
কে বাজাবে রঙ্গমল্লী? কে গাহিবে বঙ্গের অঙ্গনে
"বেণুবীণা" মিলনমঙ্গল?
মূর্ত্তিমান মধুমাস, গেলে চলে,—কে ফলাবে আর
কল্পকুঞ্জে "ফুলের ফসল"?

শত তীর্থ হ'তে আনি পুণ্যবারি সাধিয়াছ কবি
অভিষেক বঙ্গভারতীর,
সুধাস্তম্ভি তব কণ্ঠে ঝরিয়াছে গোমুখী-ধারায়
জ্ঞানগঙ্গা বিভিন্ন জাতির।
"গঙ্গাহৃদি বঙ্গে" রহি শুনিয়াছি তোমার সঙ্গীতে
সপ্তসিন্ধু-তরঙ্গের তান,
অর্হতের বোধিমন্ত্র, বিশ্বমহাকবিদের বাণী,
তব কণ্ঠে অমৃতায়মান।

মহামানবের ভক্ত মহাপ্রাণ, নর নারায়ণ
চিরবন্দ্য দৈবত তোমার
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মাঝে কে তোমারে করিবে বন্দিত
চিত্ত তব বিরাট উদার।
বৈনতেয়সম তুমি ছুটিয়াছ অমৃত সন্ধানে
দাস্যমোক্ষ—আগ্রহে অধীর,
কৃত্রিম শৃঙ্খলা ভাঙি উড়ায়েছ মৈত্রীর পতাকা
হে স্বতন্ত্র, হে বিদ্রোহী বীর।

প্রবলের উৎপীড়ন নির্য্যাতন দুর্ব্বল-দলন
কোনদিন থাকনিক' সয়ে',
উগ্ররোষে খড়্গাকরে ভদ্রকালী প্রতিভা তোমার
জ্বলিত যে রুদ্রকালী হয়ে'।
জাতিভেদ, পণপ্রথা, স্পর্শভীতি, বিধবানিগ্রহ,
আভিজাত্য-বিত্ত-অভিমান,
সহিতে পারনি তুমি। বিঁধিয়াছ লেখনীশায়কে
ধন্য তব ন্যায়-অভিযান।
যেথানে কাপট্য শাঠ্য হীনস্বার্থে হেরেছ উদ্যত
দেছ তুমি তীব্র কষাঘাত,
তুমি নাই, মৌনীমূক লাঞ্ছিতের সংসার আঁধার,
ভণ্ডদের হলো সুপ্রভাত।

হে ঋত্বিক ঋতম্ভর, ঋজুক্রতু, সারস্বতব্রতে
একনিষ্ঠ তুমি তপোধন,
ভারতের ভারতীর আরতির তরে মহামতি
সমুৎসৃষ্ট তোমার জীবন।
প্রাচীন-গৌরব-গাথাগীতাঞ্জলি প্রতিভা তোমার
ভারতের চির আরাধিকা
এ বঙ্গের শমীবনে, হে শমীন্দ্র, পাবক হতে পুনঃ
সন্দীপিলে পূত "হোমশিখা"।
পিটক-পুরাণ-তন্ত্র-শ্রুতিধারা তব কণ্ঠে মিলে
হলো নবরস-পারাবার,
লভিল নিরস তথ্য মধুমতী সঙ্গীতমূর্চ্ছনা
গীতা,—গীতগোবিন্দ-ঝঙ্কার।

কৃত্তিকা কয়াধূ কুন্তী অরুন্ধতী মেনকার ব্যথা
আজো যে গো হয়নি বিলীন,
সাশ্রুনেত্রে হেরিয়াছ জ্বলে আজো মুর্ম্মুর-দহনে
ভারতের মর্ম্মে নিশিদিন।
প্রজ্ঞান বিজ্ঞান তত্ত্ব ইতিহাস সাহিত্য সঙ্গীত
অবিশ্রয় লভি একঠাই,
হে সত্য, স্বজিল তোমা, মূর্ত্তিমান সত্যাগ্রহ, শর,
সত্যসন্ধ তুমি আজ নাই!
সত্য নাই? মিথ্যা কথা! সত্য যে গো অক্ষয়অমর
না—না—সত্য, তুমি সনাতন,
তোমার চিন্ময়ী সত্তা চিরদিন মৃণ্ময়ী মাতার
জাগাইবে অঙ্গ শিহরণ।
সত্যেন্দ্র, তোমার দান অনশ্বর শাশ্বত সম্পদ
নহে শুধু অলস ঝঙ্কার
এ ত নহে প্রাণহীন রসহীন বচন-রচনা
শুধু আত্মযশের প্রসার।
বজ্রের অক্ষরে তুমি বক্ষে যাহা দিয়াছ দাগিয়া
কেমনে তা, লুপ্ত হবে প্রিয়?
সত্য যার প্রাণবস্তু, আত্মা যারে দিয়াছে স্বরূপ
সে যে নিত্য,—চিরস্মরণীয়।

হারায়ে লেখনী তব, এ বঙ্গের জীবন সংগ্রাম
হলো আজি পাশুপত-হারা
বিশ্বকবি সভামাঝে কারে প্রেরি? মোদের গুরুর
কে রাখিবে গৌরবের ধারা?
আশানেত্রে চেয়ে ছিনু তোমাপানে, মনে মনে রচি'
সংকল্পিত বিজয় মঙ্গল,
কত স্বপ্ন গৌরবের, তোমা ঘেরি করেছি বয়ন
আজি সখা সকলি বিফল।
সাহিত্যের সব্যসাচি, জ্যারোপণ তোমার গাণ্ডিবে
করিবার যোগ্য নহি মোরা,
ক্ষাত্রিতে শক্তি নাই, তব অস্ত্রী বক্ষে চাপি শুধু,
ঝরঝর ঝরে অশ্রু মোরা।

স্মরি তব সৌম্য মূর্ত্তি নম্রকান্ত, হে বন্ধুবৎসল,
মিতভাষী যশে উদাসীন,
তোমার চরিত্র স্মরি অক্রুরের মতন অক্রুর,
অনবদ্য অবক্র স্বাধীন
ওষ্ঠাধরে চাপি কষ্টে বাষ্পোচ্ছ্বাস পারিনা রুধিতে,
তুষানলে গুমরে অন্তর,
প্রাণের পুঞ্জিত অর্ঘ্য সমারোহে সঁপিতে তোমায়
হায় ক্রুর দিলে অবসর?
রুদ্ধ হয়ে আসে কণ্ঠ, অরুন্তুদ মর্ম্মবেদনায়
শোকম্লান লোচন-দর্পণ,
কবিকল্প-স্বর্গে রতি লভ আজি হে অগ্রজদেব,
অনুজের প্রেমাশ্রু তর্পণ।

বঙ্গবাণী শ্রীকালিদাস রায়।

সত্যেন্দ্র-বিয়োগে

'শরৎ-আলোর সোনার হরিণ' ছুট্‌ল না ত' গগন-পারে—
কে ভুলালো তোমায় কবি, অমানিশার অন্ধকারে?
পারের পারিজাতের স্বপন চাইল নয়ন-দুটখানিতে,
সারাভুবন পেরিয়ে গেলে কোন্ অচেনার হাতছানিতে?
হঠাৎ বুঝি পড়ল চোখে মেঘের কোলে মরাল-সারি—
মানস-সরোবরের পথে চল্‌লে উড়ে' সঙ্গে তারি?
হায় কবি হায়, ফুলের ফসল ফুরায়নি যে!—দিন ফুরালো!
শিউলি-বকুল সবগুলি ওই হাত দু'খানি কই কুড়ালো?
মনের বনের যে সব কুঁড়ি ফুট্‌ল না আর গানের বোঁটায়,
দূর-বাগানের হাস্নুহানার গন্ধ হ'য়ে হাওয়ায় লোটায়!
আঁধার-রাতের হাস্নুহানা! হাস্‌বে না আর জ্যোৎস্নারাতে!
মরণ-সাপের গরল-নিশাস জড়ায় যেন কেয়ার পাতে!

বঙ্গবাণীর প্রাণের দুলাল!—বুক-জুড়ান কোলের ছেলে!
মায়ের আঁচল-বাঁধা প্রসাদ সবটুকু সে তুমিই পেলে!
ঘুমপাড়ানি গানের ছড়া শিখলে তুমি ঘুম না গিয়ে—
বাংলা-বুলির বুলবুলি গো!—হাজার সুরে সুর মিলিয়ে!
মায়ের মাথার সিঁথির পাটি, মায়ের হাতের পৈঁছা-খাড়ু
অবাক হয়ে দেখলে চেয়ে, ভবলে হাতে মিঠাই নাড়ু!

তাপস তুমি! তপের বলে আন্‌লে সকল বিঘ্ন নাশি'
ছন্দ-ভাগীরথীর ধারা—উঠল জীয়ে ভস্মরাশি!
মৌন-মৃত যাদের বাণী সংস্কৃতের পাতালপুরে—
জয়জয়ন্তী গাইল তারা নূতন ক'রে তোমার সুরে!
শঙ্খ-সাগর যেথায় ছিল, মিলিয়ে দিলে সেই মোহনায়
ঘুম্‌তি সাথে পাগলা-ঝোরা, সরযু সাথে শোণ-যমুনায়!

আন্‌লে ভ'রে ভাষার ঘটে সকল জাতির তীর্থ-সলিল,
ভুবন-জোড়া ভাবের হাটে পৌঁছে দিলে দাবীর দলিল!
তোমার মুখে বেণুর আওয়াজ সোনার বীণায় হার মানালো!
'কুহু-কেকা'য় ফুল-ফাগুয়ায় চমকে উঠে বিজলী-আলো!
'অভ্র-আবীর' অঞ্জলিতে রঞ্জিলে যে চরণ তুমি—
শোভায় তাহার ধন্য হ'ল 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'!

পুরাতনের বিপুলপুরী—ভিতর-আঁধার দেব-দেউলে,
মণিকোঠার দুয়ার ঠেলে ধরলে স্মরণ-দীপটি তুলে!
যুগান্তরের যবনিকায় লুকায় যে সব যুগ-সারথি—
তোমার কবি-চিত্রশালায় নিত্য তাদের ধূপ-আরতি!
কোন্ সে-কালের রাজবধূরা চুলগুলি দেয় 'ধূপের ধোঁয়ায়'—
তাদের বসন-ভূষণ-ছটায় উচ্চশিরও কুবের নোয়ায়!

বাদল-দিনের দুই-পহরে আকাশ-ঘেরা মেঘের তলে,
শুন্‌ছি তোমার কাজরী-গাথা—মন্ আঁধারে মাণিক জ্বলে!
কান্নাসুরে প্রাণের বেদন মধুর করে' তুল্‌ছে কারা?
কাজল-নয়ন সজল তাদের; কণ্ঠে সুখের সুর-ফোয়ারা!
বাদল-বায়ে দুলিয়ে দোলা, লুটিয়ে বেণী পিঠের' পরে,
তোমার দেয়া গানের ধুয়া বছর-বছর এম্‌নি ধরে!

গৌড়-সারং বাজবে না আর? গান-গাওয়া কি থামল তবে!
শুক্লা তিথির গান-দশমী অর্দ্ধরাতেই আঁধার হবে!
সেই কথা কি জান্‌তে তুমি?—প্রহর-শেষের মরণ-ছায়া
ঘনিয়ে আসে, দেখলে চেয়ে?—তাই সে এমন করুণ মায়া
ফুটিয়ে দিলে চাঁদের মুখে, সবার-সেরা গরবা-গানে—
প্রাণের নিসুত্-নিদ্-রাগিণী গাইলে চেয়ে তারার পানে।

ডালিম-গাছের তলায়-তলায়, পঙ্কমুখী-জবার বনে,
পাপ্‌ড়ি কে আর গুণবে কবি, মন্দ-মধুর গুঞ্জরণে?
টিয়ার-পালক-সবুজ ক্ষেতে উড়বে যখন শালিক ফিঙা,
ভাদর-ভরা গাঙের কূলে ভিড়বে মকরাঙ্গী ডিঙা—
মা যে তোমার নামটি ধরে' যুগে যুগেই ফিরবে ডেকে!
—গানের মাঝেই মিল্‌বে সাড়া ভাগীরথীর দু'পার থেকে।

ভারতী শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

কবি সত্যেন্দ্র

অসত্য যত রহিল পড়িয়া সত্য সে গেল চ'লে
বীরের মতন মরণটারে চরণের তলে দ'লে।
যে ভোরের তারা অরুণ রবির উদয় তোরণ দোরে—
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আরাব প্রথম ভোরে,—
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টীকা
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায় দীপ্ত তাহারি শিখা!
মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল-ধারা,
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই, নিবে গেছে সব বাতি
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি,
হেন দুর্দ্দিনে বেদনা-শিখার বিজলী-প্রদীপ জেলে
কাহারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারে বারে তব দীপ নিবে যায়, জ্বালো তুমি বারে বা[রে]
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপাতারে চাবুক মারে।
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ-শিখার কবির দীপান্বিতা?
কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দুমুঠা ছা[ই]
ডাক দিয়োনাকো, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই
ডাক দিয়োনাকো, মূর্চ্ছিতা মাতা ধূলায় পড়িয়া আছে,
কাঁদি ঘুমায়েছে কবির কান্তা জাগিয়া উঠিবে পাছে!

ডাক দিয়োনাকো, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই
গঙ্গা সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই!
আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভতলে তুমি সতী?
সত্য-কবির সত্য-জননী ছন্দ-সরস্বতী?

ঝিমসিয়া গেছে দুচোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি,
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি'
সাত কোটি এই ভগ্নকণ্ঠে ; অবশেষে অভিমানী
ভর দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী।
ডাকিছ কাহারে আকাশ পানে ও-ব্যাকুল দুহাত তুলে ?
কোল মিলেছে মা শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী কূলে !

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁঝের তারায়,
কা'ল যে আছিল মধ্য-গগনে আজি সে কোথায় হারায় ?
সাঁঝের তারা সে দিগন্তরের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ পার সে দেখায় কিরণের ইসারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম কার চলে আর যায় কেঁদে যায় দেয়া,
পরপার পারাপারে ছাধা কার কেতকীপাতার খেয়া ?
হুতাশিয়া ফেরে পুরবীর বায়ু হরিৎ হরির দেশে
জর্দ্দাপরীর কনক কেশর কদম্ব-বন-শেষে।
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কবি সে আসিবে না আর ফিরে,
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে।

তুলির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ রক্ত-রাগে
হুল হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবজী বাগে,
আজিও 'তীর্থ রেণু ও সলিলে' 'মণি মঞ্জুষা' ভরা,
বেণু বীণা' ভরি 'কুহু কেকা' রবে আজো শিহরায় ধরা,
জলিয়া উঠিল 'অভ্র আবিরী' ফাগুয়ার 'হোম-শিখা,'
হি-বাসরে টিট্‌কিরি দিয়ে হাসিল 'হসন্তিকা,'—
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
ত্য-প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যেটা হ'ল ছাই !
ল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহা শূন্যে মিলাল ফাঁকা,
জন দিনের সত্য যে, সেই রয়ে গেল চির-আঁকা !

নত-শির কালজয়ী মহাকাল হয়ে যোড়-পাণি
কে বিজয় পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি।
আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি মাঝে,
খেয়ালী বিধির ডাক এলো তাই চলে গেল আন কাজে।
গো যুগে যুগে কবি, ও মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
বির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য সুন্দর ভগবান।

ধরায় যে বাণী ধরা নহি দিল, যে গান রহিল বাকী
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে সত্য সে নহে ফাঁকি।
সব বুঝি ওগো, হারা ভীতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি
হয়ত যা গেল চিরকাল তরে হারানু তাহার দাবী।

তাই ভাবি আজ সে শ্যামার শিষ, খঞ্জন নর্ত্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুণঃ কোন্ নন্দন-বন !
চোখে জল আসে হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।
আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণীমনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
মরণ-শয়নে চমকি চাহিল বাঙালী নির্নিমিখ।
বাঁশীতে তোমার বিষাণ্ মন্ত্র রণরণি ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়।

করনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়াওনি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নিক কভু তাই
বল-দর্পীর দম্ভ তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই !
যশলোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী দামা-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।
মেকীর বাজারে আমরণ তুমি রয়ে গেলে কবি খাঁটী।
মাটীর এ দেহ মাটী হ'ল, তব সত্য হ'ল না মাটী।
আঘাত না খেলে জাগে না যে-দেশ, ছিলে সে দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্য্য-বাদক বালক।

কে দিবে আঘাত ? কে জাগাবে দেশ ? কই সে সত্য-প্রাণ ?
আপনারে হেলা করি' মোরা করি ভগবানে অপমান।
বাঁশী ও বিষাণ নিয়েগেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি।
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখনি খাতির দারী
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বলনিক দয়া, বলেছ অত্যাচার,
গড় করনিক নিগড়ের পায়, ভয়েতে মাননি হার।

অচল অটল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয় গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য করেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।

হে মহা মৌনী, মরণেও তুমি মৌন মাধুরী পিয়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল করা গীতি নিয়া।
তোমার প্রয়াণে উঠিলনা কবি দেশে কল-কল্লোল,
সুন্দর, শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল!
স্বর্গে বাদল-মাদল বাজিল, বিজলি উঠিল মাতি,
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রাতি।
কেহ নাই জাগি' অর্গল দেওয়া সকল কুটীর দ্বারে,
পুত্র-হারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে!
নিশীথ শ্মশানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস-পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালাল ঐ চিতা!
ভগবান! তুমি চাহিতে পার কি ঐ দুটি নারী পানে?
জানিনা তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে!

ভারতী কাজী নজরুল ইস্‌লাম।

সত্যেন্দ্র প্রয়াণ

তরুণ-তনু ঊষা অরুণ মঞ্জুষা পরশে সবে এসে অঙ্গ,
তপন চুম্বনে নয়নে ঘুম বোনে মিলন সুনিবিড় সঙ্গ!
কমল নীল-নীরে মেলিছে আঁখি ধীরে, বিহগ তরুশিরে গুঞ্জে
সজল সমীরণ তুলিছে শিহরণ, প্রাবৃট জাগরণ কুঞ্জে—
মাদল বাজে মেঘে বাদল চঞ্চল বরষা অঞ্চল মুক্ত,
সরসী বিহ্বল কোমল ধরাতল শ্যামল তৃণ দল ভুক্ত
কানন কুন্তল আকুল করি বহে পবন শীতবারি-সিক্ত,
সজল নীল-আঁখি ঝরিছে থাকি থাকি কাজল রেখা সম্পৃক্ত!
মরাল ভরা জলে ভাসিছে কুতূহলে ললিত গ্রীবা করি উচ্চ:
দাহুরী দূরে ডাকে, নাচিছে নীপ-শাখে ময়ূর মেলি মণি-পুচ্ছ;
কমল কেতকীর সজল সুপরেণু, মিলনাকুল বেণু-রন্ধ্র,
তপন জ্যোতিহীন গোপন সারাদিন গগনে ঘন-মেঘ-মন্দ্র;
দামিনী বাতায়নে হাসিছে ক্ষণে ক্ষণে চকিতে চমকিয়া বিশ্ব,
সভয়ে ফিরে চায় শূন্য আঙিনায় তরুণী বিরহিণী নিঃস্ব!
রেচন জলদের সেচন ক'রে বারি উশীর-সুরভিত ক্ষেত্রে;
নীরবে বনবীথি স্মরিছে কার স্মৃতি দাঁড়ায়ে অবনত নেত্রে;
মুক্ত-বেণী কূলে বীণাটি ল'য়ে ভুলে মুগ্ধ কবি গায় স্তোত্র!
সকল তারে তার তুলিয়া ঝঙ্কার নিখিল মিলনের শ্রোত্র!
সহসা আসি কোন্ রুদ্র ত্রিলোচন করাল শূলপাণি ঝঞ্ঝা
করিল অঙ্কিত ভাল-ত্রিপুণ্ড্রকে কাল-কলঙ্কিত-পঞ্জা!

• • •

তরুণ কবি গেছে বিদায় লয়ে আজ—না হ'তে যৌবন ছিন্ন
উজল মণিহার গিয়াছে ফেলি তার অমর-প্রেম-স্মৃতি-চিহ্ন;
বেণু ও বীণা যার বেজেছে বার বার কত না কবিতার ছন্দে
এঁকেছে অবনীর মোহন তসবীর তুলির লেখা শতপত্রে;-
ভুলায়ে গেছে সবে কুহু ও কেকারবে ফুলের ফসলে সে নিত্য
চীনের ধূপ জ্বালি অগুরু সৌরভে ভরিয়া গেছে শত চিত্ত;
জ্বালায়ে হোম-শিখা দিয়াছে রাজ টীকা তীর্থ সলিলে যে ভক্ত
স্বদেশ গাথা যার শুনিলে প্রতিবার শিয়রে শিহরিত রক্ত:
কাহিনী কথা গান কবিতা অনুরাগ—নাট্য-অবদান হাস্য,-
জীবন রস রাগে জীবনে সদা জাগে, ভারতী মাগে যার দাস্য
কল্প-কলা-বিদ্ কলাপে অবহিত—বাঙালী ধনী যার গর্ব্বে
ভ্রমিয়া দেশে দেশে তীর্থরেণু যে সে কুড়ায়ে, বিলায়েছে সর্ব্বে
ভাষা ও ভাবে যার স্বর্গ সুষমার অসীম অনুপম বৃদ্ধি
ছন্দ-যাদুকর শব্দ-সুর-ধর সুতান লয়ে' যার সিদ্ধি,
রচিতে রস-কলি-খচিত পদাবলী যে ছিল সুনিপুণ যন্ত্রী,
ত্রিদীব সংগীতে ক'রেছ ঝঙ্কৃত রঙ্গ-মঞ্জীর তন্ত্রী
অভ্র-আবীরে যে খেলেছে হোলি-খেলা হসন্তিকা সখী সঙ্গে
শ্রাবণ হিন্দোলে আবেশে ছিল ঢ'লে উদাস প্রেম-রাস-রঙ্গে
প্রতিভা আপনার অটুট ছিল যার পরশি রবি-রথ-চক্র
অমৃত-কণা ভুলি গরল-ফণা তুলি—করেনি শির কভু বক্র
হেরিলে অবিচার শাসিত বার বার বিদ্রূপ নব কবিরত্ন
ব্যঙ্গ কশাভারে সুমতি দানিবারে ধৃষ্টে—ছিল যার যত্ন;
ধূপের ধোঁয়া যার দেবীর কেশভার করেছে সুচিকণ স্নিগ্ধ
টুটিতে বন্ধন অটুট যার মর্ম্ম—ছিল না কভু সন্দিগ্ধ,
মহান মানবের—যে ছিল ঋত্বিক, চারণ-বীরগণ-কীর্ত্তি,
শ্রদ্ধা চন্দনে স্তুতি ও বন্দনে ত্যাগীর পূজা যার বৃত্তি—
বিগত-গৌরব কীর্ত্তি অতীতের কহিয়া পতিতের কর্ণে
ঘোষিল যার শ্লোক স্বজাতি সব লোক, অলীক ভেদাভেদ বর্ণে
মানব-সেবা সার, অচলা মতি যার মাতৃচরণারবিন্দে
উদার মহামনা অমিত গুণপনা শত্রু নাহি যারে নিন্দে,
শান্ত দৃঢ়মতি শিষ্ট সুধী অতি সুজন কৃতি সুচরিত্র,

সাহসী সংযত জগত-হিতব্রত সতত প্রিয়ভাষী মিত্র !
গিয়াছে চলি আজ কঠিন-গুরু-বাজ হানিয়া অসময়ে বক্ষে,
অসহ বেদনায় কাতর কোটী প্রাণ-উতল আঁখিধারা চক্ষে;
জনম দুঃখীদেরে যে মণি মঞ্জুষা—দিয়াছে উপহার কাব্যে—
আঁকড়ি তাই বুকে বিরস ম্লান মুখে নীরস দিন তারা যাপ্‌বে !

• • •

চলিয়া গেল কবি ফেলিয়া ছন্দভি না হ'তে সঙ্গীত পূর্ণ ;
উজল আঁখিতারা বাণী যে বীণাহারা গলার গজমতি চূর্ণ !
মুদিত শতদল, অলস অঞ্চল, নূপুর-নিক্বণ স্তব্ধ,
নীরব এস্রাজ, থেমেছে পাখোয়াজ, মুরলী মূক ভুলি শব্দ ;
সত্যপথচারী ফিরিল গৃহে তাবি সত্য ছিল যার দৌত্য,—
সুবাসে দিক্ ভরি পড়িল ফুল ঝরি মধুপে দিয়ে তার মৌত্র !
মরণ-মেঘরথে চলিল প্রিয়-পথে বিরহী অলকার যক্ষ,
ভুলিয়া দু'দিনের স্বপন-লোক মেলা আমোদ-হাসি-খেলা-সখ্য !

ভারতী শ্রীনরেন্দ্র দেব।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ

সত্য তুমি, ইন্দ্র তুমি, রচ্‌তে সুরের ইন্দ্রজাল,
বেসুরো এই মিথ্যা ধরা আর কি ভাল লাগ্‌লো না,
ফুল ফুটিয়ে কোথায় গেলে চক্রবালের অন্তরাল,
মঞ্জরিত কল্প-পাদপ ফল ধরাতে থাক্‌লো না।

সবুজ পরী অলকপুরী বন্ধ আজি কর্‌লে দ্বার,
থাম্‌লো অঘোর মুক্তা-ঝরা পাগ্‌লা-ঝোরার মুখ থেকে ;
কোন সে দারুণ জহ্নু মুনি গণ্ডূষেতে ভর্‌লে তার
সন্তঝরা গঙ্গাধারা রুক্ষ ধরার বুক থেকে !

নওকো বেলী, নও চামেলী সত্য তুমি গন্ধরাজ,
পীযূষভরা প্রাণটি গড়া ভালবাসার বিশ্বাসে,
ভোম্‌রা তোমার নিত্য চারণ কাঁদ্‌ছে শোনো বন্ধু আজ,
পারিজাতের জাত যে তুমি, শুকাও ধরার নিশ্বাসে।

পাহাড় কেটে আন্‌লে নদী প্রেমিক ফর্‌হাদ ভাই তুমি,
পান না করি' স্নিগ্ধ বারি কর্‌লে পয়াণ কোন দূরে,
হেথায় তোমার শিরিন্ কাঁদে কোথায় সখা কই তুমি,
হায়রে মানস-যাত্রী মরাল চায় না ফিরে বন্ধুরে।

বিশ্ববাণীর নূপুরধ্বনি বাজ্‌তো তোমার সুরটিতে
বর্ণে আলোয় গন্ধে নূতন সুর মিশাতে জান্‌তে গো,
তোমার বুকের সাত-মহলায় পরিমলের পুঁটিতে
দিল-দরদী তোমার দয়া দীনের লাগি কাঁদ্‌তো গো।

তুচ্ছ সে দীপ আলাদীনের, তোমার সখী আসমানী
আস্‌মানেতে গড়্‌তো তুলে অমর-পুরী তাজমহল,
তাঞ্জামেরে ছাড়্‌তো যে পথ সূর্য্য-তুরগ রাশ মানি',
আন্‌তো ছুরী নিংড়ে আঙুর দূর সিরাজের আল্‌কহল

ফুলের কবি পালিয়ে গেলে আজকে ফলের মরসুমে
এই ধরাকে তরুণ করে' করুণ কোমল সঙ্গীতে,
হায় যুবরাজ কাঁদ্‌ছে যে আজ ভাইটি তোমার কর চুমে
সান্ত্বনা দাও শান্তিকামী মুক্ত আঁখির ইঙ্গিতে।

প্রবাসী শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ

হে দীর্ঘ পথের বন্ধু, হে কবি সচ্ছন্দ ছন্দরাজ !
একি অভিনব ছন্দে মৃত্যুমন্ত্রে বরি' নিলে আজ
আপন মর্ম্মের মাঝে, সহসা পথের মধ্যখানে ?
অতৃপ্ত তৃষ্ণার মত সুর শুধু ঘুরে' মরে কানে !
রিক্ত-আশা বঙ্গভাষা—বিয়োগিনী কাঁদিছে করুণ
দুর্ভাগ্য দেশের বুকে ;—মধ্যপথে মুদিত অরুণ !
বিরহের মন্দাক্রান্তা আষাঢ়ের মেঘমন্দ্র মাঝে
গুমরি' গুমরি' তাই বাঙ্গলার বক্ষে আজি বাজে !
শুনেছি বরুণ-মন্ত্রে বিনামেঘে বৃষ্টিধারা ঝরে,
প্রমূর্ত্ত দীপক রাগে কলাবিৎ নিজে পুড়ে' মরে :
জানিনাক কোন্ সুরে বন্ধু তুমি সেধেছিলে বাণী—
রুদ্র পরিণাম যার মূর্ত্তিমান দেখা দিল আসি'
সমস্ত দেশের বুকে অকস্মাৎ বজ্রব্যথা হানি'—
বঙ্গ-সারস্বত কুঞ্জে মূর্চ্ছাতুর নিজে বীণাপাণি !
যাজ্ঞিকের হোমশিখা সমারব্ধ যজ্ঞ-সূচনায়
লাগিল কেবল গৃহে ; যজ্ঞ শেষ হ'ল না'ক হায় !
ভৃঙ্গারে শুকায়ে গেল সমাহৃত পুণ্যতীর্থবারি,
ভক্তের নয়নে শুধু রাখি' তার শেষ অশ্রু-বারি,

কাব্যের নিকুঞ্জ থেকে কুহু-কেকা লভিল বিদায়,
চোখ্ গেল—চোখ্ গেল ভয় কুরে আজি বাহিরায়!
তুলিখানি অশ্রুজলে অঙ্কে তুলি রাখিলা ভারতী—
কে লিখিবে লেখা আর, কে করিবে একান্ত আরতি
নিত্য নব নব ছন্দে মন্দিরেতে তুলিয়া ঝঙ্কার,—
কভু সহজিয়া ভাষা, কভু সাম, কভু বা ওঙ্কার!
আর কেন ছন্দ গাঁথি? বন্ধু গেছে ছন্দ লয়ে' সাথে;
মোরা শুধু মন্দভাগ্য, পড়ে' আছি চাহিয়া পশ্চাতে
শুধিতে দুঃখের ঋণ! নেত্রপথ রুদ্ধ অশ্রুজলে—
কবে মিলাইবে তার দৃশ্যপট যবনিকা-তলে?
শুধু থেকে থেকে আজ এক কথা জেগে উঠে মনে,
কেন তুমি চলে গেলে অকস্মাৎ হেন অকারণে।
যাবার সময় তা যে শুধাবার দিলে না সময়,
শুধাবার দূরে থাক্—হ'লনাক দৃষ্টি বিনিময়।
দুর্ভাগিনী বঙ্গভূমি—ছিল যে প্রাণের চেয়ে প্রিয়,—
যার নাম জপমালা, নামাবলি যার উত্তরীয়
ছিল তব অনুদিন, সে বঙ্গ তেমনি ভাগ্যহীন,
লাঞ্ছিত বিশ্বের দ্বারে, পায়ে পায়ে পরের অধীন;
তারে কি বলিয়া আজি ছেড়ে গেলে, তাই ভাবি মনে—
সিংহাসন কৈ দিলে? লুটায় সে কণ্টক-আসনে।
রাণী বলে' ডেকেছিলে—এই কি রাণীর যোগ্য সাজ,
জননী বলিয়া ডাকি' ঘুচালে না জননীর লাজ!
হে দেশবৎসল, তবু সত্যসন্ধ তোমারি সন্ধান.
আজি আরো হানে মর্ম্মে—তব সত্য কত বড় দান
যাহা তুমি রেখে গেছ; মূর্ত্তি যত পশ্চাতে লুকায়,
অভাবের অন্ধকার ঝলি' উঠে দীপ্ত প্রতিভায়।
তাই চোখে পড়ে যত ধরণীর ধূলি আর বালি,
দেশজোড়া অসত্যের পুঞ্জীভূত কলঙ্কের কালী।
তবু যে তোমারে চাই—ভাব নিয়ে ভরে না জীবন,
মাটীর মানুষ মোরা—মাটী যে একান্ত প্রয়োজন!
কি ফল বিফল বাক্যে? গেছ যদি, যাও কবি যাও—
ফুলের ফসল ফেলি' এ ধরার যদি সুখ পাও
নবীন নন্দনে আজি অম্লান মন্দারে ভরি' ডালা
গাঁথিতে নূতন ছন্দে বরদার বর কণ্ঠমালা।
হেথা সবি পুরাতন, ধূলিম্লান দৈন্যভারাতুর
চিত্ত নিত্য অশ্রুনেত্রে চায় হেথা বিয়োগবিধুর!
নিষ্কলঙ্ক মাতৃনেত্রে ঝরে সেথা যে প্রসন্ন হাসি,
তারি স্পর্শে ধৌত হোক্ ধরণীর সর্ব্ব ধূলিরাশি।

প্রবাসী শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।